সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম আলো

নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে জমিদারের বজরা। আষাঢ় মাসের আকাশে নবীন মেঘ লুকোচুরি খেলে দিনমণির সঙ্গে, কখনও হঠাৎ এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাবার মতন এক পশলা বৃষ্টি, কখনও ঝলমলে রোদ। দু পাশের তটভূমি জলরঙে আঁকা। কোথাও জনবসতি, কোথাও নিবিড় গাছপালা, আবার মাঝে মাঝে শূন্য প্রান্তর। নিছক শূন্য প্রান্তর কোনও শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে তা-ও ছবি হয়ে যায়। কখনও সূর্যালোক, কখনও মেঘের ছায়ায় ছবিগুলির রং বদলে যায়।

বজরাটি বিশেষ বড় নয়, দাঁড়ি-মাঝির সংখ্যা ছ'জন। ছাদের ওপর দুজন বন্দুকধারী প্রহরী বসে আছে ছাতা মাথায় দিয়ে। একই হুঁকো-কলকে পরস্পর বদলাবদলি করতে করতে তারা গল্প করছে নিচু গলায়। এ বজরার মাল্লাদের অকারণে হল্লা করার নিষেধ আছে, খুব প্রয়োজন না হলে তারা কথাই বলে না, পথনির্দেশ হয় হাত তুলে কিংবা চোখের ইঙ্গিতে।

মূল বজরাটির সঙ্গে আর একটি ছোট নৌকোও বাঁধা আছে। সেখানে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। জেলে ডিঙি থামিয়ে কেনা হয় টাটকা মাছ। কখনও পাশ দিয়ে স্টিমার গেলে নদী উত্তাল হয়ে ওঠে, বজরা ও ছোট নৌকোটি প্রবলভাবে দোলে, ছোট নৌকোটিরই ছটফটানি বেশি, যেন বড় ভাইয়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায় এক দুরন্ত বালক।

বজরার ভেতরের কক্ষে একজনই যাত্রী, খাটের ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধ শয়ান রয়েছেন এক ভ্রাম্যমাণ জমিদার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্র। গোষ্ঠীপতি দেবেন্দ্রনাথের এতগুলি সন্তান, তবু বাংলার বিভিন্ন জেলা ও উড়িষ্যায় ছড়ানো তাঁর জমিদারি তালুক প্রত্যক্ষভাবে তদারকি করার জন্য আর কারুকে পাওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বিদ্বান ও দার্শনিক, কিন্তু স্বভাবে একেবারে ভোলানাথ, বিষয়কর্মের দিকে তাঁর কোনও ঝোঁক নেই, দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ চাকুরি জীবিকা বেছে নিয়েছেন, হেমেন্দ্রনাথ অকাল মৃত। দুটি পুত্র বিকৃত মস্তিষ্ক। সবচেয়ে বেশি ভরসা করা গিয়েছিল যার ওপর, সে-ই হতাশ করেছে সবচেয়ে বেশি। জাহাজ ব্যবসায়ে ভরাডুবির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেন বর্তিকা শূন্য এক বাতিদান, কোনও কিছুতেই আর উদ্যম নেই, মেজ বউঠানের আঁচলের তলায় নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছেন, ভয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান না। পিতাও তাঁর এই পুত্রটির মুখদর্শনে আর আগ্রহী নন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ সাবালক হবার পর থেকেই পারিবারিক অনেক দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর যোগ্যতাও আছে, এই নাতিটিকে দেবেন্দ্রনাথেরও বিশেষ পছন্দ। কিন্তু দ্বিপু কলকাতার বিলাসীজীবনে অভ্যস্ত, খাজাঞ্চিখানায় হিসেবপত্র দেখতে তিনি রাজি আছেন, গ্রাম বাংলায় ঘোরাঘুরি করা তাঁর পছন্দ নয়। এ দিকে প্রত্যক্ষ পরিদর্শন না হওয়ায় জমিদারির আয় কমে আসছে। বিলাসব্যসন, পারিবারিক সংস্কৃতিচর্চা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রসারের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করা হয়, কিন্তু সেই টাকা যে কোথা থেকে আসে তা যেন ছেলেরা বুঝতে চায় না। অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রটিকেই সব কটি জমিদারি দেখাশুনোর ভার দিয়েছেন। সে কলকাতায় বসে অযথা

সময় অতিবাহিত করছে কি না, সে দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর আছে। বছর খানেকের মধ্যেই এ কাজে রবীন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ আপাতত এই সন্তানটির প্রতি বেশ প্রসন্ন।

রবীন্দ্র এখন বত্রিশ বছর বয়স্ক এক পূর্ণ যুবা, তিনটি সন্তানের জনক। স্বাস্থ্য ও রূপে অত্যুজ্জ্বল। শিলাইদহের কুঠিবাড়ির কাজ সম্পন্ন করে সে এখন চলেছে সাজাদপুরে। শিলাইদহ কলকাতা থেকে খুব বেশি দূর নয়, সাজাদপুর বা শাহজাদপুর পাবনা জেলার ইউসুফশাহী পরগনায়। বজরাটি এখন চলেছে গোয়ালন্দ পার হয়ে সেই দিকে।

প্রত্যেকটি জমিদারিতেই পাকা কুঠিবাড়ি আছে বটে, রবীন্দ্র অনেক সময় বজরাতেই রাত্রিবাস করতে ভালবাসে। নদীপথে যাত্রার সময় কিংবা মধ্য নদীতে নোঙর করে রাত্রিবাসের ইচ্ছে হলে যাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য সব ব্যবস্থা করা থাকে। প্রতিবার কলকাতা ত্যাগের সময় সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় কাঁড়িকাঁড়ি কামিনীভোগ চাল, সোনা মুগ ডাল, বাদাম, কিশমিশ, কলা, কমলালেবু, পেয়ারা, আপেল, ওট মিল, কোয়েকার ওট, ঝুনো নারকোল, পান-সুপারি, সরষের তেল, আমসত্ত্ব, আমচুর, হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি, সুগন্ধ সাবান, হ্যাজলিন ক্রিম, টুথ পাউডার। এ ছাড়া কয়েক কেস ব্র্যান্ডি, শ্যাম্পেইন ও ওয়াইন। শেষোক্ত দ্রব্যগুলির প্রতি অবশ্য রবীন্দ্রের কোনও আসক্তি নেই, সে হিসেবে অন্যান্য জমিদারতনয়দের তুলনায় রবীন্দ্র এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম! তবু ওগুলো রাখতে হয়, সাহেব সুবোরা কখনও আসে, দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী কিংবা অন্য জমিদার বন্ধু, আপ্যায়ন করতে হয় তাদের।

মধ্যাহ্নের নদীতে বজরাটি চলেছে মন্থর গতিতে, ভেতরের কামরায় জমিদার নন্দনটির হাতে নেই সুরার পাত্র কিংবা আলবোলার নল, কোনও গায়িকা বা নর্তকী বা বাঈজী তার সঙ্গিনী হয় না কখনও, সে এখন হিসাবের খাতা খুলেও বসেনি কিংবা দিবানিদ্রাও দিচ্ছে না। সে এখন ব্যাপৃত এক সম্পূর্ণ অ-জমিদারসুলভ কাজে। তার পোশাকও জমিদারের মতন নয়, বহুমূল্য চোগা-চাপকান ঝোলানো রয়েছে দেওয়ালের হুকে, সে পরে আছে শুধু একটা ধুতি, খালি গা। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার গৌরবর্ণ শরীরে, বুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম, গরমে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, তার হাতে স্লেট ও পেন্সিল, সে কবিতা লিখছে। সে এখন জমিদার নয়, বঙ্গ ভাষার অগ্রগণ্য কবি। কবিতা রচনার সময় সে দু এক পঙক্তি লিখেই চোখ বন্ধ করে, সদ্য লিখিত পঙক্তিগুলি গুনগুন করে কয়েকবার, পছন্দ হলে ওষ্ঠ দুটিতে হাসি ফোটে, পরবর্তী পঙক্তি রচনায় মন দেয়। স্লেটে লেখা তার অনেক দিনের অভ্যেস, কাটাকুটি মুছে ফেলার সুবিধে হয়, এক স্লেট লেখা হয়ে গেলে সে একটি বাঁধানো খাতায় কপি করে। কখনও সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাগজে দ্বিতীয় একটি কপি করে কোনও প্রিয়জনকে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়।

যারা বলে, কবিরা পাঠকদের মুখ চেয়ে বা মনোরঞ্জনের জন্য লেখে না, তারা ভুল বলে। কোনও কবিই শুধু নিজের জন্য লেখে না, লিখতে লিখতে কোনও একজন বিশেষ পাঠক কিংবা কয়েকজন অন্তরঙ্গ পাঠকের কথা মাঝে মাঝে তার মনে আসেই। সমগ্র কৈশোর জুড়ে ও প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রর মনে পড়ত নতুন বউঠানের মুখ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রের সব রচনার প্রথম পাঠিকা। তাঁর পছন্দ হবে কি না সে বিষয়ে রবীন্দ্রকে সব সময় সচেতন থাকতে হত। কাদম্বরী চলে গেছেন, অভিমানভরে এ পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছেন, সে-ও প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। তিনি চলে যাবার পরেও প্রথম প্রথম দু-এক বছর রবীন্দ্র যখন-তখন তাঁর ছায়ামূর্তি দেখতে পেত, টের পেত তাঁর শরীরহীন উপস্থিতি, প্রায় সব রচনাতেই তিনি কোথাও না কোথাও থাকতেন। ক্রমশ সে অনুভূতি ফিকে হয়ে এসেছে। তারপর কয়েকটি বছর লেখার সময় মনে পড়ত প্রিয়নাথ সেন কিংবা অক্ষয় চৌধুরীর মতন বন্ধুদের কথা, এঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে রবীন্দ্রের কাছে।

ইদানীং প্রায় সব সময় মনে পড়ে আর একজনের মুখ। সে এখন কিশোরী থেকে তরুণী হয়েছে। ভাইঝি ইন্দিরা আর রবীন্দ্রের স্ত্রী মৃণালিনী প্রায় একই তো বয়েসী, তবু দুজনের মধ্যে কত তফাত। মৃণালিনীকে শিক্ষিত, সুসংস্কৃত করে তোলার চেষ্টা তো কম হয়নি, তবু কাব্যরুচি জন্মালো না, গান-বাজনার দিকেও মন গেল না। একটা কবিতা লিখে কিংবা একটা গান রচনা করে সঙ্গে

সঙ্গে তাকে শোনাবার কোনও ইচ্ছেই জাগে না তার স্বামীর। কারণ প্রকৃত রসগ্রহণ করতে পারলে মুখে যে ভাবোল্লাস ফুটে ওঠে, তা যে কোনওদিন দেখতে পাননি রবীন্দ্র। একটু দীর্ঘ কিছু শোনাতে গেলে কখনও কখনও সে ঘুমিয়েও পড়েছে। গৃহিণী বা শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে অবশ্য তার ত্রুটি নেই। এই ক'বছরে তিনটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে। মৃণালিনী রবীন্দ্রের সংসারের যোগ্য সঙ্গিনী, কিন্তু সে তার মর্ম কিংবা নর্মসঙ্গিনী হতে পারল না কিছুতেই। যখন বাড়িতে স্ত্রী পুত্রকন্যাদের সঙ্গে থাকে রবীন্দ্র, তখন সেও কিছুক্ষণের জন্য সংসারী হয়ে যায়, ছেলেমেয়েদের চটকায়, আদর করে। যখন বাইরে আসে, একা থাকে, তখনও মাঝেমাঝে ওদের কথা মনে পড়ে ঠিকই, ইচ্ছে করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু যখন সে কবিতা রচনা করে, তখন সে তো কারুর স্বামী কিংবা পিতা নয়। সে যেন এক ব্যাকুল বিরহী, কবিতার ছত্রে ছত্রে বিচ্ছেদের বেদনা। কবিরা আসলে কোনও কিছুই পায় না, এমনকী সব কিছু দিলেও যযাতির মতন তাদের অতৃপ্তি থেকে যায়, শুধু ভোগের অতৃপ্তি নয়, কীসের যে অতৃপ্তি, কীসের যে বেদনাবোধ তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোও যায় না, সেই বেদনা থেকেই তো উৎসারিত হয় কবিতা। সার্থক বা পরিতৃপ্ত কবি বলতে এ জগতে কিছু নেই।

এখন যে-কোনও কিছু লিখলেই ইচ্ছে করে ইন্দিরাকে দেখাতে কিংবা সে কথা জানাতে। রূপে সে ঠাকুরবাড়ির অন্য সব কন্যা বা বধূদেরও ছাড়িয়ে গেছে, এবং তার গুণেরও শেষ নেই। সদ্য সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' পেয়েছে। ইংরিজি, ফরাসি ও বাংলায় তার সমান জ্ঞান, পশ্চিমি ও দেশীয় সঙ্গীত দুটোই খুব ভাল জানে, রবীন্দ্রের গানের স্বরলিপি করে ফেলতে পারে অতি দ্রুত। এত রূপসী ও গুণবতী হলেও সে বিয়ে করতে চায় না। কুড়ি বছর বয়েস হয়ে গেল, এখনও বিবাহে সে অনিচ্ছুক, এ কেমন কথা! কীসের জন্য যে তার আপত্তি, তা সে স্পষ্ট বুঝিয়েও বলতে পারে না কারুকে। তবে কি সে রবিকাকাকে ছেড়ে থাকতে চায় না?

একেবারে শিশু বয়েস থেকেই সে রবিকাকার ন্যাওটা। এখন তাদের সম্পর্কটা এমন একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছেছে যেন কেউ কারুকে ছেড়ে সত্যিই আর থাকতে পারে না। রবীন্দ্রের মতন এমন পুরুষশ্রেষ্ঠ, এমন প্রতিভাবান, এমন সহৃদয় মানুষকে এত কাছাকাছি পেয়েছে ইন্দিরা, অন্য কোনও পুরুষকে তার পছন্দ হবে কেন? রবীন্দ্র যখন বাইরে কোথাও যায়, তখন ইন্দিরা প্রতিদিন একটি বা দুটি চিঠি লেখে, রবীন্দ্রও লম্বা লম্বা উত্তর দেয়, এমনকী অন্য সব কাজ ফেলেও ইন্দিরাকে আগে চিঠি লেখা চাই-ই। নিজের মনটাকে এমন সম্পূর্ণভাবে আর কারুর কাছে মেলে ধরতে পারে না রবীন্দ্র, তার সে রকম কোনও পুরুষ বন্ধু নেই, পুরুষদের সামনে সে খানিকটা আড়ষ্ট কিংবা কেতাদুরস্ত, মেয়েদের কাছেই সে স্বচ্ছন্দ হতে পারে।

এর মধ্যে দু-এক বছর আগে রবীন্দ্র আর একবার ইংলন্ডে গিয়েছিল। এবার আর পড়াশুনোর অজুহাতে নয়, নিছকই ভ্রমণের অভিলাষে। বাবামশাইয়ের কাছ থেকে টাকাপয়সা কিছু পাওয়া যায়নি, দেবেন্দ্রনাথ আগেই বলে দিয়েছিলেন, তাঁর কোনও ছেলেকে বিলেত যাবার ব্যাপারে তিনি আর এক পয়সাও দেবেন না। রবীন্দ্র তিন শো টাকা মাসোহারা পায়, তা ছাড়া অন্য উপার্জন নেই, সে টাকা থেকেও কিছু জমে না, বরং বেশি ব্যয় হয়ে যায়। বিলেত যাবার জন্য জাহাজ ভাড়ার টাকা তাকে ধার করতে হয়েছিল ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে। সত্য বেশ হিসেবি মানুষ হয়ে উঠেছে, এখন সে মামাদের প্রায়ই টাকা ধার দেয়, সুদও নেয়।

রবীন্দ্র ভেবেছিল, নির্ভার চিত্তে সে ইংলন্ড ও ইওরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরে আসবে, সেসব দেশের শিল্প-সঙ্গীত-নাটক উপভোগ করবে। ওসব দেশে একলা বেড়াতে ভাল লাগে না, সঙ্গে ছিল বন্ধু লোকেন পালিত, তার যেমন তীক্ষ্ণ মেধা, তেমনি রসজ্ঞান। সেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথও সেইসময় ছুটি কাটাতে বিলেত যাচ্ছিলেন, সুতরাং রবীন্দ্রকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও নিতে হল না, কিন্তু লন্ডনে পৌঁছবার কয়েকদিন পর থেকেই রবীন্দ্রর মন কেমন করতে লাগল। একেবারে ছেলেমানুষের মতন। সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনের আবহাওয়া অতি চমৎকার, বেড়াবার পক্ষে আদর্শ, কিন্তু রবীন্দ্রর মন

ছটফট করে। প্রতিদিন সকালে উঠেই ডাকবাক্সের কাছে ছুটে যায়, চিঠি না থাকলে মনটা বিস্বাদ হয়ে যায়। চিঠি পেলেও স্বস্তি নেই, ইন্দিরা প্রতি চিঠিতেই লেখে, তুমি আর কতদিন ওখানে থাকবে, আমার একটুও ভাল লাগছে না, আমার কিছুই ভাল লাগে না।

একটা চিঠিতে ইন্দিরা লিখল যে রবিকাকা যদি এক্ষুনি ফিরে না আসে, তা হলে সে আর চিঠিই লিখবে না। সত্যিই সে আর চিঠি লেখে না। আগে রবীন্দ্র এতটা বুঝতে পারেনি যে ইন্দিরার সঙ্গে তার হৃদয়ের তন্ত্রী কতখানি জড়িয়ে আছে, সে অভিমান করে চিঠি লিখছে না, এটা যেন রবীন্দ্রের কাছে মৃত্যুযন্ত্রণার মতন। স্ত্রীর চিঠি আসে, তাতে সংসারের খবর থাকে, সে রকম চিঠি পেলে আশ্বস্ত হওয়া যায় কিন্তু মন ভরে না। একদিন সকালে সত্যেন্দ্রনাথ একটা খাম খোলা চিঠি দিলেন, রবীন্দ্রর বারবার অনুরোধপত্রের উত্তরে ইন্দিরা লিখেছে দায়সারা কয়েক লাইন, তাও দিয়েছে বাবাকে লেখা চিঠির খামে। অপমানে রবীন্দ্রর মুখখানা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। ইন্দিরা সব সময় তাকে আলাদা লেফাফায় চিঠি পাঠায়। তা হলে কি সত্যিই সে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চায় না? এ কথা ভাবতেই রবীন্দ্রর মনে হয় তা হলে তার জীবনটাই শূন্য ও নিষ্ফল হয়ে যাবে!

সেদিনই সে ঠিক করল ফিরে আসবে। সত্যেন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিত দারুণ বিস্মিত। রবীন্দ্র তিন মাসের রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছে, এক মাস যেতে না যেতেই সে ফেরার জন্য ব্যস্ত কেন? এখনও অনেক ভ্রমণের পরিকল্পনা রয়েছে। দেশ থেকে কোনও দুঃসংবাদ আসেনি, সবাই ভাল আছে, তবু রবীন্দ্র কেন এত উতলা হয়ে পড়েছে, তা কেউ বুঝবে না। ওঁরা ওকে ধরে রাখার অনেক চেষ্টা করলেন, সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও ফিরবেন তিন মাস পর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে, সে রকম ঠিক করা আছে। কিন্তু ছোট ভাইটি এখন আর তা মানতে চাইছে না। প্রিয়জনদের জন্য উপহার কেনাকাটি শুরু করে দিল রবীন্দ্র, আর সকলের জন্য কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনাও হল, কিন্তু ইন্দিরার জন্য কী নেবে মনস্থির করতে পারে না। যদি-বা একটা সুন্দর টেবিল ল্যাম্প পছন্দ হল, সেটা আবার লোকেন নিয়ে নিতে চায়। লোকেন বলল, তোমার ঘরে তো অনেক সুন্দর সুন্দর ল্যাম্প দেখেছি রবি, তা হলে এটা কার জন্য নিচ্ছ? লোকেন যতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোক, তবু এত ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করে না রবি।

থিয়েটার দেখতে গেলে কিংবা কোনও কনসার্ট শোনার সময়ও রবীন্দ্রর মাথায় ঘুরতে থাকে, বাবি আর চিঠি লিখবে না, বাবি আর চিঠি লিখবে না! তা হলে এই প্রবাসের দিনগুলো কী করে কাটবে?

শেষ পর্যন্ত জোরজার করে নিজেই জাহাজে বুকিং-এর ব্যবস্থা করে ফেলল রবীন্দ্র, দেড় মাসের মাথায় সে আবার সমুদ্রে ভেসে পড়ল। সেই প্রথম রবীন্দ্রর একলা জাহাজ যাত্রা, সহযাত্রীরা সবাই অচেনা। লন্ডনে থাকার সময় সে এক লাইনও কবিতা লিখতে পারেনি। ওখানে সব সময় কোট-প্যান্টলুন পরে থাকতে হয়, বাংলার কাব্যপ্রতিমা তাই বুঝি কাছ ঘেঁষতে চান না। জাহাজের ক্যাবিনের মধ্যে আঁট পোশাক ছেড়ে রাত্রিবাস পরে নেবার পর আবার রবীন্দ্রের কলমে কবিতা এসে গেল।

...আঁখি দিয়ে যাহা বল   সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভাল, থাক তাই,   তার বেশি কাজ নাই—
কথা দিয়ে বল যদি   মোহ ভেঙে যায় পাছে
এত মৃদু এত আধো   অশ্রুজলে বাধো-বাধো
শরমে-সভয়ে-ম্লান   এমন কি ভাষা আছে?
কথায় বল না তাহা   আঁখি যাহা বলিয়াছে...

অল্প বয়েসে প্রথমবার বিদেশে এসে প্রতিনিয়ত মনে পড়ত একজনের কথা। সে সময়কার কবিতার ছত্রে ছত্রে তাঁর মুখচ্ছবি। আর এ বারে মনে পড়ছে আর একজনের মুখ, সে অভিমান করে আছে, চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল, ফিরে গেলে কি কথাও বলবে না? না, না, তা হতে পারে না। বিলেতের সব প্রলোভন ত্যাগ করে রবি যে এত আগে আগে চলে আসছে, ও কি তার মূল্য দেবে না?

মুখখানি মনে পড়ে আর রবীন্দ্রের বুক কেঁপে ওঠে। ও যে এখন বড় হয়েছে, পূর্ণ যুবতী, সে কথা ওর মনে থাকে না, যেন আগের মতনই ছেলেমানুষটি রয়েছে। যখন-তখন রবীন্দ্রর কাছে চলে আসে, ঝপাস করে পাশে বসে পড়ে কিংবা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আদর করে গালে গাল ঠেকিয়ে। চুলে বিলি কেটে দেয়। এই নিয়ে কেউ কেউ বাঁকা ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে, অনেকেরই যে মন অপরিষ্কার। ইন্দিরা যে বিয়ে করব না বলে, তারও প্রতিক্রিয়া আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভাল নয়, কিন্তু ইন্দিরা তা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু রবীন্দ্র একটু একটু ভয় পায়। ইন্দিরা তার খুবই প্রিয়, তবু এর পরিণতি কী? একদিন তো ওকে ছেড়ে দিতে হবেই।

তোমার সাহস আছে,   আমার সাহস নাই।
এই যে শঙ্কিত আলো   অন্ধকারে জ্বলে ভালো,
কে বলিতে পারে বলো   যাহা চাও একি তাই!
তবে ইহা থাক দূরে   কল্পনার স্বপ্নপুরে।
যার যাহা মনে লয়   তাই মনে করে যাই—
এই চির আবরণ   খুলে ফেলে কাজ নাই।...

বম্বে পৌঁছেই পরের দিন ট্রেনে চাপার কথা, টিকিটের ব্যবস্থা করা আছে আগে থেকেই, কিন্তু মাঝরাত্রে হোটেলে পৌঁছবার পর রবীন্দ্রর খেয়াল হল টিকিট-টাকাপয়সা সুদ্ধু ব্যাগটি ফেলে এসেছে জাহাজে। দু মাস এগারো দিন কেটেছে জাহাজে, শেষের দিকে দিন যেন আর কাটছিল না, এখন ভারতের মাটিতে পা দিয়েও বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে? ভোরবেলা আবার জাহাজঘাটায় ছুটতে হল এবং সৌভাগ্যবশত ব্যাগটি পাওয়া গেল। এখন আবার ট্রেনে যেতে লেগে যাবে আরও তিন দিন।

রবীন্দ্র যে ফিরে আসছে তা তখনও কেউ জানে না। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সে সবাইকে চমকে দেবে। সেই সবাইয়ের তালিকায় প্রথম স্থানটি শুধু একজনই পেতে পারে। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল রবীন্দ্র। তাতে লটবহর চাপিয়ে সে যাত্রা করল, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেল না, বাবামশাই পার্ক স্ট্রিটের একটা ভাড়া বাড়িতে আছেন, আগে তাঁকে প্রণাম করে আসতে হবে, কিন্তু রবীন্দ্র গাড়িওয়ালাকে পার্ক স্ট্রিট ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

সেই ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বির্জিতলাও-এর বাড়ির সামনে। আকাশে অপরাহ্ণের ম্লান আলো। এ অঞ্চলে প্রচুর পাখি। সেন্ট পলের গির্জার মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির সামনের বাগানে এক তরুণী আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখি দেখছে। গাড়ির শব্দ শুনে সে মুখ ফেরাল।

গাড়ি থেকে নামছে এক দীর্ঘকায় পুরুষ। মুখে ভ্রমরকৃষ্ণ দাড়ি, মাথায় কুঞ্চিত ঘন চুলের বাবরি, স্মিত হাস্যময় মুখ। ট্রেনেই বিলেতি পোশাক ছেড়ে ধুতি ও পিরান পরে নিয়েছে রবীন্দ্র। ইন্দিরার চোখে ধন্দ লেগে গেল। এ কি সত্যিই তার রবিকা, না তার দৃষ্টিবিভ্রম! এত বেশি সে একজন মানুষের কথা ভাবছে যে সে তার একটা ছায়ামূর্তিও গড়ে ফেলেছে।

রবীন্দ্র ডাকল, বাবি

কোথায় মিলিয়ে গেল রাগ আর অভিমান। তখনই ইন্দিরা একটি হরিণীর মতন রবীন্দ্রের প্রসারিত দুই বাহুর দিকে ছুটে গেল।

ইন্দিরা রবীন্দ্রর মন যতখানি অধিকার করে আছে, সরলা ততটা পারেনি। এরা দুজনে সমবয়েসী হলেও দুজনে অনেক তফাত। ইন্দিরা আগাগোড়া ইংরিজি স্কুলে পড়েছে, বাড়িতে পশ্চিমি আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হলেও রবিকাকার সান্নিধ্যের প্রভাবে সে বাংলা কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত প্রাণ দিয়ে অনুভব করে। সরলা পড়েছে বাংলা স্কুলে, পড়াশুনোতেও সে ভাল ছাত্রী, কিন্তু তার সাহিত্য-শিল্পবোধ তেমন উঁচু তারে বাঁধা নয়। সরলা ভারতী পত্রিকায় প্রায়ই এটা সেটা লেখে, কিন্তু তা এমন কিছু হয় না। ইন্দিরা যেমন তার মন-প্রাণ সবই রবিকাকে দিয়ে দিয়েছে, সরলা তা নয়।

সরলা উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী। ইন্দিরা নিজেকে আড়াল করে রবীন্দ্রের খ্যাতিতেই মুগ্ধ, সরলা নিজেও খ্যাতি চায়। রবীন্দ্র মুখের ওপর কিছু বলে না, ঢোক গিলে তার রচনার প্রশংসা করে। গানটা অবশ্য সে ভালই বোঝে। সরলাও বিয়ে করবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, কিন্তু তার কারণটাও স্পষ্ট, সে কুমারী থেকে দেশের সেবা করতে চায়। সরলার জীবনে তার রবিমামা নয়, তার বাবার প্রভাবই বেশি। সরলার বাবা কংগ্রেসের একজন পাণ্ডা। ও বাড়িতে রবীন্দ্রর যাওয়া-আসা ক্রমশই কমে আসছে।

আর একটি তরুণীর সঙ্গে রবীন্দ্রের মানসিক ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ব্যারিস্টার আশু চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কুটুম্বিতার সূত্রে তার এক ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদার সঙ্গে পরিচয় হয়। এই সুশ্রী, বিদুষী মেয়েটিও কবিতা লেখে এবং সে রবীন্দ্রর একজন মুগ্ধ ভক্ত। রবীন্দ্রর বহু কবিতা সে দাঁড়ি-কমা, ড্যাশ সমেত মুখস্থ বলতে পারে, আশু চৌধুরীর স্কট লেনের বাড়ির আড্ডায় সে রবীন্দ্রর কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অনেকবার। রবীন্দ্রও স্বীকার করেছে যে তার কবিতা এমন পুরোপুরি মুখস্থ বলতে সে আর কারুকে দেখেনি।

প্রিয়ম্বদা নিজের কবিতা অনেকের সামনে পাঠ করতে লজ্জা পায়। সে রবীন্দ্রকে শুনিয়েছে নিরালা কোনও জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে, সসঙ্কোচে, মৃদু গলায়। চিঠিতেও কবিতা লিখে পাঠিয়েছে, রবীন্দ্র তাকে উত্তর দিয়েছে নিয়মিত। দুজনের বয়েসের ব্যবধান খুব বেশি নয়, মানসিক দূরত্বও যখন কমে আসছে অনেকখানি, এমন সময় আচম্বিতে প্রিয়ম্বদার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের পরই সে চলে গেল অনেক দূরে, মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে, তার সঙ্গে আর দেখা হবারও সম্ভাবনা রইল না। জমিদারি পরিদর্শনের সময় বজরায় থাকতে থাকতে প্রিয়ম্বদার বিবাহের সংবাদের চিঠি পেয়ে রবীন্দ্র বিমনা হয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। সম্বন্ধ করা বিয়ে, স্বামীটি এক অচেনা পুরুষ, তার সঙ্গে অতদূরে এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে প্রিয়ম্বদার মতন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মেয়ে নিজেকে কেমন করে মানিয়ে নেবে? সেখানে কেমনভাবে প্রথম প্রথম প্রিয়ম্বদার দিন ও রাত কাটবে, রবীন্দ্র ভেবে পায় না। পুরুষ মানুষের পক্ষে এ ব্যাপারটা বোঝা সম্ভবই নয়!

বজরার একটা সুবিধে, তা ঘোড়ার গাড়ির মতন লম্ফ-ঝম্প করে না। কবিতা রচনা করা, বই পড়া ও চিঠি লেখা বেশ চলতে পারে, কখনও কখনও মৃদু দুলুনিতে তন্দ্রা আসে। সামান্য ঘুমেই বহু স্বপ্ন দেখে রবীন্দ্র, অনেক স্বপ্ন থেকেই সে তার লেখার উপাদান পেয়ে যায়। কোনও কোনও স্বপ্ন আসে গল্পের বেশে। কোনও কোনও স্বপ্নে থাকে কবিতার ইঙ্গিত। ইদানীং সে গল্পের বাঁধুনি দেওয়া কিছু কবিতাও লিখতে শুরু করেছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে, একজন পরিচারক চা দিয়ে গেল। চা পান করতে করতে রবীন্দ্র শুনতে পেল মানুষের কলগুঞ্জন। মাঝি-মাল্লারাও কথাবার্তা শুরু করেছে। বজরা কোনও জনবসতির ধারে তীর ঘেঁষে চলেছে। এই সময় নদীর ঘাটে অনেক মানুষ আসে, নারীরা কাঁখে কলসি নিয়ে জল ভরতে এসে নিজেরাই উচ্ছল হয়ে ওঠে, এই দৃশ্য দেখতে রবীন্দ্রর ভাল লাগে।

রবীন্দ্র তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে রক্তিম আলোর ছড়াছড়ি, তীরবর্তী গাছপালাগুলিও যেন সেই রং মেখেছে। বজরাটি একটা ঘাটে ভিড়তে চলেছে, ঝুপ করে নোঙর ফেলার শব্দ হল, হালের মাঝি সামাল সামাল হেঁকে উঠল। একটা ভাঙা মন্দিরের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষ, জলে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে কয়েকটি রমণীও স্থির চিত্রের মতন চেয়ে আছে এ দিকে।

একজন কর্মচারী রবীন্দ্রকে বলল, হুজুর সাজাদপুর এসে গেছে—

তার কথায় আরও কিছু যেন অব্যক্ত রইল। রবীন্দ্র দেখল, অন্য দাঁড়ি-মাঝিরাও সবাই তার দিকে তাকিয়ে নীরবে যেন কিছু বলতে চাইছে।

একটু পরেই সে বুঝতে পারল। তাড়াতাড়িতে সে খালি গায়েই ওপরে চলে এসেছে। কিন্তু সে তো এখন আর তরুণ কবি রবীন্দ্রবাবু নয়, সে যে এখানকার জমিদার, লোকে বলে রাজাবাবু, তার উপযুক্ত পোশাক গায়ে চড়াতে হবে।

রবীন্দ্র তাড়াতাড়ি কামরার মধ্যে ফিরে গেল।

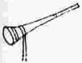

২

সকালবেলা থেকেই ভারী মিষ্টি সানাই বাজছে। ভৈরবী রাগিণী যেন ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে। আষাঢ় মাস হলেও আজকের দিনটি বর্ষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন। কুঠিবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্র, সানাইয়ের সুরে তার বুকের মধ্যে যেন একটা কষ্টের অভিঘাত হচ্ছে। অনেক সময় অতি সুন্দরের মধ্যেই মিশে থাকে এই বোধ।

এ যাত্রায় রবীন্দ্রের সঙ্গী বা সঙ্গিনী কেউ নেই। কলকাতায় সম্প্রতি তাকে বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়, গ্রাম সফরে এসে একাকিত্ব সে বেশ উপভোগ করে। এখানে যখন তখন কোনও অতিথি উপস্থিত হলে সে বিরক্তই হয়। দুদিন আগে পত্নী সহ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছিলেন, তাদের আপ্যায়নে একটি বেলা বাজে খরচ হয়েছে। আবার এক এক সময় মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য মনটা লালায়িত হয়ে থাকে।

সাধারণ প্রজাদের জমিদারবাবুর কাছে আসতে দেওয়া হয় না, বরকন্দাজরা বাধা দেয়। অধিকাংশ প্রজাই অবশ্য ভয়ে কাছ ঘেঁষে না। আবার দু'চারজন এমনই সরল হয় যে নিয়মকানুন কিছুই বোঝে না। সোজা বজরায় উঠে আসে। রবীন্দ্র দেখতে পেলে বরকন্দাজদের নিবৃত্ত করে তাদের কাছে ডেকে নেয়। তারা অকপটে নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলে। তারা যে ঠিক নালিশ জানাবার জন্য বা প্রতিকারের আশায় আসে, তাও নয়, সবই তারা নিয়তি বলে মেনে নেয়, শুধু এই দেবোপম দূরের মানুষটিকে নিজের কথা শুনিয়েই আনন্দ। কিছু কিছু বিচিত্র চরিত্রেরও দেখা পেয়েছে রবীন্দ্র। শিলাইদহতে একজন প্রায়ই আসে, সবাই তাকে বলে মৌলবি সাহেব। লোকটি পঞ্জাবি মুসলমান, আরবি-ফারসি জানে। অতদূর থেকে এসে এই বাংলার এক গণ্ডগ্রামে কেন পড়ে আছে তা বোঝা দায়। লোকটি বেশ কথা বলে, কিছুক্ষণ ভাল লাগে, তার বকবকানি শেষ পর্যন্ত বিরক্তিকর পর্যায়ে চলে যায়।

অছিমুদ্দি সরদার নামে আর একজনও বেশ গল্প জমায়। সে নাকি একজন কবিয়াল। কিন্তু তার কবিয়ালির চেয়ে উদ্ভট গল্পই বেশি উপভোগ্য। তারও একটা দোষ আছে, শেষের দিকে সে জমিদারির ম্যানেজার ও অন্যান্য আমলাদের সম্পর্কে নানান দোষের কথা সাতকাহন করে বলতে শুরু করে, তার ধারণা, এতে জমিদারবাবু খুশি হবেন।

রবীন্দ্র সবচেয়ে অবাক হয়েছিল শিলাইদহ পোস্ট অফিসের এক পিওনকে দেখে। চিঠির থলে পিঠে নিয়ে যাবার সময় সে আপন মনে গান করে। একদিন বজরার ছাদে বসে তার সেই গান শুনে রবীন্দ্র নিজেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। লোকে বলে, ওর নাম গগন হরকরা, রবীন্দ্রের কাছে সে নিজে অবশ্য বলল, তার নাম গগনচন্দ্র দাম। সাধারণ এক অশিক্ষিত মানুষ, সে নিজে গান রচনা করে, নিজেই সুর দেয়। কী গভীর উপলব্ধির কথা সে সব গানের।

আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাবো তারে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে
কোথায় পাবো তারে...

বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এরকম কত সব মণি-মুক্তো ছড়িয়ে আছে। গগন হরকরার গান শুনতে শুনতে রবীন্দ্রর মনে হয়েছে, এই ধরনের সব লোকগীতি, মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা, মাঝিদের গান, এইসব সংগ্রহ করে রক্ষা করা দরকার। এই সবই তো আমাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার।

সাজাদপুরে এসে এখনও তেমন কোনও আকর্ষণীয় মানুষের দেখা পাওয়া যায়নি। ক'দিন ঝড় বৃষ্টির জন্য বজরায় থাকা হয়নি। কুঠিবাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। নদীর ধার দিয়ে একা একা বেড়াবারও উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে দুজন পাইক-লেঠেল যাবে পাহারা দিয়ে। রবীন্দ্র তা একেবারেই চায় না, কিন্তু ম্যানেজারমশাই জেদ ধরেছেন, জমিদারমশাইয়ের নিরাপত্তার জন্য এটা বিশেষ দরকার।

দূর, ওরকমভাবে বেড়িয়ে কোনও সুখ আছে নাকি ?

আজ সকালে মনে হচ্ছে এবারে কলকাতা থেকে কারুকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভাল হত। শুধু বই পড়ে আর লেখালেখি করে ক্লান্ত লাগছে।

সিংহ দরজায় নহবত বসেছে, সানাই বাজছে সেখানে। কয়েকজন লোক গাঁদা ফুলের মালা গেঁথে টাঙাচ্ছে। মঙ্গলঘটের ওপর কচি কচি কলাগাছ কেটে এনে বসানো হচ্ছে সারি দিয়ে। ভেতরের বড় হল ঘরটিতে রঙিন কাগজের শিকলি। মেঝেতে পাতা হয়েছে বিভিন্ন রঙের সতরঞ্চি, মাদুর ও চট। মাঝখানে একটি কারুকার্যখচিত চেয়ার মখমল দিয়ে মোড়া। ঠিক যেন একটা সিংহাসন। আজ এখানে বিশেষ এক উৎসব, আজ পুণ্যাহ।

এর আগে শিলাইদহে বেশ কয়েকবার ঘুরে গেলেও সাজাদপুরে রবীন্দ্র এল এই প্রথম। কৈশোরে সে এসেছে জ্যোতিদাদার সঙ্গে, তখন ছিল খুবই ধুমধামের ব্যাপার। জ্যোতিদাদা অনেক লোক-লস্কর নিয়ে ঘুরতে ভালবাসতেন, যেমন সঙ্গে থাকত গান-বাজনার দল, তেমনই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে যেতেন। রবীন্দ্রের মনে আছে, একবার বাঘ শিকার করতে গিয়ে জ্যোতিদাদা তার হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন। ওঃ কী ভয় পেয়েছিল সে, ভাগ্যিস তার নিক্ষিপ্ত গুলি বাঘের চতুঃসীমানা দিয়েও যায়নি। নাঃ, শিকার-টিকার তার ধাতে পোষায় না।

শিলাইদহ ও পাতিসরের জমিদারি দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব হলেও সাজাদপুর পড়েছে তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথের ভাগে। গিরীন্দ্রনাথের নাতি গগন, সমর, অবনরা নাবালক ছিল বলে দেবেন্দ্রনাথকেই দেখাশুনো করতে হত, এখন ওরা বড় হয়েছে, কিন্তু বড় অলস, বাড়িতে বসে ছবি আঁকে, বাইরে বেরুতেই চায় না। তাই রবীন্দ্রকেই ওদের বকলমে খাজনা আদায় করতে আসতে হয়েছে।

এক সময় ম্যানেজারমশাই এসে বললেন, হুজুর, এবার যে নীচে যেতে হয়। সকলে অপেক্ষা করে আছেন।

বেশ একখানা ঝলমলে পোশাক পরে নিতে হল রবীন্দ্রকে। চিনা সিল্কের কুর্তা-পাজামা। মাথায় পালক বসানো পাগড়ি, পায়ে নাগরা। এই বেশে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন জমিদারপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহিমার্ণব! রবীন্দ্রের মনে হতে লাগল, সে যেন একজন থিয়েটারের রাজা। রাজার ভূমিকায় অভিনয় করা তার অভ্যেস আছে।

বড় হলঘরটিতে সে প্রবেশ করার আগেই অনেকগুলি শাঁখ বেজে উঠল। শাঁখের আওয়াজে ঢেকে গেল সানাইয়ের সুর। প্রজারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে রইল। রবীন্দ্র এসে সেই নকল সিংহাসনে বসতেই সবাই ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল, কেউ কেউ সেই অবস্থা থেকে আর ওঠেই না।

অন্য জমিদারিতে এর পর পুরোহিত এসে বন্দনা করে, কিন্তু এই জমিদাররা ব্রাহ্ম, আগে পরম ব্রহ্মের অর্চনা, তারপর অন্য কিছু। একজন আচার্য এসে প্রার্থনা পরিচালনা করলেন কিছুক্ষণ, তারপর জমিদারবাবুকে পুষ্পমাল্য ও চন্দন দিয়ে অভিষিক্ত করলেন। এর পর ম্যানেজারবাবু শুরু করলেন জমিদারের গুণগান। অনেকদিন পর ঠাকুর বংশের কেউ এলেন সাজাদপুরে, এটা এখানকার প্রজাদের পক্ষে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবতার মতন এই জমিদারের কৃপাঘন দৃষ্টিপাতে প্রজাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।

রবীন্দ্র মনে মনে ভাবছে, প্রজারা যাতে কোনও রাজা বা জমিদারকে তাদেরই মতন একজন সাধারণ মানুষ না মনে করে, সেইজন্য ভয় ও সম্ভ্রম জাগাবার কিছু কিছু ব্যবস্থা চলে আসছে অনেক দিন ধরে। এই জন্যই রাজা-জমিদারদের নামগুলি খুব লম্বা লম্বা হয়, সাধারণ মানুষদের থেকে

আলাদা। যতই গরম থাকুক, তবু জবরজং পোশাক পরতে হয় রাজাকে। তিনি উচ্চাসনে বসবেন। তিনি কথা বলবেন নীচের দিকে তাকিয়ে, প্রজাদের কথা বলতে হবে মুখ তুলে।

ম্যানেজার স্তুতি করে যাচ্ছে, রবীন্দ্র হাসছে ঠোঁট টিপে। এরা কেউ জানে না। সে একজন নকল রাজা। ম্যানেজারবাবু তাকে দেবতা বানিয়ে দিয়েছে, আর রবীন্দ্র মনে মনে বলছে তার সদ্য রচিত কবিতার লাইন "খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে..." সে এখন খাঁচার পাখি!

বক্তৃতা শেষ করার পর ম্যানেজারবাবু রবীন্দ্রের গলায় আর এক প্রস্থ মালা পরিয়ে প্রণাম করলেন ভূলুণ্ঠিত হয়ে। ম্যানেজারবাবুই এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনিও যাঁকে এমনভাবে প্রণাম জানান, সেই জমিদার তা হলে কতখানি বড়।

এবার রবীন্দ্রকে প্রজাদের সম্বোধন করে ভাষণ দিতে হবে। যিনি স্বয়ং নাট্যকার ও অভিনেতা, তাঁর পক্ষে এই ভূমিকাটি শক্ত কিছু নয়। সুললিত কণ্ঠে তিনি সমবেত প্রজা ও আমলাবর্গকে আশীর্বাদ জানালেন।

এই উৎসবের দিনে প্রজাদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে পুণ্যাহপাত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। জমিদার নিজের হাতে সেই পুণ্যাহপাত্র প্রজাকে প্রথম গলায় সোনার মালা পরিয়ে বরণ করবেন, তারপর তাকে নতুন কাপড়, এক হাঁড়ি দই, উত্তরীয়, একটি বড় মাছ, পান-তামাক ও ফলমূল ভর্তি একটি পাত্র—এইসব উপঢৌকন দেবেন। জমিদার যে কতখানি প্রজানুরঞ্জক, তিনি যে শুধু গ্রহণ করেন না, প্রজাদেরও অনেক কিছু দেন, এ অনুষ্ঠান তারই প্রতীক।

এবারে যাকে পুণ্যাহপাত্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে, তিনি একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমান। পোশাক-আশাক দেখে মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত। ম্যানেজারের নির্দেশ মতন রবীন্দ্র তাঁকে চন্দনের ফোঁটা ও মালা পরাল, তারপর উপহার দ্রব্যগুলি তুলে দিল হাতে। সেসব মাথায় ঠেকিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখে প্রজাটি হঠাৎ শুয়ে পড়ে রবীন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরলেন।

একজন বয়স্ক মানুষ পায়ে হাত দিচ্ছে বলে রবীন্দ্র স্বাভাবিক সঙ্কোচেই পা সরিয়ে নিল। কিন্তু প্রজাটি তা মানবেন কেন। যুগ যুগ সঞ্চিত বিশ্বাসের এই প্রথা যে জমিদারের পা স্পর্শ করে প্রণাম জানাতে হয়। বুকে হেঁটে এগিয়ে এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রের পায়ে। তারপর আচকানের জেব থেকে একটি মোহর ভর্তি পুঁটুলি রাখলেন সেখানে।

এরপর অন্য প্রজারা একে একে উঠে এসে নজরানা ও কর রেখে যেতে লাগল জমিদারের সামনে। রবীন্দ্র দেখল, বিভিন্ন জাতির প্রজাদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয়েছে ধপধপে সাদা চাদর বেছানো মাদুর। হিন্দু আমলা ও মহাজনদের জন্য পাতা হয়েছে রঙিন সতরঞ্চি, আর সাধারণ প্রজা, যাদের অধিকাংশই মুসলমান, তাদের জন্য চট। তাও হিন্দু ও মুসলমানদের দুদিকে।

একঘেয়েমি ও ক্লান্তি লাগলেও রবীন্দ্রের উঠে যাবার উপায় নেই। প্রজারা টাকা-পয়সা দিচ্ছে, এই জন্যই তো তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে!

সাজাদপুর থেকে আর দু দিন পরেই রবীন্দ্র ভেসে পড়ল শিলাইদহের দিকে। সেখানে অনেক কাজ বাকি আছে। সাজাদপুরে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, সেই জন্যই রবীন্দ্রকে তড়িঘড়ি করে এখানে আসতে হয়। কিন্তু সেরকম কোনও অসন্তোষের চিহ্নই দেখা গেল না। আপাতত সব কিছুই ঠিকঠাক, প্রজারাও শান্ত, ম্যানেজার ও আমলাবর্গও খুশি, যথেষ্ট কর আদায় হয়েছে বলে দেবেন্দ্রনাথও সন্তুষ্ট হবেন।

ফেরার পথে সে দু'খানা ছোট গল্প লিখে ফেলল। এখন গল্প বেশ এসে যাচ্ছে কলমের ডগায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'হিতবাদী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করায় রবি সেখানে প্রতি সংখ্যায় একটি করে গল্প লিখতে শুরু করেছিল। ভালই লাগছিল তার গল্পগুলি লিখতে, হঠাৎ একদিন কৃষ্ণকমল বললেন, রবিবাবু আপনার গল্পগুলি কিছু গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ পাঠকরা ঠিক নিতে পারছে না। আপনার কাছ থেকে কিছু লঘু রকমের রচনা চাই। এ কথা শুনে রবীন্দ্রর রাগ ধরে গিয়েছিল।

সম্পাদকের হুকুম মতন ফরমায়েশি লেখা লিখতে হবে নাকি ? হিতবাদীতে লেখাই সে বন্ধ করে দিল।

কিছুদিন পরেই ঠাকুরবাড়ি থেকে আর একটি নতুন পত্রিকা বেরুতে শুরু করছে। 'সাধনা'। নিজেদের একটা পত্রিকা না থাকলে চলে না। বড় দাদার দুই ছেলে সুধীন্দ্র ও নীতীন্দ্র নিয়েছে এই কাগজের ভার, কিন্তু রবীন্দ্রকেই সম্পাদনার ব্যাপারটা দেখে দিতে হয়, তার নিজের লেখাই থাকে সর্বাধিক। 'সাধনা'র জন্য আবার তার ছোট গল্প লেখা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রর বড় মেয়ে বেলী এখন বেশ টরটর করে কথা বলে, পৃথিবী সম্পর্কে তার হাজার রকম প্রশ্ন, তার কথা ভাবতে ভাবতে মাথায় এসে গেল 'কাবুলিওয়ালা' নামে একটা গল্প।

লেখার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কিছু কিছু প্রজার মুখ মনে পড়ে। সরল, পরিশ্রমী মানুষ, তারা ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলায়, কিন্তু তাদের দারিদ্র্য কোনও দিন ঘোচে না। কিন্তু মহাজন, আমলা, জমিদাররা তো দিব্যি আরামে থাকে। যাদের শ্রমে জমিতে ফসল ফলে, তাদের বঞ্চিত করে এই জমিদারির ব্যবসা কী করে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে ? এই প্রশ্ন তার মনে বারবার জাগে, কিন্তু সমাধানের উত্তর খুঁজে পায় না। সে নিজে এখনও জমিদার নয়, পিতার এবং খুড়তুতো ভাইদের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু সে যদি কোনও জমিদারির মালিক হত, তা হলে নিজের স্বত্ব ত্যাগ করলেও কি কোনও সুরাহা হত ! অধিকাংশ গরিব প্রজারই নিজস্ব জমি ধরে রাখার ক্ষমতা নেই, তারা মহাজনের খপ্পরে পড়বে। ইংরেজ সরকারও প্রতিটি প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারবে না, জমিদারদের কাছ থেকে থোক টাকা পেলেই তাদের সুবিধে, সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজ সরকার এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখবে।

পদ্মা নদী ধরে এসে গোরাই নদীর মুখটায় ঢুকে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। এই নামটির বেশ মজার ইতিহাস আছে। বিরাহিমপুর পরগনার এই গ্রামটির নাম এককালে ছিল খোরসেদপুর। খোরসেদ নামে এক ফকির এসে আস্তানা গেড়েছিলেন এখানে। তারপর সেই ফকিরের নাম মুছে গেল সাহেবি আমলে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে এককালে নীলকর সাহেবরা একটা কুঠি স্থাপন করেছিল। সেই নীলকরদের মধ্যে এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেবের নাম ছিল শেলী, ওই নামে যে এক কোমল হৃদয়, স্বপ্নময় কবি ছিলেন তা এই সাহেবটিকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। সেই অত্যাচারী নীলকরের নামে এই জায়গার নতুন নাম হল শেলীর দহ, তারপর লোকের জিভে একটু একটু করে বদলে গিয়ে এখন শিলাইদহ।

নীলকরদের সেই পরিত্যক্ত কুঠিবাড়িটি কিনে নিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। রবীন্দ্রের মনে আছে, কৈশোর বয়েসে এখানে সদলবলে বেড়াতে এসে তারা সেই বিশাল কুঠিবাড়িটিতেই থেকেছে। বাড়িটি একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, সম্প্রতি সেটিকে একেবারে ভেঙে ফেলে তৈরি হয়েছে নতুন কুঠিবাড়ি। কয়া, জানিপুর ও কুমারখালি, কাছাকাছি এই তিনটি মহাল, আর একটু দূরে পান্টি মহাল, এই সব কটি মহালের জমিদারির কাজ পরিচালনা করা হয় শিলাইদহের কুঠিবাড়ি থেকে।

সাজাদপুরের থেকে অনেক বেশি আড়ম্বরের সঙ্গে এখানে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কুঠিবাড়িতে না উঠে রবীন্দ্র এখানে বজরাতেই রয়ে গেল। বজরাকে সে বলে শুধু বোট, বজরা শব্দটা কেমন যেন গেরেমভারি শোনায়। বোটটা রইল পদ্মার বুকে নোঙর করে। বর্ষায় পদ্মার যে ভুবনমোহন রূপ, তা ছেড়ে ইটকাঠের বাড়িতে থাকতে কার মন চায় ! ইন্দিরাকে সে চিঠি লেখে, পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মা।

এখানে আর সানাই নয়, কয়েকটি বন্দুকের শব্দে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল। তারপর হুলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনি। নদীর পাড় থেকে কুঠিবাড়ি পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে কয়েকটি অস্থায়ী ফটক। চতুর্দিকে ফুলের ছড়াছড়ি। দু দিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কর্মচারীরা। নায়েবমশাই যখন রবীন্দ্রকে ডাকতে এল, তাকে অবাক করে সে বেরিয়ে এল শুধু শুভ্র ধুতি ও আচকান পরে, কাঁধের ওপর একটি মুগার চাদর। মাথায় পাগড়ি নেই, পায়ে নাগরার বদলে তালতলার চটি। আমলারা ভুরু তুলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, এমন সাধারণ বেশে হুজুর যাবেন প্রজাদের সামনে ?

সামান্যই পথ, তবু পালকি মজুত আছে। নায়েব রবীন্দ্রকে সেই পালকিতে ওঠার ইঙ্গিত করতেই রবীন্দ্র বলল যে সে হেঁটেই যাবে।

দরবার কক্ষের দ্বারের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

ভেতরে বসার ব্যবস্থায় হিন্দু মুসলমানদের স্পষ্ট ভাগ রয়েছে। চাদর ঢাকা সতরঞ্চির ওপর হিন্দুরা, সামনের দিকে ব্রাহ্মণদের আসন। আর মুসলমানদের জন্য সতরঞ্চি থাকলেও তার ওপর চাদর পাতা নেই। নায়েব গোমস্তাদের জন্য বেশ কয়েকটি চেয়ার পাতা, মাঝখানে জমিদার হুজুরের সত্যিকারের সিংহাসন।

রবীন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে পড়ল, অছিমদ্দি সরদারের একটা কথা। সে একদিন বলেছিল, হুজুর, সাহাদের হাত থিকা শ্যাখদের বাঁচান। কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেনি রবীন্দ্র। এখানে সব মুসলমানদের শেখ বলে। পরস্পর সম্বোধন করে 'ও শ্যাখের পো', এইভাবে। অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান বা শেখ। ইদানীং হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটি বেশ স্পর্শকাতর হয়ে এসেছে। সারা ভারতের অধিকাংশ মুসলমান নেতা এখন হিন্দুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসে যোগদানের বিরোধী। গ্রাম বাংলাতেও কি সেই প্রভাব ছড়িয়েছে ?

অছিমদ্দি সরদার অবশ্য সেভাবে কথাটা বলেনি। মুসলমান অর্থাৎ শেখরা প্রায় সবাই গরিব। হিন্দুদের মধ্যেও গরিব আছে, তবে তাদের মধ্যে সাহা সম্প্রদায় মহাজনী করে, তারা ধনবান, গরিবদের জমি-গয়নাপত্র-হাল-গরু বন্ধক রেখে তারা ফুলেফেঁপে ওঠে। জমিদারি কাচারির ম্যানেজার থেকে সমস্ত আমলাই হিন্দু, সুতরাং শোষক ও উৎপীড়ক বলতে কিছু হিন্দুর মুখই মনে পড়ে। এই অবস্থা কি যুগ যুগ ধরে চলতে পারে ? হিন্দুদের মধ্যে যারা শিক্ষিত এবং শুভবোধসম্পন্ন, তাদেরও এই দিকটা চোখে পড়ে না ?

সাজাদপুরে রবীন্দ্র যা মুখ ফুটে বলতে পারেনি, এখানে সে আর দ্বিধা করে না। এখানে তার কর্তৃত্ব অনেক বেশি।

রবীন্দ্র ম্যানেজারকে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস্ করল, প্রজাদের এ রকম ভিন্ন ভিন্ন বসার ব্যবস্থা কেন ?

ম্যানেজার বলল, এই রকমই তো চলে আসছে হুজুর। কারা আগে প্রণামী দেবে, কারা পরে দেবে, সেইভাবে বসানো হয়েছে।

রবীন্দ্র বলল, মুসলমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি, তারা পরে দেবে কেন ? তাদের বসার জায়গায় চাদর পাতা নেই কেন ?

ম্যানেজার বলল, এটাই প্রথা হুজুর। সমাজে যার যে রকম স্থান। ব্রাহ্মণের স্থান সর্বাগ্রে, তারপর কায়স্থরা—

রবীন্দ্র বলল, প্রথা মাত্রই ভাল নয়, অনেক প্রথা যুগ অনুযায়ী বদলাতে হয়। এ সব তুলে ফেলুন। সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশে বসবে।

ম্যানেজার হেসে বলল, তা কি হয় হুজুর ! ওতে দুষ্ট প্রজারা লাই পেয়ে যাবে। আপনি চলুন হুজুর, সিংহাসনে গিয়ে বসুন, শুভ মুহূর্ত পার হয়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্র বলল, আজ পুণ্যাহ, আজ প্রজাদের সঙ্গে মিলনের উৎসব। এমন বিভেদের ব্যবস্থা আমি মেনে নিতে পারি না। আমার ওই সিংহাসনও সরিয়ে নিন। আমি সবাইকার মাঝে গিয়ে বসব।

ম্যানেজার জিভ কেটে বলল, কী যে বলেন ! তা আবার হয় নাকি ? কর্তাদের আমল থেকে যা চলে আসছে, তা কখনও বদলানো যায় ? শুধু শুধু দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্র ম্যানেজারের দিকে চেয়ে রইল। ম্যানেজার চোখ সরাল না। সে জানে যে কর্তার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি কবিতা-টবিতা লেখে, যাত্রার দলের ছেলেদের মতন গান গায়। ঘোড়ায় চড়ে না, শিকার করতে যায় না, বাঈজী নাচায় না, এমনকী মদ পর্যন্ত খায় না। স্বভাবটা মেয়েলি ধরনের। এখন এর মাথায় একটা হুজুগ চেপেছে, তাকে কোনওমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। জমিদার চলে গেলে তারপর জমিদারি চালাবার সব দায়িত্ব নিতে হবে তো ম্যানেজারকেই।

প্রজারাও সবাই উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে। ম্যানেজারের সঙ্গে জমিদারতনয়ের নিচু গলায় কী

আলোচনা হচ্ছে, তা তারা বুঝতেই পারছে না।

রবীন্দ্র গলা একটুও উঁচু না করে বলল, যতদিন ধরেই এ প্রথা চলে আসুক, আমার আদেশ, এটা বদল করতে হবে। জাতিভেদ আমি মানব না। সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে বসবে এ বছর থেকে।

ম্যানেজার এবার দৃঢ় গলায় বলল, জমিদারের হুকুম না পেলে কিছুই বদলাতে পারব না আমরা। এরকমই ব্যবস্থা চলবে।

রবীন্দ্র বলল, এখানে আমিই জমিদার। আমার আদেশই চূড়ান্ত। আপনি যদি মানতে না পারেন, তা হলে আপনাকেই সরে যেতে হবে।

ম্যানেজার বলল, শুধু আমি কেন, অন্য কর্মচারীরাও কেউ এ আদেশ মানতে পারবে না। তারা পদত্যাগ করবে।

রবীন্দ্র বলল, তা হলে আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, অন্য কর্মচারীরাও সরে যান এখান থেকে। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে যে খাজাঞ্চি এসেছে, সে-ই হিসেবপত্র রাখবে।

রবীন্দ্র এবার এগিয়ে গিয়ে তার জন্য রক্ষিত ভারী সিংহাসনটা দু হাতে তুলে সরিয়ে দিল এক পাশে। তারপর প্রজাদের দিকে ফিরে বলল, এই পুণ্যাহ আমাদের সকলের শুভ মিলনের দিন। এই মিলন উৎসবে পরস্পরের মধ্যে কোনও ভেদ থাকতে পারে না। পৃথক আসন সব সরিয়ে দেওয়া হোক। আমিও অন্যদের সঙ্গে একাসনে বসব।

প্রজাদের মধ্যে বিভ্রান্তির কোলাহল শুরু হয়ে গেল। এই কথার তাৎপর্য প্রথমে বুঝতেই পারল না অনেকে। ব্রাহ্মণরা রাগারাগি শুরু করে দিল। অন্য দিকে মুসলমানরাও বলল, আমরা তো বেশ বসে আছি, অসুবিধা তো কিছু নাই!

প্রথা এমনই এক জিনিস যে তার ভাল-মন্দ বিচার করার ইচ্ছেটাই অনেকের মনে জাগে না। যে কোনও পরিবর্তনেই অনেকে ভয় পায়।

ছেলেছোকরারা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারা চেয়ার ও সতরঞ্চি সব সরিয়ে ঢালাও ফরাস পেতে দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, যার যেখানে ইচ্ছে বসে পড়ো, হুজুর বলেছেন, তাঁর কাছে প্রজাদের কোনও জাত নেই। সবাই সমান।

সকলের স্থান সঙ্কুলান হবার পর রবীন্দ্রের নির্দেশে শুরু হল মাঙ্গলিক পাঠ। আচার-অনুষ্ঠান যেমন চলার চলতে লাগল। ম্যানেজার সমেত অনেক কর্মচারীই দূরে সরে দাঁড়িয়ে ছিল, এক সময় দু'তিনজন এসে বসে পড়ল পেছনের দিকে। রবীন্দ্র তাদের দিকে চেয়ে সস্মিতভাবে হেসে বলল, অন্যরাও যদি এখন আসতে চায় আমার আপত্তি নেই। ম্যানেজারবাবুকেও আমি পদত্যাগ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাচ্ছি!

এই কবি-কবি ধরনের ছোকরাটির যে এতখানি মনের জোর থাকবে তা ম্যানেজার কল্পনাও করেনি। সে হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। সমস্ত অনুষ্ঠান চুকে গেল নির্বিঘ্নে।

এর পর রবীন্দ্র অনেক কিছুই সহজ করে দিল। সে এখন একলা বেড়াতে যায়, কোনও বরকন্দাজকে পাহারাদার হিসেবে সঙ্গে নেয় না। গ্রামের প্রজাদের নিজে কাছে ডেকে এনে কথা বলে। অনেকে অবশ্য ডাকলেও আসে না। একদিন সে দেখল, নদীর ধারে কতকগুলি বালক হা-ডু-ডু খেলছে। অনেকদিন সে এই খেলাটি দেখেনি, তার ভারি ভাল-লাগল, ছেলেগুলির সঙ্গে ভাব করার জন্য সে হাতছানি দিয়ে ডাকল তাদের। ছেলেরা ভাবল, তাদের বুঝি কোনও অপরাধ হয়েছে, খেলা ভেঙে তারা ছুটে পালাল। সকলের ভয় ভাঙাতে অনেক সময় লাগবে।

রাত্তিরে অনেকক্ষণ জেগে থাকে রবীন্দ্র। মাল্লা-পাহারাদাররা ঘুমিয়ে পড়লেও লণ্ঠন জ্বেলে সে ইন্দিরাকে চিঠি লেখে। কখনও ছাদের ওপর উঠে বিশাল আকাশের নীচে দাঁড়ায়। বর্ষায় পদ্মা নদীর যৌবন যেন প্রতিদিনই বিকশিত হচ্ছে। রাত্রির নদী ফিসফিস করে কত কথা বলে। এই নদীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে যায় এক রহস্যময়ী রমণীর কথা, আজই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নদীর ঘাটে। সে একজন গেরুয়া পরা যুবতী। বেশ মাজা মাজা শরীর, কোথা থেকে সে এই গ্রামে এসেছে কেউ জানে না। বসাকদের একটা এঁদো পুকুরের ধারে একটা তমাল

গাছের নীচে কুটির বেঁধে একলা একলা থাকে। তার কোঁচরে সব সময় বাঁধা থাকে অনেক ফুল। তার নাম সর্বখেপী, কেউ কেউ বলে সে নাকি জাদু জানে। নায়েবমশাইও রবীন্দ্রকে সাবধান করে দিয়েছে, বাবুমশাই, ওর চোখের দিকে তাকাবেন না। তা হলে আর কলকাতায় ফিরতে পারবেন না। সে কথা শুনে রবীন্দ্র হাসি পেয়েছিল।

সকালবেলা নদীর ঘাটে সেই সর্বখেপীর সঙ্গে রবীন্দ্রের মুখোমুখি দেখা। থমকে দাঁড়িয়ে সর্বখেপী এমন একটা ভাব করল, যেন সে রবীন্দ্রকে বহুদিন চেনে। কোঁচড় থেকে এক মুঠো গন্ধরাজ ফুল তুলে রবীন্দ্রের হাতে দিতে দিতে বলল, গৌর, কেমন আছ গৌর! তারপর সে রবীন্দ্রের গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, গৌরসুন্দর আমার, পরাণের নিধি...। সেই কোমল হাতের স্পর্শে রবীন্দ্রের শরীর শিরশির করছিল, এ গ্রামের কেউ তাকে এমনভাবে ছুঁতে সাহস করবে না।

সর্বখেপী একটা গানও গেয়েছিল :

মোরে যে বোলো সে বোলো সখি
সে রূপ নিরখি নারি নিবারিতে
মজিল যুগল আঁখি
ও না তনুখানি কেবা সিরজিল
কি মধু মাখিয়া তায়...

গানটা কি সর্বখেপীর নিজের রচনা, না আগেকার কোনও পদকর্তার মিলিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু সুরটা অপূর্ব। আজ সারাদিন নিজের লেখার সময়ও রবীন্দ্র মাঝে মাঝে এই গানটা গুনগুন করেছে। সুরটা গেঁথে গেছে তার মনে।

অনেক রাতেও কিছু কিছু নৌকো যায়। দূরে দেখা যায় বিন্দু বিন্দু আলো। আকাশে চাঁদ ও মেঘের লুকোচুরি চলেছে, স্নিগ্ধ বাতাস নিয়ে আসে রাত্রে ফোটা ফুলের সুগন্ধ, চলন্ত নৌকোয় শোনা যায় রাত জাগা মাঝিদের গান। একটা নৌকো এ দিকেই আসছে, রবীন্দ্র উৎকর্ণ হয়ে গানের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করল। পাশ দিয়ে যাবার সময় বোঝা গেল কিছুটা :

যোবতী
ক্যান বা কর মনভারি
পাবনা থেকে এনে দেবো
টাকা দামের মোটরি...

এ যে চিরকালের তৃষিত বিরহীর গান। কোন দূর গ্রামে রয়ে গেল স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা, সওদাগর কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। সেই অভিমানিনীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রেমিকটি পাবনা থেকে এক টাকা দামের মোটরি কিনে আনবে। মোটরিটা কী বস্তু? কী সেই দুর্লভ জিনিস পাবনায় পাওয়া যায়, মাত্র এক টাকা দাম, যা পেলে প্রেমিকার মুখে হাসি ফুটবে?

রবীন্দ্র দ্রুত কামরায় ফিরে গিয়ে নিজের খাতায় গানটি লিখে রাখল। এমন সরল হৃদয় ভরা গান অনেক কবিই লিখতে পারবে না। এই গান কেন নির্জন রাত্রির নদীবক্ষে হারিয়ে যাবে? রবীন্দ্র ঠিক করল, গগন হরকরাকে ডেকে তার গানগুলিও সে লিখে নেবে।

জমিদারি পরিদর্শনে আসার প্রধান উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব কর আদায় করে তহবিল বোঝাই করা। এ বারে আদায়-পত্র ভালই হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথ খুশি হবেন। এ ছাড়াও, গ্রামবাংলার কত গান, কত মানুষের মুখ, জীবনের কত বিচিত্র বিকাশ, প্রকৃতি ও মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের অনুভব রবীন্দ্র যে তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে বোঝাই করে নিয়ে চলেছে, সেই সম্পদের পরিমাপ করবে কে?

৩

কাশিয়াবাগানে জানকীনাথ ঘোষালের বাড়িতে সান্ধ্য চায়ের আসর বেশ বিখ্যাত। এই চায়ের আসরে আমন্ত্রণ পাওয়াই সামাজিকভাবে বিশেষ গৌরবের ব্যাপার।

বড় হলঘরটা সুদৃশ্য সোফাসেটি দিয়ে সাজানো। মাঝখানে একটি নিচু, গোল কাশ্মীরি টেবিল। এক দিকের দেয়ালে একটি এক মানুষ-সমান বিশাল ঘড়ি, তার ঘণ্টাধ্বনি গির্জার ঘণ্টার মতন সুগম্ভীর। অন্য দিকে একটি পিয়ানো। এ ছাড়া দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে বিলাতি চিত্রকরদের কয়েকটি বাঁধানো ছবি। ঝুলন্ত ঝাড়লণ্ঠনটিতে চৌষট্টিটি বাতি জ্বলে। এ বাড়িতে টানা পাখার ব্যবস্থা নেই, লেস দিয়ে মোড়া অনেকগুলি হাত-পাখা থাকে অতিথিদের জন্য। অতিথির সংখ্যা সাত-আটজনের বেশি নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি বিষয়ে কথাবার্তা হয়, রসিকতা-হাসিঠাট্টাও চলে, সঙ্গীতও চা-জলপানের অঙ্গ, কিন্তু পরনিন্দা-পরচর্চা বা নিছক লঘু কথা কেউ বললে অন্যরা ভুরু তুলে থামিয়ে দেয়।

এই চায়ের আসরে মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন, এই বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য অভিজাত গৃহে দেখা যায় না। পরিবেশটি অনেকটা বিলিতি ধরনের হলেও মানসিকতায় এঁরা খুবই স্বদেশি। এই পরিবারটিই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ।

আসরের মধ্যমণি জানকীনাথ নিজে নন, তাঁর স্ত্রী স্বর্ণকুমারী। অনেকে বলে মহারানি ভিকটোরিয়ার ভাবভঙ্গির সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর মিল আছে। ব্রিটিশ রাজত্বে এখন যেমন রাজা নেই, মহারানির শাসন চলছে, সেইরকমই এই ঘোষাল পরিবারের সব কিছু চলে স্বর্ণকুমারীর অভিপ্রায় অনুসারে। জানকীনাথ একটু আড়ালে থাকতে ভালবাসেন। তাঁর স্বভাবটিই এরকম, বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত, কিন্তু নিজের প্রচার চান না। গত সাত-আট বছর ধরে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন শহরে, তার পেছনে জানকীনাথের উদ্যোগ ও অর্থসাহায্য অনেকখানি, কিন্তু তিনি সহজে মঞ্চের ওপর বসতে রাজি হন না। তাঁর সাহিত্যজ্ঞান যথেষ্ট, তবু নিজে কলম ধরেন না, তিনি চান তাঁর স্ত্রী ও কন্যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক। নিঃশব্দে তিনি আরও এমন কিছু সমাজসংস্কারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যা অনেকের কাছে অকল্পনীয়। জমিদার-তনয় হয়েও জানকীনাথ কোনও রকম জাতিভেদ বা ছুঁৎমার্গ মানেন না। মেথর বা চণ্ডালের হাতের রান্নাও তিনি অম্লানবদনে খেতে পারেন। এ শুধু কথার কথা নয়, সমাজের একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের বাড়িতে চাকরি দিয়ে তাদের রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজকর্ম শিখিয়ে দেওয়া হয়, এ বাড়ির সর্বত্র তাদের অবাধ গতি।

আজ অবশ্য তাদের সরিয়ে দিয়ে একজন খাঁটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে সমস্ত আহার্য প্রস্তুত করানো হয়েছে। সেই ব্রাহ্মণটির খালি গা, মাথায় টিকি; গলায় সাদা ধপধপে মোটা পৈতে, অর্থাৎ তার ব্রাহ্মণত্ব প্রকটভাবে দৃশ্যমান। আজ বোম্বাই থেকে একজন অতিথি আসবেন, যাঁর ছুঁৎমার্গ সম্পর্কে নানান কাহিনী প্রচলিত।

অতিথিরা আসবেন সাড়ে ছ'টার সময়, স্বর্ণকুমারী ও সরলা ঘরটির সাজসজ্জা শেষবারের মতন তদারকি করে নিচ্ছে। প্রত্যেকটি সোফার সামনে ছোট ছোট টুল পাতা, তাতে রাখা হয়েছে জলের গেলাস, চুরুটের বাক্স ও দেশলাই। চুরুটের বাক্সগুলি সব রুপোর, আর পেতলের লম্বা লম্বা ছাইদানগুলি সোনার মতন ঝকঝকে। স্বর্ণকুমারী দেয়ালের একটা বাঁকা ছবি সোজা করে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী গান গাইবি ঠিক করেছিস?

সরলা বলল, রবিমামার দু'খানি গান গাইব। তুমি আমাকে বেশি গাইতে বোলো না।

স্বর্ণকুমারী বললেন, বাংলা গান তো মিস্টার তিলক বুঝবেন না। তুই আজ একটা সংস্কৃত গান গাইলে পারিস।

সরলা ইংরিজি, বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসি, হিন্দি এমনকী কর্ণাটকি গানও জানে, তবু সে বলল, আমি বাংলা গানই গাইব। ওরা বুঝতে শিখুক। আমরা হিন্দি গান গাই, ওরা কেন বাংলা শুনবে না?

স্বর্ণকুমারী বললেন, সংস্কৃত গান গাইলে কী হবে জানিস তো, ওরা মনে করে, বাঙালিরা সংস্কৃত ভাল জানে না, তুই দেখিয়ে দিবি, আমাদের মেয়েরাও কত ভাল সংস্কৃত জানে।

সরলা ঠোঁট উল্টে বলল, ওদের কাছে আমি অত নিজেকে জাহির করতে চাই না!

স্বর্ণকুমারী খানিকটা আদেশের সুরে বললেন, এত করে সংস্কৃত শেখা হচ্ছে, একটা গান শোনাতে কী আছে? অন্তত বঙ্কিমবাবুর ওই বন্দেমাতরম গানটা...

মায়ের সঙ্গে সরলার প্রায়ই মতবিরোধ হয়। তবু পারিবারিক সহবত অনুযায়ী কেউ গলা চড়িয়ে কথা বলে না। গুরুজনদের কথার প্রতিবাদেরও একটা সীমারেখা আছে। আপত্তি চেপে রেখে সরলা বলল, আচ্ছা গাইব।

সরলা অনেক ব্যাপারেই বিদ্রোহিনী। কলেজে ভর্তি হবার সময় সে হঠাৎ ঠিক করেছিল, সে একটা বিজ্ঞানের বিষয় নেবে। তাও আবার পদার্থবিদ্যা, ফিজিক্স! মেয়েরা পড়বে ফিজিক্স, এ তো পাগলামি! বেথুন কলেজে তো ফিজিক্স পড়াবার কোনও ব্যবস্থাই নেই। বড় জোর বটানি পড়া যেতে পারে, তাতে বিশেষ যন্ত্রপাতি লাগে না। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও জেদ ধরে রইল সরলা। কলেজে ব্যবস্থা না থাকলেও মহেন্দ্রলাল সরকারের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর দা কালটিভেশান সায়েন্স-এর সান্ধ্য লেকচার শুনে পরীক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে তো শুধু পুরুষরা যায়। অতগুলি বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে একা একটি মেয়ে গিয়ে বসতে পারে নাকি? কিন্তু অনেক প্রথাই তো ভাঙছে একটু একটু করে। সরলা ডাক্তারি পড়তে রাজি হয়নি বলে মহেন্দ্রলাল কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এবার সে বিজ্ঞান পড়তে আগ্রহী শুনে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, ব্যবস্থা হবে, আলবাৎ ব্যবস্থা হবে। ছেলেগুলো কি বাঘ নাকি যে খেয়ে ফেলবে মেয়েটাকে?

তবে, সন্ধেবেলা একা একা সরলাকে বিজ্ঞান ভবনে গিয়ে ক্লাস করতে হল না অবশ্য। লেকচার শুরু হবার আগে সরলা গিয়ে বসে থাকত মহেন্দ্রলাল ও ফাদার লাফোঁর চেম্বারে। তারপর তার দুই দাদা তাকে সঙ্গে নিয়ে আসত বক্তৃতা কক্ষে, তাদের জন্য সামনের দিকে পাতা থাকত আলাদা তিনটি চেয়ার। দাদাদের সঙ্গে আসবার সময় ছাত্ররা চাপা টিটকিরি দিয়ে বলত, বডি গার্ড, বডি গার্ড!

সসম্মানে ফিজিক্স পাস করে রুপোর মেডেল পেয়েছিল সরলা। বি এ পরীক্ষাও সে অনার্স নিয়ে পাস করেছে। এখন তার প্রধান কাজ ভারতী পত্রিকার দেখাশুনো করা এবং বিবাহেচ্ছু প্রেমিকদের দূরে সরিয়ে রাখা। না, বিয়ে করে কোনও বাড়ির বউ সেজে বসে থাকার একটুও ইচ্ছে নেই তার। জীবন তার কাছে এর চেয়ে অনেক বড়। মা-বাবাও অবশ্য বিয়ের জন্য চাপ দেন না সরলাকে।

এর মধ্যে সরলা আবার ঠিক করেছে, সে সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষা দেবে। এক বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতের কাছে শুরু করল পড়াশুনো। সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপক তা জানতে পেরে বললেন, হুঁঃ, অত সোজা নাকি? বাড়িতে পড়ে এম এ পরীক্ষা? এ আর অন্য কোনও বিষয় নয়, সংস্কৃত, কী করে পাস করে দেখব! সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে সরলা, দিনরাত সংস্কৃত পড়ছে। তার পণ্ডিত বলেছেন, হাতিবাগানের দত্তদের বাড়ির ছেলে হীরেন্দ্র, সত্যিকারের হিরের টুকরো, আর এই সরলা, এমন আর দেখিনি!

বাইরে ঘোড়ারগাড়ির শব্দ হতেই স্বর্ণকুমারী দ্রুত অন্দরমহলে চলে গেলেন। অতিথিরা হঠাৎ এসে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলবে, এরকম কখনও হয় না। অতিথিরা সবাই এসে আসন গ্রহণ করবেন, ভৃত্যেরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে যাবে, পারস্পরিক কথাবার্তা শুরু হবে, তারপর একসময় নাটকীয়ভাবে গৃহকর্ত্রীর আবির্ভাব, রাজসভায় রাজেন্দ্রাণীর প্রবেশের মতন।

সরলা অবশ্য সাজপোশাক বা আদবকায়দা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সাদা সিল্কের শাড়ি তার পছন্দ, বাঁ কাঁধের কাছে একটি বড় রক্তিম চুনি বসানো ব্রোচ, এ ছাড়া অন্য কোনও অলংকার সে পরেনি। সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওপর থেকে নেমে এলেন জানকীনাথ, কন্যার দিকে চেয়ে সকৌতুকে বললেন, আজকের পার্টিতে কোনও ব্যাচিলর নেই, তোকে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে জ্বালাতন করবে না।

প্রথম দু'জন অতিথিই সরলার অপরিচিত। বাগবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের ছোট ভাই মতিলাল একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। শিশিরকুমার এখন বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে খুব মেতেছেন, মতিলালই ওঁদের অমৃতবাজার পত্রিকা প্রধানত দেখাশুনো করেন, কিছুকাল আগে এই পত্রিকাটি তাঁরই চেষ্টায় সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হয়েছে। মতিলাল জাতীয় কংগ্রেসেরও একজন উৎসাহী সংগঠক। মতিলালের সঙ্গীটিও একজন বিখ্যাত সাংবাদিক, ইনি বোম্বাইয়ের কেশরী নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক এবং মারাঠা পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ও লেখক। ইংরিজি ও মারাঠি এই দুই ভাষাতেই লেখেন, এঁর নাম বালগঙ্গাধর তিলক।

বালগঙ্গাধর তিলকের বয়েস ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের মতন, সুগঠিত, ব্যায়ামপুষ্ট শরীর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখখানিতে চাপা অহংকারের চিহ্ন। ইনি চিৎপাওন ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রের এই চিৎপাওন ব্রাহ্মণরা মনে করে, এরাই ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এমন জনশ্রুতি আছে যে, বিদেশি একটি জাহাজ আরব সাগরে ডুবে গেলে তার যাত্রীরা ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকে কোঙ্কন উপকূলে। স্থানীয় মানুষরা এদের সবাইকে মৃত ভেবে চিতায় চড়িয়ে দেয়, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠার পর সেই প্রত্যেকটি মৃতকল্প মানুষ উঠে বসে। জ্বলন্ত চিতা থেকে পুনর্জীবিত হয় বলেই এদের নাম চিৎপাওন। এক সময় মহারাষ্ট্র তথা ভারতের অনেকখানি অংশেরই শাসনক্ষমতা দখল করেছিল এই চিৎপাওন ব্রাহ্মণরা, ছত্রপতি শিবাজীর উত্তরাধিকারী পেশোয়াগণ ছিলেন এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বালগঙ্গাধর উচ্চ শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর বেশ কিছু মতামত অত্যন্ত সংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রাচীনপন্থী। মহারাষ্ট্রে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি অগ্রণী অথচ বিধবাবিবাহের বিরোধী। জাতি-ভেদ প্রথার সমর্থক। এই কিছুদিন আগে সহবাস-সম্মতি আইন নিয়ে কত হইচই হয়ে গেল তাতেও এঁর ভূমিকা ছিল বিচিত্র। বাল্যবিবাহ প্রথার দরুন পাঁচ ছ' বছর বয়েসের মেয়েদের ওপর স্বামীরা ধর্ষণ করে, ভয়ে ও যন্ত্রণায় কত বালিকা মারাই যায়, এতকাল তা গোপনই থাকত, এখন সংবাদপত্রে সে রকম কিছু কিছু ঘটনা মুদ্রিত হয় প্রায়ই। সেইজন্য ইংরেজ সরকার একটা আইন প্রণয়ন করতে চাইলেন। বিবাহ যে-বয়েসেই হোক, স্ত্রীর বয়েস বারো বছর পূর্ণ হবার আগে কোনও স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না। বারো বছরের কম বয়েসী বধূর সঙ্গে কোনও স্বামী জোর করে মিলিত হতে চাইলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। বিবাহ একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সে ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করতে ইংরেজ সরকার সাহস পায় না। কিন্তু যেখানে বালিকাদের ওপর ধর্ষণে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, সেখানে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়াই তো সঙ্গত। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এই আইনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করে গেছেন।

বালগঙ্গাধর তিলক যদি শুধু একজন গোঁড়া, প্রাচীনপন্থী মানুষ হতেন, তা হলে তাঁকে আমল না দিলেই চলত। কিন্তু ইনি একজন প্রবল দেশপ্রেমিক, ছাত্র অবস্থাতেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কোনওদিন ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করবেন না। দেশের মানুষের চেতনা জাগ্রত করা এঁর ব্রত, জাতীয় কংগ্রেসে ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন, নেতৃত্ব দেবার সমস্ত গুণ রয়েছে এঁর মধ্যে। এরকম মানুষকে কোনওক্রমেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

জানকীনাথ এই দুই অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন ভেতরে। ধুতির ওপর গায়ে শুধু একটা সিল্কের চাদর জড়িয়ে আছেন তিলক। আসন গ্রহণ করার আগে তিনি জুতো খুলে পা ধুতে চাইলেন। সরলা নিজে তিলককে বাইরের উঠোনে নিয়ে গিয়ে জল ঢেলে দিল তাঁর পায়ে। তিলক এই যুবতীর সঙ্গে কোনও কথা বললেন না।

একে একে অন্য অতিথিরা এসে উপস্থিত হলেন। স্বর্ণকুমারী মাঝখানে এসে বসার পর নিজের হাতে এক একটি পিরিচে খাবার সাজাতে লাগলেন। নবীন ময়রার দোকান থেকে আলাদাভাবে রসগোল্লা বানিয়ে আনা হয়েছে, বাড়িতে তৈরি হয়েছে মালপোয়া, সন্দেশ, নিমকি, লুচি, মোহনভোগ। তিলকের কথা চিন্তা করে সমস্ত আহার্যই আজ নিরামিষ, পেঁয়াজ কিংবা ডিমের ছোঁয়া পর্যন্ত নেই।

মতিলাল স্বর্ণকুমারীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওঁকে কিছু দেবেন না।

স্বর্ণকুমারী বিস্মিত হয়ে বললেন, সবই তো ব্রাহ্মণের হাতে তৈরি। তাও উনি খাবেন না? কিছুই খাবেন না?

মতিলাল বাংলায় বললেন, উনি তো আমার বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি রান্নার বামুন ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু উনি নিজে বোম্বাই থেকে একজন রান্নার ঠাকুর সঙ্গে করে এনেছেন। বাঙালি বামুনদের ওপর ওঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা নেই।

স্বর্ণকুমারী খুবই আহত বোধ করলেন।

তিলক বাংলা বোঝেন না। তবু ওঁদের কথাবার্তার মর্ম খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করে ইংরিজিতে বললেন, আমি শুধু চা খাব। চা, দুধ, চিনি আলাদা করে রাখুন, আমি নিজে মিশিয়ে নেব।

মতিলাল সকৌতুকে বললেন, চা খেতে রাজি হয়েছেন? সেও তো এক সৌভাগ্যের ব্যাপার! আপনার একবার চা খাওয়া নিয়ে কী কাণ্ড ঘটে গেছে, সে কথা এঁদের বলতে পারি, বালগঙ্গাধর?

তিলক সোফাতে বসে আছেন শিরদাঁড়া সোজা করে, গম্ভীর মুখ, আয়ত চক্ষু দুটি যেন ঝকঝক করছে। মুখে কিছু না বলে সামান্য ঘাড় হেলিয়ে তিনি সম্মতি জানালেন।

মতিলাল বললেন, একবার হয়েছিল কী, পুণায় এক পাদ্রি আর তার বোন একটা বক্তৃতা সভায় সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকেছিলেন। বক্তৃতা-টক্তৃতা তো হয়ে গেল, তারপর চা আর বিস্কুট পরিবেশন করা হল। তিলক, রানাডে, গোখলে এঁরা সবাই নিলেন। আর ছিল যোশী নামে একজন নেটিভ ক্রিশ্চান। সে লোকটা উৎসাহ করে চায়ের কাপ, বিস্কুট এগিয়ে দিচ্ছিল। তারপর সে-ই একটা খবরের কাগজকে জানিয়ে দিল যে এইসব ব্যক্তিরা এক বিধর্মী মিশনারির বাড়িতে চা খেয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে উঠল, শঙ্করাচার্যের মঠে বিচার সভায় তিলকদের জাতিচ্যুত করার বিধান দেওয়া হল। তখন তিলক নানা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝালেন যে এই লঘু পাপে প্রায়শ্চিত্ত করলেই নিস্তার পাওয়া যায়। তিলক কিছু অর্থ জরিমানা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তারপর থেকে আর তিনি যেখানে সেখানে চা খান না।

উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী বললেন, মিস্টার তিলক, একটা প্রশ্ন করতে পারি? আপনি প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হলেন কেন? আপনি কি সত্যি মনে করেন, ক্রিশ্চান হোক বা যাই-ই হোক, কারুর বাড়িতে চা পান করা দোষের?

তিলক দু'দিকে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করে বললেন, না।

আশুতোষ চৌধুরী বললেন, তা হলে আপনি জরিমানা দিলেন কেন? আমরা তো কত সাহেব-মেমের হাতে চা খেয়েছি, হোটেলে গিয়েও চা খাই, আমাদের তো জাত যায় না।

তিলক এবার জলদমন্দ্র স্বরে বললেন, বাংলায় আপনারা অনেক সামাজিক নিয়ম ভাঙতে পারেন, বদলাতে পারেন, কারণ বাংলায় সে রকম সুদৃঢ় সমাজবন্ধন নেই। শঙ্করাচার্যের মতন ধর্মগুরু নেই। আমি জানি, চা-পাতার রস, একটু দুধ ও একটু চিনি মিশ্রিত পানীয়টি নির্দোষ, তাতে জাত যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত মানুষ এখনও মনে করে, বিধর্মীর হাতে কিছু খেলে জাত যায়। যতদিন না তাদের এই মনোভাবের বদল ঘটছে, ততদিন আমি বাড়াবাড়ি করতে চাই না। শঙ্করাচার্য যদি আমাকে জাতিচ্যুত করতেন, তা হলে সাধারণ মানুষ আর আমার কোনও কথা শুনতেই চাইত না। ব্রাত্যদের সবাই অবজ্ঞা করে, তাই আমি প্রায়শ্চিত্ত মেনে নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি, আমি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। আপনারা মনে করেন, আগে সমাজসংস্কার, তারপর

রাজনীতি। আমি মনে করি, আগে রাজনীতি, তারপর সমাজসংস্কার।

তিলকের বক্তৃতাটি শেষ হতেই সরলা ফস করে জিজ্ঞেস করল, আপনি নাকি বিধবাবিবাহেরও বিরোধী?

তিলক স্পষ্ট গলায় বললেন, হ্যাঁ।

সরলাও খানিকটা অভিযোগের সুরে বলল, কেন? বালবিধবাদের যে কত কষ্টের জীবন কাটাতে হয় তা আপনি জানেন না? কখনও দেখেননি?

তিলক বললেন, দেখেছি, জানি। বিধবাদের উচিত সেই কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেও পরিবারের সবার সেবা করে যাওয়া। তাতে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। নইলে সমাজে অসংযম বাড়বে।

সরলা বলল, বাঃ, বেশ কথা বললেন। মেয়েরাই শুধু কষ্ট স্বীকার করবে। আর পুরুষরা একটার পর একটা বিয়ে করে যাবে।

তিলক বললেন, কন্যা, তুমি আমার পুরো মতামত জানো না। আমি যেমন বিধবাদের বিয়ে মানি না, তেমনই বলেছি, বিপত্নীকরাও আর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না।

আসরে একটা মৃদু হাস্যরোল উঠল। এমন অদ্ভুত প্রস্তাব কেউ কখনও শোনেনি।

জানকীনাথ একটা প্রশ্ন করার জন্য উসখুস করছিলেন। কিন্তু তিনি গৃহস্বামী, অতিথি বিরক্ত হতে পারেন এমন কোনও কথাই তাঁর বলা উচিত নয়। মনে মনে ভাবলেন, ভাগ্যিস আজ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে নেমন্তন্ন করা হয়নি। তা হলে তিনি বোম্বাইয়ের এই নেতাটিকে ধমকে শেষ করে দিতেন।

তিনি ফিসফিস করে আনন্দমোহন বসুকে বললেন, সহবাস সম্মতি বিলের কথা একবার জিজ্ঞেস করো না।

আনন্দমোহন বললেন, মিস্টার তিলক, আপনি সহবাস সম্মতি বিলের এত ঘোর বিরোধী কেন, তা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারিনি। বাচ্চা মেয়েদের ওপর স্বামীরা অত্যাচার করুক, এটা আপনি মেনে নেবেন?

এই প্রসঙ্গটি ওঠা মাত্র সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সহবাস শব্দটি অন্য পুরুষদের সামনে শোনাও উচিত নয় কোনও কুমারী মেয়ের।

তিলক বললেন, সে রকম কোনও স্বামীরূপী পশুকে চোখের সামনে দেখলেই আমি জুতো পেটা করব!

সকলেই বিস্মিত। এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা।

আনন্দমোহন বললেন, কী আশ্চর্য, আমরা যে একেবারে অন্যরকম শুনেছি। এই বিল পাস হবার আগে আপনি তীব্র ভাষায় এর বিরুদ্ধে লিখেছেন, এর বিরুদ্ধে সই সংগ্রহ করেছেন। একথাও শুনেছি, পুণার ক্রীড়াভবনে ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই বিলের সমর্থনে একটা মিটিং ডেকেছিলেন, আপনি দলবল নিয়ে জোর করে সেখানে ঢুকে মিটিং ভেঙে দিয়েছেন, খানিকটা মারামারিও হয়েছিল!

তিলক বক্রভাবে বললেন, মিটিং-এ জোর করে ঢুকতে হয় কেন? মিটিং কি সবার জন্য নয়? যারা বাধা দিয়েছিল, আমার সঙ্গীদের সঙ্গে তাদের ধাক্কাধাক্কি তো হতেই পারে।

আনন্দমোহন বললেন, আপনি এই বিল পাশের ঘোর বিরোধিতা করেছেন, অথচ এখানে বলছেন, বাচ্চা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা অন্যায়।

তিলক বললেন, বিরোধী তো বটেই। এই বিল পাস হওয়া খুবই অনুচিত হয়েছে।

তারপর হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, শুনুন, আপনাদের কতকগুলো স্পষ্ট কথা বলি। আমার ব্যক্তিগত মত এই, বাল্যবিবাহ অতি ক্ষতিকর প্রথা। মেয়েদের ষোলো আর ছেলেদের কুড়ি বছর বয়েসের আগে বিয়ে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। আমাদের হিন্দু ধর্মের এরকম সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। সে আমরা যখন পারব করব। ইংরেজ সরকার মাথা গলাতে যাবে কেন? আপনারা বাঙালিরা, নিজেরা কিছু করতে পারেন না, এক একটা সমাজসংস্কারের প্রস্তাব তুলে সরকারের কাছে

ফেলে দেন, সরকার তা নিয়ে আইন পাস করলে মনে করেন, একটা দারুণ কীর্তি হল। আমরা চাইছি, সরকারের কাছ থেকে কিছু কিছু ক্ষমতা নিয়ে নিতে, আর আপনারা সরকারের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন। আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে ইংরেজ সরকারকে মাথা গলাতে দিলে ক্রমেই তো তারা পেয়ে বসবে! সেই জন্যই আমি এইসব সরকারি আইনের বিরোধী।

আনন্দমোহন বললেন, আপনি যা বললেন, আমাদের বাংলাতেও অনেকে এই মতে বিশ্বাসী। এখানকার কিছু রক্ষণশীল পত্রিকা সহবাস সম্মতি বিল সমর্থন করেনি। কিন্তু অন্য একটা দিক ভেবে দেখেছেন? আইন প্রয়োগ না করলে কি অনেক অনাচার বন্ধ করা যায়? আইন পাস না হলে সতীদাহ বন্ধ হত? ক্রীতদাস প্রথা রদ হত? পরাধীন জাতি নিজেদের সমাজ বদলাতে পারে না। আপনার যুক্তি অনুযায়ী, কবে আমাদের সমাজের কিছু কিছু বীভৎস প্রথা নিজেরাই বদলাবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকলে এখনও শত শত নারী স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরত, হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের মতন মানুষও কেনা-বেচা চলত!

জানকীনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আর একবার চা?

মতিলাল বললেন, একটু গান হোক না। সরলা মাকে ডাকুন, গান শুনি।

সরলা এসে পিয়ানোয় বসল।

পরপর তিনটি গান শোনালো সে, অন্য সকলে বাহবা দিলেও তিলকের কোনও ভাবের অভিব্যক্তি দেখা গেল না।

স্বর্ণকুমারী তাঁর রচিত দু'খানি বই এই মহারাষ্ট্রীয় অতিথিকে উপহার দিলেন। চায়ের আসরের শুধু বিশেষ বিশেষ অতিথিদেরই তিনি বই উপহার দেন। তিলক বাংলা পড়তে পারেন না। বই দুটি উল্টেপাল্টে পাশে সরিয়ে রাখলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে একটা বিশেষ প্রস্তাব জানাবার জন্যই আমি এবার কলকাতায় এসেছি।

সকলেই কৌতূহলী হয়ে তাকালেন তিলকের দিকে।

তিলক বললেন, আমরা বছরে একবার ভারতের কোনও শহরে জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে মিলিত হই, তারপর সারা বছর আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, আমাদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ থাকে না। কংগ্রেসের সভায় আমরা বক্তৃতার বন্যা ছোটাই, অবশ্যই ইংরেজিতে, তাতে আমাদের ভাষণ-পটুতার প্রমাণ হয় বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তাতে কি একটুও দাগ কাটে? এতকাল পরে আমরা ভারতীয় জাতিত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হতে চাইছি, কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে তার কি কোনও প্রভাব দেখা দিয়েছে এ পর্যন্ত। এতকালের বিদেশি শাসনে থেকে আমরা কূপমণ্ডুক হয়ে গেছি। বেশির ভাগ মানুষ নিজের এলাকার বাইরে যায় না, নিজের নিজের গোষ্ঠীর বাইরের মানুষদের চেনেই না। এক সঙ্গে অনেকে মিলে কোনও কাজ করতে আমরা জানিই না। শুধু বক্তৃতা দিয়ে আর সভা-সমিতি করে বেশি মানুষকে কাছাকাছি আনাও যাবে না। আমাদের কোনও জাতীয় উৎসব নেই। সেই জন্যই আমার প্রস্তাব, এরকম কিছু কিছু উৎসবের প্রবর্তন করা হোক, যাতে অজানা-অচেনা মানুষরাও কাছাকাছি এসে অংশগ্রহণ করতে পারে। মহারাষ্ট্রে আমরা গণেশ উৎসব শুরু করেছি। ভারতীয়রা ধর্মীয় উৎসব করে নিজের নিজের বাড়িতে, কখনও মন্দিরে গিয়ে। ধর্মের নামে পথে পথে মিছিল করতে ভারতীয়রা ভুলেই গিয়েছিল কয়েক শো বছর ধরে। গণেশ উৎসবে আমরা ভাল সাড়া পেয়েছি, প্রতি বছরই বেশি সংখ্যক মানুষ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যোগ দিচ্ছেন। উপলক্ষ যা-ই হোক, এক সঙ্গে এত মানুষ পথে নামার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আপনারা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে এরকম কোনও উৎসব চালু করতে পারেন না?

অন্যান্য অতিথিরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। জাতীয় উৎসব মানে গণেশ উৎসব? এ যে এক উদ্ভট কথা!

সরলার হাসি পেয়ে গেল। পেট মোটা, শুঁড়ওয়ালা ওই কিম্ভূতকিমাকার দেবতাটি সম্পর্কে সে অনেক ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুনেছে। তাকে নিয়ে উৎসব?

একজন অতিথি বললেন, মিস্টার তিলক, আপনি বললেন, ভারতীয়দের মধ্যে প্রকাশ্য উৎসবের

চল নেই ? কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তো আছে। মহরমের সময় সারা দেশেই তারা তাজিয়া নিয়ে বিরাট মিছিল করে।

তিলক বললেন, সেটা কি ভারতীয় উৎসব, না আরবি উৎসব ? সে যাই হোক, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তা ঠিক। কিন্তু হিন্দুরা কি ভারতীয় নয় ? তারা চিরকাল বিচ্ছিন্ন, কূপমণ্ডুক হয়ে থাকবে ? তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন নেই ? ওরা যদি সারা দেশে মহরমের মিছিল করে, আমরাই বা সারা দেশে কেন গণেশ উৎসব উপলক্ষে মিলিত হতে পারব না ? সিদ্ধিদাতা গণেশ সমস্ত হিন্দুদের কাছেই গ্রহণীয়।

মতিলাল এবার ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, ওহে তিলক, তুমি যাঁদের সামনে এই কথাগুলি বলছ, কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা থেকে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরা অধিকাংশই যে ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মরাই এখানকার সমাজের শীর্ষস্থানে বসে আছেন। তাঁরা মূর্তিপূজায় ঘোরতর বিরোধী, হিন্দু মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখ বুজে পার হয়ে যান, তাঁরা আবার নতুন করে গণেশ পূজার প্রচলন করবেন ? না হে না, তোমার এ প্রস্তাব এঁদের কাছে কল্কে পাবে না !

তিলক একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, বেশ, আপনারা বাঙালিরা উচ্চস্তরের মানুষ, ধর্মীয় উৎসব মানেন না। তা হলে অন্য কোনও উৎসবের কথা ভাবা যাক। আমরা কি বীর পূজার কথা চিন্তা করতে পারি ? ইংরেজরা মনে করে, আমরা শক্তিহীন, দুর্বল, কাপুরুষ। অতীতে কি আমাদের দেশে বীর যোদ্ধা ছিল না ? কাছাকাছি ইতিহাস থেকে সেরকম কোনও বীর দেশপ্রেমিক যোদ্ধাকে যদি আমরা আদর্শ হিসেবে স্থাপিত করি, তাকে কেন্দ্র করে উৎসব শুরু হবে, সেই উপলক্ষে আবার ব্যায়ামচর্চা, অস্ত্র অনুশীলনও হতে থাকবে, তা হলে আবার আমরা একটা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হব, আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হবে। সে রকম একজন বীরপুরুষের নাম ঠিক করুন, আপনাদের বাঙালিদের মধ্যে যদি কেউ থাকেন, তাঁকে নিয়েই সর্ব ভারতে উৎসব প্রচলিত হবে, মহারাষ্ট্রের দায়িত্ব আমি নিজে নেব।

সহসা কেউ কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। বাঙালি বীরপুরুষ ? বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, বাংলার ইতিহাস নাই। অস্পষ্ট ইতিহাস থেকে সে রকম মহান কোনও বীর যোদ্ধাকে কি খুঁজে বার করা যাবে, যাঁকে ভারতের সমস্ত প্রান্তে মোটামুটি চিনবে ?

একজন বললেন, বাঙালিই যে হতে হবে, তার কোনও অর্থ নেই। ভারতের যে কোনও অঞ্চল থেকে একজনকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক আকবর ? হ্যাঁ, সম্রাট আকবর হতে পারেন না ?

অমনি আরও কয়েকজন বললেন, হ্যাঁ, আকবর। আকবরকে সকলেই মেনে নেবে।

তিলক এঁদের প্রত্যেকের মুখপানে দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন। তারপর জিহ্বায় তলোয়ারের ধার এনে বললেন, আকবর ? আকবরের ব্যক্তিগত বীরত্বের কোনও প্রসিদ্ধি আছে বুঝি ? এদেশেরই বিভিন্ন সুলতান ও রাজাদের তিনি দমন করেছেন, তাঁর দৃষ্টান্তে আজকের কেউ প্রেরণা পাবে ?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আকবর কি ভারতীয় ? সেও তো বিদেশি শাসক। আমি যতটুকু ইতিহাস জানি, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর জয়ী হয়ে ভারত দখল করে। এই বাবর পিতা ও মাতার দিক দিয়ে তৈমুর আর চেঙ্গিস খানের বংশধর, দুজনেই কুখ্যাত লুটেরা। বিদেশি বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন কেড়ে নেয়। আর আকবর সেই সিংহাসনে বসে তেরো বছর বয়েসে, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র তিরিশ বছরেই এই বিদেশি রাজশক্তি ভারতীয় হয়ে গেল ? ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধ জয় করার পর ১৩৫ বছর কেটে গেছে, তাহলে ইংরেজরাই বা কী করে বিদেশি শক্তি হবে ?

একজন বললেন, মুঘলরা শেষ পর্যন্ত ভারতেই থেকে গিয়েছিল, এ দেশেই বিয়ে-শাদি করে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল।

তিলক বললেন, তা হলে আমরা এবারেও আরও দু-তিনশো বছর পরাধীন থেকে দেখি

ইংরেজরাও পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে যায় কি না ! তবে আর আন্দোলন করে লাভ কী ? দাসত্ব করতেই আমরা অভ্যস্ত !

এর পর আকবরের পক্ষে বিপক্ষে তর্ক শুরু হয়ে গেল। কেউ বললেন, আকবর হিন্দু মুসলমানকে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটাই একটা আদর্শ হতে পারে। আর একজন বললেন, অনেক মুসলমানের কাছে সেই জন্যই আকবর ঠিক গ্রহণীয় নন, তাঁকে খাঁটি মুসলমান বলে মনে করা হয় না। তিনি হিন্দু রমণীদের অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছেন। অন্য একজন বললেন, আকবর বেছে বেছে হিন্দু রাজকন্যাদের বিয়ে করতেন, কিন্তু নিজের পরিবারের কোনও মেয়েকে কি হিন্দু রাজার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন ? আর একজন বললেন, আকবরের ছবি নিয়ে উৎসব করতে গেলে সব মুসলমানরাই আপত্তি জানাবে, কোনও মানুষের ছবি কিংবা মূর্তিপূজাও তাদের কাছে নিষিদ্ধ।

তখন অন্য কোনও বীর খোঁজা হতে লাগল। কেউ বলল, আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে লড়েছিল, সেই পুরু ? অমনি অন্য একজন জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখতে ছিল তাঁকে ? কেউ বলল, সংগ্রাম সিংহ ; কেউ বলল, রাজা শশাঙ্ক ; কেউ বলল, নানা সাহেব ; কেউ বলল, গুরুগোবিন্দ সিং...

এইসব পরস্পরবিরোধী মতামতের সময় চুপ করে রইলেন তিলক। তাঁর কঠিন মুখভঙ্গি দেখলে মনে হয়, এঁদের কোনও প্রস্তাবই তিনি গ্রাহ্যের উপযুক্ত বোধ করছেন না।

এক সময় তিনি মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, শিবাজী ! ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ।

৪

সারা দিনের মধ্যে দুপুরগুলোই সরলার কাছে মনে হয় সবচেয়ে দীর্ঘ, সময় আর কাটতেই চায় না। এত বড় বাড়ি একেবারে শুনশান। পড়াশুনো করতেই বা কতক্ষণ ভাল লাগে ? যখন সময়ের টানাটানি থাকে কিংবা কিছু বিঘ্ন ঘটে, তখন পড়াশুনোয় মন বসে বেশি। আর সময় যখন অফুরন্ত, তখন মনে হয় পরে পড়লেই তো হয়।

দুপুরে ঘুমোতে পারে না সরলা, দোতলায় তার নিজস্ব ঘরে মাদুর পেতে গুচ্ছের বই খুলে বসে। ওপর মহলে কোনও পুরুষ মানুষ নেই, জানকীনাথ গেছেন মফস্বলে, দাদা বিলেতে, জামাইবাবু কিছুদিন দিদির সঙ্গে এখানে ছিলেন, এখন তিনিও বদলি হয়ে গেছেন রাজশাহিতে। এই গরমে বাড়িতে কোনও অন্তর্বাস পরে না মেয়েরা, সরলার অঙ্গে শুধু একটা আটপৌরে শাড়ি জড়ানো, চুল খোলা, দু চোখে গাঢ়ভাবে কাজল টানা। স্নান করার পর প্রত্যেক দিন সুর্মা-কাজল লাগানো তার শখ। সংস্কৃত বই পড়তে পড়তে এক সময় সে কোনও ইংরিজি কাব্যের বই টেনে আনে, খাতা খুলে দু-এক লাইন বাংলা কবিতা লেখে, হঠাৎ উঠে চলে যায় পাশের ঘরে। ঘরের তো অভাব নেই, সাত-আটখানা ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। যে ঘরে দিদি-জামাইবাবু থাকতেন, সেই ঘরের পালঙ্কের ওপর শুয়ে ছটফট করে সরলা। দিদি তার বন্ধু, মন কেমন করে দিদির জন্য। বিবিও তার বন্ধু, কিন্তু বিবি এখন আর এ বাড়িতে বিশেষ আসে না।

এ ঘরে দেয়াল জোড়া একটা আয়না। দিদির খুব আয়নার শখ, দিদি এই বেলজিয়াম গ্লাসের দামি আয়নাটা লাগিয়েছিল, কী পরিষ্কার সব কিছু দেখা যায়। ঠিক যেন পালঙ্কের ওপর শুয়ে থাকা আর একটি সরলাকে এই সরলা দেখছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সরলা ভাবে, সত্যি সত্যি কেমন দেখতে আমাকে ?

বিকেলে যে ছেলেগুলো আসে, তারা সুন্দরী সুন্দরী বলে বলে সরলার কান ঝালাপালা করে দেয়। কেউ বলে অপ্সরী, কেউ বলে সরস্বতী, কেউ বলে রাজকন্যার মতন। সরলা ফিক করে

হেসে ফেলে। রাজকন্যাই বটে, বন্দিনী রাজকন্যা! সরলা দু হাত ছড়িয়ে মুখে করুণ ভাব এনে রাজকন্যা সাজে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, প্রাণেশ্বর ? কে তুমি অদৃশ্য প্রাণেশ্বর, উদ্ধারিলে মোরে ?

বলতে বলতেই আবার তার হাসি পায়। এখনও পর্যন্ত কেউ তো তার প্রাণেশ্বর নয়! যেসব দিন কোনও আনুষ্ঠানিক চায়ের আসর থাকে না, সেইসব বিকেলেও কয়েকজন যুবক আসে। জানকীনাথের ভাষায়, তারা সব সরলার সিউটার। সত্যিই তারা আসে সরলার সাহচর্য পাবার জন্য, তার মনোরঞ্জনের জন্য তারা উপহার আনে কতরকম, ফুল ছাড়া সরলা অন্য কিছুই গ্রহণ করে না। তাদের মিষ্টি মিষ্টি স্তুতিবাক্যও বিশ্বাস করে না, সে জানে, ওরা তাকে অত সুন্দরী সুন্দরী বলে, বিবিকে দেখলেও গদগদভাবে ওই একই কথা বলবে। সরলা নিজে তো জানে, বিবি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

কেউ কেউ যখন একটু নিভৃতি পেয়ে সরলার কাছে উচ্ছ্বাস দেখাতে আসে, তখনও সরলা হেসে ফেললে তারা হকচকিয়ে যায়। সরলাও বোঝে যে এমনভাবে হেসে ফেলা উচিত নয়। কিন্তু সে যে হাসি সামলাতে পারে না।

একদিন ওদের একজন এমন নিরালা দুপুরে উঠে এসেছিল দোতলায়। বিশেষ পরিচিতদের মধ্যে কারুর যে ওপরে আসার নিষেধ আছে তা নয়, তবু দুপুরবেলা মেয়েরা যখন অন্দরমহলে কিছুটা অসংবৃত অবস্থায় থাকে, তখন কোনওভাবে জানান দিয়ে আসাটাই প্রথা। কিন্তু যোগিনী চাটুজ্যে যে হয় অতি সরল অথবা পাগল!

বড় মামা দ্বিজেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে সরোজার বিবাহ হয়েছে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সম্মানিত ব্যক্তি, সরোজার খুড়তুতো, মাসতুতো মিলিয়ে আঠেরো-কুড়িজন ভাই বোনের সকলেরই তিনি জামাইবাবু। এই মোহিনী জামাইবাবুর চারটি ভাই আছে, তাদের সর্বত্র অবাধ গতি। এদের মধ্যে সজনী আর যোগিনী দুজনেরই পছন্দ সরলাকে, দুজনেরই কেমন যেন পাগলাটে স্বভাব। সরলাকে তুষ্ট করার জন্য সজনী যখন-তখন বেসুরো গলায় গান গেয়ে ওঠে, সবাই হেসে গড়াগড়ি দিলেও সে থামতে চায় না। যোগিনী আবার উল্টো রকমের, সে প্রায় কথাই বলতে চায় না, চুপ করে মুগ্ধ নয়নে সরলার দিকে চেয়ে বসে থাকে। অন্য কেউ কথা বলতে গেলেও সে উত্তর দেয় না। তাই নিয়ে বারবার হাসি-ঠাট্টা করলে সে হঠাৎ অতি উৎসাহী হয়ে বলে ওঠে, তাস খেলবে ? তাস খেলবে ? এক প্যাকেট তাস নিয়ে সে সশব্দে ফ্যাটাতে থাকে, তাস খেলায় সে খুবই তুখোড়, এই খেলা দিয়ে সে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়।

যোগিনী চাটুজ্যেকে অকস্মাৎ দোতলার ঘরে দেখে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল সরলা। সেদিনও সে দিদির ঘরের এই পালঙ্কেই শুয়ে ছিল। যোগিনী চাটুজ্যে বেশ সুপুরুষ, সচরাচর সে সাহেবি পোশাক পরে, কিন্তু ধুতি ও আচকানে তাকে আরও ভাল মানায়, সেদিন তার দেশি বেশ, হাতে একটি মখমলের কৌটো, মুখখানা বিহ্বল ধরনের।

সরলা প্রথমে ভেবেছিল, ওই মখমলের কৌটোর মধ্যে বুঝি তাস আছে, যোগিনী তাস খেলতে এসেছে। কিন্তু দরজার কাছে যোগিনী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার কৌটোটি খুলে বার করল একটি আতরের শিশি। দ্রুত এগিয়ে এসে সেই শিশিটা সরলার এক হাতের মুঠোয় দিয়ে বলল, সরলা, সরলা, যে কথা আমি এতদিনেও তোমায় বলতে পারিনি, আজ তা বলতে এসেছি, এই যে আতরটুকু, গাজিয়াবাদ থেকে আনিয়েছি, বড় সাধ হল তোমাকে দিই, এ যেন আমারই বুকের নির্যাস, তুমি অঙ্গে মাখবে...

মিতবাক যোগিনী চাটুজ্যের যেন সব সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে গেছে, অনর্গল কথা বেরিয়ে আসছে।

একজন রূপবান প্রেমিক উপহার এনেছে আতরের শিশি, সরলা উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী, নিরালা দুপুর, তৃতীয় কোনও ব্যক্তি এসে পড়ার সম্ভাবনা নেই। প্রেমের এমন উপযুক্ত পরিবেশ, তবু সরলা হঠাৎ উত্থিত একটা ফোয়ারার মতন হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বলতে লাগল, ওকী, ওকী, তুমি অমন শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছ কেন ?

সেই হাসিতে চুপসে গিয়ে পিছু হটতে লাগল যোগিনী। আবার দরজার কাছে গিয়ে এমন

বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইল, যেন সে গ্রহান্তরের কোনও প্রাণীকে দেখছে। সরলার হাসি আর থামেই না।

সেদিনের পর যোগিনী আবার দিন সাতেক গুম মেরে গিয়েছিল, যদিও এ বাড়িতে আসা বন্ধ করেনি। সেদিন যোগিনী মনে খুব আঘাত পেয়েছিল, সরলা বুঝতে পারে, কিন্তু সরলার যে ওই ধরনের কথা শুনলেই ন্যাকামি মনে হয়। আজও সে কথা মনে পড়ায় তার হাসি পেয়ে যাচ্ছে।

ওদের আর এক বন্ধু অবিনাশ চক্রবর্তীও নিয়মিত আসে। এর মাথায় বাবরি চুল, কাঁধে সব সময় থাকে সিল্কের চাদর, ঢুলু ঢুলু চক্ষুটি দেখলেই মনে হয় কবি কবি। অবিনাশ নিজে অবশ্য কবি নয়, তার বাবা ছিলেন নামজাদা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। অবিনাশ যখন ছোট ছিল, তখন তার বাবা তাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে একাধিকবার সম্বোধন ছিল, 'বাছনি আমার'। এখন অবিনাশকে অনেকেই আড়ালে 'বাছনি আমার' বলে ডাকে। সরলার দাদা যখন এখানে ছিল, তখন এক একদিন ওপরে এসে দুষ্টুমি করে বলত, ও সল্লি, সল্লি, নীচে যা, 'বাছনি আমার'বাবু তোর জন্য এসে বসে আছেন!

অবিনাশের সঙ্গে যোগিনীর প্রতিযোগিতা হয়, কে কত দেরিতে উঠতে পারে। রাত্রি আটটা, নটা বেজে যায়, তবু ওরা বাড়ি যেতেই চায় না। সরলা হাই তোলে, অস্থিরতা দেখায়, সেসব বোঝার পাত্র ওরা নয়। যোগিনী যদি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, অবিনাশ বলে, তুমি এগোও, আমি আর একটু বসি। অমনি যোগিনীও বসে পড়ে। আবার যোগিনী যদি বলে, আজ খুব মেঘ করেছে, শীঘ্র বাড়ি ফিরতে হবে, অবিনাশ তখন বলে, তা হলে আর দেরি কোরো না। যোগিনী বলে, তুমি আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব! অবিনাশ বলে, আমার জন্য এক ঘণ্টা পরে গাড়ি আসবে!

পৈত্রিক সম্পত্তি পাবার মতন অবিনাশ নিজেকে কবিত্বশক্তিরও অধিকারী মনে করে এবং লেখারও চেষ্টা করে। সে কথাও বলে কবিতার ভাষায়। একদিন সরলা আপন মনে নিবিষ্ট হয়ে পিয়ানোতে বিথোফেনের মুনলাইট সোনাটা বাজাচ্ছে, সেদিন আর কেউ তখনও আসেনি, অবিনাশ আগে আগে উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সেই বাজনা শুনল। তারপর হঠাৎ ছুটে এসে সরলার একখানি হাত চেপে ধরে বলল, মরি মরি! কী সুন্দর, কী অপূর্ব! এ যেন স্বর্গের সুধাস্রোত নেমে এল মর্ত্যে, এ সুরের লহরী গুঞ্জরিত হচ্ছে কাননে কাননে, পুষ্পে পুষ্পে...সরলা, থেমো না, আরও বাজাও, আরও বাজাও...

সরলা বলল, হ্যাঁ বাজাব, কিন্তু আমার হাতখানা না ছাড়লে বাজাই কী করে ?

হাতখানা ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু সরলার বাজনার সঙ্গে চলতে লাগল তার অবিরাম কথার স্রোত, অহো, অহো, কী মধুক্ষরা সুর, তুমি মানবী নও, তুমি দেবী, তোমার ওই চম্পক বর্ণ অঙ্গুলি, ডালিম নিন্দিত গাল, বেদানার কোয়ার মতো ওষ্ঠ, বসে আছ অপ্সরার রূপ ধরি সরলা সুন্দরী...

মুনলাইট সোনাটা ভুলে গিয়ে সরলা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল।

এই সময় এসে উপস্থিত সজনী। ওদের এই অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখে সে স্থির থাকতে পারল না, নিজের ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সে মেনে নিয়েছে, কিন্তু অবিনাশকে সে সরলার কাছ ঘেঁষতে দেবে না। সে প্রায় ছুটে এসে বলল, ও সরলা, তুমি বাজাচ্ছ, আমি একটা গান গাই ? আমার গানের সঙ্গে তুমি বাজাও!

সজনীর গানের সম্ভাবনাতে সবাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। অবিনাশ বলল, ভ্রাতঃ সজনী, তুমি বাগানে গিয়ে গান কর না কেন ? সরলা আমাকে বড় অপূর্ব সুর শোনাচ্ছিলেন।

সজনী বলল, দ্যাখো অবিনাশ, প্রথমত আমি তোমার ভাই-টাই হই না। দ্বিতীয়ত, তুমি বললেই বা আমি বাগানে যাব কেন হে ? আমি এখানেই গাইব! আমার ইচ্ছে!

অবিনাশ বলল, তোমার ইচ্ছে হলে তুমি গাইতেই পার। অবশ্যই পার! তবে কি জান, সরলা তো ক্লাসিকাল সুর বাজাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে তোমার গান যে মিলবে না ভাই!

সজনী বলল, কেন মিলবে না ? ক্লাসিকাল মানে ওস্তাদি তো, আমি ওস্তাদি গানও জানি!

অবিনাশ বলল, ওই ক্লাসিকাল আর এই ক্লাসিকাল এক নয়। দা ইস্ট ইজ ইস্ট অ্যান্ড দা ওয়েস্ট

ইজ ওয়েস্ট, দা টোয়েন শ্যাল নেভার মিট ! এ মিলতে পারে না।

সজনী বলল, আলবাত মিলবে !

অবিনাশ বলল, আমি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল শিস দিয়ে শোনাচ্ছি, তুমি মেলাও তো দেখি ভাই।

অবিনাশ শিস দিতে শুরু করল আর হাঁ করে রইল সজনী।

সরলা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামিয়ে বলল, আপনারা বরং এক কাজ করুন না। দুজনেই আগে বাগানে গিয়ে দুই ক্লাসিকালে মেলামেলি হয় কিনা আগে দেখুন। তারপর না হয় এখানে—

দুজনেই তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলল, সেই ভাল, সেই ভাল ! দুজনে কাঁধ ধরাধরি করে চলে গেল বাগানে।

সরলা এক এক সময় ভাবে, সজনী, যোগিনী কিংবা অবিনাশের অন্য অনেক গুণ আছে, তিনজনই মোটামুটি সুপুরুষ, কৃতবিদ্য, ভাল বংশে জন্ম। কিন্তু এখানে এসে সব সময় প্রেম প্রেম ভাব করে কেন ? পুরুষরা কি ভাবে, শুধু প্রেমের কথা বলে মেয়েদের মন জয় করা যায় ? মেয়েরা যে পুরুষ মানুষদের পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়। এরা এ দেশের মানুষের কথা, পরাধীন দেশের গ্লানি, ইংরেজ শাসনের ঔদ্ধত্য, এসব বিষয়ে কখনও কোনও কথা বলে না। আলোচনায় এসব প্রসঙ্গ উঠলেও চুপ করে থাকে, যেন ওদের নিজস্ব কোনও মতামতই নেই !

এদের চেয়ে অনেক চৌকস ছিল আর একজন। তার কয়েকটা কথা সরলার মনে দাগ কেটে আছে।

জামাইবাবু ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় রাজশাহি কলেজে অধ্যাপনা করেন, একবার সরলা তার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল দিদি-জামাইবাবুর কাছে। সেই প্রথম সরলার পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কী ভাল কেটেছিল কয়েকটা দিন। কী সুন্দর, পরিষ্কার, ছিমছাম শহর রাজশাহি। এই রাজশাহিই তো এককালের পৌণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমি ছিল। কতরকম আদিবাসী আছে সেখানে।

স্যার তারকনাথ পালিতের ছেলে লোকেন পালিত বিলেত থেকে আই সি এস হয়ে এসে রাজশাহিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ঝকঝকে চেহারার তরুণ, দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। সরলা রবিমামার কাছে এই লোকেন পালিতের অনেক গল্প শুনেছে। রাজশাহিতে এসে ভাল করে পরিচয় হল। কোর্টে কয়েক ঘণ্টার জন্য সে সরকারি কাজ করে এসে সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই এ বাড়িতে কাটায়। তার সঙ্গে কথা বলতে বসলে গল্পের আর শেষ হয় না।

সরলা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি তো ম্যাজিস্ট্রেট। শুনেছি, ম্যাজিস্ট্রেটদের ইংরেজ সমাজের সঙ্গে মিশতে হয়। তাদের পার্টিতে গিয়ে খানা খেতে হয়, নাচতে হয়। আপনি তো যান না দেখি ? ইংরেজদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয়নি ?

লোকেন বলেছিল, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সমান সমান বন্ধুত্ব হওয়া কি কিছুতে সম্ভব ? পার্টিতে বাধ্য হয়ে যাই মাঝে মাঝে। যেতে ভাল লাগে না। ইংলন্ডে যখন ছাত্র ছিলাম, বেশ কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, তারা খাঁটি ইংরেজ, স্কটস্‌ম্যান, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতাম, গান গাওয়া হত। একদিন তারা সবাই মিলে একটা গান গাইল :

Rule Britannia! Britannia rules the waves!
Britons never shall be slaves

সেদিন বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। সেদিনই মনে হয়েছিল, ওরা রাজার জাত, আমরা স্লেভস্, ওদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব !

ফণিভূষণ ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, স্বর্ণকুমারী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে থাকেন না, আড্ডা হয় হিরণ্ময়ী আর সরলার সঙ্গে লোকেনের। কত রকম খেলা, কত জায়গায় তিনজনে বেড়াতে যাওয়া।

একদিন লোকেন ওদের দুই বোনকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, প্রেম আর বন্ধুত্বের মধ্যে কী তফাত

বলতে পার ?

হিরণ্ময়ীর কর্ণমূল রাঙা হয়ে গেল। প্রেম যেন বইয়ের পৃষ্ঠার একটা জিনিস। সে বলল, যাঃ, তা আবার মুখে বলা যায় নাকি ?

সরলা বলল, কেন বলা যাবে না ?

হিরণ্ময়ী বলল, তুই বাপু পারিস তো বল, আমি ওসব মুখে উচ্চারণ করতে পারব না।

সরলা বলল, বন্ধুত্ব আর প্রেম প্রায় কাছাকাছি। তফাত হচ্ছে, প্রেমের দুটি ডানা থাকে, বন্ধুত্বের তা থাকে না। 'ফ্রেন্ডশীপ ইজ লাভ উইদাউট ইট্‌স উইংস'।

লোকেন বলল, বাঃ, চমৎকার বলেছ তো ?

হিরণ্ময়ী জিজ্ঞেস করল, তোমার হাতে ওটা কী ? বইয়ের মতন ?

লোকেন বলল, এটাকে বলে স্পেকট্রোস্কোপ। এর মধ্যে একশো খানা বিলিতি ছাপা ছবি আছে। পরপর দুখানা একই ছবি। একটার ওপর আর একটা রাখলে অমনি সেই ছবিখানা একেবারে জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। আচ্ছা এক কাজ করা যাক, হিরণ্ময়ী তো বলছে, প্রেম আর ভালবাসার তফাতের কথা মুখে বলতে পারবে না। লিখে বোঝাতে পারবে ? চটপট তোমরা দুজনেই দশ-বারো লাইন লিখে ফেল, যারটা ভাল হবে, তাকে আমি এই দুর্লভ জিনিসটা উপহার দেব।

দুই বোন দুদিকে মুখ ফিরিয়ে লিখতে বসে গেল। সরলা তখন সবে এন্ট্রান্স পাস করেছে, তার তাড়াতাড়ি লেখা হয়ে গেলেও সে দিদিকে সময় দিল। দুজনের কাগজ একসঙ্গে গম্ভীর মুখে পড়ে গেল লোকেন। তারপর বলল, আমি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে রায় দিচ্ছি, সরলারটিই বেশি ভাল হয়েছে। পুরস্কারটি তারই প্রাপ্য। এই নাও।

সরলা বলল, তুমি যে দিচ্ছ, সেটা লিখে দাও !

লোকেন বলল, দ্যাখো, ভেতরে লেখা আছে।

সরলা পাতা উল্টে দেখল, টু সরলা, ফ্রম আ ডিয়ার ফ্রেন্ড।

সে তাকাল দিদির দিকে। হিরণ্ময়ী বলল, কী লেখা রয়েছে, দেখি, দেখি !

তার পরই রেগে গিয়ে বলল, একী, একী, ভারী অন্যায়, আমি খেলব না। তুমি আগে থেকেই সরলার নাম লিখে রেখেছ, ওকেই দেবে ঠিক করেছিলে—

লোকেন হাসতে হাসতে বলল, আমি যে জানতাম।

সরলা বলল, তবু এটা অন্যায়। এটা দিদিকেই দাও।

হিরণ্ময়ী অবশ্য বোনের ওপর রাগ করেনি। ছোট বোনকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে। এখনও ছেলেপুলে হয়নি হিরণ্ময়ীর, স্বভাবটা ছেলেমানুষের মতন রয়ে গেছে।

এক একদিন বিকেলে তিনজনে বেড়াতে যায়। শহর ছাড়িয়ে চলে যায় দূরে। গাড়িতে নয়, হাঁটতেই ভাল লাগে। এখানে এখনও প্রচুর বনজঙ্গল আছে। জঙ্গলের ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে এক এক সময় হিরণ্ময়ী পিছিয়ে পড়ে। সরলা আর লোকেন গল্পে একেবারে মশগুল, হিরণ্ময়ীর দিকে নজরই নেই।

হিরণ্ময়ী এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি আর যাব না, তোমরা যাও, আমি বাড়ি ফিরছি...

লোকেন বলল, কেন, এর মধ্যে ক্লান্ত হয়ে গেলে ?

হিরণ্ময়ী বলল, না, ভাই, ক্লান্ত আমি হইনি। তোমরা দুটিতে গল্প করছ, তোমরাই বেড়াও, আমার থাকার দরকার কী ?

লোকেন বলল, আপনার থাকার অবশ্যই দরকার আছে বইকী ! আমরা তিনজনে এক সঙ্গে আছি, এখন আমরা বন্ধু। শুধু দুজনে বেড়ালে যদি সেটা প্রেম বলে মনে হয় ?

হিরণ্ময়ী বলল, মনে হয় তো হলই বা ! কী রে সল্লি, তোর ডানা দুটো বার করবি নাকি ?

সরলা এসে হিরণ্ময়ীর হাত ধরে বলল, না, দিদি, তুমি যেতে পারবে না, আমরা এক সঙ্গে গান গাইব !

লোকেন বলল, না, না, গান গেয়ো না। বেশি আওয়াজ শুনলে এই জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে আসতে পারে।

সরলা বলল, বাঘ না ছাই ? চিড়িয়াখানার বাইরে আবার বাঘ আছে নাকি ?

লোকেন বলল, বিশ্বাস করছ না, সত্যি এখান থেকে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়।

সরলা বলল, আসুক তো বাঘ। সত্যিকারের বাঘ দেখলে আমার হাসি পেয়ে যাবে।

লোকেন বলল, ইস, ভারী সাহস তো তোমার। বাঘ দেখলে শুকিয়ে যাবে সব হাসি।

বাঘ বেরুল না, কিন্তু একটু পরেই পেছন থেকে সরলা, সরলা বলে একটা ডাক শোনা গেল। ওরা পেছন ফিরে দেখল, প্যান্ট-কোট পরা এক ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে আসছে।

হিরণ্ময়ী বলল, ওমা, এ যে যোগিনী !

লোকেন বলল, দেখতে পাচ্ছি জলজ্যান্ত এক পুরুষ মানুষ, তুমি বলছ যোগিনী।

হিরণ্ময়ী বলল, ওর নাম যোগিনী, তা আমি কী করব ? মোহিনী জামাইবাবুর ভাই—

সরলা হাসতে শুরু করে দিয়েছে।

যোগিনী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোমাদের ঠিক পেয়ে গেছি। কলকাতায় মন ভাল লাগছিল না, আজই এসে পৌঁছেছি কিছুক্ষণ আগে...ফণীদাদা বললেন, তোমরা এই দিকে বেড়াতে এসেছ...কেমন আছ, সরলা ?

যোগিনী চাটুজ্যে পৌঁছবার পর কেমন যেন সুর কেটে গিয়েছিল, আর জমেনি। লোকেনও এ বাড়িতে আসা কমিয়ে দিয়েছিল। লোকেন সরলার ডানা দুটি দেখতে পেল না, বন্ধু হয়েই রইল।

নির্জন দুপুরে যখন কোনও কিছুই ভাল লাগে না, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে সরলার। দুখানা জুড়ি গাড়ি আছে বাড়িতে, ইচ্ছে করলেই সে বেরুতে পারে, কিন্তু মায়ের অনুমতি নেবার প্রয়োজন। স্বর্ণকুমারীর মহল তিনতলায়। তিনিও দুপুরে ঘুমোন না, নিজস্ব লেখালেখি এবং পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেন। সংসার পরিচালনায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাঁর, দাস-দাসীরা কেউ ওপরে ওঠে না। অপরাহ্ণে পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলার নির্ধারিত সময়, তখন তিনি নীচে নেমে আসেন।

সরলা মায়ের মহলে এসে দেখল, স্বর্ণকুমারী মস্ত বড় টেবিলে অনেক কাগজপত্র ছড়িয়ে, খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু লিখছেন। সরলা দুবার ডাকল, মা মা।

স্বর্ণকুমারী মুখ তুললেন না।

সরলা বলল, মা, আমি একবার জোড়াসাঁকো যাব ? একটা গাড়ি নিতে পারি ?

স্বর্ণকুমারী এবারে লেখা বন্ধ করে মেয়ের মুখের দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সরলা বলল, মা, বাড়িতে ভাল লাগছে না। একবার ও বাড়িতে যেতে চাই।

স্বর্ণকুমারী বললেন, সরলা, তুমি দেখলে আমি লিখছি। এ সময় কি এরকম একটা সাধারণ কথা আমাকে না বললে চলত না ? বিকেলবেলা বলতে পারতে।

সরলা বলল, আমার যে এখন যেতে ইচ্ছে করছে ?

স্বর্ণকুমারী বললেন, ইচ্ছে করলে যাবে। তার জন্য কি আমার লেখা নষ্ট করাটা ঠিক ?

সেমিজ, সায়া পরে নিয়ে, শাড়ি বদল করে বেরিয়ে পড়ল সরলা। তার বুকখানি অভিমানে ভরা। মাকে সে কোনওদিনই নিজের করে পেল না। জানল না, কাকে বলে মাতৃস্নেহ। সরলা দেখেছে, জ্যোতিমামা কিংবা রবিমামা লিখতে বসেন, তখন বিবি কিংবা সে কাছে গিয়ে ডাকলে ওঁরা একটুও বিরক্ত হন না। লেখা থামিয়ে গল্প জুড়ে দেন। ওঁদের চেয়েও কি মায়ের সাহিত্যসাধনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ?

সরলা হঠাৎ ঠিক করল, সে ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। প্রতিটি দিন একঘেয়ে হয়ে আসছে। মায়ের কাছ থেকে সে দূরে সরে যেতে চায়। দেখা যাক, মা তার অভাব কোনওদিন বোধ করেন কিনা। ইচ্ছে করলেই সে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতে পারে, কিংবা বিরজিতলায় বিবিদের সঙ্গে। কিন্তু সে-ই বা কতদিন। আরও দূরে যেতে হবে। সে চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যাবে।

ছেলেরা বিদেশে যায়, সে কেন পারবে না ?

সরলার মন নেচে উঠল। হ্যাঁ, সে বিদেশেই চলে যাবে। মা-বাবার মত পাওয়া যাবে কি ? না পাওয়া গেলেও সে জোর করে...হ্যাঁ, জোর করেই কিছু কিছু প্রথা ভাঙতে হয়। তবে, একজনের মত নিতেই হবে, এই বংশের যিনি পেট্রিয়ার্ক, গোষ্ঠীপতি, তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা সরলার এখনও নেই।

সৌভাগ্যবশত আজই চুঁচড়া থেকে হঠাৎ কোনও প্রয়োজনে এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ। সরলা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় জানাল।

দেবেন্দ্রনাথ কিছুটা বিস্মিত হলেও ক্রুদ্ধ হলেন না। ধীর স্বরে বললেন, সময় প্রবাহে কত রকম পরিবর্তনই তো দেখছি। এর প্রতিরোধ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তোমার যদি এরকম অভিপ্রায় হয়ে থাকে, আমার আশীর্বাদ পাবে। কোথায় যাবে ?

সরলা বলল, এখনও কিছু ঠিক হয়নি।

দেবেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক হলে আমাকে জানিও। যাবার আগে দেখা করে যেয়ো। সরলা, তুমি নাকি বিবাহ করতে চাও না ? বিবাহের বয়েস পার হতে চলল যে।

সরলা বলল, সবাই শুধু আমাকেই এই কথা বলে কেন ? বিবিরও তো এখনও বিয়ে হয়নি !

দেবেন্দ্রনাথ বললেন, সে তো মেমসাহেব ! তাঁদের কি বিবাহের বয়েস থাকে। বিবি আমার কাছে তোমার মতন দেখা করতেও আসে না। শোনো সরলা, কুমারী থাকা ঠিক নয়। তুমি যদি কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে না চাও, তবে আমি একখানা তলোয়ারের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

সরলা বাড়ি ফিরল যেন একটা পাখির মতন উড়তে উড়তে। হঠাৎ সব কিছু কী রকম বদলে গেল ! দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি যে এত সহজে পাওয়া যাবে সে কল্পনাই করেনি। এর পর অন্য কারুর আপত্তি টিকবে না। তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে ? সে তো দারুণ ব্যাপার ! আগেকার কালে নাকি অরক্ষণীয়া কন্যাদের কোনও ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত, কিংবা কোনও গাছের সঙ্গে। তার চেয়ে উত্তর ভারতের এই রীতি অনেক ভাল। তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে হবে, সারা জীবন তার বিছানার পাশে সেই তলোয়ার থাকবে। আর কোনও পুরুষ হাত বাড়াতে সাহস করবে না।

ফিরে এসেই সরলা সোজা চলে এল বাবার নিজস্ব কাজের ঘরে। এ ঘরের দেওয়ালে একটি ঢাল ও দুটি তলোয়ার ঝোলানো আছে। একটি তলোয়ার সে নামিয়ে নিল, কোষমুক্ত করে তলোয়ারসুদ্ধু ডান হাতটা উঁচু করতেই শরীরে যেন সে একটা তরঙ্গ অনুভব করল। ফিসফিস করে বলল, কে বলে অবলা তুমি নারী ?

দুটো দিন কেটে গেল ঘোরের মধ্যে। কারুকে কিছু জানাল না সরলা, শুধু মনে মনে কল্পনা করতে লাগল, দূর বিদেশে কোনও গৃহে সে একলা, সারা দিন কাজকর্ম করবে, বিকেল সন্ধেগুলো ন্যাকা পুরুষদের সঙ্গে কাটাতে হবে না। সে গানবাজনা নিয়ে থাকবে। শয্যায় থাকবে এই তলোয়ার।

তৃতীয় দিনে সরলার মনটা আবার নরম হল। এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্য সে বদ্ধপরিকর, কিন্তু সারা জীবন তলোয়ারের মতন একটি বোবা পদার্থের সঙ্গে কাটাতে হবে ? যদি কখনও পুরুষকে মনে হয় পুরুষশ্রেষ্ঠ, যদি সে রকম কেউ তার সঙ্গ চায়, তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে সে ? জীবন শুধু শুকই থাকবে ? তা হলে কি গান, কবিতাও একদিন শুকিয়ে যাবে না হৃদয় থেকে ? 'এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা— সলিল রয়েছে পড়ে, শুধু দেহ নাই—'

না, না, অবিবাহের শপথ নিতে পারবে না সরলা। ভবিতব্যের দ্বার উন্মুক্ত থাক। একদিন সেই দ্বারে এসে যদি দাঁড়ায় তার হৃদয়বল্লভ, তাকে সে ফেরাবে না।

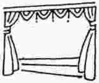

৫

গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে মঞ্চের পেছনে হলুদ রঙের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালেন গিরিশচন্দ্র। সেই দেওয়ালে ঝুলছে গিরিশচন্দ্রের গুরু রামকৃষ্ণদেবের একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি। ফটোগ্রাফ দেখিয়ে এক ইংরেজ চিত্রকরকে দিয়ে সেই ছবি আঁকানো হয়েছে, চক্ষু দুটি যেন একেবারে জীবন্ত। ছবির রামকৃষ্ণদেব চেয়ে আছেন তাঁর এই প্রিয় শিষ্যের দিকে। গিরিশ হাত জোড় করে, চক্ষু বুজে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন সেই ছবির সামনে।

গিরিশচন্দ্রের পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো, ভেলভেটের ট্রাউজার্স, পুরো হাতা সাদা জামা, তার দুই কবজির কাছে কুচি দেওয়া, বুকের কাছে লেস বসানো, টাক মাথা ঢাকা পরচুলায়, কুঞ্চিত কেশ ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঁচা-পাকা গোঁফ রং মাখিয়ে কুচকুচে কালো করা হয়েছে, মুখে গোলাপি আভা, একেবারে পাক্কা সাহেব। কোমরবন্ধে তলোয়ার। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েসে পৌঁছে গিরিশচন্দ্রকে আবার এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

গিরিশচন্দ্র মঞ্চে অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন অনেক দিন। নতুন দর্শকরা অভিনেতা হিসেবে তাঁকে চেনেই না। তিনি নাট্যকার, অভিনয় শিক্ষক ও ম্যানেজার। এইজন্যই বিভিন্ন থিয়েটার কোম্পানি তাঁকে টানাটানি করে। কিন্তু এতদিন পর তিনি বাধ্য হয়ে আবার মঞ্চে অবতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক কঠিন ভূমিকায়। এ নাটক দর্শকরা কেমনভাবে গ্রহণ করবে তার ঠিক নেই। হঠাৎ দুর্যোগের মতন, এ নাটকের নায়িকা হিসেবে বেশ কয়েক মাস ধরে গিরিশচন্দ্র যাকে পাখি-পড়ার মতন সব কিছু শিখিয়েছেন, সে দু'দিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এমনই ভেদ বমি যে শয্যা থেকে ওঠারই ক্ষমতা নেই তার। বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এখন অভিনয় বন্ধ করে দেওয়াও যায় না, তাই শেষ মুহূর্তে নায়িকা বদল করতে হয়েছে। তিনকড়ি দাসী নামের মেয়েটির অল্প বয়েস, শরীরে রোগ-ব্যাধির চিহ্ন নেই, সে যে অকস্মাৎ পীড়িত হয়ে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কাই মনে জাগেনি, তাই দ্বিতীয় কারুকে নায়িকা হিসেবে তৈরিও করা হয়নি। এখন এই দু'দিনের মধ্যে অন্য ভূমিকার একটি মেয়েকে দেওয়া হয়েছে প্রধানা নারীচরিত্র। আজ সত্যিই এক অগ্নিপরীক্ষা।

তিনকড়িকে যখন আর শয্যা থেকে তোলা যাবে না নিশ্চিত জানা গেল, তখন দু-একজন বলেছিল, এত অল্প সময়ে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকা মুখস্থ করে মঞ্চে উতরে দেবার ক্ষমতা বঙ্গের একমাত্র একজন অভিনেত্রীরই আছে, সেই বিনোদিনীকেই ডাকা হোক না! নতুন রঙ্গমঞ্চ, নতুন মালিক, অর্থব্যয় হচ্ছে অকাতরে, সুতরাং বিনোদিনীর কাছে একবার প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে। মালিকও রাজি, কিন্তু বেঁকে বসেছিলেন গিরিশচন্দ্র। না, বিনোদিনীকে তিনি আর ডাক পাঠাবেন না। বিনোদিনী মঞ্চের মর্যাদা রাখেনি, নাট্য শিল্পকলার চেয়ে তার আত্মাভিমান বেশি হয়ে গেছে। এখন বাধ্য হয়ে, কৃপাপ্রার্থীর মতন আবার বিনোদিনীর দ্বারস্থ হতে হবে? গিরিশচন্দ্র নিজেই তা হলে থিয়েটার ছেড়ে চলে যাবেন।

গত সাত বছর ধরে বিনোদিনীর কোনও সংস্রব নেই থিয়েটারের সঙ্গে। 'বেল্লিক বাজার'-এর পর "রূপ-সনাতন"-এর মহড়া যখন চলছিল স্টার থিয়েটারে, তখনই একদিন বিনোদিনী অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কলহ শুরু করায় তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর ডাকা হয়নি তাকে। যে স্টার থিয়েটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে সার্থকতার মূলে বিনোদিনীর অনেকখানি স্বার্থত্যাগ ও অভিনয়প্রতিভা, সেই স্টার থেকেই কার্যত বিতাড়িত হলেন বিনোদিনী।

এমনই হয় বুঝি রঙ্গজগতের মানুষদের নিয়তি! কে কাকে দোষ দেবে, স্টার থিয়েটারের পরিচালকবর্গের নির্দয়তা না বিনোদিনীর অহমিকা? নারীচরিত্রও কী বিষম দুর্বোধ্য! থিয়েটারকে ভালবেসে, থিয়েটারের মানুষজনকেই পরম আপনজন জ্ঞান করে যে-বিনোদিনী একসময় এক দুশ্চরিত্র যুবকের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য তার শয্যাসঙ্গিনী হতে বাধ্য হয়েছিল, সেই বিনোদিনীই যখন সার্থকতার শীর্ষে, দর্শকরা যখন তাকে ধন্য ধন্য করে, যখন সে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিল, যখন তার অর্থের অভাব ছিল না, তখনই সে থিয়েটারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আবার এক ধনীর রক্ষিতা হয়েছিল স্বেচ্ছায়! এতে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। অভিমানভরে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে-মঞ্চের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকবেন, সে মঞ্চে আর বিনোদিনীর স্থান নেই।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে, যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, তখনই বিনোদিনীকে বিদায় নিতে হয় থিয়েটারের জগৎ থেকে। সে অবশ্য বলে যে সে নিজেই সরে এসেছে, কিন্তু কোনও মঞ্চ থেকেই তাকে আর কেউ সাধতে যায় না। এখন তার একত্রিশ বছর বয়েস, রূপ-যৌবন কিছুই ম্লান হয়নি, তবু তাকে ফিরিয়ে আনতে গিরিশচন্দ্র কিছুতেই রাজি নন।

বিনোদিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হবার পর গিরিশচন্দ্রের জীবনে এবং থিয়েটার জগতেও অনেক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে। আলোর টানে যেমন পতঙ্গ ছুটে আসে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করে, তেমনি রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোও অনেককে টেনে এনে ভূপাতিত করে দেয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ফুৎকারে উড়ে যায় ভালবাসা, লকলক করে ওঠে ঈর্ষা ও স্বার্থ। আজ যার সঙ্গে গলাগলি ভাব, কাল হঠাৎ সে গলা টিপে ধরতে চায়। একের পর এক আকস্মিক আঘাতে গিরিশ একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন।

'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'বেল্লিক বাজার'-এ যখন স্টার থিয়েটারের রমরমা অবস্থা, অন্য থিয়েটারগুলি যখন একেবারে কাহিল, ঠিক সেই সময় একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। একদিন এক উকিল এসে গিরিশচন্দ্রকে বলল, ওহে ঘোষজা, তোমাদের তো এবার এখান থেকে পাট ওঠাতে হয়। আমার মক্কেল এ জমি কিনে নিয়েছেন।

গিরিশ ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমে একথা বিশ্বাসই করতে পারেনি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই হাসি মিলিয়ে গেল। স্টার রঙ্গমঞ্চটি তাদের নিজস্ব হলেও জমিটি লিজ নেওয়া। প্রখ্যাত ধনকুবের মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীল সেই জমি কিনে নিয়েছেন গোপনে। গোপাললালের কানে তার মোসাহেবেরা কুমন্ত্রণা দিয়েছে, মশাই, থিয়েটারের ব্যবসা এখন খুব ভাল চলছে, আপনি নিজে একটা থিয়েটার খুলুন না। তাতে বেশ দু' পয়সা আসবে, আবার ফুর্তিফার্তাও হবে।

গোপাললাল রাজি হয়ে গেলেন তো বটেই, তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি থেকে বুঝলেন, নতুন থিয়েটার খোলার আগে স্টার থিয়েটারকে কুপোকাত করা দরকার। তাই নতুন জমি কিনে রঙ্গমঞ্চ বানাবার বদলে ওই স্টারের জমিটাই তাঁর চাই।

বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করার পর গিরিশ ও অমৃতলালরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। জমি একজনের, তার ওপরের বাড়ির মালিক অন্যজন। অন্য কেউ জমিটা কিনে নিলেও কি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে স্টারের দল? এ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করা যায়। কিন্তু গোপাললাল বিপুল ধনী, তার সঙ্গে মামলায় কি টক্কর দেওয়া যাবে? যার বেশি টাকা, আইন তার পক্ষেই যায়। তা ছাড়া, ধনীদের পক্ষেই থাকে গুণ্ডার দল। এটাই চিরকালের নিয়ম। গোপাললালের দলবল হামলা শুরু করলে এখানে থিয়েটার চালানো সম্ভব হবে না।

শেষ পর্যন্ত আদালতের বাইরেই একটা রফা হল। গোপাললাল তিরিশ হাজার টাকায় রঙ্গমঞ্চটাও কিনে নিলেন, কিন্তু 'স্টার' নামটা তিনি পাবেন না। স্টারের দল হাতিবাগানে জমি কিনে নতুন রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করতে লাগল, আরও টাকা তোলার জন্য তারা ঢাকা শহরে চলে গেল অভিনয় করতে।

বিডন স্ট্রিটের সেই প্রাক্তন স্টার রঙ্গমঞ্চের নতুন নাম হল এমারাল্ড। নতুনভাবে সব কিছু সাজিয়ে গোপাললাল 'পাণ্ডব নির্বাসন' পালা নামালেন। প্রচুর অর্থ ব্যয়, প্রচুর আলো, অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বসু, বনবিহারিণী, কুসুমকুমারীর মতন নট-নটী, তবু নাটক জমে না। চাকচিক্যের অভাব নেই, কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন! এ যেন শশধর বিহীন রাত্রির আকাশ। চাঁদ না উঠলে কি আর অন্য তারকাদের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়? এ যেন শিবহীন যজ্ঞ!

মোসাহেবেরা গোপাললালকে আবার বোঝাল, থিয়েটার মানেই এখন গিরিশচাঁদ। ও ব্যাটাকে ধরে আনো। গিরিশের হাতের সুতোর টান না পড়লে মঞ্চের এই পুতুলগুলো ঠিকমতন নাচবে না।

গোপাললাল গিরিশের কাছে দূত পাঠালেন। দশ হাজার টাকা নগদ বোনাস, আড়াই শো টাকা মাসিক ভাতা, নাট্যকার ও ম্যানেজার হিসেবে গিরিশকে তাঁর চাই। গিরিশচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। স্টার থিয়েটার তাঁর প্রাণ। এখানে কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, মালিকের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি অনুযায়ী কিছু চলে না। থিয়েটারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কয়েকজনের এক কমিটি স্টার চালায়। এখানকার ড্রেসার-প্রমটার থেকে শুরু করে নায়ক-নায়িকা পর্যন্ত সবাই তাঁর হাতে গড়া।

পরদিন আবার দূত এল, নগদ বোনাস পনেরো হাজার, মাসিক ভাতা তিন শো। এবারেও গিরিশ হাত জোড় করে বললেন, শীলমশাইকে আমার নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাবেন, আমি স্টার থিয়েটার ছেড়ে কোথাও যাব না।

আবার পরদিন এল দূত। উকিলবাবুটি শুধু একলা নন, সঙ্গে দু'জন বন্দুকধারী পেয়াদা। উকিলবাবুটি কথা বলতে লাগলেন, গোঁফে তা দিতে লাগল পেয়াদা দুটি।

উকিলবাবু বললেন, নগদ বোনাস কুড়ি হাজার আর মাসিক ভাতা সাড়ে তিন শো. মশাই, লাটসাহেবের পর আর এত টাকা কে রোজগার করে বলুন দেখি। জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করতে চান? গোপাললাল শীলের মাথায় খেয়াল চেপেছে আপনাকে মাইনে দিয়ে চাকর করে রাখবে, তা মান্য না করলে আপনি এই কলকাতা শহরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন? টাকা ছড়িয়ে তিনি আপনার দলের সবকটাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন, আপনাদের এই স্টার-এর বাড়িও কোনওদিন শেষ হবে না!

এই স্টার-এর জন্য একদিন বিনোদিনীকে দেহ বিক্রয় করতে হয়েছিল, আজ গিরিশচন্দ্রকে মস্তিষ্ক বিক্রয় করতে হবে!

সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গিরিশচন্দ্র বুঝলেন, এ ছাড়া আর পথ নেই। এখন সবচেয়ে বড় কথা, হাতিবাগানে এই নতুন স্টার মঞ্চটি গড়ে তোলা। তার জন্য টাকা ধার করতে হচ্ছে। কুড়ি হাজার টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকাই তিনি এই মঞ্চ নির্মাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে দান করে দিলেন। অমৃতলালের হাত ধরে বললেন, আমার একটাই শর্ত রইল, এই থিয়েটারে যারা যোগ দেবে, সবাইকে ভদ্র সন্তান বলে গণ্য করবে। আর দেখো, এখানে যেন কারুর কোনও অপমান না হয়।

এমারাল্ডে এসে যোগ দিলেন গিরিশ, নতুন নাটক লিখলেন 'পূর্ণচন্দ্র', খুব ধুমধাম করে তার উদ্বোধন হল। কিন্তু গিরিশের মন পড়ে থাকে স্টারে। একজন শিল্পীর মনটাই যে আসল, তা ক'জন বোঝে? গোপাললাল নানান চুক্তিতে বেঁধে ফেলেছেন গিরিশকে, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তিনি মঞ্চে হাজিরা দেন, যথাসাধ্য পরিশ্রম করে তিনি নাটকের সুষ্ঠু উপস্থাপনার ব্যবস্থা করেন, তবু যে ভেতরে ভেতরে তিনি উদাসীন, গোপাললাল তা জানেন না।

স্টারের বন্ধুরা গোপনে গোপনে দেখা করতে আসে। হাতিবাগানে মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে গেছে, কিন্তু একখানা নতুন নাটক দিয়ে শুরু না করলে দর্শকরা আকৃষ্ট হবে কেন? 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকটাই কি স্টার-এর প্রাপ্য ছিল না? স্টার-এর জন্য নতুন নাটক কে লিখে দেবে?

গোপাললালের সঙ্গে চুক্তি আছে যে গিরিশচন্দ্র অন্য কোনও থিয়েটারের জন্য নাটক লিখে দিতে পারবেন না, স্টারকে সাহায্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ স্টার-এর প্রতি গিরিশের প্রাণের টান। তাঁর লেখা নতুন নাটক দিয়েই শুরু করতে হবে স্টার-এর জয়যাত্রা।

একটু-আধটু সুরা পান না করলে গিরিশের হাত খোলে না, ভাল ভাল সংলাপ মনে আসে না। গান রচনার সময় আরও দু' পাত্তর চড়াতে হয়। ইদানীং তিনি নিজের হাতে কিছু লিখতে পারেন না, নেশার সময় তাঁর হাত কাঁপে, তিনি নাটক রচনা করেন অবিনাশ নামে একটি ছেলেকে ডিকটেশান দিয়ে। বাড়িতে বসে সে রকমভাবে লেখা সম্ভব নয়, অহরহ এমারাল্ড-এর দূত আসে, তাঁর গতিবিধির ওপরেও নজর রাখা হয়।

একদিন গিরিশচন্দ্র শাড়ি পরে রমণী সেজে বাড়ি থেকে বেরুলেন। পথের কোনও লোক তাঁকে পুরুষ বলে সন্দেহ করল না। তিনি পাকা অভিনেতা, নারীর ভূমিকাই বা পারবেন না কেন, শুধু গোঁফটা লুকোবার জন্য ঘোমটায় মুখের অনেকখানি ঢেকে রাখতে হয়। গিরিশ বেশ মজা পেয়ে গেলেন। স্ত্রীলোক সেজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর গৃহে গিয়ে নাটক ডিকটেশন দিতে লাগলেন। রচিত হল 'নসীরাম', সেটা স্টারে যখন মঞ্চস্থ হল, তখন নাট্যকারের নাম কেউ জানল না, বিজ্ঞাপনে দেওয়া হল রচয়িতার নাম 'সেবক'। নাটক শুরু হবার আগে প্রস্তাবনা হিসেবে পাঠ করা হয় আত্মগোপনকারী নাট্যকারের এক কবিতা:

হে সজ্জন, পদে নিবেদন
নির্বাসিত মনোদুঃখে বঞ্চিলাম অধোমুখে
বঞ্চিত বাঞ্ছিত তব চরণ বন্দন...

দুটি মঞ্চেই অভিনীত হতে লাগল গিরিশচন্দ্রের নাটক। দুই দলে তীব্র প্রতিযোগিতা, এক দিকে গিরিশ, অন্য দিকে তাঁরই শিষ্য সম্প্রদায়। এমারাল্ড-এর চেয়ে স্টার-এর টিকিট যেদিন বেশি বিক্রি হয়, সে সংবাদ পেয়ে গিরিশ বেশি পুলকিত হন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গিরিশ একদিন শুনতে পেলেন একজন পথিক আর একজনকে বলছে, ওরে ভাই, স্টারের নতুন পালাটা দেখেছিস? কে একটা নতুন লোক নাটক লিখেছে, খোদ গিরিশবাবুকেও দুয়ো দিয়ে দিয়েছে!

বছর দু-এক এইভাবে কাটল, তারপর গোপাললাল শীল একদিন ম্যানেজারের ঘরে এসে মুখ ভেটকে বললেন, দুর দুর, থিয়েটার চালানো কি মানী বংশের কাজ? আট আনা এক টাকার টিকিট কেটে আসে পাঁচপেঁচি লোকেরা, তাদের মন জুগিয়ে চলতে হবে আমাকে! কাল থেকে সব বন্ধ করে দাও!

বড়লোকের খেয়াল, বেশি দিন তারা এক ব্যাপারে স্থির থাকতে পারে না। গোপাললালের শখ মিটে গেছে, তিনি রঙ্গমঞ্চ ভাড়া দিয়ে দিলেন অন্য লোকদের। তারাও থিয়েটারই চালাবে, কিন্তু তাদের সঙ্গে গিরিশের কোনও চুক্তি নেই। তিনি খুশিতে ডগোমগো হয়ে ফিরে এলেন স্টারে, তাঁর স্বভূমিতে।

কয়েক বছরের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবনের কঠিনতম আঘাতটি পেলেন এই স্টারেরই বন্ধু, সহকর্মী ও শিষ্যদের কাছ থেকে।

'নসীরাম' ছাড়া আর কোনও নাটক এই দু বছরে স্টারের জন্য লিখে দিতে পারেননি গিরিশচন্দ্র। তখন ম্যানেজার অমৃতলাল বসু 'সরলা' নামে একখানি নাটক নামিয়ে দিল। তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা উপন্যাসটির নাট্যরূপ, সাদামাঠা সামাজিক কাহিনী, তাও কিন্তু খুবই বাহবা পেল দর্শকদের কাছ থেকে। তারপর অমৃতলাল নিজেই লিখলেন 'তাজ্জব ব্যাপার', তাও বেশ জমজমাট।

গিরিশচন্দ্র ফিরে এলে অমৃতলালের বদলে তাঁকেই আবার ম্যানেজার করা হল। অমৃতলালের পক্ষে সেটা খুশি মনে মেনে নেওয়া সম্ভব কী? অমৃতলাল ইতিমধ্যে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। অমৃতলাল গিরিশের শিষ্য বটে, কিন্তু শিষ্য কি চিরকাল পায়ের তলায় পড়ে থাকবে, তারও কি বড় হওয়ার সাধ জাগে না? গিরিশেরও ভুল হল, তিনি নজর করলেন না শিষ্যের ক্ষোভ।

স্টার-এর জন্য গিরিশ লিখতে লাগলেন একের পর এক মঞ্চ-সফল নাটক। 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'চণ্ড'। স্টারের জনপ্রিয়তার তুলনায় অন্য সব থিয়েটার ম্লান। নতুন নাটক লেখার পর গিরিশ প্রথম দু-চারদিন মহড়ার সময় সবাইকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেন, তারপর শিষ্য অমৃতলালকে বলে দেন, ওরে, এর পর তুই গড়েপিটে নিস!

এখন আর গিরিশ নিয়মিত মহড়ায় আসার প্রয়োজন বোধ করেন না, শিষ্যের ওপর তাঁর যথেষ্ট ভরসা আছে। অমৃতলালকে খাটতে হয় প্রচুর, সমস্ত খুঁটিনাটির দিকে তাঁকে নজর দিতে হয়। তারপর নাটক যখন জমজমাট হয়, পত্রপত্রিকার বিজ্ঞ সমালোচকরা লেখেন, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয় বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া একটি উচ্চাঙ্গের নতুন নাটক উপহার দিয়াছেন তো বটেই, তাঁহার নিপুণ পরিচালনা ও শিক্ষাগুণে অভিনয়ও অতি উচ্চমানের হইয়াছে।' গিরিশ ম্যানেজার, পরিচালনার সব কৃতিত্ব তাঁরই, অমৃতলালের নাম উল্লেখ থাকে না। গিরিশ মনে করেন, গুরুর গৌরবেই শিষ্যের গৌরব।

এই সময় গিরিশ পারিবারিকভাবেও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী দীর্ঘদিন রোগভোগের পর দেহরক্ষা করেছেন। এই পক্ষে তাঁর দুটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মেছিল। কন্যা দুটিরই অকালমৃত্যু ঘটেছে, মাতৃহারা শিশুপুত্রটি গিরিশের চক্ষের মণি। মাতাল অবস্থায় গিরিশ প্রায়ই তাঁর গুরু রামকৃষ্ণদেবকে বলতেন, তুমি আমার ছেলে হও। এখন গিরিশের ধারণা হল, সত্যিই রামকৃষ্ণদেব তাঁর এই পুত্ররূপ ধরে এসেছেন। ছেলেটির মধ্যে অনেক অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার তিনি দেখতে পান।

এই ছেলেটি জন্ম থেকেই রুগ্ণ। এর চিকিৎসার জন্য গিরিশ সবরকম চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হয়েছেন, নিমেষের জন্যও ছেলেকে কাছছাড়া করেন না। স্টার-এর জন্য নতুন নাটক দরকার হলে অবিনাশকে ডেকে ডিকটেশন দিয়ে একটা কিছু লিখে পাঠিয়ে দেন। রঙ্গমঞ্চের ধারেকাছে যাওয়া একেবারে বন্ধ। 'মলিনা বিকাশ' আর 'মহাপূজা' নাটক দুটি হল দায়সারা গোছের।

এদিকে অমৃতলাল ও অন্য কয়েকজনের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। গিরিশচন্দ্র স্টারের কর্তৃত্বভার কখনও নেননি, তিনি বেতনভুক ম্যানেজার হিসেবে থাকাটাই পছন্দ করতেন। ব্যবসায়িক কাজকর্ম দেখা তাঁর ধাতে পোষায় না। বাইরের সকলে জানে গিরিশবাবুই স্টারের সর্বেসর্বা, আসলে কিন্তু তিনি লাভ-লোকসান নিয়ে মাথা ঘামান না।

অমৃতলাল ও আরও কয়েকজন বলাবলি করতে লাগল, গিরিশচন্দ্র মাসের পর মাস ম্যানেজারের মাইনে নিয়ে যান, কিন্তু নাটক লেখা ছাড়া তো আর কিছুই করেন না। নাটক তো অন্য কেউও লিখতে পারে। অমৃতলাল নিজেই এখন নাট্যকার হয়েছে, তার 'সরলা' গিরিশের 'নসীরাম'-এর চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়নি ? নাট্যশিক্ষক হিসেবেও তার কৃতিত্ব সবাই স্বীকার করে।

গিরিশের সঙ্গে এদের খিটিমিটি শুরু হয়ে গেল। তিনি থিয়েটার ভবনে যান না, থিয়েটারের লোকেরা তাঁর বাড়িতে ডাকতে এলেও গিরিশ তাদের পাত্তা দেন না বিশেষ। তাঁর নামেই স্টার থিয়েটারে দর্শক আসবে, সেটাই কি যথেষ্ট নয় ?

একদিন তর্কাতর্কির সময় উত্তেজনা বেশ বৃদ্ধি পেলে গর্বিত গিরিশচন্দ্র বললেন, আমি মাইনে নিই বলে তোমাদের গাত্রদাহ ? ঠিক আছে আমি বেতন চাই না, নাটকও আর লিখে দেব না, তোমরা যা খুশি করো !

গিরিশচন্দ্র নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন, দু-একদিনের মধ্যেই অমৃতলালরা অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে আসবে, পায়ে ধরে তাঁকে স্টারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কেউ এল না। তাঁকে বাদ দিয়েই স্টার দিব্যি চলতে লাগল।

পুত্রের অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছে, গিরিশ এখন থিয়েটার নিয়ে মাথা ঘামাতেও পারছেন না। ডাক্তারের পরামর্শে ছেলেকে নিয়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য মধুপুর যাবেন ঠিক করেছেন। হাতে বিশেষ টাকা নেই। এই সময় নীলমাধব চক্রবর্তী নামে একজন বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সেখানে সিটি থিয়েটার নামে নতুন থিয়েটার খুলে গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেবচরিত, বেল্লিক বাজার—এই সব পুরনো নাটক নামাতে চাইছে, গিরিশকে তারা কিছু টাকাও দিয়ে গেল।

মধুপুরে একটি বাড়ি ভাড়া করে গিরিশ ছেলেকে প্রায় বুকে করে রইলেন। মধুপুরে তরিতরকারি খুব টাটকা, বাতাস নির্মল, ডিম-মাংস ইত্যাদি অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। পুত্র একটু একটু আরোগ্যের পথে এগোচ্ছে, গিরিশেরও স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হচ্ছে। মদ্যপান খুব কমিয়ে দিয়েছেন ; এই সময়

আচম্বিতে এক দুঃসংবাদ এল। স্টার থিয়েটার তাঁকে ম্যানেজার হিসেবে বরখাস্ত করেছে, এবং তারা নীলমাধবের নামে একটি মামলাও দায়ের করেছে। স্টার থিয়েটারের জন্য তিনি যে সব নাটক লিখেছেন, বেতনভোগী ম্যানেজার হিসেবেই লিখেছেন, ওই সব পুরনো নাটক স্টারেরই সম্পত্তি, অন্য নাট্যদলকে তিনি অনুমতি দিতে পারেন না।

গিরিশ প্রথমে সংবাদটি বিশ্বাসই করতে পারলেন না। স্টার-এর কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে ? স্টার তো তাঁরই সন্তান। স্টারের জন্য তিনি কী না করেছেন ? শুধু মেধা ও পরিশ্রম নয়, অনেকবার অনেক টাকা তিনি বিনা শর্তে ব্যয় করেননি এই থিয়েটারের জন্য ? হাতিবাগানের রঙ্গমঞ্চ গড়ার জন্য ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে দিয়ে দেননি ষোলো হাজার টাকা ? এই তো সেদিনও কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে লেখা 'মহাপূজা' নাটকের অভিনয় দেখে মহারাজ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই টাকা গিরিশ নিজে না নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছেন সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে।

সেই স্টার একজন সামান্য কর্মচারীর মতন তাঁকে বরখাস্ত করে ? মামলা আনে তাঁর নামে ? এ জগতে কি কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই ?

কিন্তু মানুষ অতীত নিয়ে বাঁচে না, বর্তমানই রূঢ় সত্য। কৃতজ্ঞতার বোঝাও বেশি দিন বইতে চায় না কেউ। হ্যাঁ, আগে স্টারের জন্য অনেক কিছু করেছেন তিনি, কিন্তু এখন যে মাসের পর মাস গর্বিত বচন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না তাঁর কাছ থেকে। বিনোদিনীও তো স্টারের জন্য শরীর বিক্রয় করেছেন পর্যন্ত। সেই বিনোদিনীকেও সরে যেতে হয়নি স্টার থেকে ?

গিরিশ ব্যস্ত হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়।

ফিরে এসে দেখলেন, স্টারের কর্মকর্তাদের মনোভাব বেশ কঠোর। নট-নটীদের মধ্যেও তাঁর সমর্থক বিশেষ কেউ নেই। মামলা ওরা চালাবেই। দলচ্যুত নীলমাধবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকে অন্য নাট্যদল খোলায় সাহায্য করেছেন, এজন্য লোকচক্ষে গিরিশকে হেয় করা হবে। মামলা মোকদ্দমা গিরিশ চিরকাল এড়িয়ে যেতে চান, আজ তাঁর কপালেই সেই বিড়ম্বনা !

অমৃতলাল আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়লেও প্রকাশ্যে কখনও প্রাক্তন গুরুর মুখের ওপর কটু বাক্য বলে না। একদিন সে নিরিবিলিতে এসে গিরিশের সঙ্গে দেখা করল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দুজনেই। গিরিশের বুকে উত্তাল অভিমান। এই অমৃতলালকে তিনি কত অল্প বয়েস থেকে দেখেছেন, কত সুখদুঃখের সে সঙ্গী ছিল, গুরুকে প্রণাম না জানিয়ে সে কখনও গুরুর সামনে মদের গেলাসে হাত দেয়নি, কতবার গিরিশ একেবারে বেসামাল হয়ে পড়লে সে তাঁকে প্রায় কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে, সেই অমৃতলাল আজ শত্রুপক্ষের প্রতিনিধি ! মানুষের জীবনের কী বিচিত্র লীলা।

একটু ইতস্তত করে অমৃতলাল বলল, গুরুদেব, যদি কিছু মনে না করেন, গুটিকতক কথা বলব ? যদি রাগ করেন, আমাকে শাস্তি দিতে চান, দেবেন। আগে কথাগুলি শুনুন। অনেক বছর হল, আপনি আর ধড়াচূড়ো পরে রং মেখে মঞ্চে নামেন না। আপনি নিজেই বারবার আমাদের বলেছেন, অভিনয় করতে আপনার আর ভাল লাগে না। নতুন ছেলেমেয়েগুলোকে শেখানো-পড়ানোতেও আপনার মন নেই। শেখাতে চাইলে আপনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মহড়ার সময় বেশিক্ষণ আপনি বসতেই চান না, আমাদের মতন কারুর ওপর ভার দিয়ে দেন। কিছুদিন ধরেই তাই আমাদের মনে হচ্ছিল, থিয়েটারের ওপর থেকে আপনার টান চলে গেছে, আপনার মনপ্রাণ আর এ জগতে নেই।

গিরিশ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, থিয়েটারের ওপর আমার টান নেই ? কোন দিন বলবে, জলের মাছের জলের প্রতি টান নেই ! আকাশের পাখির আকাশের ওপর টান নেই ! আমার আর কীসের ওপর টান আছে ?

অমৃতলাল বলল, আপনার টান গেছে পরমেশ্বরের দিকে। যেদিন থেকে রামকৃষ্ণ ঠাকুর আপনাকে কাছে টেনে নিলেন, সেইদিন থেকেই কি আপনার মনে এক বিরাট পরিবর্তন আসেনি ?

মনে করে দেখুন, গুরুদেব, আগে যখন আপনার স্ত্রীর রোগ হত, আপনার পুত্র দানি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আপনি নিজে যখন পেটের ব্যামোয় কষ্ট পেতেন, তখনও কি আপনি একদিনের জন্যও থিয়েটারে অনুপস্থিত থাকতেন ? কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠাকুর যখন ব্যাধিগ্রস্ত হলেন তখন আপনি থিয়েটার উপেক্ষা করে বারবার কাশীপুরের বাগানবাড়িতে ছুটে যেতেন না ?

গিরিশ সহসা উত্তর না দিতে পেরে চুপ করে রইলেন।

অমৃতলাল বলল, আমাদের থিয়েটারই ধ্যানজ্ঞান। আমরা নাটকে ভক্তিপ্রেমের বন্যা ছুটিয়ে দিই, কিন্তু অন্তরে তেমন ভক্তি নেই। পরমেশ্বর আমাদের ধরাছোঁওয়ার বাইরে। আমার নাট্যগুরু আপনি। আর কোনও গুরু ধরিনি। টিকিট বিক্রি, মঞ্চ সাজানো, চটকদারি, এতগুলি লোকের প্রতি মাসের বেতন, এইসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়। আপনি এ সবের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। আপনি মুক্ত পুরুষ। এখন আর থিয়েটারের খুঁটিনাটির সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে রাখার কোনও মানে হয় না।

গিরিশ বললেন, থিয়েটারের সঙ্গে আমি আর কোনও সম্পর্ক রাখব না বলতে চাও ?

অমৃতলাল বলল, আপনি নিজেই তো আর সম্পর্ক রাখছেন না। শুধু নাটক লিখছেন। তাই লিখবেন, শুধু একটা যদি দয়া করেন, নতুন নাটক যা লিখবেন, তা শুধু স্টারকেই দেবেন, অন্য কোনও দলকে দেবেন না। শুধু এটুকু হলেই আমি অন্য অংশীদারদের বলে আপনার নামে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য রাজি করাতে পারি।

গিরিশচন্দ্র শুকনো হাস্য করে বললেন, অমৃত্তির, তুই কী বলতে চাস তা কি আমি বুঝিনি ? তোর এখন ডানা গজিয়েছে। নাটক লিখছিস, নাট্যাচার্য হয়েছিস। আমাকে সরিয়ে দিয়ে তুই এখন স্টারের সর্বেসর্বা হতে চাস ? তাই-ই হ তবে ! গুরু মারা বিদ্যেতে তুই যশস্বী হ, আমি আশীর্বাদ করছি !

এর পর স্টারের পরিচালকরা একটা চুক্তিপত্র নিয়ে এল। গিরিশচন্দ্রর নামে তারা মোকদ্দমা তুলে নেবে। কিন্তু স্টার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। অন্য কোনও থিয়েটার দলকেও তিনি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে সাহায্য করতে পারবেন না। এমনকী স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেও অন্য দলের হয়ে নাটক লিখে দিয়ে আসতে পারবেন না। নাটক লিখলে স্টারকেই দিতে হবে, স্টার তা ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নেবে। যদি গিরিশের কোনও নাটক স্টারের অপছন্দ হয়, তা হলে সে নাটক তিনি অন্য দলকে দিতে পারেন, কিন্তু অভিনয় শেখাতে পারবেন না। মোট কথা, দর্শকের আসন ছাড়া আর কোনও মঞ্চে তাঁর প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল।

স্টার থিয়েটারের প্রতি তাঁর যত দান ও সাহায্য ছিল এককালে, তার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি যতদিন বাঁচবেন, তাঁকে মাসিক এক শো টাকা করে পেনশন দেওয়া হবে।

সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে করতে গিরিশচন্দ্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, যাঃ আমি আর নাটকও লিখব না ! থিয়েটারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে গেল। আমি আর কোনওদিন ওদিকের পথও মাড়াব না। তাতে তোরা খুশি তো ?

৬

গিরিশচন্দ্র বেকার। নটকুল চূড়ামণি, বঙ্গের গ্যারিক এখন বেকার ! পেশাদারি মঞ্চের সমস্ত নট-নটী যাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছে, সেই নাট্যাচার্য আর কোনও রঙ্গমঞ্চে পা দেবেন না। যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার, বাংলা ভাষার শেক্সপীয়র, তিনি নীরোগ আর স্বাস্থ্যবান থাকলেও আর লিখবেন না নাটক।

এ কি বিনোদিনীর অভিশাপ ?

পূর্ণ যৌবনে বিনোদিনীকেও তো বিদায় নিতে হয়েছে ! বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যপুরুষ, দুজনেই থিয়েটার থেকে নির্বাসিত। এ যেন নিয়তির বিচিত্র পরিহাস !

মাতৃহীন শিশুটিকে আর বাঁচানো গেল না, তিন বছর বয়সও পূর্ণ হল না তার। এর পর গিরিশ একেবারেই উদাসীন হয়ে গেলেন, থিয়েটারের কথা যেন মুছে ফেললেন মন থেকে। এখন তিনি গুরুভাইদের সঙ্গেই বেশি সময় কাটান। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর কথা অনেকেই ভুলে গেছে, অধিকাংশ পত্রপত্রিকাতে তাঁর মৃত্যুসংবাদও প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তাঁর গুটিকতক তরুণ ভক্ত কিছুতেই তাঁকে ভুলতে পারছে না। বাড়ি ফিরে গেলে পাছে তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাই তারা একটা আস্তানায় জড়ামড়ি করে রয়ে গেছে। কাশীপুরের সেই বাগানবাড়ি ছেড়ে দিতে হয়েছিল, অত টাকা ভাড়া দেবে কে, গৃহী ভক্তদের মধ্যে দু-তিনজন ছাড়া আর সবাই সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তরুণরা বরানগরের গঙ্গার ধারে মাত্র এগারো টাকা ভাড়ায় একটি একেবারেই ভাঙাচোরা, পোড়ো বাড়ি নিয়েছে। লোকে বলে ওটা ভূতের বাড়ি। নরেন, রাখাল, শশী, তারক, বাবুরাম প্রমুখ দশ-বারোজন থাকে সেখানে। নিদারুণ দারিদ্র্য, পান্তা ভাতে নুন জোটে না এমন অবস্থা, তবু তারা আছে মহানন্দে। রামকৃষ্ণের ভালবাসার স্মৃতিই তাদের সম্বল। অন্য লোকেরা ভাবে, এই সব হাবাতে গরিব ছোঁড়াগুলো ওখানে পড়ে আছে কেন, চাকরিবাকরির সন্ধান করলেই পারে ? রামকৃষ্ণদেব তো কারুকে সংসার ত্যাগ করতে বলেননি। কিন্তু ওরা যে কোথা থেকে ত্যাগের মন্ত্র পেয়ে গেছে তা কেউ জানে না।

গিরিশ প্রায়ই আসেন এখানে। হাসি-ঠাট্টা, গল্প, তর্ক হয়। নরেন, রাখাল, কালী এরা সবাই পড়াশুনো করা ছেলে, বরানগরের এই বাড়িতেও বাইবেল, কোরান, বেদ-উপনিষদ, ত্রিপিটক পাঠ চালিয়ে যাচ্ছে, এদের সঙ্গে কথা বললে গিরিশ বুদ্ধিচর্চার আনন্দ পান। নরেনরা বরানগর ছেড়ে কখনও কলকাতায় এলে বাগবাজারে গিরিশের বাড়িতে তামাক খাওয়ার জন্য থামে, তখনও চলে আড্ডা আর গান। বয়েসের অনেক তফাত। তবু নরেনের সঙ্গে গিরিশের এখন তুই-তোকারির সম্পর্ক।

গিরিশ মাঝে মাঝে বলেন, আমাকে পুরোপুরি তোদের দলে নিয়ে নে, নরেন। আমিও বরানগরের মঠে গিয়ে থাকব।

মঠের মতন কিছুই না, একটা সংস্কারহীন জীর্ণ বাড়ি, সাপখোপের আস্তানা, মাঝে মাঝে ওপর থেকে ছাদের ইট-কাঠ ভেঙে পড়ে, তবু মুখে মুখে ওরা বলে, 'বরানগরের মঠ'।

নরেন রাজি হয় না। মাঝে মাঝে তাদের ভিক্ষে করে চাল জোগাড় করতে হয়। শুধু ভাতের সঙ্গে দুটো লঙ্কা পেলে খাওয়া হয়ে যায়। গিরিশ এ কৃচ্ছ্রতা সহ্য করতে পারবে না।

মহেন্দ্রলালের সংস্পর্শে এখন বিজ্ঞানের দিকেও ঝোঁক এসেছে গিরিশের। সময় পেলেই গণিতচর্চা করেন। মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান সভার এখন নিয়মিত সদস্য, প্রতিটি বক্তৃতা শুনতে যান।

সভা আরম্ভ হওয়ার তিন-চার ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকেন, কখনও মহেন্দ্রলালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে টেস্টটিউব, বিকার, গ্যাস বার্নার এইসব সাফ করেন। তখন তাকে দেখে কে বলবে, এই সেই বিখ্যাত নট-নাট্যকার গিরিশ ঘোষ। মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন ভূমিকা বদল হয়। এই ভূমিকা বদলে গিরিশ যেন বেশ তৃপ্ত। পাদপ্রদীপের আলো আর তার চোখ ধাঁধায় না।

একবার ঠিক করলেন গুরুর জন্মস্থান দেখে আসবেন। গরুর গাড়ি ছাড়া অন্য কোনও যানবাহনে কামারপুকুর-জয়রামবাটি পৌঁছবার উপায় নেই। একেবারেই গণ্ডগ্রাম, বাড়ি মানে কুঁড়েঘর। গিরিশ এমনভাবে গ্রামবাংলা দেখেননি কখনও আগে। এমন আদিগন্ত মাঠ, এমন বিস্তীর্ণ আকাশ, এমন অমলিন প্রকৃতি, সেইরকমই সরল মানুষজন। সারদামণি এখন এখানে রয়েছেন, গিরিশ তাঁর অতিথি হলেন। নিজের হাতে রান্না করেন সারদামণি, গিরিশকে খেতে বসিয়ে পাখার হাওয়া করতে করতে গল্প করেন কতরকম। বাল্যকালের মাতৃহীন গিরিশ, কখনও মাতৃস্নেহ পাননি, তাঁর চোখে জল আসে।

হঠাৎ একদিন খাওয়া থামিয়ে বলেন, তুমিই তো আমার মা! আমার নিজের মা।

সারদামণি হাসেন।

গিরিশ দৃঢ়ভাবে বললেন, না, না, শুধু ভাবের কথা নয়। আমি তোমারই সন্তান, মাঝখানে কিছুদিন অন্যের সংসারে রয়েছিলাম।

সারদামণি বললেন, বেশ তো, তুমি আবার এইখানেই থাকো!

মাত্র এক সপ্তাহের জন্য গিয়েছিলেন গিরিশ, রয়ে গেলেন দু' মাস। এখন তো তাঁর কোনও পিছুটান নেই। কলকাতা মন থেকে মুছে গেছে, এ জীবন অতি চমৎকার। তিনি দেখতে পান, পুকুরঘাটে বসে সারদামণি নিজের হাতে তাঁর জন্য বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর কাচছেন। রাত্রে সেই বিছানায় শুয়ে গিরিশের মনে হয়, তাঁর সর্বাঙ্গে মায়ের স্নেহের স্পর্শ। সমস্ত শরীর মন জুড়িয়ে যায়।

এখানে এসে একদিনও মদ্যপানের ইচ্ছেও জাগেনি।

দু মাস বাদে গিরিশ কলকাতায় ফিরলেন এক নতুন সংকল্প নিয়ে। নাটক-ফাটক কিছু নয়। তিনি আবার কলম ধরবেন তাঁর গুরু এবং মাতা ঠাকুরানির জীবন ও আদর্শ শিক্ষার কথা রচনার জন্য। এটাই হবে তাঁর জীবনের ব্রত।

কলকাতা মানেই ধুলো, ধোঁয়া, কলকাতা মানেই মানুষজন। পাওনাদার, উমেদার, চাটুকার, সুযোগ সন্ধানীদের উৎপাত। গিরিশ এখন পারতপক্ষে গুরুভাইরা ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না। থিয়েটারের লোকরা এলে দূর দূর করে দেন। কোন্ রঙ্গমঞ্চে এখন কী নাটক চলছে তারও খবর রাখেন না তিনি।

একদিন একজন অতিথি এলেন, ইনি বিশেষ সম্রান্ত বংশীয়, এঁকে উপেক্ষা করা যায় না। পাথুরেঘাটার বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাতি নগেন মুখুজ্যে।

একটুক্ষণ কুশল সম্ভাষণের পর নগেন্দ্রভূষণ বললেন, বাংলার মঞ্চগুলির কী দশা হয়েছে এখন! কুরুচিপূর্ণ নাটক, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির নাম অভিনয়? ছি ছি ছি, গিরিশবাবু, আপনি কিছু দেখেন না, কিছু বলেন না?

গিরিশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন, আমার কাছে নাটকের কথা তুলবেন না মশাই, অন্য কথা বলুন!

নগেন্দ্রভূষণ মাথা নেড়ে বললেন, না, না, আপনি ও কথা বললে শুনব কেন? আপনি বাংলা থিয়েটারের অভিভাবকস্বরূপ। আপনার শাসন করা উচিত। এতে যে বাঙালি জাতিরই দুর্নাম রটছে। ইংলিশম্যান কী লিখেছে দেখেছেন?

গিরিশচন্দ্র বললেন, নগেন্দ্রবাবু, আপনি বোধ হয় জানেন না, বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে আমি সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছি।

নগেন্দ্রভূষণ বললেন, আমি সব জানি। না জেনে কি এসেছি? আপনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেই-বা তা মানা হবে কেন? বাংলা থিয়েটারের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আর কে নিতে পারে,

আপনি ছাড়া? সাহেবরা আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাবে, এ আমার সহ্য হয় না। আমার মাতামহ বলতেন, ইংরাজদের নিন্দে করবে না, তাদের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করবে। বাংলা থিয়েটার তো ওদের সমকক্ষই হয়ে উঠেছিল। আবার তার মান উচ্চে তুলতে হবে।

—আমাকে এসব কথা না বলে, অর্ধেন্দুকে গিয়ে বলুন। সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দিতে সে-ই পারে।

—অর্ধেন্দুশেখরের কি মাথার ঠিক আছে? কখন কোথায় থাকেন কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে উধাও হয়ে যান। ওসব লোক দিয়ে হবে না। গিরিশবাবু, আপনাকে আবার হাল ধরতে হবে। আপনার এসব প্রতিভা আমরা নষ্ট হতে দেব কেন? একটা নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে, লাভ-লোকসানের চিন্তা না করে, অতি যত্নের সঙ্গে, অতি উচ্চমানের এমন একটা নাটক এখন মঞ্চস্থ করা দরকার, যা দেখে সাহেবদেরও তাক লেগে যাবে। সে কাজ আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

—নতুন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করবে কে?

—আমি! গ্রেট ন্যাশনলের জমিটা খালি পড়ে ছিল না এতদিন? সেখানে আমি সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে একটা রঙ্গালয় গড়া শুরু করেছি। নাম দিতে চাই মিনার্ভা। কেমন হবে নামটা? এবং আমার ইচ্ছে আছে, সে থিয়েটারের উদ্বোধন হবে একটি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ দিয়ে। তেমন নাটক রচনা ও পরিচালনার যোগ্যতা আর কার আছে বলতে পারেন?

গিরিশচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তাঁর বুকের মধ্যে মস্ত সমুদ্রের ঢেউ ঝাপটা মারছে। এমন কথা অনেক দিন তাঁকে কেউ বলেনি। অনেকেই যেন তাঁকে বাতিল বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু থিয়েটার যে তাঁর রক্ত-মজ্জায় মিশে আছে। হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠল তাঁর অহমিকা।

তবু তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, স্টার থিয়েটার আমাকে চুক্তিতে বেঁধে ফেলেছে। অন্য থিয়েটারে যোগ দেওয়া আমার নিষেধ। আমি তাদের কথা দিয়েছি, সত্য ভ্রষ্ট হতে পারব না আমি।

নগেন্দ্রভূষণ উত্তেজিতভাবে বললেন, আপনি হেলাফেলার মানুষ নন, আপনি গিরিশ ঘোষ, আপনাকে দিয়ে কেউ দাসখত লেখাতে পারে? চুক্তি দিয়ে আপনার হাত-পা বেঁধে ফেলবে, এমন চুক্তি আইনে টিকতে পারে না। কই, চুক্তিপত্রখানা একবার আনুন দেখি।

গিরিশচন্দ্র বললেন, আবার মামলা-মোকদ্দমা? না, না, ওর মধ্যে আমি নেই। এই বেশ আছি। সুখে আছি। স্বস্তিতে আছি।

নগেন্দ্রভূষণ জোর দিয়ে বললেন, সেখানা একবার দেখতে দিন না মশাই তাতে আপত্তি কীসের?

দেরাজ থেকে চুক্তিপত্রটি বার করে দিলেন গিরিশচন্দ্র। নগেন্দ্রভূষণ সেটিতে দ্রুত চোখ বোলালেন, মৃদু হাস্য ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠে।

তিনি বললেন, আপনি বুঝি এ চুক্তিপত্র কখনও পড়েও দেখেন নি?

গিরিশচন্দ্র বললেন, পড়ার দরকার কী, মুখের কথাই তো যথেষ্ট।

নগেন্দ্রভূষণ বললেন, না। মুখের কথা যথেষ্ট হলে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন কী ছিল? এই চুক্তির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে আপনাকে সত্যভ্রষ্ট হতে হবে না নিশ্চয়ই? ওরা পাকা কাজ করেছে। ওরা জানত, এমন চুক্তি আইনে টিকবে না। তাই তলায় আর একটি শর্ত যোগ করেছে। আপনি যদি এ চুক্তি কখনও ভঙ্গ করেন, তা হলে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলে আপনার আর কোনও দায় থাকবে না।

গিরিশ অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে বললেন, সত্যি এমন কথা লেখা আছে?

নগেন্দ্রভূষণ কাগজখানা তুলে ধরলেন গিরিশের চোখের সামনে।

গিরিশ অস্ফুট স্বরে বললেন, পাঁচ হাজার টাকা! সেও তো অনেক টাকা, আমার সঞ্চয় কিছুই নেই!

নগেন্দ্রভূষণ বললেন, আজ বিকেলেই আপনার নাম করে স্টার থিয়েটারে আমি পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর থেকে আপনি মুক্ত। আপনার সঙ্গে অন্য কথাবার্তা পরে হবে, আপনি

নাটক রচনা করতে বসে যান তো গিরিশবাবু, আমরা বাংলা নাটকের মুখ রক্ষা করতে চাই, এইটাই হবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

অনেক দিন পর আজ সন্ধ্যায় গিরিশ একটি মদের বোতল আনালেন। মাঝখানে কিছুদিন সুরা পান বন্ধ রেখে শরীর বেশ স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলেন, আর কোনওদিন ও জিনিস স্পর্শই করবেন না। কিন্তু আজ মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

দোতলায় তাঁর শয়নকক্ষে নতুন করে লেখার সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখেছিলেন গিরিশ। কয়েক দিস্তে বস্ত পেপার, দোয়াত-কলম, ব্লটিং প্যাড, ইরেজার। আর ডিকটেশন নয়, আবার নিজের হাতে গুরু ও গুরুমাতার দিব্যজীবনের কথা লিখবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, শুরু করা হয়নি। সেখানে বসে সুরা দিয়ে আচমন করলেন গিরিশ। মনের মধ্যে দোলাচল।

একবার ভাবছেন, কী হবে আর মঞ্চের জগতে ফিরে গিয়ে ? থিয়েটার মানেই তো আবার সেই প্রতিদিন উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা। ঈর্ষা ও কলহ। রাত্রি জাগরণ ও প্রমোদ। প্রতিদিন টানটান রাখতে হয় স্নায়ু, মাথায় রাখতে হয় অন্য মঞ্চগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা, নাম না জানা হাজার হাজার দর্শকের হাততালির জন্য দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা। থিয়েটারের জগতে স্নেহ, ভালবাসা, মমতা সবই কৃত্রিম। চাটুকাররা তাঁকে ঘিরে থাকবে, স্ত্রীলোকেরা ভাল পার্ট পাবার জন্য তাঁর গায়ে পড়ে সোহাগ দেখাবে।

তার চেয়ে এই জীবনই কি ভাল নয় ? লোকজনের ভিড় এড়িয়ে এই শান্ত, নিরিবিলি সময়, এখন নিজের দিকে ফিরে তাকানো যায়। মাঝে মাঝে গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা হলে উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক আলোচনায় চমৎকার সময় কাটে। এই তো বেশ ! সকালে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম ভাঙে, রাত্রে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে শুয়ে পড়া যায়, শরীরের ওপর কোনও অত্যাচার হয় না। এই শান্তিময় জীবন ছেড়ে আবার সেই উত্তাল ঝঞ্ঝাময় জীবনে ঝাঁপ দেওয়া কি ঠিক হবে ?

এখনও দোয়াতে কলম ডোবাননি গিরিশ, এক একবার সুরায় চুমুক দিচ্ছেন, তারপর তামাক টানছেন। হঠাৎ নরেনের জন্য উতলা বোধ করলেন। গুরু রামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, তুই যা করছিস করে যা ! গুরু আর সশরীরে নেই, নরেনই ছিল শিষ্যদলের নেতা, এ সময় নরেন থাকলে পরামর্শ নেওয়া যেত। কিন্তু অনেক দিন নরেনের কোনও পাত্তা নেই। বরানগরের মঠ ছেড়ে সে যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে কেউ জানে না। সংসারে ফিরে যায়নি নরেন, কিন্তু গুরুভ্রাতাদের ছেড়েই বা সে কোথায় গেল ?

বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধার মধ্যে থাকার পর গিরিশের শিল্পী সত্তাই জয়ী হল। তাঁর রক্তে রয়েছে উন্মাদনা, কোনও শান্তির আশ্বাসই তাঁকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারবে না। সাধারণ, নিয়ম মানা জীবন কোনও শিল্পীর জন্য নয়। শিল্প যে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে মারে। ফরাসিদেশের নট-নাট্যকার মলিয়ের মঞ্চের ওপরেই মারা গিয়েছিলেন, গিরিশ প্রায়ই ভাবতেন, ওই রকম মৃত্যুই তাঁরও নিয়তি।

সাদা কাগজের ওপর গিরিশ প্রথমে লিখলেন, ম্যাকবেথ।

নগেন্দ্রভূষণ যখন ইংরিজি নাটকের বঙ্গানুবাদের কথা বলেছিলেন, তখনই গিরিশের মাথায় এই নামটি এসেছিল। ইংরেজদের যদি চ্যালেঞ্জ জানাতে হয়, তা হলে শেক্সপীয়ার দিয়েই শুরু করা উচিত। অল্প বয়েসে গিরিশ একবার এই নাটকের অনুবাদ করেছিলেন, সে অনুবাদ বিশেষ সুবিধের হয়নি। আবার তিনি বাংলায় ম্যাকবেথ লিখবেন।

দু' তিন পৃষ্ঠা লেখার পর উঠে দাঁড়ালেন গিরিশ। সিংহের মতন পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে উষ্ণ নিশ্বাস বেরুচ্ছে, চক্ষু দুটি যেন জ্বলছে। ওরা তাঁকে বাতিলের দলে ঠেলে দিতে চেয়েছিল ? মঞ্চের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান ছিন্ন করে দেবে ভেবেছিল ? ওদের সবাইকে তিনি এবার দেখিয়ে দেবেন তাঁর কব্জির জোর ! গিরিশ ঘোষ মরে গেছে ? শুধু নাটক লেখা ও পরিচালনা নয়, আবার তিনি অভিনেতা হিসেবেও আবির্ভূত হবেন। দেখুক সবাই, শুধু বঙ্গে নয়, সারা ভারতে এখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী !

রাত্রির প্রথম প্রহরেও গিরিশের ঘরে জ্বলছে গ্যাসের বাতি। তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে সুরেন্দ্র উঁকি

মেরে দেখল, পাশে গড়াচ্ছে শূন্য মদের বোতল, গিরিশ ভূতগ্রস্তের মতন খসখস করে অতি দ্রুত কী সব লিখে চলেছেন।

পা টিপে টিপে সে পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর বিস্মিতভাবে বলল, বাবা, তুমি আবার নাটক লিখছ ?

গিরিশ মুখ তুলে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ। নাটক, নতুন নাটক। শিগগিরিই মঞ্চে নামাব। তুই তাতে পার্ট করবি, দানি।

মিনার্ভা থিয়েটার যেমন অতি রমণীয়ভাবে সজ্জিত হয়েছে, তেমনই ম্যাকবেথের প্রস্তুতিতেও কোনও খুঁত রাখা হয়নি। ইংরেজ চিত্রকর দিয়ে দৃশ্যপট আঁকানো হয়েছে। পোশাক-আশাক অবিকল বিলাতি। অন্তরালে বিলাতি বাজনা। সৌভাগ্যক্রমে অর্ধেন্দুশেখরকে পাওয়া গেছে দলে, তিনি তো একাই একশো। অর্ধেন্দুশেখর বড় পার্ট চান না, একই নাটকে তিন-চারটি ছোট ছোট বিভিন্ন রকম ভূমিকায় তাঁর জুড়ি নেই। ম্যাকবেথে তাঁর ভূমিকা পাঁচটি চরিত্রে, তার মধ্যে তিনি জোর করে একজন ডাকিনীও সাজতে চেয়েছেন। পুরনো আমলের আরও অনেককে পাওয়া গেছে। লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকা অতি কঠিন, সে পার্ট প্রথমে দেওয়া হয়েছিল প্রমদাসুন্দরীকে। সে পাকা অভিনেত্রী, কিন্তু ইদানীং স্থুলাঙ্গিনী হয়েছে, হাঁসের মতন থপথপ করে হাঁটে, মেমসাহেব হিসেবে তাকে একেবারেই মানায় না। তখন তিনকড়ি নামে এই নতুন মেয়েটিকে নিয়ে মহড়া দেওয়া হল কয়েকদিন। মেয়েটি ঠিক নতুন নয়, অন্য থিয়েটারে কয়েকবার খুচরো পার্ট করেছে, রোগা, লম্বা চেহারা, অনেকে ঠাট্টা করে তার নাম দিয়েছে তেঠেঙে, তবু গিরিশ বললেন, লেডি ম্যাকবেথের কিছুটা পুরুষালি চেহারা হলে ক্ষতি নেই। শেষ পর্যন্ত তিনকড়িই মনোনীত হল সেই ভূমিকায়।

এর মধ্যে দু' রাত্রি অভিনয় হয়েও গেছে, বেশ উতরে গেছে তিনকড়ি। নতুন নাটকে প্রথম দু' একটি শো-তে সমালোচকদের ডাকা হয় না, প্রথম দিকে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকেই। এই শনিবারেই প্রকৃতপক্ষে জনসমক্ষে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ, সমস্ত পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও নাট্য সমালোচকদের আহ্বান জানানো হয়েছে, আমন্ত্রিত হয়েছেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এই শো নষ্ট হলে অপমানের একশেষ হতে হবে।

তিনকড়ির অসুস্থতার সংবাদ শুনে গিরিশ যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন, তখন অর্ধেন্দুশেখর বললেন, গুরু, আমাদের এই নাটকে একটা ছুঁড়ি একটা ছেলের পার্ট করছে। আগেও ছুটকো-ছাটকা পার্ট করেছে। কিন্তু ছুঁড়িটার একটা গুণ কী জানো, পুরো নাটকটাই প্রায় ওর মুখস্থ। আমি শুনেছি, ও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব পার্ট মুখস্থ বলতে পারে। প্রায় শ্রুতিধর বলা যায়। একবার তাকে ট্রায়াল দিয়ে দেখবে নাকি ?

গিরিশ মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিলেন, থামো তো ! মুখস্থ থাকলেই পার্ট করা যায় ? তাও লেডি ম্যাকবেথ ! আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

গিরিশ ভাবছিলেন, বনবিহারিণী, কুসুমকুমারীর মতন পাকা অভিনেত্রীদের বয়েস হয়ে গেছে, মঞ্চ থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে, তাদেরই কারুকে ফিরিয়ে আনবেন কি না ! অথবা প্রমদাসুন্দরীকেই লেডি ম্যাকডাফের ভূমিকা থেকে সরিয়ে এনে লেডি ম্যাকবেথ সাজাবেন ? তাহলে ও ভূমিকাটা কে করবে ?

আবার মুখ তুলে বললেন, ঠিক আছে, ডাকো তো ছুঁড়িটাকে, একবার দেখি !

অর্ধেন্দুশেখর একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন, সে লেডি ম্যাকডাফের ছেলে সাজে। পাতলা দোহারা চেহারা, মাজা মাজা রং, চক্ষু দুটি টানা টানা, সে পরিষ্কার দৃষ্টিতে তাকাতে পারে।

গিরিশ জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোর ?

মেয়েটি বলল, নয়নমণি।

গিরিশ বিরক্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, আসল নাম কী বল্। পাঁচী, বুঁচি, খেন্তি, ডেকচি, পটল, আন্নাকালী, পদীরানি, এই সবই তো নাম হয়। ভাল ভাল নাম আমরা দিয়ে দিই। বনবিহারিণী, বিনোদিনী, প্রমদাসুন্দরী, কুসুমকুমারী এসব আমার দেওয়া নাম।

মেয়েটি জোর দিয়ে বলল, নয়নমণিই আমার নাম।

গিরিশ বললেন, বটে! জন্মেছিস কোথায়? সোনাগাছি, হাড়কাটার গলি, গোয়াবাগান, উল্টোডিঙ্গি, কোথায়?

নয়নমণি বলল, ওসব কোথাও না। আমি জন্মেছি, অনেক অনেক দূরে।

গিরিশ এবার মুখ তুলে মেয়েটির সর্বাঙ্গ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, হাড়ের ওপর মাংস নেই, খেতে পাস না বুঝি? ঠিক আছে, সাজিয়ে গুজিয়ে নিলে এই চেহারাতেই চলবে। তুই নাকি আমার পুরো ম্যাকবেথ মুখস্থ বলতে পারিস? মুখস্থ করেছিস কেন?

নয়নমণি বলল, ইচ্ছে করে করিনি। মহড়ার সময় আড়াল থেকে শুনি। শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে যায়।

গিরিশ বললেন, বল দিকি ডাকিনীর সংলাপ।

নয়নমণি সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল।

...দিদি লো, বল না আবার মিলব কবে তিন বোনে—
যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক চকাচক হানতে চিকুর
কড় কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ ডাকবে যখন ঝনঝনে...
...এলো চুলে মালার মেয়ে, বসে উদোম গায়
ভোর কোঁচরে ছোঁচা বাদাম চাকুম চুকুম খায়...

শুনতে শুনতে গিরিশের ভুরু উঠে গেল অনেকখানি, কুঞ্চিত হল ললাট। তিনি আবার বললেন, আমি আগে কখনও এদের কারুকে অন্যের পার্ট মুখস্থ বলতে শুনিনি। লেডি ম্যাকবেথের জবানী বল তো খানিকটা শুনি।

নয়নমণি বলল :

আয় আয় আয় রে নরকবাসী পিশাচনিচয়
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয় ত্বরা করি ;
হর নারী-কোমলতা হৃদি হতে মম
আপাদমস্তক কর কঠিনতাময়...

গিরিশ বললেন, তুই বললি পিশাচনিচয়অ, কঠিনতাময়অ, তোর জন্ম কোথায় ঠিক করে বল তো?

নয়নমণি আবার বলল, অনেক দূরে। আমি উচ্চারণ ঠিক করে নেব।

গিরিশ জিজ্ঞেস করলেন, মেমসাহেবরা কেমন করে হাঁটে জানিস? হেঁটে দেখাতে পারবি? এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত হেঁটে যা তো।

নয়নমণি থুতনিটা ঈষৎ উঁচু করে, গর্বিতা ইংরেজ রমণীর অবিকল ভঙ্গিতে হেঁটে গেল।

গিরিশচন্দ্র এবার অর্ধেন্দুশেখরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ মেয়েকে পেলে কোথায়।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনেছি বলতে পারো। এ মেয়ের অনেক গুণ আছে, ভাল গাইতে পারে। নাচতেও জানে। এ পর্যন্ত ভাল পার্ট পায়নি। ছোট ছোট রোল করছে তিন-চার বছর।

গিরিশচন্দ্র বললেন, এ যে দেখছি ছাই চাপা আগুন। উচ্চারণে একটু দোষ রয়ে গেছে, কিন্তু ওর হাঁটা দেখেই বুঝতে পেরে গেছি, ও বড় অভিনেত্রী হবে। যদি মাথা না বিগড়ে যায়।

তারপর নয়নমণির দিকে ফিরে বললেন, এই, তোর বাঁধা বাবু আছে?

নয়নমণি বলল, আজ্ঞে?

গিরিশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলছি, তোর বাঁধা বাবু আছে? আমার সঙ্গে আজ সারা রাত কাটাতে পারবি?

নয়নমণি চুপ করে রইল।

গিরিশ এখন অস্থির হয়ে আছেন, নীরবতা তাঁর সহ্য হল না। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, কথাটা বুঝলি না? রাত কাটাতে হবে মানে আমার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে তোকে ঢলানি করতে হবে না। আজ সারা রাত মহড়া দেব, তুই থাকতে পারবি?

নয়নমণি নতমুখে বলল, পারব।

তিন দিনের মধ্যে পুরো তৈরি হয়ে গেল নয়নমণি। গিরিশ খুবই সন্তুষ্ট। তবু একটু ভয় রয়ে গেছে। মহড়ার সময় ভাল করা আর মঞ্চে শত শত দর্শকের সামনে সব ঠিকঠাক করে যাওয়া এক কথা নয়। এত বড় পার্ট যে ও আগে করেনি। তাও এরকম শক্ত ভূমিকা।

রামকৃষ্ণদেবের ছবির সামনে প্রণাম ও ধ্যান শেষ করে গিরিশ নয়নমণিকে ডাকলেন।

লেডি ম্যাকবেথ রূপিণী নয়নমণিকে বোধ হয় এখন তার নিজের জননীও চিনতে পারবে না। কালো ভেলভেটের লম্বা গাউনে এখন আর তাকে কৃশ মনে হয় না, মুখমণ্ডল গোলাপি বর্ণ, মাথার দীর্ঘ চুল ঘোড়ার লেজের মতন গুচ্ছ করে বাঁধা। ওষ্ঠ-অধর বেদানার কোয়ার মতো রক্তিম। দীর্ঘ অক্ষিপল্লব, তার দৃষ্টি যেন সুদূর।

গিরিশ বললেন, নয়ন, তুই আমার মান রাখতে পারবি তো? আমার গুরুর ছবিকে প্রণাম কর।

নয়নমণি প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রইল একটুক্ষণ। কী যেন সে বলতে লাগল ফিসফিসিয়ে। পরে সে গিরিশের পাদবন্দনা করে উঠে দাঁড়াল, দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানাল রামকৃষ্ণদেবের ছবিকে।

গিরিশ তার মাথায় হাত রাখলেন।

ডায়নামো বসিয়ে বিজলি বাতির ব্যবস্থা হয়েছে। মঞ্চ একেবারে আলোয় আলোময়। এত আলো আগে কখনও ছিল না, মুখের প্রতিটি রেখা পর্যন্ত দেখা যায়। উইংসের পাশ থেকে বিজলি বাতির ওপর বিভিন্ন রঙিন কাগজ মুড়ে ফোকাস করা হবে, এই সব ব্যবস্থাই নতুন। এত বেশি আলো বলে গিরিশ অভিনয় ধারারও বদল করেছেন। এখন থেকে কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা ছাড়াও মুখের অভিব্যক্তি, চক্ষুর বিভিন্ন ভঙ্গিও প্রাধান্য পাবে।

এত মুহুর্মুহু করতালি গিরিশ আশাই করেননি। আজ দর্শকদের মধ্যে অনেক সাহেব রয়েছে, তারাও হাততালি দিচ্ছে। গিরিশ আগে লোকমুখে শুনেছিলেন, ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন, বাঙালি থেন অফ কডর? এ যে হাসির ব্যাপার। চলো, নেটিভদের থিয়েটারে ম্যাকবেথ দেখে একটু হেসে আসি।

কিন্তু এখন তো সাহেবরা হাসছে না, মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিচ্ছে। গিরিশ লক্ষ করলেন, নয়নমণি অভিনন্দিত হচ্ছে বারবার। মহড়ার চেয়েও ভাল অভিনয় করছে নয়নমণি, এ মেয়েটি যেন জন্ম-অভিনেত্রী।

শেষ দৃশ্যে ড্রপসিন পড়ার পর দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে এমন সহর্ষ চিৎকার করতে লাগল যে আবার পর্দা তুলে সমস্ত অভিনেতা- অভিনেত্রীরা সার বেঁধে দাঁড়াল, গিরিশ সামনে এসে নমস্কার জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। তার পরেও দর্শকরা এনকোর এনকোর বলতে লাগল, তখন গিরিশ নয়নমণিকে এগিয়ে দিলেন সামনে, একে একে অন্য সবাই একবার করে সামনে এল। এক জমিদার মেডেল ঘোষণা করলেন লেডি ম্যাকবেথের নামে।

নগেন্দ্রভূষণ দমদমের এক বাগান বাটিতে বিরাট খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। অদ্য রজনীর সার্থকতায় সবাই অভিভূত। আনন্দের শেষ নেই। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ক্লান্ত, বিষম ক্লান্ত, গত তিন রাত তাঁর ঘুম হয়নি। অভিনয়ের সময় মঞ্চে তাঁর দাপট দেখে কেউ বুঝতে পারেনি যে ভেতরে ভেতরে তিনি কতখানি ক্লান্ত হয়ে আছেন। অন্য থিয়েটারের লোকজনও আজ গোপনে টিকিট কেটে এই থিয়েটার দেখতে এসেছে, নাটকের বাঁধুনি, পাত্র-পাত্রীদের সাজসজ্জা, মঞ্চের নতুন রূপ তো আছেই, এই প্রৌঢ় বয়েসেও অভিনেতা হিসেবে গিরিশের তেজ দেখে তারা হতবাক।

গিরিশ আর পান-ভোজনের আসরে যেতে পারলেন না, শুয়ে পড়লেন বাড়ি ফিরে।

সমস্ত পত্রপত্রিকাতেই ম্যাকবেথের প্রশস্তি বেরুল, শুধু তাতে ফাঁক রয়ে গেল একটি। হ্যান্ডবিলে

লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে নাম ছিল তিনকড়ি দাসীর, সমস্ত প্রশংসা বর্ষিত হল তার নামে। নয়নমণির কথা কেউ জানেই না।

তিনকড়ি দু'দিন পরেই সুস্থ হয়ে ফিরে এসে দাবি জানাল, পরবর্তী অভিনয়ে সে তার ভূমিকা ছাড়বে না। তার দাবি ন্যায্য। কিন্তু নগেন্দ্রভূষণ, অর্ধেন্দু ও আরও কয়েকজনের মতে নয়নমণির অভিনয় অনেক জীবন্ত হয়েছে, তাকে মানিয়েছেও খুব, সুতরাং তিনকড়ির বদলে তাকেই রাখা হোক। এই নিয়ে একটা কলহের উপক্রম হল।

মধ্যস্থ হয়ে নগেন্দ্রভূষণকে গিরিশ বললেন যে, এই অবস্থায় তিনকড়িকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না, তাতে একটা কুদৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। তিনকড়িই লেডি ম্যাকবেথ করুক, নয়নমণিকে পরে অন্য সুযোগ দেওয়া যাবে এখন। সে যাতে মনে আঘাত না পায়, গিরিশ নিজে তাকে বুঝিয়ে বলবেন।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, মনে আঘাত পাবে? ও ছুঁড়িটা তো পাগলি! নিজের জন্য কিছুই চায় না।

তবু গিরিশ নয়নমণিকে ডেকে পাঠালেন গ্রিনরুমে। নরম কণ্ঠে বললেন, আয়, বোস। তুই গান জানিস শুনলুম, আমাকে একটা গান শোনাবি?

গিরিশকে চমৎকৃত করে নয়নমণি জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে খানিকটা গেয়ে শোনাল। তার সংস্কৃত উচ্চারণে ভুল নেই।

গিরিশ একটুক্ষণ মুগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কোথায় ছিলি তুই এতদিন? তুই তো লেখাপড়া জানিস মনে হচ্ছে। কে তোকে এসব শোনাল?

নয়নমণি মুখ নিচু করে বলল, আমি নিজে নিজেই শিখেছি।

গিরিশ বললেন, বাঃ! তুই সেদিন আমার মুখ রক্ষা করেছিস। সব কাগজে এ নাটকের খুব সুখ্যাতি বেরিয়েছে। ইংলিশম্যান কাগজ পর্যন্ত লিখেছে, বিলেতের স্টেজের তুলনায় আমাদের প্রোডাকশান কোনও অংশে খারাপ হয়নি। দুটো প্যারাগ্রাফ লিখেছে তোর অভিনয় সম্পর্কে, যদিও নাম পেয়েছে তিনকড়ি। দ্যাখ, থিয়েটারে এরকম হয়। নাটক ভাল হল কি না, সেইটাই বড় কথা, সবাই মিলে সেই চেষ্টাই করতে হয়।

নয়নমণি বলল, আমি ছোট পার্টই করব। ম্যাকডাফের ছেলের পার্ট।

গিরিশ বললেন, অ্যাঁ, তুই ছোট পার্ট করবি? মাঝে মাঝে তিনকড়ির বদলে তোকে যদি নামাই, কিছুদিন তিনকড়ি করুক, তারপর...

নয়নমণি বলল, আমার ছোট পার্টই ভাল। তিনকড়ি দিদির এ পার্ট আমার দেখতে খুব ভাল লাগে, কী সুন্দর গলা।

গিরিশ হেসে উঠে বললেন, এমন কথা কখনও শুনিনি! তুই কে রে? ঠিক আছে, তুই এখন ছোট পার্টই কর, পরের নাটকে তোর জন্য আমি বড় রোল লিখব। ইচ্ছে আছে, শেক্সপীয়ারের সব নাটক আমি একে একে বাংলায় মঞ্চে নামাব। হ্যামলেটে তুই হবি ওফেলিয়া। নগেনবাবুকে বলব, এ মাস থেকেই তোর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে—

নয়নমণি বলল, বেশি মাইনে নিয়ে আমি কী করব? কুড়ি টাকা পাই, তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

গিরিশ আরও জোরে হেসে উঠে বললেন, এ মেয়ে দেখছি সত্যি পাগল! পাগলদেরই আমার বেশি পছন্দ।

৭

রামবাগানে গঙ্গামণি নিজে একটি বাড়ি কিনেছে। বাড়িটি ত্রিতল হলেও বিশেষ বড় নয়, ওপরতলায় একটি মাত্র ছোট ঘর। গঙ্গামণির যত না বয়েস হয়েছে, সে তুলনায় তার রূপ ঝরে গেছে অনেক বেশি। কোমরের পরিধি যদি বুককে ছাড়িয়ে যায় তা হলে সে রমণীর পক্ষে আর যা-ই হোক মঞ্চে দাঁড়াবার কোনও যোগ্যতা থাকে না। গঙ্গামণি বুঝে গেছে যে থিয়েটারের জগৎ থেকে তার বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

এক বছর আগেও সে ইচ্ছে মতন থিয়েটার বদল করতে পারত, স্টার কিংবা এমারাল্ডে তার খাতির ছিল। মেদ বৃদ্ধি শুরু হবার পর সে কম কৃচ্ছ্রতা সাধন করেনি, মদ ছুঁত না, খাওয়া দাওয়াও সব প্রায় বন্ধ, প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের পর আহিরীটোলার কালী মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত কয়েক ঘণ্টা। কিছুতেই কিছু হবার নয়। সবাই বলত, ও তোর মায়ের ধাত, তোর মা যে ছিলেন আড়াই মনি ঘণ্টেশ্বরী।

আগে সে যে কোনও নাটকে আট-দশখানা গান গাইত, 'বিল্বমঙ্গলে' তার গান কী জনপ্রিয়ই না হয়েছিল, এখন নেচে নেচে একখানা গান গাইতেই সে হাঁপিয়ে যায়। মাস ছয়েক ওজন কমাবার চূড়ান্ত চেষ্টার পর সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে আবার সব কিছু খায়। সর্বক্ষণ এটা খাব না, ওটা খাব না ভাবলে কি মনের সুখ থাকে? গঙ্গামণির স্বভাবটাই যে হাসিখুশি ধরনের। তার রান্নার খুব শখ, ঘনিষ্ঠ মানুষজনদের সে রেঁধে খাওয়াতে ভালবাসে। গিরিশবাবু প্রায়ই তার হাতের রান্না খাওয়ার জন্য আবদার করতেন।

জমানো টাকায় গঙ্গামণি এই বাড়িটি কিনেছে, যাতে ভবিষ্যতে একেবারে নিরাশ্রয় না হতে হয়। এর আগে গোয়াবাগানে একটি বাড়ি ভাড়া করে তাকে রেখেছিল এক বাবু, সেই বাবুটি কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ একদিন সরে পড়েছে, সে নাকি চলে গেছে পাঞ্জাবে। আর কোনও ফুলবাবু তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না, তা গঙ্গা জানে, সে আর ও সবের চেষ্টাও করেনি, নিজের বাড়িতে নিশ্চিন্তে খাবে দাবে ঘুমোবে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

গঙ্গামণির মনটি নরম। যে-ই সে বাড়ি কিনেছে, অমনি কোথা থেকে তার কতকগুলি পুষ্যি জুটে গেছে। গঙ্গামণি কারুকে ফেরায় না। কুসুমকুমারী (খোঁড়া), হরিমতী (ডেকচি), টুন্নামণি, কিরণশশী (ছোট), এই রকম যারা ছোটখাটো পার্ট পায়, মাইনের টাকায় নিজস্ব বাড়ি রাখতে পারে না, অথচ বাঁধা বাবুও নেই, তারা এসে ধরেছিল। গঙ্গামণি তাদের একতলার ঘরগুলোয় থাকতে দিয়েছে। দোতলায় সে থাকে, তার নিজের ছেলেপুলে নেই বলে রাস্তা থেকে তিনটি হা-ভাতে ছেলে-মেয়েকে কুড়িয়ে এনে রেখেছে নিজের কাছে, আর আছে তার সাতখানা বেড়াল।

সন্ধে হলে গঙ্গামণি ওই অল্পবয়েসী ছেলে তিনটিকে নিয়ে নাচ-গান শেখাতে বসে। তার গানের গলা এখনও চমৎকার, এই শরীর নিয়েও সে নাচে। একটি ন বছরের ছেলের হাত ধরে নাচতে নাচতে সে গান ধরে:

গুটি গুটি ফিরবো বনে দুটি
লতা ছিঁড়ে তোর বাঁধবো ঝুটি
তোর কানে দোলাবো লো ঝুমকো ফুল
কত ডাকে বুলবুল
কোয়েলা দোয়েলা মিঠিমিঠি...

ছেলেমেয়ে তিনটিকে সে প্রায়ই বলে, একটু আড় ভাঙলে তোদের থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেব। তখন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবি, কপালে যদি থাকে, অনেক রোজগার করবি। তাই তো বলি, মন দিয়ে শেখ!

তারপর একটা বেড়ালছানাকে কোলে তুলে আদর করতে করতে বলে, তোদের আমি থিয়েটারে ঢোকাতে পারব না। আমি চক্ষু বুঁজলেই তোদের গতি হবে রাস্তায়।

তিনতলার ঘরখানি সে দিয়েছে নয়নমণিকে। এ মেয়েটিকে গঙ্গামণি বিশেষ পছন্দ করে। এতদিনের থিয়েটার-জীবনে গঙ্গামণি এমন মেয়ে দেখেনি। গঙ্গামণির পাকা চোখ, এমারাল্ড থিয়েটারে থাকার সময় যখন অর্ধেন্দুশেখর একদিন এই নয়নমণিকে এনে একটা ছোট পার্ট দিয়েছিলেন, তখনই বোঝা গিয়েছিল এ মেয়ে কালে কালে হিরোইন হবে। নাচতে জানে, গান জানে, থিয়েটারের বই—খবরের কাগজ গড়গড়িয়ে পড়তে পারে, তবু সে সব সময় আড়ালে থাকতে চায়। এ আবার কেমন ধারা স্বভাব! শুধু কি গুণ থাকলেই হয় রে বাপু, এ লাইনে ওপরে উঠতে গেলে ম্যানেজার-মালিকের গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে হয়, পা টিপে দিতে হয়, অনেক সময় গতর খাটাতেও হয়। লাইনটাই যে এ রকম। যে বিয়ের যে মন্তর! এ মেয়েটা সে সব কিছুই করে না, কোথায় যে সুরুৎ করে লুকিয়ে পড়ে, টের পাওয়াই যায় না। মহেন্দ্রলাল বোসের মতন অত বড় নাম করা হিরো, তিনি একদিন বললেন, বরানগরের এক বাগানে এক বড়মানুষ মোচ্ছবের ব্যবস্থা করেছেন, অ্যাকট্রেসদের সবাকার সেখানে নেমন্তন্ন, নাচতে গাইতে হবে। সবাই গেল, শুধু নয়নমণি গেল না। মহেন্দ্রলালকে চটালে ও কোনও দিন বড় পার্ট পাবে?

গঙ্গামণিকে এ পদ্ধতিতেই ওপরে উঠতে হয়েছিল। কিন্তু নয়নমণি যে এ সব কিছুই করতে রাজি হয় না, সেই জন্যই ওকে গঙ্গামণির বেশি ভাল লাগে। চুপচাপ থাকে মেয়েটা, বিশেষ কথাই বলে না, তবু ভেতরে ভেতরে এত তেজ! মেয়েমানুষের তেজ কি কেউ সহ্য করে? ছুঁড়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। ওই তো বিনোদিনী কত দেমাক দেখিয়েছিল, এখন কোথায় গেল সে।

এক একদিন রাতের দিকে গঙ্গামণি ওপরে উঠে আসে।

একখানি ছোট ঘর ছাড়া স্নানের জায়গা নেই, রান্নার জায়গা নেই। গঙ্গামণি কতবার বলেছে, তোকে একতলার ঘর দিচ্ছি, সেখানে ও সব সুবিধে আছে, নয়নমণি তবু যাবে না, এই ছাদের ঘরেই সে থাকতে চায়। কলসি ভরে ওপরে জল টেনে আনে, একটা তোলা উনুনে রান্না করে। ঝড় বাদলার সময় কতই না কষ্ট হয়, কিন্তু কে শোনে কার কথা!

একতলার ঘরগুলির সঙ্গে তিনতলার এই ঘরখানির অনেকটা তফাত। যে সব রাতে থিয়েটার থাকে না, সে সব রাতে কুসুম, ভেকচি, টুনাদের ঘরে ছেলে-ছোকরারা ফুর্তি করতে আসে। ঘুঙুরের আওয়াজ আঁর হাসির হর-রা ছোটে। ঝনঝন শব্দে কাচের গেলাস ভাঙে। গঙ্গামণি আপত্তি করে না। সে নিজেও তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই রকম জীবনই কাটিয়েছে, সে আপত্তি করবে কোন মুখে? তা ছাড়া ফুর্তির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো যদি দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করে তো করুক না! যে সব মেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামীর সংসারে থাকার ভাগ্য করে আসেনি, সমাজ যাদের বংশানুক্রমে পতিত করে রেখেছে, সে সব মেয়েদের রূপ-যৌবনই তো আসল। আর এ রূপ-যৌবন তো পদ্মপাতার ওপর জলের ফোঁটা, কখন শেষ হয়ে যায় তার ঠিক নেই, তারপর আর কেউ পুঁছবে না। ওরা দুটো পয়সা জমাতে পারলে আখেরে কাজে লাগবে।

নয়নমণির ঘরে কখনও কোনও পুরুষ মানুষ আসে না। থিয়েটারে কোনও পুরুষের সঙ্গেই তার বিশেষ সখ্য নেই, দুনিয়ার আর কারুকেই যেন সে চেনে না। সারাদিন আপন মনে থাকে। তার ঘরের বিছানায় সব সময় ফর্সা ধপধপে চাদর পাতা। দেয়ালে কোনও ছবি নেই, শুধু ঘরের এক কোণে একটি বেশ বড় মাটির মূর্তি রয়েছে, বংশীধারী কৃষ্ণ। সেই মূর্তিই যেন নয়নমণির একমাত্র পুরুষ সঙ্গী। গঙ্গামণি এক একদিন এসে দেখেছে, সেই মূর্তির সামনে নয়নমণি আপনমনে বিভোর হয়ে নেচে চলেছে।

একতলার মেয়েদের কাছ থেকে ঘর ভাড়া হিসেবে গঙ্গামণি পাঁচ-দশটাকা নেয়। ভাড়াটেরা খুব

বেশি উচ্চণ্ডে হলে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মিনি-মাগনার আশ্রিতরা একেবারে কাঁঠালের আঠার মতন সেঁটে থাকে। কিন্তু ওপরতলার এই মেয়েটিকে গঙ্গামণির এমনই মনে ধরেছে যে সে তাকে নিজের মেয়ের মতন কাছে রাখতে চেয়েছিল। পয়সার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ও মেয়ের আত্মসম্মান জ্ঞান অতি টনটনে, কিছুতেই বিনা পয়সায় থাকবে না, জোর করে দশটা করে টাকা সে গঙ্গামণির খাটের ওপর রেখে আসে। গঙ্গামণি প্রস্তাব দিয়েছিল, ওপরে রান্নাঘর নেই, নয়নমণির রান্না করারই বা কী দরকার, সে দোতলায় গিয়ে খাবে। তাতেও রাজি নয় নয়নমণি। তাকে এত করে কাছে টানতে চাইলেও সে কাছে আসে না।

এই প্রত্যেকটি ব্যাপারের জন্যই গঙ্গামণি আরও বেশি পছন্দ করে নয়নমণিকে।

নিজের জীবনে সে যা যা পারেনি, এই মেয়েটি সেইগুলিই অবলীলাক্রমে পেরে যাচ্ছে দেখে সে বিস্মিত হয়ে যায়। নয়নমণি যেন তার চোখ খুলে দিয়েছে, নিজের ব্যর্থতাগুলি সে এখন যাচাই করে দেখছে। পুরুষমানুষদের বাদ দিয়েও যে কোনও মেয়ে একা একা বেঁচে থাকতে পারে, এ ধারণাই যে তার ছিল না। গঙ্গামণির জীবনে কতবার পুরুষ বদল হয়েছে, সে তার ইচ্ছে অনুযায়ীও নয়, পুরুষরাই একজনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে, তার ভাল লাগা বা না লাগার প্রশ্নই ছিল না, সে ধরে নিয়েছিল, এটাই তার নিয়তি। বাচ্চা বয়েসে থিয়েটারে নামার পর এক সময় তার মা বেশি টাকার লোভে লাহোরের এক ব্যবসায়ীর কাছে তাকে বেচে দিতে চেয়েছিল, সেই একবারই প্রতিবাদ জানিয়ে খুব কান্নাকাটি করেছিল গঙ্গামণি, থিয়েটারের নেশা তার রক্তে ঢুকে গিয়েছিল। থিয়েটার সে ছাড়তে পারবে না। থিয়েটার সে ছাড়ল না বটে, কিন্তু সে আমলে অভিনয় করে কটা পয়সাই বা পাওয়া যেত? কোনও নাটক দর্শকদের মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হলে ম্যানেজারবাবু তার হাতে এক টাকা দু টাকা গুঁজে দিয়ে বলতেন, এই দিয়ে এ মাসটা চালিয়ে নে! থিয়েটারের মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত বাঁধা বাবুরা। স্রোতের ধাক্কায় বাসি ফুলের মতন ভাসতে ভাসতে কেটে গেল অনেকখানি জীবন।

যারা বঞ্চিত, তারা চোখ মেলে বেশিদূর তো দেখতে পায় না, তাই নিজেদের মধ্যেই কাড়াকাড়ি করে। থিয়েটারের মেয়েরাও ভারী কুঁদুলে হয়, পরস্পর আকচা-আকচি, লাগানি-ভাঙানি, কামড়া-কামড়ি করেই তারা মরে। গঙ্গামণি নিজেও এই খেলায় মেতেছিল। পুরনো স্টারে থাকবার সময় সুকেশিনী নামে একটা উনুনমুখী তাঁকে এমন হিংসে করত যে মনে হত যেন দৃষ্টি দিয়েই তাকে পুড়িয়ে ফেলবে, তা গঙ্গামণি একবার এমন প্যাঁচ কষল যে সে একেবারে থিয়েটারের জগৎ থেকে হারিয়েই গেল। বিনোদিনী কি গঙ্গামণিকে বিদায় করে দেবার কম চেষ্টা করেছিল? বিনোদিনীকে সরিয়ে দিয়েছে বনবিহারিনী, তার সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়েছিল গঙ্গামণি।

কিন্তু এ মেয়েটা কোনও কূট-কচালের মধ্যে না গিয়েও কী করে পারে? লেডি ম্যাকবেথের পার্টে নয়নমণি সাতখানা ক্ল্যাপ পেয়েছিল, তিনকড়ি মাত্র তিনবার পেয়ে নাম সার্থক করেছে! নয়নমণি তবু ওই পার্ট স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিল? বাইরের লোক না জানুক, সব কটা থিয়েটারের লোক তো জেনেছে, তারা নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করছে, এ মেয়েটা কে? তিনকড়িও নতুন এসেছে, কিন্তু তার পেছনে একজন বড় মানুষ আছে, তাকে সরানো সহজ নয়। কিন্তু প্রমদাসুন্দরী নয়নমণিকে সুনজরে দেখেনি, তার চোখ টাটাচ্ছে, নয়নমণিকে ঠেকনো দেবার কেউ নেই জেনে গিয়ে সে নয়নমণিকে আর ওপরে উঠতে দেবে না ঠিক করেছে। এই নিয়ে নয়নমণিকে যতবার সাবধান করতে যায় গঙ্গামণি, ততবারই মেয়েটা হাসে। সেই হাসির শব্দ শুনলেই গঙ্গামণির বুকের মধ্যে ধকধক শব্দ হয়। সে কেন সারাজীবনে অমন ভাবে হাসতে পারেনি? সে কেন উঠতে পারেনি ঈর্ষা, হিংসা, লোভের ঊর্ধ্বে? আহা, আবার যদি নতুন করে জীবনটা শুরু করা যেত।

একদিন ওপরে এসে নয়নমণিকে একা একা সেই ঠাকুরের মূর্তির সামনে নাচতে দেখে গঙ্গামণি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা নাচছে তো নেচেই চলেছে, কোনওদিকে হুঁশ নেই, বাহ্যজ্ঞানই নেই। থিয়েটারের যেমন তেমন নাচ নয়, এ নাচ অন্যরকম, গঙ্গামণি আগে কখনও দেখেনি। সে ঘরের মধ্যে ঢুকে নয়নমণির হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ লা, নয়ন, তুই যে ঘরের মধ্যে কেষ্ট

ঠাকুরের মূর্তি রেখেছিস, তাতে আমাদের পাপ হবে না ?

নয়নমণি তার সরল বিস্ময়মাখা ডাগর চোখদুটি গঙ্গামণির মুখের ওপর ন্যস্ত করে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন গো, দিদি, পাপ হবে কেন ?

গঙ্গামণি বলেছিল, ঠাকুর রাখলে নিত্য পুজো করতে হয়। সে ভাগ্য করে কি আমরা জন্মেছি ? কোনও পুরুত মশাইও আমাদের বাড়িতে আসবে না।

নয়নমণি আবার দু হাতে নাচের মুদ্রা দেখিয়ে বলেছিল, এই তো আমাদের পুজো। ঠাকুর এই পুজোতে খুশি হবেন না !

গঙ্গামণি থুতনিতে আঙুল দিয়ে বলেছিল, শোনো মেয়ের কথা ! এই নাকি পুজোর ছিরি ! নেচে নেচে পুজো হয় !

নয়নমণি হাসতে হাসতে গঙ্গামণিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, পুরুত ঠাকুর যখন মন্দিরে পুজো করেন, তখন ভাল করে দেখনি ? এক হাতে ঘণ্টা আর এক হাতে পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে নেচে নেচে আরতি করেন, তা সেটাও তো নাচই হল।

—দুর মুখপুড়ি ! পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের তুলনা ! আমরা কি মন্ত্র-তন্ত্র জানি, না তাতে আমাদের অধিকার আছে ?

—আমি গান করি। তুমিও তো ভাল গান জানো। সেই গানই তো আমাদের মন্ত্র !

—আমাদের ও সব করতে নেই রে, আমরা যে পতিত। আমাদের জীবন পাপের জীবন, তুই তার ওপর আবার কেন পাপের বোঝা বাড়াচ্ছিস ?

—ও দিদি, ভগবান কি সকল মানুষের জন্য নয় ? শুধু বামুন-কায়েতদেরই ভগবান ? তবে তাঁর সৃষ্টিতে এত সব অন্য জাতের মানুষ এল কী করে ? আমাদের কেষ্ট ঠাকুর কি গয়লার ঘরে মানুষ হননি ? ভগবানের চোখে মানুষের উচ্চ-নীচ কিছু নেই।

কথা বলার সময় নয়নমণি এমন করে হাসে যে তার ওপর রাগ করা যায় না।

আর একদিন সে একটা চমকপ্রদ কথা বলেছিল।

মঞ্চে যখন একসঙ্গে পা ফেলে হাসে-কাঁদে, নাচে-গায়, তারা সবাই সকলের পূর্ব পরিচয় জানে। কে কোথা থেকে এসেছে, কার মায়ের কী পেশা ছিল তা আর জানতে বাকি নেই। কিন্তু নয়নমণি কিছুতেই তার আগের কথা বলতে চায় না, শত প্রশ্ন করলেও সে শুধু বলে আমি রাস্তার মেয়ে, আমাকে একজন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

গঙ্গামণি একদিন তাকে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই রাস্তায় কোথা থেকে এলি ? রাস্তায় তো জন্মাসনি। তোর মা কোথায় গেল ? তোর এই কাঁচা বয়েসে, তোর খোঁজে তোর আপনজন কেউ কখনও আসে না কেন ?

নয়নমণি হাসতে হাসতে বলেছিল, আমি টুপ করে আকাশ থেকে খসে পড়েছি। কিন্তু আমি তোমাদের মতন পতিত নই। আমি ভগবানের সন্তান। তোমরা সব সময় নিজেদের পতিত পতিত বলো কেন গো ?

গঙ্গামণি বলেছিল, আমরা তো তোর মতন আকাশ থেকে খসে পড়িনি। আমার মা ছিল, মা থিয়েটারে সখী সেজেছিল কিছুদিন। কিন্তু আমার বাপ নেই। তাই জন্ম থেকেই পতিত।

নয়নমণি বলেছিল, কী যে বলো ! বাবা আর মা, এই দুজন না থাকলে কি পৃথিবীতে কেউ জন্মাতে পারে নাকি ?

গঙ্গামণি বলেছিল, সে একটা পুরুষ মানুষ ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সে মিনসেটা যে নিজের পরিচয়টা আমাকে দেয়নি। আমার মাকে ফেলে পালিয়েছিল।

নয়নমণি বলেছিল, তা হলে তোমার বাবা একজন ছিল ঠিকই। সে তোমার মাকে বিয়ে করেনি। সমাজের কাছে তোমাকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয়নি। তুমি যখন জন্মেছিলে, তখন কি এ সব কিছু জানতে ? তোমার বাবা আর মায়ের বিয়ে হয়নি, এই জেনে কি তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে ? আসনি, তাই না ? তা হলে তোমার তো কোনও দোষ নেই। বাপ-মা যদি বিয়ে না

করে, সমাজের চোখে কোনও দোষ করে, তার জন্য সন্তান দায়ি হতে যাবে কেন ? সন্তান কেন সারাজীবন বে-জন্মা হয়ে থাকবে ? দিদি, তুমি নিজেকে আর কক্ষনও পতিত বলবে না, পাপী বলবে না।

নয়নমণিকে জড়িয়ে ধরে সেদিন কেঁদে ফেলেছিল গঙ্গামণি। এমন কথা অল্প বয়েসে তাকে কেন কেউ বলেনি। তা হলে সে লম্পটদের খেলার সামগ্রী হত না, মাথা উঁচু করে একা দাঁড়াতে পারত। এ জীবনটা বৃথা গেল !

গঙ্গামণি সব সময় নয়নমণিকে আগলে রাখতে চায়। তার নিজের জীবনে সে যা পারেনি, এই মেয়েটা যেন তা পারে। এই মেয়েটা ওর তেজ নিয়ে বাঁচুক। প্রমদাসুন্দরী হতচ্ছাড়িটা যদি নয়নমণির কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তা হলে সে প্রমদার চোখ গেলে দেবে। তাতে পুলিশ যদি তাকে ফাটকে পুরে দেয় তো দিক।

একদিন বিকেলে তিনজন ভদ্রলোক সোজাসুজি উঠে এল দোতলায় গঙ্গামণির কাছে। এদের মধ্যে নীলমাধবকে চেনে গঙ্গামণি, স্টার থেকে কয়েকজনকে দল ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বীণা থিয়েটারে। আর দুজন নতুন, তাদের মধ্যে একজনের হাতের আঙুলে দুটো হিরে আর একটা পোখরাজের আংটি দেখে মনে হয় বেশ শাঁসালো মক্কেল।

নীলমাধব বলল, গঙ্গা, তুই বাড়ি কিনে আখড়া খুলেছিস শুনে দেখতে এলুম। তা বেশ বাড়িটি। শুনলুম, তোর এক পুরনো বাবু বেশ সস্তাতেই দিয়েছে। এক বাক্স সন্দেশ এনেছি তোর জন্য, আমাদের চা খাওয়াবিনি ?

দৃশ্যটি পরিচিত। যখনই কোনও দলের নাটক বেশ জমে ওঠে, তখনই অন্য দলের দালালরা দু চারজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে অন্য স্টেজে নিয়ে যেতে চায়। গঙ্গামণির জীবনে এ রকম অনেকবার ঘটেছে। বিশেষত বিল্বমঙ্গল পালায় পাগলিনীর ভূমিকায় গান গেয়ে তার যখন খুব নাম হয়েছিল, তখন দুতিনটে দলে টানাটানি পড়ে গিয়েছিল তাকে নিয়ে।

কিন্তু এখন তো গঙ্গামণির কোনও দাম নেই,কেউ তাকে ডাকে না, মিনার্ভাও তাকে ছুটি করে দিয়েছে। হঠাৎ কি আবার তার কপাল খুলল ? এদের পালাতে কোনও মোটাসোটা মেয়েছেলের ভূমিকা আছে বুঝি ? অনেক সময় এ রকম দু-একটা হাসির দৃশ্য লাগে। সে রকম যদি নেচে-কুঁদে লোক হাসাবার মতন ছোট ভূমিকা হয়, তাতে গঙ্গামণি রাজি হবে না, তার অত পয়সার দরকার নেই !

চা খেতে খেতে পুরনো কালের গল্প হতে লাগল। আগন্তুকরা আসল কথাতে আর আসেই না।

গঙ্গামণি নিজেই একসময় নীলমাধবকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন বোর্ডে আছেন গো এখন ?

নীলমাধব বলল, আমরা বেশ কয়েকজন এমারাল্ডে যাব ঠিক করেছি। আবার চাঙ্গা করে তুলব। তুই তো এমারাল্ডে ছিলি এক সময়, তোর নিশ্চয়ই টান আছে এখনও ? এখন এমারাল্ড নাম হলেও এ তো আমাদের সেই পুরনো স্টার, এর ওপর আমাদের মায়া যায় কখনও ?

গঙ্গামণি জিজ্ঞেস করল, কার বই ?

নীলমাধব বলল, রবিবাবুর লেখা। তুই বোধহয় এর নাম শুনিসনি ?

গঙ্গামণি দু দিকে মাথা নাড়ল। থিয়েটার করা ছাড়লেও সব স্টেজের খবরাখবর সে রাখে। সে জানত, এমারাল্ডে অতুলকৃষ্ণ মিত্তির এখন নাটক লিখছে। রবিবাবুর নাম সে শোনেনি।

নীলমাধব বলল, জ্যোতিবাবু মশাইয়ের কথা মনে আছে ? সরোজিনী...

গঙ্গামণি কপালে দু হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, তাঁর কথা মনে থাকবে না ? সাক্ষাৎ যেন রাজপুত্তুর। অমনটি আর দেখিনি।

নীলমাধব বলল, এই রবিবাবু সেই জ্যোতিবাবুরই ভাই, ঠাকুরবাড়ির ছোট রাজপুত্তুর। এর 'রাজা-রানী' কিছুদিন জমেছিল, এখন নামানো হবে 'রাজা বসন্ত রায়'। খুব জমবে, অনেক গান আছে।

গঙ্গামণি জিজ্ঞেস করল, আমার কটা সিন আছে ?

এবার নীলমাধব অন্য দুজন সঙ্গীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ইয়ে, গঙ্গা, এই নাটকে ঠিক তোর যোগ্য কোনও রোল নেই, তোকে তো ছোটখাটো এলেবেলে পার্ট দেওয়া যায় না। আমরা ভেবে রেখেছি, পরের নাটকে তোর জন্য বড় রোল থাকবে, অনেকগুলো গান, অডিয়েন্স তোকে দেখলেই গান আশা করবে।

গঙ্গামণি একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, এই যে বললে, এ নাটকেও অনেক গান আছে—

নীলমাধব তাকে বাধা দিয়ে বলল, সে ব্যাটাছেলের, সে ব্যাটাছেলের গান! আর একটা অল্পবয়েসী মেয়ের, মানে, তার চেহারাটা মানানসই হওয়া চাই। তাই বলছিলুম কী, গঙ্গা, তোর বাড়িতে মিনার্ভা বোর্ডের একটা মেয়ে থাকে, নয়নবালা না কী যেন নাম, সে তো ভাল অ্যাকটিং করে, তিনকড়ির বদলে এক নাইটে লেডি ম্যাকবেথের পার্ট করল, তাকে দেখে থ হয়ে গেছি! নতুন মেয়ে, গিরিশবাবুর সঙ্গে টক্কর দিয়ে লড়ে গেল! ও মেয়ের মধ্যে আগুন আছে রে! শুনেছি তার বেশ গানের গলাও আছে। সে মেয়েটাকে একবার ডাকবি? একটু কথা বলব—

ও হরি! এই ব্যাপার। এরা গঙ্গামণির জন্য আসেনি! এতক্ষণ ধানাই পানাই করছিল, আসলে এরা নয়নমণিকে ধরতে এসেছে।

এক বছর আগে হলেও গঙ্গামণি দপ করে জ্বলে উঠত, এই লোকগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিত।

কিন্তু এখন গঙ্গামণির মুখে হাসি ফুটে উঠল। একটুর জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে, এই লোকগুলোকে দেখে সে ভেতরে ভেতরে থিয়েটারের টানে নেচে উঠেছিল, ফুট লাইটের টান যে বড় মায়ার টান, ভেবেছিল বুঝি ফিরে এসেছে তার যৌবন! কিন্তু ও যে আর ফেরার নয়। উইংসের পাশে দুরুদুরু বক্ষে আর তার দাঁড়ানো হবে না এ জীবনে, তা তো সে মেনেই নিয়েছে!

আর কোনও মেয়ের নাম শুনলে সে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে দিত, তা তার কাছেই যাও না, আমার কাছে মরতে এসেছ কেন? কিন্তু এ যে নয়নমণি। তার যদি উন্নতি হয়, তাতে গঙ্গামণির সুখের পরিসীমা থাকবে না।

সে বলল, ও মেয়ে বড় খেয়ালি।

নীলমাধব বলল, একবার তাকে ডাক না! মিনার্ভায় সে কত পায়? বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ? আমরা তাকে একশো টাকা দেব, বছরে পাঁচশো বোনাস, থিয়েটারের গাড়ি এসে তাকে নিয়ে যাবে, পৌঁছে দেবে—

সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে ওপরে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গঙ্গামণি বলল, ও নয়ন, শিগগির একটা ভাল শাড়ি পরে নে। তোর কপাল ফিরে গেছে। অন্য থিয়েটারের বাবুরা বাড়ি বয়ে তোকে চান্স দিতে এসেছে, অনেক টাকা দেবে, বড় পার্ট দেবে। তুই হিরোইন হবি।

নয়নমণি আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বলল, ও দিদি, আমি অন্য থিয়েটারে যাব কেন? গিরিশবাবু বকবেন যে!

গঙ্গামণি ধমক দিয়ে বলল, আ মর, এ ছুঁড়িটার দেখছি কিছুতেই জ্ঞানগম্যি হল না। গিরিশবাবু আবার কী বলবেন? থিয়েটারে নাচতে এসেছিস, কোনও বোর্ডের কাছে বাধা থাকতে নেই। যে বড় পার্ট দেবে, তার কাছেই চলে যেতে হয়। পার্টটাই বড় কথা, তাতেই তো মানুষে চেনে। তাই না? দর্শকরাই ভগবান। যত ক্ল্যাপ পাবি, তত তোর দর বাড়বে। মিনার্ভায় ছেলে সেজে কতদিন কাটাবি? গিরিশবাবুর কথা বলছিস, দেখবি তিনিই কবে ফুরুৎ করে উড়ে গেছেন। আজ মিনার্ভায়, কালই হয়তো চলে যাবেন অন্য থিয়েটারে। কতবার যে উনি কম্পানি বদলেছেন তা কি আমরা জানি না? নে, নে, ওঠ, মুখটা ধুয়ে নে।

গঙ্গামণি একপ্রকার জোর করেই নয়নমণির আটপৌরে শাড়ি ছাড়িয়ে অন্য শাড়ি পরাল। চুল আঁচড়িয়ে স্নো মাখিয়ে দিল মুখে। তারপর তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল নীচে।

এ ঘরে চেয়ার নেই, গঙ্গামণির বিছানাটি মস্ত বড়, তারই এক প্রান্তে বসেছে তিন বাবু। নয়নমণিকে এনে গঙ্গামণি বসাল বিছানার অন্য প্রান্তে।

নয়নমণি যখন ঘরে ঢুকছে, তার কয়েক পা হাঁটা দেখেই নীলমাধব তার পাশের লোকটিকে বলল, একটু শেখালেই নাচতে পারবে, কী বলিস?

সে লোকটি দুবার মাথা নাড়ল।

নীলমাধব তার অভিজ্ঞ চোখে নয়নমণির চোখ, নাক, ঠোঁট, বসার ভঙ্গি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, লেডি হ্যামলেট যখন সেজেছিলে, তোমাকে চেনাই যায়নি। ফাটিয়েছ সেদিন! হ্যান্ডবিলে তোমার নাম দেয়নি, তোমার নামটা কী গো?

যেন বিয়ের পাত্রী দেখতে এসেছে ওরা, পাত্রীকে বেশি কথা বলতে নেই, তাই গঙ্গামণি আগ বাড়িয়ে বলল, নয়নমণি, ওর নাম নয়নমণি! বেশ নামটা না? আমি বলে রাখলুম দেখো, কালে কালে এ মেয়ে অডিয়েন্সের নয়নমণি হবেই!

নীলমাধব বলল, ও সব মণি টনি চলবে না। নামটা বদলাতে হবে। হাল ফ্যাসানের নাম রাখতে হবে পান্নারানি; কিংবা কুহকিনী নামটা কেমন?

গঙ্গামণি ফিক করে হেসে বলল, ও তোমাদের এখন আর মণি পছন্দ নয়। তা যা বলেছ, এখন মণিদের দিন গেছে, রানিদের দিন এসেছে!

নীলমাধব একটু বিরক্ত ভাবে বলল, আহা, গঙ্গা, তুই-ই তো সব কথা বলছিস! ওকে কিছু বলতে দে! ওগো মেয়ে, শোনো, আমরা একটা নতুন নাটকের জন্য তোমাকে চাইতে এসেছি। রবিঠাকুরের 'বউ ঠাকুরানীর হাট' নামে একটা নভেল আছে, সেটা ভেঙে নাটক করেছি, হিস্টোরিক্যাল, তবে নতুন ধরনের, মেইন ফিমেল পার্ট দুটো, একটাতে বনবিহারিনীকে নেব ঠিক করেছি, আর একটাতে তুমি, প্র্যাকটিক্যালি তুমিই হিরোইন...

নয়নমণি মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বউ ঠাকুরানীর হাট! এই উপন্যাসটি সে পড়েছে, সে অনেক বছর আগে, যেন অন্য জীবনে!

নীলমাধব বলল, টাকাকড়ির কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। সামনের শুক্কুরবার শুভদিন আছে, সেই দিন থেকে রিহার্সাল ফেলব। ঠিক বেলা এগারোটায় থিয়েটারের গাড়ি এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমার যদি এ বাড়িতে থাকতে অসুবিধে হয়, অন্য বাড়িরও ব্যবস্থা আছে। এই যে রাজেন্দ্রবাবু এসেছেন, উনিই টাকা ঢালছেন এই নাটকে। রাজেন্দ্রবাবুর গঙ্গার ধারে একটা ফাঁকা বাড়ি আছে, তুমি সেখানে থাকতে পারো। রাজেন্দ্রবাবু অতি দিলদার মানুষ, তোমার গা একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবেন। তিন-চারজন দাস-দাসী থাকবে...

গঙ্গামণির মনে পড়ল, তার প্রথম যৌবনে তার মায়ের কাছে এসে এই ধরনের বাবুরা ঠিক এই রকম প্রস্তাবই দিত। আনন্দে ডগোমগো হয়ে চোখ চকচক করে উঠত তার মায়ের। মা তবু দরদাম করত, দর বাড়িয়ে তাকে সঁপে দিত কোনও বাবুর হাতে। আজ তার সেই ভূমিকা।

সে বলল, গঙ্গার ধারে বাড়ি? সে বাড়িতে ও একলা থাকবে, না আরও কেউ আছে?

নীলমাধব বলল, একলা, পুরো বাড়ি। দারোয়ান গেটে পাহারা দেবে। কী রাজেন্দ্রবাবু, বলুন না!

হিরে-পোখরাজের আংটি পরা রাজেন্দ্রবাবু কিছু না বলে হেঁ হেঁ করে হাসল।

নীলমাধব বলল, তা হলে এই কথাই রইল। মিনার্ভার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে নাও। শুক্কুরবারই ও বাড়িতে চলে যাবে। আর হ্যাঁ, তোমার জন্য দুশো টাকা অ্যাডভান্স এনেছি। টাকার জন্য চিন্তা কোরো না, রাজেন্দ্রবাবু খুশি হলে তোমার কোনও অভাব থাকবে না।

প্রণয়িনীর হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেবার ভঙ্গিতে রাজেন্দ্রবাবু পকেট থেকে নগদ দুশো রুপোর টাকা ভরা একটা মখমলের থলি বার করে গুঁজে দিল নয়নমণির হাতে।

নয়নমণি থলিটা সন্তর্পণে বিছানায় নামিয়ে রাখল। তারপর হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিল অনেক দূরে। মুখ নিচু করে বলল, সোনার গয়না আমার সহ্য হয় না। আমি সোনা পরি না। আমি মিনার্ভা ছেড়ে যাব না।

নীলমাধব দারুণ অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, কী বললে? মিনার্ভা ছেড়ে যাবে না? মিনার্ভা তোমায়

কী দেয় ? তোমার এত সুন্দর চেহারা, তোমাকে ছেলে সাজিয়ে রেখেছে।

নয়নমণি বলল, আমি গিরিশবাবুর পায়ের কাছে বসে পার্ট শিখব ! আমার টাকার দরকার নেই !

এরপর আর বেশিক্ষণ কথাবার্তা চলল না। এই পাতলা চেহারার নম্র মেয়েটি যে তার জেদ ছাড়বে না তা বুঝতে দেরি হয় না। নীলমাধবরা রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

নয়নমণি বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে দেয়াল ঘেঁষে।

গঙ্গামণি কোমরে দু হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা ! তুই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি ? ঘরে বয়ে এসে টাকা দিতে চাইল, দুশো টাকা, বাপের জন্মে কেউ একসঙ্গে অত টাকা আমায় দেয়নি, কত সোনা-দানা দেবে বলল, মেয়ের এত দেমাক, তাতেও মন উঠল না ? গিরিশ ঘোষের চন্নামেত্ত খেলেই তোর চলবে ? ওঁর কোনও মায়াদয়া নেই, তা তুই কি জানবি ? আজ মাথায় তুলে নাচবে, কাল ছুঁড়ে ফেলে দেবে ! একদিন এই গঙ্গামণিকেও গিরিশবাবু কোলে বসিয়েছিল, আজ চিনতে পারে না ! রূপ-গুণ থাকতে থাকতে গুছিয়ে নিবি, তা না। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলি...

নয়নমণি এ সব ভর্ৎসনায় কানও দিল না। গঙ্গামণি একটু থামতেই ফুরফুর করে হেসে সে বলল, ও দিদি, ওই রাজেনবাবু না ফাজেনবাবু লোকটা কী রকম ঘামছিল দ্যাখোনি ? এই শীতের মধ্যে...ঘরে নিশ্চয়ই ওর দজ্জাল বউ আছে...আর তোমার ওই নীলমাধববাবু, শিকারী বেড়ালের মতন খোঁচা খোঁচা গোঁপ...

গঙ্গামণির মুখ থেকে রাগ মুছে গেল, ছলছল করে এল চক্ষুদুটি। দৌড়ে এসে নয়নমণিকে বুকে জড়িয়ে ধরিয়ে বলল, তুই কী করে পারলি রে ? কী করে পারিস।

৮

ত্রিপুরা সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন শশিভূষণ, কিন্তু তাঁর যে সঙ্কল্প ছিল ইংরেজের রাজত্বে বসবাস করবেন না তাও বজায় রেখেছেন, তিনি থাকেন চন্দননগরে। ফরাসিরা ইংরেজদের চেয়ে উন্নততর শাসক নয়, কিন্তু ইংরেজদের সম্পর্কে শশিভূষণের জাতক্রোধ জন্মে আছে। ফরাসিরা স্থানীয় মানুষজনদের সঙ্গে প্রায় মেশেই না, ভারত সম্পর্কে তাদের আগ্রহ চলে যাচ্ছে, এখন তারা আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বেশি মন দিয়েছে। কঙ্গোতে তারা সম্প্রতি এত বড় একটা কলোনি পেয়ে গেছে, যার আয়তন ফ্রান্সের চেয়েও বড়।

বাড়িটি দোতলা, ঠিক নদীর ধারে না হলেও ওপরের বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়। গঙ্গা আর বাড়ির মাঝখানে রয়েছে এক প্রাচীন দুর্গের ভগ্নস্তূপ। শাসকদের ঔদাসীন্যে এ রকম ভগ্ন প্রাসাদ আরও দেখা যায়। মোরান সাহেবের বিখ্যাত বাগানবাড়িটিতে অনেকদিন ভাড়াটে জোটেনি, এখন পরিত্যক্ত, তাতে আগাছা গজিয়ে গেছে। সুন্দর বাগানটির অস্তিত্বই আর নেই, তবে কিছু কিছু গাছপালার আড়ালে দেখা যায় একটি দোলনা, সেটি রয়ে গেছে কোনওক্রমে, কেউ সেটা ব্যবহার করে না। মাঝে মাঝে হাওয়ায় আপনা আপনি একটু একটু দোলে।

প্রতিদিন সকালে শশিভূষণ নিজেই একটি নৌকো চালিয়ে চলে যান ওপারে। নৈহাটিতে তাঁর উদ্যোগেই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে তিনি পড়াতে যান। শিক্ষকতার নেশা তাঁর যায়নি। যদিও এই শিক্ষকতা তাঁর জীবিকা নয়। তিনি বেতন নেন মাত্র এক টাকা। কলকাতায় পারিবারিক সম্পত্তির নিজস্ব অংশ বিক্রি করে ভাইদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছেন শশিভূষণ। লক্ষাধিক টাকায় এক পাট কোম্পানির অংশীদার হয়েছেন, সেখান থেকে মাসে মাসে যে টাকা পান,

তাতে তাঁর স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

পূর্বে কখনও জলের ধারে বাস করেননি বলে শশিভূষণ নৌকো চালাতে জানতেন না। এমনকী সাঁতারেও পারদর্শী ছিলেন না। প্রথম প্রথম এখানে এসে নদী পারাপার করতেন ফেরি নৌকোয়। তখন বিকেলে ফেরার সময় দেখতেন, ওপারের ঘাটে একটি নৌকোয় বসে থাকত একা একটি তরুণী, তার হাতে বৈঠা। বহু লোকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকাত তরুণীটির দিকে, কিন্তু সে নির্বিকার। এক সময় হাতে একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হত একটি যুবক। নৌকোয় চেপে সে দাঁড়ে বসত। তারপর দুজনে জল ছপছপিয়ে চলে যেত চন্দননগরে।

মাঝিদের সাহায্য না নিয়ে ভদ্রশ্রেণীর এক নারী-পুরুষ যুগলকে প্রতিদিন নৌকো বাইতে দেখলে তো কৌতূহল হবেই। শশিভূষণ নিজে থেকেই যুবকটির সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তার নাম জগদীশচন্দ্র বসু, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স পড়ায়, নৈহাটি দিয়ে ট্রেনে কলকাতায় যাতায়াত করতে তার সুবিধে হয়। তার স্ত্রীর নাম অবলা হলেও সে অতি সপ্রতিভ মহিলা এবং বেশ সবলা, তরণী-চালনায় সেই বেশি পারদর্শিনী, চন্দননগর থেকে সে একা আসে। জগদীশের অনুরোধে শশিভূষণ মাঝে মাঝে ওদের নৌকোতেই ফিরতেন। জগদীশের সঙ্গে থাকত একটি বক্স ক্যামেরা, ফটোগ্রাফি বিষয়ে দুজনের আলোচনা জমে উঠত।

অবলাই একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি রোয়িং করতে জানেন না ?

শশিভূষণ লজ্জা পেয়েছিলেন। রোয়িং একটা সাহেবি ক্রীড়া, লর্ড পরিবারের ছেলেরাও অংশগ্রহণ করে, শশিভূষণ অনেক ছবি দেখেছেন, কিন্তু দিশি নৌকো বাওয়া যেন পেশাদার মাঝিদেরই কাজ। আসলে তো ব্যাপারটা একই। শশিভূষণের হাতে অবলা একটা বৈঠা দিয়ে বলেছিলেন, চেষ্টা করুন না। কয়েকদিনের মধ্যেই সড়গড় হয়ে যাবে।

কোনও নারীর কাছ থেকে পুরুষ একটা কিছু শিখছে, তাও নৌকো চালাবার মতন অদ্ভুত কাজ, কিছুদিন আগেও এ একেবারে অকল্পনীয়, অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল। এটাও একটা প্রমাণ যে যুগ বদলাচ্ছে।

সেই বসু-দম্পতির সঙ্গে শশিভূষণের বন্ধুত্ব হয়েছিল, কারণ তাদের তাঁর সঙ্গে চিন্তার সাযুজ্য ছিল। এখন তারা চন্দননগর ছেড়ে চলে গেছে, শশিভূষণের আর বিশেষ বন্ধু নেই এখানে। বেশি লোকের সঙ্গে তিনি মন খুলে মিশতে পারেন না। পরিচিতের সংখ্যা বেশি হলে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়। বই নিয়ে সময় কাটাতেই শশিভূষণ বেশি আনন্দ পান। প্রতিদিন কয়েকঘণ্টা স্কুলে পড়িয়ে আসেন, বাকি সময় থাকেন বাড়িতেই, কলকাতার সঙ্গে তাঁর প্রায় যোগাযোগ নেই-ই বলতে গেলে। মাসে একবার শুধু তাঁর কোম্পানির বোর্ড মিটিং-এ যোগ দিতে কলকাতায় যেতে হয়। তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে যান, সেখানকার লোকই নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয়।

সেইজন্যই এক ছুটির দিনের অপরাহ্ণে ভৃত্যের মুখে যখন শুনলেন যে বেশ বড় জুড়িগাড়ি করে একজন দর্শনার্থী এসেছে তাঁর কাছে, তিনি বেশ অবাক হলেন। এখানে কে আসবে তাঁর কাছে। শশিভূষণ সদ্য দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেছেন, এ রকম তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু আজ দুপুরে বেশ গুরুভোজন হয়ে গেছে। একটি জেলে বড় একটি ইলিশ মাছ গছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে গঙ্গায় এত ইলিশ ওঠে যে ক্রেতা পাওয়া যায় না। আগে শশিভূষণের ইলিশ মাছে বিশেষ রুচি ছিল না। এত তৈলাক্ত মাছ তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু গঙ্গার ধারে বাস করে ইলিশ মাছ না খেলে কি চলে ?

গায়ে বেনিয়ান চাপিয়ে, চটি ফটফটিয়ে দোতলা থেকে নেমে এসে বসবার ঘরে আগন্তুককে দেখে শশিভূষণ আরও অবাক হলেন। ফিনফিনে কাঁচি ধুতি পরা, গায়ে মুগার চাদর জড়ানো, পায়ের ওপর পা তুলে একটা সোফায় বসে আছেন ত্রিপুরার মহারাজার সচিব রাধারমণ ঘোষ। মাথার চুলে পাউডারের ছোপ লেগেছে, চোখে এখন সোনালি ফ্রেমের চশমা, এ ছাড়া তাঁর আর কোনও পরিবর্তন হয়নি।

শশিভূষণকে দেখে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার, নমস্কার, শুভ অপরাহ্ণ, সিংহমশাই ! আমার এ রকম বিনা নোটিসে আগমনে দোষ নেবেন না। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে বিষ্মান,

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যারা হিতোপদেশ দেয় আর যারা ভ্রাম্যমাণ পথিক, এই তিনজনকে অতিথি বলে। বিদ্বান আমি মোটেই নই, তেমন কিছু ভ্রমণও করি না, তবে হিতোপদেশ দিতে আমার কার্পণ্য নেই, সেই হিসাবে আমাকে অতিথি বলা যায় নিশ্চয়ই ? তোমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটালাম নাকি ?

শশিভূষণ ঈষৎ আড়ষ্ট গলায় বললেন, না, আপনি দয়া করে আমাকে স্মরণ করেছেন, এতেই আমি ধন্য হয়েছি। কিন্তু আপনি কি আমাকে হিতোপদেশ দিতে এসেছেন নাকি ?

রাধারমণ বললেন, দিলেই যে তুমি শুনবে, তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে ? ভাল ভাল উপদেশের এই এক সুবিধে, কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক, যত্রতত্র বিলিয়ে দেওয়া যায়, পয়সা তো খরচ হয় না। তা তোমার কী সংবাদ বলো ! শুনলাম, কলকাতা ছেড়ে তুমি এই ফরাসডাঙায় নির্বাসনে আছ ?

শশিভূষণ বললেন, চন্দননগর একটি জনবহুল শহর, এখানে কি কেউ নির্বাসনে থাকতে পারে ?

রাধারমণ বললেন, নির্বাসন কাকে বলে ? নির্ পূর্বক বস্ প্লাস ণিচ্ প্লাস অনট্ ভাব। অর্থাৎ কোনও অপরাধের জন্য কারুকে দেশান্তরিত করা হয়েছে, তারপর সে কোনও নগরেও থাকতে পারে, জঙ্গলেও থাকতে পারে।

শশিভূষণ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, ঘোষমশাই, আপনি দেখছি এক চলন্ত অভিধান। কোনও অপরাধের জন্যই আমাকে কেউ বহিষ্কার করেনি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।

রাধারমণ এ বার সজোরে হেসে উঠে বললেন, আরে চটছ কেন, চটছ কেন ? তুমি বলেছিলে তুমি ইংরেজ রাজত্বে থাকো না, তাই ত্রিপুরা গিয়েছিলে, তা কি আমার মনে নেই ? তবে নির্বাসন অনেক সময় স্বেচ্ছা নির্বাসন হতে পারে। কেউ অভিযুক্ত করেনি, নিজের মনে একটা অপরাধ বোধ থেকেও কেউ দেশ ছেড়ে চলে যায়।

শশিভূষণ বললেন, আমার মনে কোনও অপরাধবোধও নেই। কী অপরাধ করেছি আমি ?

রাধারমণ বললেন, তুমি দুম করে মহারাজের চাকরি ছেড়ে দিলে, মহারাজকে একবার মুখের কথাটাও জানালে না, সার্কুলার রোডের বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেলে, এটাকে কি ছোটখাটো অপরাধ বলা যায় না ?

শশিভূষণ বললেন, কীসের অপরাধ ? আমার চাকরির কোনও শর্ত ছিল না। মহারাজ ইচ্ছে করলে, তাঁর মেজাজ খারাপ হলে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও কর্মচারীকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। সেইরকম আমরাও যে কোনও মুহূর্তে ছেড়ে চলে আসতে পারি। তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি বটে, চিঠি লিখে জানিয়ে এসেছি। রাজবাড়ির কোনও জিনিস আমি সঙ্গে আনিনি, বরং উল্টে বলা যায়, আমি এক মাসের বেতনও নিইনি।

রাধারমণ বললেন, সেটাও একটা অপরাধ। কেন মাইনেটা নাওনি ? মহারাজকে তুমি ঋণী রাখতে চাও ? তোমার টাকাটা কোথায় পাঠানো হবে, তাও আমরা বুঝতে পারিনি। যাক গে, যাক সে কথা। মহারাজ এখনও তোমার কথা মনে রেখেছেন। প্রায়ই তোমার কথা বলেন। তিনি তোমাকে প্রকৃতই স্নেহ করতেন। আচ্ছা শশী, তুমি হঠাৎ অমন ভাবে চাকরি ছেড়ে পালালে কেন বলো তো।

শশিভূষণ বললেন, আপনি জানেন না ? এক সময় মহারাজের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে আমার মনে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব এসেছিল। তিনি ছিলেন আমার প্রতিপক্ষ। এই রকম অবস্থায় আনুগত্য থাকে না। তখন চাকরি করে যাওয়াটাই অন্যায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অর্থের প্রয়োজনে আমি চাকরি করতে যাইনি।

রাধারমণ বললেন, তুমি অতি আহাম্মক। ত্রিপুরায় অতদিন ছিলে। রাজা-রাজড়াদের স্বভাব বোঝনি ? সেই ছুঁড়িটাকে তুমি সার্কুলার রোডের বাড়িতে এনে রেখেছিলে কোন বুদ্ধিতে ? যদি রূপের একটু চমক থাকে, তার ওপর যদি গান গাইতে পারে, মহারাজের নজরে সে পড়লে তাকে মহারাজ ছাড়বেন কেন ? তোমার যদি মেয়েটার ওপর আসক্তি জন্মে থাকত, তাকে অন্য কোথাও

রাখতে পারতে না ? তা হলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

শশিভূষণ একটা প্রগাঢ় নিশ্বাস ফেলে বললেন, সে অনেক জটিল ব্যাপার। প্রথমে কিছু বোঝা যায়নি !

রাধারমণ বললেন, মহারাজ কিন্তু আজও তাকে ভুলতে পারেননি ! এখনও হঠাৎ হঠাৎ সেই গান জানা মেয়েটির প্রসঙ্গ ওঠে, আর তখন মহারাজের চোখে ক্রোধের বিদ্যুৎ খেলে যায়।

শশিভূষণ বললেন, এতদিন পরেও ? মহারাজের জীবনে কি নারীর অভাব আছে ?

রাধারমণ বললেন, বাঘ যখন কোনও শিকার ধরে, তাকে তো হজম করে ফেলে, তারপর আর তার কথা মনে রাখে না। কিন্তু যে শিকার হাতছাড়া হয়ে যায়, থাবা উদ্যত করলেও সরে পড়ে, সে বাঘের অহমিকায় দারুণ আঘাত দিয়ে যায়। বাঘ তাকে ভুলতে পারে না। মনে মনে হলেও তাকে সারাজীবন তাড়া করে ফেরে ! সে মেয়েটা এখন কোথায় ?

শশিভূষণ হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠে বললেন, কেন ? আপনি দেখতে এসেছেন তাকে আমার এখানে লুকিয়ে রেখেছি কি না ? সেই মতলবেই আপনার আগমন ?

রাধারমণ হাত তুলে বললেন, আহা-হা-হা, তা নয়, তা নয় ! তুমি এখনও ওই ব্যাপারে খুব সেনসিটিভ হয়ে আছ দেখছি ! সে মেয়েটা যে তোমার বাড়িতে নেই, তা আমি ভাল করেই জানি ! এমনিই অলস কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায় !

শশিভূষণ বললেন, আমি জানি না। আর জানতেও চাই না ! হয় সে কোনও ক্লেদাক্ত নরকে তলিয়ে গেছে, অথবা অপঘাতে মরেছে।

রাধারমণ বললেন, হরিণের নিজের গায়ের মাংস আর মেয়েদের রূপ-গুণ, এই-ই তাদের শত্রু !

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন দু'জনে।

পাশের বারান্দা দিয়ে একজন দাসী একটি ফুটফুটে শিশুর হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরের উদ্যানে খেলা করার জন্য অধীরতায় লাফাচ্ছে শিশুটি।

সেদিকে চেয়ে রাধারমণ জিজ্ঞেস করলেন, এই বুঝি তোমার বড় ছেলে ?

শশিভূষণের আবার ভুরু উঁচুতে উঠে গেল। সবিস্ময়ে বললেন, আপনি জানলেন কী করে যে আমার একাধিক সন্তান ? ঘোষমশাই, আপনি কি দৈবজ্ঞ ?

রাধারমণ গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন, জানি, জানি, সব জানি। দৈবজ্ঞ টৈবজ্ঞ কিছু না। তোমার পেছনে আগাগোড়া চর লাগানো ছিল, তুমি জানতে না ? তোমার বিবাহ হয় ইংরাজি সাতাশি সালে, ছাতুবাবুদের বাড়ির এক কন্যার সঙ্গে। বিবাহ বাসর বসেছিল শোভাবাজারে। সেখানে নিমন্ত্রিতদের ভিড়ের মধ্যে মিশেছিল আমাদের দুটি চর। তুমি সেই ভূমিসুতা নামের ছুঁড়িটাকেই বিয়ে করছ কিনা, মহারাজ তা জানতে চেয়েছিলেন। তোমরা বনেদি কায়েত, বিয়ের পরেও একটি রক্ষিতা পোষণ করা তোমাদের প্রথার মধ্যেই পড়ে বলতে গেলে। সেইজন্য পরেও কিছুদিন নজর রাখা হয়েছিল তোমাদের গতিবিধির ওপর। বিবাহের পরের বছরই তোমার একটি পুত্র সন্তান জন্মায়, আর একটি মেয়ে হয়েছে বছর দেড়েক আগে, ঠিক কিনা ?

শশিভূষণ উত্তেজিতভাবে বললেন, তার মানে কি এখনও আমি নজরবন্দি ? এ অন্যায়, ঘোর অন্যায় ! আমি পুলিশে খবর দেব !

রাধারমণ বললেন, নাঃ এখন আর কেউ নেই। গতবছর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। শশী, এত বছর তো মহারাজের সঙ্গে রইলাম, মানুষটা কিন্তু অন্যরকম। বাঘের সঙ্গে ওঁর তুলনা দিয়েছি বটে, কিন্তু ওঁর মধ্যে দয়া-মায়া-করুণাও যথেষ্টই আছে। ওই মেয়েটি মহারাজের অঙ্কশায়িনী হতে চায়নি, ভয় পেয়েছিল, তো ঠিক আছে, সে যদি মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইত, মহারাজ নিশ্চয়ই তাকে নিষ্কৃতি দিতেন। এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। তা হলে আর কোনও ঝামেলাই হত না, মেয়েটাও বেঁচে যেত।

শশিভূষণ বললেন, ওসব কথা আর এখন বলে কী হবে ? আমি আর ওসব এখানে ভাবতে চাই না।

রাধারমণ বললেন, তবে এবার উঠি। তোমার বাড়িতে বুঝি চায়ের পাট নেই? অতিথি সৎকারের কোনও ব্যবস্থাও রাখনি বোঝা যাচ্ছে।

শশিভূষণ লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বললেন, আরে ছি ছি ছি ছি। আপনাকে দেখে আমি এমন অবাক হয়েছিলাম যে চা-জলখাবারের কথা মনেই পড়েনি। আরে বসুন, বসুন। চা-তো খাবেনই, আমিও বিকেলের চা খাইনি। আর আপনার যদি ফেরার তাড়া না-থাকে, তা হলে রাতটা অনুগ্রহ করে এই গরিবের বাড়িতে থেকেও যেতে পারেন।

উঠোনে গিয়ে চায়ের কথা হাঁক দিয়ে জানিয়ে এসে আবার ফিরে এসে বললেন, ঘোষ মশাই, একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খচখচ করছে। বলি? আপনার মতন মানী লোক এতদূর উজিয়ে এসে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন, ঠিক কী জন্য, তা এখনও বুঝলাম না।

রাধারমণ বললেন, উদ্দেশ্য তো কিছু নেই। তোমার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়, একসময় অনেক সুখ-দুঃখের কথা হত, তাই ভাবলাম, একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

শশিভূষণ বললেন, আপনি ব্যস্ত মানুষ, রাজকার্যের কত রকম ভার আপনার মাথার ওপর, শুধু এই জন্যই এসেছেন, তা ঠিক বিশ্বাস হয় না। সাত বছরের মধ্যে আর কখনও মনে পড়েনি, হঠাৎ এবারেই মনে পড়ল?

রাধারমণ নিজের থুতনিতে হাত বুলোতে বুলোতে কয়েক মুহূর্ত স্থির চক্ষে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, শশী, ঈশ্বরের কৃপায় তুমি রক্ষা পেয়েছ। ওই অলক্ষ্মী মেয়েটাকে বিয়ে করলে তুমি হয়তো কোনও সময় খুন হয়ে যেতে! বা সে রকম কিছু না ঘটলেও সারাজীবন তোমার অশান্তি লেগে থাকতই। নৃত্য-গীত পটীয়সী মেয়েরা অন্তঃপুরে মানায় না, সেইজন্যই পুরাকালে তাদের বারবনিতা বানিয়ে দেওয়া হত। সে গেছে, আপদ গেছে। এখন তুমি পাল্টি ঘরে বিয়ে করেছ, দুটি ফুটফুটে সন্তান হয়েছে, এই তো বেশ ভাল। সংসারে মন বসেছে। আমি কলকাতায় এসেছি, কিছু কাজ নিয়ে তো বটেই, তা ছাড়া মহারাজ শীঘ্রই কলকাতায় আসবেন, তার একটা প্রস্তুতি দরকার। মহারাজের শরীর ভাল নয়, জানো। প্রায়ই রোগে ভুগছেন। এদিকে রাধাকিশোর আর সমরেন্দ্র এই দুই কুমারের মধ্যে আকচা-আকচি লেগে গেছে, কুমার সমরেন্দ্র সিংহাসনের ওপর তার পুরনো দাবি এখনও ছাড়েনি। মহারাজ কী করে দু'দিক সামাল দেবেন জানি না।

শশিভূষণ বললেন, আমি যতটা দেখেছি, ওখানে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র চলতেই থাকবে।

রাধারমণ বললেন, হুঁ। এদিকে তো ইংরেজরা থাবা বাড়িয়ে আছেই। মহারাজ যদি হঠাৎ চোখ বোজেন, সিংহাসন নিয়ে কুমারদের মধ্যে লড়াই লেগে যায়, তা হলে ইংরেজ সেই ছুতোয় ঠিক ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাস করে নেবে। মহারাজের রাজকার্যে বিশেষ মন নেই, ফোটোগ্রাফি আর কবিতা লেখা নিয়ে মেতে আছেন, এ সময় উপযুক্ত বিশ্বাসী লোকদের বিভিন্ন দিকে হাল ধরা দরকার। সে রকম লোক পাওয়া যায় কোথায়? তাই বলছিলাম কী শশী, তুমি আবার ফিরে এস না কেন। মহারাজের তোমার ওপর কোনও রাগ নেই, ফোটোগ্রাফির প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, ছবি তোলা ভাল বুঝত বটে সেই একটি লোক, শশী মাস্টার। তুমি আসবে।

শশিভূষণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, এই কথা? নাঃ ঘোষ মশাই, কোনও চাকরিতেই আমি আর ফিরে যাব না।

রাধারমণ বললেন, তুমি সচিবের পদ পাবে। তুমি ইচ্ছে করলে ত্রিপুরা বা কলকাতায় যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারো...

শশিভূষণ বললেন, প্রশ্নই ওঠে না। যাক ওসব কথা। আমি বেশ আছি। এই নিরিবিলিতেই আমি থাকতে চাই।

রাধারমণ বললেন, বেশ! তুমি ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে কোনও কাজ করতে চাও না, ত্রিপুরার বিপক্ষেও কিছু করবে না আশা করি?

শশিভূষণ বললেন, সে প্রশ্ন উঠছে কী করে?

রাধারমণ বললেন, কৈলাস সিংহের সঙ্গে তোমার দেখা হয়। সে এ বাড়িতেও এসেছে দু'বার।

কৈলাস আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে।

শশিভূষণ বললেন, তবে যে বললেন, আমার পেছনে এখন আর চর নেই? আমার বাড়িতে কে আসে না-আসে, তা নিয়ে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে? এখানকার ব্রাহ্মদের সভায় কৈলাসবাবু এসেছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বাড়িতে ডাকব না? এটা তো সামাজিক ভদ্রতা। এ কথা জেনে রাখুন, কৈলাসচন্দ্র মোটেই ত্রিপুরার শত্রু নন। তিনি বর্তমান মহারাজকে পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁর মন-প্রাণ পড়ে আছে ত্রিপুরায়।

রাধারমণ এবার কঠিন গলায় বললেন, শশী, তোমার হিতের জন্যই বলছি, কৈলাসের সঙ্গে সংস্রব রেখো না। সে রাজকুমারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাবার তালে আছে। তা আমরা সহ্য করব না।

শশিভূষণও তীব্র কণ্ঠে বললেন, এটাই বুঝি আপনার হিতোপদেশ?

রাধারমণ চলে যাবার পর শশিভূষণ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহকে নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। রাজকুমারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগুক বা না লাগুক তাতে শশিভূষণের কী আসে যায়? কিন্তু রাধারমণ ভূমিসুতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন।

শশিভূষণ তো তাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। সে হারামজাদি এক বিষকন্যা, শশিভূষণের জীবনটা বিষিয়ে দিয়েছিল প্রায়। তাকে তিনি মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। কিন্তু মনের দর্পণের ছায়া কি ইচ্ছে করলেই মোছা যায়? কোন অতল গভীরে রয়ে যায়। না হলে বুকটা এত তোলপাড় করছে কেন?

ভূমিসুতার অন্তর্ধানের পর শশিভূষণের মাথায় প্রবল যন্ত্রণা হতে শুরু করেছিল। তার সেই পুরনো রোগ। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কাহিনী জেনে তিনি বলেছিলেন, শুধু ওষুধে কোনও কাজ হবে না, তুমি অবিলম্বে বিয়ে করো। তোমার এখন শরীর ভরা খিদে, সে খিদে না-মেটালে এ রোগ সারবে না। হাতের কাছে তোমার লোভের জিনিস সন্দেশ যদি না পাও, যদি আম থাকে তা হলে আমই খাও। কিছু একটা খাও!

ডাক্তার সরকারই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন, এক মাসের মধ্যে শশিভূষণের বিবাহ হয়ে গেল। মনোরমা ছিলেন বালবিধবা। মহেন্দ্রলাল ও আরও অনেকের মত এই যে কোনও বিপত্নীক দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করলে কোনও বিধবাকেই গ্রহণ করা উচিত। শশিভূষণের তাতে কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু বিধবা-বিবাহকে কোনও বীরত্বের ব্যাপার মনে করা কিংবা তাই নিয়ে ঢাক-ঢোল পেটানো তাঁর পছন্দ নয়, বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বিনা আড়ম্বরে।

দশ বছর বয়েসে বিধবা হয়েছিল মনোরমা, পুনর্বিবাহ হল একুশ বছর বয়েসে। এতদিন সে বাপের বাড়িতে থেকে সব রকম নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করে এসেছে। আবার তার বিয়ে হল বটে, কিন্তু বৈধব্যের খোলস ছেড়ে সে যেন আর বেরিয়ে আসতে পারে না। সে অন্তঃপুরে সুগৃহিণী, স্বামীর নর্ম সঙ্গিনী সে হতে পারে না। কাব্যপ্রিয়, রোমান্টিক শশিভূষণ পূর্ণিমা রাতে স্ত্রীকে নিয়ে গঙ্গায় নৌকা-বিহার করতে চান, মনোরমা তাতে রাজি নয়। গান জানে তবু উচ্চকণ্ঠে গান করে না মনোরমা। পড়তে জানে, বই পড়ায় উৎসাহ নেই।

ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে শশিভূষণ পরিতৃপ্ত। মেয়েটি খুবই ছোট, এখনও কথা বলতে শেখেনি। ছেলের নাম অভিমন্যু, সে এখন সাড়ে পাঁচ বছরের ছটফটে বালক। শশিভূষণ তার এই আত্মজকে মনের মতন করে গড়তে চান। শুধু লেখাপড়া শেখা নয়, তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হবে।

কোনও কোনও দিন খুব ভোরে কিংবা বিকালের দিকে শশিভূষণ ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরোন। নদী, আকাশ, গাছপালা, পশু-পাখি, মানুষ চিনতে শেখান তাকে। নিজে খুব যে উপদেশ বা শিক্ষা দেন তা নয়, অভিমন্যুর কৌতূহল জাগ্রত করে তোলেন, সে নানা রকম প্রশ্ন করে, তিনি উত্তর দেন। মায়ের চেয়ে বাবার সঙ্গেই বেশি ভাব অভিমন্যুর, বেড়াতে বেরুলে সে আর বাড়ি ফিরতে চায় না সহজে।

একদিন অভিমন্যুকে নিয়ে শশিভূষণ বেড়াতে বেড়াতে চলে এলেন-মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির দিকে। এই অঞ্চলটি বেশ নির্জন, অনেক পাখি দেখা যায়। শশিভূষণ নিজেও সব পাখি চেনেন

না। ছেলের কাছে তা অকপটে স্বীকার করতে লজ্জা নেই। একটা ইষ্টিকুটুম পাখি দেখে অভিমন্যু জিজ্ঞেস করল, বাবা ওটা কী পাখি? শশিভূষণ বললেন, নামটা তো জানি না। দু'একবার আগে দেখেছি বটে, দ্যাখ কী সুন্দর পালকের রং, কতখানি ল্যাজ, অবাক-অবাক চোখ, অন্য পাখিরাও বোধহয় এই পাখিটাকে চেনে না—

ঘাটের সিঁড়িগুলো ভাঙা, সেখানে একটা নৌকা বাঁধা। শশিভূষণ ভুরু কুঞ্চিত করে তাকালেন। এক অতি রূপবান যুবা-পুরুষ আগাছা ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে বাগানের দিকে। সাপ-খোপের ভয়ে এখানে সহসা কেউ আসে না। শশিভূষণের অবশ্য সে ভয় নেই, কিন্তু এই অচেনা আগন্তুক কে? সুদীর্ঘ, সুগঠিত শরীর, পায়ে মোজা ও বুট জুতো, প্যান্টালুন, ওয়েস্ট কোট ও জ্যাকেট পরা, গ্রিক ভাস্কর্যের মতন কাটা-কাটা নাক-চোখ-ওষ্ঠাধর, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল ললাট, সারা মুখে ভ্রমরকৃষ্ণ সরু দাড়ি, মাথার চুল লুটিয়ে পড়েছে ঘাড় পর্যন্ত। আর একটু কাছে গিয়ে শশিভূষণ চিনতে পারলেন। এ তো কবীন্দ্র রবীন্দ্রবাবু। চুঁচড়োর কাছে গঙ্গাবক্ষে এক বজরায় থাকেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর পুত্র-জামাতাগণ প্রায়ই দেখা করতে আসে। শশিভূষণের মনে পড়ল অনেক বছর আগে কবিবর রবীন্দ্রবাবুকে এ বাড়িতেই তিনি প্রথম দেখেছিলেন। সে দিন আর আজ কত তফাৎ।

রবীন্দ্র শশিভূষণের উপস্থিতি টের পায়নি। সে উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল এদিক-ওদিক। এক-একটা গাছ স্পর্শ করে। একটু থমকে দাঁড়ায়। একটা কদমগাছের তলায় গিয়ে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দোলনাটার কাছে গিয়ে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দের মতন। তার চক্ষু দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

শশিভূষণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রবীন্দ্রবাবু কোন্ স্মৃতিভারে আপ্লুত তা তিনি জানেন না। কিন্তু তাঁর নিজেরই যেন এক পলকের জন্য মনে হল, এমনকী দেখতেও পেলেন, ওই দোলনায় বসে আছে এক নারী। অবিকল ভূমিসূতার মতন।

৯

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগোতে এক বিরাট বিশ্বমেলার আয়োজন করা হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশের শিল্পসম্ভার, বাণিজ্যসম্ভার, বস্ত্র ও ধাতুদ্রব্য, সব মিলিয়ে এক মহা প্রদর্শনী, তার সঙ্গে রয়েছে বহুবিধ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা।

এই বিশ্বমেলারই এক অংশে এক ধর্ম সম্মেলন আহূত হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা সেখানে এক মঞ্চে বসে মত বিনিময় করবেন। বিশ্বমেলার চেয়েও এই ধর্মসভা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ধর্ম মানেই রেষারেষি, ধর্ম মানেই পরমত অসহিষ্ণুতা। যদিও সব ধর্মেই আছে এক পরমেশ্বরের কথা এবং মানুষ মাত্রেই সেই পরমেশ্বরের সন্তান, কিন্তু তা হলে যে আলাদা আলাদা ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখাটাই অর্থহীন, তা ধর্মীয় নেতাদের মাথায় ঢোকে না। পৃথক পৃথক ধর্মের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে একটি মাত্র মানবধর্ম প্রচার করলে যে এতগুলি ধর্মগুরুর গুরুগিরি ঘুচে যায়। তাই প্রকৃতপক্ষে ছোট-বড় মিলিয়ে পৃথিবীতে এখন অনেকগুলি ধর্মমত, তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বরের সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত। এক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা অন্য ধর্মগুলিকে নস্যাৎ করার জন্য কাল্পনিক অভিযোগ, অসত্য এমনকী কুৎসিত, কদর্য, হিংস্র ভাষা প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করে না।

প্রধান ধর্মগুলির উৎস ও বিস্তার প্রাচ্য ভূমিতে। আবার ধর্মের বহু রকম ব্যভিচার এবং ধর্মের নামে বহুবার মনুষ্য হত্যার রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে এই প্রাচ্য ভূমিতেই।

প্রথম দিকে সব ধর্মই ছিল টোটেম বা মূর্তিপূজক। গ্রিস, রোম, ভারতের এই মূর্তিপূজা শিল্পকলার চরম উৎকর্ষে পৌঁছয়। গৌতম বুদ্ধ এসে সমস্ত মূর্তির কল্পনা ধূলিসাৎ করলেন, তিনি মানুষের আত্মিক উন্নতির এমন এক উচ্চমার্গের দার্শনিক ভাবনার প্রচার করলেন, যাতে ঈশ্বরেরও কোনও স্থান নেই। কিন্তু এত উচ্চমার্গের চিন্তা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে পারবে কেন? বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্ম আস্তে আস্তে ভাগ হতে লাগল, তার মধ্যে ঢুকে পড়ল তন্ত্রমন্ত্র এবং বকলমে মূর্তিপূজা। ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই চলল কিছুকাল, তারপর বৌদ্ধরা পাড়ি দিল দূর প্রাচ্যে, চিন-জাপানে। আর হিন্দুরা ভারতকেই মনে করে মহাভারত তথা নিজস্ব ভুবন, তার বাইরে কোথায় কী ঘটছে সে খবরও রাখে না। প্রথম তারা রূঢ় আঘাত পেল, যখন আরব দেশ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে ভারতভূমিতে ঢুকে পড়ল মুসলমানেরা।

রাজশক্তির সমর্থন না থাকলে ধর্ম টেকে না। সাধারণ মানুষের ধর্মের প্রতি ভক্তির চেয়ে ভয়ই বেশি থাকে। সব ধর্মেরই প্রধান পতাকা হচ্ছে তলোয়ার কিংবা বন্দুক। মুসলমানদের কাছে হিন্দু রাজারা পদানত হবার পর থেকেই হিন্দু ধর্মের অবনতি হতে থাকে। হিন্দু ধর্ম এমনই হীনবল হয়ে পড়ে যে শেষপর্যন্ত আশ্রয় নেয় রান্নাঘরে। অসুস্থ লোক যেমন এটা খাব না, ওটা খাব না বলে, তেমনি হিন্দু ধর্মের নেতাদের মুখে শুধু শোনা যায়, এর হাতের ছোঁয়া খাব না, ওর হাতের ছোঁয়া খাব না। আমিষ কিংবা পেঁয়াজ খেলেই ধর্ম গেল।

গতিবেগ ও বারুদের জোরে মুসলমানেরা অধিকাংশ প্রাচ্য দেশ তো বটেই, ইওরোপকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। মহা শক্তিশালী অটোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল এ দিকে স্পেন, ও দিকে রাশিয়ায়। তাদের অস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারে না কেউ, অস্ত্রধারীদের পিছে পিছে আসে মোল্লাতন্ত্র, প্রথমে লুণ্ঠন, তারপর ধর্মপ্রচার।

রোমান সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ফলে খ্রিস্টানরা পিছিয়ে পড়ছিল ক্রমশ, নিজেদের গণ্ডি ছেড়ে বেরোতে পারেনি, মধ্যযুগ পার হবার পর তারা আবার জাহাজ সাজাল। বাণিজ্যতরীর সঙ্গে সঙ্গে রণতরী। মুসলমানরা স্থলপথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নৌযুদ্ধের দিকে তারা মনোযোগ দেয়নি বিশেষ। জল বনাম স্থলের যুদ্ধে ক্রমশ বিজয়ী হয়ে উঠতে লাগল খ্রিস্টানরা। শুধু যুদ্ধ নয়, বড় বড় জাহাজ অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল অজানার অভিযানে, আবিষ্কৃত হল বিশাল বিশাল মহাদেশ, যেখানে স্বর্ণ ও শস্যের সম্ভাবনা অফুরন্ত। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমানেরা সে সব মহাদেশের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করেনি।

বাণিজ্যে ও যুদ্ধে একাধিপত্য বিস্তার করার পর খ্রিস্টানরা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে লাগল খ্রিস্ট ধর্মের বাণী। মুসলমানদেরই মতন তারা ক্রীতদাসদেরও নিজেদের ধর্মে দীক্ষা দিতে দ্বিধা করে না। বর্তমান শতাব্দীতে মুসলমানরা দিকে দিকে পরাজিত হয়ে মাথা নিচু করে আছে, আর খ্রিস্টানদের কামানের গোলার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে বাইবেল হাতে পাদ্রিরা। রাজশক্তির ওপর সওয়ার হয়ে তারা জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছে, জগতে খ্রিস্টানদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, আর সব ধর্মের লোকেরা পাপী ও অধঃপতিত।

এই রকম অবস্থায় শিকাগোর সর্ব ধর্ম সম্মেলন অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। একই মঞ্চে খ্রিস্টধর্মের গুরুদের পাশে অন্য ধর্মের প্রবক্তাদের স্থান দেওয়ার অর্থ তো সেই সব ধর্মের গুরুত্বও স্বীকার করে নেওয়া। নিজেরা পয়সা খরচ করে খ্রিস্টানরা তা করতে যাবে কেন? ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ তো এই প্রস্তাব শুনেই বলে উঠেছিলেন, না, না, আমি যাব না। ওই সব নেটিভরা, হিদেনরা, ওরা আমাদের চাকর বাকরের মতন, ওদের সঙ্গে এক জায়গায় বসলেই তো স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, ওরা আমাদের সমান।

আমেরিকায় এই গোঁড়ামি কিছুটা শিথিল হবার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশের মানুষ ধন-ঐশ্বর্যে সব জাতকে ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন উদ্ভাবনেও এরা অগ্রণী। এত বড় একটা দেশে বসতি স্থাপন করতে এসে চাষ-বাস, খনি খোঁড়া, দূরপাল্লার যাতায়াতের ব্যাপারে যখনই তারা কোনও অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই চরম

অধ্যবসায়ে তারা কিছু না-কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করে ফেলছে। তারপর সেই সব যন্ত্রপাতির পেটেন্ট নিয়ে বিক্রি করছে অন্য দেশে। টমাস আলভা এডিসন নামে একটা মুখচোরা লোক যেন জাদুকর, এর মধ্যে কত কী যে আবিষ্কার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। একটা অতি পাতলা কাচের গোলাকার জিনিস, তার মধ্যে সরু সরু তার, সেই জিনিসটায় এমন আলো জ্বলে ওঠে যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আগুন নেই, অথচ আলো? বিদ্যুৎ! যারা দেখে, তারাই হতবাক হয়ে যায়। আকাশের বিদ্যুৎ বন্দি হয়েছে ওইটুকু একটা ভঙ্গুর কাচের গোলাকার জিনিসে! প্রমিথিউসের আগুন চুরি করে আনার চেয়েও এ যেন আরও বড় কৃতিত্ব। এই আলো বহু ঘরের কোণের অন্ধকার দূর করে দিয়েছে।

হঠাৎ এত অর্থ ও ঐশ্বর্যে বলীয়ান হবার ফলে অধিকাংশ আমেরিকান হয়ে উঠেছে ভোগবাদী। ধর্মের অত কড়াকড়ি নিয়ে মাথা ঘামাতে তাদের ভাল লাগে না। ম্যাজিক, ভূত-প্রেত, ডাকিনী নৃত্য, মৃতের পুনরুত্থান, পূর্বজন্ম, পরজন্ম এই সব এখন অনেককে আকৃষ্ট করেছে। শিক্ষিত সমাজ, যারা নানা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো শুরু করেছে, তারা ধর্মের অনুশাসনের বদলে দর্শনের দিকটা সম্পর্কে বেশি আগ্রহী, তারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, বিশেষত বৌদ্ধদের শাস্ত্র পড়ে বিস্মিত হয়ে ভাবতে শুরু করেছে যে এত উচ্চমার্গের চিন্তা অন্য ধর্মে থাকতে পারে? ডারউইন ও তার অনুগামীরাও শিক্ষিত খ্রিস্টানদের মনে একটা জোর আঘাত দিয়েছে। বাইবেল অভ্রান্ত নয়, মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই, এটা যে প্রমাণসিদ্ধ। তা হলে দেখা যাক, অন্য ধর্মে কী বলে!

আমেরিকানদের উন্নতির মূলে অন্য দেশে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ নয়, বাণিজ্য। তাই ধর্ম নিয়ে বাণিজ্য করার কাজেও লেগে আছে এ দেশের বহু মানুষ। নানা রকম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে তারা চাঁদা তোলে বিদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। ধনী আমেরিকানরা মনে করে, নিয়মিত গির্জায় যাবার বদলে এই সব প্রতিষ্ঠানকে মোটা চাঁদা দিয়ে দিলেই তো বেশ ধর্মের কাজ হল! এ ব্যাপারে মহিলাদের উৎসাহ বেশি। বিবাহ সম্পর্ক ছাড়াও পুরুষ সংসর্গে যদি কোনও পাপ হয়, ধর্মপ্রচারের জন্য অনেক টাকা দিলে সে পাপ কেটে যাবে। এই ধর্ম ব্যবসায়ীরাও পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে যে কোনও প্রকারে গরিব, অসহায়, নির্যাতিত মানুষদের খ্রিস্ট ধর্মের আলো পৌঁছে দেয়। যদি এক হাজারটা অন্ধকারাচ্ছন্ন এ রকম মানুষকে খ্রিস্টান করা যায়, তা হলে পরের বছরে তা দেখিয়ে চাঁদা তোলা যাবে অনেক বেশি। সেই টাকায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের নিজেদের আরাম-বিলাসের উপকরণ জুটবে ঢের। এই ধরনের ধর্ম ব্যবসায়ীরাও শিকাগোর সর্বধর্ম সম্মেলন সমর্থন করেছে। বিশেষ মতলবে। দূর দূর দেশ থেকে অন্য ধর্মের কালো-খয়েরি-হলদে মানুষগুলি এখানে এসে ইংরিজি ভাষায় কী এমন মহৎ কথা শোনাতে পারবে? বরং এই মঞ্চেই আবার প্রমাণিত হবে, খ্রিস্ট ধর্মই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। খ্রিস্ট ধর্মের জয়-জয়কার পড়ে যাবে। তাতে আমেরিকান মিশনারিদেরই চাঁদার পরিমাণ বাড়বে।

আহ্বান জানানো হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য ধর্মের প্রতিনিধিদের। ইহুদি, মুসলমান, বৌদ্ধ, তাও, কনফুসিয়ান, শিন্টো, পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্ম, ক্যাথলিক, গ্রিক চার্চ, প্রটেস্টান্ট ইত্যাদি। এমনকী থিয়োসফিস্ট ও ব্রাহ্মদেরও ডাকা হয়েছে। শুধু হিন্দু ধর্ম বাদ। হিন্দু ধর্মটা আবার কী? এ দেশের লোক কিছুই জানে না, শুধু কিছু কিছু বমন উদ্রেককারী গল্প শুনেছে। হিন্দু মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরে, মায়েরা নিজের সন্তানদের নদীতে কুমিরের মুখে ছুঁড়ে দেয়, হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ নামে এক বিচিত্র প্রাণী আছে, অন্য কেউ তাদের ছুঁয়ে দিলেই তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, সেই লোকদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, জগন্নাথের রথের চাকায় হাজার হাজার লোক চাপা পড়ে...। এই কোনও গল্পই পুরোপুরি মিথ্যে নয়। কিন্তু এর বাইরেও যে হিন্দু ধর্মে মহৎ কোনও চিন্তা বা আদর্শ আছে, তা হিন্দুরাই ভুলে গেছে। হিন্দুদের নাকি 'বেদ' নামে একটি ধর্মগ্রন্থ আছে, তা হিন্দুরাই পড়ে না, পড়লেও বুঝতে পারত না অবশ্য, সেই বই পাওয়াই যায় না বলতে গেলে। মহা জলধিতে বেদ একবার লুপ্ত হয়েছিল, এখনও প্রায় সেই অবস্থা।

কোনও হিন্দু প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জানালেই বা কে আসত? হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য দলাদলি, তাদের মুখপাত্র কে হবে? সে রকম কেউ নেই। অন্যান্য প্রতিনিধিদের জানিয়ে

দেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের নিজ ব্যয়ে জাহাজে আসতে হবে। শিকাগো শহরে পৌঁছবার পর তাঁদের আহার ও আশ্রয়ের দায়িত্ব নেবে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ। কোনও হিন্দুকে আমন্ত্রণ জানাবার প্রশ্নই ওঠে না আরও এই কারণে যে, কোনও নিষ্ঠাবান হিন্দু তো জাহাজেই চাপবে না। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ! বহু শতাব্দী ধরে হিন্দুরা কূপমণ্ডুক, তারা সমুদ্রকে ভয় পায়, সমুদ্র চিনল না বলে তারা পৃথিবীকেও চিনল না। তারা শুধু ঘরে শুয়ে শুয়ে প্রাচীন কালের মহিমা নিয়ে জাবর কাটতে পারে।

আমন্ত্রিত বক্তা-অতিথি ছাড়াও শ্রোতা এবং দর্শক হিসেবেও নিজেদের উদ্যোগে এসেছে বহু দেশের মানুষ। ভারত থেকে এ রকম একটা দল আসবার একটা কথা উঠেছিল বটে। বোম্বাইয়ের মেসার্স কারসেটজি সোরাবজি অ্যান্ড কোম্পানি নামে এক জাহাজ কোম্পানির পারসি মালিকরা একটা 'হিন্দু জাহাজ' ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এ জাহাজে পুরোপুরি হিন্দুয়ানি বজায় রাখবার জন্য হিন্দু ব্রাহ্মণ রাঁধুনি, হিন্দু মোদক, হিন্দু পরিচারক, হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক আর অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের বদলে হিন্দু কবিরাজ রাখা হবে। পুরো যাত্রাপথে খাদ্যদ্রব্যে মাছ-মাংসের ছোঁয়া থাকবে না, সব নিরামিষ, চাল-ডাল-আলু-বেগুনও নিয়ে যাওয়া হবে দেশ থেকে, আর থাকবে অনেকগুলি জালা ভর্তি গঙ্গাজল। যাওয়া-আসাও আমেরিকায় বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ সমেত মোট চার মাসের জন্য ব্যয়ও এমন কিছু বেশি নয়, প্রথম শ্রেণীর তিন হাজার টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়াই হাজার ও পরিচারকদের জন্য দেড় হাজার মাত্র। কিছু রাজা-মহারাজা-জমিদার এ পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন, বাংলার মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রায়বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র মুখার্জি প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী ছিলেন যাওয়ার ব্যাপারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট যাত্রী পাওয়া গেল না, জাহাজ কোম্পানি পরিত্যাগ করলেন পরিকল্পনাটি।

এগারোই সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল দশটায় বিশ্বমেলার হল অফ কলম্বাসে এই ধর্মসভার উদ্বোধন। আমন্ত্রিতরা বাইরে থেকে সারবন্দ হয়ে একশো ফুট লম্বা মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন, নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগল। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটি লোহার সিংহাসন, তাতে বসবেন আমেরিকার ক্যাথলিকদের সর্বপ্রধান ধর্মযাজক কার্ডিনাল গিবন্স। তাঁর দু পাশে তিন সারিতে তিরিশটি করে কাঠের চেয়ার অন্যদের জন্য। খ্রিস্টানদের কার্ডিনাল বলে কথা, তাঁকে তো সিংহাসন দিতেই হবে।

বক্তাদের মধ্যে ভারতীয় আছেন বেশ কয়েকজন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি ধর্মপাল, জৈন ধর্মের বীরচাঁদ গান্ধী, থিওসফিস্ট জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অ্যানি বেশান্ট, ব্রাহ্ম সমাজের বি বি নাগরকর ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দশ বছর আগে একবার আমেরিকা ঘুরে গেছেন, তিনি সুবক্তা ও সুপুরুষ। কেশব-শিষ্য প্রতাপচন্দ্র একেশ্বর ব্রাহ্ম ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মকে মেশাতে পারেন চমৎকারভাবে, তাই তিনি এ দেশে আগে থেকেই কিছুটা জনপ্রিয়।

এখানে ঢোকার সময়েই প্রতাপচন্দ্র দেখলেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে বিচিত্র পোশাক পরা এক ব্যক্তি। অন্য সকলেই সাদা বা খয়েরি ধরনের চাপা রঙের পোশাক পরে এসেছেন, আর এই লোকটার গায়ে একটা ক্যাটকেটে কমলা রঙের হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা আলখাল্লা, কোমরে কোমর-বন্ধ, মাথায় ওই রঙেরই এক বিরাট পাগড়ি। প্রতাপচন্দ্র ভুরু কুঁচকিয়ে ভাবতে লাগলেন, এ মূর্তিমানটি আবার কে? কোন দেশের। মুখখানা কচি, বয়েস বেশি নয়, সকলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, এ আবার কোন ধর্মের লোক!

অন্য ভারতীয়রাও এই অচেনা ব্যক্তিটিকে লক্ষ করেছেন। ধর্মপাল ফিসফিস করে প্রতাপচন্দ্রকে বললেন, হিন্দু, হিন্দু! শেষ মুহূর্তে নাকি একজন হিন্দু এসে ঢুকেছে।

কৌতূহলে প্রতাপচন্দ্রের ভুরু কুঁচকে গেল। হিন্দু? দেশে থাকতে তিনি কোনও হিন্দু প্রতিনিধির কথা ঘুণাক্ষরেও শোনেননি। হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে কেউ যাবে না, এ রকমই বরং শুনে এসেছেন। এ লোকটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল? এর গায়ের আলখাল্লাটা ঠিক গেরুয়া নয়, হিন্দু সন্ন্যাসী কখনও সিল্কের চকচকে কমলা রঙের পোশাক পরে? সাধুরা আবার এত বড় পাগড়ি পরতে

শুরু করল কবে থেকে ? পাগড়িটা দেখলে মনে হয় কোনও রাজসভার দেওয়ান।

প্রতাপচন্দ্র নিচু গলায় ধর্মপালকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথাকার হিন্দু, নেপালের নাকি ?

ধর্মপাল বললেন, না, না, শুনেছি তো মাদ্রাজ, নাকি কলকাতার !

কলকাতার ? সেখানে এমন কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা থাকতে পারে, যাকে প্রতাপচন্দ্র চেনেন না ? হতেই পারে না। এ কোনও জালিয়াত নাকি ?

পাগড়িধারী যুবকটির সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই সে ফিক করে হাসল।

প্রতাপচন্দ্র মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলেন। না, একে আগে কখনও দেখেছেন বলে তো মনে পড়ে না। অথচ এ ছোকরাটি তাঁকে চেনার ভান করে হাসছে। পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে, ধর্ম সম্মেলন জালিয়াতির জায়গা নয়, এ যদি সে রকম কিছু হয় তা হলে সেটা ফাঁস করে দেওয়া তাঁর অবশ্যকর্তব্য। বলে কি না কলকাতা থেকে এসেছে ? ও বোধ হয় জানে না, কলকাতা তথা বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি তিনি, তাঁকে এখানকার অনেকেই আগে থেকে চেনে, তিনি কর্মসমিতির অন্যতম সদস্য, তিনি কিছু টের পেলেন না, আর কলকাতা থেকে একজন হিন্দু প্রতিনিধি হঠাৎ এখানে এসে উদয় হল ?

আমন্ত্রিত অতিথিরা কয়েক দিন আগে থেকেই উপস্থিত হলেও তাঁদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা এক জায়গায় হয়নি। কোনও হোটেলেও নয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যেই এক একজন নিজের নিজের বাড়িতে এক একজনকে রেখেছেন। তাই পরস্পর মেলামেশার সুযোগ হয়নি। প্রতাপচন্দ্রও পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করায় ব্যস্ত ছিলেন।

মস্ত বড় হলঘরটিতে শ্রোতার সংখ্যা প্রায় ছয়-সাত হাজার। অন্য সব বক্তাদের ম্যাটমেটে পোশাক, কিন্তু ওই তরুণটির গাঢ় রঙের সিল্কের পোশাক যেন ঝলমল করছে তার মধ্যে। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। বিচিত্র পোশাক ছাড়াও তার তারুণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল, টানা টানা দুটি চক্ষু খুব উজ্জ্বল, যেন ঠিকরে পড়ছে তেজ। সে সোজা হয়ে বসে আছে।

বাইরে থেকে তাকে যতই তেজস্বী দেখাক, ভেতরে ভেতরে কিন্তু ওই তরুণটি এখন খুব দুর্বল। ভয়ে সে কাঁপছে প্রায়, বুকের মধ্যে টিপ টিপ শব্দ হচ্ছে। এই বিপুল জনসমষ্টির সামনে তাকে বক্তৃতা দিতে হবে ! এর আগে দু-চারটে ছোটখাটো আসরে সে কিছু বললেও বড় কোনও জনসভায় বক্তৃতা দেবার অভিজ্ঞতা তার একেবারেই নেই। অন্যান্য বক্তারা তাঁদের বক্তব্য আগে থেকে গুছিয়ে লিখে এনে সেটা পাঠ করছেন, তাতে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা, অনেক মহাপুরুষ ও বিখ্যাত গ্রন্থের উদ্ধৃতি। সে যে একেবারেই তৈরি হয়ে আসেনি। কেন কিছু লিখে আনেনি, এই ভেবে আফশোসে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে তার। সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে, এখানে ফাঁকিবাজি চলবে না।

দর্শকরা যে এই কমলা রঙের পোশাক পরিহিত অতিথিটির মুখের কথা শোনার জন্য আগ্রহে অধীর হয়ে আছে, তা উদ্যোক্তারা টের পেয়ে গেছেন। অন্য সকলে একরকম, আর এ ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ আলাদা, সুতরাং কৌতূহল তো হবেই। পরিচালকদের একজন এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করছেন, এর পরের বার আপনি বলবেন তো ? যুবকটি অমনি ছটফটিয়ে উঠে বলছে, না, না, আর একটু পরে। আর একটু পরে।

এ রকম দু-তিনবার হল। দূর থেকে সব লক্ষ করছেন প্রতাপচন্দ্র। মুখ খুললেই ছোকরাটির বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত, কিন্তু ও বারবার এড়িয়ে যাচ্ছে, তাতেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

অনুষ্ঠান পরিচালক ডক্তর ব্যারোজ প্রতাপচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয়। একবার তিনি প্রতাপচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন, মজুমদার, এর পরে আপনার পালা। আপনি তো খুব সুবক্তা, আপনি ফাটাবেন জানি।

প্রতাপচন্দ্র নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, ওই যে পাগড়ি পরা যুবকটিকে দেখছি, উনি কে ?

ডক্তর ব্যারোজ বললেন, উনি তো আপনারই দেশের লোক। আপনি ওঁকে চেনেন না ?

দু দিকে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে প্রতাপচন্দ্র বললেন, না, আমি ওঁকে আগে কখনও দেখিনি। কী নাম ?

ডক্তর ব্যারোজ বললেন, কী নাম, কী নাম, দাঁড়ান দেখছি, এই যে, বেশ শক্ত উচ্চারণ করা, সোয়া... সোওয়ামী ভিভ্ কানন্ড !

প্রতাপচন্দ্র ভুরু উত্তোলন করে রইলেন। সোওয়ামী না হয় বোঝা গেল স্বামী। কিন্তু ভিভ্ কানন্ড ? এ রকম নাম তিনি সাত জন্মে শোনেননি। বাঙালির আবার এ রকম উদ্ভট নাম হয় নাকি ?

ধর্মপালের কাজকর্ম কলকাতা কেন্দ্রিক হলেও তিনি কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত নন। আর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাঙালি বটে কিন্তু এলাহাবাদের অধিবাসী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসেছেন মঞ্চের অন্য দিকে, কাছাকাছি থাকলে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেত।

প্রতাপচন্দ্রের নাম ঘোষিত হতেই তিনি উঠে চলে গেলেন বক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট রোস্ট্রামের দিকে। পরিশীলিত উচ্চারণে, বহু অপ্রচলিত ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে তিনি যে চোস্ত বক্তৃতাটি দিলেন, তাতে বাইবেল ও উপনিষদের অপূর্ব সমাহার ঘটেছে। লিখিত অংশ পাঠ করা ছাড়াও মাঝে মাঝে তিনি মুখ তুলে বাইবেলের অংশবিশেষ মুখস্থ বলতে লাগলেন অনর্গলভাবে। প্রচুর হাততালিতে শ্রোতারা তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

হাততালি অবশ্য কোনও বক্তাই কম পাচ্ছেন না। এ দেশে একটা হাততালির ভদ্রতা আছে। বক্তৃতা চলাকালীন যারা ঘুমোয়, বক্তৃতা শেষ হলে হঠাৎ জেগে উঠে তারাও চটাপট শব্দে হাততালি দিতে শুরু করে। একটু আগে চিনের প্রতিনিধি বলে গেলেন, তাঁর ইংরিজি উচ্চারণ কিছুই প্রায় বোঝা গেল না, তিনিও হাততালি পেয়েছেন যথেষ্ট।

পাগড়ি পরা যুবকটি বারবার এড়িয়ে গেল, সকালের অধিবেশনে সে বক্তৃতা দিলই না। এর পর মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। দু ঘণ্টা পরে আবার শুরু হবে দ্বিতীয় অধিবেশন।

খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে আর একটি বিশাল হলঘরে। লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো বহু রকম খাদ্যদ্রব্য, নিরামিষেরও পৃথক ব্যবস্থা আছে। বক্তারা ছাড়াও অন্য নিমন্ত্রিতদের সংখ্যাও চার-পাঁচশো'র কম নয়, বসবার জায়গা দূরে থাক, দাঁড়াবার জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। হাতে প্লেট ধরে খাবার তুলে নিতে হচ্ছে লাইন দিয়ে।

প্রতাপচন্দ্র সেই ভিড়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, প্রতাপদা, ভাল আছেন ?

আমূল চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন সেই পাগড়ি পরা যুবকটিকে। তার সারা মুখে হাসি ছড়ানো। বাংলায় কথা বলছে, সত্যি সত্যি বাঙালি ? পাগড়ি পরা বাঙালি সন্ন্যাসী ?

প্রতাপচন্দ্র আমতা আমতা করে বললেন, আপনি... মানে তুমি কে ? ঠিক চিনতে পারলুম না তো !

যুবকটি সকৌতুকে বলল, এরকম জবরজং ধড়াচূড়ো পরে আছি তাই ধরতে পারছেন না। আপনি আমাকে চেনেন, আগে অনেকবার দেখেছেন।

প্রতাপচন্দ্র বললেন, আগে দেখেছি ? তোমার নাম কী ?

যুবকটি বলল, আমি এখন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর তো পূর্বাশ্রমের নাম উচ্চারণ করতে নেই। আপনার ঠিক মনে পড়বে, আমি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য। আপনাদের নববিধানেও এক সময়ে আমি অনেকবার গেছি !

প্রতাপচন্দ্র বললেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, তাঁকে তো আমি বিলক্ষণ চিনতাম। আমাদের কেশববাবুই তাঁকে কলকাতার গণ্যমান্য সমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস কি কারুকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিতেন ? শুনিনি তো ! তিনি বড় কষ্ট পেয়ে দেহত্যাগ করলেন, তারপর তার কথা আর বিশেষ শোনা-টোনা যায় না, কোনও খবরও সংবাদপত্রে চোখে পড়েনি।

যুবকটি বলল, আমরা গুটিকয় চেলা এখনও ঠাকুরকে অবলম্বন করে আছি। তিনিই আমাদের

জীবন নিয়ন্ত্রণ করছেন।

প্রতাপচন্দ্র বললেন, তুমি যে এখানে এলে, কাদের পক্ষ থেকে এলে ? কোন সম্প্রদায় তোমাকে পাঠাল ?

যুবকটি বলল, ঠিক কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আসিনি। এমনকী দেশে থাকতে কোনও আমন্ত্রণও পাইনি। তবু কী করে যেন পাকেচক্রে আসা হল, এমনকী মঞ্চে আপনাদের পাশে বসার সৌভাগ্যও জুটে গেল।

প্রতাপচন্দ্র বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, মনে পড়েছে। তুমি তো নরেন ? সিমলের দত্ত বাড়ির ছেলে ? গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলে, খুব ভাল গান গাইতে, তাই না ?

নরেন মাথা নিচু করে বলল, চিনতে পেরেছেন তা হলে ?

প্রতাপচন্দ্রের মনোভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। এই যুবকটি সম্পর্কে এতক্ষণ যে বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল, তা অপসৃত হয়ে গেল এক নিমেষে। এই যুবকটি তো কলকাতার তাঁদের নিজস্ব বৃত্তেরই একজন, রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলাদের সঙ্গে তাঁদের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। এত দূরদেশে একজন পরিচিত মানুষকে দেখলে আপনাআপনি একটা আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হয়ে যায়।

তিনি বললেন, তোমার পিতৃবিয়োগের পর তুমি খুব অসুবিধেয় পড়েছিলে, এই পর্যন্ত জানি, তারপর আর কিছু শুনিনি। তুমি কবেই বা সন্ন্যাসী হলে আর কী করেই বা এখানে এলে ! তোমাকে দেখে বড় খুশি হলুম গো নরেন !

নরেন বিনীতভাবে বলল, ইচ্ছে আছে হিন্দু ধর্মের হয়ে দু'চার কথা বলব এখানে। কিন্তু প্রতাপদা, আপনারা কী চমৎকার ভাষণ দিলেন। ভাষার কী অপূর্ব বাঁধুনি। আমি কি পারব ? কখনও এত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলিনি।

প্রতাপচন্দ্র তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, পারবে না কেন, নিশ্চয়ই পারবে ! ঘাবড়াবার কী আছে ? গুরুর নাম স্মরণ করে বলে যাবে !

এই সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রতাপচন্দ্র তাঁর সঙ্গে নরেনের আলাপ করিয়ে দেবার জন্য সোৎসাহে বললেন, জ্ঞানবাবু, এই ছেলেটিকে চেনেন ? এ আমাদের কলকাতা থেকে এসেছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ, কয়েক দিন ধরে এঁর কথা শুনছি। এঁর নামই তো বিবেকানন্দ, তাই না ?

প্রতাপচন্দ্র বললেন, বিবেকানন্দ, তাই বল। তখন ডক্তর ব্যারোজ কী একটা বিদঘুটে উচ্চারণ করল, বুঝতেই পারিনি ! বাঃ বেশ নাম। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এই সব আনন্দের দল ছিল, তুমিও সেই রকম এক আনন্দ। তা নরেন, তুমি কী করে আমেরিকায় এসে পৌঁছলে, টাকাপয়সা কে দিল, আমন্ত্রণপত্রই বা কীভাবে জোগাড় করলে, এসব জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

নরেন বলল, সে এক লম্বা গল্প। শুনলে আপনারা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। প্রতাপদা, এখন তো বেশি সময় নেই। পরে একদিন আপনাদের সব বলব।

১০

নরেনের রূপান্তর এবং আমেরিকার এই ধর্ম মহাসম্মিলনে উপস্থিতির পশ্চাৎপট অনেকটা রূপকথার মতন অবিশ্বাস্য শোনায় তো বটেই, প্রায় যেন অলৌকিকত্বের ধার ঘেঁষে যায়।

সেই নরেন, আর এই নরেন ! বরানগর মঠের সেই ছিন্নকন্থা পরিহিত ভিক্ষাজীবী এক বাউণ্ডুলে যুবক, আর আমেরিকার এই মহতী জনসভায় সম্মানিত অতিথি।

বরানগরের সেই জীর্ণ পোড়ো বাড়ি, সাপখোপ, শেয়ালের উৎপাত আর প্রতিবেশীদের তর্জনগর্জন। শ্রীরামকৃষ্ণ নেই, মাসের পর মাস দশ-বারোজন ভক্ত তবু কায়ক্লেশে জড়ামড়ি করে এখানে পড়ে আছে। আত্মীয়-স্বজনরা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করে মাঝে মাঝে, তবু তারা মঠ ছেড়ে যায় না, যদিও তারা নিজেরাও জানে না যে তাদের ভবিষ্যৎ কী ? এখানে তারা নানান শাস্ত্র পাঠ করে, কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন গানে মেতে থাকে। রাত জেগে হইহল্লোড় করে, কিন্তু এইভাবেই কি দিন কাটবে ?

গৃহী ভক্তরা অর্থসাহায্য করে, আবার সংসারের নানা কাজের ব্যস্ততায় মাঝে মাঝে ভুলেও যায়। তখন এরা ভিক্ষে করতে বাধ্য হয়। সেই ভিক্ষান্ন পাক হয় বটে কিন্তু থালা বাসন কিছু নেই। একদিন কলাপাতা কাটতে যাওয়ায় বাগানের মালির কাছে গালাগালি খেতে হয়েছিল বলে এখন ভেঙে আনে বড় বড় মানকচুর পাতা, সেই পাতায় ঢালা হয় সবটা ভাত, তার সঙ্গে শুধু লঙ্কার ঝোল, সবাই একসঙ্গে গোল হয়ে বসে সেই ভাত আর ঝোল তুলে তুলে খায়।

এতে কৃচ্ছ্রসাধনা হচ্ছে বটে, কিন্তু এর পরিণাম কী ? শরীরগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, এর পর রোগব্যাধি, তারপর মৃত্যু ! সবাই বলাবলি করছে, এই ছেলের দল নিতান্ত পাগলামিতে মেতেছে, বরানগরের ওই মঠ টিকিয়ে রাখার আর দরকার নেই, যে যার ঘরে ফিরে যাক না।

ক্রমে দল ভাঙতে লাগল, নৈরাশ্যে নয়, গৃহীদের উপদেশে নয়, আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ-কান্নাকাটিতে নয়, আহার-শয়নের কষ্টের জন্যও নয়, নিছক একঘেয়েমির কারণে। এক একজন মঠ ছেড়ে চলে যেতে লাগল, বাড়ি ফিরল না, বেরিয়ে পড়ল তীর্থযাত্রায়। নরেনের পারিবারিক সঙ্কট খুব তীব্র, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মামলামোকদ্দমা চলেছে তো চলেছেই, মাঝে মাঝে সে দিনের বেলা বাড়ি যায়, মামলা তদারকি করে, রাত্তিরে মঠে ফিরে আসে। মায়ের কষ্ট সে দেখতে পারে না। মাকে সে সবরকম সাহায্য করতে চায়, কিন্তু এ কথাও সে জানিয়ে দিয়েছে যে সে আর কখনও গৃহী হবে না, ঘর তার জন্য নয়। সাপ আর সন্ন্যাসীর কোনও নিজস্ব বাসা থাকে না। নিক্ষিপ্ত তীর আর ফেরে না।

এক সন্ধেবেলা নরেন কলকাতা থেকে বরানগরের মঠে ফিরে এসে শুনল যে এক গুরুভাই সারদা গোপনে মঠ ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। শুনেই খুব উতলা বোধ করল নরেন। সারদার বয়েস বেশ কম। প্রায় বালক বলা যায়, সে একা একা কোথায় যাবে, কী বিপদে পড়বে কে জানে। কিছুক্ষণ পরে সারদার একটা চিঠি পাওয়া গেল নরেনকে লেখা। সে লিখেছে যে, পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন যাবার অভিপ্রায়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। ইদানীং সে স্বপ্ন দেখে ভয় পাচ্ছিল। স্বপ্নে সে মা-বাবা আর বাড়ির লোকজনদের দেখতে পায়, তারা যেন হাতছানি দেয়। এ তো মায়ার হাতছানি। এর মধ্যে দু'বার সে বাড়িতে ছুটে চলেও গিয়েছিল। তারপর সে ঠিক করেছে, এই মায়াপাশ কাটাতেই হবে। একবার সন্ন্যাসী হয়ে আবার সে গৃহী হতে পারবে না। তাই সে চলে যাচ্ছে বহু দূরে।

কয়েক দিন নরেন খুব চিন্তিত হয়ে রইল। সারদার ঘটনাটা তার মনে একটা জোর ধাক্কা দিয়েছে। সারদা চলে গেছে শুনে সে এত বিচলিত হয়ে পড়েছিল কেন, সারদা তার কে ? সন্ন্যাসীর আবার কোনও বন্ধন থাকে নাকি ? নিজের সংসার ছেড়ে এসে সে কি এই মঠের সংসার চালাচ্ছে ? এখানে অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয় তাকেই।

সন্ন্যাসীর পক্ষে এক জায়গায় বেশি দিন থাকা মানায় না। বহতা জল আর রমতা সাধু, এরাই পবিত্র থাকে। এবার নরেনকেও বেরিয়ে পড়তে হবে। সে এ দেশটাকে চিনতে চায়।

কারুকে কিছু না জানিয়ে নরেন একদিন মঠ ছেড়ে চলে গেল।

তারপর শুরু হল তার পরিব্রাজক জীবন। পিছুটান নেই, সামনেও নির্দিষ্ট কোনও অভীষ্ট নেই। শুধু চলা, কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রেনে। অঙ্গে গেরুয়া কৌপীন, হাতে একটি লম্বা লাঠি আর কমণ্ডলু, আর একটা পুঁটলিতে খানকতক বই। পড়ার নেশা সে ছাড়তে পারে না। পড়ার ব্যাপারে তার বাছবিচারও নেই, সে যেমন বেদান্ত পড়ে, তেমনি জুল ভার্ন-এর রোমাঞ্চকর উপন্যাসও পড়ে। কোথাও কেউ ভাল ভাল খাবার দিলে সে বিনা দ্বিধায় পেট পুরে খায়, আবার কোনওদিন একমুঠো ছাতু জুটলে তাই সই। পয়সার কোনও বালাই নেই, কেউ ট্রেনের টিকিট কেটে দিলে সে ট্রেনে চাপে, সেরকম কেউ না দিলে সে হাঁটে। কিছুর জন্য ব্যস্ততা তো নেই তার।

নরেন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির যেমন দেখতে যায়, তেমনি সে আগ্রার তাজমহলও দেখতে যায়। গাজীপুরের পওহারি বাবার মতন তপঃক্লিষ্ট সাধুর কাছে যেমন সে গিয়ে পড়ে থাকে, তেমনি বারাণসীতে পণ্ডিতপ্রবর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তর্কে মাতে। ভক্তির জন্য সে জ্ঞানকে ছাড়েনি, আবার জ্ঞানের জন্য সে সৌন্দর্যবোধও বিসর্জন দেয়নি।

বেশ কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর এক জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়ল নরেন। শরীরের ওপরে নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল, এবার শরীর বুঝি যায় যায়। এক নবলব্ধ শিষ্য পরিবার তাকে পৌঁছে দেয় কলকাতায়। বরানগরের মঠে শশী, রাখাল, বাবুরাম, লাটুদের সেবায় সাহচর্যে সুস্থ হয়ে উঠল সে, কিছুদিন আনন্দে কাটল, কিন্তু পথ যাকে একবার টেনেছে, সে আর ঘরে থাকবে কী করে ?

বাঙালিরা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। ডাক্তার, উকিল, সাংবাদিক, স্কুল মাস্টার, রেলের স্টেশন মাস্টার অধিকাংশই বাঙালি। বাঙালিরা আগে ইংরিজি শিখেছে, তাই এই সব জীবিকায় তারা অগ্রণী। অনেক জায়গাতেই নরেনের থাকার জায়গা জুটে যায়। কোথাও কোথাও হঠাৎ হঠাৎ নরেনের প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধুরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা সব প্রতিষ্ঠিত, উচ্চ চাকুরে, আর নরেনের ধূলিধূসরিত খালি পা, ময়লা চিটচিটে গেরুয়া বসন, কোটরে বসা দুই চোখ, মাথার চুলে জট। নরেনের কলেজি বন্ধুরা নরেনকে চিনতে পেরে স্তম্ভবাক হয়ে যায়।

এক স্থানে আশ্রয় পেলে সেই আশ্রয়দাতাই পরবর্তী কোনও স্থানের পরিচিত ব্যক্তির ঠিকানা দিয়ে দেয়। ক্রমে নরেনের পরিচিতের সংখ্যা বাড়ে। রাস্তার ধারে মুচি কিংবা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষও বন্ধু হয় তার। ট্রেনে যাওয়ার সময় নরেনের চেহারা দেখে ও দু'একটি কথা শুনেই আকৃষ্ট হয় সহযাত্রীরা। নরেন গৌরবর্ণ সুপুরুষ, তার মুখে কখনও দীন ভাব ফোটে না, সে নিঃস্ব হলেও কারুর কৃপাপ্রার্থী নয়। তা ছাড়া নরেনের ইংরিজি পরিষ্কার, ওজস্বিনী। ইংরিজি বলা সাধু এ দেশে কেউ আগে দেখেনি। এ সাধু শুধু ইংরিজি বলে না, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং চিন্তা-ভাবনায় আধুনিক। ট্রেনের কামরাতেই একবার নরেনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ জননেতা বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিলক রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেননি, নরেন সম্পর্কে কিছুই জানেন না, শুধু তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে স্থান দিলেন কয়েক দিনের জন্য।

ক্রমে এই শিক্ষিত, তরুণ, সুদর্শন সন্ন্যাসীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে উচ্চ মহলে। রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজপরিবার তাকে অতিথি হিসেবে পেয়ে ধন্য হয়। আলোয়ার, কোটা, খেতড়ি, রামনাদের রাজা, হায়দারাবাদের নিজাম, এমনকী ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যিনি প্রধান হিসেবে গণ্য, সেই মহীশূরের রাজার সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়। প্রত্যেকেই নরেনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে

বিস্মিত। তারা বুঝতেই পারে না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী পুরুষ এরকম পাগলের মতন ঘুরে বেড়ায় কেন ? আলোয়ার রাজ্যের মহারাজ একদিন তো জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, স্বামীজি, আমি তো শুনেছি আপনি বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত। ইচ্ছে করলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন। তবু আপনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে ঘুরছেন কেন ?

নরেন সহাস্যে বলল, আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো। আপনি রাজকার্যে অবহেলা করে প্রায়ই জঙ্গলে গিয়ে সাহেবদের মতন জন্তু-জানোয়ার শিকার ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে সময় কাটান কেন ?

মহারাজ থতমত খেয়ে বললেন, হ্যাঁ, ওসব করি বটে, তবে কেন করি তা বলতে পারি না। ভাল লাগে, ভাল যে লাগে তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

নরেন বলল, আমারও ভাল লাগে বলেই আমি ফকির সেজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই।

আর একজন নরেনকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি গেরুয়া পরেন কেন ? গেরুয়া কাপড়ের কী বৈশিষ্ট্য আছে ?

নরেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, সাধারণ লোকের মতন জামা-কাপড় পরলে আমি খুব বিপদে পড়তাম। দেশে তো ভিখারির অভাব নেই। পথের ভিখারিরা আমাকে ভদ্দরলোক মনে করে ভিক্ষা চাইত। কিন্তু আমি তো নিজেই একজন ভিক্ষুক, আমার হাতে একটা পয়সাও থাকে না। আবার কোনও প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতেও কষ্ট হয়। তাই গেরুয়া পরি। আমাকেও ভিক্ষুক মনে করে অন্য ভিখারিরা পয়সা চায় না।

কোনও কোনও রাজা নরেনের সঙ্গে দু'চারদিন আলাপ-আলোচনা করে এতই মুগ্ধ হয় যে তারা নরেনকে রাজগুরু পদে বরণ করে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু নরেন যে রমতা সাধু, তার শিকড় গাড়তে নেই। সব অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে, রাজভোগ ছেড়ে সে আবার নেমে পড়ে পথে। আজ সে রাজার অতিথিসদনে রাত কাটাচ্ছে, পরদিন কোনও গাছতলায়।

কেউ কিছু উপহার দিলেও সে নেয় না। অনেকে জোর করে পকেটে টাকা গুঁজে দিতে চায়, নরেন প্রত্যাখ্যান করে, খুব পীড়াপীড়ি শুনলে বলে, আপনি বরং পরবর্তী গন্তব্যের জন্য আমার একটা ট্রেনের টিকিট কেটে দিন। মহীশূরের মহারাজ বহু মূল্যবান সোনা রুপোর দ্রব্য দিতে চেয়েছিলেন, একেবারে কিছু না গ্রহণ করলে অশিষ্টতা প্রকাশ পায়, কোনও ধাতু দ্রব্যই সে নিতে পারে না, শেষ পর্যন্ত সে শুধু একটা চন্দন কাঠের ছোট হুঁকো নিয়ে পুঁটুলিতে রাখল। আর সব ছাড়লেও তামাকের নেশা নরেন কিছুতেই ছাড়তে পারেনি। আমেরিকাতে এসেও একটা চুরুটের দাম আট আনা দেখে সে আঁতকে উঠেছিল। দিনে সাত-আটখানা চুরুট তো তার লাগেই।

আমেরিকায় পাড়ি দেবার ইচ্ছেটা তার মনে একটু-একটু করে দানা বাঁধছিল, মনঃস্থির করতে অনেক সময় লেগেছে।

হরিদ্বার-হৃষিকেশ থেকে দ্বারকা, ত্রিবান্দ্রম থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, সারা ভারতবর্ষ এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঘুরে বেড়াল নরেন। পর্যটনে শুধু তো প্রকৃতির রূপ দেখা হয় না, মানুষই প্রধান দ্রষ্টব্য। মানুষ, মানুষ, অসংখ্য মানুষ। রাজা-মহারাজা আর ক'জন ? সচ্ছল চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ীই বা কত ? অধিকাংশই তো দরিদ্র, নিপীড়িত জনসাধারণ। দু'বেলা আহার জোটে না, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। দারিদ্র্যের এমনই কুম্ভীপাক যে কেউ বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পায় না, শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, ধর্মের মর্মও বোঝে না। যে মহান ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা গর্ব করি, তার অবস্থা এখন এত নিম্নস্তরে এসে পৌঁছেছে।

তিরিশ কোটি মানুষ, তার মধ্যে শতকরা একজন মাত্র ইংরেজি শিক্ষিত। ইদানীং সেই শিক্ষিতদের মধ্যেও বেকারের সংখ্যা প্রচুর। তারা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার ইংরিজি শিখেও জীবিকার সংস্থান করতে পারে না। ইংরেজের শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য শোষণ, ভারতীয়দের নিজস্ব সম্পদ বলতে আর কিছু নেই।

এইরকম অবস্থায় ধর্মেরও অধঃপতন হয়। জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ, যুক্তি মার্গ সব চুলোয় গেছে,

এখন শুধু ছুঁৎ মার্গ। জাত-পাতের হাজার বিভেদ। হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তর নেই, অন্য দেশে তারা ধর্ম প্রচার করতে যায়নি, অন্য ধর্মের মানুষদের হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে টেনে আনেনি কখনও, বরং নিজেদের ধর্মের মানুষদেরই জাতিচ্যুত করেছে। অপমান করে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

এক এক সময় নরেনের মনে হয়েছে, চুলোয় যাক ধর্ম! যে ধর্ম মানুষের অপমান করে, তা আবার ধর্ম নাকি! দেশের দারিদ্র্য দূর করা, অসহায় মানুষদের সেবা করাই তো এখন প্রকৃত ধর্ম।

বরানগর মঠ ছাড়বার চার বছর পর নরেন সারা ভারত পরিভ্রমণ করে কন্যাকুমারীর এক শিলাতটে বসল। সামনে বিশাল নীল জলধি, পিছনে সমগ্র ভারতবর্ষ। সে একা একা বসে কাঁদল কিছুক্ষণ। এর পর সে কী করবে? বেদান্ত চর্চা আর জপতপ করে কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন? তার মনে পড়ছে অগণিত ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ। সারা দেশ রসাতলে যাক, শুধু নিজের আত্মিক উন্নতি হলেই হল, এই তো ভেবে এসেছে এতকাল সন্ন্যাসীরা। কিন্তু এই ধর্মচর্যা তো নিতান্ত স্বার্থপরতারই নামান্তর। তার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসও বারবার বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।

সমুদ্রে নেমে সাঁতার দিতে লাগল নরেন। অদূরে একটা পাথরের টিবি জেগে আছে সমুদ্রের বুকে। সেই পাথরে উঠে নরেন মহাসমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে যেন দেখতে পেল ভারতের মহা জনসমষ্টি। অভুক্ত, অর্ধনগ্ন। এদের উদ্ধার করতে না পারলে ধর্মপ্রচার নিতান্ত অপপ্রয়াস। কীভাবে এদের উন্নতি করা সম্ভব? বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই। বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে পশ্চিম দেশগুলি অনেক এগিয়ে গেছে। সেই কারিগরি নিয়ে আসতে হবে ভারতে। কিন্তু তারা দেবে কেন? ইংরেজরা তো কিছুতেই দেবে না। অন্য দেশগুলির কাছেও ভিক্ষুকের মতন হাত পাতলে তারা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করবে। ভিক্ষুককে কেউ রেয়াত করে না। চাই বিনিময়। ওদের কাছ থেকে কিছু নিতে হলে ওদেরও কিছু দিতে হবে। এই রিক্ত, হীনবল ভারতের দেবার মতন কী আছে? স্বর্ণ নেই, শস্য নেই, শুধু এখনও রয়ে গেছে কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও দর্শন। পশ্চিমের মানুষ এখন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নানান দ্বিধা, সংশয় ও নৈরাশ্যে ভুগছে। তাদের কাছে গিয়ে বলা যেতে পারে, তোমরা আমাদের উদরের অন্ন দাও, আমরা তোমাদের মানসিক খাদ্য দেব।

পশ্চিম দেশে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এ কথা বলা যাবে না। শিকাগোতে যে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন হচ্ছে, সেই মঞ্চই প্রকৃষ্ট স্থান, সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে অনেকের কাছে।

এর আগে বিভিন্ন স্থানে যখন বিদেশ যাত্রার প্রসঙ্গ উঠেছে, তখন অনেক রাজা-মহারাজা নরেনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু নরেন ঠিক করল, যদি ভারতের প্রতিনিধি হয়েই তাকে যেতে হয়, তা হলে ভারতের মানুষই তাকে চাঁদা করে পাঠাবে। সাধারণ মানুষের চাঁদা দেওয়ার সঙ্গতি নেই, টাকা তুলতে হবে মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে। মাদ্রাজে কিছু শিক্ষিত তরুণ যুবক তার খুব অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল, এদের মধ্যে পেরুমল আলাসিঙ্গা নামের যুবকটি তার বিশেষ ভক্ত।

মাদ্রাজে ফিরে এসে নরেন আলাসিঙ্গাকে তার অভিপ্রায়ের কথা জানাতেই সে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। মাদ্রাজের এই যুবকদের নরেন সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে যে এই তেজস্বী তরুণ সন্ন্যাসী অসাধারণ কিছু কীর্তি রেখে যাবে। বাংলার কেউ কিছু জানল না, গুরুভাইদের সঙ্গেও নরেনের অনেক দিন যোগাযোগ নেই, দক্ষিণ ভারতে চাঁদা তোলা হতে লাগল তার জন্য। শেষ পর্যন্ত অবশ্য টাকা উঠল না, জাহাজ ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ আছে, আমেরিকায় কতদিন থাকতে হবে তারও ঠিক নেই, বাধ্য হয়েই সাহায্য নিতে হল রাজাদের কাছ থেকে। অনেকেই কিছু কিছু সাহায্য করলেন, সবচেয়ে উদার হস্ত প্রসারিত করে দিলেন খেতড়ির রাজা অজিত সিং। এই অজিত সিং তো নরেনের প্রায় শিষ্য ও সখা বনে গেছে। বহুকাল ধরে সে অপুত্রক ছিল, নরেনের আশীর্বাদে তার একটি উত্তরাধিকারী জন্মেছে, এ জন্য তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অজিত সিং-ই নরেনের পোশাকের পরিকল্পনা করে দিলেন। দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশে গেলে পশ্চিমে কেউ গ্রাহ্য করবে না, পরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্যে আগে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চাই। এবং

সন্ন্যাসী নরেনের নাম কী হবে?

বরানগরের মঠে বিরজা হোমের পর রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস নিয়েছিল। নরেনই গুরুভাইদের এক একজনকে এক একটি নতুন নাম দিয়েছিল, রাখালের নাম হল ব্রহ্মানন্দ, বাবুরামের নাম প্রেমানন্দ, কালীপ্রসাদ হল অভেদানন্দ, লাটু হল অদ্ভুতানন্দ...। নরেনের ইচ্ছে ছিল সে নাম নেবে রামকৃষ্ণানন্দ, কিন্তু আগেভাগেই শশী ওই নামটা চেয়ে বসল। তখন নরেন নিজের নাম নিল বিবিদিষানন্দ।

যেমন বিদঘুটে নাম, মানে বোঝা যায় না, উচ্চারণ করার তেমনই অসুবিধে। ভ্রমণের সময় সেটা বদলে সে সচ্চিদানন্দ করে নিল, কখনও-সখনও চিঠিতে লিখত বিবেকানন্দ। খেতড়ির রাজা অজিত সিং শেষ নামটাই পছন্দ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ।

খেতড়ির রাজা আর একটি দারুণ উপকার করেছিলেন। নরেন সন্ন্যাসী হোক বা নাই হোক, সে কখনও মাকে ভুলতে পারবে না, মায়ের কষ্টও সহ্য করতে পারবে না। সমুদ্র পাড়ি দেবার পর সে আবার কবে ফিরতে পারবে না পারবে তার ঠিক নেই, বিদেশে বেঘোরে প্রাণটাও যেতে পারে, তখন মায়ের কী হবে? খেতড়ির রাজা নরেনের এই দুশ্চিন্তা টের পেয়ে তার মায়ের জন্য মাসোহারা আর তার ছোট ভাইদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট সাহায্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মাদ্রাজি ভক্তরা জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে দিয়েছিল, খেতড়ির রাজা সেটাকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করে দিয়েছেন। দীন হীনের মতন নেটিভের পোশাকে এই শ্রেণীতে যাওয়া যায় না, নরেন গেরুয়া ছেড়ে ট্রাউজার ও লম্বা কোট পরেছে, পায়ে মোজা ও বুট জুতো। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল, তারা সবিস্ময়ে দেখল, খালি পায়ে যে সারা ভারত ঘুরেছে, সেই সন্ন্যাসী এই পোশাকেও বেশ অভ্যস্ত।

বিদায়ের ক্ষণে নরেন বিশেষ কোনও কথা বলতে পারল না। গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগল শুধু। গুরুভাইরা কিছু জানে না, সারা ভারতেও বিশেষ কেউ জানে না, কোনও সংবাদপত্রেই তাঁর নাম উল্লেখ নেই, তবু তাঁর কাঁধে এক বিশাল দায়িত্ব। কয়েকজন শুভার্থী অনেক ভরসা নিয়ে তাকে পাঠাচ্ছে, সেই জড়বাদী, ভোগবাদীদের দেশে গিয়ে এ দায়িত্ব সে পালন করতে পারবে তো?

সমুদ্রযাত্রা নিয়ে কয়েকজন আপত্তি জানিয়েছিল, নরেন তাদের কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। মাদ্রাজি ব্রাহ্মণদের সে দাপটের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার নিষেধ আছে, আমাকে দেখান তো? তরুণ ভক্তদের সে বলেছে, কোনও শাস্ত্রে যদি এমন কথা থাকেও তো সে শাস্ত্র বদলাতে হবে। যে সমস্ত সামাজিক লোকাচার এ যুগের উপযুক্ত নয়, সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। পুরুতদের কথা একদম মানবে না।

সমুদ্র নরেনের ভাল লাগে। যে জলরাশির পরপার দেখা যায় না, তার যেন এক অজানা রহস্যের হাতছানি আছে। এতকাল হিন্দুরা সেই হাতছানি উপেক্ষা করে রইল কীভাবে? তাতেই তো অন্য জাতিগুলি এত এগিয়ে গেল!

নরেনের জাহাজ এসে পৌঁছল কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে। সেখান থেকে ট্রেনে শিকাগোয় আসতে তিন দিন লেগে গেল। টাকা পয়সা হু হু করে খরচ হয়ে যাচ্ছে, নতুন দেশে যে পাচ্ছে সে-ই ঠকাচ্ছে, স্টেশনের কুলিরা পর্যন্ত। জাহাজে ওঠার সময় নরেনের সম্বল ছিল প্রায় হাজার তিনেক টাকা মাত্র, এখন সন্ন্যাসী হয়েও তাকে টাকার হিসেব রাখতে হচ্ছে, ব্যয় করতে হচ্ছে টিপে টিপে।

শিকাগো পৌঁছবার পর নরেন বুঝতে পারল, কী আহাম্মকির কাজই না সে করেছে। আমেরিকায় একটা ধর্ম সম্মেলন হচ্ছে শুনেই হুট করে সেখানে চলে আসা যায়? এ যেন, উঠল বাই তো কটক যাই! আগে থেকে কিছু যোগাযোগ করা হয়নি, কোনও আমন্ত্রণপত্র নেই, এমনকী কোনও পরিচয়পত্র পর্যন্ত নেই। কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে গেলে তার প্রমাণ দিতে হবে না? সমগ্র হিন্দু সমাজের মুখপাত্র হিসেবে নরেনকে কে নির্বাচন করল? সে কি গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! আমেরিকায় সব কিছু নিয়মতন্ত্র মেনে চলে, তাকে এখানে পাত্তাই দেবে না কেউ।

যে-সব শুভার্থীরা তাকে এখানে পাঠাল, তাদেরও কারুর মাথায় এসব কথা আসেনি ?

আরও ভয়ংকর ব্যাপার, নরেন শিকাগোয় এসে জানল, সম্মেলন শুরু হতে এখনও এক মাস দেরি আছে। আর কোনও দেশের প্রতিনিধি এখনও এসে পৌঁছয়নি, তারা আসবে সম্মেলনের দু'তিনদিন আগে। এই এক মাস নরেন থাকবে কোথায়, খাবে কী ? ভিক্ষে করতে গেলেই এখানে জেলে পুরে দেবে। সম্মেলনে আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখও পার হয়ে গেছে, উদ্যোক্তাদের আতিথ্যও সে কোনওক্রমে পাবে না।

শিকাগোর সাউথ ওয়াবাশ এভিনিউতে দাঁড়িয়ে নরেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শীতে কাঁপছে। এ দেশের আবহাওয়া সম্পর্কেও কোনও খোঁজখবর নিয়ে আসেনি সে। বাংলায় ছ'টি ঋতু, পশ্চিমের লোকেরা তার মধ্যে দুটি ঋতুর নামই জানে না। এ দেশে একটি ঋতুই প্রধান, তার নাম শীত। এই শীতের ধারপাশ ঘেঁষে কখনও গ্রীষ্ম, কখনও বসন্ত, কখনও শরৎ উঁকি মেরে যায়। কিন্তু ওইসব ঋতুতেও যদি হঠাৎ জাঁকিয়ে বৃষ্টি নামে, থার্মোমিটারের পারাও অনেক বেশি নেমে যায়, হু হু করে ছুটে আসে হিমেল হাওয়া। নরেন কোনও গরম জামাকাপড়ই আনেনি।

অচেনা দেশ, একটি মানুষও চেনা নেই। সঙ্গে যা টাকা আছে তাতে দেশে ফেরার জাহাজ ভাড়াও কুলোবে না, অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তিরিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক। রাস্তার লোক ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। তারা কেউই আগে কোনও ভারতীয় দেখেনি, এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরা মানুষটি যেন অন্য গ্রহের প্রাণী।

আস্তে আস্তে তাকে ঘিরে জুটে গেল একদল বালক ও কিশোর। তারা অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী বলছে তা বোঝা যায় না। চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল তারা। তাতেও নরেনের কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না দেখে তারা রাস্তা থেকে ইট কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

এই হয়েছে আর এক জ্বালা। রাজা অজিত সিং খুব ভালবেসে নরেনের জন্য এই গাঢ় কমলা রঙের রেশমি পোশাক তৈরি করে দিয়েছে, যাতে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জাহাজ থেকে নামার পর নরেন ট্রাউজার্স-কোট বদল করে এই ভারতীয় পোশাক পরে নিয়েছিল। দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে ঠিকই। ফলটা হচ্ছে বিপরীত। বয়স্ক লোকেরা শুধু বক্র দৃষ্টিতে তাকায়, বাচ্চারা সহ্য করতেই পারে না, ঢিল মারে।

মালপত্র তুলে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল নরেন, বাচ্চারা পেছন পেছন তাড়া করে এল। যেন পাগল তাড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ছুটতে হল নরেনকে। ছুটতে ছুটতে সে একটা হোটেলের দরজায় পৌঁছে গেল।

এ দেশে পয়সা থাকলেই হোটেলে আশ্রয় পাওয়া যায় না। সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যেও অদ্ভুত একটা পরিহাস আছে। যে-সমাজ এক দিকে খুব উদার, সেই সমাজই অন্য দিকে গোঁড়া। এক দিকে যুক্তিবাদী, অন্য দিকে অন্ধ। যারা মানবতার নামে জয়ধ্বনি দেয়, তারাই আবার ধর্মের তফাত কিংবা গায়ের সাদা-কালো রঙের তফাত ভুলতে পারে না।

নিজের দেশে নরেন একজন গৌরবর্ণ পুরুষ, পশ্চিমিদের চোখে সে কালো। আমরা ক্যাটক্যাটে সাদা ও কুচকুচে কালোর মাঝখানেও অনেকগুলি রং দেখতে পাই, সাহেবরা পারে না। তাদের চোখের দোষ আছে। কালো লোকদের জন্য হোটেলে জায়গা নেই। কেউ ভদ্র ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে, কেউ মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। কেউ বা নরেনের পোশাক দেখে বিকট মুখভঙ্গি করে, যেন চোখের সামনে রয়েছে এক অদ্ভুত জানোয়ার।

নরেন দারুণ বিষণ্ণ, ক্লান্ত ও শীতার্ত, মাথা গোঁজার জন্য একটা ঘর পেতেই হবে, না হলে সে হয়তো মরেই যাবে। একটা রেল স্টেশনের স্নানঘরে ঢুকে নরেন পোশাক বদলে আবার প্যান্ট-কোট পরে নিল। তারপর সস্তার হোটেলের বদলে গেল একটা বড় হোটেলে। এখানে বিভিন্ন দেশের মানুষ আসে, ঘর ভাড়া খুব বেশি। যত টাকাই লাগুক, তাকে তো বাঁচতে হবে আগে।

দু'তিনদিন সেই হোটেলে থেকে নরেন কিছুটা ধাতস্থ হয়ে নিল। বোঝার চেষ্টা করল

দেশটাকে। চুরুটের দাম আট আনা, সব জিনিসেরই দাম এখানে অত্যন্ত বেশি। এখানকার ধনীরা বিপুল ধনবান, মধ্যবিত্তদের সংখ্যাই সর্বাধিক, গরিবও আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ অনাহারে থাকে না, কিছু না-কিছু কাজ সবাই পায়। নরেনের যা সম্বল তাতে সে এখানে দিন পনেরোর বেশি টিকতে পারবে না। সে সন্ন্যাসী, তার চাকরি খোঁজার প্রশ্নই ওঠে না, তা হলে সে কীসের ভরসায় এ দেশে এসেছে ?

অনেকেই এই অবস্থায় ভেঙে পড়ে। প্রথম প্রথম ঘোর বিদেশে এসে অনেকেরই দেশের জন্য খুব মন কেমন করে, ইচ্ছে করে তখনই ফিরে যেতে। সহায়-সম্বল না থাকলে অন্য যে-কেউ যে-কোনও উপায়ে ফেরার জন্য জাহাজঘাটায় ধরনা দিত। কিন্তু নরেন যে সে ধাতুতে গড়া নয়। তার প্রধান সম্বল আত্মবিশ্বাস, জেদ, গোঁয়ার্তুমি। এত দূর এসে সে পরাজিত হয়ে ফিরে যাবে ? ধর্ম সম্মেলনে জায়গা পাওয়া যাবে না তাতে কী হয়েছে, অন্যভাবেও তো আমেরিকানদের কাছে তার বক্তব্য পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা যায়। কোনওক্রমে দাঁতে দাঁত চেপে কয়েক মাস এখানে টিকে থাকতে পারলে একটা কিছু উপায় বার করা যাবেই। আলাসিঙ্গাকে চিঠি লিখলে সে আরও কিছু টাকা চাঁদা তুলে পাঠাতে পারবে না ? অজিত সিংকেও অগত্যা লিখতেই হবে।

নরেন একা একা ঘুরে বেড়ায়। বিশ্ব শিল্পমেলার প্রদর্শনী এক এলাহি ব্যাপার, দশ দিনেও দেখে শেষ করা যাবে না। আমেরিকায় সব কিছুই বিরাট বিরাট, রাস্তাগুলি অত্যন্ত চওড়া, মস্ত মস্ত সব বাড়ি, শিল্পমেলাও তো বিশাল হবেই। কিন্তু এসব দেখেও নরেন খুব একটা হতচকিত হয় না, আমেরিকায় এসে সে সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছে নারীদের দেখে।

বস্তুত এ দেশে এসেই যেন প্রথম নারীদের দেখল নরেন। দেশে থাকতে সে জননী, ভগিনী বা মাসি-পিসিদের দেখেছে, কিন্তু নারী কোথায় ? ভারতের নারীরা তো সব অন্তঃপুরে থাকে। সে হতভাগ্য দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই তো গৃহ-বন্দিনী। আর এ দেশে পথে-ঘাটে সর্বত্র নারী। স্বাস্থ্যবতী, সপ্রতিভ মহিলারা দোকানপাট করছে, ব্যবসা চালাচ্ছে, কোনও কাজেই তারা পিছিয়ে নেই। আগে কত শোনা গিয়েছিল এই ধনবানদের দেশে সব সময় বিলাসের স্রোত বয়ে যায়, নারীরা এ দেশে শুধু ভোগের সামগ্রী। কিন্তু ভোগ-বিলাসের স্রোতে সব সময় ভেসে থাকলে এ দেশটার এত উন্নতি হল কী করে ? কিছু কিছু লাস্যময়ী রমণী যে নেই তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ নারীই স্বাবলম্বিনী, নম্র, ভদ্র, যে-কোনও দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। এই বিশাল নারী বাহিনীই যেন দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ দৃশ্য অভূতপূর্ব, এ অভিজ্ঞতা অপার বিস্ময়কর।

সেইরকম একজন নারীই নরেনের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিল।

কয়েক দিন পর হোটেল ছেড়ে দিয়ে নরেন চেপে বসল বস্টনগামী ট্রেনে। সে শুনেছে শিকাগোর তুলনায় বস্টনে থাকার খরচ কম। লালুভাই নামে এক ভারতীয় তার সহযাত্রী, তার সঙ্গে গল্পগুজব করছে, এক কোণ থেকে একজন মাঝবয়েসী মহিলা উঠে এসে সামনে দাঁড়ালেন। ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন, মাপ করবেন, ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা কোন দেশের লোক ?

নরেন বলল, আমরা ভারতীয়।

মহিলাটি আরও অবাক হয়ে বললেন, ভারতীয়রা ইংরিজিতে কথা বলে ? তারা এত ভাল ইংরিজি জানে ?

প্রবাসে বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় পরস্পরের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতেই বাধ্য হয়, তা ছাড়া উপায় নেই। নরেন হেসে বলল, আমরা সংস্কৃত ভাষাতেও কথা বলতে পারি, কিন্তু তা তো আপনি বুঝবেন না। সংস্কৃত ভাষার নাম শুনেছেন। সংস্কৃত ভাষা কিন্তু ইংরিজি ভাষার মাসি কিংবা দিদিমার মতন এক আত্মীয়া।

মহিলার নাম ক্যাথরিন এবট স্যানবর্ন, তিনি বেশ ধনবতী আবার ভালমতন লেখাপড়াও জানেন। কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে ভাব জমে গেল। বস্টনে নামবার সময় তিনি নরেনকে বললেন, আপনি এখানে হোটেল খুঁজবেন কেন, আমার সঙ্গে চলুন না, আমার একটা ফার্ম হাউস আছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। আমার বন্ধু-বান্ধবরা কেউ কখনও ভারতীয় দেখেনি, আপনার সঙ্গে

আলাপ করলে খুশি হবে।

নরেনের আপত্তি করার কোনও প্রশ্ন নেই, তার তো হোটেল খরচ বেঁচে গেল। টাকা বাঁচানোই তার প্রধান চিন্তা। ক্যাথরিনের গোলাবাড়িটি যেমন খুব বড় তার পরিচিতদের সংখ্যাও অনেক। তারা দলে দলে ছুটে আসে এক ভারতীয়কে দেখতে। ক্যাথরিনের অনুরোধে নরেনকে মাথায় পাগড়ি ও আলখাল্লা পরে বসতে হয়, স্থানীয় আমেরিকানদের চোখে সে যেন এক চিড়িয়াখানার প্রাণী। বিনা পয়সায় খাওয়া থাকা, নরেন মেনে নেয়। কিন্তু এই প্রাণীটি আবার কথা বলে, তাও ইংরিজিতে, এবং সে মিনমিন করে ভিক্ষেও চায় না। অনেক মজার কথা বলে, এক এক সময় আমেরিকানদের সম্পর্কে কড়া কথা বলতেও ছাড়ে না। ক্যাথরিনের বন্ধুরা অবশ্য সবাই নিছক অজ্ঞ কৌতূহলী নয়, তাদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিও আছে। তারা দেখল এই অদ্ভুত লোকটা বাইবেল পড়েছে, অনেক বই পড়েছে, তাদের কারুর কারুর চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী।

ক্রমে নরেনের ভূমিকা বদল হয়, কৌতূহলের বদলে সে অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তখন বিভিন্ন জায়গায় তার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। মহিলারাই বেশি উৎসাহী, বিভিন্ন মহিলা ক্লাব থেকে তার ডাক পড়ে। কিছু কিছু খ্যাতি ছড়াতে থাকে এই "ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী"র।

এই সূত্রেই পরিচয় হয় হেনরি রাইটের সঙ্গে। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিক ভাষার অধ্যাপক, প্রাচ্য দর্শন বিষয়ে আগ্রহী, তিনিও নরেনকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে রাখলেন কয়েক দিন এবং নরেনের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে দারুণ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়লেন। আচার-ব্যবহারেও এই সন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত, সকলের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানাপিনা করেন, এমনকী গো মাংস ভক্ষণেও আপত্তি নেই। ধর্ম মহাসভায় যোগদান বিষয়ে নরেন সম্পূর্ণ আশা ত্যাগ করেছিল, অধ্যাপক হেনরি রাইটই তাকে আবার উদ্দীপিত করলেন। উৎসব কমিটির সেক্রেটারির সঙ্গে হেনরি রাইটের পরিচয় ছিল, তিনি সেই সেক্রেটারিকে একটা চিঠিতে লিখলেন, এই সন্ন্যাসীকে অবশ্যই বক্তৃতার সুযোগ দেওয়া উচিত, ইনি এমনই একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, আমাদের এখানকার সব কটি অধ্যাপককে একত্র করলেও এঁর সমকক্ষ হবে না।

প্রায় অলৌকিক যোগাযোগ বলতে গেলে। অধ্যাপক হেনরি রাইট নরেনের পরিচয়পত্র লিখে দিলেন, শিকাগোয় যাতে থাকার ব্যবস্থা হয় সে চিঠি দিলেন সঙ্গে, এমনকী শিকাগো যাবার ট্রেনের টিকিট কিনে দিলেন পর্যন্ত।

এত সুযোগ পেয়েও নরেন একটা গণ্ডগোল করে ফেলল। শিকাগোতে ট্রেন থেকে নেমে পকেটে হাত দিয়ে দেখল পকেটে তিনখানা চিঠির মধ্যে রয়েছে মাত্র একখানা। শুধু তার পরিচয়পত্রটি রয়েছে, কিন্তু বারোজ নামে যে ব্যক্তিটি তার থাকার ব্যবস্থা করে দেবে, তাঁর নামে চিঠিটিও উধাও, তার ঠিকানাও নরেন জানে না। মহাসভার অফিসের ঠিকানাও গেছে হারিয়ে। এখন এই গোলোকধাঁধার মতন শহরে সে কোথায় যাবে ? বৃষ্টি পড়ছে খুব, নরেন স্টেশনের বাইরে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সম্মেলন সমাসন্ন বলে এ শহরে বহু অতিথি এসে গেছে, বড় বড় সব হোটেল ভর্তি। একটু বাদে বৃষ্টির মধ্যে খুঁজতে বেরিয়ে নরেন কোনও হোটেলেই জায়গা পেল না কিংবা প্রত্যাখ্যাত হল। উপায়ান্তর না দেখে সে ফিরে এল রেল স্টেশনে, শীত থেকে বাঁচবার জন্য সে ঢুকে পড়ল একটা খালি কাঠের বাক্সের মধ্যে।

সেই বাক্সের মধ্যে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে রইল নরেন। এ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিও এমনভাবে রাত কাটায় না। নরেনের বুকটা খুব দমে গেছে। তীরে এসে তরী ডুববে ? এতটা সুযোগ পেয়েও সে সব হারাল ? এখন আর হার্ভার্ডে ফিরে গিয়ে অধ্যাপক রাইটের কাছ থেকে নতুন করে পরিচয়পত্র লিখিয়ে আনার সময় নেই, সম্মেলন শুরু হয়ে যাবে এক দিন পরেই।

কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না। পর দিন সকালেই সে বেরিয়ে পড়ল, যেমনভাবেই হোক ধর্মসভার কার্যালয়ে পৌঁছোতেই হবে তাকে। সে এক একটা বাড়ির দরজায় ঘা দিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, ধর্ম মহাসভার অফিসটা কোথায় আমাকে একটু বলে দেবেন ? বিরাট লেক মিসিগানের তীরবর্তী এই বাড়িগুলিতে ধনীদের বাস। অনেকে ধর্ম মহাসভা সম্পর্কে কিছুই জানে না। অনেকের

ধারণা হল এই লোকটি পাগল। একটা কালা আদমি, ময়লা পোশাক, দাড়ি না কামানো মুখ, সে বিড়বিড় করে কী বলছে। অবাঞ্ছিত বেড়াল-কুকুরের মতন ভৃত্যারা দুর দুর করে তাকে তাড়িয়ে দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ এ রকম চেষ্টা করার পর বিফল মনোরথ হয়ে নরেন বসে পড়ল রাস্তায়।

এর পরেই স্বর্গ থেকে দেবদূতীর আগমন। বিপদ ভঞ্জনে এগিয়ে এল আর এক নারী।

এক প্রাসাদের তিনতলার জানলায় দাঁড়িয়ে এক অপরূপা রমণী অনেকক্ষণ ধরে নরেনকে লক্ষ করছিলেন। এক সময় তিনি নীচে নেমে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রাজপথে। নরেনের সামনে এসে তিনি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটি করলেন, মহাশয় আপনি কি ধর্ম মহাসভার একজন প্রতিনিধি ?

এই মহিলার নাম শ্রীমতী হেল। এঁর নজরে পড়ায় আর কোনও সমস্যাই রইল না। ইনি নরেনকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে নিয়ে এলেন ধর্ম মহাসভার অফিসে। অধ্যাপক রাইটের ডাকে পাঠানো চিঠির ফলে সব ব্যবস্থাই হয়ে ছিল, সে প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি পেল, তার থাকার ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট হল।

এখন নরেন সেই মহা সম্মেলনের মঞ্চে উপবিষ্ট। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে অপরাহ্নে। একে একে প্রতিনিধিরা বক্তৃতা শেষ করছেন। আর তো উপায় নেই, এবার নরেনকে দাঁড়াতেই হবে এই বিশাল জনসমষ্টির সম্মুখে।

চারজন বক্তার ভাষণ শেষ হবার পর নাম ঘোষিত হল হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধির। নরেনের বুকের কাঁপুনি এখন দ্বিগুণ। গুরুর নাম কিংবা মা কালীর কথা তার মনে পড়ল না। সে একবার মঞ্চের পেছন দিকে তাকাল। সেখানে দু'জন গ্রিক দার্শনিকের পাথরের মূর্তি সাজানো রয়েছে, আর একটু দূরে একটি নারীমূর্তি, আকারে বেশ বড়, একটি হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তোলা, হয়তো কোনও গ্রিক বা রোমান দেবীর প্রতিমূর্তি। কিন্তু অনেকটা হিন্দুদের দেবী সরস্বতীর সঙ্গে মিল আছে। সে দিকে চেয়ে নরেন মনে মনে বলল, হে মা সরস্বতী, দয়া করো, আমার জিহ্বাগ্রে তোমার একটুখানি স্পর্শ দাও মা !

ধীর পায়ে সে গিয়ে দাঁড়াল রোস্ট্রামে। শ্রোতাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। কত বিভিন্ন বর্ণের পোশাক। হলে তিল ধারণের স্থান নেই, পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। অন্য সবাই প্রথম সম্বোধন করেছে, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ'। এটাই বিলিতি সভ্যতার রীতি, নরেন বলল, হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ...

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি, প্রবল হাততালি, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে হাততালি এবং সে হাততালি যেন থামতেই চায় না। এ তো ঠিক ভদ্রতার হাততালি নয়। নরেন নিজেই বেশ বিস্মিত হল। ভারতে অনাত্মীয় মহিলাদের মা কিংবা বোন বলে সম্বোধন করার রীতি আছে, এ দেশে নিজের মা-বোন ছাড়া অন্যদের ওইভাবে ডাকাটা ন্যাকামির পর্যায়ে পড়ে। ভারতে পুরুষে পুরুষে ভাই সম্বোধন খুবই স্বাভাবিক, আর এদেশে পারিবারিক বন্ধন শিথিল, নিজের ভাই-বোনেরই অনেকে খবর রাখে না, পরিবারের বাইরে ভাই শব্দটার প্রায় ব্যবহারই নেই বলতে গেলে, ইয়ার্কির ছলে ছাড়া। ভারতীয় সম্বোধন এদের এত পছন্দ হয়ে গেল ?

এত হাততালিতে অনেকখানি ভরসা পেল নরেন। এর পর সে জোরাল গলায় বলতে লাগল, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে এসেছি... আমরা শুধু সকল ধর্মকেই সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে মনে করি... বিভিন্ন নদীর বিভিন্ন উৎস, কিন্তু সব নদীই সাগরে মেশে, তেমনি যত ধর্মমত, যত রকম বিশ্বাস, সকলের মূলে একই ভগবান... আজ এই সম্মেলনের শুরুতে যে ঘণ্টাধ্বনি হয়েছিল, তাতেই যেন একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রগামী বিভিন্ন মতবাদের রেষারেষির অবসান ঘোষিত হল।

সময় নির্দিষ্ট, নরেন বক্তৃতা দীর্ঘ করল না। শেষ হতে না হতেই সে কি তুমুল হর্ষধ্বনি। যেন মহা সমুদ্রের কলরোল। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য বক্তাদের মুখ ধূসর হয়ে গেল, এত অভিনন্দন তো

আর কারুর ভাগ্যে জোটেনি।

নরেনের বক্তৃতার ভাষা বা বিষয়বস্তু খুব যে অভিনব বা চমকপ্রদ, তা কিন্তু নয়। ব্যবহারিকভাবে না মানলেও প্রত্যেক ধর্মের প্রবক্তারাই এক এক সময় উদার ভাব দেখিয়ে অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার কথা ঘোষণা করেন। সকাল থেকে প্রত্যেক বক্তার কণ্ঠেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা ধ্বনিত হয়েছে। তা হলে নরেন এমন নতুন কী বলল ? নরেনের চেহারা বা পোশাকের ঔজ্জ্বল্য দেখেই সবাই মুগ্ধ হয়েছে, আমেরিকান শ্রোতাদের এতটা ছেলেমানুষ মনে করাও ভুল। অন্য বক্তারা পাঠ করেছেন লিখিত বক্তৃতা, তা কিছুটা ক্লান্তিকর হয়, ভাষার কারিকুরিতে সব বোঝা যায় না, বক্তার মুখ দেখা যায় না। নরেন যে আগে থেকে লিখেটিখে তৈরি হয়ে আসেনি, সেটাই যেন তার পক্ষে শাপে বর হয়েছে। সে সোজাসুজি শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে তার বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করেছে সরল, আন্তরিক ভাষায়। তার বক্তব্যের আড়ালেও এমন কিছু ছিল, যা স্পর্শ করেছে সকলের মন। যেন এই তেজস্বী যুবকটি নিছক তত্ত্বকথা শোনাতে আসেনি, মানুষে মানুষে মিলন ঘটানোর দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছে, তার বিশ্বাসের জোরেই ভালবাসার প্রতিষ্ঠা ঘটাবে। যেন সে এক নতুন অবতার।

নরেন জয়ী হয়েছে। এতগুলি মানুষের হৃদয় হরণ করেছে সে। এই মুহূর্ত থেকে নরেন মুছে গেল, সে এখন স্বামী বিবেকানন্দ, এই নামেই বিশ্বের বহু লোক তাকে চিনবে।

শুধু হর্ষধ্বনিতেই শেষ হল না, শত শত শ্রোতা চেয়ার-বেঞ্চি টপকিয়ে ছুটে এল তার দিকে। মহিলারাই অগ্রবর্তী হয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরে ধরল, তাঁকে একটু স্পর্শ করার জন্য।

উৎসবের একজন কর্তাব্যক্তি সেদিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, ও বলেছে খুবই ভাল। কিন্তু এর পরেও যদি ছোকরা মাথার ঠিক রাখতে পারে, তা হলে বুঝব ওর এলেম!

১১

লয়েড কম্পানি একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছে পাটনা শহরে। এই নতুন ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষা পদ্ধতি ঠিকঠাক বুঝিয়ে দেবার জন্য ওই কম্পানির কটক শাখা থেকে ভরতকে বদলি করা হয়েছে কিছুদিনের জন্য। পাটনা শহর ভরতের একেবারে অচেনা নয়, এখানে সে একবার থেকে গেছে কয়েকদিন, পথ ঘাট মোটামুটি চেনা।

গোলঘরের কাছে সে একটি বাড়ি ভাড়া করেছে, সেখানেই কেটে গেল মাস তিনেক। একটা নিজস্ব টাঙ্গা রয়েছে তার, সেই গাড়িতে করে সে চক অঞ্চলে ব্যাঙ্কে যায় প্রতিদিন, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে, তার পরেও সে সরাসরি বাড়ি ফেরে না, কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়। বাড়িতে যদিও তার রান্নার বন্দোবস্ত আছে, তবু সহকর্মীরা তাকে আমন্ত্রণ জানায় প্রায়ই।

পাটনা শহরটিতে বেশ একটি ঐতিহাসিক গন্ধ আছে। এককালের পাটলিপুত্র, হিন্দু আমলের সেই গৌরবচিহ্ন অবশ্য এখন আর বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু এখানেই ছিল সেলুকাস-বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী, সম্রাট অশোক এখান থেকেই রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন, এ কথা ভাবলেই ভরতের রোমাঞ্চ হয়। ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়। বর্তমানে পাঠান ও মোগল আমলের চিহ্নই চতুর্দিকে ছড়ানো : শের শাহের দুর্গ, শের শা স্থাপিত শাহী মসজিদ, আবার মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের পুত্র পারভেজও এখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বুদ্ধদেব এখানে পদার্পণ করেছিলেন, আবার শিখদের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ সিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন এখানেই। পথ দিয়ে যেতে যেতে শোনা যায় মসজিদের আজান, গুরুদোয়ারার সঙ্গীতময় প্রার্থনা, মন্দিরের কীর্তন।

ইংরেজ শাসকদের উপস্থিতিও টের পাওয়া যায় ভালভাবেই। সন্ধের সময় গঙ্গার ধারে গোরাদের ব্যান্ড বাজে। বাংলার শেষ নবাব মীরকাশিমকে এই পাটনার কাছেই চরমভাবে পরাজিত করার পর ইংরেজরা এখানে বড় রকমের ঘাঁটি গেড়েছে। ভরতের বাড়ির কাছে যে গোলঘর, সেটি আসলে একটি বিশাল শস্যাগোলা, শতাধিক বৎসর আগে এই অঞ্চলে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল, তারপর ইংরেজরাই এই শস্যভাণ্ডারটি নির্মাণ করে। এই শস্যাগারের ওপরের দিকটা গম্বুজের মতন, সিঁড়ি দিয়ে চূড়ায় ওঠা যায়, সেখান থেকে নিশ্চয়ই গঙ্গা নদী ও শহরাঞ্চলের অনেকখানি দেখা যেতে পারে, ভরত মাঝে-মাঝেই কিছু ইংরেজ নারী-পুরুষকে সেই ওপরে উঠে হাওয়া খেতে দেখে। সে নিজেও ওখানে একবার যাওয়ার চেষ্টা করে প্রতিহত হয়েছে, শুধু সাহেব-মেমদেরই অধিকার আছে ওপরে ওঠার, নেটিভদের জন্য নিষিদ্ধ।

ভরতের ব্যাঙ্কে এজেন্ট ও ম্যানেজার এই দু'জনই ইংরেজ, বাকি পাঁচজন স্থানীয় কর্মচারী। চিফ ক্যাশিয়ার বিষ্ণুকান্ত সহায় নামে এক ব্যক্তি, তিনি দেড় লক্ষ টাকা জমা রেখে এই পদটি পেয়েছেন। বিষ্ণুকান্তজি ইয়েস, নো, ভেরি গুড ছাড়া আর একটিও ইংরিজি শব্দ জানেন না। অন্য কর্মচারীরাও ইংরিজিতে তেমন সড়গড় নয়। ভরতই আপাতত মালিকপক্ষ ও কর্মচারীদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী। ভরত হিন্দি-উর্দুও কিছুটা শিখে নিয়েছে। পাটনার হিন্দুরা অনেকেই উর্দু জানে, বৃদ্ধরা এখনও ফার্সি বলে ও আওড়ায়।

বাবু বিষ্ণুকান্ত সহায় এক হৃষ্টপুষ্ট চেহারার প্রৌঢ়, অবস্থাও বেশ সচ্ছল। তিন পুরুষ ধরে তাঁদের মহাজনি কারবার, তাঁর পিতা সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির ফৌজকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বিষ্ণুকান্তজি হেড ক্যাশিয়ারের চাকরি নিয়েছেন শুধু সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য। প্রথম দিন থেকেই তিনি পছন্দ করে ফেলেছেন ভরতকে, প্রায়ই নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাইয়ে আপ্যায়ন করেন। অন্য কর্মচারীরা আড়ালে কৌতুক করে বলে, ভরত সিংহের আর কটক ফেরা হবে না, কোষাধ্যক্ষ মশাই তাকে দামাদ করে রেখে দেবেন। বিষ্ণুকান্ত সহায়ের নটি কন্যা ও দুটি পুত্র। এদের মধ্যে তিনটি কন্যার বিবাহ এখনও বাকি আছে।

বিষ্ণুকান্তজির বাড়ি গঙ্গার কিনারে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কঠোর ভাবে পর্দানশীন, তাদের কারুর কণ্ঠস্বর কিংবা অলংকারের রিনিঝিনি পর্যন্ত শোনা যায় না। বিষ্ণুকান্তজি বাঙালিদের বিশেষ পছন্দ করেন না, তাঁর একটি মাত্র কন্যার বিয়ে হয়েছে এক বাঙালি কেরানির সঙ্গে, সেই জামাইটি উদ্ধত ধরনের, শ্বশুরালয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখেনি। ভরত অবশ্য নিজেকে বাঙালি বলে না, তার ত্রিপুরার পরিচয়ও সে মুছে ফেলেছে, সবাইকে সে বলে তার জন্ম আসামে। সিংহ পদবি উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। বিষ্ণুকান্তজি বিশ্বাস করেন, ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারটি আসলে সংঘটিত হয় দুই পক্ষের বাবাদের মধ্যে, অনুষ্ঠানটি নিছক সামাজিকতা। ভরতের বাবা-মা কেউ নেই শুনে তিনি খানিকটা খটকার মধ্যে আছেন।

নিছক খাওয়া দাওয়ার লোভেই ভরত এ বাড়িতে আসে না। সন্ধের দিকে প্রায়ই এখানে একটা আড্ডা বসে এবং নানা রকম তর্ক বিতর্ক হয়। নিজের বাড়িতে একা একা সময় কাটাবার বদলে এই আড্ডায় যোগ দিতে ভরতের ভাল লাগে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলীর ব্যাপারে সে উৎসাহী, কলকাতার অধিবেশনে একবার সে যোগ দিয়েছিল।

বিষ্ণুকান্তজির জ্যেষ্ঠ পুত্র শিউপূজন কংগ্রেসের একজন উৎসাহী সদস্য। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দলবলের সঙ্গে বোম্বাই কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার কথা সে সবাইকে শোনায়। বোম্বাই কত দূর, সেখানকার মানুষজন, তাদের খাদ্য, পোশাক, ভাষা সম্পর্কে এখানকার অনেকেই কিছু জানে না।

এই শিউপূজন কয়েকদিন ধরে হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। গোরক্ষা। বালিয়া জেলার নাগরার রাজপুত জমিদার জগদেও বাহাদুর গোরক্ষার একজন প্রধান প্রবক্তা, সম্প্রতি তার লোকজন এসে পাটনায় সভা করে বলে গেছে, যেমনভাবেই হোক গোহত্যা বন্ধ করতেই হবে।

জগদেও বাহাদুর মুসলমান কশাইদের কাছ থেকে গোরু কেড়ে নেবার জন্যও ডাক দিয়েছেন।

শিউপূজনের উত্তেজনা দেখে ভরত অবাক হয়। কয়েক বছর ধরেই গোহত্যা বন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম আন্দোলন চলছে। পত্র-পত্রিকা খুললেই এ প্রসঙ্গ চোখে পড়ে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তো প্রথম থেকেই এ আন্দোলন থেকে বিযুক্ত রয়েছে। কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক সমস্যা এখানে আলোচিত হবে না, এটাই কংগ্রেসের নীতি। সামাজিক সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়লেই তো দলাদলি শুরু হবে।

মুসলমানরা গোড়া থেকেই কংগ্রেস সম্পর্কে সন্দিহান। আলিগড় থেকে প্রকাশ্যেই বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা যেন কংগ্রেসে যোগ না দেয়, ওটা হিন্দু আর পার্শিদের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস গরিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দুদেরই স্বার্থ দেখবে। সৈয়দ আহমদ খান বলেছেন, ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করতেই হবে। অবশ্য বদরুদ্দিন তায়েবজীর মতন শিক্ষিত মুসলমান এর বিরোধিতা করেছেন, দেওবন্ধের মওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহি ফতোয়া দিয়েছেন যে, সৈয়দ আহমদের কথা মানবার কোনও দরকার নেই, ইসলামের মূল নীতি বিঘ্নিত না করে হিন্দুদের সঙ্গে জাগতিক ব্যাপারে সহযোগিতা করা যায়।

কিন্তু গোহত্যা নিষিদ্ধ করলে তো সমগ্র মুসলমান সমাজই ক্রুদ্ধ হবে এবং তাতে সৈয়দ আহমেদের হাতই শক্ত হবে।

ভরত জিজ্ঞেস করল, শিউপূজন ভাই, আপনি কংগ্রেস নেতা হয়ে এর মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছেন কেন?

শিউপূজন বলল, কংগ্রেস তো হয় বছরে একবার, তিন দিনের জন্য। সারা বছর আমাদের অন্য পরিচয় নেই? আমরা আমাদের পূজা-পার্বণ করব না, ধর্ম রক্ষা হবে না? মুসলমানরা সারা বছরই মুসলমান থাকে, আমরা কংগ্রেসি হয়েছি বলে কি জাত খোয়াব? তুমি জানো, আজকাল তারা গোহত্যা করে রাস্তা দিয়ে তা দেখাতে দেখাতে নিয়ে যায়। গোরুর রক্ত দেখলে হিন্দুদের ধর্মনাশ হয়, তারা ইচ্ছে করে এ রকম করে।

ভরত বলল, আমার অনেক মুসলমান বন্ধু আছে। তারা তো এ রকম করে না।

শিউপূজন বলল, তুমি থাকো তোমার বন্ধুদের নিয়ে। কশাইরা রোজ কত গোরু জবাই করে, তা জানো? দুধের অভাবে সারা দেশ দুব্‌লা হয়ে যাচ্ছে। দয়ানন্দ স্বামী বলেছেন, একটা গোরু মারলে কতজন মুসলমান তার গোস্ত খায়? বড় জোর কুড়িজন। আর একটা গোরুকে যদি বাঁচিয়ে রাখো, তার অন্তত ছটা বাছুর হবে, এদের সারা জীবনে যত দুধ-ঘি-মাখন হবে, তাতে কয়েক হাজার হিন্দু-মুসলমান খেয়ে তাগত সঞ্চয় করতে পারে।

এই আড্ডায় প্রতিদিনই একজন লোক উপস্থিত থাকেন, তাঁকে সবাই পণ্ডিতজি বলে ডাকে। পণ্ডিতজি এক কোণে বসে আলবোলার নল মুখে দিয়ে ফুরুক ফুরুক করে টানেন আর মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করেন। তাঁর সেই সব মন্তব্য শুনে বোঝা যায়, লোকটির নানা বিষয়ে জ্ঞান আছে।

পণ্ডিতজি বললেন, আরে শিউপূজন বেটা, তুই খালি মুসলমান মুসলমান করছিস কেন? গো-হত্যা বন্ধ করতে হবে কাদের জন্য জানিস? ইংরেজদের জন্য। গো-মাংস কারা বেশি খায়? ইংরেজরা। মুসলমানরা অন্য মাংস খায়, বকরির মাংস খেতে পারে, কিন্তু ইংরেজরা বকরির মাংস পছন্দ করে না, গো-মাংসই তাদের চাই। তোরা কংগ্রেসিরা মুসলমান ভাই-বেরাদরদের বোঝা যে ইংরেজদের জব্দ করার জন্যই হিন্দু মুসলমানের মিলিতভাবে গো-হত্যা বন্ধ করা উচিত।

ভরত কৌতূহলীভাবে লোকটির দিকে তাকাল। এ রকম কথা তো সে আগে কখনও শোনেনি, কোথাও পড়েনি। হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়ে গো-হত্যা বন্ধ আন্দোলন করবে? ইংরেজরা মাংস খেতে না পেয়ে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে। বেশ মজা তো!

অন্য একজন বলল, আরে পণ্ডিতজি, তুমি কী পাগলের মতন কথা বলছ! মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাবে কেন? তা ছাড়া বকরীদের সময় গোরু কোরবানি দেওয়া তারা পুণ্য কাজ মনে করে। তারা এমনি এমনি সে অধিকার ছাড়বে? জোর করে পবিত্র গো-মাতার হত্যা বন্ধ

করতে হবে।

পণ্ডিতজি বললেন, গোরুই যে কোরবানি দিতে হবে এমন কথা ইসলামে কোথাও নেই। আরবি বক্‌র শব্দ থেকেই এসেছে বকরী আর বক্‌রত মানে হচ্ছে গোরু। সুতরাং বকরীদে ছাগল বলি দিলেও চলে। ইসলামি আইনে এমন কথাও আছে, একটা উট বা একটা গোরু বা একটা ভঁইসের বদলে সাতটা ছাগল বা ভেড়া বলি দেওয়া যেতে পারে।

শিউপূজন বলল, সাতটা ছাগলের যা দাম, তার চেয়ে একটা গোরু অনেক শস্তা। সেইজন্যই ওরা গোরু বলি দেয়!

ভরত আরবি শব্দের সূক্ষ্ম প্রভেদ কিংবা এই সব নিয়মের কথাও জানে না। সে চুপ করে রইল।

পণ্ডিতজী আরও বললেন, মুসলমানদের ঠিক করে বুঝাও। এই হিন্দুস্থানে এক সময় গোহত্যা বন্ধ করেছে তো মুসলমানরাই। সম্রাট আকবর গোহত্যা নিষিদ্ধ করেননি? তাঁর আদেশ না মেনে কেউ গোহত্যা করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতেন। অত দূরেও যেতে হবে না, এই তো সেদিন, সিপাহি যুদ্ধের সময় জাঁহাপনা বাহাদুর শাহ দিল্লিতে শুধু গোবধ নিষিদ্ধ করেননি, কশাইখানা থেকে সব গরু বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারি করেছিলেন। দিল্লির লড়াইয়ের সময় বকরীদের সময় যারা গোরু কোরবানি করেছিল, তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। যেখানেই হিন্দু-মুসলমান হাত মিলিয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়েছে, সেখানেই গোহত্যা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এই পাটনা শহরেও কেউ তখন গোরু কোরবানি করেনি। এখন কি আবার হিন্দু-মুসলমানে হাত মিলিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময় আসেনি?

শিউপূজন বলল, পাশার দান উল্টে গেছে পণ্ডিত! এখন মুসলমানরা ইংরেজদের পক্ষে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হবার জন্য তারা এখন ইংরেজদের সাহায্য চায়। আলিগড়ের ওই সৈয়দ আহমদ খান তো ইংরেজদের বুদ্ধিতেই চলে! ইংরেজও মওকা বুঝে ভেদ নীতি চালাচ্ছে।

পরপর কয়েকদিন এই আলোচনাই চলল। শুনতে শুনতে ভরত অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু এই আন্দোলনের পরিণতি যে হঠাৎ এত মারাত্মক হবে, তা সে কল্পনাও করেনি।

এক রাত্তে সে একা নিজের টাঙ্গায় ফিরছে। কথায় কথায় যে অনেক রাত হয়ে গেছে তা সে খেয়াল করেনি। টাঙ্গা চালক মকবুল ঝিমোতে ঝিমোতে গাড়ি চালায়। ভরতেরও ঝিমুনি এসে গেছে। হঠাৎ এক জায়গায় বহু লোকের কোলাহল শুনে তার চটকা ভেঙে গেল। কারা যেন মশাল নিয়ে ছুটে আসছে এদিকে। শহিদ কা মকবরার পাশ দিয়ে এই রাস্তা, কাছাকাছি বাড়িগুলিতে বাতি নিবে গেছে, শহর এখন প্রায় ঘুমন্ত, এই সময় এত লোক ছুটে আসছে কেন?

ভরত বেশি চিন্তার সময় পেল না। সেই ক্রুদ্ধ জনতার কণ্ঠে রক্তপিপাসু জিগির। তারা পথ আটকে টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, তোর সওয়ারি হিন্দু না মুসলমান?

টাঙ্গাওয়ালা কোনও জবাব না দিয়ে এক লাফ দিয়ে পালাল।

ভরত দেখল, এই জনতার অধিকাংশ লোকের মুখে দাড়ি, মাথায় ফেজ, হাতে তলোয়ার বা বর্শা। তারা ভরতকে দেখে হিন্দু হিন্দু বলে চিৎকার করে টেনে নামাল।

কী করে তারা ভরতকে হিন্দু বলে চিনল? ভরতের মাথায় টিকি বা কপালে চন্দন চর্চার মতন কোনও হিন্দুত্বের চিহ্ন নেই। শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের পোশাকও একই রকম, পা-জামা ও শেরওয়ানি। মুখের আকৃতি ও গায়ের রঙেরই বা মুসলমান-হিন্দুতে তফাত কোথায়?

তবু কেমনভাবে যেন চেনা যায়! সেই জনতা ভরতকে কোনও কথা বলারই সুযোগ দিল না। আল্লা হো আকবর ধ্বনি দিতে দিতে ভরতকে মারতে শুরু করল।

দু'একটা চড় চাপড় খেয়েই ভরত শুরু করল দৌড়। তার ছিপছিপে মেদহীন শরীর, সে বরাবরই খুব জোরে দৌড়োতে পারে, প্রাণভয়ে গতি আরও বেড়ে যায়। কিন্তু দৌড়ে পালাতে পারবে না ভরত। এই জনতার মধ্যে তার মতন চেহারার যুবক অনেক আছে, তা ছাড়া তারা বড় বড় পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারছে তার দিকে।

একটা পাথর লাগল ভরতের মাথার পেছনে, ভরত তাল সামলাতে পারল না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে

গেল মাটিতে। খুব জোরে লেগেছে, রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে, তবু ভরত হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর করে একটা বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করল। তাতেও কোনও লাভ হল না, লোহার বল্টু বসানো সেই বিশাল দরজা একেবারে পাষাণের মতন বন্ধ, এখন কে সে-দ্বার খুলবে!

ভরত ফিরে তাকিয়ে দেখল, জনতা থেকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে জনাতিনেক লোক, তাদের হাতে উদ্যত তলোয়ার, আর কিছু মুহূর্তের মধ্যেই তারা ভরতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভরত ভয়ে চোখ বুজে ফেলল, মৃত্যু বারবার তাকেই তাড়া করে আসে কেন? জীবন তাকে কেন আশ্রয় দিতে চায় না। জন্ম থেকেই যেন সে অভিশপ্ত। তা হলে সে জন্মাল কেন? এ জন্মের কোনও সার্থকতা রইল না, রাস্তার মধ্যে কিছু উন্মত্ত মানুষের হাতে তার প্রাণ যাবে, কেন প্রাণ দিতে হচ্ছে সেটাও সে জানতে পারবে না।

উঠে আবার পালাবার চেষ্টা করার মতন ক্ষমতা নেই ভরতের। জলে ডোবা মানুষের মতন অসহায়ভাবে কুঁকড়ে মুঁকড়ে গিয়ে পাগলের মতন বলতে লাগল, হে ভগবান, বাঁচাও, আমি কোনও দোষ করিনি, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও!

পরপর দু'বার বন্দুকের গুলির শব্দ হল সেই বাড়িটির এক জানলা থেকে। তাতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জনতা। ওপর থেকে কেউ একজন জলদগাম্ভীর স্বরে বলল, হঠে যা, সব হঠে যা। আগে ফাঁকা আওয়াজ করেছি, এবার সত্যিই গুলি মারব।

জনতা তবু চিৎকার করে উঠল এবং সত্যিই আরও দু'বার গুলির আওয়াজ হল।

এরপর জনতার ছত্রভঙ্গ হতে আর দেরি লাগল না। সাধারণ কোনও ভারতীয়ের বাড়িতে বন্দুক-পিস্তল থাকে না, সরকারি আইনে নিষিদ্ধ। জনতার কাছেও কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই, সুতরাং এ বাড়িকে ভয় পেতেই হবে।

সেই কঠিন দরজা যখন খুলে গেল, তখনও ভরত মাটিতে শুয়ে থরথর করে কাঁপছে। সে বীরপুরুষ নয়, আসন্ন মৃত্যুর সামনে সে শান্তভাবে দাঁড়াতে পারে না, সে যে বাঁচতে চায়, সে ভীষণভাবে বাঁচতে চায়।

দরজা খুলে যাবার পরেও ভরত যে এ যাত্রা বেঁচে গেল, তাও সে বুঝতে পারছে না। সে হে ভগবান, হে ভগবান করে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় সে নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকেছিল, কিন্তু চরম বিপদের সময় সে মনের জোর থাকে না। তখন ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর কাছে সাহায্য চাইবার কথা মনে পড়ে না।

দু'জন ভৃত্য শ্রেণীর লোক ভরতকে তুলে নিয়ে ভিতরের এক উঠোনে শুইয়ে দিল। ভরত জ্ঞান হারায়নি, সে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বন্দুকধারী বলশালী পুরুষ, মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি, মাথায় একটা শোলার টুপি। তিনি উর্দুতে জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোমার? কোন মহল্লায় বাড়ি?

ভরত কী নাম বলবে? এ বাড়ি হিন্দুর না মুসলমানের? শুধুমাত্র নাম শুনেই তাকে আবার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কি? মিথ্যে নাম বলেও কি পার পাওয়া যাবে?

ভরত নিজের নামটাই বলল।

লোকটি বলল, তুমি বেওকুফের মতন এত রাত্রে পথে বেরিয়েছ কেন? জান না শহরে দাঙ্গা লেগে গেছে? হিন্দুরা মুসলমান বস্তিতে আগুন লাগিয়েছে, মসজিদের সামনে শুয়োর মেরেছে, মুসলমান মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করেছে, তাই মুসলমানরাও ক্ষেপে গিয়ে বদলা নিতে শুরু করেছে!

ভরত কম্পিতভাবে হাত জোড় করে বলল, আমি জানি না, আমি কিছু টের পাইনি, আমায় মাফ করুন, আমি কোনও দোষ করিনি!

এ বাড়ির অধিপতির নাম মির্জা খোদাবক্স, তিনি পাটনার পুলিশ বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট। রাত্রির দিকে তিনি নিয়মিত সরাব পান করেন, তাই চক্ষু লাল, কিন্তু তেমন নেশাগ্রস্ত নন। ভরত কী কাজ করে, কোথায় থাকে সব জেনে তিনি ভরতের মাথার ক্ষত পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, আজ রাতে তোমার আর ঘরে ফেরা হবে না, আজ এখানেই শুয়ে

থাকো।

ভরত তার ভগবানের কাছে বাঁচার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেছিল, সেই মতোই তার ভগবান যেন পাঠিয়ে দিলেন ত্রাতা হিসেবে এক পুলিশ অফিসারকে।

সে রাত্তিরে তো বটেই। তার পরের দু'দিনও ভরতের বাড়ি ফেরা হল না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি চলছে চতুর্দিকে। গোহত্যা বন্ধের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে মানুষ হত্যা চলছে নির্বিকারে। ক্রমশ জানা গেল, শুধু পাটনায় নয়, এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের নানা প্রান্তে, গয়া, আজমগঞ্জ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মহারাষ্ট্রে। উড়িষ্যা-বাংলা-আসাম-ত্রিপুরায় অবশ্য কিছু ঘটেনি।

এর আগেও যে হিন্দু-মুসলমানে মারামারি হয়নি তা নয়। প্রতিবেশীর কলহ কিংবা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে সংঘর্ষ অনেক সময় দাঙ্গার আকার নিয়েছে, কিন্তু তা এক স্থানেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, এরকমভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে আগুন ছড়ায়নি। যেখানে যেখানে গোরক্ষণী সভা স্থাপিত হয়েছে, জোর প্রচার চলেছে, সেইসব জায়গাতেই শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিহারের দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, দুমরাঁও-এর মহারাজা এবং আরও অনেক হিন্দু জমিদার গোরক্ষার সমর্থনে প্রচুর চাঁদা দিয়েছেন। একদল উগ্র হিন্দু, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তারা এই সুযোগে যবন-নিধনে মেতেছে। সম্রাট আকবরের আমলে হিন্দু সাধু দেখলেই ফকিররা তাদের খুন করত, সেই জন্য আকবরের পারিষদ বীরবল সম্রাটকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হিন্দু সাধুদের রক্ষা করার জন্য একদল অব্রাহ্মণ সাধুদের হাতে অস্ত্র দিতে রাজি করিয়েছিলেন, এতদিন পর সেই সব সাধুরাই যেন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে।

দাঙ্গার সময় অনেক অনেক গুজব, অনেক অলীক, অতিরঞ্জিত কাহিনী ছড়ায়। কে আগে শুরু করেছে তা নিয়ে দুই সম্প্রদায়ই পরস্পরের ওপর দোষারোপ করে। নারী-নিগ্রহের কোনও ঘটনা না ঘটলেও কিছু বিকৃত রুচির মানুষ সেরকম গল্প বানাতে ভালবাসে। যত এরকম গল্প প্রচারিত হয়, ততই নিরীহ মানুষের রক্ত গড়ায় পথে পথে।

ভরতের মাথা থেকে প্রচুর রক্তপাত হলেও ক্ষতটি মারাত্মক হয়নি। কিন্তু তার বিষম মন খারাপ। কংগ্রেসে যোগ দিতে মুসলমানরা এমনিতেই দ্বিধান্বিত, এই সব ঘটনা ঘটলে তারা আরও পিছিয়ে যাবে। তার বন্ধু ইরফানের কথা মনে পড়ে। সে আছে মুর্শিদাবাদে। ইরফানই তাকে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, এখন কি ইরফানও সন্দিহান হয়ে উঠবে।

মির্জা খোদাবক্সের বাড়িতে তার যত্নের ত্রুটি নেই। সেলিনা নামে একটি পরিচারিকা তার দেখাশুনো করে, মাঝবয়েসী আঁটসাঁট চেহারার এই রমণীটির জিভে বেশ ধার আছে, কিন্তু অন্তরটি কোমল। প্রথম দিনই সে ঝংকার তুলে জিজ্ঞেস করেছিল, কী গো, তুমি তো হিঁদু, তার ওপর আবার ব্রাম্ভন নাকি? তা হলে তো আমাদের হাতের ছোঁওয়া খাবে না, নিজের রুটি নিজে পাকিয়ে নিতে হবে। তোমরা হিঁদুরা কি কাঁচা সবজি খাও?

ভরত এ সব কথা কখনও চিন্তাই করেনি। সে বলেছিল, আমি ব্রাহ্মণ নই। আপনারা যা খান, আমি সবই খেতে পারি। গোস্ত-এও আপত্তি নেই।

সেলিনা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেছিল, বড় গোস্ত এ বাড়িতে ঢোকে না। খোদ মালিকের বারণ।

থালা ভর্তি খাবার সাজিয়ে এনে সে বলে, হিঁদুরা মোছলমানদের ধরে ধরে মারছে, আর এ বাড়িতে আমরা একটা হিঁদুকে খাইয়ে দাইয়ে পুষছি। মালিকের যে কী মর্জি! আমার ইচ্ছে করে তোমার খাবার মধ্যে জহর মিশিয়ে দিই!

ভরত এক টুকরো রুটি মুখে তুলতে গিয়েও বলে, সত্যি মিশিয়ে দিয়েছেন নাকি?

সেলিনা তখন হেসে কুটিকুটি হয়। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে, আহা রে, যে-সব মানুষগুলো মরে, তাদের মায়েদের কত কষ্ট। তোমাকে মারলে তোমার মা কেঁদে কেঁদে কত ডাকবে তোমাকে! তোমার জরু-বাচ্চারা কোথায়?

ভরতের সেরকম কেউ নেই শুনে সে থুতনিতে আঙুল দিয়ে বলে, ও মা, এত বয়েসেও শাদি

করোনি ? তোমার মায়ের তো তা হলে কষ্টের শেষ নেই !

ভরতের কল্পিত মায়ের কথা চিন্তা করে সেলিনার চোখ ছলছলিয়ে আসে।

ভরত ভাবে, সেলিনার মতন মেয়ে তো সব জাতেই আছে, তবু ধর্মের এত তফাত কেন ?

ইংরেজ সরকার পুলিশ নামিয়ে তিনদিনের মধ্যে ঠাণ্ডা করে দিল দাঙ্গা। উপদ্রুত এলাকায় বসানো হল পিটুনি কর। কলকাতার ইংরিজি কাগজগুলো বিদ্রূপ করে লিখল, হিন্দু ও মুসলমানরা বর্বরের মতন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। ইংরেজ শাসন এ দেশের পক্ষে যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা আর একবার প্রমাণিত হল।

মির্জা খোদাবক্স ব্যস্ত ছিলেন, তিনি একবার করে শুধু উঁকি দিয়ে ভরতের খবর নিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ভরতের বিশেষ কথা হয়নি। তবে, ভরত বিদায় নেবার সময় তিনি যে কথাগুলো বললেন, তা দাগ কেটে গেল ভরতের মনে।

তিনি বললেন, এ দাঙ্গায় মুসলমান মরেছে, হিন্দুও মরেছে। কিন্তু দাঙ্গা বাধাবার জন্য হিন্দুরাই দায়ী। আমি গো-মাংস খাই না, আমার পরিবারের কেউ খায় না। কিন্তু গোরু-কোরবানি নিষিদ্ধ করার জন্য হিন্দুদের যে উৎসাহ, তা এ দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে ! এ আঘাত প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আঘাত। কংগ্রেস থেকে সরকারের সব কাজে এ দেশের লোকদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা হচ্ছে। আইন সভায়, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রতিনিধিত্ব পেতেও শুরু করেছে, কিন্তু তারা কারা ? হিন্দুরাই শিক্ষাদীক্ষায় বেশি অগ্রসর, তারাই বেশি সুযোগ পাচ্ছে। এতকাল হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা ছিল না, এখন ক্ষমতা পেয়েই যদি তারা মুসলমানদের অধিকার খর্ব করতে শুরু করে, তা হলে মুসলমানরা তা মানবে কেন ? গোরক্ষা হল মুসলমানদের ওপর সেই জুলুমের প্রথম চিহ্ন।

বিষ্ণুকান্ত সহায়ের বাড়িতে পণ্ডিতজির মুখে ভরত যে-কথা শুনেছিল, সেটা তার বলার ইচ্ছে হয়েছিল একবার। হিন্দু আর মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্তত গোরু-কাটা বন্ধ করে ইংরেজদের জব্দ করতে পারে না ? তারপরেই তার মনে পড়ল, মির্জা খোদাবক্স ইংরেজ সরকারের পুলিশ, তাঁর কাছে ইংরেজ-বিরোধী কোনও কথা বলা সঙ্গত হবে না।

মির্জা বক্স সাহেব এর পরে আর একটি মোক্ষম কথা বললেন। তিনি বললেন, হিন্দুদের আর কোনও দেশ নেই, মুসলমান আছে সারা দুনিয়ায়। মুসলমান কখনও শুধু ভারতীয় হবে না, সে অন্য দেশের মুসলমানের সঙ্গে ভাই-বেরাদরি ছাড়বে না কিছুতেই। হিন্দুরা সারা ভারতকে এখন এককাট্টা করতে চায়, তাতে তাদের লাভ আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারবে। মুসলমান তা মানবে কেন ? সারা ভারত যত এক হতে চাইবে, তত বিচ্ছিন্নতা বাড়বে, দুই সম্প্রদায় তত দূরে সরে যাবে, এই আমি বলে রাখলাম !

১২

কটক শহরে ভরতের বাসা-বাড়ির খুব কাছেই থাকেন এক বিশিষ্ট বাঙালি দম্পতি। বিহারীলাল গুপ্ত এখানকার ডিস্ট্রিক্ট জজ, শহরের সবাই তাঁকে মান্য করে। এত বড় পদাধিকারী হয়েও বিহারীলাল নিজেকে আড়ালে সরিয়ে রাখেন না, তিনি অতিথি বৎসল, প্রায়ই তাঁর বাড়িতে সান্ধ্য আসর বসে, গান-বাজনা হয়। অনেককেই তিনি আমন্ত্রণ জানান, শুধু কোনও উকিল-মোক্তারের সঙ্গে তিনি বাড়িতে দেখা করেন না। আদালত থেকে ফেরার পর আর আইনের কচকচি তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়।

বিহারীলালের স্ত্রী সৌদামিনী অতি স্নেহশীলা রমণী। বাড়িতে বাবুর্চি ও দাস-দাসীর অভাব নেই,

তবু তিনি প্রায় প্রতিদিনই নিজের হাতে কিছু না কিছু রান্না করেন এবং অতিথিদের ডেকে খাওয়ান। মানুষকে নিজের হাতে কিছু খাইয়ে তাঁর ভারী তৃপ্তি হয়। তাঁর পাতলা ছোটখাটো চেহারা, নিজে খুবই কম খান, কিন্তু অন্যদের খাবার জন্য বারবার জোর করেন। শুধু মানুষদের নন, পশু-পাখিদেরও খাওয়ান তিনি। ভোরবেলা উঠে ছোলা ছড়িয়ে দেন পায়রাদের জন্য। বাগানে একটি পোষা হরিণকে তিনি নিজের হাতে ঘাস খাওয়ান। এমনকী সহিসরা যখন ঘোড়াদের খড়-বিচালি খেতে দেয়, তিনি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন।

বিহারীলাল এবং সৌদামিনী ব্রাহ্ম এবং কলকাতার ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। সৌদামিনী এক সময় স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে 'সখি সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কটকে এসেও স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে একটি সমিতি গড়েছেন। তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখা, গান-বাজনা, সূচিশিল্প, ছবি আঁকার উৎসাহ দেন। তাঁর ব্যবহারে এমন একটা সহজ স্বাভাবিকতা আছে, যা সকলকেই আকৃষ্ট করে। নারী-পুরুষের ভেদাভেদ তিনি একেবারেই মানেন না, তাঁর বাড়িতে যে-সব মেয়েরা আসে তারা যদি পুরুষদের সামনে ঘোমটায় মুখ ঢেকে, মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে থাকে, তিনি তাদের ধমক দিয়ে বলেন, হ্যাঁ রে, তোরা কি মাটির পুতুল, কথা বলতে পারিস না ? পুরুষ মানুষদের মুখ দেখাবি না, তা হলে ভগবান তোদের এত সুন্দর মুখ দিয়েছেন কেন ?

ভরতের মতন একজন সাধারণ ব্যাঙ্ক-কর্মচারীও এ বাড়িতে আমন্ত্রণ পায়। তার কারণ এই নয় যে সে প্রতিবেশী ও বাঙালি, এই গুপ্ত দম্পতি বাঙালি-অবাঙালির কোনও ভেদ মানেন না, উড়িষ্যার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এখানে নিয়মিত আসেন, বেশির ভাগ ওড়িয়া মহিলাই সৌদামিনীর সখি সমিতির সদস্যা।

এ বাড়ির লোহার গেটের সামনে দিয়ে ভরতকে যাতায়াত করতে হয়, বিহারীলাল নিজে একদিন ভরতকে ডেকে আলাপ করেছিলেন। ভেতরে এনে বসাবার পর যথারীতি সৌদামিনী এক থালা ভর্তি খাবার দিয়েছিলেন এবং খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেছিলেন। এখন ভরত দু'তিনদিন না এলে সৌদামিনী হঠাৎ ভরতের ক্ষুদ্র একতলা বাড়িটিতে হানা দেন, তার রান্নাঘরে উঁকি মারেন, সারাদিন সে কী কী খেয়েছে তার ফিরিস্তি শুনে শিউরে উঠে বলেন, এই খেয়ে মানুষ বাঁচে ? জোয়ান ছেলে, বিদেশ-বিভুঁয়ে একা পড়ে থাকা, কেউ দেখার নেই...।

চতুর্ভুজ নামে একটি লোককে রেখেছে ভরত, সে তার গৃহস্থালি সামলায় ও রান্না করে দেয়। নামের সঙ্গে তার স্বভাবের বড়ই অমিল। একটা ভুজও নাড়াচাড়া করতে তার খুবই আলস্য, এবং সে রান্নাটা খুবই খারাপ করে। সে সর্বক্ষণ শুয়ে থাকতে ভালবাসে। তবে তার প্রধান যোগ্যতা এই, সে চোর নয়।

জজসাহেবের পত্নী ভরতের বাড়ির অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে রান্নাঘরে ঢুকে চতুর্ভুজকে রান্না শেখাবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হন, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে আদেশ করেন, চলো, আমার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসবে চলো !

ভরতের আপত্তি তিনি কিছুতেই শোনেন না। তাঁর এই স্নেহের অত্যাচার ভরতকে মেনে নিতেই হয়।

ভরত সম্পর্কে দুটি কৌতূহল এই গুপ্ত-দম্পতির এখনও মেটেনি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাল ছাত্র হয়েও ভরত কেন এই কটক শহরে একটা ব্যাঙ্কের চাকরি করতে এল ? এবং শিক্ষিত যুবক হয়েও সে কেন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেনি ?

এ দুটি প্রশ্নেরই ভরত ঠিক সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। সে সুকৌশলে এড়িয়ে যায়।

বিহারীলালের বাড়িতে মাঝেমাঝেই প্রার্থনা সভা হয়, উড়িষ্যার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন, এবং যেন সেই ধর্মের অঙ্গ হিসেবেই তাঁরা বাংলায় কথা বলেন, বাংলা গান করেন। ভরত সেই সব সভার এক কোণে বসে থাকে এবং ওড়িয়া ভদ্রলোকদের কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করে। এই গৃহে বাঙালি-ওড়িয়াদের একাত্মতা কিছুটা বিস্ময়করই বটে।

কারণ, ভরত জানে, সে তার কর্মস্থলে এবং হাটে-বাজারে ঘুরে দেখেছে, বাঙালিদের প্রতি ওড়িয়া

ভদ্রলোকদের বেশ বিদ্বেষের ভাব আছে। বাঙালিরাই তার জন্য অনেকাংশে দায়ি।

উড়িষ্যা নামে কোনও আলাদা রাজ্য নেই, তা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। সেটা ইংরেজরা করেছে প্রশাসনিক কারণে, কিন্তু বাঙালিরা মনে করে, উড়িষ্যা যেন বাংলারই একটা অংশ। ওড়িয়াদের নিজস্ব ভাষার কোনও মর্যাদা নেই। সর্বত্র বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব স্কুল-কলেজে বাংলা পড়ানো হয়, অধিকাংশ শিক্ষক, এমনকী প্রধান শিক্ষকরাও বাঙালি। উকিল-ব্যারিস্টার-জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-ডাক্তারদের মধ্যেও বাঙালির সংখ্যা প্রচুর। অনেক জমিদারিও বাঙালিদের। এই বাঙালি-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ওড়িয়াদের ক্ষোভ জমছে দিন দিন। তারা যত শিক্ষিত হচ্ছে, ততই নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মর্যাদাবোধ জাগছে, বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির চাপে সেই মর্যাদা হারাতে তারা কিছুতেই রাজি নয়।

অবশ্য উড়িষ্যার কিছু কিছু লেখক প্রথমে বাংলা ভাষাতে সাহিত্য শুরু করেছিলেন, বাংলা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে তাঁরা বাঙালিদের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেদের ভাষায় ফিরে এসেছেন।

বিহারীলালের বাড়ির আসরে প্রায়ই আসেন মধুসূদন রাও, তিনি উড়িষ্যার একজন গণ্যমান্য কবি। তিনি বাংলাতেও কবিতা লিখেছেন, কলকাতার পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। মধুসূদন রাও নির্বিবাদী শান্তশীল মানুষ, কিন্তু ফকিরমোহন সেনাপতি নামে আর একজন লেখকের সঙ্গে ভরতের আলাপ হয়েছে, তিনি অত্যন্ত উগ্র ধরনের। ভরতের ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে। তিনি কেঁওনঝর স্টেটের ম্যানেজার, মধ্যে মধ্যে কটকে আসেন, তখন ব্যাঙ্কে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে যান। তিনি হাসতে হাসতে এমন সব গল্প বলেন, যার মধ্যে তীব্র বিদ্রূপ আর রাগ ঝকঝক করে।

একদিন তিনি বলেছিলেন, তাঁর অল্প বয়েসের এক কাহিনী। বালেশ্বর জেলায় গভর্নমেন্ট স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনি পড়াতেন ওড়িয়া আর সংস্কৃত। সে ভদ্রলোক ওড়িয়া ভাষা পড়তে পারতেন মোটামুটি, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারতেন না একেবারেই। ওড়িয়া ভাষার ন এবং ণ-এর উচ্চারণ আলাদা, বাঙালিরা মূর্ধ ণ-এর উচ্চারণ জানেই না। ওড়িয়াতে ল-এর উচ্চারণও অন্যরকম। ভটচার্যিমশাই এমন বিকৃত উচ্চারণ করেন যে তা হাসির উদ্রেক করে। তিনি 'হে বালকগণ' এর বদলে বলেন 'হে বাড়ক্ গনো', তা শুনে ছাত্ররা হেসে গড়াগড়ি যায়।

ছাত্রদের হাসি থামানো যাচ্ছে না দেখে ভট্টচার্যিমশাই এক বুদ্ধি বার করলেন। একদিন তিনি বলেই ফেললেন, আরে বাপু, ওড়িয়া তো আর আলাদা ভাষা কিছু নয়, বাংলারই বিকৃতি মাত্র, তা হলে আর ওড়িয়া ভাষা পড়ার দরকার কী?

তিনি ঝটপট একটা পুস্তিকা লিখে ফেললেন, 'ওড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নয়'। হেডমাস্টারও বাঙালি, তিনি সেই পুস্তিকাখানি জুড়ে দিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠালেন ইনসপেক্টরের কাছে। সেই সময়ে স্কুল বিভাগের ইনসপেক্টর যদিও সাহেব, কিন্তু তার অফিস মেদিনীপুরে এবং সেখানকার সব কর্মচারীই বাঙালি। সবাই মিলে সাহেবকে এমনভাবে বোঝাল যে সাহেব এক সার্কুলার দিয়ে দিল, বালেশ্বর গভর্নমেন্ট স্কুলে শুধু সংস্কৃত আর বাংলা পড়ালেই চলবে, ওড়িয়া পড়াবার দরকার নেই। উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদস্থ সব কর্মচারীই বাঙালি, সবাই বলল, ঠিক ঠিক। শুধু সরকারি স্কুলে কেন, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতেও ওড়িয়া ভাষা তুলে দেওয়া হোক।

এইভাবে ওড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত চলেছিল।

ছাত্ররাও তখন এর প্রতিবাদ করেনি। কারণ ওড়িয়া ভাষা তখন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও বাধ্যতামূলক ছিল না। পাস করার কোনও কড়াকড়ি নেই, তা বলে আর শুধু শুধু পড়তে যাওয়া কেন?

ফকিরমোহনই তখন কিছু লোককে বুঝিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সভা করে এর প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করেন।

এই কাহিনী বলার সময় হঠাৎ এক সময় থেমে গিয়ে তিনি ভরতের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ওহে, তা বলে সব বাঙালির নামেই আমি দোষ দিচ্ছি না। দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদ জন্মায়। এই

উড়িষ্যাতেই এমন বাঙালিও আছেন, যাঁদের উদ্দেশে আমি শত সহস্র প্রণিপাত করি। যেমন বাবু গৌরীশঙ্কর রায়। তিনি 'উৎকল দীপিকা' নামে পত্রিকা বার করেছেন, সেখানে প্রতি সপ্তাহে আমাদের ভাষার সমর্থনে প্রবন্ধ বার করতেন। অতি যুক্তিপূর্ণ সে সব প্রবন্ধ। তিনি আমাদের চেয়েও অনেক জোরাল ভাষায় আমাদের ভাষার পক্ষ নিয়ে লিখেছেন। তাঁর ভাই রামশঙ্কর রায় ওড়িয়া ভাষায় নাটক লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন!

উড়িষ্যার মানুষজনকে ভরতের বেশ ভাল লাগে। বেশির ভাগ মানুষই অতিথিপরায়ণ এবং ব্যবহারে আন্তরিক। ভরত সবাইকে কথায় কথায় জানিয়ে দেয়, তার জন্ম আসামে। স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী বাঙালিরা যখন ওড়িয়াদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তখন ভরত মানুষের চরিত্রের একটা বিচিত্র দিক দেখতে পায়।

শাসক ইংরেজরা এ দেশের মানুষদের অপমান করে কথায় কথায়। বাঁদর কুকুর এসব বলতেও ছাড়ে না। বাঙালিরা অন্যদের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় যতই এগিয়ে থাকুক, তবু তারা ইংরেজদের কাছে অনুগ্রহ-ভিখারি। ইংরেজরা অপমান করলে তারা গায়ে মাখে না, লাথি মারলেও হেঁ-হেঁ করে হাসে। সেই বাঙালিরাই আবার নিজের দেশের মানুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যখন তখন। এমন ভাব দেখায়, যেন তারা সকলের চেয়ে উঁচুতে। যে-বাড়িতে অনেক দাস-দাসী, সেখানে পুরনো ভৃত্যেরা প্রভুর সামনে হাত-জোড় করে তোষামোদ করে, প্রভু লাথি কষালেও সেটাকে মনে করে অনুগ্রহ, আবার সেই ভৃত্যরাই নতুন ভৃত্যদের দেখলে দাঁত খিঁচোয়, লাথি-ঝাঁটা মারে।

উড়িষ্যাবাসীদের ভরত নিজের আত্মীয়ের মতন মনে করে। এটা যে ভূমিসূতার দেশ। ভূমিসূতার সন্ধানেই তো সে সাত বছর আগে বাংলা ছেড়ে এতদূরে এসেছিল। কলকাতায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও ভূমিসূতার সন্ধান না পেয়ে সে ভেবেছিল, হয়তো রাগে-অভিমানে ভূমিসূতা ফিরে গেছে উড়িষ্যায়।

কিন্তু এখানেই বা কোথায় তাকে খুঁজে পাবে ভরত। সে তো বাড়ি বাড়ি ঢুকে দেখতে পারে না! কয়েক মাস ধরে কটক, পুরী, বালেশ্বর এই সব জায়গায় ঘুরেছে। শেষপর্যন্ত সে ক্লান্ত, রিক্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় পুরীর মন্দিরের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে তোলেনি, কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। মন্দিরের সামনে কত অনাথ-আতুর কুষ্ঠরোগী-পাগল থাকে, কে কার দিকে তাকায়! দু' চারজন পুণ্য সঞ্চয়কারী তার অজ্ঞান অবস্থাটাকে ভিক্ষের নতুন ঢং ভেবে একটা-দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

ভিক্ষেটাকেই জীবিকা করতে হয়নি অবশ্য। নিছক বেঁচে থাকার জন্য সে পোস্ট অফিসের সামনে গিয়ে বসে থাকত, লোকের মানি-অর্ডার ফর্ম লিখে দিয়ে একটা করে পয়সা নিত। কলকাতার তুলনায় এ অতি শস্তার দেশ; দিনে দশ-বারো পয়সা উপার্জন করলে দিব্যি দু'বেলার আহার জোটানো যায়। মন্দিরের চাতালে শুয়ে থাকার কোনও নিষেধ নেই।

ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। এইভাবে চলেছিল এক বছর। কলকাতায় না গিয়ে সে পুরীতেই পড়ে রইল এই আশায় যে, দৈবাৎ তো ভূমিসূতার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে! কত মানুষই তো জগন্নাথ মন্দিরে পুজা দিতে আসে। ভূমিসূতার যদি ইতিমধ্যে অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, তাতেও দুঃখ নেই ভরতের। সে শুধু ভূমিসূতার কাছে একবার ক্ষমা চাইতে চায়। ভূমিসূতার মর্মে গভীর আঘাত দিয়েছে সে, নিজে পুরুষ হয়ে সে পৌরুষের মর্যাদা রাখেনি। ভূমিসূতাকে সে নিজের জীবনসঙ্গিনী করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েও সে তাকে তুলে দিতে চেয়েছিল শশিভূষণের হাতে। এ কি কোনও পুরুষ মানুষের কাজ! কিন্তু তখন যে ভরতের মাথার ঠিক ছিল না। ভূমিসূতার কাছে একবার অন্তত ক্ষমা চাইতে না পারলে সে কিছুতেই শান্তি পাবে না।

কিন্তু দেখা হল না এত প্রতীক্ষার পরেও।

পুরীতেই এক ভদ্রলোক তাকে ব্যাঙ্কের চাকরির প্রস্তাব দেয়। শুধুমাত্র ভরতের হাতের লেখা দেখেই তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। এমন পাকা যার ইংরিজি লেখা, সে কেন এই সামান্য

কাজ করে ? কটকে নতুন ব্যাঙ্ক খোলা হচ্ছে, ইংরিজি জানা লোক দরকার, মোটামুটি স্কুল-পাস হলেই চলে, হাতের লেখাটি ভাল হওয়া চাই। কলকাতায় আর ফিরবেই না, ভরত ঠিক করে ফেলেছিল, তাই সে চাকরিটা নিয়ে নিল।

এই ক'বছরেই চাকরিতে তার বেশ উন্নতি হয়েছে, সে এখন প্রধান হিসাব-রক্ষক। কটকে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে তার। গুপ্তদের বাড়িতে সান্ধ্য আসরে তার যোগ দিতে ভাল লাগে। বিহারীলাল যদিও ইংরেজদের মন জুগিয়ে চলেন, কিন্তু উড়িষ্যার সাধারণ মানুষদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখান না। তিনি অন্য বাঙালিদের মতন নন।

বিহারীলাল ও সৌদামিনী মাঝে মাঝে ভরতের ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেবার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেন, ভরত গা করে না। ধর্ম সম্পর্কে তার আকর্ষণই নেই, সুতরাং এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণের যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না সে। ছোটবেলায় সে শশিভূষণের সঙ্গে একবার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চেম্বারে গিয়েছিল। তিনি ভরতকে বলেছিলেন, এই ছোঁড়া, সব সময় এইটা মনে মনে গুনগুন করবি, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'। কী ভেবে মহেন্দ্রলাল এই কথাটা বলেছিলেন, তা ভরত জানে না। কিন্তু এই লাইনটা তার মনে গেঁথে গেছে। শরীরের ফাঁদ থেকে ব্রহ্মেরও মুক্তি নেই ? তা হলে আর ব্রহ্মের বন্দনা করা কেন ?

ভরত পাটনা থেকে ফিরে আসার পর একদিন সৌদামিনী বললেন, ভরত, তুমি গান জান না ? এবারের মাঘোৎসবে আমরা রবিবাবুর 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটক করব ঠিক করেছি। পুরুষ গায়কের বড় অভাব। তুমি গলা দাও না !

ভরত লজ্জা পেয়ে প্রবল ভাবে মাথা নাড়ে। গান তার গলায় আসে না। প্রকাশ্যে গান গাইবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু সৌদামিনী ছাড়বেন কেন ? তাঁর মাথায় যখন যে ঝোঁক চাপে, সেটা তিনি করবেনই। তিনি জোর করে ভরতকে এক দস্যুর ভূমিকায় রিহার্সালে বসালেন। গান শেখাবেন বিহারীলাল, তিনি নিজে অভিনয় করবেন না যদিও। জজ সাহেবের পক্ষে মঞ্চে অভিনয় মানায় না। ভরতের গলায় সুর ওঠে না, তবু বিহারীলালের অসীম ধৈর্য, তিনি শিখিয়েই ছাড়বেন।

প্রথম কয়েকদিন না-না বললেও পরে ভরত বেশ মজা পেয়ে গেল। ১নং দস্যুর গান খুব সুরেলা না হলেও চলবে। সবাই মিলে মহড়া দেবার সময় বেশ হাসি-মস্করা হয়, এসব ভরতের পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা।

নারী-ভূমিকায় স্থানীয় ডাক্তার ও মাস্টার মশাইয়ের দুটি বাঙালি মেয়ে পাওয়া গেছে, অন্যরা ওড়িয়া মেয়ে। সবাই বাংলা বেশ ভাল বলে। এদের মধ্যে এক বালিকা ও সরস্বতী, এই দুই ভূমিকায় যে মেয়েটি মহড়া দিচ্ছে, তার উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর দুইই চমৎকার। মেয়েটির নাম মহিলামণি। সে বালবিধবা। উড়িষ্যায় বিধবাবিবাহের চল হয়নি, নইলে তাকে রমণীরত্নই বলা উচিত। সে কিছু লেখাপড়া শিখেছে, ব্যবহারেও বেশ সপ্রতিভ, শরীরে লাবণ্য আছে। মহিলামণি এখানকার সখি সমিতির সহকারি পরিচালিকা, সে এই গুপ্ত পরিবারেই দিনের অনেকখানি সময় কাটায়। সৌদামিনী তাকে নিজের কন্যার মতন ভালবাসেন।

মহড়া দিতে দিতে বিহারীলাল বললেন, প্রথম আমি যখন ঠাকুর বাড়িতে এই নাটকের অভিনয় দেখি, তাতে সত্যেন্দ্রনাথ, রবিবাবু সবাই অভিনয় করেছিলেন। হিরোইন হয়েছিল সত্যেনবাবুর আর এক ভাইয়ের মেয়ে, তার নাম প্রতিভা, যেমন তার রূপ, তেমনই গানের গলা। সেই প্রতিভার নামেই তো বাল্মীকি প্রতিভা। সত্যি বলব, আমাদের মহিলামণি যেন সেই প্রতিভাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে অভিনয়ে !

মহিলামণি হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে বলে, মামাবাবু, আপনি অত বাড়িয়ে বললে কিন্তু পার্ট করব না।

বিহারীলাল বলেন, না গো, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। তোমার মাসিমা সে অভিনয় দেখেননি, না হলে তিনিও স্বীকার করতেন।

দস্যুসর্দার বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করছে সরকারি স্কুলের অঙ্কের মাস্টার হেরম্বচন্দ্র দাস। সে বলল, ইয়োর অনার, আমার পার্টটা সেই তুলনায় কেমন হচ্ছে বললেন না তো !

বিহারীলাল বললেন, তোমারও বেশ ভালই হচ্ছে। কিন্তু সেদিনে বাল্মীকির ভূমিকায় নেমেছিলেন রবিবাবু। তাঁর সঙ্গে তো আর তোমার তুলনা করতে পারি না। তিনি যে সরস্বতীর বরপুত্র।

কয়েকদিন পর রিহার্সালে নতুন করে উৎসাহ সঞ্চারিত হল একটি সংবাদ শুনে। স্বয়ং নাট্যকার রবীন্দ্রবাবু শিগগিরই আসছেন কটকে। বালিয়াতে ঠাকুরদের জমিদারি আছে, তিনি আসছেন সেই জমিদারি পরিদর্শনে। বিহারীবাবু সত্যেন্দ্রবাবুর বন্ধু, সেই সুবাদে রবীন্দ্রবাবু কটকে এসে এ বাড়িতে এসেই উঠবেন।

নাট্যকারকে এই গোষ্ঠীর অভিনয় দেখানো যাবে বলে দারুণ ভাবে রিহার্সাল চলতে লাগল প্রতিদিন। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সেরে আসতে ভরতের এক একদিন একটু দেরি হয়ে যায়, তার জন্য সে সৌদামিনীর কাছে বকুনি খায়। বিহারীলালের তো কোনও অসুবিধে নেই তিনি পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আদালতে শুনানি মুলতুবি করে চলে আসেন। হেরম্ব মাস্টারের চারটের সময় ছুটি হয়ে যায় ! কিন্তু ভরতকে যে সব হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হয়।

এরই মধ্যে একদিন ভরতের এক আশ্চর্য উপলব্ধি হল। মহিলামণি বলে যাচ্ছে সরস্বতীর পার্ট :

দীনহীন বালিকার সাজে
এসেছিনু এ ঘোর বন মাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন
কেন বৎস, শোন তাহা শোন্।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান...

বলতে বলতে মহিলামণি একদিকে মুখ ফেরাল, সঙ্গে সঙ্গে ভরতের বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। অবিকল ভূমিসূতার মতন তার মুখের পার্শ্বরেখা !

মহিলামণিকে ভরত প্রায় এক বছর ধরে দেখছে, তেমন সখ্য গড়ে না উঠলেও দুটি-একটি কথাও বলেছে। কখনও তো এমন মনে হয়নি ! আজ মনে হচ্ছে কেন ? তা হলে কি ভরত তার মুখের ঠিক এই ভঙ্গিটি আগে কখনও দেখেনি ?

ইচ্ছে করে ভরত উঠে গিয়ে অন্য জায়গা থেকেও মহিলামণিকে ভাল করে লক্ষ করল। সামনাসামনি কোনও মিল নেই, ভূমিসূতা আর মহিলামণিকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলেও কোনও মিল পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে-ই সে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে দৃষ্টি নত করছে, অমনি তাকে ভূমিসূতা বলে মনে হয়। হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই।

তা হলে কি ভূমিসূতার সঙ্গে মহিলামণির কোনও আত্মীয়তা আছে ? ওরা সম্পর্কে বোন হতে পারে। আপন বোন না হোক, মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যেও অনেক সময় মুখের মিল থাকে। মহিলামণির কাছে ভূমিসতার সন্ধান পাওয়া যাবে ?

পরের দিনও ভরতের পৌঁছতে দেরি হল। সৌদামিনী কৃত্রিম তর্জন-গর্জন করতে লাগলেন তার ওপর। ভরত সেসব কিছু শুনল না। সে দেখল, ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে মহিলামণি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। ঠিক যেন ভূমিসূতা তাকে কিছু বলছে নীরব ভাষায়।

১৩

অনেকদিন পর দুই বন্ধুতে দেখা। কলেজ জীবন থেকে বহুদূর সরে এসে দু'জনেই এখন প্রতিষ্ঠিত। দ্বারিকা এখন ছোটখাটো জমিদার, তবে খুলনা জেলায় সে তার জমিদারি সন্দর্শনে বছরে একবার, দু'বার যায় মাত্র, অধিকাংশ সময়েই কলকাতায় থাকে। দ্বারিকার সাহিত্য সাধনার শখ ছিল, সেইজন্য সে 'নবজ্যোতি' নামে একটি পত্রিকার মালিক হয়েছে, সেখানে সে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিজের কবিতা প্রকাশ করে।

যাদুগোপালেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিটেছে অনেকখানি। সে বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিল ঠিকই, পাশ করে ফিরে এসে হাইকোর্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির একটি কন্যাকে বিবাহের সাধও মিটেছে তার। রানি রাসমণির বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সে এখন প্র্যাকটিস জমাতে ব্যস্ত। দ্বারিকানাথের তুলনায় যাদুগোপালেরই কবিত্ব শক্তি অনেক বেশি ছিল কিন্তু সে আর একেবারেই কবিতা রচনা করে না, আইনের কচকচির মধ্যে কবিতার স্থান কোথায় ? বন্ধুদের সঙ্গে রসালাপের সময় অবশ্য সে এখনও মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠে।

মেডিক্যাল কলেজের বিপরীত দিকে প্রতাপ চাটুজ্যের গলিতে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বাড়ি করেছেন। সেই বাড়ির সদরের সামনে বিকেলবেলা দুই বন্ধু মুখোমুখি হয়ে গেল। শীতকাল শেষ হয়ে গিয়েও হঠাৎ ক'দিন আবার একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। দ্বারিকানাথের তসরের পাঞ্জাবির ওপরে একটি বহুমূল্য কাশ্মীরি শাল জড়ানো। তার মুখে বেশ পুরুষ্টু গোঁফ। যাদুগোপালের অঙ্গে বিলাতি পোশাক।

বঙ্কিমবাবু কয়েকদিন ধরে বেশ অসুস্থ, তাঁর বহু ভক্ত, বন্ধু ও শুভার্থীরা উদ্বিগ্ন হয়ে খবর নিতে এসেছে, বৈঠকখানা ও বাড়ির অন্দরে খুব ভিড়।

কুশল আদান-প্রদানের পর যাদুগোপাল জিজ্ঞেস করল, কী রে দ্বারিকা, তুই কি তোর পত্রিকার জন্য লেখার তাগাদা দিতে এসেছিস নাকি ? অসুস্থ মানুষটাকেও ছাড়বি না !

দ্বারিকা শুষ্ক মুখে বলল, নারে ভাই, উনি অনেকদিনই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন জানিস না ? আমার কাগজে উনি একটাও লেখা দেননি।

যাদুগোপাল বলল, তোকে উনি কত স্নেহ করতেন, ছাত্র বয়েস থেকেই তোর এখানে যাতায়াত ছিল, তবু তোকে লেখা দেননি।

দ্বারিকা বলল, আরে আমি তো কোন ছাড়। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর উনি একটাও উপন্যাস লিখলেন ? কত জন পীড়াপীড়ি করেছেন। 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ওঁকে একটি নতুন উপন্যাসের জন্য পাঁচশো টাকা দিতে চেয়েছিলেন। আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম। বঙ্কিমবাবু অরাজি হওয়ায় সেই সম্পাদক আরও টাকা বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু ওঁর সেই এক গোঁ, গড়গড়ার নল টানতে টানতে বলতে লাগলেন, না, আমার দ্বারা হবে না।

যাদুগোপাল বলল, পাঁচশো টাকা তো কম নয়। এর আগে অত টাকা কেউ দিয়েছে উপন্যাসের জন্য ?

দ্বারিকা বলল, পাঁচশো কী বলছিস। 'জন্মভূমি'র সম্পাদক চলে যাবার পর আমি বললাম, জ্যাঠামশাই, আপনাকে আমি এক হাজার টাকা দেব। প্রাচীন ভারত নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার কথা আপনি এক সময় বলতেন, সেটা লিখে দিন, তাতে আমার কাগজ দাঁড়িয়ে যাবে। উনি কী উত্তর দিলেন জানিস ? সেই একই ভাবে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে টানতে টানতে বললেন, দ্বারিকা, তুই যদি কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আমাকে বলি দিতে চাস, তাতেও রাজি আছি। কিন্তু আমাকে আর

লিখতে বলিস না !

যাদুগোপাল বলল, বয়েস তো ওঁর বেশি নয়, পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে বোধহয়, এর মধ্যেই সাহিত্য সম্রাট অবসর নিতে চাইলেন কেন ? রাজা-বাদশারা তো কেউ অবসর নিতে চান না ?

দ্বারিকা বলল, ওঁর মন ভেঙে গেছে। স্বর্ণকুমারী দেবী কতবার এসেছেন, ওঁর নাতিদের জন্য কত খেলনা দিয়েছেন, তবু 'ভারতী'র জন্য লেখা পাননি। রবিবাবু এসেছেন 'সাধনা'র জন্য, সুরেশ সমাজপতি এসেছেন 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য। এমনকী বঙ্কিমবাবুর বেয়াই দামোদরবাবু কত ঝুলোঝুলি করেছেন 'নব্যভারতে' একটা কিছু লেখার জন্য, সবাইকেই উনি বলেছেন, আমি আর পেরে উঠব না। ওঁর মেয়ের মৃত্যুর পরই উনি যেন গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে।

যাদুগোপাল বলল, ওঁর ছোটমেয়ে উৎপলকুমারী আত্মহত্যা করেছে শুনেছি। ভেরি স্যাড !

দ্বারিকা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, আত্মহত্যা নয়। ভেতরের খবর তো সব আমি জানি। আরও জঘন্য, আরও কুৎসিত ব্যাপার ! ওঁর জামাই মতীন্দ্রটা তো একটা নরপশু !' মদ, জুয়া, গাঁজা, পরদার গমন, কোনও গুণেরই ঘাটতি নেই। ওর নজর আবার গেরস্থ ঘরের বউদের দিকে। বন্ধু বান্ধবও জুটেছে সেই রকম, টাকা উড়িয়েছে দু'হাতে। উৎপলার কাছে বারো হাজার টাকার গয়না ছিল, মতীন বারবার সেই গয়নাগুলো চাইত। উৎপলা দেবে কেন, ওই গয়নাই তো তার শেষ সম্বল। মতীন তখন করল কী এক বদ বন্ধুর সঙ্গে মতলব এঁটে ডাক্তারের কাছ থেকে বিষ নিয়ে এল, ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিল বউকে। ভেবেছিল, বউ অজ্ঞান হয়ে গেলে গয়নাগুলো নিয়ে চম্পট দেবে। বিষ খেয়ে উৎপলা মরেই গেল দেখে মতীন তখন তার গলায় কাপড় বেঁধে কড়িকাঠে টাঙিয়ে দেয়। তাইতে লোক প্রথমে ভেবেছিল আত্মহত্যা। পরে মেয়েটার শরীর কেটে কুটে পোস্ট মর্টেমে বিষ পাওয়া গেছে।

যাদুগোপাল বলল, কিন্তু আদালতের রায়ে তো আত্মহত্যাই বলেছে ?

দ্বারিকা বলল, মেয়ে যখন মারাই গেছে, তখন আর পরিবারের কুৎসা বাইরে ছড়াতে চান নি বঙ্কিমবাবু। আদালতে কেস কনটেস্ট করেননি। মতীনের ঠাকুর্দাও নাতিকে বাঁচাবার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিলেন।

যাদুগোপাল অস্ফুট স্বরে বলল, কুন্দনন্দিনী !

দ্বারিকা বলল সেই কথাই মনে পড়ে, তাই না ? উনি নিজেও আফশোস করে অনেকবার বলেছেন, আমি কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি, আর আমার অদৃষ্টেই আমার নিজের মেয়ে বিষ খেয়ে মরল। দ্যাখ যাদু, এতবড় একজন লেখক, আরও কত কিছু লিখতে পারতেন, কিন্তু জীবন থেকে শান্তিটাই চলে গেল। কিছুদিন ধরেই বলতে শুরু করেছেন, উনি আর বাঁচবেন না, বাঁচতে চান না। কত লোক ওঁর মনে আঘাত দিয়েছে। নিজের পৈতৃক ভিটে কাঁঠালপাড়াতেও আর যেতে চান না। রাগ করে বলেছেন, ওখানে আর পা দেব না। দাদারা ভাল ব্যবহার করেননি, নিজের উপার্জনের টাকায় দাদাদের সংসার বহুকাল টেনেছেন, তবু কৃতজ্ঞতা বলে কোনও বস্তু নেই। সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলেটি তো ওঁকে জ্বালিয়েছে সারাজীবন। নৈহাটির ভট্টাচার্যিরা ওঁর পেছনে লেগেছিল। এক ব্যাটা ভট্টাচার্যি তো সামান্য এক টুকরো জমির জন্য মামলা করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে বঙ্কিমবাবু একজন ঠক, প্রতারক। এক সবের জন্যই তো মন ভেঙে গেছে।

যাদুগোপাল বলল, আমি লোকমুখে শুনেছি, উনি ইদানীং অনেককে বলতেন ধর্ম অনুশীলন করে ধর্ম প্রচারই ওঁর এখন প্রধান কাজ। সেই ধর্ম ও ওঁকে শান্তি দিতে পারল না। দ্বারিকা, আমি একটা কাজে এসেছি, তোকে একটু সাহায্য করতে হবে। ইংলন্ড প্রবাসী আমার গুটিকতক বন্ধু বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদ করে সেখানে প্রকাশ করতে চায়। আমাদের দেশে যে কত উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা ইংরেজরা পড়ুক, এই ওদের উদ্দেশ্য। লেখকের তো অনুমতি চাই। আমি যখন বঙ্কিমবাবুকে বলব, তুই পাশে থাকবি।

দ্বারিকা বলল, অনুমতি পাবি না।

যাদুগোপাল বিস্মিত হয়ে বলল, কেন ? এতে তো ওঁর কোনও পরিশ্রম নেই, অন্য লোকে অনুবাদ

করবে, উনি শুধু সম্মতি জানাবেন। কিছু টাকাও পাবেন।

দ্বারিকা বলল, জানিস তো মানুষটা কেমন জেদি! কিছুদিন ধরে ওঁর ধারণা হয়েছে, সাহেবরা ওঁর লেখা অনুবাদ হলেও পড়তে চাইবে না, পড়লেও বুঝবে না। এর আগে দু'একজন অনুমতি চেয়েছে, উনি রাজি হননি। উনি নিজে 'দেবী চৌধুরানী' অনুবাদ করেছিলেন, এখন সে পাণ্ডুলিপি ফেলে রেখেছেন, আর ছাপতে চান না।

যাদুগোপাল বলল, ইংলন্ডে প্রকাশক পাওয়া শক্ত। আমার বন্ধুরা নিজেদের খরচে ছাপাবে বলেছে।

দ্বারিকা বলল, তা হোক না। সাহেবদের পড়াবার ব্যাপারে ওঁর আর কোনও আগ্রহ নেই। উনি নিজেই তো একবার ইংল্যান্ডে যেতে চেয়েছিলেন, সে ইচ্ছে কবে ঘুচে গেছে, ইংরেজদের ওপর খুব রাগ।

বাড়ির ভেতর থেকে লোক বেরিয়ে আসছে দলে দলে। দোতলায় বঙ্কিমের শয়নকক্ষে এখন কারুকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এখন সেখানে রয়েছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

অশান্তি ও মানসিক অবসাদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন ধরে বহুমূত্র রোগে ভুগছেন। চাপা স্বভাবের মানুষ, নিজের বিষয়ে কিছু বলতে চান না, রোগের কথা অনেক দিন কারুকে জানাননি। কিন্তু এই শীতকালে রোগের প্রকোপ খুব বেড়ে গেল, রাত্তিরে ঘুমোতে পারেন না, মুহুর্মুহু উঠে জল খান আর প্রস্রাব করতে যান। তাঁর স্ত্রী বিচলিত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার কথায় বঙ্কিম বিশেষ গা করেন না। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের মনে যাতে আক্ষেপ না থাকে, ডাকো ডাক্তার।

সাধারণ ওষুধে বিশেষ কিছু উপকার হল না। চলছিল একই রকম, হঠাৎ একদিন অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এবার বড় বড় চিকিৎসকদের ডাকা হল, তাঁরা বললেন, মূত্রনালীর মধ্যে বড় একটা ফোঁড়া হয়েছে, অপারেশান না করলে যন্ত্রণা আরও বাড়বে। শহরের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ওব্রায়েনকে কল দিয়ে তাঁর পরামর্শ নেওয়া হল। ডক্তর ওব্রায়েন বললেন, তিনি অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করে ফোঁড়াটি বাদ দিতে চান।

বঙ্কিম রাজি হলেন না। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে থাকলেও তাঁর মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কারুর নেই। তিনি বললেন, আমার আর পরিত্রাণ নেই, আমি জেনে গেছি। অস্ত্রাঘাত করো বা না করো, ফল একই হবে। তবে মিছেমিছি আর কেন অস্ত্রাঘাতে যাতনা বাড়াও।

ডাক্তার ওব্রায়েন নিরস্ত হয়ে ফিরে গেছেন। তারপর ডাকা হয়েছে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে।

মহেন্দ্রলাল বঙ্কিমের বন্ধু স্থানীয়। দু'জনের চরিত্রগত আর আদর্শগত প্রভেদ অনেক, তবু কোথাও একটা মিল আছে। দু'জনেই দেশের মানুষের উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন। সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে দু'জনের মধ্যে তর্ক বেঁধেছে প্রায়ই, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিজ্ঞান চেতনা জাগানো দরকার এ বিষয়ে বঙ্কিম মহেন্দ্রলালের সঙ্গে একমত। মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান সংস্থার জন্য চাঁদা তোলায় সাহায্য করেছেন বঙ্কিম। এ দেশের ধনীরা পুতুলের বিয়ে কিংবা পোষা বাঁদরের বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অথচ বিজ্ঞান সংস্থা পরিচালনায় সাহায্যের জন্য মুষ্টি খোলে না, এ নিয়ে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন।

অসহ্য যন্ত্রণায় বঙ্কিম কয়েকদিন ধরেই তন্দ্রাচ্ছন্নের মতন রয়েছেন, কিছু খেতে চান না, কারুর সঙ্গে কথাও বলেন না। মহেন্দ্রলাল আসার পর অবশ্য উঠে বসেছিলেন, কথাও বললেন অনেকক্ষণ, কক্ষের মধ্যে তখন আর কারুকে থাকতে দেননি।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যাদুগোপাল বলল, আমি চলি রে, দ্বারিকা। আর থাকতে পারছি না। আর একদিন আসব।

দ্বারিকা তার হাত ধরে টেনে বলল, ধৈর্য হারাচ্ছিস কেন? একটু অপেক্ষা কর, ডাক্তার চলে গেলে আমি ঠিক একবার ওপরে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করে আসব। তখন তুই তোর প্রস্তাবটা পেড়ে দেখিস,

যদি রাজি হন!

আর কিছু পরে ওপর থেকে নেমে এলেন মহেন্দ্রলাল। যাদুগোপাল তাঁকে দেখেছে কয়েকটি বক্তৃতা সভায়, তাও বেশ কয়েক বছর আগে। এক সময় মহেন্দ্রলালের চেহারায় যে তেজ ও দার্ঢ্য ছিল তা যেন ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে কিছুটা। চুলে পাক ধরেছে, চোখের নীচে ক্লান্তির রেখা। তবু পুরুষ সিংহের ভাবটি রয়েছে ঠিকই, সিঁড়ি দিয়ে নামলেন দপদপিয়ে। বঙ্কিমের চেয়ে তিনি বয়েসে বছর পাঁচেকের বড়, এখনও তাঁর কণ্ঠস্বর গমগম করে।

বৈঠকখানা ঘরে এসে ওয়েস্টকোটের পকেটে দুটি হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন লোকের জমায়েতটি দেখলেন। তারপর, এটা যেন তাঁর নিজের বাড়ি এই ভঙ্গিতে বললেন, আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন? বাড়ি যান। রুগির সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। আমি বলে এসেছি, লোকজনের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। উনি এখন ঘুমোবেন।

দ্বারিকা তাঁর মায়ের চিকিৎসার জন্য মহেন্দ্রলালকে বাড়িতে নিয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। তাই সে এগিয়ে গিয়ে বলল, নমস্কার ডাক্তার সরকার, আপনার ব্যাগটা দিন গাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।

মহেন্দ্রলাল গম্ভীর ভাবে বললেন, তার দরকার নেই, আমি নিজেই নিতে পারব। আমার তল্পিবাহক লাগে না।

দ্বারিকা ও যাদুগোপাল ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে গেল বাইরে বগিগাড়ি পর্যন্ত। দরজাটা খুলে দিয়ে দ্বারিকা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলেন একটু বলুন। উনি অপারেশান করাতে রাজি হয়েছেন?

মহেন্দ্রলাল অপ্রসন্ন ভাবে বললেন, রুগি যে নিজেই ডাক্তার। বলে কি না কাটা ছেঁড়া করলে ফোঁড়ার দুষিত পুঁজ রক্তে মিশে যাবে, তাতে আরও রোগ বৃদ্ধি পাবে। যে অপারেশন করবে সে যেন তা বোঝে না!

দ্বারিকা বলল, আপনি জোর করে বোঝালেন না? সবাই তো বলছে, অপারেশান ছাড়া গতি নেই। আপনার কথা শুনবেন, আপনাকে তো সবাই ভয় পায়।

মহেন্দ্রলাল বললেন, রুগি নিজে না চাইলে আমি কক্ষনও জোর করি না। তাও এরকম বিখ্যাত মানুষ। অপারেশানের সময় অন্য রকম কিছু হয়ে গেলে তখন তোমরাই তো আমাকে দুষবে!

—আপনি ওষুধ দিয়েছেন?

—না দিইনি। যা চলছে তাই চলুক। অ্যালোপাথির সঙ্গে হোমিওপ্যাথি মিশিয়ে আর লাভ কী?

—ডাক্তারবাবু, ওঁকে আমি আমার বাবার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করি। ওঁকে কেমন দেখলেন, আপনি সত্যি করে বলুন।

মহেন্দ্রলাল চশমার ওপর দিয়ে দ্বারিকার থমথমে মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধমকের সুরে বললেন, যদি অতই শ্রদ্ধা করো, তা হলে ওই সব সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসীগুলোকে আটকাতে পারো না?

যাদুগোপাল অস্ফুট স্বরে বলল, সন্ন্যাসী?

মহেন্দ্রলাল বললেন, তিব্বত থেকে এক সন্ন্যাসী এসে চাটুজ্যের কানে কী যেন ফুসমন্তর দিয়ে গেছে। এই সন্ন্যাসীগুলোর কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই? হিমালয়ের গুহা-কন্দরে তপস্যা করছিলি, বেশ তো তাই কর না, তোদের আবার এই ধুলো-ময়লা-পাপে ভর্তি শহর-বাজারে নেমে আসার কী দরকার? চাটুজ্যেকে সে কী যেন বুঝিয়ে গেছে। তাতেই ওর ধারণা হয়েছে যে ওর আর বেশিদিন আয়ু নেই। আরে বাপু, তোরাই যদি জন্ম-মৃত্যুর নিদান দিবি, তা হলে আমরা ডাক্তাররা রয়েছি কী করতে? এতবড় একজন রাইটার, এতগুলো বছর কাটল সরকারি চাকরির জোয়াল টেনে, এখন রিটায়ার করার পর কোথায় খোলা মনে লিখবে, বঙ্গ সরস্বতীর সেবা করবে, তা না হঠাৎ হাত গুটিয়ে বসে রইল। ছি ছি ছি!

গাড়িতে উঠতে উঠতে মহেন্দ্রলাল আবার বললেন, দেখো বাপু, অনেক রকম ডাক্তারি শাস্ত্র তো ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলুম এতগুলো বছর, তাতে একটা সার কথা বুঝেছি। যে মানুষ নিজে বাঁচতে চায়

না, কোনও ডাক্তারের বাপেরও সাধ্য নেই তাকে বাঁচাবার।

মহেন্দ্রলাল চলে যেতেই দ্বারিকানাথ বন্ধুর কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। একেবারে শিশুর মতন কান্না।

যাদুগোপাল ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, আরে করিস কী, করিস কী, এ তে যে গৃহস্থ বাড়ির অকল্যাণ হবে!

দ্বারিকা জলভরা নয়নে বলল, বঙ্কিম নেই, এ আমি সহ্য করতে পারব না রে যাদু, কিছুতেই পারব না।

যাদুগোপাল বলল, উনি তো এখনও আছেন আমাদের মধ্যে, সেরে যে উঠবেন না তা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে? তুই এখানে দাঁড়িয়ে কান্না শুরু করলি, ওঁর বাড়ির লোক কী ভাববে?

যাদুগোপালের নিজের গাড়ি নেই, সে দ্বারিকানাথকে জোর করে টেনে নিয়ে তার গাড়িতে উঠিয়ে দিল। দ্বারিকা শক্ত ভাবে আঁকড়ে রইল যাদুগোপালের হাত, বন্ধুকে সে এখন ছাড়বে না। অগত্যা যাদুগোপালকেও উঠতে হল সেই গাড়িতে।

বেলা পড়ে এসেছে। রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে পুরসভার কর্মী। হাজার হাজার কয়লার উনুনের ধোঁয়া বাতাসে যেন জমাট বেঁধে আছে। কোচোয়ানকে কিছু নির্দেশ দেবার আগেই সে অদূরের হাড় কাটার গলিতে ঢুকে পড়ল।

যাদুগোপাল বাইরে তাকিয়ে বলল, গাড়িটা একটু থামাতে বল দ্বারিকা, আমি এখানে নেমে যাব।

দ্বারিকা বলল, বসন্তমঞ্জরীকে তোর মনে আছে? একবারটি চল তার কাছে। তোকে দেখলে সে বড় খুশি হবে! কতদিন তোকে দেখেনি!

দ্বারিকার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে পারল না যাদুগোপাল। মধ্যে বেশ কয়েক বছর দেখা না হলেও দ্বারিকা সম্পর্কে কিছু খবরাখবর তার কানে এসেছে। অনেকে দ্বারিকাকে মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল এবং হুজুগে মানুষ বলেই জানে, কিন্তু সেটাই তার প্রকৃত পরিচয় নয়। বসন্তমঞ্জরীর সঙ্গে দ্বারিকার সম্পর্কের জন্য যাদুগোপাল মনে মনে বন্ধুকে শ্রদ্ধাই করে।

লোভী ও জাত্যভিমানী পিতার জন্য বসন্তমঞ্জরীর ভুল বিবাহ এবং জীবনটা নষ্ট হতে বসেছিল, তাকে উদ্ধার করেছে দ্বারিকা। কিন্তু তাকে নিছক রক্ষিতা করে রাখেনি, তাকে অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছে। বসন্তমঞ্জরীকে সে বিয়ে করতেও চেয়েছিল, কিন্তু দ্বারিকার মা বেঁচে থাকতে তা সম্ভব নয়। মায়ের ভয়ে সে বেশ্যাপল্লীর একটি নারীকে নিজের স্ত্রীর আসনে বসাতে পারে না বটে, কিন্তু মায়ের শত অনুরোধেও সে এখনও অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে করেনি। বসন্তমঞ্জরী তার স্ত্রীরই মতন।

নৈতিকতার বাধায় যাদুগোপাল এসব পল্লীতে কখনও প্রবেশ করে না। তবু বসন্তমঞ্জরীকে একবার দেখার কৌতূহল হল তার। অল্প বয়সে এই বসন্তমঞ্জরী তাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে খেলা করতে আসত।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দ্বারিকা বলল, বাসির একটা অদ্ভুত শক্তি আছে জানিস? ও ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।

যাদুগোপাল বিস্মিত না হয়ে বলল, এখনও পায় বুঝি? বাচ্চা বয়েসেই ও বিচিত্র সব কথা বলত। একবার শীতকালে আমাদের ঠাকুর দালানে খেলা করতে করতে ও 'ঝড় আসছে' 'ঝড় আসছে' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না, শীতকালে ঝড়ই বা উঠবে কেন? কিন্তু সত্যি সত্যি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল দারুণ ঝড়-বৃষ্টি। আমার দিদিমা এখনও সেই গল্প করেন। দিদিমার মতে, কোনও কোনও পশু-পাখি নাকি ঝড় বা ভূমিকম্পের কথা আগে থেকে টের পেয়ে যায়।

দ্বারিকা বলল, কী জানি। কোনও কোনও মানুষও বোধহয় পায়। একদিন আমাকে বলল, তুমি মাংস খেয়ো না। তোমার আজ অশৌচ! শুনে আমি বললুম, চুপ কর, ও কি অলক্ষুণে কথা! ওমা,

পরদিনই তার এল, দেশের বাড়িতে আমার এক কাকা মারা গেছেন! এরকম আরও কয়েকবার হয়েছে!

যাদুগোপাল জিজ্ঞেস করল, ও কি নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্বারিকা বলল না, ও নিজের কথা কিছু বলে না।

দুই বন্ধু যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল তখন বসন্তমঞ্জরী মেঝেতে বসে একটা তানপুরা নিয়ে তন্ময় হয়ে গান গাইছে।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব
কবে বৃষভানুপুরে আহীর গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব...

ওরা দুজনে চুপ করে বসে গানটা শুনল। ভাঙা ভাঙা গলা বসন্তমঞ্জরীর, এ গান যেন সে শুধু নিজের জন্য গাইছে। তারপর মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কত বৎসর পর যাদুগোপালকে দেখল সে, চিনতে তার একটুও দেরি হয়নি। 'যাদু কাকা!' বলে ছুটে এসে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে লাগল হু হু করে।

যাদুগোপাল তাকে কাঁদতে দিল। যাদুগোপাল যে ওর পুরো বাল্যকালটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে!

খানিক পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাদুগোপালের মামা বাড়ির সকলের খোঁজ নিতে লাগল, কিন্তু নিজের মা-বাবার প্রসঙ্গ উচ্চারণ করল না।

নিজেই গেলাস ও ব্র্যান্ডির বোতল বার করে নিল দ্বারিকা। প্রতিদিন সে মদ্যপান করে, আজ তার গুরু বঙ্কিমের পীড়ার সংবাদ শুনে মন খারাপ, আজ তো সে বেশি করে পান করবেই। যাদুগোপাল ওসব স্পর্শ করে না, তাকে সে অনুরোধও জানাল না। সত্যিই দ্বারিকা বঙ্কিম-ভাবনায় খুব বিচলিত হয়ে আছে। বারবার বলছে সেই কথা।

যাদুগোপাল একবার বলল, বছর তিনেক আগে বিদ্যাসাগর মশাই চলে গেলেন, একবার শেষ দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি তখন এলাহাবাদে।

দ্বারিকা বলল, তিনি বড় কষ্ট পেয়ে গেছেন। খুব হিক্কা হত, সেই সঙ্গে প্রলাপ। শেষ মুহূর্তের কিছু আগে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল অনবরত... কী বলতে চাইছিলেন কে জানে!

হঠাৎ সচকিত হয়ে দ্বারিকা বলল, সে দিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, ১৩ই শ্রাবণ, আমরা দু'জনে একটা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে অনেক রাত পর্যন্ত গপ্প করেছি ছাদে বসে। বাসি গান গাইছিল, এক সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, একজন মহাপুরুষ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ওই আকাশে, ওই যে যাচ্ছেন। পরদিনই শুনি রাত প্রায় আড়াইটের সময় বিদ্যাসাগর মশাই শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন। তুই কী করে বলেছিলি রে বাসি?

বসন্তমঞ্জরী বলল, কী জানি! কেমন যেন দেখতে পেলাম একটা জ্যোতি, অন্য কোনওদিন তেমন দেখি না—

দ্বারিকা বলল, বাসি, বঙ্কিমচন্দ্রের খুব অসুখ। সবাই খুব ভয় পাচ্ছে। তুই বলতে পারিস তিনি আর বাঁচবেন কি না!

বসন্তমঞ্জরীর মুখে একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়ল। সে ত্রস্ত ভাবে বলে উঠল, না, না, না, আমি কী করে বলব? আমি ওসব জানি না। আমি তো তেনাকে কখনও চক্ষেও দেখিনি।

যাদুগোপাল জিজ্ঞেস করল, তুমি তো বিদ্যাসাগর মশাইকেও কখনও দেখনি!

বসন্তমঞ্জরী হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, হ্যাঁ দেখেছি। তাঁকে একবার দেখেছি।

দ্বারিকা বলল, তা ঠিক। ওকে নিয়ে আমি একবার ফরাসডাঙায় গিয়েছিলুম, তখন বিদ্যাসাগর মশাই-ও স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য ফরাসডাঙায় ছিলেন, রোজ প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেন, আমরা দু'জনে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি।

যাদুগোপাল বলল, বঙ্কিমচন্দ্র কে তা তুমি জানো?

বসন্তমঞ্জরী বলল, বাঃ জানব না ? এই তো সেদিন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়া শেষ করলুম। বড় দুঃখের বই। 'কৃষ্ণচরিত্র' বারবার পড়ি।

যাদুগোপাল চমৎকৃত হল। বসন্তমঞ্জরীর পড়াশুনো এতটাই এগিয়েছে যে সে বঙ্কিমের প্রবন্ধগ্রন্থ পর্যন্ত পাঠ করে ! এই মেয়ের এমন ভাগ্য বিড়ম্বনা !

এবার বসন্তমঞ্জরীই প্রশ্ন করল, হ্যাঁ গো, তোমাদের সেই বন্ধু ভরত কোথায় ?

যাদুগোপাল বলল, তাই তো, আসামের সেই ছোকরাটা কোথায় গেল। বহুদিন তার পাত্তা নেই, তুই জানিস নাকি রে দ্বারিকা ?

দ্বারিকা বলল, নাঃ ! ইরফানের কাছে শুনেছি, কোন্ একটা মেয়ের জন্য নাকি তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইরফানের সঙ্গে আমার দেখা হয় মাসে মাসে। ইরফানের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখে না ভরত। কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

বসন্তমঞ্জরী আবিষ্টের মতন বলল, অনেক দূরে চলে গেছে।

দ্বারিকা বলল, এটাও আশ্চর্য, জানিস যাদু, বাসি ভরতকে দেখেছে মাত্র একবার, তাও একটুখানি, তবু ও ভরতের কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। প্রথম প্রথম আমার বেশ হিংসে হত। এখন অবশ্য মনে হয়, ছ' সাত বছর যার দেখা নেই, সে রকম একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষকে হিংসে করাটাও ছেলেমানুষী !

আর কিছুক্ষণ পর আড্ডা ভঙ্গ হল। যাদুগোপালের বাড়ি ফেরার তাড়া আছে।

দ্বারিকা এর পরও প্রতিদিন বঙ্কিমের স্বাস্থ্যের খবর নিতে যায়। একদিন পাওয়া গেল সুসংবাদ। অস্ত্রোপচারের দরকার হয়নি, মূত্রনালির ফোঁড়াটি নিজে নিজেই ফেটে গেছে, বঙ্কিম অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন।

দ্বারিকার খুশি আর ধরে না। একদিন সে বঙ্কিমের শয্যার কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বসে রইল অনেকক্ষণ। বঙ্কিম বালিশে ঠেস্ দিয়ে বসেছেন, তাঁর এই ভক্তটির পাগলামি দেখে মৃদু হেসে বললেন, কী রে, তুই কি এখনও আমাকে দিয়ে উপন্যাস লেখাবার আশা ছাড়িসনি ?

দ্বারিকা বলল, আপনাকে আবার লিখতেই হবে। আমার কাগজে না হয়, 'ভারতী' কিংবা 'সাহিত্যে' লিখুন। বাংলাভাষা আপনার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

একজন লোক বঙ্কিমের কতকগুলি ছবি নিয়ে এসেছে। ফটোগ্রাফ নয়, বড় আকারের ছাপানো ছবি। বাজারে এই ছবি এক একখানা বিক্রি হচ্ছে দু' আনা দামে। বঙ্কিম সে ছবি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না, দ্বারিকাকে বললেন, তুই একটা নিয়ে যা।

দ্বারিকা একটির বদলে দুটি ছবি নিল। ভাল ফ্রেমে বাঁধিয়ে একখানা সে রাখল তার মানিকতলার বাড়িতে। আর একটি সে নিয়ে এল বসন্তমঞ্জরীর কাছে। খুব আবেগের সঙ্গে বলল, বাসি, এটা তোর ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবি, রোজ প্রণাম করবি একবার করে।

ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাসির চোখ জলে ভরে গেল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রাক্ প্রৌঢ়ত্বের বঙ্কিমকে। গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণনাসা, শাণিত চক্ষু, মাথার কাঁচা-পাকা কুঞ্চিত চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে খানিকটা।

বসন্তমঞ্জরীর ঘরে কোনও ছবি নেই। দেয়ালের একটি পেরেকে ঝুলছে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার। তার একটি মাত্র পৃষ্ঠা। শুধু চৈত্র মাসটা বাকি। সেখানে এসে বসন্তমঞ্জরী ধরা গলায় বলল, বছর শেষ হয়ে আসছে। প্রত্যেক বছরই এই সময় কেমন যেন ভয় হয়, পরের বছর বাঁচব তো ?

শুধু তো বৎসরের শেষ নয়, চৈত্র ফুরোলেই যে শতাব্দীরও শেষ, শুরু হবে তেরোশো সাল। মহাকালের গায়ে আর একটি আঁচড় পড়বে। কত কিছু হারিয়ে যায়, অভ্যুদয় হয় কত অপ্রত্যাশিত নবীনের।

বঙ্কিমের সেই ক্ষতস্থানে গজিয়ে উঠল আরও কতকগুলি ছোট ছোট বিস্ফোটক। আবার প্রচণ্ড যন্ত্রণা, তারপর যন্ত্রণাবোধও চলে গেল, তিনি চলে গেলেন চেতন-অচেতনের মাঝখানে। চৈত্রের

পৃষ্ঠা ছিঁড়তে বাকি রয়ে গেল, তার মধ্যেই ঘটে গেল ইন্দ্রপতন। বঙ্কিমের আর নতুন শতাব্দী দেখা হল না।

১৪

খেলার জগতে যেমন 'ভাল খেলিয়াও পরাজিত' বলে একটি কথার প্রচলন আছে, গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথের ভাগ্যেও ঘটল তাই। বিদ্বজ্জন ও সমালোচকরা ভূয়সী প্রশংসা করলেন এই নাটকের অনুবাদ ও অভিনয়ের, এমনকী ইংরেজরাও তুলনা করল বিলেতি প্রযোজনার সঙ্গে, কিন্তু দর্শকদের আসনগুলিতে দিনদিনই বাড়তে লাগল শূন্যতা। টিকিটঘরে মাছি ওড়ে। ঢাকা, পাটনা, এলাহাবাদ, লখনউ, লাহোর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গিরিশচন্দ্রকে চিঠি লেখেন, তাঁরা ম্যাকবেথ-এর সুখ্যাতি শুনে শীঘ্রই কলকাতায় এসে অভিনয় দেখতে চান। কিন্তু গুটিকতক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য তো আর রাতের পর রাত মঞ্চের বাতি জ্বালিয়ে রাখা যায় না ! থিয়েটার চালাতে গেলে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন আছে। মিনার্ভা অবিলম্বে লোকসানের দশায় পড়ল।

খুবই নিরাশ হয়ে গেলেন গিরিশচন্দ্র। এমনই মন ভেঙে গেল যে এক একবার সংকল্প নিতে গেলেন, আবার থিয়েটারের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করবেন। বড় মুখ করে অনেককে বলেছিলেন, এরপর একটার পর একটা শেক্সপীয়ারের রচনা অনুবাদ করে বাংলা মঞ্চে উত্তম নাটক পরিবেশন করবেন। ঘুচে গেল সে সাধ ! ছ্যা ছ্যা ছ্যা, কাদের জন্য করবেন ভাল নাটক, সে রকম দর্শকই তৈরি হয়নি। ভাল থিয়েটার দেখতে গেলে দর্শকদেরও যোগ্য হয়ে উঠতে হয়, সে জন্য আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে !

মিনার্ভার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র চুক্তিবদ্ধ, হুট করে ছেড়ে দেওয়া যায় না। নগেন্দ্রভূষণ সজ্জন ব্যক্তি, তাঁর স্বার্থও দেখতে হয়, তিনি কত দিন লোকসানের খাতে টাকা ঢালবেন ? এতগুলি অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবিকার প্রশ্নও জড়িত।

গিরিশচন্দ্র হালকা, চুটকি নাটক রচনা শুরু করলেন। তাতে রসের চেয়ে গ্যাঁজলা বেশি। হাস্যরসের বদলে ভাঁড়ামি। টিকিট-কাটা দর্শকরা যে এই সবই চায়। মঞ্চস্থ হতে লাগল 'মুকুল-মুঞ্জরা', 'আবু হোসেন', 'বড়দিনের বখশিস', 'সপ্তমীতে বিসর্জন' ইত্যাদি। কোনওটাই একটানা নয়, দু'চারদিন অন্তর বদল করে করে। গানে মিশিয়ে দেওয়া হতে লাগল আদিরস। 'আবু হোসেন'-এর এই একখানা গান খুব জনপ্রিয় হল :

> একে লো তোর ভরা যৌবন
> রসে করেছে অবশ, আবেশে ঢলে নয়ন
> ঘোর বিরহ-বিকার তাতে
> জোর করেছে নাড়ির ধাতে
> বাই কুপিতে সরল মন মাতে—
> ভরা হৃদি, গুরু উরু—বিষম কুলক্ষণ...

টিকিটঘর কিছুটা চাঙ্গা হবার পর গিরিশচন্দ্র মন দিয়ে আর একটি নাটক লিখলেন। পাকেচক্রে পেশাদার থিয়েটারে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর তো মূল সাধ ছিল বাংলার নাট্যশিল্পের উন্নতি। দর্শক মজালেও নিছক লঘু নাটকে তাঁর মন ভরে না।

তা ছাড়া সমালোচনা এখন উল্টো সুর গাইতে শুরু করেছেন। 'আবু হোসেন' নাটক সম্পর্কে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা লিখল, 'জহুরী গিরিশবাবু, ঠিক জহরই সম্মুখে ধরিয়াছেন। যেমন দেশ, যেমন

রুচি, যেমন দর্শক, তেমনই তো তার আয়োজন চাই ? তা ভাল ! বুঝিলাম, দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া, সঙ নাচ দিয়া কাজ হাসিল হইল। লোকেও হাসিল-মজিল-আনন্দ পাইল। কিন্তু প্রবীণ গিরিশবাবুর কাছ হইতে আমরা তো এরূপ সঙ নাচ দেখিবার আশা করি না।'

অনেক ভেবেচিন্তে এবার গিরিশচন্দ্র বিষয়বস্তু নির্বাচন করলেন মহাভারত থেকে।

দর্শকদের রুচি ঘন ঘন বদলায়। কখনও ঐতিহাসিক নাটকে তারা মেতে ওঠে, কখনও সামাজিক বিষয়ে। কখনও ভক্তিরস তাদের পছন্দ, কখনও বীররস। মহাভারত সব রসেরই খনি। গিরিশ বেছে নিলেন জনার কাহিনী, এতে অনেকগুলি রসের সংমিশ্রণ করা যায়, পৌরাণিক নাটকও অনেকদিন হয়নি, পৌরাণিক নাটকে ভাবগম্ভীর সংলাপ আসে স্বাভাবিকভাবে, পোশাক-পরিচ্ছদও ঐতিহাসিক নাটকের মতন।

দর্শক-মনোরঞ্জনের সব রকম উপাদান থাকলেও গিরিশচন্দ্র-এর মধ্যে নিজস্ব জীবন-দর্শনের কথাও ঢুকিয়ে দিলেন কিছু কিছু। বিদূষক চরিত্র গিরিশের খুব প্রিয়, তাঁর হাতে খেলেও ভাল। 'জনা' নাটকেও বিদূষকই যেন প্রধান, তার মুখে শ্লেষ-বিদ্রূপের আড়ালে জীবনের সব সার কথা উচ্চারিত।

বিদূষকের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর একেবারে অতুলনীয়। কৌতুক যেন তাঁর শরীরের প্রতিটি ভঙ্গিতে সহজাত। অর্ধেন্দুশেখরের চলনে, বলনে, পোশাকে এমনকী নীরবতাতেও লোকে হাসে। এমন নিরভিমান মানুষও দেখা যায় না। নাটকে যে-কোনও ভূমিকা দেওয়া হোক, তাঁর আপত্তি নেই। একটি মাত্র দৃশ্যের ভৃত্যের ভূমিকাতেও তিনি অদ্বিতীয়। কোনও কোনও নাটকে অর্ধেন্দুশেখরের নাম বিজ্ঞাপিত থাকে, কিন্তু দর্শকরা প্রথম প্রথম অর্ধেন্দুশেখরকে চিনতেই পারে না। তিনি নায়ক নন, প্রধানও নন, চার পাঁচটি ছোটখাটো চরিত্রে বিভিন্ন সাজে তিনি অবতীর্ণ হন এবং মাতিয়ে দেন।

'জনা' নাটকে বিদূষকই অবশ্য মুখ্য আকর্ষণ। নায়ক প্রবীরের ভূমিকায় নেমেছে সুরেন্দ্র, যদিও তার এই নামটি অনেকেই জানে না, গিরিশচন্দ্রের ছেলেকে গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে সবাই দানী বলেই ডাকে। দর্শকদের কাছেও সে দানীবাবু। দানীর কণ্ঠস্বর অপূর্ব, এর মধ্যেই লোকে বলাবলি করতে শুরু করেছে যে কালে কালে দানী তার বাবাকেও ছাড়িয়ে যাবে অভিনয়প্রতিভায়। জনার ভূমিকায় তিনকড়ি দাসী যেন লেডি ম্যাকবেথেরই আরেক রূপ। নয়নমণি একটি ছোট ভূমিকা পেয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট।

জনার জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে, তখনই হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল।

একদিন সকালে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে এলেন অর্ধেন্দুশেখর। কচুরি-রসগোল্লা ও চা পানের সঙ্গে সঙ্গে রসালাপ চলল কিছুক্ষণ। তারপর আচম্বিতে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, জি সি, এবার আমায় ছুটি দিতে হবে। পাখি আবার উড়ে যাবে।

গিরিশচন্দ্র আঁতকে উঠলেন!

অর্ধেন্দুশেখর অতিশয় খেয়ালি, তাঁর রক্তের মধ্যে যেন রয়েছে এক যাযাবর। অর্থ কিংবা যশ, কোনও কিছুরই লালসা নেই। নাট্যজগতে তাঁর এত খ্যাতি, তবু মাঝে মাঝেই থিয়েটার ছেড়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যান। বেশ কিছুদিন পাহাড়ে পড়েছিলেন এক সন্ন্যাসীর কাছে হঠযোগ শেখার জন্য। কর্নেল আলকটের কাছে শিখেছেন হিপ্‌নোটিজম।

গিরিশচন্দ্র বললেন, আবার কোথায় পালাবার কথা ভাবছ ? না, না, ওসব চলবে না। পাগলামি ছাড়ো। মিনার্ভা এখন সবে মাত্র জমে উঠেছে, এখন তুমি চলে যাবে বললেই হল আর কি!

অর্ধেন্দুশেখর মুচকি হেসে বললেন, পালাব না, কলকাতাতেই থাকব। কিন্তু মিনার্ভায় থাকব না।

গিরিশচন্দ্র বললেন, কেন ? তোমায় কেউ কিছু বলেছে ? কার এমন সাহস হবে ? তোমাকে সকলেই খুব প্রীতি করে—

অর্ধেন্দুশেখর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, কেউ কিছু বলেনি। বললেও কি আমি গায়ে মাখি ? কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে দাও!

গিরিশচন্দ্র এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, তা হলে স্টার থেকে তোমাকে ডেকেছে ?

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, উহুঃ ! কেউ ডাকেনি। স্টারে কে যাবে, ধুৎ!

গিরিশচন্দ্র ধমক দিয়ে বললেন, বাড়ি যাও তো, আমাকে বিরক্ত কোরো না। যতসব উদ্ভুটে কথা! কেউ খারাপ কথা বলেনি, অন্য থিয়েটার থেকে ডাকেনি, বিদূষকের রোলে তোমার নামডাক কত বেড়েছে, তবু তুমি মিনার্ভা ছাড়তে চাও! এর মাথা-মুণ্ডু কিছু বোঝা যায়!

গিরিশের কাছ থেকে গড়গড়ার নলটা নিয়ে না মুছেই ভুড়ুক ভুড়ুক করে টানলেন কয়েকবার। তারপর একগাল হেসে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, আসল কথাটা বলি ? তুমি যেন আবার রেগে গিয়ে আমায় মারতে এসো না। আমার মাথায় একটা শখের ভূত চেপেছে। আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি এক নম্বর হব!

—তার মানে ?

—সব সময় তুমিই এক নম্বর। তুমি নাট্যকার, তুমি পরিচালক, তুমি গান বাঁধো। আমরা শুধু স্টেজে নাচি কুঁদি। বড়জোর দু' নম্বর হতে পারি। তা দু' নম্বরের কি কখনও সখনও এক নম্বর হওয়ার সাধ জাগে না ?

—ও, এই কথা ? ঠিক আছে, পরের পালায় তুমিই এক নম্বর হও। তুমি নাট্যশিক্ষা দেবে, তুমিই সব কিছু হবে। আমি আড়ালে থাকব।

—পর্বতকে কি আড়াল করা যায় ? তুমি পেছনে থাকলেই লোকে বলবে, তোমার ঠেকনোতে আমি লম্ফ ঝম্প করছি। তা হয় না, জি সি! এক অরণ্যে ব্যাঘ্র আর সিংহ দু'জনে থাকতে পারে না। কাল স্বপ্ন দেখেছি, আমি এক বনে বাঘ সেজে হালুম হালুম করছি। তখনই বুঝলুম, তুমি সিংহ, আর তো তোমার পাশে আমার থাকা চলবে না। ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয় না কখনও।

—কাল বুঝি খুব পোলাও কালিয়া সাঁটিয়েছ ? বদহজমের স্বপ্ন। আমিও সিংহ নই, তুমিও বাঘ নও। আমরা দু'জনেই রং মাখা সঙ। সুতোয় বাঁধা পুতুল। যাও, বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গে ভাল করে।

—না গো, আমার মাথায় পোকা নড়েছে। জান তো, একবার গোঁ ধরলে আমি সহজে ছাড়ি না। এমারেল্ড থিয়েটারটা খালি পড়ে আছে। ওটা ভাড়া নিয়ে আমি নিজে একটা দল চালাব। কালই কথাবার্তা বলেছি।

—টাকা কে দেবে ?

—আমার নিজের টাকা। যেখানে যা আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে প্রথমটা চলে যাবে। এক নম্বর যখন হব ঠিক করেছি, তখন মাথার ওপর আর কেউ থাকবে না। মালিক ফালিক কেউ না।

গিরিশচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অর্ধেন্দুশেখর যে মস্করা করছেন না, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অর্ধেন্দুশেখরের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তারা দু'জনে বহুদিনের বন্ধু। কখনও মনোমালিন্য ঘটেনি। অর্ধেন্দুশেখরের মনে ঈর্ষা নামে কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই। তাঁর মুখে আজ এমন কথা!

গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরের হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, সাহেব, এমন কম্মো কিছুতেই করতে যেয়ো না! থিয়েটারের মালিক হতে যেয়ো না কক্ষনও! হিসেব রাখা, সকলের পাওনা-গণ্ডা মেটানো, এর অনেক হ্যাপা। আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। দ্যাখো না, আমি কি কখনও থিয়েটারের মালিক হয়েছি ? ইচ্ছে করলে কি প্রথম আমলে স্টারের হর্তা-কর্তা আমি হতে পারতুম না ? ওসব ঝামেলায় নিজেকে জড়াইনি কখনও। তোমাকে ভাল মতন চিনি, তুমি আপনভোলা মানুষ, তুমিও পারবে না। এই চিন্তা ছাড়ো।

অর্ধেন্দুশেখর নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, ওই যে বললুম পোকা নড়েছে। এখন আর অন্য কোনও চিন্তা ঢুকবে না মাথায়। একবার দেখিই না চেষ্টা করে!

গিরিশচন্দ্র অস্ফুট স্বরে বললেন, তুমি চলে গেলে জনা নাটক কানা হয়ে যাবে। ওই বিদূষকের পার্ট আর তো কেউ পারবে না!

—কেন, তুমি নামবে ?

—আমি ! এই বুড়ো বয়েসে আর মুখে রং মেখে আমার মঞ্চে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না।

—আহা, তুমি বুড়ো হলে আমিই বা কি কচি ? এই সেদিনও তো ম্যাকবেথে ফাটালে !

— তোমার কথা ভেবেই বিদূষক চরিত্রটির সৃষ্টি। ওই ভূমিকায় তোমার যে সুখ্যাতি হয়েছে, তাতে দর্শক আর এখন আমাকে নেবে না !

—বড়বাবু, তুমি সব পারো। যে ডায়ালগে আমি মানুষকে হাসাই, সেই ডায়ালগেই তুমি মানুষকে কাঁদাবে !

— মিনার্ভায় জনা চলুক বা বন্ধ হয়ে যাক, সে সব ভেবে বলছি না। সাহেব, তোমার সুহৃদ হিসেবে বলছি, তুমি নিজে মালিক হয়ে থিয়েটার চালাতে যেয়ো না। অন্য যা হয় ইচ্ছে করো।

অনেক যুক্তি-তর্কেও অর্ধেন্দুশেখরকে আর বোঝানো গেল না। গিরিশচন্দ্রকে বিদূষকের ভূমিকায় তৈরি হবার সময় দেবার জন্য তিনি আর মাত্র দুটি রজনীর অভিনয়ে রাজি হলেন, তারপর থেকে তিনি এমারাল্ডে এক নম্বর।

কিছু কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীও অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে চলে যাবে মিনার্ভা ছেড়ে। থিয়েটারের জগতে এরকম দল ভাঙাভাঙি অবিরাম চলে। এরই মধ্যে একদিন নয়নমণিকে নিজের ঘরে ডেকে আনলেন অর্ধেন্দুশেখর।

নতমুখী সেই তরুণীকে তিনি বললেন, নয়ন, আমি এমারেল্ডে গিয়ে নতুন দল খুলছি। তুই আমার সঙ্গে যাবি ? মিনার্ভায় তোর ভাগ্য চাপা পড়ে থাকবে। তিনকড়ি যতদিন আছে, তুই বড় পার্ট পাবি না। তিনকড়ি গিরিশবাবুর খুব পেয়ারের। তোর দিকে তাঁর চোখ নেই। আমি বুঝেছি, তোর ভেতরে অনেক শক্তি আছে। একটু মাজা ঘষা করলে তুই হিরোইন হতে পারবি। পয়সাও বেশি পাবি। আজই উত্তর দিতে হবে না, কী করবি ভেবে দ্যাখ। আমি তোকে চাই।

নয়নমণি দারুণ দোলাচলের মধ্যে পড়ে গেল। এর মধ্যে দু' তিন জায়গা থেকে তার কাছে প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু সে মিনার্ভা ছাড়তে রাজি হয়নি। সে গিরিশচন্দ্রের পায়ের কাছে পড়ে থেকে অভিনয় কলা শিখতে চায়। কিন্তু ইনি যে অর্ধেন্দুশেখর, এঁর ডাক সে ফেরাবে কী করে ? অর্ধেন্দুশেখরই বলতে গেলে নয়নমণিকে রাস্তা থেকে তুলে এনে থিয়েটারে সুযোগ করে দিয়েছেন। ইনি নয়নমণির পিতৃতুল্য।

বাড়িতে এসে গঙ্গামণিকে কথাটা জানাতেই সে বলল, নিয়ে নে, নিয়ে নে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি ! এক থিয়েটারে বেশিদিন পড়ে থাকলে নট-নটীদের কদর হয় না। লোকে ভাবে, তাকে বুঝি অন্য কেউ চায় না। যত বদল করবি, তত তোর দাম বাড়বে। মুখপুড়ি, তুই এবার আপত্তি করলে তোর মুখে আমি ঝাঁটা মারব !

তারপর গলা নামিয়ে সে আবার বলল, তুই অ্যাকটিং শিখতে চাস তো ? তোকে আমি সত্যি কথাটা বলি। গিরিশবাবুর চেয়ে আমাদের এই অর্ধেন্দুসাহেব অনেক ভাল পার্ট শেখায়। আমি থিয়েটারের ঘাগি, আমি সব জানি।

নয়নমণি মিনার্ভা ছেড়ে যোগ দিল এমারাল্ড থিয়েটারে।

নাটক বাছা হল অতুলকৃষ্ণ মিত্তিরের 'মা'। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। নয়নমণিই প্রধানা নায়িকা। সঙ্গে সঙ্গে নয়নমণির মান-মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। এখন তাকে রিহার্সালে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি আসে, বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে যায়। রিহার্সালের সময় বিনা পয়সায় খাওয়া, মাস মাইনে দেড় শো টাকা। খরচের ব্যাপারে অর্ধেন্দুশেখর দিলদরিয়া।

অর্ধেন্দুশেখর তাঁর দলে অধিকাংশই অখ্যাত নট-নটীদের নিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে, নামের জোর দিয়ে দর্শক টানবেন না, দর্শক আসবে অভিনয়ের গুণে। তিনি সকলকে এমন ভাবে তৈরি করবেন, যেমনটি আগে কেউ কখনও দেখেনি।

এমনিতে এমন হাস্যময় ভালমানুষ, কিন্তু রিহার্সালের সময় অর্ধেন্দুশেখর যেন সত্যিই বাঘ। কারুর টুঁ শব্দটি করার উপায় নেই।

রিহার্সাল চলছে সামনে দু'জনকে নিয়ে, পেছনে কেউ একজন অন্যকে ফিসফিস করে বলল, এই এক খিলি পান দিবি !

অমনি অর্ধেন্দুশেখর হাত তুলে মহড়া বন্ধ করে দিয়ে বললেন, থামো গো, ওদিকে বাবুদের কী সব কথাবার্তা হচ্ছে, আগে শেষ হোক, তারপর আবার শুরু করা যাবে !

কেউ একজন উঠে গেল, সামান্য পায়ের শব্দ হয়েছে, অমনি অর্ধেন্দুশেখর গর্জন করে উঠলেন, আর কে কে উঠে যাবেন, যান, যান, ইচ্ছে না হলে বসে থাকার দরকার নেই !

নয়নমণিও বকুনি খেয়েছে, তবে একবার মাত্র। ব্যোমকেশ নামে একটি ছোকরা মেয়েদের সঙ্গে বড় দুষ্টামি করে। রিহার্সালের সময় সকলের একাগ্রতার সুযোগ নিয়ে সে মেয়েদের আঁচল ধরে টানে। একদিন সে নয়নমণির ঠিক পিছনে বসেছে, মেঝেতে ছড়ানো তার আঁচল ধরে গোপনে একটু একটু করে টানছে ব্যোমকেশ।

পার্ট বলতে বলতে হঠাৎ একসময় মুখ ফিরিয়ে নয়নমণি বিরক্ত স্বরে বলল, এই কী হচ্ছে ? ছাড়ো !

অর্ধেন্দুশেখর তৎক্ষণাৎ হাত তুলে বললেন, এটা কী হল ? এটা কী হল ? 'এই কী হচ্ছে, ছাড়ো,' এ কী সংলাপের মধ্যে আছে ?

নয়নমণি চুপ করে গেল।

অন্যের নামে নালিশ করা তার স্বভাব নয়। উত্ত্যক্ত হয়ে সে ওই কথা বলে ফেলেছে, তা বলে ব্যোমকেশকে সে শাস্তি দেওয়াতে চায় না।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, ব্যোমকেশ কী করেছে আমি জানি, দেখেছি। কিন্তু নয়ন, স্টেজেও যদি ব্যোমকেশের মতন কেউ পেছন থেকে তোর সঙ্গে ফচকেমি করে, তখনও কি তুই পার্ট ভুলে ওই কথা বলবি ? জানিস, বিনোদিনীর শাড়িতে একবার আগুন ধরে গিয়েছিল, তাও সে কারুকে বুঝতে দেয়নি। অভিনয় হচ্ছে ধ্যানের মতন, এরকম সামান্য ব্যাঘাতে ধ্যান ভেঙে গেলে চলবে কী করে ?

তারপর তিনি ব্যোমকেশকে বললেন, বাপধন, তোমাকে তো আমি দুঃশাসনের পার্ট দিইনি, তা হলে আঁচল ধরে টানাটানি কেন ? যখন মহাভারতের পালা নামাব, তখন তোমায় ডাকব, এখন তুমি এসো !

শুধু অভিনয় শেখানোই নয়, প্রত্যেকটি নট-নটীর প্রতিদিনের জীবনযাপনের প্রতিও অর্ধেন্দুশেখরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

একদিন তিনি নয়নমণিকে নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই সারাদিন কী কী খাস, আমাকে বল তো ! একেবারে সকাল থেকে শুরু কর।

সব শুনে তিনি বললেন, তুই মাছ-মাংস খাস না। এ তো বড় সাঙ্ঘাতিক কথা। শরীরে তাগদ না থাকলে টানা তিনঘণ্টা স্টেজে লাফালাফি করবি কী করে ? মাংস বা মাছ কিছু একটা খাবি রোজ। তুই কি বিধবা নাকি ? নটীরা কেউ বিধবা-সধবা কুমারী থাকে না, তারা শুধু নটী। সকালে উঠে চিরতার জল খাবি কিংবা চুনের জল। পেট পরিষ্কার রাখা দরকার, সবসময় মনে রাখবি, পেট পরিষ্কার না থাকলে গলা ভাল খোলে না। শাক খাস না কেন ? সপ্তাহে দু'তিনদিন পুঁই শাক, কুমড়ো শাক, কলমি শাক কিছু একটা খেতে হয়। শাক রাঁধতে জানিস তো ? না হলে আমি শিখিয়ে দেব। জানিস, আমি কোর্মা-কালিয়া থেকে শাক-চচ্চড়ি সব রাঁধতে পারি, একদিন খাওয়াব তোদের। তুই মদ খাস ?

নয়নমণি দু'দিকে মাথা নেড়ে জোরে জোরে বলল, না।

—তোর কোনও বাঁধা বাবু আছে ? কেউ তোকে রেখেছে ?

—না।

—তোর কোনও পেয়ারের লোক আছে ?

—না।

—তবে কি তোর বিয়ে হয়েছিল নাকি রে ? স্বামী আছে ?

—না।

অর্ধেন্দুশেখর এবার ধমক দিয়ে বললেন, খালি না না বলে! একটা কিছু হ্যাঁ বলতে পারিস না? তোর কোনও পুরুষমানুষ যদি না থাকে, সেটা তো ভাল কথা নয়। মাঝে মাঝে কোনও পুরুষের আলিঙ্গন না পেলে মেয়েদের শরীরের রস শুকিয়ে যায়। মুখখানা প্যাস্তাখ্যাঁচা হয়ে যায়, তা নিয়ে বেশি দিন পার্ট করা যায় না। থিয়েটারের জগতে সাত্ত্বিক হলে চলে না রে! তোর পুরুষমানুষ নেই, এ তো মহা চিন্তার কথা। এই বুড়ো বয়েসে আমি তো তোর নাগর হতে পারি না। তা হলে কি ওই ব্যোমকেশটার ওপর তোর মন মজেছিল? বল, তবে তাকে ফিরিয়ে আনি।

নয়নমণি এবার হেসে ফেলে বলল, আপনি তাকে ফিরিয়ে আনুন। সে নাকি রোজ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদে। তবে আমার জন্য নয়, আমার একজন আছে।

সাধারণত দশ-বারোদিন রিহার্সাল দিয়েই একটা নাটক শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর মাসের পর মাস রিহার্সাল চালিয়ে গেলেন, তবু নাটক মঞ্চস্থ হবার নাম নেই। সব কিছু একেবারে নিখুঁত না হলে অর্ধেন্দুশেখরের মনে ধরে না। এদিকে টাকা পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে জলের মতন।

ব্যোমকেশ ফিরে এসে একটা ছোট ভূমিকা পেল বটে, কিন্তু সে নয়নমণির পেছনে লেগে রইল; এখন আর সে অন্য মেয়েদের আঁচল ধরে টানে না। নয়নমণির জন্যই যে সে অর্ধেন্দুশেখরের দয়া পেয়েছে সেটা সে জেনে গেছে, সুতরাং সে ধরেই নিয়েছে নয়নমণির কাছ থেকে সে আরও অনেক কিছু পাবে।

নয়নমণি তাকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু একদিনও কোনও শৌখিন বাবু নয়নমণিকে নিতে আসে না, সে রোজ মহড়ার পর বাড়ি ফিরে যায়, এতে সকলেরই খটকা লাগে। থিয়েটারের মানুষদের রাতটাই দিন, দিনটাই রাত। তারা দিনে ঘুমোয়, রাত জেগে আমোদ করে। নয়নমণির মতন কোনও সোমখ যুবতী একলা একলা থাকবে, এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ব্যোমকেশ নয়নমণির বাড়িতে পর্যন্ত ধাওয়া করে। বাধ্য হয়ে নয়নমণিকে গঙ্গামণির শরণ নিতে হল। গঙ্গামণি অতিশয় দজ্জাল, জীবনে সে অনেক পুরুষ চরিয়েছে, পুরুষ মানুষদের কী করে আটকাতে হয়, তাও সে জানে। ব্যোমকেশকে সে দোতলায় ধরে রাখে, তিনতলায় উঠতে দেয় না। একদিন সে ব্যোমকেশকে আদর করে বড় এক গেলাস শরবত খেতে দিল। আসলে তা ক্যাস্টর অয়েল, তাতে একটু চিনি মেশানো। সেটা খাবার পর তিনদিন আর ব্যোমকেশ বাথরুম থেকে দূরে থাকতে পারেনি।

অবশেষে এমারাল্ড থিয়েটার অধিগ্রহণ করার সাড়ে ছ'মাস পরে 'মা' নাটকটি পাদপ্রদীপের সামনে এল।

সমালোচকরা ধন্য ধন্য করল, দর্শকও মন্দ হল না। অর্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে অনেকেই খুব উৎসাহী, শুধু তাঁর অভিনয় দেখার জন্যই লোকে আসে, আর এ নাটক তো তাঁর সৃষ্টি! গিরিশচন্দ্র শ্রদ্ধেয় আর অর্ধেন্দুশেখর সকলের প্রিয়। তিনি যা-ই করুন, তাতেই তাঁর সমর্থকের অভাব নেই। এ নাটকে নতুন নট-নটীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেল নয়নমণি। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় লিখল, বাংলার নাট্যজগতে আর এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর আবির্ভাব!

কিন্তু আয়ের চেয়ে যে ব্যয় বেশি হয়ে যাচ্ছে, অর্ধেন্দুশেখর সে হিসেব রাখছেন না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল তাঁর অনেক দেনা হয়ে গেছে। গিরিশবাবু যা বলেছিলেন, তা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

তবু হাল ছাড়লেন না অর্ধেন্দুশেখর। নিজের সর্বস্ব গেছে, এরপরেও থিয়েটার চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি একজন অংশীদার ঠিক করলেন। হরিশ্চন্দ্র মালাকার নামে এক ব্যক্তি অর্থ নিয়োগ করবেন, আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখার ভার তাঁর ওপর। তবে নাটক নির্বাচন বা প্রযোজনার ব্যাপারে তিনি মাথা গলাতে পারবেন না।

হরিশ্চন্দ্রবাবু পাকা লোক। মুখের কথায় তিনি বিশ্বাসী নন, সব কিছু লেখাপড়ায় থাকা চাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গেও তিনি নতুন ভাবে চুক্তি করিয়ে নিচ্ছেন। তিনি সঙ্গে এনেছেন

একজন তরুণ ব্যারিস্টার।

এই ব্যারিস্টারের নাম যাদুগোপাল রায়। থিয়েটারের সব লোকজন অফিস ঘরে এসে চুক্তিপত্রে সই করে যাচ্ছে, যাদুগোপাল বসে আছে একপাশে। নয়নমণির দিকে সে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ। তার মক্কেলের অনুরোধে যাদুগোপাল এর মধ্যে 'মা' নাটক দেখে গেছে একবার। পৌরাণিক নাটকে সাজগোজ করা নয়নমণির সঙ্গে আজকের আটপৌরে শাড়ি পরা নয়নমণির অনেক তফাত।

নয়নমণির সই হয়ে যাবার পর সেই কাগজটি হাতে তুলে নিয়ে যাদুগোপাল বলল, নয়নমণি দাসী? থিয়েটারের জন্য অনেকে নতুন নাম নেয়, আপনার আসল নাম কী?

নয়নমণি বলল, ওই একই নাম।

ভুরু কুঞ্চিত করে আবার নয়নমণির মুখের দিকে তাকাল যাদুগোপাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম। আমি কিছুই ভুলি না। কলেজ জীবনে আমার এক বন্ধু ছিল ভরত সিংহ, বেশ কয়েক বছর আগে তার ভবানীপুরের বাড়ির কাছাকাছি একটি বাগানে আমরা একদিন বনভোজন করেছিলাম। সেখানে আমাদের উনুন ধরিয়ে দিয়েছিল একটি কিশোরী। সে লেখাপড়া জানত, গান জানত। যতদূর মনে পড়ে, তার নাম ছিল ভূমিসুতা। তাই না?

নয়নমণির শরীরটা যেন অনড় পাথর হয়ে গেছে। সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যাদুগোপালের দিকে।

যাদুগোপাল বলল, ভরত আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল। শুনেছি, আপনার জন্য সে বিবাগী হয়ে গেছে। সে এখন কোথায় আছে, আপনি জানেন?

এবারে নয়নমণির শরীরে স্পন্দন এল, থরথর করে কাঁপছে তার ঠোঁট। সে বলল, না, জানি না, জানি না! আমি কিছুই জানি না।

আর দাঁড়াল না নয়নমণি, ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়িতে বসে সে একা একা কাঁদতে লাগল অঝোরে। বাড়ি ফিরেও তার কান্না থামে না। গঙ্গামণি উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কী হয়েছে, হ্যাঁ লা, কী হল তোর, কোন অবাগীর ব্যাটা তোকে কী বলেছে?

নয়নমণি একটা কথাও বলতে পারল না।

১৫

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে, একটু আগে এ বাড়ির সমস্ত ঘরের বাতি নিবেছে, কোথাও কোনও শব্দ নেই। বলু অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করে। আজ সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু জেগে আছেন রবি। রাত্রির পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন জানলার গরাদ ধরে। ক্রোধে তাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলছে, দপদপ করছে কপালের পাশের দুটি শিরা। বাইরের আকাশ মেঘলা, নক্ষত্রমণ্ডলী নিয়ে নিশাপতি অদৃশ্য, মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, একটু পরে শোনা যাবে গুরু গুরু ধ্বনি। অদূরের গাছগুলি যেন নিশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে আছে প্রতীক্ষায়।

এত প্রকৃতিপ্রেমী এই কবি এখন দেখছেন না প্রকৃতির শোভা। ক্রোধের কারণে তাঁর চোখের সামনে এখন কিছুই নেই। এত রাগ তাঁর অনেক দিন হয়নি। তার নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। তিনি জানেন, ক্রোধকে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই, তাতে যুক্তিবোধ ঝাপসা হয়ে যায়। পাকস্থলিতে অম্লরস

স্মরণ হয়। এ সব জেনেও রবি নিজেকে শান্ত করতে পারছেন না। জানলা ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন, একবার দরজা খুলে এলেন বাইরে। আজ বাতাসও থমথমে, তার মস্তিষ্কে শান্তির প্রলেপ দেবার মতন কিছু নেই।

মুস্কিল হচ্ছে এই, লোকজনের সামনে যতই ক্রোধের কারণ ঘটুক কিংবা যতই অপমানিত বোধ করুন, রবি কিছুতেই তাঁর ক্রোধ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেন না। যারা পারে, কিছুক্ষণ পরে তাদের মেজাজ সুস্থ হয়ে যায়। রবি লাজুক নন, কিন্তু কটুকথা কিছুতেই বেরুতে চায় না তাঁর মুখ থেকে। বিশেষত নিমন্ত্রিত হয়ে কোথাও গিয়ে কি দুর্ব্যবহার করা চলে? তাঁদের বংশের কেউ কখনও এমন কিছু করবে না। অন্য নিমন্ত্রিত কেউ যদি উল্লুকের মতন ব্যবহার করে, তবে সেটা তার বংশের দোষ, শিক্ষার দোষ! অথচ এরাই আবার শিক্ষিত বলে গর্ব করে, ডিগ্রিধারী, তকমাধারী!

মুখে বলতে না পারলেও লিখে প্রকাশ করলে মনের জ্বালা মেটে। রবি এর মধ্যে কাগজ-কলম নিয়ে বসেও ছিলেন, কিন্তু মনের একাগ্রতা আসেনি। ক্রুদ্ধ মেজাজ নিয়ে কবিতা লেখা উচিত না। রবি আগে কয়েকবার লিখেছেন বটে, কিন্তু বুঝতে পেরেছেন তাতে কবিতার মান ঠিক থাকে না। ক্রোধ, ক্ষোভ, ঈর্ষা, বক্রোক্তি, কারুর প্রতি ব্যক্তিগত অসূয়া নিয়ে রসসাহিত্য হয় না, মনকে এসব থেকে মুক্ত করে নিতে হয়।

এবার উড়িষ্যায় এসে বারবার তাঁর মন বিগড়ে যাচ্ছে।

উপলক্ষ যদিও জমিদারি পরিদর্শন, আসল উদ্দেশ্য ভ্রমণ, প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জন এবং বন্ধু-সংসর্গ উপভোগ। এমন মহান সুন্দর সমুদ্র। রবি মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইওরোপ ঘুরে এসেছেন দু'বার। আরব্য সাগরের তীরে থেকে এসেছেন বারবার। কিন্তু পুরীর সমুদ্রের যেন তুলনা হয় না। বেলাভূমিতে দাঁড়ালে অবিরাম তরঙ্গমালার রূপ দেখতে দেখতে যেন ফেরানো যায় না চোখ। কিন্তু পুরীতেই একটি বিশ্রী অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কটকে এসে আবার। সমুদ্র নিয়ে একটা কবিতা লেখার কথা মাথায় এসেছিল, কলমের মুখে এসে হারিয়ে যাচ্ছে সেই ভাব। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কি কবিতা লেখা যায়?

শুধু চিঠিতেই খুলে বলা যায় মনের কথা। কাকে চিঠি লিখবেন? একজনকেই শুধু লিখতে ইচ্ছে করে, ইন্দিরা, তাঁর বিবি, বাবি, বব্। ইন্দিরা প্রতিদিন অপেক্ষা করে রবির চিঠির জন্য। রবির মনে পড়ে তার উন্মুখ চাহনি, তার ব্যাকুলতা। কিন্তু এমন তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে ইন্দিরাকেও চিঠি লেখা যায় না।

এবার যাঁদের কাছে আতিথ্য নিয়েছেন, সেই বিহারীলাল গুপ্ত ও সৌদামিনী দেবীর সৌজন্য ও যত্ন তুলনাহীন। কিন্তু তাঁরা বারবার একটা ভুল করছেন। বিহারীলালের ধারণা, রবীন্দ্রবাবু ওড়িশায় এসেছেন, এটা একটা বিশেষ ঘটনা, সুতরাং তা অনেককে জানানো দরকার। রবীন্দ্রবাবু একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সুগায়ক, উচ্চ বংশের সন্তান এবং জমিদার, তাঁর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত হলে খুশি হবে।

পুরীতে সমুদ্রস্নান এবং বেলাভূমিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে বসে থাকাতে চমৎকার সময় কাটছিল। পুরী তাঁর এমন পছন্দ হল যে রবি এখানে একটা বাড়ি বানাবেন ঠিক করে ফেললেন। একটা বেশ ছোট্ট বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, সেখানে এসে থাকবেন মাঝে মাঝে এখন থেকেই কল্পনায় দেখতে পান সেই বাড়িটা। এর মধ্যে বিহারীলাল তাঁর বাড়িতে লোকজনদের ডাকছেন। একদিন ঠিক করলেন রবিকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাবেন। রবির যাবার ইচ্ছে নেই, তিনি যে নিরালায় কিংবা ছোট একটা পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সেটা অন্যে বোঝে না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বকবক করার চেয়ে নীলাম্বুরাশির দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকাও কি অনেক ভাল নয়? বিহারীলাল গুপ্ত যদি এটা বুঝতেন তা হলে তিনি নিজেই তো কবি হতেন। বিহারীলাল রবিকে বোঝালেন যে রবি যখন জমিদার হিসেবে পরিদর্শনে এসেছেন, তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একবার অন্তত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার বিশেষ জরুরি।

ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্স সাহেবের কাছে রবির বিস্তৃত পরিচয় জানিয়ে আগে একটি চিঠি পাঠালেন

বিহারীলাল, বিকেলবেলা রবিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন সাহেবের বাংলোতে। তাঁদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে চাপরাশি ভেতর থেকে ঘুরে এসে জানাল যে সাহেব-মেম ব্যস্ত আছেন, কাল সকালবেলা এলে দেখা হতে পারে। অপমানে রবির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। যেচে এসে এ রকম প্রত্যাখ্যানের অপমান সহ্য করতে হল!

বিহারীলাল অবশ্য ফেরার পথে বারবার বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এ রকম তো হবার কথা না—। খানিকবাদে ম্যাজিস্ট্রেট গিন্নির চিঠি এল, তাতে দুঃখ প্রকাশ করে জানানো হয়েছে যে, চাপরাশি আগের চিঠিটি দিতে ভুল করেছে, না হলে ডিস্ট্রিক্ট জজের সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সব সময়ই দেখা করতে প্রস্তুত। কাল সবাইকে অবশ্যই ডিনারে আসতে হবে ইত্যাদি!

এ চিঠিও রবির পক্ষে সম্মান জনক নয়। একজন জমিদার তথা লেখক বাড়ির দ্বার থেকে ফিরে এসেছেন সেটা বড় কথা নয়, ডিস্ট্রিক্ট জজ মিঃ গুপ্ত ফিরে গেছেন, সেটাই প্রটোকল হিসেবে ঠিক হয় নি। সেই জন্য ডিনার। রবির আবার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিহারীলাল নাছোড়বান্দা। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট পত্নী চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এখন না গেলে তিনি অপমানিত হবেন। আমরা অপমান গিলে ফেলতে পারি, কিন্তু রাজার জাতকে তো অপমান করা যায় না। ভুল ভাঙাভাঙির দায়িত্ব বিহারীলাল নেবেনই। রবি বারবার না না বলতে পারেন না, অগত্যা বিহারীলালের সম্মান রক্ষার্থে তাঁকে যেতেই হল। তারপর শুধু কৃত্রিম হাসি আর আমড়াগাছি কথাবার্তা। রবির মন তিক্ত হয়ে ছিল, কিছুতেই সহজ হতে পারেন নি। ডিনার টেবিলে বসার সময় ম্যাজিস্ট্রেট গিন্নি বললেন, কোনও রকম গো-মাংসের ডিশ্ রাখা হয় নি, আপনারা তো হিন্দু, অপনাদের জাত যাবার সম্ভাবনা নেই!

সম্প্রতি গো-রক্ষা নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, সেই ইঙ্গিত করে একটা খোঁচা মারা হল। বিহারীলালের মুখ চেয়ে রবি কোনও উত্তর দিলেন না। লোককে আমন্ত্রণ করে তার রুচিমতন আহার্যই তো পরিবেশন করা উচিত, সাহেব-সুবোদের ডেকে আমরা কি খুব ঝাল রান্না তাদের পাতে দিই?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবার গান করেন। খানিকটা সুরাপানের পর তিনি গান জুড়ে দিলেন। বিহারীলালই বা ছাড়বেন কেন? তাঁর সঙ্গী এই তরুণ জমিদারটিও যে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক সে কথা বলতে লাগলেন সাতকাহন করে। রবি বারবার বিহারীলালকে ভুরুর ইঙ্গিতে নিষেধ করতে লাগলেন, এখানে গান গাইবার তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, বিহারীলাল বুঝছেনই না। ম্যাজিস্ট্রেটের যুবতী শ্যালিকা বিস্মিত চোখে বলল, রিয়েলি? ইনি একজন সিংগার? আমি কখনও ইন্ডিয়ান সং শুনিনি।

রবিকে গাইতেই হল। এমন অনিচ্ছুক ভাবে তিনি জীবনে কখনও গান করেন নি। এই শ্বেতাঙ্গরা কথা বলছে ওপর থেকে, এরা পিঠ চাপড়াচ্ছে। এ গানের মর্ম কিছুই বুঝছে না। তবু হাততালি দিচ্ছে, বাচ্চাদের আধো আধো বুলি শুনে বয়স্করা যে-রকম হাততালি দেয়।

রবির মুখে একটা তিক্ত স্বাদ লেগে রইল। বাড়ি ফিরে সে বিহারীলালকে দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিল, আর কোনও ইংরেজ রাজপুরুষের সঙ্গে সে দেখা করতে মোটেই রাজি নয়। জমিদারি কাজের জন্যও ওদের সংস্পর্শে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই।

কটকে ফিরে আসার পর আরও বিপত্তি ঘটল। আজই সন্ধের ঘটনায় রবি এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে তা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

বিহারীলাল বাড়িতে লোকজনদের না ডেকে পারেন না। মানুষজনদের না খাইয়ে সৌদামিনীর তৃপ্তি নেই। রবি অন্য কোথাও কারুর বাড়িতে দেখা করতে যাবেন না। কিন্তু এ বাড়িতে তো স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। ওড়িশার কবিরা সবাই বাংলা পড়েন, তাঁরা রবির কবিতার অনুরাগী, অগ্রগণ্য কবি মধুসূদন রাও রবিকে তাঁর কবিতা শোনাতে চান, তাঁরা তো আসবেনই। মধুসূদন রাও আবার স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য। এর মধ্যে এক রবিবার ওড়িয়াবাজারের ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা সভায় রবিকে যেতে হয়েছিল। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদক, এখানকার ব্রাহ্মরা ছাড়বেন কেন! রবির গান গাইবার কথা ছিল, কিন্তু গান

গাইবেন কি, বেদিতে বসে মধুসূদন রাও ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন, রবির গান গাইবার মেজাজই নষ্ট হয়ে গেল। প্রার্থনা সভায় এত লম্বা লম্বা বক্তৃতা রবির একেবারেই পছন্দ নয়। এর পরে মধুসূদন রাওয়ের কবিতা শোনার ব্যাপারেও রবির ভীতি জন্মে গেছে।

ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে মিশতে চান না রবি, কিন্তু ইংরেজ শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে তাঁর আপত্তি থাকার কথা নয়। বিহারীলাল তাই আজ ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এখানকার র‍্যাভেন শ' কলেজের প্রিন্সিপাল হলয়ার্ড সাহেবকে। কিন্তু এই নাকি এক কলেজ অধ্যক্ষের ছিরি! লোকটির দৈত্যের মতন চেহারা। থ্যাবড়া নাক, ধূর্তের মতন চোখ, মুখখানাই প্রকাণ্ড, ঘ্যাড়ঘেড়ে গলার আওয়াজ, অনেক শব্দ বোঝাই যায় না। অধ্যক্ষের বদলে নগরকোটাল হলেই যেন তাকে বেশি মানাত। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়টের সঙ্গে এই হলয়ার্ডের দোস্তি আছে, তাই সবাই তাকে বেশি বেশি খাতির করে, ভয় পায়। ছাত্রদের কাছেও এই অধ্যক্ষ একেবারেই জনপ্রিয় নয়। কলেজ শুরু হয় সাড়ে দশটায়, হলয়ার্ড নিয়ম করেছিল যে গেটের তালা দশটা পঁচিশের আগে খোলা হবে না। রোদ্দুর কিংবা বৃষ্টির মধ্যে ছাত্রদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তালা খোলার পর সবাই হুড়হুড় করে ঢোকে, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। কোনও একটি ছাত্র একদিন গেটের তালাটা চুরি করে নিয়েছিল, সেই জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল বহু ছাত্রকে।

হলয়ার্ডের চেহারা ও কর্কশ ব্যবহার দেখে রবি প্রথম থেকেই তাকে অপছন্দ করেছিলেন। এমন উৎকট ইংরেজ খুব কম দেখা যায়। রবি প্রায়ই ভাবেন, ইংল্যান্ডে তিনি কত ভদ্র, সভ্য, নম্র ইংরেজদের সঙ্গে মিশেছেন, মার্জিত ব্যবহার সে সব ইংরেজদের সঙ্গে বেশ মেশা যায়। এ দেশে এসেই ইংরেজরা এত অভদ্র হয়ে যায় কী করে? কিংবা বেছে বেছে অভদ্র, গোঁয়ারগোবিন্দদেরই পাঠানো হয় ভারতবর্ষে? এই হলয়ার্ড অন্যদের কথা বলার সুযোগ দেয় না, নিজেই বেশি বকবক করে। খাবার টেবিলে বসেই তো অসভ্যতা শুরু করে দিল।

এ বাড়িতে রবি প্রধান অতিথি, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যই সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু হলয়ার্ড রবিকে পাত্তাই দিল না। কে একজন বাংলা কবিতা লেখে কি না লেখে তাতে তার কিছু যায় আসে না। একবার সে শুধু রবিকে বলল, তুমি ইংরিজিতে কিছু লেখার চেষ্টা করো না? তারপরই চলে গেল প্রসঙ্গান্তরে। এই আসরে সে এক মাত্র ইংরেজ, সুতরাং তার কথাই শেষ কথা।

ইংরেজদের মহলে এখন মুখ্য আলোচনার বিষয় দুটি। গোরুর মাংসের মতন একটি সুখাদ্য খাওয়া হবে কি হবে না, তা নিয়ে নেটিভদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি। আর দ্বিতীয়টি হল, বিচার ব্যবস্থায় জুরি প্রথা। লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়ট কিছুকাল আগে এক আদেশ জারি করে বাংলার কয়েকটি জেলায় জুরি ব্যবস্থা ছেঁটে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। শিক্ষিত সমাজ পত্র পত্রিকায় সরকারের এই আচরণের নিন্দা করে, ইংরেজদের কাগজগুলো আবার এই সব শিক্ষিত ভারতীয়দের কুকুর-বাঁদরদের সঙ্গে তুলনা করে। সরকারি আদেশ এখন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঝগড়ার জের মেটেনি।

খাবার টেবিলে বসে সুরায় চুমুক দিয়ে হলয়ার্ড বিহারীলালকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো একজন জজ, তুমি এই জুরি ব্যবস্থা সম্পর্কে কী বলো?

বিহারীলাল বললেন, ইংল্যান্ডে যদি এই জুরি ব্যবস্থা থাকতে পারে, তাহলে ভারতেই বা থাকবে না কেন? আইন তো একই।

হলয়ার্ড অট্টহাসি করে বলে উঠল, তুমি বলো কী গুপ্ত? ইংল্যান্ডের সঙ্গে এদেশের লোকদের তুলনা? ইংল্যান্ডের লোকদের একটা মরাল স্ট্যান্ডার্ড আছে। সেন্স অফ রেসপনসিবিলিটি আছে।

—এ দেশের লোকের নেই?

—কোথায়? কোথায়? নেটিভদের মধ্যে থেকে বেছে জুরি করলে দেখবে তারা ঘুষ খাবে। মিথ্যে কথা বলবে। আইনের পবিত্রতা রক্ষা করবে না।

—এ দেশের সবাই এরকম?

—আলবাত! আমি ছাত্র চড়িয়ে খাই, আমি জানি না? শয়তানের হাড্ডি সব।

একটু থেমে, সকলের দিকে তাকিয়ে হলয়ার্ড বলল, যে বি, দা প্রেজেন্ট কম্পানি এগজেমটেড। কিন্তু আমি দেখেছি, এ দেশের অধিকাংশ লোক অসৎ। মিথ্যেবাদী। এরা জুরি সেজে ইংরেজদের বিচার করবে? অডাসিটি আর কাকে বলে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, নেটিভদের মরাল স্ট্যান্ডার্ড লো, লাইফ-এর সেক্রেডনেস সম্পর্কে কোনও বিশ্বাস নেই···

লোকটি এই কথাই বলে গেল অনবরত। রবি প্রতিবাদ করতে গেলেন দু' একবার, কিন্তু হলয়ার্ড হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়েই বাজিমাৎ করতে চায়। রবি মরে গেলেও অত গলা তুলে কথা বলতে পারবেন না।

আশ্চর্য এই যে হলয়ার্ডের এই সব কথার মধ্যেও অনেকে হাসল, কৃতার্থ হয়ে যাবার ভাব করে তাকিয়ে রইল। অনেকখানি খাদ্য-পানীয় গলাধঃকরণ করে হলয়ার্ড যখন হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার আমাকে যেতে হবে, তখন অনেকে হেঁ হেঁ করে তাকে এগিয়ে দিতে গেল, কেউ কেউ নিজের সন্তানের শিক্ষার কথাও বলল ফিসফিস করে।

এ দেশে বসে, এ দেশের একজন মানুষের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এসে, এদেশের সব মানুষকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়ে গেল একজন লোক। রাজার জাত বলেই তার এত সাহস? আমরা সকলে মিলে এর প্রতিবাদ করতে শিখব কবে?

সেই থেকে রবির মাথায় আগুন জ্বলছে, আজ আর ঘুম আসবে না কিছুতেই।

একটু পরে রবি পাশের ঘর থেকে বলুকে ডেকে তুললেন। বলেন্দ্র এখন তেইশ, চব্বিশ বছরের যুবক, রবি ইদানীং এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে আসছেন মাঝে মাঝে, তাকে জমিদারির কাজ শেখাচ্ছেন তো বটেই, তার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনাতেও অনেক সময় কাটানো যায়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অল্পবয়সীদের মধ্যে বলেন্দ্ররই সত্যিকারের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। বলেন্দ্রর একটাই দোষ, সে বড় বেশি লাজুক, সে লোকজনের সামনে মুখ তুলে কথাই বলতে পারে না।

বলেন্দ্র ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, রবিকা?

রবি ধমকের সুরে বললেন, 'সাধনা'র জন্য তোকে লেখা তৈরি করতে হবে না? শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোলেই চলবে? এত ঘুম ভাল নয়!

রাত্রির তৃতীয় প্রহর, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, বলেন্দ্রর ঘর অন্ধকার, রবির ঘরে একটা হ্যাজাক বাতি রাখা আছে এক কোণে। এই রকম সময় হঠাৎ লেখার কথা?

রবি বললেন, তুই কতখানি লিখেছিস, আমাকে দেখা। আমি সংশোধন করে দিচ্ছি। কাল-পরশুই কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে।

বলেন্দ্র নিজের লেখা কয়েকটি পৃষ্ঠা নিয়ে এল রবির ঘরে। হ্যাজাকটা তুলে রবি টেবিলে বসলেন। বলেন্দ্রর অধিকাংশ লেখাই রবি নিজে দেখে দেন, কোথাও ভাষা বদল করেন, কোথাও জুড়ে দেন কয়েকলাইন, বলেন্দ্র পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, শেখে।

রবি মনঃসংযোগের চেষ্টা করলেন কয়েক মিনিট। তারপর মুখ তুলে বললেন, আজকের ওই সাহেবটা যে আমাদের অপমান করে গেল, তুই কিছু বললি না কেন?

বলেন্দ্র বলল, লোকটা অতি অসভ্য! রবিকা, তুমিও তেমন প্রতিবাদ করলে না। আমি আর কী বলব!

রবি বললেন, আমি বলব কী, ও গাঁক গাঁক করে ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিল যে! একটি খাটি জনবুল!

বলেন্দ্র বলল, লোকটা র-অক্ষরটা উচ্চারণই করে না, অনেক কথা বোঝা যায় না।

রবি বললেন, বলু, আমরা শুধু ওদের সহ্য করি, তাই না। তার ওপর আবার ওদের বাড়িতে ডেকে আনি, ওদের আদর কাড়তে যাই, অবনতির একশেষ। ওদের উচ্ছিষ্ট, ওদের আদরের জন্য আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই। আমি তাতে লাথি মারি।

বলেন্দ্র চমকে উঠল। রবিকাকার মুখে এ ধরনের ভাষা সে কখনও শোনে নি।

রবি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আবার বললেন, মুসলমানের কাছে যেমন শুয়োরের মাংস, ওদের আদর আমার পক্ষে তেমন। যাতে আত্ম অবমাননা করা হয়, তাতেই তো যথার্থ জাত যায়! জানিস বলু, আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভাঙা কুটিরের, সবচেয়ে মলিন চাষিকেও আমি আপনার লোক বলতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিটফাট কাপড় পরে ডগকার্ট হাঁকায়, আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য, যতই উন্নত হোক—আমি যদি কখনও তাদের কাছাকাছি যাবার জন্যে লোভ করি, তা হলে যেন আমার মাথার ওপর জুতো পড়ে!

বলেন্দ্র ব্যাকুল ভাবে বলল, রবিকা, রবিকা।

রবি বললেন, ওই লোকটার কথা শুনে আমার যে কী রকম করছিল, তোকে কী বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, এখনও —

বলেন্দ্র বলল, আর থাক, আর থাক, রবিকা। এখন আর ও নিয়েভেবো না। তুমি বরং একটা গান গাও—

রবি বললেন, এখানে আর একদিনও থাকব না। কালই আমরা বালিয়া চলে যাব। এখানে আর আমার গান আসবে না।

ক্রোধের নিবৃত্তি হল বালিয়াতে গিয়ে। সেখানে ক'দিন ধরেই অশ্রান্ত বৃষ্টি। জমিদারির কাজকর্ম সেরে ফেরার পথে ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি দেখে আবার চলে এলেন কটকে। ভারতের মহান ঐতিহ্যের এই শিল্প নিদর্শনগুলি দেখার পর রবির মন থেকে সব গ্লানি দূর হয়ে যায়।

কটকে এসে ওঁরা আবার উঠলেন বিহারীলালের বাড়িতেই। গুপ্ত দম্পতি অত্যন্ত সজ্জন, তাঁদের ওপর রাগ করে থাকা যায় না। চাকরির সূত্রে বিহারীলালকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়। কিন্তু মনে মনে তাঁরা স্বদেশি। রবিদের পরিবারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অনেক দিনের।

এবারে আর বিহারীলাল সামাজিক অনুষ্ঠানাদির দিকে গেলেনই না। সৌদামিনী তাঁর 'সখি সমিতি'র উদ্যোগে শুরু করলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকের মহড়া। রবিকে অনুরোধ করলেন গানের সুরগুলি ঠিকঠাক দেখিয়ে দিতে।

এ কাজ রবির খুবই পছন্দ। তাঁর গান অন্য কেউ গাইলে তিনি বেশ শ্লাঘা অনুভব করেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ, নিধুবাবুর মতন তাঁর গানও কি একদিন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে? এই বত্রিশ বছর বয়েসের মধ্যেই কম গান তিনি লেখেননি। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এখন তাঁর গান গাওয়া হয়, কিন্তু বাংলার বাইরে রবি তাঁর গান অন্যের মুখে এই প্রথম শুনলেন।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করছে, তাদের সকলেরই উচ্চারণ বা সুর এখনও ঠিক সড়গড় হয়নি। 'বাল্মীকি'র ভূমিকায় হেরম্বচন্দ্র নামে স্থানীয় এক শিক্ষকের অভিনয় বেশ আড়ষ্ট। গানের গলা আছে, কিন্তু কথায় কথায় তাল দেবার দিকে ঝোঁক। অন্যরা মোটামুটি চলনসই, শুধু মহিলামণি নামে একটি তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন রবি। এই চঞ্চলা তরুণীটি অন্যদের সঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে, আবার নাটকের মহড়ার সময় তার বাংলা উচ্চারণ একেবারে নির্ভুল, একটু টানও নেই। শুধু তাই নয়, অন্যরা কেউ দু'একটি পংক্তি ভুলে গেলে মহিলামণি বই না দেখেই তা বলে দেয়। অর্থাৎ পুরো নাটকটিই তার মুখস্ত।

অভিনয় প্রতিভা অনেকের সহজাত ভাবেই থাকে। আবার কারুর কারুর অনেক ঘষামাজাতেও কিছু হয় না। বাল্মীকির ভূমিকাটি ফুটছে না একেবারেই।

রবি এক সময় মহিলামণির তারিফ করে বললেন, তুমি দেখছি সব গানগুলিই শিখে নিয়েছ, ইচ্ছে করলে তুমি বোধহয় বাল্মীকি সাজতেও পারো!

মহিলামণি সঙ্কোচে মাথা নিচু করল।

ইঙ্গিতটি বুঝতে পারলেন সৌদামিনী। তিনি বললেন, কী আশ্চর্য হেরম্ব, তুমি তো আগে এর চেয়ে অনেক ভাল শিখেছিলে। এখন ভুল করছ কেন?

হেরম্বচন্দ্র বলল, স্বয়ং নাট্যকারকে দেখে আমার সব গুলিয়ে গেছে। তা ছাড়া, উনি নিজে এই ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছিলেন, সেই কথা ভেবেই আমার হাত-পা গুটিয়ে যাচ্ছে। ওঁর তুলনায় আমি তো নিতান্তই তুচ্ছ!

একথা ঠিক, রবি উপস্থিত থাকলে মেয়েদের তুলনায় পুরুষরা সবাই যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। যেন তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে। রবির মতন এমন রূপবান ও মধুর স্বভাব সম্পন্ন পুরুষ দুর্লভ। মেয়েরা তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, পুরুষদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। রবি আসবার আগে মহড়ার সময় হেরম্বচন্দ্রের নায়কোচিত দাপট ছিল, এখন স্বয়ং নাট্যকারই নায়ক, সে একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। নাট্যকারও নারীদের প্রতি যত মনোযোগী, পুরুষদের প্রতি ততটা নন। রবির স্বভাবই এই, অচেনা পুরুষদের সঙ্গে তিনি সহজে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে অনায়াসেই তাঁর সখ্য হয়ে যায়।

হেরম্বচন্দ্র হাত জোড় করে বলল, আমি একটা প্রস্তাব নিবেদন করব? আমাদের এই নাটক মান্যগণ্য অনেকেই দেখতে আসবেন। আমাদের সৌভাগ্যবশত স্বয়ং রবীন্দ্রবাবু যখন এখানে উপস্থিত আছেন, তিনিই বাল্মীকির ভূমিকা গ্রহণ করুন। তা হলেই পালাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে। আমি ঠিক পারছি না, আমি সরে দাঁড়াচ্ছি।

অনেকেই সমর্থনসূচক শব্দ করল। সৌদামিনী দারুণ আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে রইলেন রবির দিকে।

রবি মাথা নেড়ে সহাস্যে বললেন, তা হয় না। নাটক রচনা করে এমনই কী অপরাধ করে বসেছি যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমায় তা অভিনয় করেও দেখাতে হবে? সঙ্গীত যিনি রচনা করেন, এক সময় তিনি তুচ্ছ হয়ে যান, বিভিন্ন গায়কেরাই সে সঙ্গীতের যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তোলেন। আমি এখানে দর্শকের আসনেই বসতে চাই। হেরম্ববাবু, আপনি অবশ্যই পারবেন।

তিন চারদিন মহড়াতে বসেই রবি সকলকে চিনে গেলেন। মহিলামণিই তাঁকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি সৌদামিনীর কাছ থেকে ওর সম্পর্কে সব খবরাখবর জেনেছেন, এমন এক প্রাণোচ্ছল তরুণীকে অকালবৈধব্যের যাতনা বয়ে যেতে হবে সারাজীবন? সৌদামিনীর সাহচর্যে এসে সে বাইরের পৃথিবীর অনেক কথা জেনেছে, খানিকটা যেন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু বিহারীলালের বদলির চাকরি, তাঁরা তো কটকে বেশিদিন থাকবেন না। তাঁরা চলে গেলে এই মেয়েটি আবার যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে?

রবিই প্রস্তাব করলেন, আচ্ছা, ওই যে ভরত নামে ছেলেটিকে দেখি পেছনের দিকে চুপ করে বসে থাকে, নিজে থেকে কোনও কথাই বলতে চায় না, যেন অন্যেই সব কথা বলবে, ও শুধু শুনবে, ওর কি বিবাহ হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তা হলে এই দু'জনকে মিলিয়ে দেবার জন্য ঘটকালি করলে হয় না?

সৌদামিনী বললেন, কে ঘটকালি করবে? তুমি? এখানে বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই।

রবি বললেন, কারুকে তো শুরু করতে হবে? নইলে প্রচলন হবে কী করে? এই যুবকটি সেই সাহস সঞ্চয় করতে পারবে কি না, সেইটা জানাই আগে দরকার।

সৌদামিনী বললেন, আমি দু'একবার ইঙ্গিত দিয়েছি। ভরতের বিবাহে মন নেই মনে হয়।

ভরত পারতপক্ষে রবির কাছ ঘেঁষে না। এই কবির কবিতা সে কৈশোরকাল থেকে পছন্দ করে, মুখস্থও বলতে পারে এখনও অনেক লাইন, কিন্তু ওঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার ব্যাপারে তার একটা আশঙ্কা আছে। ভরত জানে, রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ সরকারের যোগাযোগ আছে। সেই জন্যই ভরত এঁর কাছে নিজের পরিচয় কোনওক্রমেই জানাতে চায় না। এর মধ্যেই একবার রবি ভরতের উচ্চারণ শুনে বলেছেন, বাড়ি কোথায়? কুমিল্লা, নাকি সিলেট?

নিজের পার্টের সময়টুকু ছাড়া আর মুখ খোলে না ভরত। মহিলামণিকে সে চক্ষু দিয়ে অনুসরণ করে, কিন্তু এখন আর তার বুক কাঁপে না। একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলামণির মুখের একটা পাশের সঙ্গে ভূমিসুতার মুখের যথেষ্ট মিল আছে ঠিকই, এই পৃথিবীতে কত মানুষ, একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারার কিছুটা সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু ভরত ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে ভূমিসুতার সঙ্গে মহিলামণির আর কোনও সম্পর্কই নেই। আত্মীয়তা দূরে থাক, ভূমিসুতা নামে সে কারুকে চেনে না। সুতরাং এখন আর মহিলামণি সম্পর্কে ভরতের কৌতূহল বা আগ্রহ নেই, মহিলামণির মুখের একটি পাশ যখন ভূমিসুতার মতন দেখায়, তখন শুধু সেইটুকু সে দেখে।

ঘটকালির ব্যাপারে রবির খুব উৎসাহ। যে সব মেয়েরা নিছক অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে না, স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে, নিজস্ব কোনও গুণপনার পরিচয় দেয়, সে রকম কারুর সঙ্গে একবার পরিচয় হলে রবি তাদের একেবারে হারিয়ে ফেলতে চান না। তিনি চান, তারা কাছাকাছি থাকুক। পরিচিত কারুর সঙ্গে বিবাহ হলে সংস্পর্শ থেকে যায়।

ভরতের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেবার বদলে রবি তার কাছে বলেন্দ্রকে পাঠালেন। ভরত এখানকার একটি ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষক, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, তাকে অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। শিলাইদহে একজন নতুন ম্যানেজারের প্রয়োজন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও খাজাঞ্চিখানায় এরকম একজন উপযুক্ত লোক পেলে ভাল হয়। বলেন্দ্রকে সে রকম কথাই বলে পাঠালেন রবি।

চতুর্ভুজ নামে কাজের লোকটি ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবার নাম করে আর ফেরেনি, ভরতের ক্ষুদ্র সংসারটি এখন নিজেকেই সামলাতে হয়। মোটামুটি রান্নার কাজ ভরত নিজেই চালাতে পারে, কিন্তু স্বভাবটি তার বড় অগোছালো, তার জিনিসপত্র সব ছড়ানো থাকে এদিকে সেদিকে। বিছানাটা পাতাই থাকে দিনের পর দিন, গুটিয়ে রাখা হয় না। সেই খোলা বিছানায় থাকে দু'একখানা বই, ময়লা জামা, ভিজে গামছা।

বলেন্দ্র ধনীর সন্তান, দাস-দাসী পরিবৃত সংসারে মানুষ, নিজের হাতে কোনও কিছু করতে শেখেনি, লেখা-পড়া ও সঙ্গীত-শিল্পের চর্চাতেই বর্ধিত হয়েছে। একটি অবিবাহিত যুবকের এমন ছন্নছাড়ার মতন সংসার দেখার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। সে এসে দেখল, ভরত নামে এই গ্র্যাজুয়েট যুবকটি কোমরে একটি গামছা বেঁধে, একটি ঝাঁটা নিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘরের কোণ থেকে আরশোলা মারছে।

আরশোলা নামক প্রাণীটিকে, প্রাণী বা পতঙ্গ যাই-ই হোক, বলেন্দ্র বড়ই ভয় পায়। তটস্থ হয়ে সে দরজার কাছ থেকে সরে গেল।

ভরত তাকে দেখে কুণ্ঠিতভাবে বলল, ইস্, আপনি এলেন, কোথায় যে আপনাকে বসতে বলি! এই বর্ষার সময়ে বড় পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়! সকালেই খাটের তলা থেকে একটা তেঁতুলে বিছে বেরিয়েছে! ব্যাটাকে মেরে ফেলেছি অবশ্য।

তেঁতুলে বিছের নাম শুনেই বলেন্দ্রর একটি লম্ফ দিতে ইচ্ছে হল। সভয়ে তাকিয়ে দেখল, দ্বিতীয় কোনও বিছে পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করছে কি না। তেঁতুলে বিছেরা ব্যাচেলারের মতন একা একা থাকে এমন কখনও শোনা যায়নি, তাদের সঙ্গী-সাথী কাছাকাছি থাকতেই পারে।

হাত ধুয়ে, গামছাটা খুলে রেখে এসে ভরত বলেন্দ্রকে নিয়ে বাইরের রকে বসল। গল্প হল কিছুক্ষণ। ভরত অবশ্য এখানকার ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে, ঠাকুরদের জমিদারিতে চাকরি নিতে রাজি নয়। এখানেই সে বেশ আছে।

ভরতকে বেশ পছন্দই হল বলেন্দ্রর। ফিরে গিয়ে রবিকাকাকে সব বিবরণ দিতে দিতে বলল, জানো, ওর ওই একলা একলা গৃহস্থালি আমার বেশ লেগেছে। বিদেশের কোনও গল্পের নায়কের মতন! তবে, ওসব দেশে আরশোলা কিংবা তেঁতুলে বিছে থাকে না বোধ হয়।

সৌদামিনী বললেন, বলুকে দিয়ে হবে না, তুমি নিজে কথা বলে দেখো, রবি।

পরের দিন সারা দিন বৃষ্টি, অঝোরে বৃষ্টি, আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। বিকেল পাঁচটা থেকে মহড়া শুরু হওয়ার কথা, কেউ আসেনি। জজসাহেব অবশ্য যথাসময়ে আদালতে গেছেন, দুপুরে রবি কিছুক্ষণ 'নেপালিজ বুদ্ধিস্ট লিটেরেচার' নামে একটি বই পড়েছেন, কিছুক্ষণ 'সাধনা'র জন্য একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বলেন্দ্রকেও লিখতে বসিয়ে দিলেন, কোনও এক ফাঁকে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। রবির একেবারেই দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই।

একসময় রবি একটা গান শুনতে পেলেন। কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সুর শুনে অনুসরণ করতে করতে তিনি এলেন মহড়ার ঘরটিতে। বাংলোর পেছন দিকে প্রশস্ত এই ঘরটিতে অন্য সময় সখি সমিতির অধিবেশন হয়। এখন প্রায় প্রতিদিনই থিয়েটারের মহড়ার শেষ পর্ব চলছে।

ঘর জোড়া সতরঞ্চি পাতা, তার ওপর রাখা রয়েছে দুটি তানপুরা। এই ঘরে সবই কাচের জানলা। বাইরের প্রান্তর ও দূরের গাছপালার রেখা স্পষ্ট দেখা যায়। একটি খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টি মাখানো বাতাস ভেতরে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। সেই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মহিলামণি। আর কেউ আসেনি। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যেও তার গরজ এমন বেশি যে সে না এসে পারেনি। ভিজে গেছে তার শাড়ি। তার আলুলায়িত চুল থেকে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল। গুনগুনিয়ে সে গাইছে : এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়...।

দূরে দাঁড়িয়ে রবি নিঃশব্দে শুনতে লাগলেন সেই গান। কোনও নিপুণ শিল্পীর আঁকা ভাল ছবি দেখলে যেরকম মুগ্ধতাবোধ হয়, কোনও উত্তম কাব্যের বর্ণনাংশ পড়লে যেমন হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে, সঙ্গীতরতা মহিলামণিকে দেখে রবিরও সেইরকম অনুভূতি হল। এ যেন মেঘদূতের সেই কশ্চিৎ বিরহী কান্তা, মেঘের উদ্দেশে জানাচ্ছে তার হৃদয়বেদনা।

রবি আরও গভীর তৃপ্তির আচ্ছন্নতা বোধ করলেন এই কারণে যে, এই নায়িকাটি কালিদাসের রচনা উচ্চারণ করছে না, গাইছে তাঁরই রচিত গান। নিজের সৃষ্টির এমন মূর্ত রূপ দেখলে কোন স্রষ্টার না আনন্দ হয়?

মহিলামণি হঠাৎ রবির উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ নিচু করল। রবি বললেন, থামলে কেন? সম্পূর্ণ গানটা গাও, বেশ গাইছিলে।

মহিলামণি বলল, আর জানি না।

রবি বললেন, গাও, আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি :

...সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—
আঁধারে মিশে গেছে আর সব...

শিল্পের এমনই নিগূঢ় রহস্যময় টান যে এক এক সময় সত্যিই যেন সমাজ-সংসার সব তুচ্ছ হয়ে যায়। সেসবের কথা কিছুই মনে পড়ে না। এক মুগ্ধ রমণীর কণ্ঠে নিজের গান তুলিয়ে দিচ্ছেন এক কবি। বর্ষার সেই গানের সঙ্গে সঙ্গত করছে বৃষ্টিপাতের ধ্বনি, এখন শুধু এটাই সত্য।

এই নাটকটিকে উপলক্ষ করে কয়েক দিনের মধ্যেই একটা বেশ বড় নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

অভিনয়ের দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেছে, মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে বিহারীলালের বাড়িরই উদ্যানে। কটক শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হচ্ছে। বলেন্দ্রনাথ মহা উৎসাহে মঞ্চ সাজাবার পরিকল্পনায় মেতে উঠেছেন, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত।

যে-দিন পাত্রপাত্রীদের সাজসজ্জা পরে মহড়া হবার কথা, সেইদিন মহিলামণি এল না। নাটকের ব্যাপারে তারই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ, প্রতিদিন সে সকলের চেয়ে আগে আসে, মাঝে মাঝে সে সারা দিনই এ বাড়িতে কাটায়, তবে কি সে অসুস্থ হয়ে পড়ল?

একজন আর্দালিকে পাঠানো হল মহিলামণির বাড়িতে। আর্দালি ফিরে এসে বিশেষ কিছু খবর দিতে পারল না। মহিলামণি অসুস্থ কি না তা জানা যায়নি, সে বাড়ির একজন লোক শুধু বলে দিয়েছে, যে মহিলামণি আসতে পারবে না।

এর পর স্বয়ং বিহারীলাল গেলেন এবং ফিরে এলেন মুখ চুন করে। নাটক বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মহিলামণিকে আর পাওয়া যাবে না। ওর বদলে অন্য কোনও মেয়েকে এত

তাড়াতাড়ি তৈরি করা অসম্ভব।

মহিলামণির বাবা সুদামচন্দ্র নায়ক একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী, শহরের অনেকেই তাঁকে চেনে। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন, কন্যার বয়েস তখন এগারো বছর। দু'বছরের মধ্যেই মহিলামণির সেই স্বামীটি জলে ডুবে মারা যায়, ভরা বর্ষায় মহানদী নদীতে সে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। এর মধ্যে মহিলামণি একদিনও স্বামীর ঘর করেনি, স্বামীটিকে সে চিনলই না, তার সব সাধ-আহ্লাদ সারা জীবনের মতন ঘুচে গেল। এটা ওই মেয়ের নিয়তি। সকলেরই ধারণা, পূর্বজন্মের কোনও পাপের জন্যই মেয়েরা অকালে বিধবা হয়। এ জন্মে শুদ্ধচারিণী থেকে সেই পাপ মোচন করতে পারলে পরজন্মে সেই স্বামীর সঙ্গেই মিলিত হওয়া যায়।

সুদামচন্দ্র মেয়ের ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন না। মহিলামণি বাড়িতে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিল, গান-বাজনারও চর্চা করেছে। জজসাহেব ও তাঁর পত্নীকে এখানকার সবাই খুব শ্রদ্ধা করে, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে মহিলামণি আনন্দে সময় কাটায়, তাতেও তার বাবার আপত্তি নেই। সুদামচন্দ্র নিজে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত না হলেও স্থানীয় ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে, কারণ ব্রাহ্মরা মদ্যপান করে না, রক্ষিতা পোষে না। শহরের অনেক ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে ওই দুটি ব্যাপার অবাধে চলে। সুতরাং মেয়ে একটি ব্রাহ্ম পরিবারের সুস্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বলে সুদামচন্দ্র খুশিই হয়েছিলেন।

কিন্তু পুরুষের সঙ্গে মিলে নাটক করা, সে যে এক অসম্ভব ব্যাপার। সমাজে সবাই ছি ছি করবে। বিহারীলালের সামনে হাত জোড় করে সুদামচন্দ্র বলেছেন, জজসাহেব, এ অনুরোধটা আমাকে করবেন না। জেনেশুনে আমার মেয়েকে অমি অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেব? বিধবা মেয়ে মঞ্চে নাচবে? লোকে আমার মুখে চুনকালি দেবে!

কটক শহরে নাটকের ঐতিহ্য অনেক দিনের। বাঁধা মঞ্চে ওড়িয়া নাটকের অভিনয় হয়, কিন্তু সেখানে পুরুষ অভিনেতারাই মেয়ে সাজে। শাড়ি পরা পুরুষরা নানান আদিরসাত্মক অঙ্গভঙ্গি আর রং ঢং করে, তাতে দর্শকরা হেসে গড়াগড়ি যায়। প্রকাশ্যে কোনও মেয়ের অমন কিছু করা মানে তো সমাজ একেবারে রসাতলে যাওয়া।

কলকাতার ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা, মেয়েরা, ঘরের বউরা পর্যন্ত মিলেমিশে অভিনয় করে। সেই দেখাদেখি আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে এরকম পারিবারিক নাটকের চল হয়েছে। বিভিন্ন মঞ্চেও মেয়েরা এসে গেছে অনেক দিন। এখানে একেবারে ঘরোয়া অভিনয়ে মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করালে যে কোনও আপত্তি উঠতে পারে, তা বিহারীলালের মাথাতেই আসেনি।

সুদামচন্দ্রকে তিনি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এটা তো পেশাদারি মঞ্চের অভিনয় নয়, টিকিট কেটে যে-কেউ দেখতে আসতে পারবে না। শুধুমাত্র গণ্য মান্য নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, অভিনয় হচ্ছে তাঁর নিজের বাড়িতে। কিন্তু সুদামচন্দ্র অনড়।

যেন দারুণ কোনও শোকের ঘটনা ঘটে গেছে, সবাই তেমনভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়লেন সৌদামিনী। তিনিই তো সকলকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করেছেন। মহিলামণি তাঁর নিজের হাতে গড়া।

সৌদামিনী ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, ওর বাবা অমন অন্যায় জুলুম করলেই বা আমরা মেনে নেব কেন? এত একটা গুণী মেয়ে...আমরা ওকে জোর করে নিয়ে আসতে পারি না?

বিহারীলাল ম্লানভাবে হাসলেন। তিনি মহামান্য বিচারক হয়ে এমন একটা বে-আইনি কাজ করবেন কী করে?

রবি কোনও মন্তব্য করলেন না। এরকম কত মেয়ে হারিয়ে যায় এদেশে। নিয়তিনির্ভর জাতি। এই নিয়তির বোঝা সরাতে না পারলে আলো আসবে কীভাবে! তিনি বলেন্দ্রর দিকে তাকালেন। অর্থাৎ এবার তল্পি-তল্পা বাঁধতে হবে। এই নাটকের জন্যই ওঁরা কলকাতায় ফেরা বিলম্বিত করেছিলেন।

সৌদামিনী আবার আপন মনে বললেন, ভরতের সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হত, কেমন সুন্দর মানাত

দুটিকে, তা হলে আর কেউ আপত্তিও করতে পারত না।

সকলেরই তখন মনে হচ্ছে, এটাই যেন সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। অনেকে ঘিরে ধরল ভরতকে। দুটি মেয়ে তখুনি চলে গেল মহিলামণির কাছে।

তারপর কয়েকটি দিনের মধ্যেই দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল ঘটনার। বিহারীলাল তাঁর ওড়িয়া বন্ধুদের ধরলেন বিধবাবিবাহের ব্যাপারে সুদামচন্দ্রকে রাজি করাতে। বিদ্যাসাগরমশাই ওড়িশাতে মোটেই অপরিচিত নন, ফকিরমোহন সেনাপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত অনুবাদ করেছেন বহু দিন আগেই। পত্র-পত্রিকায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কেও লেখালেখি হয়।

মহিলামণির আপত্তি নেই। ভরত আপত্তি জানাবার সুযোগই পেল না, সৌদামিনী নিজের মায়ের মতন তাকে স্নেহের ধমক দিতে লাগলেন বারবার। ভরত শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, ভূমিসুতাকে সে আর পাবে না, হয়তো সে বেঁচেই নেই। তা হলে ভূমিসুতার মতন মুখের ডান পাশটা দেখতে, এমন একটি মেয়েই হোক তার জীবনসঙ্গিনী। এও যেন আংশিকভাবে ভূমিসুতাকে পাওয়া।

মহিলামণি ও ভরত দু'জনেই দীক্ষা নিল ব্রাহ্ম ধর্মে। ব্রাহ্ম মতে সম্পন্ন হয়ে গেল তাদের বিবাহ। পরদিনই তাদের অভিনয়।

১৬

একটি স্পেশাল ট্রেনে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এসে পৌঁছলেন শিয়ালদা স্টেশনে। সঙ্গে পারিষদ এবং খিদমতগারদের বেশ বড় একটি দল। মহারাজের প্রধান দেহরক্ষী এখন মহিম ঠাকুর, তাকে কর্নেল পদে উন্নীত করা হয়েছে, সে মহারাজের স্নেহভাজন বয়স্যও বটে। আঠাশ বৎসর বয়সী এই যুবা মহিম ঠাকুর সুঠাম দেহের অধিকারী, পড়াশুনোও করে যথেষ্ট। মহারাজ তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেন।

মহারাজের শরীর এখন প্রায়ই সুস্থ থাকে না, চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতে হয়। ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদেও অশান্তি লেগেই আছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত, ইংরেজ রাজপুরুষদের আধিপত্য ঠেকাবার জন্য চাণক্যসম ধুরন্ধর রাধারমণ ঘোষ বুদ্ধির খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে তিনি মাথা গলান না। মহারাজ একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেই তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কুমার সমরেন্দ্র ও কুমার রাধাকিশোরের পক্ষ নিয়ে দুটি দল ভাগ হয়ে যায়। রাধাকিশোর অনেক আগেই যুবরাজের পদ পেয়েছেন, সিংহাসনের ওপর তাঁর পরিপূর্ণ দাবি রয়েছে, কিন্তু মহারাজ ইচ্ছে করলে অন্য কারুকেও মনোনীত করতে পারেন। মহারাজের ব্যবহারে সে রকম একটা কিছু যেন প্রকাশ পায় মাঝে মাঝে। প্রথমা পত্নী ভানুমতীর স্মৃতি তিনি এখনও ভোলেননি, ভানুমতীর সেই স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা তাঁর মনকে পীড়া দেয়, ভানুমতীর প্রিয় সন্তান সমরেন্দ্রচন্দ্রকে সেই জন্য তিনি কাছাকাছি রাখেন। সমরেন্দ্রচন্দ্রের আশা, পিতা শেষ পর্যন্ত তাকেই সিংহাসনে বসাবেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্য দুই পুত্রের দাবি সম্পর্কে নিজে এখনও মৌখিক ভাবে কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। কিছুদিন রোগভোগের পর একটু সুস্থ হয়ে উঠেই মুচকি হেসে বলেন, আমি তো এবারেও মরিনি। মাত্র উনষাট বছর বয়েস, যদি একশো বৎসর বাঁচি? ততদিন কে ধৈর্য ধরে থাকতে পারে দেখা যাক!

মহিম ঠাকুরের কাঁধে ভর দিয়ে স্টেশন চত্বর দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে মহারাজ বললেন, মহিম, আমার কাছে ত্রিপুরার চেয়ে বেশি প্রিয় স্থান আর কোথাও নেই, ত্রিপুরার বাতাসে আমার শরীর জুড়োয়, কিন্তু

কলকাতায় এলেও বেশ ভাল লাগে হে! কলকাতার বাতাস বিশুদ্ধ নয়, দূষিতই বলতে পার, রাস্তায় কত ধুলো, অনেক কল-কারখানা গজিয়ে উঠেছে, সেগুলির চোঙা থেকে গল গল করে ধোঁয়া বেরোয়, তাতে চক্ষু জ্বালা করে, অনবরত ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, তবু কলকাতায় এলে চাঙ্গা বোধ করি কেন জানো? এখানকার বাতাসে মিশে আছে বহু বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ মানুষের নিশ্বাস। এমনটি আর ভূ-ভারতে কোথায় আছে?

মহিম বলল, তা ঠিক। মহারাজ, আপনার হাত এত ঘামছে কেন?

মহারাজ বললেন, ওইটাই তো আমার প্রধান রোগের লক্ষণ! শরীরের কলকব্জায় কোথাও কিছু গোলযোগ ঘটেছে। এখানে যে ওই এক নামজাদা ডাক্তার আছে, কী যেন নাম, মহীন, মহীনলাল, তাই না।

মহিম বলল, মহেন্দ্রলাল সরকারের কথা বলছেন?

মহারাজ বললেন, ঠিক ঠিক, মহেন্দ্রলাল, তাকে ডেকে আনিস, তার ওষুধ খাওয়ার চেয়েও তার কথাবার্তা শুনে আমি বেশ মজা পাই।

তারপর মহারাজ উচ্চহাস্য করে বললেন, ওই একটিমাত্র ডাক্তার, যে আমাকেও ধমকে কথা বলে!

স্টেশনের বাইরে অনেকগুলি জুড়িগাড়ি মহারাজ ও তাঁর দলবলের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এ যাত্রায় কনিষ্ঠা রানি মনোমোহিনীকেও সঙ্গে আনা হয়নি, তিনি এর মধ্যেই দুটি সন্তানের জননী। কুমার রাধাকিশোর কলকাতায় আসার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তিনি কলকাতার উচ্চবর্গীয় সমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তার আসার ব্যবস্থা সব ঠিক ছিল, শেষ মুহূর্তে কোনও কারণে মহারাজ তাঁকে ত্রিপুরাতেই থাকতে বলেছেন।

গাড়িতে ওঠার আগে মহারাজ একটুক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই নগরী যেন সদাই ব্যস্ত। মানুষজন হাঁটে না, দৌড়োয়। কোথায় যায়, এদের এত কীসের কাজ? এই তুলনায় ত্রিপুরায় জীবন কত শান্ত, ঢিলেঢালা। কলকাতার মানুষ একে অপরকে ঠেলেঠুলে ছুটছে, যেন জীবন যাপনের মধ্যে সর্বক্ষণই রয়েছে এক প্রতিযোগিতা।

সার্কুলার রোডের বাড়িটিতে মহারাজ বীরচন্দ্র যখন প্রথমবার আসেন, তখন শশিভূষণ তাঁর সাড়ম্বর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন শশিভূষণ নেই, মহারাজও আসছেন ঘন ঘন, তাই সে রকম কিছু ঘটল না। মহারাজ এসেই ওপরে উঠে গেলেন বিশ্রাম নিতে। একেই তো শরীর সুস্থ নয়, তার ওপর দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার ক্লান্তি, প্রথম দিন তিনি বাইরের কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না। রানিদের কারুকে সঙ্গে আনেননি, কিন্তু দুজন কাছুয়া তরুণী সঙ্গে এসেছে সেবার জন্য। সারাদিনে ও রাত্রে কিছু সময়ের জন্য অন্তত নারীসঙ্গ তাঁর চাই-ই, না হলে প্রাণ উচাটন হয়। পুরুষরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে কেমন একটা রুক্ষতার বাতাস এসে গায়ে লাগে, নারীদের অলঙ্কারের সামান্য রিনিঝিনি, তাদের কটাক্ষ, তাদের বিলোল হাস্যে মধুর রসের সৃষ্টি হয়।

প্রভাবতী ও গিরিধারা নাম্নী যে যুবতী দুটি এসেছে, তারা সেবাকার্যে ও অঙ্গসংবাহনে খুবই নিপুণ, কিন্তু দুজনের একজনও গান জানে না। আসর জমিয়ে বড় বড় ওস্তাদদের গান শুনতে মহারাজ পছন্দ করেন, কীর্তনীয়ারা তাঁকে প্রায়ই পদাবলী সঙ্গীত শোনায়, কিন্তু মহারাজের বড় শখ, বিশ্রাম নেবার সময় শয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি রমণীকণ্ঠের গান শুনবেন। সে শখ আর মিটল না। তাঁর রানিরা কেউ গান জানে না, ত্রিপুরায় স্ত্রীলোকেরা গান বাজনার চর্চা করে না।

মহারাজকে বিশ্রাম নেবার জন্য পাঠিয়েই বেরিয়ে পড়ল মহিম। কলকাতা শহর তার খুব পরিচিত। সে এই শহরে থেকে পড়াশুনো করেছে। হেয়ার স্কুলে তার সহপাঠী ছিল ঠাকুরবাড়ির ছেলে বলেন্দ্রনাথ। কলেজ স্ট্রিটে শ্রীহট্ট মেসে থাকার সুখস্মৃতি আছে। সেই মেসের সহবাসীরা ত্রিপুরার ছেলে বলে মহিমকে বিশেষ খাতির করত। সুরেন বাড়ুজ্যের গরম গরম বক্তৃতা শুনে ছাত্রদের মধ্যে তখন রাজনৈতিক চেতনা জাগছে, ত্রিপুরা-রাজ্য প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের বাইরে একটি স্বাধীন দেশ, সে জন্য সকলেরই কৌতূহল ছিল ত্রিপুরা সম্পর্কে।

মহিম কলেজ স্ট্রিটের সেই মেসে গিয়ে পুরনো আমলের কাউকেই পেল না। আবাসিকরা সব নতুন তো বটেই, ম্যানেজার-ঠাকুর-চাকররাও বদলে গেছে। শুধু একজন দারোয়ান এখনও রয়ে গেছে, সে মহিমকে চিনতে পারল বলেই তার বড় আনন্দ হল।

সেখান থেকে সে গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। খবর পেয়ে নেমে এল বলেন্দ্র, মহিমকে দেখে আলিঙ্গন করল সাদরে। দুই কৈশোরের বন্ধু মেতে উঠল গল্পে।

মহিম ছাত্রজীবনে এ বাড়িতে আগেও এসেছে। বলেন্দ্রর কাকা কবিবর রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গেও পরিচয় আছে বিলক্ষণ। মহারাজ এই রবীন্দ্রবাবুকে খুব পছন্দ করেন, কলকাতায় এলেই তাঁকে ডেকে নেন। রবীন্দ্রবাবু এখন বাড়িতে নেই, মহিম বলেন্দ্রকে বলল, আর একদিন সে নিজে এসে রবীন্দ্রবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যাবে।

এরপর সে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চেম্বারে গিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এল।

মহেন্দ্রলাল এলেন পরদিন বিকেলে।

কলকাতায় এসেই শরীরে বেশ অস্বস্তিবোধ করছেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, তিনি শয্যা ছেড়ে আর ওঠেননি। ডাক্তারকে নিয়ে আসা হল অন্দরমহলে।

মহেন্দ্রলালের যা স্বভাব, দরজার সামনে কিছুক্ষণ গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে, ওয়েস্ট কোটের পকেটে দুটি হাত দিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন সারা ঘর। রোগীর চিকিৎসা করার আগেই কক্ষের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখলে তিনি ধমক দিতে শুরু করেন।

এখানে সে রকম কিছু পেলেন না, কিন্তু রোগীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তাঁকে বেশ অসন্তুষ্ট মনে হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, হুঁ।

পালঙ্কের পাশে একটি চেয়ারে বসে তিনি মহারাজের একটি হাত ধরে নাড়ি দেখতে দেখতে বললেন, গতবারে আপনাকে যেমনটি দেখেছি, তার চেয়ে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে। মুখের চামড়ার রং ভাল নয়। খুব অনিয়ম করছেন বুঝি?

মহারাজ বললেন, অনিয়ম কাকে বলে? বাপ-ঠাকুরদারা যেরকম ভাবে জীবন কাটিয়েছেন, আমিও সেইভাবে কাটাই।

মহেন্দ্রলাল বললেন, বাপ-ঠাকুরদার মতন। হুঁ! রাজা-মহারাজাদের অনেক রকম বদ অভ্যেস থাকে শুনেছি। আপনার সে রকম কী কী আছে শুনি?

মহারাজ হেসে বললেন, তা কিছু কিছু আছে বটে। এমনকী আমার বাপ-ঠাকুরদার যে সব দোষ ছিল না আমার সে রকমও কিছু আছে। সেগুলিই আগে বলি?

মহেন্দ্রলাল বললেন, বেশ, তাই শোনা যাক। রুগির সম্পর্কে সব কিছু না-জানলে চিকিৎসা করা যায় না।

মহারাজ দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বললেন, আমি কবিতা রচনা করি।

মহেন্দ্রলাল প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ! কবিতা লেখেন? কেন?

মহারাজ বললেন, কেন লিখি? মাথায় মাঝে মাঝে কবিতা এসে যায়, তাই না লিখে পারি না।

মহেন্দ্রলাল বললেন, এ তো ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়। একজন রাজার মাথায় কবিতা আসবে কেন? রাজকার্যে পুরোপুরি মন না দিয়ে কবিতা লিখে সময় নষ্ট করা তো ভাল কথা নয়। কবিরা কবিতা রচনা করবে, রাজারা রাজত্ব চালাবে, এটাই তো ঠিক!

মহারাজ বললেন, রাজার মস্তিষ্কে যদি কবিতা সেঁধিয়ে পড়ে তা হলে কী করা যাবে?

মহেন্দ্রলাল বললেন, বিদেয় করে দিতে হবে। উহুঁ, এ লক্ষণ ভাল নয়। ইদানীংকালে দুজনের কথা জানি। কবিতা লিখে বিপদে পড়েছে। দিল্লির মোঘল বাদশা বাহাদুর শাহ আর আওয়েধের নবাব ওয়াজির আলি শাহ, এই দুজনেরই কবিতা লেখার বাতিক ছিল, সেই জন্য দুজনেই রাজ্য খুইয়ে নির্বাসিত হয়েছে। ঠিক কিনা?

মহারাজ বললেন, আমার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই। আমি লিখি, দু চারজন মাত্র শোনে। ইংরেজরা আমার কবিতা রচনার কথা টের পায়নি, পাবেও না।

মহেন্দ্রলাল গম্ভীরভাবে বললেন, যদি লিখতেই হয়, ও দোষ একেবারে কাটাতে না-পারেন, তা হলে শুধু দিনের বেলায়। রাত্তির জেগে লেখা চলবে না একেবারেই। শরীরে সইবে না।

মহারাজ বললেন, রাতে লিখি না বটে, কিন্তু গান-বাজনা শুনি। কোনও কোনও দিন শুনতে শুনতে রাত ভোর হয়ে যায়।

মহেন্দ্রলাল বললেন, দিনেরবেলা কাব্যি করবেন, রাত্তিরে গান-বাজনা, তা হলে প্রজাদের দেখবেন কখন! রাজকার্য কখন সামলাবেন ?

মহারাজ বললেন, আমার রাজত্বে রাজকার্য তেমন গুরুতর নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবই তো ঠিক চলে যায়। প্রজারাও আমাকে মান্য করে। দিনের বেলা আমি আর একটি কাজও করি। ছবি আঁকি, ছবি তুলি। আঁকার কাজটি এখন তেমন হয় না, তবে ফটোগ্রাফির শখ রয়েছে পুরোপুরি। এবারে গঙ্গার ধারের কতকগুলো ফটো তুলব ঠিক করেছি।

মহেন্দ্রলাল বললেন, আপনি দেখছি এক মর্ডান মহারাজ! দিনকাল পাল্টেছে, এখনকার রাজা কিংবা নবাবরা প্রজাদের পিটিয়ে আনন্দ পায় না। অন্য রকম শখে মেতেছে। তা বেশ। মদ্যপান করা হয় কতখানি ?

মহারাজ বললেন, জীবনে কখনও স্পর্শ করিনি!

মহেন্দ্রলাল ভুরু প্রায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত তুলে বললেন, অ্যাঁ ? রাজা হয়েও মদ খায় না, এমন তো কখনও শুনিনি। এ যে দেখছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

মহারাজ বললেন, মদ্য পান করি না বটে, তবে তামাক বেশি খাই। দেখছেনই তো। গড়গড়ার নল হাতে না নিয়ে একটুক্ষণও থাকতে পারি না। এমনকী যখন পথ দিয়ে হেঁটে যাই, তখনও হুঁকো-বরদার সঙ্গে ছোটে।

মহেন্দ্রলাল বললেন, তামাক তো রাজা-প্রজা সকলেই খায়। এমনকী দক্ষিণেশ্বরের যে সাধু ছিলেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুর, তিনিও খুব তামাক টানতেন। গলায় ক্যানসার হল, তাও বন্ধ করেননি, তাঁর শিষ্যরাও খুব তামাকের ভক্ত। মহারাজ, আপনার রানির সংখ্যা কত ?

মহারাজ একটু চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, ঠিক বলতে পারি না। ঠিকঠাক হিসেব করে পরে আপনাকে সংখ্যাটা জানাব।

মহেন্দ্রলাল জিজ্ঞেস করলেন, আর রাজকীয় ভোজনবিলাস ? সেটা কী রকম ?

মহারাজ বললেন, সেটা বলার মতন কিছু নয়। এককালে খেতে পারতাম বটে। খিচুড়ি বড় প্রিয় ছিল, একগামলা উড়িয়ে দিতে পারতাম। এখন আর পেটে তত সয় না। বিশ-পঁচিশটা লুচি খাই বড় জোর, তাও দুপুরবেলা, রাত্তিরে চাট্টি গরম ভাত আর মাংসের জুস, একটা মাছের মাথা আর গোটাকতক সন্দেশ। কলকাতা এলে রসগোল্লা খাই। বড় ভাল এখানকার রসগোল্লা।

মহেন্দ্রলাল বললেন, হুঁ, বুঝলাম। এবার আমার কথাটা বলি ? আপনি পদ্য লিখে, গান শুনে, ফটোগ্রাফির চর্চা করেও কী ভাবে রাজ্য শাসন করবেন, সে চিন্তা আপনার, আমার নয়। আপনি সিংহাসনে বসেছেন বলেই তো সৃষ্টিকর্তা আপনার শরীরটা অন্যভাবে গড়েননি ? রাজা আর প্রজা, সকলেই মানুষ, সকলেরই শরীরের গঠন এক প্রকার। আমাকে যখন চিকিৎসা করতে হবে, তখন আপনার এই শরীরটাই চিকিৎসা করতে হবে, একজন মহারাজের শরীর বলে আলাদা কিছু নয়। কিছু কিছু নিয়ম মেনে না-চললে যত বড় ডাক্তারই ডাকুন আর যত দামি ওষুধই খান, আপনার রক্তআমাশা সারবে না। আপনার হৃদযন্ত্রও দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপনাকে খাওয়া কমাতে হবে, লুচি চারখানার বেশি না, আর সন্দেশ একটা। মাছের মুড়ো এখন অল্পবয়েসীদের পাতে তুলে দিন। তামাক টানাও কমাতে হবে, বন্ধ করতে পারলেই ভাল হয়। অধিক রাত্রি জাগরণ একেবারে নিষিদ্ধ। গান-বাজনা শোনা ভাল, মন প্রফুল্ল হয়, আমিও খুব পছন্দ করি, কিন্তু রাত বারোটার পর একেবারেই নয়। এই সব মানলে ওষুধের ফল পাওয়া যাবে। নচেৎ না। কোথাও বায়ু পরিবর্তনের জন্য যেতে পারলে ভাল হয়।

মহারাজ বললেন, ত্রিপুরা থেকে কলকাতায় এসেছি, এই তো বায়ু পরিবর্তন হল!

মহেন্দ্রলাল হেসে উঠে বললেন, কলকাতার বায়ু ? পরিবর্তন মানে ভাল ছেড়ে মন্দের দিকে নয়। আপনার দেশে উঁচু কোনও পাহাড় আছে ? যেখানে বরফ জমে ?

মহারাজ বললেন, পাহাড় আছে অগুনতি, কিন্তু তেমন উঁচু নয়।

মহেন্দ্রলাল বললেন, কোনও শৈলনিবাসে গেলে আপনার উপকার হতে পারে। দার্জিলিং কিংবা কার্শিয়াং যেতে পারেন, ঠাণ্ডায় আপনার উপকার হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে, চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়ে মহেন্দ্রলাল আবার বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা। আমি এখানে আসব শুনে আনন্দমোহন বসু আমাকে বললেন, ত্রিপুরায় নাকি এখনও সতীদাহ হয় ? ইংরেজের আইন আপনার রাজ্যে খাটে না। এখানে যারা বিধবা বিবাহের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছে, তারা আপনার দেশে সতীদাহ এ যুগেও চালু আছে শুনে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মহারাজ বললেন, না, না, ওই প্রথা ছিল এক সময়। আমি বছর কয়েক আগে তা রদ করে দিয়েছি।

মহেন্দ্রলাল বললেন, আপনি সিংহাসনে বসেছেন অনেককাল আগে, তবু এতদিন চালু ছিল ? হঠাৎ বদলাতে গেলেনই বা কেন ?

মহারাজ বললেন, অনেক দিনের ধর্মীয় প্রথা। বদলানো সহজ নয়। আমার সচিব রাধারমণ ঘোষ এই নিয়ে অনেকদিন ধরে খুঁচিয়েছে আমাকে। তারপর হল কী। আমার সেনাপতি চরণ, সে হঠাৎ মারা গেল। তার স্ত্রী নিছন্দবতী পরমাসুন্দরী। নিছন্দবতী নিজেই সতী হতে চাইল। আমি কিছুই জানি না, এমন তো কতই হয়। আমি জঙ্গলে ফটোগ্রাফি করতে গেছি, এমন সময় ঘোষমশাই এসে বলল, মহারাজ, একবার শ্মশানে চলুন। প্রায় জোর করেই নিয়ে গেল আমাকে। গিয়ে দেখি কী, লোক জড়ো হয়েছে অনেক, ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজছে, একটা লাল পাড় শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে নিছন্দবতী, চুল খোলা, চোখে কাজল, টকটকে গৌরবর্ণ, ঠিক দেখাচ্ছে এক দেবীর মতন। এই অপরূপ রমণী জীবিত অবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ? আমি হাত তুলে বললাম, ওরে রাখ, রাখ! বন্ধ কর! নিছন্দবতী তবু মানতে চায় না, জ্বলন্ত চিতায় সে উঠবেই। তখনই আমি আদেশ জারি করলাম, আজ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে সতী হওয়া নিষিদ্ধ হল। কেউ স্বেচ্ছায় সতী হতে চাইলেও আমার সেনা তাকে আটকাবে!

মহেন্দ্রলাল বললেন, তারপর আপনি সেই নিছন্দবতীকে বিয়ে করে ফেললেন ?

মহারাজ ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে না না।

মহেন্দ্রলাল বললেন, একটি সুন্দরী রমণীকে দেখে আপনার মন গলে গিয়েছিল। ওই নিছন্দবতী যদি এক কুচ্ছিত বুড়ি মাগি হত, তা হলে আপনি মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন, তাই না ?

মহেন্দ্রলাল কাছে এসে মহারাজের বাহুর চামড়া দু আঙুলে টেনে ধরে বললেন, একবার কল্পনা করুন তো, আপনার একখানা রানি মারা গেছে, তারপর আপনাকে জ্যান্ত অবস্থায় সেই চিতায় চড়ানো হয়েছে, সতীর পুংলিঙ্গ কী জানি না, আপনাকে পুরুষ-সতী করা হল, পটপট করে পুড়ছে গায়ের চামড়া, মাথার চুল জ্বলছে দাউ দাউ করে, গলে যাচ্ছে চোখ, ভাবুন তো একবার সেই অবস্থাটা ? সতী! যত সব শয়তান, বদ, গুখেকোর বাচ্চারা এই প্রথা চালু করেছিল, আপনার মতন লোকেরা সেই সব কুচরিত্তির পুরুতগুলোর কথায় নেচেছেন, তাদের মদত দিয়েছেন!

মহারাজ স্তম্ভিতভাবে ডাক্তারটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁর রাজ-অঙ্গ এই ভাবে স্পর্শ করার সাহস নেই কারুর। তাঁর সামনে এ রকম দাঁত কিড়মিড়িয়ে আজ অবধি কেউ কথা বলেনি। এটা ব্রিটিশ রাজত্ব, নিজের রাজ্যে কেউ এমন বেয়াদপি করলে তিনি তাকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে মাথাটা কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারতেন।

ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে মহেন্দ্রলাল বললেন, আমি যে সংযমগুলি পালন করতে বলেছি, তা মানতে পারেন তো ভাল। আর যদি না মানেন, তা হলে আর আমাকে কল দেবার দরকার নেই। শুধু ওষুধে কোনও কাজ হয় না। যে রুগি আমার নির্দেশ মানে না, হাজার টাকা ফি দিলেও আমি তাকে দেখতে আসি না।

মহিম দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। সে ডাক্তারকে এগিয়ে দিতে গেল।

ওই অবস্থায় খানিকক্ষণ বসে থাকার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য পালঙ্ক থেকে নামলেন। তাঁর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্রোধের জ্বালা। নাগরা পায়ে দিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে।

একটু বাদে তিনি উঁচু গলায় ডাকলেন, মহিম! মহিম!

মহিম ছুটে এল এদিকে। হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে বলল, কিছু আনতে হবে?

মহারাজ হাত নেড়ে বললেন, না। ওই হারামজাদা ডাক্তারটা আমাকে কী রকম কথা শুনিয়ে গেল দেখলি? এত সাহস!

মহিম চুপ করে রইল। এই ডাক্তার বরাবরই দুর্মুখ, সবাই জানে। তবে এতটা বাড়াবাড়ি কখনও করেননি। বিশেষত দু আঙুল চিমটের মতন করে মহারাজের চামড়া টেনে ধরা, মহিম তখন শিউরে উঠেছিল।

খাঁচায় বন্দি সিংহের মতন ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মহারাজ বললেন, তোর কাছে পিস্তল ছিল না? তুই ওকে গুলি করে মারতে পারলি না?

মহিম ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, আজ্ঞে—

মহারাজ বললেন, ডাক্তার হয়েছে বলে ও যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এতবড় কলকাতা শহরে আর বুঝি ডাক্তার নেই? কত সাহেব ডাক্তার আছে, মাদ্রাজি ডাক্তার আছে, টাকা ছড়ালে ডাক্তারের অভাব!

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেলেন মহারাজ। ক্রোধের বদলে তাঁর মুখে এবার ফুটে উঠল বিস্ময়।

তিনি বললেন, মহিম, একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস?

মহিম বলল, কী মহারাজ?

মহারাজ ধমক দিয়ে বললেন, চোখ নেই? দেখতে পাস না? প্রায় দু মাস ধরে আমি ভাল করে হাঁটতে পারি না। বুক ধড়ফড় করে। কাল সন্ধে থেকে আমি মাটিতে পা ফেলতেই পারিনি। কিন্তু এখন আমি কী করছি? নিজে নিজে হেঁটে বেড়াচ্ছি, কারুর কাঁধে ভর দিতেও হচ্ছে না।

তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, এ ব্যাটা ডাক্তারের গুণ আছে বাবা, স্বীকার করতেই হবে। ওষুধ লাগল না, শুধু কথা বলে বলেই আমাকে খাড়া করে দিলে! অ্যাঁ? এতক্ষণ তামাকও খাইনি। ওকেই বারবার ডাকবি। আসতে না-চায়, ধরে বেঁধে আনবি। তবে দেখিস, ও যখন আসবে, আমার ঘরের আশেপাশে কেউ যেন না থাকে। ও ব্যাটা যখন আমাকে অপমান করবে, আর যেন কেউ তা শুনতে না-পায়। আজ ও আমার সঙ্গে যেমন ব্যাভারটা করে গেল, সে কথা তুই যদি কারুকে বলিস, তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব। যা এবার একটু তামাক সাজতে বল।

মহারাজ আপন মনে হাসতে লাগলেন।

এরপর ক্রমশই বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। শহরে তাঁর আগমনবার্তা প্রচারিত হয়ে গেল। অনেকেই তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে আসে। বাইরের লোকের সঙ্গে তার ব্যবহার বেশ মধুর, ধনী বা দরিদ্রের প্রভেদ করেন না। তাঁর দানের মধ্যে প্রকাশ্য অহমিকা নেই। দীনেশচন্দ্র সেন নামে এক নবীন গ্রন্থকার নিজের বই ছাপার খরচ পেয়েছে মহারাজের কাছ থেকে, কৃতজ্ঞতাবশত সে গ্রন্থখানি মহারাজের নামে উৎসর্গ করতে চায়। মহারাজ বিনম্রভাবে বলে উঠলেন, না, না তা আবার কেন, তা আবার কেন?

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা তিনি বরাবরই পছন্দ করেন, এবারও এই কবির নতুন কবিতা শুনে মুগ্ধ হলেন। 'চিত্রা' নামে রবীন্দ্রবাবুর একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বড় সরেস এর কবিতাগুলি।

রবীন্দ্রবাবু উচ্চবংশের সন্তান, তিনি মহারাজের কাছে কখনও কিছু চাইবেন না। কিন্তু মহারাজের কিছু দিতে ইচ্ছে করে। 'চিত্রা' গ্রন্থখানি নাড়াচাড়া করতে করতে মহারাজ বললেন, ছাপা-বাঁধাই

তেমন ভাল নয়। এমন উত্তম কবিতা, সোনার জলে ছাপানো উচিত ছিল। চিত্র-শোভিত করে মরক্কো চামড়ায় বাঁধালে এর উপযুক্ত হয়।

রবির গ্রন্থগুলির প্রকাশক পাওয়া যায় না। নিজেদেরই ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে ছাপা হয়, দাম কমাবার জন্য বাঁধাইয়ের যত্ন নেওয়া হয় না।

মহারাজ বললেন, রবিবাবু, আমার ইচ্ছে হয়, আপনার যে কটি বই বেরিয়েছে, সব একত্র করে একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করি। আপনি কী বলেন?

রবি সলজ্জ সম্মতি জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার আনুকুল্যে যদি একটি সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশ করা যায়, তা হলে অনেকের উপকার হয়। পদাবলীগুলি এক একটি রত্ন, কিন্তু কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

মহারাজ উৎসাহিত হয়ে বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনি সংগ্রহ করতে লেগে যান। যদি লক্ষ টাকাও লাগে, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপারে রাধারমণেরও বিশেষ আগ্রহ। তিনি রবির সঙ্গে বসে গেলেন সম্পাদনার পরিকল্পনায়। মহিমের অনুরোধে কয়েকখানা গানও গাইলেন রবি। তার মধ্যে বিশেষত একখানা গান শুনে মহারাজ বলে উঠলেন, কথা? শুধু কথা বিষয়ে একখানি গান? এমন কথা কে কবে শুনেছে? আর একবার শোনান তো!

রবি দ্বিতীয়বার গাইলেন:

কত কথা তারে ছিল বলিতে
চোখে চোখে দেখা হলো পথ চলিতে
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
কত যে পূরবী রাগে কত ললিতে।
যে কথা ফুটিয়া ওঠে কুসুমবনে
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে...

নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে মহারাজ বললেন, এমন গান শুনলে বয়েস কমে যায়। কী গান শোনালেন রবিবাবু, আমার সব রোগ সেরে গেল। কাব্য আর গানের কাছে ওষুধ-বিষুধ কোন ছার! এক ডাক্তার বলে কী, রাজা হলে নাকি কবিতা ভালবাসতে নেই!

বাংলার সাহিত্য জগৎ সম্পর্কে মহারাজের স্পষ্ট ধারণা নেই। কিছু কিছু বই পড়েছেন শুধু। রবি প্রতিটি লেখক, প্রতিটি পত্র-পত্রিকার খুঁটিনাটি খবর রাখেন। রবির সঙ্গে আলোচনা করতে করতে মহারাজ অনেক কিছু জেনে নেন। মহারাজ স্বয়ং কবিতা রচনা করেন, রবি তার কয়েকটি 'ভারতী' কিংবা 'সাধনা'য় প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, মহারাজ কিছুতেই তাতে সম্মত হন না। তাঁর যশের বাসনা নেই।

কথায় কথায় রাধারমণ এক সময় বললেন, শুনছি এখন দ্বিজুবাবু নামে একজনও বেশ ভাল লিখছেন, আমাদের কৃষ্ণনগরের ওদিককার ছেলে।

রবি বললেন, হ্যাঁ, খুব ভাল লিখছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আমার বন্ধু মানুষ, নিজের রচিত গান গাইতেও পারেন খুব ভাল।

রাধারমণ বললেন, একদিন তাকে ডেকে তার গান শুনলে হয়।

মহারাজ মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, আমি একনিষ্ঠ। আমি রবিবাবু ছাড়া আর কারুর গান শুনতে চাই না। তোমরা শুনে দেখো।

রবি এ কথা শুনে শ্লাঘা বোধ করলেও জোর দিয়ে বললেন, না, মহারাজ, আপনি একবার শুনে দেখুন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর গান অতি উচ্চাঙ্গের।

রবি মহারাজকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একদিন আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে ওঁকে সরলা ও ইন্দিরার গান শোনানো হবে।

মহারাজ বললেন, যাব, আপনাদের সুবিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে গেলে আমি ধন্য হব। তবে একটা

শর্ত আছে। আমি যদি হাওয়া পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং বা কার্শিয়াং যাই, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

কাব্য ও সঙ্গীত ছাড়া মহারাজের অপর শখ নাটক দেখা। শরীর বেশ সুস্থ আছে, এখন মহারাজ এক এক সন্ধ্যায় এক একটি থিয়েটারে যান। এখন দুটি মঞ্চে গিরিশবাবু ও অর্ধেন্দুশেখর জোর পাল্লা দিয়ে নাটক নামিয়ে যাচ্ছেন। স্টারে অমৃতলালের দলটিও বেশ জনপ্রিয়। তুলনামূলক বিচার করার জন্য মহারাজ দেখতে লাগলেন সবগুলি।

এমারাল্ড থিয়েটারে গিয়ে একটি ঘটনা ঘটল।

ব্যবসাবুদ্ধিহীন অর্ধেন্দুশেখর অনেক আর্থিক দণ্ড দিয়ে থিয়েটারের মালিকানা খুইয়েছেন। অংশীদাররাও ত্যাগ করেছে তাঁকে। এমারাল্ড এখন ভাড়া নিয়েছে বেনারসী দাস নামে এক মারোয়াড়ি, অধ্যক্ষ ও নাট্য-পরিচালক রয়েছেন অর্ধেন্দুশেখরই। নাটক চলছে রমেশ দত্তর 'বঙ্গ বিজেতা'।

অভিনয় চলাকালীন নায়িকার মুখে একখানি গান শুনে মহারাজ চমকিত হলেন।

মহারাজের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়, অনেক পরিচিত মানুষেরও তিনি নাম ভুলে যান। কিন্তু গান কখনও ভোলেন না। গানের বাণী তাঁর সহজে মুখস্থ হয়ে যায়, একবার শোনা গানের সুরও তাঁর কানে লেগে থাকে।

এই নাটকের গানটি তাঁর চেনা চেনা লাগল। অথচ কোথায় শুনেছেন, কবে শুনেছেন ঠিক মনে পড়ছে না। এই নাটক তিনি আগে দেখেননি, সবে মাত্র শুরু হয়েছে। এ নাটকের জন্য লিখিত গান তিনি পূর্বে শুনবেনই বা কী করে? অনেকে অবশ্য নতুন গানেও পরিচিত সুর লাগিয়ে দেয়। অন্যান্য দৃশ্যগুলির বদলে, যে সব দৃশ্যে ওই মেয়েটি আসছে মহারাজ শুধুই সেগুলিই দেখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।

নায়িকাটি বেশ জনপ্রিয় বোঝা যায়। তার চোখা চোখা সংলাপে ও গানে দর্শকরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে। মেয়েটি অভিনয়ও করছে খুব দাপটের সঙ্গে। তার মুখে আর একটি গান শুনেই মহারাজ বুঝতে পারলেন, এই গান নয়, এই কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত।

মহারাজের দু পাশে বসেছে রাধারমণ ও মহিম। ইন্টারভ্যালের সময় মহারাজ রাধারমণকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘোষজা, এই প্রধানা অভিনেত্রীটিকে চিনতে পারলে?

রাধারমণ বললেন, আমি আগে ওর অভিনয় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

মহারাজ বললেন, এ মেয়ে এক সময় আমাদের এই কলকাতার বাড়ির দাসী ছিল। কী যেন ওর নাম?

রাধারমণ বাড়ির দাসীদের খোঁজখবর রাখেন না। তিনি তাকালেন মহিমের দিকে। মহিমের অন্দরমহলে যাতায়াত আছে। কিন্তু মহিম কলকাতার বাড়িতে এবারেই প্রথম এসেছে। সেও দেখেনি ও মেয়েটিকে।

মহারাজ ভুরু কুঞ্চিত করে স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে বললেন, নাম মনে করতে পারলে না? কী যে করো! ও যে আমার বাড়ির দাসী ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাধারমণ উঠে গিয়ে থিয়েটারের একটা হ্যান্ডবিল জোগাড় করে এনে বললেন, এর নাম তো দেখছি নয়নমণি।

মহারাজ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, না, ও নাম নয়। ও নাম নয়। অন্য, কী যেন। সেই যে শশীমাস্টার যে-মেয়েটাকে নিয়ে ভেগে পড়েছিল।

রাধারমণের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। তিনি বললেন, ভূমিসূতা? না, শশিভূষণ ওকে নিয়ে পালায়নি। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, সে চন্দননগরে অন্য এক বউ নিয়ে থিতু হয়েছে। সে ভূমিসূতার কোনও খবর রাখে না। এই সেই ভূমিসূতা?

মহারাজ গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, শশিভূষণ ওকে নিয়ে ভাগেনি! তা হলে...আমি এই মেয়েটিকে চেয়েছিলাম, তবু সে চলে গেল কেন?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন রাধারমণ। তিনি চুপ করে রইলেন।

অভিনয় শেষ হবার পর মহারাজ নট-নটীদের কিছু পারিতোষিক দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মঞ্চের পেছনে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। সমস্ত নট-নটীরা সার-বদ্ধ হয়ে রইল তাঁর সামনে, মধ্যিখানে অর্ধেন্দুশেখর।

মহারাজ নাটকটির অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে অর্ধেন্দুশেখরকে উপহার দিলেন একটি হিরের আংটি। এক হাজার রুপোর টাকা দিলেন নট-নটীদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্য।

সবাই মহারাজকে প্রণাম করে যেতে লাগল। নয়নমণি যেই নিচু হয়ে মহারাজের পায়ে হাত দিয়েছে, তখনই মহারাজ রাধারমণকে বললেন, ঘোষমশাই, জিজ্ঞেস করো, এই মেয়েটি আমার বাড়ির দাসী ছিল কিনা।

নয়নমণির মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। মহারাজ তাকে চিনতে পারবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। এত বছর বাদে, তাও তার মুখে রং মাখা।

নয়নমণির সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন না মহারাজ। তিনি আবার রাধারমণের দিকে চেয়ে বললেন, ওকে জিজ্ঞেস করো, আমাকে কিছু না জানিয়ে এই মেয়ে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেন?

নয়নমণি এবারেও কোনও উত্তর না দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

মহারাজ অর্ধেন্দুশেখরের দিকে ফিরে বললেন, মুস্তফিমশাই, কাল সোমবার বোধকরি আপনাদের থিয়েটার খোলা থাকে না। কাল সন্ধেবেলা এই মেয়েটিকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন তো। আমি নিভৃতে ওর গান শুনব।

১৭

অফিস ঘরে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর জোড়া পা তুলে দিয়ে গড়গড়া টানছেন অর্ধেন্দুশেখর। আজ তাঁর মেজাজ বেশ প্রসন্ন। তার হাতে ঝিকমিক করছে একটি হিরের আংটি, টেবিলের ওপর রয়েছে একটি টাকার তোড়া। এই টাকাটার বড় প্রয়োজন ছিল। ইদানীং টিকিট বিক্রি আশানুরূপ নয় বলে থিয়েটারের মালিক বেনারসী দাস নট-নটী, কলা-কুশলীদের পুরো মাইনে দেয় না। আগে অর্ধেন্দুশেখর যখন এমারাল্ড থিয়েটারের মালিক ছিলেন নিজে, তখন তিনি প্রায়ই তার সঙ্গী-সাথীদের বেতনের অতিরিক্ত পারিতোষিক দিতেন। এক একদিন টিকিটঘর থেকে এক মুঠো টাকা এনে তিনি কোনও সহকারীকে বলতেন, ওরে, আজ একটা খানাপিনার ব্যবস্থা কর। মাঝে মাঝে ফুর্তি না করলে কি আর অভিনয় জমে!

এখন তিনি নিজেই বেতনভুক কর্মচারী, টিকিটঘরের টাকা যথেচ্ছ খরচ করার অধিকার তাঁর নেই। অথচ হিসেব বহির্ভূত টাকা খরচ করতে না পারলে তাঁর মনটা ছটফট করে। আজকের এই এক হাজার টাকা স্বয়ং ভগবান যেন ত্রিপুরার মহারাজের হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন, মালিকের কাছে এই টাকার হিসেব দিতে তিনি বাধ্য নন। অর্ধেন্দুশেখর সকলের মধ্যে সমবণ্টনেও বিশ্বাস করেন না। কিংবা যে-সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর বড় বড় ভূমিকা তাদের বেশি টাকা আর ছোটখাটো পার্শ্বচরিত্রদের সামান্য টাকা, তাও না। বড় থেকে ছোট সকলেরই নাড়িনক্ষত্র জানেন তিনি, তিনি বোঝেন কার প্রয়োজন কতখানি। যার মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, সে আজ হঠাৎ অর্ধেন্দুশেখরের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হল সেই রকমই একজন তো আনন্দের চোটে অর্ধেন্দুশেখরের পা জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দিল। আবার যার বেতন পঞ্চাশ টাকা,

তার হাতে পনেরোটি টাকা গুঁজে দিয়ে তিনি বললেন, জগা, তোকে তো যা দেব, তার এক পয়সাও বাড়িতে পৌঁছবে না, রামবাগানে গিয়ে বিলাসিনীর ঘরে খোলামখুচির মতন মালকড়ি ছড়াবি, যা, এই পনেরো টাকা নিয়েই আজ কাপ্তেনি করগে যা।

মানুষকে দেওয়াতেই অর্ধেন্দুশেখরের আনন্দ, নিজের জন্য তিনি কিছু রাখতে চান না। হিরের আংটিটাও তিনি দু'দিন বাদে বিক্রি করে সেই টাকায় আবার কোনও বিপদাপন্ন সহকর্মীকে সাহায্য করবেন। এক একজনকে ডেকে ডেকে টাকা দিতে দিতে তোড়া প্রায় খালি হয়ে এসেছে, সেই সময় তিনি নয়নমণিকে ভেতরে আসতে বললেন।

ঐতিহাসিক নাটকের রানির সাজগোজ ছেড়ে নয়নমণি একটা আটপৌরে শাড়ি পরে নিয়েছে। চুল পিঠের ওপর খোলা। রং তোলার জন্য সে অনেকক্ষণ ধরে মুখ ধুয়েছে, সেই সময় যে সে কান্নাও ধুচ্ছিল, তা অবশ্য কেউ জানে না। অভিনয়ের সময় ছাড়া নয়নমণির অঙ্গে থাকে না কোনও অলঙ্কার।

মখমলের তোড়াটা টিপে দেখে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, তোকে আমি কী দিই বল তো নয়ন। এ তো ফুরিয়ে এসেছে দেখছি, আরও কয়েকজনকে দেওয়া বাকি রয়ে গেল।

নয়নমণি মৃদু স্বরে বলল, আমাকে কিছু দিতে হবে না, আপনি বরং উদ্ধবদাদাকে কিছু বেশি দিন, গত সপ্তাহে ওঁর একটি ছেলে হয়েছে, বউয়ের শরীর ভাল নয় শুনেছি—

অর্ধেন্দুশেখর চোখ পাকিয়ে বললেন, উদ্ধব দাস? সে তো একটা হারামজাদা! বাইশ টাকা মাইনে পায়, তা দিয়ে আবার জুয়ো খেলে। কত নম্বর সন্তান হল, সতেরোটা নয়? পেটে ভাত জোটে না, তবু গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চার বাবা হবার শখ! বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন! বউটাকে একেবারে মেরে ফেল্লে। আর বউটাও হয়েছে তেমনি, বছর বিউনি! উদ্ধবের এ নাটকে পার্টও নেই, ওকে আমি পাঁচ টাকার বেশি দেব না!

নয়নমণি বলল, আর একটু বেশি দিন। বাচ্চাটার দুধের বন্দোবস্ত করতে হবে। মায়ের বুকে দুধ নেই।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, জন্ম দেবার আগে সে কথা মনে ছিল না? দু'চক্ষে দেখতে পারি না এসব। হ্যাঁ রে নয়ন, ওই উদ্ধবব্যাটা বুঝি তোকে ধরেছে, তোকে দিয়ে কওয়াচ্ছে? সবাই জানে তো, তোর দয়ার শরীর। আমি না দিলেও তুই নিজের থেকে ওকে দিয়ে দিবি! তুই নিজের জন্য কোনও দিন কিছু চাস না, আমি দিতে গেলেও নিবি না?

নয়নমণি বলল, আমার তো কিছুর অভাব নেই। একটা মোটে মানুষ, যা পাই তাতেই বেশ চলে যায়, কিছু জমেও।

অর্ধেন্দুশেখর বলল, তোকে দু'দশ টাকা দেবার কোনও মানে হয় না। তোকে বরং... তুই আমার এই আংটিটা নে!

জিভ কেটে একটু পিছিয়ে গিয়ে নয়নমণি বলল, না, না, ওটা আমি নেব কেন? মহারাজ আপনাকে দিয়েছেন।

আঙুল থেকে আংটিটা খুলতে খুলতে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা! এ আংটি কখনও আমাকে মানায়? আমি কি সে রকম কাপ্তেন? হ্যাঁ, কাপ্তেন ছিল বটে বেলবাবু, অমৃতলাল মুখুজ্যে, তোরা তাঁকে দেখিসনি, দু' হাতে আটটা আংটি পরতেন। এটা খাঁটি হিরে, কমলহিরে, তোর হাতেই মানাবে। নে—

নয়নমণি হাত জোড় করে বলল, ওটা আমি কিছুতেই নিতে পারব না। আপনার জিনিস।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, তুই কিছু নিবি না, তা কখনও হয়? মহারাজ তো আজ তোর অভিনয় দেখেই খুশি হয়ে এসব দানছত্তর করে গেলেন। নাটকটা তুই একাই মাতিয়ে রেখেছিস পাগলি। নে, আমি নিজে তোকে দিচ্ছি, না বলতে নেই, হাত পাত।

নয়নমণি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমি কিছুতেই নিতে পারব না, বিশ্বাস করুন, সোনা-রুপো-হিরে-মুক্তো আমার অঙ্গে সয় না।

একটুক্ষণ হাঁ করে নয়নমণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর। তারপর কপালে একটা চাপড় মেরে বললেন, তুই যে তাজ্জব করে দিলি রে বেটী! কালে কালে দেখব কত! পঁচিশ বছর থিয়েটারে কেটে গেল, কোনও দিন দেখিনি বা বাপের জন্মে শুনিনি যে কোনও থিয়েটারের মেয়েকে হিরের আংটি দিলেও নেয় না! শুধু থিয়েটারের মেয়ে কেন, গয়নার লোভ নেই এমন কোনও মেয়ে মানুষ হয়? তুই কি আগে স্বর্গের অপ্সরা ছিলি নাকি রে?

নয়নমণি বলল, না, আমি সামান্যা দাসী ছিলাম।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, হ্যাঁ, মহারাজের মুখে তা শুনলাম বটে। তা দাসীরই তো কত কদর। মহারাজ আবার তোর গান শুনতে চেয়েছেন। দেখবি হয়তো, খুশি হলে তোকে একটা গজ মুক্তোর মালা পরিয়ে দেবেন। তখন কি তুই ফেরত দিতে পারবি?

নয়নমণি জিজ্ঞেস করল, আমি আপনার সামনে একটু বসব?

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, হ্যাঁ, বোস, বোস। কতদিন তো ভাল করে কথাই হয় না। একদিন যে রেঁধে খাওয়াবি বলেছিলি? ভিণ্ডালু রাঁধতে জানিস? সর্ষে দিয়ে মাংস!

নয়নমণি খানিকটা অস্থির হয়ে বলল, হ্যাঁ, খাওয়াব, নিশ্চয়ই খাওয়াব। আপনার কাছে একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি। আমি কাল কোথাও যাব না, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

সচকিতভাবে সোজা হয়ে বসে সবিস্ময়ে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, তুই যাবি না? কেন? এলেবেলে জমিদার নয়, রাজত্বহীন রাজা নয়, আস্ত একটা স্বাধীন রাজ্যের মহারাজ, তিনি নিজের মুখে তোর গান শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, তবু তুই যেতে চাইছিস না? অন্য যে-কেউ এমন ডাক পেলে ধন্য হয়ে যেত। মহারাজের যখন বাই চেপেছে, অনেক কিছু দেবে থোবে!

নয়নমণি বলল, আমার একটা শপথ আছে। আমি কারুর বাড়িতে মুজরো খাটতে যাব না। একা একা কোনও পুরুষ মানুষকে গান শোনাব না।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, কারুর বাড়ি আর রাজার বাড়ি কি এক হল? ওঁদের ইচ্ছে হলে তার আর প্রতিবাদ করা যায় না। ছেলেমানুষি করিসনি নয়ন, তোর ভালর জন্য বলছি, আমাদের থিয়েটারের ভালর জন্য বলছি, কাল তুই তো যাবিই, আমিও তোর সঙ্গে যাব। মহারাজ কলকাতায় এলে অমৃতবাজার পত্রিকায় আর্টিকেল বেরোয়, তাতে তোর নাম উঠে গেলে তোর আরও মান বাড়বে।

অর্ধেন্দুশেখরের সামনে কোনও দিন মুখ তুলে উঁচু গলায় কথা বলে না নয়নমণি। অর্ধেন্দুশেখর তার পিতৃতুল্য, গুরু। আজ সে দৃঢ় গলায় বলল, যদি আত্মহত্যা করতে হয়, তাতেও রাজি আছি, কিন্তু আমি কিছুতেই যাব না।

অর্ধেন্দুশেখর এবার চোখ সরু করে বললেন, তুই ত্রিপুরার মেয়ে, এক সময় মহারাজের বাড়িতে দাসী-বাঁদি ছিলি, এসব আমাদের আগে কিছুই জানাসনি।

নয়নমণি বলল, আমি ত্রিপুরার মেয়ে নই, সেখানে কস্মিনকালেও যাইনি। আমার জন্ম উড়িষ্যায়। আতান্তরে পড়ে এক সময় মহারাজের কলকাতার বাড়িতে বাঁদিগিরি করেছি বটে। কিন্তু মহারাজের বাঁদি ছিলাম না। তাঁর এক কর্মচারীর সেবা করতাম।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, ও একই কথা। বাড়ির সব বাঁদিই মহারাজের বাঁদি।

নয়নমণি বললেন, না, একই কথা নয়। আমি মহারাজের কাছ থেকে এক আধলাও বেতন নিইনি, উনি আমাকে কিনেও রাখেননি!

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, কিন্তু মহারাজ সবার সামনে নিজের মুখে বললেন, ওদের কথার ব্যত্যয় হয় না। ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাটা শোন, নয়ন। ওসব শপথ-টপথ শিকেয় তুলে দে। বাঁচতে গেলে অনেক কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিস, পুরুষ জাতের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কতদূর যাবি? তাও মহারাজ বলে কথা। উনি যদি ক্রুদ্ধ হন, পুলিশে এত্তালা দিলে তোকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। উনি যদি বলেন, তুই ওঁর বাড়ি থেকে হিরে জহরত চুরি করে পালিয়ে এসেছিলি, তখন কি পুলিশ তোর কথা বিশ্বাস করবে? ওঁদের কত ক্ষমতা, ইচ্ছে করলে আমাদের থিয়েটারটা ধ্বংস করে দিতে পারেন। একেই তো টিম টিম করে চলছে।

নয়নমণি বলল, ওসব আমি বুঝি না। পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে জেল খাটব, তবু আমি ওঁর কাছে যাব না। এজন্য আপনি যদি আমাকে এ থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিতে চান, তাও দিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অর্ধেন্দুশেখর বলল, তোর এতখানি জেদের কারণ তো আমি বুঝছি না! তবে কি তোর পাখা গজিয়েছে! এইবার উড়বি, তাই না? তোর নাম-ডাক হয়েছে, তোর জন্য এখন টিকিট বিক্রি হয়। তোকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে এই জায়গায় এনেছি। এখন অন্যরা তোকে নিয়ে টানাটানি করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। থিয়েটারের জগতে এটাই নিয়ম। আমি জানি, স্টার তোকে চাইছে। মিনার্ভাও তোকে বাগাবার জন্য দালাল লাগিয়েছে। আমি এখন ফুটো জাহাজ, আমার হেনস্থা দেখে সবাই হাসবে, আমার দলের লোকেরা আমায় লাথি মেরে একে একে সবাই চলে যাবে। তুই সেটা শুরু করলি, তুই পথ দেখালি।

নয়নমণি ধীর স্বরে বলল, আমি আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। বরং আমি থিয়েটার একেবারে ছেড়ে দেব, তবু আমি অন্য কোথাও যাব না। আপনি আমায় অবিশ্বাস করলেন? এর চেয়ে আমার বুকে একটা ছুরি বিঁধিয়ে দিলেও কম কষ্ট হত।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, ওসব ঢংয়ের কথা রাখ! দেখলাম তো কত জীবনে! বেশ্যাপাড়ার মাগিগুলো থিয়েটার করতে এসে শেখানো ডায়ালগগুলোর কিছুই মানে না বুঝে তোতাপাখির মতন মুখস্থ বলে। ওমা, দু'তিন বছর কাটতে না কাটতেই সেই ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। কাল তুই যাবি কি না বল!

নয়নমণি বলল, না, আমি পারব না।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, তবে তোকে সাফ সাফ কথা জানিয়ে দিচ্ছি। মহারাজ এক হাজার টাকা দিয়ে গেলেন, হিরের আংটি দিলেন, আমার লোকেরা কটা দিন খেয়ে বাঁচবে। এর পর তাঁর সামান্য একটা অনুরোধ রাখতে পারব না, এত অকৃতজ্ঞ আমি হতে পারব না। থিয়েটারের গাড়ি কাল বিকেলে তোর বাড়িতে যাবে, তুই যদি সে গাড়ি ফিরিয়ে দিস তা হলে আমি নিজে গিয়ে মহারাজকে জানিয়ে আসব যে তুই আমার কথার অবাধ্য হয়েছিস, তোর সঙ্গে এমারাল্ড থিয়েটারের আর কোনও সম্পর্ক নেই।

নয়নমণি হাত জোড় করে বলল, আমি আপনার কাছ থেকে কোনওদিন কিছু চাইনি। একবার শুধু আমাকে এইটুকু ভিক্ষা দিন। আমাকে শপথ ভাঙতে বলবেন না।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, ছিলি রাজবাড়ির দাসী। তোর এত জেদ হল কী করে? এখন যা, বাড়িতে গিয়ে ভাল করে ঘুমো। কাল সকালে ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝবি, আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। বড় মানুষদের চটিয়ে থিয়েটার চালানো যায় না।

নয়নমণি পিছন ফিরে আস্তে আস্তে চলে গেল, অর্ধেন্দুশেখর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। এ মেয়েটার রহস্য তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কী অপূর্ব ওর শরীরের গড়ন, ক্ষীণ কোমর, গুরু নিতম্ব, পিঠের দিকটা ত্রিভুজাকৃতি, ওর চলার একটা ছন্দ আছে, গ্রীবা উন্নত করে হাঁটে। নাচে-গানে ওর জুড়ি নেই। সাধারণ কথাবার্তায় ওর বেশ বুদ্ধির পরিচয় ও পরিহাসজ্ঞান আছে। এমন এক বরবর্ণিনী পুরুষদের এড়িয়ে চলে কেন? অর্ধেন্দুশেখর খবর পেয়েছেন যে অনেক ধনবান যুবকই ওর পেছনে ঘুর ঘুর করে, কিন্তু নয়নমণি পাত্তা দেয় না কারুকেই। থিয়েটারের কোনও পুরুষকেও ও বাড়িতে যেতে দেয় না। কেন?

রঙ্গমঞ্চে যৌবন ক্ষণস্থায়ী। থিয়েটার করে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেউ বড়লোক হতে পারে না, মালিকদেরই ধন বৃদ্ধি হয়। নয়নমণির মতন রূপ-যৌবন সম্পন্না খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীরা কোনও-না-কোনও বড় মানুষের রক্ষিতা হয়ে একটা-দুটো বাড়ির মালিকানী হয়ে যায়। সেই বাড়িই তাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা। বিনোদিনীকে নিয়ে এককালে কতজন ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্তু বুদ্ধিমতী বিনোদিনী অন্তত তিনখানা বাড়ি কিনে রেখেছে নিজের নামে। কুসুমকুমারী, বনবিহারিণী, তিনকড়ি এদের সকলেরই বাবু আছে, এরাও বাড়ি কিনেছে, অর্থ-অলঙ্কার জমিয়েছে, থিয়েটার ছাড়লেও আরামে থাকবে। আর এই নয়নমণি ওদের সমকক্ষ হয়েও আজও থাকে গঙ্গামণির ভাড়া

বাড়ির একখানা ঘরে। একজন মহারাজের আমন্ত্রণও ফিরিয়ে দেয়।

অর্ধেন্দুশেখরের মনটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। মনের এক অংশে তিনি তারিফ করতে লাগলেন নয়নমণির এই তেজস্বিতার। কত স্ত্রীলোক নিয়েই তো ঘাটাঘাটি করলেন এ জীবনে, এমনটি আগে কখনও দেখেননি। পাঁঠা-ছাগলের যেমন স্বাভাবিক জীবন নেই, জন্ম থেকেই বন্দিদশা, তেমনি মেয়েরাও বলি প্রদত্ত। পুরুষের ইচ্ছার অধীন তাদের থাকতেই হবে। থিয়েটারের মেয়েরা সবাই নষ্ট, তাদের বিয়ে হয় না, যতদিন যৌবন থাকে ততদিন তাঁতের মাকুর মতন এক পুরুষের আশ্রয় থেকে অন্য পুরুষের কাছে যেতে বাধ্য হয়। বুড়ি হয়ে গেলে হয় বাড়িউলি। এই মেয়েটি তার ব্যতিক্রম। একে তো সম্মান করাই উচিত।

আবার তিনি ভাবলেন, এই জেদি মেয়েটা এক অসম্ভবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতেছে। যে কোনও দিন ওর বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। এখনকার সমাজে যা দেখা যাচ্ছে, একমাত্র উচ্চবিত্ত ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই কিছুটা স্বাধীন, তুই সে রকম কোনও পরিবারে জন্মাসনি কেন? তোর জন্মের ঠিক নেই, এসেছিস থিয়েটারে ঘোমটা খুলে খ্যামটা নাচতে, এখানকার নিয়ম তোকে মানতে হবে না? যে-সব ধনী উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের তুই ফিরিয়ে দিচ্ছিস, তারা তোকে ছাড়বে কেন? একদিন কেউ হঠাৎ গুণ্ডা দিয়ে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে, আটকে রাখবে কোনও বাগানবাড়িতে। তাঁর মনে পড়ে ছোট হরি ওরফে কাত্যায়নী নামে একটি অভিনেত্রীর কথা। অর্ধেন্দুশেখর তখন মিনার্ভায় ছিলেন, নতুন নতুন এসেছিল ছোট হরি, তার বড় দেমাক ছিল। একদিন সাজঘরে একটা ছোঁড়া ঢুকে পড়ে বেলেল্লা করছিল, কাত্যায়নী রাগের মাথায় তার গালে কষিয়ে দিল সপাটে এক চড়। সে ছোঁড়াটা ছিল শেঠদের বাড়ির ছেলে, সে এই অপমান মুখ বুঁজে সহ্য করবে কেন? একদিন থিয়েটারের পর ছোট হরি রাত করে বাড়ি ফিরছে, কোথা থেকে দুটো লোক ছুটে এসে তার মুখে জোর করে কী যেন মাখিয়ে দিয়ে গেল। কোনও সাঙ্ঘাতিক অ্যাসিড। মুখখানা পুড়ে বীভৎস দগদগে হয়ে গেল ছোট হরির, সে মুখের দিকে আর তাকানো যায় না, তার থিয়েটারের জীবনও শেষ। নয়নমণির যদি সে রকম কিছু হয়!

এমারাল্ড থিয়েটারকে চাঙ্গা করার জন্যও ত্রিপুরার মহারাজের কাছে নয়নমণির যাওয়া দরকার। জনসাধারণের মধ্যে এ খবর রটে যাবেই যে এমারাল্ডের অভিনেত্রীর গান শুনতে চেয়েছেন মস্ত বড় এক মহারাজ। এতে সেই অভিনেত্রীর চটক অনেক বেড়ে যাবে। লোকে ভাববে, এক মহারাজ বহু টাকা খরচ করে যার গান শুনছেন, আমরাও মাত্র আট আনার টিকিট কেটে থিয়েটারে ওর নাচ-গান দেখি না কেন? আবার দলে দলে লোক ছুটে আসবে। কাল নয়নমণিকে মহারাজের কাছে নিয়ে যেতেই হবে।

বাড়িতে ফিরে নয়নমণি সব কথা খুলে বলল গঙ্গামণিকে। প্রথমে তো গঙ্গামণি থুতনিতে আঙুল দিয়ে থ হয়ে গেল। হেঁজি-পেঁজি জমিদার নয়, সত্যিকারের এক মহারাজ। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নাম কে না শুনেছে, কলকাতায় তিনি এলে সাড়া পড়ে যায়। থিয়েটারের ধড়াচুড়ো পরা রাজা ছাড়া গঙ্গামণি স্বচক্ষে এমন জলজ্যান্ত রাজাকে দেখেই নি। তিনি এত্তেলা দিয়েছেন, তবু নয়নমণি যাবে না? কত সোনাদানা দেবেন তার ঠিক নেই। সাহেব পাড়ায় একটা বাড়িও দান করে দিতে পারেন।

গঙ্গামণি বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কেন যাবি না রে? হ্যাঁ লা, আমায় একটু বুঝিয়ে বল না, কেন যেতে চাস না?

নয়নমণি বলল, আমার ঘেন্না করে। কেউ জোর করে আমায় গান শোনাতে বললে, আমার গলা দিয়ে গান বেরোয় না।

গঙ্গামণি বলল, জোর করবে কেন? তোকে তিনি সাধ করে ডেকেছেন।

নয়নমণি বলল, না গো, দিদি। তুমি ওদের চেনো না। আমি যেতে না চাইলেও জোর করে ধরে নিয়ে যাবে? পুলিশ লেলিয়ে দেবে! আমি কিছুতেই যাব না।

গঙ্গামণির মুখের রেখায় পরিবর্তন ঘটে গেল। নিজের জীবনে সে যা যা করতে পারেনি,

স্ত্রীলোক হয়ে যে-সব চিন্তা কোনও দিন তার মাথাতেই আসেনি, নয়নমণির কথা ও কাজে সে রকম দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে সে অভিভূত। বয়েসে এত ছোট নয়নমণি, তবু যেন সে গঙ্গামণির গুরু।

সে এবার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ইস, জোর করে ধরে নিয়ে যাবে? মগের মুল্লুক নাকি? আসুক না! ঝ্যাঁটাপেটা করে তাড়াব। পাড়ার ছেলেদের ডাকব, তারা আমার কথা শোনে। পুলিশ লেলিয়ে দেবে? এ পাড়ার কোতোয়ালির দারোগা আমার বাড়িতে এসে মিনি মাগনায় ফুর্তি করে যায় না? তার চুলের মুঠি চেপে ধরে বলব, মুখ পোড়া, এমনি এমনি ফুর্তি করে যাবি, আবার আমার বোনটির গায়ে হাত তুলবি?

গঙ্গামণির এসব কথাতেও নয়নমণি বিশেষ ভরসা পায় না।

সে জানে, রাজা-মহারাজদের লোকবল-অর্থবলের কাছে পাড়ার ছেলেদের প্রতিরোধ তুচ্ছ। এতদিন পরেও যখন মহারাজ তার গান শোনার জন্য গোঁ ধরে রয়েছেন, তখন তিনি সহজে ছাড়বেন না। কিছু কিছু পুলিশ এ বাড়ির একতলার মেয়েদের কাছে রাত কাটাতে আসে, তা বলে পুলিশের কৃতজ্ঞতাবোধ বলে কিছু আছে নাকি? ওপর মহলের চাপ এলেই তারা রুদ্রমূর্তি ধরবে।

সারারাত নয়নমণির ঘুম আসে না। আর কাঁদে না সে, বরং তার সারা শরীর জ্বলতে থাকে।

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতন সে মহারাজের কাছে ধরা দেবে? তা হলে যে তার এতগুলি বছরের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। সে মহারাজের একপলক দৃষ্টি দেখেই বুঝেছে, মহারাজ তাকে ছাড়বেন না। আগেকার সঙ্কল্প অনুযায়ী তাঁকে ত্রিপুরায় নিয়ে যাবেন। বন্দি করবেন খাঁচায়। দুটো বছর সে অন্ধকার নরকের মতন একটা জগতে অজস্র কষ্ট সহ্য করেছে, তারপর মুক্তির স্বাদ পেয়েছে থিয়েটারের মানুষদের সংস্রবে এসে। এখানে তার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম আছে, সেসব আবার নষ্ট হয়ে যাবে এক মহারাজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য?

সারা রাত বিনিদ্র থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ছেড়ে উঠে এল নয়নমণি। স্নান সেরে এসে ঠাকুরের মূর্তির সামনে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। ছোটবেলা থেকেই সে সকালের অনেকটা সময় ঠাকুরঘরে কাটায়। পাথরের মূর্তির কাছে মনের কথা বলে। সে অবশ্য জানে, দেবতার কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। তবু কারুকে তো বলতে হবে!

এখানে বসেই সে সঙ্কল্প নিয়ে নিল, যদি মহারাজের দৃষ্টি এড়াবার রাস্তা সে খুঁজে না পায়, তা হলে সে আত্মঘাতিনী হবে। অপরের ইচ্ছা-দাসী হয়ে সে আর বাঁচতে চায় না।

গঙ্গামণির ঘুম ভাঙে অনেক বেলায়। তাকে কিছু না জানিয়ে সে একটি ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে চলে এল জানবাজারে।

ব্যারিস্টার যাদুগোপাল চৌধুরীর চেম্বার এখনও খোলেনি। যাদুগোপাল সাড়ে আটটার আগে নীচে নামে না। ভাড়া গাড়ি ছেড়ে দিয়ে গাড়ি-বারান্দার রকে বসে রইল নয়নমণি। একটা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা, ঘোমটা টেনে দিয়েছে অনেকখানি, তার হাত দুটিও ঢাকা, দেখা যাচ্ছে শুধু ফর্সা পায়ের পাতা দু'খানি। সে স্থির হয়ে বসে রইল একটা মূর্তির মতন।

যাদুগোপাল তখন বাড়িতেই ছিল না। সে মাঝে মাঝে ময়দানে ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যায়াম করতে যায়। সেখান থেকে ঘর্মাক্ত দেহে ফিরে এসে বারান্দায় এক নীলবসনা নারীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

নয়নমণি মৃদু কণ্ঠে বলল, আমি অতি নগণ্য এক স্ত্রীলোক। আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

যাদুগোপাল ভৃত্যকে ডেকে চেম্বারের দরজা খুলে দিতে বলে দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করতে চলে গেল।

ফিরে এসে নিজের গদিমোড়া চেয়ারে বসে একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, আপনার সঙ্গী সাথী কেউ নেই? আপনি একা কী করে এলেন?

যাদুগোপালের মক্কেলদের মধ্যে নারীরাও থাকে। কিন্তু তার অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে, মেয়েরা নিজেদের কথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না। বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা অনেকভাবে বঞ্চিত হয়। কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টারদের কাছে এমনই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে নিজের পরম শত্রুর

নামটিও উচ্চারণ করতে পারে না।

নয়নমণি ঘোমটা খুলে বলল, আপনি আমায় আগে দেখেছেন, হয়তো আপনার স্মরণে নেই। আমি একাই এসেছি। আপনি প্রসিদ্ধ আইনজীবী, একটি ব্যাপারে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি, আপনার ফি যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করব।

যাদুগোপাল বলল, ভূমিসুতা! তোমাকে সেই যে একদিন বলেছিলাম, আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। আমি মানুষের মুখ ভুলি না। তা ছাড়া এর মধ্যে দু'বার আমি সস্ত্রীক তোমার অভিনয় দেখে এসেছি। তোমাকে মনে থাকবে না কেন? তোমার তো বেশ খ্যাতি হয়েছে। কী ব্যাপার বলো তো, কোনও গোলমাল হয়েছে থিয়েটারে?

নয়নমণি পরিষ্কার ভাষায় সম্পূর্ণ ঘটনাটা শুনিয়ে দিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের গৃহে সে যে কিছুকালের জন্য দাসী ছিল, সে কথাও গোপন করল না।

সব শুনে যাদুগোপাল বলল, হুঁ, শুধু দুটি ব্যাপার এখনও পরিষ্কার হয়নি। একজন মহারাজের আমন্ত্রণ পেলে সব নট-নটীদেরই ধন্য হবার কথা, তোমার আপত্তি কীসের জন্য?

নয়নমণি বলল, একজন মহারাজের ইচ্ছে হয়েছে তিনি আমার গান শুনবেন, আর আমার তাঁকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গান শোনাবার কোনও ইচ্ছে নেই। আমি নগণ্য মানুষ হলেও আমার ইচ্ছের কোনও দাম থাকবে না?

যাদুগোপাল হেসে বলল, ইচ্ছের লড়াই? এক রাজা বনাম এক নটী! অনেকটা রূপকথার মতন শুনতে লাগছে। শুধু এই? অন্য কোনও কারণ নেই? তোমার স্বামী... তোমার বোধ হয় বিবাহ হয়নি, তোমাদের তো কোনও না কোনও রক্ষক পুরুষ থাকে, সে আপত্তি করেছে?

নয়নমণি বলল, আমার সে রকম কেউ নেই।

যাদুগোপাল বলল, কেন নেই?

নয়নমণি বলল, আমার দুর্ভাগ্য, মনের মানুষ এখনও পাইনি। যারা শুধু টাকা দেখায়, তাদের কাছে যেতে আমার ঘেন্না করে। আপনি আমাকে বলুন, আমার কি আত্মরক্ষা করার কোনও উপায় নেই?

যাদুগোপালের ভুরু কুঞ্চিত হল। বিলেতে থাকবার সময় একটা ছোট গোষ্ঠীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, যারা কার্ল মার্কস নামে এক জার্মান অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তারা সেই চিন্তার চর্চা করে, সারা বিশ্বে এক শ্রেণীহীন, সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখে। তাদের সংস্পর্শে এসে যাদুগোপালের মনেও সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বিরাগ জন্মে গেছে।

সে বলল, ত্রিপুরার রাজা, কলকাতায় এসে জোর-জুলুম ফলাবার কে? এটা ব্রিটিশ রাজত্ব, এখানে আইন-শৃঙ্খলা আছে। আইনের চোখে একজন রাজা আর একজন সাধারণ মানুষ, সবাই সমান। তুমি কোথাও যেতে না চাইলে কেউ তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। আইন তাকে শাস্তি দেবে।

নয়নমণি বলল, আইন কখন শাস্তি দেয়? অপরাধের আগে না পরে? কেউ যদি খুন করতে চায়, খুনের আগে কি আইন তাকে শাস্তি দেয়? মহারাজ যদি আমায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দেন, তারপরেও কি আইন আমাকে বাঁচাতে পারবে?

যাদুগোপাল বলল, সে রকম সম্ভাবনা আছে নাকি?

নয়নমণি বলল, আমার আশঙ্কা, আমি রাজি না হলে মহারাজের সাঙ্গোপাঙ্গরা এসে আমাকে যে-কোনও প্রকারে বন্দি করে নিয়ে যাবে।

যাদুগোপাল চুপ করে চিন্তা করতে লাগল।

নয়নমণি ব্যাকুলভাবে বলল, মহারাজের প্রাসাদে যাবার বদলে আমি জেলখানায় যেতেও রাজি আছি। আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

যাদুগোপাল এবার দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ওই অপদার্থ রাজাটা যদি তোমার গায়ে হাত ছোঁয়াতে আসে, আমি ওকেই জেল খাটাব। ভূমিসুতা, তুমি একটা কাজ করতে পারবে? কয়েকটি দিন তুমি

আমার বাড়িতে থাকো। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তিনি তোমাকে আশ্রয় দেবেন।

নয়নমণি দারুণ বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার বাড়িতে ? আমি থিয়েটারের মেয়ে, সবাই আমাদের নষ্ট, পতিতা বলে জানে। কোনও ভদ্র বাড়ির অন্দরমহলে তো প্রবেশের অধিকার নেই আমাদের। এ আপনি কী বলছেন ?

যাদুগোপাল বলল, মেয়েরা কি একা একা নষ্ট হতে পারে, না পতিতা হয় ? যে সব পুরুষ তাদের ওই পথে ঠেলে দেয়, তারা দিব্যি ভদ্র সেজে থাকে। ওসব আমার জানতে বাকি নেই। বিলেতে থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বলে শিল্পী, তাদের আর কোনও জাত-ধর্ম থাকে না। অনেক ভদ্র বাড়িতেই তাদের সাদরে নেমন্তন্ন হয়। ভূমিসুতা, তুমি থাকো আমার বাড়িতে, আমি আজকালের মধ্যেই ওই মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে চরম ধাতানি দেব।

নয়নমণি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনি আমাকে ভূমিসুতা বলে ডাকবেন না। আমি নয়নমণি। ভূমিসুতা মরে গেছে।

যাদুগোপাল নয়নমণিকে নিয়ে গেল ভিতর মহলে।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য সন্ধেবেলা ছোটখাটো একটি দরবার সাজিয়ে বসে আছেন। আজ তাঁর অঙ্গে রাজপোশাক, মাথায় মুকুট। জনা চারেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সবাই নিম্নস্বরে গল্পগুজব করছেন। মহারাজ ঘড়ি দেখছেন বারবার। দুপুরবেলাতে অর্ধেন্দুশেখরের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল, সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে নয়নমণিকে নিয়ে আসার কথা। তাঁর বাড়ির এক একদা দাসী এখন থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেত্রী, এটা মহারাজের কাছে বেশ শ্লাঘার বিষয়। এই মেয়েটি যেন তাঁরই সৃষ্টি, তিনি সকলকে দেখাবেন। এ বাড়ির দোতলার একটি ঘর সাফ-সুতরো করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মেয়েটি ওখানেই থাকবে।

প্রায় সাতটার সময় এক ভগ্নদূত এসে দুঃসংবাদ জানাল, যে নয়নমণিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে পালিয়েছে, আজ তাকে পৌঁছে দেবার কোনও উপায় নেই।

খবরটি শুনে মহারাজের বদনমণ্ডলে ক্রোধের বদলে বিস্ময় ও বিষাদ ফুটে উঠল। তিনি মহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, আসবে না ? পালিয়েছে ? কেন ?

মহিম কোনও উত্তর দিতে পারল না।

মহারাজ আপন মনে বললেন, আমি তার গান শুনতে চেয়েছি... সে গান শিখেছে, গান শোনাবে না কেন ? আমি কি তার যত্নের কোনও ত্রুটি করতাম ? সে থাকত এখানে রানির মতন। থিয়েটারে রোজ রোজ ঘুরে ঘুরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলার রক্ত তোলার চেয়ে এখানে নিরিবিলিতে গান শোনানো ভাল নয় ? থিয়েটারে ক'পয়সা রোজগার হয় ? গয়না দিয়ে মুড়ে দিতাম ওকে।

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে তিনি ওই কথাই বলতে লাগলেন বারবার। এক সময় মহিমের সামনে এসে বললেন, ও মহিম, মেয়েটা আমাকে ভয় পেল কেন ? আমি কি ওকে খেয়ে ফেলতাম ? আমি বাঘ না ভাল্লুক ? সবাই যে বলে, আমার দয়া-মায়া আছে, তা কি মিথ্যে ? ও মহিম, বল না !

মহিম বলল, তা তো বটেই। ও মেয়েটা অভাগি, আপনার দয়া পেল না। আর কোনও গায়িকা ডেকে আনব !

মহারাজ সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, নাঃ ! মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর কিছু হবে না। তবে জানিস, গান শুনলে আমার সারা শরীর ভাল থাকে। কলকাতা শহরেই আর থাকব না। চল, কার্শিয়াং, কি দার্জিলিং চলে যাই। সেখানে নিরিবিলিতে একটা মাস কাটিয়ে দেব।

একটু থেমে তিনি বললেন, কিন্তু সেখানে আমাকে কে গান শোনাবে ? দিনগুলি কী করে কাটাব ?

মহিম বলল, সেই জন্যই বলছিলাম, থিয়েটারে আরও তো অনেক মেয়ে গান গায়, কেউ কেউ

নিশ্চয়ই যেতে রাজি হবে।

মহারাজ হাত নেড়ে বললেন, না, না, ওসব থিয়েটারের মেয়েটেয়ে দিয়ে কাজ নেই। ঢের হয়েছে। তুই বরং এক কাজ কর। তুই রবি ঠাকুরকে গিয়ে একবার খবর দে। ওঁর গান বড় মধুর, শুনলে শরীর জুড়িয়ে যায়। রবিবাবুকে গিয়ে বলবি, উনি যদি আমাদের সঙ্গে কার্শিয়াং-দার্জিলিং যান, আমি বড় প্রীত হব। হ্যাঁ, এই ভাল। ওই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা পালিয়েছে, আপদ গেছে। রবিবাবুর গান শুনব প্রাণ ভরে।

১৮

পত্র-পত্রিকায় যাঁকে দুরন্ত ঝঞ্ঝা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির কিছু কিছু বিড়ম্বনা তো থাকেই, তা বোঝা যায়, কিন্তু এই তরুণ সন্ন্যাসীটি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তাঁকে কুক্ষিগত করে ফেলবে।

শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের শুধু উদ্বোধনী ভাষণে নয়, আরও অনেকগুলি আলোচনা চক্রে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় এক দারুণ আকর্ষণী শক্তি আছে। যে-সব সভায় অনেক বক্তা, সে-সব সভায় বিবেকানন্দের ডাক পড়ে সবচেয়ে শেষে। অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে শ্রোতারা যখন ঝিমিয়ে পড়ে, অনেকে উঠে চলে যেতে শুরু করে, তখন উদ্যোক্তারা ঘোষণা করে, আপনারা বসুন, বসুন, এর পরে বলবেন স্বামী বিবেকানন্দ ! অমনি সভামণ্ডপে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়।

বিবেকানন্দ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন না, তাঁর সমস্ত কথাই স্বতঃস্ফূর্ত। ইংরিজি উচ্চারণে কিছুটা আইরিশ টান থাকলেও স্পষ্ট বোঝা যায়, অহেতুক উদ্ধৃতি বা পাণ্ডিত্যের কচকচি নেই, তাঁর চোখের দৃষ্টির মতনই তাঁর মুখের বাক্যও প্রবল আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। ধর্মীয় দর্শন এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন, এই ধরনের গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও তিনি উৎকট গুরুগম্ভীর ভাব করেন না। তাঁর গুরুর নির্দেশ মতনই তিনি রসে-বশে থাকেন, শুকনো সন্ন্যাসী নন।

শুধু প্রকাশ্য জনসভায় নয়, বিভিন্ন ঘরোয়া আসরেও তাঁর ডাক পড়ে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর কথা শোনে।

আমেরিকায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই সময়ের দাম আছে। যে যে-কাজই করুক, সে প্রতিটি মিনিটের জন্য দাম পায়, কিংবা তাকে দাম দিতে হয়। বক্তৃতা, বিনা পয়সায় হয় না, বক্তা যেহেতু সময় ব্যয় করছেন, তাই সেই সময়ের দাম তাঁর প্রাপ্য, যারা শুনতে আসে, তারাও দাম দিতে দ্বিধা করে না।

স্বামী বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখে শিকাগোর স্লেটন লাইসিয়াম ব্যুরো নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাঁর সঙ্গে তিন বৎসরের একটা চুক্তি করে ফেলল। তারা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে, টিকিট বিক্রির টাকা বক্তা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে।

আপাত-দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের পক্ষে বেশ উপযোগী। তিনি ভারতের ধর্ম ও বাণী প্রচার করার জন্য এ-দেশে এসেছেন, সহসা ফিরে যাওয়ার জন্য কোনও মানে হয় না। তাঁর পক্ষে নানা শহরে ঘুরে ঘুরে হল ভাড়া করা, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে শ্রোতা সংগ্রহ কিংবা টিকিট বিক্রির ভার নেওয়া

সম্ভব নয়। সে সব দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপানোই শ্রেয়। তিনি বক্তৃতা দেবার পর কোথাও আশি ডলার, কোথাও একশো সাতাশ ডলার পেয়ে মনে করতে লাগলেন বেশ ভালই উপার্জন হচ্ছে। ডেট্রয়েটে এক দিনের বক্তৃতায় পেলেন ন'শো ডলার! ডলারের দাম এখন ভারতীয় মুদ্রায় তিন টাকা, সেই অনুযায়ী হিসেব কষলে এ তো অনেক টাকা! ভারতে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সারা বছরেও সাতাশ শো টাকা রোজগার করে না।

কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে এরকম ভাবে অর্থ উপার্জন করা কি নীতিসম্মত? চুক্তিটি করার সময় বিবেকানন্দ আমেরিকায় তাঁর নবলব্ধ বন্ধুদের কারুর সঙ্গে পরামর্শ করেননি, দেশেও কারুকে জানাননি।

দেশের সঙ্গে, বিশেষত বাংলার গুরু-ভাইদের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। শিকাগোর ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর জয়বার্তা যখন একটু একটু করে কলকাতায় পৌঁছোয়, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী বা সংসারত্যাগী শিষ্যরা কেউ বুঝতে পারেননি যে, এই দিগ্বিজয়ী তাঁদের সেই নরেন। বিবেকানন্দ নামটাও তাঁদের কাছে অপরিচিত, নরেনের সমুদ্র পাড়ি দেবার ঘটনাও ছিল তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। বিবেকানন্দ চিঠিতে যোগাযোগ রাখতেন শুধু তাঁর মাদ্রাজি ভক্ত আলাসিঙ্গা, খেতড়ির রাজা অজিত সিং ও আর দু' একজনের সঙ্গে। এখন অবশ্য বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর গুরু-ভাইদের যোগাযোগ হয়েছে।

অর্থ উপার্জন করার ব্যাপারে বিবেকানন্দ একটা যুক্তি তৈরি করে নিয়েছেন। ভারতে একজন সন্ন্যাসী গাছতলায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারে, এই শীতের দেশে তা সম্ভব নয়। ভারতে সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখলে সাধারণ মানুষ পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় তাঁদের আহার্যের ব্যবস্থা করে দেয়। সে রকম প্রথা নেই এদেশে। এর মধ্যে বিভিন্ন পরিবারে তিনি আতিথ্য নিয়েছেন বটে। কিন্তু দিনের পর দিন তা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝেই তিনি হোটেলে থাকতে বাধ্য হন। তাও সাধারণ হোটেল তাঁকে স্থান দেয় না, দামি হোটেলেই উঠতে হয়, সে খরচ কে দেবে! কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যয়ও আছে, তামাকের নেশা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না, দেশে হুঁকো টানা বেশ সস্তার ব্যাপার ছিল, এ দেশে চুরুটের খুব দাম, তেরো ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনে ফেলেছেন। তিরিশ ডলার খরচ হয়ে গেল একটা কালো রঙের কোট কেনার জন্য। তা ছাড়া অনেক টাকা জমাতে হবে, সেই টাকা তিনি দেশে পাঠাবেন। শিল্প স্থাপন করতে না পারলে ভারতের দারিদ্র্যদশা কোনও দিন ঘুচবে না। তিনি এ-দেশীয় বন্ধুদের বলেন, আমি এ দেশে এসেছি দেশ দেখতে নয়, তামাশা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, আমার দেশের দরিদ্র মানুষদের জন্য উপায় দেখতে। মনে মনে তিনি দেশে গিয়ে মানুষের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ার কথাও ভাবছিলেন, তার জন্যও অর্থের প্রয়োজন।

কিন্তু দু'-এক মাস যেতে না যেতেই বিবেকানন্দ বুঝলেন, ওই রকম একটা চুক্তির জালে আবদ্ধ হওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে। এদেশের ব্যবসায়ীরা ধর্ম বোঝে না, মানুষের সেবাকার্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা বোঝে শুধু মুনাফা। আর বিবেকানন্দের মতন একজন বিদেশি, অসংসারী, অনভিজ্ঞ মানুষকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত লাভ করাও তাদের পক্ষে সহজ। বিবেকানন্দকে তারা চরকির মতন ঘোরাতে লাগল এক শহর থেকে আর এক শহরে, দিনের পর দিন বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হতে লাগলেন, কিন্তু তাতে পকেট ভরতে লাগল ওই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরই। এক সময় তিনি টের পেয়েও গেলেন যে, তিনি প্রতারিত হচ্ছেন। প্রশংসা ও নিন্দে দুটোই বাড়ার ফলে তাঁকে নিয়ে যত বিতর্ক জমছে, ততই তাঁর সম্পর্কে লোকের কৌতূহল বাড়ছে, দলে দলে লোক ছুটে আসছে তাঁর বক্তৃতা শুনতে। এক জায়গায় টিকিট বিক্রি হল আড়াই হাজার ডলার, তার থেকে স্বয়ং বক্তা পেলেন মাত্র দুশো ডলার!

অথচ এই চুক্তির জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় নেই, তা হলে তাকে অসম্ভব ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তিন বছর ধরে যদি তাঁকে এরকম পরাধীন ভাবে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে বেড়াতে হয়, তা হলে তাঁর জীবনীশক্তির কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

শিকাগো থেকে ম্যাডিসন ও মিনিয়াপোলিস, আয়ওয়া সিটি ও ডিময়েন, মেমফিস, সেখান থেকে

একবার শিকাগোয় ফিরে আবার ঘোর শীতের মধ্যে ডেট্রয়েট, ওহায়োর আডা নামে শহর, মিশিগানের বে সিটি ও স্যাগিনো, তারপর দক্ষিণের কিছু কিছু শহরে ঝঞ্ঝার মতনই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এই তরুণ সন্ন্যাসী। তাঁর জীবনীশক্তি অপরিমিত হলেও এত পরিশ্রম সহ্য হয় না। মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ বলে বক্তৃতা দিয়েই যেতে হবে।

বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা আছে তাঁর, ভারতের শাশ্বত বাণী এ দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাঁর জীবনের ব্রত, তবু এক এক জায়গায় শ্রোতারা এমনই অদ্ভুত যে, সেখানে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলাই যায় না। আমেরিকার অধিবাসীরা জাগতিক ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি করেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকানই জগৎ সম্পর্কে অতিশয় অজ্ঞ। ভারতবর্ষের মতন এতবড় একটি দেশ সম্বন্ধে দু'চারটি খারাপ কথা ছাড়া কিছুই জানে না। সম্রাট অশোক বা আকবর কিংবা রাজা রামমোহনের নাম শুনেছে, এমন লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ভারতীয়রা দরিদ্র, অতিশয় দরিদ্র, এইটুকু তারা জানে। কিন্তু এককালের ঐশ্বর্যময় ভারত এখন কেন দরিদ্র, তাদের জাতভাইরা যে ভারতের শোষণকারী, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। এই ভারতেরই অনেক মানুষ যে স্বেচ্ছায় সংসারের সুখ সম্ভোগ ছেড়ে সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করে, সে সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণাই নেই।

বিবেকানন্দের নাম সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে প্রায় কেউই পারে না। কেন একজন মানুষের এরকম নাম, তা বোঝারও চেষ্টা করে না। তাদের ধারণা, এই লোকটির নাম হচ্ছে বিব্। এবং এর পদবি কানন্দ্। এরা মিঃ কানন্দ্ মিঃ কানন্দ্ বলে ডাকে। বিবেকানন্দ অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে কোনও খনি বা কল-কারখানা নিকটবর্তী অঞ্চলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। এরা প্রাচ্যদেশীয় কোনও মানুষ দেখেইনি, মাথায় পাগড়ি পরা একটি অদ্ভুত প্রাণী দেখার জন্যই এরা দলে দলে এসে টিকিট কাটে। এদের সামনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই যায় না।

বক্তৃতা শুরু করতে না করতেই এই সব শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ চেঁচিয়ে বলে ওঠে, হেই মিঃ কানন্দ্, ওসব বড় বড় কথা শুনতে চাই না। তোমাদের দেশে শুনেছি, মায়েরা সন্তানের জন্মের পর নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কুমিরদের খাওয়াবার জন্য! একথা সত্যি?

বক্তৃতা থামিয়ে বিবেকানন্দ একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর স্মিতমুখে বলেন, আমার মা যে আমাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেননি, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

আর একজন বলল, ছেলেদের ছুঁড়ে দেয় না, শুধু মেয়েদের ফেলে দেয়।

বিবেকানন্দ বললেন, তাই নাকি! তা হলে নিশ্চয়ই কুমিররা মেয়ে সন্তানদেরই বেশি পছন্দ করে। মেয়েদের মাংস খুব নরম আর সুস্বাদু লাগে বোধহয় ওদের কাছে।

এতে একদল হেসে উঠলেও অন্যদল সন্তুষ্ট হয় না। তারা বলে, হ্যাঁ, তোমাদের দেশের বাচ্চা মেয়েদের জলে ফেলে দেওয়া হয়, আমরা জানি। তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।

বিবেকানন্দ বললেন, না, এড়িয়ে যাচ্ছি না। আমি ভাবছি, সব মেয়েই যদি কুমিরের পেটে যায়, তা হলে পুরুষ সন্তানরা জন্মায় কী করে?

অন্য একজন উঠে দাঁড়িয়ে সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে, বাচ্চা মেয়েদের জলে ফেলে দেওয়া হোক বা না হোক, স্বামী মরে গেলে তোমাদের দেশের বিধবাদের জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়, এটা সত্যি। নিশ্চয়ই সত্যি। আমি অনেক বইতে ছবি দেখেছি।

বিবেকানন্দ বললেন, হ্যাঁ, এটা মিথ্যে নয়। এখন আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এক সময় কিছু কিছু বিধবা স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছেন, এ কথা সত্যি। দু' চার জায়গায় জোর করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বুঝিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা হত। তবু কোনও বিধবা মোহের বশে জিদ ধরলে তাঁকে আগে আগুনে হাত দিয়ে পরীক্ষা দিতে হত। আমি এ ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছি। এবার প্রশ্ন করি, আপনারা জোন অব আর্কের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? এই তো মাত্র সেদিন ফরাসিদেশে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল! তাই না?

এরা কেউই জোন অফ আর্কের নাম শোনেনি, তাই চুপ করে যায়।

বিবেকানন্দ আবার বলেন, মধ্যযুগের ইওরোপের খ্রিস্টানরা কত শত শত অসহায় মেয়েদের ডাইনি বলে কাঠের দণ্ডে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে। তাদের কথা শোনেননি ?

দর্শকদের মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে তিনি আবার জোর দিয়ে বলে ওঠেন, এই ধরনের ধর্মান্ধতা সব দেশেই আছে। শুধু এরকম দু' একটি ঘটনা দিয়ে কোনও দেশকে বিচার করা যায় না। একজন ফরাসি বা ইংরেজকে দেখলেই কেউ এখন জোন অব আর্কের কথা জিজ্ঞেস করে না। একজন ভারতীয়কে দেখলেই বা কেন সতীদাহের প্রসঙ্গ তোলা হবে !

শুধু খনি-শ্রমিক বা কারখানার মানুষরাই নয়, অনেক গির্জায়, অনেক উচ্চাঙ্গের ক্লাবে, অনেক শিক্ষিতদের সমাবেশেও এই ধরনের প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হয় তাঁর দিকে। একদল লোক এই সব প্রশ্নের উত্তরও চায় না, ভারত সম্পর্কে কুৎসাগুলি অন্যদের শোনানোই তাদের উদ্দেশ্য। একদিন বিবেকানন্দ এই রকম একটি সমাবেশে বলে ফেললেন, পশ্চিমি দেশগুলির একদল অত্যুৎসাহী প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে যত নিন্দা আর অপপ্রচার করেছে, ভারত মহাসাগরের তলদেশের সমস্ত কাদা পাশ্চাত্যের দিকে ছুঁড়ে মারলেও তার যথেষ্ট প্রতিশোধ হয় না। কিন্তু আমি এ দেশে কাদার বদলে কাদা ছুঁড়তে আসিনি।

বহু যথার্থ ভোগবাদবিমুখ নারী-পুরুষ অবশ্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদের কথা মন দিয়ে শুনেছে এবং তাঁর ভক্ত হয়েছে। ভক্তের সংখ্যা বাড়লে শত্রুর সংখ্যাও বাড়ে।

শিকাগোর ধর্মসভায় অন্য যে-সব ভারতীয় যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁরাও বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন এবং শ্রোতাও পেয়েছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মতন তাঁরা এমন স্পষ্ট বক্তা নন, তাঁরা উচ্চাঙ্গের কথা বলেছেন বটে কিন্তু বিবেকানন্দর মতন এমন মতবিরোধের সৃষ্টি করেননি, এমনভাবে মিশনারিদের সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরাননি। বিবেকানন্দ পত্র-পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি আলোচ্য, আমেরিকার প্রায় সব গির্জায় গির্জায় তাঁর বিরুদ্ধে বিযোদ্গার চলছে। এই সবই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে, এবং তাতে অন্য বক্তাদের ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন অনেক। প্রতাপ মজুমদার প্রথম দিকে বিবেকানন্দের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন, পরে বিবেকানন্দকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর ঠিক সহ্য হল না। তিনি তাঁর কাছাকাছি মানুষদের বলে বেড়াতে লাগলেন যে, ও ছেলেটা তো গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, ওর কথাগুলি তো সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদের মনোভাবের প্রতিফলন হতে পারে না, কারণ হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে ওকে তো প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়নি। ও একটা ভুঁইফোড় !

প্রতাপ মজুমদার দেশে ফিরে যাবার পর সেখানকার দু'একটি পত্র-পত্রিকায় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কটু কথা প্রকাশিত হতে লাগল। নরেন দত্ত নামে একটি ছোকরা ব্রাহ্মদের থিয়েটারে গান গাইত, ওর আবার ধর্মীয় নেতা হবার যোগ্যতা হল কী করে ? কেশবচন্দ্র সেনও থিয়েটারে অভিনয় করেছেন, তাঁর ধর্মগুরু হতে কোনও আপত্তি ওঠেনি, সে কথা এঁরা মনে রাখলেন না। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বলাবলি হতে লাগল যে, সন্ন্যাসীর ভেক ধরে সে আমেরিকায় ব্যভিচারী হয়েছে, সর্বদা চুরুট ফোঁকে। পানাহারের কোনও বাছ-বিচার নেই, অখাদ্য কুখাদ্য খায়, নারীঘটিত দুর্বলতাও আছে।

এসব খবর বিবেকানন্দের কাছে এসে পৌঁছোয়, তিনি প্রতিবাদ করতে চান না, কিন্তু ব্যথিত হন। তাঁর মনে পড়ে বৃদ্ধা মায়ের কথা। মা শত আপত্তি সত্ত্বেও ছেলেকে ব্রহ্মচারী হতে দিয়েছেন, এই জ্যেষ্ঠ সন্তানটির প্রতি তাঁর অনেক আশা-ভরসা, এখন যদি মা শোনেন যে সেই ছেলে দূর বিদেশে গিয়ে অনাচারী হয়েছে, তা হলে তিনি কষ্ট পাবেন। মা কি বিশ্বাস করবেন শেষ পর্যন্ত ?

আর একজন ভারতীয় এই সময় আমেরিকায় বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন। তিনি একজন মহিলা, সবাই তাঁকে বলে পণ্ডিতা রমা বাঈ। মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এই রমা বাঈয়ের জন্ম, তাঁর বাবা তাঁকে উত্তমরূপে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন এবং যৌবন উদ্গমেই রমা বাঈ উন্নত মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি একটি বাঙালি যুবকের প্রেমে পড়েন, সে যুবকটি ছিল

অব্রাহ্মণ। এক অব্রাহ্মণ তনয়ের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ কন্যার প্রণয় বিবাহে এক সময় বেশ শোরগোলের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু ওঁদের বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, যুবকটি অকালে মারা যায়। বিধবা রমা বাঈ কিছুদিন পরে ইংল্যান্ডে চলে আসেন এবং সেখানে আরও বিদ্যাচর্চা করে তাঁর পণ্ডিতা উপাধিটি সার্থক করেন এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। দেশে ফিরে এসে তিনি হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থা নিবারণের কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দেন।

রমা বাঈয়ের এই সেবামূলক কাজ অবশ্য মহারাষ্ট্রের অনেকে সুনজরে দেখেনি। বিধবা আশ্রম গড়ার জন্য তাঁকে খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে হত, এবং মিশনারিদের প্রভাবে অনেক বিধবাই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ এটাই প্রতিভাত হতে লাগল যে, হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট মোচনের একমাত্র উপায় ধর্মান্তর। মহারাষ্ট্রের গোঁড়া হিন্দুদের এটা পছন্দ হবার কথা নয়। বাল গঙ্গাধর তিলক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, ওকে সবাই পণ্ডিতা বলে কেন, ওর নাম হওয়া উচিত রেভারেন্ডা রমা বাঈ !

আমেরিকায় রমা বাঈয়ের কাজের সমর্থনে ও সাহায্যকল্পে অনেকগুলি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। রমা বাঈ সার্কল নামে এ রকম পঞ্চান্নটি প্রতিষ্ঠান। তারা ঘন ঘন প্রকাশ্য জনসভা ও আলোচনাচক্রে ভারতীয় বিধবাদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে চাঁদা তুলত ভারতে পাঠাবার জন্য। চাঁদা তুলতে গেলে নানারকম মর্মন্তুদ কাহিনীর অবতারণা করতে হয়। সেইসব কাহিনীর মধ্যে অনেক রগরগে গল্পও এসে পড়ে। শুনতে শুনতে উপস্থিত জনসাধারণ শিউরে ওঠে, তারা মনে করে, ভারত এমনই এক বর্বরদের দেশ, যেখানে লক্ষ লক্ষ বালবিধবা পুরুষদের পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে।

বিবেকানন্দর বক্তৃতার আসরে কিছু লোক কুমিরের মুখে শিশু বিসর্জন, সতীদাহ, ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিধবাদের প্রতি অত্যাচারের প্রসঙ্গও তোলে। এগুলো তো মিথ্যে হতে পারে না, বিবেকানন্দর স্বদেশবাসীরাই তো এইসব কথা বলেছে, শুধু রমা বাঈয়ের দল নয়, ব্রাহ্মরাও বলে।

বিদেশে এসে স্বদেশের নানান দুর্বলতার কথাই শুধু তুলে ধরা বিবেকানন্দর ঘোর অপছন্দ। নিজের দেশের কিছু কিছু কুৎসিত রীতিনীতির কথা স্বীকার করতে তাঁর লজ্জা নেই, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও তো কত খারাপ প্রথা আছে, তাও বলা হবে না কেন ? যিশুর নামে করুণার বাণী যারা প্রচার করে, সেই খ্রিস্টানরা বর্বর শক্তি দিয়ে এক একটা দেশকে পদানত করেনি ? ধর্মের নামে বারবার রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেয়নি ? এই খ্রিস্টানরাই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা দেয়নি ? গ্যালিলিও-কে বন্দি করেছিল কারা ? এরাই ভারতে মদ আর চিনে আফিং-এর প্রচলন করায়নি ব্যবসার স্বার্থে ?

আমেরিকানরা ধনমদে মত্ত হয়ে চূড়ান্ত নীতিহীনতার পরিচয় দেয়, তারাই আবার অন্য দেশের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের নিন্দা করে কোন মুখে ! বিবেকানন্দ এক এক সময় তীব্র ভাষায় বলে উঠেছেন হ্যাঁ, আমাদের দেশে ধর্মান্ধতা আছে, কুসংস্কার আছে। আমরা যখন ধর্মান্ধ হই, আমরা জগন্নাথদেবের বিরাট রথের চাকার সামনে লাফিয়ে পড়ে নিজেরাই নিষ্পেষিত হই, নিজেদের গলায় ছুরি দিই কিংবা কণ্টকশয্যায় শুই। আর তোমরা যখন ধর্মান্ধ হও, তখন তোমরা অপরের গলায় ছুরি চালাও, অন্যদের আগুনে পোড়াও, তাদের জন্য কণ্টকশয্যা তৈরি করো। নিজেদের চামড়া তোমরা সাবধানে বাঁচিয়ে চলো।

বিধবাদের প্রসঙ্গেও বিবেকানন্দ বললেন, হ্যাঁ, বহুকাল ধরে ভারতের বিধবাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু তা বলে অতিরঞ্জন আমি সহ্য করব না। অবস্থা কি কিছু পাল্টায়নি ? আইন অনুযায়ী বিধবাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে কোনও বাধা নেই। অন্য উত্তরাধিকারী না থাকলে স্বামীর সম্পত্তিতেও তাদের জীবনস্বত্ব থাকে। সমাজের উঁচু শ্রেণীতে বিধবাদের বিয়ে হয় না, কারণ সেখানে পুরুষদের সংখ্যা বেশি, পুরুষের ক্ষমতাও বেশি, কিন্তু নিম্নস্তরে বিধবাদের আকছার বিয়ে হয়। এখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ কি সারাদেশেই আইনসম্মত হয়নি ? উঁচু-নিচু যে-কোনও স্তরের বিধবাদেরই আবার বিয়ে হতে পারে। বিধবাদের অবস্থা বর্ণনা করার সময় এসব কথাই বা বলা হবে না কেন ?

রমা বাঈ চক্রের সঙ্গে বিবেকানন্দর বিরোধ শুরু হয়ে গেল।

বিধবাদের অবস্থা যদি অতটা ভয়াবহ ও বীভৎস মনে না হয়, তা হলেই চাঁদা কম ওঠে। সুতরাং ওই বিবেকানন্দ নামে উটকো লোকটা, ভারতে যার নাম কেউ কোনওদিন শোনেনি, ওর মুখ বন্ধ করা দরকার। বিবেকানন্দর বিরুদ্ধে অপপ্রচার বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছল। এমনও বলা হল যে ওই লোকটা একটা বোহেমিয়ান, আত্মসংযম বলতে ওর কিছু নেই। শ্রীমতী ব্যাগলি শিকাগোর এক বিশিষ্ট পরিবারের কর্ত্রী, তিনি বিবেকানন্দকে কিছুদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ এমনই দুশ্চরিত্র যে ও-বাড়ির একটি যুবতী চাকরানি ওর অত্যাচারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

শ্রীমতী ব্যাগলি অবশ্য এই অভিযোগ শুনে আকাশ থেকে পড়েছিলেন। একাধিক চিঠিতে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে তো বটেই, বিবেকানন্দের মতন এমন উন্নত চরিত্রের মানুষ আর তিনি দেখেননি। তার দাস-দাসীরা কেউ কোনওদিন তাঁদের ছেড়ে যায়নি, অভিযোগকারীরা যে তরুণীর নাম করেছে, ওই নামে কারুকে তিনি চেনেন না, ওরকম কোনও দাসীও তাঁর বাড়িতে কখনও কাজ করেনি।

অর্থই যত অনর্থের মূল। মিশনারিরাও যে বিবেকানন্দের ওপর খড়্গহস্ত হয়েছিল, তার কারণ তাদেরও চাঁদা কমে যাচ্ছিল হু হু করে। বিবেকানন্দর বক্তৃতা শুনে অনেকেরই ধারণা হচ্ছিল যে, যে-দেশে এমন উচ্চ ধর্মীয় ভাব আছে, সে দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য মিশনারি পাঠাবার কী দরকার? চাঁদার পরিমাণে এক বৎসরে কমে গিয়েছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা। খ্রিস্টান মিশনারিদের আয় কমে যাচ্ছে, আর বিবেকানন্দ ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর ডলার পকেটস্থ করছে। লোকটাকে প্রাণে মারলেও যেন গায়ের ঝাল মেটে না। একজন সন্ন্যাসীকে বাতিল করার শ্রেষ্ঠ উপায় তার চরিত্রহনন। পাদ্রিরা বিভিন্ন পরিবারে বেনামি চিঠি পাঠাতে লাগল, খবরদার ওই দুশ্চরিত্র লোকটাকে তোমাদের বাড়িতে স্থান দিয়ো না।

অন্যরা ভাবছে বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করছেন, কিন্তু তিনি নিজে যে এ কাজ আর একেবারেই পছন্দ করছেন না, তা কেউ জানে না। সার্কাসের ক্লাউনের মতন ব্যবসায়ী তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাচ্ছে। বক্তৃতার পর বক্তৃতা, যেন মুখে রক্ত উঠে আসছে। আবার একটা নতুন শহরে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে ভাবলেই বিভীষিকা জাগে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি পরবর্তী বক্তৃতার বিষয় আওড়ান। চুক্তির হাত থেকে রেহাই পাবার কি কোনও উপায় নেই?'

বক্তৃতা দেবার সময় শুধু যে উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তাই-ই নয়, অন্য রকম বিপদও ঘটে। একবার পশ্চিমের একটি শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার সময় বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি যার হয়, তিনি পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করেন, বাইরের কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না। ছাত্রদের মধ্যে ছিল কিছু কাউ বয়। তারা ওই কথা শুনতে শুনতে বলল, বটে! তাই নাকি?

পরীক্ষা করার জন্য তারা বিবেকানন্দকে নিজেদের র‍্যাঞ্চে নিয়ে গেল বক্তৃতা দেওয়াবার জন্য। একটা মস্ত বড় কাঠের টব উল্টে দিয়ে বলল, মশাই, এটার ওপর দাঁড়িয়ে আপনার ওই সব বড় বড় ভাবের কথা শোনাতে পারবেন?

আপত্তি করে লাভ নেই। মোগলের হাতে পড়লে যেমন এক সঙ্গে বসে খানা খেতেই হয়, সেই রকমই কোমরবন্ধে পিস্তল ঝোলানো কাউবয়দের কথা অগ্রাহ্য করা চলে না। টাবটার ওপর উঠে দাঁড়ালে সেটা ঢকঢক করে নড়ে। এই অবস্থায় মনঃসংযোগ করে কথা বলা যায় না। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে এই দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলেগুলি তাঁকে আরও কিছু বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। বক্তৃতা শোনার জন্য এরা পয়সা দিয়েছে, তা উশুল না করে ছাড়বে না।

তিনি দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন ভাষণ।

হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ হল, তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটি পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেল। বিবেকানন্দ বিচলিত হবার কোনও লক্ষণ দেখালেন না। এরা যদি তাঁকে মেরে ফেলতে চাইত, তা

হলে একটি গুলিই যথেষ্ট ছিল, কাউবয়দের হাতের টিপ অব্যর্থ। ভয় দেখানোই এদের উদ্দেশ্য, ভয় পাওয়া মানেই পরাজয়।

কিছুদিন আগে রবার্ট ইঙ্গারসোল নামে এক প্রসিদ্ধ বক্তার সঙ্গে বিবেকানন্দের আলাপ হয়েছিল। ইঙ্গারসোল প্রচণ্ড নাস্তিক এবং মানুষের মন থেকে ধর্মের নামে নানাবিধ সংস্কার দূর করাই তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর এই ধরনের বক্তব্য প্রচার করতে গিয়ে বহুবার তাঁকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি আমেরিকান, এদেশের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের দাবি করতে পারেন সদর্পে। বিদেশি হয়ে বিবেকানন্দ কখনও আমেরিকানদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির সমালোচনা করেন শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে বলেছিলেন, স্বামীজি, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। পঞ্চাশ বছর আগে হলে আপনাকে এরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিত কিংবা পুড়িয়ে মারত। এখনও অনেক জায়গায় লিঞ্চিং হয়। অশ্বেতকায়দের দক্ষিণাঞ্চলে পাথর ছুঁড়ে মারে যখন তখন।

বিবেকানন্দ হেসে বলেছিলেন, আমি আপনার মতন ধর্মদ্বেষী নই। যিশুখ্রিস্টকেও আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি। আমাকে এরা মারবে কেন?

মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হল না, বিবেকানন্দ সেই বেপরোয়া কাউবয়দের সমাবেশে ভাষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বক্তব্যকে তিনি সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন না, তিনি বলতে লাগলেন উচ্চ মার্গের জীবনদর্শনের কথা। এরা কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, তিনি বিচ্যুত হবেন না তাঁর কেন্দ্র থেকে।

আরও কয়েকবার বিকট শব্দে গুলি ছুটে গেল তাঁর মাথার দু'পাশ দিয়ে। শেষের দিকে তিনি যেন সে শব্দ আর শুনতেই পেলেন না, গুরুর নাম স্মরণ করে একাগ্র হয়ে রইলেন তিনি।

বক্তৃতা শেষ হবার পর সেই যুবকরা পিস্তল খাপে গুঁজে ছুটে এল এই হিন্দু স্বামীজির সঙ্গে করমর্দন করার জন্য। প্রকৃত সাহসীর তারা সম্মান দিতে জানে।

তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বিবেকানন্দ মৃদু হাস্য করতে লাগলেন। আর কত পরীক্ষা দিতে হবে?

১৯

মাস চারেক পর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে বক্তৃতার চুক্তি থেকে কোনওক্রমে মুক্তি পেলেন বিবেকানন্দ, তাঁর কয়েকজন বিশেষ বন্ধুর সহায়তায়। তাঁর শরীর ও মন কিছুতেই আর মানতে পারছিল না। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি এই চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করলেন বটে, কিন্তু বিবেকানন্দকে এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হল, যা কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল, তা প্রায় সবই গেল।

তাঁর আহার-বাসস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয় অবস্থাটা অবশ্য অনেকটাই ঘুচে গেছে। কিছু কিছু শুভার্থী এখন বিবেকানন্দকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে চান। কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিজের বাড়িতে আতিথ্য দিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে গর্ব করার ব্যাপার এটা নয়। বরং তার বিপরীত। এ এমনই এক সমাজ, যেখানে বিধর্মী বা অশ্বেতকায়দের কোনও বাড়িতে স্থান দিলে প্রতিবেশীরা ঠোঁট বেঁকায়, সে বাড়ির বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের স্কুলের বন্ধুরা যা-তা বলে ক্ষেপায়, ভেংচি কাটে। অবশ্য আমেরিকান সমাজেরই শুধু দোষ দেওয়া যায় না, ভারতীয় হিন্দুরাই কি স্বগৃহে কোনও বিধর্মীকে স্থান দেয়? এ ব্যাপারে তারা আরও গোঁড়া। কোনও আত্মীয়ও যদি ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। আমেরিকায় কিছু কিছু লোক এই ধরনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উল্লাস বোধ

করে। মিঃ পামার সেই ধরনের এক ব্যক্তি।

বিবেকানন্দ অশ্বেতকায় তো বটেই, এ দেশের রাস্তাঘাটের বহু মানুষ কালো ও বাদামি রঙের পার্থক্যও বোঝে না। তারা তাঁকে নিগ্রো বলে ভুল করে। ভারতীয়দের সম্পর্কে এদের কোনও ধারণাই নেই এবং নিগ্রোরা এদের চোখে অতি নিম্নস্তরের মানুষ। নিগ্রোরাও বিবেকানন্দকে স্বগোত্রীয় মনে করে। বক্তৃতামঞ্চে আসা-যাওয়ার পথে একদল শ্বেতাঙ্গ যখন বিবেকানন্দকে খাতির করে নিয়ে যায়, নিগ্রোরা তা দেখে কৌতূহল বোধ করে।

একবার বিবেকানন্দ দক্ষিণাঞ্চলের একটি শহরে বক্তৃতা দিতে গেছেন, রেল স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উদ্যোক্তাদের অনেকে উপস্থিত। একটি নিগ্রো কুলি দূর থেকে অবাক হয়ে দেখছিল, এক সময় সে সাহস করে কাছে এসে বলল, মিস্টার, আপনার সম্মানে নিগ্রো সমাজ গর্বিত, আমি একবার আপনার করমর্দন করে ধন্য হতে চাই।

বিবেকানন্দ তার হাত চেপে ধরে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন, এ জন্য আপনাকেই ধন্যবাদ।

অন্যদের কাছ থেকে সরে এসে বিবেকানন্দ সেই কুলিটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

সেবারে সেই শহরে থাকার জায়গা নিয়ে বিবেকানন্দকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছিল। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের মনুষ্যেতর প্রাণী মনে করে। শুধু গায়ের রঙের জন্য নয়, ওরা যে ক্রীতদাস। কোনও ভাল হোটেল-রেস্তোরাঁ বা স্কুল-কলেজে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। নিগ্রোরা খ্রিস্টান হলেও তাদের গির্জা আলাদা। বিবেকানন্দকেও নিগ্রো মনে করে অনেক হোটেলওয়ালা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আবার এমনও হয়েছে, কোথাও বক্তৃতার পর সংবাদপত্রে তাঁর ছবি ও প্রশংসা ছাপা হবার পর সেই হোটেলওয়ালা এসে ক্ষমা চেয়েছে তাঁর কাছে।

এক শ্বেতাঙ্গ বন্ধু বলেছিলেন, স্বামীজি, হোটেলে গিয়ে আপনি বলেন না কেন যে আপনি হিন্দু এবং ভারতবাসী, তা হলে ওরা আপনাকে নিগ্রো বলে ভুল করত না।

বিবেকানন্দ আহত বিস্ময়ে বলেছেন, কী, অপরকে ছোট করে আমি বড় হব? আমি তো পৃথিবীতে সে জন্য আসিনি! যার ইচ্ছে আমাকে নিগ্রো মনে করুক, আমার কিচ্ছু আসে যায় না।

বিবেকানন্দের বক্তৃতা সভাগুলিতে অবশ্য নিগ্রো শ্রোতাদের দেখা পাওয়া যেত না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগও তিনি পাননি।

ডেট্রয়েটে বিবেকানন্দ বারবার প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন, অনেকভাবে তাঁকে নাজেহাল করার চেষ্টা হয়েছে। সেই সব দেখেই প্রাক্তন সেনেটের মিস্টার পামার বিবেকানন্দকে খাতির করে নিয়ে গেছেন নিজের গৃহে। তাঁর ভাবখানা এই, আমার বাড়িতে এই হিন্দু সন্ন্যাসী যতদিন ইচ্ছে অতিথি হয়ে থাকবে, দেখি তো কে কী বলে।

পামার মানুষটি বেশ মজার। বয়েস হয়ে গেছে ষাটের ওপর, অঢেল টাকা পয়সার মালিক। তাঁর র‍্যাঞ্চ এ অঞ্চলে বিখ্যাত। পারবেরন জাতীয় বহু তেজী অশ্ব এবং স্বাস্থ্যবতী জার্সি গাভীগুলি দেখবার মতন। পামার দিলখোলা, মজলিশি মানুষ, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মদ্যপানে খুব উৎসাহ, অধ্যাত্ম ব্যাপারে তেমন কিছু আকর্ষণ নেই।

একটা গির্জার বক্তৃতায় বিবেকানন্দকে দেখে অনেকটা অভিনবত্বের কারণেই এই বিদেশিটিকে তাঁর বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিশাল বাড়ি, সংলগ্ন উদ্যান, অনেক পরিচারক-পরিচারিকা, বিবেকানন্দর কোনওই অসুবিধে হবার কথা নয়, অসুবিধে শুধু একটাই, প্রায় কখনও নির্জনে থাকার উপায় নেই। পামার নিজে গল্প করতে ভালবাসেন, তা ছাড়া রোজই তাঁর বাড়িতে পার্টি লেগে থাকে। সেই সব পার্টিতে খাদ্য ও মদ্য অফুরান। পামার তাঁর যত চেনাশুনো বন্ধুদের ডেকে ডেকে এই তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান।

একদিন সেরকম এক পার্টিতে এক সাংবাদিক উপস্থিত। সে পামারকে জিজ্ঞেস করল, আপনি নাকি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করছেন?

পামার বললেন, যদি হিন্দু হই, তাতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?

সাংবাদিকটি বলল, না, না, আমি আপত্তি করতে যাব কেন? হিন্দু হলে আপনি কি ভারতবর্ষে চলে যাবেন?

পামার বললেন, তাও যেতে পারি।

সাংবাদিকটি বলল, কিন্তু আপনার যে এই এতগুলো ঘোড়া আর গরু, ওদের একদিনও না দেখে আপনি থাকতে পারেন না, ওদের কী হবে?

পামার বললেন, ওগুলোও সব ভারতে নিয়ে যাব, তাতে কে আটকাবে আমাকে?

এসব যদিও কথার কথা, কিন্তু পরের দিন একটি পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেল যে, মিঃ পামার হিন্দুত্ব গ্রহণ করে ভারতে চলে যাচ্ছেন খুব শিগগিরই। তবে তাঁর দুটি শর্ত আছে, তাঁর পারবেরন ঘোড়াগুলো জগন্নাথদেবের রথ টানবে, আর তাঁর জার্সি গাভীগুলোকে হিন্দুর গো-মাতা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

এই পামারের বাড়িতে থাকার সময়েই বিবেকানন্দর খাদ্য-পানীয় গ্রহণ সম্পর্কে আরও বদনাম রটে। পামারের বাড়িতে যে-ধরনের খাদ্য পরিবেশিত হয়, তা কোনও সন্ন্যাসীর উপযুক্ত বলে অনেকেই মনে করে না। মদ্যপায়ীরা মাংসের ভক্ত হয়, এবং মাংসও অনেক রকম। বিবেকানন্দ মাছ-মাংস আহার ও ঝাল-মশলা ছাড়েননি। আইসক্রিম ভালবাসেন ছেলেমানুষের মতন।

এসব বদনাম বিবেকানন্দ গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তাঁর অন্য শুভার্থীরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শুধু শুধু বিরুদ্ধপক্ষীয়দের হাতে এই ধরনের অস্ত্র তুলে দেওয়ার কী দরকার? প্রাক্তন এক গভর্নরের স্ত্রী মিসেস ব্যাগলি বিবেকানন্দকে খুব পছন্দ করেন। এই মহিলারও বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে, নানারকম সামাজিক সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত, ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাবসম্পন্ন। মিসেস ব্যাগলি বিবেকানন্দকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে চাইলেন। পামারের তাতে ঘোর আপত্তি।

বিবেকানন্দ পড়লেন মুশকিলে। পামারের আন্তরিকতার কোনও ত্রুটি নেই, বক্তৃতা-ব্যবসায়ীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ব্যাপারে পামার অনেকটা প্রভাব খাটিয়েছিলেন, কী করে এখন হুট করে চলে যাবেন। দু'পক্ষের টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পামারকেই দুঃখ দিতে বাধ্য হলেন। কোনও মহিলার দাবি তাঁর পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

এ দেশের নারীদের স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বিবেকানন্দ। গোড়া থেকে নারীরাই তাঁকে সাহায্য করেছেন অনেকভাবে। এখনও তাঁর শুভার্থীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশি। এঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর মা কিংবা বোনের মতন সম্পর্ক।

শিকাগোয় প্রথম তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন লায়ন পরিবারে। লায়নরা চিনি কলের মালিক ও বিশেষ ধনী। লায়ন-গৃহিণী এবং তাঁর কন্যা, এঁরা দুজনেই বিবেকানন্দর চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ধর্ম মহাসভার দিনগুলিতে বিবেকানন্দের দারুণ জনপ্রিয়তার সময়ে অনেক সুন্দরী তরুণী তাঁকে সব সময় ঘিরে থাকত, তা দেখে শ্রীযুক্তা লায়ন উদ্বিগ্ন বোধ করতেন। সন্ন্যাসী হলেও বয়েসটা তো কম, এত যুবতীদের সংস্পর্শে মাথা ঘুরে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। একদিন তিনি আড়ালে ডেকে সাবধান করে দিলেন বিবেকানন্দকে।

বিবেকানন্দ হেসে বললেন, আপনি আমার মায়ের মতন, তাই আমার জন্য ভয় পাচ্ছেন। আমি এক সময় গাছতলায় শুয়ে থেকেছি, কোনও চাষার দেওয়া অন্নে জীবনধারণ করেছি। আবার এ কথাও সত্যি যে, আমিও কখনও কখনও কোনও মহারাজের বাড়িতে অতিথি হয়েছি এবং যুবতী দাসীরা ময়ূর পুচ্ছের ঝালর দেওয়া পাখায় সারারাত আমাকে বাতাস করেছে। সুতরাং প্রলোভনও আমি ঢের দেখেছি, আমাকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।

এই শিকাগোতেই তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হয়েছিল হেল পরিবারের সঙ্গে। শ্রীযুক্তা হেল প্রকৃতই বিবেকানন্দের মাতৃসমা। এঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে, ছেলেটি কাজের সূত্রে অন্যত্র থাকে। এই পরিবারেই রয়েছে শ্রীযুক্তা হেলের বোনের দুই মেয়ে, এই চারটি যুবতীই বিবেকানন্দকে খুব ভালবাসে, তিনিও এদের বোন বলে সম্বোধন করেন।

মিশনারিরা এ বাড়িতেও বেনামি চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখিয়েছিলেন, এতগুলি যুবতী মেয়ের সঙ্গে ওই লোকটাকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া একেবারেই উচিত নয়, কিছু একটা কেলেঙ্কারি ঘটে যেতে পারে।

শ্রীযুক্তা হেল চিঠিখানা অগ্রাহ্য করে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এই বাড়িই বিবেকানন্দর স্থায়ী ঠিকানা, এখানে তাঁর কিছু কিছু জিনিসপত্র রাখা থাকে, তিনি অন্য যেখানেই যান, আবার ফিরে এসে এ বাড়িতে ওঠেন। এমনই সহজ ও সাবলীল সম্পর্ক যে, বিবেকানন্দর মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি বোধহয় পূর্ব জন্মে এই পরিবারেরই কেউ ছিলেন।

বস্টনের কাছে কেমব্রিজে থাকেন শ্রীমতী ওলি বুল। ইনি একজন ধনী বিধবা, এঁর স্বামী ছিলেন নরওয়েতে প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক। কেমব্রিজের জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবীদের সমাজে প্রৌঢ়া শ্রীমতী ওলি বুলের বিশেষ একটি স্থান আছে, প্রায়ই তাঁর বাড়িতে নানা বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটে, খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম উচ্চাঙ্গের আলোচনা হয়। শ্রীমতী ওলি বুল এখানে ইউরোপীয় প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। ইউরোপে অভিজাত সমাজের নারীরা শুধু সংসার বা তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন না, তাঁরা কবি-শিল্পী-বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষক হন, স্বগৃহের আসরে গুণীজনদের মাঝখানে এইসব মহিলারা মধ্যমণি হয়ে থাকেন।

শ্রীমতী ওলি বুলের বৈঠকখানায় বিবেকানন্দ কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবন দর্শনে শ্রীমতী ওলি বুল মুগ্ধ হয়ে যান, এবং বিবেকানন্দকে জানিয়ে দেন, তাঁর বাড়ির দরজা এই হিন্দু সন্ন্যাসীর জন্য সর্বদা উন্মুক্ত, বিবেকানন্দ যখন ইচ্ছে এখানে এসে থাকতে পারেন।

বেসী স্টার্জেস ও জোসেফিন ম্যাকলাউড দুই বোন। এরাও ধনী পরিবারের কন্যা, এদের বাবা-মা তাঁদের সব ছেলে-মেয়েদের নাম রেখেছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে। ইংল্যান্ডের রানির নামে বেসী, আর জোসেফিন ছিল নেপোলিয়ানের স্ত্রীর নাম। বেসীর স্বামী মারা গেছে কিছুদিন আগে, সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের ধনী শস্য ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস লেগেটের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, লেগেটও বিপত্নীক, সুতরাং দু'জনের বিবাহে বাধা নেই।

বেসীর ছোট বোন জোসেফিন ম্যাকলাউড কাকে বিয়ে করবেন, সে বিষয়ে এখনও মনস্থির করতে পারেনি। সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী ও দারুণ প্রাণোচ্ছল এই রমণীটির পাণিপ্রার্থীর অভাব নেই, জোসেফিন কারুকেই তনু-মন সঁপে দিতে পারে না। দু'একজনের সঙ্গে এনগেজমেন্ট হবার পরেও ভেঙে দিয়েছে। সব সময় তার মনে হয়, সংসার, স্বামী, পুত্র-কন্যা, সুখ-সম্ভোগ, এসবই কেমন যেন ধরাবাঁধা জীবন, এ ছাড়া কি আর কিছু নেই? যেন আড়ালে রয়েছে অন্য এক জীবন।

বেসীর ডাকনাম বেটি আর জোসেফিনের ডাকনাম জো, এই নামেই তারা বন্ধুমহলে পরিচিত। সমাজের ওপর মহলে এই দুই বোনেরই খুব সমাদর। এরা দু'জনেই কিছুদিন ফ্রান্সে কাটিয়ে এসেছে, প্যারিসের শিল্পী, লেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংস্পর্শে এসে সাংস্কৃতিক রুচি উন্নত হয়েছে। আমেরিকানরা ফরাসি সংস্কৃতি ও আদব-কায়দাকে সমীহ করে, সুতরাং তাদের চোখে এই দুই বোন অন্যদের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়া।

বেটি আর জো নিয়মিত ছবির প্রদর্শনী দেখতে যায়, কোনও কনসার্ট বা থিয়েটার বাদ দেয় না, বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তৃতাও শুনতে যায় আগ্রহের সঙ্গে। একদিন ডোরা নামে ওদের বান্ধবী স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতার আসরে নিয়ে গেল। বেটি কিংবা জো আগে এই সন্ন্যাসীর নাম শোনেনি, ছবি দেখেনি, হিন্দু ধর্মটা কী ব্যাপার তাও জানে না। নিউইয়র্কের একটি অনভিজাত পল্লীতে নিতান্তই ঘরোয়া ব্যবস্থাপনা, একটা ভাড়া করা ঘরে কয়েকখানি মাত্তর চেয়ার পাতা, মোট পনেরো-কুড়িজনেরও বসার ব্যবস্থা নেই, শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী। দু-তিনজন মাত্র পুরুষ। মনে হয়, কোনও মহিলা সমিতিই উদ্যোগ নিয়েছে। কয়েকজন মেঝেতেই বসে পড়েছে, বাইরের সিঁড়িতে কয়েকজন, দুই বোন কোনওক্রমে ঘরের মধ্যে গিয়ে মাটিতেই বসল।

একটু পরে স্বামী বিবেকানন্দ সে ঘরে ঢুকে দাঁড়ালেন এক কোণে। উজ্জ্বল কমলালেবু রঙের এক

আলখাল্লা পরা, মাথায় পাগড়ি, হাত দুটি বুকের ওপর আড়াআড়ি, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কোনও আড়ষ্টতা নেই। জো'র বুকটা ধক করে উঠল। বিদ্যুৎ ঝলকের মতন তার মনে হল, এই লোকটিই তার জীবনে এ পর্যন্ত দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ। জো-র বয়েস সাঁইত্রিশ, এই সন্ন্যাসীর বয়েস বত্রিশ।

বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা শুরু করলেন, জো'র মনে হল এঁর প্রথম বাক্যটি সত্য, দ্বিতীয় বাক্যও সত্য, তৃতীয় বাক্যও সত্য। ইনি সত্যপথদ্রষ্টা।

একটাও বাক্য বিনিময় হল না, তবু জো যেন এক ঘোরের মধ্যে রইল। বাড়িতে ফিরেও সে ঘোর কাটে না। এর পর আবার কোথায় বিবেকানন্দর বক্তৃতা আছে, সে খবর নিয়ে জো দিদিকে বলল, আমি আবার শুনতে যাব!

এরপর পরপর ছ-সাত জায়গায় বক্তৃতা শুনতে গেল ওরা। বেটি বারবার যেতে চায় না। তার অন্য ব্যস্ততাও আছে, কিন্তু জো নাছোড়বান্দা, সে যাবেই। ছোট বোনকে একা ছেড়ে দিতে পারে না, বেটিও সঙ্গে যায়। কোনওবারই এরা বক্তাকে কোনও প্রশ্নও জিজ্ঞেস করে না, আলাপও করতে চায় না। বিবেকানন্দ কয়েকটি জায়গায় এদের দেখার পর মুখ-চেনা হয়ে গেছে, নিজেই একদিন ভদ্রতাবশত এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বুঝি দুই বোন?

জো মুখ নিচু করে রইল, বেটি বলল, হ্যাঁ।

বিবেকানন্দ আবার জিজ্ঞেস করলেন, অনেক দূর থেকে আসেন বুঝি?

বেটি বলল, খুব বেশি দূর নয়, আমরা থাকি হাডসন নদীর উজানে ডব্‌স ফেরি নামে একটা জায়গায়, এখান থেকে মাইল তিরিশেক হবে!

বিবেকানন্দ বললেন, সে তো অনেক দূর! বাঃ চমৎকার!

ব্যস, এই পর্যন্ত, আর কিছু না।

জো বিবেকানন্দর সঙ্গে কথা বলে না বটে, কিন্তু বিবেকানন্দর ভাষণের প্রতিটি শব্দ সে মনে গেঁথে নিতে চায়। সব মনে রাখা সম্ভব নয়, বেদান্ত বা ভগবৎ গীতা সম্পর্কে অনেক শব্দই অপরিচিত। জো নিজের পয়সা খরচ করে একজন স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ করল, সে ওদের সঙ্গে এসে সব কিছু লিখে নেবে।

মিঃ গুডউইন অতি দক্ষ স্টেনোগ্রাফার, প্রতি মিনিটে দু'শো শব্দ লিখে নিতে পারে, সে আদালতে কাজ করে, অন্য সময় কারুও ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত হলে অনেক পয়সা নেয়। এক সপ্তাহ কাজ করার পরই গুডউইন বলল, সে এই কাজের জন্য কোনও পয়সা নেবে না। জো জিজ্ঞেস করল, সে কী! কেন? গুডউইন বলল, যদি বিবেকানন্দ নিজের জীবনটাই দান করে দিতে পারেন, তা হলে আমি কি অন্তত এইটুকুও ছাড়তে পারব না?

ফ্রান্ক লেগেট একদিন তাঁর ভাবী স্ত্রী ও হবু শ্যালিকাকে ডিনার খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ওয়ালডর্ফ হোটেলে। টেবিলে বসে লেগেট লক্ষ করলেন, দুই বোনই কেমন যেন ছটফট করছে আর মাঝে মাঝে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাচ্ছে। ঠিক আটটা বাজতেই দু'জনে উঠে দাঁড়াল, বেটি বলল, দুঃখিত, আমরা আর থাকতে পারছি না, আমাদের আর এক জায়গায় যাবার কথা আছে।

ডিনার টেবিল ছেড়ে এইভাবে হঠাৎ উঠে যাওয়াটা অসভ্যতা বলে গণ্য হতে পারে। ফরাসি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত এই দুই বোনের কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার আশা করাই যায় না। লেগেট ভ্রু কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবে, জানতে পারি কি?

বেটি বলল, একজনের বক্তৃতা শুনতে।

লেগেট আরও কৌতূহলী হয়ে বললেন, সেখানে কি আমার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব?

বেটি আর জো-র ভয় ছিল, লেগেটের মতন একজন বাস্তববাদী ব্যবসায়ী বোধহয় এক হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখে ধর্মকথা শুনতে যাবার মতন ব্যাপার পছন্দ করবেন না। সেই জন্যই আগে যে তারা অনেকবার গিয়েছে, তা বিন্দুবিসর্গ জানায়নি লেগেটকে। সেদিনকার বক্তৃতার স্থানটি ছিল ওয়ালডর্ফ হোটেলের প্রায় উল্টোদিকের এক বাড়িতে। বসার জায়গা নেই, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

লেগেট শুনলেন সম্পূর্ণ বক্তৃতা। দুই বোন বারবার তাকিয়ে দেখছে, লেগেটের মুখে কোনও বিরক্তির রেখা ফুটছে কি না!

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর লেগেট এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বিনীতভাবে বিবেকানন্দকে বললেন, আপনি যদি এক সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে ডিনার খেতে আসেন, তা হলে আমি ধন্য হব। আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

লেগেটের বাড়িতে ডিনার পার্টিতে তাঁর বন্ধু বলতে মাত্র দু'জন আমন্ত্রিত, তাঁর ভাবী স্ত্রী ও শ্যালিকা। সেখানেই বেটি আর জো-র সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় হল বিবেকানন্দর। একবার জড়তা কেটে যাবার পর দুই বোন কথার বন্যা বইয়ে দেয়। বিবেকানন্দও হাসি-ঠাট্টা-গল্প-তত্ত্বকথায় অত্যল্প কালের মধ্যেই ওদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। জো'র ধারণা, বিবেকানন্দকে সে প্রথম যেদিন দেখেছে, সেইদিনই তার নবজন্ম হয়েছে। সে বিবেকানন্দকে আর ছাড়তেই চায় না। এ বাড়িতে ঘন ঘন বিবেকানন্দর ডাক পড়তে লাগল।

এই রকম আরও অনেক রমণীই বিবেকানন্দর ভক্ত হয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগল নানাভাবে। তাঁর আহার-বাসস্থানের চিন্তা আর রইল না।

ব্যবসায়ী কম্পানির সঙ্গে বক্তৃতার চুক্তি ছিন্ন করার পরও বক্তৃতা দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না বিবেকানন্দ। অনেকেই তাঁর কথা শুনতে চায়, বন্ধুদেরও ইচ্ছে যত বেশি মানুষের কাছে সম্ভব, তিনি ভারতের আত্মিক সম্পদের কথা প্রচার করুন। তবে এখন আর টিকিট কাটার ব্যবস্থা নেই, শুভার্থীরাই কেউ হল ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা করে। দরজার কাছে একটা বাক্স রাখা থাকে, শ্রোতাদের যার যা ইচ্ছে ওর মধ্যে দিয়ে যায়। তাতেই চলে যায় দৈনন্দিন খরচ।

বিরুদ্ধপক্ষীয়রা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সমানে, বিবেকানন্দ তা নিয়ে বিচলিত না হলেও, একটা ব্যাপার তাঁর মনকে পীড়া দেয়। প্রথম থেকেই একটা অভিযোগ উঠেছে, বিবেকানন্দ লোকটি প্রকৃতপক্ষে কে? ভারতে ক'জন তাঁকে চেনে? হিন্দু ধর্মের পক্ষ নিয়ে কথা বলার তিনি কতটা অধিকারী? ভারতের কোনও পত্র-পত্রিকাতেও তো তাঁর সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। বিবেকানন্দর যারা ঘনিষ্ঠ, যারা ভক্ত, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ এই ব্যাপারটা নিয়ে কখনও কখনও সন্দেহ প্রকাশ করে।

বিবেকানন্দ মাদ্রাজে আলাসিঙ্গাকে বারবার চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তোমরা ওখানে একটা সভা ডেকে আমার কার্যাবলি সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করে এখানে কিছু সংবাদপত্রে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তার অনুলিপি পাঠাও। কলকাতার গুরুভাইদের কাছেও সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতে যে আঠারো মাসে বছর! বিবেকানন্দ চিঠির পর চিঠি লিখছেন, তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। অবশ্য বিবেকানন্দর প্রতি আলাসিঙ্গার আনুগত্য তুলনাহীন। ব্যবস্থাপনায় দেরি হলেও মাদ্রাজে একটি জনসমাবেশে বিবেকানন্দকে সমর্থন জানানো হল। তারপর আরও দুটি সভা হল কুম্ভকোনম ও বাঙ্গালোরে। রামনাদের রাজা এই তরুণ সন্ন্যাসীর কীর্তিকে প্রশংসা করে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখলেন। খেতড়ির রাজা অজিত সিং স্বামীজির ভক্ত ও বন্ধু, তিনি দরবার ডেকে স্বামীজির আমেরিকা-বিজয়ের কাহিনী ঘোষণা করলেন এবং সকলের সহর্ষ অনুমোদনের কথা জানিয়ে দিলেন বিবেকানন্দকে।

কলকাতাতেও টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল বিবেকানন্দর সংবর্ধনা সভা। সভাটি এক হিসেবে অভূতপূর্ব, কারণ এর আগে রাজা-মহারাজা কিংবা ইংরেজ রাজপুরুষদেরই সভা ডেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে, এক তরুণ সন্ন্যাসীকে এভাবে নাগরিক সংবর্ধনা আগে কখনও জানানো হয়নি। সভাপতিত্ব করলেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। আরও অনেক রাজা-মহারাজা, জজ-ব্যরিস্টার, তর্কবাগীশ-ন্যায়রত্ন, সমাজের মাথা মাথা ব্যক্তিরা উপস্থিত। এদের মধ্যে প্রায় কেউই আগে কখনও বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় জানতেন না, কিন্তু এ দেশেরই একটি ছেলে সুদূর আমেরিকায় গিয়ে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ধ্বজা উড়িয়েছেন প্রবল বিক্রমে, এই সংবাদ জেনে তাঁরা অভিভূত। খ্রিস্টান বা মুসলমানদের মতন হিন্দুদের কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা নেই, একক অভিযানে

গিয়েছেন বিবেকানন্দ।

যথা সময়ে এই সব সভা-সমিতির সংবাদ আমেরিকায় পৌঁছল। ভারতের সংবাদপত্রে এই সভাগুলির বিবরণ ছাপা হলে জনসাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দের কৃতিত্বের কথা প্রচারিত হল। আমেরিকাতেও অনেকে বুঝে গেল, এই মানুষটি ভারতের প্রতিনিধি হবার যোগ্য, সমালোচকদেরও মুখ বন্ধ হল খানিকটা।

ফ্রাঙ্ক লেগেটের একটি বাগানবাড়ি আছে নিউ হ্যামপশায়ারে, সেখানে তিনি বেটি আর জো-কে সঙ্গে নিয়ে ছুটি কাটাতে যাবেন কয়েকদিনের জন্য, দুই বোনের ইচ্ছে, স্বামীজিকেও আমন্ত্রণ জানানো হোক।

একটা হ্রদ, তার চতুর্দিকে ঘন সবুজ অরণ্য, পটভূমিকায় পাহাড়ের সারি। সেই স্থানের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন বিবেকানন্দ। কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই, আর কোনও মানুষজনের দেখা পাওয়া যায় না। এই স্নিগ্ধ নির্জনতায় বিবেকানন্দর ক্লান্ত শরীর ও মস্তিষ্ক বহুদিন পর জুড়িয়ে গেল।

সুদৃশ্য একটি কাঠের দোতলা বাড়ি সমেত এত বড় সম্পত্তি, তবু লেগেট বিনয় করে এর নাম দিয়েছেন, 'মাছ ধরার তাঁবু'। এখানে এসে লেগেট ব্যবসা ও টাকা পয়সার চিন্তা ভুলে একটা ছিপ নিয়ে হ্রদের ধারে বসে সারাদিন মাছ ধরার চেষ্টায় কাটিয়ে দেন। বিবেকানন্দ দুই বোনকে নিয়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়ান, কখনও একটা ক্ষুদ্র নৌকো নিয়ে ভেসে পড়েন হ্রদের জলে, তিনি নিজেই দাঁড় বাইতে পারেন, কলকাতায় হেদোর পুকুরে তাঁর নৌকো চালানোর অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লেগে যায়। কখনও ওদের তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করে শোনান। কিছু না বুঝলেও জো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ শুনতে ভালবাসে, সেই শব্দ ঝংকার তার হৃদয়তন্ত্রীতেও যেন টং টং করে বাজে।

দুই বোন নানা রকম নতুন নতুন রান্না করে বিবেকানন্দকে খাওয়ায়। নারীদের যত্নের আধিক্যে ইদানীং তিনি বেশ মোটা হয়ে গেছেন, তাঁর ওজন প্রায় দু'মণ। তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি, তাই মেদস্ফীতি তেমন বোঝা যায় না।

একদিন সকালবেলা বিবেকানন্দ একখানা বই হাতে নিয়ে নিজের ঘর ছেড়ে বাগানের দিকে যাচ্ছেন, জো জিজ্ঞেস করল, স্বামীজি, কোথায় চললেন? একটু পরেই যে ব্রেকফাস্ট দেবে।

বিবেকানন্দ আঙুল তুলে বললেন, জো, আমি ওই পাইন গাছটার তলায় বসে কিছুক্ষণ 'গীতা' পাঠ করব। ব্রেকফাস্ট তৈরি হলে আমায় ডেকো। আজ অনেক কিছু খাওয়াবে তো?

বিবেকানন্দ গিয়ে বসলেন পাইন গাছটার নীচে, জো চলে গেল রান্নাঘরে তদারকি করতে। একটুক্ষণ 'গীতা' পাঠ করলেন তিনি, তারপর এক সময় মনে হল, এ দেশে কী করছি আমি? কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম? সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় কত রকম অনিশ্চয়তা ছিল, তারপর এ দেশে এসে যেমন প্রচুর সম্মান, ভালবাসা, স্নেহ, যত্ন পেয়েছি, তেমনি কত বাধা, কত অপমান, কত গ্লানি সইতে হয়েছে। নাপিতের দোকানে পয়সা দিয়ে চুল কাটতে গেছি, তারা ঢুকতে দেয়নি, আবার কত মানুষ অযাচিতভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত, ঘূর্ণিবায়ুর মতন পার হয়ে এলাম কত শহর-জনপদ। এ দেশের মানুষ বেদান্তের বাণী আগে শোনেইনি, এখন কিছু কিছু নারী-পুরুষ বুঝতে শুরু করেছে, তবু আমি এই যে পাগলের মতন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি, এতে সত্যিই কি পরমার্থ সাধিত হবে?

তিনি আরও ভাবতে লাগলেন, এই জীবনের পরিণতি কোথায়! সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম পরিব্রাজক হয়েই কাটিয়ে দেব সারাজীবন, কিন্তু এ দেশে এসে বিভিন্ন পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। মানুষের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন পথে সেই মুক্তি? এ দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখে বারবার মনে পড়ে ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন, হতভাগ্য মানুষের কথা। মনে পড়ে কোন পথে তাদের মুক্তি? ক্ষুধার্ত মানুষের অন্নের ব্যবস্থা না করে তাকে ধর্মকথা শোনানোও পাপ। আমার স্থান এখানে নয়, স্বদেশে। দুঃখী, বঞ্চিত মানুষদের সেবা করাই পরম ধর্ম। শুধু সেবা নয়, সেই মানুষগুলোকে জাগাতে হবে, তারা মানুষ

হিসেবে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার দাবি করবে...

কিছুক্ষণ পর জো বিবেকানন্দকে ডাকতে এসে আঁতকে উঠল। পাইন গাছে ঠেস দিয়ে একেবারে নিস্পন্দের মতন বসে আছেন স্বামীজি। বইখানা পড়ে গেছে হাত থেকে, আলখাল্লার বুকের কাছটা ভিজে গেছে তাঁর চোখের জলে। আরও কাছে গিয়ে জো-র মনে হল, স্বামীজির নিশ্বাস পড়ছে না, বুকে কোনও স্পন্দন নেই।

দৌড়ে গিয়ে সে লেগেটকে বলল, স্বামীজি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বেটি তাই শুনে শুরু করে দিল কান্না। তিনজনে পাইন গাছের কাছে এসে বিবেকানন্দকে একই অবস্থায় দেখতে পেল। সত্যিই মনে হয়, ওই শরীরে প্রাণ নেই। দু হাতে মুখ ঢেকে জো আর বেটি বসে পড়ল মাটিতে। লেগেট বললেন, উনি আমাদের ভাব-সমাধির কথা বলেছিলেন, এটা সে রকম কিছু নয় তো ? একবার শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে দেখব ?

জো আর্ত চিৎকার করে বলল, না, না!

সে একবার স্বামীজির মুখে শুনেছিল, কারুর ভাব-সমাধি হলে তখন তাকে স্পর্শ করতে নেই।

একটু পরে সেই নিস্পন্দ শরীরে যেন সামান্য প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। নিশ্বাস পড়তে লাগল আস্তে আস্তে। অর্ধ নিমীলিত চক্ষু আর একটু উন্মুক্ত হল। মৃদু, খুবই মৃদু স্বরে তিনি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, আমি কে ? আমি কোথায় ?

তিনবার এই রকম বলে তিনি আচ্ছন্নের মতন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তিনি দেখতে পেলেন সামনে তিনটি পাংশু মুখ।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা অমন করে চেয়ে আছ কেন ? কী হয়েছে ?

জো কেঁদে উঠে আপ্লুত স্বরে বলল, স্বামীজি! স্বামীজি! আমরা এত ভয় পেয়েছিলাম!

বিবেকানন্দ বললেন, ইস, আমি দুঃখিত। তোমাদের ভয় দেখাতে চাইনি, কিন্তু কী করব, আমার চেতনা মাঝে মাঝেই সীমা ডিঙিয়ে যাচ্ছে। তবে একটা কথা জেনে রাখো, আমি আমার দেহটা এ দেশে ফেলে রেখে যাব না।

একটু থেমে তিনি আবার হেসে বললেন, কই গো, ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়েছে ? বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে। চলো, চলো, খাবার টেবিলে চলো।

২০

রবিকে আবার জমিদারির কাজ তদারকির জন্য শিলাইদহে যেতে হবে, তার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। তাঁর স্ত্রী সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে না নিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হয়েছে। মৃণালিনী আবার সন্তান-সম্ভবা। তার গর্ভে রবির পঞ্চম সন্তান।

রথী ধরে বসে আছে, সে এবার বাবার সঙ্গে যাবেই। রথীর যদিও খুব ইচ্ছে ছিল দার্জিলিং বেড়ানোর, বিবিদিদির কাছে দার্জিলিং-এর অনেক গল্প শুনে পাহাড় দেখার খুব আগ্রহ তার, কিন্তু বাবামশাইকে যেতেই হবে শিলাইদহে। তা সেখানে গিয়ে নদীবক্ষে বজরায় বাস করাও কম আকর্ষণীয় নয়।

সকালবেলা রবি খাজাঞ্চিখানায় বসে শিলাইদহ-পতিসরের খাজনা পত্র আদায়ের হিসেব বুঝে নিচ্ছেন। এমন সময় এক ভৃত্য এসে খবর দিল মহিম ঠাকুর নামে এক ব্যক্তি তাঁর দর্শনপ্রার্থী। কাজ ফেলে রবি ব্যস্ত হয়ে চলে এলেন বৈঠকখানায়।

উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে মহিম বলল, রবিবাবু, আমি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের

দূত হয়ে এসেছি।

রবি খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললেন, মহারাজ এখনও কলকাতায় আছেন ? শুনেছিলাম যেন তিনি ফিরে গেছেন ত্রিপুরায়।

মহিম বলল, মহারাজ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই ফেরা হয়নি। এখন ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য। ত্রিপুরায় রাজকার্যের কিছু জটিলতাও আছে, সেখানে গেলে তিনি আবার উত্তেজিত হয়ে পড়বেন, চিকিৎসকরা সেটাও চান না। তাই কিছুদিনের জন্য মহারাজকে কার্শিয়াং নিয়ে গিয়ে রাখা হবে ঠিক হয়েছে।

রবি বললেন, কার্শিয়াং অতি উত্তম জায়গা। সেখানকার শোভার কোনও তুলনা হয় না।

মহিম বলল, মহারাজের আন্তরিক অভিপ্রায়, এ যাত্রায় আপনি যদি তাঁর সঙ্গী হন। মহারাজ বারবার বলেন, রবীন্দ্রবাবুর গান শুনলে তাঁর মস্তিষ্ক জুড়িয়ে যায়। রেলের কামরা রিজার্ভ করা আছে, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

রবি বললেন, মহারাজ আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন, সে জন্য আমি ধন্য বোধ করি। এমন আমন্ত্রণ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমাকে যে পূর্ববঙ্গে যেতে হবে, সব ঠিক হয়ে আছে।

মহিম বলল, মহারাজ আরও জানিয়েছেন যে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সংকলন প্রস্তুত করার ব্যাপারে যে প্রস্তাব উঠেছিল, ওখানে বসে তিনি সেই আলোচনা পাকাপাকি সেরে ফেলতে চান। একটি উন্নত ধরনের বাংলা প্রেস স্থাপনের খুব ইচ্ছে তাঁর, এ বিষয়েও আপনার পরামর্শ দরকার।

রবি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। জমিদারি তো রয়েইছে, তার কাজ পরেও করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সংকলন প্রকাশের শখ তাঁর অনেক দিনের। এর প্রকাশনা ব্যয়বহুল, মহারাজের সাহায্য পেলে অনেক সুবিধে হবে। একটি উন্নত, আধুনিক বাংলা প্রেসেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মহারাজ চান রবির সমগ্র রচনাবলীর একটি শোভন সংস্করণ ছাপা হোক।

কিন্তু শিলাইদহ যাত্রা বাতিল করতে গেলে পিতার অনুমতি নিতে হবে। তিনি আছেন চুঁচড়োয়। তিনি অনুমতি দেবেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। জমিদারির কাজে অবহেলা প্রদর্শন করলে তিনি বিরক্ত হন। এই কারণে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।

একমাত্র উপায় আছে, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে আর্জি পেশ করা। তিনি যদি রবির বদলে তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন, তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়।

মহিমকে বসিয়ে রেখে রবি দ্রুত উঠে এলেন বড়দাদার মহলে।

সাদা ও কালো রঙের চক মেলানো পাথরের বারান্দায় একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া হয়ে রয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। কার্পেট বা মাদুর পাতা নেই, খালি ঠাণ্ডা মেঝেই তাঁর পছন্দ। তিনি গরম সহ্য করতে পারেন না বলে বাড়িতে অধিকাংশ সময়ই গায়ে জামা রাখেন না। শুধু ধুতি পরা, মাথার চুল অবিন্যস্ত, হাতে আলবোলার নল। তাঁর সামনে ছড়ানো তিনখানা বই ও অনেক কাগজপত্র। আপনভোলা এই মানুষটি সব সময় লেখা কিংবা পড়া নিয়েই থাকেন। তবে কোনও একটা বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারেন না। একটা বই খানিক পড়তে পড়তে শুরু করেন আর একটা বই। একটা লেখা অসমাপ্ত রেখে বসে যান অন্য লেখায়। তাঁর লেখা ছাপা হল কিনা কিংবা কেউ পড়ল কিনা, তা নিয়েও মাথাব্যথা নেই। কখনও বাতাসে তাঁর লেখা কাগজ উড়ে যায় অনেক দূরে, তিনি সেই দিকে তাকিয়ে হাসেন। উঠে গিয়ে কাগজটা কুড়িয়ে আনতেও তাঁর আলস্য।

রবি তাঁর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসতেই তিনি সকৌতুকে বললেন, বাংলা সাহিত্য গগনের মেঘনাদ, না, এটা ঠিক হল না, সাহিত্য রণক্ষেত্রের তরুণ সব্যসাচীর হঠাৎ এই গুহাবাসীর নিকট আগমনের কারণ ? ওহে ভ্রাতঃ, আর যাই বলো, টাকা-পয়সা চেয়ো না যেন। আমার ভাঁড়ে মা ভবানী। সে প্রয়োজন থাকলে সত্যপ্রসাদকে ধরো, সতু আমাদের ব্যাঙ্কার।

রবি তাঁর বক্তব্য নিবেদন করলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অট্টহাসি করে উঠে বললেন, তুই বাঁচালি আমাকে রবি! এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। দিপুটা আমার ওপর বড্ড খবরদারি করে। সব সময় বলে, বাবা, আপনি এটা খাবেন না, ওটা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, কী মুশকিল বল তো! ইচ্ছে মতন খেতেও পারব না? দিপুকে কিছুদিনের জন্য বাইরে সরিয়ে দিলে তো আমারই উপকার হবে রে। কিন্তু এখনও বৃষ্টি বাদলা নামেনি, এই সময়ে তুই পাহাড়ে যাবি কেন? তোরা এত পাহাড়ে যাস, সেখানে গিয়ে কী আনন্দ পাস? পাহাড় মোটেই সুবিধের জায়গা নয়, অতখানি পথ ঠেঙিয়ে যেতে হয়, যখন তখন পদস্খলন হতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একেবারেই ভ্রমণ বিলাসী নন, তাঁকে অনেক বলে বলেও বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না। তিনি ভ্রমণ কাহিনী পড়েন, মানস-ভ্রমণেই তাঁর আনন্দ। ভ্রমণের জন্য শারীরিক পরিশ্রম তাঁর ঘোর অপছন্দ।

পাহাড় সম্পর্কে তিনি নানা কথা বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, এক গ্রাম্য কবি পাহাড় সম্পর্কে ঠিক আমার মনের কথাটা লিখে গেছেন, শুনবি?

কী যে সুখ পাহাড়ে থাকা
বিলোড় আর পিপ্‌সে জোকা
বিছানায় কুটকি পোকা
লাফায় তিড়িং তিড়িং
বলে গোঁসাই হারাধনে
তোরা দার্জিলিঙে এলি কেনে
সদাই করে সেখেনে
শীতে মার্গ সিড়িঙ সিড়িঙ

শেষ পঙ্‌ক্তিটি শুনে রবি মাথা নিচু করলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ হাসতে লাগলেন আপন মনে। তাঁর হাসি থামলে রবি জানালেন ত্রিপুরার মহারাজের আমন্ত্রণের কথা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন, তবে তো যেতেই হবে, রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে...এই ধরনের কী যেন লিখে গেছেন না মাইকেল? রাজা-মহারাজা বলে কথা। ফিরে এসে আমায় গল্প বলিস!

রথীর মহা আহ্লাদ, শেষ পর্যন্ত পাহাড়েই যাওয়া হচ্ছে, যেন তার ইচ্ছের জোরেই এটা হল। কিন্তু মুশকিল হল বিবিকে নিয়ে। মহিমকে রবি জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সপুত্রক যাবেন, বিকেলবেলা বিবি এসে সব শুনে বলল, রবিকা, আমায় নিয়ে যাবে না? আমি মহারাজকে দেখব।

রবি সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। বিবির কোনও আবদার, উপরোধ ঠেলতে পারেন না তিনি। নিজের উদ্যোগে গেলে বিবিকে তিনি অবশ্যই নিয়ে যেতেন, কিন্তু অন্যের আমন্ত্রণ, সেখানে তিনি রথীকে নিয়ে যাচ্ছেন এই তো যথেষ্ট, আরও কারুর জন্য কি বলা যায়? তা ছাড়া বিবি এখন পূর্ণ যুবতী, তার শয়নের জন্য পৃথক ঘরের প্রয়োজন। মহিমের কাছে তিনি জেনেছেন, মহারাজের সঙ্গে এবারে তাঁর রানিরা কেউ নেই। একা বিবির জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতে হবে।

বিবি আয়ত চক্ষু মেলে উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছে, রবি দুর্বল কণ্ঠে বললেন, না রে, বিবি, তোকে এ বার নিতে পারছি না। আমরা আর একবার...

বিবির দু চোখে অশ্রুবিন্দু এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে রবির পিঠে কিল মারতে মারতে ধরা গলায় বলতে লাগল, যাও, যত দিন ইচ্ছে গিয়ে থাকো, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না, কোনওদিন কথা বলব না—

দৌড়ে চলে গেল সে, আর ডাকাডাকি করেও ফেরানো গেল না। এ বারের অন্যরকম ভ্রমণের আকর্ষণে রবি যে-উদ্দীপনা অনুভব করছিলেন, তার মধ্যে পড়ল একটা বিষাদের রেখা। ইদানীং রবির হাত দিয়ে বেরুচ্ছে ছোট ছোট সনেটের আকারের কবিতা। কার্শিয়াং যাত্রার আগের রাত্রে লিখলেন:

ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদূর দেশে
কিসের করিস চিন্তা বসি পথ শেষে
কোন্ দুঃখে কাঁদে প্রাণ। কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধ নেত্র মেলি। কার কথা শুনে
মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে...

কার্শিয়াঙে এ বার আগে আগেই শীত পড়ে গেছে জব্বর। সেই সঙ্গে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বাড়ি থেকে বেরুবার উপায় নেই, ঘরের মধ্যেও আগুন জ্বেলে বসতে হয়। রথীর সমবয়েসী কেউ নেই, সে বেচারি ঘরের মধ্যে ছটফট করে। পাহাড়ের দেশে এসেও বৃষ্টি আর কুয়াশার জন্য পাহাড় দেখাই যায় না। অবশ্য মহিম তাকে কথা দিয়েছে, বৃষ্টি একটু ধরলেই তাকে দার্জিলিং ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হবে।

প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ওপরতলার বড় ঘরটিতে গান-বাজনা ও গল্পের আসর বসে। মহারাজের ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক ও আন্তরিক, তবু তাঁর সামনে রবি কিছুতেই সহজ হতে পারেন না। রাজতন্ত্র সম্পর্কে রবির মনে যেন একটা রোমান্টিক মোহ আছে। চোখের সামনে যিনি বসে আছেন, তাঁকেই রবি দেখেন ইতিহাস ও রূপকথা মিশ্রিত এক আদর্শ রাজা হিসেবে। যে রাজা স্বার্থশূন্য, দেশপ্রেমিক, প্রজার মঙ্গলের জন্য নিবেদিত-প্রাণ, আবার তিনিই কাব্য-শিল্প-সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। বীরচন্দ্র মাণিক্যের চরিত্রে এ রকম কিছু কিছু গুণ আছে অবশ্যই। কিন্তু রবি তাঁর কল্পনার নেত্রে যে-মহান্ রাজাকে দেখতে পান, সেই রাজা আর এই বাস্তবের মানুষটি এক হতে পারেন না।

গান গাওয়ার ব্যাপারে রবির কোনও সঙ্কোচ নেই, বড় বড় সভা-সমিতিতে, কংগ্রেসের অধিবেশনেও তিনি গান করেন। কিন্তু মহারাজের সামনে গান গাইতে বসলেই তিনি কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যান। যেন বিশাল এক রাজদরবারে তিনি সভা-গায়ক। আকবরের দরবারে তানসেন। এ রকম ভাবলেই সঙ্কোচ এসে যায়।

মহারাজের মতন এমন মুগ্ধ শ্রোতা অবশ্য খুবই দুর্লভ। কার্শিয়াঙে এসে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এই ভিজে আবহাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছে না, কিন্তু রোগের কষ্টের কোনও চিহ্ন তাঁর মুখে ফোটে না। তামাক খেতে খেতে সোজা হয়ে বসে তিনি একাগ্র হয়ে গান শোনেন, এক এক সময় তামাক টানতেও ভুলে যান। গানের প্রতিটি শব্দ তিনি বুঝে নিতে চান বলে, একই গান গাইতে বলেন বারবার।

উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দ রাতি
বিকশিয়া তোমার আনন্দ মুখ ভাতি
সভা-মাঝে তুমি আজ বিরাজো হে রাজরাজ
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি...

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, রবিবাবু, কাল যে গানটি গেয়েছিলেন, 'মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ', তাতে বলেছিলেন বিশ্বরাজ, আর এ গানটিতে আছে রাজ রাজ, এ দুইয়ের মধ্যে তফাত আছে কি কিছু?

রবি বললেন, না, অর্থ একই। তবে একই শব্দ বারবার ব্যবহার না করে ভিন্ন শব্দ বসালে ভাল হয়।

মহারাজ বললেন, আর একটি গান গেয়েছিলেন, 'আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয় মাঝারে', তাতেও আছে, 'তোমারে বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব তোমার ভেতরেই এ অভিমান...', এখানে আবার 'বিশ্বরাজ' রয়েছে।

রবি চমৎকৃত হলেন। মহারাজ এত খুঁটিয়ে শোনেন এবং পদগুলি মুখস্থ রাখেন? এমন শ্রোতা পাওয়া যাবে কোথায়?

আরও একটা ব্যাপার খেয়াল হওয়ায় ঈষৎ লজ্জা বোধ করলেন রবি। মহারাজের সামনে গাইতে বসলেই সেই সব গান মনে আসে, যার মধ্যে রাজা শব্দটি আছে।

গানে গানে অনেক রাত হয়ে যায়, অসুস্থ মহারাজকে বিশ্রাম নেবার জন্য তাড়া দেয় মহিম। মহারাজ তা গ্রাহ্য না করে মহিমের গায়ে চাপড় মেরে বলেন, তুই থাম! ক' দিন বাঁচব ঠিক নেই। এ রকম সঙ্গীত সুধা পান না করে গেলে জীবনটাই ব্যর্থ হবে।

মহিম তখন রবিকে ইঙ্গিত করে গান থামাবার জন্য।

রবি এবং রথীর স্থান হয়েছে নীচের একটি প্রশস্ত ঘরে। রাত্রে আসর ভঙ্গ হবার পর মহারাজ রবিকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসেন। তাতে রবির বড় অস্বস্তি হয়, তিনি বলেন, মহারাজ, আপনি অসুস্থ শরীর নিয়ে আবার এতটা আসছেন কেন? আপনি আসবেন না।

মহারাজ সামান্য হেসে বলেন, রবিবাবু, পাছে অলসতা এসে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি। আমায় বাধা দেবেন না।

সকালের আসরে গানের বদলে হয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনা। এ বিষয়ে রাধারমণের জ্ঞান অসামান্য। পদাবলী সংকলনটিতে কোন কোন পদকর্তাদের রচনা নেওয়া হবে এবং বইটি কত বড় হবে, তা ঠিক হয়ে গেছে। মহারাজ বলেছেন, এ বইয়ের জন্য প্রকাশক খোঁজার দরকার নেই। তিনিই দেবেন এক লক্ষ মুদ্রা। ছাপাখানার জন্য মেশিনপত্র কেনার খরচও দেবেন তিনি, আগে একটি বাড়ি দেখতে হবে, উপযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে ম্যানেজার করা দরকার, এই সব আলোচনা হতে হতে মহারাজ হঠাৎ একদিন জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লেন।

স্থানীয় একজন চিকিৎসক এসে কিছুক্ষণের চেষ্টায় তাঁর জ্ঞান ফেরালেন বটে, কিন্তু দেখা গেল যে মহারাজের শরীর এমনই দুর্বল যে তিনি আর হাঁটতে পারছেন না। এই অবস্থায় আর কার্শিয়াং থাকা মোটেই সঙ্গত নয়। অসুস্থ মহারাজকে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে সবাই ফিরে এল কলকাতায়।

মহারাজের জীবনীশক্তি অদম্য। কলকাতার বড় ডাক্তারদের ওষুধ খেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন তিনি। কুমার রাধাকিশোর তাঁকে ত্রিপুরায় চলে আসার জন্য তার পাঠালেন, কিন্তু মহারাজ এখনই ত্রিপুরায় ফিরতে চান না, তিনি ডেকে পাঠালেন কুমার সমরেন্দ্রকে।

কার্শিয়াং থাকার সময় 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটক সম্পর্কে কথা হয়েছে অনেকবার। রবি 'বিসর্জন'-এর কিছু অংশ পাঠ করেও শুনিয়েছেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠে সেই পাঠ শুনে মহারাজ বলেছিলেন, আপনাদের ঠাকুর বাড়িতে অনেক নাটকের অভিনয় হয় শুনেছি। আমাদের ত্রিপুরার এই কাহিনীটির অভিনয় একবার হতে পারে না?

কলকাতায় ফিরে রবি ঠিক করলেন, বিসর্জন একবার মঞ্চস্থ করে মহারাজকে দেখানো উচিত। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই রাজি। দুই ভ্রাতুষ্পুত্র গগন আর অবন বেশ ছবি আঁকে, ওরা মঞ্চের সাজসজ্জা বানাতে লেগে গেল। মহড়া দিতে শুরু করে রবি নিজে নিলেন রঘুপতির ভূমিকা।

তার আগে অবশ্য বিবির মান ভাঙাতে হল। বিবি জেদ ধরে বসেছিল সে এই নাটকে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু বিবি না-থাকলে নেপথ্যে হারমোনিয়াম বাজাবে কে? বিবির আঙুলে জাদু আছে, তার স্পর্শে হারমোনিয়াম যেন কথা বলে।

আগে একবার বিসর্জন পালা অভিনীত হয়েছিল, পার্ট অনেকেরই মুখস্থ আছে। আর একবার ঝালিয়ে নিতে বেশিদিন লাগল না। ঠাকুর বাড়িতে প্রায়ই কিছু না কিছু নাটক হয়, মঞ্চ একটা তৈরিই থাকে, অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করতে তাই দেরি হল না।

মহারাজ বীরচন্দ্র সুস্থ হলেও তাঁর পা-দুটি দুর্বল হয়ে গেছে, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। কিন্তু আজ তাঁকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যেতে হবে রাজকীয় মর্যাদায়, বাইরের লোকদের তিনি কোনও রকম শারীরিক অক্ষমতা দেখাতে চান না। ওপরটা হাতির দাঁতে বাঁধানো একটা রোজউডের ছড়ি কিনে আনা হল, সেই ছড়ি হাতে নিয়ে তিনি কিছুক্ষণ হাঁটা অভ্যেস করলেন।

ঠাকুর বাড়ি তিনি পৌঁছে গেলেন অভিনয় শুরুর বেশ কিছুক্ষণ আগে। আসন গ্রহণ না করে

তিনি চলে এলেন গ্রিন রুমে। গোবিন্দ মাণিক্য, নক্ষত্র রায়দের পোশাক দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে। ঠাকুর বাড়ির নাটকে পোশাকের তেমন বাহুল্য থাকে না। রাজা-রাজড়ারাও সাধারণ পোশাক পরে, কিন্তু এ বারে কস্টিউম ড্রামা হচ্ছে, মহড়ার সময় মহিম এসে পোশাক সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে গেছে। মহারাজ তার পরেও কিছু অদল বদল করে দিচ্ছেন, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন আজ, তাঁরা প্রত্যক্ষ করবেন ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী, তাই মহারাজ কোনও রকম ত্রুটি রাখতে চান না।

অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রবিবাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি না।

মহিম বলল, ওই তো আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন।

মহারাজ ঘুরে তাকিয়েই দারুণ বিস্মিত হলেন। রঘুপতির ভূমিকায় রবি পরেছেন একটা লাল টকটকে কাপড়, উর্ধ্বাঙ্গে শুধু একটা নামাবলি জড়ানো। দীর্ঘকায় পুরুষ, চওড়া বুক যেন শ্বেতমর্মরের মূর্তির মতন, ভুরু দুটি গাঢ় করে আঁকা, চন্দন চর্চিত ললাট, মাথায় জটাজুটের পরচুলা। রবি মিটিমিটি হাসছেন, মহারাজ বললেন, একেবারে চিনতেই পারিনি।

মঞ্চে একটিই সেট। এক কোণে বেশ বড় আকারের একটি করালবদনা কালীর মৃন্ময়ী মূর্তি। সামনেই হাঁড়িকাঠ, সেখানে পুরনো রক্ত জমে আছে। মঞ্চের অন্য কোণে রাজবাড়ির অন্দর মহলের আভাস।

প্রথম দৃশ্য থেকেই নাটক জমে গেল। ক্রূর, ক্রোধী রঘুপতির ভূমিকায় রবি যেন অন্য মানুষ। শান্ত, মিষ্ট স্বরে যিনি সব সময় কথা বলেন, গলা কখনও চড়ে না, এখন তাঁর কণ্ঠেই ঘন ঘন হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

এই নাটকের বিষয়বস্তু মহারাজের মনঃপূত, তিনি নিজেও বৈষ্ণব। পশুবলি তিনি দেখতে পারেন না, জঙ্গলে গিয়ে পশু শিকারের রাজোচিত শখও তাঁর অনেকদিন ঘুচে গেছে। নাটক দেখতে দেখতে তিনি মাঝেমাঝেই ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য দর্শকদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছেন। এ নাটকের সার্থকতায় যেন তাঁরই গর্ব। তাঁর ত্রিপুরাকে প্রত্যক্ষ করছে কলকাতার মানুষ।

অভিনয় করার সময় রবির মধ্যে সত্যিই যেন রূপান্তর ঘটে যায়। তাঁর নিজেরই লেখা নাটক, এর আগেও অভিনয় করেছেন, তবু প্রতিবারই অভিনয় চলার সময় তাঁর মনে হয়, এই সব ঘটনা যেন সত্যি সত্যি এখনও ঘটছে।

জয়সিংহের আত্মহত্যার পর তিনি যখন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'জয় সিংহ! জয় সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর! এ কী সর্বনাশ করিলি রে—' তখন সমস্ত মঞ্চ যেন কেঁপে উঠল। যেন শোকে সত্যিই তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

দুটি দৃশ্যের পর, একা কালী মূর্তির সঙ্গে কথা বলছেন রঘুপতি। অভিনয় করতে করতে সাঙ্ঘাতিক উত্তেজিত হয়ে গেলেন রবি। যেন এই মাটির মূর্তিটি সত্যিই রক্তলোলুপ, জীবজগতের রক্ত পান না করলে এর তৃষ্ণা মেটে না। স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে রবি একটা বিপজ্জনক কাণ্ড করে ফেললেন।

নাটকে আছে যে গোমতী নদীতে কালী প্রতিমাকে নিক্ষেপ করা হবে। মঞ্চে তো সত্যি সত্যি তা দেখানো যায় না। আগে থেকে ঠিক ছিল যে রঘুপতিবেশী রবি কালী প্রতিমাটা তোলার ভান করবেন, সেই প্রতিমার কাঠামোর পেছনে দড়ি বাঁধা আছে, অবন আর গগন আড়াল থেকে দড়ি টেনে মূর্তিটিকে উইংসের মধ্যে নিয়ে যাবে। সংলাপ বলতে বলতে রবি ভুলে গেলেন সে কথা।

দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী।
শুনিতে কি
পাস? আছে কর্ণ? জানিস কী করেছিস?
কার রক্ত করেছিস পান? কোন পুণ্য
জীবনের?

দু হাতে মূর্তিটা ধরে নাড়া দিতে লাগলেন রবি। তারপর বললেন:

কার কাছে কাঁদিতেছি
তবে দূর, দূর, দূর ; দূর করে দাও
হৃদয় দলনী পাষাণীরে ! লঘু হোক
জগতের বক্ষ !

বলতে বলতেই অত বড় মূর্তিটাকে তুলে নিলেন শূন্যে। দর্শকরা সবাই ভয়ের শব্দ করে উঠল। রবি এমনিতেই বলশালী পুরুষ, এখন তার শরীরে যেন অসুরের শক্তি এসেছে। মূর্তিটা নিয়ে ঘুরতে লাগলেন সারা মঞ্চ। তারপর একদিকের উইংসের কোণে সেটাকে ছুঁড়ে চুরমার করে দিতে গেলেন। যেন শুধু রঘুপতির নয়, কালীমূর্তির প্রতি রবির নিজস্ব যে বিরাগ আছে সেটাই এখন প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে।

উঁচু করে ছুঁড়তে গিয়ে রবি দেখলেন, সেই উইংসের পাশে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে আছে বিবি। সে বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে চেয়ে আছে রবিকাকার দিকে। ওই মূর্তিটা আছড়ে পড়লে বিবির আর বাঁচার আশা থাকবে না। শেষ মুহূর্তে রবির চৈতন্য ফিরে এল, তিনি কেঁপে উঠলেন, দ্রুত অন্য পাশে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন সেই মূর্তি।

সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ করতালি ধ্বনিতে ফেটে পড়ল।

অভিনয়ের শেষে নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে একটি করে মোহর উপহার দিলেন মহারাজ। কিন্তু আর বেশি দেরি করলেন না, নিজেই আগে আগে গিয়ে উঠলেন জুড়ি গাড়িতে। ফেরার পথে তাঁকে গম্ভীর মনে হল।

বাড়িতে এসেও মহিম যখন উচ্ছ্বসিতভাবে নাটকটির প্রশংসা করছে, তাকে বাধা দিয়ে মহারাজ বললেন, চুপ কর ! কলকাতার লোক সব কিছু ভাল পারে, আমরা পারি না কেন ? ত্রিপুরাতে এমন নাটক হয় না কেন ? আমরা কম কীসে ?

মহিম থতমত খেয়ে বলল, আমাদের ওখানে যে চর্চা নেই। কলকাতায় এঁরা সব কিছুই অনেক আগে শুরু করেছেন।

মহারাজ আবার ধমক দিয়ে বললেন, আমাদের ওখানে চর্চা শুরু করিসনি কেন ! তোরা লেখাপড়া শিখেছিস কী কম্মে ? যা, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা !

মহারাজের মেজাজ বিগড়ে গেলে তখন আর কোনও কথা বলা চলে না। তিনি দূর হয়ে যেতে বললেও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, চলে গেলে আর বকুনি দেবেন কাকে ?

নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি আরও কয়েকবার ওই একই কথা বলতে লাগলেন। তারপর বললেন, সব ব্যবস্থা কর, আমি দু একদিনের মধ্যেই ত্রিপুরায় ফিরে যেতে চাই। আমার প্রাসাদে আমি একখানা স্টেজ বানাব। এই বিসর্জন নাটক দিয়েই শুরু হবে। কে কে পার্ট করবে ?

মহিম বলল, আজ্ঞে সে রকম লোক খুঁজলে পাওয়া যাবে।

মহারাজ বললেন, খুঁজলে পাওয়া যাবে মানে কী ? কোথায় গরু খোঁজা খুঁজবি ? নিজের দিকে চাইতে জানিস না ? তুই সাজবি জয় সিংহ। আমি রঘুপতি। রাধারমণ গোবিন্দ মাণিক্য। না, বড্ড রোগা, ওকে মানাবে না। ও মন্ত্রী হোক বরং, নরধ্বজকে দিয়ে ট্রাই করতে হবে। বাড়িতে বিসর্জন বই আছে না ? নিয়ে আয় ! দ্যাখ, রবিবাবুর চেয়ে আমি ভাল পারি কি না।

বুকে হাত বুলোতে বুলোতে মহারাজ পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। মহিম দৌড়ে গিয়ে নাটকটি নিয়ে এল। মাঝখানের একটা পৃষ্ঠা খুলে মহারাজ বললেন, আমাদের এখানে অভিনয় হবে, কলকাতার লোক দেখতে যাবে। সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের ত্রিপুরা কোনও অংশে কম নয়। এইখানটা শুনে দ্যাখ :

সত্য
কেন না বলিব ? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে ? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে
চাও, বলো...

বইটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল আগে, তারপর দুলতে দুলতে মহারাজও ঝুপ করে মুখ থুবড়ে পড়লেন মাটিতে।

মহিম ছুটে এসে দেখল, মহারাজের নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, ঠোঁটের পাশে ফেনা।

মহারাজ ফিসফিস করে বললেন, বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাকে শিগগির ত্রিপুরায় ফিরিয়ে নিয়ে চল, মহিম। নইলে আর বুঝি আমার ফেরা হবে না।

সত্যিই আর ফেরা হল না। এরপর কয়েকদিন যমে-মানুষে টানাটানি চলল। পাঁচজন বিখ্যাত চিকিৎসক পালা করে বসে রইলেন তাঁর শিয়রের পাশে। কেউই আর ভরসা দিতে পারছেন না।

মহারাজের গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনেও রবি আসতে পারলেন না। সেদিন অত বড় একটা কালীমূর্তি হ্যাঁচকা টানে তোলার জন্য তাঁর কোমরে চোট লেগে গেছে, তিনিও শয্যাশায়ী, সারা গায়ে ব্যথা।

মহারাজ আচ্ছন্ন অবস্থায় রইলেন দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে নিজের মনে কথা বলেন। তাঁর প্রথমা রানি ভানুমতীকে যেন চোখের সামনে দেখতে পান, ডাকেন তাঁর নাম ধরে। রাধাকিশোরের কাছে খবর গেছে, তিনি এখনও এসে পৌঁছতে পারেননি, কুমার সমরেন্দ্র আগেই রওনা দিয়েছিলেন বলে এসে গেছেন। তিনি পিতার পাশে বসে থাকেন। মহারাজ মাঝে মাঝে তার মাথায় হাত দিয়ে বিকারের ঘোরে বলেন, তোর মাকে কথা দিয়েছিলাম, তুই রাজা হবি। সিংহাসন ছেড়ে উঠবি না !

সতেরো দিন পর মহারাজের অবস্থার আবার খানিকটা পরিবর্তন হল। পুরো চোখ খুলে তাকালেন, নিশ্বাসও স্বাভাবিক। পাত্র-মিত্ররা উৎফুল্ল হয়ে ভাবল, মহারাজ তা হলে আবার সঙ্কট কাটিয়ে উঠবেন। কিন্তু সাহেব ডাক্তার বলে গেল, এই সময়টায় বেশি সাবধানে থাকবেন। যে কোনও মুহূর্তে বিপদ হতে পারে।

অনেকগুলি বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে মহারাজ ফলের রস খেলেন চুমুক দিয়ে। একটু তামাক খেতে চাইলেন।

মহিমকে বললেন, হ্যাঁ রে, আমি ত্রিপুরায় ফিরতে পারব না আর ? আমার জীবনে আমি অনেক সাধই মিটিয়েছি। বৃন্দাবন দর্শন করে এসেছি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করে রাজ্যে শান্তি এনেছি। পিতৃপুরুষের সিংহাসন কলঙ্কিত করিনি। আমি যে ফোটোগ্রাফগুলো তুলেছি, সেগুলো যত্ন করে রাখিস। মহিম, আমার ছোটরানি এখনও নেহাত বালিকা, দেখিস যেন তার অযত্ন না হয়।

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মহিমের দিকে। তার দু চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। একটু পরে তিনি আবার ধরা গলায় বললেন, শুধু দুটো অতৃপ্তি রয়ে গেল, যদি ত্রিপুরার মাটিতে শুয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারতাম... আর, আর, সেই যে দাসীটি, কী যেন নাম, শুয়ে শুয়ে তার গান শুনতে চেয়েছিলাম, সে কিছুতেই রাজি হল না, আমি কী দোষ করেছি ? তোরা তাকে আনতে পারলি না

মহিমের চোখে জল এসে গেল। তখনই সে ছুটে গেল অর্ধেন্দুশেখরের কাছে।

এমারাল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থায় অর্ধেন্দুশেখর আপাতত বেকার হয়ে বসে আছেন বাড়িতে। নয়নমণিকে দু তিনটে থিয়েটার থেকে ডাকাডাকি করলেও সে কোনওটিতেই যোগ দেয়নি এখনও পর্যন্ত।

অর্ধেন্দুশেখরকে সঙ্গে নিয়ে মহিম এল নয়নমণির বাড়িতে। দুজনে মিলে তাকে বোঝাতে লাগল, টাকাপয়সা কিংবা জোর জবরদস্তির প্রশ্ন নয়, একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছা কি সে পূরণ করতে পারে না ? মুমূর্ষু অবস্থাতেও মহারাজ নয়নমণির কথা মনে রেখেছেন, তার গান শুনতে চেয়েছেন। অত বড় মানুষটা কাঁদছেন এ জন্য।

এ বারে আর নয়নমণি না বলতে পারল না। একটা গরদের শাড়ি পরে সে ওদের সঙ্গে গিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠল।

মহারাজের নিশ্বাস আবার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু নয়নমণিকে দেখে তাঁর মুখখানি যেন

আলোকিত হয়ে উঠল। স্পষ্ট খুশির ভাব দেখা দিল তাঁর ওষ্ঠে। রাজা-রাজড়ার জেদ, এক নারীর সান্নিধ্য তিনি চেয়েছিলেন, তাকে না পেয়ে তিনি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছিলেন না।

মহারাজকে প্রণাম করে নয়নমণি বসল তাঁর মাথার কাছে একটা চেয়ারে।

মহারাজ ফিসফিস করে বললেন, যখন তোমাকে চেয়েছিলাম, তখন তুমি যদি আসতে, তা হলে হয়তো আমি বেঁচে থাকতাম আরও অনেকদিন। তুমি কেন চলে গিয়েছিলে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার এখন সময় নয়। নয়নমণি বলল, কী গান শোনাব?

মহারাজ বললেন, তুমি বেঁচে থাকো, ভূমিসুতা। তুমি সুখী হও। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে টের পাচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছে হয় সেই গান শোনাও।

নয়নমণি হাত জোড় করে গান ধরল :

দেখ সখী মোহন মধুর সুবেশং
চন্দ্রক চারু মুকুতাফলমণ্ডিত
অলি কুসুমায়িত কেশং
তরুণ অরুণ করুণাময় লোচন
মনসিজ তাপ বিনাশং...

পুরো গানটি শেষ হল না, তার আগেই ডুকরে উঠল মহিম।

মহারাজের শেষ সময়েও রবি উপস্থিত থাকতে পারেননি, সেই সময় তাঁর স্ত্রীর প্রসববেদনা উঠেছিল। পরদিন মৃণালিনী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। পুত্র মুখ দর্শন করার পর তিনি দ্রুত রওনা দিলেন। কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে মহীশূরের রাজার দাহকার্যের পর যে স্থানটি আলাদা করে ঘিরে রাখা হয়েছে, সেখানে সাজানো হচ্ছে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের চিতা। রবি মৃতদেহের বুকের ওপর একটি ফুলের স্তবক রাখলেন। একটা কথা বারবার তাঁর মনে হতে লাগল, মানুষ কত কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যায়!

২১

বিয়ের ঠিক দেড় বছর পর মহিলামণির ক্রোড়ে একটি পুত্র সন্তান এল। সে রাত্রে ভরত একা একা অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। বাড়ির উঠোনে বানানো হয়েছে আঁতুড় ঘর। প্রসববেদনা ওঠার পর মহিলামণিকে সে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়ার পরেও ভরতের আসন্ন-পিতৃত্ব সম্পর্কে কোনও অনুভূতি হয়নি। সে মহিলামণি সম্পর্কেই চিন্তিত ছিল। একজন দাই নিযুক্ত করা হয়েছিল আগে থেকেই, দুজন প্রতিবেশিনীও কয়েকদিন ধরে মহিলামণিকে সাহায্য করছিল নানাভাবে। মহিলামণি যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, সেই সময় বৃষ্টি নামল হঠাৎ। দরমা ও কঞ্চি দিয়ে বানানো অস্থায়ী আঁতুড় ঘর। বৃষ্টির তোড় বাড়লে ভেতরে জল পড়বে, তাই নিয়ে ভরতের দারুণ উৎকণ্ঠা। আঁতুড় ঘরে পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষেধ, বাইরে সে ছটফট করতে লাগল, বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল অকারণে।

তারপর একসময় শোনা গেল ট্যাঁ ট্যাঁ করে একটি অচেনা প্রাণীর কান্নার শব্দ। অনেকটা রাতপাখির ডাকের মতন। পৃথিবীতে এল একজন নতুন মানুষ। সব মানুষই প্রথমে কাঁদতে কাঁদতে ভূমি স্পর্শ করে।

কিছুক্ষণ পরে দাই যখন কোলে করে দরজার কাছে এনে কাপড়ে জড়ানো শিশুটিকে এনে দেখাল, ভরত প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারল না। মধ্যবয়স্কা দাইটি কলকল করে কত কথাই বলে যাচ্ছে, ভরত কিছুই শুনছে না। একটি মানুষের সে জন্ম দিয়েছে, এটা এখনও যেন তার কাছে

অবিশ্বাস্য। সে এখন পিতা!

মহিলামণিকে আরও তিনদিন আঁতুড় ঘরে থাকতে হবে। ভরত তার কাছে যেতে পারবে না। সৌভাগ্যক্রমে বৃষ্টিও ধরে গেল একটু পরেই।

বাড়ির মধ্যে এসে মহিলামণির ঠাকুর ঘরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভরত প্রণাম করল, তখনই তার চোখে এল অশ্রু। হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন, অশেষ করুণাময় ঈশ্বর এই দম্পতিকে একটি সন্তান উপহার দিয়েছেন। ভরত এতকাল তার জীবনটাকে অর্থহীন ভেবে এসেছে। নিয়তি তাকে বঞ্চনা করেছে বারবার। নিজের মাকে সে চেনে না। পিতা হিসেবে যিনি পরিচিত, তিনিই যে তার প্রকৃত জন্মদাতা তারও কোনও ঠিক নেই এবং সেই তিনিও পুত্র হিসেবে তাকে কোনও স্বীকৃতি দেননি। এ পৃথিবীতে ভরত সেই মানুষটিকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। আজ যে শিশুটি জন্মাল, সবাই জানবে ভরতই তার পিতা, ভরত তাকে বুকে জড়িয়ে রাখবে, শত ঝড়-ঝাপটা এলেও দু হাত দিয়ে আড়াল করে রাখবে তার প্রাণশিখা। নিজের জীবনে সে কখনও এক বিন্দু স্নেহ পায়নি, নিজের সন্তানের ওপর উজাড় করে দেবে বুক ভরা স্নেহ-মমতা।

ভরতের তো বেঁচে থাকারই কথা ছিল না। তার মনে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে সেই রাত্রির কথা। সমস্ত শরীর মাটিতে গাঁথা, শুধু মুণ্ডুখানি বাইরে, যে-কোনও মুহূর্তে কোনও হিংস্র জানোয়ার তাকে শেষ করে দিতে পারত। দৈবাৎ আদিবাসীরা তাকে দেখতে পেয়েছিল। সেই আদিবাসীদের কি ঠিক সেই সময় ভগবানই সেখানে পাঠিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই তাই, ঈশ্বরের করুণা ছাড়া তার পক্ষে বাঁচা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আগে তাকে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল কেন, তখন কেন ঈশ্বর বাধা দেননি? এমন নিষ্ঠুর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কোনও অপরাধ কি সে করেছিল? থাক, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করতে নেই। বারবার কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে আজ তো ঈশ্বর তাকে আশাতীত পুরস্কার দিয়েছেন। সে একজন সার্থক পুরুষ।

ভরত এখন অনেক দিক থেকেই সার্থক। ব্যাঙ্কের চাকরিতে তার পদোন্নতি হয়েছে। স্ত্রী ভাগ্যেই এই উন্নতি বলা যেতে পারে। ব্যাঙ্কের এজেন্ট ফার্গুসন সাহেব ভরতের কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। ভরত বিবাহ করেছে শুনে তিনি একদিন তাকে ডেকে বলেছিলেন, বাবু, তোমার এখন উপার্জন বৃদ্ধির প্রয়োজন আমি বুঝি। তোমাকে আমি কলকাতায় বদলি করে দিতে পারি, অথবা পুরীতে আমাদের ব্যাঙ্কের যে নতুন শাখা হচ্ছে, তুমি সেখানকার ভার নিয়ে ম্যানেজার হতে পারো।

ভরতের কলকাতা সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই, সে পুরীতে যাওয়ার প্রস্তাবই বেছে নিয়েছিল। নতুন শাখা প্রতিষ্ঠায় পরিশ্রম বেশি, তাতে তার কোনও আপত্তি নেই, কাজের মধ্যে ডুবে থাকাতে সে তৃপ্তি পায়। স্বর্গদ্বারের কাছেই একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, বাড়ির সংলগ্ন জমি রয়েছে অনেকখানি, গাছপালা বা বাগান নেই অবশ্য, কিন্তু বেশ খোলামেলা পরিবেশ। দোতলা বাড়িটি ভারী সুন্দর করে সাজিয়েছে মহিলামণি। অকালবৈধব্যের জন্য কোনওদিন পিতৃগৃহ ছেড়ে বাইরে যাওয়ার আশা ছিল না তার, ভাগ্যের এক সুমধুর মোচড়ে সে একটা নিজস্ব সংসার পেয়ে গেছে। তার রুচিবোধ সূক্ষ্ম, বেশি আসবাবপত্রে না ভরিয়েও ঘরগুলিতে সে শোভন শ্রী এনেছে, অতিথিরা এসে মুগ্ধ হয়।

বিয়ের আগে এরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল, কিন্তু ভরত সে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ছাত্র বয়েসের নাস্তিকতা বোধ তাকে কখনও ছাড়েনি। ব্রাহ্মদের উপাসনা ও উপদেশের বাহুল্য সম্পর্কে একটা গোপন তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল তার মনে। দীক্ষা নিতে সে রাজি হয়েছিল প্রয়োজনের খাতিরে। ব্রাহ্মদের সক্রিয় সমর্থন না পেলে কটক শহরে বসে বিধবাবিবাহ সম্ভব ছিল না। মহিলামণি তারপর থেকে ব্রাহ্মদের সবরকম আচার-আচরণ মেনে চলে। পুরীতে ব্রাহ্মসমাজ নেই, সে একা একাই মাঝে মাঝে উপাসনায় বসে, চক্ষু বুজে বিভোর হয়ে রবীন্দ্রবাবুর শেখানো ব্রহ্মসঙ্গীত গায়। অবশ্য একটি পৃথক ঘরে সে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহও রেখেছে, সেখানেও প্রতিদিন সকালে ফুল-জল দেয়। এই বৈপরীত্যের মধ্যে যেন কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। মহিলামণির যুক্তি এই যে, বিয়ে করেছে বলেই তো সে তার বাবা-মা, ভাই-বোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়নি,

সুতরাং বাল্যকাল থেকে সে যে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে পুজো দিয়ে এসেছে, সেটাই বা ছাড়বে কেন? আর ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে সে তার স্বামীকে পেয়েছে। সুতরাং এ ধর্মকেও শ্রদ্ধা জানাবে। নিরাকারের ভজনা ও পৌত্তলিকতার এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে।

ভরত এতদিন কোনও ধর্মেরই ধার ধারেনি। সে এখন পাক্কা সাহেবি পোশাক পরে অফিসে যায়, নইলে ম্যানেজার হিসেবে লোকে তাকে সমীহ করবে কেন? ইংরেজ কিংবা দো-আঁশলা ফিরিঙ্গিরাই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়, দিশি লোকের এই পদ পাওয়া দুর্লভ ঘটনা। বাড়িতেও লোকজন এলে ভরত পায়ে মোজা না দিয়ে কারুর সামনে বেরোয় না। মদ্যপানের প্রতি তার ঝোঁক না থাকলেও সে নৈশভোজনের সময় এক পাত্র শেরি পান করে। মহিলামণি যখন তন্ময়ভাবে ব্রহ্মসঙ্গীত গায়, সে দূরে বসে মাথা দোলায়, কিন্তু কখনও পরম ব্রহ্মের প্রসঙ্গ উঠলে সে মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলে, 'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে', আমি ব্রহ্ম বিষয়ে এর বেশি কিছু জানি না। ভরত রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনেও কোনওদিন মাথা নত করেনি।

কিন্তু সন্তানজন্মের রাতে কী যে হল তার, সে ঠাকুরঘরে শুয়ে থেকে বহুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল। হয়তো বাল্যস্মৃতি প্রবল আলোড়ন তুলেছিল তার বুকে। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে সে রাধাকৃষ্ণের নিত্য পূজা দেখেছে, রাসলীলা দেখেছে, পদাবলী কীর্তন শুনেছে, সেই সব স্মৃতি ফিরে এসেছে অকস্মাৎ। রক্তের উত্তরাধিকার সে অস্বীকার করতে পারে না। তার সন্তান তার মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছে বংশপরম্পরাবোধ।

পরদিন থেকে ভরত রীতিমতন আস্তিক হয়ে গেল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে ঠাকুরঘরে প্রণাম না সেরে জলপান করে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল মহিলামণি। শিশুটি এখন আর শুধু কাঁদে না, হাসতেও শিখেছে। দু চামচ অতি স্বচ্ছ সমুদ্রের জলের মতন তার টলটলে দুটি চোখ, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে চতুর্দিক দেখে আর হঠাৎ হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয়। ভরত ভাবে, এইটুকু অবোধ শিশু পৃথিবীর কী দেখে এমন আনন্দ পাচ্ছে? অথবা ওর মনে পড়ছে গত জন্মের কথা? প্রতিদিন এই শিশুর পরিবর্তন গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে ভরত। ক্রমশ এর নাক, চোখ, কপাল, ওষ্ঠ স্পষ্ট হচ্ছে, মুখের সেই রক্তাভ ভাবটা কেটে যাচ্ছে। তবু পুতুলের রূপ থেকে মানুষ হয়ে উঠতে যেন এখনও অনেক দেরি। ভরত দেখেছে গরুর যখন বাচ্চা হয়, বাছুরটা খানিকবাদেই লাফালাফি শুরু করে। ছাগলছানাগুলো জন্মের একদিন পরেই এদিক ওদিক ছুটে যায়। আর মানুষের বাচ্চার স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে এত সময় লাগে! দু মাস হয়ে গেল, এখনও তাদের ছেলেটিকে চিত করে মাটিতে শুইয়ে রাখলে অসহায় কচ্ছপের মতন হাত-পা ছোড়ে, নিজে নিজে উপুড় হতেও পারে না।

প্রতিবেশিনীরা এসে বলে ছেলেটির চোখ দুটি অবিকল মায়ের মতন, ঠোঁটও মায়ের মতন, কিন্তু থুতনির কাছটায় বাবার সঙ্গে খুব মিল। ভরত কিছুই বুঝতে পারে না। তার ব্যাঙ্কের ক্যাশবাবু একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিয়মিত পুজোআচ্চা করেন, তিনি একদিন দেখতে এসে বললেন, এ তো দেখছি মায়ের মুখ পেয়েছে, মাতৃমুখী সন্তান সুখী হয়, তবে এর কপাল বাবার মতন, ললাটে রাজটিকা একেবারে স্পষ্ট।

এ কথাটা শুনে ভরত চমকে উঠেছিল। কিন্তু ক্যাশবাবু পর মুহূর্তেই বললেন, এ ছেলে ভবিষ্যতে নির্ঘাত জজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট হবে। তখন ভরতের হাসি পেয়েছিল। এ যুগে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরাই রাজা!

ভরত নিজে যদিও কোনও মিল খুঁজে পায় না। কিন্তু অন্য কেউ যখন তার পুত্রের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে পিতার মিল খুঁজে পায়, তখন তা শুনে সে গুপ্তসুখ অনুভব করে।

মহিলামণি যখন দোতলার বারান্দায় বসে ছেলেকে স্তন্যপান করায় তখন ভরত মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে। সে ভাবে, তাকে কি কেউ কখনও অমনভাবে কোলে শুইয়ে বুকের দুধ খাইয়েছে? তার জননী তো তাকে জন্ম দিয়েই বিদায় নিয়েছে, তবু সে বেঁচে থাকল কী করে? কোনও রমণীর কোলে

মাথা রাখার স্মৃতি তার নেই।

একদিন শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মহিলামণিকে সেই অবস্থায় দেখে দারুণ চমকে উঠল ভরত। যেন অবিকল ভূমিসুতা! ঠিক ভূমিকম্পেরই মতন কেঁপে উঠল ভরতের বুক। তার স্ত্রীর মুখের একটা পাশের সঙ্গে ভূমিসুতার মুখের কিছুটা আদল আছে ঠিকই। কিন্তু এতখানি মিল মনে হয়নি কখনও! অথচ, বুকের জামা খোলা, একটি স্তনে সন্তানের মুখ, জননী মুখ নিচু করে চেয়ে আছে সন্তানের দিকে, এই ভঙ্গিতে ভূমিসুতাকে তো কখনও দেখেনি ভরত, তবু কেন এমন মনে হল? দু তিন বার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার চাইতেও সে ঘোর ভাঙল না, ভরত তখন সরে গেল সে জায়গা থেকে।

বিয়ের পর একাধিকবার স্ত্রীর কাছে ভূমিসুতার বৃত্তান্ত বলবে বলবে ভেবেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি ভরত। বলে ফেলতে পারলে ভরত অনেকখানি ভার মুক্ত হত। কিন্তু বলা উচিত কি না সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেনি। চিরতরে হারিয়ে গেছে ভূমিসুতা, জীবনের সে একটি লুপ্ত অধ্যায়, তার স্মৃতি আর জাগিয়ে রেখে কী হবে? মনে পড়লেই বরং অপরাধ বোধ জাগে। এমন সুখের দিনে কেন হানা দেবে সেই মুখ? মহিলামণিকে বলতে হবে, মাথার চুল যেন সে ঘুরিয়ে বুকের ওপর না আনে।

ঘুমন্ত সন্তানের মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে ভরত। শুধু কি মায়ের সঙ্গেই মুখের মিল এই শিশুর, নাকি ভূমিসুতা নাম্নী এক ভাগ্যহীনা রমণীরও কোনও ছাপ রয়েছে?

মহিলামণি ছেলেকে সোনা সোনা বলে ডাকে। কিন্তু তার তো একটা পোশাকি নামও দিতে হবে। মহিলামণি স্বামীকে বলেছে, আপনাদের আসামে পুরুষদের কেমন নাম হয়, আমি তো জানি না। আপনি সেইরকম একটি নাম দিন।

ভরত চুপ করে থাকে। এখানে সবাই জানে, ভরত এসেছে আসাম রাজ্য থেকে। তবে ভরতের জন্মদাত্রী ছিলেন আসামের রমণী, এ ছাড়া আসামের সঙ্গে ভরতের কোনও সম্পর্কই নেই, কোনওদিন সে সেখানে যায়নি। ত্রিপুরা থেকেও তাকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে। বাংলা থেকেও সে একহিসেবে বিতাড়িত। শশিভূষণ বলেছিলেন, তিনি আর কোনওদিন ভরতের মুখ দেখতে চান না। শেষ পর্যন্ত এই ওড়িশাতে এসেই সে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখানেই সে কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন। তার সন্তান হবে ওড়িশারই মানুষ।

অনেক ভেবেচিন্তে ছেলের নাম রাখা হল জগৎপতি। জগন্নাথ রাখাই প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই নামে এখানে এত মানুষ আছে যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জগন্নাথ বলে ডাকলে একসঙ্গে চার-পাঁচজন মানুষ সাড়া দেবে। জগৎপতি আর জগন্নাথের অর্থ একই। কলেজে পড়ার সময় ভরত নিজের পদবি লিখিয়েছিল সিংহ, এখন থেকে সে সিং হয়ে যাবে, ভারতের বহু রাজ্যের মানুষেরই সিং পদবি হয়; তার পুত্র হয়ে যাবে সিংদেও। জগৎপতি সিংদেও, চমৎকার!

আগে ব্যাঙ্কের সব কাজকর্ম চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভরতের দেরি হত। এখন সে পাঁচটা বাজতে না বাজতে ঝাঁপ বন্ধ করে ছুটে আসে। অফিসের কাজের মধ্যে মধ্যেও স্ত্রী ও পুত্রের মুখ মনে পড়ে শতবার। বাড়ি তাকে টানে। কটক শহরে গান বাজনা থিয়েটারের একটা সাংস্কৃতিক জীবন ছিল, পুরীতে সেরকম কিছু নেই। ভরত তার জন্য অভাবও বোধ করে না। মাঝে মাঝে সমুদ্রের সামনে বেলাভূমিতে সন্ধে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে সে বেড়ায়, ছেলে এখন কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছে, কিন্তু তার কোনও মানে বোঝা যায় না, ভরত সেইরকম অর্থহীন ভাষাতেই ছেলের সঙ্গে গল্প করে।

বাড়ি ফিরে ভরত ছেলেকে তার মায়ের কোলে দিয়ে বলে, আমার জীবনটা ভরে গেছে মণি। আমি আর কিছুই চাই না।

জগৎপতির যখন দেড় বছর বয়েস, সেই সময় কটক থেকে খবর এল যে মহিলামণির বাবা খুব অসুস্থ, তিনি একবার নাতির মুখ দেখতে চান।

মহিলামণির বাপের বাড়ির লোকেরা তার বিবাহ নিমরাজি অবস্থায় মেনে নিয়েছিল। বিধবাবিবাহ

এবং ব্রাহ্মধর্ম নেওয়ার জন্য অন্য আত্মীয়স্বজনরা রুষ্ট হয়েছিল, তাই বিয়ের পর এদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করা হয়নি। মহিলামণির দুই দাদা অবশ্য এর মধ্যে একাধিকবার এসে দেখা করে গেছে, জগৎপতির অন্নপ্রাশনের সময় কটক থেকে অনেক উপহার সামগ্রীও এসেছিল। মহিলামণির এক মাসি পুরীতেই থাকেন, সে বাড়ির সঙ্গেও আসা-যাওয়া আছে। অর্থাৎ মহিলামণির বাপের বাড়ির দিক থেকে সম্পর্কটা না-গ্রহণ, না-বর্জনের মতন।

বাবার অসুখের সংবাদ ও আমন্ত্রণ পেয়ে মহিলামণি কটকে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হল। স্ত্রী ও পুত্রকে ভরসা করে অন্য কারুর সঙ্গে পাঠানো যায় না। ভরতকে সঙ্গে যেতে হয়। কিন্তু এজেন্টের অনুমতি ছাড়া ভরতের পক্ষে হুট করে পুরী ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভরত হেড অফিসে অনুমতি চেয়ে তার পাঠাল।

এখানে কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাওয়ার মতন বিশ্বস্ত লোকেরও খুব অভাব। বিশেষত ভাগ্যধর মিশ্র নামে অধীনস্থ একজন কর্মচারী আড়ালে শত্রুতা শুরু করেছে কিছুদিন ধরে। যাদের নিয়ে সে ভরতের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকায়, তাদেরই দু-একজন ভরতকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যধর লোকটি শক্তিশালী, সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কথার জাল বিস্তার করে মানুষকে বশীভূত করতে পারে, অনেক বিষয়ে খোঁজখবর রাখে। কিন্তু ব্যাঙ্কের চাকরির পক্ষে সে অযোগ্য। ভরত লক্ষ করেছে, অনেক মানুষই জগৎসংসারে সঠিক ভূমিকাটি পায় না বলে নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। জলদস্যুদের সর্দার হলে যে-ব্যক্তিটি প্রভূত উন্নতি করতে পারত, সওদাগরি অফিসের কেরানি হিসেবে সে একেবারে ব্যর্থ। যার হওয়া উচিত ছিল যাত্রাদলের অভিনেতা, ধনী বাড়ির রান্নাঘরের পাচক হিসেবে তাকে মানাবে কেন ? উকিল হিসেবে যে সার্থক হতে পারত, ইস্কুল মাস্টার হিসেবে সে বিরক্তিকর।

ভাগ্যধরের হওয়া উচিত ছিল কোনও জমিদারির নায়েব। সে জমিদার আর প্রজা, এই দু পক্ষকেই ঘোল খাইয়ে রাখতে পারত। তার এক প্রতিপত্তিশালী কাকার সূত্রে সে এই ব্যাঙ্কের চাকরি জোগাড় করেছে। সে ইংরিজি প্রায় কিছুই জানে না, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তার আগ্রহও নেই। অঙ্কের ব্যাপারেও সে অমনোযোগী, কিন্তু নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার মতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মচারীরা ভাগ্যধরকে ভয় পায়। ভরতের প্রতি তার যেন জাতক্রোধ আছে। সামনাসামনি মিষ্টি ব্যবহার করলেও আড়ালে কটুকাটব্য করে। ভরত দু' একবার তার গুরুতর ভুল ধরে ফেলেছে। সে জন্য সে ভাগ্যধরকে বরখাস্ত করতে পারত, সে অধিকার তার আছে, কিন্তু এই বাজারে কারুর চাকরি খেতে চায় না সে। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কী, ভাগ্যধরকে সে নিজেও একটু একটু ভয় পায়।

ভরতের আশঙ্কা হল, তার অনুপস্থিতিতে ভাগ্যধর একটা বড় রকমের গোলমাল পাকাতে পারে। সহকারী ম্যানেজার দীনবন্ধু পটনায়ক অতি মৃদু স্বভাবের মানুষ। ভাগ্যধরকে যেমন নায়েব হিসেবে মানাত, তেমনই দীনবন্ধুর হওয়া উচিত ছিল কোনও পাহাড়ের গুহায় নির্জন সাধক। ভাগ্যধর ধমক ধামক দিয়ে দীনবন্ধুকে দিয়ে যে-কোনও কাজ করাতে পারে। টাকাপয়সার যদি তছরূপ হয়, ভাগ্যধর কৌশলে হয়তো সে দায়িত্ব ভরতের ঘাড়েই ফেলে দেবে। ভরতের নিজস্ব কোনও সম্পত্তিই নেই, সঞ্চয়ও নেই, সে দায় সে মেটাবে কীভাবে ? অথচ, ছুটি নিতে হলে, ব্যাঙ্কের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সে ব্যবস্থা তারই করে যাওয়া উচিত।

অনেক ভেবে-চিন্তে ভরত একদিন বিকেলবেলা ছুটির পর অন্য কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে ভাগ্যধরকে ডেকে বসাল নিজের কামরায়। ভাগ্যধর ছ' ফিটের ওপর লম্বা, জোয়ান পুরুষ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। অনবরত পান খায় বলে তার ঠোঁট সব সময় লাল, কশের পাশ দিয়ে একটু একটু রস গড়ায়। কথা বলার সময় সে সোজাসুজি, মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভরতের আবার মনে হল, ভাগ্যধর যদি হত কোনও জমিদারির নায়েব, আর সে হত প্রজা, তা হলে এরকম নায়েবের সামনে সে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকত।

ভরত বলল, ভাগ্যধরবাবু, আপনাকে আমি একটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করব, আপনি সোজাসুজি উত্তর দেবেন।

ভাগ্যধর বলল, আমি তো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে জানি না।

ভরত বলল, তা ঠিক। সেইজন্যই আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাইছি। আপনার প্রতি কি আমি কখনও কোনও অন্যায় ব্যবহার করেছি ? আপনার প্রতি কোনও অবিচার করা হয়েছে ? আপনি আমাকে পছন্দ করেন না তা জানি। কেন ? আমার চরিত্রে কোনও দোষ আছে ?

ভাগ্যধর বলল, না। আপনি সচ্চরিত্রের মানুষ, বিনয়ী, ভদ্র। এসব তো স্বীকার করতেই হবে।

ভরত বলল, আপনি আমাকে পছন্দ করেন না, একথাও তো ঠিক ?

ভাগ্যধর বলল, তা ঠিক।

ভরত বলল, জানতে পারি কি, কেন ?

ভাগ্যধর একটুক্ষণ ভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু হেসে বলল, অনেকগুলি কারণ দেখানো যায়। এককথায় উত্তর দেব ?

বলল, তাই দিন।

ভাগ্যধর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীরের মতন উত্তর ছুঁড়ে দিল, কারণ আপনি বাঙালি !

ভরত দারুণ চমকে খানিকটা পিছিয়ে এল। আর যাই হোক, এরকম উত্তর সে আশা করেনি। অস্ফুট স্বরে সে বলল, বাঙালি ? কিন্তু আমার তো জন্ম আসামে।

ভাগ্যধর বলল, তা হোক। আপনি কলকাতায় লেখাপড়া শিখেছেন, সেখানে বাঙালি বনে গেছেন। আমাদের ওড়িশার ছেলেরাও কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়ে বাঙালি সাজে। বাপ-ঠাকুরদার ধর্ম ছেড়ে ব্রেহ্ম হয়, বাংলা গান করে, বাড়িতে বাংলা পত্রিকা রাখে।

—আমি ওড়িশার মেয়ে বিয়ে করেছি, ওড়িয়া ভাষা জানি, ওড়িয়া পত্রিকাও পড়ি, তবু আমি

—দেখুন মশাই। কয়লা যেমন শতবার ধুলেও তার কালো রং ঘোচে না, তেমনই বাঙালিরা যেখানেই থাকুক, আর যে মেয়েই বিয়ে করুক, তাদের বাঙালিত্ব ঘোচে না।

—তাই ? কিন্তু শুধু বাঙালি হওয়াটাই এত দোষের কেন ?

—বাঙালিদের জন্যই তো আজ ওড়িশার এই দুর্দশা।

—ঠিক বুঝলাম না।

—আপনি বাঙালি-ভাবে চিন্তা করেন, তাই বোঝেন না। আমাদের কী আছে এখন। ওড়িয়া নামে কোনও জাত আছে, না ওড়িশা নামে কোনও রাজ্য আছে ? আমাদের সম্বলপুর জেলা জোড়া আছে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে। গঞ্জাম জেলাটা একবার গেল মধ্যপ্রদেশে, একবার গেল মাদ্রাজে। বাকি ওড়িশা গ্রাস করে নিল বাংলা। বাংলার সরকার বাংলার উন্নতির জন্য যত চিন্তা করে, ওড়িশাকে নিয়ে মাথাই ঘামায় না। আমরা পড়ে আছি অন্ধকারে।

—ভাগ্যধরবাবু, ওড়িশা টুকরো টুকরো হয়ে আছে তা জানি। কিন্তু তা কি বাঙালিরা করেছে ?

—না, তা করেনি।

—তবে বাঙালিদের দোষ দিচ্ছেন কেন ? ওড়িশাকে টুকরো টুকরো করেছে ইংরেজ সরকার। তারা ছুতো দেয়, শাসন কাজের সুবিধের জন্য। আপনারা প্রতিবাদ করতে পারেননি ? এখনও আপনারা সম্বলপুর, গঞ্জাম ছিনিয়ে আনার জন্য...

—কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব ? ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ? তা আবার হয় নাকি ? ইংরেজরা যুদ্ধে জয় করে নিয়েছে ওড়িশা, এখন তারা রাজা, এখন তারা ইচ্ছেমতন এদেশটাকে যেমন খুশি ভাগ করবে, এতে আমাদের বলার কী আছে ? নিরস্ত্র প্রজা কখনও রাজার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ জানাতে পারে ?

—এ তো ভারী অদ্ভুত কথা। তবে বাঙালিদের ওপর আপনাদের রাগ কেন ?

—তার কারণ, ইংরেজ সরকার ওড়িশাকে ছিন্নভিন্ন করে অন্ধকারে ঠেলে রেখেছে, আর বাঙালিরা তার সুযোগ নিয়েছে। আপনাদের বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর এখানে সূর্যাস্ত আইন, সেই সুযোগে একটার পর একটা জমিদারি কিনে নিচ্ছে বাঙালিরা। ডাক্তার-মোক্তার, মাস্টার-ব্যারিস্টার সব বাঙালি।

—এ তো প্রতিযোগিতার ব্যাপার। যোগ্যতার ব্যাপার। শুধু বাঙালি হলেই কি কেউ কাজ পায় ?

—প্রতিযোগিতা আবার কী মশাই ? আপনাদের ওখানে ইস্কুল-কলেজ খুলেছে, আপনারা দু পাতা ইংরিজি বেশি পড়েছেন। সেটাই যোগ্যতা হয়ে গেল ? আপনি ম্যানেজারের চেয়ারে বসেছেন, আমি কেন টেবিলের এদিকে বসে থাকব ? আপনি আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জিততে পারবেন ?

ভরতের হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। পাঞ্জা লড়ে জেতাটাই যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়, এমন কথা কে কবে শুনেছে !

ভাগ্যধর প্রায় ধমক দেবার সুরে বলল, হাসছেন কেন ? খানিকটা ইংরেজি বিদ্যা ছাড়া জীবনে আর কোন ক্ষেত্রে আপনি আমার সঙ্গে জিততে পারবেন ?

ভরত বলল, তা হয়তো ঠিক। কিন্তু ভাগ্যধরবাবু, আমি যদি আজ পদত্যাগ করি, কিংবা কম্পানি আমাকে সরিয়ে দেয়, তা হলেও কি আপনি এখানকার ম্যানেজার হতে পারবেন ? দীনবন্ধুবাবুর দাবিই বেশি।

ভাগ্যধর অম্লানবদনে বলল, দীনবন্ধুকে আমি ল্যাং মেরে ফেলে দেব !

—অর্থাৎ শুধু বাঙালি নয়, একজন ওড়িয়াও যদি আপনার মাথার ওপর থাকে, তাকেও আপনি সরিয়ে দিতে চান। কিন্তু শুধু ল্যাং মেরে কি ম্যানেজার হওয়া যায় ? ইংরিজিতে চিঠিপত্র লিখতে হবে যে !

—তলার কর্মচারীরা লিখবে, আমি সই মারব !

—ভাল করে হিসেবপত্র বোঝার ব্যাপার আছে।

—দীনবন্ধুর মতন কেউ তা বুঝবে !

—আপনি কিছু কাজ না করেও ম্যানেজার হতে চান ?

—অনেক বাঙালিকে আমি দেখেছি, কিছুই কাজ করে না। শুধু ডিগ্রির জোরে আমাদের মাথার ওপর লাঠি ঘোরায়।

ভাগ্যধর যতবার বাঙালি শব্দটা উচ্চারণ করছে, ততবারই যেন দাঁতে দাঁত ঘষছে। বাঙালি বিদ্বেষের পরিচয় আগেও পেয়েছে ভরত। কটকে থাকার সময় ফকিরমোহনবাবুর কাছেও শুনেছে শিক্ষাক্ষেত্রে ওড়িয়াদের ক্ষোভের কারণ। কিন্তু ভাগ্যধরের মতন এমন তীব্র ও উগ্র ভাব আর কারুর মধ্যে সে দেখেনি। ওড়িশার মানুষ সাধারণত বিনীত ও নম্র হয়, ভাগ্যধরের মধ্যে সে সবের নামগন্ধও নেই।

তার মনে পড়ল, পটনায় খোদাবক্স নামে এক পুলিশ অফিসার তাকে বলেছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ কীভাবে বাড়ছে। এখন সে বুঝল, শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেও বিভেদ ঘটিয়ে দেওয়া ইংরেজদের নীতি। ওড়িশার খানিকটা অংশ কেটেকুটে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় বাঙালি আর ওড়িয়াদের মধ্যে তিক্ততা বাড়তেই থাকবে। এটাই ইংরেজদের অভিপ্রায়, রাজ্য শাসনের এই ভেদনীতি বুঝতে পারলেও সাধারণ মানুষ সুযোগসন্ধানী হবেই। আসামও একসময় বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল, কুড়ি-বাইশ বছর আগে পৃথক হয়ে গেছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরটাকে আসামকে দিয়ে দেওয়া হবে, তা যদি হয় তা হলে আসামের মানুষদের সঙ্গে বাঙালিদের ঝগড়া লেগে যাবে।

ভরত বলল, ভাগ্যধরবাবু, আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভাল লাগল। এমন অকপট, স্পষ্টভাবে কেউ মনের কথা খুলে বলে না। বাঙালি বলে আপনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না। বেশ। এবার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনি যদি বাঙালি হতেন এবং এরকম একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হতেন, তা হলে কি একজন কর্মচারীর ঈর্ষার কথা শুনে চাকরি ছেড়ে দিতেন ?

ভাগ্যধর বলল, না। অবশ্যই না।

ভরত বলল, আমিও চাকরি ছাড়ছি না। সুতরাং আপনি চেষ্টা করে যাবেন কী করে আমাকে চেয়ার থেকে সরানো যায়, আমিও চেষ্টা করে যাব এই চেয়ার আঁকড়ে ধরে থাকার। আপনি

শুনেছেন নিশ্চয়ই, আমি ছুটি নিতে যাচ্ছি। কাল কটকে আর একটা তার পাঠিয়ে জানাব, আমার অনুপস্থিতিতে সমস্ত কাজের ভার থাকবে দীনবন্ধুবাবু এবং আপনার ওপর। কোনও গোলযোগ হলে সে দায়িত্ব আপনাদের দুজনকেই বহন করতে হবে। আমি ফিরে এলে পাইপয়সার হিসেব পর্যন্ত আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।

ভাগ্যধর বলল, ন্যায্য প্রস্তাব। সিংহবাবু, আমি প্রথমেই বলেছি, মানুষ হিসেবে আপনি খারাপ নন, আমার নামে হেড অফিসে এ পর্যন্ত কোনও অভিযোগ পাঠাননি, ব্যক্তিগতভাবে আপনার ওপর আমার কোনও রাগ নেই।

ভরত হেসে বলল, আমি কটক থেকে ফিরে আসি, তারপর একদিন আপনার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে দেখতে হবে।

তিনদিন পর ভরত স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কটক যাত্রা করল।

পুরী পর্যন্ত লাইন পাতা হয়নি, ট্রেন ধরতে হবে খুর্দা রোডে, সে পর্যন্ত যেতে হবে পাল্কিতে। শীত পড়েছে বেজায়। তাই তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ইদানীং খুব কম। পথের খানিকটা অংশ খুব নির্জন। অরণ্যপ্রায়, কখনও সখনও সেখানে ডাকাতের উপদ্রবের কথা শোনা যায়। তাই দুজন সশস্ত্র পাহারাদারও সঙ্গে নেওয়া হল।

চার বেহারার পাল্কিতে ভরত আর মহিলামণি বসেছে মুখোমুখি। শিশু পুত্রটি একবার বাবার কোলে একবার মায়ের কোলে যাচ্ছে। দুটো চারটে শব্দ সে এখন উচ্চারণ করতে পারে, সেই যৎকিঞ্চিৎ শব্দভাণ্ডার দিয়েই সে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে। ছেলেকে সুন্দর করে সাজিয়েছে মহিলামণি। গায়ে একটা লাল মখমলের জামা, মাথায় সাদা উলের টুপি, পায়ে সাদা মোজা, দু হাতে দুটি সোনার বালা। মহিলামণির মাথায় এখন ঘোমটা নেই, চুড়ো করে বাঁধা চুলে ফুল গোঁজা, শীতের মিষ্টি রোদে ঝলমল করছে তার ফর্সা মুখ।

দুজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছে, বিকেলের আগেই রেল স্টেশনে পৌঁছে যাবার কথা। এরই মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর কাণ্ড হল।

হঠাৎ পাল্কি বাহকরা আর্ত চিৎকার করে উঠতেই ভরত ভাবল বুঝি তারা কোনও হিংস্র জানোয়ার দেখেছে। মুখ বাড়িয়ে সে দেখতে যেতেই পাল্কিটা আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে, শোনা গেল ঠকাঠক লাঠির শব্দ। কোনওক্রমে পাল্কি থেকে বেরিয়ে এসে ভরত দেখল পাল্কি বাহকরা জঙ্গলের মধ্যে ছুটে পালাচ্ছে, তিনজন ভীষণকায় লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে পাল্কি। তাদের মধ্যে একজন একটা তলোয়ার ভরতের বুকে ঠেকিয়ে বলল, চুপ করে দাঁড়া, চ্যাঁচালে তোর গর্দান যাবে।

দিনেদুপুরে ডাকাতি ! ভরত যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। পাল্কিবাহকরা মারামারি করতে জানে না, সেটা তাদের কাজের শর্তও নয়। অস্ত্রধারী পাইক দুজনের মধ্যে একজনের পাত্তা নেই, অন্যজন মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। ভরত একবার ভাবল, এ কি ভাগ্যধরের কাজ, সে-ই ডাকাত লেলিয়ে দিয়েছে ? এইভাবে সে ভরতকে পর্যুদস্ত করতে চায় ? বিশ্বাস করা শক্ত, তবু মনে হয়।

ভরত ফ্যাকাসে গলায় বলল, আমাদের প্রাণে মেরো না। যা আছে সব নিয়ে যাও।

একজন দস্যু কর্কশ গলায় মহিলামণিকে বাইরে এসে দাঁড়াতে বলল।

মহিলামণি এক হাতে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে অন্য হাতে খুলতে লাগল শরীরের গহনা। দস্যুরা পোঁটলা-পুঁটলি সব নিল, মহিলামণির অলঙ্কার নিল, শিশুর হাত থেকে বালা দুটি খুলে নিতেও ছাড়ল না। শিশুটি এতক্ষণ কিছু বোঝেনি, এবার সে কেঁদে উঠল।

দস্যুরা শুধু অর্থ-অলঙ্কার লুট করতেই আসেনি। একজন মহিলামণির বুক থেকে সবলে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ঝোপের মধ্যে। অন্য একজন মহিলামণির এক হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল।

ভরত যেন পাথর হয়ে গেল। চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার সাময়িক সুখের সংসার। ঈশ্বর তাকে দয়া করে যা দিয়েছিলেন তাও তার ভাগ্যে সইল না। তার জীবনে এরকম বিপদ আসে বারবার। আর কারুর জীবনে তো এমন ঘটে না, শুধু তার জীবনটাই বিড়ম্বিত। এবারের বিপদটাই

চরম, এরপর আর তার বেঁচে থাকার কী মানে হয় ?

মহিলামণি আকুল আর্তনাদ করতে করতে তাকাচ্ছে ভরতের দিকে, দুজন দস্যু তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছ্যাঁচড়াতে লাগল। হঠাৎ ভরতের শরীরে যেন আবার প্রাণ ফিরে এল। সে লাফিয়ে উঠল।

যে দস্যুটি ভরতের বুকে তলোয়ার ছুঁইয়ে ছিল, সে একটু পিছিয়ে গেছে, যদিও তলোয়ার তুলে আছে। ভরত প্রাণের মায়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, লোকটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তলোয়ারটি কেড়ে নিতে সমর্থ হল। এখন যেন ভরতের শরীরে অসুরের শক্তি। সে তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, হারামজাদারা, ছাড় ওকে, আজ তোরা মরবি!

ভরত কোনওদিন অসিচালনা শিক্ষা করেনি। শারীরিকভাবে লড়াই করার প্রবৃত্তিই তার হয়নি কখনও। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ওপরে যেন মন্ত্রশক্তি ভর করেছে। সে একা তিন ডাকাতকে প্রতিহত করে যেতে লাগল, তার শরীরে কোনও আঘাত লাগছে কি না সে সম্পর্কে কোনও ভ্রূক্ষেপও করছে না। তার একটাই শপথ, স্ত্রী ও পুত্রকে রক্ষা করতে না পারলে সে আগে প্রাণ বিসর্জন দেবে। প্রত্যেকটি আঘাতের সঙ্গে সে এত জোরে চিৎকার করছে যে জীবনে সে কখনও তত উঁচে গলা তোলেনি।

যতই পরাক্রম দেখাক ভরত, তার একার পক্ষে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হত না, ডাকাতেরা অত্যন্ত বলশালী এবং হিংস্র। সৌভাগ্যক্রমে একটু পরেই আরও দুটি পাল্কি সেখানে এসে পৌঁছল, তাদের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে, তাদের দেখে ডাকাতরা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাল। ভরত তবু তাদের তাড়া করে গেল কিছু দূর। তারপর পেছন ফিরে যেই দেখল বিপদ কেটে গেছে, তখনই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

অন্য যাত্রীদের সহায়তায় রেল স্টেশনে পৌঁছতে আর কোনও অসুবিধা হল না।

এই ঘটনার পর ভরত উপলব্ধি করল, সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু নেই। প্রেমময়ী স্ত্রী কিংবা স্বাস্থ্যবান সুন্দর সন্তান পেলেও মনের মতন জীবন কাটানো সম্ভব নয়। সবসময় বিপদের জন্য সতর্ক থাকতে হয়। তাকে লড়াই করতে হবে। ভাগ্যধরের মতন মানুষই হোক আর পথের মধ্যে দস্যুদলই হোক, যে-কোনও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি না রাখলে পায়ের তলার চোরাবালির মতন দুর্ভাগ্য তাকে টেনে নেবে। ভরত ঠিক করল, কটকে গিয়ে সে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হিসেবে নিজের কাছে বন্দুক রাখার আবেদন জানাবে।

কিন্তু পরবর্তী বিপদটি অতর্কিতে এমনভাবে এল যে তার বিরুদ্ধে ভরতের লড়াই করার কোনও উপায়ই রইল না।

মহিলামণির পিত্রালয়ে দুতিন দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর বেশ সুস্থ হয়ে উঠল ভরত। এ বাড়িতে তাদের অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হয়নি। মহিলামণির পুত্র সন্তানটিকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। সে-ই মন কেড়ে নিল সকলের। মহিলামণির অসুস্থ পিতা নাতির মুখ দেখে পাঁচটি মোহর উপহার দিলেন। এ পরিবারে অনেকদিন কোনও পুত্রসন্তান জন্মায়নি।

দস্যুরা যে মহিলামণির হাত ও চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে লাঞ্ছনা করেছিল, তাতে তার শরীরের চেয়েও মনে আঘাত লেগেছে বেশি। সেই আঘাত সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তার স্বামী যে অসীম বীরত্ব দেখিয়ে তাকে রক্ষা করেছে, সে জন্য কৃতজ্ঞতার ভাষাও তার মুখে ফোটে না। সে কথা বলছেই খুব কম, যখন তখন চক্ষু দিয়ে জল গড়ায়। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ভরতের হাত তার শরীরে ছোঁয়া লাগলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভরত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, ওটা ছিল দুঃস্বপ্ন। ভুলে যাও, মণি, অমন আর কখনও হবে না। আমি বেঁচে থাকতে আর কেউ তোমাকে ছুঁতে পারবে না।

শ্বশুরবাড়িতে নিজের থাকার ইচ্ছে ছিল না ভরতের। স্ত্রী-পুত্রকে এখানে রেখে সে জজসাহেবের বাড়িতে উঠতে পারত। কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে প্রথমে এখানেই আসতে হয়েছিল। শ্যালকদের অনুরোধে থেকে যেতেই হল। বাড়ির একটেরের একটি ঘর দেওয়া হয়েছে, কোনও

অসুবিধে নেই।

মহিলামণির বাবার সঙ্কট কেটে গেছে, তিনি শয্যা ছেড়ে চলাফেরা করতে পারেন। নাতিটিকে এমন ভালবেসে ফেলেছেন যে কাছ ছাড়া করতেই চান না। ছুটি ফুরিয়ে গেলে স্ত্রী-পুত্রকে আরও কিছুদিনের জন্য এখানে রেখে ভরতকে হয়তো একাই ফিরে যেতে হবে।

ভরত পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। বিহারীলাল গুপ্তর বাড়িতে গানবাজনার আসর এখনও বসে। মহিলামণি আর আগের মতন যখন তখন আসতে পারে না। তার মনের গ্লানি এখনও কাটেনি, মুখখানি এখনও মলিন।

ভরত একদিন তার প্রাক্তন ব্যাঙ্কে কথাবার্তা বলতে গেছে, একসময় শ্বশুরবাড়ির একজন ভৃত্য হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল যে তাকে এক্ষুনি যেতে হবে, তার স্ত্রী খুব অসুস্থ।

উঠোনে স্নানের ঘরে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল মহিলামণি, তারপর আর তার জ্ঞান ফেরেনি। একজন কবিরাজ এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও জ্ঞান ফেরাতে পারেননি। দ্বিতীয় একজন কবিরাজ এসে বললেন, রোগ কঠিন, মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে গেছে।

এরপর তিনদিন কেটে গেল, মহিলামণির চেতনা ফিরল না। মৃদু হলেও নাড়ি আছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সামান্য চিহ্ন দেখে প্রাণের লক্ষণ টের পাওয়া যায়, কিন্তু চক্ষু বোজা। বাক্ রুদ্ধ। পরপর ডাক্তার কবিরাজ আসতে লাগলেন, কেউ কিছু করতে পারলেন না। সরকারি সিভিল সার্জেন এ শহরের একমাত্র ইংরেজ চিকিৎসক, তাঁকেও ডেকে আনা হল। তিনিও বিশেষ ভরসা দিতে পারলেন না, কবিরাজদের মত সমর্থন করে বললেন, মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, এখন জ্ঞান ফিরে আসা কিংবা না-আসা ওর নিয়তির ওপর নির্ভর করছে।

ভরতের প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। মহিলামণি বাঁচবে না ? মাত্র তেইশ বছর বয়েসে, সে কী এমন অপরাধ করেছে, কেন তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে ? এত মানুষ থাকতে ভরতই বা কেন সংসার রাখতে পারবে না ? ঈশ্বরের এ কী বিচার ? ভরত তার সর্বশক্তি দিয়েও মহিলামণিকে বাঁচাতে চায়, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সে কীভাবে লড়াই করবে ? মহিলামণির শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে সে এমন ব্যাকুলভাবে তার নাম ধরে ডাকতে থাকে যে অন্যরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

চিকিৎসকরা জবাব দিয়ে যাওয়ার পর ভরত বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে পুজো দিতে লাগল। চোখ বুজে, জোড় হাতে সে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ডাকে, হে ভগবান, হে মা কালী, হে মা চণ্ডী, মহিলামণিকে ফিরিয়ে দাও! আমার চাকরি যাক, আমার সংসার যাক, স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে আমি জঙ্গলে গিয়ে থাকব, আর কিছু চাই না, শুধু মহিলামণিকে বাঁচিয়ে রাখো।

কয়েকজন বলল, উদয়গিরির কাছে একটি গুহার মধ্যে থাকেন এক তান্ত্রিক, অলৌকিক শক্তিতে তিনি অনেককে বাঁচিয়ে তুলেছেন। তবে সেই তান্ত্রিকের দেখা পাওয়া যায় না সহজে। পরপর কয়েকদিন তাঁর গুহার কাছে ধর্না দিয়ে থাকতে হয়। ভরত ছুটে গেল উদয়গিরিতে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ঝরনায় স্নান করে শুধু ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে সে গুহার সামনে শুয়ে পড়ল। গুমরে গুমরে বলতে লাগল, বাঁচাও, মহিলামণিকে বাঁচাও, আমি মরি তাতেও ক্ষতি নেই, আমার সন্তানের জননীকে বাঁচিয়ে দাও! হে ভগবান, দয়া করো!

২২

কয়েকজন বন্ধু ও ভক্ত পরিবৃত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বৈঠকখানায় নানান আলোচনায় ব্যস্ত, এই সময় ভৃত্য এসে জানাল যে একজন আগন্তুক তাঁর দর্শনপ্রার্থী। সকাল থেকেই বহু ধরনের মানুষ আসে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনাতে, সুরেন্দ্রনাথ কারুকেই ফেরান না। সকলের সমস্যা দূর করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তবু মন দিয়ে শুনে দু-একটা পরামর্শ দিলেই অনেকে সান্ত্বনা পায়। সুরেন্দ্রনাথ ভৃত্যটির দিকে সম্মতিসূচক মাথা হেলালেন।

অল্প পরেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি। তার চেহারা ও পোশাকে ঠিক যেন সামঞ্জস্য নেই। বয়েস মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশ, কৃশকায় শ্যামলা রং, সারা মুখে বড় নাকটিই বেশি চোখে পড়ে, পরনে সাহেবি পোশাক, পাক্কা থ্রি পিস সুট, কিন্তু মাথায় একটি বিশাল পাগড়ি। যুবকটি হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে একটি ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল সুরেন্দ্রনাথের দিকে।

দেখলেই বোঝা যায় যে যুবকটি বাঙালি নয়, তাই সুরেন্দ্রনাথ তাকে একটি চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

লোকটি বেশ ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বসল। তারপর নম্র, শান্ত গলায় বলল, আমি একটি বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যেই আপনার কাছে এসেছি বটে, কিন্তু প্রথমত আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আমি দূর থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি একজন অসাধারণ বাগ্মী। দেশের মানুষ আপনার কাছ থেকে প্রেরণা পায়।

প্রশংসা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই ধরনের কথা প্রতিনিয়তই শুনতে পান। অনেকেই এসে এইভাবে কথা শুরু করে, তারপর ব্যক্তিগত কোনও সংকটের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে বলতে অনেকখানি সময় নিয়ে নেয়।

সুরেন্দ্রনাথ এবার ভিজিটিং কার্ডটি দেখলেন। নাম এম কে গান্ধী, তলায় লেখা বার-অ্যাট-ল। নামটি তো সম্পূর্ণ অচেনা বটেই, লোকটি একজন ব্যারিস্টার জেনেও সুরেন্দ্রনাথ কোনও আগ্রহ বোধ করলেন না। ইদানীং ব্রিফ-লেস ব্যারিস্টারের সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা বিলেতে দু-তিন বছর কাটিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসে। কোনও রকমে ইংরিজি বলতে পারা আর সাহেবি ধরনের খানা-পিনা করতে শেখাটাই ব্যারিস্টার হবার প্রধান যোগ্যতা। এই লোকটির ঠিকানা লেখা আছে নাটাল, দক্ষিণ আফ্রিকা। ও দেশে তো ভারত থেকে নিয়মিত শ্রম-দাস পাঠানো হয়, ইংরেজরা যাদের বলে কুলি। এই লোকটি তা হলে সেইসব কুলিদের ব্যারিস্টার!

কথায় কথায় গান্ধী নামে যুবকটি জানাল যে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে সেখানকার সম্পাদক।

এতেও সুরেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট বোধ করলেন না। কংগ্রেসের সংগঠন বেশ অগোছালো, বড় বড় কয়েকটি শহরে একটি করে কমিটি থাকলেও সমস্ত রাজ্যে, কিংবা জেলাস্তরে নানা রকম অব্যবস্থা। বছরে একবার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, আঞ্চলিক প্রতিনিধি সাজার জন্য অনেকে নিজ নিজ এলাকায় কংগ্রেসের শাখা গঠন করে, নিজেরাই সভাপতি, সম্পাদক বনে যায়। কংগ্রেস অধিবেশনের সময় এইসব উটকো প্রতিনিধিদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বছরের অন্য সময় এদের কোনও পাত্তাই পাওয়া যায় না।

নামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হলেও এই কংগ্রেস এখনও প্রকৃতপক্ষে সর্বভারতীয় সংস্থা হয়ে উঠতে পারেনি। বোম্বাই-কলকাতা-মাদ্রাজেই অনেকখানি সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের

বাইরে এবং অনেক দূরে, সেখানকার কংগ্রেসের শাখা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাবে।

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ গান্ধী, আপনি ঠিক কী প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন, তা বুঝতে পারলাম না তো!

গান্ধী তার কোটের পকেট থেকে একটি ছোট্ট পুস্তিকা বার করল, সেটাতে সবুজ মলাট দেওয়া। পুস্তিকাটি সুরেন্দ্রনাথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনি যদি এটা দয়া করে পড়ে দেখেন।

সুরেন্দ্রনাথ পুস্তিকাটি হাতে নিলেন বটে কিন্তু উল্টেও দেখলেন না। এক্ষুনি পড়তে হবে তার কোনও মানে নেই। তিনি গান্ধীর দিকে সরাসরি চেয়ে থেকে যেন বলতে চাইলেন, এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

গান্ধী বলল, হ্যাঁ, এবার আসল কাজের কথাটা বলি। মিঃ ব্যানার্জি, আমি একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। আপনি একটি জনসভা সংগঠনের ব্যবস্থা করুন, সেখানে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সবাইকে জানাব। সেখানকার ভারতীয়রা যে কতরকমভাবে বর্ণবৈষম্যের শিকার, কত অবিচার হয় তাদের ওপর, সে সব বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

সুরেন্দ্রনাথ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। এই পাগড়ি পরা উটকো ব্যারিস্টারটির দাবি তাঁর কাছে অনেকটা স্পর্ধার মতন শোনাল। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিশয় ব্যস্ত মানুষ, একটা কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গলি নামে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব, তা ছাড়া কংগ্রেসের অনেক কাজের ভার তাঁর ওপর, তিনি একটি অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির জন্য সভার ব্যবস্থা করতে যাবেন?

সুরেন্দ্রনাথ নীরসভাবে বললেন, আমি তো সভা সংগঠন করি না, অন্যরা সভা ডেকে অনুরোধ জানালে আমি সেখানে বক্তৃতা দিই।

গান্ধী বলল, আমি তো এখানে কারুকে চিনি না, আমার পক্ষে সভা ডাকা সম্ভব নয়। আপনি ধনামধন্য পুরুষ, সেই জন্যই আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, সভা ডাকা হলেই যে লোকে শুনতে আসবে তার কি কোনও মানে আছে?

গান্ধী বলল, আমি বোম্বাই, পুণা ও মাদ্রাজে কয়েকটি সভায় এ বিষয়ে বলেছি, লোকে মন দিয়ে শুনেছে। আমার এই পুস্তিকাটিও লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়ে দেখেছে। কলকাতার মতন একটি প্রাণবন্ত শহরের মানুষ দূরের আত্মীয়দের সম্পর্কে জানতে চাইবে না?

সুরেন্দ্রনাথ আর অসহিষ্ণুতা গোপন করতে পারলেন না। শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মিঃ গান্ধী, এ বিষয়ে আমি আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারছি না। আপনি রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জি কিংবা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, এই ধরনের ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করুন। এঁরা প্রভাবশালী ব্যক্তি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পরিচালনা করেন, এঁরা ইচ্ছে করলে সভা-টভা ডাকতে পারেন।

সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেও গান্ধী তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করল না। সে পকেট থেকে একটি নোট-বুক বার করে বলল, কী কী নাম বললেন, আমি একটু লিখে নিই? ওঁদের ঠিকানা?

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর এক সহচরের দিকে নির্দেশ করে বললেন, ওর কাছ থেকে জেনে নিন, আমি একটু ব্যস্ত আছি।

তারপর তিনি পাশ ফিরে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল গান্ধী। সে উঠেছে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে, এখান থেকে বেশ দূর, কিন্তু সে হাঁটতে ভালবাসে। না হেঁটে ঘুরলে একটা শহরকে ঠিকমতন চেনাও যায় না।

কলকাতা শহরে প্রকৃতপক্ষে এই তার প্রথম আসা। এর আগে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার সময় জাহাজ এসে ভিড়েছিল কলকাতা বন্দরে। কিন্তু সেখানে নেমেই সে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরেছিল, শহরের কিছুই দেখা হয়নি।

এবারে সে হেঁটে হেঁটে ঘুরছে এই শহরের নানান অঞ্চলে। বড় সুন্দর এই শহর, পথ-ঘাট পরিচ্ছন্ন, রাজপথের দু'ধারের বাড়িগুলির গড়ন নানারকম, ঝকঝকে রং করা, যেন নতুনের মতন।

মাঝে মাঝে উদ্যান ও জলাশয়। এত জুড়িগাড়ি সে ভারতের আর কোনও শহরে দেখেনি।

এ শহরটিকে ঠিক জনবহুল বলা যায় না। কোনও কোনও অঞ্চলে রাস্তায় বেশ কিছু পথচলতি মানুষ দেখা গেলেও কোনও কোনও অঞ্চল একেবারে ফাঁকা। অধিকাংশ বাড়ির সঙ্গে কিছুটা খালি জমি কিংবা বাগান, যেগুলি খুব বড় বাড়ি, ধনীদের প্রাসাদ, সেগুলির বাগানে বিভিন্ন মর্মরমূর্তি ও ফোয়ারা। এক-একটি রাস্তায় গিয়ে গান্ধীর চমক লেগে যায়, মনে হয় অবিকল লন্ডন শহরের মতন। এসপ্লানেডের ময়দান আর লন্ডনের হাইড পার্কও যেন একই রকম।

গান্ধীর যেখানে জন্ম, গুজরাতের সেই পোরবন্দর কলকাতা থেকে বহু দূরে, বলা যেতে পারে ভারতের দুই প্রান্তে। তবু সেখানে বসেও কলকাতার অনেক গল্প সে শুনেছে ছেলেবেলায়। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা, আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান। ব্যবসা-বাণিজ্যেও যেমন উন্নত, তেমনি কত রকম সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়েছে এখান থেকে। রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এঁদের নাম সারা ভারতে কে না জানে। বাঙালি যুবকরা কত রকম সংস্কারের বেড়ি ভেঙেছে বহু বছর আগে, তার ঢেউ সুদূর গুজরাতেও গিয়ে লেগেছে।

হাঁটতে হাঁটতে গান্ধীর মনে পড়ল তার স্কুলজীবনের কথা। হাই স্কুলে পড়তে পড়তেই তার বিয়ে হয়ে যায় এক অক্ষরজ্ঞানহীনা বালিকার সঙ্গে। তাতে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও প্রশ্ন ছিল না। কাথিয়াওয়াড়ের সামাজিক রীতিতেই বাড়ির লোকরা তার বিয়ে দিয়ে দেয়। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে সে যখন পড়তে যাচ্ছে, তখন সে রীতিমতন একজন স্বামী। সেই সময়ে তার একজন বন্ধু বাল্যবিবাহ নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত, শুধু তাই নয় গুজরাতিদের নিরামিষ খাওয়ার অভ্যেসও তার কাছে মনে হত হাস্যকর। সে বলত, মোহনদাস, নিরামিষ খাই বলেই আমরা এত দুর্বল আর আমিষাশী ইংরেজরা সবল বলেই আমাদের শাসন করে। আমাদের কবি নর্মদই তো লিখেছেন,

Behold the mighty Englishman
He rules the Indian Small
Because being a meat-eater
He is five cubits tall...

সুতরাং ইংরেজদের সমকক্ষ হতে গেলে আমাদেরও মাংস খেতে হবে, মদ্যপান করতে হবে। বাঙালি শিক্ষিতসমাজ তা কত আগেই শুরু করেছে। ইয়ং বেঙ্গল প্রকাশ্যে আহার করেছে গোমাংস, বাবার সঙ্গে এক টেবিলে বসে ঠোকাঠুকি করেছে মদের গেলাসে। সেই দৃষ্টান্তে গুজরাতেও অনেকে মদ্য-মাংস গ্রহণ করছে। বন্ধুটি বোঝাল, স্কুলের শিক্ষকরাও কেউ কেউ এখন ওসব খায়, ছাত্ররাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

সংস্কারমুক্ত হবার জন্য গান্ধী সেই বন্ধুটির কথায় উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়েছিল। নদীর ধারে একটি নির্জন জায়গায় একদিন হল সেই আধুনিকতার দীক্ষা। এর আগে গান্ধী কখনও রান্না মাংস চোখেই দেখেনি। পাউরুটি জিনিসটাও তার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। জন্মের পর থেকেই শুধু নিরামিষ খাবারে অভ্যস্ত, প্রথমবার পাউরুটি বা মাংস কিছুই তার ভাল লাগেনি, প্রায় বমি এসে গিয়েছিল, সারা রাত দুঃস্বপ্ন দেখেছে। একটা জ্যান্ত ছাগল যেন চুঁসোচুঁসি করছে পেটের মধ্যে। কিন্তু সংস্কার ভাঙার উত্তেজনায় ক্রমশ সে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, মাংস-পাউরুটি ভালই লাগতে লাগল। এক বছর ধরে সে এসব খেয়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে।

শুধু এইটুকুই নয়, বন্ধুটি তাকে নিয়ে গিয়েছিল আর এক ধাপ এগিয়ে। নৈতিকতাও তো একটা সংস্কার। বিয়ে করেছে তো কী হয়েছে, তা বলে কি অন্য রমণীর সংসর্গ উপভোগ করা যাবে না?

বন্ধুটি একদিন কিশোর গান্ধীকে নিয়ে গিয়েছিল এক বেশ্যালয়ে। সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে বন্ধুটি একা তাকে ঢুকিয়ে দিল একটি স্ত্রীলোকের ঘরে। গান্ধী ধীর পায়ে তার খাটের এক পাশে বসল। তার সারা শরীর কাঁপছে, কিন্তু লজ্জায় সে নারীটির মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। এমনিতেই সে লাজুক, তখন একটাও কথা ফুটছে না তার মুখে। নারীটি বলল, কী গো, ঘরে এসেছ, একবার আমার মুখের পানে চাও। আমিও তোমার বদনখানি একটু দেখি। মেয়েটি ছুঁতে এলে গান্ধী সরে

সরে বসে, কোনও কথাই বলে না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে মেয়েটি তাকে ঘর থেকে বার করে দেয়।

গান্ধীর ধারণা, সেদিন ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। ঈশ্বরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। তবু সেদিনের সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে গ্লানিতে তার মন ভরে যায়। বেশ্যাটির সঙ্গে তার শারীরিক সংসর্গ ঘটেনি বটে, কিন্তু সে তো স্বেচ্ছায় ওই ঘরে ঢুকে খাটে বসেছিল। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে লোভ ও কাম ছিল ঠিকই। এর পরেও আর একবার, ইংলন্ডে থাকার সময় সে আর এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বারবণিতালয়ে গিয়েছিল, সেবারেও শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি, ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু দু'বারই সে যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাও ঠিক।

গান্ধী এখন আবার সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। আধুনিকতার সঙ্গে মাছ-মাংস খাওয়ার যে কোনও সম্পর্ক নেই, তা সে বুঝেছে। তবে, আমিষ সে বর্জন করে সত্যের খাতিরে। মাংস জিনিসটা যখন তার বেশ মুখরোচক হয়ে উঠেছিল, তখনও তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করত। বাড়ির কেউ কিছু জানে না, সব কিছুই চলছিল গোপনে। কোনও দিন জানতে পেরে মা যদি সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, তা হলে সে কী উত্তর দেবে? অল্প বয়েস থেকেই গান্ধী নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, কখনও, কোনও অবস্থাতেই সে মিথ্যে কথা বলবে না। মাকেও সে মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। আর সত্য কথা স্বীকার করলে মা প্রচণ্ড আঘাত পাবেন। সেই কথা ভেবেই সে তার আমিষ-আহারের গোপন অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিল। বিলেতে যাবার সময় সে তার মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনও মদ্য পান করবে না, মাছ-মাংস স্পর্শ করবে না, কোনও রমণীর ঘনিষ্ঠ হবে না।

গান্ধীর বিলেত যাওয়াটা অনেকটা আকস্মিক।

ম্যাট্রিক পাস করার আগেই তার বাবার মৃত্যু হয়, সংসারের অবস্থাটা খারাপ হয়ে যায়। তার পিতা-পিতামহরা দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানি করেছে, কিন্তু এখন সেই পদের জন্য অনেক উমেদার। বি.এ পাস করা ছেলেরা বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান্ধী ভাবনগর কলেজে ভর্তি হয়েছে, সেখানেও শহুরে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে পিছিয়ে পড়ছে। তার ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। এই সময় তাদের এক পারিবারিক বন্ধু এসে তার মাকে বললেন, ছেলেকে সাধারণ বি এ পাস করিয়ে আজকালকার দিনে কোনও লাভ নেই। বিলেত গিয়ে বরং ব্যারিস্টার হয়ে আসুক। ব্যারিস্টারি পাস করা সহজ, বছর তিনেক থাকতে হবে, সব মিলিয়ে খরচ পড়বে বড় জোর চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। বিলেত থেকে ফিরে এসে সাহেবি আদব-কায়দায় থাকবে, তখন যে-কোনও দেশীয় রাজ্য ওকে দেওয়ানি দেবার জন্য লুফে নেবে। গান্ধীর দাদাও উৎসাহ দিলেন, কোনওক্রমে টাকার জোগাড়ও হয়ে গেল।

প্রায় একটি গ্রাম্য কিশোর হিসেবেই বিলেত গিয়েছিল গান্ধী। ইংরিজি বলতে পারে না, ঠিকমতন পোশাক পরতে জানে না। ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত কিছু কিছু গুজরাতি ব্যক্তির ঠিকানা ছিল তার কাছে। তাঁরাই প্রথম প্রথম তাকে সাহায্য করেন গুছিয়ে নিয়ে বসতে। ডাক্তার মেহতা নামে একজন তাকে শেখালেন, অন্য লোকের টুপি বা পোশাকে হাত দেবে না, লোকের সামনে হাই কিংবা ঢেকুর তুলবে না, শব্দ করে চা খাবে না, চেঁচিয়ে কথা বলবে না। আমাদের দেশের মতন প্রথম আলাপেই কারুকে কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবে না, কারুকে স্যার বলবে না ইত্যাদি।

বিলেতে কয়েক বছরেই গান্ধীর মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্তন আসে। যত্ন করে, মন দিয়ে সে ইংরিজি শেখে। পৃথিবীটাকে জানবার জন্য নানা রকম বই পড়ার আগ্রহ জন্মায়, বিলিতি পোশাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দা রপ্ত করে, এমনকী নাচতেও শেখে। ব্যারিস্টারির জন্য পড়াশুনো করতে হয় না বিশেষ, বারবার ইংরেজদের সঙ্গে খানা খেতে হয় আর সহবত শিখতে হয়, পরীক্ষায় বসলেই পাস করা যায়।

যথাসময়ে পাস করে দেশে ফিরে এল গান্ধী। ইংল্যান্ডে থাকার সময় সে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে এবং ইংরেজ জাতির ভক্ত হয়ে গেছে। তার ধারণা, ইংরেজদের শাসন ভারতের পক্ষে

বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। রাজভক্ত প্রজা হিসেবে ভারতীয়দের উচিত ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। ইংরেজদের অত্যাচারের অনেক কাহিনী সে জানে, সে নিজেও প্রত্যক্ষদর্শী বা ভুক্তভোগী, ফার্স্ট ক্লাসের ট্রেনের টিকিট কাটা সত্ত্বেও তাকে সে কামরায় বসতে দেওয়া হয়নি, দক্ষিণ আফ্রিকায় এক রাস্তায় ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অপরাধে এক ইংরেজ সেপাই তাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, তাতেও তার রাগ হয় না, সে মনে করে ওসব কিছু কিছু ইংরেজের ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষ, জাতিগত ত্রুটি নয়। অনেক জায়গায় ভারতীয়দের ওপর যে অবিচার বা পীড়ন হয়, সেগুলিও আইনের ত্রুটি বা আইনের অপপ্রয়োগ। আইনসঙ্গত পথেই তার সুরাহা করতে হবে।

গান্ধীর কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই। সে চায় ভারতবাসীরা স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার আদর্শ শিখুক, সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যকর্মকে ধর্ম জ্ঞান করুক, তা হলেই ইংরেজরা আর ভারতীয়দের নিচু চোখে দেখবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সে সাধ্যমতন এই সবই শেখাচ্ছে। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটাও সভ্যতার লক্ষণ, তাই সে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নিয়েও একটি সমিতি স্থাপন করেছে এবং সেই সমিতির অন্য কিছু নাম দেবার বদলে কংগ্রেস নামটাই নিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে মূল ভারত ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষদের তো বটেই, জননেতাদেরও বেশ ভুল ধারণা আছে। সবাই মনে করে, ওখানে বুঝি কুলি-কামিন ছাড়া আর কোনও ভারতীয় নেই। হ্যাঁ, শ্রম-দাস হিসেবেই এক সময় ভারতীয়দের ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ বুদ্ধিবলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, জমি-বাড়ি কিনেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু করেছে। কোনও কোনও ব্যবসায়ী এমনই প্রতিপত্তিশালী যে নিজস্ব জাহাজ পর্যন্ত চালায়। ইংরেজরা ভেবেছিল কুলিরা চিরকাল কুলিই থাকবে, ওখানকার আদিবাসী জুলু সম্প্রদায়কে তারা সেইভাবেই দেখতে অভ্যস্ত, ভারতীয়দের এই রকম সমৃদ্ধি, বিশেষত ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা তাদের চক্ষুশূল হয়েছে। এখন তারা নানান পাকেপ্রকারে ভারতীয়দের দমন করতে চায়, আর ভারতীয়দের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে গান্ধী প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে সবিস্তারে দরখাস্ত পাঠায় কিংবা আদালতে মামলা লড়ে। যদিও তার তরুণ বয়েস, তবু সে কখনও উত্তেজিত হয় না, তার শরীরে যেন রাগ নামে ব্যাপারটাই নেই, সে ধৈর্য ধরে ঠিকঠাক নিয়মসঙ্গত পথে অগ্রসর হয় এবং বেশ কয়েক জায়গায় সে শেষ পর্যন্ত জয়ীও হয়েছে।

এই সব বৃত্তান্তই সে এখন ভারতের নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে জানাতে চায়। সমস্ত বিষয়েই ইংরেজ সরকারের নির্দিষ্ট আইন আছে, আইনের পথেই মোকাবিলা করলে যে অনেক অধিকার আদায় করা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় তা প্রমাণিত হচ্ছে, এখানকার ভারতীয়রাই বা তা জানবে না কেন?

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজন সেরে গান্ধী আবার একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে চলল উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করা যত সহজ, রাজা-মহারাজাদের দেখা পাওয়া অত সহজ নয়। প্যারীমোহন অতিশয় ব্যস্ত মানুষ, শুধু জমিদার নন, সার্থক আইনজীবী এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্তাব্যক্তি। সেদিন দেখা হল না, বিমুখ হয়ে ফিরে এসেও নিরুদ্যম হল না গান্ধী, পরের দিন আবার গেল উত্তরপাড়ায়। প্যারীমোহন সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনলেন বটে, কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। তিনি বললেন, কেউ এসে বললেই কি হঠাৎ হুট করে মিটিং ডাকা যায়? আপনি বরং সুরেন বাড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা করুন, তিনি যদি কিছু করতে পারেন!

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও ওই একই কথা বললেন। গান্ধীর মনে হল, সুরেন্দ্রনাথের কাছে আবার ফিরে যাবার কোনও মানে হয় না। তিনি স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন। তা হলে কী উপায়?

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে একজন ইংরেজ সাংবাদিকের সঙ্গে তার আলাপ হল। লোকটির নাম এলারথর্প, লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি। বিলেত ফেরত এই ব্যারিস্টারটির সঙ্গে এই সাংবাদিকটি কথা বলার অনেক বিষয় পেয়ে গেল। এলারথর্প ওই হোটেলে লাঞ্চ খেতে এসেছিল, কিন্তু সে উঠেছে বেঙ্গল ক্লাবে। সে সেখানে গান্ধীকে নেমন্তন্ন করল পরদিন। কিন্তু হোটেল আর

ক্লাবের মধ্যে অনেক তফাত আছে। বেঙ্গল ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। এলারথর্প সরল মনে গান্ধীকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকতে যাচ্ছে, একজন এসে বলল, ওই নেটিভটিকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এলারথর্প হকচকিয়ে গিয়ে বলল, ভারতের মাটিতে এই ক্লাব, অথচ সেখানে একজন ভারতীয় ঢুকতে পারবে না, এ আবার কী অদ্ভুত নিয়ম! তা ছাড়া এই নেটিভ ভদ্রলোকটি ইউরোপীয় আদব-কায়দায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত!

কিন্তু নিয়ম হচ্ছে নিয়ম! রাগে গজগজ করতে করতে এলারথর্প বলল, ঠিক আছে, ড্রয়িং রুম বা ডাইনিং রুমে ওর প্রবেশ নিষেধ হলেও আমার ঘরে নিশ্চিত আমি যাকে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারি!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এলারথর্প বলল, এ দেশের ইংরেজগুলি দেখছি চাষা!

গান্ধী মৃদু হাসল। ইংরেজ জাতির মধ্যে যেমন বেঙ্গল ক্লাবের কর্মচারীটির মতন মাথামোটা লোক আছে, তেমনি এলারথর্পের মতন মানুষও তো আছে। সেই জন্যই তো ইংরেজ জাতির প্রতি তার কোনও বিদ্বেষ নেই।

এই এলারথর্পের সূত্রেই গান্ধীর পরিচয় হল স্থানীয় পত্রিকা দা ইংলিশম্যানের সম্পাদক মিঃ সন্ডার্সের সঙ্গে। সন্ডার্স গান্ধীর লেখা পুস্তিকাটি পড়ে ঠিক করল, সে এই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিস্টারটির একটি সাক্ষাৎকার নিজের কাগজে ছাপাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ে এখানকার পাঠকরা কিছুই জানে না। সাক্ষাৎকার নিতে নিতে সন্ডার্স মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল গান্ধীর দিকে। এই যুবকটির কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ তো বটেই, এমনকী দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কেও কিছু কিছু ভাল কথা বলে যাচ্ছে। সন্ডার্স জিজ্ঞেস করল, মিঃ গান্ধী, তুমি শ্বেতাঙ্গদের অবিচার ও অত্যাচারের কথা জানাতে গিয়ে ওদের পক্ষ নিয়েও যে বলে ফেলছ মাঝে মাঝে।

গান্ধী মুচকি হেসে বলল, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, প্রতিপক্ষের কিছু কিছু প্রশংসা করলে সহজে মামলা জেতা যায়!

ইংরেজদের কাগজে গান্ধীর বক্তব্য প্রকাশিত হবে, অথচ বাঙালিদের কাছে পাত্তা পাওয়া যাবে না? গান্ধী হাল ছাড়তে রাজি নয়। বাঙালিদের সবচেয়ে বিখ্যাত পত্রিকা অমৃতবাজার, রাস্তা থেকে কিনে পত্রিকাটি কয়েকদিন পড়েও দেখেছে গান্ধী। সে একদিন হাজির হল ওই পত্রিকা অফিসে।

অমৃতবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক মতিলাল ঘোষ কংগ্রেসের একজন পাণ্ডা এবং সারা ভারতে পরিচিত। তিনি গান্ধীর ভিজিটিং কার্ডটি নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, গান্ধী? এরকম পদবি আগে শুনিনি! আমাদের এই কাগজ ইংরিজি ভাষায় বেরোয় বটে, কিন্তু পড়ে প্রধানত বাঙালিরা। তারা তোমার ওই দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন? যে সব কুলি-কামিন আর ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছে, তারা গেছে ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে, ঠিক কি না! গুজরাতি, মারাঠি, মাদ্রাজি। বাঙালি একজনও গেছে? তুমি ওখানে একটিও বাঙালি কুলি বা ব্যবসায়ী দেখেছ?

গান্ধী স্বীকার করল, তা দেখিনি বটে!

মতিলাল বললেন, তবে? বাঙালিরা কুলিগিরিও করে না, ব্যবসাও জানে না। সবাই চাকরি চায়, আর না হলে বড়জোর মাস্টারি, ডাক্তারি, ওকালতি! তা বাপু, আমাদের এখানেই সমস্যার শেষ নেই, ওই ধাপধারা গোবিন্দপুর দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে আমাদের এখন ব্যস্ত হবার সময় কোথায়।

গান্ধী বলল, কিন্তু তারাও তো ভারতীয়। আর কংগ্রেস ভারতীয়দেরই প্রতিষ্ঠান।

মতিলাল বললেন, তা যখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হবে তখন তোমার কথা সেখানে বলতে চাও তো বোলো। এখন মিটিং-ফিটিং-এর ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গরম গরম কোনও বিষয় না থাকলে লোকে শুনতে আসবেই বা কেন?

গান্ধী বলল, আপনার কাগজেও ছাপবেন না, কোনও মিটিং-এরও ব্যবস্থা করা যাবে না?

মতিলাল বললেন, নাঃ! রাগ করলে নাকি, একটা চুরুট খাও!

গান্ধী সবিনয়ে বলল, ধন্যবাদ, আমি ধূমপান করি না।

মতিলাল নিজে একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, ওহে মোহনদাস, তুমি

বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার হয়ে হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে গেলে কেন ? অত দূরে ?

গান্ধী বলল, আমি বোম্বাই আর রাজকোটে চেম্বার খুলে বসেছিলাম। পসার জমাতে পারিনি একেবারেই। এ দেশে তো ব্যারিস্টারের অভাব নেই। আমার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হচ্ছিল। এই সময় আমার বড় ভাইয়ের মারফত দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার প্রস্তাব পাই। দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানি ওখানকার খুব বড় ব্যবসায়ী, তাদের মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকে, তারা সাহেব ব্যারিস্টার নিয়োগ করে। ঠিক ব্যারিস্টার হিসেবে নয়, আমাকে প্রায় একটি চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, প্রধানত ইংরিজিতে চিঠিপত্র লেখার কাজ। পরে অবশ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমি স্বাধীনভাবে প্র্যাক্টিস শুরু করেছি, ওখানকার অনেকের আস্থা অর্জন করেছি।

মতিলাল বললেন, ওখানে পসার বেশ ভালই জমেছে বোঝা যাচ্ছে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এসে উঠেছ, তার মানে পয়সাকড়ি ভালই করেছ। উকিল-ব্যারিস্টারি মানে কথা বেচে খাওয়া আর মিথ্যের ফুলঝুরি ছড়ানো। কথার মারপ্যাঁচে উকিলরা রাতকে দিন করে দেয়। তোমায় দেখলে তো নিরীহ ভালমানুষটি মনে হয়। তুমি কী করে পারো ?

গান্ধী রেখাহীন মুখে বলল, আমি সারা জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলিনি। আর এ পর্যন্ত একটাও মিথ্যে মামলা নিইনি। যে পক্ষ অন্যায় মামলা করতে চায়, আমি তাদের ফিরিয়ে দিই।

প্রচণ্ড শব্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন মতিলাল। হাসতে হাসতে তাঁর কাশি এসে গেল। হাত তুলে কোনওক্রমে বললেন, তুমি তো ভারী মজার মানুষ দেখছি, আর হাসিও না, হাসিও না।

ফিরে এসে গান্ধী আবার ভাবতে বসল, এর পর কার কাছে যাওয়া যায়। মুশকিল হচ্ছে, এখানে তার পরিচিত কেউ নেই। তবু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যখন সে এসেছে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার পাত্র সে নয়।

বোম্বাইয়ের নেতাদের তার কথা বোঝাতে এরকম অসুবিধে হয়নি। বোম্বাইতে সে প্রথম দেখা করেছিল বিচারপতি রানাডে এবং বিচারপতি বদরুদ্দিন তায়েবজির সঙ্গে। এঁরা তার কথা ধৈর্য ধরে শুনে বলেছিলেন, আমরা ঠিক সাহায্য করতে পারব না, তুমি স্যার ফিরোজ শা মেটার কাছে যাও। আমাদের সহানুভূতি রইল, কিন্তু ওঁর সম্মতিটা প্রথমে দরকার।

স্যার ফিরোজ শা মেটাকে লোকে বলে বোম্বাইয়ের সিংহ। কেউ কেউ বলে মুকুটহীন রাজা। দারুণ তার প্রভাব-প্রতিপত্তি। গান্ধী ভয়ে ভয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে, কিন্তু তিনি পিতার মতন স্নেহে গান্ধীকে গ্রহণ করেছিলেন এবং মিটিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বোম্বাই থেকে গান্ধী গিয়েছিল পুণায়। বাল গঙ্গাধর তিলক এখানকার প্রসিদ্ধ জননেতা। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে কিছুটা খোঁজখবরও রাখেন। তিনি গান্ধীর বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে বললেন, গান্ধী, আমি তোমার মিটিং-এর ব্যবস্থা অনায়াসে করে দিতে পারি। কিন্তু এখানে রাজনীতিতে আমার বিরুদ্ধপক্ষ যথেষ্ট আছে। আমি মিটিং-এর ব্যবস্থা করলে তুমি আমার দলের লোক হিসেবে মার্কামারা হয়ে যাবে। তাতে পরে তোমার অসুবিধে হতে পারে। তুমি তো রাজনীতির লোক নও, তুমি নিরপেক্ষ কারুকে সভাপতি করো। তুমি ভাণ্ডারকরের কাছে যাও। তিনি আপাতত কোনও দলে নেই।

ভাণ্ডারকরের কাছে যাবার আগে গান্ধী গেল অপর প্রখ্যাত নেতা গোখলের কাছে। গোখলে তখন ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ, সেই কলেজেই দেখা করতে গেল গান্ধী। আগে থেকেই গোখলের নামডাক শুনেছে গান্ধী, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে সে বিস্মিত হয়ে পড়ল। এমন শান্ত, সহৃদয় একজন মানুষ, অথচ তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে আছেন। গান্ধীর মনে হল, ফিরোজ শা মেটা যেন হিমালয়, আর তিলক যেন সমুদ্র। কিন্তু গোখলে যেন গঙ্গা নদী। হিমালয় কিংবা মহাসাগর অতিক্রম করা যায় না, কিন্তু গঙ্গা নদী সকলকেই অবগাহনের জন্য আহ্বান জানায়। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই গোখলের দারুণ ভক্ত হয়ে গেল গান্ধী।

গোখলেও পরামর্শ দিলেন ভাণ্ডারকরকে সভাপতি করার জন্য। তা হলে সব দলের লোকই

আসবে। ভাণ্ডারকর যখন শুনলেন যে তিলক আর গোখলের মতন দুই পক্ষের দুই নেতাই তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন, তখন তিনি সম্মতি জানাতে দ্বিধা করলেন না।

মহারাষ্ট্রের এই নেতাদের সুপারিশ নিয়ে মাদ্রাজে গিয়ে সভা করতেও অসুবিধে হয়নি। ওঁদের কাছ থেকেই গান্ধী কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথের নাম শুনে এসেছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কোনও আগ্রহ নেই, তা স্পষ্ট বোঝা গেছে।

কলকাতায় কয়েক দিন থাকতে থাকতে গান্ধী জানতে পারল বঙ্গবাসী নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা এখানে খুব জনপ্রিয়। পত্রিকা বেরুনো মাত্র হু হু করে কাটতি হয়ে যায়। তা হলে একবার এই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করা যাক।

বঙ্গবাসীর কার্যালয়ে গিয়ে গান্ধী বিস্মিত হয়ে গেল। প্রায় তিরিশ-বত্রিশ জন লোক সেখানে লাইন দিয়ে বসে আছে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সরকারি অফিসে যেমন লোকে যায়। দু-একজনের সঙ্গে গান্ধী কথা বলে দেখল, তাদের নানারকম ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। কারুও প্রতি পুলিশ দুর্ব্যবহার করেছে, কেউ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কারুর সন্তান নিরুদ্দিষ্ট। একজন একজন করে সম্পাদকের ঘরে যাচ্ছে আর বেরিয়ে আসছে দু-এক মিনিটের মধ্যে। এক-একবার সম্পাদকের ঘরে শোনা যাচ্ছে ক্রুদ্ধ চ্যাঁচামেচি। একবার একজন কর্মচারী এসে বলে গেল, সম্পাদকমশাই আজ আর কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। আপনারা আজ বাড়ি যান। কিন্তু কেউ ওঠার লক্ষণ দেখাল না ; সবাই বসে রইল গ্যাঁট হয়ে। গান্ধী সেই কর্মচারীটিকে নিজের কার্ড দিয়ে বলল, আমি এসেছি অনেক দূর থেকে।

প্রায় দু ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল, তবু ডাক এল না। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সম্পাদকমশাই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে, গায়ে একটি উত্তরীয় জড়ানো। গান্ধী সামনে গিয়ে বলল, মিস্টার বসু, আমি এসেছি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে—

যোগেন্দ্রচন্দ্র দু হাত ছুঁড়ে অতিষ্ঠ ভঙ্গিতে বলে উঠল, না, না, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। তোমরা কি আমাকে পাগল করে দেবে ? সবাই ভাবে, কাগজের সম্পাদক হয়েছি বলেই বুঝি আমাদের অনেক ক্ষমতা, সবার সব সমস্যা সমাধান করে দিতে পারি। আসলে আমার কোনওই ক্ষমতা নেই। কেউ কাজও করতে দেবে না। আমি কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু পারব না, তোমরা সব যাও, এখন যাও তো এখান থেকে।

গান্ধীর মতন অক্রোধীও কয়েক মুহূর্তের জন্য অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই সহানুভূতি হল সম্পাদকের জন্য। সত্যিই তো, সবাই মিলে এত জ্বালাতন করলে তিনি কাজ করবেন কী ভাবে। এত লোকের ব্যক্তিগত সমস্যা উনি শুনতে যাবেনই বা কেন ? গান্ধীর সমস্যাটা যে ব্যক্তিগত নয়, তা উনি বুঝতেও পারলেন না।

আজ আর এই সম্পাদকের কাছে যাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

বাঙালিদের মনোজগতে কি কিছুতেই প্রবেশ করা যাবে না ? দেশের রাজধানী এই কলকাতা, বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কেন্দ্র, এখানে সে সম্পূর্ণ অপরিচিতই থেকে যাবে ? বাঙালিদের নৈতিক সমর্থন পাওয়া তার পক্ষে জরুরি, কারণ ইংরেজরা বাঙালিদের মতামতের গুরুত্ব দেয়। বাঙালিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার বিশেষ কোনও উপায় আছে কী ?

এর মধ্যে গান্ধী আরও কয়েকটি নাম সংগ্রহ করেছে। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু, জানকীনাথ ঘোষাল, এঁরাও এখানকার বিশিষ্ট নেতা। এঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করতে হবে, কেউ না-কেউ তার কথা নিশ্চয়ই শুনবে।

হোটেলে ফিরে গান্ধী একটা টেলিগ্রাম পেল। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান থেকে ডাক এসেছে, 'পার্লামেন্ট শুরু হচ্ছে জানুয়ারি মাসে। আপনি এক্ষুনি ফিরে আসুন।'

মিটিং-এর ব্যবস্থা কিংবা বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ আর হল না, পরদিনই গান্ধীকে রওনা দিতে হল বোম্বাইয়ের দিকে।

২৩

সারা দিন আকাশ থমথমে হয়ে আছে। শরীর পোড়ানো গ্রীষ্ম। এই বৈশাখ মাসে এ দেশের সমস্ত মানুষের মনই যেন চাতক পক্ষী হয়ে থাকে। বারবার চক্ষু যায় আকাশের দিকে। এখন আকাশে নীলিমার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ যে-মেঘ ঢেকে আছে দিগন্ত অবধি, তাও কেমন যেন বর্ণহীন। এ রকম গরমে কর্মোদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।

রবির শীত এবং গ্রীষ্মবোধ দুই-ই যেন বেশ কম। শীতকালে যেমন তিনি খুব একটা উষ্ণ বস্ত্র অঙ্গে চাপান না, খুব গরমের সময়েও তাঁর তেমন অস্থিরতা প্রকাশ পায় না। ঘরে ঘরে টানা পাখার ব্যবস্থা আছে, ঠাকুরবাড়ির কর্তা ও গৃহিণীরা সারা দুপুর ঘরের বার হন না, রোদ্দুরের আঁচ লাগলে গাত্রবর্ণ মলিন হয়ে যাবে বলে কুমারী ও তরুণী বধূরা সব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখে, ভৃত্যেরা বাইরে বসে পাখার দড়ি টানে। রবি কিন্তু দ্বিপ্রহরেও বেরিয়ে পড়েন প্রায়ই, তাঁর ছাতার দরকার হয় না। সকালে কিংবা সন্ধের পর তিনি লিখতে বসেন তিনতলার মহলের ঢাকা বারান্দায়, সেখানে টানা-পাখার ব্যবস্থা নেই, তিনি হাতপাখাও ব্যবহার করেন না। দরদর করে সারা শরীরে ঝরতে থাকে ঘাম, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই রবির।

কোনও রাতেই রবির তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে না, বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন সেই নিস্তব্ধতা তিনি উপভোগ করেন সর্বাঙ্গ দিয়ে। সংসারের চিন্তা, বিষয় কর্মের চিন্তা যেন সম্পূর্ণ মুছে যায় মন থেকে, নদীর তরঙ্গের মতন ছুটে আসে কবিতার পঙক্তি। কোনও কোনও দিন কিছু না লিখলেও কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসে থাকতে ভাল লাগে। না-লেখা কবিতা নিয়ে খেলা করতেও যে কত আনন্দ পাওয়া যায়, তা অন্য কেউ বুঝবে না।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাধুরী আর রথী কিছুটা বড় হয়েছে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে আলাদা কক্ষ, বড় ঘরটিতে বাকি সন্তানদের নিয়ে শোয় মৃণালিনী। রাত ন'টার মধ্যে বাচ্চাদের বিছানায় পাঠাবার দৃঢ় নিয়ম আছে। ওরা অবশ্য তার পরেও খানিকটা হুটোপাটি করে তবে ঘুমোয়। তখন সেলাই নিয়ে বসে মৃণালিনী। রাতের বেলা সেলাই করা নিয়ে রবি অনেকবার নিষেধ করেছেন যদিও, মৃণালিনী শোনে না।

এ সময় স্বামীর পাশে গিয়ে বসে না মৃণালিনী, বাধা নেই কোনও, যদি যায়, গিয়ে কথা বলে, রবি ঠিকই উত্তর দেবেন, বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। তবু মৃণালিনী বুঝতে পারে, স্বামীর সেই সব কথার মধ্যে কোনও আন্তরিকতা নেই, যেন একজন অন্যমনস্ক, উদাসীন মানুষ। প্রশ্নের উত্তর দেন, নিজে থেকে কিছু বলেন না। এই স্বামী তার সন্তানদের জনক, কর্তব্যে কোনও ত্রুটি নেই, কিন্তু ওঁর মনের কাছাকাছি কিছুতেই পৌঁছোনো যায় না। মৃণালিনী লক্ষ করেছে, বাইরের লোকদের সঙ্গে রবি অতি নিখুঁত ভদ্রতা মেনে চলেন, বাড়ির মানুষের কাছেও যেন সেই লৌকিকতা ও ভদ্রতার আবরণ পুরোপুরি ঘোচে না। একমাত্র মেজো ভাসুরের মেয়ে বিবির সঙ্গেই উনি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন। এ বাড়ির অনেকেই বলে, বিবিকে উনি রাশি রাশি চিঠি লেখেন, শিলাইদহ কিংবা পতিসরে গিয়ে যখন বোটে থাকেন, তখন প্রায় প্রতি দিনই বিবির নামে একখানা করে চিঠি আসে, আর নিজের বউয়ের কাছে চিঠি আসে দু'-একখানা মাত্র দায়সারা গোছের।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম উনি রাত্তিরবেলা নিজেই কাছে ডেকে সদ্য রচিত কবিতা শোনাতেন কিংবা কোনও বইয়ের গল্প শোনাতেন। দু'একবার সেসব শুনতে শুনতে মৃণালিনীর চোখে ঢুলুনি এসেছিল, সেই তার দোষ। সারা দিন সংসারের কত রকম কাজ থাকে, চতুর্দিকে গুরুজন, বাচ্চাদের দৌরাত্ম্য সামলাতে হয়, রাত্তিরে একটু শান্ত হয়ে বসলে ঘুম আসতে পারে না বুঝি? এখন আর রবি কখন কী

লিখছেন তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন না স্ত্রীর সামনে। অথচ বিবি যদি আসে, তাকে নিয়ে যাবেন পাশের ঘরে, তখন আর দু'জনের কথা ফুরোয় না।

মৃণালিনী মেনেই নিয়েছেন, বিখ্যাত স্বামীর সেবাপরায়ণা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের জননী হয়েই তাকে থাকতে হবে, ওঁর মনোজগতে তার ঠাঁই নেই।

মৃণালিনী ঘুমিয়ে পড়ার পরেও অনেকক্ষণ জেগে থাকেন রবি। কলম খোলা, লিখছেন না কিছু। পত্র-পত্রিকার চাপ থাকলেই তাঁর মাথায় লেখা বেশি আসে। 'সাধনা'র পৃষ্ঠা ভরাবার জন্য পরপর কতকগুলো ছোট গল্প লিখে ফেললেন, সেই সঙ্গে প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, কবিতা তো আছেই। এখন 'সাধনা' বন্ধ হয়ে গেছে, লেখার কোনও তাড়া নেই। গত এক-দেড় মাস কিছুই লেখেননি। তবে দু'-একটা গান এসে যায়। একমাত্র গান রচনার ব্যাপারেই কোনও সম্পাদকীয় তাগিদের প্রয়োজন হয় না। গানের প্রথম পঙক্তিগুলি নিজেরা এসে ধরা দেয়। কথার আগে আসে সুর। দূর থেকে ভেসে আসা কোনও ফুলের সুগন্ধের মতন একটা কোনও নতুন সুর মাথার মধ্যে গুঞ্জরিত হয়, তারপর আপনি আপনিই যেন সেই সুর কথার অবয়বে ফুটে ওঠে।

মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেছে, একটা হাম্বীর সুর গুন গুন করছেন রবি। একটু পরেই সুরটাতে তেওরা তাল এসে গেল। তাল ফেরতার সঙ্গে সঙ্গে তাতে বসে গেল শব্দের ডানা, 'আরও কত দূরে আছে সে আনন্দধাম... আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি...'

হঠাৎ রবি বেশ চমকে উঠলেন, মাথার ঠিক পেছনে স্নিগ্ধ মধুর বাতাসের স্পর্শ। বাতাস এল কোথা থেকে? পরপর কয়েক দিন অসহ্য গুমোট চলছে, তবে কি ঝড় উঠল? রবি চোখে তুলে দেখলেন, বারান্দায় টবের গাছগুলোর একটা পাতাও কাঁপছে না, অন্ধকারে অদৃশ্য আকাশ, ঝড়ের আগমনের কোনও চিহ্নই নেই।

আর একবার ওরকম হাওয়া রবির চুলে যেন হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিতেই তাঁর সর্বাঙ্গে শিহরন হল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, নতুন বউঠান?

এক যুগ কেটে গেল, নতুন বউঠান চলে গেছেন। তারও আগে, সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ রবি এরকম গ্রীষ্মের দিনে ঘর্মাক্ত অবস্থায় লেখায় নিমগ্ন থাকলে কাদম্বরী চুপি চুপি পেছন দিক থেকে এসে পাখার হাওয়া করতেন, কিংবা হাত বুলিয়ে দিতেন রবির চুলে। এত বছর বাদেও সেই মনের ভুল?

জ্যোতিদাদা এ বাড়ি চিরকালের মতন ত্যাগ করার পর রবি তিনতলার এই চমৎকার মহলটি নিজে নিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম রবির এরকম মনের ভুল শুধু নয়, চোখের ভুলও হত প্রায়ই। সে নতুন বউঠানের ছায়া দেখতে পেত। ঠিক মনে হত, দরজার আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক গভীর অসুখী, অতৃপ্ত হাহাকার ভরা নারীর আত্মা যেন মৃত্যুলোক থেকে ফিরে এসে আবার শরীর ধারণ করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না, স্বচ্ছ কাচের মতন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। রবি জানতেন, এটা সত্যি নয়, তবু তার ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর একবার নতুন বউঠান দেহ ধারণ করতে পারেন না?

এখন আর রবি তা চান না। যে একেবারেই হারিয়ে গেছে, তাকে আর আঁকড়ে ধরার বৃথা চেষ্টা কেন? তা ছাড়া, ওঁর কথা তো মাসের পর মাস মনেও পড়ে না। এই রবি তো আগেকার সেই রবি নন। তখন রবি ছিলেন প্রায় এই বাড়ি ও পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ এক ভীরু, কাব্য যশোপ্রার্থী, কাদম্বরী ছিলেন তাঁর একমাত্র বন্ধু ও কবিতার প্রধান সমঝদার ও প্রেরণা। এখন রবি বাংলার সাহিত্যাকাশে উদিত জ্যোতিষ্ক, কবিতা ও গদ্যে সব্যসাচী, ঠাকুর পরিবারের এত বড় জমিদারির প্রধান পরিচালক, পাঁচটি সন্তানের জনক এবং পাবলিক ফিগার।

মৃতদের বয়েস বাড়ে না। কাদম্বরী যে-বয়সে আত্মহত্যা করেছিলেন, সেই বয়েসেই আটকে আছেন, আর রবির বয়েস এখন ছত্রিশ। এখন কি আর নিরিবিলিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে খুনসুটি মানায়? বিশেষত যাঁর শরীরী অস্তিত্বই নেই!

রবির মনে পড়ল বছর দু'-এক আগেকার এমনই একটি রাতের কথা। সে রাতে রবি সত্যি বেশ উতলা হয়ে পড়েছিলেন।

মধ্য রাতে হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। রবি একটি প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে চলে এসে বন্ধ করে দিলেন সব কটি জানালা। আবার যে-ই লেখাতে মনোনিবেশ করেছেন, একটু পরেই মনে হল কে যেন ঠকঠক করছে একটা জানলায়। শব্দ শুনলে মনে হয়, কেউ যেন ব্যাকুলভাবে বলতে চাইছে, খুলে দাও, দ্বার খুলে দাও, ঝড়ের মধ্যে আমি বাইরে থাকতে পারছি না, ভেতরে আসতে দাও আমাকে।

রবি অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন জানলাটার দিকে। কেউ নেই, তিনতলার বারান্দায় কারুর পক্ষে এসে দাঁড়ানো সম্ভবই নয়। তবু ঠকঠক শব্দ হচ্ছে ঠিকই এবং তার ভাষা যেন ওই রকম।

নিশ্চয়ই কোনও একটা ছিটকিনি আলগা আছে। রবি উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে ঠিক করতে যেতেই এক ঝলক হাওয়া ঢুকে এল। বাইরে মাতামাতি করছে ঊনপঞ্চাশ পবন, ধারালো বৃষ্টির ফোঁটাও পড়তে শুরু করেছে।

হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে এল একটা জুঁই ফুল।

অতি সামান্য কোনও ব্যাপারও এক এক সময় কত গভীর তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। বারান্দায় সার সার সাজানো ফুলের টব, তাতে অনেক জুঁই-বেল-রজনীগন্ধা ফুটে আছে। একটা জুঁই ফুল ঝড়ের তোড়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়তেই পারে। কিন্তু রবির মনে হল, হাওয়া যেন কারুর আত্মা, আর ফুলটা সে-ই ছুঁড়ে দিয়েছে, যার ওই ফুল ছিল খুব প্রিয়।

সঙ্গে সঙ্গে রবির মনে পড়ল, ঠিক দশ বছর আগে, বৈশাখ মাসের এই দিনটিতেই নতুন বউঠান আত্মঘাতিনী হয়েছিলেন! এ কথা রবির সারা দিন মনে পড়েনি, ভুলে ছিলেন কী করে? এ বাড়িতে অন্য কারুর এ দিনটি স্মরণ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কেউ তাঁর নাম ভুলেও উচ্চারণ করে না, যেন কাদম্বরী নামে কোনও বধূ এ পরিবারে কোনও দিনই ছিল না।

অন্যরা না স্মরণ করুক, রবিও মনে রাখবেন না?

ফুলটি মেঝে থেকে তুলে নিয়েছিলেন রবি।

জানলা খোলা রাখা যায় না, ভেতরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। বন্ধ করলেন বটে, কিন্তু ছিটকিনিটা সত্যিই নড়বড়ে, আবার খটাখট শব্দ শুরু হল। এবং সেই শব্দ শুনে রবির মনে হবেই যে নতুন বউঠান আবার ভেতরে আসতে চাইছেন।

অশরীরীর সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বলা যায় না। আগের লেখাটি সরিয়ে রেখে রবি অন্য একটি কাগজে লিখলেন :

বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার
জন শূন্য পথ, রাত্রি অন্ধকার
গৃহ হারা বায়ু করি হাহাকার
ফিরিয়া মরে।

জানলার বাইরে থেকে ব্যাকুল কণ্ঠে যেন কেউ এর উত্তর দিল। গৃহহারা বায়ু নয়, আমি সে, আমি সে, আমাকে চিনতে পারছ না?

রবি আবার লিখলেন :

তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে
এ হেন নিশীথে আসিয়াছ তবে
কিসের তরে?

লিখতে লিখতে রবির চক্ষু জ্বালা করে উঠল। গলায় অবরুদ্ধ হল বাষ্প। 'ভুলিয়াছে সবে'? এটা কি বড় বেশি কঠিন হয়ে গেল না? কেউ আর নাম উচ্চারণ করে না বটে, কিন্তু মন থেকে কি ইচ্ছে করলেই মুছে ফেলা যায়?

কত সাধ করে নতুন বউঠান সাজিয়েছিলেন এই তিনতলার মহল। এখনও অনেক কিছুতেই রয়ে গেছে তাঁর হাতের চিহ্ন। সব কিছু ছেড়ে নিজেই তো চলে গিয়েছিলেন, তবে আর ফিরে আসা

কেন? বিদেহী আত্মা কি পুরনো অধিকার ফিরে পেতে পারে?

এ দুয়ারে মিছে হানিতেছ কর...

রবির চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে কাগজের ওপর; তবু তিনি লিখে যাচ্ছেন :

যেথা একদিন ছিল তোর গেহ
ভিখারীর মত আশে সেথা কেহ?
কার লাগি জাগে উপবাসী স্নেহ
ব্যাকুল মুখে...

ঘুমায়েছে যারা তাহারা ঘুমাক
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কেন দাও ডাক
তোমারে হেরিলে হইবে অবাক
সহসা রাতে...

পাশের ঘরে দুধের শিশুটি হঠাৎ কেঁদে উঠতে রবির ঘোর ভেঙে গিয়েছিল। সহসা বাস্তব এসে যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল পরাবাস্তবতা। তখন জানলার খটখটানিতে স্পষ্ট বোঝা যায় আলগা ছিটকিনির শব্দ। বাইরের ঝড় শুধুই ঝড়, তাতে কারুর মুখ ভাসে না।

দু' বছর বাদে আজ রাতে আবার সেই অনুভূতি। আজও সেই বৈশাখের বিশেষ দিন। মাঝখানের বছরটিতে বৈশাখের এ সময় রবি কলকাতায় ছিলেন না, তাই কিছু খেয়ালও হয়নি। শুধু এ বাড়ির তিনতলার এই বারান্দার আশেপাশেই সেই আত্মা ঘোরাফেরা করে এক যুগ কেটে গেছে, তার পরেও?

রবি উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। না নেই, সে কোথাও নেই, আত্মা বলে, যদি কিছু থাকেও, তবু তা পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়ে ফিরে আসে না। এ সবই রবির নিজের মনের রসায়ন।

দু'-একবার বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে, দূর দিগন্তে। ঝড় ও বৃষ্টি আসুক। বৃষ্টির খুব প্রয়োজন এখন। শহরে এখন কলেরা ও পান বসন্তের খুব উপদ্রব চলছে। মহারাষ্ট্র থেকে ছড়াচ্ছে প্লেগের আতঙ্ক। এই সব রোগ-মহামারীর কাছে মানুষ অসহায়, একমাত্র প্রবল বর্ষণেই রোগের বীজাণু ধুয়ে যেতে পারে।

এই ধরনের বাস্তব কথা মনে এনে রবি নতুন বউঠানের অশরীরী অস্তিত্বকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন।

দশ-বারো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল, এখনও রবির অনেক রচনায় কাদম্বরীর ছায়া এসে যায়। এক সময় রবি যেমন তার সদ্য লেখা কবিতা ওঁকে শোনাবার পর ওঁর মতামত শুনে কিছু কিছু পঙক্তি অদলবদল করতেন, এখনও তেমনই যেন, তিনি নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ান হঠাৎ হঠাৎ, রবির কলম দিয়ে তিনি তাঁরই বিলাপ, তাঁর মর্মবেদনা লিখিয়ে নেন।

ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে!
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চির-পুরাতন চির জীবনে!

অন্য কেউ এসব কবিতার সঠিক মর্ম বুঝবে না। তুলিয়া অঞ্চলখানি/ মুখ-'পরে দাও টানি/ ঢেকে দাও দেহ।/ করুণ মরণ যথা/ ঢাকিয়াছে সব ব্যথা/ সকল সন্দেহ... যে কবিতায় এই সব লাইন আছে, সেই কবিতাটি 'মৃত্যুর পরে' নাম দিয়ে ছাপা হবার পর অনেকে মনে করেছিল, ওটা বুঝি বঙ্কিমবাবুর স্মরণে লেখা। মূর্খ আর কাকে বলে! ভাবুক, যার যা খুশি ভাবুক!

যদি অন্তরে লুকাবে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী

তবে তাই হোক। দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহো তবে রহো
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে...

পরদিন সকালে রবি ভৃত্যদের ডাকিয়ে তাঁর লেখার টেবিলটি আনালেন দোতলার একটি ঘরে। এ ঘরখানি যেমন-তেমন, বাইরের কোনও দৃশ্য দেখা যায় না। তিনতলার অমন সুদৃশ্য জায়গা ছেড়ে রবি লেখার জন্য এ ঘর বেছে নিলেন বলে অনেকেই বিস্মিত। সঠিক কারণটি অন্যদের বলে বোঝানো যায় না। রবি বললেন, ওপর তলায় মৃণালিনীকে পাঁচটি বাচ্চা সামলাতে হয়, খোকা-খুকুরা লেখার মধ্যে এসে কথা বলে, তাতে একাগ্রতা নষ্ট হয়, সেই জন্যই একটা নিরিবিলি স্থান দরকার।

একজনের স্মৃতিভার নিয়ে পড়ে থাকলে সাহিত্যের জগতে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া কী করে সম্ভব? লেখা ছাড়াও আরও কত কাজ আছে, জমিদারি পরিদর্শন ছাড়াও রবি বলেন্দ্রদের সঙ্গে পাট আর আখ মাড়াই কলের ব্যবসা শুরু করেছেন, তাতেও মনোযোগ দিতে হয়। অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে ভবিষ্যৎকে দেখা যাবে কী ভাবে? এক একবার ভাবের ঘোরে মনে হয়েছে, নতুন বউঠান যখন বারবার নিশীথ কালে এসে দুয়ারে আঘাত করছেন, তখন তাঁর সঙ্গে অচেনা অসীম আঁধারের জগতে ভেসে পড়লে কেমন হয়? কিন্তু না, তা কী করে হয়, নতুন বউঠান আত্মঘাতিনী হয়েছিলেন বলে রবিও কেন জীবন বিসর্জন দেবে? ওঁকে বিদায় দিতেই হবে মন থেকে। বলো শান্তি, বলো শান্তি—/ দেহ সাথে সব ক্লান্তি/ পুড়ে হোক ছাই...

এর পর রবি সত্যি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সম্পত্তি নিয়ে কিছু কিছু অশান্তি চলছিলই, এই সময়ে তা প্রকট হয়ে পড়ে। গুণেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর তাঁর তিনটি নাবালক পুত্রের ভাগের সম্পত্তির দেখাশোনার ভার দেবেন্দ্রনাথই নিয়েছিলেন। বার্ধক্যহেতু অশক্ত হয়ে পড়ায় তিনি সেই দায়িত্ব দিয়েছেন রবিকে। যদিও গুণেন্দ্রনাথরা কখনও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি এবং তাঁদের বসতবাটিও আলাদা, তবু একই পরিবারের এই দুই শাখায় কখনও সৌহার্দ্যের অভাব হয়নি। গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র এই তিন ভাই-ই রবির বিশেষ ভক্ত। কিন্তু বাইরে থেকে নানা লোকের উস্কানি দেবার অভাব হয় না। গুণেন্দ্রনাথের ওই পুত্রেরা এখন সাবালক, নিজেদের সম্পত্তি তাদের এখন বুঝে নেওয়াই তো উচিত, জমিদারিতে তাদের ন্যায্য ভাগ কোথায় কতখানি তাও জানা দরকার, এরকম একটা গুঞ্জন তুলে দিল ওই পরিবারের শুভার্থীরা। এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হলে অনেকেরই লাভ।

দেবেন্দ্রনাথের এতগুলি কৃতী পুত্র, তবু তিনি জমিদারি ও পারিবারিক বিষয়ে সব কিছু দেখাশুনো ও সিদ্ধান্ত নেবার পূর্ণ কর্তৃত্ব দিলেন কনিষ্ঠ পুত্রকে। এই সময় তিনি রবিকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দিলেন, যার ফলে দুই পরিবারের যে-কোনও খুঁটিনাটি সমস্যায় রবিকেই মাথা ঘামাতে হবে। এ জন্যে এখন রবিকে প্রায়ই উকিল-ব্যারিস্টারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়, কখনও ছুটতে হয় আদালতে। কে বলে কবিদের সাংসারিক জ্ঞান থাকে না? এই সব বৈষয়িক কাজে দেবেন্দ্রনাথকে খুশি করা সহজ নয়, সামান্য গাফিলতিও তাঁর নজর এড়ায় না। দেবেন্দ্রনাথ এখন অবস্থান করছেন পার্ক স্ট্রিটের এক ভাড়া বাড়িতে, রবিকে সেখানে ঘন ঘন ছুটতে হয়, পিতার কাছে সব হিসেবনিকেশ দাখিল করতে হয়। রবির কাজকর্মে পিতা বেশ সন্তুষ্ট, তিনি অন্য পুত্রদের বাদ দিয়ে, জোড়াসাঁকো বাড়ির সংলগ্ন একখণ্ড জমি দান করেছেন রবিকে। রবি সেখানে নিজস্ব একটি বাড়ি বানাচ্ছে, সে খরচও জোগাচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ।

রবির অবস্থা এখন বেশ সচ্ছল। পারিবারিক মাসোহারা ছাড়াও জমিদারি কাজ দেখার জন্য অতিরিক্ত মাসোহারা পান, ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে পৃথক ব্যবসাতেও বেশ লাভ হচ্ছে। পাট ও আখ মাড়াই কল ছাড়াও এখন কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা যুক্ত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কাঁচা চামড়া কেনা হয়, সেগুলি বিক্রি হয় কলকাতায়। এর মধ্যে শেখ রহম আলি ও ফকির মহম্মদ নামে দুই

ব্যক্তি রবিদের কোম্পানি থেকে প্রচুর চামড়া কিনে নিয়ে টাকা আটকে দিল। অনেক টাকার ব্যাপার, সুতরাং মামলা ঠুকতে হল ওদের বিরুদ্ধে।

ব্যবসাতে জড়িয়ে পড়ে রবি বুঝতে পারলেন, ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে না পারলে এ দেশের মানুষের উন্নতির কোনও আশা নেই। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠিক পথেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু বেহিসেবি ও হঠকারী ছিলেন বলেই তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। দেশীয় ব্যবসায়ীদের অগ্রসর হতে হবে ধীরে ধীরে, ইংরেজ কম্পানিগুলি সহজে তাদের বাজারে ঢুকতে দেবে না। সেই জন্যই আগে দরকার দেশের মানুষদের সজাগ করা, তারা যদি স্বেচ্ছায় বিলিতি দ্রব্যের বদলে স্বদেশি দ্রব্য কিনতে শুরু করে, তা হলে বিদেশি ব্যবসায়ীরা পিছু হঠতে বাধ্য হবে। অবশ্য দিশি জিনিসের মান ও গুণেরও উন্নতি করতে হবে। অনেক গ্রামীণ কুটির শিল্পের কথা শহরের মানুষ জানেই না, সে কারণে শহরে শহরে স্বদেশি শিল্প ভাণ্ডার স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

জমিদারির কাজ, ব্যবসা, বৃহৎ পরিবারের সব কিছুর বিলিব্যবস্থা, এসব তো আছেই, কিন্তু কলমও থেমে নেই। এখন আর রবি দিনের বেলায় লেখার সময় প্রায় পান না, লেখেন রাত্তির বেলা। দিনের কর্মব্যস্ত মানুষটির সঙ্গে রাত্রির মানুষটির যেন কোনও মিলই নেই। সকলের থেকে আলাদা এক নির্জন মানুষ। নিজের মধ্যে বিভোর। এখন গদ্যের চেয়ে গানই আসছে বেশি। সভাসমিতিতে গেলে লোকে নতুন গান শুনতে চায়।

কখনও সখনও ফরমায়েশি গানও লিখতে হয়। আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে কারুর বিয়ে হলে রবি সেই উপলক্ষে নতুন গান বাঁধবেনই, সবাই ধরে নিয়েছে। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে হয়। অনুবাদ-ঘেঁষা গানের দিকেও তাঁর ঝোঁক পড়েছে। বহুল প্রচলিত কোনও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গুন গুন করতে করতে তাতে বাংলা কথা বসাতে ইচ্ছে করে। 'কৌন রূপ বনে হো রাজাধিরাজ', তিলক কামোদের সুরে এই গানটি কয়েকবার গাইতে গাইতে কথাগুলো বদলে যায়, 'মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ...'। মূল সুরের কাঠামোটা ঠিকই থাকে, তবু এমন কিছু একটা ঘটে যায় যে শেষ পর্যন্ত আর সেটা ঠিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থাকে না, রবির নিজস্ব গান হয়ে যায়। রবির বন্ধু কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন, আপনার গান এত শক্ত যে আমার গলায় ওঠে না কিছুতেই। আপনি সুরের মধ্যে কী একটা ঘটিয়ে দেন বলুন তো! দ্বিজেন্দ্রবাবু নিজে সুগায়ক, যে-কোনও আড্ডা-সম্মিলনে তিনি নিজস্ব হাসির গান গেয়ে দারুণ জমিয়ে দেন, তাঁর রীতিমতন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেওয়া তৈরি গলা, তবু তিনি রবি-রচিত গান কিছুতেই গলায় তুলতে পারেন না।

এই শীতে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে, সেই উপলক্ষেও রবিকে নতুন গান রচনার ফরমাস জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বা কৌতূহল দিন দিন বাড়ছে। কংগ্রেসের অধিবেশন একটা বেশ বড় রকমের ঘটনা। রবি এবং ঠাকুর পরিবারের অনেকেই কংগ্রেস সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী, আসন্ন অধিবেশনে রবি একজন প্রতিনিধি, তাঁর ওপর পড়েছে উদ্বোধন সঙ্গীতের ভার।

একদিন সকালে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা বিপিন পাল আরও কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। বিপিন পাল মশাই রবিকে একটি বিচিত্র অনুরোধ জানালেন। মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজো খুব জনপ্রিয়, সেই উপলক্ষে বহু মানুষ সমবেত হয়। বিপিন পালের ইচ্ছে এখানে দুর্গা পূজাও সেইভাবে প্রচলিত হোক, দিকে দিকে সর্বজনীনভাবে এই পূজা ছড়িয়ে পড়ুক। তবে নিছক পূজা নয়, দেবীমূর্তিকে দেশমাতৃকার রূপ দিতে হবে, এই পূজা উপলক্ষে সবাই নিজের দেশকে জননী হিসেবে ভাবতে পারবে। সেইভাবে দেবীমূর্তির আদলে মাতৃস্তোত্র রচনা করা দরকার। রবীন্দ্রবাবু ছাড়া তেমন গান আর কে বাঁধতে পারবে? সেই গান পরিবেশিত হবে কংগ্রেসের মঞ্চে।

অনুরোধটি শুনে রবি বেশ অবাক হলেন। কংগ্রেসের মঞ্চে দুর্গা মূর্তির বন্দনা? কংগ্রেস কি শুধু হিন্দুদের? হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-পারসিক-খ্রিস্টান সবাইকে মেলাবার জন্যই তো কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। হিন্দু ছাড়া আর কেউই তো ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাসী নয়।

বিপিন পাল বললেন, আমি তো ধর্মের গান চাইছি না, চাইছি দেশবন্দনা। নিছক মানচিত্র দেখে দেশকে বোঝা যায় না। মাতৃমূর্তি হিসেবে কল্পনা করলে, সমগ্র দেশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ভক্তিতে আমাদের মাথা নুয়ে আসে। মুসলমান-খ্রিস্টানরা তো এখনও তেমন কোনও গান রচনা করেনি, দেশাত্মবোধক গান আর কোথায়? হিন্দুরা লিখতে গেলে একটা মূর্তির আদল এসে যাবেই। অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না, রবিবাবু! আমরা তো মুসলমান-খ্রিস্টানদের দুর্গা পূজা করতে বলছি না, কিন্তু দেশকে মা বলে মেনে নিতে আপত্তি হবে কেন?

রবি বললেন, বঙ্কিমবাবুর বন্দে মাতরম্ গানটিই তো সেরকম গানের আদর্শ। সেটি গাইলেই হয়।

বিপিন পাল বললেন, আপনি নতুন করে সহজ ভাষায় লিখে দিতে পারতেন যদি, একই সঙ্গে ভক্তি উদ্দীপনা মিলিয়ে...

রবি বললেন, আমাকে মাপ করবেন, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিপিন পাল খানিকটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন। রবি কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। কংগ্রেসের মঞ্চে দেবীবন্দনা গীতি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি তো আছেই। তা ছাড়া তিনি নিজেও যে মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নন। অন্তরে যদি ভক্তি না থাকে তা হলে কলম দিয়ে ভক্তি রসের গান বেরুবে কী করে?

রবি বরং অন্যরকম একটি গান লেখার কথা ভাবলেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আসবেন, তাঁদের পৃথক পৃথক ভাষা। কংগ্রেসের মঞ্চে ভাষা একটা সমস্যা। ভারতের কোনও ভাষাই সর্বজনবোধ্য নয়, তাই ইংরিজিতেই সব বক্তৃতা ও প্রস্তাব পেশ হয়। এক একজনের বক্তৃতায় ইংরিজির ফোয়ারা ছোটে। যেখানে স্বদেশি ভাব জাগাবার এত প্রয়াস চলেছে, সেখানে রাজশক্তির ভাষাকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া রবির পছন্দ নয়। ইংরিজির প্রাধান্যের জন্যই কংগ্রেসের নেতৃত্বে যত সব বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারদের আধিপত্য। যাঁরা ভাল ইংরিজি জানেন না, তারা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগও পান না।

কলকাতায় অধিবেশন হলেও সব বাংলা গান হলে অনেক প্রতিনিধিই কিছুই বুঝবেন না। যদি অধিকাংশ তৎসম শব্দ মিশিয়ে কোনও গান রচনা করা যায়, তা হলে কেমন হয়। অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষই সংস্কৃত কিছুটা বোঝেন। দক্ষিণ ভারতের তামিল-তেলুগুভাষীরাও সংস্কৃত জানেন। যেমন শিক্ষিত হিন্দুরা ফার্সি ও উর্দুচর্চা করে, তেমনি শিক্ষিত মুসলমানরাও সংস্কৃত শেখে।

রবি লিখলেন, অয়ি ভুবনমনোমোহিনী

অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননী জননী

নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত-শ্যামল অঞ্চল
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল, শুভ্রতুষার কিরীটিনী...

গানটি তৎসম শব্দবহুল বটে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে এর মধ্যেও যে একটি মূর্তির আদল এসে গেছে, তা রবি তখন খেয়াল করলেন না।

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতারা ঠিক করলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমই হবে উদ্বোধনী সঙ্গীত। রবিরই যুক্তিতে এই গানটিও সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ, সুতরাং সর্বজনগ্রাহ্য হবে।

রবির ইচ্ছে ছিল, প্রথম গানটি হবে অন্তত দশ বারোজনকে নিয়ে সমবেতভাবে। তাতে বেশ জমজমাট হয়। বন্দে মাতরম্ গানটির প্রথম দুটি স্তবকের সুর রবি নিজেই দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যদের শেখাতে গিয়ে দেখলেন, সবাই সুর ঠিক তুলতে পারছে না। তেমন জমছে না গানটা। তখন রবি ভাবলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি গান দিয়ে উদ্বোধন করলে কেমন হয়? 'চল রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান...' এ গানের কথা যেমন দেশাত্মবোধক, সুরও সহজ,

অনেকটা মার্চিং সং-এর মতন।

কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হয়েছে বিডন স্কোয়ারে। এই দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব রহিমতুল্লা এম. সায়ানি, ভারতের খ্যাতিমান সমস্ত ব্যক্তিই এখানে উপস্থিত। মঞ্চের ওপর একটা পিয়ানো ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এনে রবির পরিচালনায় প্রথমে সমবেত স্বরে হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওই গান। প্রচুর হাততালির পর কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান!

রবিকে এককভাবে গাইতেই হবে জনতার দাবিতে। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় দু' হাজার। মঞ্চ থেকে মনে হয় যেন এক বিপুল জনরাশি। রবি নিজের গানের বদলে বন্দে মাতরমই গাইবেন ঠিক করে রেখেছিলেন। সরলাকে বসতে বললেন অর্গানে। সে এই গানটির সুর ভাল জানে। তারপর রবি মঞ্চের একেবারে সামনে এসে একক কণ্ঠে ধরলেন গান। অত মানুষ একেবারে নিঃশব্দ, তার মধ্যে গমগম করতে লাগল রবির ভরাট কণ্ঠস্বর। সেই প্রথম সারা ভারতের প্রতিনিধিরা বন্দে মাতরম গানটি শুনল এবং জাতি- ধর্ম- সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত প্রতিনিধিই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এর পর আর অন্য গান জমে না। রবি তাঁর নতুন গান, অয়ি ভুবনমনোমোহিনী কয়েকজনকে শিখিয়ে তৈরি করেছিলেন, সেটা বাদ গেল। যারা গানটি শিখেছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম অতুলপ্রসাদ সেন, বিলেত প্রত্যাগত এই নবীন ব্যারিস্টারটির বেশ মিষ্টি, সুরেলা গলা। অতুল খানিকটা নিরাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল, রবিবাবু, আমাদের গানটা হবে না?

কয়েক দিন পর ঠাকুরবাড়িতে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হল। খাদ্য পরিবেশনের আগে গান। রবি তাঁর গায়ক-গায়িকাদের সবাইকে সাদা পোশাক পরে আসতে বলেছিলেন। তিনি নিজেও পরেছেন শুভ্র ধুতি ও কামিজ, তার ওপর সিল্কের চাদর। তিনি মাঝখানে দাঁড়ালেন, দু' পাশে অন্য যুবক-যুবতীরা। অয়ি ভুবনমনোমোহিনী শুনে অন্য প্রদেশের শ্রোতারা স্বীকার করলেন, তাঁদের বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি, এমন মধুর সুরের গানও তাঁরা আগে শোনেননি।

পরপর কয়েক দিন বেশ ধকল যাওয়ায় রবি খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। মনটা কলকাতা ছেড়ে পালাই পালাই করছে। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। এই সময় শিলাইদহের নাগর নদীতে বজরা ভাসিয়ে দিন কাটানোর মতন আনন্দের কোনও তুলনা হয় না। নদী হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কিন্তু কলকাতার কিছু কাজ না চুকিয়ে যাওয়া যাবে না।

হই-হট্টগোলের মধ্যে প্রায় এক মাস লেখা হয়নি কিছুই। এরকম কিছুদিন না লিখলে তাঁর মন ছটফট করে। শিল্পরস ছাড়া তাঁর মন পরিশ্রুত হয় না। রাত্তিরে দোতলার ঘরে গ্যাসের বাতি জ্বেলে রবি কাগজকলম নিয়ে বসলেন। মাথায় কিছু আসছে না। কলম নিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে এক সময় একটা ছবি ফুটে উঠল। একটি নারীর মুখের আদল। এ কে?

রবি ভুরু কুঞ্চিত করে বললেন, আবার তুমি এসেছো? না, না, মিথ্যে মিথ্যে, তুমি কোথাও নেই! সব শেষ হয়ে গেছে, কতগুলি বছর কেটে গেল, আমি তোমায় মনে রাখিনি—

হঠাৎ রবি হাহাকার করে ভেঙে পড়লেন, টেবিলে মাথা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আপ্লুত স্বরে বলতে লাগলেন, না, না, নতুন বউঠান, সত্যি নয়, এ কথা সত্যি নয়, আমি তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলিনি, আমি কি এত অকৃতজ্ঞ হতে পারি? সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে... সেদিন বিডন স্কোয়ারে গান গাইবার পর যখন হাজার হাজার লোক আমার সুখ্যাতি করছিল, আমি তখনও শুধু ভাবছিলুম, নতুন বউঠান এই দৃশ্য দেখলে কত খুশি হত! অন্য লোক যতই সম্মান দিক, শিরোপা দিক, আমার তুচ্ছ মনে হয়, তুমিই তো আমাকে সম্রাট করেছ, তুমি আমার মাথায় পরিয়েছ প্রেমের মুকুট...

বেশ কিছুক্ষণ বাদে রবি চোখ মুছে শান্ত হলেন। তারপর হঠাৎ সদ্য পাথর ভেদ করে উঠে আসা ঝর্নার মতন লিখতে লাগলেন :

আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলিয়ে দাও
আমায় আনন্দে ভাসাও
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা
আমার অন্তরে জাগাও...

২৪

আদালত থেকে ফিরে দোতলার গাড়ি বারান্দায় বসে চা পান করছিল যাদুগোপাল। প্রতিদিন এই সময় তার স্ত্রী তো বটেই, ছেলেমেয়ে দুটি, তাঁর বিধবা ভগিনী, এক দূর সম্পর্কের পিসিমা, পিসতুতো ভাই সবাই উপস্থিত থাকে। এই সময়টিতে পারিবারিক সম্মিলন হয়।

যাদুগোপাল এখন নামজাদা ব্যারিস্টার। যে-কোনও পেশাতেই যারা সার্থক হয়, তারা নিজের সংসারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে না। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় কচিৎ। সকালে এবং সন্ধের পর যাদুগোপালকে চেম্বারে বসতে হয়, ক্রমেই মক্কেলদের ভিড় এমন বাড়ছে যে এক একদিন রাত এগারোটা বেজে যায়। তাই যাদুগোপাল বিকেলের এই সময়টায় বাইরের কারোর সঙ্গে দেখা করে না। পরপর তিন কাপ চা খায়, তার স্ত্রী সুনেত্রা নিজের হাতে কিছু না কিছু খাবার বানায়, যাদুগোপাল ছোট মেয়েটিকে কোলে বসিয়ে আদর করতে করতে টুকিটাকি পারিবারিক কাহিনী শোনে। যাদুগোপালের এক সময় গান-বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল, এখন একেবারেই সময় পায় না, তবে ছেলে আর মেয়েকে গান গাইবার উৎসাহ দেয়।

আর্দালি এসে একটা ভিজিটিং কার্ড দিতেই যাদুগোপাল ভুরু কোঁচকাল। এ সময় আবার কে এসে উৎপাত করে ? যাদুগোপাল হাত নেড়ে বলতে যাচ্ছিল, না, না, এখন দেখা হবে না বলে দাও, তবু একবার নামটার ওপর চোখ বুলিয়ে থমকে গেল। এ যে তার কলেজের বন্ধু দ্বারিকা। সে বলল, বাবুটিকে বসিয়েছ তো, আমি এক্ষুনি আসছি।

আবার আর্দালিকে হাতের ইঙ্গিতে থামতে বলে সে সুনেত্রার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো আমার বন্ধু দ্বারিকাকে দেখেছ ! তাকে এখানে আসতে বলি ? তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখাটা ভাল দেখায় না। আমাদের সঙ্গে এখানে বসে সে চা খাক !

সুনেত্রা ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা, পুরোপুরি অন্তঃপুরিকা নয়, বাইরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যেস আছে। সে সম্মতি জানাল। যাদুগোপাল তার পিসতুতো ভাইকে বলল, যা তো, ওঁকে ওপরে নিয়ে আয়।

দ্বারিকা সম্পর্কে যাদুগোপালের মনে একটা অপরাধবোধ আছে। মাস তিনেক আগে দ্বারিকার মাতৃবিয়োগ হয়েছে, দ্বারিকা নিজে এসে নেমন্তন্ন করে গেলেও যাদুগোপাল বন্ধুর মাতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হতে পারেনি। বিশেষ কাজে তাকে নাটোর যেতে হয়েছিল। তারপরেও যে একদিন দ্বারিকার সঙ্গে দেখা করে আসবে, আজ না কাল করতে করতে যাওয়াই হয়ে ওঠেনি, কাজের এমনই চাপ। এটা একটা গর্হিত অসামাজিকতা। খাঁটি বন্ধু বলেই দ্বারিকা তবু নিজে থেকেই আবার এসেছে।

দ্বারিকাকে হঠাৎ চিনতে পারা যায় না। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেশ বড় আকারের মানুষ, তার মাথায় ছিল ঝাবরি চুল ও নাকের নীচে পুরুষ্টু গোঁফ। শ্রাদ্ধের সময় মস্তক মুণ্ডন করতে হয়েছিল, এখন মাথাটি কদম ফুলের মতন। গোঁফটি অদৃশ্য। চোখে সে সদ্য সোনার ফ্রেমের চশমা নিয়েছে। চুনোট করা ধুতির ওপর জড়ির কাজ করা বেনিয়ান পরা, গলায় সোনার মফচেন। দু' হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি মণি-মাণিক্যের আঙটি।

যাদুগোপাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আয়, আয় দ্বারিকা, তোর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি ভাই, তোর মায়ের কাজে আমি যেতে পারিনি, সে জন্যে মরমে মরে আছি।

দ্বারিকা বলল, তুই তখন নাটোর গিয়েছিলি তা আমি শুনেছি। এ সময় উপস্থিত হয়ে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো ?

যাদুগোপাল বলল, মোটেই না, মোটেই না। বরং ভাল সময়ে এসেছিস। তুই আমাদের সঙ্গে চা-পান করবি তো !

দ্বারিকা বলল, চায়ে আমার কোনও সময়েই আপত্তি নেই।

যাদুগোপালের পিসিমা, দিদি, অন্যান্যরা আস্তে আস্তে ভেতরে চলে গেল, ছেলে-মেয়েরাও থাকতে চাইল না। সুনেত্রা দ্বারিকার সামনে প্লেট সাজিয়ে দিল, বিস্কিট, কাজু বাদাম, হ্যাম-স্যান্ডুইচ, বরফি। পোরসিলিনের পেয়ালায় চা। দ্বারিকা বরাবরই ভোজন রসিক, সে অত খাদ্যদ্রব্য দেখে আপত্তি জানাল না।

যাদুগোপাল সুনেত্রাকে বলল, ওকে হ্যাম-স্যান্ডুইচ দিয়ো না, শশার স্যান্ডুইচ বানিয়ে দাও বরং।

দ্বারিকা মুখ তুলে বলল, কেন ?

যাদুগোপাল বলল, কালাশৌচ এক বছর থাকে না ? এই এক বছর অন্যের বাড়িতে আমিষ ভক্ষণ করতে নেই। তুই বুঝি এসব মানিস না ?

দ্বারিকা বলল, তুই একে ব্রাহ্ম, তায় বিলেত-ফেরতা ব্যারিস্টার, তুই এত জানিস, আমি তো জানিই না। এক বছর অন্যের বাড়িতে আমিষ খেতে নেই, এটা কোন্ বইতে লেখা আছে রে ?

যাদুগোপাল ইতস্তত করতে লাগল। এসব কোন্ বইতে লেখা থাকে সে খবর সে জানে না। তবে হিন্দুদের এই সব আচার-বিচার মানতে সে তো দেখে আসছে ছোটবেলা থেকে। দ্বারিকা কট্টর হিন্দু, পাছে এ বাড়িতে এসে তাকে আচারভ্রষ্ট হতে হয়, সেই জন্যই যাদুগোপাল তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।

সমস্ত আহার্য পরিপাটিভাবে শেষ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগল দ্বারিকা। যাদুগোপাল ভাবল, দ্বারিকা নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। সে নিছক অলস জমিদার নয়। একটি পত্রিকা চালায়, পাঁচটি স্কুল স্থাপন করেছে, সম্প্রতি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। তা ছাড়া আরও অনেক সামাজিক কর্মের সঙ্গে জড়িত। দ্বারিকাও বেশ ব্যস্ত মানুষ।

সুনেত্রার দিকে তাকিয়ে দ্বারিকা বলল, বড় তৃপ্তি পেলাম, বউঠান। আপনার হাতের চায়ের স্বাদ অপূর্ব।

সুনেত্রা জিজ্ঞেস করল, আর দু'খানা স্যান্ডুইচ আর বরফি দিই ?

যাদুগোপাল বলল, দ্বারিকা, তোর মা চলে গেলেন, তাঁকে তো আমি দেখেছি, কী ব্যক্তিত্বময়ী ছিলেন, আমাদের কত যত্ন করে খাওয়াতেন, তিনি ছিলেন তোর মাথার ওপর··· মায়ের স্থান আর কেউ নিতে পারে না।

দ্বারিকা নিঃশব্দে মাথা নাড়তে লাগল।

যাদুগোপাল আবার বলল, শ্রাদ্ধে তুই যে বিরাট ধুমধাম করেছিস তা আমি শুনেছি। শহরের বহু লোক বলাবলি করেছে। একবার গ্রামের বাড়িতে, একবার কলকাতায়, পাঁচশো জন ব্রাহ্মণ আর দু'হাজার কাঙালিকে তুই বস্ত্র দান করেছিস, সবাই ধন্য ধন্য করেছে।

দ্বারিকা বলল, জমিদারদের এই সব আড়ম্বর করতেই হয়। জমিদারের রক্ত তো আমার শরীরে নেই, তুই তো জানিস, আমার বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে, কার্যগতিকে মামাদের জমিদারি পেয়ে

গেছি। পাছে লোকে বলে আমি কৃপণ কিংবা জমিদারি আদপ-কায়দা জানি না, তাই মায়ের শ্রাদ্ধে খরচ করেছি ঢালাও ভাবে। এসব লোক দেখানো ব্যাপার, নিজের মনের সায় ছিল না। এত অর্থ ব্যয়, এই অর্থ দিয়ে অনেক ভাল কাজ করা যেত।

যাদুগোপাল বলল, কিছু কিছু সামাজিকতা আর লোকাচার তো মানতেই হয়।

দ্বারিকা সুনেত্রাকে বলল, বউঠান, আপনার পতিদেবতাটি আমার বাল্যবন্ধু, তবু আমার সঙ্গে যান্ত্রিক ভদ্রতার সুরে কথা বলছেন কেন? মাতৃবিয়োগ, পিতৃবিয়োগ হলে সবাই ঠিক যেন একই ভাষায় সান্ত্বনা জানাতে আসে। এতে কি সান্ত্বনা সত্যিই পাওয়া যায়? আবার এমনও তো হতে পারে, জীবনের কোনও একটা সময়ে মা কিংবা বাবার মৃত্যু হলে কেউ কেউ খুশিও হতে পারে? আমার মা চলে গেছেন, তাতে আমি যেন একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছি। হ্যাঁ, সত্যি। মা আমাকে একটা অন্যায় শপথে বন্দি করে রেখেছিলেন।

সুনেত্রা ও যাদুগোপাল দু'জনেই বেশ চমকে উঠল।

দ্বারিকা বলল, মা চলে গেলে সকলেরই কষ্ট হয়। হঠাৎ সব কিছু ফাঁকা ফাঁকা লাগে, সে রকম অবশ্যই মনে হয়েছে। আমার মা দেড় বছর যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন, শেষের দিকে বাক্‌শক্তিও ছিল না, শুধু চেয়ে থাকতেন অসহায়ভাবে। কত যন্ত্রণা ভোগ করতেন কে জানে। সেবা-যত্নের কোনও ত্রুটি ছিল না, আমি নিজেও কত সময় শিয়রের কাছে বসে থেকেছি, তবু কি এক এক সময় মনে হয় না, এ রকম জীবন্মৃতের মতন পড়ে থাকার চেয়ে মায়ের চলে যাওয়াই ভাল?

এই ধরনের কথার সম্মতি বা প্রতিবাদ দুটোই অসমীচীন। ওরা চুপ করে রইল।

ভেতরে ভেতরে কিঞ্চিৎ অস্থির বোধ করছে যাদুগোপাল। এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসেছে, তবু তার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করার সময় নেই। একটু পরেই মক্কেলরা আসতে শুরু করবে।

যাদুগোপাল জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে দ্বারিকা, তুই কি কোনও মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিস? সম্পত্তির আর কোনও দাবিদার এসেছে?

দ্বারিকা বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন করলি কেন?

যাদুগোপাল লঘু স্বরে বলল, বন্ধুবান্ধবরা তো বিশেষ কেউ আর আসে না। সকলেই যে-যার কাজে ব্যস্ত। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যদি নিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়ে, আমাকে জানালে··· যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি··· মানে, বন্ধুদের জন্য কিছু করতে পারলে ভাল লাগে।

দ্বারিকা বলল, বিষয়-সম্পত্তি থাকলেই তা নিয়ে খটাখটি লেগেই থাকে। আমার এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য তোর মতন বড় ব্যারিস্টারের সাহায্য চাওয়া যায়। না, আমি সে জন্য আসিনি।

যাদুগোপাল বলল, তোর ইরফানের কথা মনে আছে? আহা হা, কী যে বলছি আমি, তোর মনে থাকবে না কেন, তোর মানিকতলার বাড়িতেই তো সে ম্যানেজার ছিল! আমার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা। সেও একটা মামলার ব্যাপারে। বাগবাজারের দিকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটা সম্পত্তি আছে। অনেক কাল ধরেই বেশ কয়েক ঘর মুসলমান সেই জমি ইজারা নিয়ে বাড়ি-ঘর বেঁধে আছে। সেখানে একটা মসজিদও তৈরি করেছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এখন সেই জমি থেকে ওদের উৎখাত করতে চান। ইরফানের কোনও এক আত্মীয়ের ইচ্ছে, ওদের পক্ষ নিয়ে আমি মামলাটা লড়ি। আমি ইরফানকে বললাম, হ্যাঁ রে, এরকম দরকারের সময় ছাড়া কি বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা করতে নেই?

দ্বারিকা বলল, ইরফানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। সে নানা রকম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে রয়েছে।

যাদুগোপাল বলল, একটা মজার কথা শোন, ইদানীং কয়েক বছর ধরে দেখছি আমার কাছে মুসলমান মক্কেল বেশি আসছে। মুসলমানদের মধ্যে উকিল-ব্যারিস্টারের সংখ্যা কম বটে, তবে ইদানীং ওমর আলি আর নুরুল হুদা বেশ নাম করেছে, বেশ পসারও জমিয়েছে। কিন্তু আমি মুসলমানদের মধ্যে হঠাৎ জনপ্রিয় হলাম কী করে? এখন বুঝেছি, ইরফানই ওই সব মক্কেলদের পাঠায় আমার কাছে। কয়েকটা শক্ত কেসে জিতে ওদের বিশ্বাসও অর্জন করেছি। এর মধ্যে একটা

মামলা নিয়ে খুব চক্ষুলজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম বুঝলি। ইরফানের পাঠানো মক্কেলদের একটা মামলা, চামড়া কেনা-বেচার দর নিয়ে বিরোধ, কেসটা টেক আপ করতে গিয়ে দেখি বিরুদ্ধ পক্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের একজনের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কে বুঝলি তো? কবি রবীন্দ্রবাবু! আমরা ছাত্র বয়েস থেকে তাঁর কবিতা পড়ছি, হেমবাবু-নবীনবাবুর চেয়ে রবীন্দ্রবাবুর কবিতা বেশি ভাল লাগে, গোটা কতক মুখস্থও বলতে পারি, সেই রবীন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে আমি মামলা লড়ব? ভেবে দ্যাখ কী কাণ্ড! তা ছাড়া, ঠাকুরবাড়ির ওঁরা আমার কুটুম্ব হন। আমার স্ত্রীর মুখ ভার। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষকে ডেকে আদালতের বাইরে মিউচুয়াল সেটেলমেন্ট হল।

বিশ্রম্ভালাপে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া যায় অনায়াসে। যাদুগোপালই বেশি কথা বলছে, দ্বারিকা হুঁ-হ্যাঁ দিয়ে যাচ্ছে শুধু। দ্বারিকার ওঠার লক্ষণও নেই।

এক সময় দ্বারিকা বলল, যাদু, এখানে এসে যখন দেখলাম, তুই তোর একটি সন্তানকে কোলে বসিয়ে আদর করছিস, তোর বউ নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করছেন, আত্মীয়-পরিজন নিয়ে ভরা সংসার, দেখে আমার যেমন ভাল লাগল, তেমন একটু একটু হিংসেও হল। আমার আজও কোনও সংসার নেই।

যাদুগোপাল বলল, আ-হা-হা, এ কথার কোনও মানে হয়। তুই তো শখের বিবাগী। এতদিনেও বিয়ে করলি না।

সুনেত্রার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বারিকা বলল, এবারে বিবাহ করব মনস্থ করেছি। সেই কথাই জানাতে এসেছি তোকে। কিছু পরামর্শও চাই।

যাদুগোপাল উৎসাহিত হয়ে বলল, তাই নাকি, তাই নাকি! অতি সুসংবাদ। দিন-ক্ষণ স্থির করে ফেলেছিস? কিন্তু, কিন্তু, এই সেদিন জননী চলে গেলেন, কালাশৌচ, এক বছরের মধ্যে তো বিয়ে করা চলে না।

দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, তাই নাকি? আমাদের কোন্ শাস্ত্রে এমন বিধি-নিষেধ লেখা আছে বল তো? অনেকের মুখেই এই কথাটা শুনি। কিন্তু কেউ কোনও শাস্ত্রের নাম বলতে পারে না।

যাদুগোপাল বলল, শাস্ত্রের নাম আমিও বলতে পারব না। বরাবরই এরকম শুনে আসছি। মনুসংহিতাখানা একবার উল্টে দেখা যেতে পারে।

দ্বারিকা বলল, মনুসংহিতা মেনে কি হিন্দু সমাজের সব কিছু চলে এখন? ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়িতে এক বামুনের পাশে যদি এক প্যান্ট কোট পরা চাঁড়াল এসে বসে, দু'জনের ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়ে যায়, সে বিষয়ে মনুসংহিতাকারের কোনও বক্তব্য আছে?

যাদুগোপাল বলল, দ্বারিকা, তোর মুখে এ সব কথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমি জাত-বিচার মানি না। কিন্তু তুই তো ছিলি কট্টর হিন্দু।

দ্বারিকা বলল, আমি হিন্দু ছিলাম, এখনও আছি। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সগর্বে বলতে পারি, আমি হিন্দু। ভারতের এই চিরাচরিত মহানধর্মের আমি উত্তরাধিকারী। কিন্তু হিন্দুধর্মের কোথাও যা নেই, সেই সব কুসংস্কার ও লোকাচার আমাকে মানতে হবে কেন? এমনকী কোনও শাস্ত্র গ্রন্থে যদি এমন কিছু থাকেও, যা একালের উপযোগী নয়, বরং ঘৃণ্য এবং পরিত্যাজ্য, যেমন জাত-পাতের বিচার, সেগুলোও বদলাতে চাইব।

যাদুগোপাল বলল, অতি সাধু প্রস্তাব, কিন্তু এখন ওসব কথা থাক। পাত্রী নির্বাচন হয়ে গেছে! কোন্ পরিবারের কন্যা?

দ্বারিকা বলল, এ বিষয়ে অনেক কথা আছে। তোর স্ত্রীর সামনে বলতে সংকোচ বোধ করছি। নীচে গিয়ে বসলে হয় না?

সুনেত্রা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না, আপনারা এখানেই বসুন।

যাদুগোপাল সুনেত্রাকে বলল, না, না, তুমিও বসো। দ্বারিকা, আমার স্ত্রী যথেষ্ট সাবালিকা, তার সামনে গোপন করার কিছুই নেই। বিয়ের ব্যাপার, মেয়েদের মতামত পেলে ভালই হবে। তুই বল্।

দ্বারিকা একটু ইতস্তত করে মৃদু গলায় বলল, বউঠান, এই যাদুর মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েই এক সময় একটি কিশোরীকে আমার পছন্দ হয়েছিল। আমি তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার বাবা ছিল এক অর্থপিশাচ ব্রাহ্মণ। টাকার বিনিময়ে সে সেই মেয়েটির বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল এক শ্মশানযাত্রী বুড়োর সঙ্গে। আমার প্রস্তাব কিছুতেই মানল না।

যাদুগোপাল বাধা দিয়ে বলল, আমার দিদিমাকে তো তুমি দেখেছ, সুনেত্রা, দারুণ তেজী মহিলা ছিলেন, তিনি নিজে সেই বুড়োর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দ্বারিকার সঙ্গে মেয়েটির যাতে বিয়ে হয়, সেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাও শেষ পর্যন্ত হল না। মেয়ের বাবা হরমোহন ভটচাজ রটিয়ে দিল যে দ্বারিকারা ভঙ্গ কুলীন, এই বিয়ে হলে তাঁদের জাত যাবে।

দ্বারিকা বলল, ভঙ্গ কুলীন টুলিন আসল কারণ নয়। আসল কারণ হল টাকা। আমি তখনও জমিদারির মালিক হইনি, সে রকম সুদূর সম্ভাবনাও ছিল না। আমার মায়ের মামাতো ভাইরা পরপর তিনজন কলেরায় মারা না-গেলে এ জমিদারি আমার পাবার কথা ছিল না। তখন আমি ছিলাম গরিব গৃহস্থের সন্তান, গাদা গুচ্ছের পণের টাকা দেবার সামর্থ্য ছিল না, মেয়ের বাপ সেই জন্যই আমাকে পছন্দ করেনি।

যাদুগোপাল বলল, বড় ভাল মেয়ে, আমাদের বাড়িতে খেলা করতে আসত, আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের থেকে একেবারে আলাদা। বিয়ের পর বছর ঘুরল না, সেই ফুলের মতন নিষ্পাপ মেয়ে বিধবা হল, তারপর কারা যেন তাকে লুট করে নিয়ে গেল।

দ্বারিকা বলল, সে একেবারে হারিয়ে যায়নি। আমি পরে তাকে আবার খুঁজে পেয়েছি। বউবাজারের একটা ভাড়া বাড়িতে সে থাকে। তার নাম এখন বসন্তমঞ্জরী।

সুনেত্রা বলল, এই বসন্তমঞ্জরীর কথা আমি ওঁর কাছে শুনেছি।

দ্বারিকা বলল, খুঁজে পাওয়ার পরই আমি ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। বিধবা বিবাহে এখন কোনও বাধা নেই। কিন্তু আমার মা বেঁকে বসেছিলেন প্রচণ্ডভাবে। ওই মেয়েকে বিয়ে করলে তিনি আত্মঘাতিনী হবেন এই ভয় দেখিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে। মা এখন আর নেই। সেই শপথের দায় থেকে আমি মুক্ত। এবারে বসন্তমঞ্জরীকে আমি সানন্দে বিয়ে করতে পারি।

যাদুগোপাল বলে ফেলল, সর্বনাশ!

দ্বারিকা চমকে উঠে বলল, সে কী, তুই সমর্থন করবি না?

যাদুগোপাল বলল, দ্বারিকা, তুই সাধারণ ঘরের ছেলে হলেও তোর মায়ের সঙ্গে জমিদার বংশের সম্পর্ক ছিল। তিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, জমিদারের পক্ষে কিছু কিছু বাহ্যিক চালচলন মেনে চলতেই হয়। জমিদারের পক্ষে একটা কেন পাঁচটা রক্ষিতা থাকলেও দোষ নেই, কিন্তু কোনও নষ্ট, পতিতাকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে গৃহিণীর পদে বসালে সমাজ তা মেনে নেবে না, প্রজারা ছি ছি করবে!

দ্বারিকা ধমকের সুরে বলল, বসন্তমঞ্জরী নষ্টও নয়, পতিতাও নয়!

যাদুগোপাল বলল, তুই কিংবা আমি তা মানলেও আর পাঁচজন তা মানবে কেন? বিধবা হবার পর দু'তিন হাত ঘুরে সে হাড়কাটার গলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, সুতরাং সমাজের চোখে সে পতিতা। তুই হঠাৎ এরকম হঠকারিতা করতে গেলে বিরাট গোলমালের সৃষ্টি হবে। তুই বরং এক কাজ কর না। আমাদের বাসন্তীকে তুই যেমন দেখাশুনো করছিস, ওর কাছে যাওয়া-আসা করিস, সে রকম চলুক। তুই অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে কর। তাতে তোর বংশ রক্ষা হবে।

দ্বারিকা বলল, বাঃ, কী চমৎকার প্রস্তাব! আর একটি নির্দোষ মেয়ে, তাকে আমি বিয়ে করব কিন্তু তাকে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দেব না, আর একটি নিরপরাধ মেয়ে, যে-তার বাপ-মায়ের দোষে খারাপ অবস্থায় পড়েছে, যাকে আমি সত্যি সত্যি নিজের স্ত্রী মনে করি, সে পাবে না স্ত্রীর অধিকার। আ-হা-হা, কী তোদের অদ্ভুত বিচার!

যাদুগোপাল বলল, তুই আমাকে ধমকাচ্ছিস কেন? এসব তো তোদের হিন্দু সমাজের ব্যাপার।

মামলা-মকদ্দমা চালাবার জন্য আমাকে এসব জানতে হয়। আমাদের সমাজে এসব কিছু নেই। তোকে তো তোদের সমাজের রীতিনীতি মানতেই হবে, তাই বলছিলাম।

দ্বারিকা ভুরু তুলে বলল, ও, তোদের ব্রাহ্মরা বুঝি সবাই ধোয়া তুলসি পাতা? সবাই বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকে?

সুনেত্রা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, যা বলেছেন!

দ্বারিকা বলল, হিন্দুত্ব নিয়ে আমার গর্ব আছে। তবে, যে-মানুষ নিজের ধর্মের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা না করে, সে নিজের ধর্মকে ভালবাসে না! ধর্ম মানে তো কতকগুলি সংস্কারের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস নয়! বাপ-মায়ের দোষে যদি একটি মেয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে, তবু যে সমাজ সেই মেয়েটিকে শাস্তি দিতে চায়, চিরকালের জন্য তাকে নরকে ঠেলে দেয়, তা হলে সেটা আবার কোনও সমাজ নাকি? সে সমাজ গোল্লায় যাক! সমাজের নির্দেশ আমি মানব না, তবু আমি হিন্দুই থাকব।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বারিকা বলল, যাক, বোঝা গেল, আমার এ বিয়েতে তোর সমর্থন নেই। তবু বসন্তমঞ্জরীকে এবার আমি বিয়ে করবই।

যাদুগোপাল সচকিত হয়ে বলল, সে কথা আমি বললাম কখন? আমার আপত্তি থাকবে কেন? তুই বিপদে পড়তে পারিস, সে কথাই আমি ভাবছিলাম।

দ্বারিকা বলল, আমি কোনও বিপদ গ্রাহ্য করি না!

সুনেত্রা বলল, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে আপনার কথা শুনে। রক্ষিতা রাখলে সমাজ আপত্তি করে না। চোখ বুজে থাকে, অথচ সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে গেলে সমাজ দাঁত কিড়মিড় করে তেড়ে আসে, এ আবার কেমন কথা!

যাদুগোপাল বলল, দ্বারিকা, তোকে আমি আগে যেমন দেখেছি, তার থেকে তোর যেন অনেক বদল ঘটে গেছে। তুই যখন বদ্ধপরিকর হয়েছিস, তোর সাহসও আছে, তখন একটা টেস্ট কেস হিসেবে এটা দেখা যেতে পারে। বিয়ে হয় একজন পুরুষের সঙ্গে একজন রমণীর, তাদের যদি পরস্পরের সম্মতি থাকে, তা হলে সমাজ সেখানে মাথা গলাতে আসবে কেন? হয়তো গোপনে গোপনে আগে হয়েছে, কিন্তু তুই যা প্রকাশ্যে করতে যাচ্ছিস, স্মরণ কালের মধ্যে সে রকম ব্যাপার ঘটেনি। একটা দারুণ শোরগোল পড়ে যাবেই। যদি আইনগত কোনও বাধা আসে, আমি অবশ্যই তোর পাশে থাকব, সর্বশক্তি দিয়ে লড়ে যাব। সামাজিক বাধাটা তোকে সামলাতে হবে।

দ্বারিকা বলল, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। তবু বন্ধুরা আমার পাশে থাকবে, এটাই শুধু চাই। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। হ্যাঁ রে, ভরত ছোঁড়াটা এখন কোথায় থাকে বলতে পারিস?

যাদুগোপাল বলল, কী জানি, বহুদিন তার কোনও পাত্তা নেই। তবে ভূমিসুতার সন্ধান পেয়েছি, আমাদের বাড়িতে সে কয়েকটা দিন কাটিয়েও গেছে।

দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, ভূমিসুতা কে?

যাদুগোপাল বলল, ভরত যখন ভবানীপুরে ছিল, সেই বাড়িতে ওই নামে একটি মেয়ে থাকত, তোর মনে নেই? ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত পরিবর্তনে সে এখন থিয়েটারের নাম করা অভিনেত্রী। সেও অবশ্য ভরতের সন্ধান জানে না।

দ্বারিকা বলল, আমার বিয়েতে মাঠে ম্যারাপ বেঁধে, রোশন চৌকি বসিয়ে বিরাট একটা ভোজ দেব। শহরের মাথা মাথা লোকদের নেমন্তন্ন করব, যাতে কেউ মনে না করে আমি চুপিসাড়ে এই বিয়ে করছি। সে সময় ওই মেয়েটিকেও ডাকতে হবে। ভরতটা এমন নিমক হারাম, একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে না!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে জুড়ি গাড়িতে উঠতে যাবার আগে যাদুগোপালের দু'হাত জড়িয়ে ধরে দ্বারিকা বলল, তোর কথায় আমি যে কতখানি ভরসা পেলাম। যাদু, তোর স্ত্রীর সামনে

আমি একটা কথা বলতে পারিনি। বসন্তমঞ্জরীকে আমি ছেড়ে থাকতে পারি না, সে আমার প্রাণাধিক কিন্তু সে যে আমায় কত কষ্ট দিয়েছে, তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমি প্রায় প্রতিদিনই তার কাছে যাই, তার ঘরে রাত্রিবাস করি, এক শয্যায় শুই, কিন্তু এতগুলি বছর গেল, আমরা একদিনের জন্যও উপগত হইনি। বসন্তমঞ্জরী কিছুতেই রাজি নয়। আমাদের মিলনে যদি কোনও সন্তান জন্মায়, সে হবে বেজন্মা, সে পিতৃপরিচয় পাবে না। এই কথা ভেবেই ওর আপত্তি। পৃথিবীতে ও এমন কোনও শিশুকে আনতে চায় না, যার জন্মের সঙ্গে জড়ানো থাকবে অপমান! এক বিছানায় শোওয়া, পাশে প্রিয় নারী, অথচ তাকে গ্রহণ করা যাবে না, এ যে কী যাতনা, কী কষ্ট, তুই বুঝবি না!

যাদুগোপাল মৃদু স্বরে বলল, এ মেয়ে যদি সতী না হয়, তা হলে জগতে সতী কে?

দ্বারিকার এই জেদি পরিকল্পনায় এক দারুণ বাধা এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। বসন্তমঞ্জরী নিজেই এ বিয়েতে রাজি নয়।

দ্বারিকার একটা ভুল হয়েছিল, সে অনেকখানি প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল বসন্তমঞ্জরীকে কিছু না জানিয়েই। সে ভেবেছিল একেবারে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে এনে তা দেখিয়ে বসন্তমঞ্জরীকে অবাক করে দেবে। সে ধরেই নিয়েছিল, বসন্তমঞ্জরী চমকিত তো হবেই, খুশির জ্যোৎস্নায় তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু নিমন্ত্রণপত্র তৈরি হবার আগেই সংবাদটা বসন্তমঞ্জরীর কানে পৌঁছে গেল। মুফি নামে তার দাসীর সঙ্গে বাবুর কোচোয়ানের বেশ ভাব। সেই কোচোয়ানের মুখেই মুফি জানতে পারল যে বাবুর বাড়িতে বিবাহের প্রস্তুতি চলছে। মুফি সঙ্গে সঙ্গে সে খবর জানিয়ে দিল বসন্তমঞ্জরীকে।

বসন্তমঞ্জরী সত্যিই খুশি হল। এই সংবাদ এনে দেবার জন্য সে মুফিকে পুরস্কার দিল দুটি টাকা। সেই সন্ধ্যায় দ্বারিকা আসার পর বসন্তমঞ্জরী তার পায়ের কাছে বসে হাসি মুখে বলল, হ্যাঁ গো, তুমি নাকি বিয়ে করছ? যাক, এতদিনে তোমার সুমতি হয়েছে। আমি তো তোমায় আগে কতবার বলেছি। তোমার মা বেঁচে থাকতে থাকতে কেন করলে না, উনি কত আনন্দ পেতেন। নাতি-নাতনির মুখ দেখে শান্তিতে স্বর্গে যেতে পারতেন। যাক, তবু তো বংশের মুখ রক্ষে হবে। তুমি আমার একটা কথা রাখবে? তোমার বিয়ের বাসরে তো আমার যাওয়া হবে না, কিন্তু মালা বদলের দু'খানা মালা আমি গেঁথে দেব, সে দুটি মালা তোমরা পরবে বলো!

দ্বারিকা হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর রঙ্গ করে বলল, আমার বিয়ের আসরে তোমার যাওয়া হবে না? তা হলে আমার বিয়েই হবে না!

বসন্তমঞ্জরী বলল, যাঃ, সে আবার কী কথা। না, না, তুমি আমার কথা কিছু ভেব না। বিয়ে বাড়িতে আমাদের যেতে নেই, তাতে অমঙ্গল হয়। আমি তোমাদের জন্য মালা গেঁথে দেব, সেই মালা তোমরা গলায় দেবে, তাতেই আমার আনন্দ হবে!

দ্বারিকা ঝুঁকে এসে বসন্তমঞ্জরীর একখানি হাত ধরে বলল, সত্যি রে, সত্যি কথা বলছি। বাসি, তুই না গেলে আমার বিয়ে হবে কী করে? আমি যে তোকেই বিয়ে করব!

বসন্তমঞ্জরী চোখ কুঞ্চিত করে বলল, অমন অলক্ষুণে কথা বল না! আমার সঙ্গে তোমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে!

দ্বারিকা বলল, বাসি, তুই কি ভাবছিলি, আমি গোপনে গোপনে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করবার ব্যবস্থায় মেতেছিলাম? আমি বুঝি এমন ফেরেপবাজ? এবার তুই আমার স্ত্রী হবি। তুই তো জানিস, মায়ের কাছে আমার শপথ ছিল। মা নেই, সে শপথেরও ইতি হয়ে গেছে।

বসন্তমঞ্জরীর মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। খুব আস্তে আস্তে সে বলল, মানুষ মরে গেলেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়? তিনি কি ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছেন না?

উঠে দাঁড়িয়ে বসন্তমঞ্জরী চলে গেল জানালার ধারে। সে সাজগোজ করতে ভালবাসে। আজও পরে আছে একটি রক্তবর্ণ রেশমি শাড়ি, খোঁপায় সাদা রঙের ফুল, পায়ে রুপোর মল। তার মুখমণ্ডল বিষাদে ভরে গেছে। আপনমনে সে বলতে লাগল, তোমার বউ হব, সে ভাগ্য করে আমি আসিনি।

সে জন্য আমার মনে কোনও খেদও নেই। তুমি আমায় অনেক কিছু দিয়েছ, আমিও সাধ্যমতন...তুমি গান ভালবাস, আমি তোমাকে গান শোনাই, তোমার গেলাসে মদ ঢেলে দিই, এক একদিন মনের আনন্দে নাচি, এই তো বেশ, আর কিছু চাই না। তুমি অন্য মেয়েকে বিয়ে করো, তোমার বংশ রক্ষা হোক।

দ্বারিকা উঠে এসে বসন্তমঞ্জরীর দুই কাঁধ ধরে বলল, বাসি, আমি তোর ওপর কখনও জোর করিনি। মাতাল হয়ে দাপাদাপি করেছি, তবু তোর অনিচ্ছের জন্য তোর গায়ে হাত দিইনি। কিন্তু এবার আমি জোর করব। পুরুত ডেকে, মন্ত্র পড়ে আমি বিয়ে করব তোকে। দেখি কে আমাদের বাধা দিতে পারে! অনেকখানি ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন তুই এমন কথা কেন বলছিস! এখন বিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে লোকে হাসবে, সবাই বলবে, আমিই বুঝি ভয়ে পিছিয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত!

বসন্তমঞ্জরী মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি অনেককে জানিয়ে দিয়েছ, শুধু আমায় জানাওনি। তোমার জেদ বজায় রাখার জন্যই তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও!

দ্বারিকা বলল, সে জন্য কেন হবে? আমি তোকে চাই, তোকে কতখানি চাই, তা কি তুই জানিস না?

বসন্তমঞ্জরী বলল, তুমি পিছিয়ে গেলে লোকে হাসবে। আর আমি রাজি হলে লোকে আমার সম্পর্কে কী বলবে? সবাই বলবে, আমি একটা লোভী পাপীয়সী, নরকে থেকে স্বর্গের দিকে হাত বাড়াচ্ছি। আমি একটা নষ্ট মেয়েমানুষ, মোহিনী মায়া দিয়ে একজন পুরুষের মাথা খেয়েছি, ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি করিয়েছি, যার মা মারা গেছেন মাত্র কয়েক মাস আগে, এখনও বছর পেরোয়নি। ছি ছি ছি, এমন কাজ আমায় করতে বোলো না।

দ্বারিকা কম্পিত গলায় বলল, বাসি, লোকে কী বলল আর কী ভাবল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমরা কেন ওসব গ্রাহ্য করব। তোর গর্ভের সন্তানই হবে আমার বংশধর।

বসন্তমঞ্জরী জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। সদ্য সূর্যাস্তের আকাশে এখনও লাল রঙের আভা। এদিকে ওদিকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। একটুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সে বলল, আকাশে কোথাও আমার বিয়ের কথা লেখা নেই।

তারপর সে মুখ ফেরাল ঘরের একটা সাদা দেওয়ালের দিকে। এমনভাবে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেদিকে, যেন নগ্ন দেওয়াল নয়, সে দেখছে একটি দর্পণ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, দেওয়ালেও কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ওগো, আমাদের মতন মেয়েদের আর বিয়ে হয় না, হতে নেই।

হু হু করে কান্না বেরিয়ে এল তার দু'চক্ষু দিয়ে।

দ্বারিকা তবু দৃঢ় স্বরে বলল, আমরা ভবিতব্যের কথাও চিন্তা করব না। বাসি, মুখ তোল, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার বুকে কী আগুন জ্বলছে দেখতে পাচ্ছিস না? যদি একদিনের জন্যও হয়, তুই সে আগুনে ঝাঁপ দিবি না? জোর করে নয়, গোপনে গোপনে নয়, পাপবোধ নিয়েও নয়, আমি সসম্মানে তোকে চাই।

২৫

বিশ্বনাথ দত্তের মধ্যমপুত্র মহেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষার জন্য এসেছে ইংল্যান্ডে। এদেশে তার পরিচিত কেউ নেই, অর্থবলও নেই, তবে তার একমাত্র ভরসা এই যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখন লন্ডনে অবস্থান করছেন।

মহেন্দ্রকে জাহাজ-ঘাটা থেকে নিয়ে এসে একটি বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে কৃষ্ণ মেনন নামে তার দাদার এক ভক্ত। নতুন দেশ, সম্পূর্ণ অন্যরকম পরিবেশ, চতুর্দিকে রাজার জাতের লোক, প্রথম প্রথম খুব আড়ষ্ট হয়ে রইল মহেন্দ্র। দিন সাতেক কেটে গেছে, এখনও দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি নানা কাজে ব্যস্ত।

একদিন কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে মহেন্দ্র। প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পর দেখতে দেখতে মনে হয়, ব্রিটিশ রাজত্বের এই রাজধানীর সঙ্গে ভারতের রাজধানী কলকাতা শহরের বেশ খানিকটা মিল আছে। ইংরেজরা নিজেদের এই শহরের আদলেই তো কলকাতা শহরটা বানিয়েছে। অক্সফোর্ড সার্কাস, পিকাডেলি সার্কাস দেখতে দেখতে কলকাতার ডালহৌসি-পার্ক স্ট্রিটের কথা মনে পড়ে। এখানে মস্ত মস্ত বাড়িগুলির দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকাতে হয়, কলকাতার মল্লিক, শীল, ঘোষ, বোস, ঠাকুরদের প্রাসাদগুলিই বা কম কীসে!

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে চলে এল চীপসাইড পল্লীর দিকে। এটা বাণিজ্য এলাকা, কলকাতার বড়বাজারের মতন। অসংখ্য মানুষ পিলপিল করছে চতুর্দিকে, সবাই ছুটছে যেন কীসের তাড়ায়। রাস্তার ধারে ধারে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে ফেরিওয়ালারা, ঘরঘরিয়ে যাচ্ছে চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি আর দু' চাকার এক্কা, কিশোরবয়েসী খবরের কাগজের হকাররা তারস্বরে শোনাচ্ছে সেদিনের গরম গরম খবর। রেস্তোরাঁগুলি থেকে ভেসে আসছে কফির গন্ধ।

একটা চৌমাথার কোণে এক ইংরেজের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন ভারতীয়, সেদিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র চমকিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভারতীয়দের মধ্যে একজন তার চেনা, সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, ওই তো শরৎদাদা!

বরানগর মঠে দীক্ষা নেবার পর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর যদিও সন্ন্যাস নাম হয়েছে সারদানন্দ, কিন্তু মহেন্দ্র তাঁকে পূর্ব নামেই ডাকে। সারদানন্দ খুব স্নেহ করেন তাকে। বরানগর-আলমবাজার মঠে মহেন্দ্র নিয়মিত যাতায়াত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সব শিষ্যেরই সে স্নেহভাজন, কিন্তু সে দীক্ষা নেয়নি। ভুবনেশ্বরীদেবী তাঁর এক পুত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেছেন, আর কোনও সন্তানকে ছাড়তে তিনি রাজি নন।

প্রবাসে একজন পরিচিত মানুষকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। মহেন্দ্রর ইচ্ছে হল তখনই সারদানন্দের দিকে ছুটে যেতে। মেননকে সে জিজ্ঞেস করল, পাশের ভদ্রলোকটি কে?

মেনন পাশ ফিরে দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে রইল মহেন্দ্রর দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, আপনি চিনতে পারছেন না?

মহেন্দ্র আবার তাকিয়ে দেখল। সেই ব্যক্তিটি কালো রঙের প্যান্টালুন, কালো রঙের ভেস্ট পরিহিত, গলায় টাই নেই বটে, কিন্তু জামার কলারটি স্বতন্ত্র, মাথায় লখনউয়ের তাজের মতন অর্ধচন্দ্রাকৃতি কালো, মোটা টুপি, সামনের দিকে সিঁথি কাটা চুল দেখা যায়। গায়ের রং বেশ ফর্সা, চক্ষু দুটি সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় আকারের, দারুণ তেজসম্পন্ন দৃষ্টি। তিনি স্থির নেত্রে দূরের কিছু একটা লক্ষ করছেন।

মেননের বিস্ময় দেখেই মহেন্দ্র বুঝতে পারল, সে কী ভুল করেছে। নিজের অগ্রজকে সে চিনতে পারেনি! কিন্তু মানুষের এমন রূপান্তরও হয়! কলকাতার সেই নরেন দত্তের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের এত তফাত! মাত্র চার-পাঁচ বছর, তার মধ্যেই এমন পরিবর্তন!

নরেন দত্তই যে বিবেকানন্দ, সে কথা জানতে কলকাতার অনেকেরই বেশ সময় লেগেছিল। তারপর থেকে মহেন্দ্র এবং তার বাড়ির লোকজন সবাই স্বামী বিবেকানন্দের জয়যাত্রার সমস্ত কাহিনী অনুসরণ করেছে। মার্কিন মুলুকের দিকে দিকে বেদান্তের বাণী প্রচার করে তিনি এসেছেন ইংল্যান্ডে, কিন্তু এ যেন অন্য মানুষ। মানুষের চরিত্র-রূপ ফুটে ওঠে তার চোখে, স্বামী বিবেকানন্দর চোখ দেখে আর বোঝাই যায় না, ইনি মহেন্দ্রর সহোদর ভ্রাতা। মহেন্দ্রর একটু ভয় ভয় করতে লাগল। তার মনে হল, তার অগ্রজ এমন একটা উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন, এখন আর তাঁর কাছাকাছি সে পৌঁছতে পারবে না।

বিবেকানন্দের পাশে যে ইংরেজ যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম গুডউইন। সে দ্রুত সংকেত লিপি বা শর্ট হ্যান্ড বিশেষজ্ঞ। সেই জীবিকা নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়, পেশাগতভাবে বিবেকানন্দর বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে অন্য সব ছেড়েছুড়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে জুটে গেছে, এখনও সে ওই কাজই করে। কিন্তু পয়সাকড়ির প্রশ্ন নেই, গুরুর ছিটেফোঁটা কৃপাই তার ভরসা।

সারদানন্দও ইংলন্ডে পৌঁছেছেন মাত্র দিন সাতেক আগে। বিবেকানন্দই তাঁকে আনিয়েছেন কলকাতার মঠ থেকে। দিনের পর দিন একা বহু শ্রোতাদের সামনে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। ক্লান্ত হয়ে পড়েন মাঝে মাঝে, তাই বিবেকানন্দ ঠিক করেছেন কলকাতা থেকে আরও কয়েক জন গুরুভাইকে আনিয়ে নিজের আরব্ধ কাজ আরও বেশি প্রচারের দায়িত্ব দেবেন।

গুডউইন সারদানন্দকে কিছু বোঝাচ্ছিল, বিবেকানন্দ অনেকক্ষণ নীরব। মহেন্দ্র আর মেনন কাছে আসতেই সারদানন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মহেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন। যেন সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তি হঠাৎ পেয়ে গেছে একটি কাষ্ঠখণ্ড। সারদানন্দ বাংলায় মহেন্দ্রর কুশল সংবাদ নিতে নিতে বললেন, ওরে, কী দেশে এসে পড়েছি, সর্বক্ষণ ইংরিজিতে ক্যাচ-ম্যাচ করতে হয়, কোনও খাদ্য মুখে রোচে না...

বিবেকানন্দ ভাইকে দেখে তেমন কিছু সাদর সম্ভাষণ করলেন না। গম্ভীরভাবে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? কয়েকদিন পর তুমি আমার সঙ্গে এসে থাকবে।

কোটের পকেট থেকে পাঁচটি পাউন্ড বার করে মহেন্দ্রর হাতে দিয়ে তিনি মেননকে নির্দেশ দিলেন, আমি স্টার্ডির বাড়ি ছেড়ে আগামীকাল সেন্ট জর্জেস রোডে লেডি ফার্গুসনের বাড়িতে উঠে আসছি। তুমি মহেন্দ্রকে সেখানে পৌঁছে দিয়ো।

তারপর আর বিবেকানন্দ সেখানে দাঁড়ালেন না, এগিয়ে গেলেন।

মহেন্দ্রর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ নামে যাকে সে দেখল, ইনি যেন সত্যিই এক অপরিচিত দূরের মানুষ। একে কি সে দাদা বলে ডাকতে পারবে, না স্বামীজি বলতে হবে?

মেনন বলল, মহেন্দ্র, তুমি প্রথমে তোমার নিজের অগ্রজকে চিনতে পারনি, তাতে আমি অবাক হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার নিজেরও ওই একই ব্যাপার হয়েছে। উনি আমেরিকা যাত্রা করার আগে মাদ্রাজে আমি ওঁকে দেখেছি। আলাসিঙ্গা আর আমি ওঁর সঙ্গে কত সময় কাটিয়েছি। আমিই তো ওঁর তামাক সেজে দিতাম। তখন অঙ্গে ছিল সন্ন্যাসীর সাজ, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কত হাসিমস্করা করতেন, সাধারণ মানুষের মতন মিশতেন। কিন্তু এখন যেন উনি এক পৃথক ব্যক্তি, দারুণ এক মহাশক্তি ভর করেছে ওঁর ওপর। এক একদিন বক্তৃতার সময় এমন সিংহবিক্রম প্রকাশ পায় যে আমার গা ছমছম করে। আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস পাই না।

পরদিন সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে এসে মহেন্দ্র সঙ্কোচে এক পাশে বসে রইল। বাড়িতে তখন অন্য দু' চারজন অভ্যাগত রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন বিবেকানন্দ।

সারদানন্দ কাছেই রয়েছেন, কিন্তু মুখ খুলছেন না। এরকম গম্ভীর পরিবেশে সময় যেন কাটতেই চায় না। এক সময় অন্যরা বিদায় নিলে বিবেকানন্দ উঠে গেলেন ওপর তলায়। খানিক বাদে আবার নেমে এলেন বৈঠকখানায়। এবারে যেন তিনি অন্য মানুষ।

সারা মুখে হাসি মাখা, তবু সারদানন্দকে এক ধমক দিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে শরৎ, তুই শালা কাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভ্যাড় ভ্যাড় করে বাংলা বলছিলি কেন রে ? কতবার বলে দিয়েছি না, কাছাকাছি কোনও ইংরেজ থাকলে নিজেদের ভাষায় কথা বলা অতি অভদ্রতা। যাতে সকলে বুঝতে পারে, সেই জন্য ইংরিজি বলতে হয়। মহীনকে দেখেই তুই যে একেবারে উথলে উঠলি ! তুই ইংলিশ বলা প্র্যাকটিস করবি। শালা, তোকে এখানে আনিয়েছি কি এমনি এমনি।

মহেন্দ্রর দিকে ফিরে বললেন, ও মহীন, তোর মুখখানা শুকনো কেন ? খাওয়া হয়নি কিছু বুঝি ? মা কেমন আছেন বল ! আর সবাই কে কেমন আছেন ? আসার পথে জাহাজের দুলুনিতে তোর কষ্ট হয়নি তো ? তুই বুঝি ভারছিস, কোথায় এসে পড়লুম রে বাবা ! প্রথম প্রথম এমন মনে হয়। লোকের সঙ্গে কথা বলতে বাধো বাধো লাগে। সব ঠিক হয়ে যাবে ! জিভের আড় ভাঙতে একটু সময় লাগবে। বেশি বেশি লজ্জা করবি না। এ দেশে তুই লজ্জা করে না খেয়ে থাকলে কেউ পুঁছবেও না।

বুক পকেট থেকে একটি অতি সুদৃশ্য সোনার কলম বার করে বললেন, এটা তুই নে। আমার দরকার নেই, তুই এটা ব্যবহার করবি।

মহেন্দ্রর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে এক গাল হেসে বললেন, এই পোশাক তোকে কে বানিয়ে দিয়েছে ? ঠিক যেন নব কার্তিকের মতন দেখাচ্ছে। এই গাইয়া জামা-প্যান্ট এদেশে চলবে না।

এবার পাশ পকেটে হাত দিলেন, এগারোটি পাউণ্ড মুঠোয় উঠে এল, সেগুলো মহেন্দ্রর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, এক প্রস্থ পোশাক কিনে নিবি।

একটা চুরুট ধরিয়ে শরতের কাছে গিয়ে বললেন, এই হুঁৎকো, একটা গান গা না। এখন যত ইচ্ছে বাংলা বলে পেট খোলসা করে নিতে পারিস !

মহেন্দ্র এখনও কথা বলতে পারছে না। এ যেন ঠিক সেই আগেকার আমুদে নরেন দত্ত। এক শরীরে দুই সত্তা। যেন কিছুক্ষণের জন্য উচ্চ স্তর থেকে নেমে এসেছেন সাধারণ স্তরে।

কয়েক দিন পর স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডন ছেড়ে কাছাকাছি একটি গ্রামে মিস মুলার নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার বাড়িতে আতিথ্য নিলেন। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে মেইড্নহেড স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে মাইল তিনেক গেলে পিংমিনিস গ্রিন গ্রাম। সেখানে মিস মুলারের বাগান বাড়িটি ভারী সুন্দর।

অক্ষয়কুমার ঘোষ নামে একটি বাঙালির ছেলেকে মিস মুলার প্রায় নিজের পুত্রের মতন গণ্য করেন। তিনি বেশ ধনী এবং বিবাহ করেননি। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট। এই মিস মুলার ও ই টি স্টার্ডি নামে আর একজন ভদ্রলোকই স্বামীজিকে ইংলন্ডে আমন্ত্রণ করে এনেছেন।

মহেন্দ্র লন্ডনে একা থাকতে চায় না, সেও চলে এল সেই গ্রামে, কিন্তু মিস মুলারের বাড়িতে তার আশ্রয় জুটল না। আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা সম্পর্কে মিস মুলারের মনোভাব বেশ কঠোর। স্বামী বিবেকানন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনি ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন সেই জন্য, কিন্তু তাঁর ভাই এসে থাকবে কেন ? সারদানন্দ বক্তৃতার ব্যাপারে সাহায্য করবেন, তিনি থাকতে পারবেন। আর গুডউইন নামে ছোকরা ইংরেজ হলেও একেবারেই অভিজাত নয়, তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে তিনি রাজি নন। গুডউইন এক দিকে স্বামীজির ভক্ত হলেও প্রায়ই জুয়া খেলে টাকা ওড়ায়, নেশা ভাঙ করে। তারও এ বাড়িতে স্থান নেই।

যাই হোক, মিস মুলারের বাড়িতে অনেক জায়গা খালি পড়ে থাকলেও মহেন্দ্রকে পাশের একটা বাড়ির ঘর ভাড়া করতে হল। এ বাড়িতেই সে অধিকাংশ সময় কাটায়, এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়াও করে প্রায়ই।

প্রৌঢ়া মিস মুলারের প্রকৃতিটি বিচিত্র। তিনি উদার হৃদয়া এবং কৃপণ, সরল ও বদমেজাজি, ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না কিন্তু ইংরেজের জাত্যাভিমান সম্পর্কে অতি সচেতন। একমাত্র স্বামীজি ছাড়া তিনি অন্যদের যখন তখন বকাঝকা করতে ছাড়েন না। তাঁর চেহারাটি পুরুষালি, ওপরের ঠোঁটে বেশ স্পষ্ট গোঁফের রেখা আছে। সম্প্রতি এখানকার রমণীদের পুরুষের মতন পোশাক পরিধানের ফ্যাশান হয়েছে, সেই অনুযায়ী মাঝে মাঝে তিনি হাঁটু পর্যন্ত মোজা, তার ওপর অর্ধেক পা-ওয়ালা ইজের, গায়ে ডবল-ব্রেস্ট কোট ও মাথায় টুপি পরেন। পিংমিনিস গ্রিনে তিনি সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়ান।

দু'বেলা অনেক খরচ করে তিনি সবাইকে খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু কেউ তাঁর কোনও বইতে হাত দিলেই ভারী চটে যান। একদিন বৈঠকখানা ঘরে মহেন্দ্র স্ট্যানলির লেখার 'হাউ আই ফাউন্ড লিভিংস্টোন' বইটা দেখে কয়েক পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে খুব আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল।

একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, আমি এই বইখানা আজ নিয়ে যেতে পারি, কাল ফেরত দেব ?

মিস মুলার ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলেন, না, রেখে দাও ! আমি কারুকে বই দিই না। বই নিয়ে কোনও ব্যাটা ফেরত দেয় না।

মহেন্দ্র ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বইটা রেখে দিল।

বিবেকানন্দ ফায়ার প্লেসের পাশে একটি সুখাসনে বসে চক্ষু বুজে কিছু চিন্তা করছিলেন। ধ্যান ভঙ্গ করে মৃদু হাস্যে বললেন, না, না। মহীন সে রকম ছেলে নয়, ও বই নিশ্চয়ই ফেরত দেবে।

মিস মুলার গজ গজ করতে করতে বললেন, ব্যাটাছেলেদের বিশ্বাস নেই। বই পড়তে নিলে আর ফেরত পাওয়া যায় না। পুরুষদের এই এক দোষ। আর মাগিদের কথা যদি বলো তো নিড়লবক্স, থিম্বল, কাঁচি দেখতে পেলেই সুবিধে মতন নিয়ে সরে পড়বে। মাগিদের সামনে থেকে ওই সব জিনিস লুকিয়ে রাখতে হয়।

স্বামীজি এবার হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, কেন, তাদের বাড়িতে কি কাঁচি-নিড়লবক্স এ সব থাকে না ?

মিস মুলার বললেন, থাকবে না কেন ? মাগিদের তবু তো ওই এক রোগ ! এ পাড়ার মাগিরা বাড়িতে এলেই আমার ভয় করে।

স্বামীজি বললেন, ওগুলোর আর ক' পয়সা দাম ! তারা বাড়িতে এলে আপনি যে কত আদর-যত্ন করে খেতে দেন ?

মিস মুলারের বাড়িতে ভোজ্য পদ নানা রকম থাকলেও তিনি কঠোরভাবে নিরামিষাশী। মহেন্দ্র, সারদানন্দের মতন সদ্য এদেশে আগত বঙ্গসন্তানদের শুধু নিরামিষ মুখে রোচে না। স্বামীজিও মাছ-মাংস পছন্দ করেন, তবু সবাই বাধ্য হয়ে মিস মুলারের নীতি মেনে নিয়েছেন। শুধু মহেন্দ্র মাঝে মাঝে রেল স্টেশনের ধারে রেস্তোরাঁয় গিয়ে লুকিয়ে মাংস খেয়ে আসে।

আহারের স্থানটি অতি রমণীয়। বাড়িটি দোতলা ও কাঠের তৈরি। সামনে একটি ঘেরা বাগান। বাড়ির একতলায় একটি বড় বৈঠকখানা, আর একটি ছোট ঘর। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি, ওপরে আরও তিনটি ঘর রয়েছে। বাড়ির পেছনে উঠোন, তাতে একটি লম্বা কাচের ঘরে অনেক রকম দুর্লভ ফুলের গাছ ও অর্কিড। আর একপাশে নানা রকম লতা কুঞ্জে সাজানো ঘর, সেখানে চেয়ার টেবিল পাতা। এখন বসন্তকাল, শীত খুব কম, এই ঘরটিতে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে খাওয়াদাওয়া করা যায়।

একদিন সেখানে সান্ধ্য আহারে বসা হয়েছে। প্রথমেই পরিবেশন করা হল দুধের মধ্যে মোটা মোটা ম্যাকারনির সুপ, তাতে আবার নুন দেওয়া। দু'এক চামচ মুখে দিতে না-দিতেই সারদানন্দ বিটকেল করে ওয়াক তুলে ফেললেন। স্বামীজি ভুরু কুঁচকিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। সারদানন্দের বমি পেয়ে গেছে, কিন্তু বমি করার উপায় নেই, উঠে যাবারও নিয়ম নেই। অতি কষ্টে প্রায় দম বন্ধ করে তিনি সেই সুপই গিলতে লাগলেন। শেষের দিকে সুপের বাটিটা কাত করে ধরতে হয়, সারদানন্দ সামনের দিকে এমনভাবে কাত করলেন যে গড়িয়ে পড়ে যাবার উপক্রম। স্বামীজি ফিস ফিস করে বাংলায় বললেন, ওরে শরৎ, ও রকম করে ধরে না। আমি যেভাবে করছি সে-রকম

কর। উল্টো দিকে উঁচু কর।

সুপের পর এল মেইন ডিশ। টমাটো ও আলু চটকানো বড় বড় দুটি চপ। সারদানন্দ কাঁটা-ছুরি ধরতে গোলমাল করে ফেললেন। স্বামীজি টেবিলের তলা দিয়ে সারদানন্দের পা নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে বললেন, ডান হাতে ছুরি, বাঁ হাতে কাঁটা ! ছুরি দিয়ে খাবার তোলে না, শুধু কাঁটা দিয়ে তুলতে হয়।

মিস মুলার কী জন্য যেন একবার টেবিল ছেড়ে উঠে যেতেই স্বামীজি অন্য দু'জনকে তাড়াতাড়ি শেখাতে লাগলেন, অত বড় বড় গরস করে না, ছোট ছোট গরস করবি। খাবার সময় জিভ বার করতে নেই। কখনও কাশবি না, ঢেঁকুর তুলবি না, আস্তে আস্তে চিবুবি। খাবার সময় বিষম খাওয়া বড় দূষণীয়। আর নাক ফোঁস ফোঁস করবি না কক্ষনও !

মিস মুলার ফিরে আসতেই আবার ইংরিজি শুরু হল। সারদানন্দের মুখে একটিও কথা নেই, কোনও রকমে গিলছেন ! মহেন্দ্র কম বয়েসী ছেলে, তার খিদে বেশি, স্বাদ ভাল না লাগলেও সে খেয়ে যায়। টেবিলের ওপর একটি প্লেটে তিনটি মাত্র কাঁচা লঙ্কা রয়েছে। স্বামীজি কাঁচা লঙ্কা ছাড়া খেতে পারেন না, তাই কৃষ্ণ মেনন অনেক দোকান খুঁজে খুঁজে ওই তিনটি মাত্র লঙ্কাই জোগাড় করতে পেরেছে। অতি কচি লঙ্কা, ঝাল নেই, শুধু একটু গন্ধ আছে। তার এক একটার দাম প্রায় এক টাকা ! স্বামীজি কৃপণের মতন তারিয়ে তারিয়ে সেই একটি লঙ্কা খেলেন, বাকি দুটি রেখে দেওয়া হবে। সারদানন্দ আর মহেন্দ্ররও লঙ্কা দেখে লোভ হয়, কিন্তু দাম শুনে হাত দেবার উপায় নেই।

আরও কিছু শাক-চচ্চড়ি খাওয়ার পর পুডিং এসে গেল। তখনও মহেন্দ্রর খিদে মেটেনি। সে মৃদু স্বরে বলল, আমি আর এক টুকরো রুটি নিতে পারি ?

মিস মুলার অমনি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলেন, কে তোমায় বারণ করেছে ? অমন মিনমিন করে চাইলে কেন ? আমরা কি কৃপণ না নিষ্ঠুর ? নাকি তোমায় আধপেটা খাইয়ে রাখতে চাই ! রুটি চাইলে, তা অমন ভয়ে ভয়ে চাওয়ার কী আছে ?

স্বামীজি প্রৌঢ়াটিকে সামলাবার জন্য বললেন, ভয়ে বলেনি। আমাদের ভারতবর্ষে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সামনে কিছু চাইবার বেলা নম্রভাবে কথা বলে।

মিস মুলার তাতেও ক্ষেপে উঠে বললেন, এ তোমার ভারতবর্ষ নয় ! এ ইংল্যান্ড, এখানে ছোট ভাই, বড় ভাই সব সমান ! যা খেতে ইচ্ছে হয় খাবে, কেউ জোরও করবে না, বারণও করবে না ! ওর কথা শুনলে লোকে ভাববে, আমি ওকে খেতে দিই না !

এত বকুনির পর মহেন্দ্রর খাবার ইচ্ছেটাই উপে গেল।

স্বামীজি আর মিস মুলার এর পর লন্ডনে বক্তৃতা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। সারদানন্দ ও মহেন্দ্র উঠে চলে গেল বৈঠকখানা ঘরে। সারদানন্দ ধপাস করে একটা কেদারায় বসে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, ওরে বাপ রে বাপ। এর নাম খাওয়া ! এটা কোরো না, সেটা কোরো না, কথায় কথায় ধমক ! কোথায় হাতে করে বড় বড় থাবা করে খাব, তা না একটু-একটু করে ছুঁচ বিঁধে খাওয়া। আর দেখ দেখি হিন্দুর ছেলেকে দুধে নুন মিশিয়ে খাওয়ালে ! ও খেয়ে আমার পেট গুলিয়ে উঠল, কিন্তু ভয়ে বমিও করতে পারি না, উঠতে পারি না। এ দেশের দুধ কেমন সুন্দর ঘন, মোটা ভারমিশেলি পাওয়া যায়, কমলালেবুও এ দেশে আছে, তা দিয়ে চিনি মিশিয়ে কী দিব্য ক্ষীর বানানো যেতে পারে, তা নয়, ছ্যা ছ্যা ছ্যা, দুধে নুন মিশিয়ে নষ্ট করছে !

সারদানন্দের অবস্থা দেখে হাসতে লাগল মহেন্দ্র। সারদানন্দ আরও বলতে লাগলেন, কী কুক্ষণেই এ দেশে এলুম রে ! বাবাঃ, চব্বিশ ঘণ্টা আটে-কাটে বদ্ধ থাকা, এ কি আমার সাধ্যি ! অষ্টবক্রে বন্ধন করে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা। এ বাপু নরেনের সাধ্যি, নরেন করুক গে ! নরেনের হাপরে পড়ে প্রাণটা আমার গেল। কোথায় বাড়ি ছাড়লুম মাধুকরী করব, নিরিবিলিতে জপ-ধ্যান করব, না এক হাপরে ফেলে দিলে। না জানি ইংরিজি, না জানি কথাবার্তা কইতে, অথচ তহিশ হচ্ছে লেকচার কর, লেকচার কর। আরে বাপু, আমার পেটে কি কিছু আছে ! আবার নরেন যা রাগী হয়েছে, কোন্ দিন না মেরে বসে। তা চেষ্টা করব, দাঁড়িয়ে উঠে যা আসবে তাই একবার বলব ; যদি

হয় তো ভাল, না হয় এক চোঁচা দৌড় মারব, একেবারে দেশে গিয়ে উঠব। সাধুগিরি করব, সে আমার ভাল। কী উপদ্রবেই না পড়েছি। এমন জানলে কি এখানে আসতুম। শুধু নরেনের অসুখ শুনে, তার সাহায্যের দরকার শুনে এলুম ! নরেন তো দেখি সারাদিন বকছে তো বকছেই, মুখের আর বিরাম নেই। নরেন কিনা উকিলের ব্যাটা, তাই অত বকতে পারে... হ্যাঁ রে, ওর কি মুখ ব্যথা করে না, মাথা ধরে না ?

এই সময় স্বামীজি এ ঘরে আসতেই সারদানন্দ হঠাৎ একেবারে চুপ করে গিয়ে ভাল মানুষের মতন একটা খবরের কাগজ পড়তে শুরু করে দিলেন।

স্বামীজি বললেন, শরৎ, খাওয়াদাওয়া তো হল, কিন্তু এক্ষুনি শুতে গেলে তো চলবে না। অনেক কাজ পড়ে আছে। কী রে, কাজ করার ইচ্ছে আছে এখন ?

সারদানন্দ বললেন, হ্যাঁ, আমার মোটেও ঘুম পায়নি। কোন কাজটা ধরবি বল ?

স্বামীজি বললেন, তোর সেই লেখাটা শেষ হয়েছে ? সেটা আজ রাত্তিরের মধ্যে ঠিকঠাক করে নিলে কেমন হয় ?

মাদ্রাজ থেকে ব্রহ্মবাদিন নামে একটি ইংরিজি পত্রিকা বেরুচ্ছে, স্বামীজি মাঝে মাঝে সে পত্রিকার জন্য অর্থ প্রেরণ করেন। আমেরিকায় তিনি কতদূর কাজ করে এসেছেন তার একটা রিপোর্ট ওই কাগজে ছাপা হবে। সারদানন্দ ওপর থেকে সেই লেখাটি নিয়ে এলেন। স্বামীজি তাঁর নির্দিষ্ট সুখাসনটিতে বসে পাইপে তামাক গুঁজে ধরিয়ে বললেন, পড়ে যা।

সারদানন্দ পড়ছেন, স্বামীজি শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে সংশোধন করে দিচ্ছেন। ইয়েস্টারডে নাইট ঠিক হয় না, ওটা কেটে দিয়ে লেখ লাস্ট নাইট... ফর অ্যামেরিকান্‌স নয়, লেখ ফর দা অ্যামেরিকান্‌স...

সারদানন্দের মনমেজাজ ভাল নেই, তাই গলায় তেজ নেই, মাঝে মাঝে চুপসে যাচ্ছে কণ্ঠস্বর ! স্বামীজি এক সময় ব্যঙ্গচ্ছলে বলে উঠলেন, দুর শালা, অমন এত্যাঁ এত্যাঁ করে পড়ছিস কেন ? তোর চণ্ডীপাঠ করা অভ্যেস কিনা, তাই মনে করিস যেন চণ্ডীপাঠ কচ্ছিস ! এটা ইংরিজি ! ভাল করে, স্পষ্ট করে পড় !

সারদানন্দ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তারপর লেখাপড়ার কাজ চলল গভীর রাত পর্যন্ত।

এই গ্রামের বাড়িতে অনেকেই স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে আসে। শিগগিরই বক্তৃতা শুরু হবে, তার উদ্যোগ চলছে। বক্তৃতার ব্যাপারে স্টার্ডির উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। খ্রিস্ট ধর্মের ওপর স্টার্ডির দারুণ বিরাগ জন্মে গেছে। পাদরিদের টাকা সংগ্রহের অত্যুৎসাহ, বিলাসবহুল জীবনের প্রসঙ্গ উঠলে স্টার্ডি আফশোসের সঙ্গে বলে ওঠেন, খ্রিস্ট ধর্মটা একেবারে পচে গেছে, এটা এখন নিতান্ত মিলিটারি আর কমর্শিয়াল ধর্ম হয়েছে। সর্বত্র খ্রিস্টানরা লড়াই আর কারবারকেই জীবনের সার বলে ধরে নিয়েছে। গির্জাগুলো হয়েছে টাকা রোজগারের দোকান। যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির নামগন্ধ নেই, তারাও যদি গির্জায় অনেক টাকা ঢালে, অমনি ধর্মপরায়ণ হিসেবে তাদের নাম রটে যায়। একেবারে গোড়া বদলে নতুন ধর্ম স্থাপন করতে হবে।

স্বামীজি বললেন, খ্রিস্ট ধর্মে অনেক মহান ভাবের কথা আছে। যিশু কোথায় মহা ত্যাগ বৈরাগ্য দেখিয়ে গেলেন, এক কম্বল গায়ে দিয়ে পথে পথে ঘুরে ভগবানের নাম শুনিয়ে গেলেন, আর পাদরিগুলো কেবল টাকা টাকা করে বেড়াচ্ছে। আমেরিকাতেই এসব বেশি দেখেছি। পাদরিদের দপদপানিতে কেউ মুখ খুলে ধমকানিও দিতে পারে না। আমি মাঝে মাঝে দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

স্টার্ডি বললেন, বেদান্ত ধর্মের কথাই এখন সকলকে শোনানো দরকার।

স্বামীজি বললেন, অন্যান্য ধর্মগুলিতে আচার-আচরণের কথা, নিজস্ব গৌরবের কথাই বেশি বলা হয়। ধর্মের দর্শনের কথা কেউ বলে না। বেদান্তের দর্শন হচ্ছে সর্ব ধর্মের সমন্বয়। সেই একটা বিশ্বধর্মের আদর্শের কথাই আমি মানুষকে জানাতে চাই।

এই বিশ্বধর্মের প্রসঙ্গে যখন কথা চলে, তখন স্বামীজি নিজেও যেন স্থান-কালের ঊর্ধ্বে উঠে

যান। ইতিহাস-ধর্মতত্ত্ব-দর্শন মথিত করা যেন এক বাণী-মূর্তি। ফলে মাঝেই মাঝেই তিনি বলে ওঠেন, আই অ্যাম আ ভয়েস উইদাউট ফর্ম!

সেই সব সময় মহেন্দ্র সত্যিই যেন এই মানুষটিকে চিনতে পারে না। এক টানা দু'দিন তিন দিন এই রকম ভাব চলে, কখনও কখনও গভীর ভাবনায় ডুবে থাকেন, অথবা একা একা অধ্যয়ন করেন। সেইসময় অন্যরা কেউ অতি সাধারণ কথা নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পায় না। এমনকী মিস মুলার, যিনি সব সময় কথা বলতে ভালবাসেন, তিনিও ধারে কাছে এগোন না।

আবার হঠাৎ হঠাৎ স্বামীজি নেমে আসেন সাধারণ মানুষের স্তরে। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতনই তিনি রঙ্গপ্রিয়, একেবারে কৌতুক বর্জিত হয়ে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন না। সন্ন্যাসী হলেও তিনি স্নেহপ্রবণ, ছোট ভাইটির সুবিধে অসুবিধের প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখেন। সারদানন্দকে তিনি মাঝে মধ্যেই খোঁচা মারেন ও বকুনি দেন বটে, আবার ইংল্যান্ডের পরিবেশে তাঁকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ব্যাপারেও তিনি বিশেষ মনোযোগী।

মহেন্দ্র একদিন নিজের ঘরে বসে চিঠিপত্র লিখছে, হঠাৎ দরজায় টোকা মারার শব্দ হল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখল, স্বামীজি দাঁড়িয়ে আছেন। পাশের বাড়ি থেকে তিনি মহেন্দ্রর ঘরখানা দেখতে এসেছেন। তার বিছানাখানি কেমন, জানলা দিয়ে শীতের বাতাস ঢোকে কি না তা পরীক্ষা করে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, কী খেয়েছিস? কাল থেকে তো তুই ও বাড়িতে খেতে যাস না!

মহেন্দ্র অপরাধীর মতন মুখ করে বলল, অনেক দিন ভাত খাইনি, খুব ইচ্ছে করছিল, তাই হোটেলে গিয়ে ভাত আর মাংস খেয়ে এসেছি।

স্বামীজি হেসে বললেন, বেশ করেছিস। ভেতো বাঙালি! ভাত ছাড়া খিদে মেটে না। আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। গ্রামের দিকে খোঁজ করলে ভাত পাবি। নিরামিষ তোর মুখে রোচে না তা বুঝি। রান্নার মাগিটাকে বলবি, ডিমের পোচ কিংবা ওমলেট ভেজে দেবে। চুল উসকোখুসকো কেন তোর? চান করিস না?

মহেন্দ্র বলল, কী করে নাইব? স্নানের ঘর নেই, কল-চৌবাচ্চা নেই যে!

স্বামীজি বললেন, এ দেশে অমনভাবে স্নান করে না। ঘরেতে বাথটাবে গরম জল মিশিয়ে নিবি। একখানা স্পঞ্জ ভিজিয়ে গায়ে বুলিয়ে নিতে হয়, তারপর সাবান দিয়ে গা-টা ঘষে নিতে হয়। ওই বাথটাবে বসে মগে করে মাথায় জল ঢেলে গা-টা পুঁছে নিবি। মাথার চুল সব সময় বুরুশ করে রাখবি, চুল উসকোখুসকো থাকলে এদেশের লোক বড় ঘেন্না করে। সব সময় ফিটফাট হয়ে থাকতে চেষ্টা করবি। একেই তো ইন্ডিয়ানস বলে লোকে অবজ্ঞা করে। তার ওপর ফিটফাট না থাকলে লোকে আরও ঘেন্না করবে। আর শোন, নাকের শিকনি ফ্যাত ফ্যাত করে হাত দিয়ে ফেলতে নেই, দু'খানা রুমাল পকেটে রাখতে হয়, নাক ঝাড়তে হলে রুমাল দিয়ে নাক মুছে পকেটে রাখতে হয়। শিকনি-থুতু যেখানে সেখানে ফেললে এরা বলে তাতে অপরের ব্যামো হবে!

মহেন্দ্র মনে মনে বলল, শিকনি মাখানো রুমাল পকেটে রাখতে হবে? হায় রে কপাল!

স্বামীজি আবার বললেন, অমন ছাগল দাড়ি রাখাও চলবে না। কালই গুডউইনের সঙ্গে নাপ্তের দোকানে গিয়ে একেবারে গাল পরিষ্কার করে আসবি। এখন চল আমার সঙ্গে, শরৎকে সাইকেল চড়া শেখাব। এদেশে এখন অনেকেই এই সাইকেল নামে জিনিসটা বেশ ব্যবহার করছে।

মিস মুলারের বাড়ির সামনে বেশ একটি প্রশস্ত মাঠ রয়েছে। বিকেল বেলা, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। এ দেশে সব সময়ই মেঘ-মেঘ আর কুয়াশা থাকে। হঠাৎ এক দিন চড়া রোদ দেখলে দেশের কথা মনে পড়ে যায়। মিস মুলারের বাড়ির ছোকরা মালি গ্রিন হাউজ থেকে সাইকেলটা এনে মাঠে পৌঁছে দিয়ে গেল। প্রথমে স্বামীজি নিজে মহেন্দ্র ও সারদানন্দের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে চালাতে লাগলেন। আজ তাঁর মন খুব প্রসন্ন, তিনি গাইতে লাগলেন:

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে
ভাসালো তরী সকালবেলা ভাবিলাম এ জলখেলা
মধুর বইছে সমীর, ভেসে যাবো রঙ্গে।

খানিকবাদে তিনি নেমে পড়ে বললেন, শরৎ, এবার তুই চেষ্টা কর দেখি।

সারদানন্দের চেহারাটি বেশ মোটাসোটা। জীবনে কখনও সাইকেলে চড়েননি। মহেন্দ্র ও স্বামীজি দু'দিক দিয়ে ধরে রইলেন, তবু সারদানন্দ টাল সামলাতে পারেন না, ভয়ে চেঁচাতে লাগলেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে তিন বিদেশির কাণ্ড দেখে মালিটি হেসে একেবারে লুটোপুটি খাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে স্বামীজি বললেন, ওরে, আমাদের চড়া দেখে মালি ছোঁড়া হাস করছে। আরে এত হাস করছিস ক্যানে?

মহেন্দ্র বলল, তাও তো সেদিনের মতন পাড়ার যাবতীয় ছোঁড়াগুলিন জড়ো হয়নি।

অন্য একদিনের ঘটনা মনে পড়ায় তিনজনেই অট্টহাস্য করে উঠলেন।

সেদিন মিস মুলার ও স্টার্ডি দম্পতি তিনখানা বাইক নিয়ে গ্রাম ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। একটু গিয়ে স্টার্ডি পত্নী আছাড় খেয়ে উল্টে পড়ে যান। একদল ছেলেমেয়ে তাদের ঘিরে হাততালি দিচ্ছিল। মিস মুলার সাইকেল চালনায় কৃতিত্ব দেখালেও ছেলেমেয়েরা তাকেই টিটকিরি দিচ্ছিল বেশি। মিস মুলারের পোশাক পুরুষদের মতন, সেই জন্য ওরা বলছিল, দ্যাখ দ্যাখ এক বুড়ি মেয়েছেলে মদ্দর পোশাক পরেছে!

সারদানন্দকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে গলদঘর্ম হয়ে স্বামীজি বললেন, দ্যাখ শরৎ, তুই এত মোটা, তুই তো হাত-পা চালাতেই পারছিস না। মহীন রোগা পাতলা আছে, ও সহজে শিখে যাবে।

সারদানন্দ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থায় করুণ সুরে বললেন, ভাই নরেন, তোমার এ দেশের যা খাওয়াদাওয়ার অবস্থা, এ চেহারা আর থাকবে না, দু'দিনেই শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাব!

স্বামীজি তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আহা রে! এদের রান্না খেতে পারিস না, তাই না? আস্তে অভ্যেস করে নিতে হবে, দ্যাখ না, আমি তো সবই খেতে পারি। রোজ রোজ একঘেয়ে খাবার খেলে রুচি নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা চল, তোদের জন্য আমি আজ একটা কিছু রান্না করে খাওয়াব।

মিস মুলার বাড়িতে নেই, রাঁধুনীটিও পাড়া বেড়াতে গেছে। সবাই মিলে রান্নাঘরের দিকে এগোতেই স্বামীজি বাধা দিয়ে বললেন, বেশি লোক রান্নাঘরে ঢুকতে নেই, তাতে এ দেশে বড় নিন্দে হয়। তোরা বাইরে থাক।

স্বামীজি রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন, শুধু কিছু আলু ছাড়া উপস্থিত কিছুই নেই। মিস মুলার সন্ধের বাজার করে আনবেন। স্বামীজি আলু, মাখন আর গোলমরিচ দিয়ে একটা বেশ ঝালঝাল চচ্চড়ি রেঁধে আনলেন।

যেন একটা গোপন খেলা হচ্ছে, এইভাবে তিনজনে বাগানের এক কোণে খেতে বসে গেলেন। শুধুই আলু-চচ্চড়ি, মহেন্দ্র আর সারদানন্দ তাই-ই গরম গরম টপাটপ মুখে পুরতে লাগলেন হ্যাংলার মতন।

সারদানন্দ বললেন, ভাই নরেন, কী অপূর্ব স্বাদ যে হয়েছে কী বলব! অনেক দিন পর ঠিক যেন দেশের মতন রান্না। খাচ্ছি আর মনে হচ্ছে, আমি যেন দেশে ফিরে গেছি!

আনন্দে জল গড়াতে লাগল সারদানন্দের দুই চক্ষু দিয়ে।

২৬

স্বামী বিবেকানন্দর এই দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে আগমন। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য যখন ভারত থেকে জাহাজে ভেসেছিলেন, তখন ইওরোপের পথে আসেননি, গিয়েছিলেন জাপানের দিক দিয়ে। আমেরিকায় দিগ্বিজয় করার পর যখন তিনি প্রভূত খ্যাতি ও ভক্তবৃন্দ সংগ্রহ করেছেন, তখন তাঁকে একবার ইওরোপে আসতে হয়েছিল। উপলক্ষটি ছিল একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগদান, বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ এই দু তরফেরই অনুরোধে।

শ্রীমতী জো ম্যাকলাউডের দিদি বেটি'র সঙ্গে ধনকুবের শ্রীযুক্ত লেগেটের পরিণয়ের কথা পাকা হয়ে যাবার পর তাদের শখ হল, উৎসবটা হবে সভ্যতা ও বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল প্যারিস নগরীতে। দুই বোনই স্বামীজির বিশেষ অনুরক্ত, তারা দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গহারা হয়ে থাকতে চায় না, শ্রীযুক্ত লেগেটও এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে পছন্দ করেন। সুতরাং ওরা তিনজনেই স্বামীজিকে প্যারিসে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল।

একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে কোনও বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করা সমুচিত নয়। তবু স্বামীজি প্যারিসে এলেন কেন? জো আর বেটি, এই দুই ভগিনীর পীড়াপীড়ি এড়াতে পারেননি বলে? প্যারিস তথা ইওরোপীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে দেখার সাধ হয়েছিল তাঁর? পূর্বাশ্রমের নরেন্দ্রনাথের যে দেশ ভ্রমণ ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য দর্শনের টান ছিল তা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে? এই কারণগুলি হয়তো একেবারে গৌণ নয়, তা ছাড়াও একটি অন্য উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজি ভেবেছিলেন, এই সুযোগে তিনি প্যারিস থেকে একবার ইংল্যান্ডেও ঘুরে আসবেন, ইংরেজ জাতির মধ্যে বেদান্তের ধর্ম প্রচার করা যায় কিনা, তা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এর আগে বেশ কয়েকজন ব্রাহ্ম নেতা ইংল্যান্ডে বক্তৃতা করে গেছেন এবং সমাদরও পেয়েছেন, হিন্দু ধর্মের উদার দর্শনের কথা কেউ সেখানে বলবে না? ইংল্যান্ডে গিয়ে অবস্থানের সমস্যাও নেই। আমেরিকাতেই শ্রীমতী হেনরিয়েটা মুলারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি বলে রেখেছিলেন, লন্ডনে তাঁর গৃহের দ্বার স্বামীজির জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। আর শ্রীযুক্ত ই টি স্টার্ডি এক সময় আলমোড়ায় তপস্যা করে এসেছেন, হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে, তিনিও বার বার স্বামীজিকে চিঠি লিখেছেন লন্ডনে আসবার জন্য।

প্যারিসে শ্রীযুক্ত লেগেট স্বামীজিকে রেখেছিলেন এক বিশাল রাজকীয় হোটেলে। সারা দিন খানাপিনার অন্ত নেই। সে রকম হোটেলে থাকতে স্বামীজি মোটেই স্বস্তি বোধ করেননি। এ রকম বিলাসবহুল অবস্থার মধ্যে দিন কাটালে যে তাঁর আরও সমালোচনা হবে, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। শুধু আমেরিকান মিশনারিরাই যে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছে তাই-ই নয়, ভারতেও তাঁর সম্পর্কে নানা রকম কটূক্তি শুরু হয়ে গেছে। তিনি যার তার সঙ্গে বসে হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ আহার্য গ্রহণ করেন, মহিলাদের দ্বারা সব সময় পরিবৃত হয়ে থাকেন, অর্থোপার্জনের জন্য লালায়িত, এই সব অভিযোগ শোনা যাচ্ছে তাঁর নামে। এমনকী কলকাতাতেও তাঁর কোনও কোনও গুরুভাই এবং আরও অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। স্বামীজি বছরের পর বছর আমেরিকাতে পড়ে আছেন কেন? তিনি ভারতের প্রতিনিধি, ভারতে ফিরে এসে দরিদ্র, অজ্ঞ মানুষদের জাগাবার চেষ্টা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক! তিন বছর কেটে গেল, এখনও তাঁর দেশে ফেরার কোনও লক্ষণ নেই।

আমেরিকায় ছোটাছুটি করে প্রতিদিন বক্তৃতা দিতে দিতে ক্লান্ত অবস্থায় স্বামীজি এই ধরনের অভিযোগ শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। তিনি খাদ্যাখাদ্যের বাছ-বিচার করেন না তা ঠিক,

কেনই বা করতে যাবেন, কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? যস্মিন দেশে যদাচার, এ কথা লোকে জানে না? আমেরিকায় কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, স্বামীজি আপনি স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন না কেন? তিনি মুখের ওপর বলে দেন, আমি কি শুধু ভারতের? আমি কি সারা পৃথিবীর নই? মানুষ নামে প্রাণীটি কি নিছক কোনও দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ? এই জগতের কাছ থেকে আমি দেহ পেয়েছি, দেশের কাছ থেকে ভাব পেয়েছি, আর মনুষ্যজাতি, যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলতে পারি, এই তিনের জন্যই আমি কিছু করে যেতে চাই।

প্যারিসে অবস্থানের সময় ওই সব অভিযোগ-সমালোচনার কথা মনে রেখেই তিনি আলাসিঙ্গাকে একটা ক্রুদ্ধ চিঠিতে লিখলেন :

তোমরা যে মিশনারিদের বাজে কথাগুলোর ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করো, তাতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কলকাতার লোকেরা চায় যে আমি হিন্দু-খাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের বলো, তারা যেন আমায় একজন রাঁধুনি ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কানাকড়ি সাহায্য করার মুরোদ নেই, এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া— এতে আমার হাসিই পায়।

অপরদিকে যদি মিশনারিরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ রূপ প্রধান দুই ব্রত ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বলো যে, তারা মস্ত মিথ্যেবাদী। মিশনারি হিউমকে পরিষ্কার রূপে লিখে জিজ্ঞেস করবে...তিনি আমার কী কী অসদাচরণ দেখেছিলেন... তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কি না...এই রূপ করলেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে আর তাদের দুষ্টামি ধরা পড়বে!

...আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারও কথায় আমি চলব না। আমার জীবনের ব্রত কী, তা আমি জানি। ...আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি— আর যা কিছু টাকা পেয়েছি সব কলকাতা ও মাদ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত করবার পর তাদের আহাম্মকের মতন হুকুমে আমাকে চলতে হবে?...আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি?...বাঙালিরা রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কটা টাকা তুলতে পারে না। এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে!...তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাকো, সেই জাতিভেদ চক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশশূন্য, কপট, নাস্তিক কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্য আমি জন্মেছি?...আমি কাপুরুষদের সঙ্গে আর রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখতে চাই না। আমি কোনও প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই।...

বিবাহ-উৎসব শেষ হতেই স্বামীজি প্যারিস ছেড়ে চলে এসেছিলেন লন্ডনে। সেবারে বেশিদিন থাকেননি, কিন্তু ইংরেজ জাতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের বেশ পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি সিপাহি বিপ্লবের দু দশক পরে কলকাতায় কলেজের ছাত্র ছিলেন, সদ্য জাগ্রত স্বদেশি চেতনার আঁচ তার গায়ে লেগেছিল, নিজে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন ইংরেজের শাসনে দেশের চরম দুর্দশা, কোটি কোটি মানুষ শোষিত, নিষ্পেষিত, অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। শাসক শ্রেণীর ঔদ্ধত্যের অনেক পরিচয় তিনি পেয়েছেন, সুতরাং এদের সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। ইংল্যান্ডে এসে তিনি ইংরেজ জাতির অন্য একটি রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

আমেরিকার তুলনায় ইংল্যান্ডে বর্ণবিদ্বেষ অনেক কম। একা একা রাস্তায় ঘুরলেও ফেউ-এর মতন এক পাল ছেলে-মেয়ে জুটে ব্ল্যাকি ব্ল্যাকি বলে তাড়া করে না। আমেরিকায় ছোট কিংবা মাঝারি হোটেলে কালো চামড়ার লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, এমনকী নাপিতের দোকানেও চুল কাটিতে প্রত্যাখ্যান করে, ইংল্যান্ডে সে সব সমস্যা নেই। স্বামীজির বক্তৃতা সভায় যে-সব নারী পুরুষ আসে, তারা ধৈর্যশীল শ্রোতা, যে কোনও বিষয়ই তারা গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করে, সেই তুলনায় আমেরিকানরা ছটফটে। অধিকাংশ আমেরিকানই কূপমণ্ডূক, ইংরেজরা পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। এই সব দেখে স্বামীজির মনে হয়, ভারত শাসনের জন্য যে-সব ইংরেজদের পাঠানো হয়, তারা বেশির ভাগই ছাঁচড়া ধরনের। তারা ইংরেজ জাতির কুলাঙ্গার।

সেবারে বেশি দিন থাকতে পারেননি স্বামীজি, এবার এসেছেন অনেকটা প্রস্তুতি নিয়ে। দেশে ফেরার আগে আমেরিকাতে এবং ইংল্যান্ডে কয়েকটা বেদান্তের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চান। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ-দেশীয় শিষ্যরাই সেই সব কেন্দ্র চালাবে। দেশ থেকেও কয়েকজন গুরুভাইকে আনিয়ে নিতে হবে, শরৎ এর মধ্যেই চলে এসেছে, তা ছাড়াও কালী বেদান্তী বা শশীকে আমেরিকায় পাঠাতে পারলে ভাল হয়। খানিকটা ইংরিজি ও সংস্কৃতজ্ঞান আছে এমন লোক দরকার, তা ওদের আছে, ওরা শাস্ত্র পাঠ করে শোনাতে পারবে।

আমেরিকায় শেষ দিকে খুবই ভাল কাজ হয়েছে। প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা কমে গেছে তো বটেই, এমন কয়েকজনকে পাওয়া গেছে, যারা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বেদান্তের মানব ধর্ম প্রচারের কাজ করতে চায়।

সবচেয়ে সুন্দর সময় কেটেছে সহস্রদ্বীপে। আমেরিকা ও কানাডার মধ্যবর্তী সীমান্তে সেন্ট লরেন্স নদীর বক্ষে অজস্র দ্বীপ আছে, লোকে বলে থাউজ্যান্ড আয়ল্যান্ডস। সেখানকার একটি দ্বীপে স্বামীজির এক ছাত্রী শ্রীমতী ডাচারের একটি দোতলা বাড়ি আছে। দ্বীপটি নির্জন, চতুর্দিকে নিবিড় অরণ্য, এক পাশের পাহাড় যেখানে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে, তার গায়ে সেই বাড়িটি, যেন তপোবনের মধ্যে একটি আধুনিক কুটির। সেই দ্বীপ-ভবনে স্বামীজি প্রায় দেড় মাস ছিলেন, সঙ্গে জনা দশেক ভক্ত শিষ্য, একদল চলে যায়, আবার একদল আসে, সকাল থেকে চলে উপাসনা, শাস্ত্র পাঠ, উপদেশ, বনের মধ্যে ভ্রমণ, হাস্য পরিহাস, এক সঙ্গে সবাই মিলে আহার। স্বামীজি এক-একদিন অন্যদের নিজের হাতে রেঁধেও খাইয়েছেন। আমেরিকার বিভিন্ন শহর ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেবার বদলে এই পরম রমণীয় দ্বীপ-উদ্যানে, ভক্তদের সঙ্গে দেড় মাস সময় কাটিয়ে স্বামীজি খুব শান্তি পেয়েছিলেন। তাঁর এখানকার বক্তৃতা ও উপদেশও অতি উচ্চস্তরের, কারু কারু মনে হত, এ যেন দেববাণী।

এই সহস্রদ্বীপে থাকার সময়েই স্বামীজি তাঁর ভক্তদের দীক্ষা দিতে শুরু করেন। ল্যান্ডসবার্গ ও মেরি লুই হলেন কৃপানন্দ ও অভয়ানন্দ। আমেরিকান নারী-পুরুষেরা নিজেদের নাম বর্জন করে ভারতীয় নাম গ্রহণ করতে লাগল, এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পূজারি ব্রাহ্মণ সেই রামকৃষ্ণ, যাঁকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিজের দেশেরই মুষ্টিমেয় লোক চিনত, সেই রামকৃষ্ণ হলেন এই সব আমেরিকানদের গুরু।

এবারে স্বামীজি লন্ডনে এসে তাঁর আদর্শ প্রচারে মন দিলেন। শ্রীমতী মুলার এবং শ্রীযুক্ত স্টার্ডির উৎসাহে বক্তৃতাস্থানের ব্যবস্থা হয়ে গেল, প্রথম থেকেই উৎসাহী লোক আসতে লাগল দলে দলে। সংবাদপত্রগুলি মনোযোগ দিল তাঁর দিকে। একটি পত্রিকায় লিখল, রাজা রামমোহন এবং কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া আর কোনও এত উৎকৃষ্ট ভারতীয় বক্তাকে ইংল্যান্ডের বক্তৃতা মঞ্চে দেখা যায়নি।

ক্রমশ ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় চলে আসতে হল। তাতেও মানুষ ধরে না, অনেকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রোতারা মন দিয়ে শোনে, প্রশ্ন করে। দু' একটা লোক যে কিছু উৎকট প্রশ্ন করে বসে না তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতার মুখ দেখে বা কথা শুনে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে সত্যিকারের একটা অন্বেষণ আছে, তারা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তৃপ্ত নয়।

ক্রমে দিনে দু'বার বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। সকালে লন্ডনের বাড়িতে খানিকটা ক্লাস নেবার মতন, আর সন্ধ্যায় কোনও প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তৃতা। এক একদিন এক এক বিষয়। বিষয়টিও তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক হয়, পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি অনর্গল বলে যান, তাতে ইতিহাস, শাস্ত্র, দর্শন যেমন থাকে, তেমনই বর্তমান পৃথিবীর অবস্থাও বাদ যায় না। আমেরিকায় যেমন তিনি আমেরিকানদের ধনতান্ত্রিক উন্মত্ততার কথা বলতে ছাড়েননি, এখানেও তিনি ইংরেজদের যুদ্ধনীতি এবং শোষণের শাসনের সমালোচনা করতে পিছপা হন না।

লাল রঙের একটা ঝোলা কোট পরা, কোমরে একটি কোমরবন্ধ, দীপ্তিমান মুখ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বক্তৃতামঞ্চে তিনি যেন অন্য মানুষ। শ্রোতারা তাঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, কেউ কেউ তাঁর মুখে গৌতম বুদ্ধের মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পায়।

সারদানন্দ এর মধ্যে অনেকটা সড়গড় হয়ে উঠেছেন। হঠাৎ বিদেশে আসার প্রাথমিক জড়তা কেটে গেছে, বাড়িতে একা একা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যেস করেন। কখনও মহেন্দ্রকে বলেন, তুই শোন, মাঝে মাঝে হুঁ দিয়ে যাবি, আমার কিছু ভুল হলে বলবি। কখনও সখনও স্বামীজি এসে পড়েন, সারদানন্দকে উৎসাহ দেন, কাছে এসে সারদানন্দের ডান হাতখানি ধরে বলেন, এমন আড়ষ্টভাবে থাকবি কেন, সহজভাবে হাত নাড়বি, সব সময় ব্যাকরণ শুদ্ধির কথা মাথায় রাখলে চলবে না, মনের ভাব গড় গড় করে বলে যাওয়াটাই বড় কথা। সব ইংরেজের বাচ্চা কি সঠিক ইংরিজি বলে!

সারদানন্দ স্বামীজির প্রতিটি বক্তৃতা সভায় একেবারে সামনের সারিতে বসে থাকেন, স্বামীজির চিবুক তুলে কথা বলা, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত ছোঁড়া, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা লক্ষ করেন খুব মনোযোগ দিয়ে। এই তেজোদীপ্ত, বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন সন্ন্যাসীটিই যে তাঁর পূর্ব-পরিচিত নরেন, সেই বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটতে চায় না।

স্বামী বিবেকানন্দর মধ্যে যেন স্পষ্ট দ্বৈতসত্তা আছে। এক এক সময় তিনি যেন একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যান। উত্তর কলকাতার গলির আড্ডাবাজ ছোকরার মতন, সেই রকমই মুখের ভাষা। একদিন বক্তৃতা শুরু হবার আগে স্বামীজি সেজেগুজে পায়চারি করছেন ঘরের মধ্যে। নির্দিষ্ট সময়ের আরও মিনিট দশেক দেরি আছে, এখনও কেউ আসেনি। শ্রীমতী মুলার ও শ্রীযুক্ত স্টার্ডি অন্যত্র গেছেন, ওঁরা থাকলে বাংলায় কথা বলা যায় না। স্বামীজি সারদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে শরৎ, এখানে কী রকম কাজ হবে বুঝছিস?

সারদানন্দ বললেন, অনেকেরই তো দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে দেখছি। কয়েকজন প্রত্যেকটা বক্তৃতা শুনতে আসে। সবাই বলে, এ দেশে সময়ের দাম আছে। তবু তো এরা সময় ব্যয় করে আসছে। তবু যেন একটু দ্বিধার ভাব আছে।

স্বামীজি বললেন, আমেরিকায় তুই এরকম সভা দেখলে চমকে যেতিস। এক দিন বক্তৃতা শুনেই কেউ কেউ পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছে। ওদের স্বভাবটাই এরকম। এ দেশে সব কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজ বাচ্চা কোনও কাজে হাত একবার দিলে আর সহজে ছাড়ে না। আমেরিকানরা চটপটে, কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুনের মতন।

কথা বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন জানলার ধারে। স্বচ্ছ কাচের জানলা দিয়ে দেখা যায় পথের জনস্রোত। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। এদেশে সকলেই ছাতা নিয়ে বেরোয়। এক দঙ্গল মহিলাকে দেখে স্বামীজি হঠাৎ একটা গান বানিয়ে গাইতে লাগলেন:

ছাতি হাতে, টুপি মাথায় আসচে যত ছুঁড়ি
মুখে মেখেছে তারা ময়দা ঝুড়ি ঝুড়ি...

এমনভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে ব্যঙ্গের সুরে তিনি গানটা গেয়ে চললেন, যেন এই সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নন, স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র নরেন। সারদানন্দ ও মহেন্দ্র তো একেবারে হেসে কুটিকুটি। দাদার সামনে ওরকম ভাবে হাসতে নেই বলে মহেন্দ্র ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিল।

স্বামীজি সারদানন্দকে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ, মাগিরা মুখে পাউডার মেখেছে যেন কোদাল দিয়ে চাঁচা যায়!

সারদানন্দ বললেন, ওই বুঝি কারা এসে পড়ল!

স্বামীজি ট্যাঁক ঘড়ি খুলে দেখে বললেন, এখনও চার-পাঁচ মিনিট বাকি আছে। তারপর সারদানন্দকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বললেন, তুইও গানটা গা না!

সকালের অধিবেশনে মহিলারাই বেশি আসে, সন্ধ্যায় পুরুষদের সংখ্যা বেশি। এই সব শ্রোতারা আসে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। উঁচুতলার মহিলারাও আসে খানিকটা অভিনবত্বের সন্ধানে, খানিকটা হুজুগে, কেউ কেউ নিঃসঙ্গতা-অশান্তিবোধের তাড়নায়। জোসেফিন ম্যাকলাউড দিদির বিয়ের পর আমেরিকায় ফিরে গিয়েও স্বামীজির জন্য ব্যাকুলতা বোধ করে। স্বামীজি তাকে নিয়মিত

চিঠি লেখেন, তবু সে একদিন হুট করে লন্ডনে চলে এল। স্বামীজির খাওয়া দাওয়া কিংবা থাকার অসুবিধে হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে সে চিন্তিত। স্বামীজি এখন শ্রীমতী মুরের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, সেখানে তার মাথা গলানো শোভন নয়, তাই সে লন্ডনের একটি বড় দোকানে টাকা জমা দিয়ে রাখল, সেখান থেকে প্রতিদিন এক ঝুড়ি বাছাই করা সেরা ফল পাঠানো হয় স্বামীজিকে, প্রেরণকারীর নাম জানানো হয় না। তার দিদি শ্রীমতী লেগেটেও একবার দেখতে এল স্বামীজিকে। সে এখন এতই একজন বড় ব্যবসায়ীর পত্নী যে তার আগমনে সাড়া পড়ে যায় লন্ডনের ধনী মহলে, স্বামীজি সম্পর্কেও এই মহলের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়।

সমস্ত মহিলা-শ্রোতাই অবশ্য ধনী শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। স্কুল শিক্ষিকা, নার্স, মধ্যবিত্ত গৃহবধূ, ব্যর্থ প্রেমিকা, গৃহ-বিচ্ছিন্ন উদভ্রান্ত রমণীরাও আসে শান্তি ও সান্ত্বনা পাবার আশায়। এরা অনেকেই নিয়মিত আসে, তবে একজনকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সেই তরুণীটির নাম শ্রীমতী মার্গারেট নোব্‌ল।

বক্তৃতা দিতে উঠে স্বামীজি দর্শকদের মধ্যে চোখ বুলিয়ে দেখে নেন, মার্গারেট এসেছে কি না। চোখাচোখি হলে স্বামীজি একটু হাসেন। এই হাসির একটা বিশেষ অর্থ আছে। মার্গারেটের সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়ে গেছে বটে, তবু মার্গারেটের মন এখনও সংশয়পূর্ণ, স্বামীজির অনেক বক্তব্যই সে মেনে নিতে পারে না। তবু সে আসে, যেন চুম্বকের টানে এসে উপস্থিত হয়।

মার্গারেট স্বামীজির চেয়ে চার বছরের ছোট। এখনও তিরিশ বছর পূর্ণ হয়নি। তবু তার জীবনে অনেক হাহাকার ও শূন্যতা রয়ে গেছে। মার্গারেটের জন্ম আয়ার্ল্যান্ডে, তার পিতা ও পিতামহ দু জনেই ছিলেন ধর্মযাজক। তার যখন দশ বছর বয়েস, তখন বাবা মারা যান। অর্থ সঞ্চয় কিছু ছিল না, তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে নিয়ে মার্গারেটের মা আশ্রয় নেন বাপের বাড়িতে। সেইজন্য মাত্র সতেরো বছর বয়েসেই জীবিকার জন্য শিক্ষিকার চাকরি নিতে হয় মার্গারেটকে। সে তার ভাই-বোনদের শিক্ষার দায়িত্ব নেয়।

এই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির জীবনে অচিরেই দেখা দিল প্রেম। এক ওয়েল্‌সবাসী যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হল, পেশায় সে ইঞ্জিনিয়ার, সুঠাম, সুন্দর চেহারা। দু' জনের রুচিরও বেশ মিল আছে। তাদের এই বন্ধুত্ব ও প্রেম যখন বিবাহের পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, ব্যবস্থা প্রায় পাকা, তখন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল, সামান্য দু' এক দিনের অসুখে সেই যুবকটি চলে গেল ইহলোক ছেড়ে।

সেই আঘাত সামলানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেন এমন হয়? মানবজীবনের নিয়ন্তা যদি কেউ থাকে, তবে এ কী রকম তার বিচার? কোনও সান্ত্বনা বাক্যই মার্গারেটের সহ্য হত না। সেই স্থান ত্যাগ করে অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেল মার্গারেট।

আরও দু' একবার চাকরি বদল করার পর মার্গারেট চলে এল লন্ডনে। বাচ্চাদের সংস্পর্শে তার হৃদয় কিছুটা জুড়োয়, পড়াতে সে ভালও বাসে। মার্গারেটের মধ্যে যে একটা জন্মগত সংগঠন ক্ষমতা আছে, তা সে নিজেই উপলব্ধি করে এ সময়। পরিচিত ব্যক্তিরা তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়। কিছুদিন পর সে সাহস করে সঙ্কল্প নিল, নিজেই একটা ইস্কুল খুলবে, যেখানে শিশুদের শাসনের কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। তাদের মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করে, যার যেদিকে ঝোঁক সেদিকে চালনা করার চেষ্টা করা হবে। শিক্ষার এই এক আধুনিক পদ্ধতি। কিছু বন্ধু-বান্ধব তাকে সাহায্য করতে রাজি হল।

মফস্বল থেকে লন্ডনে এসে পড়ায় মার্গারেটের জীবনে বেশ একটা পরিবর্তন এল। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এখন লন্ডন, দুনিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ইংরেজ জাতির রাজধানী শুধু নয়, জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চারও কেন্দ্র, বহু দেশের বুদ্ধিজীবীরা এখানে সমবেত হন। এখানকার তরুণ সমাজ যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করে, বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত তাদের মস্তিষ্কে থাকে।

এরকম কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় হল মার্গারেটের, ক্রমশ সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সেসেমি ক্লাব নামে একটি সংগঠনে সাহিত্য পাঠ, বক্তৃতা ও বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক হয়, মার্গারেট

প্রথমে সেই ক্লাবের সদস্যা ও পরে সেক্রেটারি হয়ে যায়। এই ক্লাবে সে বার্নার্ড শ', হাক্সলি প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের ডেকে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে, নিজেও বিতর্কে অংশ নেয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সে লেখালেখিও শুরু করেছে।

এই সব কাজে ব্যস্ত থেকে সে প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার আঘাত সইয়ে নিল অনেকখানি। কিছুদিন পর তার জীবনে এল আবার প্রেম। সেসেমি ক্লাবেরই সদস্য একটি যুবকের সঙ্গে মনের মিল হল তার। সেই যুবকটিরও অবস্থা অনেকটা মার্গারেটেরই মতন, তারও এক পূর্ব-প্রণয়িনী ছিল, কিছু দিন আগে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। ব্যর্থতাবোধ ও বেদনাই দু জনকে কাছে টেনে আনে। দু জনে একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে বেশি উৎসাহ পায়। মার্গারেটের পরের বোনটি এর মধ্যে লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পেয়েছে, ছোট ভাইটি কলেজে পড়ছে, মার্গারেটের দায়িত্ব অনেকটা কমে গেছে। এখন সে তার প্রেমিককে স্বামীত্বে বরণ করে নিজস্ব সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, এই সময় এল আবার দারুণ আঘাত। সেই যুবকটি হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল। না, এবারও মৃত্যু টেনে নেয়নি, সে যুবকটি ছিল চঞ্চলমতি। সে মার্গারেটের মতন এক রমণীরত্নের মূল্য বুঝল না, সে ফিরে গেল তার আগেকার প্রেমিকার কাছে, বিয়েটাও সেরে ফেলল দ্রুত।

এবারে মার্গারেট সব কিছু ছেড়েছুড়ে পালিয়ে গেল লন্ডন থেকে। অন্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সে মুখ দেখাতে চায় না। হ্যালিফ্যাক্সে শ্রীমতী কলিন্‌স নামে তার এক বান্ধবী ছিল। সেখানে গিয়ে সে শয্যা নিল।

আবার যে সে ফিরল, সে শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির টানে। নিজের বুকে যতই দুঃখ-দহন থাক, ওই সব কচি কচি মুখগুলিকে তো ম্লান করা যায় না। তারা যে মিস নোব্‌লকে খুব ভালবাসে। স্কুলটাকে চালাতেই হবে, মার্গারেট লন্ডনে এসে আবার স্কুলের কাজে ও ক্লাব পরিচালনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উইম্‌বলডনে সে স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকে সারা দিন, আর বিকেলের পর লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমিতিতে যোগদান করে। নিজের বুকের ক্ষতটির কথা সে কারুকে জানতে দেয় না।

মার্গারেটের এই রকম মানসিক অবস্থার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে দেখা।

এক বছর আগে স্বামীজি প্রথমবার ইংল্যান্ডে এসেছেন, কিছু কিছু জায়গায় বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। মার্গারেট একদিন লন্ডনের সমাজের এক বিশিষ্ট মহিলা, লেডি ইসাবেল ফার্গুসনের কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণপত্র পেল। সেই মহিলার বাড়ির বৈঠকখানায় স্বামী বিবেকানন্দ নামে কে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেবে। মার্গারেট এর সম্পর্কে কিছুই জানে না, ভারতবর্ষ সম্পর্কেই তার জ্ঞান খুব কম। তবে ভারত সম্পর্কে তার একটা সহানুভূতির ভাব আছে, তার পিতৃভূমি আয়ার্ল্যান্ড ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য লড়াই চালাচ্ছে। ভারতও ব্রিটিশ শাসনের অধীন, এই সূত্রে একটা যোগ আছে।

নভেম্বর মাসের এক রবিবারের বিকেল। বেশ শীত পড়ে গেছে, ওয়েস্ট এন্ডের সেই বৈঠকখানার ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালতে হয়েছে, সেদিকে পিঠ দিয়ে বসে আছেন ভারতীয় সন্ন্যাসীটি, লাল রঙের আলখাল্লা ও কোমরবন্ধ পরা, শিরদাঁড়া সোজা, বিশেষভাবে চোখে পড়ে উজ্জ্বল দুই চক্ষু। শ্রোতারা বসে আছে অর্ধ বৃত্তাকারে, সব মিলিয়ে পনেরো-ষোলোজন। শ্রোতারা প্রায় সকলেই সকলের পরিচিত, কেউই ধর্ম-তৃষ্ণা নিয়ে আসেনি, এরা সন্দিগ্ধমনা বুদ্ধিজীবী। স্বয়ং গৃহকর্ত্রীর ধারণা, ধর্ম বিশ্বাস একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, শাশ্বত জীবনবোধের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ডারউইনের মতন বৈজ্ঞানিকরা জীবসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, সেখানে বিধাতার কোনও ভূমিকা নেই, প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে স্থান নেই কোনও সৃষ্টিকর্তার।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে আদর্শ বিনিময়ের সময় এসেছে, এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা শুরু করলেন স্বামীজি। ইংরিজির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক একবার উচ্চারণ করছেন সংস্কৃত মন্ত্র, তার একটি অক্ষরেরও মানে বুঝতে পারছে না কেউই, কিন্তু সেগুলির শব্দ ঝঙ্কার শুনতে ভাল লাগে। মাঝে মাঝে স্বামীজি চোখ বন্ধ করে বলে উঠছেন, শিব! শিব!

জানলার বাইরে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার, ঘরের মধ্যে আলো জ্বালা হয়নি, ফায়ার প্লেস থেকে আসছে আগুনের আভা, স্বামীজির কথা শুনতে শুনতে মার্গারেট কল্পনায় দেখতে পেল, ভারতবর্ষের গ্রামে সূর্যাস্তের সময় কোনও বটবৃক্ষের নীচে কিংবা গ্রামে কুয়োর ধারে বসে সন্ন্যাসীরা যেন ঠিক এমনভাবেই উপদেশ দেয়।

বক্তৃতা শেষ হবার পর চা-পান। মার্গারেট সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটিও কথা না বলে উঠে গেল। দরজার বাইরে কয়েকজন বলাবলি করছে, এই হিন্দু সন্ন্যাসী তো এমন কিছু নতুন কথা শোনায়নি। এঁকে নিয়ে মাতামাতি করার কী আছে? 'সমস্ত ধর্মই সমভাবে সত্য', এটা একটা নিছক গালভরা কথা। তা হলে এতগুলি ধর্মের আলাদা আলাদা অস্তিত্বের কী দরকার? ধর্ম প্রচারেরই বা কী অর্থ হয়? 'বিভিন্ন রূপে সেই এক অদ্বিতীয় সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ', সেই অদ্বিতীয় সত্তাই যে কী বস্তু তা সঠিকভাবে আগে কেউ বোঝাতে পারেননি, ইনিও কিছু বললেন না। নাঃ, এই ভারতীয় যোগী মৌলিক কিছু বলতে পারেননি।

মার্গারেটও অন্যদের সঙ্গে একমত হল। আজকের বক্তৃতা শুনে তার নতুন কোনও সত্যের উপলব্ধি হয়নি।

একা একা তাকে ফিরতে হল নিজের বাড়িতে। কাল সোমবার, কাল থেকে আবার অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি কিছু রান্না করে নিতে হবে নিজের জন্য। রান্না ঘরে টুকিটাকি কাজ সারছে মার্গারেট, তার ছোট্ট বাড়িটিতে কোনও শব্দ নেই, বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সন্ন্যাসীটির বসে থাকার ছবিটি। কণ্ঠস্বরে গভীর আত্মবিশ্বাস, একই সঙ্গে সারল্য-মাখা তেজোদ্দীপ্ত মুখ, এই মানুষটি তার দেখা অন্য কোনও মানুষের মতন নন। তাঁর মুখখানি মনে পড়লেই মা মেরির কোলেও বসে-থাকা শিশু যিশুর কথা মনে আসছে কেন?

সারা সপ্তাহ ধরে নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখখানি ঘুরে ফিরে আসতে লাগল তার মানসপটে। মার্গারেট নিজেই বেশ বিস্মিত। পরের শনিবার তার মনে হল, একবার শুনেই ওই সন্ন্যাসীটির সব কথা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। উনি নতুন কিছু বলেননি বটে, তবে এক ঘণ্টা ধরে অনেকগুলি দিক ছুঁয়ে গেছেন তো বটে, এমন বক্তাই বা ক'জন পাওয়া যায়! সংবাদপত্রের নোটিশ দেখে সে নিজেই খুঁজে খুঁজে স্বামীজির পরবর্তী বক্তৃতা সভাতে উপস্থিত হল।

সেদিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তুতেও মার্গারেট সন্তুষ্ট হল না। তার মধ্যে তো অনেক যদি এবং কিন্তু আছে। তবু আগাগোড়া সে সম্মোহিতের মতন চেয়েছিল ওই মানুষটির দিকে। এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কাছাকাছি বসে ওঁর কণ্ঠস্বর শোনারও একটা শিহরন আছে।

সভার শেষে মার্গারেট কোনও কথা বলল না বটে, কিন্তু সে অন্যদের কাছে খবর নিয়ে জানল, স্বামীজি রিডিং অঞ্চলের একটি বাড়িতে থাকেন। সেই ঠিকানা সংগ্রহ করে একটা চিঠি লিখে ফেলল সে। অচিরেই সেই চিঠির উত্তর এল, সে উত্তর পড়ে মার্গারেট চমৎকৃত। আলাপ-পরিচয় না হলেও স্বামীজি তাকে চেনেন, তাকে সম্বোধন করেছেন আপনজনের মতন। মার্গারেটের সংশয়ের উত্তরে স্বামীজি লিখেছেন: পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দিয়ে সকল বাধাবিঘ্ন দূর করা যায়। সব বড় বড় ব্যাপারই ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।...আমার ভালবাসা জানবে। ইতি বিবেকানন্দ।

স্বামীজি তাকে ভালবাসা জানিয়েছেন? মার্গারেট যাঁর উক্তিগুলিকে মেনে নেয়নি, বক্তৃতা সভার পর যাঁকে অভিনন্দন জানায়নি, তিনি অযাচিতভাবে ভালবাসা জানাতে দ্বিধা করেন না! এত সহজে তিনি মানুষকে আপন করে নিতে পারেন?

স্বামীজি তো সেবার ফিরে গেলেন আমেরিকায়। আবার লন্ডনে ফিরে এলেন কয়েক মাস পরেই। এবারে মার্গারেট তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তৃতা সভায় যায়, এখনও ধর্ম-দর্শনে তার আস্থা হয়নি। পাদ্রির মেয়ে হয়েও গির্জার আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠানে তার অভক্তি জন্মে গেছে, নতুন করে অন্য কোনও ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে তার আগ্রহ জাগেনি, এখন সে দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছে, এখন সে মাঝে মাঝে তর্ক করে। স্বামীজি সহাস্যে তাকে প্রশ্রয় দেন। মিনমিনে স্বভাবের মানুষজন তিনি দু

চক্ষে দেখতে পারেন না। এই তরুণীটির তেজ ও দৃপ্ত ভঙ্গিমা তাঁর বেশ পছন্দ হয়। তর্ক করুক, তবু তো নিয়মিত আসে! তিনি নিজে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বছরের পর বছর অবিশ্বাস নিয়ে তর্ক করেননি? তর্ক করতেন, এবং বার বার ছুটে ছুটে সেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই তো যেতেন!

মার্গারেটও বুঝতে পেরেছে যে, এই হিন্দু সন্ন্যাসীটির জীবন-বার্তা সে মানতে পারুক বা না পারুক, তবু সে ওঁর সান্নিধ্য থেকে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারবে না। এখন স্বামীজির ঘনিষ্ঠ মানুষজন, শ্রীমতী মুলার, স্টার্ডি দম্পতি ও সেভিয়ার দম্পতি, ওঁদের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছে, সে এঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

স্থান সঙ্কুলানের জন্য পিকাডিলি অঞ্চলে রয়েল ইনস্টিটিউট অব পেইন্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স-এর গ্যালারিটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেখানে বক্তৃতা হয় প্রতি রবিবার সন্ধ্যায়। জনসমাগম দিন দিন বাড়ছে। স্বামীজি সেখানে 'ধর্মের প্রয়োজন', 'সার্বজনীন ধর্ম', 'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ' এই সব বিষয়ে ভাষণ দিতে লাগলেন। শুনতে শুনতে মার্গারেটের মনে হয়, স্বামীজি একেবারেই বিশ্বাস করেন না যে, মানুষ আজন্ম পাপী বা দুর্বল। মানুষের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। মানুষের যা কিছু মহৎ ও পবিত্র শুধু তারই সঙ্গে উচ্চারিত তাঁর আহ্বান। স্বামীজি ইদানীং ত্যাগের কথা খুব বলছেন। একদিন প্রশ্নোত্তরের সময় তিনি অকস্মাৎ বজ্র ধমকের সুরে বলে উঠলেন, জগৎ আজকের দিনে যা চায়, তা হচ্ছে এমন বিশজন নরনারী যারা ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহস ভরে বলতে পারবে যে, ভগবান ছাড়া তাদের আপনার বলবার আর কেউ নেই। কে প্রস্তুত? কে পারবে সব কিছু ছেড়েছুড়ে মানুষের সেবার কাজে বেরিয়ে আসতে!

এই কথাগুলি মার্গারেটের বুকে বিষমভাবে বাজে। ত্যাগ একটা চমৎকার শব্দ। ত্যাগের জন্য তো কেউ আগে এমনভাবে ডাকেনি। সংসার বাঁধার স্বপ্ন মার্গারেটের কাছ থেকে বারবার পিছলে সরে গেছে, তার আর ওই সাধ নেই। সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে অতি সহজ।

স্বামীজির এই আহ্বানে সাড়া দিতে তার কোনও দ্বিধা নেই।

২৭

অর্ধেন্দুশেখর এখন কর্মহীন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই বহুরূপী নট নিজে থিয়েটার চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তিনি জাত শিল্পী, কিন্তু থিয়েটার চালানো তো একটা ব্যবসারই মতন, সেই ব্যবসাদারি তাঁর ধাতে নেই। থিয়েটার ছেড়ে দিলেও পাওনাদাররা তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল, একদিন তিনি নিজের সব সোনা-রূপোর মেডেল ও স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে সব দেনা মিটিয়ে দিলেন। সংসার চালাবার দায় অবশ্য তাঁর নেই, ছেলে বড় হয়েছে, সে বাবাকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে।

বাড়িতে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না অর্ধেন্দুশেখর, পথে পথে ঘুরে বেড়ান। সাতচল্লিশ বছর বয়েস, শরীর এখনও বেশ মজবুত আছে, হাঁটতে তাঁর ভাল লাগে। মঞ্চে অভিনয়ের সময় অর্ধেন্দুশেখর এতরকম ভূমিকায় এত বিভিন্ন ধরনের মেকআপ নিয়েছেন যে তাঁর আসল চেহারা বহু মানুষই চেনে না। রাস্তায় কোথাও জটলা দেখলে তিনি উঁকি মারেন, কোথাও দাঁতের মাজনের ফেরিওয়ালা ম্যাজিক দেখাচ্ছে, কোথাও সাপুড়ে দেখাচ্ছে সাপ-খেলা। অর্ধেন্দুশেখর জানেন না এমন বিষয় যেন নেই, ম্যাজিকওয়ালাকে হতচকিত করে তিনি নিজেই একটা ম্যাজিক দেখিয়ে ফেলেন, সাপুড়ের পাশে বসে পড়ে তার হাত থেকে পেট-ফুলো বাঁশিটি নিয়ে এমন চমৎকার ভাবে বাজাতে থাকেন যে পথচারীরা তাজ্জব বনে যায়।

সবাই জানে, অর্ধেন্দুশেখর নিরহঙ্কার, দিলখোলা, কৌতুকপ্রবণ মানুষ। কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদা জ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম, সে খবর অনেকেই রাখে না। থিয়েটার-অন্তপ্রাণ এই মানুষটি এখন কোনও থিয়েটারের ধারে কাছেও যান না একেবারেই। থিয়েটারের কোনও পরিচিত ব্যক্তিকে রাস্তায় দূর থেকে দেখতে পেলেই তিনি ফুটপাথ বদল করেন। নট-নটীরা এক থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে অন্য থিয়েটারে যায় কাজের সন্ধানে, অর্ধেন্দুশেখর নিজে থেকে কোথাও যাবেন না, এ তো জানা কথাই। পাছে অন্য কোনও দল থেকে কোনও অসঙ্গত প্রস্তাব আসে, সেই জন্যই তিনি মঞ্চ-সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের এড়িয়ে যান। যে-কোনও নাটকে যে-কোনও ছোটখাটো ভূমিকায় নামতে তিনি কখনও আপত্তি করেননি, অনেক ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে তিনি ছিলেন এক মঞ্চের মালিক, তারপর নাট্য-পরিচালক, এখন শুধুমাত্র অভিনেতা হিসেবে কোনও দল তাঁকে আহ্বান জানালেও তিনি যাবেন কেন? তিনি এক নম্বর হয়েছিলেন, সেখান থেকে আবার তিন-চার নম্বরে নেমে যাওয়া যায় না। ফেল-করা নাট্য পরিচালককে আবার কেই-বা ওই পদ দিতে চাইবে?

অর্ধেন্দুশেখর বেকার হয়ে রইলেন তো বটেই, বাংলার রঙ্গমঞ্চও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল।

সারাদিনে বোতল তিনেক দেশি মদ লাগে, সেই খরচটা তিনি ছেলের কাছ থেকে চাইতে পারেন না। ঘড়ি-আংটি বিক্রি করে এখনও কোনওক্রমে চলে যায়। দিশি ছাড়া বিলিতি পানীয় কেউ সেধে দিলেও তিনি খান না। পরিচিত সবাইকে বলে রেখেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর শবের ওপর কয়েক বোতল দিশি মদ ঢেলে দিয়ে যেন দেশলাই জ্বেলে দেওয়া হয়, চন্দন কাঠ-ফাটের দরকার নেই।

একদিন অর্ধেন্দুশেখর পীরুর হোটেলে ঢুকে একজোড়া হাফ বয়েল্ড হাঁসের ডিমের অর্ডার দিয়ে একটা চুরুট টানছেন, দু'জন লোক তাঁকে দেখে এগিয়ে এল টেবিলের দিকে।

অর্ধেন্দুশেখর মুখটা ব্যাজার করলেন। আবার থিয়েটারের লোক! এদের বলা যায় স্রোতের শ্যাওলা, ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করে, জীবনে কোনওদিনই বড় পার্ট পাবে না, এক থিয়েটার থেকে অন্য থিয়েটারে যায়, মাঝে মাঝে কোনও কাজই জোটে না। অর্ধেন্দুশেখর প্রায় সবকটা রঙ্গমঞ্চে কখনও না কখনও ছিলেন, ছোট-বড় সবাইকেই চেনেন। এদের দু'জনের নাম ব্যোমকেশ আর নীলধ্বজ, ব্যোমকেশকে তিনি একবার এক অভিনেত্রীর সঙ্গে রিহার্সালের সময় খুনসুটি করার অপরাধে বরখাস্ত করেছিলেন।

অর্ধেন্দুশেখর মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চান না। ওরা তা মানবে কেন? কাছে এসে হেসে বিগলিত ভাবে বলল, নমস্কার, নমস্কার, গুরু, বড় ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলুম!

অর্ধেন্দুশেখর শুকনো গলায় বললেন, আমি এখন আর কারুর গুরু-ফুরু নই!

ব্যোমকেশ আর নীলধ্বজ ধপ ধপ করে বসে পড়ল দুটি চেয়ারে। অর্ধেন্দুশেখর আঙুল দিয়ে ছবি আঁকতে লাগলেন টেবিলে। একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ব্যোমকেশ বলল, গুরু, কী ভাবছেন?

অর্ধেন্দুশেখর বলল, এমন কিছু না। কী ভাবব, তাই-ই ভাবছি!

নীলধ্বজ বলল, ক্লাসিক থিয়েটারে কী কাণ্ড হচ্ছে শুনেছেন?

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, না শুনিনি, শুনতেও চাই না।

হোটেলের এক ছোকরা প্লেটে দুটি অর্ধসিদ্ধ ডিম এনে রাখল টেবিলে। অর্ধেন্দুশেখর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ার উপক্রম করে বললেন, ওরে, পয়সা নিয়ে যা। কত দিতে হবে?

ছোকরাটি বলল, আজ্ঞে দু'আনা!

অর্ধেন্দুশেখর আঁতকে উঠে বললেন, দু'আনা? বলিস কী? এত দাম কেন, ডিমের জোড়া তো চার পয়সা।

ছোকরাটি বলল, আজ্ঞে, কী করব বলুন, আজকাল ডিম বড় মাগ্‌গি হয়েছে।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, কেন, হাঁসেরা আজকাল সব পরমহংস হয়ে উঠেছে নাকি?

ব্যোমকেশ ও নীলধ্বজ অট্টহাসি করে উঠল। ওদের একজন টেবিল চাপড়ে বলল, যা বলেছেন, আজকাল পরমহংসদের বড় রবরবা। দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলাটার কথা তো লোকে ভুলেই গেললো, এখন তাঁর কোন এক শিষ্য নাকি বিলেত আমেরিকায় তার খুব নাম রটাচ্ছে। এদিকে গিরিশবাবুর কাণ্ডটা দেখুন, বাইরে এমন ভাব দেখান যেন পরমহংসের ভক্ত হয়ে একেবারে গদ্গদ, মুখ দিয়ে নাল গড়ায়। অথচ আগে যা যা চালাচ্ছিলেন, সবই তো চলছে। মদ-মাগি কিছুই বাকি নেই, টাকা পয়সার ব্যাপারেও সেয়ানা! এ যে বড় সুবিধাবাদের ভক্তি, কেমন কিনা!

নীলধ্বজ বলল, পরশু গিরিশবাবুর কাছে গেসলুম, বুঝলেন? বললুম যে, ক্লাসিকে ওই যে এক ছোকরা যা খুশি তাই করছে, আপনারা এর যোগ্য উত্তর দিন। আপনি আর অর্ধেন্দুবাবু এক জোট হয়ে কোনও স্টেজে দাঁড়ালে ও ছোকরা এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে! তা গিরিশবাবু কী বললেন জানেন? মাছি তাড়াবার মতন বাঁ হাত নেড়ে বললেন, যা যা, আমার সামনে অর্ধেন্দুর কথা উচ্চারণ করবিনি! সে একেবারে গোল্লায় গেছে।

ব্যোমকেশ বলল, গিরিশবাবু আপনাকে বেদম হিংসে করেন। গিরিশবাবু তো বুড়ো ঘোড়া। পাবলিক এখনও আপনাকে চায়। উনি সেটাই সহ্য করতে পারেন না।

অর্ধেন্দুশেখর নিঃশব্দে ডিম দুটি শেষ করে বললেন, কেউ একলা খেতে বসলে যে তার মুখের সামনে হাঁ করে বসে থাকতে নেই, সে ভদ্রতা-সভ্যতাটুকুও তোরা জানিস না! তোদের আমার চিনতে বাকি নেই। ভাবছিস, আমার সামনে গিরিশের নিন্দে করলে আমি খুশি হব। আবার গিরিশের কাছে গিয়ে আমার নামে কান ভাঙাবি! ওরে হারামজাদা, গিরিশ যদি আমাকে হিংসে করে থাকে, তা হলে সে তো যোগ্য লোককেই করে। তোদের মতন হেঁজিপেঁজি চুনোপুঁটিদের কি সে হিংসে করতে যাবে? আমি মরলে ওই গিরিশই সবচেয়ে বেশি কাঁদবে। আর গিরিশ যদি আগে যায়, আমিই সত্যিকারের কাঁদব তার জন্য।

অর্ধেন্দুশেখর উঠে দাঁড়াতেই ব্যোমকেশ ঝপাস করে তার পায়ে পড়ে বলল, স্যার, আমাদের দু'জনকে উদ্ধার করুন। দু'মাস কোনও কাজ নেই। আপনি গিরিশবাবুর সঙ্গে জয়েন করছেন না জানি, আপনি কি তবে ক্লাসিকে যাচ্ছেন? আমরা আপনার পায়ের ধুলো, আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলুন!

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, কী আপদ! ওঠ ওঠ। হোটেলের মধ্যে আর নাটক করতে হবে না। তোদের কে বলল, আমি ক্লাসিকে জয়েন করছি?

ব্যোমকেশ বলল, লাইনের সবাই বলাবলি করছে, অর্ধেন্দু মুস্তফি কি চুপচাপ বসে থাকবে? ক্লাসিক তাকে লুফে নেবে!

অর্ধেন্দুশেখর এবার ফিকে ধরনের হাসলেন। ক্লাসিক থিয়েটার থেকে তাঁকে লুফে নেওয়া দূরের কথা, কোনও প্রস্তাবই আসেনি। ক্লাসিকের নবীন পরিচালক পুরনো বয়স্ক অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাইকে বাদ দিয়ে চলতে চায়।

তিনি বললেন, যদি কোনও থিয়েটারে যোগ দিই, তা হলে কি আর ধুলো পায়ে যাব সেখানে? কেউ এসে পায়ে জল ঢেলে ধুইয়ে বরণ করে নেবে, তবে না! যা যা, ভাগ!

অর্ধেন্দুশেখর ওদের এড়িয়ে পথে নেমে পড়লেন, কিন্তু ওদের কথায় তাঁর মনের মধ্যে একটু একটু জ্বালা করতে লাগল। ক্লাসিক থেকে তাঁকে ডাকেনি, মিনার্ভাও ডাকেনি। আর কেউ সাধাসাধি করবে না? নিজে থিয়েটার খোলার সাধ্য আর নেই, এখন থেকে তিনি বাতিলের দলে।

রক্তে যাঁর থিয়েটারের নেশা ঢুকেছে, সে আর কিছুতেই ছাড়তে পারে না। অর্ধেন্দুশেখর একা একা পথ চলতে চলতে বিড়বিড় করে কোনও একটা পার্ট বলে যান। মানুষের সঙ্গ সহ্য হয় না বলে সন্ধের পর একা এসে বসে থাকেন গঙ্গার ধারে। সঙ্গে একটি বোতল। মাঝে মাঝে একটা করে চুমুক দেন আর একটা গোটা নাটকের সবকটা ভূমিকা গলার স্বর বদলে আবৃত্তি করে যান। অন্ধকার নদী আর এলোমেলো বাতাস তাঁর শ্রোতা। এক সময় সেখানেই শুয়ে পড়েন তিনি। কলের জাহাজের ভোঁতে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখেন ভোর হয়ে গেছে। অর্ধেন্দুশেখর দু'হাত

ছড়িয়ে অ্যাঁ শব্দ করে আড়মোড়া ভাঙেন।

একটু দূরে একটা পাগল শুয়ে আছে, সেও বলে উঠল, অ্যাঃ!

অর্ধেন্দুশেখর তার দিকে একবার তাকিয়ে একটা গান ধরলেন, 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে মা গো—'

পাগলটি ভেঙচে উঠে গেয়ে উঠল, মা গো, মাগো!

সেই উন্মাদের গলাটি বেশ গম্ভীর, সুরেলা। গান থামিয়ে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, কে হে তুমি বাপধন, তুমিও থিয়েটার থেকে ছাঁটাই নাকি?

পাগল বলল, বোম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী!

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, ও তো সবাই পারে! আমি এইটে ধরছি, আমার সঙ্গে গলা মেলা দেখি!

হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট
Mr. Mustafee name হামারা
চাটগাঁও মেরা আছে বিলাট
Rom-ti-tom-ti-tom...

পাগল হাঁ করে চেয়ে রইল। অর্ধেন্দুশেখর গান শেষ করে বললেন, বুঝলি কিছু? বেশ তাগড়া চেহারা করেছিস তো। ওই দুনিয়া সত্যি বিচিত্র স্থান। তোরও নিশ্চয়ই দু'বেলা আহার্য জুটে যায়। আয় তো কাছে আয়, তোর জীবন কথা শুনি!

তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে সেই উন্মাদ তরতর করে নেমে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল। অর্ধেন্দুশেখর পকেট থেকে একটা আধ পোড়া চুরুট বার করে ধরালেন। এত সকালেই বেশ কিছু মানুষ গঙ্গায় স্নান করতে এসেছে। ভরা বর্ষার নদীকে মনে হয় যেন এক যৌবন-মদ-মত্তা রমণীর মতন। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ এসে ভাঙছে পাড়ে। অনেকগুলি ইলিশ মাছ ধরা নৌকো ছড়িয়ে আছে এধারে ওধারে।

অর্ধেন্দুশেখরের শরীরে এখনও নেশার আলস্য রয়ে গেছে, এমন সকাল সকাল তাঁর স্নান করার অভ্যেস নেই, গঙ্গা স্নানে পুণ্য অর্জন করারও প্রবৃত্তি নেই। তিনি কিছুটা বিস্মিত ভাবে পাগলটির ডুব দেওয়া দেখতে লাগলেন। তাঁর ধারণা ছিল, পাগলরা সহজে জল ছুঁতে চায় না।

কয়েকবার ডুব দিয়ে পাগলটি দ্রুত গতিতে উঠে এসে অর্ধেন্দুশেখরের সামনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, দে। কিছু দে!

পাগলটির পরনে একটি ছেঁড়া ধুতি, খালি গা, মুখভর্তি দাড়ি। চোখের দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, তার মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, কী দেব?

পাগলটি আবার বলল, দে, কিছু দে!

অর্ধেন্দুশেখর রুক্ষ স্বরে বললেন, আমি ভিক্ষে দিই না, যা ভাগ হিঁয়াসে!

আপন মনে বললেন, আমি নিজেই এখন ভিখিরি, অন্যকে দেব কী?

পাগলটি তবু গেল না। অর্ধেন্দুশেখর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। এ লোকটা ভিক্ষে চাইবার আগে গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে এল কেন? ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের মণিদুটো যেন ঘুরছে, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। এ কী কোনও পাগল, না ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।

হঠাৎ অর্ধেন্দুশেখরের মনে হল, তিনি বেশ কয়েকবার মঞ্চে পাগল সেজেছেন, দর্শকদের হাততালিও পেয়েছেন, কিন্তু এমন ঘাড় বেঁকিয়ে তো দাঁড়াননি। ঠোঁটের হাসিটায় ওর পাগলামি যেন অন্য একটা মাত্রা পেয়েছে। এই লোকটাকে স্টাডি করলে ভবিষ্যতে তিনি পাগলের ভূমিকা অনেক নিখুঁত করতে পারবেন। তিনি যেন অভিনয় কলার একজন ছাত্র, এই হিসেবে পাগলটিকে নতুন আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

এক সময় উঠে এসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, চলো দোস্ত, গরম গরম জিলিপি খাবে নাকি? আমার কাছে এখনও দু'আনা পয়সা আছে।

পরদিনও অর্ধেন্দুশেখর ওই জায়গাটিতে এসে পাগলটির পাশে বসে তাকে দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে। পাগলটি মাঝে মাঝে দু'চারটি বাক্য বলে, হাসে, হঠাৎ হঠাৎ মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কাঁদে। অর্ধেন্দুশেখর তার জন্য খাবার কিনে আনেন, গরম রাধাবল্লভী হাতে নিয়ে সে মাঝখানে একটা ফুটো করে ফুঁ দেয়, তারপর যেন প্রেমিকাকে অনুনয় করছে এই ভঙ্গিতে বলে, তোমাকে একটু খাই?

অর্ধেন্দুশেখর তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গি মনে এঁকে রাখেন। মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক না থাক, তবু তিনি অভিনয় শিখে চলেছেন। মঞ্চের বাইরেই তো প্রকৃত অভিনয় শিক্ষা করা যায়।

দিন চারেক তিনি পাগলটির সঙ্গে অনেক সময় কাটালেন। তারপর পাগলটি কোথায় উধাও হয়ে গেল। তারপর তিনি ভিড়ে গেলেন শ্মশানের পাশে এক সাধুর আখড়ায়। এখানে মদ-গাঁজা সবই চলে, সাধুটি যে এক নম্বরের ভণ্ড তা বুঝে যেতে অর্ধেন্দুশেখরের একটুও বিলম্ব হল না, সম্ভবত কোনও ফেরার ডাকাত বা খুনি আসামি সাধু সেজে আছে। তা হোক না, এরকমও তো কোনও নাটকের চরিত্র হতে পারে। সব ধরনের চরিত্রই নাটকের কাজে লেগে যায়।

প্রতি সন্ধেবেলা কলকাতা শহরের বিভিন্ন মঞ্চে যখন জ্বলে ওঠে পাদপ্রদীপের আলো, মুখে রং মেখে নট-নটীরা যখন হাসি-কান্নার অভিনয় করে যায়, অর্ধেন্দুশেখর বসে থাকেন অন্ধকার গঙ্গার ধারে। বেশির ভাগ দিনই একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর অভিমানের দীর্ঘশ্বাস আর কেউ টের পায় না।

গঙ্গার ধারে যাবার জন্য তাঁকে রামবাগানের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। সন্ধের সময় এই অঞ্চলটাতে বেশ ভিড় থাকে। একটু অন্ধকার হবার পরই যেন এখানে অনেক ফুল ফোটে, সেই সব ফুলের টানে ছুটে আসে অনেক রসের নাগর। একদিন একটা বাড়ির মধ্যে খুব চ্যাঁচামেচি শোনা গেল, একটি স্ত্রীলোক ডুকরে কাঁদছে, আর গর্জন করছে দু'তিনটি পুরুষ, মনে হয় যেন একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটতে চলেছে। সে বাড়িটার দরজার সামনে জড়ো হয়েছে অনেক মানুষ। যেন এক্ষুনি কোনও সাংঘাতিক নাটকীয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

কৌতূহলী হয়ে অর্ধেন্দুশেখর জনতার পেছনে দাঁড়িয়ে গোড়ালি উঁচু করে উঁকি দিলেন। ও হরি, নাটকীয় কাণ্ড কিছু নয়, সত্যি সত্যি নাটক। একটি শখের নাট্যদল 'নীলদর্পণ' নাটকের মহড়া দিচ্ছে।

অর্ধেন্দুশেখর সেখান থেকে আর নড়তে পারলেন না। এই নীলদর্পণে তিনি কতবার কত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শেষবার নীলদর্পণ মঞ্চস্থ হবার পরই তাঁর এমারাল্ড থিয়েটার উঠে যায়। তারপর থেকেই তো তাঁর কপাল পুড়েছে।

লম্বা একটি হলঘরের মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা, দু'চারটে চেয়ার ছড়ানো, দশ-বারোজন লোক বিভিন্ন পার্ট মুখস্থ বলে যাচ্ছে, মাঝখানে পরিচালকের হাতে খাতা। দরজা বন্ধ রেখেও বাইরের লোকদের আটকানো যায় না, তারা জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে, বাইরে গোলমাল করে, তাই দ্বার উন্মুক্ত করে পাবলিককে রিহার্সাল দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবে এই শর্তে। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে ফিসফিসানি শুরু হলে পরিচালক চেঁচিয়ে ওঠে, সাইলেন্স। সাইলেন্স।

গঙ্গার ধারে আর যাওয়া হল না অর্ধেন্দুশেখরের। সেখানে জনতার মধ্যে সেঁটে রইলেন। একটু একটু করে এগোচ্ছেন সামনের দিকে। পাড়ার ক্লাবের শখের অভিনয়, কেউ-ই তেমন তৈরি নয়, এক একজন তোতলাচ্ছে, এক একজন পার্ট ভুলে যাচ্ছে, তবু তাই-ই দেখে যাচ্ছেন নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর। হঠাৎ এক সময় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, চোপ। তুম শালা নালায়েক আছে।

সবাই চমকে ফিরে দাঁড়াল। পরিচালক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কে? কে বললে?

দর্শকরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ঠিক কে যে বলেছে, তা বোঝা যায়নি। অর্ধেন্দুশেখর লজ্জা পেয়ে মুখটা নিচু করে ফেলেছেন। এ ভাবে মহড়ায় বিঘ্ন ঘটানো তাঁর উচিত হয়নি।

পরিচালক আবার ধমকে উঠে বলল, এমন ভাবে ডিসটার্ব করলে কিন্তু আমি কারুকে অ্যালাউ

করব না। একদম স্পিকটি নট হয়ে থাকতে হবে।

আবার শুরু হল। অর্ধেন্দুশেখর ঠেলে ঠুলে একেবারে সামনে এসে পড়লেন একসময়। হলঘরের অভিনেতারা পার্ট বলে যাচ্ছে, তিনিও ঠোঁট নেড়ে চলেছেন। প্রত্যেকটি ভূমিকাই তার মুখস্থ, কতবার কতজনকে তিনি এইসব অভিনয় শিখিয়েছেন। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন তিনি, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রইল না, মনে মনে পার্ট বলে যাচ্ছিলেন, আবার এক সময় গর্জন করে উঠলেন, হামি তুমার বাপ কেন হব, হামি তুমার ছেলিয়ার বাপ হইটে চাই!

সাহেবের ভূমিকায় যে ব্যক্তিটি অভিনয় করছে তার বাচনভঙ্গি একেবারে ভেতো বাঙালির মতন। না আছে তেজ, না আছে দার্ঢ্য। যে-কোনও সাহেবের ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখরের তা সহ্য হবে কেন?

এবারে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীকে শনাক্ত করতে দেরি হল না। তোরাপের ভূমিকাভিনেতাটি ছুটে এসে অর্ধেন্দুশেখরের টুঁটি চেপে ধরে বলল, শালা, তুই আমাদের ভ্যাঙচাচ্ছিস? মারব এক রদ্দা—

অর্ধেন্দুশেখর আত্মস্থ হয়ে বললেন, না, না, ভ্যাঙচাইনি, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করে দিন।

ষণ্ডামার্কা সেই লোকটি অর্ধেন্দুশেখরকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ভুল হয়ে গেছে? তুই কোন ক্লাবের? আমাদের থিয়েটার ভণ্ডুল করতে এসেছিস!

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, আজ্ঞে না, আমি কোনও ক্লাব থেকে আসিনি। সত্যি ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা চাইছি...

লোকটি তবু অর্ধেন্দুশেখরকে চপেটাঘাত করতে উদ্যত হল। অন্য দর্শকরাও বলতে লাগল, এ লোকটাকে দূর করে দাও! ভাগাও!

পরিচালকটি শুধু একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল অর্ধেন্দুশেখরের দিকে, সে এবার বলল, অ্যাই, মারিস না। ওকে আমার সামনে নিয়ে আয়।

অর্ধেন্দুশেখরকে হিড় হিড় করে টেনে আনা হল মাঝখানে। পরিচালক ভালভাবে নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ অর্ধেন্দুশেখরের মুখে খোঁচাখোঁচা পাঁচ দিনের দাড়ি। ধুতির ওপর উড়ুনিটা বেশ মলিন, মাথার চুল অবিন্যস্ত। তিনি নিরীহ গলায় বললেন, আজ্ঞে আমি কেউ না, এমনিই রাস্তার লোক, নীলদর্পণ দু'তিনবার দেখেছি কি না, তাই মুখ ফস্কে বেরিয়ে এসেছে।

পরিচালকটি বলল, আমার নাম ছোনে মিত্তির। ছোটবেলা থেকেই আমি থিয়েটারের নামে পাগল। আপনার গলা শুনে যদি চিনতে না পেরে থাকি, তা হলে আমি থিয়েটারের কিছুই বুঝি না! আপনি যে সে লোক নন, আপনি মুস্তুফিসাহেব!

তখন এক সঙ্গে আরও চার পাঁচজন লোক বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। ইনিই তো মুস্তুফি সাহেব বটে!

অগত্যা অর্ধেন্দুশেখর অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছোনে মিত্তির হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোড় করে বলল, গুরু, আমি দূর থেকে আজীবন আপনার শিষ্য। আপনি দ্রোণাচার্য, আমি একলব্য। আজ এত সামনাসামনি আপনাকে দেখলাম, আমার জীবন ধন্য হল।

বস্ত্রহরণের পর শ্রীকৃষ্ণের সামনে গোপিনীরা যেমন ভাবে স্তব করেছিল, সেই ভাবে অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল, আপনাকে চিনতে পারিনি। ক্ষমা করুন, গুরুদেব। আমাদিগে আপনি আশীর্বাদ করুন।

অর্ধেন্দুশেখরের বুকটা ভরে গেল। অনেকদিন তিনি এমন চাটুকারিতা শোনেননি। টানা বেশ কিছুদিন হাততালি বা প্রশংসা না পেলে শিল্পীর মন স্তিমিত হয়ে যায়। অর্ধেন্দুশেখর আবার চাঙ্গা বোধ করলেন।

ছোনে মিত্তির উঠে দাঁড়িয়ে নাটকের খাতাটা অর্ধেন্দুশেখরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলল, একবার আপনাকে পেয়েছি যখন, আর ছাড়ছি না। আপনি আমাদের একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিন।

আপনি স্বয়ং নাট্যাচার্য, আর নীলদর্পণ তো আপনার কাছে জলভাত!

তোরাপবেশী লোকটি দু'কানে হাত দিয়ে বলল, আপনার 'মুকুল মঞ্জরা', 'আবু হোসেন', 'প্রতাপাদিত্য', 'পাণ্ডব নির্বাসন' এরকম কত প্লে দেখেছি, তবু আপনাকে চিনতে পারিনি। এমন গুখুরির কাজ কোনও মানুষে করে! আমি হেন নরাধম আপনার গায়ে হাত তুলেছি, আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি এক মাইল রাস্তা নাকে খত দিয়ে যাব, সাতদিন জল স্পর্শ করব না, তারপরেও আমাকে যা শাস্তি দেবার দিন।

অর্ধেন্দুশেখর তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, মনের অগোচরে দোষ নেই। ওসব কিছু করতে হবে না। তুমি যে তখন পার্ট বললে, 'শালার কান আমি কামড়ে কেটে দিয়েছিলাম গো', ও জায়গাটা অন্য ভাবে বললে দর্শকের ক্ল্যাপ পাবে। ট্যাঁক থেকে একটা ছোট কোনও জিনিস বার করে দর্শকদের দিকে দেখিয়ে চোখে আগুন ঢেলে এইভাবে বলবে, 'হালার কানের খানিকডা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছি...'

২৮

শখের এই দলটির নাম বেশ জমকালো, 'ভিকটোরিয়া ড্রামাটিক ক্লাব'। বছরে চার পাঁচটি নাটক এরা নামায়। শহরে বিশেষ পাত্তা পায় না, মফস্বলের গ্রামে গঞ্জে এদের ডাক পড়ে। দুটি-তিনটি ভাড়া করা অভিনেত্রীকে কিছু পয়সা দিতে হয়, এ ছাড়া বাকি সকলের ভালবাসার পরিশ্রম।

অর্ধেন্দুশেখর এদের নাট্য পরিচালক হয়ে বসলেন। তাঁর নিজের মঞ্চ ভাড়া করার কিংবা নতুন করে দল গড়ার মতন আর রেস্তর জোর নেই। কোনও প্রতিষ্ঠিত মঞ্চ থেকেও তাঁর কাছে ডাক আসেনি। হোক না এটা একটা নিতান্ত পাড়ার ক্লাব, তবু তো এখানে তিনি এক নম্বর। সবাই তাঁর কথা মানে।

এখানে তিনি নাট্য পরিচালক হতে রাজি হয়েছেন দুটি শর্তে। কোথাও তাঁর নাম থাকবে না, হ্যান্ডবিল-পোস্টারে তো নয়ই, মুখে মুখেও জানানো চলবে না। কাগজে-কলমে ছোনে মিত্তিরই পরিচালক। দ্বিতীয় শর্ত হল, তিনি এদের কাছ থেকে এক পয়সাও নেবেন না। শুধু গোটা দু'তিন বাংলা মদের বোতল জোগান দিলেই চলবে।

রিহার্সালের স্থান পরিবর্তন হয়েছে, এখন আর সেখানে পাবলিক উঁকি ঝুঁকি মারতে পারে না। প্রতিদিন হল ঘরের মাঝখানে একটা বড় চেয়ারে তিনি বসেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন তাঁর হাতে একটি গড়গড়ার নল তুলে দেয়। আর একজন একটি গেলাসে মদ সেজে এনে সামনে রাখে। অর্ধেন্দুশেখর সারাদিনই একটু একটু করে মদ্যপান করেন বলে কোনও সময়েই খুব বেশি নেশাগ্রস্ত হন না, তাঁর কথা জড়িয়ে যায় না।

গেলাসে একবার করে চুমুক দেন, গড়গড়ার নলে টান মারেন, আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বরের খেলা দেখিয়ে দেন। এক এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কখনও বীরদর্পে, কখনও কৌতুকের ভঙ্গিতে হাঁটা চলা করেন, গান গেয়ে ওঠেন কারুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে। এই আনাড়ি লোকগুলোকেই দারুণ ভাবে গড়ে পিটে নিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

'নীলদর্পণ' প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে, আর দশ দিন পরেই চন্দননগরের ফরাসডাঙায় প্রথম মঞ্চস্থ

হবে। তারপর শ্রীরামপুরেও আমন্ত্রণ আছে। মহলা শেষ হয়ে যাবার পরও কয়েকজন থেকে যায়, গল্প গুজব হয়। অর্ধেন্দুশেখরের বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া নেই। ছোনে মিত্তির অর্ধেন্দুশেখরের কাছ থেকে রঙ্গমঞ্চের নানান কাহিনী যেন দু'চোখ দিয়ে গিলে নেয়। অর্ধেন্দুশেখরের জন্য সে গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, তামাক সেজে দেয়, কিন্তু নিজে গুরুর কাছে ওসব কিছু ছোঁয় না।

একদিন ছোনে মিত্তির বলল, গুরুদেব, একটা কথা বলব, অপরাধ নেবেন না ?

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, সে আবার কী ? যা ইচ্ছে হয় খোলসা করে বলো। মনের কথা কখনও চেপে রাখতে নেই, তাতে অসুখ করে। বলে ফ্যালো !

ছোনে মিত্তির মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, আমি মাঝে মাঝে হরিদাসীর কাছে যাই। রাত্তিরে ওর ওখানেই থাকি।

হরিদাসী এই ক্লাবেরই একজন ভাড়া করা অভিনেত্রী। এই ধরনের অভিনেত্রীদের সঙ্গে নাট্য পরিচালকদের একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এরকম যেন একটা অলিখিত নিয়ম আছে।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, তা বেশ তো, যাও না। তুমি বিয়ে-থা করেছ তা জানি। মাঝে মাঝে পরনারীর কাছে গেলে রক্ত চলাচলের গতি বৃদ্ধি পায়, তাতে শরীর মেজাজ ভাল থাকে, এমনই তো অনেকে বলে। তুমি হরিদাসীর ঘরে যাবে, তার জন্য আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে নাকি ?

ছোনে মিত্তির বলল, আজ্ঞে তা নয়। হরিদাসী ভয়ে বা সঙ্কোচে একটা কথা আপনাকে জানাতে পারে না। তাই আমাকে বলেছে। শুনে আমিও দু'দিন ধরে বড় উতলা হয়ে আছি। চেপে রাখতে পারছি না। গুরুদেব, আপনার জন্য একটি মেয়ের সর্বনাশ হতে যাচ্ছে।

অর্ধেন্দুশেখর চমকে উঠে বললেন, সে কী ! এমন অপবাদ তো আমার নামে কেউ কখনও দেয়নি ! আমি মদ-গ্যাঁজা খাই সবাই জানে। শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকি। কিন্তু কারুর ক্ষতি তো করি না বাপ্প। থিয়েটারের মাগিদের নিয়ে বেলেল্লা করা আমার ধাতে নেই। ভদ্রঘরের কোনও মেয়েকেও নষ্ট করিনি। তুমি এত বড় একটা কথা বললে ?

—মিথ্যে বলিনি, আগে সবটা শুনুন। হরিদাসী যেখানে থাকে, তার কাছেই গঙ্গামণির বাড়ি। এককালে নাম করা অ্যাকট্রেস ছিল গঙ্গামণি...

—অত ব্যাখ্যান করে বলতে হবে না। গঙ্গামণিকে আমি চিনি না ? ওর ডাক নাম হাঁদু। ওর বাড়িতে আমি কতবার গেছি।

—সেই বাড়িতেই থাকে নয়নমণি।

—হ্যাঁ হাঁ জানি। ওর আগে নাম ছিল ভূমিসুতো না মাটির দড়ি কী যেন। থিয়েটারে ওই নাম চলবে না বলে আমিই ওর নাম রেখেছিলাম নয়নমণি। তারপর বলো—

—লোকে বলে ওই নয়নমণি আপনার মানসকন্যা।

—আরে দূর, মানসকন্যা ফন্যা কিছু না। ওসব গালভরা কথা আমি বিশ্বাস করি না। ওকে আমি রাস্তা থেকে তুলে এনে গড়ে পিটে নিয়েছি। শেষের দিকে বেশ ভাল পার্ট করত, ও মেয়ের গুণ আছে। তা এমন তো আরও কতজনকে আমি শিখিয়েছি-পড়িয়েছি। বিনোদিনী আমার কাছে শেখেনি ? কুসুমকুমারী, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী কে শেখেনি আমার কাছে ? এত মানস পুত্রকন্যা হলে যে বিরাট সংসার হয়ে যায় হে আমার।

—নয়নমণি আপনাকে পিতার মতন জ্ঞান করে।

—তা করে তো করুক। নয়নমণির নাগর আমি যখন ছিলুম না, তখন তার মানসবাপ হতে দোষ কী ? তা বাপের মতন যদি হয়ে থাকি, তা হলে আমি আবার তাকে নষ্ট করলুম কী করে ?

—আজ্ঞে নষ্ট করার কথা তো বলিনি। ছি ছি ছি ছি, এমন কথা আমার মুখেও আসবে না। বলছিলাম যে, আপনার জন্য, হয়তো আপনার অজ্ঞাতসারেই নয়নমণির সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে !

—কী রকম ? কী রকম ? আমার কৌতূহল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

—আপনি এমারাল্ড তুলে দিলেন, আপনার দলের সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, দু'চারজন ছাড়া অন্যরা সবাই কোনও না কোনও স্টেজে এখন ঢুকে পড়েছে। আর নয়নমণি, যে ছিল আপনার

হিরোইন, পাবলিকের কাছে যার দারুণ ডিমান্ড, সে চুপচাপ বসে আছে বাড়িতে।

—আমি তার কী করব ? দল ভেঙে গেছে, এখন যে যেখানে পারবে যাবে। সবার কাজ খুঁজে দেবার জন্য আমি দাসখৎ লিখে দিয়েছিলাম নাকি ? এমন কথা বলা তোমাদের ভারী অন্যায়।

—আজ্ঞে, নয়নমণির বেলায় কাজ খুঁজে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। মিনার্ভা তাকে ডেকেছে, স্টার ডেকেছে। ক্লাসিক থেকে সাধাসাধি করছে, তবু সে যায় না।

—সে কোথায় যাবে না যাবে, তার আমি কী জানি ! ও ছেমড়িটার বরাবরই গুমোর বেশি !

—অমর দত্ত নিজে গিয়েছিলেন তার কাছে, তবু নয়নমণি দেখা করেনি। আপনি তাকে শপথে বেঁধে রেখেছেন। আপনি একদিন তাকে পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে আপনাকে ছেড়ে সে যেন কোথাও না যায়। তাই এখনও সে আপনার অনুমতি ছাড়া কোনও বোর্ডে যোগ দেবে না। শপথ সে ভাঙবে না ! আপনার সন্ধানও কেউ জানে না।

অর্ধেন্দুশেখর হা-হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। মদের গেলাসে আবার একটা চুমুক দিয়ে বললেন, শপথ না ঘোড়ার ডিম ! ওহে থিয়েটারে আমরা নকল কথা বলি, নকল ভাবে হাসি, নকল ভাবে কাঁদি। আমাদের জীবনে আসল কিছু আছে নাকি ? ওসব শপথ টপথের কোনও দাম নেই। থিয়েটারের ভেতরের খবর তুমি কী জানো? আজ যে দু'জনের গলাগলি ভাব, কালকেই দেখবে দু'পাঁচটাকা বেশি রোজগারের লোভে একজন অন্য স্টেজে চলে গেল, শত্রুতা শুরু করে দিল। গিরিশবাবুর হাতে গড়া শিষ্য অমৃতলাল, সেই দু'জনের মধ্যে আকছা-আকছি হয়নি ? 'অসার এ সংসার, তুমি কার কে তোমার !' লোকে বাপ-মাকে পর্যন্ত ভুলে যায়। ওই নয়নমণি যদি থিয়েটার আর না করতে চায়, তা হলে শাঁসাল দেখে কোনও বাবু ধরুক। যেখানে খুশি যাক।

ছোনে মিত্তির বলল, হরিদাসী তো বলে মেয়েটা একেবারে অন্য ধাতুতে গড়া। অমন রূপ-যৌবন, অমন নাম ডাক, তবু নাকি কোনও পুরুষের সঙ্গে মেশে না। রাত্তিরে কেউ ওর ঘরে যেতে পারে না। মেয়েরাও ওর গুণের প্রশংসা করে, এমনটি আগে কখনও শুনিনি। অমর দত্তকে ফিরিয়ে দেবার মতন হিম্মত কটা মেয়ের থাকতে পারে বলুন।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, ও মেয়েটা যেমন ঠেঁটি, তেমনি দেমাকি। একবার এক মস্তবড় মহারাজা ওর গান শোনার জন্য কত পেড়াপিড়ি করলেন, ও ছুঁড়ি কিছুতেই গেল না। ও যদি নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চায়, তবে আমি কী করব !

—ও কিন্তু থিয়েটার ভালবাসে। থিয়েটারে আবার যোগ দেবার ইচ্ছে আছে, শুধু আপনার জন্য পারছে না। হরিদাসী বলে, আর কিছুদিনের মধ্যে আপনার সন্ধান না পেলে ও কাশীতে চলে যাবে। তাতে থিয়েটারের কত ক্ষতি হবে বলুন ! অমন প্রতিভাময়ী একজন অ্যাকট্রেস ! আমি হরিদাসীকে বলে দিলুম একদিন তাকে এখানে নিয়ে আসতে। এসে আপনার পায়ে পড়ুক। কিন্তু তা বোধহয় সে আসবে না। তাই বলছিলুম কী, আপনি যদি একদিন গিয়ে তাকে অভয় দেন ! নয়নমণি ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দিলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে।

অর্ধেন্দুশেখর এবার দপ করে জ্বলে উঠে বললেন, কী, আমি যাব তার বাড়ি ? তোদের মুখের কোনও আড় নেই ? আমার এমারাল্ড ঋণের দায়ে উঠে গেল, সেখানে দত্ত বাড়ির এক উটকো ছোকরা ক্লাসিক থিয়েটার খুলেছে, সেই ক্লাসিককে আমি সাহায্য করব ? খবরদার এমন কথা আর আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। নয়নমণি কাশী যাক বা উচ্ছন্নে যাক, তাতে আমার কী ?

মাথায় রাগ চড়ে গেলে রাত্তিরে ভাল করে ঘুম আসতে চায় না। অর্ধেন্দুশেখর বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল নয়নমণির মুখ। কুমোরটুলির কুমোররা একতাল মাটি নিয়ে যেমন আস্তে আস্তে একটা মানুষের মুখ ফুটিয়ে তোলে, সেই ভাবে তিনি নয়নমণিকে গড়েছেন। প্রথম যখন মেয়েটিকে দেখেন, তখন শুধু তার গানের গলাটা ভাল ছিল। কিন্তু শুধু তা দিয়ে কি বড় অভিনেত্রী হওয়া যায় ? মঞ্চের ওপর হাঁটা চলা, হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাকানো, প্রস্থানোদ্যত হয়ে উইংসের কাছে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ানো, এই গুলোও তো আসল। কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা শেখানোর জন্য কি কম খাটতে হয়েছে ? হ্যাঁ, একথা ঠিক, মেয়েটার

শেখার আগ্রহ ছিল। দু'লাইন পার্ট দশবার ধরে বলালেও কখনও ক্লান্তির চিহ্ন দেখায়নি। ওর প্রধান সম্পদ ওর চক্ষুদুটি। শুধু নীরবে চেয়ে থাকার মধ্যেও অনেক রকম ভাষা ফোটে। থিয়েটারের অধিকাংশ মেয়েই তো গরুর মতন ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে। ও মেয়ের চোখে কখনও নদীর চাঞ্চল্য কখনও আগ্নেয়গিরির ধারা। তাই তো ওর নাম রেখেছিলেন নয়নমণি।

নয়নমণি কবে তাঁর কাছে শপথ করল? মনে পড়ছে না তো! শপথ টপথের কোনও মূল্য আছে নাকি! তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারি, তোমাকে ছেড়ে কখনও যাব না, এরকম কথা তো থিয়েটারের লোকেরা যখন তখন বলে, মুখস্থ করা সংলাপের মতন, কেউ কি তার গুরুত্ব দেয়? কবে সেরকম কী কথা হয়েছিল, ও মেয়েটা তাই আঁকড়ে ধরে বসে আছে? ক্লাসিক থেকে ডাকাডাকি করছে, তাও যোগ দিতে যাচ্ছে না, এই পাপে ভরা পৃথিবীতে এমন মেয়েও জন্মায়! মেয়েটা পাগল নাকি?

ক্লাসিক, ক্লাসিক! অর্ধেন্দুশেখরের এমারাল্ড থিয়েটার উঠে গেল, এখন ক্লাসিকেরই জয়-জয়াকার। সবাই বলাবলি করছে, বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের শুরু হয়েছে,—সেই যুগের প্রবর্তন করেছে এক দেবদূত, তার নাম অমর দত্ত। রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দি দ্বারকানাথ দত্ত বিরাট ধনী, তার এক ছেলে হীরেন্দ্র কায়স্থ হয়েও সংস্কৃতে বড় পণ্ডিত আর দার্শনিক হিসেবেও নাম হয়েছে কিছুটা। আর এক ছেলে এই অমর, বাপের টাকা তো অনেক আছে বটেই, বাড়িতে লেখাপড়ারও চর্চা আছে।

ধনী পরিবারের সন্তান শখ করে থিয়েটার খুলে টাকা ওড়াচ্ছে, এমনটি যে আগে আর ঘটেনি তা তো নয়। কিন্তু এই অমর দত্তর ধরন-ধারণ সবই অন্য রকম। ছেলেটি যে অতিশয় সুপুরুষ তা স্বীকার করতেই হবে। কাশ্মীরিদের মতন গৌরবর্ণ, সুগঠিত শরীর, কপাট বক্ষ, ভরাট কণ্ঠস্বর। বাংলার রঙ্গমঞ্চে এরকম সত্যিকারের নায়কোচিত চেহারার অভিনেতা আগে আসেনি। শুধু অভিনেতা নয়, অমর দত্ত নিজেই নির্দেশক। ক্লাসিক থিয়েটার প্রবর্তনের পরই অনেক রকম পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সে। স্টেজ থেকে শুরু করে হলের চেয়ার পর্যন্ত সব ঢেলে সাজাচ্ছে, সব কিছু ঝকঝকে তকতকে, কোথাও একবিন্দু ময়লা থাকবে না, নতুন করে আলো বসানো হয়েছে, পুরনো ব্যাক ড্রপ বাতিল। শুধু থিয়েটার বিষয়ে সে পত্রিকা বার করছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে, কাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা এনেছে, তাই যে-কেউ এখন ক্লাসিকে যোগ দেবার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যায়।

তা এসব হোক না, ভাল কথা। কেউ যদি থিয়েটারের উন্নতি ঘটায়, আরও বেশি সংখ্যক দর্শক টানতে পারে, তা হলে তো অর্ধেন্দুশেখরের মতন যাঁরা পাবলিক থিয়েটারের সঙ্গে প্রথম থেকে জড়িত তাঁদের তো খুশি হবারই কথা। কিন্তু অমর দত্ত যে চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি শুরু করেছে। সে নাকি বলে, বুড়ো-ধুড়োদের দিয়ে আর চলবে না, ঘোষ-মুস্তাফিদের মতন টেনে টেনে আবৃত্তির ঢঙে অভিনয় আর চলে না! আবৃত্তির ঢঙে অভিনয়? অর্ধেন্দুশেখরের মতন একই নাটকে পাঁচটি ভূমিকায় পাঁচ রকম কণ্ঠস্বরের খেলা দেখাবার ক্ষমতা আছে ওই ছোকরার? হিস্টোরিকালে হিরো সাজছে, চাষাভুষোর অভিনয় করে দেখাক তো!

নিদ্রাহীনতার জড়তা কাটাবার জন্য সকালবেলা ভাল করে তেল মেখে স্নান করলেন অর্ধেন্দুশেখর। তারপর চুপ করে বারান্দায় বসে তামাক টানতে লাগলেন। সংসারের কোনও ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামান না। এই জন্যে আর সংসারী হওয়া হল না। কুল রাখি না মান রাখি, সেই অবস্থা। একবার থিয়েটারের নেশা রক্তে ঢুকে গেলে আর সংসারে মন বসে না।

বেলা দশটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়ার মন করে পোশাক বদলালেন। আজ তিনি দাড়ি কামিয়েছেন, একটা কোঁচানো ধুতি ও সিল্কের বেনিয়ান গায়ে দিয়ে, একটা ছড়ি হাতে নিয়ে বেরুলেন বাড়ি থেকে। হাঁটতে হাঁটতেই এক সময় তিনি উপস্থিত হলেন গঙ্গামণির বাড়িতে। সোজা উঠে এলেন দোতলায়।

গঙ্গামণি তখন পাড়ার চারটি অনাথ ছেলেমেয়েকে আবৃত্তি শেখাচ্ছিল, অর্ধেন্দুশেখরকে দেখেই

তাদের ছুটি দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। অর্ধেন্দুশেখরের পায়ের কাছে গড় হয়ে সে প্রণাম করল বটে, কিন্তু রাগ রাগ গলায় জিজ্ঞেস করল, কী গো, সাহেব-দেবতা, হঠাৎ এদিকে এলে কী মনে করে?

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, অনেকদিন তোকে দেখিনি হাঁদু, তাই ভাবলুম এই চাঁদ বদনটি দেখে আসি।

গঙ্গামণি থুতনিতে আঙুল দিয়ে বলল, আহা, মরে যাই, মরে যাই! শুনে একেবারে প্রাণ জুড়িয়ে গেল! এই জলহস্তীকে তো আজকাল কেউ দেখতে আসে না! তোমার বাড়িতে চার-পাঁচবার লোক পাঠিয়েছি, বাবুর পাত্তাই নেই। কক্ষনও বাড়িতে পাওয়া যায় না। তা থাকো কোথায় সারাদিন?

অর্ধেন্দুশেখর মুচকি হেসে বললেন, শ্মশানে। এগিয়ে থাকচি, বুঝলি! একদিন তো যেতেই হবে!

গঙ্গামণি বলল, যেতে সকলকেই হবে, তা বলে আগে থেকেই এক পা বাড়িয়ে থাকতে হবে কেন গা?

—হাঁদু, অনেকদিন পর এলুম, দুটো মিষ্টি কথা বল। আগে তোর মুখ দিয়ে মধু ঝরত।

—তখন তোমার চেহারাটাও নব কার্তিকের মতন ছিল, এমন সিড়িঙ্গে পানা হয়নি।

—আমার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলি কেন? প্রেম উথলে উঠেছিল বুঝি?

—হ্যাঁ গো, দুধের ফেনার মতন উথলে উঠেছিল। অনেককাল তোমায় না দেখে প্রাণটা আনচান করছিল। তুমি কেমন ধারা মানুষ, আমাদের নয়ন বলে মেয়েটাকে কী সব চুক্তি দিয়ে বেঁধে রেখেছ?

—চুক্তি, কীসের চুক্তি? আমার এমারাল্ড থিয়েটারে তো কোনও লেখাপড়ার কারবার ছিল না!

—তুমি নাকি তাকে কোন্ বাঁধনে বেঁধে রেখেছ, তোমার অনুমতি ছাড়া সে আর কোনও বোর্ডে নামতে পারবে না। কেলাসিকের অমর দত্ত নিজে তাকে সাধতে এসেছিলেন, মেয়েটা তার সঙ্গে দেখাই করল না।

—অমর দত্ত তোর এখানে এসেছিল? কেমন দেখলি রে?

—আহা, ঠিক যেন রাজপুত্তুর। এমনটি আর দেখিনি। যেমন গায়ের রং, তেমনি মাথায় চুলের কী বাহার! কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায়, বড় বংশের ছেলে। একটুও ছ্যাবলামি নেই। ছুঁড়িটাকে কত করে বললুম, একবার নীচে নাম, দুটো কথা অন্তত বলে যা, তা এলই না।

—মেয়েটা কোনও থিয়েটারে যায়নি, বাবু ধরেছে?

—অমন কথাটি মুখে এনো না। কত কত বড় মানুষের ছেলে ওকে চেয়েছে, ও কারুর পানে ফিরেও তাকায় না। এ মেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। তুমি আমি যে লাইনে আছি, সে লাইনে এমন মেয়ে কেউ কখনও দেখেনি।

—মেয়েটাকে একবার ডাক, তার সঙ্গে কথা বলি।

—দ্যাখো বাপু, কত টাকা পেলে তোমার ওই চুক্তির কাটানকুটিন হবে, বলে দাও তো। যেমন করে পারি, আমরা তা দিয়ে দেব। অমন একটা মেয়ে এস্টেজে নামবে না, এতে যে আমারই বদনাম।

—আরে মাগি, ছুঁড়িটাকে ডাক না! তোর চোপা একটু বন্ধ কর, আমি ওর সঙ্গে সরাসরি কথা কইব!

নয়নমণি পুজোয় বসেছে। তার পুজোয় কোনও মন্ত্র নেই, ঠাকুরের কোনও ভোগও নেই। কৃষ্ণের মূর্তির সামনে সে অনেকক্ষণ চোখ বুজে নিঃশব্দে বসে থাকে।

গঙ্গামণি নিজে তাকে ডাকতে এল। অর্ধেন্দুশেখরের নাম শুনে নয়নমণি উৎফুল্ল হয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ খুলে একটা পুঁটুলি সঙ্গে নিয়ে দ্রুত নেমে এল নীচে।

চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা, মাথার চুল খোলা, আর কোনও প্রসাধন নেই। মাটিতে বসে পড়ে অর্ধেন্দুশেখরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে যখন সে উঠে দাঁড়াল, অর্ধেন্দুশেখর কয়েক মিনিট মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। নয়নমণি সাতাশ বছর বয়েসে এখন পূর্ণ যুবতী, শরীরে একটুও

মেদ জমেনি, সিংহিনীর মতন কোমরের গড়ন।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, কেমন আছিস, নয়ন ?

নয়নমণি বলল, আপনার আশীর্বাদে ভাল আছি।

অর্ধেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে নাকি আমার কী শপথের বন্ধন আছে ? সবাই বলাবলি করছে, অথচ আমারই কিছু মনে নেই।

নয়নমণি মৃদু স্বরে বলল, একদিন আপনি আমাকে একটা নাচ শেখাচ্ছিলেন। সেদিন আপনার শরীর ভাল ছিল না, পরিশ্রমও হচ্ছিল যথেষ্ট। আপনি একসময় বললেন, এত কষ্ট করে তালিম দিয়ে কী আমার লাভ ! একদিন ফুরুৎ করে পাখি উড়ে যাবে। অন্য থিয়েটার থেকে বেশি টাকার অফার দিলেই তুই পালাবি। আমি তখন আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আপনার অনুমতি ছাড়া আমি কোনওদিনই অন্য থিয়েটারে যাব না।

অর্ধেন্দুশেখর হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, ও, এই কথা ! নেশার ঝোঁকে কবে কী বলেছি মনেই নেই। এমন কথা তো অনেককেই বলি, তারা তো মানেই না, আমি নিজেও মনে রাখি না।

নয়নমণি বলল, সেদিনের কথার প্রতিটি অক্ষর আমার মনে আছে। সারাজীবন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।

অর্ধেন্দুশেখর এগিয়ে এসে নয়নমণির থুতনি ছুঁয়ে বললেন, তোর বুঝি থিয়েটার খুব ভাল লাগে ? তুই কারুর সঙ্গে সোহাগ-পীরিত করিস না শুনেছি।

নয়নমণি বলল, আপনি কত কষ্ট করে শিখিয়েছেন, তা নষ্ট হতে দিতে চাই না। তাই থিয়েটার ভাল লাগে।

অর্ধেন্দুশেখর এবার নয়নমণির মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, যা নয়ন, তোকে আমি মুক্তি দিলাম। কথার কথাই হোক বা পবিত্র শপথ হোক, সব এখন থেকে চুকে গেল। এখন থেকে তুই স্বাধীন, তুই যে-কোনও থিয়েটারে যোগ দিতে পারিস। যদি আমার নিজের দল গড়ার সামর্থ্য হয় কখনও, তখন তোকে আবার ডাকব। তখন তুই আসিস !

নয়নমণি আবার অর্ধেন্দুশেখরকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে টাকার তোড়াটি রাখল।

অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, এটা কী ?

নয়নমণি বলল, এটা আমার প্রণামী। আপনি আমাকে কত টাকা দিয়েছেন, তার বেশির ভাগই খরচ হয়নি।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, তুলে নে, তুলে নে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি যতই নীচে নামুক, কোনওদিন ভিখিরি হবে না। যাকে যে টাকা দিয়েছি, তা ফেরত নেবার বদলে আমার মৃত্যুও ভাল। তবে এখনই মরছি না আমি। সবাই বুড়ো বুড়ো বলে, এই বুড়ো হাড়েই আবার ভেলকি দেখাব !

হঠাৎ তার চোখে জল এসে গেল। লজ্জা পেয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ধরা গলায় বললেন, নয়ন, আমি আশীর্বাদ করছি, তুই খুব বড় অভিনেত্রী হবি। নিজের মান থেকে কখনও বিচ্যুত হবি না। এই বুড়োকে মনে রাখিস।

•

২৯

এক বস্ত্রে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্রায় কারুকে না জানিয়ে যিনি বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনি চার বৎসর পর ফিরে এলেন রাজকীয় মহিমায়। স্বদেশ ছেড়ে তিনি যখন আমেরিকায় যাত্রা করেন, তখন অল্প সংখ্যক মানুষই সে সংবাদ জানত, তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময়

বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল সর্বত্র।

ভারত সাম্রাজ্যের ভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম পা রাখলেন কলম্বো শহরে। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য সেখানকার হিন্দু সমাজ আগেই একটি কমিটি গঠন করেছিল, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি জাহাজঘাটায় উপস্থিত। জাহাজ থেকে নেমে একটা স্টিম লঞ্চে যাত্রীদের আনা হচ্ছিল, ডেকে গেরুয়া পোশাক ও পাগড়ি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ, হাজার হাজার মানুষ তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। স্বামীজির সঙ্গে এসেছেন সেভিয়ার দম্পতি, তাঁরা এরকম দৃশ্য কখনও দেখেননি।

কলম্বো ছাড়াও সিংহলের অনুরাধাপুর, কাণ্ডি, জাফনা প্রভৃতি নগরে তাঁর বিপুল সংবর্ধনা চলল দিনের পর দিন, তাঁকে বক্তৃতা দিতে হল অনেকগুলি। বক্তৃতার সময় যাঁর বীরবিক্রম দেখে সবাই অভিভূত, যাঁকে মনে হয় সিংহপুরুষ, তিনি কিন্তু ভিতরে ভিতরে বেশ ক্লান্ত, শরীরও সুস্থ নয়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত জনসমাগম লেগেই আছে, মানুষের শ্রদ্ধাভক্তিও এক সময় অত্যাচারের পর্যায়ে চলে যায়। দিনের পর দিন এরকম চলতে থাকলে স্বামী বিবেকানন্দকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে হত, তাই তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা একটি ছোট জাহাজ ভাড়া করে সিংহল ছেড়ে রওনা হলেন মূল ভারত ভূখণ্ডের দিকে।

জাফনা থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল সমুদ্র পথ পেরুলেই ভারতের উপকূল রেখা। সদলবলে স্বামীজি এসে পৌঁছলেন পাম্বান নামে একটি ছোট শহরে।

ইংল্যান্ডে বক্তৃতা সভাগুলি দিন দিন বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, বেশ কয়েকজন সক্রিয় শিষ্য ও কর্মী পাওয়া গিয়েছিল, তারই মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় ঠিক করলেন দেশে ফিরে আসবেন। বিদেশে যতই সাফল্য আসুক, দেশে তাঁর গুরুভাইরা অনেকটা দিশেহারা অবস্থায় রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে তাঁরা সংসার ছেড়েছেন, একটা ভাড়াবাড়িতে একসঙ্গে থেকে জপ-তপ, রান্না-বান্না ও আড্ডা গুলতানি চলে, এই কি মুক্তি লাভের উপায় !

বিবেকানন্দ ঠিক করলেন, সবাইকে এক নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে এনে একটি সঙ্ঘ বা মিশন স্থাপন করতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেবামূলক কাজে। এতকাল হিন্দু ধর্ম শিখিয়েছে শুধু ব্যক্তিমানুষের মুক্তির কথা, জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ দিয়ে তুমি মোক্ষ লাভ করো। কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে। এখন চিন্তা করতে হবে মানুষের মুক্তির কথা। চতুর্দিকে এত অভাব, এত দারিদ্র্য, এত বঞ্চনা, এসব থেকে চোখ ফিরিয়ে তুমি যদি নির্জনে একা একা তপস্যা করো, তা তো স্বার্থপরতারই নামান্তর। অন্য সব ধর্মে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানবসেবার উদ্যোগ থাকে, হিন্দু ধর্মে সঙ্ঘবদ্ধ হবার কোনও ধারণাই নেই, তাই তো এ ধর্মের এত অবনতি।

একবার দেশে ফেরার কথা মনে হতেই বিবেকানন্দ ছটফট করছিলেন, আর দেরি করতে চাননি। একজন ইংরেজ শুভার্থী বলেছিলেন, আপনি চার বছর পাশ্চাত্য দেশে রইলেন, এখানকার বাতাস নির্মল, জল জীবাণুশূন্য, খাদ্যদ্রব্য অনেক ভাল, আপনি এইসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এখন হঠাৎ ভারতে গিয়ে কি টিকতে পারবেন ? সেখানে সব কিছুই অস্বাস্থ্যকর, নোংরা, ধুলো, কাদা প্যাচপেচে...। বিবেকানন্দ তাঁকে সহাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন, দ্যাখো ভাই, দেশ ছেড়ে আসার আগে আমি ভারতকে শুধু ভালবাসতুম। এখন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার পবিত্র মনে হয়, সেখানকার বাতাস পবিত্র, ভারত আমার পুণ্যভূমি, সারা ভারতই আমার তীর্থক্ষেত্র।

পাম্বানে নেমে বিবেকানন্দ সেখানকার খানিকটা ধুলো নিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন।

এখানেও নিরিবিলিতে থাকা গেল না, রামনাদের রাজা স্বয়ং সেখানে পাত্রমিত্রদের নিয়ে বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত। রাজশকটে তাঁকে বসিয়ে অন্যরা পদব্রজে অনুসরণ করতে লাগলেন, কিছুদূর যাবার পর রাজার মনে হল এতেও যেন এই সন্ন্যাসীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, ঘোড়াগুলো খুলে দিয়ে তিনি স্বয়ং গাড়িটা টানতে গেলেন, আরও বহু লোক এসে তাতে হাত লাগাল। সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে বিমথিত হল বাতাস। এত বাড়াবাড়ি বিবেকানন্দর ঠিক সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিবাদ জানাবারও উপায় নেই।

রামেশ্বর শিবের মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর মনে পড়ল পুরনো দিনের কথা। আমেরিকা যাবার আগে যখন তিনি পরিব্রাজক ছিলেন, তখনও একবার এই মন্দিরে এসেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন দণ্ড-কমণ্ডলুধারী এক পথশ্রান্ত সন্ন্যাসী, কেউ এখানে তাঁকে চিনত না। আর আজ শুধু তাঁকে একটু চোখে দেখার জন্য বহু লোক ঠেলাঠেলি করছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁকে একটি বক্তৃতা দিতে হল। কোনও হিন্দু সন্ন্যাসী সচরাচর যে কথা বলেন না, বিবেকানন্দ উচ্চারণ করলেন সেই সার সত্য। মূর্তিপূজা প্রকৃত পূজা নয়। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—এই সকলের মধ্যেই যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। শিবের সন্তানদের সেবাই শিবের সেবা। যে ব্যক্তি শুধু প্রতিমার মধ্যে শিবোপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র।

এর পর মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, কুম্ভকোণম, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরেও সংবর্ধনার উত্তরে বিবেকানন্দ প্রায় এই রকম কথাই বলতে লাগলেন। আমাদের এই মাতৃভূমি বহুকাল পরে গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করে জেগে উঠছে। অন্ধ যে, সে দেখতে পাচ্ছে না। বিকৃত মস্তিষ্ক যে, সে বুঝতে পারছে না।...সব ধর্মই সত্য। পৃথিবীর লোককে আমাদের কাছ থেকে এই পরধর্মসহিষ্ণুতা শিখতে হবে।

মাদ্রাজে বিবেকানন্দের আগমন উপলক্ষে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সভার পর সভা, বক্তৃতার পর বক্তৃতা, অসংখ্য দর্শনপ্রার্থী। ভারতের জল ও বায়ু যতই তাঁর কাছে পবিত্র মনে হোক, অনেক দিন অনভ্যাসের পর এখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে তাঁর সর্দি-কাশি হল, জল পান করে পেটের গণ্ডগোল। শরীর বেশ কাবু হয়ে পড়েছে, তবু সে কথা তিনি কারুকে জানাতে চান না। বক্তৃতাতেও তিনি ক্রমশই ধর্মের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলছেন। মাদ্রাজের শেষ বক্তৃতায় বললেন, এখন পুজো-টুজো সব বন্ধ থাক। আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারত মাতাই আমাদের আরাধ্য হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কটা বছর ভুলে থাকলে ক্ষতি নেই। সেইসব দেবতারা এখন ঘুমোচ্ছে, দেশের মানুষই জাগ্রত দেবতা। সবাই যোগী হতে চায়, সবাই ধ্যান করতে চায়, এ কি তামাসা নাকি?

মাদ্রাজ থেকে আবার জাহাজে চাপলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। জাহাজের ডেক ভর্তি ডাব, ডাবে ডাবে একেবারে ছয়লাপ। শ্রীমতী সেভিয়ার ডেকে এসে সমুদ্র দর্শনের জন্য দাঁড়াবারই জায়গা পেলেন না। তিনি ভাবলেন, এটা কি মালের জাহাজ নাকি? আসলে তা নয়, ডাক্তার বিবেকানন্দকে জলের বদলে ডাব খেতে বলেছেন, সে কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ভক্তরা সবাই ডাব দিয়ে গেছে! বিবেকানন্দর অবস্থা বেশ কাহিল, তিনি শুয়ে শুয়ে কাটালেন কয়েকটা দিন।

চারদিন পর জাহাজ এসে ভিড়ল খিদিরপুরে। কলকাতাতেও দ্বারভাঙ্গার মহারাজের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা কমিটি তৈরি হয়ে গেছে, পরদিন খিদিরপুর থেকে একটি স্পেশাল ট্রেনে স্বামীজিকে নিয়ে আসা হল শিয়ালদা স্টেশনে।

কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ নামে কেউ ছিলেন না। বরানগরের মঠ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবিদিষানন্দ, তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ রূপে ফিরে এলেন। শিয়ালদা স্টেশনে তাঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বিপুল জনতার মধ্যে সকলেই যে তাঁর ভক্ত তা নয়, বেশ কিছু রয়েছে নিছক কৌতূহলী দর্শক। কেউ কেউ অন্যদের আবেগ ও ভক্তির প্রাবল্য দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, এই তো দেশের অবস্থা! যে-হেতু সাহেবরা এই সন্ন্যাসীটিকে কব্জে দিয়েছে, দু'চারটে সাহেব মেম ওকে নিয়ে নাচানাচি করেছে, তাই দেশের লোক ওকে এখন মাথায় নিয়ে নাচছে। আগে তো বাবা ওর কথা কিছু শুনিনি। সাহেবরা প্রশংসা করলেই বুঝি গুণপনা বোঝা যায়! কেউ কেউ বলল, শুনেছি তো এ লোকটা সিমলে পাড়ার এক কায়স্থ বাড়ির ছেলে। অব্রাহ্মণরাও গায়ে গেরুয়া চড়াচ্ছে, হায় রে, কালে কালে দেখব কত! কেউ বলল, সন্ন্যেসী হয়ে কালাপানি পাড়ি দিয়েছে, কেরেস্তানদের সঙ্গে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছে, ছ্যা ছ্যা, তাকে সন্ন্যাসী বলে মানতে হবে!

এই সব অবিশ্বাসীদের তুলনায় ভক্ত ও উচ্ছ্বাসপ্রবণদের সংখ্যা অবশ্যই বহুগুণ বেশি। এখানেও বিবেকানন্দ গাড়িতে ওঠার পর ছাত্ররা ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই টানতে লাগল, গাড়ির সামনে ব্যান্ড

পার্টি, পেছনে সংকীর্তনের দল। পথের মাঝে মাঝে তোরণ ফুলের মালায় সাজানো। শোভাযাত্রাটি এসে থামল অদূরেই রিপন কলেজের সামনে। স্বামী বিবেকানন্দ খুবই ক্লান্ত, পরে তাঁর প্রকাশ্য সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছে, এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর সদলবলে তিনি চলে এলেন বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে। সেখানে মধ্যাহ্নভোজ। সঙ্গের সাহেব মেম ভক্তদের উত্তম থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা দরকার তাই বরানগরে গোপাললাল শীলের সুরম্য বাগানবাড়িটি ঠিক করে রাখা আছে। বিবেকানন্দ নিজে অবশ্য সেখানে রাত্রিবাস করবেন না, তিনি চলে গেলেন আলমবাজারের মঠে গুরুভাইদের সান্নিধ্যে।

চার বছর বাদে আবার বন্ধু সম্মিলন। অভাব-কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও আমোদ আহ্লাদে এই বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছেন বিবেকানন্দ। প্রায় সকলের সঙ্গে তুই-তুকারির সম্পর্ক। কিন্তু মাঝখানের এই কয়েক বৎসরে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, বিবেকানন্দর বিশ্বখ্যাতি যেন অনেকখানি দূরত্ব এনে দিয়েছে। পশ্চিম গোলার্ধে বিবেকানন্দর সাফল্যে অনেকে যেমন গর্বিত, তেমনি কেউ কেউ ক্ষুব্ধও বটে। ক্ষোভের কারণ এই যে বিদেশে শত শত বক্তৃতায় এবং শ্বেতাঙ্গ শিষ্য-শিষ্যা সংগ্রহ করে বিবেকানন্দ যেন ব্যক্তিগত কৃতিত্বই অর্জন করেছেন বেশি, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম তো তেমনভাবে প্রচার করেননি! হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধার কিংবা বেদান্তের টানে এঁরা ঘর ছাড়েননি, এঁরা সংসার ত্যাগ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য, তাঁর ভালবাসার প্রবল টানে। শিকাগোর বিশ্বধর্মসম্মেলনের অত লোকের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের কথা নরেনের বলা উচিত ছিল না? সেখানে সে একবারও উচ্চারণ করেনি গুরুর নাম!

সকলকে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিবেকানন্দ বললেন, কী রে, তোরা সব চুপ করে আছিস কেন? ভাবছিস কি, আমি বদলে গেছি? বিলেত-ফেরতা হাফ-সাহেব হয়ে গ্যাট-ম্যাট করে কথা বলি? ওরে, আমি তো সেই তোদেরই একজন।

লাটু মহারাজের কাঁধে হাত দিয়ে তিনি আবার বললেন, কী রে, লেটো, বেগুনভাজার মতন মুখ করে আছিস কেন? এর মধ্যে আরও মুটিয়েছিস!

লাটু মহারাজ বিবেকানন্দর গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, লরেন, তুই ঠিক-ঠাক এক রকমই আছিস? হামি শুনেছি কি, তুই বিলায়েত আম্রিকা ঘুমকে ঘুমকে বহোৎ লেকচার ফাটিয়েছিস, বহোৎ লেকচার। হামি সবাইকে বলেছি, ও ছাড়া কে এমুন পারবে? ঠাকুরই তো বলকে গিয়েছেন, লরেন শিক্ষে দিবে!

বিবেকানন্দ বললেন, লেটো, তুই আমার বুকটা ছুঁলি, আমার বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। হ্যাঁ রে, তামাক খাওয়াবি না? কতদিন হুঁকো খাইনি। সিগারেট-চুরুটে কি নেশা শানায়!

একজন কল্কে ধরিয়ে নিয়ে এল, বিবেকানন্দ মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে হুঁকো টানতে টানতে বললেন, আঃ, কী আরাম হল! রাজা-মহারাজারা যতই খাতিরযত্ন করুক, আপনজনের মধ্যে বসে থাকার মতন সুখ আর হয় না।

তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসলেন গুরুভাইরা। শিবানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে নরেন, আমেরিকায় নাকি অনেকগুলি বেদান্ত সেন্টার স্থাপিত হয়েছে?

বিবেকানন্দ হাত তুলে বললেন, ওসব কথা পরে হবে। আজ আয় নিজেদের গল্প করি শুধু। তারক তুই যে এক সময় শেয়াল-কুকুরকে রোজ রুটি খাওয়াতিস, সেই অভ্যেসটা এখনও আছে? সেই যে বরানগরের মঠে তুই জানলায় দাঁড়িয়ে ভোঁদা ভোঁদা বলে ডাকতি, আর একটা শেয়ালছানা এসে ঘোঁ ঘোঁ করে আওয়াজ করত—

বিবেকানন্দ শিয়ালের ডাক এমন নকল করে দেখালেন যে সবাই হেসে উঠলেন। বাবুরাম বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমার এসব মনে আছে?

বিবেকানন্দ বললেন, মনে থাকবে না কেন রে শালা! আমি কি মরে ভূত হয়েছি? তোর সেই কথাটাও মনে আছে। সেই যে একবার, ওরে রাখাল, তোর মনে আছে, একবার মঠে কালীপুজোর সময় পাঁঠাবলি হল? আমরা ক'জনা পাঁঠাবলি চেয়েছিলুম, তোর আর বাবুরামের আপত্তি ছিল খুব।

শেষ অবধি আমাদের মতটাই টিকল। বলি যখন হচ্ছে, পাঁঠার ব্যাঁ ব্যাঁ ডাক যাতে শোনা না যায়, সেইজন্য এই বাবুরামটা চট করে ঠাকুরঘর থেকে একটা খোল এনে সেটা বাজিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছিল। ওদেশে গিয়েও দৃশ্যটা যতবার আমার মনে পড়েছে, অমনি একা একা হেসেছি। শালার বৈরিগির মতন বিটকেলমি, খোল বাজিয়ে বলি করা।

বাবুরাম হাসতে হাসতে বললেন, সুরেশবাবুর ভয়ে আর আমি খোল বাজাই না।

বিবেকানন্দ কৌতূহলী হয়ে বললেন, কেন, কেন, সুরেশবাবুকে ভয় পাবার কী আছে?

বাবুরাম বললেন, সুরেশবাবু বোষ্টমদের ওপর বড় খাপ্পা। একদিন বলরামবাবুকে কী ভয়টাই না দেখালেন! আমারও পিলে চমকে গিয়েছিল।

বিবেকানন্দ ধমক দিয়ে বললেন, আ মোলো সবটা খুলে বল না!

বাবুরাম বললেন, বলরামবাবু নিরীহ মানুষ, পরম বৈষ্ণব। ঠাকুরের ভক্ত হয়েও বৈষ্ণব ভাব ছাড়েননি। আর সুরেশ মিত্তির ঘোর শাক্ত। একদিন বলে কী, বলরাম শালা বোষ্টম! তোর রাধাকেষ্ট একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পাঁ পাঁ আওয়াজ কচ্ছে; সাত জন্মের শুকনো উপোসী, টি টি কচ্ছে আর একটা বাঁশিতে ফুঁ পাড়ছে! আর আমার মা কেমন জানিস? লাক চড়াচড় আওয়াজ কচ্ছে, শালা তোর একটা বোষ্টমকে ধরছে আর আমার মার খাঁড়া দিয়ে বলি হয়ে যাচ্ছে!

বিবেকানন্দ প্রাণ খুলে হাসলেন। বারবার বলতে লাগলেন, কী বললেন, মা লাক চড়াচড় আওয়াজ কচ্ছে, সেটা কী রে? ঢাকের বাজনা?

স্মৃতি রোমন্থনে আর গল্পে গল্পে রাত ভোর হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গণে এক জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দকে সংবর্ধনা জানানো হল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। কলকাতা ত্যাগের আগে তাঁকে কেউ বক্তৃতা দিতে দেখেনি। তিনি নম্র, বিনীত স্বরে বললেন, আমি এখানে আপনাদের সামনে সন্ন্যাসী হিসেবে আসিনি, ধর্মপ্রচারক হিসেবেও আসিনি, আগের মতন আপনারা আমাকে এই কলকাতারই একটি ছেলে বলে গণ্য করবেন। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী কোনও মানুষ কি কখনও এ কথা ভুলতে পারে?

সভাসমিতি ইত্যাদি থিতিয়ে যাবার পর বিবেকানন্দ কাজে মন দিলেন। দিনের বেলা শীলদের বাগানবাড়িতে কিংবা বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা ও ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় কাটান, রাত্তিরবেলা ফিরে যান আলমবাজারের মঠে। মিশন স্থাপনের প্রস্তুতিও চলছে।

দেশে ফিরে এসে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, যে-ভারত তিনি দেখে গিয়েছিলেন সে ভারত এখন আরও বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছে কোটি কোটি মানুষ, প্রতিদিন বহু সহস্র লোকের প্রাণ যাচ্ছে। চতুর্দিকে হাহাকার। এত বড় দুর্ভিক্ষ আগে কখনও আসেনি। এর ওপর আবার পশ্চিম ভারতে ছড়িয়েছে সর্বনাশা প্লেগ, যে-কোনও সময় সেই কালরোগ সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়তে পারে।

দেশের যখন এই অবস্থা, তখন ধর্মের কথা কে শুনবে? কোটি কোটি অভুক্ত মানুষের কাছে বেদান্তের ব্যাখ্যা শোনাতে গেলে তা পরিহাস বলে মনে হবে না? শ্রীরামকৃষ্ণও বলে গেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না।

কাজ শুরু করতে হবে, তার আগে ভাল করে সংগঠিত হওয়া দরকার।

একদিন গিরিশ ঘোষ এলেন দেখা করতে। বয়েসের অনেক তফাত হলেও দু'জনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। বলরাম বোসের বাড়িতে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গিরিশবাবু কৌতুক করে গান ধরলেন:

আমারে ভুলে রে প্রাণ, ভাল তো ছিলে?
কী জন্য আর দেখি নে হে,
পথ ভুলে কি এলে?
শুনছি লোকে, প্রাণ, করে ভান
ঢুকলে গো কার অন্দরে...

বিবেকানন্দ দ্রুত উঠে গিয়ে বন্ধুকে আলিঙ্গনে জড়ালেন।

একটুক্ষণ কুশল বিনিময় হল। বিবেকানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, জি সি, তুমি এখন কোন থিয়েটারে আছ? তুমি তো ঘন ঘন ঠাঁই বদলাও।

গিরিশচন্দ্র বললেন, যে আমায় ধরে রাখতে পারে তার কাছেই থাকি। এখন আবার ফিরে এসেছি স্টার থিয়েটারে। সে থাক। সাহেবদের দেশে তোমার খুব সুনাম রটেছে, কিন্তু আমি বাপু তোমাকে বিবেকানন্দ-টিবেকানন্দ বলতে পারব না, নরেন বলেই ডাকব।

বিবেকানন্দ বললেন, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, তোমার যেমন মর্জি। নতুন কী পালা লিখলে বলো। 'বিল্বমঙ্গল' পালাটা এখন কোথাও হয়? আহা, অনবদ্য, বারবার দেখতে ইচ্ছে করে।

গিরিশচন্দ্র বললেন, সে সব হবে অখন। কিন্তু নরেন, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? মাত্র চৌতিরিশ বছর বয়েস, এর মধ্যেই চুলে পাক ধরেছে? চোখের নীচে কালি! কী দিব্যকান্তি দেখেছি তোমাকে!

বিবেকানন্দ বললেন, ভাই, সবাই বলে, বিদেশে আমার খুব নাম-যশ রটেছে। কিন্তু সেখানে খাটতে খাটতে যে আমার মুখে রক্ত উঠে গেছে, তা কেউ জানে না।

গিরিশচন্দ্র বললেন, তাই তো দেখছি।

বিবেকানন্দ বললেন, তুমি তো দিব্যি নাদুস-নুদুস আছ। তুমি শালা স্টেজে মাগি নাচাও আর দু'খানা গান জুড়ে দিয়ে পয়সা লোটো। সন্ধের সময় এখনও ক' পাত্তর চলে?

তারপর ভৃত্যের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বললেন, ওরে, তামাক দিয়ে যা?

গিরিশবাবু বললেন, এখনও তামাক চালাচ্ছ? ভাষাও বদলায়নি দেখছি। ও দেশেও এমন করতে নাকি?

বিবেকানন্দ সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, মানুষের স্বভাব কি বদলায়? আমার কী জান ব্রাদার, বেশিক্ষণ গুরুগম্ভীর মুখ করে থাকতে পারি না, মাঝে মাঝে ফষ্টিনষ্টি না করলে ভাল লাগে না। ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে-যত ধর্মপরায়ণ হবে, অর চালচলন তত গম্ভীর হবে। পাদ্রিরা সব উৎকট মুখ করে থাকে। আমি বক্তৃতা দিতাম এক রকম, তারপরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যখন হাসি-ঠাট্টা করতাম, তা দেখে অনেকে অবাক হয়ে যেত। কেউ কেউ মুখের ওপর বলেও ফেলত, আপনার এমন চপলতা শোভা পায় না। তার উত্তরে আমি বলতাম, আমরা আনন্দের সন্তান, বিরস মুখে থাকব কেন?

গিরিশচন্দ্র বললেন, নরেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? এ প্রশ্নটা অনেকের মনেই এসেছে, তোমার সামনে কেউ স্পষ্ট করে বলছে না। সেদিন তুমি রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ির সভায় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শতকণ্ঠে বললে। এমন কথাও বললে যে যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোনও সৎ কাজ করে থাকি, যদি আমার মুখ দিয়ে এমন কোনও কথা বেরিয়ে থাকে যাতে জগতের কোনও ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছে, তাতে আমার কোনও গৌরব নেই, তা তাঁরই। এ কথা শুনে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আমেরিকা-ইংল্যান্ডে এমন কথা বলোনি কেন? ওইসব দেশে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কেন প্রচার করে এলে না?

বিবেকানন্দ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এই প্রশ্ন অনেকের মনে তোলপাড় করেছে। তারা ওদেশের পরিবেশটা জানে না, ওদেশের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা কোন স্তরের সে সম্পর্কে ধারণা নেই। গুরুদেবের কথা যে কোথাও বলিনি তা নয়। বলেছি, ঘনিষ্ঠদের কাছে বলেছি। যারা দীক্ষা নিয়েছে, তারা ঠাকুরের নামেই দীক্ষিত হয়েছে। প্রথম থেকেই প্রকাশ্যে কেন বলিনি জানো? শুধু ধর্মের কথা বলে ওদের মনোযোগ টানা যায় না। প্রথম থেকেই নতুন অবতারবাদের কথা তুললে ওরা বলবে, ওঃ, আবার অবতার? আমাদের যিশুই তো এক অবতার, আরও নতুন অবতারের দরকার কী? ওরা দর্শন ও বিজ্ঞানের বড়াই করে। ভক্তির বদলে এখন যুক্তিবাদের যুগ এসেছে। সুতরাং যুক্তি দিয়ে দর্শন-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এনেই ওদের মন জয় করতে

হবে। শুধু গুরু গুরু করে নাচলে ওরা মানবে কেন? আমাদের অধ্যাত্ম দর্শনের যে বিশাল ভাণ্ডার আছে, সে কথা তো ওদের দেশের প্রায় কেউই জানে না।

গিরিশচন্দ্র বললেন, তোমার কাছ থেকে এসব জ্ঞানের কথা শোনার জন্য ওদের কী দায় পড়েছিল? ওরা বড়লোক, বিলাস-ব্যসনে মেতে আছে, আমাদের মতন গরিব-গুর্বোরা কী ভাবে না ভাবে, তাতে ওদের কী আসে যায়?

বিবেকানন্দ বললেন, ভাই জি সি, ওদেশে গিয়ে বুঝেছি, যারা খুব ধনী, তাদেরও খুব অভাব থাকে। যাদের আহার-বিহারের কোনও অভাব নেই, তারাও মানসিক দিক থেকে বুভুক্ষু। জাগতিকভাবে প্রচুর উন্নতি করেও অনেকের মধ্যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আর কে বলেছে, আমরা শুধুই গরিব? আমি ভিখিরির মতন ওদের কাছ থেকে কিছু চাইতে যাইনি। বারবার বলেছি, আমাদের মধ্যে হবে আদান-প্রদানের সম্পর্ক। ওদের কাছ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের নিতেই হবে, তার বদলে আমরাও দেব এক উদার ধর্ম ও দর্শন, যাতে শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, শুনেছ নিশ্চয়ই আমরা একটা মিশন গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। সেই মিশন হবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নামে, সেই মিশনের মাধ্যমেই বিশ্ববাসী তাঁর নাম জানবে।

গিরিশচন্দ্র বললেন, মিশন? খ্রিস্টানদের মতন? সাহেব মিশনারিরা জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়ে কোনও কোনও ন্যাংটা আদিবাসীদের মধ্যে পাঁউরুটি আর বিস্কুট বিলোয় সেইরকম কিছু নাকি?

বিবেকানন্দ বললেন, ঠাট্টা নয়, জি সি, সত্যিকারের সেবার কাজ শুরু করতে হবে, এ দেশটাকে জাগাতে হবে। আমি ঠিক করেছি, বেশ কিছু ব্রহ্মচারী আর ব্রহ্মচারিণী তৈরি করব, তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে শেখাবে, শুধু লেখাপড়া নয়, শেখাবে যে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করতে পারলে মানুষ সব কিছু পারে।

এই সময় একজন শিষ্য একখানি বেদগ্রন্থ নিয়ে উপস্থিত হল। কয়েক দিন ধরে বিবেকানন্দ ওই শিষ্যটিকে বেদ ও সায়নভাষ্য পড়াচ্ছেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে বললেন, তুমি একটু বসো, একে কিছুক্ষণ পড়িয়ে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে আবার কথা বলব।

গিরিশচন্দ্র বললেন, ওরে বাবা, অত সব শক্ত শক্ত জ্ঞানের কথা এখন বসে থেকে শুনতে হবে?

বিবেকানন্দ সহাস্যে বললেন, শুনলে ক্ষতি কী? সারা জীবনে এসব তো কিছু পড়লে না, খালি কেষ্ট-বিষ্টুদের নিয়েই দিন কাটালে।

গিরিশচন্দ্র বললেন, কী আর পড়ব ভাই! অত সময়ও নেই, বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুবো। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদ-বেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। আমার কাছে সবই তিনি। ওই বেদও তিনি।

মাথার ওপর হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!

বিবেকানন্দ শিষ্যটির দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখে রাখ, এ হচ্ছে কাল-ভৈরব। এর মতন যার ভক্তি বিশ্বাস তার বেশি পড়াশুনো করার দরকার হয় না। তোরা কিন্তু একে অনুকরণ করতে যাসনি। বেশির ভাগ মানুষেরই পড়াশুনো করে বুদ্ধিটা মার্জিত করা দরকার। শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা-পঠন-পাঠনে সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ হয়।

গিরিশচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-বেদান্ত তো ঢের পড়লে, এই যে দেশ জুড়ে ঘোর হাহাকার পড়ে গেছে, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি মহাপাপ চোখের সামনে রোজ ঘটছে, এই সব নিবারণ করার কোনও উপায় সম্পর্কে তোমার বেদে কিছু বলেছে?

বিবেকানন্দ চুপ করে রইলেন।

গিরিশচন্দ্র বললেন, তুমি এতকাল সাহেবদের মুলুকে ছিলে, দেশের প্রকৃত অবস্থা বোধ করি জানো না। ওরে ভাই রে, গ্রামেগঞ্জে গিয়ে দ্যাখো, মানুষ আর মানুষ নেই। খিদের জ্বালায় মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে না। ভিক্ষান্নের ভাগ দিতে হবে বলে স্বামী তার স্ত্রীকে জলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, ছেলে তার বাপের গলায় পা দিয়ে পিষছে। বাঁকুড়ার হাটে এক মা তার তিনটি ছোট ছোট সন্তানকে

বিক্রি করতে এনেছিল। লোকে যেমন বাড়ির পোষা গরু-ছাগল অভাবের জ্বালায় বিক্রি করে দেয়, সেইভাবে এখন জননীরা সন্তানদের বেচছে। খবর পাওয়া যাচ্ছে যে গ্রামের ঘরে ঘরে মানুষ মরে পড়ে থাকছে, কি হিন্দু কি মোছলমান কেউ সেই সব শবদেহ দাহ করে না, কবর দেয় না, শ্যাল-কুকুরে দিনদুপুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তোমার বেদই বলো আর কোরানই বলো, কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থে এর সুরাহা আছে বলো দেখি?

বিবেকানন্দ কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর ওষ্ঠ কেঁপে উঠল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, চক্ষু দিয়ে নেমে এল জলের ধারা। নিজেকে সামলাবার জন্য তিনি উঠে চলে গেলেন বাইরে।

গিরিশচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিষ্যটিকে বললেন, দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ। তোদের স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না। ওই যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো শুনে স্বামীজির বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!

বিবেকানন্দ সভা-সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করে সংগঠনের কাজে মন দিলেন। অবিলম্বে সেবামূলক কাজ শুরু করতে হবে। একটা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি চাই, বাড়ি চাই, কে দেবে টাকা? জো ম্যাকলাউড, ওলি বুল, স্টার্ডি প্রমুখ বিদেশি ভক্তদের সঙ্গে পত্রবিনিময় চলছে নিয়মিত। তাঁর যে-কোনও কাজে ওঁরা সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে প্রস্তুত। ক'দিন ধরে বিবেকানন্দর মাথায় স্ত্রীশিক্ষার কথাটা ঘুরছে। মেয়েদের আগে তুলতে হবে। ভারতে এখন শতকরা দশ-বারোজন মাত্র শিক্ষিত তার মধ্যে আবার মেয়েদের শিক্ষার হার শতকরা একজনও হবে কি না সন্দেহ। মাকে শিক্ষার আলো দিতে পারলে, কুসংস্কারমুক্ত করে তুলতে পারলে তবেই তো সন্তানরাও ঠিক ঠিক মানুষ হবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য উপযুক্ত নারী চাই। এদেশে সেরকম নারী কোথায়? ইংল্যান্ডে মার্গারেট নামে মেয়েটি এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু এত দূর দেশে এসে সে কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? এ দেশের ভাষা জানে না, এখানকার নোংরা পরিবেশের কথা সে বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না! আরও একটা কথা, তার মতন একজন মেম সাহেবকে কি মেনে নিতে পারবে এ দেশের ছাত্রীরা?

ঘুমের মধ্যে বিবেকানন্দর ভ্রম হল। তিনি যেন আবার আমেরিকায় ফিরে গেছেন। বক্তৃতা দিচ্ছেন ডেট্রয়েট শহরে কিংবা পায়চারি করছেন সহস্র দ্বীপপুঞ্জের অরণ্যে। আবার জেগে উঠে মনে হয়, সত্যিই কি তিনি কখনও গিয়েছিলেন পশ্চিম গোলার্ধে? নাকি সেটাই স্বপ্ন? কী বিশাল দূরত্ব, মাত্র কয়েকটা শতাব্দী আগে, আমেরিকা নামে মহাদেশটির অস্তিত্বই জানা ছিল না। জো ম্যাকলাউড চিঠি লিখেছে, আর কি কোনওদিন দেখা হবে না?

দিনের বেলা দর্শনার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তিনি কোথায় কখন যান, কী করে যেন লোকে সন্ধান পেয়ে যায়। এর মধ্যে অনেকেই কৌতূহলী মানুষ। নিজে নিজে সন্ন্যাসী সাজা উটকো গেরুয়াধারী কারুর কারুর ধারণা হয়েছে, বিলেত আমেরিকায় গিয়ে সাধু সেজে বসলেই বাহবা পাওয়া যাবে, তারা যাওয়ার উপায় জানতে চায়। কারুর কারুর ধারণা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ সাহেবদের দেশে বক্তৃতা দিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছেন, সাহেব-মেমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সেই সব লোকেরা আসে আর্থিক সাহায্য চাইতে। বিবেকানন্দ সকলকেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিদায় করতে চান, অনর্থক সময় নষ্ট হয়। এক একদিন মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হয়ে পড়ে।

সেদিন তিনি বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় প্রিয়নাথ মুখুজ্যের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। আরও কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে, তারই মধ্যে একজন এসে খবর দিল বাইরে একজন বিবেকানন্দর সাক্ষাৎপ্রার্থী, সে কিছুতেই যাবে না, ঝুলোঝুলি করছে।

বিবেকানন্দ বাইরে বেরিয়ে এলেন। লোকটির চেহারা আধা-সন্ন্যাসী ধাঁচের, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। কাঁধের ঝোলা থেকে একটি ছবি বার করে তাঁর হাতে দিয়ে সে বলল, সে গোরক্ষা সভার

একজন প্রচারক, স্বামী বিবেকানন্দর নাম শুনে সে এসেছে, তাঁর কাছ থেকে এই পুণ্য কাজের জন্য কিছু অর্থসাহায্য চায়।

বিবেকানন্দ ছবিটি দেখতে লাগলেন। একটি বেশ স্বাস্থ্যবতী গাভীর ফটোগ্রাফ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের সভার কাজটা ঠিক কী বলুন তো?

প্রচারকটি উদ্দীপ্তভাবে বলল, আমরা গোমাতার হত্যা নিবারণ করতে চাই। কশাইদের হাত থেকে গোমাতাকে রক্ষা করি।

বিবেকানন্দ বললেন, কিন্তু যে-সব গরু খুব বুড়ো-ধুড়ো হয়ে পড়ে, সেগুলির কী হবে? গোয়ালা বা চাষীরাও তো সেরকম গরু বলদ রাখতে চায় না।

সে বলল, আমরা সারা দেশে পিঁজরাপোল স্থাপনের ব্যবস্থা করছি। সেখানে গোমাতার সেবা করা হবে। সেই জন্যই আরও অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ বললেন, তা বেশ, কিন্তু দেশে এখন মহা দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলছে। ভারত গভর্নমেন্ট ন' লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন, সরকারি রিপোর্টেই ন' লাখ! আপনাদের সভা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সাহায্যের কোনও উদ্যোগ নিয়েছে কী!

লোকটি বলল, সেটা আমাদের কাজ নয়। গোমাতাকে রক্ষা না করলে সনাতন হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে।

বিবেকানন্দ বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এত মানুষ যখন বিপন্ন, তখন কিছুদিনের জন্যে গোমাতার কাজ মুলতুবি রেখে মানুষের সেবা করাই কি উচিত নয়?

লোকটি বলল, গোমাতার কথা ভুলে যাব? মশাই, মানুষ মরছে তো আমরা কী করব? মানুষের পাপেই তো এই দুর্ভিক্ষ। যেমন কর্ম তেমনি ফল। পাপের কর্মফলেই তো মানুষ মরে!

হঠাৎ বিবেকানন্দর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। তিনি সক্রোধে বললেন, যে সভা মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক মুষ্টি অন্ন দেয় না, পশু-পক্ষী রক্ষার জন্য মাতামাতি করে, সে সভার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। কর্মফল! হুঁঃ!

লোকটি বলল, আপনি কর্মফলে বিশ্বাস করেন না?

বিবেকানন্দ বললেন, কর্মফলে মানুষ মরছে এরকম দোহাই দিলে জগতে কোনও বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই তো বিফল সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। গো-মাতারাও নিজ নিজ কর্মফলেই কশাইয়ের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, তাতে আমাদের কী করার আছে?

লোকটি বলল, শাস্ত্রে বলে গরু আমাদের মাতা।

ওকে বাধা দিয়ে বিবেকানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তা না হলে আপনাদের মতন এমন কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন!

এ কথার মর্ম না বুঝে লোকটি আবার বলল, অনেক আশা করে আপনার কাছে কিছু অর্থসাহায্যের জন্য এসেছি!

বিবেকানন্দ এবার নিজেই হেসে ফেললেন। এমন ব্যক্তির ওপর রাগ করেও লাভ নেই।

তিনি নরম গলায় বললেন, আমি সন্ন্যাসী, ফকির, আমি অর্থ পাব কোথায়? আমি নিজের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। আমার কাজ আপনাদের সঙ্গে মিলবে না। আগে মানুষকে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর ধর্ম।

৩০

নিছক খামখেয়ালে থিয়েটারের জগতে আসেনি অমরেন্দ্রনাথ, নিজেকে রীতিমতন প্রস্তুত করে নিয়েছে। বাল্যকাল থেকেই তার অভিনয়ের দিকে ঝোঁক, বাড়ির বৈঠকখানায় চৌকির ওপর মঞ্চ সাজিয়ে ভাই-বোনদের নিয়ে অনেক দুপুরে সে নাটক-নাটক খেলা খেলেছে। কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়েই সে স্টার, এমারাল্ড, মিনার্ভায় প্রত্যেকটি নাটক দেখতে গেছে বারবার। বিলেত থেকে মাঝে মাঝে থিয়েটারের দল আসে, তাদের কোনও প্রযোজনাই সে বাদ দেয়নি। সাহেব পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সে থিয়েটার বিষয়ে বহু বইপত্র সংগ্রহ করেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে নট-নটীদের জীবনী।

ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকরি-বাকরির কথা সে কখনও চিন্তাও করেনি, সতেরো বছর বয়েসেই সে ঠিক করেছিল, তার প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র হবে রঙ্গমঞ্চ। শুধু অভিনয় নয়, পরিচালনা ও সম্পূর্ণ উপস্থাপনারও ভার নেবে সে। বিখ্যাত বংশের সন্তান হয়ে কারুর অধীনে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই থিয়েটারের মালিকও হতে হবে। এ রকম বাসনা সামান্য প্রকাশ করাতেই অমরেন্দ্রনাথ বড় দাদার কাছে ধমক খেয়েছিল। কত বিলাসী ধনী এর আগে থিয়েটার চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে, কোনও ভদ্র, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও ও পথে যায়?

তারপর থেকে অমরেন্দ্রনাথ ও বিষয়ে আর মুখ খোলেনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইচ্ছেটি বদ্ধমূল হয়েছে। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে সে বহু রাত্রি জেগে থিয়েটার চালাবার হিসেব কষেছে। যেদিন সে একুশ বছরে পা দিল, সেদিনই সে স্বমূর্তি ধরল।

এখন সে সাবালক, পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে, নিজের অংশের টাকায় সে যা খুশি করতে পারে। কোনও উপদেশ বা ভর্ৎসনা বা অনুরোধ সে গ্রাহ্য করল না। অর্দ্ধেন্দুশেখর বিদায় নেবার পর আরও দু'-একজন এমারাল্ড থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, রঙ্গমঞ্চটি খালি পড়েছিল, অমরেন্দ্রনাথ সেটা লিজ নিয়ে নিল।

মাত্র একুশ বছর বয়েসের এক সদ্য যুবা, সবেমাত্র নাকের তলায় নবীন রোম গজিয়েছে, সে একা একটি থিয়েটার চালাবে? যারাই নাম-ডাক শুনে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, তারাই ওই অল্পবয়েসী ছোকরাটিকে দেখে প্রথমে থমকে যায়। অমরেন্দ্রনাথ তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে মস্করা করে বলে, জানেন তো, আমার জন্ম হয়েছে পয়লা এপ্রিল, আমি সবাইকে এপ্রিল ফুল বানাব।

প্রত্যেকটি থিয়েটারের নাড়ি-নক্ষত্রের সন্ধান রাখে অমরেন্দ্রনাথ, সে বেছে বেছে লোক ভাঙিয়ে আনতে লাগল। নৃত্য-শিক্ষক, সঙ্গীত-শিক্ষক, রঙ্গভূমি-সজ্জাকর, রূপ-সজ্জাকর, কর্মসচিব। যথাসম্ভব প্রবীণদের এড়িয়ে অল্পবয়েসী অথচ যোগ্যতাসম্পন্নদের প্রতিই তার ঝোঁক। নট-নটী প্রায় সব নতুন। পুরনোদের মধ্যে কয়েকজনকে নিতেই হল, বড় বড় ভূমিকাগুলি চট করে নতুনদের শেখানো যাবে না। রিহার্সালের খুঁতখুঁতুনির জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মাসের পর মাস সময় নষ্ট করেছেন, নতুন নাটক নামাতে দেরি হয়েছে, খরচ বেড়ে গেছে অনেক, সেই জন্যই তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। অমরেন্দ্রনাথ সে ভুল করবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে অভিনয় শুরু করে দিতে চায়। একসঙ্গে চার-পাঁচখানা নাটকের মহড়া সে শুরু করে দিয়েছে।

খ্যাতিমান অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্র বসুকে নিতে হয়েছে, অধিকাংশ নাটকে দুটি প্রধান পুরুষ চরিত্র থাকে, অমরেন্দ্রনাথ নিজে অবশ্যই নায়ক সাজবে, দ্বিতীয় চরিত্রটির জন্য একটি পাকা অভিনেতার দরকার। অমরেন্দ্রনাথের পাশাপাশি মহেন্দ্র বসুকে দেখে দর্শকরাও বুঝবে, সেকেলে অভিনয়রীতির সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নতুন ধারার কত তফাত।

প্রথম প্রথম থিয়েটারের ঝানু লোকেরা ভেবেছিল, আর একটি বড়মানুষের ছেলে মঞ্চে নায়ক সাজার লোভে আর অভিনেত্রীদের সঙ্গে ঢলাঢলি করার বাসনায় টাকা ওড়াতে এসেছে। সুতরাং এর মাথায় হাত বুলিয়ে যতটা পারা যায় আদায় করে নেওয়া যাক। কিন্তু কাছাকাছি আসার পর সবাই বুঝল, যতই কম বয়েস হোক, এ ছোকরার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। কেউ কোনও অসমীচীন কথা বললে অমরেন্দ্রনাথ বেশ কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চুপ করে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘকায় রূপবান যুবা, পটল-চেরা চক্ষুর মণি দুটি যেন হীরকখণ্ড, মনে হয় যেন এক্ষুনি তার হাতে ঝলসে উঠবে তলোয়ার।

থিয়েটারের সব বিভাগের কাজ সে জানে ও বোঝে, সুতরাং তাকে ধাপ্পা দেওয়া সহজ নয়। যে-কোনও বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তবু বড় বড় ব্যাপারগুলি ঠিক করার আগে সে সমস্ত কলাকুশলী ও নট-নটীদের এক জায়গায় ডাকে, সব বুঝিয়ে বলে। তারপর যোগ করে, আমি ঠিক যেমনটি চাই, তেমনটিই হওয়া চাই। যদি সার্থকতায় ভাসি, সেটা আমার বুদ্ধিতেই হবে, আর যদি ব্যর্থতায় ডুবি তো নিজের বুদ্ধিতেই ডুবব। মনে রাখবেন, অন্য কারুর বুদ্ধিতে চলার পাত্র আমি নই।

রাত্রে বাড়ি ফেরারও সময় নেই, গ্রিনরুমে অমরেন্দ্রনাথের জন্য একটি খাট পাতা হয়েছে। সকাল থেকে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত সে খুঁটিনাটি সব কিছুর তদারকি করে। রঙ্গমঞ্চটির খোল-নলচে পাল্টে যাচ্ছে একেবারে, নতুন করে তৈরি হচ্ছে দর্শকদের আসন। ছারপোকার কামড় খেতে খেতে নাটক উপভোগ করা যায় না। আলোগুলি সব নতুন, সাজসজ্জা নতুন, পশ্চাৎপট নতুন। এতদিন পেছন দিকে একটা করে হাতে আঁকা দৃশ্য ঝোলানো থাকত, অমরেন্দ্রনাথ বিলিতি পত্রপত্রিকার ছবি দেখে দেখে ঠ্যালা সিন, কাটা সিন, বক্স সিন বানিয়েছে, এমনকী উইংস পর্যন্ত ঠেলে সরানো যায়। এক একটি অঙ্কের পর নেমে আসে কার্টেন বা যবনিকা। নাচের দৃশ্যে আলোগুলোকে নানা রঙের কাগজে মুড়ে তৈরি হয় স্বপ্নের পরিবেশ।

এতকাল মঞ্চের ওপর আসবাবপত্র দেখলেই বোঝা যেত যে সেগুলো নকল। প্যাকিং বক্সের ওপর কাপড় মুড়ে তৈরি হত খাট, আলমারি। অমরেন্দ্রনাথ সেই প্যাকিং বক্সগুলো লাথি মেরে মেরে বাইরে ফেলে দিল। চাঁদনিচক থেকে ভাড়া করে আনল আসল সোফা সেট, খাট, টেবিল-চেয়ার, নিজের বাড়ি থেকে ছবি আর আয়না এনে ঝুলিয়ে দিল দেয়ালে। একটা জ্যান্ত টিয়া পাখি সমেত খাঁচা দুলতে লাগল। একটি সত্যিকারের ঘোড়াও আনা হল। সেই ঘোড়ায় চেপে একটি দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চে প্রবেশ করবে।

ক্লাসিক থিয়েটারে নাটক দেখতে এসে দর্শকরা প্রথম থেকেই চমৎকৃত হয়ে গেল। বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে একঘেয়েমির ভাব এসে গিয়েছিল, একটি নবীন যুবক এসে যেন এক ফুঁয়ে তা উড়িয়ে দিয়েছে। সব কিছুই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এখানকার নাটক বারবার দেখা যায়।

'নল দময়ন্তী' ও 'বেল্লিক বাজার' দিয়ে উদ্বোধন হল, একই সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ 'হ্যামলেট', 'রাজা-রানী' ও 'আলিবাবা'-র রিহার্সাল চালিয়ে যেতে লাগল। এক একটি নাটকের এক এক রকম স্বাদ। দর্শকরা ক্লাসিকে আসতে বাধ্য হবে, ক্লাসিকে আসা অভ্যেস হয়ে যাবে।

গিরিশবাবু যখন 'ম্যাকবেথ' নামিয়েছিলেন তখন চরিত্রগুলির মূল নামই রেখেছিলেন। সাজ-পোশাকও ছিল বিলিতি ধাঁচের, অর্থাৎ বাঙালি নট-নটীরা সাহেব-মেম সেজেছিল। দর্শকরা সেই নাটক নেয়নি, অনেক দিন পর গিরিশবাবু স্বয়ং অভিনয় করতে নেমেছিলেন, তবু তাঁর আকর্ষণেও টিকিট বিক্রি হত না। বালক বয়সে অমরেন্দ্রনাথ সেই নাটক দেখতে গিয়ে থলথলে চেহারার গিরিশবাবুকে সাহেবসাজা অবস্থায় দেখে হেসে ফেলেছিল। নিজে সে সেই ভুল করবে না। 'হ্যামলেট' নাটকটি রূপান্তরিত করা হয়েছে ভারতেরই কোনও অঙ্গ রাজ্যের পটভূমিকায়, পাত্র-পাত্রীরাও দিশি, নাটকের নাম 'হরিরাজ'। মূল নাটকটি অবিকৃতই আছে, শুধু একটি পঙ্‌ক্তি, 'টু বী অর নট টু বী, দ্যাট ইজ দা কোয়েশ্চেন,' এর সঠিক বাংলা হয় না, এর অনুবাদ করাও হয়নি। ওই পঙ্‌ক্তিটি অমরেন্দ্রনাথ নিজেই মনে মনে বলে, মুখের অভিব্যক্তিতে ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে চায়।

'হরিরাজ'-এর রিহার্সাল চলছে টানা, সন্ধে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত, নারী চরিত্রগুলির অভিনয় অমরেন্দ্রনাথের পছন্দ হচ্ছে না। ধনী কন্যাদের মুখে একটা সারল্যের ভাব থাকে, তারা টাকা-পয়সার হিসেব বোঝে না, বাস্তবরুক্ষতার সঙ্গে পরিচয় না থাকার ফলে তাদের দৃষ্টি থাকে বিস্ময় ভরা, থিয়েটারের গরিব ঘরের মেয়েদের সেই ভাবটি বোঝাই সম্ভব নয়, খুব বড় অভিনেত্রী ছাড়া মুখে সেই ভাবটি অন্য কেউ আনতে পারে না।

এমারাল্ডে একটি অভিনেত্রীর মুখে একই সঙ্গে সারল্য ও তেজের ভাব দেখেছিল অমরেন্দ্রনাথ। নয়নমণি নামে সেই মেয়েটিকে পেলে কত ভাল হত! এমারাল্ড উঠে গেছে, তাকে পাওয়া স্বাভাবিক ছিল, এমারাল্ডে সে মাইনে পেত একশো কুড়ি টাকা। অমরেন্দ্রনাথ তাকে দেড়শো টাকা বেতনের প্রস্তাব দিয়েছিল, তবু সে এল না। অর্ধেন্দুশেখর পেছন থেকে কী সব যেন কলকাঠি নেড়ে তাকে আটকাচ্ছে। কী চুক্তি আছে অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে, তাও জানা যাচ্ছে না। যদি কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাতেও অমরেন্দ্রনাথ রাজি।

ক্লাসিকে যোগ দেওয়ার জন্য কত অভিনেতা-অভিনেত্রী লালায়িত, সকাল থেকে উমেদারদের ভিড় লেগে থাকে। এখন দ্বারবান দিয়ে তাদের আটকাতে হচ্ছে। আর অমরেন্দ্রনাথ নিজে থেকে যাকে চায়, সে-ই এল না!

দু'দিন বাদে একজন লোক খবর নিয়ে এল, অর্ধেন্দুশেখরের পাত্তা পাওয়া গেছে, রামবাগানের এক শখের থিয়েটার দলে তিনি অবৈতনিক পরিচালক হয়েছেন, তাঁর এখন এমনই দুর্দশা। তিনি ওই নয়নমণির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন, কিছু টাকা-পয়সা নিয়েছেন বোধ হয়, মেয়েটিকে চুক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। গঙ্গামণির কাছ থেকে এ খবর জানা গেছে।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, তা হলে সে এখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না কেন?

আশুতোষ বড়াল নামে লোকটি বলল, সেইটাই তো কথা, কারণটি শুনলে আপনি খুব রাগ করবেন!

অমরেন্দ্রনাথ ভুরু কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করল, টাকা বেশি চায়?

আশুতোষ বলল, না, ও মেয়ের টাকার আহিংকে নেই। কিন্তু নিজে থেকে সে আসবে না। আপনাকে আবার গিয়ে বলতে হবে।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অমরেন্দ্রনাথ বলল, ঠিক আছে, যাব। থিয়েটার চালাতে এসেছি, ছেঁদো মান-সম্মানের কথা ভাবলে চলে? মনে করো, আর্ভিং যাচ্ছে এলেন টেরির কাছে। এক্ষুনি চলো।

অমরেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভৃত্য বৃন্দাবনকে ডাকা হল। সে বাবুর ধুতি বদল করে দেবে। অমরেন্দ্রনাথ নিজে ধুতি পরতে পারে না। তাদের পারিবারিক কেতা অনুযায়ী পায়ের জুতো জোড়া পর্যন্ত ভৃত্যরা পরিয়ে দেয়। এই সেদিনও অমরেন্দ্রনাথের চুল আঁচড়ে দিতেন তার বউঠান।

গঙ্গামণির বাড়ির সামনে জুড়িগাড়ি থেকে অমরেন্দ্রনাথ নামতেই অমর দত্ত এসেছে, অমর দত্ত এসেছে, বলে একটা শোরগোল পড়ে গেল সেই পল্লীতে। অনেক লোক তাকে দেখার জন্য ছুটে এল। এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা অমরেন্দ্রনাথ নিজেও জানে না। ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগল, আহা গো, কী রূপ, রাজপুত্তুর, রাজপুত্তুর!

গঙ্গামণি একেবারে বিগলিত হয়ে গিয়ে অমরেন্দ্রনাথকে বসাল একটি আরামকেদারায়। আজ সকালেই নয়নমণির সঙ্গে তার একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে। গঙ্গামণির দৃঢ় ধারণা ছিল যে অমরবাবুর মতন অত মানী একজন মানুষ একবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, সে আর দ্বিতীয়বার আসবে না। সত্যিই সে এসেছে? নয়নমণির এত দেমাক কেন, তার নিজেরই এবার যাওয়া উচিত ছিল না? থিয়েটারের ম্যানেজার বা অ্যাক্টর বা রাইটার তো শুধু নয়, মালিক বলে কথা! মালিককে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতেই হয়।

দোতলায় নেমে এসে নয়নমণি দু' হাত জোড় করে অমরেন্দ্রনাথকে নমস্কার জানাল। গঙ্গামণি চোখের ইশারায় বোঝাবারও চেষ্টা করল, প্রণাম কর, প্রণাম কর, তবু নয়নমণি তার থেকে বয়েসে ছোট এই যুবকটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল না।

একটা কমলা রঙের শাড়ি পরে আছে নয়নমণি, মাথার চুল সব খোলা, শরীরে কোনও অলঙ্কার নেই। সোনার গয়না সে একেবারেই পরে না। অভিনয়ের সময় ছাড়া সে রুজ-পমেটম মাখে না মুখে। তবু তার শরীরের গড়নে ঝরে পড়ে লাবণ্য।

অমরেন্দ্রনাথ মুগ্ধভাবে কয়েক পলক চেয়ে দেখল নয়নমণির রূপ ও ব্যক্তিত্বের বিভা। তারপর পাশের কর্মসচিবকে বলল, আপনি সব জিজ্ঞেস করুন।

আশুতোষ বলল, হ্যাঁ গা বাছা, মুস্তাফি সাহেবের সঙ্গে তোমার কী সব চুক্তি ছিল, তা খারিজ হয়ে গেছে বলে আমরা শুনেছি। আমরা কি ভুল শুনেছি?

নয়নমণি বলল, না, আপনারা ঠিকই শুনেছেন।

—তা হলে তুমি ফ্রি? ক্লাসিকে যোগ দিতে কোনও বাধা নেই?

—আপনারা যদি চান, যোগ দিতে পারি।

—আমরা তোমার সঙ্গে লিখিত-পড়িত চুক্তি করব, তা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার হুজ্জোত হবে না তো? মুস্তাফি সাহেব আবার ব্যাগড়া দেবেন না? ওনার সঙ্গে যে চুক্তিখানা ছিল, সেটা ছেঁড়া হয়ে গেছে?

—লিখিত কোনও চুক্তি ছিল না।

—বেশ বেশ। বেতনের কথাটা তো আগেই জানানো হয়েছে। মাস মাস দেড়শো টাকা পাবে। গাড়ি এসে তোমায় নিয়ে যাবে, পৌঁছে দেবে তো বটেই। মাঝে মাঝে হোল নাইট রিহার্সাল চলবে, অমরবাবুর প্রত্যেকটি কথা মানতে হবে।

এই সব কথা চলার সময় নিঃশব্দে বসে পা দোলাতে লাগল অমরেন্দ্রনাথ। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে গঙ্গামণির ঘরখানি। গঙ্গামণির বিভিন্ন বয়েসের বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে দেওয়ালে। অমরেন্দ্রনাথ গঙ্গামণিকে মঞ্চে কখনও দেখেনি।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হবার পর আশুতোষ বড়াল দু' হাত ঘষে পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলল, যাক, সব পাকাপাকি হয়ে গেল, এখন আর কেউ তেণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করতে পারবে না। কাল থেকেই কাজ শুরু।

এবারে অমরেন্দ্রনাথ নয়নমণির চোখে চোখ রেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, নয়নমণি, তুমি আমাকে এখানে দু'বার আসতে বাধ্য করালে, নিজে যাওনি কেন আমার কাছে? তোমার চেয়ে আমার সময়ের দাম বেশি নয়?

নয়নমণি বলল, আপনার কাছে আমি যাইনি ... লজ্জা করছিল!

অমরেন্দ্রনাথ বলল, লজ্জা? তুমি থিয়েটার করতে এসেছ, এর মধ্যে লজ্জার আবার স্থান কোথায়?

নয়নমণি বলল, প্রথমবারে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। পরে ভেবেছি, নিশ্চয়ই আপনি রেগে আছেন। তাই ঠিক করেছিলাম, থিয়েটার না হয় আর না-ই হবে, তবু নিজে থেকে অমর দত্তর সামনে গিয়ে আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, হুঁ, বুঝলুম। এর মধ্যে তুমি অন্য কোনও থিয়েটারে যোগ দেবার চেষ্টাও করোনি?

—না।

—কেন?

—কেন? ঠিক জানি না, এমনিই, ইচ্ছে হয়নি।

—তোমার বয়েস কত?

—সাতাশে পা দিয়েছি।

গঙ্গামণি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না, না, ওর বয়েস তেইশ ... ও কিছু জানে না।

নয়নমণি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, সে কী গো দিদি, আমি নিজের বয়েস জানব না? এই বৈশাখে আমার ছাব্বিশ পূর্ণ হয়ে গেছে।

অমরেন্দ্রনাথ উত্তেজিতভাবে বলল, না, না, তোমার সাতাশ হলে তো চলবে না। তোমার বয়েস একুশ। আমি বিজ্ঞাপনের হ্যান্ডবিলে লিখব 'ষোড়শী রূপসী নায়িকা'।

নয়নমণির হাসি এবার সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, তবে তো আমায় দিয়ে চলবে না। অত কমবয়েসী মেয়ের রোলে আমাকে মানাবে কেন!

গঙ্গামণি বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানাবে, মানাবে। ভাল করে রূপটান দিলে কে বুঝবে যে ওর বয়েস বেড়েছে?

অমরেন্দ্রনাথ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সে আমরা বুঝব। শোনো নয়নমণি, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি বলবে তোমার বয়েস একুশ।

নয়নমণি বলল, ওমা, তা কি হয়! সাতাশ বছরের মেয়ের বয়েস একুশ বললে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? আমি মিথ্যে কথাই বা বলব কী করে?

অমরেন্দ্রনাথ ধমকের সুরে বলল, আমার যে হিরোইন হবে, তার বয়েস কি আমার চেয়ে বেশি হতে পারে? দর্শকরা মানবে কেন? আমার বয়েস আমি বাড়িয়ে বলব চব্বিশ, তোমাকে একুশ থাকতেই হবে!

আশুতোষ বলল, আ-হা-হা, অত কথার দরকার কী? উর্বশী, মেনকা, রম্ভাদের কি বয়েস বাড়ে? থিয়েটারের মেয়েদের ওই একই ব্যাপার। এমন মেক-আপ দেবে, ছাব্বিশকে বোলো করা কিছুই না। বয়েসের কথা আদৌ তোলারই কোনও প্রয়োজন নেই। তা হলে এই ঠিক রইল। কাল বেলা এগারোটায় গাড়ি আসবে, সারা দিন রিহার্সাল।

নয়নমণি তবু বলল, ভাল করে ভেবে দেখুন, আমাকে দিয়ে চলবে কি না। আরও তো কত মেয়ে আছে। আমার বয়েস কিন্তু সত্যি সাতাশ। এখনও যদি চুক্তি ক্যানসেল করতে চান, আমি রাজি আছি।

অমরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী বললে, ক্যানসেল? মানাবে কি মানাবে না সেটা আমি বুঝব! ক্লাসিকের সঙ্গে কারুর চুক্তির খেলাপ হতে পারে না। মাসের পর মাস ঠিক মাইনে পেয়ে যাবে। কাল ঠিক বেলা এগারোটা।

তারপর গঙ্গামণির দিকে ফিরে বলল, তোমার বাড়িতে এই নিয়ে দু'বার এলুম, তুমি একবারও কিছু খেতে দিলে না তো! হিন্দুর বাড়িতে অতিথি অভ্যর্থনার রীতি নেই?

গঙ্গামণি দারুণ লজ্জা পেয়ে, জিভ কেটে বলল, ও মা, সে কী কথা! আমি কোথা যাব গো! আপনি কত মানী বংশের লোক, বড় মানুষের ব্যাটা, আমাদের মতন হতভাগির বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এই কত ভাগ্যি। আমাদের হাতের ছোঁয়া খাবেন কি না

অমরেন্দ্রনাথ খপ করে গঙ্গামণির একখানা হাত ধরে বলল, হাতের ছোঁয়ায় কি সন্দেশ-রসগোল্লার স্বাদ পাল্টে যায় নাকি? আমরা থিয়েটারের লোক, আমাদের আবার জাত-পাত কী? থিয়েটারের লোক সবাই এক জাত। তা বলে এখন বাজারের খাবার আনতে পাঠিয়ো না। একদিন নিজের হাতে কিছু বানিয়ে খাওয়াবে।

গঙ্গামণি বলল, আমাদের নয়ন খুব ভাল রান্না করে। কই মাছ রাঁধে, দু'পিঠ দু'রকম।

সে কথা না শুনে অমরেন্দ্রনাথ এগিয়ে গেল দেওয়ালের দিকে। কোনও এক নাটকের দৃশ্যের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়াল। দুটি তরুণী হাত ধরাধরি করে নাচছে।

গঙ্গামণি ডান দিকের তরুণীটির দিকে আঙুল তুলে বলল, এইটে আমি। এখন কেউ চিনতেই পারবে না। আমিও যে এককালে ফিনফিনে রোগা ছিলুম, তা কেউ বিশ্বাসই করে না। আর এ পাশের জন বিনোদিনী। বিল্বমঙ্গল পালা—

অমরেন্দ্রনাথ বলল, ও, এই-ই বিনোদিনী! নামই শুনেছি, কখনও অ্যাকটিং দেখিনি। সে স্টেজ ছেড়ে দিল কেন?

গঙ্গামণি বলল, কী জানি, শ্বেতি না কুষ্ঠ কী যেন হয়েছে শুনেছি। বাড়ি থেকেই আর বেরুতে চায় না।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, না, না, সে রকম কিছু নয়। গিরিশবাবুর সঙ্গে কী সব মান-অভিমান হয়েছিল ... কেমন অভিনয় করত সে ?

গঙ্গামণি বলল, তা বাবু মানতেই হবে, অ্যাকটিং-এ তার দাপট ছিল। নাচে-গানে সমতুল, ইচ্ছে করলেই ঝরঝর করে চক্ষু দিয়ে জল গড়াত।

অমরেন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে নয়নমণির দিকে চেয়ে বলল, ওকে তো আমি এমারাল্ডে নাচতে-গাইতে দেখেছি। কী গো, তুমি বিনোদিনীকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না ?

৩১

এসেছ পাষাণী। দয়া হয়েছে কি মনে ?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল ?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে ? জান না কি, প্রিয়ে,
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য—
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর।

এরপর রানি সুমিত্রার সংলাপ। এর আগের ক'দিন রিহার্সালে বই দেখে পার্ট হচ্ছিল, আজ মুখস্থ বলা হবে, রাজা বিক্রমদেবের কথা শেষ হতে না হতেই রানি শুরু করবে। কিন্তু নয়নমণি চুপ করে রইল।

যেদিন থিয়েটারে শো থাকে না, সেদিন রঙ্গমঞ্চেই রিহার্সাল হয়। অমরেন্দ্রনাথ হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। কাঠের পুতুলের মতন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পার্ট বলে যাওয়া তার ঘোর অপছন্দ। প্রথম রিহার্সাল থেকেই প্রত্যেক অভিনেতাকে মুভমেন্ট শেখানো হয়।

অমরেন্দ্রনাথ নিজে মদ্যপান করে না, রিহার্সালের সময় কেউ মদ ছুঁতে পারবে না, এই রকম কঠোর নির্দেশ দেওয়া আছে। কোনও রকম উটকো মন্তব্য, গল্প-গুজব নিষিদ্ধ। প্রত্যেককে আগাগোড়া উপস্থিত থাকতে হবে, কোনও দৃশ্যে পার্ট নেই বলে আড়ালে যাওয়া চলবে না। বঙ্গ সন্তানের পক্ষে বেশিক্ষণ মুখ বুজে থাকা খুবই কষ্টকর, রিহার্সালের মধ্যে অবান্তর কথা বলার অপরাধে দু'জনকে এর মধ্যেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় আর সকলেরই বয়েস বেশি। তবু তার ব্যক্তিত্বের প্রতাপে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে।

বিভিন্ন নাটকে সে বিভিন্ন বয়েসী ভূমিকা নেয়, সব রকম পার্টেই সে তার অভিনয়-প্রতিভা দেখাতে চায়। হ্যামলেট বা 'হরিরাজ' নাটকে সে তরুণ নায়ক, 'রাজা-রানী' নাটকে সে প্রৌঢ় রাজা। সব নাটকেই নয়নমণি তার বিপরীত ভূমিকায়।

ঠিক সময় পার্ট শুরু না করায় অমরেন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে বলল, কী হল, নয়নের পার্ট মুখস্থ হয়নি ?

নয়নমণি রাজার সংলাপের মাঝখানে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে, সে বলল, আপনার কিউ ঠিক হয়নি।

অমরেন্দ্রনাথ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কিউ ঠিক হয়নি মানে ? আমার মুখস্থ কখনও ভুল হয় না।

নয়নমণি বলল, মুখস্থ ঠিকই আছে। কিন্তু শেষ দুটি লাইন উল্টে গেছে। 'প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য', এই লাইনটা শেষে হবে। আপনি 'প্রেম গুরুতর' দিয়ে শেষ করলেন, কিন্তু

'কর্তব্য'-তে আমার কিউ।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন, হতেই পারে না। প্রম্‌পটার !

একটু পেছনে দাঁড়ানো প্রম্‌পটার ভয়ে কাঁপছে। নয়নমণি ঠিকই ভুল ধরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে কথা শুনলে অমরেন্দ্রনাথ চটে যাবে। সে বলল, 'প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য', আপনি এখানেই তো শেষ করলেন। এটা স্পষ্ট মিথ্যে কথা, অন্য সকলেই বুঝল, কেউ প্রতিবাদ জানাল না।

অমরেন্দ্রনাথ নয়নমণিকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি মন দিয়ে শোনোনি। অন্য কিছু ভাবছিলে ?

নয়নমণি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা হলে আমারই ভুল হয়েছে। আপনি আর একবার বলবেন ?

এবার অমরেন্দ্রনাথ শেষ করতেই নয়নমণি ধরল :

হায়, ধিক মোরে ! কেমনে বোঝাব, নাথ
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে।
মহারাজ, অধিনীর শোনো নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু,
পারি নে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন। রক্ষা করো
পীড়িত প্রজারে—

অমরেন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠল, পীরিত নয়, পীরিত নয়, পীড়িত। বাঙাল মুলুক থেকে এসেছ নাকি ! ড়, ড় স্পষ্ট উচ্চারণ করবে ! তুমি আগে যাদের কাছ থেকে শিখেছ, তারা তোমাকে র আর ড়-এর উচ্চারণ ঠিকমতন শেখায়নি ?

নয়নমণি বলল, আমি বাঙাল দেশে কোনও দিন যাইনি। তবু চেষ্টা করব, এর পর আর ভুল হবে না।

টানা দু' ঘণ্টা মহড়ার পর মধ্যাহ্নভোজের বিরতি।

অমরেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে নয়নমণিকে ডেকে পাঠাল। একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, তুমি তখন কেন বললে, আমি কিউ দিতে ভুল করেছি ? ম্যানেজারের মুখে মুখে কথা বলতে তোমাকে কে শিখিয়েছে ?

নয়নমণি উত্তর না দিয়ে হাসল।

অমরেন্দ্রনাথ আরও উত্তপ্ত হয়ে বলল, আমার কথার উত্তর না দিয়ে হাসছ যে ?

নয়নমণি বলল, সে জন্য আজই বরখাস্ত হব নাকি ? আমি এর আগে দু'তিনটি থিয়েটারে কাজ করেছি। কখনও এ রকম ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়নি। এখানে সবাই ভাবে, যে-কোনও দিনই বুঝি বরখাস্ত হয়ে যেতে পারে !

অমরেন্দ্রনাথ বলল, ভয় পেলে বুঝি মানুষ হাসে ? তোমার ব্যবহারে তো ভয়ের কোনও লক্ষণ নেই।

নয়নমণি বলল, আমি গিরিশবাবু, অর্ধেন্দুশেখরের অধীনে পার্ট শিখেছি। তাঁরা নমস্য ও মহা শ্রদ্ধেয়। তাঁদের খুব ভয় পেতাম। কিন্তু আপনার সামনে দাঁড়ালে ... আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে আপনি আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। তাই ভয় লাগে না।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, বয়েসে ছোট হলেই বুঝি গুণে কম হয় ? বুড়ো দামড়াদের মধ্যে কি বহু নির্বোধ নেই ?

নয়নমণি বলল, আপনার অবশ্যই অনেক গুণ আছে। দর্শকরা কি এমনি এমনি আপনাকে ভালবাসছে ! কিন্তু আপনার অহং বড় বেশি। নিজের ভুল স্বীকার করাটাও মহত্তের লক্ষণ।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, তবু বলবে, আমি ভুল করেছি ? প্রম্‌পটারের কথা শুনলে না ?

—সে আপনার ভয়ে সত্যি কথাটা বলেনি।

—তা হলে একমাত্র তোমার কথাটাই মানতে হবে ? রিহার্সালের সময় কোনও রকম বাদ-প্রতিবাদ

আমি সহ্য করব না। ফের যদি কোনও দিন শুনি...

—তা হলে আজই আমি বাড়ি চলে যাই?

—বাড়ি যাবে মানে? তোমাকে আমি চুক্তি দিয়ে বেঁধে রেখেছি, জানো না? অর্ধেন্দুশেখরের কাছ থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ, আমার কাছ থেকে অত সহজে নিষ্কৃতি নেই।

—অমরবাবু, মানুষের মনকে কি কোনও চুক্তি দিয়েই বেঁধে রাখা যায়? আমি তো নিছক টাকা রোজগারের জন্য থিয়েটারে আসিনি। অভিনয় ভাল লাগে বলে এসেছি। অভিনয়ে যদি মন না লাগে, সব সময় আপনার ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, তা হলে নাটক জমবে কেন? সবাইকেই আপনি দাবড়ে ভয় পাইয়ে রাখছেন। মহেন্দ্র বসুর মতন অত বড় একজন পাকা অভিনেতাকেও আপনি ধমকেছেন।

—নয়নমণি, আমিও থিয়েটার খুলেছি নাটক ভালবেসে। নিছক টাকা রোজগারের জন্য নয়। আমি নতুন ধরনের অ্যাকটিং দেখাতে চাই, তা সকলে মানবে না? তা হলে যে জগাখিচুড়ি হবে!

—কিন্তু আপনি কিউ দিতে ভুল করলে অন্যদের অসুবিধে হবে না?

—এখনও বলছ, আমি ভুল বলেছি? আচ্ছা ঠিক আছে, ধরো, পাবলিকের সামনে শো করার সময় এরকম একটা ভুলই হয়ে গেল, তখন তুমি সামলাবে না?

—তখন অবশ্যই সামলাব। সেটা তো প্রত্যেকের দায়িত্ব। কিন্তু সে রকম ভুল যাতে না হয়, সেই জন্যই তো রিহার্সালে সাবধান হওয়া দরকার। অভিনয় যাতে সার্থক হয়, তা আমরা সবাই চাই। আর একটা কথা বলব? আপনি আমার র আর ড়-এর ভুল ধরলেন, কোনও দিন আমাকে কেউ এমন কথা বলেনি। আপনিই বরং হৃদয়-কে রিদয় উচ্চারণ করেন। থিয়েটারে প্রত্যেকটি শব্দ ঠিকঠিক উচ্চারণ করাই তো উচিত।

—আমি হৃদয়কে রিদয় বলি? কক্ষনও না! তোমার এত সাহস...

—না, না, সাহস নয়। অধীনার অপরাধ হয়েছে। তবে কি আজই বরখাস্ত?

—কোথায় যাবে তুমি, চুলের মুঠি ধরে তোমায় বেঁধে রাখব!

নয়নমণি আবার হেসে ফেলল! মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, অন্য কেউ এমন কথা বললে ভয়ে কাঁপতুম। কিন্তু আপনার কথা শুনে ভয় লাগে না!

অমরেন্দ্রনাথ এমনই রাগে ছটফট করতে লাগল যেন নয়নমণিকে শারীরিক আঘাত করে সে বশে আনতে চায়। টেবিলের ওপর একটা কাচের পেপার ওয়েট সে মুঠোয় চেপে ধরল। এখানে আর কেউ তার নির্দেশ অবহেলা করতে সাহস পায় না, শুধু এই রমণীটি তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে চলেছে।

আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে সে গরম কণ্ঠস্বরে বলল, যাও, ভাল করে পার্ট মুখস্থ করো। ফের যদি ভুল হয়—

পরপর তিনটি নাটকের রিহার্সাল চলেছে, সকলেই স্বীকার করে যে নয়নমণির স্মৃতিশক্তি সবচেয়ে ভাল। কোনও সংলাপই সে ভোলে না কিংবা জোড়াতালি দেয় না। 'আলিবাবা'-তে সে মর্জিনার ভূমিকায় নাচ ও গান এমনই জমিয়ে তুলল যে কলা-কুশলীরাও নিজেদের কাজ ফেলে রিহার্সাল দেখার জন্য ভিড় জমায়, তাদের ছুটি হলেও বাড়ি যেতে চায় না।

পুরনো যারা এমারাল্ডে নয়নমণির সঙ্গে কাজ করেছে, তারা নয়নমণির চরিত্রে অনেকখানি পরিবর্তন লক্ষ করে বিস্মিত হয়। আগে ছিল সে লাজুক ও নিভৃতচারিণী, মঞ্চে অভিনয়ের সময় ছাড়া অন্য সময় কারুর সঙ্গে কথাই বলত না প্রায়। পরিচালকের সমস্ত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। এখন তার ব্যবহার অনেক সাবলীল, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে উত্তর দেয়, মালিক ও নির্দেশক অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক করে।

অবশ্য সকলেই মনে মনে স্বীকার করে, অন্য নাটকগুলি পুরুষপ্রধান, স্ত্রী চরিত্রগুলিতে বিশেষ কিছু অভিনয়-ক্ষমতা দেখাবার সুযোগ নেই, কিন্তু 'আলিবাবা'-তে নয়নমণি একাই চুম্বকের মতন হাজার হাজার দর্শক টেনে আনবে।

কিছুদিন পরেই আবার নয়নমণির সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের খটাখটি লেগে গেল।

থিয়েটারের জন্য অমরেন্দ্রনাথ দুটি জুড়িগাড়ি কিনেছে। তার একটিতে চারজন প্রধান অভিনেত্রীকে আনা-পৌঁছনো হয়। অমরেন্দ্রনাথের আদেশ, পথে যাওয়া-আসার সময় সেই গাড়ির দরজা বন্ধ থাকবে, জানলা থাকবে ঢাকা, মাঝপথে দোকানপাটে কেউ নামতে পারবে না, রাস্তার লোক যাতে ঘুণাক্ষরেও না টের পায় যে সেই গাড়ির যাত্রী কারা।

একদিন অমরেন্দ্রনাথ নাট্যশালার হাওয়ায় বসে চা খাচ্ছে, দেখল অভিনেত্রীদের নিয়ে একটি গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকছে চত্বরে, সে গাড়ির দরজা খোলা, ভেতরে শোনা যাচ্ছে ঝর্নার জলের মতন রমণীদের ছলোচ্ছল হাসির শব্দ।

বিরক্তিতে অমরেন্দ্রনাথের ভুরু বক্র হয়ে গেল। একটু পরে নিজের ঘরে বসে সে কোচোয়ানকে ডেকে পাঠাল। সে সেলাম করে দাঁড়াতেই অমরেন্দ্রনাথ তার দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, রহমত, তুমি যা মাইনে পাও, এ মাসে তার অর্ধেক পাবে। প্রথম অপরাধের জন্য এই শাস্তি। ফের যদি কোনও দিন গাড়ির দরজা খোলা দেখি, একেবারে দূর করে দেব।

রহমত হাউ হাউ করে বলে উঠল, আমার কোনও দোষ নেই হুজুর, আমি বারবার বলেছি, কিন্তু একটা দিদি কলুটোলায় চুড়ির দোকানে গাড়ি থামিয়ে নামল।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, গাড়ি থামাল মানে? গাড়ি কে চালায়?

রহমত বলল, দরজা খুলে দিদি বলল, রোকো, রোকো, তখন আমি কী করি?

—কোন দিদি?

—ওই যে মর্জিনাদিদি। তার সঙ্গে আর দুটো দিদিও নামল। দিদিদের হুকুম মানব না, এমন কথা তো আপনি বলেননি হুজুর।

রহমতকে বিদায় করে অমরেন্দ্রনাথ উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগল। বাল্যকাল থেকেই সে জেদি। তার পরিবারের লোকেরা বারবার তার অনেক জেদ মানতে বাধ্য হয়েছে, আর এখানে, এই থিয়েটারের সবাই তার বেতনভুক কর্মচারী, তারা তার নির্দেশের অবাধ্য হবে? যে-কোনও উপায়ে ওই-নয়নমণি নামের মেয়েটিকে শায়েস্তা করতে হবে। না হলে ওর দেখাদেখি অন্যরাও মাথায় চড়ে বসবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, নয়নমণিকে যে তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখানো যায় না। যে-কোনও মুহূর্তে ও চলে যেতে রাজি। টাকা-পয়সা গ্রাহ্য করে না। ধমক দিলে হাসে। ও কি ভাবে, ওকে বাদ দিয়ে ক্লাসিক থিয়েটার চলবে না? তারাসুন্দরী নামে মেয়েটিও দুর্দান্ত অভিনয় করে, শুধু গানের গলাটা তেমন সুরেলা নয়, আরও কিছু তালিম দিয়ে ওই তারাসুন্দরীকেই নয়নমণির ওপরে তুলতে হবে।

কিন্তু অপেক্ষা করারও ধৈর্য নেই অমরেন্দ্রনাথের। নয়নমণির সঙ্গে আজ কুসুমকুমারী ও সরোজিনী ছিল, তিন জনেরই ডাক পড়ল একটু বাদে।

ঘরে তিন-চারটি চেয়ার আছে, তবু ওদের বসতে বলল না অমরেন্দ্রনাথ। গলার আওয়াজে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এনে সে বলল, আজ কলুটোলায় মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে তোমরা নেমেছিলে কেন?

অন্যরা অমরেন্দ্রনাথের সামনে কথা বলতে সাহস পায় না, আড়ালে তারা অমরেন্দ্রনাথের নাম দিয়েছে ধানিলঙ্কা, তারা কনুই দিয়ে ঠেলল নয়নমণিকে।

নয়নমণি বলল, ওখানে একটা বড় চুড়ির দোকান আছে। কত রকম বেলোয়াড়ি চুড়ি, পুঁতির মালা, গালার বালা। আলিবাবা নাটকের ড্রেসের সঙ্গে ওগুলো খুব ভাল যাবে। তাই কিনে আনলাম।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, চুড়ি কেনার দরকার, তা বড়ালবাবুকে বললে না কেন? আমাদের প্রোডাকশান থেকে কিনে আনত।

নয়নমণি বলল, পুরুষ মানুষে আবার চুড়ি পছন্দ করতে জানে নাকি? কোন রঙের সঙ্গে কোন রং মানায়, তাই-ই বোঝে না।

—ড্রেসারদের চেয়েও তুমি ভাল বোঝো ? তোমাকে অত রং নিয়ে মাথা ঘামাতে কে বলেছে ? মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে কোথাও নামতে আমি নিষেধ করেছি না ? গাড়ির দরজাই বা কেন খুলে রেখেছিলে ?

—দরজা বন্ধ রাখলে হাঁসফাঁস করতে হয়। এত গরম পড়েছে।

—যেতে-আসতে কতক্ষণ লাগে ? এইটুকু গরম সহ্য করতে হবে। মোট কথা দরজা খোলা রাখা চলবে না। মাঝপথে কোথাও নামার কথা কোচোয়ানকে কক্ষণও বলবে না।

—আমরা কি বেনে বাড়ির বউ নাকি ?

—চোপ ! আবার হাসছ, তোমার এত সাহস ! যা বললাম, তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। যাও !

—এসব কথা চুক্তিতে লেখা ছিল নাকি ?

—সব কথা লেখার দরকার হয় না। থিয়েটারের স্বার্থেই এটা করতে হবে।

—একটু বুঝিয়ে বলুন না, অমরবাবু। এতে থিয়েটারের কী স্বার্থ রক্ষা হবে ?

—আমি চাই না, স্টেজে ছাড়া আর কোথাও রাস্তার পাঁচপেঁচি লোকেরা তোমাদের দেখুক। থিয়েটারের সময় মেক-আপ দিয়ে তোমাদের চেহারা সব বদলে যায়। লোকে টিকিট কেটে তোমাদের দেখতে আসে। পথেঘাটে তোমাদের মেক-আপ ছাড়া খেঁদিপেঁচি মুখ যদি লোকে দেখে ফেলে, তা হলে তারা বলবে, ও হরি, এই, এ যে আমাদের ঘরের বউ-ঝিদের মতনই। এদের জন্য শুধুমুধু পয়সা ওড়াতে যাব কেন ? তোমাদের নিয়ে কেউ আর স্বপ্ন দেখবে না।

—লোকে কি শুধু চেহারা দেখতে আসে, না অভিনয় দেখতে আসে ? আপনিও তো নাটকের হিরো, আপনি কি সব সময় মেক-আপ দিয়ে রাস্তায় ঘোরেন ?

—পুরুষ মানুষ আর মেয়েমানুষের কথা এক হল ? নয়ন, তর্ক করবে না ! থিয়েটারের গাড়িতে দরজা বন্ধ করে আসতে হবে, এই আমার ফাইনাল কথা !

নয়নমণি অন্য দুজনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রে, তোরা রাজি আছিস ?

কুসুমকুমারী ও সরোজিনী ফ্যাকাসে মুখে চুপ করে রইল।

নয়নমণি বলল, আমরা কি গুড়ের নাগরি ? বন্ধ গাড়িতে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার থিয়েটারের গাড়ি দরকার নেই। আমি ভাড়া গাড়িতে আসব, কেমন ? এইটুকু আমাকে ছাড় দিন।

অমরেন্দ্রনাথ আবার কিছু বলতে যেতেই নয়নমণি বলল, লোকেরা এখনও আমাদের থিয়েটারের মেয়ে বলে চিনতে পারে না। খেঁদি-পেঁচি বলে কেউ তাকিয়েও দেখে না।

এর দু'দিন বাদে নয়নমণি বেলা এগারোটার সময় রিহার্সালে এসে দেখল, মঞ্চের সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, এক কোণে একটি সিংহাসনের মতন চেয়ারে একজন অত্যন্ত রূপবান, অচেনা ব্যক্তি বসে আছে। অতি দামি কোঁচানো ধুতি পরা, পায়ে মখমলের লপেটা, গায়ে ফিনফিনে সাদা কাপড়ের পিরান, গালে কালো দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত এলানো ঘন চুলের বাবরি, দীঘল দুটি চক্ষু, বয়েস হবে ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। এমন সুদর্শন পুরুষ আগে কখনও দেখেনি নয়নমণি। প্রথমেই তার মনে হল, নতুন কোনও নায়ক এল নাকি ? বাংলার কোনও রঙ্গমঞ্চেই এমন দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ নায়ক নেই।

রিহার্সাল এখনও শুরু হয়নি, অমরেন্দ্রনাথ খুব খাতির করে কথা বলছে সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। অহংকারী, উগ্র স্বভাব অমরেন্দ্রনাথের মুখে এমন গদ্‌গদ ভাব দেখা যায়নি আগে।

নয়নমণি কুসুমকুমারীকে জিজ্ঞেস করল, ইনি কে ?

কুসুমকুমারী ঠিক জানে না, সে বলল, শুনছি তো আজ যে পালাটার মহলা হবে, ইনি সেই পালাটা লিখেছেন। মহলা দেখতে এসেছেন।

শুনে নয়নমণি বিস্মিত হল। বাংলার প্রতিটি মঞ্চেই গিরিশবাবুর লেখা নাটকের অভিনয় হয়। নাট্যকার হিসেবে একমাত্র তাঁরই সম্মান আছে। আর যারা খুচরো-খাচরা নাটক লেখে, তারা বিশেষ

পাত্তা পায় না। তাদের নাটকের যে-কোনও অংশ যখন-তখন বদলানো হয়।

নয়নমণি অন্যদের কাছ থেকে ক্রমশ জানতে পারল, এই নাট্যকারকে যে এত খাতির করা হচ্ছে, তার মূল কারণ, এঁর বংশগরিমা। ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সন্তান, এঁর নাম রবীন্দ্রবাবু। 'রাজা ও রানী' নাটকের রিহার্সাল দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই ইনি মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেবেন। শুধু নাট্যকার নন, ইনি একজন ভাল গায়ক এবং শখের অভিনেতা হিসেবেও সুনাম আছে। নয়নমণির মনে হল, ইস এই অপরূপ মানুষটির সঙ্গে যদি একবার এক মঞ্চে অভিনয় করার সুযোগ পেতাম ! এঁর দিকে তাকালেই মনে হয়, ইনি সকলের চেয়ে আলাদা।

একটু পরেই রিহার্সাল শুরু হল।

অন্য দিন সবাই পার্ট বলে হলের শূন্য চেয়ারগুলির দিকে চেয়ে। আজ রিহার্সাল হচ্ছে রবীন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে। কেন যেন, অনেকেই আজ বেশি ভুল করতে লাগল। এমনকী অমরেন্দ্রনাথের পর্যন্ত সংলাপে শব্দ বাদ যাচ্ছে। সকলেরই যেন স্নায়ু চঞ্চল। রবীন্দ্রবাবু অবশ্য মাঝপথে কারুকেই বাধা দিচ্ছেন না, কোনও মন্তব্য করছেন না, সহাস্য মুখে তাকিয়ে শুনছেন।

নয়নমণি প্রতিদিনই রিহার্সাল শুরু করার আগে একটুক্ষণ নিরালায় বসে তার ঘরের শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটির রূপ মনে এনে চক্ষু বুজে ধ্যান করে। তাতেই তার মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়, স্মৃতিতে কোনও কুয়াশা হয় না।

এক সময়ে অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, রবীন্দ্রবাবু, কেমন লাগছে, ঠিক হচ্ছে কি ?

রবি এতক্ষণ স্থির হয়ে বসে ছিলেন, এবার একটু নড়েচড়ে উঠলেন। প্রশ্ন করা না হলে নিজে থেকে কিছু বলবেন না, এটাই বোধ হয় তাঁদের পরিবারের কেতা।

তিনি বললেন, এই নাটক কিছুটা গদ্যে লেখা, কিছুটা কবিতায়। গদ্যাংশে ভারী চমৎকার হচ্ছে, খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু কবিতার সংলাপে মাঝে মাঝে বোধ হয় ছন্দের ঝোঁক ঠিক থাকছে না।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, সেটা আমিও বুঝি। বাংলা থিয়েটারের অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেসরা এতকাল মাইকেলের অমিত্রাক্ষর কিংবা গিরিশবাবুর ভাঙা পয়ারে অভ্যস্ত। আপনার ছন্দের নতুন রকম চালটা এখনও ঠিক ধরতে পারছে না।

রবি বললেন, শক্ত তো নয় তেমন। কবিতার সংলাপেও স্বাভাবিক কথ্য ভাবটা থাকবে, আবার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আট মাত্রার পর সামান্য বিরতির কথাও মনে রাখতে হবে।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, কোথায় কত মাত্রা, সে তো আমিই জানি না। আপনি একটু দেখিয়ে দেবেন ? কয়েকটা লাইন যদি পড়ে দেন...

রবি প্রথমে বসে বসেই বললেন, এই যে পঙ্‌ক্তিটা, 'এসেছ পাষাণী, দয়া হয়েছে কি মনে ? এটাকে তুমি বললে এই ভাবে :

> এসেছ পাষাণী ?
> দয়া হয়েছে কি মনে ?

এটা বরং এভাবে যদি বলা যায়,

> এসেছ পাষাণী !
> দয়া—
> হয়েছে কি মনে ?

অর্থাৎ দয়া শব্দটির পর সামান্য টান দিয়ে পরবর্তী ছ'মাত্রায় চলে গেলে ছন্দটা ঠিক বজায় থাকে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি নয়নমণিকে বললেন, রানি সুমিত্রা, তুমি আমার সঙ্গে সংলাপ বলো, এইখান থেকে :

> আরামে রয়েছে তারা,
> যুদ্ধ ছাড়া কভু
> নড়িবে না একপদ

নয়নমণি সঙ্গে সঙ্গে বলল, তবে যুদ্ধ করো।

রবি বললেন, যুদ্ধ করো! হায় নারী, তুমি কি রমণী!

ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা—
ধর্মাধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ—
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল ...

একটু আগে নয়নমণির যে ইচ্ছেটা হয়েছিল, তা আংশিকভাবে সার্থক হল। সত্যিকারের অভিনয় না হলেও রিহার্সাল তো দেওয়া হল রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে। কী সুন্দর ভরাট, উচ্চগ্রাম এঁর কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রবাবু একবার তাঁর কাঁধে হাত ছোঁয়াতেই শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। যেন সর্বশ্রেষ্ঠ এক পুরুষের স্পর্শ।

রবি নয়নমণিকে বললেন, তোমার বেশ ভাল হচ্ছে। উচ্চারণে কোনও ত্রুটি নেই।

নয়নমণি নিচু হয়ে রবির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

রবি তাকে ধরে তুলে, থুতনিতে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, তোমাকে তখন থেকে দেখছি, আর খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

নয়নমণি মাথা নাড়ল। এমন একজন মানুষের সঙ্গে আগে দেখা হলে তার মনে থাকবে না, এমন কখনও হতে পারে!

রবি বললেন, মনে হচ্ছে, খুব মনে হচ্ছে। এরকম অভিনয়ের ব্যাপারেই, কোথায়, কোথায়? ওঃ হো, মনে পড়েছে, কটকে! তুমি কটকে কখনও আমার একটি নাটকে অভিনয় করেছিলে?

নয়নমণি আবার মাথা নাড়ল দু'দিকে।

রবি বললেন, তা হলে তুমি নও। কটকে কয়েকটি ছেলেমেয়ে মিলে আমার 'বাল্মীকি-প্রতিভা' শখের অভিনয় করেছিল। সেখানে একটি বেশ গুণী মেয়ে ছিল, তার নাম মহিলামণি। তার সঙ্গে তোমার মুখের গড়নের খুব মিল আছে। বিশেষত একপাশ থেকে দেখলে। সেই মেয়েটি কি তোমার বোন-টোন কিছু হয়? কটকে তোমার আত্মীয়-স্বজন থাকে?

নয়নমণি বলল, না, কটকে আমার আত্মীয়-স্বজন থাকে না যতদূর জানি।

তারপর মুখ নিচু করে মৃদু গলায় বলল, আমার কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই।

৩২

স্বামী বিবেকানন্দ যখন লন্ডনের বিভিন্ন বক্তৃতাসভায় বেদান্তের বাণী শুনিয়ে অনেক শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের আকৃষ্ট করেছিলেন, সেই সময় আরও একজন বঙ্গসন্তান ইংল্যান্ডে কিছু নির্বাচিত এবং বিশিষ্ট শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের চমৎকৃত করেছিলেন। ইনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার সেই অধ্যাপক, জগদীশচন্দ্র বসু। দু'জনের কেউ কারুকে চেনেন না।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহেব অধ্যাপকদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে নিজের স্থান করে নিলেও আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগেননি জগদীশ। বেশির ভাগ অধ্যাপকই কোনওক্রমে একসময় বিভাগীয় প্রধান হওয়াটাকেই জীবনের পরমার্থ জ্ঞান করেন, তার বেশি আর কী চাইবার আছে! কিন্তু জগদীশ অন্য ধাতুতে গড়া। বিজ্ঞানের অজানা রহস্য তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি শুধু অধ্যাপক নন, গবেষক। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর গবেষণার কথা কেউ জানতই না।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কোনও গবেষণাগার নেই, বাথরুমের মতন একটি অব্যবহার্য ছোট্ট ঘর নানারকম হাবিজাবি জিনিসপত্র ও মাকড়সার জালে ভরা ছিল, সেই ঘরখানা নিজে সাফসুতরো করে জগদীশচন্দ্র নিজের কাজে ব্যবহার করতে লাগলেন। সেখানে টিনের পাত আর দড়িদড়া দিয়ে তৈরি খেলনার মতন যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি ছুটির পরেও বসে কী সব খুটখাট করেন, তা নিয়ে অনেক দিন কেউ মাথা ঘামায়নি।

ইউরোপের নানা দেশে আলোর তরঙ্গ, অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে কত রকম কাজ হচ্ছে, সে সব দেশের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিকদের নানাভাবে সাহায্য করে। জগদীশচন্দ্র পরাধীন দেশের মানুষ, সরকার তাঁর প্রতি বিমুখ, সাহেব সহকর্মীরা অবহেলার চক্ষে দেখে, অনেকেই মনে করে ভারতীয় হয়েও যে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের চাকরি পেয়েছে, এই তো ঢের! কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু ভারতীয়দের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?

স্থানীয় একজন ঝালাই মিস্তিরিকে দিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্র তৈরি করিয়ে নিয়ে জগদীশচন্দ্র নিভৃতে বিজ্ঞানচর্চা করেছেন বছরের পর বছর।

কলেজে যা মাইনে পান তার বেশির ভাগই খরচ হয় বই কেনায় আর গবেষণার জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করায়। একটা সুবিধে আছে, তাঁর স্ত্রী অবলা শাড়ি-গয়না বা সংসারের ছোটখাটো অভাব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিলেন বলে অবলারও বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মন আছে, তিনি নিছক গৃহিণী নন। জগদীশচন্দ্র স্ত্রীর সঙ্গে নিজের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

আলো জিনিসটা কী? কবি ও দার্শনিকরা আলো বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। বিজ্ঞান জানতে চায় উৎস ও কার্যকারণ। এই সবেমাত্র কিছুদিন হল বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির যৌথ কম্পনেই আলোর সৃষ্টি হয়। কিন্তু শুধু তত্ত্বটি বুঝলে তো চলবে না, হাতেকলমে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। প্রখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎজ এক যন্ত্র তৈরি করে দেখালেন একদিকে উৎপন্ন হচ্ছে অদৃশ্য আলো, আর দূরে রাখা একটি যন্ত্রে ধরা পড়ছে সেই অদৃশ্য আলোর ঢেউ।

হার্ৎজের এই আবিষ্কার নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের সাড়া পড়ে গেছে। এই আলোর তরঙ্গই বেতার তরঙ্গ হতে পারে কি না তাই নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ইতালির মার্কনি ও লম্পা, রাশিয়ায় পপভ, ফ্রান্সের ব্রাঁলি এবং ইংল্যান্ডের স্যার অলিভার লজের মতন বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা।

জগদীশচন্দ্র হার্ৎজের রচনাবলি কিনেছেন, বারবার পাঠ করেন, তাঁর ইচ্ছে হয় ওই বিষয়টা নিয়ে কাজ করার। কিন্তু হতভাগ্য এই দেশের এক নগণ্য বৈজ্ঞানিক তিনি, কে তাঁকে সাহায্য করবে? তবু তিনি গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একটা সুবিধে হল এই যে এর মধ্যে একসময় প্রফুল্লচন্দ্র রায় নামে আর একটি যুবক তাঁর সহকর্মী হয়েছেন। অত্যন্ত কৃতী ও মেধাবী ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র ইংল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এসসি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে, প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ পেয়েছেন, এঁরা দুজনে আগে থেকেই বন্ধু। প্রফুল্লচন্দ্র বিবাহ করেননি, করবেনও না ঠিক করে ফেলেছেন, তিনি শুধু বিজ্ঞানী নন, দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য কাতরতা তাঁর কথাবার্তার মধ্যে সব সময় ফুটে ওঠে। তিনি জগদীশচন্দ্রের কাজে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন।

বছর দু-এক আগে জগদীশচন্দ্র একদিন কলেজের লেবরেটরিতে কয়েকজন সহকর্মীকে ডেকে একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখালেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে রাখা হল একটি প্রেরক যন্ত্র। আর আলেকজান্ডার পেডলার নামে আর একজন অধ্যাপকের ঘরে রাখা হল গ্রাহক যন্ত্র। দুটো ঘরের মধ্যে ব্যবধান ৭০ ফুট এবং মাঝখানে রয়েছে মোটামোটা দেওয়াল। প্রেরক যন্ত্র থেকে অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গ গিয়ে অন্য ঘরের গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে একটি পিস্তলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল।

ব্যাপারটি কী হল, ম্যাজিক নাকি? বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারগুলিকে প্রথমে ম্যাজিকের মতনই মনে হয়। বেতার তরঙ্গ চোখে দেখা যায় না। বিদ্যুৎ রশ্মিতে যে বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে তা কিছু দূরের যান্ত্রিক কলকব্জাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাড়াচাড়া করে দিতে পারছে। বিজ্ঞানের এ এক নতুন

দিগন্ত। এইভাবে বেতার তরঙ্গে দূরদূরান্তে খবরাখবর পাঠানোও তো যেতে পারে।

টাউন হলে আর একটি বড় আকারের সভার আয়োজন করে জগদীশচন্দ্র আবার দেখালেন তাঁর গবেষণার ফল। এখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন স্বয়ং ছোটলাট স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি। বিশাল তাঁর বপু। সেই ছোটলাটকেই জগদীশচন্দ্র দাঁড় করালেন তাঁর দুই যন্ত্রের মাঝখানে। জগদীশচন্দ্র দেখালেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছোটলাট মহোদয়ের অত বড় চেহারা ভেদ করে, আরও তিনটি বন্ধ ঘর পেরিয়ে গ্রাহক যন্ত্রের মারফত বারুদের স্তূপ উড়িয়ে দিয়ে একটা লোহার গোলা ছুটিয়ে দিল।

সকলেই স্তম্ভিত এবং অভিভূত। জগদীশচন্দ্র ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, এর মধ্যে অলৌকিক বা ভোজবাজি কিছু নেই, এটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এতখানি অগ্রগতি সম্পর্কে ভারতের আর কেউ তখনও অবগত নন, জগদীশচন্দ্র কলকাতায় বসে একা একা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই আবিষ্কার করলেন কী করে?

লেফটেনান্ট গভর্নর ম্যাকেঞ্জি জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে সব খোঁজখবর নিলেন এবং সরকারি তরফে কিছু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে জগদীশচন্দ্রকে আহ্বান জানানো হল এই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য। সেই প্রবন্ধ ছাপা হল সোসাইটির পত্রিকায়।

বিলেতে জগদীশচন্দ্রের মাস্টারমশাই ছিলেন লর্ড র‍্যালে। তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্র যোগাযোগ রেখেছিলেন, এই সময় তাঁর কাছে দুটি গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দিলেন। প্রিয় ছাত্রটির উদ্ভাবনী শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই গবেষণাপত্র ছাপার ব্যবস্থা করে দিলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানের পত্রিকা 'দ্যা ইলেকট্রিশিয়ানে' ছাপাও হয়ে গেল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ক্ষুদ্র গবেষণাগারে যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, তার বিবরণ দিয়ে একটি পুস্তিকা ছাপালেন। সেটি পাঠিয়ে দিলেন বিখ্যাত পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনের কাছে। লর্ড কেলভিন সেগুলি পড়ে চমৎকৃত। বিদ্যুৎ রশ্মির যে তরঙ্গ, তার দৈর্ঘ্য নানা মাপের হয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়ে অনেক বিজ্ঞানীই কাজ করছেন, জগদীশচন্দ্র একটা গবেষণাপত্র লিখলেন ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নির্ণয়কৌশল নিয়ে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সেই গবেষণাপত্রের জন্য জগদীশচন্দ্রকে ডি এসসি ডিগ্রি দেবার কথা ঘোষণা করলেন। একজন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে এ রকম ডিগ্রি দেওয়ার দৃষ্টান্ত নেই।

জগদীশচন্দ্র এই সময় অনুভব করেছিলেন, এই সব বিষয়ে ইউরোপে অন্য বৈজ্ঞানিকরা কে কী কাজ করছেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল হয়। এ জন্য তাঁর একবার বিদেশে যাওয়ার দরকার। একটা যোগাযোগও ঘটে গেল। তাঁর মাস্টারমশাই লর্ড র‍্যালে ভারতে এলেন এই সময়ে। সত্যি সত্যি জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের এক বাথরুমে বসে এইসব কঠিন পরীক্ষা চালাচ্ছেন কি না তা চাক্ষুষ করার জন্য তিনি কলেজে চলে এলেন একদিন। দেশি মিস্তিরিদের দিয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বানিয়ে একেবারে নতুন ধরনের পরীক্ষা চালাচ্ছেন এই মানুষটি, এ কী সত্যি ম্যাজিশিয়ান! বিনা পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব?

লর্ড র‍্যালে বললেন, তুমি এক্ষুনি ইংল্যান্ডে চলে এসো, তোমার এই পদ্ধতিগুলির কথা সবাইকে জানাও!

দলাদলি থাকবে না, পারস্পরিক ঈর্ষা থাকবে না। এমন আবার কলেজ হয় নাকি?

লর্ড র‍্যালে চলে যাবার পর বিকেলবেলাতেই কলেজের অধ্যক্ষ জগদীশচন্দ্রের কাছে জবাবদিহি চাইলেন, লর্ড র‍্যালেকে আপনি কলেজের লেবরেটরি দেখিয়েছেন। কোন অধিকারে, কার অনুমতিতে আপনি একজন বাইরের লোককে এখানে ঢুকতে দিলেন?

ডি এসসি ডিগ্রি পাবার পর থেকেই অন্যান্য অধ্যাপকদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস হচ্ছিল যে জগদীশ বোস মন দিয়ে ছাত্রদের পড়ায় না, সরকারের কাছ থেকে অধ্যাপনার জন্য মাইনে নিয়ে সে নিজের কাজ করে।

জগদীশচন্দ্র কোনও অভিযোগেরই উত্তর দিলেন না, তিনি বিলেত যাবার জন্য লম্বা ছুটির দরখাস্ত

করলেন। কিন্তু ছুটি চাইলেও সহজে পাওয়া যায় না, নানা অজুহাতে তাঁকে আটকে দেবার চেষ্টা হল। কিন্তু লর্ড র‍্যালে নিজে ভারত সচিবকে জগদীশচন্দ্রকে ইংল্যান্ডে পাঠাবার জন্য সুপারিশ করেছেন, ইংল্যান্ডের অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক তাঁর সম্পর্কে উৎসাহী। এমনকী রয়াল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের কাজকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলার গভর্নর ম্যাকেঞ্জিও এঁর প্রতি সহানুভূতিশীল, সুতরাং বিরোধীরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারল না। জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা বিভাগ বৈজ্ঞানিক হিসেবে ডেপুটেশানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল।

নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিগুলি নিয়ে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক সমুদ্র পাড়ি দিলেন।

ভারতে যে ধর্ম ও দর্শনের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, সে সম্পর্কে ইংল্যান্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায় অবহিত। সংস্কৃত সাহিত্যের লুপ্ত ভাণ্ডার পুনরুদ্ধার করার পর ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। এই সমস্যাসঙ্কুল দরিদ্র দেশে রামায়ণ-মহাভারতের মতন মহান গ্রন্থ রচিত হয়েছে কতকাল আগে। ইলিয়াড-ওডিসির তুলনায় এই দুটি গ্রন্থ অনেক বেশি কাব্যময় ও গভীর মূল্যবোধসম্পন্ন। উপনিষদ ও গীতার মতন সূক্ষ্ম দর্শন ও জীবনবোধের কথা আর কোন দেশে পাওয়া যায়? কালিদাসের মতন কবি জন্মেছে এ দেশে। কিন্তু বিজ্ঞান? ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কোনও ইতিহাস নেই। প্রাচীন কালে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় কিছু কিছু কাজ হয়েছিল। কিন্তু ধারাবাহিকতা নেই। বিজ্ঞানে কোনও কিছুই চূড়ান্ত নয়, একটি আবিষ্কার বা একটি নতুন তত্ত্ব, পরবর্তী অনেকগুলি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। ভারতে পর পর বিদেশি আক্রমণে সমাজজীবন পর্যুদস্ত, তা ছাড়া ছোট ছোট রাজ্যগুলি অন্তঃকলহে লিপ্ত থেকেছে যুগ যুগ ধরে। এ রকম অশান্তির পরিবেশে একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধনা হয় না।

পশ্চিমি জগৎ ধরেই নিয়েছে যে আধুনিক বিজ্ঞানে, বিশেষত পদার্থ ও রসায়নে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি হচ্ছে এই উনবিংশ শতাব্দীতে, তাতে প্রাচ্য দেশগুলির কোনও ভূমিকাই নেই। এ সব বুঝতে ওদের আরও কটা শতাব্দী লাগবে কে জানে! স্বামী বিবেকানন্দও অনেক জায়গায় বলেছেন, ওদের কাছ থেকে আমরা নেব বিজ্ঞানের সুফল, বিনিময়ে আমরা ওদের দেব ধর্ম ও দর্শন।

কিন্তু জগদীশচন্দ্র লন্ডনে এসে তাঁর যন্ত্রপাতির মাধ্যমে হাতেকলমে পরীক্ষায় বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর গবেষণার কাজ পৃথিবীর প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের সমতুল্য। হার্ৎজের অনুগামীরা অনেকেই বেতার তরঙ্গ নিয়ে কাজ করছেন। বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে দূর থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে কোনও যন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয় করার পরীক্ষায় পথিকৃতের সম্মান জগদীশচন্দ্রের প্রাপ্য। জগদীশচন্দ্র অবশ্য পেটেন্ট নেবার কথা চিন্তা করেননি। ইতালিয়ান বৈজ্ঞানিক মার্কনি নিজের যন্ত্রের পেটেন্ট-এর জন্য নকশা জমা দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র ও মার্কনির কাজের অবশ্য কিছুটা তফাত আছে, জগদীশচন্দ্র কাজ করছেন মাইক্রো ওয়েভে, আর মার্কনি শর্ট ওয়েভে। শর্ট ওয়েভে বেতার সংকেতের দূরত্ব অনেক বেশি।

লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতার সময় বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে বসে ছিলেন বৃদ্ধ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় লর্ড কেলভিন। বক্তৃতা শেষ হবার পর সবাই যখন জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, তখন লর্ড কেলভিন হাঁটুর ব্যথা নিয়েও কষ্ট করে উঠে এলেন দোতলায়। সেখানে মহিলাদের আসনের কাছে গিয়ে অবলাকে বললেন, মহাশয়া, আপনি আপনার স্বামীর জন্য গর্ব বোধ করতে পারেন। তিনি একজন সার্থক বিজ্ঞানী।

ইংল্যান্ডের পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে লন্ডন টাইমস ও স্পেকটেটর বরাবরই ভারতবিদ্বেষী। নানান ছুতোয় এরা ভারত সম্পর্কে কুৎসা ছড়ায়। এ সব লিখে এরা প্রমাণ করতে চায় যে অকর্মণ্য, অলস, মূর্খ ভারতীয়দের ইংরেজ-শাসন ছাড়া গতি নেই, শাসক ইংরেজরাই তাদের রক্ষাকর্তা, তারাই ভারতে নিয়ম-শৃঙ্খলার রাজত্ব স্থাপন করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকে অমান্য করার উপায় নেই। লন্ডন টাইমস লিখতে বাধ্য হল, 'এ বছর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিষয়ে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা।...এই বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ রশ্মির সমবর্তন সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন তার প্রতি ইওরোপের বিজ্ঞানী মহলে আগ্রহ জন্মেছে।'

সবচেয়ে বেশি সম্মানের আহ্বান এল রয়াল সোসাইটি থেকে। রয়াল ইনস্টিটিউটে মাঝে মাঝে শুক্র-সন্ধ্যা হয়। কোনও কোনও মাসের শুক্রবারের সন্ধেবেলা পৃথিবীর অগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিকদের কোনও একজনকে ডাকা হয় বক্তৃতা দেবার জন্য। এখানে ডাক পাওয়াই একটি খুব বড় খেতাব পাওয়ার সমান।

এখানে সভারম্ভে বক্তার পরিচয় দেবার কোনও রীতি নেই। কারণ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছাড়া কেউ সুযোগই পাবেন না, আর যাঁরা এর কাজ সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাঁরা শ্রোতা হিসেবেও আমন্ত্রণও পাবেন না। ঠিক রাত নটা থেকে দশটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা বক্তৃতা। যেখানে স্যার হামফ্রে ডেভি বা মাইকেল ফ্যারাডের মতন বিজ্ঞানীরা বক্তৃতা দিয়ে গেছেন, সেখানে বক্তৃতা দিতে উঠলেন এই প্রথম এক ভারতীয়। সভাপতির পাশে বসে অবলার বুক গর্বে ভরে গেল। তিনি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর স্বামীর হাতে রয়েছে ভারতের জয়-পতাকা। অবলার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ। পরাধীনতার জ্বালা সব সময় মনের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলে, এই সব মুহূর্তে তা মুছে যায়। তিনি ভাবলেন, এমনও কি দিন আসবে, যখন কলকাতায় এই রয়াল ইনস্টিটিউটের মতন কোনও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান হবে, সেখানে আমরা এইরকম ভাবে বিদেশি বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানাতে পারব?

বক্তৃতা শেষে অন্যদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে গলা মিলিয়ে লর্ড র‍্যালে বললেন, এমন নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আগে দেখিনি। জগদীশ, তুমি দু-একটা ছোটখাটো ভুল করলে তবু মনে হত জিনিসটা বাস্তব। এ যেন মায়াজাল!

স্পেক্টেটর পত্রিকা এই বক্তৃতার বিবরণ দিয়ে লিখল, 'একজন খাঁটি বাঙালি, লন্ডনে উপস্থিত হয়েছে, বাঘা বাঘা ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অতি দুরূহ বিষয়ে সাবলীলভাবে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে, এ দৃশ্য যেন বিশ্বাস করা যায় না!'

রয়াল ইনস্টিটিউশনের বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত খ্যাতি ও সাফল্যই বড় কথা নয়। উপস্থিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা বললেন, ভারতে বিজ্ঞানচর্চার আরও প্রসার হওয়া উচিত। প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের অধীনে একটি আধুনিক লেবরেটরি তৈরি করে দেওয়া ভারত সরকারের কর্তব্য। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে চিঠি দিলেন ভারত সচিবকে, অনুকূল সাড়াও পাওয়া গেল, চিঠি চালাচালি চলতে লাগল।

এর পর ফ্রান্স ও জার্মানিতে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে এই বসু পরিবার দেশে ফিরলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় ফেরার দু মাস পরে।

স্বামী বিবেকানন্দকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনে। দেশবাসী তাঁর পাশ্চাত্য-বিজয় কাহিনী আগে থেকেই জেনে উৎসাহিত। সেই তুলনায় জগদীশচন্দ্রের কথা বিশেষ কেউ জানে না। তিনি কী নিয়ে গবেষণা করছেন, তা কজনই বা বোঝে! বিলেতের পত্র-পত্রিকায় কারুর প্রশংসা বেরুলে এ দেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিকই। এখানকার কিছু কিছু কাগজেও জগদীশচন্দ্র বিষয়ে সংবাদ ছাপা হয়েছে, বিশেষ কেউ গুরুত্ব দেয়নি। জাহাজে বোম্বাই পর্যন্ত এসে জগদীশচন্দ্র ও অবলা ট্রেনে এসে পৌঁছলেন হাওড়া স্টেশনে। গুটিকয়েক আত্মীয় ছাড়া আর কেউ আসেনি। ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসু নিজে আসতে পারেননি, একজনকে পাঠিয়েছেন ওঁদের নিয়ে যাবার জন্য, ওঁরা প্রথমে তাঁর বাড়িতেই উঠবেন।

মালপত্র দেখেশুনে যখন কুলির মাথায় চাপানো হচ্ছে, তখন পেছন থেকে একজন একটা চাপড় মারলেন জগদীশচন্দ্রের পিঠে।

চমকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন সহাস্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে। এই এপ্রিল মাসের গরমেও থ্রি পিস সুট পরা, বয়েসের ছাপ পড়েছে মুখে, তবু আনন্দে-উৎসাহে চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে।

জগদীশচন্দ্র বিস্মিতভাবে বললেন, এ কী স্যার, আপনি এসেছেন? খবর পেলেন কী করে?

মহেন্দ্রলাল বললেন, তুমি এত বড় একটা কীর্তি করে আসছ, আর আমি খবর পাব না? ট্রেন

চল্লিশ মিনিট লেট! টুপিওয়ালা লালমুখোরা বুঝেছে যে এ দেশের মানুষেরও সায়েন্সের ব্রেন আছে, শুধু কেত্তন গায় আর মা মা করে না। কী হে সুলেমান, মালাটালাগুলো বার করো!

মহেন্দ্রলালের সঙ্গে বিজ্ঞান পরিষদের চার-পাঁচজন সদস্যও এসেছেন। তাঁরা কয়েকটি মালা পরিয়ে দিলেন জগদীশচন্দ্রের গলায়, বয়ঃকনিষ্ঠরা প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

মহেন্দ্রলাল ফিরে তাকালেন অবলার দিকে। কুচি দিয়ে শাড়ি পরা, কাঁধের কাছে ব্রোচ লাগানো, মাথায় আধ-ঘোমটা, অবলা স্মিতমুখে চেয়ে আছেন পিতৃবন্ধুর দিকে। মহেন্দ্রলাল মালার বদলে একটি ডাঁটাসুদ্ধ গোলাপ ফুল তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কেমন আছিস মা? তুই ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলি বলে তোকে আমি একদিন রাম বকুনি দিয়েছিলুম, মনে আছে?

অবলা বললেন, শুধু বকুনি, প্রায় মারতে গিয়েছিলেন!

মহেন্দ্রলাল বললেন, স্বীকার করছি আমার গুখুরি হয়েছিল। ডাক্তারনী হলে কি আর এমন স্বামী পেতিস! ওরে, তুই সব সময় জগদীশের পেছনে লেগে থাকবি, ওকে থামতে দিবি না। এই তো সবে শুরু, জগদীশ আমাদের নিউটন, গ্যালিলিও হবে। বিলিতি কাগজে জগদীশ সম্পর্কে লেখা পড়েছি আর গর্বে আমার বুক ভরে গেছে। জার্মানিতে এক্স-রে আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জগদীশ নিজের চেষ্টায় এক্স-রে যন্ত্র বানিয়ে ফেলেছিল। আমার রুগিদের হাড়গোড় ভাঙার ছবি তুলে দিয়েছে, তখন থেকেই বুঝেছি এ ছোকরার মাথায় অনেক কিছু আছে।

জগদীশচন্দ্র বললেন, স্যার, ও দেশে আমার কী সুখ্যাতি হয়েছে না হয়েছে, তার চেয়েও একটা বড় খবর আছে। সেটা শুনলে আপনি সত্যিকারের খুশি হবেন।

মহেন্দ্রলাল আগ্রহের সঙ্গে বললেন, তাই নাকি, কী খবর, শুনি শুনি!

জগদীশচন্দ্র বললেন, লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলভিন ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন কলকাতায় একটি অত্যাধুনিক লেবরেটরি গড়ে দিতে হবে। ভারত সরকার রাজি হয়েছে, এর জন্য চল্লিশ হাজার পাউন্ড বরাদ্দ হয়েছে!

মহেন্দ্রলাল চক্ষু ছানাবড়া করে বললেন, চল্লিশ হাজার পাউন্ড, বলো কী হে!

জগদীশচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গেছে। নতুন বাড়ি হবে, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আসবে, আমরা যা চাইব তাই-ই পাব।

মহেন্দ্রলাল বুকে হাত দিয়ে একটি আরামের নিশ্বাস ফেলে বললেন, ব্যাটাদের সুমতি হয়েছে তা হলে? এ দেশের ইংরেজরা তো শুধু শোষণ করতেই জানে। অত বড় লেবরেটরি তৈরি হলে আরও কত ছেলেমেয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারবে, আমাদের দেশেও এডিসন, ডেভি'র মতন বিজ্ঞানী তৈরি হবে। বড় আনন্দ হচ্ছে গো, বড় আনন্দ হচ্ছে!

তারপর বললেন, কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে নাও। একদিন আমাদের ইনস্টিটিউটে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে সব বোঝাবে। আমাকে এক্ষুনি রুগি দেখতে দৌড়তে হবে।

দু'-চারদিনের মধ্যে কয়েকটি সভা-সমিতিতে ডাক পড়ল জগদীশচন্দ্রের, তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ শুরু হয়ে গেল। তাও খুব বড় মাত্রায় নয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও জগদীশচন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হল। বলেন্দ্র রবিকে বলল, রবিকা, রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দকে যদি নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয় এত বড় করে, তা হলে জগদীশ বোসকেই বা দেওয়া হবে না কেন? ইউরোপে উনিও প্রবল সাড়া ফেলে দিয়েছেন, এ দেশের সম্মান বাড়িয়েছেন।

রবি বললেন, তা তো ঠিকই।

দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার উহ্য রয়ে গেল। বিবেকানন্দকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য আসলে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদেরই পুনরুত্থান, ব্রাহ্মদের তা ভাল লাগার কথা নয়। প্রতাপ মজুমদারের দল বিবেকানন্দের কৃতিত্বকে হেয় করে দেখাবার চেষ্টা করেছে। ঠাকুরবাড়ি পরিচালিত আদি ব্রাহ্ম সমাজ অবশ্য তাতে গলা মেলায়নি, তাঁরা প্রকাশ্যে কখনও কারুর নামে কটু কাটব্য করেন না, সব সময় শিষ্টতা বজায় রাখেন, তবু তাঁরা বিবেকানন্দ সম্পর্কে শীতল মনোভাব অবলম্বন করে

আছেন।

কিন্তু জগদীশচন্দ্র ব্রাহ্ম, তাঁদের নিজেদের লোক। জগদীশচন্দ্রের সংবর্ধনার জন্য ব্রাহ্মদেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

রবি জগদীশচন্দ্রকে চেনেন, তেমন ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটেনি। বিজ্ঞানী হিসেবে হঠাৎ এত খ্যাতি অর্জনের আগেও জগদীশচন্দ্রের ফটোগ্রাফি, ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতির শখ ছিল। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও তিনি সাহিত্যের অনুরাগী, সাধনা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তা রবি জানেন। রবির কবিতার কিছু কিছু পঙক্তি তিনি মুখস্থ বলতে পারেন, কিছুকাল আগে তিনি রবিকে একবার প্রেসিডেন্সি কলেজে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে তাঁর কণ্ঠে ব্রহ্ম সঙ্গীত রেকর্ড করিয়েছিলেন। তখন সামান্য আলাপ হয়েছিল।

কবি হলেও রবি সব সময় ভাবের জগতে তো থাকেন না, অন্যান্য নানা বিষয়ের মতন বিজ্ঞানেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ আছে। বিজ্ঞানও এক অলীক রহস্যময় জগতের সন্ধান দেয়। সময় পেলেই তিনি বিজ্ঞানের বই পড়েন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বলেন্দ্রকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন রবি। ধর্মতলায় আনন্দমোহন বসুর বাড়ি তাঁর চেনা, অযাচিতভাবে সেখানে যেতে তাঁর লজ্জা নেই। ব্যস্ত ব্যারিস্টার হয়েও আনন্দমোহন বহু রকম সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত, কংগ্রেসের কাজ, সিটি স্কুল ও কলেজ, বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় এই সব দেখাশুনোর জন্য অনেক সময় ব্যয় করেন, তা ছাড়া আছে দানধ্যান। বাড়িতে অনেক আশ্রিত।

জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বাড়িতে নেই, কাছাকাছি একটি সভায় যোগ দিতে গেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরার কথা। এ বাড়ির অনেকেই রবিকে চেনে, তাঁদের খাতির করে বসানো হল। কিন্তু রবি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন না, তাঁর আর এক জায়গায় যাবার কথা আছে।

রবি সঙ্গে করে দুর্লভ ম্যাগনোলিয়া ফুলের একটি গুচ্ছ এনেছিলেন। টেবিলের ওপর সেই ফুল রেখে তিনি একটা চিরকুট লিখতে গেলেন। প্রথমে ভাবলেন লিখবেন, এক দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞানীর প্রতি বঙ্গের এক কবির শ্রদ্ধা নিবেদন। কিন্তু কলম হাতে নিতেই তাঁর মাথায় এসে গেল কবিতা। তিনি লিখলেন :

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয় মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে...

৩৩

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরায় শুরু হয়ে গেল রাজনীতির খেলা। কুচক্রী ও সুযোগসন্ধানীরা ঘোঁট পাকাতে লাগল সিংহাসনের অধিকার নিয়ে। অশান্তির আগুন জ্বললে সেই আগুনে অনেকে নিজেদের মাংস-রুটি বানায়।

যুবরাজ হিসেবে রাধাকিশোরেরই সিংহাসন প্রাপ্য। কিন্তু কুমার সমরেন্দ্রনাথ তাঁর দাবি আবার তুললেন, তাঁর পক্ষেও অনুচর-শলাকার কম নেই। বহুদিন পর আবার মহারানি ভানুমতীর নামে

জয়ধ্বনি দেওয়া হতে লাগল, স্বর্গীয় মহারাজের পাটরানির সন্তানই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী, এই নিয়ে শোরগোল তোলা হল। মহারাজ বীরচন্দ্রও মৃত্যুর আগে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে স্পষ্ট ব্যবস্থা করে যাননি, হঠাৎ এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, সে চিন্তাও তিনি করেননি। রাধাকিশোর নামে যুবরাজ ছিলেন বটে, কিন্তু সমরেন্দ্রনাথের প্রতি মহারাজ যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন, পাত্রমিত্রদের বুঝিয়ে দিতেন যে ভানুমতীর গর্ভের সন্তানই তাঁর প্রিয় সন্তান। কলকাতার সফরে অধিকাংশ সময় তিনি সমরেন্দ্রনাথকেই সঙ্গে আনতেন। এখন সমরেন্দ্রনাথের সমর্থকরা বলতে লাগল, রাধাকিশোরকে এক সময় যুবরাজ করা হয়েছিল, তাতে কী হয়েছে ? তা কি বদলানো যায় না ? পরলোকগত মহারাজ সমরেন্দ্রনাথকেই বেশি পছন্দ করতেন, তিনি ওঁকেই সিংহাসনে বসাতেন।

একালের রাজকুমাররা তলোয়ার হাতে নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতার প্রশ্ন মিটিয়ে ফেলে না। তারা মামলা-মোকদ্দমায় যায়, দল ভাঙাভাঙির খেলায় মেতে থাকে, অর্থ ব্যয় হয় জলের মতন, রাজ্যে চলতে থাকে অরাজকতা, ভারতের এই সব দেশীয় রাজ্যরূপী মেষশাবকগুলিকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হয়ে আছে ব্রিটিশ সিংহ।

যুবরাজ রাধাকিশোর তাঁর পিতার মতন জবরদস্ত পুরুষ নন। তাঁর পিতার চরিত্রে ছিল অনেক বৈপরীত্য, তিনি ছিলেন এক দিকে কবি ও শিল্পী, অন্য দিকে চতুর রাজনীতিবিদ, ভোগী কিন্তু অসংযমী নন, সাধারণ মানুষের প্রতি উদার, আবার নিজের অধিকার রক্ষার জন্য নিষ্ঠুর স্বার্থপর। সেই তুলনায় রাধাকিশোর সরল ও এক-রঙা মানুষ। তিনি বুদ্ধিমান কিন্তু তাঁর জাগতিক জ্ঞান কম।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয়েছে কলকাতায়, সেই খবর পেয়েই রাধাকিশোর ত্রিপুরার সিংহাসনের দখল নিয়েছেন। এদিকে সমরেন্দ্রনাথও পিতার শেষকৃত্যের পর সদলবলে ধেয়ে এসেছেন, তাঁদের ধাক্কায় সিংহাসন টলটলায়মান।

রাধাকিশোরের কোনও বন্ধু নেই। তাঁর বাবা কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করাননি, ত্রিপুরাতেই কিছু কিছু রাজকার্য নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত। এই সংকটের সময় তিনি বুঝলেন যে কলকাতার সাহায্য ছাড়া ত্রিপুরায় টেঁকা যাবে না। হাই কোর্ট কলকাতায়, ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী কলকাতায় সব রকম ক্ষমতার কলকাঠি নড়ে। কলকাতায়, ত্রিপুরার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য ইংরিজি জানা ভাল লোক দরকার। রাধাকিশোর এই সময় শশিভূষণ মাস্টারের অভাব অনুভব করলেন, তাঁকে পেলে অনেক সুবিধে হত, কিন্তু তিনি কোথায় কে জানে ! রাধারমণ ঘোষকে তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না, তিনি পরম বৈষ্ণব অথচ দারুণ ধূর্ত, এই ধরনের লোকদের বোঝা শক্ত। রাধারমণ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কুমারের মধ্যে যে ঠিক কার পক্ষে, তা প্রকাশ করছেন না, ওঁকে বিদায় করে দেওয়াই ভাল।

কলকাতার গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা চিন্তা করে রাধাকিশোরের প্রথমেই মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে এক কবির কথা। এই কবি প্রায় তাঁরই সমবয়েসী, চল্লিশ হতে এখনও তিন চার বছর বাকি আছে। রাধাকিশোর রবীন্দ্রবাবুর কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন মহিমকে।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুতে রবি প্রায় আত্মীয়বিয়োগের মতনই আঘাত পেয়েছিলেন। মহারাজ কত পরিকল্পনা করেছিলেন, একটি সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন, বাংলা বই ছাপার উত্তম প্রেস স্থাপন, সব বন্ধ হয়ে গেল, এ রকম সাহিত্য অনুরাগী রাজা আর ক'জন হয় ! মহারাজের পুত্রদের তিনি চেনেন না, ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। ওখানে সিংহাসনের দাবিদাররা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, এ সংবাদ একটু একটু তাঁর কানে আসে, সংবাদপত্রেও দেখতে পান, কিন্তু এ ব্যাপারে রবি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন।

হঠাৎ একদিন রাধারমণ ঘোষ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উপস্থিত হলেন সকালবেলা। রবি লেখাপড়ার টেবিলে বসেছিলেন, খবর পেয়ে বৈঠকখানা ঘরে নেমে এলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্যের এই সচিবটির বৈষ্ণব সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান, এর সঙ্গে কথা কয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। গত বছর

কার্শিয়াঙে ইনি খুব খাতিরযত্ন করেছেন। ইনি কোনও প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই, রবি সাদর-সম্ভাষণের পর কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

রাধারমণ শীর্ণকায় মানুষ, ধুতির ওপর শুধু একটি উত্তরীয় গায়ে জড়ানো। হাত জোড় করে নমস্কারের পর বলে উঠলেন :

কলি ঘোর তিমিরে গরাসন জগজন
ধরম করম বহু দূর
অসাধনে চিন্তামণি বিহি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর...

রবিবাবু, দেশে চলে যাচ্ছি, কাল সন্ধেবেলা আপনার কথা বারবার মনে পড়ল। তাই একবার সাক্ষাৎ করতে এলাম, হয়তো আর দেখা হবে না।

রবি বললেন, বসুন, বসুন, ঘোষমশাই। ত্রিপুরা থেকে কবে এলেন, কবে ফিরছেন সেখানে ?

রাধারমণ বললেন, এসেছি পক্ষকাল আগে। আর ফিরছি না সেখানে। ত্রিপুরার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে গেছে।

রবি অবাক হয়ে বললেন, সে কী ? আপনাকে ছাড়া ওখানকার কাজকর্ম চলবে কী করে ?

রাধারমণ বললেন, চলবে না কেন, কোনও একজন মানুষের জন্য কোনও কাজই থেমে থাকে না। আপাতত অবশ্য সেখানে অরাজকতা ছাড়া আর কিছুই চলছে না। সিংহাসন সর্বক্ষণ টলমল করছে।

—আপনি কি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন ?

—আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করিনি, আবার ছাড়িয়েও দেয়নি, এমনিই চলে এলাম বলতে পারেন।

—কিন্তু ত্রিপুরার এই দুঃসময়ে আপনার চলে আসা কি উচিত হল ? আপনি অনেক কিছু সামলাতে পারেন।

—রবিবাবু, আমার কতটা ক্ষমতা ? আমি ত্রিপুরার মানুষ নই, বহিরাগত, তা নিয়ে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। মহারাজ বীরচন্দ্র ওই সব ছিদ্রান্বেষীদের আমল দিতেন না। এখন তিনি নেই, তারা আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। আমাকে বরখাস্ত করার আগেই মান-সম্মান নিয়ে চলে আসাটাই ঠিক নয় ?

—শেষ পর্যন্ত কে রাজা হচ্ছে ?

—আপাতত রাধাকিশোর রয়েছে, কতদিন থাকে তার ঠিক নেই। কথায় আছে না, বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা ! বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন বাঘ, আপনি তো ভাল করেই জানেন। এখন শিয়ালদের রাজত্ব চলবে। শিয়াল যদি রাজা হয়, তবে তার মন্ত্রী হবার মতন যোগ্যতা আমার নেই। মহারাজ ছিলেন স্বশিক্ষিত, কুমাররা শিক্ষার ধার ধারে না। কুমার সমরেন্দ্রনাথ তবু বাইরের লোকজনের সঙ্গে কিছু কিছু মেলামেশা করেছে, দৃষ্টির কিছুটা প্রসার হয়েছে, রাধাকিশোর তো যাকে বলে কূপমণ্ডূক। পড়াশুনোয় ক-অক্ষর গোমাংস। ইংরিজি কিছুই বোঝে না। বর্তমান কালে এই লোক রাজ্য চালাবে ? সামান্য ছুতোয় ইংরেজ সরকার মুকুট ছিনিয়ে নেবে।

—সেটা হবে খুবই দুঃখের কথা। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্ধন হচ্ছিল। এখানকার শিক্ষিত সমাজ হ্যাট-কোট পরে নকল সাহেব সাজতে ব্যস্ত, মুখে ইংরিজি বুলি, বাংলা ভাষায় কথা বলতেও তারা ঘৃণা বোধ করে। বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক আর কে আছে ? মাতৃভাষার প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে জাতীয়তাবোধ কখনও দৃঢ় হতে পারে ? কংগ্রেসের নেতারা ইংরিজি ভাষণের তুফান ছোটান, জনসাধারণের ক'জন তা বোঝে ! মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বাংলা ভাষা-প্রীতি দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

রাধারমণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আর সে সব আশা করবেন না। কুমারদের সংস্কৃতি বোধ নেই। ইতিমধ্যেই রাজকোষ শূন্য। সিংহাসনের দাবিদারদের আঁচড়া-আচড়ি, কামড়া-কামড়ি

দেখে তিতিবিরক্ত হয়ে প্রজারাই ইংরেজ শাসন চাইবে। যাক, আপনার আর সময় ব্যয় করতে চাই না। আপনার কথা খুব মনে পড়ছিল, ভেবেছিলাম রসশাস্ত্র বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপচারিতা হবে, তা নয়, যত সব স্থুল বিষয় এসে গেল। এবার আমি বিদায় হই। আর বোধ করি দেখা হবে না।

রবি জিজ্ঞেস করলেন, কেন দেখা হবে না। আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন ?

রাধারমণ বললেন, বাল্মীকির ভাষায় অভিশাপগ্রস্ত ব্যাধের মতন আমি এখন প্রতিষ্ঠাবিহীন। এখনকার বাজারের ভাষায় কর্মহীন। ত্রিপুরায় ফেরার আর প্রশ্ন নেই, কলকাতাতে থেকেই বা কী করব, আমার দেশের বাড়িতে গিয়ে চুপচাপ বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেব।

রবি বললেন, সে কী ! আপনার মতন মানুষ কর্মহীন থাকবেন কেন ? রাজস্ব বিষয়ে আপনার অগাধ জ্ঞান, যে-কোনও দেশীয় রাজ্য আপনাকে সাগ্রহে ডেকে নেবে। আপনার বয়েস এমন কিছু বেশি নয়, আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার অর্থনীতি অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত। মহীশূরের রাজা এরকমই একজন লোক খুঁজছেন শুনেছি।

রাধারমণ বললেন, অত দূরে, অন্য ভাষাভাষী রাজ্যে যাবার বাসনা আমার নেই।

রবি বললেন, বাংলাতেও অনেক বড় বড় জমিদার আছেন, কুচবিহারের রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা হয়েছে, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি—

বলতে বলতে রবি থেমে গেলেন। রাধারমণের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি কী নির্বোধ, এমন রত্ন কেউ হাতছাড়া করে ! আমাদেরই নিজস্ব জমিদারি তদারক করার জন্য একজন বিশেষ অভিজ্ঞ মানুষের প্রয়োজন। ঘোষমশাই, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে রাজি হন, আমরা কৃতার্থ হব। আমি তা হলে আজই বাবামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বলতে পারি।

রাধারমণ বললেন, আপনাদের মতন সুবিখ্যাত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া তো আমার পক্ষে ভাগ্যের কথা। আমাকে যদি আপনারা যোগ্য মনে করেন—

সেইদিনই কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথের অমত নেই। রবি অনেকখানি ভারমুক্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। জমিদারির কাজে তাঁকে এত জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যে নিজস্ব লেখাপড়ার সময় যাচ্ছে কমে। মাঝে মাঝে জমিদারি পরিদর্শনে যেতে তাঁর ভাল লাগে, কিন্তু কলকাতাতেও প্রতিদিন সেরেস্তায় হিসেব-নিকেশ বুঝে নিতে মেজাজ নষ্ট হয়। রাধারমণের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

দিন তিনেক বাদেই রাধারমণ আবার রবির দর্শনপ্রার্থী হলেন। মুখখানি পাণ্ডুর, চিন্তাক্লিষ্ট।

রবি লঘু কণ্ঠে বললেন, ঘোষমশাই, আগের দিন আপনি এসেই প্রথমে একটি পদ বলেছিলেন। আজ আপনাকে দেখে আমারও জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে :

আজি কেনে তোমা এমন দেখি
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি।
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা
না জানি অন্তরে কী ভেল বেথা ?

রাধারমণ এ রসিকতায় সাড়া দিলেন না। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, রবিবাবু, আমার ভুল হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন।

রবি সচকিত হয়ে বললেন, কী ব্যাপার ? কোনও গণ্ডগোল হয়েছে ?

সবেগে মস্তিষ্ক চালনা করে রাধারমণ বললেন, না, না, কিছু হয়নি, সেদিন ভাল করে চিন্তা না করেই সম্মত হয়েছিলাম। সেটাই আমার ভুল। আপনাদের এখানে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রবি বললেন, আপনার সঙ্গে কেউ অসদাচরণ করেছে ? কর্মচারীরা মাথার ওপর নতুন কারুকে দেখলে প্রথম প্রথম সহযোগিতা করতে চায় না, সে রকম কিছু হলে আমি অবশ্যই তার বিহিত করব।

রাধারমণ বললেন, সে সবই আমার জানা। তেমন কিছুই ঘটেনি। আমারই সিদ্ধান্তের ভুল।

আমি এতকাল মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অধীনে কাজ করেছি, রাজার মুখ্যসচিব ছিলাম আমি, এখন আমার পক্ষে আর অন্য কারুর অধীনে কাজ করা সম্ভব নয়।

রবি বললেন, আপনাকে আমরা ঠিক কর্মচারী হিসেবে দেখতে চাইনি তো। আপনি স্বাধীনভাবে—

রাধারমণ বললেন, আপনি আমার সঙ্গে যতই সদয় ব্যবহার করুন, তবু আপনাকে আমার মনিব হিসেবেই গণ্য করতে হবে। আপনি আমার প্রিয় কবি, আপনাকে আমার বন্ধু হিসেবেই পেতে চাই। মনিব কখনও বন্ধু হতে পারে না।

রবি চুপ করে গেলেন।

রাধারমণ বললেন, রবিবাবু, আমার অর্থের প্রয়োজন নেই। একা মানুষ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাকি জীবনটা ভিক্ষা কিংবা দাসত্ব না করেও চলে যাবে। ভাবছি একবার মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করে আসব। বিষয়চিন্তা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে যদি পরমার্থের চিন্তা করা যায়, তার চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! আপনি প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দিন।

রাধারমণকে পেয়ে অনেকখানি দায়িত্বমুক্ত হওয়া গেল ভেবে রবি কয়েক দিন বেশ উৎফুল্ল হয়ে ছিলেন। তা আর হল না। তবে রাধারমণ স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে যাওয়ায় যে আর এক দিকে সুদূরপ্রসারী লাভের সম্ভাবনা দেখা দেবে, তা রবি টের পেলেন কয়েক দিন পরে।

সেদিন মহিমচন্দ্র এল ত্রিপুরা রাজ সরকারের দূত হয়ে। বলেন্দ্রর সহপাঠী হিসেবে এ বাড়িতে তার অবাধ আনাগোনা। সে বলল, ত্রিপুরার নতুন রাজা কলকাতায় এসেছেন, তিনি রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। রবি অনুমতি দিলে তিনি নিজেই এখানে দর্শনপ্রার্থী হয়ে আসবেন।

রবি জিজ্ঞেস করলেন, নতুন রাজা, মানে কোন জন?

মহিমের আনুগত্য প্রথম থেকেই প্রথাগত দিকে। সে স্পষ্ট স্বরে বলল, যিনি ন্যায্য উত্তরাধিকারী, যিনি যুবরাজ ছিলেন, সেই মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর।

রবি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। সিংহাসনে যিনি উপবিষ্ট, তিনিই রাজা। ভ্রাতৃ-বিরোধের পরিণতি যাই-ই হোক না কেন, এখন এঁকেই রাজা বলে গণ্য করতে হবে। স্বাধীন দেশের রাজা হিসেবে তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী, তাঁর সংবর্ধনার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে হুট করে তাঁকে বাড়িতে আসতে বলা যায় না। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে রবি যে গোবিন্দ মাণিক্যের কথা লিখেছিলেন, এই রাধাকিশোর তো তাঁরই বংশধর। নিজস্ব যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, বংশ-মর্যাদার জন্যই তিনি শ্রদ্ধেয়। রাজ-সন্দর্শনে একজন কবি যাবেন, এতে অসম্মানের কিছু নেই।

রবি বললেন, আমিই আজ সন্ধ্যাকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব।

দেশীয় রাজাদের কুকীর্তি ও মুখামির বহু কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত। ইংরেজ শাসকদের দরবারে এই সব দেশীয় রাজারা উৎকট পোশাক পরে ভৃত্যসুলভ আচরণ করে। বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন অনেকটাই ব্যতিক্রম, তাঁর ঢাল-তলোয়ারের জোর না থাকলেও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভা ছিল। রাধারমণের বিবরণ শুনে রবি ধরে নিয়েছেন যে ত্রিপুরার এই নবীন রাজাটি অশিক্ষিত এবং ব্যক্তিত্বহীন। তাই রবি ঠিক করেছিলেন, অল্প সময়ের জন্য শিষ্টাচার বিনিময় করেই ফিরে আসবেন।

সার্কুলার রোডের বাড়িতে মহারাজ রাধাকিশোর দোতলার দরবারকক্ষে কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, রবিকে দেখেই নিজের আসন ছেড়ে এগিয়ে এলেন। একটি রেশমি উত্তরীয় রবির গলায় পরিয়ে দিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন, কবিবর, আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম, আপনি কষ্ট করে নিজে এসেছেন, এ জন্য আমি কৃতার্থ।

অন্য সকলে ঘর থেকে সরে গেল, মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসার পর কয়েক মিনিট দু'জনে নীরব।

রবি দেখলেন, বীরচন্দ্র মাণিক্যের দশাসই শরীরের তুলনায় তাঁর এই পুত্রটি বেশ কৃশ, মুণ্ডিত মুখ, গোঁফ আছে বটে কিন্তু তা বনবিড়ালের লেজের মতন পুরুষ্টু নয়, ধুতির ওপর গলাবন্ধ জামা পরা,

অলঙ্কারের বাহুল্য নেই, ডান হাতের আঙুলে একটি অঙ্গুরীয়। চক্ষু দুটি স্নিগ্ধ, ওষ্ঠের ভঙ্গি দেখলেই মনে হয়, মানুষটি লাজুক প্রকৃতির।

একটু পরে ধীর স্বরে রাধাকিশোর বললেন, রবীন্দ্রবাবু, আপনার সঙ্গে আমার আগে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। আমার পিতার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল আমি জানি। পিতা আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেননি। একবারই আমি কলকাতায় এসেছিলাম কয়েক বছর আগে, আপনি পিতার সঙ্গে এই ঘরে বসেই কথা বলছিলেন, আমি প্রায় জোর করেই প্রবেশ করেছিলাম, আপনার সঙ্গে কথা বলতে উদ্যত হয়েছি, তখনই একজন ইংরেজ রাজপুরুষ এসে গেল, আমার আলাপ করা হল না। সে ঘটনা বোধ করি আপনার মনে নেই?

সত্যিই রবি মনে করতে পারলেন না। স্মিত হাস্য করলেন শুধু।

রাধাকিশোর বললেন, আমার পিতা আপনার ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থটি পড়ে আপনার জন্য শিরোপা পাঠিয়েছিলেন। সেদিনের তুলনায় আজ আপনি বঙ্গের অগ্রগণ্য কবি। আপনাকে কী দিয়ে সংবর্ধনা জানাব জানি না। শুধু এটুকুই জানাতে চাই, আমি আপনার রচনার বিশেষ অনুরক্ত। আপনার প্রতিটি রচনা সাগ্রহে পাঠ করি।

সাধারণত উচ্চ বংশের অশিক্ষিত সন্তানরা উদ্ধত, অহংকারী ও দুর্বিনীত হয়। কিন্তু এই যুবকটি অতিশয় নম্র ও ভদ্র। রবি ক্রমশ একে পছন্দ করতে লাগলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সামনে রবি কখনও সহজ হতে পারতেন না, বয়েসের ব্যবধান তো ছিলই, তা ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব অন্যদের কাছ থেকে খানিকটা ভয় ও সম্ভ্রম আদায় করে নিত। কিন্তু সিংহাসনের অধিকারী হলেও এই যুবকটির সামনে রবি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

রাধাকিশোর আবার বললেন, কলকাতার সমাজ আমার কাছে অপরিচিত। আমি এতকাল আড়ালেই থেকেছি। ভাগ্যদোষে আমি লেখাপড়া তেমন কিছু শিখিনি। আমার পিতার মতন আমি গান জানি না, ছবি আঁকতে পারি না, কাব্য রচনা করার শক্তিও নেই। কোনও যোগ্যতাই আমার নেই। আপনাকে শুধু এটুকুই জানাতে চাই, আমি সাহিত্য ভালবাসি। বাংলা ভাষার বই, বিশেষত আপনার রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আপনার কাছে আমি ঋণী।

রবি এবার উৎসাহিত হয়ে বললেন, শুধু বাংলার মাধ্যমেই কি শিক্ষিত হওয়া যায় না! পৃথিবীর সব জাতিই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা করে।

রাধাকিশোর মুখ নিচু করে বললেন, বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম, আপনার বন্ধুত্ব কামনা করব। আমার দুর্ভাগ্য! মহিমের মুখে শুনলাম, আমার পিতার সচিব রাধারমণ ঘোষমশাই আগেই আপনার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি আপনাদের জমিদারি পরিচালনার ভার পেয়েছেন, আপনার দক্ষিণ হস্ত হবেন। ঘোষমশাই আমাকে পছন্দ করেন না। সিংহাসনে আমার অধিকার নিয়েও তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। অথচ, আমি যৌবরাজ্য পদে অভিষিক্ত হয়েছি অনেক আগে।

রবি বললেন, কুমারদের মধ্যে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, সিংহাসন তো আপনারই প্রাপ্য।

রাধাকিশোর এবার আবেগমথিত স্বরে বললেন, আপনি, আপনি তা স্বীকার করেন?

রবির মনে হল, বর্তমান ত্রিপুরাতেও কি রঘুপতির মতন কেউ আছে? যে কূটকুশলী নক্ষত্র রায়ের মতন অনুজ কোনও কুমারের মন বিষিয়ে দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে!

তিনি বললেন, আপনাদের ভ্রাতৃ-বিরোধের বৃত্তান্ত আমি জানি না। তবে এটা বলতে পারি, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার প্রতি অবজ্ঞা দেখানো একটা পাপ। সে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পৃথিবীতে জন্মে সকলেই রাজা হয় না, কিন্তু রাজভক্ত হবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাধাকিশোর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, রবিবাবু, রবিবাবু, আপনি আমাকে বন্ধু বলে মানবেন?

রবিও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বন্ধু

তারপর পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

৩৪

এখন আর সরলাকে বাড়ি থেকে বেরুবার জন্য কারুর অনুমতি নিতে হয় না। তার নিজস্ব গাড়ি ও কোচোয়ান আছে। তার জনক-জননী শুধু নন, মাতৃকুল ঠাকুর পরিবারের সবাই ধরে নিয়েছে, ও মেয়েকে কিছুতেই বাগ মানানো যাবে না। এমন তেজস্বিনী, এমন স্বাধীনচেতা যুবতী এ সমাজে আগে কেউ দেখেনি।

হিন্দু রমণীরা অন্তরালবর্তিনী, উচ্চ বংশের মহিলারা খানদানি মুসলমান রমণীদের মতন বোরখা পরেন না বটে, কিন্তু পরপুরুষদের মুখ দেখান না, আত্মীয়দের সামনেও এক গলা ঘোমটা দিয়ে থাকেন, পথে-ঘাটে তাঁদের একা চলাফেরার তো প্রশ্নই ওঠে না। ব্রাহ্মরা নারীদের পর্দাপ্রথা ঘোচাবার জন্য কিছুটা উদ্যম নিয়েছেন বটে, তাও খুব সীমিত গণ্ডিতে, পরিবারের কোনও পুরুষ-সঙ্গী ছাড়া ব্রাহ্ম রমণীরাও গৃহ থেকে নির্গত হন না। সরলার মা ব্রাহ্ম, বাবা হিন্দু, সরলা ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে আলোকপ্রাপ্তা হলেও হিন্দু রীতিনীতির প্রতিও তার বেশ ঝোঁক আছে। তাদের পরিবার বঙ্কিমচন্দ্র এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের ভক্ত, স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সরলা বেশ উৎসাহী ও কৌতূহলী।

পঁচিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, সরলা এখনও কুমারী, পুরুষদের সঙ্গে সে অসংকোচে মেশে, কিন্তু কোনও বিশেষ পুরুষ বেশি ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে সে মাঝখানে একটি অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দেয়, কারুর গদ্গদ বাক্য শুনলে সে প্রাণ খুলে হাসে। মা ও বাবা তার বিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সরলা কখনও বলে না যে সে চিরকুমারী থাকবে, সে বলে, সেরকম যোগ্য পুরুষ কোথায়? মাতামহ দেবেন্দ্রনাথ একখানা তলোয়ারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তেমন পুরুষ কে আছে যে সেই তলোয়ার হাতে তুলে নিয়ে তার জীবন সঙ্গিনী হতে পারবে?

সরলার ব্যর্থ-প্রণয়ীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তিক্তভাবে মন্তব্য করে, ভগবান ভুল করে ওকে মেয়ে হিসেবে গড়েছেন! ও তো আসলে ব্যাটাছেলে!

সরলা যে একা একা যেখানে সেখানে যায়, যার তার সঙ্গে মেশে, এতেও কিন্তু কেউ ঠিক নৈতিক আপত্তি জানাতে পারে না। সে বিদুষী ও বুদ্ধিমতী, তার সম্ভ্রমবোধ কোনও অংশে কম নয়। সে একা একা দূর প্রবাসে চাকরি করে এসেছে।

ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও সরলা মহীশূরে চাকরি করতে গিয়েছিল নিছক ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্পৃহায়। পুরুষরা লেখাপড়া শেখে জীবিকা অর্জনের জন্য। সরলাও লেখাপড়া শিখেছে, তা সে কাজে লাগাবে না কেন? মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেও নিছক ঘরের বউ হয়ে থাকবে, তা হলে সে শিক্ষার প্রয়োজন কী? স্বামীরা সগর্বে, কোনও বন্ধুকে বলবে, আমার স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট, ভাল সংস্কৃত জানে, আর স্ত্রী সেই সময় অন্দরমহলে বসে কোলের সন্তানকে দুধ খাওয়াবে, এতেই রমণী জীবনের চরম সার্থকতা?

মহীশূরের মহারানি গার্লস কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট-এর চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল সরলা। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। রাজ সরকার থেকে তাকে দেওয়া হয়েছিল একটি সুন্দর ছোটখাটো দোতলা বাড়ি, নীচে ড্রয়িংরুম ও খাবার ঘর, ওপরে দুটি শোবার ঘর, তার একটিকে সে ড্রেসিংরুম বানিয়েছিল, সংলগ্ন স্নানের ঘর ও টানা বারান্দা। সব ঘরেই ওয়াল পেপার লাগানো। দু'জন সেপাই সে বাড়ি পাহারা দেয়, এ ছাড়া একজন দক্ষিণ ভারতীয় আয়া,

একজন রান্নার ঠাকুর ও কলকাতা থেকে আনা একটি ভৃত্য থাকে সেখানে। সরলা তো নিতান্ত নিরাশ্রয়ী নয়, সে ব্রাহ্ম সমাজের প্রখ্যাত নেতা ও জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি, সে পরিচয় রাজ পরিবারের সবাই জানে, সে জন্য তার বিশেষ খাতির।

সেখানে কয়েকটি বিশিষ্ট মুসলমান ও পার্শি পরিবারের সঙ্গে সরলার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে মিশে তার দৃষ্টি অনেক প্রসারিত হয়েছে, মহীশূরের ব্রাহ্মণরা এখনও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে, তাদের রক্ষণশীলতার মধ্যে ফুটে ওঠে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য। বেশ ভালভাবেই গুছিয়ে নিয়েছিল সরলা, তবু এক বছরের বেশি সে চাকরিতে টিকতে পারল না।

আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা কোনও যুবতীর কোথাও থাকাটা ভারতীয় সমাজ এখনও মেনে নিতে পারে না। বিশেষত যদি সেই যুবতী হয় সরলার মতন রূপে গুণে অদ্বিতীয়া। মধুলোভী ভ্রমরের মতন যুবকেরা ঘুরঘুর করতে লাগল তার চারপাশে। তারা ঠারেঠোরে প্রেমের কথা বলে, প্রকারান্তরে বিবাহের প্রস্তাব আসে। এই সব যুবকদের কী ভাবে প্রতিহত করতে হয়, তা সরলা জানে, সে ভয় পায় না। কিন্তু কেউ যদি জোর-জবরদস্তি করে? ব্যভিচারী, গুণ্ডা প্রকৃতির কেউ যদি তাকে সবলে হরণ করতে চায়?

একদিন মাঝরাত্তিরে তুমুল কাণ্ড হল।

দারুণ গ্রীষ্মের রাত, সরলার মাদ্রাজি আয়াটি তার ঘরে না শুয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে ঘুমিয়েছে, বেশি বাতাস পাবে বলে। পাহারাদার সেপাই দু'জনও ঘুমে ঢুলছে। হঠাৎ আয়াটি হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, তার একটা হাত মাড়িয়ে কে যেন ঢুকে পড়েছে পাশের ঘরে। সেই চিৎকারে জেগে উঠে সরলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, কী হয়েছে?

আয়াটি তখনও ভয়ে অস্থির। সে হাত তুলে ড্রেসিংরুমটি দেখিয়ে বলতে লাগল ওখানে কেউ ঢুকেছে, ভূত কিংবা ডাকাত, বিকট তার চেহারা।

এ রকম অবস্থাতেও বুদ্ধি হারায়নি সরলা। সে চট করে সেই দরজার শেকল বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। তারপর বারান্দায় গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বাড়িতে চোর ঢুকেছে!.

সেই চিৎকারে সেপাই দু'জন জেগে উঠল তো বটেই, রাস্তা থেকে ছুটে এল কয়েকটি পুলিশ। ঘরের মধ্যে সত্যিই কেউ রয়েছে, সে দিশেহারা হয়ে পেছনের জানলা ভেঙে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। পালাতে পারল না, ধরা পড়ে গেল। তখন দেখা গেল, সে চোর কিংবা ডাকাত নয়, সে একটি কুখ্যাত লম্পট। শহরের একটি অবস্থাপন্ন ঠিকাদারের অকালকুষ্মাণ্ড, বহু নারীর সে সর্বনাশ করেছে। এরকম একটি জীব তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে, এ কথা জেনে সরলার শরীর ঘৃণায় কাঁপতে থাকে।

সে রাতে অন্য একটি পরিবারে আশ্রয় নিল সরলা। পরদিনই এ খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল, বিভিন্ন সংবাদপত্রে সে বিবরণ প্রকাশিত হয়ে সরলাকে আরও লজ্জায় ফেলে দিল। কলকাতার পত্রপত্রিকাগুলি এ জন্য দায়ী করল সরলাকেই। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা এই মর্মে মন্তব্য করল যে, অমন মানী বংশের যুবতী কন্যার ধেই ধেই করে বিদেশে চাকরি করতে যাবার প্রয়োজনটাই বা কী? খাওয়া-পরার অভাব নাই, কেন খামোখা নিজেকে এমন বিপদগ্রস্ত করা। এ খালি বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ!

এর পর আর থাকা যায় না, ফিরে আসতে বাধ্য হল সরলা। মাঝখানে তার জ্বর-জারি হয়েছিল, এখানে স্বাস্থ্য টিকছে না, এই অজুহাতে তবু কিছু মান রক্ষা হল। সরলাও অনুভব করল যে, জীবিকার সঙ্গে প্রয়োজনের একটা সম্পর্ক থাকা চাই। তাকে কোনও দিন অর্থ-চিন্তা করতে হয়নি, জানকীনাথ তাঁর কন্যার জন্য ভাল মাসোহারার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তবু যে সরলা অত দূরে চাকরি করতে গিয়েছিল, তা খানিকটা জেদ আর অনেকটাই শখের বশে। এর কোনওটাই বেশি দিন টেঁকে না।

কলকাতার অনেকে চাপা বিদ্রূপের স্বরে বলেছে, কী রে, চাকরির শখ মিটল? খুব তো স্বাধীন হতে গিয়েছিলি!

এখন চাকরি না করলেও সরলা চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে রাজি নয়। স্বাধীন থাকার ইচ্ছেও তার ঘুচে যায়নি।

'ভারতী' পত্রিকার অনেকখানি ভার নিয়েছে সে। নিজে লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, প্রয়োজনে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তাগাদা দেয়। নিজেও লিখতে শুরু করল নানা প্রবন্ধ। বাবা কংগ্রেসের নেতা, সরলার অন্তরেও দেশপ্রেমের শিখা দিন দিন উজ্জ্বল হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাঙালিদের কিছু কিছু দুর্বলতা তাকে পীড়া দেয়। বাঙালিরা যেন স্বভাবগতভাবেই কাপুরুষ। অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে বাঙালিরা সাহস করে এগিয়ে আসতে পারে না, কেউ অপমান করলেও মুখ বুজে সহ্য করে যায়। বাঙালিরা মুখেই যত বাক্যবাগীশ, জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতার তোড় ছোটাতে পারে, কিন্তু কেউ লাঠি উঁচিয়ে ধরলেই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

বাঙালিদের এই কাপুরুষতার কারণ কি শারীরিক দুর্বলতা ? ট্রেনে চেপে বোম্বাই থেকে কলকাতা পর্যন্ত আসতে আসতেই কত তফাত চোখে পড়ে। মধ্যবর্তী স্টেশনগুলিতে কত তাগড়াই চেহারার মানুষ দেখা যায়, জব্বলপুর-এলাহবাদ-পাটনার   কুলিরাও জোয়ান, তারা জোর গলায় এক একটা স্টেশনের নাম হাঁক পাড়ে। আর বাংলার ঢোকার পরই দেখা যায়, রোগা ডিগডিগে পুরুষ সব, এমন কী কুলিদের গলার স্বরও মিনমিনে।

একই দেশের মানুষ, অথচ এত বৈপরীত্য কেন ? বাঙালিরা শরীরচর্চায় পরাঙ্মুখ, শুধু সেটাই কি কারণ ? বাঙালিদের শরীরচর্চায় উৎসাহিত করতে হবে ঠিকই। পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়ামাগার খোলা দরকার, কিন্তু তার আগে এই জাতের মন থেকে ভয় তাড়াতে হবে। কিছু দুঃসাহসী, বেপরোয়া যুবকের দল না থাকলে সে জাতির কাপুরুষতার অপবাদ ঘুচতে পারে না। যার খেয়েঃ মনের জোরে যারা রুখে দাঁড়ায়, তারা অনেক সময় সবলের বিরুদ্ধেও জয়ী হয়।

'ভারতী' পত্রিকায় সরলা একটা রচনা লিখল, তার নাম 'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশি কিল'। এই রচনায় পাঠকদের প্রতি একটা আহ্বান জানানো হল, আপনারা যদি কোনও প্রতিবাদের ঘটনা দেখে থাকেন বা তাতে অংশ নিয়ে থাকেন, তা হলে সেই সব ঘটনা লিখে পাঠান। ট্রেনে-স্টিমারে, পথে-ঘাটে গোরা সৈন্য বা ইংরেজ সিভিলিয়ানরা অনেক সময় অপমান করে, লাথি- ঘুঁষি মারে, এমন কী কোনও দেশি লোকের সামনে তাদের স্ত্রী-ভগিনী-কন্যাদের প্রতিও অশোভন ইঙ্গিত করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশি লোকরা সেই সব অপমান গিলে ফেলে বাড়িতে গিয়ে ফোঁসে, কিংবা বেশি বাড়াবাড়ি কিছু হলে আদালতে নালিশ করে। কেউ কি সাহেবদের সেই বেয়াদপির তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করতে পারে না ? দেখা গেল, কোথাও কোথাও সে রকম ঘটনাও ঘটে, বাঙালিরা একেবার নির্জীব হয়ে যায়নি, কোথাও কোনও দুর্বিনীত মাতাল গোরা সৈনিককে কোনও যুবক টানতে টানতে কোতোয়ালিতে নিয়ে গেছে, বরিশালে একজন রাগত এক ইংরেজ তার স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়েছিল বলে তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে জেল খাটাতেও দ্বিধা করেনি। যশোরে একটি কলেজের ছাত্র এক সাহেবের হাত থেকে উদ্যত ছড়ি কেড়ে নিয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকায় এই সব বৃত্তান্ত ছাপা হতে অনেকে অবশ্য ঠোঁট বেঁকাল। 'ভারতী' একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা, কত উচ্চাঙ্গের রচনা সেখানে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে এসব কী ? এগুলো কি সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে ? সরলা এ সমালোচনায় কান দেয় না, সে বলে, নাই বা হল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, তবু এই সব বৃত্তান্ত পাঠ করে অন্য অনেকে উদ্বুদ্ধ হবে, আরও অনেকে প্রতিবাদ জানাবার সাহস সঞ্চয় করতে পারবে !

সরলাকে কেন্দ্র করে তার একটি অনুরাগীবৃন্দ আবার গড়ে উঠেছে। ঘোষাল পরিবার এখন কাশিয়াবাগান ছেড়ে চলে এসেছে সার্কুলার রোডে। এ বাড়িটাও বেশ বড়, সামনে প্রশস্ত চত্বর, পেছন দিকে একটা পুকুর, তার পাশে একটি চৌকো জমি ঝোপঝাড়ে ঢাকা। সেইখানে সরলা স্থাপন করেছে একটি ব্যায়ামাগার, পাড়ার ছেলেরা প্রতিদিন বিকেলে মার্তজা নামে এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে লাঠি খেলা, তলোয়ার চালনা শেখে। সরলা নিজে দাঁড়িয়ে সেই প্রশিক্ষণ দেখে, এক এক সময় সে নিজের হাতে তলোয়ার তুলে নেয়। এই অস্ত্রটি তাকে চুম্বকের মতন টানে, কল্পনায় সে যেন প্রহরণধারিণী ভারতমাতার মূর্তি দেখতে পায়।

সরলার অনুরাগীদের মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী, যারা শারীরিক ব্যায়ামট্যায়াম পছন্দ করে না, তাদেরও সরলা নিভৃতে ভাবের কথা বলার সুযোগ দেয় না। এক সঙ্গে সে একাধিককে কাছাকাছি রাখে। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সে বিস্মিতভাবে লক্ষ করে যে অনেকেই দেশ সম্পর্কে উদাসীন, মাতৃভূমি যে বিদেশি শাসকদের অধীনে রয়েছে, সে বোধটাও যেন নেই। যে পরাধীন জাতি পরাধীনতার জ্বালাও অনুভব করে না, তাদের কি উদ্ধার পাবার কোনও উপায় আছে ? অনেকেই একটা ছোট্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ, বাংলার বাইরে পা বাড়ায় না, বোম্বাই-মাদ্রাজকে বলে বিদেশ।

বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালে সরলা ভারতের একটা বড় মানচিত্র টাঙিয়ে রেখেছে। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে সেই মানচিত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলে, ওই দেখো, ওই আমাদের দেশ, ওদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় না, ঠিক যেন মাতৃমূর্তি ? তোমরা নিজেরা একা একা তাকিয়ে থেকে দেখো।

এর পর সে বন্ধুদের ওই মানচিত্রকে প্রণাম করতে শেখাল। ঘরে ঢুকে তারা প্রথমে মানচিত্রের দিকে ফিরে দুই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। এরকম কিছুদিন চলার পর সরলা একদিন সেইসব বন্ধুদের সবার হাতে লাল রঙের রাখি বেঁধে দিয়ে বলল, তোমাদের সকলকে একটা শপথ করতে হবে। আমরা সবাই তনু-মন-ধন দিয়ে দেশের সেবা করার জন্য দীক্ষিত হলাম। মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য যদি বিপদ বরণ করতে হয়, তাতেও পিছু-পা হব না। এই রাখিই আমাদের ব্যাজ।

ক্রমশ এই রাখিবন্ধনের দলটিতে সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগল। এই বিষয়টি সরলা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু মুখে মুখে খবর রটেই যায়। একটি তরুণী মেয়ে ঘরসংসারের চিন্তা না করে এসব কী কাণ্ড করছে, অনেকে বুঝতেই পারে না। শুভার্থীরা শঙ্কিত হয়ে ভাবে, এবার বুঝি এ মেয়েটির পেছনে পুলিশের চর লেগে যাবে !

যুব সমাজের মুখে মুখে এখন সরলা ঘোষালের নাম। কলেজের ছাত্ররা সুরেন বাড়ুজ্যের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্যারিবল্ডির জীবনী পাঠ করে। ইতালিতে গুপ্ত সমিতি গঠন করে সে দেশের যুবকেরা স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এ দেশে সেরকম গ্যারিবল্ডি কোথায় ? বড় বড় নেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনে শুধু বিভিন্ন দাবিদাওয়ার আবেদন-নিবেদন জানান, স্বাধীনতার কথা তো উচ্চারণ করেন না ! সরলা ঘোষাল কি হবেন সেই প্রেরণাদাত্রী ?

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় নামে একটি যুবক প্রায়ই আসে সরলার কাছে। সাহিত্যচর্চায় তার খুব উৎসাহ, ভবানীপুর অঞ্চলে তাদের একটি সাহিত্য সমিতি আছে। সে একদিন সরলার কাছে প্রস্তাব দিল, তাদের সমিতির সাংবৎসরিক উৎসবে সরলাকে সভানেত্রী হতে হবে। সরলা তো আকাশ থেকে পড়ল ! এ রকম আবার হয় নাকি ? পুরুষদের আহূত সভায় সভাপতির আসনে বসবে এক নারী, এ কখনও সম্ভব ? এমন কেউ কখনও শোনেনি। যদি বা লোকনিন্দা বা অপবাদ অগ্রাহ্য করাও যায়, তবু সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করার কী এমন যোগ্যতা আছে সরলার ? সে এখনও সে রকম কিছু সাহিত্য রচনা করেনি। বরং তার মা স্বর্ণকুমারী একজন প্রধানা লেখিকা, তিনি রাজি হলে তবু মানায়। কিন্তু মণিলাল নাছোড়বান্দা, সরলাকেই তাদের চাই, তাদের ক্লাবের সব সদস্য মিলে সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

কয়েক দিন এই নিয়ে পীড়াপীড়ি চলার পর সরলার মাথায় একটা বিশেষ পরিকল্পনা এসে গেল। বোম্বাই রাজ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করে বিশেষ সার্থক হয়েছেন। গণেশ পুজো যেমন জনপ্রিয় হয়েছে, তেমনি বীর যোদ্ধা শিবাজীকেও জনসাধারণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সরলার মাথায় মাঝে মাঝে ঘোরে, বাংলার কোনও বীরপুরুষকে সেইরকম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না ? বাংলার সাধারণ মানুষ শিবাজীর বিষয়ে কিছুই জানে না। শিক্ষিত লোকেরাও শিবাজীকে উচ্চ চক্ষে দেখে না। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা শিবাজীকে আখ্যা দিয়েছে 'পাহাড়ি ইঁদুর', আফজল খাঁ হত্যা প্রসঙ্গটিকে শিবাজীর বীরত্বের বদলে হীন বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন, এ দেশের শিক্ষিত লোকেরাও তাই মনে করে। তিলক অবশ্য তাঁর পত্রিকায় আফজল খাঁ হত্যার যৌক্তিকতা

প্রমাণ করেছেন জোরালো ভাষায়, সরলা সেটাই মানে। তবু একজন বাঙালি বীর কি পাওয়া যাবে না। কতকাল হল বাঙালিরা যুদ্ধ করতে ভুলে গেছে। বাঙালির ইতিহাসও তো লেখা হয়নি এ পর্যন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত এ নিয়ে আফশোস করে গেছেন।

হঠাৎ সরলার মনে পড়ল, প্রতাপাদিত্যর কথা। শিবাজী মহারাজার তুলনায় প্রতাপাদিত্য নিতান্তই এক ছোট জমিদার, বারভুঁইয়ার অন্যতম। খুল্লতাতকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কলঙ্ক আছে তাঁর নামেও। কিন্তু অন্য দিকে বাংলার এক ক্ষুদ্র জমিদার হয়েও তিনি মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন, নিজের নামে সিক্কা টাকা চালিয়েছেন, এই যে সাহস, এই যে পৌরুষ, এটাকেই যদি বেশি করে দেখানো যায়? বাঙালি জানবে যে প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার মতন বীর্যবান বাঙালি ছিল। প্রতিবাদের এই তেজটাই তো বড় কথা। এখনকার ইংরেজ শাসকরাও তো মহা শক্তিমান, সব অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে, তবু কি তাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে না এ দেশের মানুষ? চিরকাল এমন মুখ বুজে সহ্য করে যাবে?

মণিলালকে সরলা বলল, তোমাদের সভায় আমি যেতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে। সাহিত্য পাঠ-টাঠ আপাতত বন্ধ থাক। তোমরা একটা 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' করতে পারবে? ১লা বৈশাখ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল, উৎসব হোক সেই দিনটাতে। প্রতাপাদিত্যের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করো, বই জোগাড় করো, তারপর তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার দিকটা বেশি উজ্জ্বল করে কেউ লিখুক একটা প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধটি পাঠ করে সাধারণ মানুষকে তাঁর কথা জানানো হোক। সভায় আর কোনও বক্তৃতা হবে না। চতুর্দিকে লোক লাগিয়ে খুঁজে খুঁজে বার করো, কোন্ বাঙালির ছেলে তলোয়ার খেলতে জানে, কুস্তি, বক্সিং জানে, লাঠি চালায়। কবিতা আর গল্প পাঠের বদলে সেই সব ছেলেদের অস্ত্র শিক্ষার প্রদর্শন হোক। যারা যারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাবে, তাদের প্রত্যেককে আমি একটি করে সোনার মেডেল দেব! সেই মেডেলের পেছনে লেখা থাকবে, দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ!

মণিলালের দলবল তাতেই রাজি। দেখা গেল, বাঙালি একেবারে নির্জীব নয়, লাঠি-ছোরা-তলোয়ার চালাতেও বেশ কিছু ছেলে দক্ষ। মঞ্চের ওপর প্রতাপাদিত্যের একটি তৈলচিত্র, তার সামনে একটি তলোয়ার। সরলা শুভ্র সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে। শরীরে কোনও অলঙ্কার নেই, একটা ওড়নায় মাথার অর্ধেকটা ঢাকা, সে একটা রক্তজবা ফুলের মালা সেই তৈলচিত্রে পরিয়ে দিয়ে উদ্বোধন করল সভার। তার পর দর্শকদের দিকে ফিরে নমস্কার জানিয়ে বসল পাশের চেয়ারে, একটি কথাও উচ্চারণ করল না। শুরু হল লাঠি খেলা, অসি খেলা।

ভবানীপুরের ক্লাব-প্রাঙ্গণে দর্শকের ভিড়ে যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। এ রকম দৃশ্য কলকাতার মানুষ আগে কখনও দেখেনি। বাঙালির হাতে অস্ত্র, আর তাদের উৎসাহ দিচ্ছে মঞ্চে উপবিষ্ট এক বড় ঘরের কুমারী তরুণী।

পরের দিন সংবাদপত্রগুলিতে লেখা হল, 'কলিকাতার বুকের ওপর যুবক-সভায় এক মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম!' এমন যে রক্ষণশীল পত্রিকা 'বঙ্গবাসী', সেখানেও বেরুল, 'মরি মরি কী দেখিলাম? এ কী সভা। বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন,' বঙ্গ যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা—ব্রাহ্মণকুমারীর সুকোমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণ হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।'

এর পর আরও অনেক জায়গায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হতে লাগল। সরলা বাংলার ইতিহাস ঘেঁটে আরও কয়েকজন শৌর্যবান পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় মন দিল। রাজস্থান, পঞ্জাবে অনেক বীরের আত্মদানের কাহিনী আছে, সরলা খুঁজে পেতে চায় বাঙালির দৃষ্টান্ত। শিবাজী কিংবা বিশেষ কোনও একজনকে সারা ভারতের মানুষ মেনে নেবে কি না, কিংবা মানতে কতদিন সময় লাগবে কে জানে! তার চেয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় বীরপুরুষদের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও অনেক কাজ হবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করাটাই বড় কথা।

সরলার চোখ পড়ল প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের দিকে। এঁর সম্পর্কে অনেকেই প্রায় কিছুই জানে না। উদয়াদিত্য স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু আক্রমণোদ্যত বিশাল মোগল বাহিনীকে দেখেও তিনি ভয়ে পালাননি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্মুখসমরে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। সেই সাহসিকতার মূল্য নেই? এখন আবার অনেককেই তো দেশের জন্য প্রাণ দিতে হবে। যারা প্রাণ দেবে, তারাও হবে পরবর্তীদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

এবারে 'উদয়াদিত্য উৎসবের' ব্যবস্থা করতে হবে বেশ বড় আকারের। পাছে কেউ মনে করে যে প্রত্যেকটি উৎসবে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করে সরলা নিজের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে, তাই মাঝে মাঝে সে আড়ালে থাকে। মঞ্চে ওঠে না কিংবা উৎসবের ধারে-কাছেও যায় না। যদিও পরিকল্পনা সব তারই এবং টাকাপয়সাও সে নিজেই দেয়। কলেজ স্ট্রিটের অ্যালবার্ট হল সভাসমিতির জন্য বিখ্যাত, 'উদয়াদিত্য উৎসব' হবে সেখানেই। অ্যালবার্ট হলের ট্রাস্টি এখন নরেন সেন, তাঁর কাছে ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হল। উদয়াদিত্যের কোনও প্রতিকৃতি পাওয়া যায় না, তাই ঠিক হল মঞ্চে রাখা হবে শুধু একটা তলোয়ার। সবাই তাতেই পুষ্পাঞ্জলি দেবে। এক অবাঙালি জমিদারের কাছ থেকে হাতলে হীরে-জহরত বসানো একটি বড় তলোয়ারও সংগ্রহ করা হয়েছে। শ্রীশ সেন নামে উৎসাহী যুবকের ওপর সব ব্যবস্থাপনার ভার, সে প্রতিদিন এসে সরলার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে যায়। সভাপতি হবেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, তিনি উত্তম বক্তা, তিনি আসতে সাগ্রহে রাজিও হয়েছেন।

মিটিং শুরু হবে বিকেল চারটের সময়, দুপুর বারোটায় শ্রীশ সেন দৌড়তে দৌড়তে এসে এক দারুণ দুঃসংবাদ দিল। নরেন সেন ভয় পেয়ে অ্যালবার্ট হলে তালাবন্ধ করে দিয়েছেন, এ মিটিং তিনি হতে দেবেন না। তিনি শুনেছেন, ছেলেরা তলোয়ার পূজা করবে, এ তো ভয়াবহ রাজদ্রোহাত্মক কাজ। সুতরাং মিটিং বন্ধ।

সরলার ফর্সা মুখখানি ক্রোধে অগ্নিবর্ণ ধারণ করল। শাণিত গলায় সে বলল, কী, মিটিং হবে না মানে? সব সংবাদপত্রে জানানো হয়েছে, রাশি রাশি হ্যান্ডবিল বিলি হয়েছে, দেয়ালে পোস্টার পড়েছে, মিটিং হবে না? উনি সই করে অগ্রিম টাকা নিয়েছেন, এখন মিটিং বন্ধ করার কী অধিকার আছে? আমি ওঁর নামে মামলা করব?

কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি তো একদিনে হয় না। আজকের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা ছাড়া তো গতি নেই।

সরলা বাড়ির ভেতর থেকে এক মুঠো টাকা নিয়ে এসে বলল, আপনারা কাছাকাছি কোনও থিয়েটার হল যে-কোনও উপায়ে ভাড়া করুন। যত টাকা লাগে আমি দেব। মিটিং হবেই হবে।

শ্রীশ অন্য হল ভাড়া করতে ছুটে গেল, সরলা চিঠি লিখতে বসল নরেন সেনকে। ইন্ডিয়ান মিরার পত্রিকার সম্পাদক নরেন সেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত। কতবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, এখন বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর ভীমরতি হয়েছে নাকি? একদল যুবক তলোয়ার পুজো করতে চায়, পুলিশ যদি ধরপাকড় করতে চায় ওই ছেলেদের ধরবে, উদ্যোক্তা হিসেবে সরলাকে নজরবন্দি করতে পারে, জেনেশুনেই তারা এই ঝুঁকি নিয়েছে, আর অ্যালবার্ট হলের ট্রাস্টি হিসেবে নরেন সেন এইটুকু দায়িত্ব নিতে পারেন না?

রাগের মাথায় সরলার চিঠির ভাষায় আগুন ছুটতে লাগল। "...আজ আপনি তাদের এ পূজা যদি বন্ধ করেন, সংবাদপত্রের সূত্রে সমস্ত ভারতবর্ষে ঢি ঢি পড়ে যাবে। সবাই বলবে, বাঙালি যুবকেরা খড়্গপূজা করতে চেয়েছিল, একজন নেতৃস্থানীয় বাঙালি বৃদ্ধ হিন্দু তাতে বাধা দিয়েছেন, তাঁর অতিমাত্রায় রাজভক্তি তাতে রাজদ্রোহিতার গন্ধ পেয়ে থরহরি কম্পমান হয়েছে, তাঁর তথাকথিত হিন্দুত্বের আজ তিনি সম্পূর্ণ ফেইল করেছেন। এই তো একদিকে দেশের লোকের ধিক্কার—আর একদিকে আপনি মামলায় ফেঁসে যাবেন...ছেলেরা আপনার নামে ক্ষতিপূরণের মামলা আনতে পারে। আইনত আপনিই দায়ী...।"

লোক মারফত সেই চিঠি পেয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন নরেন সেন। সরলা ঘোষালের

জনপ্রিয়তার কথা তিনি জানেন। অনেক যুবক তার কথায় ওঠে-বসে। সরলার উস্কানিতে তারা কখন কী হামলা করবে তার ঠিক নেই। এদিকে তলোয়ার পূজাও তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, এ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ইঙ্গিত। ইতালিতে, আয়ার্ল্যান্ডে যা চলেছে, তা কি ভারতে কখনও সম্ভব? সরলা ছেলেমানুষ, সিপাহি বিদ্রোহের দিনগুলির কথা সে জানে না। নরেন সেনের তখন চোদ্দো বছর বয়েস ছিল, সিপাহিদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজরা যে কী চরম নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করেছিল, তার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও অনেকের মনে রয়ে গেছে।

অনেক ভেবেচিন্তে দূত মারফত চাবি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে জানালেন যে, যুবকেরা উৎসব করতে চায় করুক, তবে এ বাবদ কোনও রকম গণ্ডগোল হলে তার সব দায়িত্ব সরলা ঘোষালকে নিতে হবে।

নিজে একজন মানী-গুণী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েও যে দায়িত্ব নিতে ভয় পান, সেই দায়িত্ব তাঁর কন্যাসমা একটি পঁচিশ বছরের যুবতীর কাঁধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান নরেন সেন।

এদিকে শ্রীশ এর মধ্যে অ্যালবার্ট হলের কাছাকাছি হ্যারিসন রোডের ওপর আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া করে এসেছে দ্বিগুণ টাকায়। থিয়েটারের মালিক একজন মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী, তাকে জানানো হয়েছে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে তলোয়ার পুজোর কথা। মালিকের তাতে আপত্তি নেই, সে বলেছে, আপনারা পূজা করেন, নাচেন, কুঁদেন, সে আপনারা জানেন। আমার ভাড়ার টাকা ঠিকঠাক পেলেই হল।

সে মারোয়াড়ি আর টাকা ফেরত দেবে না। দুটো হলের মধ্যে কোথায় হবে উৎসব? উদ্যোক্তারা জরুরি মিটিং-এ বসল। হাতে আর বেশি সময় নেই। অ্যালবার্ট হলের কথা লোকজনকে জানানো হয়ে গেছে, সেখানেই ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু নরেন সেনের ব্যবহারে সকলেই কুপিত হয়ে আছে। নরেন সেন যে হল দিতে আপত্তি করেছিলেন, সেটাও জনসাধারণের জানা উচিত। তখন ঠিক হল, আলফ্রেড থিয়েটার হলেই হবে অনুষ্ঠান, অ্যালবার্ট হলের সামনে ভলান্টিয়ার দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, তারা দর্শক-শ্রোতাদের থিয়েটার হলে পৌঁছে দেবে।

যথাসময়ে বিপুল জনসমাগমে শুরু হল অনুষ্ঠান। সরলা নিজে গেল না, তার উদ্বোধনী ভাষণ লিখে পাঠিয়ে দিল। বাড়িতে সে বসে রইল উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায়। সত্যিই কি পুলিশ হামলা চালাবে? তার অনুবর্তী যুবকেরা কারারুদ্ধ হবে? সরলাও ওদের সঙ্গে যেতে রাজি আছে। সরলা যেন মনে মনে চায়, একটা কিছু ঘটুক, ইংরেজ সরকারের টনক নড়ুক, দমননীতি শুরু হোক। তাতে যুব সম্প্রদায় আরও বেশি উত্তেজিত হবে। ব্রিটিশ সরকারের অস্ত্র আইনে ভারতীয়রা কোনও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে না। এখন প্রকাশ্যে অস্ত্র পূজা তো সরকারি আইনেরই বিরুদ্ধতা। এত বড় একটা দেশ, কোটি কোটি মানুষ, তারা আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না? শাসকরা সব সময় অস্ত্র উঁচিয়ে রাখবে, আর তার তলায় বধ্য পশুর মতন মাথা নিচু করে থাকবে এ দেশের মানুষ?

একা বৈঠকখানা ঘরে ভারতের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সরলা। এক সময় সে সেই মানচিত্রের মধ্যে যেন দেখতে পায় অসংখ্য মানুষের চেহারা। তাদের পোশাক কতরকম, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ...এত মানুষ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, দেশকে মাতৃভূমি হিসেবে চিনতে শেখে, মাতৃভূমিকে পরাধীনতার অপমান থেকে মুক্ত করার জন্য একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায়, তা হলে শাসক সম্প্রদায় বিচলিত হবে না?

আবেগে সরলার চোখে জল এসে যায়। আঁচল দিয়ে বারবার চক্ষু মোছে তবু জলের ধারা থামে না। এই অবস্থায় তাকে কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে? সে একা একা কাঁদছে কেন? আর তো কোনও মেয়ের এরকম হয় না!

দুঃখে নয়। এ সরলার আনন্দাশ্রু। কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছে জাগ্রত ভারত। অস্ফুট কণ্ঠে সে গাইতে লাগল:

গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাবে

নমো হিন্দুস্থান!
হর হর হর— জয় হিন্দুস্থান!
সৎশ্রী আকাল হিন্দুস্থান!
আল্লা হো আকবর— হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান

৩৫

মেঘলা দুপুরবেলা জানলার ধারে লেখার টেবিলে বসে আছে ইন্দিরা। বালিগঞ্জের এই বাড়িটি জ্ঞানদানন্দিনী কিনেছেন কিছুদিন আগে। কলকাতার দক্ষিণে বালিগঞ্জ নামে অঞ্চলটি খুবই জনবিরল, মাঝে মাঝে একটি-দুটি বাড়ি, আর বেশিরভাগই ঝোপঝাড় ও পুকুর। ন' বিঘে জমির ওপর এই বাড়িটিকেও ঘিরে রয়েছে বড় বড় গাছপালা, রাস্তা দিয়ে কচিৎ দু-একটি গাড়ি-ঘোড়া যায়।

একটা বাঁধানো খাতায় একখানি চিঠি দেখে দেখে টুকে রাখছে ইন্দিরা। মাঝে মাঝে লেখা থামিয়ে অলস নেত্রে দেখছে জানলার বাইরের দৃশ্য। মেঘের ছায়া পড়েছে সামনের চত্বরে, উদ্যানে, দূরের দিঘিতে। অনেক উঁচু আকাশ থেকে ঘুরে ঘুরে নামছে চিল, ওরা আসন্ন বৃষ্টির গন্ধ পায়। জামরুল গাছটায় লাফালাফি করছে গুটিকতক হনুমান, মনরাখন নামে দারোয়ান লোহার গেটে পিঠ ঠেকিয়ে উদাস সুরে কী একটা গান গাইছে। আবার লেখায় মনোনিবেশ করল ইন্দিরা। খানিক বাদে কিছু একটা শব্দে পিছনে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, কখন সরলা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। গেট দিয়ে সরলার গাড়ি ঢোকার শব্দও সে টের পায়নি।

চট করে চিঠিটা ভাঁজ করে ব্লাউজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল ইন্দিরা, তারপর খাতাটা বন্ধ করে বলল, ওমা, সল্লি, আয় আয়—।

সরলা কাছে এসে বলল, সারা বাড়িতে দেখি সবাই ঘুমোচ্ছে। তুই বুঝি দুপুরে ঘুম দিস না!

ইন্দিরা বলল, দুপুরবেলা আমার ঘুম আসে না। বৃষ্টি আসবে, বাইরের আলোটা কী সুন্দর হয়েছে দ্যাখ! ঠিক ভোরবেলার মতন।

সরলা বলল, এরকম ডিফিউজড লাইট আমারও ভাল লাগে। বিবি, তুই আমাকে দেখেই কী লুকিয়ে ফেললি রে?

ইন্দিরা সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে হাত চাপা দিয়ে বলল, ও কিছু না।

সরলা সারা মুখ হাসিতে ঝলমলিয়ে বলল, চিঠি, তাই না রে? কার চিঠি, দেখি দেখি!

সরলা হাত বাড়াতেই ইন্দিরা খানিকটা পিছিয়ে গেল। সরলা তবু তাকে ধরতে যেতেই দৌড়তে লাগল ইন্দিরা। কৌতুকহাস্যে খলখলিয়ে সরলা বলল, তবে রে, দিবি না? আমি দেখবই—

দুই বোনে ছোটাছুটি করতে লাগল কক্ষের মধ্যে। সরলার শাড়ি আঁট-সাঁট করে পরা, ইন্দিরার আঁচল লুটোচ্ছে। সরলা দৌড়ঝাঁপে অভ্যস্ত, ইন্দিরা নরম, নমনীয়। অচিরেই সরলা ধরে ফেলল ইন্দিরাকে, ইন্দিরা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, না, না, দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না।

সরলা থমকে গেল। ইন্দিরার মুখের দিকে বেশ কয়েক পলক দৃষ্টি স্থাপন করে শান্ত গলায় বলল, সত্যি দেখাবি না? তবে থাক। আমি কি জোর করে কেড়ে নেব নাকি?

সরলা টেবিলের কাছে সরে এসে চেয়ারটিতে বসল।

ইন্দিরা বুক থেকে চিঠিখানা বার করে রেখে দিল একটা দেয়াল-আলমারিতে। সেটাতে চাবি বন্ধ করল।

সরলা খাতাখানা খুলে পড়া শুরু করল। ইন্দিরার হস্তাক্ষর যাকে বলে মুক্তোর মতন। বাংলা ও ইংরিজি দুটোই পাকা লেখা। কয়েক লাইন পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে সরলা বলল, এ কী লিখেছিস রে বিবি? এত সুন্দর ভাষা। তোকে ভারতী পত্রিকার জন্য কিছু লেখা দেবার জন্য বলে বলে হন্যে হয়ে গেছি। কিছুতেই লেখা দিস না। আর এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে সাহিত্যচর্চা করিস? 'আজকাল আমি আমার লেখা ও আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্‌সের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত অল্পবল্প পাঠ করি। পাছে একদমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেই জন্য রেখে রেখে রয়ে রয়ে পড়ি— পড়তে বেশ লাগে। আমি যত ইংরাজ কবি জানি সবচেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি।... কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভেতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারি আকর্ষণ করে।'... বাঃ বাঃ, অতি চমৎকার। কীট্‌সের ওপর এই প্রবন্ধটা তুই আজই 'ভারতী'র জন্য কপি করে দে!

ইন্দিরা ওষ্ঠ টিপে হেসে বলল, ওটা বুঝি আমার লেখা? তুই পড়ে বুঝতে পারলি না? আমি অমন ভাষা লিখতে পারি? তা হলেই হয়েছে।

—তবে এ কার রচনা?

—রবিকা'র লেখা!

—রবিমামার লেখা, তোর খাতায় কেন? তোরই তো হাতের লেখা দেখছি।

—রবিকা আমায় যত চিঠি লেখেন, তার কতক কতক অংশ আমি এই খাতায় টুকে রাখি। এগুলির লিটারেরি ভ্যালু অমূল্য।

—রবিমামার সব লেখারই লিটারেরি ভ্যালু অমূল্য। কিন্তু চিঠি থেকে খাতায় টোকার কী মানে হয়? পুরো চিঠিই তো রেখে দেওয়া যায়।

—চিঠি হারিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া পুরো চিঠি তো সকলের পড়ার দরকার নেই। বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে টুকে রাখি।

সরলা মুখ তুলে একটুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে চুপ করে রইল। তারপর বলল, তুই যে চিঠিটা লুকোচ্ছিলি, সেটাও রবিমামার চিঠি? আমি ভেবেছিলুম, কার না কার প্রেমপত্র! রবিমামার চিঠি তুই আমাকেও দেখাবি না কেন?

ইন্দিরা জানলার বাইরে চেয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, রবিকা আমাকে যে চিঠি লিখেছেন, সেগুলি আমি কোনওদিন কারুকে দেখাব না। ও আমার নিজস্ব সম্পত্তি।

সরলা ঠোঁট উল্টে বলল, কী জানি বাপু, আমি বুঝি না। রবিমামার চিঠি কি একবার দেখলেও ক্ষয়ে যাবে নাকি?

একটু থেমে সে আবার বলল, রবিমামা আমার ওপর রাগ করে আছেন শুনেছি।

ইন্দিরা এবার বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কেন, কেন, রবিকা তোর ওপর রাগ করবেন কেন?

—ওই যে আমি প্রতাপাদিত্য উৎসব প্রবর্তন করার চেষ্টা করছি! রবিমামা 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অন্যরকম এঁকেছেন। উনি কাকে যেন বলেছেন, ওই প্রতাপাদিত্যটা তো একটা বিশ্বাসঘাতক, খুনি! সরলা এখন তাকে হিরো বানাতে চাইছে'! দ্যাখ বিবি, প্রতাপাদিত্যের তো অন্য দিকও আছে। সামান্য জমিদার হয়েও দিল্লির বাদশাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল— এই যে রাজশক্তির বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরার সাহস আর তেজ, আমি বাঙালির কাছে সেটাকেই আদর্শ হিসেবে তুলে ধরতে চাই।

—ও, এই ব্যাপার! রবিকার রাগ বেশিদিন থাকে না। দু'দিন বাদেই ভুলে যাবেন।

—রবিমামা আমাকে কখনও চিঠি লেখেন না।

—সল্লি, তুই কত কাণ্ডই না করছিস শুনতে পাই। ছেলেদের সভায় বক্তৃতা, তলোয়ার পুজো, বাড়িতে কারা সব লাঠিসোঁটা নিয়ে দাপাদাপি করে, ধন্যি তোর সাহস।

—তোকেও তো কতবার ডাকাডাকি করি। কতবার বলেছি, বিবি, তুই আয়, আমরা একটা দল

গড়ি, এ দেশের মেয়েদের জাগাতে হবে।

—আমি বাপু ওসব পারি না। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার মুখই খোলে না। সল্লি, তুই একা একা চাকরি করতে গেছিস, কত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছিস, পুরুষরা তোর হুকুম মানে, তোকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।

—তুই আমার সঙ্গে যোগ দে। আস্তে আস্তে সব পেরে যাবি।

—সবাই কি সব কিছু পারে? মা তো সব সময় বলে, আমি নাকি ইনট্রোভার্ট। আমি বাড়ি বসে, একলা একলা বইটই পড়তে ভালবাসি। আমি বইয়ের জগতে ঘুরে বেড়াই। সাহিত্য-গান-বাজনা এই সবের মধ্যে আমি বড় আনন্দে থাকি। বাড়ির বাইরে কী সব ঘটছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না।

—তা হলে তুই বিয়ে করছিস না কেন, মুখপুড়ি? শুধু শুধু বয়েস বেড়ে যাচ্ছে।

—আহা-হা, কে কাকে বলে! তোর মা কত ভাল ভাল পাত্র জোগাড় করে আনে, তুই সব কটা নাকচ করে দিস না?

—আমার কথা আলাদা। আমি বিয়ের জন্য তৈরি নই।

—মা বলে, সল্লির উপযুক্ত পাত্র এ দেশে পাওয়া যাবে না। ঢাল-তরোয়ালধারী বীর যোদ্ধা চাই, সে আর বাঙালিদের মধ্যে কোথায়?

—বিবি, তুই কেন বিয়ে করতে চাস না সত্যি করে বল তো। তোর যখন অন্য কোনও অ্যামবিশান নেই, তোর পক্ষে বিয়ে করাই তো স্বাভাবিক। কত ছেলে তোর জন্য হেদিয়ে মরছে! এখানে তো আর কেউ নেই, আমাকে বল না, বিয়ে সম্পর্কে তোর কী ধারণা? তুই ভয় পাস?

—ভয়? তা এক রকম বলতে পারিস। আমার দূরে চলে যেতে ভয় করে। বিয়ে হয়ে গেলে কোনও একটা অচেনা জায়গায় চলে যাব। সব অচেনা মানুষজন, এখানকার সবাইকে ছেড়ে থাকতে হবে।

—কেন, কলকাতা শহরের মধ্যে বুঝি বিয়ে হতে পারে না? এখন তো আর সেই আগেকার দিন নেই, যে মেয়ের বিয়ে হল আর বাপের বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেল, শ্বশুরবাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন! কলকাতায় বিয়ে হলে বাপের বাড়িতে আসা-যাওয়া করবি। কিংবা একজন বেশ শান্তশিষ্ট ঘরজামাই আনলেই হয়, তোকে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে না। ঠাকুর-পরিবারে সেটা তো নতুন কিছু নয়!

—আমি ঘর-জামাইদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এই যাঃ— কী বলে ফেললুম!

—লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমার বাবাও ঘর-জামাই থাকেননি। তোর জন্য আমার চিন্তা হয়, বিবি। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকিস, শেষ পর্যন্ত যদি তোর বিয়ে না হয়? বিধবা হওয়ার চেয়েও আইবুড়ো হয়ে থাকা কি কম জ্বালা?

—তুই থাম তো, আর বিয়ে বিয়ে করতে হবে না। আমার বিয়ের চিন্তায় গোটা বংশের কারুর যেন ঘুম নেই। সকলের মুখে এক কথা। তুই যে বিয়ে করছিস না সে জন্য তোকে তো কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। আমার জন্যই শুধু যত চিন্তা। সেদিন দিনু পর্যন্ত এসে বলল, বিবিপিসি, বিয়ে করো না কেন? আমি বললুম, ধ্যাৎ, তুই থাম তো ছোঁড়া। ভাইপো হয়ে আবার পিসির বিয়ে দিতে এসেছেন!

দুই বোন এবার প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

সরলা ও ইন্দিরা যথাক্রমে পঁচিশ ও চব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত কুমারী থেকে ঠাকুর পরিবারে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। শুধু ঠাকুর পরিবারে কেন, বাংলায় আর কোনও ভদ্র, উচ্চবংশীয় পরিবারে এরকম সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার একেবারে অকল্পনীয়। অথচ দুটি কন্যারই পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা প্রচুর।

ইন্দিরা বলল, নু জাভোঁ শাঁখ তুত্ সেলা, তাই না?

সরলা বলল, ফরাসি কথা, মানে কী রে?

ইন্দিরা বলল, আমরা ও সব রীতি-নীতি বদলে দিয়েছি! মলিয়েরের একটা নাটকে আছে। অচেনা একজন লোককে বিয়ের মন্ত্র পড়ার পরেই প্রাণনাথ বলে আমি ডাকতে পারব না। ওসব আমার দ্বারা হবে না।

সরলা আবার খাতাখানি ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, রবিমামা তোকে এত চিঠি লিখেছেন?

ইন্দিরা বলল, রবিকা যেখানেই যায়, আমাকে লেখে। আমার কাছে সব মনের কথা বলে। সন্নি, তুই নিশ্চয়ই মানবি, রথীর মা এসব কথা কিছুই বুঝতে পারে না। আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয়, রবিকা খুব একা। বাড়িতে যখন থাকে, বউয়ের কাছে শুধু ঘর-সংসারের কথা আর ছেলেমেয়েদের কথা শুনতে হয়। ওতে কি তার মন ভরে? একটা নতুন কবিতা লিখে কাকে শোনাবে? রথীর মাকেও দোষ দিতে পারি না, পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়েকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যায়।

সরলা বলল, শুধু ছেলেমেয়ে সামলানো নয়, মৃণালিনীমামী রান্নাঘর বড্ড ভালবাসে, যখনই যাই দেখি যে রান্নাঘরে কিছু না কিছু রাঁধছে।

ইন্দিরা বলল, রবিকার জন্য আমার মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। অতবড় একজন কবি। এই যে রবিকা কীটসের কথা লিখেছে, কীট্স ভাল কবি হতে পারে, রবিকাই বা কম কীসে? সাহেবদের দেশে জন্মালে রবিকার আজ কত কদর হত। সাহেবরা ওর লেখার খবরও রাখে না।

সরলা বলল, তুই ইংরেজিতে কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ কর না! ইংরিজির এত ভাল ছাত্র ছিলি...

ইন্দিরা বলল, আমার দ্বারা হবে না। কত বড় বড় পণ্ডিত রয়েছেন। কারুর না কারুর করা উচিত। আমার কী মনে হয় জানিস, সন্নি, যথাসাধ্য রবিকার সেবা করি, ওর কাছাকাছি থাকি, ওর মনে স্ফূর্তি এনে দিই, দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করি, গান শোনাই... তুই লক্ষ করেছিস, পিয়ানোতে নতুন কোনও সুর বাজালে রবিকার অমনি গান রচনার ইচ্ছে জাগে? কতদিন আমাদের সঙ্গে কথা বলা বা তর্ক করার পর রাত্তিরে সে বিষয়ে কবিতা লিখেছেন বা প্রবন্ধ লিখেছেন। একজন প্রতিভাবান লেখককে উৎসাহিত করার জন্য আমার মতন দু'একজনের জীবন নিবেদন করলেও একটা কাজ হয়। রবিকার জন্য আমি সব কিছু ছাড়তে পারি। সারাজীবন বিয়ে না করে আমি যদি রবিকার কাছাকাছি থাকি, তাতে আমার একটুও কষ্ট হবে না।

সরলা জিজ্ঞেস করল, রবিমামা তোকে বিয়ের জন্য তাড়া দেন না?

ইন্দিরা বলল, আর সবাই বললেও রবিকা একবারও ও কথা উচ্চারণ করেননি।

এই সময় শত শত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল ঝড়। জানলাগুলিতে খটাখট শব্দ হতেই ওরা দৌড়ে গেল। ইন্দিরা পর পর জানলা বন্ধ করতে লাগল, সরলা একটির কাছে দাঁড়িয়ে বলল, এটা বন্ধ করতে হবে না, আয় ঝড় দেখি।

ইন্দিরা বলল, চোখে ধুলো লাগবে যে।

সরলা বলল, লাগুক! প্রকৃতির এই শক্তির প্রকাশ দেখলে আমার ভারী আনন্দ হয়। দ্যাখ দ্যাখ বড় বড় গাছের ডগাগুলো কেমন নুইয়ে দিয়েছে বাতাস, যে-বাতাস দেখা যায় না!

ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দে ইন্দিরার ভয় ভয় করে, চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের পর প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও। কিন্তু সরলা সরে আসার পাত্রী নয়, সে দাঁড়িয়ে রইল জানলার শিক ধরে।

একটু পরেই ঝড় প্রশমিত হয়ে নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি দেখতে ইন্দিরারও ভাল লাগে, সে বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির স্পর্শ নিতে নিতে গুনগুনিয়ে গাইতে লাগল একটা গান।

হঠাৎ গান থামিয়ে বলল, সন্নি, তোর তো বীরপুরুষ পছন্দ। ঢাল-তলোয়ারধারী বাঙালি যখন পাওয়া যাবে না, বন্দুকধারী বাঙালি হলে চলবে? প্রতিভাদিদির এক দেওর, কুমুদ, তিনি খুব ভাল বন্দুক চালাতে পারেন। প্রায়ই শিকার করতে যান শুনেছি। একবার সেই কুমুদবাবুকে দেখবি নাকি?

সরলা সকৌতুকে বলল, চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি? প্রতিভাদিদির তো অনেকগুলো দেওর, তারা তো প্রায়ই এ বাড়িতে তোর হাতের চা খেতে আসে শুনেছি।

ইন্দিরা বলল, ওরা রবিকাকে খুব পছন্দ করে, রবিকার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

সরলা বলল, রবিমামার সঙ্গে দেখা করার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না গিয়ে এখানে আসে যখন, নিশ্চয়ই অন্য টান আছে। হ্যাঁরে বিবি, ওদের ভাইদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সেই মৃত্যুঞ্জয়নাথের সঙ্গে আমাদের দ্বিপুদার মেয়ে নলিনীর বিয়ে হয়ে গেল, অথচ তার ওপরে ক'টা ভাই রয়েছে, তারা এলিজিবল ব্যাচেলর, তাদের এখনও বিয়ে হল না, এটা কী রকম ব্যাপার রে?

ইন্দিরা বলল, তা আমি কী জানি?

সরলা বলল, তুই জানিস না? সুহৃত্তের এক দাদা, প্রমথ, ওই যে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেও ভ্যারেন্ডা ভাজছে, সেও তো বিয়ে করেনি। তুই সেই প্রমথকে আপনির বদলে তুমি বলিস? অ্যাই অ্যাই, মাথা নাড়লে চলবে না, আমি শুনে ফেলেছি। গতবারে সুরেনের জন্মদিনে অনেকে এসেছিল, আশু চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানির সবাই ছিল, একসময় তুই সিঁড়ি দিয়ে নামছিলি আর প্রমথ উঠছিল, তুই আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলি, তুমি খেয়েছ? ভাল করে খেয়েছ? আমি পেছন থেকে শুনে ফেলেছি!

ইন্দিরা লজ্জাবনত মুখে বলল, উনি ইনসিস্ট করেন আমাকে তুমি বলার জন্য।

সরলা বলল, উনি ইনসিস্ট করলেই...তুই প্রথমে যখন চিঠিখানা লুকোচ্ছিলি, আমি ভেবেছিলুম বুঝি ওই প্রমথবাবুর চিঠি। মানুষটি খুব বাক্যবাগীশ। তোকে চিঠি লেখে নিশ্চয়ই?

ইন্দিরা বলল, তা লেখেন কখনও সখনও। আমরা পরস্পরের বন্ধু।

সরলা ভুরু তুলে বলল, বন্ধু? এই বন্ধুত্বের পরিণতি কী?

ইন্দিরা বলল, কী আবার পরিণতি হবে? একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকতে পারে না সারাজীবন?

সরলা বলল, কেন পারবে না? দু'জনেই যদি লেখাপড়া জানা হয়, একটা ইনটেলেকচুয়াল ফ্রেন্ডশিপ তো হতেই পারে। কিন্তু সমাজ কি তা মেনে নেবে?

এই আলোচনা আর এগোতে পারল না, দেখা গেল, গেট দিয়ে একটা বগি গাড়ি ঢুকছে। দু'জনেই সেদিকে তাকাল, ইন্দিরা বলে উঠল, রবিকা এসেছে, রবিকা!

সরলা বলল, আমি তবে এবার যাই?

ইন্দিরা বলল, ওমা, রবিকা এসেছে। তুই চলে যাবি কেন? দেখা করবি না?

সরলা বলল, উনি বোধহয় তোর সঙ্গে আলাদা করে বিশেষ কোনও কথা বলতে এসেছেন।

ইন্দিরা এবার হেসে বলল, ধ্যাৎ! মুখখানা তোর ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন রে সন্নি? রবিকাকে ভয় পাচ্ছিস নাকি? দেখিস, রবিকা তোকে কিছুই বকবেন না।

গাড়ি থেকে নামতে নামতেই বৃষ্টিতে খানিকটা ভিজে গেছেন রবি। একটা তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে এলেন। পরনে শুধু কুর্তা আর পাজামা। ইন্দিরা দরজার কাছে উৎসুকভাবে দাঁড়িয়েছে, রবি কাছে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, বি, বি, দুটো মৌমাছি, দেখিস যেন হুল ফোটাসনি।

ইন্দিরা বলল, রবিকা, সন্নি এসেছে।

ঘরের ভেতরে তাকিয়ে রবি বললেন, এই যে বীরাঙ্গনা, আবার কী নতুন প্রস্তাব?

সরলা শুধু হাসল।

রবি বললেন, সন্নি, এমাসের 'ভারতী' খানা পাইনি এখনও। পাঠিয়ে দিস তো।

তারপর ইন্দিরার দিকে ফিরে বললেন, এক্ষুনি যেতে হবে রে। অনেক কাজ। কালই নাটোর রওনা হব। বিবি, তোদের বাড়িতে আমার পকেট-ঘড়িটা ফেলে গেছি? কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না তো। বাইরে গেলে ঘড়িটা লাগে।

ইন্দিরা বলল, ঘড়ির কথা তোমার খেয়ালই থাকে না। ভুলো গঙ্গারাম একটা। মা সে ঘড়ি তুলে রেখেছেন। হঠাৎ নাটোর যাবে কেন?

রবি বললেন, হঠাৎ কেন হবে, আগে থেকেই তো ঠিক হয়ে আছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কনফারেন্স হবে না নাটোরে? অনেকেই যাচ্ছেন। এবার সেখানে একটা হাঙ্গামা বাধাব।

—ওমা, কীসের হাঙ্গামা হবে ?

—বড় বড় নেতাদের দিয়ে এবারে বাংলা বলিয়ে ছাড়ব। গ্রামের সাধারণ মানুষের সামনে ওঁরা ইংরিজি বক্তৃতার তুফান ছোটান, কেউ কিছু বুঝতে পারে না। এরকমটা আর চলতে দেওয়া যায় না। ছেলে ছোকরাদের একটা দলকে উস্কে রেখেছি, ওখানে কোনও নেতা ইংরিজি বক্তৃতা শুরু করলেই তারা হই হই রব তুলবে।

—রবিকা, আমিও নাটোর যাব। আমাকে নিয়ে চলো।

—তুই যাবি ? তা যেতে পারিস।

সরলা বলল, রবিমামা, আমিও নাটোর যেতে চাই।

রবি তার দিকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, তুইও যাবি ? তোর যাওয়ার যে একটু মুশকিল আছে।

সরলা বলল, কীসের মুশকিল ? কলকাতার ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে আমি গান গেয়েছি, প্রাদেশিক কংগ্রেসে যাবার অধিকার নেই আমার ?

রবি বললেন, অধিকার নিশ্চয়ই আছে। মুশকিলটা হচ্ছে এই, নাটোরের রাজা জগদিন্দ্র এবারকার হোস্ট। জগদিন্দ্র একদিন বলছিলেন, সরলা ঘোষাল কী সব করছে, ওর পেছনে পুলিশ লাগবে। তুই গেলে তোর পিছু পিছু নাটোরেও যদি পুলিশ যায়, সেটা জগদিন্দ্রের পক্ষে সুখকর হবে না। আমার অবশ্য মনে হয় না, পুলিশ এতটা বাড়াবাড়ি করবে।

সরলা ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, আমি না গেলেও তুই যাবি ?

ইন্দিরা আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, না।

রবি বললেন, বরং তোরা দু'জনেই এক কাজ কর। আমি সরাসরি যাচ্ছি না, আমাকে একবার শিলাইদহ ঘুরে যেতে হবে। অবন, বলু এরা সব যাচ্ছে স্পেশাল ট্রেনে পরশু দিন। ওদের সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ না, ওরা যদি তোদের নিয়ে যায়—

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দু'বোনেরই নাটোর যাওয়া হল না। মহারাজ জগদিন্দ্র কংগ্রেসের সব নেতা এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বাড়ির দু'তরফের প্রায় সবাইকেই ঢালাও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু মহিলাদের কথা উল্লেখ করেননি। অনাহুতভাবে মহিলাদের নিয়ে যাওয়া চলে না, তাদের থাকার ব্যবস্থার অসুবিধে হবে।

কংগ্রেসের অধিবেশন বটে, কিন্তু এ যেন নাটোরের রাজার ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ। খরচপত্র সবই তাঁর। কলকাতা থেকে পুরো একটি স্পেশাল ট্রেন, প্রতিটি স্টেশনে, মহারাজের লোক দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে প্রচুর খাবার-দাবার, তা ছাড়াও কার কী প্রয়োজন তার তদারকি করার জন্য। ট্রেন এসে থামল সারাঘাটে, সেখানে স্টিমার প্রস্তুত। নাটোর পৌঁছে দেখা গেল, ব্যবস্থাপনা একেবারে নিখুঁত তো বটেই, এলাহি ব্যাপার যাকে বলে। অনেকগুলি বাড়ি সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে, সকলের জন্য নম্বর করা নির্দিষ্ট বিছানা, প্রত্যেক বিছানার পাশে একটি করে বাক্স, তার মধ্যে রয়েছে নতুন ধুতি-চাদর। কলকাতা থেকে সবাই নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদের পুঁটুলি নিয়ে এসেছেন, সেগুলি খোলারই দরকার হবে না।

এমনভাবে সকলকেই ধুতি-চাদর উপহার দেওয়ার অন্য একটি গূঢ় উদ্দেশ্যও আছে। রবি এবং তাঁর অনুরাগী তরুণ সমাজ আগে থেকেই মতলব করে এসেছে, এবারের সম্মেলনে সকলকেই বাঙালি মতে দেশি পোশাক পরে আসতে হবে। এখন বাড়ির বাইরে বাঙালিরা চোগা-চাপকান পরে থাকেন, আর বিলেত-ফেরত বা হোমড়া-চোমড়ার সর্বক্ষণ সুট-টাই। মোজা না পরা অবস্থায় পা দেখানো তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন না। এখন ধুতি-চাদর পরার প্রস্তাব উঠলে কেউ আর বলতে পারবেন না যে আমি ধুতি আনিনি।

শুধু বাঙালি পোশাক নয়, সম্মেলনের সব কার্যক্রম চলবে বাংলা ভাষায়। অধিবেশনের শুরুতেই যুবকের দল এই প্রস্তাব তুলবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র রবির চেয়ে বয়েসে ছ'সাত-বছরের ছোট হলেও রবির বিশেষ অনুরক্ত বন্ধু, রবি তাঁকে একটি বইও উৎসর্গ

করেছেন। মহারাজ জগদিন্দ্রকে রবি শুধু নাটোর বলে ডাকেন। জগদিন্দ্রের গান-বাজনা, খেলাধুলো ও সাহিত্য সব দিকেই খুব উৎসাহ, নিজে ভাল পাখোয়াজ বাজান। প্রবীণ নেতাদের বিরুদ্ধে নবীন দলের এই যে বিদ্রোহ, জগদিন্দ্রও তাতে গোপনে যোগ দিয়েছেন।

প্রবীণরা কিন্তু নবীনদের এই দাবি মানতে চাইলেন না। সম্মেলন শুরু হবার আগেই চলতে লাগল তর্ক বিতর্ক। প্রবীণদের মধ্যে আছেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, জানকীনাথ ঘোষাল প্রমুখ। তাঁরা বললেন, অনেকদিন ধুতি পরার অভ্যেস নেই। সভার মধ্যে মুক্তকচ্ছ হবার সম্ভাবনা। আর বাংলায় বক্তৃতা ? কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় দল, সেখানে বাংলায় বক্তৃতা কেন হবে ?

তরুণরা বলল, মুক্তকচ্ছ হবার সম্ভাবনা থাকলে বেল্ট বেঁধে ধুতি পরুন। আর কংগ্রেস সর্বভারতীয় দল ঠিকই, কংগ্রেসের বাৎসরিক জাতীয় অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি আসে, সেখানে ইংরিজিতে বক্তৃতার যুক্তি আছে। কিন্তু প্রাদেশিক কনফারেন্স হচ্ছে বাংলাদেশে, বক্তারা সবাই বাঙালি, আর শ্রোতারাও বাংলার সাধারণ মানুষ, তাদের মধ্যে চাষা-ভুষোও থাকে, তারা ইংরিজি এক বর্ণও বোঝে না। তাদের সামনে চোস্ত ইংরিজিতে বক্তৃতা করা হাস্যকর নয় ?

প্রবীণরা বললেন, বাংলায় আবার বক্তৃতা দেওয়া যায় নাকি ? বাংলায় সারগর্ভ কথা বলার মতন ভোকাবুলারিই নেই ! সাধারণ ঘর সংসারের কথা বাংলায় চলে, রাজনৈতিক বক্তৃতা চলে না।

এর প্রতিবাদে যুবকের দল হই হই করে উঠল।

শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল। যে-ক'জন নেতা ইংরিজি ছাড়া বাংলায় বক্তৃতা দিতে একেবারেই পারেন না, তাঁরা ইংরিজিতেই বলবেন, তরুণদের পক্ষ থেকে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সব বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করে শোনাবেন। আর গান হবে সব বাংলায়, তা বলাই বাহুল্য।

মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, কয়েক হাজার লোকের সেখানে স্থান সঙ্কুলান হবে। অধিবেশনের আর দু'দিন বাকি আছে, এর মধ্যে আদর-আপ্যায়নের ঠেলায় কারুর কারুর প্রাণ ওষ্ঠাগত। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ডজন হুঁকো-বরদার এসে বিছানাতেই গড়গড়ার নল হাতে গুঁজে দেয় ধূমপায়ীদের। যারা চুরুট কিংবা সিগারেট পছন্দ করে, তাদের জন্যও ওসব রয়েছে প্রচুর। প্রাতঃকৃত্য সারার পরেই কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে জলপান, চপ-কাটলেট, লুচি-মণ্ডা, পুডিং, মিষ্টান্ন তো আছেই, তা ছাড়া কার চা, কার কফি, কার ডাবের জল, সোডার জল বা অন্য পানীয় চাই, তাও হাতের কাছে মজুত। দুপুরে ও রাত্রের ভোজের জন্য ভিয়েন বসেছে। বড় বড় উনুনে সর্বক্ষণ রান্না চলেছে, পাচক-হালুইকররা সদা ব্যস্ত, বারোয়ারি খানা নয়, যে-যেটা খেতে চাইবেন, ঠিক সেইরকমই প্রস্তুত করে দেওয়া হবে। মাছ-মাংস-ডিম-পিঠে-পায়েস সবই আছে। একজন রসিকতা করে বলল, রসগোল্লা গরম গরম হয়, কিন্তু সন্দেশ হয় ঠাণ্ডা। গরম সন্দেশ পাওয়া যায় না ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, কেন পাওয়া যাবে না ? খাবারের ঘরের দরজার সামনে উনুন পেতে মস্ত কড়া চাপানো হল। সন্দেশ পাক দিয়ে সেই কড়াই থেকেই গরম গরম তুলে এনে দেওয়া হল সকলকে !

আলাদা আলাদা বাড়িগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ক্যাম্প। বয়সের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা। সাহেব-মনস্ক প্রবীণদের নানারকম পিটপিটিনি দেখে তরুণরা আড়ালে হাসাহাসি করে। তরুণদের শিবিরই গান-বাজনা, হই-হুল্লোড়ে জমজমাট। গান গাইবার জন্য রবিকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে।

অনেকদিন পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বাইরে বেরিয়েছেন, এসেছেন এই দলের সঙ্গে। এখনও তাঁর মনের ভার কাটেনি, সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন না, মাঝে মাঝেই উদাসীনের মতন চুপ করে বসে থাকেন। রবিও যেন জ্যোতিদাদাকে একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন, দু'জনে মুখোমুখি পড়ে গেলে কথা খুঁজে পান না। সময় মানুষকে কত বদলে দেয়। চন্দননগরের সেই সুমধুর দিনগুলির কথা মনে পড়লে এখনও রবির বুক মুচড়ে ওঠে।

বিশেষ কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এখন তার ছবি আঁকার ঝোঁক চেপেছে।

নাটোরের বিভিন্ন মন্দির ও প্রাসাদের স্কেচ করেন, কিছু কিছু মানুষেরও স্কেচ করেন, যাদের মাথার আকৃতি আকর্ষণীয় মনে হয় তাঁর কাছে। ছেলে-ছোকরাদের মধ্য থেকেই বেছে নিচ্ছেন, চাঁইদের ধারে কাছে যান না। এক এক সময় তাঁর সঙ্গে থাকে এক ভাইপো, অবন। এই ছেলেটির আঁকার হাত বেশ ভাল।

সম্মেলনের শুরুতে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন ইংরিজিতে। মেজদাদার পাশে দাঁড়িয়ে রবি তৎক্ষণাৎ প্রতিটি বাক্যের অনুবাদ করে শোনাতে লাগলেন বাংলায়। এরপর অন্যান্য বক্তারাও ইংরিজিতেই বক্তৃতার আগুন ছোটালেন। বিক্ষুব্ধ তরুণরা মাঝখানে একবার চ্যাঁচামেচি করে উঠলেও সুবিধে হল না। বক্তারা বাংলাতে বলবেনই না। রবি সকলের বক্তৃতাই বাংলায় অনুবাদ করে যেতে লাগলেন। বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কোনও ক্লান্তি নেই। শুধু শেষের দিকে বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ একেবারে বিশুদ্ধ ও জোরালো বাংলায় বক্তৃতা করে চমকিত করে দিলেন সবাইকে। শ্রোতারা সহর্ষ হাততালিতে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। এই তো যেন জয় হল বাংলা ভাষার।

রবির গান দিয়েই প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হল।

সভাভঙ্গের পর বাইরে বেরুবার সময় পাক্কা সাহেব ডব্লু সি ব্যানার্জি রবির কাঁধ চাপড়ে বাঁকা সুরে বললেন, ওয়েল, ওয়েল, রবিবাবু, ইয়োর বেঙ্গলি ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল, বাট ডু ইউ থিঙ্ক ইয়োর *চাষাজ* অ্যান্ড *ভুষাজ* আন্ডারস্টুড ইয়োর মেল্লিফ্লুয়াস বেঙ্গলি বেটার দ্যান আওয়ার ইংলিশ?

অনেকেরই আশঙ্কা ছিল প্রবীণ ও নবীন দলের মন কষাকষিতে সম্মেলন ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেরকম কোনও সম্ভাবনা দেখা দিল না। কিন্তু আর একটি সাঙ্ঘাতিক বিপদ যে আসন্ন, তা কেউ জানে না তখনও।

সভা মণ্ডপের বাইরে টেবিল-চেয়ার পেতে চা পানের ব্যবস্থা হয়েছে। বিকেল পাঁচটা বাজে, আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু পাখিগুলো যেন অকারণে বেশি কিচির মিচির করতে করতে উড়ে যাচ্ছে। দূরে কোথাও এক সঙ্গে শোনা যাচ্ছে অনেকগুলি কুকুরের ডাক। চায়ের সঙ্গে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যও রাখা রয়েছে, কিন্তু কেউ সেসব বিশেষ মুখে তুলছেন না। আজ সন্ধের সময় দিঘাপাতিয়ার রাজপ্রাসাদে সমস্ত অতিথিদের সংবর্ধনা ও ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ঠিক সাতটায় সেখানে উপস্থিত হবার কথা। সেই রাজকীয় ভোজের আগে এখন কে আর অন্য খাবার খেয়ে পেট ভরাতে চায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে গল্প চলছে ছোট ছোট বৃত্তে। বৈকুণ্ঠ নামে এক ভদ্রলোক বেশ জমিয়ে একটা রোমহর্ষক কাহিনী শুরু করেছে, মন দিয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ অবনের হাতের চায়ের কাপ চলকে উঠে পড়ে গেল খানিকটা চা। অবন ভাবল, এ কী তার হাত কাঁপল কেন? আরও কাঁপছে, কাপটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। তারপর দেখা গেল সবারই হাতের কাপে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

অবন দু'হাত দিয়ে কাপটা ধরে আবার চুমুক দিতে যেতেই বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত শুরু হল। চতুর্দিকে বোমা ফাটার মতন বিকট শব্দ। কেউ বাজি পোড়াচ্ছে না কামান দাগছে? হাতিশালের হাতি আর ঘোড়াশালের ঘোড়াগুলি আর্ত চিৎকার শুরু করেছে, মণ্ডপটা দুলছে, মাটি দুলছে, শত শত শাঁখ বেজে উঠল।

এটা যে ভূমিকম্প তা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। তারপরেই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়। কে কার নাম ধরে ডাকছে বোঝা যাচ্ছে না, ধুলো বালিতে চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে রবি এক সময় এসে অবনের হাত ধরে ফেললেন, সামনে একটা মস্ত ফাটল, অবন আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল, সেই ফাটলের মধ্য থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। লাফিয়েও সেই ফাটল পেরুনো যাবে না। ঝাপসা অন্ধকারের মধ্য থেকে এসে আশু চৌধুরী বললেন, ডান দিকে কেউ যেয়ো না, নদী উপচে এগিয়ে আসছে।

এই বুঝি মহাপ্রলয়। কারা যেন চিৎকার করছে, পালাও পালাও! কিন্তু কে কোন দিকে পালাবে? দ্রুম-দ্রাম করে এক একটা বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রেল লাইনের দিকটা

উঁচু। সেখানে উঠে দাঁড়ালে কি রক্ষা পাওয়া যাবে?

যেমন হঠাৎই শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

অনেকেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে লাগল, বেঁচে আছি? সত্যি বেঁচে আছি।

দূরে শোনা যাচ্ছে কান্নার কলরোল। হতাহতের সংখ্যা এখনি জানা যাচ্ছে না, তবে ধ্বংসের চিহ্ন বিপুল। এরই মধ্যে কিছু রাজকর্মচারী এসে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগলেন, আপনাদের সকলেই ঠিকঠাক আছেন। রাজপ্রাসাদের একটি অংশের কোনও ক্ষতি হয়নি, আপনারা সেখানেই বসবেন চলুন, আর ভয় নেই।

ফেরার পথে অবন আর রবি দেখলেন, পুকুরের ধারে একটা ভারী সুন্দর মন্দির ছিল, সেটা একেবারে ধ্বংসস্তূপ। আরও কত বাড়ি অর্ধেক ভাঙা। উল্টে গেছে প্রচুর বড় বড় গাছপালা। নাটোরের রাজাদের বৈঠকখানা বাড়িটি ছিল দেখবার মতন, বহু সুদৃশ্য ঝাড়লণ্ঠনে সাজানো, কত রকম ফুলদানি আর ঘড়ি ছিল, আগাগোড়া লাল কার্পেট পাতা, সে বাড়ি একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। রবির মুখ থমথম করছে। নিজেরা তো এখানে বেঁচে গেলেন, কিন্তু কলকাতার কী অবস্থা? সেখানকার প্রিয়জনেরা কেমন আছে?

এক জায়গায় আবার সবাই মিলে বসার পর নানান ধ্বংসের বিবরণ আসতে লাগল। রেল লাইন উপড়ে গেছে, টেলিগ্রাফের লাইন ছিন্ন ভিন্ন, অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে ব্রিজ। এক্ষুনি এখান থেকে কলকাতায় ফেরারও উপায় নেই।

একটি সংবাদ শুনে সকলে দ্বিতীয়বার শিহরিত হল। দিঘাপাতিয়ার যে-রাজবাড়িতে সকলের আজ সাতটার সময় যাবার কথা ছিল, সেই প্রাসাদটি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, চাপা পড়েছে বেশ কয়েকজন। অর্থাৎ, ভূমিকম্প যদি পাঁচটার বদলে সাতটায় শুরু হত, তা হলে বাংলা মায়ের বহু কৃতী সন্তান, প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ, কত কবি-শিল্পী-গায়ক সব একসঙ্গে শেষ হয়ে যেত।

৩৬

কথায় বলে, বিপদ যখন আসে, তখন একা আসে না। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে যখন গ্রামাঞ্চলে হাহাকার পড়ে গেছে, তারই মধ্যে ভূমিকম্প দারুণ তাণ্ডব ঘটিয়ে গেল। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ উত্তর-পশ্চিম ভারতেই বেশি, আর ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা উত্তর-পূর্ব ভারত, বিশেষত বাংলাদেশ এবং আশেপাশের রাজ্যগুলিতেই ছড়িয়ে রইল। স্মরণকালের মধ্যে বাংলায় এত বড় ভূমিকম্প আর হয়নি।

রাজশাহি, ঢাকা, মৈমনসিং-এর বহু বাড়ি একেবারে বিধ্বস্ত, নদীর জল উঠে প্লাবিত হল অনেক গ্রাম, অসংখ্য মানুষ হতাহত ও গৃহচ্যুত হল। মাঠে মাঠে হাজার হাজার গরু-মহিষ-ছাগলের মৃতদেহ পচে গেলে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। প্রথম দিনের ভাঙচুরের পরও কয়েকদিন ধরে মাঝেমাঝেই ভূমি কেঁপে ওঠে, আরও গভীর বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত মানুষ দিশেহারা। যারা প্রবাসে রয়েছে, তারা দূরের আত্মীয়স্বজনের কোনও সংবাদ পাচ্ছে না, ট্রেন চলাচলও বন্ধ।

ত্রিপুরায় রাজবাড়িটি একেবারে তাসের বাড়ির মতন ভেঙে পড়েছে। পিতৃবিয়োগের পর মহারাজ রাধাকিশোর নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যেও সবে রাজ্যপাট গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, এই নিদারুণ বিপদে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। সেই বিশাল অট্টালিকার আনাচে কানাচে কত নারী-পুরুষ যে ছিল তার হিসেব নেই। অনেকেই চাপা পড়েছে, দ্রুত উদ্ধারকার্যে যখন সংজ্ঞাহীন ও মুমূর্ষুদের বার করে আনা হচ্ছে, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্যা রানিরা এই প্রথম খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে কান্নাকাটি

করছেন, তখন কয়েকজনের খেয়াল হল যে, প্রাক্তন মহারাজের ছোট রানি মনোমোহিনীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজার মৃত্যু হলে রানিদেরও সুখের দিন অস্তমিত হয়। ভূতপূর্ব মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের শেষ জীবনে প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন মনোমোহিনী, এঁর গর্ভে মহারাজের পাঁচটি পুত্র-কন্যা জন্মেছে। নতুন রাজা রাধাকিশোরের সঙ্গে মনোমোহিনীর সম্পর্ক তেমন ভাল নয়, পারতপক্ষে তিনি এঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। তবু তিনি যখন শুনলেন মনোমোহিনী ও তাঁর সন্তানদের জীবিত বা মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়নি, তখন তিনি সেপাই সান্ত্রীদের হুকুম দিলেন যেভাবেই হোক ওদের খুঁজে বার করতে হবে। ইট-কাঠ-পাথর সরাতে সরাতে এক সময় শোনা গেল একাধিক শিশুকণ্ঠের কান্না। উদ্ধার প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত করার পর দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

সমগ্র প্রাসাদটি প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও দু'-একটি কক্ষ যেন দৈববলে অক্ষত আছে। সেই রকম একটি কক্ষে মনোমোহিনী তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসে আছেন, এত বড় একটি কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরেও তাঁর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। উদ্ধারকারীদের একজন একটি ক্রন্দনরত শিশুকে কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করতেই মনোমোহিনী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, খবরদার, ওদের গায়ে কেউ হাত ছোঁয়াবে না। আমরা এখানেই থাকব।

উদ্ধারকারীদের শত অনুরোধেও কর্ণপাত করলেন না মনোমোহিনী, তিনি কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চান না। এ তো বড় অদ্ভুত কথা। ওরকম ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তিনি থাকবেন কী করে!

এ সংবাদ পেয়ে স্বয়ং রাধাকিশোর ছুটে এলেন। মনোমোহিনী মণিপুরের মেয়ে। তাঁর উদ্ধার ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটির কথা জানাজানি হলে এ রাজ্যের মণিপুরিরা ক্ষেপে যাবে। তা ছাড়া রাধাকিশোর কারুর সঙ্গেই পূর্বতন মনোমালিন্য বজায় রাখতে চান না। রাজাকে সকলের প্রতিই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়।

মনোমোহিনী রাজা রাধাকিশোরের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। পাঁচটি পুত্র-কন্যার জননী হলেও তাঁকে এখনও সদ্য যুবতীর মতনই দেখায়। তবু রাধাকিশোর হাতজোড় করে মনোমোহিনীকে জননী সম্বোধন করলেন। মিনতিপূর্ণ স্বরে বললেন, মা তুমি এখানে থাকতে চাও কেন? যে-কোনও মুহূর্তে এ কক্ষের দেওয়াল ভেঙে পড়তে পারে। নয়া হাভেলিতে আমি আস্তানা বানাচ্ছি। এখানে যে-কটি বাড়ি অক্ষত আছে সেগুলিতে রানিরা আপাতত থাকবেন, আমার গর্ভধারিণীও রয়েছেন, আপনিও চলুন!

সন্তানদের আগলে ঠিক যেন একটি বাঘিনীর মতন ঘরের এককোণে বসে আছেন মনোমোহিনী। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটি। তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি মরিনি। আমার সন্তানদেরও কেউ মারতে পারবে না।

রাধাকিশোর চমকিত হয়ে বললেন, পরম করুণাময় ঈশ্বর আপনাদের রক্ষা করেছেন। আপনার সন্তান, ওরা আমার ভ্রাতা-ভগিনী, ওদের কে ক্ষতি করবে?

মনোমোহিনী ওপরে ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে বললেন, আমার স্বামী, দেবতার মতো আমার পতি, তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। চতুর্দিকে সব ভেঙে পড়ল, আমি মনে মনে শুধু তাঁকে ডেকেছি, তাই এই ঘরের কোনও ক্ষতি হয়নি। আমি এই ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি নতুন রাজপ্রাসাদ বানাও, সেখানে রাজত্ব করো গে! আমি আমার স্বামীর প্রাসাদেই থাকব।

শত অনুরোধ-উপরোধেও মনোমোহিনীকে টলানো গেল না। রাধাকিশোর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তক্ষুনি রাজমিস্তিরি লাগানো হল সেই অংশটি মেরামত করার জন্য।

কুচবিহার রাজ্যের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তবে সেখানকার রাজপ্রাসাদটি অনেকখানি রক্ষা পেয়েছে। মহারানি সুনীতি দেবী আর্তদের সেবা ও ক্ষতিপূরণের জন্য উদার হস্তে অর্থব্যয় করতে লাগলেন।

নাটোরে ঠাকুরবাড়ির দলবল কয়েকদিন আটকে থাকার পর কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই একটি ট্রেনে চেপে বসল। পথের বিপদ এখনও কাটেনি, তবু পরীক্ষামূলকভাবেই ট্রেনটি ছাড়া হয়েছে।

কলকাতার প্রিয়জনদের জন্য সবাই উদ্বিগ্ন, যদিও এর মধ্যে একটা তার এসেছে জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে। কিন্তু টেলিগ্রাম-চিঠিতে বড় কোনও দুঃসংবাদ জানানো হয় না।

স্নেহ নিম্নগামী। মা নেই, বাবা, ভাই-বোন, এমনকী নিজের স্ত্রীর চেয়েও রবির বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের জন্য। দুরন্ত সব শিশু, ওদের কিছু হয়নি তো? ট্রেন যখন শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছল, তখন দেখা গেল বহু লোক সেখানে উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছে, ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকে তারা দূরের জেলাগুলির অবস্থা জানতে চায়।

সত্যেন্দ্রনাথের জন্য একটি গাড়ি এসেছে। তিনি রবিকে বললেন, তুইও আমার সঙ্গে চল। বালিগঞ্জের বাড়িতে গেলেই সব খবর পাওয়া যাবে, তুই ওখানে বিশ্রাম নিয়ে নিবি।

সার্কুলার রোডে বিবি রয়েছে অধীর অপেক্ষায়। নাটোর থেকে তাকে চিঠি লেখারও সময় পাওয়া যায়নি। রবি তার সঙ্গে গিয়ে প্রথম দেখা না করলে তার খুব অভিমান হবে।

একটু দ্বিধা করেও রবি মেজদাদাকে বলল, না, আপনারা বরং এগিয়ে যান। আমি একটা ভাড়া গাড়ি নিয়ে আগে জোড়াসাঁকো যাচ্ছি।

পথে যেতে যেতে চোখে পড়ে বহু পরিচিত বাড়ির ভগ্নদশা।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িটি আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ক্ষতির পরিমাণ তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। দেয়াল জুড়ে বড় বড় ফাটল, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছে কার্নিশ, একদিকের বারান্দার রেলিং হেলে পড়েছে, কয়েকটি ঘরের সিলিং থেকে টালি খসে পড়ে আহত হয়েছে কয়েকজন।

রবির গাড়ি থামতেই রথী দৌড়ে এসে খবর দিল, মায়ের মাথায় লেগেছে, ওপর থেকে টালি পড়ে মাথা কেটে গেছে, কত রক্ত বেরিয়েছিল—

একতলার একটি ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে মৃণালিনীকে। মাথায় ব্যান্ডেজ। রবি দ্রুত পায়ে সেখানে গিয়ে স্ত্রীর দিকে দু'-এক পলক তাকিয়েই কোলে তুলে নিলেন কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রকে।

এদিককার ভূমিকম্পের রেশ কাটতে না কাটতেই পশ্চিম ভারত থেকে এল এক নিদারুণ চমকপ্রদ সংবাদ।

দুর্ভিক্ষপীড়িত মহারাষ্ট্রে গত বছর থেকেই শুরু হয়েছিল প্লেগ। এর মধ্যে তা মহামারীর আকার ধারণ করেছে। গত এক বছরে, সরকারি হিসেবেই এই রোগে কবলিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে পঞ্চাশ হাজার মানুষ। এই রোগ দমন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে সেখানকার প্রাদেশিক সরকার। এবং প্লেগ দমনের নামে সরকার যে-সব কাণ্ডকারখানা শুরু করেছে, তাতে অনেকের মনে হচ্ছে এই সরকারি অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করাও সম্মানজনক।

রোগের বিস্তার রোধ করার জন্য সরকার প্রয়াস নেবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কলেরা-বসন্তেও কম লোক মারা যায় না। এত জনবহুল দেশে এক-একবার দুর্ভিক্ষেও পঞ্চাশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে সব সময় তো সরকারের এত তৎপরতা দেখা যায় না। এ দেশের মানুষ মরলে বিদেশি শাসকদের তা নিয়ে বেশি মাথা ব্যথা থাকবে কেন?

কিন্তু প্লেগ রোগ সাদা মানুষ আর কালো মানুষে কোনও ভেদাভেদ করে না। এই রোগ শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে যেতে পারে যে-কোনও সময়ে। মধ্যযুগে ইউরোপে প্লেগের তাণ্ডবের ইতিহাস সাহেবেরা জানে। তাই প্লেগ নামটা শুনলেই তাদের আতঙ্ক হয়। সুতরাং ইংরেজ সরকার প্লেগ নিবারণের জন্য উঠেপড়ে লাগল আত্মরক্ষার কারণে।

এ কথা ঠিক, ভারতীয়রা, বিশেষত দরিদ্র ভারতীয়রা বড়ই নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা নেই। আবর্জনার স্তূপের পাশে বসে তারা অনায়াসে খাবার খেতে পারে, দুর্গন্ধ যেন তাদের নাকে লাগে না। এবং এ কথাও ঠিক, নোংরা-আবর্জনার মধ্যেই প্লেগের বীজাণু হু হু করে বেড়ে যায়।

সরকার প্লেগ দমনের জন্য সামরিক বাহিনী নামিয়ে দিল। তারা মহল্লায় মহল্লায় হানা দিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করতে লাগল। ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু জাতের পরোয়া করে না তারা,

পায়ে বুট জুতো পরা, কোমরে ঝোলানো তলোয়ার কিংবা পিঠে বন্দুক, যমদূতের মতন চেহারার এক-একটি গোরা সৈন্য সরাসরি ঢুকে পড়ে অন্দরমহলে, লাথি মেরে খাট-বিছানা উলটে দেয়, ভাতের হাঁড়ি, জলের কলসি, চাল-গমের জালা চূর্ণ বিচূর্ণ করে। ভীত-সন্ত্রস্ত নারী-পুরুষদের অস্ত্রের গুঁতোয় লাইন করে দাঁড় করায় উঠোনে, তাদের নোংরা বস্ত্র ছোঁবে না বলে সবাইকে উদোম হতে বলে। কারুর সামান্য জ্বর বা শরীর খারাপ দেখলেই তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে।

ইংরেজরা ভারতীয়দের সমশ্রেণীর মানুষ বলেই গণ্য করে না। সুতরাং তাদের মান-সম্ভ্রম, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্যই নেই তাদের কাছে। গোরা সৈন্যরা এ দেশের লোকদের ধর্মবোধ, সংস্কার, প্রথারও তোয়াক্কা করে না, এমনকী নারীদের আব্রু রক্ষার জন্য আকুল মিনতিও তারা কানে তোলে না। অন্তঃপুরের নারীদের হাত ধরে তারা টানাটানি করে তো বটেই, অনেক সময় পুরুষদের পাশাপাশি তাদেরও উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেয়। নারীদের ওপর অত্যাচারের আরও অনেকরকম বীভৎস কাহিনী শোনা যেতে লাগল। একটা ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে গেল চতুর্দিকে।

বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকায় প্লেগ দমনের নামে ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। তিনি নিজে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে নানান ঘিঞ্জি এলাকায় সাধারণ মানুষকে রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা বোঝাতে লাগলেন, সরকারের সাহায্য অবশ্যই কাম্য, কিন্তু এ দেশের মহামারীর সময় এ দেশের মানুষকেই সেবা ও প্রতিকারের ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। সরকার যে প্লেগ কমিটি গঠন করেছে, তার সভাপতি হওয়া উচিত এ দেশেরই কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির।

সরকার তিলকের প্রতিবাদ বা পরামর্শে কর্ণপাত করল না। অত্যাচার চলতেই লাগল। প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান ডব্লু সি র‍্যান্ড একজন দুঁদে অফিসার, সে সেনাবাহিনীকে বলগাছাড়া স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে, অত্যাচার বেড়েই চলল। অনেক রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাদের অঙ্গে পরপুরুষের ছোঁয়া লাগলেই কুল নষ্ট হয়, সেরকম মহিলাদের বিবস্ত্র করে বাড়ি থেকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যায় সৈনিকেরা। প্লেগে যারা আক্রান্ত হয়নি, এমন কয়েকজন আত্মহত্যা করে বসল অপমানে, লাঞ্ছনায়। মহারাষ্ট্রের যুব সম্প্রদায় ফুঁসতে লাগল ক্রোধে।

তারপর এক রাতে ঝলসে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র।

সেদিন মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী। সারাদিন ধরে উৎসব চলছে। পুণার গণেশখিণ্ডে গভর্নরের বাড়িতে রাত্রের খানাপিনার আসরে নিমন্ত্রিত হয়েছে বড় বড় কিছু অফিসার, তাদের মধ্যে র‍্যান্ডও আছে। রাত আটটা থেকে সেই গভর্নর প্যালেসের অদূরে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে চারজন যুবক। এদের মধ্যে রয়েছে দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর নামে দুই ভাই এবং রানাডে ও শাঠে নামে তাদের দুটি বন্ধু। দামোদরদের আর এক ভাই বাসুদেও দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে একটা গাছের আড়ালে। অত্যাচারী, উদ্ধত, দুর্মুখ র‍্যান্ডকে আজ ওরা চরম শাস্তি দেবে।

এই যুবকের দলটি ঝোঁকের মাথায় আসেনি। এদের পরিকল্পনা নিখুঁত। ওদের মধ্যে একজন কয়েকদিন ধরে ছায়ার মতন র‍্যান্ড সাহেবের গাড়ির পেছন পেছন ঘুরে তার গতিবিধি লক্ষ করেছে। ঘোড়ার গাড়িটির রং, তার চালককে চিনে রেখেছে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে প্রচুর, পিস্তল ও তলোয়ার, দু' রকমই রেখেছে সঙ্গে।

রাত বারোটার পর গভর্নরের বাড়ি থেকে অতিথিরা নির্গত হতে লাগল। একটার পর একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে ঝোপের পাশ দিয়ে, কথা আছে যে র‍্যান্ডের গাড়ি দেখলেই বাসুদেও একটা সংকেত দেবে। অধীর উত্তেজনায় ছটফট করছে ওরা, হঠাৎ একটা গাড়ি দেখে মনে হল ঠিক র‍্যান্ডের গাড়ির মতন। অথচ বাসুদেও কোনও সঙ্কেত দেয়নি। চাপেকরদের মধ্যম ভ্রাতা বালকৃষ্ণ আর ধৈর্য রাখতে পারল না, সে লাফিয়ে গিয়ে গাড়িটার পেছনে উঠে ভেতরে গুলি চালাল।

সে গাড়িতে র‍্যান্ড ছিল না, ছিল লেফটেন্যান্ট আয়ার্স্ট ও তার পত্নী। বালকৃষ্ণের পিস্তলের গুলিতে আয়ার্স্ট তৎক্ষণাৎ মারা গেল, তার পত্নীর আর্ত চিৎকার বুঝতে না পেরে কোচোয়ান আরও

জোরে ছুটিয়ে দিল গাড়ি। কাজ সম্পন্ন হয়েছে ভেবে হাসিমুখে বালকৃষ্ণ ফিরে আসছে, এমন সময় দূর থেকে শোনা গেল বাসুদেওর সঙ্কেত ধ্বনি। ঠিক ওইরকম আর একটি গাড়ি আসছে। ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল দামোদর, গাড়ির পেছনের পর্দা সরিয়ে পিস্তলটা একেবারে র‍্যান্ডের ঘাড়ে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল অকম্পিত হাতে। র‍্যান্ড কোনওরকম বাধা দেবার সময়ই পেল না।

আরও অনেকগুলি গাড়ি এসে পড়ে হই-হল্লা, আর্তনাদ ও খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেলেও ধরা পড়ল না কেউ। এর মধ্যে আততায়ীরা উধাও হয়ে গেছে।

সংবাদপত্রে এই চাঞ্চল্যকর বিবরণ পাঠ করে সারা ভারত স্তম্ভিত। ব্রিটিশ ভারতে এই প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের মতন দু'জন উচ্চপদস্থ অফিসারকে খুন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে দুর্বল ভারতবাসী? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বেশ কয়েকজন মিলে কিছুদিন ধরে ষড়যন্ত্র করেছে এবং তারা পলায়ন পথের কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে তোলপাড় করেও তাদের ধরা গেল না। কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল তাদের সম্পর্কে খবরাখবরের জন্য।

হত্যাকারীদের না ধরতে পেরে পুলিশ গ্রেফতার করল তিলককে। তাঁর দুটি পত্রিকায় তীব্র উত্তেজক রচনা প্রকাশ করে তিনিই ওদের উস্কানি দিয়েছেন। এই অপরাধের তিনিই আসল হোতা। তিলক বোম্বাই সরকারের আইনসভায় একজন সম্মানিত সদস্য, তবু তাঁকে জামিন দেওয়া হল না। সাধারণ অপরাধীদের মতন তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

কলকাতার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের ওপর মহলের মানুষেরা এই হত্যাকাণ্ডের তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারলেন না। বাঙালিরা পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদ রচনা কিংবা সভা-সমিতিতে জ্বলন্ত ভাষণই স্বাদেশিকতার চূড়ান্ত মনে করে, রক্তারক্তি কাণ্ড তাদের পছন্দ নয়। মহাশক্তিধর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামান্য অস্ত্র তুলে ধরা তো বাতুলতা। এ দেশটা কি আয়ার্ল্যান্ড হয়ে গেল নাকি? প্রায় সকলেই এই সাহেব হত্যার তীব্র নিন্দা করলেন। স্বদেশি আন্দোলনে এরকম হঠকারিতার কোনও স্থান নেই।

তবে তিলকের গ্রেফতারের সংবাদে সবাই বিচলিত। তিলক তো নিজে পিস্তল বা তলোয়ার ধরেননি, তিনি কলম ধরেছেন মাত্র। লেখনী চালাবার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়াটা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। তিলক জাতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা, তাঁর অপমান সকলের অপমান।

আরও সংবাদ এল যে, তিলককে পুণা থেকে বোম্বাই পাঠানো হয়েছে, সেখানে হাইকোর্টে তাঁর পক্ষ সমর্থনে কোনও উকিল ব্যারিস্টার পাওয়া যাচ্ছে না। রাজরোষের ভয়ে সবাই গুটিয়ে আছে। তিলক গোপনে কলকাতায় তাঁর পুরনো বন্ধু শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে এক সন্ধ্যায় মতিলাল একটা ঘরোয়া আলোচনা সভার ব্যবস্থা করলেন। আদালতে তিলকের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত কৌঁসুলি দাঁড় করাতেই হবে। সারা ভারতের কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে উকিল-ব্যারিস্টাররাই সংখ্যাগুরু, তাঁদের মধ্যে কারুকে পাওয়া যাবে না? মতিলাল এরই মধ্যে বোম্বাইতে বদরুদ্দিন তায়েবজির কাছে জরুরি তার পাঠিয়েছেন। আলোচনা সভায় উপস্থিতদের মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ইংরেজ বিচারপতির সামনে শুধু ভারতীয় ব্যারিস্টার নিয়োগ করলে কাজ হবে না, বেসরকারি ইংরেজ ব্যারিস্টার দাঁড় করাতে হবে। কলকাতা থেকে এরকম দু'জন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পাঠালে ভাল হয়, কিন্তু এঁদের টাকার খাঁই খুব বেশি। সুতরাং মামলা চালাবার জন্য চাঁদা তোলা দরকার। আশুতোষ চৌধুরী, জানকীনাথ ঘোষাল, আনন্দমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সবাই মোটা চাঁদার প্রতিশ্রুতি দিলেন তৎক্ষণাৎ। আশুতোষ চৌধুরী আফশোস করে বললেন, তারকনাথ পালিত মশাইকে আজকের সভায় আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তাঁর মতন দানবীর একাই অনেক টাকা দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি বলেছেন, এরকম রাজদ্রোহমূলক ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ো না।

মতিলাল বললেন, এর মধ্যে তো রাজদ্রোহের কিছু নেই। তিলক দেশের মানুষের আত্মসম্মান

জাগাবার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন, তিনি কখনও খুনে-ডাকাতদের উস্কানি দেবার কথা চিন্তাও করেন না। কোথাকার কোন এক বদমাস কী রাগে কে জানে র‍্যান্ড সাহেবের ওপর গুলি চালিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে তিলকের নাম জড়িয়ে দেওয়াটা সরকারের অনুচিত-কর্ম হয়েছে।

শিশিরকুমার গুলি শব্দটার উল্লেখেই যেন শিহরিত হলেন। তিনি একেবারেই হিংসার পক্ষপাতী নন।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, এ রকম ঘটনায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষতি হবে। ইংরেজের অত্যাচার আরও বাড়বে। আইনসঙ্গত পথে, আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে আমাদের কিছু কিছু দাবি আদায় করা দরকার।

ওই পত্রিকার একজন কর্মচারী অতিথিদের জন্য চা-জলপানের ব্যবস্থা করছিলেন, তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যার, আমি কিছু বলতে পারি? আমি মাত্র গত কাল বোম্বাই থেকে ফিরেছি। সাহেব দু' জনের হত্যাকারীরা এখনও ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু সারা মহারাষ্ট্রে লোকের মুখে মুখে একটি কাহিনী চালু হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পুণায় এক শিবাজী উৎসবে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তিলক ছিলেন সেদিনকার উৎসবের সভাপতি, বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতা বিষয়ে বলছিলেন। হঠাৎ দর্শকদের মধ্য থেকে এক ছোকরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, এই সব ফাঁকা বক্তৃতা দিয়ে যারা স্বাধীনতা আনতে চায়, তারা সব হিজড়ে! ...দুঃখিত স্যার, আমি দুঃখিত, কথাটা উচ্চারণ করে ফেলেছি, নপুংসক, নপুংসক। তখন সভায় একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ধাক্কাতে ধাক্কাতে সেই যুবকটিকে বার করে দিতে গেল। তিলক মঞ্চ থেকে তাদের নিষেধ করে ইঙ্গিতে ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। নিচু গলায় বললেন, ওহে, তুমি তো সবাইকে নপুংসক বলে দিলে! কিন্তু এদেশে যদি সত্যিকারের পুরুষ মানুষ কেউ থাকত, তা হলে ওই অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার র‍্যান্ড কি দাপটে ঘুরে বেড়াতে পারত? স্যার, এখন অনেকেই বলছে, সেই ছেলেটিই র‍্যান্ড ও অন্য সাহেবটিকে খুন করেছে। সে সাধারণ ডাকাত বা বদমাস নয়। আর তিলকেরও প্ররোচনা আছে ঠিকই।

অনেকেই আপত্তিকর শব্দ করে উঠলেন। কয়েকজন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে রইলেন নিঃশব্দে। তাঁদের খটকা লেগেছে। রাজনীতিতে তিলক খুবই যে উগ্রপন্থি, তাতে কারুর সন্দেহ নেই। ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বক্তৃতার রাজনীতি সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন বহুবার। তিনি কি আয়াল্যান্ডের পথে চলতে চান?

অনেকের কাছে ঘুরে ঘুরে আরও চাঁদা তোলার প্রস্তাব নিয়ে সভা শেষ হল। সকলে বেরিয়ে এলেন বাইরে, গাড়িতে ওঠার আগে জানকীনাথ ঘোষাল সহাস্যে আশুতোষ চৌধুরীকে বললেন, আমার মেয়ে সরলা কী কাণ্ড করেছে জানো? কাগজে র‍্যান্ড হত্যার খবর দেখে সে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে! আমার দেশের ছেলেরা সত্যিকারের মুরোদ দেখিয়েছে! ইংরেজরা এবার বুঝুক, এ দেশের ছেলেরাও অস্ত্র ধরতে জানে। সরলার ধারণা, তিলক নিশ্চিত আছেন এর পেছনে। তিলকের কারাবাসেও সে খুশি। আমায় সে বলল, বাবা, তোমরা তিলককে সাহায্য করতে যাচ্ছ কেন? মামলা চলুক, তাতে দেশের মানুষ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ জানবে। তিলকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হবেই, তাতে দেশের মানুষ আরও রাগে ফুঁসবে! আরও কয়েকটা র‍্যান্ড নিকেশ হবে!

আশু চৌধুরী বললেন, কী সর্বনেশে কথা! আপনার মেয়ে সম্পর্কে আমার শ্যালিকা, কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমার ভয় হয়!

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ঘোষালমশাই, মেয়েকে সামলান! শুনেছি তো সে এখন ছেলে-ছোকরাদের লাঠিখেলা, তলোয়ার চালনা শেখায় উৎসাহ দিচ্ছে। এরপর কি সে তাদের হাতে পিস্তলও তুলে দেবে নাকি? এসব ছেলেমানুষি করতে করতেই বড় রকমের বিপদ ডেকে আনবে।

রবি পাশেই দাঁড়িয়ে, তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না।

রবি গাড়ি আনেননি, তিনি আশু চৌধুরীর গাড়িতে উঠলেন। বাড়ি ফেরার পথে প্রাণখুলে গল্প

করা যাবে। খুব বেশিক্ষণ রাজনীতির আলোচনা রবির ঠিক সহ্য হয় না। তিলকের তিনি অনুরক্ত, তিলককে সাহায্য করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ঠিকই, তারকনাথ পালিতের কাছ থেকেও চাঁদা আদায় করে ছাড়বেন, কিন্তু এখন অন্য কথা বলা যাক।

রাত নটা বেজে গেছে, অসহ্য গুমোট গরম। সবাই হা পিত্যেশ করে রয়েছে বৃষ্টির জন্য। এই রকম গ্রীষ্মের সময় সব রাস্তাতেই পচা জঞ্জালের দুর্গন্ধ নাকে আসে। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা অনেকেই দার্জিলিং-এ হাওয়া বদলাতে চলে গেছেন।

আশু চৌধুরী বললেন, রবি, তোমার 'পঞ্চভূত' বইখানি পড়লাম। বড় সরেস ও উত্তম হয়েছে। বাংলা ভাষায় এরকম গ্রন্থ আগে কেউ লেখেনি। রবি, আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, কবিতার চেয়েও তোমার গদ্য রচনার হাত যেন বেশি ভাল। সেদিন খামখেয়ালী সভায় তুমি যে দুটি গল্প পাঠ করে শোনালে, একটি তো 'মানভঞ্জন', আর একটির নাম কী যেন?

রবি বললেন, 'ক্ষুধিত পাষাণ'

আশু চৌধুরী বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনবদ্য, অনবদ্য! অতিশয় রোমান্টিক, কিন্তু এমন একটা মিস্টি এলিমেন্ট মিশিয়েছ,' আউটস্ট্যান্ডিং!

রবি বললেন, এখন বেশি গদ্য লিখতেই আমার ভাল লাগছে। হাতে আসছেও বেশ।

আশু বললেন, তোমার প্রথম প্রেমিকা, কবিতা, তাকে ভুলে গেলে নাকি?

রবি হেসে বললেন, তাকে কখনও ভুলতে পারি! কবিতা যে আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতন। যেদিন কবিতা চলে যাবে, সেদিন আর আমি বেঁচে থাকব না।

আশু বললেন, তোমার নতুন কবিতা একটা শোনাবে নাকি? তোমার তো বেশ মনে থাকে...

আশু চৌধুরীকে কবিতা শোনাবার জন্য রবি উদগ্রীব হয়ে থাকেন। ইনি যে সত্যিকারের সাহিত্য রসিক। আশু চৌধুরী তারিফ করেন বেশি, কখনও সামান্য বিরূপ সমালোচনা করলেও তাতে ঝাঁঝ থাকে না।

রবি শুরু করলেন:

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, 'যাও!'
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়ালো সমুখে, কহিনু তাহারে, 'সরো'
ধরিল দু'হাত, কহিনু, 'আহা কী করো!'
সখী, ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে
তবু ছাড়িল না মোরে।...

আশু চৌধুরী বললেন, একী, এ যে গল্পের মতন। যদিও ছন্দ মিল সবই আছে।

রবি জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম করে লিখলে কবিতা হয় না?

আশু চৌধুরী বললেন, কেন হবে না? তুমি যা লিখবে তা-ই কবিতা হবে। সুরেশ সমাজপতি কী বলবেন জানি না, আমার এ ধরনের নতুন এক্সপেরিমেন্ট ভাল লাগে। বাকিটা শুনি।

রবি আবার শুরু করতে না করতেই আশু চৌধুরী বাইরে মুখ বাড়িয়ে বললেন, একটু থামো তো রবি। পথের অবস্থাটা দেখো, এরকম কেন? তেমন বেশি তো রাত হয়নি।

রবি কবিতায় তন্ময় হয়েছিলেন, রাস্তার দিকে লক্ষ করেননি। এখন তাকিয়ে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। চিৎপুরের রাস্তায় একটাও গ্যাসের বাতি জ্বলছে না, চতুর্দিক অন্ধকারে শুনশান, কোনও মানুষ নেই। শুধু এই গাড়ির দুটি ঘোড়ার পায়ের কপ কপ আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দও নেই।

রবি বললেন, এদিকে আর কোনও গাড়িও যাচ্ছে না। এ সময় অনেক গাড়িঘোড়া চলে।

আশু চৌধুরী ওপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রমজান মিঞা, রাস্তা এমন ফাঁকা কেন !

কোচোয়ান বলল, কিছুই তো বুঝতে পারছি না হুজুর।

তক্ষুনি পাশের গলি থেকে একদল লোক হই হই করে বেরিয়ে ছুটে গেল বিপরীত দিকে। তাদের চিৎকার কেমন যেন হিংস্র ধরনের।

আশু চৌধুরী বললেন, ব্যাপার ভাল ঠেকছে না। রমজান, তুমি জোরসে চালাও।

কোনও বাধা বিঘ্ন ছাড়াই জোড়াসাঁকোতে রবিকে নামিয়ে দিয়ে আশু চৌধুরী চলে গেলেন নিজের গৃহের দিকে।

ওপরে এসে রবি পোশাক পরিবর্তন করতে না করতেই শুনতে পেলেন, তাঁদের বাড়ির সামনে এবং অদূরে বড় রাস্তায় কীসের যেন হুড়োহুড়ি পরে গেছে, বহু লোক একসঙ্গে উত্তেজিতভাবে চ্যাঁচামেচি করছে।

রবি বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। একজন দারোয়ান বলল, কত্তাবাবু, দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিন। মোছলমান ব্যাটারা ধেয়ে আসছে, তারা সব হিন্দুর মন্দির ভাঙবে, হিন্দুদের বাড়ি আগুনে পোড়াবে !

রবি দু' তিনবার জিজ্ঞেস করলেন, কারা আসছে ? কারা আসছে ?

উত্তর পেয়েও তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না। মুসলমানরা আক্রমণ করতে আসবে কেন ? হঠাৎ কী ঘটল ? এ পল্লীতে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি থাকে, নাখোদা মসজিদ বেশি দূরে নয়, জীবিকা সূত্রেও অনেক মুসলমানের বাস, কখনও তো কোনও অশান্তি হয়নি।

দেখতে দেখতে বহু লোক জড়ো হয়ে গেল। সবাই মুসলমানদের আক্রমণের আশঙ্কায় সশস্ত্র হচ্ছে। ঠাকুর বাড়ির দারোয়ান-চাকর-কোচোয়ান-ভিস্তিওয়ালা সবাই লাঠি-সোঁটা-তলোয়ার নিয়ে টহল দিতে লাগল, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলমানও আছে, তারাও আক্রমণকারী মুসলমানদের রুখবার জন্য প্রস্তুত। অনেক দূরে বহু লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ঠিকই, দুমদাম গুলির শব্দও স্পষ্ট বোঝা যায়।

রবি ভাবলেন, লোকে কি ভুল করে মুসলমানদের কথা বলছে ? নাকি, পুণার হত্যাকাণ্ডের প্রভাবে এখানেও ইংরেজদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল ? গুলি চালাচ্ছে কারা ?

সারা রাত আশঙ্কা ও প্রহরায় কেটে গেল, কিন্তু আক্রমণকারীরা এতদূর এল না। সকাল থেকে গুজবে কান পাতা দায়। তার থেকে আসল সত্যটা কোনও রকমে বার করা গেল, শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, সত্যিই। দিনের বেলাও কেউ বাড়ি থেকে এক পা বেরুতে সাহস করল না, মাঝে মাঝেই গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, গোরা সৈনিকরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ঘোড়া ছুটিয়ে। এই কিছুদিন আগে ভূমিকম্প হয়ে গেল, তারপর আবার দাঙ্গা ? হা ভগবান !

গুজব সৃষ্টিকারীরা রটনা করছে যে শত শত হিন্দুর বাড়ি এর মধ্যে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, বহু হিন্দুর প্রাণ গেছে, তাদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা অনেক ইত্যাদি। প্রকৃত ঘটনা অবশ্য তা নয়। দাঙ্গার উৎপত্তির কারণটিও সামান্য।

টালা অঞ্চলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কয়েক বিঘে জমির একটা সম্পত্তি আছে। কিছু গরিব মুসলমান সেখানে বস্তি বানিয়ে আছে অনেক দিন ধরে। যতীন্দ্রমোহন এখন সেই জমিতে দালান কোঠা তুলতে চান, কিন্তু বস্তিবাসীরা বলেছে তারা এতকাল ভাড়া দিয়ে এসেছে, তারা উঠে যেতে বাধ্য নয়। মহারাজের পক্ষ থেকে ওদের উচ্ছেদ করার জন্য হাইকোর্টে মামলা করা হল, এবং যতীন্দ্রমোহন আদালত থেকে ডিক্রিও পেয়ে গেলেন। মামলা চলার সময় বস্তিবাসীদের উকিল একটা বুদ্ধি বার করেছিল। রাতারাতি ওই বস্তির মধ্যে একটা মসজিদ বানিয়ে ফেললে সেটা ধর্মস্থান হয়ে গেল, তখন আর সেটা কেউ ভাঙতে পারবে না। রাতারাতি পাকা মসজিদ তোলা সম্ভব নয়, তাই একটা কুঁড়ে ঘরকেই মসজিদ বলে ঘোষণা করে দিয়ে সেখানে নামাজ পড়তে শুরু করে দিল মুসলমানেরা। কিন্তু আদালতের ডিক্রি বলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের লোকজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসে বস্তিবাড়ি সব ভেঙে দিল, মসজিদ নামাঙ্কিত কুঁড়ে ঘরটিকেও রেয়াত করল না।

অমনি একদল লোক রটিয়ে দিল যে হিন্দুরা মুসলমানদের একটা মসজিদ ভেঙে দিয়েছে, মুসলমানের ধর্ম বিপন্ন। কাছাকাছি অঞ্চলের মুসলমানরা ছুটে এল, সেখানে সত্যিকারের কোনও মসজিদ ছিল কি না তা সরেজমিনে কেউ দেখল না। ধর্ম বিপন্ন এটুকু শোনাই উত্তেজিত হবার পক্ষে যথেষ্ট। ধর্ম বিপন্ন হলে প্রাণ বিপন্ন করতেও দ্বিধা নেই।

শুরু হল ভাঙচুর, একদল মুসলমান টালার বিশাল জলের ট্যাঙ্ক আক্রমণ করতে এলে পুলিশ গুলি চালাল, পড়ে গেল দু' চারটে লাশ। এতে উত্তেজনার ওপর আবার ক্রোধের ইন্ধন জোগানো হল। আরও বহু মুসলমান এসে জড়ো হল সেখানে, দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল উত্তর কলকাতা থেকে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত।

দু'দিনের বেশি অবশ্য এই দাঙ্গা প্রশ্রয় পেল না। সরকার প্রথম থেকেই কঠোরভাবে দমন করবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এক রেজিমেন্ট সৈন্য নামিয়ে দিল পথে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দাঙ্গাকারীদের দেখামাত্র গুলি করা হবে, এই ঘোষণা করে দেওয়া হল এবং সত্যি সত্যি গুলি চলল কয়েকবার। শেষ পর্যন্ত সরকারি হিসেব মতন, নিহতের সংখ্যা এগারো জন, আর কুড়ি জন গুরুতর আহত, সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির এখনও পূর্ণ তালিকা হয়নি।

দাঙ্গা থামল বটে, কিন্তু অনেকের মনে তা একটা স্থায়ী দাগ রেখে গেল। ভাবলেই মন খারাপ লাগে। এত সামান্য কারণে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিষিয়ে তোলা যায় ? আদালতের আদেশে একটা নকল মসজিদ ভাঙলেও তার প্রতিশোধ হিসেবে হিন্দু মন্দির ভাঙার প্ররোচনা কারা দেয় ? হিন্দু ও মুসলমান এতকাল ধরে মিলে মিশে কাজ-কারবার চালাচ্ছে, একটা তুচ্ছ গুজব শুনলেই তারা পরস্পরের দিকে সন্দেহের নেত্রে তাকাবে ? যে-এগারো জনের প্রাণ গেল, তারা কীসের জন্য প্রাণ দিল ?

লোকের মুখে এখন খালি দুর্ভিক্ষের কথা, দাঙ্গার কথা, প্লেগের কথা, ভূমিকম্পের কথা। কে কোথায় কী দেখেছে, তার বাস্তব বা কাল্পনিক বর্ণনা। পুণা হত্যাকাণ্ডের সেই অপরাধীরা কি ধরা পড়ল ? তারা কি কলকাতায় এসে লুকিয়ে আছে ?

কিন্তু মানুষ প্রতিনিয়ত সমস্যার কথা শুনতে চায় না। আপদ-বিপদ যেমন আছে, তেমন কি আনন্দও নেই, ফুর্তি নেই ? গান-বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে ? ধনী ও অভিজাতরা এই সব সমস্যাও বেশিদিন গায়ে মাখে না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এখন প্রায়ই একটা খামখেয়ালী সভা বসে। এক একবার এক একজন এই সভার সব ব্যয়বহন করেন। বন্ধু-বান্ধব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, সাহিত্যপাঠ, সঙ্গীত, কৌতুক ও নানারকম উপাদেয় দ্রব্যের ভূরিভোজন হয়।

দাঙ্গা-টাঙ্গা চুকে যাবার কিছুদিন পরেই রবির খুড়তুতো ভাইপো সমরেন্দ্রনাথ খামখেয়ালী সভার একটা আসর বসাতে চাইলেন। প্রতিটি সভারই পরিকল্পনা করে দেন রবি। এবারে তিনি একটু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। শহরের যা অবস্থা, নিমন্ত্রিতরা এসে যদি ওই দাঙ্গা-ভূমিকম্প নিয়েই কথা বলতে শুরু করে, তা হলে আনন্দটাই মাঠে মারা যাবে।

সমরেন্দ্রনাথের ছোটভাই অবনীন্দ্র রবিকে সমর্থন করে বলে উঠল, না, না ওসব চলবে না। রবিকা, তুমি সবাইকে বারণ করে দিয়ো।

রবি বললেন, আয় তবে আমন্ত্রণ পত্রটা আমি লিখে দিই। তাতেই বরং নির্দেশ নামা থাকবে।

রবি লিখলেন : শুন সভ্যগণ যে যেখানে থাকো

সভা খামখেয়াল, স্থান যোড়াসাঁকো ;
বার রবিবার, রাত সাড়ে সাত
নিমন্ত্রণকর্তা সমরেন্দ্রনাথ।
তিনটি বিষয় যত্নে পরিহার্য
দাঙ্গা, ভূমিকম্প, পুণা হত্যাকার্য।
এই অনুরোধ রেখো খামখেয়ালী
সভাস্থলে এসো ঠিক Punctually।

৩৭

মোগলসরাই স্টেশনে ট্রেন থেকে নামল দ্বারিকা আর বসন্তমঞ্জরী। দ্বারিকার পরনে পুরো দস্তুর সাহেবি পোশাক, মাথায় টুপি পর্যন্ত। বসন্তমঞ্জরীর রেশমি শাড়ির ওপর জামেয়ার জড়ানো, ঘোমটায় মুখ অনেকখানি ঢাকা। অন্য সময়ের তুলনায় এই রেলওয়ে স্টেশনে এখন জনসমাগম অনেক বেশি, চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে কোলাহল। একটা চুরুট ধরিয়ে দ্বারিকা ভিড়ের মধ্যে তার এক কর্মচারীকে খুঁজতে লাগল। যেখানেই সে যায়, সেখানে আগে থেকে সে একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেয় সব কিছু বন্দোবস্ত করে রাখার জন্য।

অল্পক্ষণ পরেই রতিকান্ত নামে সেই কর্মচারীটি ছুটতে ছুটতে এসে দ্বারিকার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলল, বাইরে গাড়ি তৈরি আছে হুজুর। বাড়িও ভাড়া করে রেখেছি, ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি হবে না।

স্টেশনের বাইরে এসে দ্বারিকা সস্ত্রীক বগি গাড়িতে চড়ে বসল, গাড়ি ছুটল এলাহাবাদের দিকে।

দ্বারিকার জেদ সফল হয়েছে, বসন্তমঞ্জরীর সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে তার বিবাহ। এর মাঝখানে অন্তরায় ছিল অনেক। বসন্তমঞ্জরীর মানসিক বাধা কাটাতেই বেশ সময় লেগেছে। শেষ পর্যন্ত বসন্তমঞ্জরী রাজি হয়েছিল, কিন্তু দ্বারিকার এক বছরের কালাশৌচ পালন করার আগে নয়। অন্য বাধা এসেছিল সমাজের কাছ থেকে। দ্বারিকার সাধ ছিল, ধুমধাম করে হিন্দুমতে বিবাহ হবে, কিন্তু একজনও পুরুত পাওয়া যায়নি। বসন্তমঞ্জরী শুধু বিধবা নয়, সে কুলভ্রষ্টা, হাড়কাটার গলির এক বারবনিতা, হিন্দু সমাজ থেকে সে ব্রাত্য। হিন্দু সমাজ অন্য ধর্ম থেকে মানুষ টেনে এনে দীক্ষা দিয়ে হিন্দুত্বে বরণ করে না। বরং নিজের সমাজ থেকে নানান ছুতোনাতায় অনেককে বিতাড়নের ব্যবস্থা রেখেছে। দ্বারিকার বন্ধু যাদুগোপালের আশঙ্কাও সত্যে পরিণত হয়েছিল, এই বিবাহ প্রস্তাবে দ্বারিকার জমিদারিতে অনেক কর্মচারী ও প্রজাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, নায়েব-গোমস্তারা চাকরি ছেড়ে দিতেও উদ্যত হয়েছিল। এই আক্রার বাজারে চাকরি জোটানো সহজ নয়, তবু তারা এই অনাচার সহ্য করবে না।

ক্রোধের বশে দ্বারিকা জমিদারি বিক্রিই করে দিল। ওসব ঝঞ্ঝাট সে আর রাখতে রাজি নয়। সে নিজে হিন্দুত্বের গর্ব করে, অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছে, সে জানে বসন্তমঞ্জরী নির্দোষ, তার জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে তার পিতার দোষে, যে পিতা এক মূর্খ, লোভী ব্রাহ্মণ। সমাজ তার পিতাকে কোনও শাস্তি দেবে না, দেবে শুধু এক অসহায় নারীকে?

রেজিস্ট্রি করে সিভিল ম্যারেজে বাধা নেই। সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার জন্য দ্বারিকা এক মস্ত ভোজের আয়োজন করেছিল, মানিকতলার বাড়ির চৌহদ্দি ঘিরে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছিল বিশাল, নিমন্ত্রিত ছিল দেড় হাজার বিশিষ্ট নারী-পুরুষ, কিন্তু উৎসবের দিনে হাজির হয়েছিল মাত্র পঁয়ষট্টিজন, রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য বিলিয়ে দেবার জন্য যথেষ্টসংখ্যক কাঙালিও পাওয়া যায়নি। বহু পরিচিত ব্যক্তি, যারা দ্বারিকাকে মৌখিক সমর্থন জানিয়েছিল, তারাও প্রকাশ্যে দ্বারিকার পাশে দাঁড়াতে চায়নি বলেই বেশি আঘাত পেয়েছিল দ্বারিকা।

এখন সে নানান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে।

জেদ বজায় রেখেছে বটে, কিন্তু বিবাহ করে দ্বারিকা পরিপূর্ণ সুখী হতে পারেনি। বসন্তমঞ্জরীর

মনের মেঘ কিছুতে কাটে না। এই বিবাহের জন্য দ্বারিকাকে অনেক কিছু হারাতে হয়েছে, জমিদারি বিক্রি করেছে, অনেক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, এ জন্য বসন্তমঞ্জরী নিজেকে দায়ি করে। মাঝে মাঝে সে আপনমনে কাঁদে। শত অনুরোধ করলেও গান গাইতে চায় না।

শীতের অপরাহ্ণ, বাতাসে মেদুর ভাব, আকাশে সূর্যাস্তের লাল আভা। পথে অনেক তীর্থযাত্রী পদব্রজে চলেছে, প্রয়াগ সঙ্গমে অর্ধকুম্ভের পবিত্র স্নান শুরু হবে আগামীকাল থেকে। গাড়িটা চলেছে ধীরে ধীরে।

দ্বারিকা এক সময় বলল, বাসি, ঘোমটা একটু তোলো। বাইরেটা দেখো, দেখো কত ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে।

বসন্তমঞ্জরী অবগুণ্ঠন কিছুটা সরাল, তার চক্ষু দুটি জলে ভেজা। সে পাখি খুব ভালবাসে, কিন্তু আকাশে ঝাঁক ঝাঁক পাখি নেই, মাত্র পাঁচ-সাতটি বক দেখা গেল।

দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, বাসি, আবার তুমি কাঁদছ? তোমার কী কষ্ট হচ্ছে আমায় বলো?

বসন্তমঞ্জরী আঁচল দিয়ে চক্ষু মুছে বলল, কষ্ট কিছু নেই। আমি ভাবছিলাম, আমার জীবনখানি চলেছে ছোট নদী থেকে ক্রমশ বড় নদীর দিকে। এরপর কী হবে?

দ্বারিকা বিস্মিতভাবে বলল, তার মানে! ছোট নদী-বড় নদী? ওঃ হো, নবদ্বীপের গঙ্গার চেয়ে কলকাতার গঙ্গা ছিল বড়।

বসন্তমঞ্জরী বলল, এখানে ত্রিবেণী সঙ্গম!

দ্বারিকা বলল, নামেই ত্রিবেণী, আসলে গঙ্গা-যমুনা মিশেছে বোঝা যায়, আর সরস্বতী নদীকে দেখাই যায় না। তিনি নাকি পাতালবাহিনী।

বসন্তমঞ্জরী বলল, এরপর আমার জীবন কোন দিকে যাবে?

দ্বারিকা বলল, মানুষ কত জায়গায় বেড়াতে যায়, কত নদী দেখে, তার সঙ্গে জীবনের কী সম্পর্ক? এরপর আমরা পুরীতে গিয়ে সমুদ্র দর্শন করব।

বসন্তমঞ্জরী বলল, সমুদ্র... সমুদ্রে যদি আমি মিলিয়ে যাই? আচ্ছা, সমুদ্রের চেয়ে আরও বড় কিছু হয় না?

দ্বারিকা বলল, হ্যাঁ, হয়। পুরীর কাছে উপসাগর, তারপর সাগর, মহাসাগর। আমরা যদি কন্যাকুমারী যাই, সেখানে ভারত মহাসাগর দেখতে পাব। তাও যেতে পারি।

বসন্তমঞ্জরী অস্ফুট স্বরে বলল, মহাসমুদ্র আমাকে কোলে টেনে নেবে।

দ্বারিকা বলল, কী পাগলের মতন কথা বলছ! কত লোক সমুদ্র দর্শন করে ফিরে আসে। তোমাকে টেনে নেবে কেন? তোমার মাথায় এই সব চিন্তা আসে কী করে?

বসন্তমঞ্জরী বলল, তা জানি না। তবু আসে। কত কী-ই যে মনে আসে, আমি নিজেই নিজের মনের নাগাল পাই না। যে সব জায়গায় কখনও যাইনি, সে সব জায়গারও ছবি দেখতে পাই।

দ্বারিকা বলল, অনেকের জলের ফাঁড়া থাকে। তুমি জলে নামবে না। প্রয়াগেও স্নান করার দরকার নেই, মাথায় জল ছিটিয়ে নেবে।

বসন্তমঞ্জরী ম্লান হেসে বলল, আমি সাঁতার জানি।

গাড়ি এলাহাবাদ শহরে পৌঁছল প্রায় মধ্যরাত্রে। নূরগঞ্জে একটি সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ির সামনে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রতিকান্ত, একটি দ্রুতগামী টাঙ্গায় সে আগেই পৌঁছে গেছে। দ্বারিকা দু-একদিনের মধ্যেই কোনও তীর্থ দর্শন করে পরবর্তী স্থানের জন্য যাত্রা পছন্দ করে না। সে ধীরেসুস্থে স্থানমাহাত্ম্য অনুভব করতে চায়, তাই এখানে মাসাধিক কাল থাকবে বলে মনস্থ করেছে। বাড়িটি তার পছন্দ হল।

আহারাদি সমাপনের পর সে এসে দাঁড়াল দোতলার অলিন্দে। এত রাতেও রাজপথে জনস্রোত অব্যাহত। দূর দূরান্ত থেকে আসছে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, এই শীতের রাতে এত মানুষ কোথায় মাথা গোঁজার আশ্রয় পাবে কে জানে! কাছাকাছি একটা ধরমশালায় মানুষ গিসগিস করছে, শোনা যাচ্ছে তাদের কোলাহল। অনেকে নাকি নদীর ধারে বালির ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে।

ঘরের মধ্যে গুনগুনিয়ে গান গাইছে বসন্তমঞ্জরী। অনেকদিন পর তার গলায় গান শুনে পুলকিত হয়ে উঠল দ্বারিকা। তা হলে বসন্তমঞ্জরীর মন ভাল হয়েছে। এই গান তারিফ করতে গেলে সে হয়তো থেমে যাবে, তাই দ্বারিকা চুপ করে শুনতে লাগল।

যবে দেখাদেখি হয় হেন তার মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পীয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কী কব আরতি
কী দিয়ে শোধিব শ্যাম বঁধুর পীরিতি...

ঘাড় ফিরিয়ে দ্বারিকা দেখল। একবস্ত্রা বসন্তমঞ্জরী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আলুলায়িত চুলে চিরুনি চালনা করছে। দেওয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনে তার মুখের এক পাশ দেখা যাচ্ছে না, অন্য পাশ উদ্ভাসিত। তার শরীরের গড়নটি মৃৎ প্রতিমার মতো ঢলোঢলো, তার মুখে অভিজ্ঞতাজনিত কোনও ক্লিষ্ট রেখা নেই।

দ্বারিকার মনে হল, বসন্তমঞ্জরী একটি নারীরত্ন হলেও যে-কোনও রত্নই তো অর্থ দিয়ে কেনা যায়। এ দেশে সমস্ত নারীই পণ্যা। সে এখন যথেষ্ট ধনবান, ইচ্ছে করলে, বসন্তমঞ্জরীর চেয়েও কোনও বেশি রূপসী নারীকে সে নিজের ঘরনি করে নিয়ে আসতে পারত। একজন কেন, এরকম একাধিক রমণীকেও যদি সে নিজের অধীনে রাখত, তা হলেও সমাজ তাকে বাধা দিত না।

অর্থ থাকলে রমণীরত্ন যত খুশি ক্রয় করা সম্ভব, কিন্তু তাদের মন জয় করা যে কত কঠিন, তা কজন জানে? অনেকে মনের খবরই রাখে না। অথচ মন না পাওয়া গেলে শরীরেরও ঠিক স্বাদ থাকে না। বসন্তমঞ্জরীর মন পাওয়ার জন্য দ্বারিকা কত কিছু স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে। একবার ওর বিয়ে হয়েছিল, সে অবশ্য খুবই বৃদ্ধ বরের সঙ্গে, তবু সে তো কুমারী নয়। বৈধব্যের পর অপহৃতা হয়েছিল বসন্তমঞ্জরী। তারপর সে অত্যাচারী পুরুষদের রিরংসার শিকার হয়েছিল, সেই আড়াই বছরের ইতিহাস দ্বারিকা জানতে চায় না কখনও। বসন্তমঞ্জরী যে ক্লেদাক্ত পরিবেশেও তার সারল্য হারায়নি, এইটাই তো যথেষ্ট। তার কথাবার্তা অনেকেই বুঝতে পারে না, সে মাঝে মাঝেই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন ভবিষ্যতের ছবি দেখে বিস্ময়ে বিভোর হয়ে। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বলে একটা কথা আছে, সত্যিই কি তা মানুষের পক্ষে সম্ভব? দ্বারিকা জ্যোতিষীদের বিশ্বাস করে না, কিন্তু বসন্তমঞ্জরীর কথা শুনে সে প্রায়ই হকচকিয়ে যায়।

দ্বারিকা নরম গলায় বলল, বাসি, এখানে এসো, আমার পাশে একটু দাঁড়াও।

বসন্তমঞ্জরী বলল, ও মা, ওখানে যাব কী? আমার সাজ খুলে ফেলেছি, লোকে যে দেখবে?

দ্বারিকা বলল, লণ্ঠনটা নিবিয়ে দাও, তা হলে অন্ধকারে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

দ্বারিকার একাধিকবার সাধাসাধিতে বসন্তমঞ্জরী অলিন্দে এসে দাঁড়াল। পথে কোনও বাতি নেই, যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ লণ্ঠন ঝুলিয়ে চলেছে, অস্পষ্টভাবে দেখা যায় চলমান মানুষের মিছিল। আকাশ তারাখচিত, নির্মেঘ, বেশ শীত আছে। দ্বারিকা নিজের শালটা দিল বসন্তমঞ্জরীর গায়ে।

একটুক্ষণ নীরবে পথের দিকে চেয়ে থাকার পর বসন্তমঞ্জরী বলল, এই যে এত মানুষ, এর মধ্যে আমাদের চেনা কেউ আছে?

দ্বারিকা বলল, কী করে থাকবে? এখানে পশ্চিমের মানুষই বেশি আসে। বাংলার মানুষ গঙ্গাসাগরে ডুব দিতে যায়। এত দূরের পথ, তবে দু-চারজন বাঙালি আসতেও পারে।

বসন্তমঞ্জরী বলল, আমাদের চেনা একজন মানুষকে আমি দেখতে পেলাম মনে হল!

দ্বারিকা হেসে বলল, যাঃ পাগলি! কোনও মানুষের মুখই দেখা যাচ্ছে না, এর মধ্যে তুই লোক দেখবি কী করে?

বসন্তমঞ্জরী বলল, মুখ দেখিনি, কিন্তু একজন মানুষের হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটা যেন চেনা চেনা। সে কে আমি জানি না, কিন্তু চেনা লেগেছে ঠিকই।

দ্বারিকা বলল, তুই পারিস বটে। এই অন্ধকারে কে কীরকমভাবে হাঁটছে, তাও কি বোঝা যায় নাকি।

বসন্তমঞ্জরী বলল, এখন একবার সঙ্গমে গেলে হয় না?

দ্বারিকা বলল, এত রাতে? কোচোয়ান ছুটি নিয়ে চলে গেছে, হাঁটার পক্ষে অনেক দূর। শীতের মধ্যে এতটা পথ হাঁটা যায়?

বসন্তমঞ্জরী বালিকাসুলভ আবদারের ভঙ্গিতে তবু বলল, আমরা আস্তে আস্তে হেঁটে যাব, বেশ মজা হবে, এই অন্ধকারে আমাদের মুখ কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু আমরা নদী দেখতে পাব।

দ্বারিকা তবু উৎসাহ বোধ করে না। এই শীতের রাতে আরামের শয্যার প্রলোভন ছেড়ে হাঁটাহাঁটি করতে চায় না সে। বসন্তমঞ্জরীর কাঁধে হাত রেখে বলল, কাল বরং ভোর হতে না হতেই যাব, ত্রিবেণীসঙ্গমে সূর্য ওঠা দেখব।

বসন্তমঞ্জরী বলল, অত ভোরে কী করে আমাদের ঘুম ভাঙবে? তা হলে এসো আমরা সারা রাত জেগে থাকি।

দ্বারিকা বলল, যদি তুমি গান শোনাও, তা হলে জাগতে পারি।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ধারালো শীতের বাতাসের ঝাপটা লাগছে গায়ে। ওরা চলে এল কক্ষের মধ্যে। বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে বসল বসন্তমঞ্জরী। তার কোলে মাথা রেখে দ্বারিকা শুয়ে পড়ল। আপনমনে বলে উঠল, আঃ, বড় ভাল লাগছে।

বসন্তমঞ্জরী বলল, যদি কোনও গাছের তলায়... আর কোথাও কেউ নেই, তুমি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছ, গাছের পাতাগুলোয় বাতাসে ঝিলিমিলি শব্দ হচ্ছে, তা হলে আরও ভাল লাগত না?

শীতের রাতে বিছানার উষ্ণতাই বেশি পছন্দ হল দ্বারিকার, সে বলল, আমরা যখন বৃন্দাবন যাব, তখন বসন্তকাল এসে যাবে, তখন না হয় কোনও গাছতলায়... এখন তুই গান ধর, বাসি।

বসন্তমঞ্জরী গুনগুন করে গান শুরু করল। একটা পুরো গানও শেষ হল না, তার আগেই দ্বারিকার নাসিকাগর্জনে তাল ভঙ্গ হতে লাগল। একটু পরে দ্বারিকার মাথাটি খুব সন্তর্পণে নামিয়ে বালিশের ওপর স্থাপন করে দিল বসন্তমঞ্জরী। তারপরেও নিজে শুয়ে পড়ল না, বসেই রইল। অনেকদিন পর আজ তাকে গানে পেয়েছে, মৃদু কণ্ঠে সে গেয়ে চলল একটার পর একটা গান, নিজেকেই শোনাচ্ছে না, তন্ময় হয়ে যেন সে কোনও অদৃশ্য দেবতার কাছে নিবেদন করছে তার সঙ্গীত।

প্রথম কুক্কুটের ডাক ধ্বনিত হতে না হতেই সে জাগিয়ে তুলল দ্বারিকাকে। নিজে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। সঙ্গমে গিয়ে সূর্যোদয় দেখতে হবে। দ্বারিকার ঘুমের জড়তা সহজে কাটে না, সে বিলাসী পুরুষ, ভোরে জেগে ওঠার কথাটা ছিল নিতান্তই কথার কথা, বিলাসী পুরুষরা সূর্যের তোয়াক্কা করে না। গড়িমসি করতে করতে সে বলল, আমরা তো এখানে বেশ কয়েকদিন থাকব, ব্যস্ততার কী আছে, না হয় আর একদিন দেখব সূর্য ওঠা!

বসন্তমঞ্জরী অনুনয় করে বলতে লাগল, না, আজই ইচ্ছে করছে, তুমি কথা দিয়েছিলে, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না?

দ্বারিকাকে শেষ পর্যন্ত উঠতেই হল। বসন্তমঞ্জরী তার চোখ-মুখ প্রক্ষালনের জন্য এনে দিল ঈষদুষ্ণ জল, পরিধানের জন্য জুগিয়ে দিল কুর্তা-পাজামা। কোচোয়ানকে তলব করে তারা যাত্রা করল প্রয়াগের দিকে।

পথে তীর্থযাত্রীদের স্রোত এখনও অব্যাহত। হিন্দুদের বিশ্বাস ত্রিবেণীসঙ্গমের জলে অমৃত মিশে আছে। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অসুরদের ছলনা করে যখন অমৃতের কুম্ভ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার থেকে কয়েক ফোঁটা অমৃত পড়ে যায় এখানে। অমৃত অনিঃশেষ, তাই এখানে স্নান করলে সেই অমৃতের স্পর্শে সব পাপ ধুয়ে যায়। মৎস্যপুরাণে আছে যে, সমুদ্র মন্থনের পর অমৃতকুম্ভ নিয়ে স্বর্গের নন্দনকাননে পৌঁছতে জয়ন্তর দীর্ঘ বারো দিন সময় লেগেছিল। দেবতাদের বারো দিনে

মানুষের বারো বৎসর, তাই জয়ন্তর সেই যাত্রার স্মৃতিতে এখানে প্রতি দ্বাদশ বৎসরে পুণ্যস্নান হয়। ইদানীং আর বারো বছর অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকছে না, তাই ছ' বছর অন্তর অর্ধকুম্ভের প্রবর্তন হয়েছে।

তীর্থের পুণ্য সঞ্চয়ের সঙ্গে শারীরিক কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারটাও যেন জড়িত আছে। যাদের গাড়ি-ঘোড়া চড়ার সামর্থ্য আছে, তারাও ইচ্ছে করে পদব্রজে আসে, তাও নগ্ন পদে। নদীর চড়ায় অসংখ্য ছোট ছোট তাঁবু, তার মধ্যেই তীর্থযাত্রীরা কোনওক্রমে মাথা গুঁজে থাকে। অনেকে তাঁবুর আশ্রয়ও পায়নি, খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকতেও তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। নানান সম্প্রদায়ের সাধুরাও সমবেত হয়েছে আগে থেকে, তাদের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসীরা সম্পূর্ণ নিরাবরণ।

দ্বারিকারা যখন এসে পৌঁছল, ততক্ষণে সূর্যদেব জল ছেড়ে উঠে এসেছেন। জবাকুসুম বর্ণের বদলে তাঁর রূপ এখন স্বর্ণাভ। এরই মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা জলে বহু লোক নেমে পড়েছে স্নানে। সাধুদের তাঁবু থেকে ভেসে আসছে নানারকম সঙ্কীর্তনের ধ্বনি। নাগা সন্ন্যাসীরা সার বেঁধে ছুটছে ত্রিশূল হাতে, কয়েকজন চ্যাঁচাচ্ছে হঠ যাও, হঠ যাও!

ভারতীয় নারীরা অন্য সময় যতই আব্রু রক্ষা করুক, তীর্থস্থানে এসে সব বিধিনিষেধ যেন ঘুচে যায়। এখানে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে নারীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাদের জন্য পৃথক কোনও ঘাট নেই, পুরুষদের সঙ্গেই তারা নদীতে স্নান করছে, অনেকে ভিজে শাড়ি পরেই অসংখ্য চক্ষুর দৃষ্টিপথ দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

বসন্তমঞ্জরী ওড়নায় মুখ ঢেকে রেখেছিল, গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে দ্বারিকা বলল, ঘোমটা খুলে ফেল, বাসি, এখানে স্ত্রীলোকের খোলা মুখ দেখাতে কোনও আপত্তি নেই। ঘোমটায় চক্ষু ঢাকা থাকলে তুমিই বা সব কিছু দেখবে কী করে?

বসন্তমঞ্জরী সঙ্গে সঙ্গে ওড়না সরিয়ে বলল, জায়গাটা কত চেনা লাগছে, যেন আগে দেখেছি।

দ্বারিকা বলল, অনেক লোকের মুখে গল্প শুনেছি তো, শুনতে শুনতে চেনা লাগে।

বসন্তমঞ্জরী হাত তুলে বলল, ওই ডান দিকটায় চলো যাই।

দ্বারিকা সেদিকে তাকিয়ে বলল, ওখানে বড় বেশি মানুষের জটলা। ধুলো আর ধোঁওয়া উড়ছে। ওদিকে গিয়ে কী হবে? বরং বাঁ দিকটা নিরিবিলি। এদিক দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

আপত্তি না করে সেদিকেই খানিকটা এগোল বসন্তমঞ্জরী। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, ওই দিকটাই কিন্তু ভাল ছিল। আমাদের ওদিকেই যেতে হবে।

দ্বারিকা লঘু হাস্যে বলল, শোনো পাগলির কথা! তুই তো সত্যিই আগে এখানে আসিসনি, তুই কী করে জানলি ওদিকটা ভাল?

বসন্তমঞ্জরী বলল, আমার মন বলছে!

কাশী না এলাহাবাদ, মোগলসরাই থেকে যে-কোনও দিকেই যাওয়া যায়, দ্বারিকার ইচ্ছে ছিল আগে কাশীতে গিয়ে কিছুদিন থাকার। বসন্তমঞ্জরী তখন বলেছিল, আগে প্রয়াগ দর্শন করে আসি চলো। তখনও কিন্তু সে কুম্ভমেলার এই স্নানের কথা জানত না, দ্বারিকারও জানা ছিল না, হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে নদীতে ডুব দিয়ে পুণ্য অর্জনের স্পৃহাও তার নেই। মেলার কথা জেনেই সে বলেছিল, অত ভিড়ের মধ্যে এখন এলাহাবাদ না গিয়ে আগে কাশী যাওয়াই তো শ্রেয়। বসন্তমঞ্জরী তবু জেদ ধরেছিল, না, আগে এলাহাবাদ, তার মন বলছে, এখন এলাহাবাদ যেতে হবে।

ওর মন কী করে এসব কথা বলে? এই মনের নিরিখ পাওয়া বেজায় কঠিন।

দ্বারিকা বলল, ঠিক আছে। চল ডান দিকেই যাই, দেখি সেখানে কী আছে।

সেদিকে ক্রমশই ভিড় বাড়ছে, মানুষজন ঠেলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে। এদিকটায় গা ঘেঁষাঘেঁষি অসংখ্য তাঁবু, মাঝখান দিয়ে সরু পথ, তার ওপর আবার ভিখিরির উৎপাত। বসন্তমঞ্জরী এক পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে যাচ্ছে নিজে নিজে, যেন সব তার চেনা, সে-ই দ্বারিকার পথ প্রদর্শক।

আরও কিছুটা যাবার পর দেখা গেল সারি সারি দোকান। গরম গরম জিলিপি আর কচুরি ভাজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তা দেখে দ্বারিকা বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে পেটুক মানুষ, খাবারের সুগন্ধে

তার খিদে চাগাড় দিয়ে উঠেছে। তা হলে তো ঠিক দিকেই নিয়ে এসেছে বসন্তমঞ্জরী।

এদিকে চায়ের বিশেষ চল নেই। দোকানগুলির সামনে বিশাল বিশাল কড়াইতে ফুটছে খাঁটি দুধ। বড় এক ভাঁড় দুধের দাম দশ পয়সা। বাঙালিরা ছোট ছোট জিলিপি বানায়, এখানে এক একটি জিলিপি তার চার গুণ বড়, রসে একেবারে টুসটুসে। পদ্মপাতায় করে বিক্রি হচ্ছে কচুরি আর হালুয়া। দ্বারিকার একেবারে জিভে জল আসার উপক্রম।

বসন্তমঞ্জরী কিন্তু খাবারের জন্য আকৃষ্ট হয়ে এদিকে আসেনি। এত সকালে সে কিছুই খেতে চায় না। কচুরি কিংবা জিলিপি কিছুই সে খাবে না। দ্বারিকার অনেক পীড়াপীড়িতে সে এক টুকরো জিলিপি ভেঙে মুখে দিল শুধু। গরম দুধ দ্বারিকার খুব প্রিয়, বসন্তমঞ্জরীর মুখে দুধ একেবারে রোচে না। একটা মস্ত ভাঁড় ভর্তি দুধ নিয়ে চুমুক দিতে দিতে দ্বারিকা আবার হাঁটতে শুরু করল। দোকানগুলির পর জায়গাটা ফাঁকা, এদিক দিয়েও নদীর ধারে পৌঁছনো যায়।

দ্বারিকার চেয়ে একটু এগিয়ে গিয়েছিল বসন্তমঞ্জরী, পিছিয়ে এসে বলল, কাল রাতে তোমাকে বলেছিলাম, এখানে আমাদের একজন চেনা মানুষ আছে? আমি ভুল বলিনি।

দ্বারিকার গোঁফ দুধ লেগে সাদা হয়ে গেছে। শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কই?

বসন্তমঞ্জরী চোখের ইঙ্গিতে একদিক দেখাল।

সেদিক তাকিয়ে আরও বিস্মিত হল দ্বারিকা। একটা পাথরের চাঙড়ের ওপর বসে আছে একজন মানুষ, পরনে মলিন গেরুয়া বস্ত্র, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, হাতে একটি লাঠি। এই লোকটিকে দ্বারিকা কস্মিনকালেও দেখেনি।

দ্বারিকা বসন্তমঞ্জরীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ও কে?

বসন্তমঞ্জরী পালটা প্রশ্ন করল, তুমি ওকে চেনো না?

দ্বারিকা বলল, বাপের জন্মেও চিনি না।

বসন্তমঞ্জরী হাসল।

দ্বারিকা গোঁয়ারের মতন উপবিষ্ট লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, নমস্কার, মহাশয় কি বাঙালি?

লোকটি মুখ তুলে দ্বারিকার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

দ্বারিকার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। বিস্ময়ে বা পুলকে নয়, অজানা আশঙ্কায়। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সে চিনতে পারেনি, অথচ বসন্তমঞ্জরী চিনল কী করে? এই মানুষটিকে সে মাত্র একবার দু-বার দেখেছে, তাও অল্প সময়ের জন্য। এই মানুষটি যে এখানে বসে থাকবে, তাই বা বসন্তমঞ্জরী কেমনভাবে জানল? সে এদিকেই আসবার জন্য বারবার বলছিল কেন? বসন্তমঞ্জরীর কি অলৌকিক ক্ষমতা আছে? এত কাণ্ডের পর যাকে সে বিবাহ করল, সে সাধারণ মানবী নয়?

দাড়ি-গোঁফে মুখমণ্ডল ঢাকা থাকলেও চোখ দেখে মানুষকে চেনা যায়। দ্বারিকা অস্ফুটভাবে বলল, ভরত!

ভরতের দৃষ্টিতে বিস্ময় নেই, সামান্য চাঞ্চল্যও নেই। সে কোনও কথা না বলে চেয়ে রইল শান্তভাবে।

দ্বারিকা তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, ভরত, তুই এখানে? কতকাল তোর কোনও সন্ধান নেই, তুই এখানে আছিস কতদিন? এখানে কী করিস? কথা বলছিস না কেন? আমাকে চিনতে পারিসনি। আমি দ্বারিকা, দ্বারিকা!

ভরত এবারে শুধু বলল, দ্বারিকা!

দ্বারিকা বলল, ওই দ্যাখ বসন্তমঞ্জরী, আমার বাসি। মনে আছে ওর কথা? আমি এখন ওকে বিয়ে করেছি। সমাজের মুখের ওপর তুড়ি মেরে দিয়েছি। বাসিই দেখাল যে তুই এখানে একলা বসে আছিস।

ভরত বসন্তমঞ্জরীর দিকে এক পলক তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল মুখ। কোনওরকম সম্ভাষণ জানাল

না।
দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, তুই এলাহাবাদে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছিস কেন রে ? কতদিন হল ?
ভরত বলল, কাল এসেছি।
—কাল ? কাল কখন ?
—রাতে পৌঁছেছি
—বসন্তমঞ্জরী তোকে হাঁটতে দেখেছিল রাস্তায়। দেখেই চিনেছে। আমি দেখতে পাইনি। ব্যাটা, তুই সাধু হয়েছিস নাকি ?
—না।
—তা হলে গেরুয়া ধারণ করেছিস কেন ?
—চলাফেরায় সুবিধা হয়।
—চলাফেরায় সুবিধা হয় মানে ? তুই কি ঘুরে ঘুরে বেড়াস নাকি ? কাল রাতে এসে পৌঁছেছিস, তোর কোনও আস্তানা ঠিক হয়েছে ?
ভরত আবার চুপ করে গেল।
দ্বারিকা বলল, বুঝেছি, তুই সন্ন্যেসী সেজেছিস, খোলা মাঠে পড়ে থাকতে চাস ! ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে, তাই না ? ওসব চলবে না, ওঠ, আমাদের সঙ্গে চল।
ভরত ঈষৎ কাতরভাবে বলল, এই বেশ বসে আছি।
দ্বারিকা প্রবল বেগে মাথা দুলিয়ে বলল, উঁহুঃ, ও কথা শুনব না। এতদিন পর দেখা হল, তোকে সহজে ছাড়ছি নাকি ? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন রে, তোর কী হয়েছে ?
ভরত বলল, কিছু না।
দ্বারিকা তার কুর্তার জেব থেকে চুরুটের বাক্স বার করল। একটি চুরুট ভরতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে। আমি এলাহাবাদে বাসা ভাড়া করেছি, অনেক ঘর আছে, তুই সেখানে থাকবি চল। অনেক গল্প আছে। এর মধ্যে কত কী যে ঘটে গেল !
ভরত চুরুট নিতে আপত্তি করল না।
বসন্তমঞ্জরী মুখ নিচু করে আছে, এবার সে ফিসফিস করে স্বামীকে বলল, আগে ওঁর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অনেকদিন উনি ভাল করে খাননি।
দ্বারিকা বলল, ঠিক কথা। আগে কিছু খাওয়া দরকার। চল ভরত, এখানে খুব ভাল দুধ পাওয়া যাচ্ছে, খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবি, আমিও আর এক ভাঁড় খাব।
ভরত যেন একটি চাকা লাগানো কাঠের পুতুল, তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল দ্বারিকা। দুধের ভাঁড় দেওয়া হলে সে পান করতে লাগল যন্ত্রের মতন।
দ্বারিকা আরও অনেকগুলি জিলিপি কিনল, বসন্তমঞ্জরী এখনও কিছু খেতে রাজি নয়। স্নানের আগে সে কিছু খেতে চায় না।
দ্বারিকা বলল, বাসি কিছু না খেলেও তুই তা নিয়ে ভাবিস না ভরত। ওর পাখির আহার। সারাদিনে কখন যে চুটিমুটি কী একটু খায় তা টেরই পাওয়া যায় না। তুই জিলিপি ভালবাসতি, মনে আছে, মানিকতলা বাজারের কাছে এক দোকান থেকে আমরা প্রায়ই গরম গরম জিলিপি খেতাম, তখন তোরও পয়সা ছিল না, আমারও তেমন পয়সা ছিল না, ইচ্ছে হলেও দু-চার খানার বেশি কেনার ক্ষমতা থাকত না। এ জিলিপি অতি সরেস !
ভরত বসন্তমঞ্জরীর উপস্থিতির প্রতি কোনও মনোযোগই দিচ্ছে না, গোটা চারেক জিলিপি সে খেয়ে ফেলল। দোকানির কাছ থেকে এক ঘটি জল চেয়ে নিয়ে পান করল সবটা। সে যে খুবই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
চুরুটে টান দিয়ে বলল, এবার আমি যাই ?
দ্বারিকা বলল, যাই মানে, কোথায় যাবি ? বললাম যে, তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি ?
দ্বিধাগ্রস্তভাবে ভরত বলল, বাড়ি ? আমি তো কারুর বাড়িতে থাকি না।

দ্বারিকা প্রায় ধমক দিয়ে বলল, কারুর বাড়ি আর আমার বাড়ি কি এক হল ? এতদিন পর তোকে পেয়ে আমি ছাড়ছি আর কি ! এত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন চেনা মানুষকে খুঁজে পাওয়া কী আশ্চর্য ব্যাপার। বাসির চোখ আছে বটে, ঠিক তোকে দেখেছে। জানিস ভরত, অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার, আমাদের প্রয়াগে আসার কোনও ঠিক ছিল না। কাশীতেও চলে যেতে পারতাম। কাশীতে গেলে আর তোর সঙ্গে দেখা হত না। তারপর এখানে এসেও আমরা প্রথমে জটাধারী আশ্রমের দিকটায় যাচ্ছিলাম, বাসির কী খেয়াল হল, বলল, ওই দোকানগুলোর দিকে চলো। ও ঠিক বুঝেছিল, জিলিপি আর গরম দুধ পেলে আমি খুশি হব। এদিকে এলাম বলেই তো দেখা হয়ে গেল তোর সঙ্গে। তোর সঙ্গে আর কেউ এসেছে ?
ভরত দু দিকে মাথা নাড়ল।
দ্বারিকা বলল, তবে আর কী, চল, চল। আমি এত মানুষের ভিড়ে স্নান-টান করব না। বাড়ি ফিরে ওসব সেরে নেওয়া যাক। বিকেলের দিকে আবার না হয় এদিকে আসা যাবে। সম্রাট আকবরের তৈরি ফোর্টটা দেখেছিস ? ও দেখবি কী করে, তুই তো কাল রাত্তিরে এসেছিস। ফোর্টটা ভাল করে ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে। তারপর ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম...
নিমরাজি অবস্থায় ভরতকে ভাড়াবাড়িতে নিয়ে এল দ্বারিকা। ভরত হুঁ-না ছাড়া কথাবার্তা বিশেষ বলে না। তার মুখখানি উদাসীনতায় মাখা। দ্বারিকা অবশ্য তা লক্ষ করছে না বিশেষ। এতদিন পর পুরনো বন্ধুকে পেয়ে সে নিজের কথাই বলে যাচ্ছে সাতকাহন।
দুপুরবেলা গরম জল আনিয়ে দ্বারিকা নিজেও যেমন স্নান করল, তেমনি বন্ধুকেও স্নান করতে বাধ্য করাল। ভরতের গেরুয়া বসন ছাড়িয়ে পরাল নিজের পরিষ্কার ধুতি ও কুর্তা। কালই সে পরামানিক ডেকে ভরতের দাড়ি কামিয়ে দেবে শাসিয়ে রাখল।
তারপর চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানা পদের মধ্যাহ্ন ভোজ চলল অনেকক্ষণ ধরে। নারী-পুরুষের একসঙ্গে খেতে বসার রীতি নেই, দ্বারিকা অনেক সাধাসাধি করলেও বসন্তমঞ্জরী তার সঙ্গে আহারে বসে না, আজ অতিথি রয়েছে, আজ তো প্রশ্নই ওঠে না। বসন্তমঞ্জরী পরিবেশন করল সব। ভরত নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ শেষের দিকে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল থালার ওপরে। দ্বারিকা তার কাঁধ ধরে টেনে তুলে বলল, একী, কী হল তোর ?
ভরতের দু চক্ষু ঘুমে জড়ানো। শুধু তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত নয়, বোঝা গেল, অনেকদিন সে ভাল করে ঘুমোয়নি। আজ উদর পূর্ণ হওয়ার পর রাজ্যের ঘুম ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার চোখে। তখনই তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বিশ্রামের জন্য।
দ্বারিকাও নিজের বিছানায় এসে পান মুখে দিয়ে গড়গড়া টানল খানিকক্ষণ। তার দিবানিদ্রার অভ্যেস আছে। বসন্তমঞ্জরী নিজের কাজ টাজ সেরে এল খানিক পরে। বসন্তমঞ্জরী মাথার চুলে বিলি কেটে দিলে দ্বারিকার সহজে ঘুম আসে।
আরামে চোখ বুজে দ্বারিকা বলল, বাসি, তোর নজরের জোর আছে বটে। আমার বন্ধু, আমি তাকে চিনতে পারিনি, তুই ঠিক চিনেছিস।
বসন্তমঞ্জরী বলল, মানুষটা বড় দুঃখী।
দ্বারিকা বলল, বরাবরই ওর দুঃখী দুঃখী ভাব। অল্প বয়স থেকেই ওর বাপ-মা নেই, আপনজনও কেউ নেই। দুঃখ তো থাকবেই। স্বাভাবিক। তবে কী জানিস, ক্রমান্বয়ে দুঃখী দুঃখী ভাব করলে ওই ভাবটাই শেষপর্যন্ত পেয়ে বসে। এবার ওর ঘাড় থেকে এই দুঃখের ভূতটা ছাড়াতে হবে। এবার জোরজার করে ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়ে করে থিতু হলে ওসব কেটে যাবে।
বসন্তমঞ্জরী বলল, উনি কি রাজি হবেন ? মনে হল যেন, কিছুদিন আগেই ওঁর বউ মারা গেছে।
দ্বারিকা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল, তার ভুরু কুঁচকে গেল। সে বলল, অ্যাঁ ? কী বললি ? ভরতের বিয়ে হল কবে যে তার বউ মারা যাবে ! ভরত তো ওর বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেনি। তোকে নেমন্তন্ন করেছিল ? তা হলে তুই জানলি কী করে ?
বসন্তমঞ্জরী কাঁচুমাচুভাবে বলল, না, আমি জানি না। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে হল, উনি সদ্য বড়

একটা শোক পেয়েছেন। স্ত্রীবিয়োগের মতন শোক।

উঠে বসে রীতিমতন রাগত স্বরে দ্বারিকা বলল, কী উদ্ভট পাগলের মতন কথা বলিস! কোনও মানুষকে দেখেই বলা যায় যে তার বউ মারা গেছে? মনে হল আর মনে হল, তোর এই মনে হওয়া নিয়ে আর পারি না।

এর আগের সব ব্যাপারগুলো কাকতালীয় বলে ধরে নিয়ে দ্বারিকা অনেকটা স্বস্তি বোধ করেছিল। কিন্তু এবারে বসন্তমঞ্জরীর ব্যবহার খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। যাকে সে প্রেম ও নর্ম সহচরী রূপে পেতে চায়, সে জাদুকরীর ভূমিকা নেবে কেন? জাদুকরীকে নিয়ে কেউ সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখে না।

সে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, আমি এখুনি ভরতকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

বসন্তমঞ্জরী ব্যাকুলভাবে দ্বারিকার হাত চেপে ধরে বলল, না, না, এখন থাক, উনি বিশ্রাম করছেন। হয়তো আমার ভুল হয়েছে।

দ্বারিকা বলল, ভুল হয়েছে না ঠিক হয়েছে এখুনি তার সমাধান হয়ে যাবে।

দপদপিয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একতলায় ভরতের ঘরেও তাকে পাওয়া গেল না। তার বিছানা শূন্য। হাঁকাহাঁকির পর একজন খিদমতগারের কাছ থেকে জানা গেল যে ভরতকে সে তার লাঠি ও পুঁটুলি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

শয্যার ওপর ভরত খুলে রেখে গেছে দ্বারিকার দেওয়া পোশাক।

৩৮

এলাহাবাদ থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পদব্রজে, জনতার স্রোতের সঙ্গে মিশে তিনদিন পর ভরত বিন্ধ্যাচলে পৌঁছল। এমন এক অদ্ভুত উদাসীনতা তাকে পেয়ে বসেছে যে, তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা বোধেরও সঙ্গতি নেই। সারাদিন হয়তো আহারের কথা মনেই পড়ে না, আবার মধ্য রাতে হঠাৎ সে উদরের জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

একটানা পথ চলার পর পা দুটি প্রায় অবশ হয়ে এসেছে, বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের সিঁড়িতে অনেকক্ষণ বসে রইল ভরত। শরীর ক্লান্ত, কিন্তু মনের নিবৃত্তি নেই। মন আকাশ থেকে পাতালে পরিভ্রমণ করে। আবার এমনও হয়, মানুষ নিজে কী যে চিন্তা করছে, সেটাই সে মনে রাখে না।

মন্দিরের চত্বরে বহু মানুষের ভিড়, ভরত অলস মনে সে দিকে চেয়ে আছে, বিশেষ কারুকে দেখছে না। এক জায়গায় একদল লোক গোল হয়ে ঘিরে বসে একটা গান গাইছে। ভরত সে গানের প্রতিও মনোযোগ দেয় নি, তীর্থযাত্রীদের সব গান প্রায় একই রকম হয়, সুরেরও বৈচিত্র্য থাকে না। হঠাৎ তার খটকা লাগল, এরা কী ভাষায় গাইছে?

শ্রী মধুদ্বিষ ঈশ্বরের কীর্তন মঙ্গল নিরন্তর
যিটো ভূমিভাগে শুদ্ধরূপে হোয়ে জাত
তার ধুলি যিটো শিরে ধরে, নিশ্চয়ে জানিবা সিটো নরে
কৃষ্ণের পরম বল্লভ হোয়ে সাক্ষাত।

খানিকটা বাংলার মতন শুনতে লাগলেও উচ্চারণ বাঙালিদের মতন নয়। ভরত ওড়িয়া ভাষা মোটামুটি শিখে নিয়েছিল, ওড়িয়াদের উচ্চারণও অন্যরকম। বাংলার বিভিন্ন জেলায় বাগ্‌ভঙ্গি বিভিন্ন, ভরতের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছু সিলেট ও কুমিল্লার ছাত্র ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে

কথাবার্তার সময় কিছুই প্রায় বোঝা যেত না। লিখিতভাবে বাংলা, কিন্তু উচ্চারণ শুনে মনে হয় অন্য ভাষা।

ওরা যে ভাষাতেই গান করুক, তাতে ভরতের কিছু আসে যায় না। তবু সে একটা অকারণ কৌতূহল বোধ করল। মন দিয়ে শুনতে লাগল সেই গান।

একটু পরে ওদের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি, এই শীতেও খালি গায়ে শুধু একটা নামাবলি জড়ানো, তার মুণ্ডিত মস্তকে মস্ত বড় শিখা, এসে বসল ভরতের কাছাকাছি। ভরত তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আপনারা বাংলাদেশের কোন জেলা থেকে এসেছেন?

লোকটি হঠাৎ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। রুদ্র চক্ষে বলল, সবই আপনাদের বাংলা? কেন, মানুষের অন্য কোনও ভাষা নেই? আমরা আসাম থেকে এসেছি, আমাদের ভাষা অহমিয়া।

ভরত খানিকটা কুঁকড়ে গেল। অকারণে তাকে এই ধমক খেতে হল। কার ভাষা বাংলা, কার ভাষা অহমিয়া, তা জেনে তার কী দরকার!

তারপর তার একটু হাসি পেল। তার মা ছিলেন আসামের কন্যা। সেই হিসেবে অহমিয়া তো ভরতেরও মাতৃভাষা! মা! শুধু একটা শব্দ মাত্র, মায়ের মুখখানা কেমন ছিল, তাও সে জানে না। সে কখনও আসামে যায়নি, সে সেখানকার ভাষা শিখবে কী করে? তবু এই লোকটিকে তার আত্মীয়ের মতন মনে হল।

সে বিনীতভাবে লোকটিকে বলল, গানটি শুনতে ভাল লাগছিল। আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, ফিরতে ফিরতে অনেক দিন লেগে যাবে, তাই না?

লোকটি এবারে একটু নরম হয়ে বলল, আমরা এক বৎসরের জন্য তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি। আসছি সেই শিবসাগর থেকে। আসামের মানুষ বেশি দূর যায় না, আমি প্রতি বৎসর দশ-বারোজনের একটি দল নিয়ে কাশী-প্রয়াগ-মথুরা-বৃন্দাবন পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আমি নিজে সতীমার পীঠস্থান অনেকগুলি ঘুরেছি। বিন্ধ্যাচল বাকি ছিল, এখানে সতীমায়ের বাম পায়ের আঙুল পড়েছিল জানেন বোধ করি? মহাশয়ের নিবাস কোথায়?

ভরত একটু ইতস্তত করে বলল, আমার বাড়ি পুরী, জগন্নাথধাম।

লোকটি কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে বলল, ওঃ, সে তো মহাতীর্থ। দু'বার দর্শন করে এসেছি। আপনি তা হলে বাঙালি নন, বাংলায় কথা বলছিলেন।

ভরত বলল, কাজের জন্য শিখতে হয়েছে।

লোকটি বলল, আমাদের ইস্কুলেও বাংলা পড়তে হয়। আমাদের স্ত্রীলোকেরা মেখলা ছেড়ে শাড়ি পরা শুরু করেছে। ছোকরারা বাঙালিদের কায়দায় চুলে টেরি কাটে। এ সব আমার দু'চক্ষের বিষ।

ভরত কোনও বিতর্কে জড়াতে চায় না। সে লোকটির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমার খুব আসামে যেতে ইচ্ছে করে। একবার অন্তত সেই দেশটা দেখতে চাই।

লোকটি উৎসাহিত হয়ে বলল, এ আর এমন কী কথা, আমাদের সঙ্গেই যেতে পারেন। আমার নাম লক্ষ্মীনাথ ফুকন, শিবসাগরে ছড়িদার হিসেবে আমাকে সকলে এক ডাকে চেনে। কোনও অসুবিধে হবে না। ওখানে আমার বাড়িতে থাকবেন। রাহা খরচ দিতে পারবেন তো?

ভরত মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

লোকটি বটুয়া থেকে একটা কাঁচা সুপুরি বার করে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন, গুয়া খান।

এটা বন্ধুত্বের চিহ্ন। সরলভাবে ভরত সেটা মুখে পুরে দিল।

বৎসরখানেক ধরে ভরত স্রোতের শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছে। তার জীবন এখন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। কোনও জায়গাতেই সে দু' একদিনের বেশি থাকে না। এক জায়গা ছেড়ে অন্য কোথায় যাবে, তাও সে ভাবে না আগে থেকে। অথচ সে সন্ন্যাসী হয়নি, নাস্তিকও হয়নি।

মহিলামণির কঠিন অসুখের সময় সে বিভিন্ন দেবালয়ে গিয়ে ধর্না দিয়েছে, সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে সে পূজা দিয়েছে শুদ্ধ ভাবে, একান্ত মনে। সাধক পুরুষদের কাছে কৃপা ভিক্ষা করেছে। মহিলামণি তবু বাঁচল না, তার সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

ছাত্র বয়সে সে দেব-দ্বিজে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতিও ভক্তি ছিল না। মহিলামণিকে বিবাহের সময় সে কটকে কবি রবীন্দ্রবাবুর অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেয়। মহিলামণির যখন জীবন-সংশয় হয় তখন যে-কোনও বিশ্বাসের মূল্যে সে তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। নিরাকার ব্রহ্মের কাছে কিছু প্রার্থনা করা সহজ নয়, চোখ বুঁজে যার কোনও রূপ কল্পনা করা যায় না, তাঁর কাছে কি কিছু চাওয়া যায়? বরং হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তিগুলির রূপ মানুষেরই মতন, মানুষের দুঃখে তাঁদের প্রাণ কাঁদতে পারে। ভরত তাই জগন্নাথদেব, শিব, দুর্গা, কালী, কোনও দেবতাকেই ডাকতে বাকি রাখেনি। যে যা বলেছে, তাগা-তাবিজ, জড়ি বুটি, চরণামৃত সব মেনেছে। তবু মহিলামণিকে রাখা গেল না।

এর ফলে ভরত যদি আবার কঠোর নাস্তিক ও অবিশ্বাসী হয়ে উঠত, ঠাকুর-দেবতাদের গালমন্দ করত, তা হলে তা খুব অস্বাভাবিক মনে হত না। ক্রোধ-অভিমান-ব্যর্থতার হাহাকারে সে ধর্ম-বিমুখও হতে পারত। মহিলামণির শেষ শয্যায় সে তার হাত ধরে বসেছিল শিয়রের কাছে, বারবার বলছিল যেতে দেব না, তোমাকে চলে যেতে দেব না। মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে সে তার স্ত্রীকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, তবু আকাশের দেবতারা তাকে কেড়ে নিলেন। ঈশ্বরের এ কী লীলা, কে জানে!

মহিলামণি শেষ নিশ্বাস ফেলার পর ভরত হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে ক্রোধে জ্বলে ওঠেনি, শোকে ভেঙে পড়েনি। অদ্ভুত এক অবসাদে ভরে গিয়েছিল তার মন। সে নিজের ভাগ্যকেই দায়ি করেছিল। এ জীবনে সে সুখ পাবে না, এটাই তার নিয়তি। মৃত্যু বারবার তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মৃত্যুর দেবতা কেন চূড়ান্ত ভাবে তাকে টেনে নিচ্ছেন না? মহিলামণির তো কোনও দোষ ছিল না।

সংসারের পাট চুকিয়ে, জিনিসপত্র সব বেচে দিয়ে, সন্তানকে শ্বশুরালয়ে রেখে ভরত এখন যে ভ্রাম্যমাণ, তার গতিপথের কোনও আপাতত ছক নেই, তবু নিজের অজ্ঞাতেই যেন সে তীর্থস্থানগুলিতেই ঘুরছে। প্রতিটি মন্দিরের বিগ্রহ সে দর্শন করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, এখন আর তার কিছু চাইবার নেই, শুধু যেন জানতে চায় কেন এমন হল? সে যখনই এক বুক আশা নিয়ে একটা সুস্থির জীবন পেতে চায়, তখনই সব কিছু তছনছ হয়ে যায় কেন?

খুব বেশিক্ষণ কোনও মন্দিরের বিগ্রহের দিকে চেয়ে বসে থাকলে একটা ভয়ের ব্যাপার হয়। ভরত মন্ত্র তন্ত্র জানে না, গানের গলাও নেই তার, কিন্তু সে ফিসফিস করে বলতে থাকে, পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল, পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল.... ক্রমে খুব দ্রুত ভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, পাখি সব, পাখি সব, পাখি সব....। যেন তার বুক পর্যন্ত মাটির মধ্যে গাঁথা, শুধু মুণ্ডুটা বেরিয়ে আছে, সে প্রাণপণে চেতনা বজায় রাখছে। আশে-পাশের লোকজন সভয়ে তার দিকে তাকায়। তখন কেউ না কেউ তাকে একটা ঠেলা মারলে সে হঠাৎ সজাগ হয়, শীতের মধ্যেও ঘামে ভরে যায় তার মুখমণ্ডল, সে এক লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে চলে যায়, দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবে, আমি কি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি? না, না, আমি উন্মাদ-দশা চাই না, আমি ভরত সিংহ, আমি লেখাপড়া শিখেছি, ইংরেজি-অঙ্ক-লজিক জানি...

এই সব দিনে ভরত কাছাকাছি কোনও নদীতে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে, পেট ভরে নানান রকম মুখরোচক দ্রব্য খায়, কোনও সরাইখানায় ঘর ভাড়া নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোয়। তারপর সুস্থ বোধ করে।

লক্ষ্মীনাথ ফুকনের নেতৃত্বে সে আসামের দলটিতে ভিড়ে গেল। লক্ষ্মীনাথ ও ভৃগু নামে একটি অল্পবয়েসী যুবক ছাড়া এ দলের আর সকলেই প্রৌঢ়ত্ব পার করে দিয়েছে। এরা রেলগাড়িতে চড়ে না, গরুর গাড়ি বা এক্কা ভাড়া করে না। দিনের পর দিন হাঁটে। পায়ে হেঁটে তীর্থস্থানগুলি দর্শন করলে নাকি বেশি পুণ্য হয়।

এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভরতের বেশ ভালই লাগছে। এই তো এখন তার জীবনে একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেল। সে তার মাতৃভূমি দর্শন করতে চায়, সেই পথেই চলেছে, হয়তো আসামের

মানুষজনের সঙ্গে সে একাত্মতা বোধ করবে। শুধু একটা ব্যাপার সে ঠিক মেনে নিতে পারছে না। ফেরার পথে এরা কলকাতা শহরে দিন সাতেক থেকে বিশ্রাম নেবে। সেখানে কিছু কিছু কেনাকাটিও আছে। কলকাতার নাম শুনলেই ভরতের কেমন যেন বিরাগ জন্মে যায়। যেন সে কারুর কাছে শপথ করেছে, কলকাতা শহরে সে ইহজীবনে আর কখনও পা দেবে না। সত্যি সত্যি এমন শপথে সে বদ্ধ নয় কারুর কাছে, তবু তার মনে হয়।

ভৃগু নামে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলেটি বেশ দুরন্ত প্রকৃতির। বোঝাই যায়, তাকে জোর করে এই দলের সঙ্গে আনা হয়েছে। তার প্রতি লক্ষ্মীনাথের ব্যবহার পালিত পুত্রের মতন, লক্ষ্মীনাথ একটুক্ষণের জন্যও তাকে নজর-ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু শুধু বুড়ো-বুড়িদের সঙ্গ সর্বক্ষণ তার ভাল লাগবে কেন? মাঝে মধ্যেই সে ছিটকে কোথাও চলে যায়। তীর্থস্থান পুজো-অর্চনায় পুণ্য অর্জনের বদলে সে যুবতী তীর্থযাত্রিণী দেখলে তাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। তীর্থক্ষেত্রে রমণীরা আব্রু রক্ষা করে না। উত্তর ভারতের রমণীদের স্বাস্থ্য মজবুত হয়, অনেকেই আসে সন্তানকামনায়, এক একটা মন্দিরের সামনে তারা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রূপমুগ্ধ যুবার মতন ভৃগু সেই স্থান থেকে নড়তে চায় না, কখনও সে গিয়ে বসে থাকে স্নানের ঘাটে। যাত্রা শুরু করার সময় অন্য কেউ ডাকতে গেলেও সে আসে না, শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীনাথ গিয়ে তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনে।

চুনারে ভৃগু একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল। একজন রমণীকে অনেকক্ষণ একা একা দেখে সে ধারণা করে নিয়েছিল, ওর সঙ্গে বুঝি কোনও পুরুষ সঙ্গী নেই। ভৃগুর চেহারাটি রমণী-মোহন, সে দৃষ্টি তরল করে বেশ মিটিমিটি হাসি দিতে পারে। অনেক স্ত্রীলোকই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকায়, দৃষ্টি ফেরাতে চায় না। তীর্থস্থানগুলিতে নারী-হরণ বা ব্যাভিচার এমন কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অনেক বাঁজা রমণী দেবতার আশীর্বাদের বদলে পরপুরুষ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে সন্তানবতী অবস্থায় ঘরে ফেরে। ভৃগু অত্যুৎসাহী হয়ে সেই রাজস্থানী রমণীটিকে নিভৃতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ যমদূতের মতন যেন মাটি ফুঁড়ে এক পুরুষের উদয় হল। সে ওই রমণীটির স্বামী।

দৌড়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়েও ভৃগু পার পেল না। সেই লোকটি তাকে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে কিল ও লাথি মারতে লাগল অনবরত। ভৃগু বাবা রে মা রে বলে চিৎকার করছে, প্রতিরোধের চেষ্টা নেই বিন্দুমাত্র। একজন স্বামী তার অধিকার প্রয়োগ করছে মারের সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস সব গালাগালি উচ্চারণ করে, অন্য কেউ তাকে বাধা দিতে যাচ্ছে না, যাবেই বা কেন!

আসামের অধিকাংশ মানুষই শান্তিপ্রিয় হয়, লড়াই-হাঙ্গামার মতন স্থূল ব্যাপারে জড়াতে চায় না। এই দলটির সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, এমনকী একটা লাঠি পর্যন্ত নেই। পথে কোনও দস্যু-তস্করের দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করার কোনও ব্যবস্থা রাখেনি, অর্থ-বস্ত্র-অলঙ্কার সবই লুণ্ঠনকারীদের হাতে তুলে দিতে হবে। বাহুবলের বদলে ভক্তিই যাদের সম্বল, তাদেরও একটি অস্ত্র থাকে, তার নাম কান্না।

ভৃগুর ওই দশা দেখে পুরো দলটি এক সঙ্গে কান্না জুড়ে দিল। তাও দূরে বসে। যেন সমবেত মড়াকান্না। একমাত্র লক্ষ্মীনাথ সেই রাজপুতের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি জানাতে লাগল আকুলি বিকুলি ভাবে কেঁদে কেঁদে, সেও দু'চারটি চড়-চাপড় খেল।

ভরত বসে আছে খানিক দূরে মন্দিরের চাতালে। সে দেখছে দৃশ্যটি, কিন্তু তার কোনও প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে না। ভৃগুর নারী-ঘটিত দুর্বলতা সে আগে লক্ষ করেছে দু'একবার। এবারে সে ধরা পড়ে গেছে, ক্রুদ্ধ স্বামীটি শাস্তি দিচ্ছে তাকে, স্ত্রীটি দাঁড়িয়ে আছে একটি স্তম্ভের আড়ালে, গলা পর্যন্ত অবগুণ্ঠিতা, তবে অর্ধেক বক্রভাবে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, সূক্ষ্ম বস্ত্রের মধ্য দিয়ে সে দেখছে সব কিছু। হয়তো ভৃগুকে সে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়ে কাছে টেনেছিল, এখন তার স্বামীর বীরত্ব উপভোগ করছে।

বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে উৎসাহ দিচ্ছে স্বামীটিকে। মুখে মুখে ঘটনাটি প্রচারিত হয়ে, সকলেই বিচারক সেজে যেন ভৃগুকে চরম দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছে, পূজা-প্রার্থনা বা তীর্থের অন্য আকর্ষণের

চেয়ে এই রিরংসা ও হিংসার ঘটনাটিই এখন প্রধান আকর্ষণ।

ভৃগুর আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে ভরত, তবু সে একটুও বিচলিত বোধ করছে না। প্রায় সময়ই তার মন এমন অসাড় হয়ে থাকে, যে বাইরের কোনও ঘটনার প্রতিক্রিয়াই হয় না তার। আবার কখনও কখনও হঠাৎ সে সমসাময়িক বাস্তবতার মধ্যে ফিরে আসে।

রাজপুতটি এখন ভৃগুর গলা টিপে ধরেছে, অন্যরা তাকে এমনই উৎসাহ জোগাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত সে বুঝি ভৃগুকে খুনই করে ফেলবে। স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা খুন কিছুই না।

এই সময় ভরত নিজেকেই প্রশ্ন করল, একজন লোক আর একজনকে মেরে ফেলছে, আমি কেন চুপ করে বসে আছি ?

নিজেই উত্তর দিল, একজন আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছে, এর মধ্যে তুমি মাথা গলাতে যাবে কেন ?

—লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যাচ্ছে নাকি ? ছোকরাটি একটু রসস্থ হয়ে পড়েছিল, তার জন্য তাকে প্রাণ দিতে হবে ?

—তোমাকে বিচারক সাজতে কে বলেছে ? স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার, এর মীমাংসা শুধু যুক্তি-তর্ক দিয়ে হয় না।

—তবু একটা প্রাণ, মানুষের প্রাণ বিপন্ন দেখেও আমি সাড়া দেব না ?

—তুমি একা কী করবে ? দেখছ না, কতগুলো লোক ওকে শাস্তি দেবার পক্ষে ? তুমি নিজের মনে বেশ তো বসেছিলে, ও সব তুচ্ছ ব্যাপারে জড়াতে যাবে কেন ?

—কখনও কখনও কি মানুষকে একাও দাঁড়াতে হয় না ?

ভরতের কাছে সবসময় একটি পাকা বাঁশের লাঠি থাকে। একবার একটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসার পথে একটি নেকড়ে বাঘের পাল্লায় পড়েছিল, সেবার এই লাঠিই তাকে রক্ষা করেছে। ভরতের সুগঠিত দীর্ঘ শরীর, মুখমণ্ডল দাড়ি গোঁফে ঢাকা, তাকে ভ্রাম্যমাণ সাধুর মতনই দেখায়।

ভরত দ্রুত পদে সেই ভিড় ঠেলে গিয়ে লাঠিটা তুলে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ওকে ছেড়ে দাও !

রাজপুত প্রথমটায় অগ্রাহ্য করলে ভরত তার লাঠির অগ্রভাগ লোকটির কপালে ঠেকিয়ে আদেশের সুরে বলল, উঠে দাঁড়াও !

রাজপুতটি ভৃগুকে ছেড়ে উঠল বটে, রক্ত চক্ষে তাকাল ভরতের দিকে। একবার সে নিজের কোমরে হাত দিল, যেন সে তলোয়ার খুঁজছে। একালের রাজপুতরা তরবারির শক্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত হলেও মাঝে মাঝে পূর্ব গৌরবের স্মৃতি চাগিয়ে ওঠে।

দর্শকরা এই আকস্মিক বিঘ্ন একেবারেই পছন্দ করল না। বেশ রঙ্গ জমেছিল, এর মধ্যেই শেষ হতে দেওয়া যায় না। তারা মনে করল, ভরত বুঝি পূর্ব বৃত্তান্তটি জানে না, তাই সমস্বরে বলতে লাগল, মহারাজ ওই বদমাশটা কী করেছে জানেন, এক সতী সাধ্বী কুল রমণীর... । এই রকম সময়ে অনেকেরই গুপ্ত লালসা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, রসালো ভাষায় তা উপভোগ করে। ভৃগু ওই রমণীকে যতটুকু স্পর্শ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে দর্শকরা অনেকে দৃষ্টি দিয়ে তাকে চাটছে।

ভরত অন্যদের কথায় কর্ণপাত করল না, লাঠি উঁচিয়ে এক দৃষ্টিতে সেই রাজপুতের দিকে চেয়ে রইল।

দর্শকদের মধ্য থেকে একজন একটা লাঠি ছুঁড়ে দিল রাজপুতটির দিকে। সে লাঠিটি লুফে নিয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা, কোমরের কষি দৃঢ় করতে লাগল।

জনতা হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠল। এবার অন্যরকম মজা হবে। এক সাধুর সঙ্গে একজন স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষাকারী স্বামীর লড়াই। কে জেতে, কে হারে।

ভরত অবশ্য এরকম নাটকে অংশগ্রহণ করতে চায় না। ভৃগু হ্যাঁচোর প্যাঁচোর করে খানিকটা দূরে সরে গেছে। লাঠি নামিয়ে ভরত দু'হাত জোড় করে স্বামীটিকে শান্ত, ধীর কণ্ঠে বলল, যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন, এবার ওকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনার সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি, ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমিও ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। ওর যা শাস্তি প্রাপ্য ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি

পেয়েছে।

জনতার অধিকাংশ মানুষই রক্তলোলুপ, তারা এমন সমাধান চায় না। তারা রাজপুতটিকে আরও প্ররোচনা দিতে লাগল। সে লোকটিও ভাবল, শান্তির প্রস্তাব মেনে নেওয়া মানে কাপুরুষতা। রাজপুত জাতির ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব এখন তার ওপর।

একটা কুৎসিত গালাগালি উচ্চারণ করে সে ভরতের মস্তকটি বিদীর্ণ করার জন্য লাঠি চালাল প্রচণ্ড জোরে। ভরতও যথাসময়ে ক্ষিপ্র ভাবে নিজের লাঠি তুলে তাকে আটকাল। পরমুহূর্তেই সে নিজের লাঠি ফেলে দিয়ে লোকটিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল, সেই অবস্থায় তাকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, আমাকে মেরে ফেললে তোমার কোনও লাভ হবে না, আমিও তোমার গায়ে আঘাত করতে চাই না। আমি সকলের সামনে আবার ক্ষমা চাইব। ওই ছেলেটি তোমার পত্নীর পা ছুঁয়ে মা বলে ডাকবে, তাতেই তোমার সম্মান রক্ষা হবে। আমরা কেউ কারুর শত্রু নই।

এই ঘটনার পর ভরত আবার আত্মসমীক্ষা শুরু করল।

এক বছর ধরে তার মন বিকল হয়েছিল, বিশেষ কোনও ভাল লাগা, মন্দ লাগা ছিল না। নারী জাতির সংস্পর্শ সে সন্তর্পণে এড়িয়ে যেত। নারীরা তার জীবনে শুধু বিড়ম্বনাই ডেকে আনে, তারাও বিড়ম্বিত হয়। সংসার সম্পর্কেও তার মোহ ভেঙে গেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনার ছায়ামাত্র নেই। কোনও মানুষের সঙ্গেই সে নৈকট্য বোধ করে না, অন্য কারুর আনন্দ-দুঃখে তার কিছু যায় আসে না। সমাজের সঙ্গে সে সম্পর্ক-শূন্য। তা হলে ভৃগু-রাজপুত ঘটনার সঙ্গে সে নিজেকে জড়াতে গেল কেন ? ওদিককার গোলযোগ শুনে সে অন্যদিকে উঠে চলে যেতে পারত। ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করার মুহূর্তেও সে ঘুণাক্ষরে ভাবেনি যে সে ওই লোকটির সঙ্গে লাঠি খেলায় প্রবৃত্ত হবে। তা হলে নিজেকে সে সমাজ-ছাড়া মনে করলেও সমাজ তাকে ছাড়বে না ? অবচেতনে সমাজ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে ? প্রকৃত সন্ন্যাসীরাই সংসারত্যাগী হয়, সে ভেক ধরেছে মাত্র, সন্ন্যাসী হতে পারেনি। তার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। তবু কি মনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব সুপ্ত আছে ? নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস না থাকলে কি সে একটি অচেনা লোকের সামনে লাঠি তুলে দাঁড়াতে পারত ? কিন্তু ক্ষমতার প্রকাশ তো সে চায় না। এই পৃথিবীর কাছে তার কোনও প্রত্যাশা নেই।

আসামের দলটির মধ্যে ভরতের খাতির এত বেড়ে গেল যে তাতেও সে বিব্রত বোধ করতে লাগল। তাকে বেশি বেশি খাবার দেওয়া হয়, তার শয়নের জন্য বেছে নেওয়া হয় সবচেয়ে ভাল স্থানটি। ভরত প্রথম আপত্তি করলেও ওরা শোনে না। ভৃগু এখন তার পদসেবাকারী হয়ে পড়েছে। আর কোনও স্ত্রীলোকের দিকে সে ভুলেও চায় না। সব সময় ছায়ার মতন ভরতের পাশে পাশে থাকে। লক্ষ্মীনাথ বারবার ঘোষণা করেছে, শিবসাগরে পৌঁছে সে ভরতকে তিন বিঘে জমি দেবে, তাকে আর ছাড়বে না।

বারাণসী পৌঁছবার ঠিক আগের রাতে ভরত ওদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে চুপি চুপি সরে পড়ল। একে তো ওদের অত আদিখ্যেতা তার সহ্য হচ্ছিল না, তা ছাড়া সে চিন্তা করে দেখল, কেন সে আসামে যাবে ? মাতৃভূমি না ছাই। মাকে যে চেনে না, তার আবার মাতৃভূমি থাকে নাকি ? সারা হিন্দুস্থানের সব জায়গাই তার কাছে সমান।

ভরত আবার চলতে লাগল বিপরীত দিকে। তার কাছে যা অর্থ আছে, তাতে বৎসর দুয়েকের খরচ চলে যেতে পারে, তারপর যা হয় দেখা যাবে। কলকাতায় সে যাবে না, পুরী-কটকের দিকেও সে যেতে চায় না, ওই সব জায়গা থেকে যত দূরে যাওয়া যায়। তাই সে যাবে।

একদিন তার দ্বারিকার কথা মনে পড়ল। দ্বারিকা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল এক সময়, প্রয়াগে দ্বারিকাকে দেখে সে খুশি হতে পারল না কেন ? কেমন যেন জড়ের মতন হয়ে গিয়েছিল সে, কিছুতেই মন খুলতে পারেনি। দ্বারিকা নয়, বসন্তমঞ্জরীকে দেখেই কি তার অমন হয়েছিল ? অনেককাল আগে, মাত্র একদিন কিছুক্ষণের জন্য সে বসন্তমঞ্জরীকে দেখছিল, তবু মুখখানি স্পষ্ট মনে আছে। এই মুখটি মনে পড়লেই কেমন যেন গা ছমছম করে। দ্বারিকা মেয়েটিকে বিবাহ করে স্ত্রীর

সম্মান দিয়েছে, এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। সাহস আছে দ্বারিকার। ওরা সুখী। হ্যাঁ, ওরা সুখী হোক, সেই জন্যই ভরতের সরে আসাটা ঠিক হয়েছে। কোনও সুখী পরিবারের সংস্পর্শে তার থাকা উচিত নয়, তাতে ওদেরই অশান্তি হতে পারে। সাংসারিক সুখ আর ভরত, এ যেন পরস্পরের বিপরীত।

একটা বড় রকমের হোঁচট খাওয়ার পর বুড়ো আঙুলে একটা ক্ষত হয়ে গেছে ভরতের। হাঁটতে কষ্ট হয়। সে রেলে চেপে ঘুরতে লাগল। পাহাড়ের দিকে গেল না, ট্রেন বদল করতে করতে সে এগোতে লাগল পশ্চিম ভারতের দিকে। সহযাত্রীদের কথাবার্তা শুনে সে বুঝতে পারে যে ভাষা বদলাচ্ছে। সে অবশ্য কারুর সঙ্গে মেশে না, পাশে-বসা যাত্রীটির সঙ্গেও বাক্যালাপ করে না। নীরবতাই যেন তার ধ্যান। সে নিজের মনের গভীর গহনে প্রবেশ করতে চায়। সেখানে যেন একটা অন্ধকার, দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। ভরত সে সুড়ঙ্গ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল নয়, সে অদৃশ্য দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করে জানতে চায়, আমি কী চাই, আমি কী চাই?

শুধু একটি চাওয়ার কথা ভরত নিশ্চিত জানে। তার মৃত্যুবাসনা নেই, আত্মহত্যা করতে কখনও ইচ্ছে করে না। সে বেঁচে থাকতেই চায়। কিন্তু কীসের জন্য বাঁচা?

পায়ের ক্ষতটির যন্ত্রণা ক্রমশই বাড়ছে। ভরত যখন পুরী শহরে একটি ব্যাঙ্কের শাখা-পরিচালক ছিল, সাহেবি-পোশাক পরিধান করত, তখন এরকম কিছু হলে কোনও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হত অবশ্যই। এখন ভরতের জীর্ণ বেশবাস, চিকিৎসকের কথা তার মনেই পড়ে না। ব্যথা যখন খুব বাড়ে, তখন সে সেই পা মুখের কাছে এনে ফুঁ দেয়।

ঘুরতে ঘুরতে নাগপুর রেল স্টেশনে নেমে সে অনুভব করল, এবার একটু বিশ্রাম দরকার।

টাঙ্গাওয়ালাদের কাছে জেনে, একটি টাঙ্গা ভাড়া করে সে চলে এল সীতাবলদিতে একটি ধর্মশালায়। দৈনিক আট আনা ভাড়ায় এখানে রাত্রিবাস করা যায়। পৃথক ঘর নয়, বড় বড় এক একটি কক্ষ, তাতে আট-দশজনের শয্যা পাতা যায়। একখানা হোগলার চাটাই, একটি বালিশ ও একটি কম্বলের জন্য আরও চারআনা অতিরিক্ত ভাড়া লাগে। ভরত এক কোণের দেয়াল ঘেঁষা স্থান পেয়ে বেশ খুশি হল। সন্ধে হতে না হতেই সেই শয্যায় শুয়ে সে নিদ্রাভিভূত হয়ে রইল একটানা কুড়ি ঘণ্টা।

জেগে ওঠার পর সে দেখল, তার পা বেশ ফুলে গেছে, হাঁটার ক্ষমতাই যেন আর নেই। শরীরে জ্বর জ্বর ভাব। কিন্তু এতখানি ঘুমোবার পর তার মন বেশ প্রফুল্ল হয়েছে, ক্ষুধাও বোধ করছে। উঠে বসে সে পায়ের ক্ষততে ফুঁ দিল কিছুক্ষণ।

তার পাশের শয্যায় একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট যুবক শুয়ে আছে, তারও অঙ্গে গেরুয়া এবং মুখময় দাড়ি গোঁফ, সে কৌতূহলী হয়ে ভরতের ফুঁ দেওয়া দেখতে দেখতে কী যেন জিজ্ঞেস করল। তার ভাষা হিন্দি নয়, অন্য কিছু, ভরতের কানে দুর্বোধ্য শোনাল। ভরত এমনিতেই কারুর সঙ্গে হৃদ্যতা করতে চায় না, এই লোকটির প্রশ্নের উত্তরও সে দিতে পারবে না, সে শুধু মাথা নাড়ল দু'দিকে।

কিছু পরে, ক্ষুধার তাড়নায় সে উঠে দাঁড়াল। ধরমশালা তো সরাইখানা বা হোটেল নয় যে চাইলে খাবার পাওয়া যাবে। তাকে যেতেই হবে বাইরে। এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে এল নীচে। সৌভাগ্যবশত তাকে বেশিদূর যেতে হল না, পাশেই একটি দোকানে ডালপুরি ভাজা হচ্ছে।

নাগপুর বেশ বড় শহর, এই দ্বিপ্রহরে রাজপথে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়ার বেশ ব্যস্ততা রয়েছে। এক ধরনের এক্কাগাড়ি দেখা গেল, যা ঘোড়ার বদলে উট দিয়ে টানানো হচ্ছে। হাতির পিঠেও যাচ্ছে কেউ কেউ। কাছাকাছি দোকান-পাট অনেক, একটি ডাক্তারখানার ইংরেজি সাইনবোর্ডও ভরতের চোখে পড়ল। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডালপুরি ও লাড্ডু খেতে খেতে ভরত ভাবল, পায়ের এই ক্ষতের জন্য চিকিৎসকের কাছে যেতেই হবে? না গেলে কী হয়?

ক্ষতটা আরও বাড়বে, আঙুলটা খসে পড়বে? কিংবা চিরতরে একটা পা পঙ্গু হয়ে যাবে? তাতেই বা কী এমন ক্ষতি? পৃথিবীতে কত পঙ্গু মানুষ আছে, তারাও দিব্যি বেঁচে থাকে, ভরতকে যে দুটি

পা-ই অক্ষত রাখতে হবে, তার কী মানে আছে? ব্যথা হচ্ছে খুবই, তবে ব্যথাও যেন একটা নেশা, ভরত সেটা উপভোগও করছে খানিকটা। পুরোপুরি সুস্থতা নিয়ে সে কী করবে? সুস্থ মানুষের অনেক রকমের ব্যস্ততা থাকে, তার তো কিছুই নেই।

আবার সে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এল। এবারেও পাশের শয্যার যুবকটি কিছু জিজ্ঞেস করল তাকে, ভরত ভাষা বুঝতে পারল না, মাথা নাড়ল দু' দিকে।

ভরত একটা সিকি দিয়ে ডালপুরি আর লাড্ডু কিনেছিল। অনেক কিনেছে, সবটা সে শেষ করতে পারেনি। নিয়ে এসেছে শালপাতায় মুড়ে। কী ভেবে সে শালপাতার ঠোঙাটি এগিয়ে দিল যুবকটির দিকে। যুবকটি লুব্ধ ভাবে সেটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করে দিল। তারপর সে গায়ের কাপড় সরিয়ে পেটে চাপড় মেরে এবং আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, সে খুবই ক্ষুধার্ত এবং তার কাছে পয়সা নেই।

একজন মানুষের সঙ্গে খাদ্য ভাগাভাগিতে ভরতের কোনও আপত্তি নেই, কথাবার্তা বলতে না হলেই সে খুশি। এই যুবকটির ভাষা মারাঠি, ভরত তা একবর্ণ বুঝছে না। নাগপুর যদিও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অন্তর্গত, কিন্তু এখানে মারাঠি অধিবাসীর সংখ্যা অনেক। কিছুকাল আগেও এ অঞ্চল ভোঁসলেদের অধিকারে ছিল।

ভরত জানে না, সম্প্রতি এই এলাকায় হুলুস্থুলু চলছে। অল্পবয়েসী যুবকেরা সব সন্ত্রস্ত, তারা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে গ্রামে, লুকিয়ে থাকছে বনে জঙ্গলে। পুলিশের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ব্যতিব্যস্ত, বিশেষ করে মারাঠিদের মহল্লাগুলিতে পুলিশবাহিনী যখন তখন হানা দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে, তছনছ করে দিচ্ছে বাড়িঘর।

প্লেগ কমিশনের প্রধান র‍্যান্ড এবং আয়ার্স্ট নামে দুজন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষের হত্যাকারীরা এখনও ধরা পড়েনি। পুণার কয়েকটি মারাঠি যুবকই যে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা মোটামুটি জানা গেলেও তাদের গতিবিধির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। চতুর্দিকে অসম্ভব রকমের গুজবের অন্ত নেই। দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেও এই তিন ভাই এবং তাদের দুই বন্ধু রানাডে আর সাঠে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোনওদিন শোনা যায়, দামোদর আর বালকৃষ্ণকে দেখা গেছে কোলাপুরে, আবার সেদিনই নাকি তারা ঔরঙ্গাবাদে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ন করেছে।

ইংরেজ সরকারের মানসম্মান বিপন্ন, এই হঠকারী যুবকদের চরম শাস্তি দিতে না পারলে এ দেশের মানুষের কাছে রাজশক্তির দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়বে। অস্ত্র-আইন কঠোরভাবে প্রযুক্ত, তবু কোথা থেকে ওই যুবকেরা রিভলবার সংগ্রহ করল? ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলার সাহসই বা তারা পেল কী করে? এরকম রাজনৈতিক হত্যা ইংরেজ আমলে আগে কখনও হয়নি। আন্দামানে এক গভর্নর জেনারেল খুন হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে তো এক ধর্মান্ধ মুসলমানের কাজ। ধর্মের জন্য মুসলমানরা প্রাণ দিতে বা নিতে কুণ্ঠিত হয় না। পুণা হত্যাকাণ্ড যেন ইংরেজের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সারা দেশের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ।

ইংরেজ শাসকরা এই হঠকারীদের খুঁজে বার করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে সকলের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়। যাতে আর কেউ কোনও রাজপুরুষের কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস না করে। পুলিশ বাহিনী এখন হানা দিচ্ছে সর্বত্র।

ভরত এসব কিছুই জানে না। সে বুঝতেও পারল না যে, তার পাশের শয্যার যুবকটি ওই পাঁচজনের একজন, ওর নাম রানাডে। ওরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কোথাও নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার উপায় নেই। শুধু পুলিশের ভয় নয়, তার চেয়েও বেশি বিশ্বাসঘাতকদের চোখে পড়ার ভয়। চতুর্দিকে গুপ্তচর। এদেশের বহু মানুষেরই এখনও স্বাধীনতা-পরাধীনতার বোধ নেই। রাজশক্তিকে তারা শুধু ভয় পায় না, ভক্তিও করে। শাসকরা এদেশি না বিদেশি, তা নিয়েও তারা মাথা ঘামায় না। বিশ্বাসঘাতকতা যেন অধর্ম নয়, সামান্য পাঁচ-দশ টাকার জন্য নিজের বন্ধু বা আত্মীয়কেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রানাডে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছে

পয়সাকড়ি কিছু নেই, তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর, তবু সে স্থান বদল করছে অনবরত।

আরও একটা দিন কাটার পর, মাঝরাত্রে ভরতের ঘুম ভাঙল শরীরে প্রচণ্ড আঘাতে। কেউ তার পিঠে সজোরে এক লাথি কষিয়েছে। চোখ মেলে সে দেখল, ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একজন বলশালী ব্যক্তি, তার হাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। সে উৎকট মুখভঙ্গি করে কী যেন বলছে তাকে।

ভরতের মুখে মর্মবেদনার ছায়া পড়ল। মানুষ কেন এমন হয়। এই অচেনা লোকটি কেন তাকে লাথি মেরে, গালাগালি করছে? সে তো এই লোকটির কোনও ক্ষতি করেনি, জ্ঞানত সে কারুর প্রতিই কোনও দোষ করেনি। যদি কোনও কারণে তাকে ডাকার প্রয়োজন হয়, পদাঘাত না করে, আস্তে ডাকা যেত না?

সেই লোকটি এবার ঝুঁকে ভরতের চুলের মুঠি ধরে তুলতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চক্ষু, মাথায় চড়ে গেল রক্ত। অহং বোধ মানুষের কিছুতেই যায় না। সে এক রাজবাড়িতে প্রতিপালিত হয়েছে, কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ গ্রহণ করেছে, উচ্চ পদে চাকুরি করেছে, সাধারণ একটা পথের ভিখারির মতন সে এরকম অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবে কেন? সে তার পোশাক, পরিবেশ ও অবস্থান ভুলে গিয়ে হয়ে উঠল পূর্বতন ভরত সিংহ।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে ইংরিজিতে হুংকারের মতন বলে উঠল, হাউ ডেয়ার ইউ টাচ মি!

ভরতের পদাঘাতকারী একজন পুলিশ তো বটেই, তার সঙ্গে আরও পাঁচজন পুলিশ রয়েছে, তাদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ভরতের পাশে রানাডে কম্বলে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁপছে।

ভরতের মুখে ইংরিজি শুনে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পুলিশটি এগিয়ে এসে বলল, হু ইজ দিস বাস্টার্ড?

তারপর সে ভরতের টুঁটি টিপে ধরতে যেতেই ভরত ক্রোধান্ধ ও দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি কষাল তার মুখে।

এরপর ভরতকে মারতে মারতে ওরা আধমরা করে ফেলল। রানাডেকে চিনিয়ে দিল এক গুপ্তচর। সেই কক্ষের মোট এগারো জনকেই হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে, টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল কোতোয়ালিতে। ভরত তখনও জানল না যে সে কী অপরাধ করেছে।

৩৯

এখনও ভোর হতে দেরি আছে, গঙ্গার মোহনা দিয়ে প্রবেশ করে একটি জাহাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে কলকাতা বন্দরের দিকে। গঙ্গাবক্ষে আরও প্রচুর স্টিমার, গাদা বোট, নৌকোর ছড়াছড়ি, ইংলন্ড থেকে আসা এই বড় যাত্রীবাহী জাহাজটি উজ্জ্বল সার্চ লাইট ফেলে পথ করে নিচ্ছে। যাত্রী-যাত্রিণীরা প্রায় সকলেই ঘুমন্ত, শুধু মার্গারেট নামে তরুণীটি একলা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ডেকে।

চতুর্দিক কুয়াশায় ঢাকা, জাহাজের আলোতেও দু তীরের কিছুই দেখা যায় না, মার্গারেট তবু ব্যগ্র চোখে চেয়ে আছে। জানুয়ারির প্রায় শেষ, নদীর ওপর বইছে হিমেল বাতাস। যদিও এই সময়কার ইংল্যান্ডের দুর্দান্ত শীতের তুলনায় কিছুই নয়, তবু এখানকার হাওয়ায় একটা কনকনে ভাব আছে। মার্গারেট গায়ে জড়িয়ে আছে একটা শাল, শীত ছাড়াও এক অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে তার বুক। এ

দেশটা ঠিক কেমন? পশ্চাতের সমস্ত টান ছিন্ন করে সে চলে এসেছে, সে কি এখানকার মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে?

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকেই ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে চেপে দলে দলে ইংরেজ মেয়েরা এসেছে ভারতবর্ষে, নেমেছে রাজধানী কলকাতায়। তখন চতুর্দিকে রটে গিয়েছিল ভাগ্যান্বেষী ইংরেজরা ভারতে গিয়ে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছে, তাদের বিলাসিতার বিচিত্র সব কাহিনী শুনে তাক লেগে যায়। কারু কারু নিজস্ব দাস-দাসীর সংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশের বেশি, কিন্তু গৃহে নেই গৃহিণী। কিছু কিছু ইংরেজ শরীরের জ্বালা মেটাবার জন্য দেশীয় রমণীদের রক্ষিতা করে নিত, সিপাহি বিদ্রোহের পর সেটাও কমে যায়, দেশীয় নারী-পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হয়ে যায়। ঝাঁক ঝাঁক ইংরেজ মেয়ে তখন আসত স্বামী পাকড়াও করার আশায়।

মার্গারেট অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, যার ওরকম কোনও উদ্দেশ্য নেই, সে আসছে ভারতকে ভালবেসে, এ দেশের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার আকাঙ্ক্ষায়।

এ দেশের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে। তিনিই একমাত্র যোগসূত্র। স্বামীজি লন্ডন ছেড়ে চলে এসেছেন বছর খানেক আগে, তখনও মার্গারেট ভারতে আসার কথা চিন্তা করেনি। স্বামীজি তার ওপর বেদান্ত প্রচার কেন্দ্রের ভার দিয়ে এসেছিলেন। ভারতপ্রেমিক মিস্টার স্টার্ডি এবং স্বামী অভেদানন্দ সহযোগিতা করবেন তার সঙ্গে। প্রথম কিছুদিন কাজ চলছিল ভালই, বেদান্ত সমিতির কাজে সে মনোনিবেশ করেছিল, মাঝে মাঝে স্বামী বিবেকানন্দর স্মৃতি তাকে উতলা করে তুলত। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। কিন্তু বেদান্ত প্রচার সমিতি চালানো গেল না বেশি দিন। মিস্টার স্টার্ডির স্বভাব খানিকটা উদ্ধত ধরনের, তাঁর সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের মতবিরোধ ঘটতে লাগল বারবার, একসময় স্বামী অভেদানন্দ ক্ষুণ্ণ মনে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে গেলেন আমেরিকায়, মিস্টার স্টার্ডিও আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে বেদান্তচর্চা বন্ধ ছিল, পরে তা আর শুরুই হল না। মার্গারেট একা কী করবে?

স্বামীজির চিঠিতে সে জানতে পারে যে ভারতে কিছু কিছু কাজ শুরু হয়ে গেছে। স্বামীজির গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মিশন গড়া হয়েছে, সেবা ও শিক্ষামূলক কাজে স্বামীজি অনেককে প্রবৃত্ত করছেন। মার্গারেট সেই কাজে যোগ দিতে পারে না? ইংল্যান্ডের সমাজের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগে না তার।

কিন্তু স্বামীজি প্রত্যেক চিঠিতে নিরুৎসাহ করছেন তাকে। তার ভারতে আসার দরকার নেই। ইংল্যান্ডে থাকলেই তার দ্বারা বেশি কাজ হবে। পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এবং বক্তৃতা দিয়ে সে বেদান্তের প্রচার করতে পারবে, কলকাতার মিশনের কাজের জন্য কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করার কাজেও মন দিতে পারে সে। একা একা এ সব কিছুই করতে আর ইচ্ছে করে না মার্গারেটের। সে স্বামীজির কাছাকাছি থেকে যে কোনও কাজে নিযুক্ত হতে চায়। বিশেষত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভার তো সে নিতেই পারে!

স্বামীজি কেন বারবার নিষেধ করেছেন তাকে? স্বামীজির ধারণা হয়েছে, ইওরোপিয়ান বা আমেরিকানদের পক্ষে ভারতে এসে দীর্ঘস্থায়ী কোনও গঠনমূলক কাজে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। এ দেশের জলবায়ু তাদের সহ্য হবে না, দু-তিন মাস বাদ দিলে প্রায় সারা বছরই তো গ্রীষ্ম। এখানকার জাত-পাত, ছোঁয়াছুঁয়ির কত রকম সমস্যা, তারা বুঝবেই না। শ্বেতাঙ্গ মিশনারিরা অনেকে পাহাড়ে-জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা ভারতকে ভালবাসে না। তারা আসে স্বার্থের কারণে, খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধিই তাদের একমাত্র কাম্য। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত সেভিয়ার দম্পতি আলমোড়ায় একটি আশ্রম খুলেছেন বটে, সেটা ঠাণ্ডা, আরামপ্রদ স্থান, সে আশ্রমের সঙ্গে ভারতের নিপীড়িত মানুষদের কী সম্পর্ক!

আমেরিকা থেকে ওলি বুল আর জো ম্যাকলাউডও ভারতে আসার জন্য ব্যস্ত। তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা স্বামীজির সব রকম কাজে সাহায্য করার জন্য বদ্ধপরিকর, মিশনে ও নতুন মঠ গড়ার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়েছেন, তাঁরা এই রহস্যময় দেশটি একবার স্বচক্ষে দেখে যেতে চান। কয়েক মাস

থেকে ফিরে যাবেন। এ দেশে ঘোরাফেরার জন্য কত রকম অসুবিধে ভোগ করতে হবে, সে সম্পর্ক সাবধান করে দিলেও স্বামীজি তাঁদের আসতে বারণ করেননি। কিন্তু মার্গারেট যে লন্ডনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে চলে আসতে চায়!

স্বামীজি যতই নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন, ততই মার্গারেটের জেদ বেড়ে গেছে।

মার্গারেটকে উৎসাহ জুগিয়েছেন মিসেস মুলার। মার্গারেটের যাওয়ার ভাড়া, ভারতে অবস্থানের জন্য টাকাপয়সা যা দরকার, সবই তিনি দেবেন। মিসেস মুলার এর মধ্যেই চলে এসেছেন ভারতে। তিনিও আপাতত রয়েছেন আলমোড়ায়।

স্বামীজি তার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার কতখানি মূল্য দেন, সে সম্পর্কে মার্গারেট মাঝে মাঝে ধাঁধায় পড়েছে। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ, এই দেশের সামগ্রিক ছবি সম্পর্কে মার্গারেটের ধারণা নেই। এ দেশের ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার কিংবা ইংরেজ শাসনের অব্যবস্থা দূর করার ক্ষমতা তার নেই, সে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, তাঁর কাছাকাছি থেকে, তাঁর নির্দেশমতন নিজের সাধ্য অনুযায়ী কাজ করতে চায়। স্বামীজি যদি তাঁর ইচ্ছার গুরুত্ব না দেন, তা হলে আর ভারতে গিয়ে কী হবে? ইংলন্ডের শুষ্ক জীবনে পড়ে থাকারই বা কী মানে হয়? না, এখানকার চেয়ে তবু একবার সেই অনিশ্চিতের দিকে ঝাঁপ দেওয়াই ভাল।

মিস্টার স্টার্ডি ও মিসেস মুলার স্বামীজিকে জানালেন, মার্গারেট ভারতে যাবার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। এঁরা দুজনে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। স্বামীজি এ বার মনোভাব বদলালেন। আসুক মেয়েটি। নারীসমাজের জন্য কাজ করতে পারবে। নারীদের মধ্যে কাজের জন্য একজন নারীরই প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ এখনও সে রকম কোনও মহিয়সী মহিলার জন্ম দিতে পারছে না। তাই অগত্যা অন্য জাতি থেকে ধার করতে হবে। মার্গারেটের সিংহিনীর মতন তেজ এখানকার কাজে লাগাতে হবে।

স্বামীজি তাকে লিখলেন, আসতে চাও, এসো, কিন্তু কয়েকটি ব্যাপার মনে রেখো। সারা বছরই গরম সহ্য করতে হবে, এখানকার শীতও তোমাদের গ্রীষ্মকালের মতন। বড় বড় শহরে দু চারটে হোটেল আছে বটে, শহরের বাইরে কোথাও ইওরোপীয় স্বাচ্ছন্দ্য পাবার উপায় নেই। সর্বত্র নোংরা আর আবর্জনা। এ দেশের মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও দাসত্ব যে কী ধরনের, তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। যেখানেই যাবে অর্ধ উলঙ্গ অসংখ্য মানুষ তোমাকে ঘিরে ধরবে। এ দেশের ইংরেজরা এ দেশের মানুষের সঙ্গে মেশে না, ঘৃণা করে। এ দেশের মানুষও কিন্তু ঘৃণা করে ইংরেজদের। তারা ইংরেজদের ছুঁলে অশুচি বোধ করে, ইংরেজদের সঙ্গে বসে খায় না। আমিও হয়তো তোমার সঙ্গে বসে খাব না। তুমি ইচ্ছে করলে এ দেশের ইংরেজদের সঙ্গে মিশতে পারো, তাতে খানিকটা নিজের দেশের পরিবেশ পাবে, তা হলে অবশ্য এ দেশের মানুষদের চিনতেই পারবে না। আর যদি এ দেশের মানুষদের সঙ্গে মেশো, তা হলে ইংরেজরা তোমার গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে!

এ সব পড়ে মার্গারেট একটুও নিরাশ বোধ করেনি। এ সব বাধা কিছুই নয়। সব বাধাই তার কাছে তুচ্ছ। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপার সে গ্রাহ্যই করে না। প্রায় সমগ্র ভারত যে দারিদ্র্য ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা তো সে জানেই। স্বামীজির চিঠির একটা অংশ পড়ে আর রক্ত উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল। এ যে প্রত্যাশার অতিরিক্ত অনেক কিছু।

স্বামীজি লিখেছেন, এ সব জেনে শুনেও তুমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে অবশ্যই তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।...কাজে ঝাঁপ দেবার পরে যদি তুমি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবুও আমার দিক থেকে নিশ্চিত জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ করো আর নাই করো, বেদান্ত ধর্ম ত্যাগই করো আর ধরে থাক। 'মরদ কী বাত হাতি কা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না; খাঁটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

'আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে', এর চেয়ে আর বেশি কি চাইবার থাকতে পারে! এই

বাক্যটি ভরসা করেই মার্গারেট জাহাজে চেপেছে।

জাহাজ এসে লাগছে জেটিতে, ভোঁ বাজছে জোরে জোরে। তীরে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়জনদের অভ্যর্থনা করবার জন্য। মার্গারেট উৎসুক নয়নে সেই ভিড়ের মুখগুলির ওপর চক্ষু বোলাতে লাগল। তার জন্য কি কেউ আসবে? স্বয়ং স্বামীজি আসবেন, এমন প্রত্যাশাই করা যায় না। তিনি কারুকে পাঠালেই বা মার্গারেট চিনবে কী করে?

প্রথমে চেনা সত্যিই খুব শক্ত হল। আরও অনেক ইংরেজ মহিলা নামছে সিঁড়ি দিয়ে, তীরের লোকরা হাতছানি দিচ্ছে, হঠাৎ সে গম্ভীর গলায় ডাক শুনল, মার্গট!

গেরুয়া বস্ত্র লুঙ্গির মতন পরা, গায়ে একটা মোটা চাদর, মুণ্ডিত মস্তক, মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। শুধু গভীর চক্ষু দুটি দেখে চেনা যায়। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ, কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর?

মার্গারেট পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল, স্বামী বিবেকানন্দ দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে বললেন, থাক থাক। তারপর বললেন, এসো, তোমার জন্য গাড়ি রয়েছে।

এক বছর পর দেখা, কোনও উচ্ছ্বাস নেই, কোনও রকম হাস্য-পরিহাস করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, সমুদ্র পীড়ায় কষ্ট পাওনি তো?

সঙ্গে আর একজন শিষ্য রয়েছে, মার্গারেটের মালপত্র বয়ে নিয়ে তিন জনে উঠলেন অপেক্ষমাণ একটি ঘোড়ার গাড়িতে। মার্গারেট কাতর নয়নে বারবার দেখছে তার আরাধ্য স্বামীজিকে। লন্ডনে স্বামীজির মাথায় প্রচুর চুল ছিল, তার ওপর পাগড়ি পরলে তাঁকে পুরুষ সিংহের মতন দেখাত। ন্যাড়া মাথায় চেহারাটাই যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার ওপর দাড়ি, তাও কাঁচা-পাকা? কতই বা বয়েস ওঁর, বড় জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, মার্গারেটের চেয়ে মাত্র তিন চার বছরের বড়। মুখের চামড়াতেও শুষ্ক ভাব।

গাড়ি কিছুক্ষণ চলার পর স্বামী বিবেকানন্দ সামান্য হেসে বললেন, বুড়ো হয়ে গেছি, তাই না? গত বছর দার্জিলিং-এ থাকার সময় দাড়ি রাখার শখ হয়েছিল। কেমন, মানিয়েছে না?

মার্গারেট নিঃশব্দে দুদিকে মাথা নাড়ল। এ রকম দাড়ি তার পছন্দ নয়।

স্বামীজি বললেন, বুড়ো সাজলে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়। দাড়িতেও বেশ পাক ধরেছে!

গত বছর দেশে ফেরার কিছুদিন পরেই স্বামীজি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সংবর্ধনার প্রাবল্য, অজস্র মানুষের সঙ্গে অবিরাম কথা বলা, মিশনের কাজ, এত ব্যস্ততার মধ্যে বিশ্রামের একটুও সময় ছিল না। হঠাৎ একদিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। শরীরে অনেক দিনের ক্লান্তি জমেছিল তো বটেই, চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে বললেন, তাঁকে মারাত্মক বহুমূত্র রোগে ধরেছে। এই রোগের তেমন কোনও চিকিৎসা নেই, ভাত-রুটি একেবারে বাদ দিয়ে শুধু মাংস খেতে হবে, জল খাওয়াও যতদূর সম্ভব কম, আর মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

কলকাতার গরমও তাঁর একেবারে সহ্য হচ্ছিল না, তা ছাড়া কলকাতায় অবস্থান করলে লোকজনের সর্বক্ষণ আনাগোনা লেগেই থাকবে। শিষ্য-শুভার্থীদের অনুরোধে তিনি চলে গিয়েছিলেন দার্জিলিং। সেখানকার স্নিগ্ধ বাতাস ও অনুপম প্রাকৃতিক পরিবেশে খানিকটা সুস্থ বোধ করছিলেন, কিন্তু সেখানেও কি একটানা বেশি দিন থাকার উপায় আছে? খেতড়ির রাজা অজিত সিং এর মধ্যে কলকাতায় আসার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিলেতে মহা সমারোহে এক দরবার হবে, সেখানে ভারতের দেশীয় রাজারা অনুগত ভৃত্যের মতন উপস্থিত হয়ে মহারানির পায়ে নজরানা দেবেন। অজিত সিংও যাচ্ছেন এবং তাঁর ইচ্ছে তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। বিলেত দেশটা অচেনা, সেখানে অনেক রকম আদবকায়দা মানতে হয়, গুরু সব জানেন, গুরু সঙ্গে থাকলে রাজা ভরসা পাবেন। অজিত সিং-এর কোনও অনুরোধ উপেক্ষা করা স্বামী বিবেকানন্দর পক্ষে সম্ভব নয়, প্রধানত এঁর সদিচ্ছায় এবং আনুকূল্যেই তিনি পাশ্চাত্য বিজয়ে গিয়েছিলেন। বিপদে আপদে অনেকবার ইনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। স্বামীজি ইচ্ছুক হলেও চিকিৎসকরা কিছুতেই রাজি হলেন না, শরীরের যা অবস্থা

তাতে সুদীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণের ধকল তিনি সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু যাত্রার আগে অজিত সিংয়ের সঙ্গে দেখাও হবে না? স্বামীজি পাহাড় থেকে নেমে এলেন, অজিত সিংকে ভরসা ও আশীর্বাদ দিয়ে ফিরে গেলেন আবার। দার্জিলিং যাওয়া-আসা সহজসাধ্য নয়, যেটুকু বা শরীরের উন্নতি হয়েছিল, এই পরিশ্রমে তাও মিলিয়ে গিয়ে আবার অবসন্ন ভাব ফিরে এল।

মাস দেড়েক দার্জিলিং-এ কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পরও সুস্থ হলেন না। মে মাসের সাঙ্ঘাতিক গরমে কোনও রকম কর্মে উদ্যম থাকে না, আলমবাজার মঠে হৈ হট্টগোল লেগেই আছে, খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সকলে এসে তাঁর মতামত চায়, বাধ্য হয়ে তিনি আবার চলে গেলেন আলমোড়ায়।

এখন এই শীতকালে তিনি বেশ ভাল আছেন, অন্তত সকলকে তাই বলছেন। কাজ তো করতেই হবে। পাহাড়চূড়ায় বসে থাকলে চলবে কেন? নতুন মঠ গড়তে হবে। অনেক কাজ।

ঘোড়ার গাড়িটি গড়ের মাঠ পেরিয়ে চলে এসেছে এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে। স্বামীজি মার্গারেটকে বললেন, সাহেবপাড়ায় তোমার জন্য একটা হোটেল ঠিক করা আছে। সেখানে কিছুদিন থাকো। এই পরিবেশে নিজেকে খানিকটা সইয়ে নাও। ইতিমধ্যে বাংলা শেখার চেষ্টা করো। আমি তোমার জন্য একজন বাংলার মাস্টার পাঠিয়ে দেব।

হোটেলের ভেতরেও গেলেন না, বাইরে থেকেই বিদায় নিলেন স্বামীজি।

স্নান সেরে, সারা দিন ঘুমিয়ে ও বিশ্রাম নিয়ে বিকেলবেলা বাইরে বেরিয়ে এল মার্গারেট। প্রথমটায় সে বিস্মিতই বোধ করল। আবর্জনা ভরা, পূতিগন্ধময় শহর তো নয়! হোটেলের সামনের প্রশস্ত পথটি বেশ পরিচ্ছন্ন। সুদৃশ্য বড় বড় বাড়িগুলি দেখলে লন্ডন শহরের কথাই মনে পড়ে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও নগরের হর্ম্যসারির মাঝখানে যে বিশাল ময়দান, গাছপালায় ভরা, মাঝে মাঝে পুকুর ও সরু সরু পায়ে চলা রাস্তা, এটা যেন হাইড পার্কের মতন।

অর্ধনগ্ন, কালো কালো মানুষেরা কোথায়? এই অঞ্চলে যারা চলাফেরা করে, তারা পরিচ্ছন্ন, সুদৃশ্য পোশাক পরা, অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী, কিছু কিছু স্থানীয় মানুষও দেখা যায়, তাদের গাত্রবর্ণ বাদামি বা খয়েরি, পরিধেয় দেখলে মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন। একটু এগিয়ে মার্গারেট দেখতে পায় পথের দু ধারে কত সব মনোহারী দোকান, রকমারি জিনিসপত্রে ঠাসা, লন্ডনেও এ রকম দোকান খুব বেশি নেই।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মার্গারেট কাছাকাছি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে যায়। কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তারা পথনির্দেশ দেয়, কেউ কেউ সঙ্গেও আসে, ইডেনের বাগান, মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, বটানিক্যাল গার্ডেন। সবই ইংরেজদের বানানো।

পরপর কয়েক দিন কাটল, স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে তার আর দেখা হল না। এইভাবে হোটেলেই থাকতে হবে নাকি মার্গারেটকে? সে কি সাহেব পাড়ায় স্বজাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য ভারতে এসেছে?

বাংলার একজন মাস্টার আসে প্রতিদিন সকালে, তার কাছে নিবিষ্টভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষা করছে মার্গারেট, কিন্তু অন্য সময় তার মন বড় অস্থির হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ থাকেন এই চৌরঙ্গি অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। গত বছর ভূমিকম্পে আলমবাজারের মঠ বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন তিনি গঙ্গার অপর পার বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন, সেটাই সাময়িক মঠ। কাছেই অনেকখানি জমি কেনার জন্য বায়না দেওয়া হয়ে গেছে, সেখানে তৈরি হবে প্রস্তাবিত বিশাল মঠ ভবন।

মাঝে মাঝে তিনি বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে আসেন। সেখানেই একদিন ডেকে পাঠালেন মার্গারেটকে। সেই দিনই মার্গারেট প্রথম দেখল নেটিভ পাড়া। ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি গলি। গা ঘেঁষাঘেঁষি শ্রীহীন বাড়ি, কোথাও পথের পাশে শুয়ে আছে ষাঁড়। আবর্জনার স্তূপের ওপর লড়াই করছে পারিয়া কুকুর। এই সব দেখে মার্গারেট একটু একটু আতঙ্কিত হলেও একটা ব্যাপারে সে

আশ্বস্ত হল, সাধারণ মানুষের ব্যবহার বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ।

বলরাম বসুর বাড়ির বৈঠকখানায় একটি হুকো হাতে নিয়ে তামাক টানছেন স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যদের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলেন। মার্গারেটকে প্রবেশ করতে দেখে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, বসো।

মার্গারেটের জন্য একটি চেয়ার দেওয়া হল। মার্গারেটের চোখের মণির রং নীল, চুলের রং বাদামি স্বর্ণাভ। সে দীর্ঘাঙ্গিনী, হাতির দাঁতের মতন গায়ের রং, সাদা সিল্কের স্কার্ট-ব্লাউজ পরা। উত্তর কলকাতার কোনও বাঙালি পরিবারে এ রকম একজন বিদেশিনী অতিথির আগমন একটা অভিনব ঘটনা।

স্বামীজি কয়েকটি মামুলি কুশল প্রশ্ন করলেন তাকে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাংলা শিক্ষা কেমন চলছে? হোটেলে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মার্গারেট বলল, মিসেস মুলার হোটেলে এসেছিলেন। তিনি এখানে একটা বাড়ি ভাড়া করেছেন। আমাকে কাল থেকে সেই বাড়িতে নিয়ে যেতে চান।

স্বামীজি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। মিসেস মুলারকে তিনি আড়ালে বলেন 'ক্ষাপতান মাগি'। ইনি বিলেতে থাকার সময় অশেষ উপকার করেছেন, এখানে এসেও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করছেন অনেক, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর ব্যবহার আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এই বাতিকগ্রস্ত মহিলাটি সব ব্যাপারেই কর্তৃত্ব ফলাতে চান, যাকে তাকে হুকুম করেন, ধমক দেন, তাঁর ধারণা টাকা-পয়সা দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু কেনা যায়। আর খুব বেশি দিন এর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা যাবে বলে মনে হয় না।

স্বামীজি বললেন, ঠিক আছে, তুমি মিসেস মুলারের সঙ্গে গিয়েই থাকো। হোটেলে অনেক খরচ। তবে, মনে রেখো, এখানে কাজ করতে গেলে মিসেস মুলারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে চলবে না। তুমি কতকাল ওঁর ডানার আশ্রয়ে থাকবে? কারুর কারুর সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভাল।...যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

মার্গারেট জিজ্ঞেস করল, আমি কবে থেকে স্কুল শুরু করব?

স্বামীজি বললেন, হবে, হবে, ব্যস্ততার কিছু নেই।

ফেরার পথে মার্গারেট বেশ ক্ষুণ্ণ বোধ করল। স্বামীজির ব্যবহার এত নিরুত্তাপ কেন? একবারের জন্যও অন্তরঙ্গ সুরে কথা বললেন না! এ দেশের সমাজে প্রকাশ্যে কোনও নারীর সঙ্গে সখ্য দেখানো চলে না? তিনি সন্ন্যাসী ও মার্গারেট বিদেশিনী, এটাও বড় বাধা। কিন্তু তিনি যে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে'?

কয়েক দিন পরই ওলি বুল ও জোসেফিন ম্যাকলাউড বম্বে থেকে ট্রেনে এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। এঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য স্বামীজি একদল শিষ্য নিয়ে হাজির হলেন স্টেশনে। এঁরা অবশ্য আগে থেকেই চিঠিপত্র লিখে নিজেদের সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রখ্যাত অ্যাটর্নি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এঁদের পরিচয় আছে, তিনি যে ভগবদগীতার ইংরিজি অনুবাদ করেছেন, তাও এঁরা পড়েছেন। মোহিনীবাবুই তাঁদের নিয়ে গেলেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হোটেলে।

দুই মহিলাই বিশেষ ধনবতী। জো ম্যাকলাউড প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বামীজিকে, একসঙ্গে অগ্রিম দিয়েছেন তিনশো ডলার। ওলি বুলও অর্থের ব্যাপারে উদার হস্ত। বেলুড় মঠের জমি কেনার জন্যও অনেক টাকা দিয়েছেন। এঁরা কিন্তু সাহেব পাড়ায় হোটেলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের তোয়াক্কা করলেন না। এঁরা এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দর কর্মপ্রণালী দেখতে, পরদিনই চলে এলেন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়িতে। বাড়িটি বেশ, দু একর জমির মধ্যে রয়েছে বাগান, একটি পুকুর, পাশেই কুলুকুলু প্রবাহিনী গঙ্গা।

ফেব্রুয়ারি মাস, রোদ্দুরে এখনও তেমন উত্তাপ নেই, হু হু করে বইছে বাতাস। বাগানে ফুটে আছে অজস্র ফুল, সেই বাগানে বসে চা পান ও অনেক পুরনো গল্প হল। স্বামীজির শিষ্যরা এই দুই বিদেশিনীকে দুপুরে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ালেন। বিকেলে স্বামীজি বললেন, চল, এবার তোমাদের

সেই জমিটা দেখাতে নিয়ে যাই, যেখানে আমরা মঠ বানাব ঠিক করেছি।

জো বিস্মিত হয়ে বলল, আবার জমির দরকার কী? এই বাড়ির চার পাশে কত জায়গা, পরিবেশটাও সুন্দর, এখানেই মঠ বানালে হয় না?

স্বামীজি বললেন, প্রথম থেকেই আমি ছোটখাটো কিছুতে বিশ্বাসী নই। আমি যে মঠের কথা কল্পনা করেছি, সেখানে আমার গুরুভাই ও অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বসবাসের সংস্থান রাখতে হবে, ধ্যানের জন্য রাখতে হবে পৃথক স্থান, আমার গুরুর জন্মোৎসবে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিতে আসবে, ভবিষ্যতে এটা একটা তীর্থস্থানের মতন হয়ে উঠবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চলো, আমার সঙ্গে গিয়ে দেখলেই বুঝবে।

জোয়ারের সময় নৌকোতেই যাওয়া যায়, কিন্তু এখন ভাটা, কাদার মধ্য দিয়ে পাড়ে ওঠা যাবে না, সুতরাং এখন ওপর দিয়ে হেঁটে যেতেই হবে। প্রায় আধ মাইল দূরত্ব, পথ ঝোপজঙ্গলে ভরা, দুই রমণীর পোশাকে লেগে যাচ্ছে চোরকাঁটা, দু জনেরই প্রতিটি পদক্ষেপ পড়ছে ভয়ে ভয়ে, সাপ খোপ থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। এক জায়গায় পার হতে হবে একটা নালা, তার ওপরে নড়বড়ে সাঁকো, সাঁকো মানে শুধু একটা তালগাছের গুঁড়ি ফেলে রাখা। স্বামীজি ঈষৎ বিব্রতভাবে বললেন, এই রে, এটা কি পার হতে পারবে?

জো বলল, কেন পারব না?

আগেই সে তরতর করে পেরিয়ে চলে গেল। ওলি বুলও ভয় না পেয়ে পার হলেন আস্তে আস্তে। স্বামীজি হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা আমেরিকানরা সব ব্যাপারে অদম্য।

ওরা যে সত্যিই কত অদম্য, তা বুঝতে পারা গেল আরও পরে।

বায়না করা জমিটার মাঝখানে একটা ভাঙাচোরা একতলা বাড়ি, তার জানলা-দরজা নেই বলতে গেলে, অনেক দিন সেখানে কেউ বাস করে না, আর চারপাশে ফাঁকা জমির মধ্যে দু চারটে বড় বড় গাছ। সব ঘুরে ফিরে দেখার পর জো বলল, স্বামী, এই বাড়িটা তো খালি, আমরা দুজনে এখানে এসে থাকতে পারি না? তা হলে তোমার কাছাকাছি এসে থাকা হবে।

স্বামীজি বললেন, পাগল নাকি! এটা তো একটা পোড়ো বাড়ি, এখানে কেউ থাকতে পারে নাকি?

জো বলল, কেন পারব না? সব সারিয়ে টারিয়ে ঠিকঠাক করে নেব।

জো তাকাল ওলির দিকে, তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

স্বামীজি প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এরা বলে কী? বোস্টন এবং নিউ ইয়র্কে তিনি এদের দুজনেরই বিলাসবহুল বাসস্থান দেখেছেন। কলকাতার হোটেলের নিশ্চিত আরাম ছেড়ে এরা এখানে থাকতে চায়!

আমেরিকান জেদ কোনও বাধাই গ্রাহ্য করে না। পরদিনই মিস্ত্রি লেগে গেল, শুরু হল সেই বাড়ির মেরামতির কাজ। নালাটার ওপরে বসে গেল মজবুত সাঁকো। দুই রমণী কলকাতার বিভিন্ন দোকান ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলেন মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র। দু জনেই প্রায় প্রত্যেক দিন এসে বাড়ির কাজকর্ম পরিদর্শন করেন, স্বামীজির সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়ে যান।

এই সব সংবাদ টুকরো টুকরোভাবে মার্গারেটের কাছে পৌঁছয়। স্বামীজি দুই আমেরিকান নারীকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তার খোঁজখবর নেবার সময় পান না। শ্রীমতী বুলকে মার্গারেট চেনে না, তবে শুনেছে যে মহিলার বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুবই স্নেহশীলা, ধীরস্থিরভাবে কথা বলেন। আর জো ম্যাকলাউডকে সে দেখেছে দু-একবার লন্ডনের বক্তৃতা সভায়, চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস, বেশ রূপসী এবং সাজগোজ পছন্দ করে খুব। তার সব পোশাক নাকি প্যারিস থেকে তৈরি হয়ে আসে। জো ম্যাকলাউড স্বামীজির কাজে সাহায্য করে বটে, কিন্তু নিজে সে ভক্ত বা শিষ্য হতে চায় না। নিজেকে সে মনে করে স্বামীজির বন্ধু।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বেলুড়ের সেই বাড়িটিতে গৃহপ্রবেশ হল। নতুন রং করায় ঝকঝকে দেখাচ্ছে বাড়িটিকে, ভিতরটা পশ্চিমি ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে সাজানো। দু খানা ঘর,

বৈঠকখানা, পেছন দিকে রান্নার ব্যবস্থা আছে পর্যন্ত। বাড়ির সামনের ঘাট ধাপে ধাপে নেমে গেছে গঙ্গা পর্যন্ত।

স্বামীজি বললেন, তোমরা বাংলাকে এত ভালবেসে ফেলেছ, তোমাদের আমি এবার বাংলা নাম দিতে চাই। জো ম্যাকলাউড সব সময় প্রাণোচ্ছল, তাই তার নাম রাখা হল জয়া। আর ওলি বুলকে মনে হয় মাতৃসমা, তাঁর নতুন নাম হল ধীরামাতা।

এরা দু'জনে বাড়িটিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্বামীজি বললেন, তোমাদের এখানে আর একটি মেয়েকে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে? মেয়েটির নাম মিস মার্গারেট নোবল, সে পিতৃপরিচয়ে আইরিশ, তোমাদের চেয়ে বয়েসে অনেকটা ছোট, সে আমাদের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য চলে এসেছে।

দু'জনেই সাগ্রহে সম্মতি জানাল।

উগ্রচণ্ডী মিসেস মুলারের সংস্পর্শ থেকে মার্গারেটকে সরিয়ে আনতেই চাইছিলেন স্বামীজি। তিনি এ বার মার্গারেটকে ডেকে বললেন, তুমি বেলুড়ে ওদের সঙ্গে থাকবে? তোমার ভাল লাগবে। দেখো, মিসেস বুলের বাড়ি যেন আগাগোড়াই ভালবাসা, শুধু ভালবাসা।

বেলুড়ে চলে এসে মার্গারেট সর্বপ্রথম স্বচ্ছন্দ বোধ করল। এমন খোলামেলা পরিবেশ, সামনে এত বড় একটা নদী। নৌকোর মাঝিরা গান গাইতে গাইতে যায়, একটা মস্ত ঝাঁকড়া আমগাছে কত রকম পাখি এসে বসে, এ সব দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। আমেরিকান মহিলা দুটির ব্যবহারে কোনও খাদ নেই। ওরা মার্গারেটকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, এখানে প্রতিদিন অনেকক্ষণ স্বামীজির সঙ্গে দেখা হয়। ভোরবেলাতেই স্বামীজি অন্য বাড়িটি থেকে এখানে চা খেতে চলে আসেন। তিনিই ওদের ডেকে জাগান। আমগাছটির তলায় বসে চায়ের আসর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। স্বামীজি এক একদিন তাদের রামায়ণ-মহাভারত, এক একদিন ভারতের ইতিহাসের নানান কাহিনী শোনান।

জয়া এবং ধীরামাতার মতন মার্গারেটেরও তো একটা বাংলা নাম দিতে হবে। স্বামীজি মার্গারেটের মুখে একদিন এই অনুরোধ শুনে বললেন, তুমি তো এ দেশের জন্য মন-প্রাণ নিবেদন করে বসে আছ, তোমার আর ফেরা হবে না। তাই তোমার নাম নিবেদিতা।

ওলি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সত্যিই আর ইংল্যান্ডে ফিরবে না?

নিবেদিতা স্বামীজির দিকে তাকিয়ে বলল, উনি সঙ্গে নিয়ে গেলে যাব। ওঁকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না।

৪০

'রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা...।'

কুসুমকুমারী মাঝে মাঝেই নয়নমণির উদ্দেশে এই গানের কলি গেয়ে ওঠে। অন্য সখীরা হাসে। সবাই কিছুকাল ধরে নয়নমণির ব্যবহারে এক গভীর পরিবর্তন লক্ষ করেছে। সে যেন হারিয়ে ফেলেছে তার মানসিক ভারসাম্য।

ক্লাসিক থিয়েটার খোলার পর অমরেন্দ্রনাথ তার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর নানান নিয়ম কানুনের শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল। তা ঠিক সময়ে যাওয়া-আসা, পার্ট মুখস্থ করা, মহড়ার সময় হাসি-মস্করা বন্ধ রাখা এই রকম কিছু কিছু নিয়ম তো মানতেই হবে। কিন্তু নিয়ম ভাল, নিয়মের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। থিয়েটারের মেয়েরা রাস্তায় আলো-বাতাস গায়ে লাগাতে পারবে না, বাইরের

লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, নাচের রিহার্সালে সবকটি মেয়েকে সারাদিন উপবাসে থাকতে হবে, কেউ কারুকে টাকা ধার দেবে না, এসব আবার কী ? নয়নমণি অন্যদের মুখপাত্রী হয়ে অমরেন্দ্রনাথের এরকম কিছু কিছু নির্দেশের প্রতিবাদ জানিয়েছে। অমরেন্দ্রনাথের মুখের ওপর কথা বলার সাহস শুধু সেই দেখিয়েছে। নাচের রিহার্সালের সময় একদিন একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সারাদিন সে বেচারি কিছু খায়নি। দুর্বল শরীর অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল তার। নয়নমণি দ্রুত গিয়ে সে মেয়েটিকে কোলে নিয়ে নৃত্য শিক্ষক নেপা বোসকে তেজের সঙ্গে বলেছিল, দুটো ডাল-ভাত খেয়ে এলে নাচতে পারবে না, এর কী মানে আছে ? আমি তো রোজ কিছু না কিছু খেয়ে আসি, আমার নাচের সময় কি পা এলিয়ে যায় ?

অমরেন্দ্রর যতই রুক্ষ মেজাজ হোক, নয়নমণিকে সে টিট করতে পারেনি। নয়নমণি যে কারুর তোষামোদ করে না, থিয়েটারের চাকরি আঁকড়ে থাকার জন্য সে লালায়িতও নয়, যখন তখন সে ছেড়ে চলে যেতে পারে। তাকে বাদ দিলে ক্লাসিকেরও এখন চলবে না। থিয়েটারের সব মেয়েরা নয়নমণিকে তাদের নেত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছিল, তাদের যে কোনও অভিযোগ নয়নমণিকেই জানাত।

বেশ চলছিল, হঠাৎ কী হল নয়নমণির ? সে এখন আর হাসে না। কারুর সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না, অন্যদের থেকে খানিক দূরে সরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। অন্য মেয়েরা তাদের দুঃখের কথা নয়নমণিকে জানাতে গেলে সে তাকিয়ে থাকে উদাসীনভাবে, উত্তর দেয় না।

অমরেন্দ্রও নয়নমণির এই আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করেছে। কিন্তু অভিনয়ের সময় তার কোনও ভুল হয় না, ঠিক ঠিক সময়ে মঞ্চে ঢোকে, নাচে-গানে মাতিয়ে দেয়, প্রতিটি শো-তে অন্তত সাতবার ক্ল্যাপ পায়। অন্য সময় সে যদি এক কোণে চুপচাপ বসে থাকে, তাতে বলার কিছু নেই।

সহ-অভিনেত্রীরা কৌতুক-ভাঁড়ামি করে তাকে হাসাবার চেষ্টা করেছে, সে হাসে না। তার আঁচল ধরে টেনে, খোঁপা খুলে দিয়ে খুনসুটি করলে সে রাগে না। হ্যাঁ লা, তোর কী হয়েছে, কী হয়েছে, বারবার এ কথা জিজ্ঞেস করলে, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কিছু না।

কারুর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ-মনোমালিন্য হয়েছে ? সবাই জানে, নয়নমণি বাবু রাখে না। কত খানদানি লোক কত অর্থ-অলঙ্কারের প্রলোভন দেখিয়েছে, তবু এ পর্যন্ত সে কারুর রক্ষিতা হয়নি। তার শয়নকক্ষে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গেই যার সম্পর্ক নেই, সে কলহ করবে কার সঙ্গে ?

ব্রজদুলাল নামে একটি অকিঞ্চিৎকর অভিনেতা গঙ্গামণির বাড়িতে যাতায়াত করে। ব্রজদুলাল জানে সে থিয়েটারে কোনওদিন বড় পার্ট পাবে না, তার কণ্ঠস্বরে ওঠা-নামা নেই, কখনও কাটা-সৈনিক, কখনও বড় জোর দু'লাইনের ডায়ালগ পায়, তবু থিয়েটারের সঙ্গে সে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। মহড়ার সময় সে সর্বক্ষণ বসে থাকে, অন্যদের ফুট-ফরমাশ খাটে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গেই সর্বক্ষণ কাটায়, নিজের বাড়িতে ফেরে না। থিয়েটার তার নেশা, থিয়েটারেই সে মরবে। এই ব্রজদুলাল নয়নমণির কৃপা পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে, নয়নমণি যখন যে থিয়েটার বদলেছে, সেও সেখানে যায়। অবশ্য এতদিনে সে জেনে গেছে যে, কোনওদিনই সে নয়নমণির নেকনজরে পড়বে না, কোনও দিনই নয়নমণির শয্যায় তার স্থান হবে না। তবু নয়নমণির সান্নিধ্যে থাকাতেই সে ধন্য। কুসুমকুমারীরা বিদ্রূপ করে বলে, দৈবাৎ যদি নয়নমণি কোনও দিন ওই বেজা ভেড়ুয়াটাকে আদেশ দেয়, যা আমার জন্য অমুকবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, তাতেও বেজাটা লাফাতে লাফাতে গিয়ে সেই বাবুকে ধরে আনবে, তাকে নয়নমণির ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, বন্ধ দরজার বাইরে বসে কেত্তন গাইবে।

ব্রজদুলাল গঙ্গামণির বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই যায়, ওখানকার সব খবর সে রাখে। তার কাছ থেকেও নয়নমণির এই ভাবান্তরের কোনও কারণ জানা যায় না। কী হল ওই মেয়ের ?

কী যে হয়েছে, তা নয়নমণি নিজেও স্পষ্ট জানে না।

ভরতের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ভূমিসূতা ওরফে নয়নমণি পুরুষ মানুষদের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হয়েছিল। তার জীবনে পুরুষ মানুষের কোনও প্রয়োজন নেই। তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শয়নকক্ষে সে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি রেখেছে, প্রতিদিন সকালে সে সেই মূর্তির সামনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তার সমস্ত ব্যথা-বেদনা-আনন্দ সে ওই মূর্তিকেই নিবেদন করে। শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তার শরীরের জ্বালাও জুড়োয়।

এক একদিন মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যায়, সমস্ত শরীরে ছটফটানি ভাব আসে, দারুণ নিঃসঙ্গতা যেন তাকে ভূতের মতন চেপে ধরে, সে তখন দ্রুত বিছানা ছেড়ে নেমে গিয়ে বাতি জ্বালে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, প্রভু, তুমিই আমার প্রাণসর্বস্ব, আমার সব জ্বালাযন্ত্রণা তোমার নয়ন স্পর্শে ঘুচিয়ে দাও। আমি তোমারই দাসী, আমি আর কারও পানে এ জীবনে চাইব না।

মূর্তির চোখদুটি নয়নমণিকে দেখে। যেন দুটি অদৃশ্য হাত এই ভূমিসূতাকে ভূমি থেকে তুলে নিয়ে বক্ষে জড়ায়।

কোনও কোনওদিন ভরতকে স্বপ্নে দেখলেও তার এমন অবস্থা হয়। শ্রীকৃষ্ণই তাকে ভরতের কথা ভুলিয়ে দেন। যাদুগোপালের পরিবারের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তাদের গৃহে সে কখনও কখনও যায়, সেখানে কচিৎ কখনও ভরতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, নয়নমণি তা শুনতে চায় না। ভরত নিরুদ্দিষ্ট, একজন নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে নিয়ে কেন মিছিমিছি কষ্ট পাওয়া। সে তো ইচ্ছে করেই নিরুদ্দেশে গেছে সকলকে ছেড়ে।

শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির কাছে সব রকম সান্ত্বনা পেত নয়নমণি, হঠাৎ একদিন তার ব্যতিক্রম হল। মাস দু-এক আগের কথা, এক সকালে চক্ষু বুজে ধ্যান করছে নয়নমণি, এক সময় সে দারুণ চমকে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির বদলে তার চক্ষু জুড়ে রয়েছে অন্য একজন পুরুষ।

এক সময় ভরতের মুখচ্ছবি এসে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণকে আড়াল করে দিত। ভরতকে সে আত্মনিবেদন করেছিল, সেখান থেকে মানসিক বন্ধন ছাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করা সহজ হয়নি। যতই দূরত্ব তৈরি হোক, বন্ধন কিছুতে যেতে চায় না।

ধ্যানের তীব্রতা বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সে সেই মায়াপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। ভরত এখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দিনমানে তার কথা প্রায় মনেই পড়ে না, মাঝে মাঝে সে শুধু স্বপ্নে ফিরে আসে। সে মনে মনে তখন বলে, হে নিরুদ্দিষ্ট, তুমি আর এসো না, এসো না, আমার দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে তুমি ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলে, সে সব এখন ঘুচে গেছে। আমি আর ভূমিসূতা নই, তার মৃত্যু হয়েছে, আমি এখন নয়নমণি। থিয়েটারের নটী।

এতদিন পর আবার কোন পুরুষ মানুষ এল ?

অস্পষ্ট থেকে প্রতিবিম্বটি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়। ভরতের মতন একজন সাধারণ যুবক নয়, এর দেবদুর্লভ কান্তি, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, ভ্রমরকৃষ্ণ চুল নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত, সারা মুখে চিক্কণ দাড়ি, টানা টানা দুটি চক্ষুর কী গভীর, মর্মস্পর্শী দৃষ্টি। নবাব বাদশাদের মতন কারুকার্যময় একটা আচকান পরিহিত। সমস্ত শরীরে পুরুষোচিত দীপ্তি, অথচ হাতের আঙুলগুলি কী কোমল। বীণানিন্দিত তার কণ্ঠস্বর।

চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না, ইনি কবিবর রবীন্দ্রবাবু। 'রাজা-রানী'র মহড়ার সময় উনি এসেছেন ক্লাসিকে। তখন সবাই বলাবলি করেছিল, এমন সুপুরুষ, এমন মানী ব্যক্তির মতন ব্যবহার দেখাই যায় না।

একজন বিখ্যাত ব্যক্তির চেহারা মনে পড়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবু কেন নয়নমণির বুক কেঁপে উঠল ? চক্ষে এল অশ্রু।

পরপর কয়েকদিন ধ্যানের সময় শ্রীকৃষ্ণের বদলে রবীন্দ্রবাবুর মুখ মনে পড়ায় নয়নমণির খুবই কষ্ট হতে লাগল। ওই মুখ, ওই মানুষটির দৃষ্টি তার সারা শরীর অবশ করে দিচ্ছে। এ এক অন্যরকম অনুভূতি।

রবীন্দ্রবাবুকে সে দেখেছে মাত্র তিনবার, তাও তৃতীয়বার কোনও কথাই হয়নি। দু'বার তিনি মহড়ার সময় উপস্থিত ছিলেন, উচ্চারণ ও অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দিয়েছেন, আর একবার তিনি জিজ্ঞেস

করেছিলেন, তোমার নাম নয়নমণি ? হাতের একটি ভঙ্গি দেখাবার জন্য তিনি সামান্য স্পর্শ করেছিলেন নয়নমণির মুখ। থিয়েটার করতে গেলে ছোঁয়াছানির কোনও বাছ-বিচার চলে না অন্য অভিনেতারা ঠেলাঠেলি করে, নাচের শিক্ষক সাপটে ধরে, পরিচালক কখনও কখনও চড় মারে। এসব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ওই অপরূপ মানুষটি যে একবার একটুক্ষণের জন্য মুখখানি ছুঁলেন, তাতেই নয়নমণির সমস্ত শরীর ঝনঝনিয়ে উঠেছিল। এ যেন বহুদিন পর সত্যিকারের এক পুরুষ মানুষের স্পর্শ। নয়নমণির সেই শিহরন কেউ বুঝতে পারেনি।

তৃতীয়বার তিনি ছিলেন দর্শকের আসনে। রাজা-রানী তিনি সবান্ধবে দেখতে এসেছিলেন তৃতীয় রাতে। নয়নমণি সে কথা জানতও না। অভিনয়ের সময় মঞ্চে আলোর খেলা চলে, প্রেক্ষাগৃহ থাকে অন্ধকার, নয়নমণি দর্শকদের দিকে তাকায়ও না। রবীন্দ্রবাবু বসেছিলেন প্রথম সারির ঠিক মাঝখানে, হঠাৎ নয়নমণির চোখ পড়ে গেল সেদিকে। অন্ধকারের মধ্যেই যেন নিজস্ব আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে বসে আছেন কবি। এবং তিনি এক দৃষ্টিতে নয়নমণিকেই দেখছেন।

তারপর অন্যান্য দৃশ্যে যতবার নয়নমণি ঘুরে ফিরে আসে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তিনি কি আর কারুকে দেখছেন না। শুধু নয়নমণির দিকেই চেয়ে আছেন ? একি সত্য হতে পারে , না, না সত্য নয়। তবু, শারীরিক স্পর্শের মতনই, সেই দৃষ্টির সংযোগে নয়নমণির সারা শরীরে সুখানুভূতি হচ্ছিল।

অভিনয় সাঙ্গ হলে রবীন্দ্রবাবু গ্রিনরুমে এসেছিলেন, অমরেন্দ্রনাথ ও আর দু'একজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, নয়নমণি কিছুতেই ওঁর সামনে আসতে পারেনি। কী যে সঙ্কোচ তাকে পেয়ে বসেছিল। যেন ওঁর সামনে গেলে সে চক্ষু তুলে কথাই বলতে পারবে না।

আর দেখা হয়নি। শুধু বারবার তিনি ফিরে আসছেন ধ্যানে। শুধু বিখ্যাত ব্যক্তি নন, উনি একজন পুরুষ। পুরুষের মতন পুরুষ, মনশ্চক্ষে ওঁকে দেখলেই নয়নমণির সেইরকম রোমাঞ্চ হয়। ছি ছি, এ কী লজ্জার কথা। শ্রীকৃষ্ণের সামনে বসে সে অন্য পুরুষের কথা ভাবছে। অথচ মনকে যে দমন করা যায় না। বারবার মন ওঁকে ফিরিয়ে আনে। কেন আনে ? আর কোনওদিনও সশরীরে দেখা হবে কি না সন্দেহ, আকাশের রবির মতনই উনি সুদূর।

তবু দিন দিন আকর্ষণের তীব্রতা বেড়েই যায়। দিনে রাতে যখন তখন মনে পড়ে তাঁর কথা। মনে পড়লেই শরীরে সেই রোমাঞ্চ। শরীরের এ কী বেহায়াপনা !

এ কথা সে কারুকে বলতেও পারে না। মনের সব কথা বলার মতন ঘনিষ্ঠ সাথি তো তার কেউ নেই। গঙ্গামণিকেও এই কথা বলা চলে না। ওঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে, জানবে কার কাছে ! পত্রপত্রিকায় মাঝে মাঝে রবীন্দ্রবাবুর নাম দেখা যায়, সেই ছাপার অক্ষরের দিকে নয়নমণি তৃষিতভাবে তাকিয়ে থাকে। যেন সেই নামের মধ্যেই ফুটে ওঠে অবয়ব। এই নামটি দেখার জন্য নয়নমণি অনেক পত্রপত্রিকা কেনে। 'সাহিত্য' নামে একটা কাগজে কে একটা লোক ওঁকে গাল দিয়েছে দেখে নয়নমণির সর্ব অঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। পত্রিকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আঁস্তাকুড়ে। এখন মনে মনে রবীন্দ্রবাবুকে সে জীবন দেবতা করে নিয়েছে, তাঁর কোনও নিন্দে সে সহ্য করতে পারবে না ।

অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন সে ওঁর সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে পায়।

মহড়া শেষ হবার পরেও কিছুক্ষণ গুলতানি চলে। যাদের বাড়ির টান নেই, তারা থেকে যায়। কিছু খাবার দাবার আসে। 'আলিবাবা' নাটক খুব জমে গেছে, ক্লাসিকের এখন দারুণ রবরবা। এই 'আলিবাবা' যখন প্রথম মঞ্চস্থ হল, তখন দর্শকই আসতে চায়নি, গিরিশবাবু নেই, অর্দ্ধেন্দুশেখর নেই, উটকো অমর দত্তর অভিনয় কে দেখতে চায় ! প্রথম দু-একটা নাটকে কিছু কৌতূহলী লোক এসেছিল, 'আলিবাবা'য় দর্শকরা সব ভোঁ ভাঁ। এমনও দিন গেছে, দশ বারো জনের বেশি টিকিট কাটেনি। অথচ অভিনয় বন্ধ রাখা যায় না, তখন ব্রজদুলালের মতন কর্মীরা রাস্তায় গিয়ে পথিকদের কাছে হাত জোড় করে বলেছে, 'আলিবাবা দেখবেন আসুন, বিনা পয়সায়, দয়া করে আসুন।' সেই বিনা পয়সার দর্শকরাই মুগ্ধ, বিমোহিত হয়ে অন্যদের কাছে গল্প করেছে। থিয়েটারের সবচেয়ে ভাল

[illegible], লোকের মুখে মুখে প্রচার। কাগজের বিজ্ঞাপনের চেয়েও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। ক্রমে এ নাটকের খ্যাতি ছড়াল, দর্শকদের ভিড় বাড়তে লাগল। এখন এমন অবস্থা, প্রতিটি শো হাউজ ফুল। বহু লোক টিকিট কাটতে এসেও নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। ক্লাসিকের সবাই এখন খুব খুশিতে আছে।

এক সঙ্গে দু'খিলি পান মুখে দিয়ে কুসুমকুমারী বলল, আমাদের রাজা-রানীর সময় রোববাবু নামে একজন নাট্যকার আসতেন মনে আছে ? ওব্ বাবা, তাঁর কী গুমোর ! আমাদের অমরবাবু গেসলেন 'আলিবাবা' দেখার জন্য নেমন্তন্ন করতে, তিনি আসতে পারবেন না। তাঁর সময় নেই। হিংসে, বুঝলি হিংসে। তিনি নিজের নাটক ছাড়া অন্যের নাটক দেখবেন না। রাজা-রানী তো চলল না মোটেও। ওর নাটক আবার কে নেবে ? অমন কত নাট্যকার এল গেল, ঢের দেখেছি !

ব্রজদুলাল বলল, তুই বলছিস কী রে কুসোম ! রোববাবু কি শুধু নাট্যকার নাকি ? উনি কোবতে টবতে লেখেন, দু'দশ লাখ গানও বেঁধেছেন শুনেছি, কিন্তু ওসব কিছু না। ওসব হল এলেবেলে খেয়াল, আসলে ঠাকুররা তো মস্ত জমিদার। সে জমিদারির বেশির ভাগটা উনিই দেখাশুনো করেন শুনেছি। ইচ্ছে করলে ওঁর মতন মানুষ এ রকম তিনটে থিয়েটার কিনতে পারেন।

চোখ গোল গোল করে কুসুমকুমারী বলল, শখের নাট্যকার, তাই বলো ! রাজা-রানীর সময় যখন আসতেন, আমি দুটো অন্য কথা বলতে গেলুম, পাত্তাই দিলেন না।

ব্রজদুলাল হাসতে হাসতে বলল, কথা বলার সময় তুই চোখ ঘুরিয়েছিলি ? পুরুষ মানুষ দেখলেই তো তোর খাই খাই ভাব হয়। এরা বনেদি লোক, ওসব পছন্দ করে না।

কুসুমকুমারী বলল, সোমত্থ ব্যাটাছেলেরা তো তাই-ই চায়। হ্যাঁ গা, অতবড় জমিদার তো রাঁড় রাখেননি ?

ব্রজদুলাল বলল, কে জানে, তা কে খবর রাখে। আমাদের ঢোল বাজায় যে গুপী, তার বাপ ঠাকুরদের জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করে। গুপীর বাপের কাছে শুনিছি, রোববাবু বাঙালদেশে জমিদারি দেখতে গিয়ে বজরায় থাকেন, মাটিতে পা দেন না। সেই বজরায় সাহেব সুবোরা আসে, আরও সব জমিদার, ইয়ার বক্সিরা আসে, খানা-পিনা হয়, সেখানে কি আর বাইজী নাচে না ? জমিদাররা ইচ্ছে করলেই প্রত্যেক রাতে একটা করে নতুন মাগি আনাতে পারে। বাঁধা মাগি রাখতে যাবে কোন দুঃখে। রোববাবুর বিয়ে করা বউয়ের ঘরে পাঁচটি ছেলেমেয়ে, আরও কত ছেলেমেয়ে কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে কে জানে ! আহা হা আমি যদি ভাগ্য করে অমন কোনও জমিদারের ঘরে জন্মাতুম, তা হলে ভ্রমরের মতন নিত্যি নতুন ফুলে ফুলে মধু খেতুম।

কুসুমকুমারী বলল, মর মুখপোড়া !

নয়নমণি যথারীতি খানিকটা দূরে সরে বসে আছে। এ সব কথা তার কানে যায়, আগুনের ছ্যাঁকা লাগার মতন সে শিউরে শিউরে ওঠে। খুব রাগ হলেও সে এসব কথার প্রতিবাদ করে না। ওদের কথা বিশ্বাসও করে না সে। সে দেখেছে, বেশির ভাগ মানুষই অন্যের নিন্দে করে সুখ পায়। মুক্ত মনে অন্যের প্রশংসা করতে পারে ক'জন ? প্রশংসাবাক্য যেন খুবই মূল্যবান জিনিস, কেউই প্রাণে ধরে খরচ করতে চায় না। প্রশংসার ভাষাতে বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু নিন্দের সময় কতরকম রং-বেরঙের বাক্যচ্ছটা ফুটে বেরোয়।

শ্রীকৃষ্ণের নামেও তো কত অপবাদ আছে, সত্যিকারের ভক্ত কি তা মনে রাখে ? নয়নমণি নিজের অভিজ্ঞতায় বিচার করে, রবীন্দ্রবাবুকে সে যতটুকু দেখেছে, তাতেই তার মনে হয়েছে ওঁর গুণের পরিমাপ করা ব্রজদুলালের মতন পরের মুখে ঝাল খাওয়া মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। উনি জমিদার হলেও অন্য জমিদারদের সঙ্গে ওঁর তুলনা চলে না, জমিদারও তো কম দেখেনি নয়নমণি !

রবীন্দ্রবাবুর সান্নিধ্যে যাবার উপায় নেই, সে ওঁর অনেকগুলি বই কিনিয়ে আনাল। বেশির ভাগই কবিতার বই। নয়নমণি কিছু কিছু গল্প-উপন্যাস পাঠ করেছে। কবিতা সে ঠিক বোঝে না। বৈষ্ণব পদকর্তাদের কিছু গান তার মুখস্থ আছে, এ ছাড়া অন্য কবিতা বিশেষ পড়েনি। অমর দত্ত আর ক্ষীরোদপ্রসাদ একদিন তর্কের সময় মাইকেল নামে একজন কবির নাম করছিলেন বারবার।

ক্ষীরোদপ্রসাদ একখানা বই নাচিয়ে বলছিলেন, অমর পড়ো, অন্যের কথায় না নেচে নিজে পড়ে দেখো। তুমি নবীন সেনের প্রশংসা করছ, তার আগে মাইকেলকে বুঝতে হবে। থিয়েটার চালাতে এসেছ, গিরিশবাবুর সঙ্গে টক্কর দিতে চাও, তোমাকে পড়তে হবে অনেক, সমাজে পাঁচজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথা বলার যোগ্য হতে হবে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বইখানি রেখে গিয়েছিলেন। নয়নমণি পাতা উল্টে দেখেছিল। সেটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত মেঘনাদবধ কাব্য। এই কবির কোনও রচনাই সে আগে পড়েনি। এই বইয়ের দু'এক পাতা পড়তে গিয়েও তার বোধগম্য হল না। রামায়ণের কাহিনী সে ভালই জানে, কিন্তু মাইকেলের ভাষা এত শক্ত কেন? ক্ষীরোদপ্রসাদ এত প্রশংসা করলেন, অথচ তাঁর নিজের লেখা 'আলিবাবা'র ভাষা অতি সুবোধ্য।

নয়নমণি ঠিক করল, বুঝুক বা না বুঝুক, সে রবীন্দ্রবাবুর কাব্যগ্রন্থগুলি পড়ে শেষ করবেই। এঁর ভাষা সরল, প্রতিটি শব্দেরই অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু অনেক কবিতাই পড়ার পর কেমন একটা অস্পষ্টভাব মনের মধ্যে ঘোরে। আবার এক এক সময় সে দারুণ চমকিত হয়। কবি যেন অবিকল তাঁর মনের কথাটাই লিখেছেন :

বৃথা এ বিড়ম্বনা!
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ
কেন এত যন্ত্রণা!....

কিংবা :

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহিরে—
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।...

আর একটি ব্যাপারেও নয়নমণি খুব বিস্ময়বোধ করে। এই কবি রমণীদের মনের কথা এমন সত্যভাবে প্রকাশ করেন কোন মন্ত্রবলে? তিনি যেন রমণীদের অন্তরের গহনে ডুব দিয়েছেন। কিংবা যেন পূর্বজন্মে নারী ছিলেন তাই তাদের ব্যথা-বেদনা আকাঙ্ক্ষার কথা ঠিক ঠিক জানেন। অনেক কবিতাই নারীর উক্তি : আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?... রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ, নাহিক মোর রানীর সাজ, পরিয়া আছি জীর্ণ চীর বাসনা, অমন দীন নয়নে তুমি চেও না।... আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়নে রে। ...কত শারদ যামিনী যাইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া....

এ তো সবই নয়নমণির নিজের জীবনের কথা, কী করে জানলেন ওই কবি?

এই সব পড়তে পড়তে নয়নমণির মহা বিপদও হল বটে। অনেকগুলি বছর সে তার বিড়ম্বনার কথা ভুলে ছিল। সে পিছন ফিরে তাকায়নি, শোক করেনি। থিয়েটারের জগতে সর্বক্ষণ মেতে থাকা যায়, অন্য কথা মনে পড়ার বিশেষ সময়ও পাওয়া যায় না, কিন্তু এখন এই সব কবিতা পড়ার পর সে আবার অনুভব করে যে, সে একজন রমণী, সে একজনকে নিয়ে সংসার গড়ার সাধ করেছিল, সে সবই বিফলে গেছে, তবু তার যৌবন আছে, সেই যৌবন বড় নিঃসঙ্গ। এখন সে মাঝে মাঝে নিজের শরীরের দিকে চায়। এক একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি তার রক্তে তরঙ্গ তোলে, তার শরীরে বেদনা বোধ হয়। কবিতার পঙ্‌ক্তি যেন কবির অঙ্গুলি হয়ে তাকে স্পর্শ করে। সেই যে রবীন্দ্রবাবু একদিন তাঁকে ঈষৎ ছুঁয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেই রকম অনুভূতি।

সেইজন্যই তো নয়নমণির এখন আর থিয়েটার ভাল লাগে না, অন্য কোনও লোকের সংস্পর্শ পছন্দ হয় না। এক এক সময় ভাবে, থিয়েটার ছেড়েই দেবে। কিন্তু তারপর? সে তার একাকিত্বের বোঝা বহন করবে কী করে? ওই কবি তার ঘরের শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিকেও আড়াল করে দাঁড়াচ্ছেন, কিন্তু তিনি তো সত্যি সত্যি সশরীরে তার কাছে আসবেন না।

থিয়েটারের গাড়ি এসে প্রতিদিন নয়নমণিকে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে যায়। কোনও কোনও দিন পথে

থেমে থেমে অন্য মেয়েদের তুলে নিতে হয়, কোনও কোনওদিন সে একাই যায়। যাত্রাপথেও গাড়ির মধ্যে বসে সে রবীন্দ্রবাবুর বই পড়ে, কবিতার বই বারবার পড়া যায়, পঙ্‌ক্তিগুলো মুখস্থ হলে বেশি রসগ্রহণ করা যায়। সে সময় নয়নমণি বাইরের দৃশ্য খেয়াল করে না।

একদিন নয়নমণির মনে হল, গাড়িটা যেন বড় বেশিক্ষণ ধরে যাচ্ছে। আজ মঞ্চে অভিনয় নেই, পরবর্তী নাটকের মহড়া হবার কথা, সবে মাত্র বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হয়েছে। পর্দা সরিয়ে নয়নমণি একবার বাইরে তাকাল, এ তো প্রতিদিনের পরিচিত পথ নয়, সম্পূর্ণ অচেনা রাস্তা। নয়নমণি একবার মুখ বাড়িয়ে সহিসকে ডাকার চেষ্টা করল, ঘোড়ার পায়ের কপ কপ শব্দের জন্য সে শুনতে পেল না। সহিস অবশ্য বেশ পরিচিত এবং বিশ্বস্ত, ভয়ের কিছু নেই।

খানিক বাদে গাড়ি থামল, সহিস এসে দরজা খুলে দিতে নয়নমণি জিজ্ঞেস করল, আজ কোথায় নিয়ে এলে?

অঞ্চলটি ফাঁকা ফাঁকা। কিছুদূর অন্তর অন্তর এক একটি বাড়ি। গাড়িটি থেমেছে একটি মস্ত লোহার গেটের সামনে, ভেতরে বাগানের মধ্য দিয়ে সুরকি ঢালা পথ, সেই পথের দু'ধারে জ্বলছে গ্যাসের বাতি।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নৃত্যশিক্ষক নেপা বোস, সে সব সময় জবরজং পোশাক পরে থাকে, তার পায়জামার রং হলুদ, কুর্তার রং টকটকে লাল, মাথায় আবার একটা মুসলমানি ফেজ। সহিস কিছু বলার আগেই সে বলল, এসো এসো নয়নমণি, তোমারি কুশলে কুশল মানি।

গাড়ি থেকে নেমে নয়নমণি ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করল, আজ রিহার্সাল হবে না?

নেপা বলল, হবে না কেন, এখানে হবে। কালুবাবুর হুকুম। এটা কালুবাবুর বাগানবাড়ি।

মানিকতলার দিকে অমর দত্তর একটি বাগান বাড়ি আছে, এ-কথা শুনেছে নয়নমণি। কিন্তু আগে কোনওদিন সেখানে মহড়া হয়নি। বাড়িটি ভারী সুন্দর, মালিকের শৌখিনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। চার দিকে বাগান, তার মধ্যে একটি দ্বিতল গৃহ, প্রবেশ পথের বাইরে বর্শা হাতে দুটি পুতুল-দারোয়ান ঠিক জীবন্ত বলে মনে হয়।

লাল মখমলের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় একটি প্রশস্ত হলঘর, সেখানে ঝুলছে রঙিন ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালে দেয়ালে বিলাতি ছবি। বাড়ির অন্দর একেবারে নিস্তব্ধ, আর কোনও জন-মনুষ্যের সাড়া পাওয়া গেল না।

নয়নমণি জিজ্ঞেস করল, আর কেউ এখনও এসে পৌঁছয়নি?

নেপা বলল, আর কে আসবে না আসবে তা তো আমি জানি না। আমাকে কালুবাবু শুধু তোমার জন্যই বাইরে দাঁড়াতে বলেছিলেন।

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল অমর দত্ত। কোঁচানো ধুতির ওপর শুধু একটা বেনিয়ান পরা, মাথার চুল অবিন্যস্ত, চক্ষু দুটি দেখলেই বোঝা যায় সে প্রকৃতিস্থ নয়, এখনও হাতে একটি মদের বোতল।

অমরকে এই অবস্থায় নয়নমণি কখনও দেখেনি। রঙ্গালয়ে সে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মানে, সেখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ, নিজেও কখনও পান করে না। প্রথম প্রথম এই নবীন নায়ক ও নাট্য পরিচালককে বেশ ভাল লেগেছিল নয়নমণির, থিয়েটারের জগতে এই যুবকটিকে মনে হত ব্যতিক্রম। ক্রমশ অবশ্য অমর দত্তর অন্য সব গুণপনার কথাও সে জেনেছে। উচ্চ বংশের ছেলে হলেও সে অল্প বয়েসেই বখাটে। লেখাপড়ায় মন ছিল না, কুসঙ্গে পড়ে উচ্ছন্নে যাবার কিছু বাকি রাখেনি। পনেরো বছর বয়েসেই তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে সুখে সংসার করলে যে সমাজে মান থাকে না। ভাল করে দাড়ি গোঁফ গজাবার আগেই সে এক রক্ষিতা রেখেছে এই মানিকতলার বাগানবাড়িতে। ব্রজদুলাল সব খবর রাখে, তার কাছ থেকেই শোনা গিয়েছিল যে অমরের মা নাকি দুঃখ করে বলেছিলেন, ঘরে অমন সুন্দরী সতী-লক্ষ্মী বউ, তাকে ফেলে অমর এক বাঁদর মাগি নিয়ে আছে।

অমরের অভিনয়-প্রতিভা আছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। 'আলিবাবা'র প্রভৃত জনপ্রিয়তার

পর অনেকেই স্বীকার করেছে যে, এবার বাংলা নাট্যজগৎ জয় করে নেবে এই ছোকরাটি।

বয়েসে ছোট বলে নয়নমণি কখনও অমরকে সমীহ করে কথা বলেনি। অমরও যতই তেজ দেখায়, কিছুতেই পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি এই মেয়েটিকে। দু'জনের ঝগড়া ও কথা কাটাকাটির মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রবিবাবু মন জুড়ে থাকার পর নয়নমণি আর অমরকে তেমন পছন্দ করতে পারে না।

নয়নমণি বলল, আর কে কে আসবে? আমাকে এত সাত তাড়াতাড়ি আনালেন কেন?

অমর নীচে নেমে ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, আর কেউ আসবে না। আজ শুধু তুমি। তুমি আর আমি। হ্যাঁ নেপা বোস থাকবে, তা থাকুক, মনে করো, ও একটা খাঁচার পাখি। নেপা বোস নতুন ড্যান্সের তালিম দেবে, তুমি নেচে দেখাবে। শুধু আমি দেখব, দেখে পছন্দ করব।

নয়নমণি বলল, এ আবার কী ধরনের রিহার্সাল? কোন নাটক?

অমর বলল, নাটক যাই হোক না। নাচ তো থাকবেই। নাচ না থাকলে লোকে টিকিট কাটে না। এবার তোর একখানা উলঙ্গিনী ড্যান্স জুড়ে দেব।

নয়নমণি নেপা বোসকে বলল, নাটকের ঠিক নেই, আগেই নাচ? ও আমি পারব না। আগে পার্টটা বুঝে নিতে হবে না? আমার বাড়ি ফিরে যাবার ব্যবস্থা করুন।

অমর জড়িত গলায় ধমক দিয়ে বলল, অ্যাই ছুঁড়ি, ওর দিকে ফিরে কথা বলছিস কেন? আমি মালিক। আমার দিকে তাকা। আমার হুকুম, তোকে নাচতে হবে।

নয়নমণি কঠিন মুখ করে বলল, কারুর হুকুম মানার জন্য আমি থিয়েটারে যোগ দিইনি। মালিককে একা একা নাচ দেখাবার কোনও শর্ত ছিল না।

অমর বলল, তুই সব সময় শর্ত শর্ত করিস কেন রে? এ কী পাটকলের নোকরি নাকি? থিয়েটারে পরিচালকের মেজাজ আর মর্জি সবচেয়ে বড় কথা। মাঝে মাঝে এ বাড়িতে রিহার্সাল হবে। কুসুম, ভূষণ, রানি, ক্ষেমী, বীণা এরা সবাই এসেছে। একা একা এসেছে।

নয়নমণি বলল, শুধু মেয়েরা রিহার্সাল দিতে আসে? পুরুষদের দরকার নেই?

অমর বলল, আরে রোজ রোজ সন্ধের পর কি ব্যাটাছেলের মুখ দেখতে ভাল লাগে? পুরো পুরো রিহার্সাল তো বোর্ডে হয়ই। এখানে তোরা মাঝে মাঝে এসে আমার মেজাজ শরিফ করে দিবি। বুঝলি? নে এবার আঁচলটা গুজে কোমরে বেঁধে নে।

নয়নমণি বলল, অমরবাবু, আপনি নেশা করেছেন, এখন আপনি আর আপনাতে নেই। কুসুম-ভূষণরা কী করে আমি জানি না, আপনি সজ্ঞানে থাকলে আমাকে এমন মন্দ প্রস্তাব দিতেন না। কাল আপনার সঙ্গে কথা হবে।

নেপা বোস বলল, দু' একখানা নাচ নেচেই দাও না নয়ন! সেই যে একটা হংস-নাচের কথা তোমায় বলেছিলুম।

নয়নমণি কোনও কথা না বলে নৃত্যশিক্ষকটির দিকে শুধু খর চক্ষে তাকাল।

অমর বোতলে আর একটা চুমুক দিয়ে দর্পের সঙ্গে বলল, কী আমি মাতাল? আমি মদ খাই বটে। কিন্তু মাতাল হই, এ কথা কোনও শুয়োরের বাচ্চাও বলতে পারবে না। জ্ঞান টনটনে আছে। নাচতে নেমে ঘোমটা! থিয়েটারে এসে সতী-সাধ্বী সেজে থাকতে চাস!

টলমলে পায়ে উঠে এসে সে নয়নমণির একটা হাত খপ করে ধরে বলল, তোর বিষ দাঁত আমি ভেঙে দেব! নাচবি কি না বল!

ঠাণ্ডা গলায় নয়নমণি বলল, আমার ওপর কক্ষনও জোর করবেন না, অমরবাবু। হাত ছাড়ুন। আমার অনিচ্ছায় কেউ আমার গায়ে হাত দিলে আমি সহ্য করতে পারি না। এ ব্যাপারে আমার একটা কঠিন শপথ আছে।

অমর ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করল, কী শপথ, শুনি শুনি!

তার চোখে চোখ রেখে নয়নমণি বলল, তাকে আমি খুন করে ফেলব।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অমর নেপার দিকে তাকিয়ে বলল, ওগো, বলে কী! খুন করে ফেলবে? এ মাগির এত তেজ হয় কী করে? আমি থিয়েটারের মালিক, আমার কথা শুনবে না?

তারপর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। ধপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দু'হাত জুড়ে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলল, নয়ন, অমন কোরো না! কেউ আমার কথা না শুনলে আমার বড় রাগ হয়। সেই রাগ থেকে বুকে কষ্ট হয়। সবাই যদি শোনে, নয়ন আমার হুকুম অগ্রাহ্য করেছে, তা হলে আমার মান কোথায় থাকবে? একটুখানি নাচ, লক্ষ্মীটি, অন্তত দু'চার পাক, তাতে আমার কথা থাকে—

অমর নয়নমণির পা জড়িয়ে ধরতে যেতেই সে ত্রস্তে সরে গেল। ঝোঁক সামলাতে না পেরে অমর পড়ে গেল উপুড় হয়ে। তারপর মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে শিশুর মতন অভিমানে বলতে লাগল, একটু নাচ, তোর পায়ে ধরছি, আমার মাথার দিব্যি, ওই হংস-নাচখানা শুধু দেখা, আর কোনওদিন বলব না। শুধু আজকের দিনটা।

নেপা বোস হো-হো করে হেসে উঠল। নয়নমণিও না হেসে পারল না।

ন্যাপা বোস জিজ্ঞেস করল, কী গো, এ পাগল তো থামবে না দেখছি। একটু নাচবে নাকি? ঘুঙুর বেঁধে দেব?

নয়নমণি দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, না।

অমর জোর করুক বা কেঁদে ভাসাক, তবু নয়নমণি তার নাচের মর্যাদা নষ্ট করবে না। সে সোজা বেরিয়ে গেল বাইরে।

সে রাতে বাড়ি ফিরে নয়নমণি ভাল করে স্নান করল। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, অমর দত্ত আর একদিন ওরকম বাড়াবাড়ি করলে সে ক্লাসিক ছেড়ে দেবে। এই ধরনের ঘটনায় তার মনের মধ্যে যে অশান্তির ঝড় বইতে থাকে, তা সহজে থামে না। কেন পুরুষরা মনে করে যে মেয়েদের ওপর জোর করে সব কিছু আদায় করা যায়!

আত্মস্থ হবার জন্যে সে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসল। চোখ বুজতেই সে দেখতে পেল রবিবাবুর সৌম্য সুন্দর মুখখানি। নয়নমণির ঠোঁট নড়তে লাগল, কোনও মন্ত্রের বদলে সে বলতে লাগল, রবিবাবুর কবিতা:

আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান
কেবল শরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।....

অনেকক্ষণ এই ভাবে বসে থাকার পর নয়নমণি ভাবল, রবিবাবুর কাছাকাছি সে যেতে পারবে না, কিন্তু তাঁকে একটা চিঠি লেখা যায় না? এই অধীনার চিঠিখানি যদি তিনি একবার হাতে তুলে নেন, সেটাই তো হবে তাঁর স্পর্শ।

৪১

বাল গঙ্গাধর তিলকের মামলা চালাবার জন্য কলকাতায় যথেষ্ট চাঁদা তোলা হয়েছিল, ব্যারিস্টারও পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কোনও লাভ হল না। ইংরেজ-সরকার কঠোর দৃষ্টান্ত স্থাপনে বদ্ধ পরিকর। নিজস্ব পত্র-পত্রিকায় কিছু স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা ছাড়া ইংরেজ-হত্যাকারীদের সঙ্গে তিলকের

কোনও যোগসূত্র প্রমাণিত না হলেও তাঁর আঠারো মাসের কারাদণ্ড হয়েছে। তার পরেই ভারতীয়দের মতামত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পাশ হয়ে গেল সিডিশান আইন।

কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ সমালোচনা ও কিছু কিছু অধিকার আদায়ের জন্য বক্তৃতাবাজি এতদিন শাসকমহল খানিকটা কৌতুকের চোখে দেখত, এই আইন এবার সেইসব বক্তাদের প্রতি খানিকটা চোখ রাঙানি দিল। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে যে উগ্র সুর দেখা দিচ্ছিল, তাও নরম হয়ে গেল।

চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষেও বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না। প্রত্যেকের মাথার দাম বিশ হাজার টাকা। এ দেশে বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই। দামোদর আর বালকৃষ্ণ একটা কীর্তনের দলে ভিড়ে গিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াত। বেশ কিছুদিন তাদের কেউ সন্দেহ করেনি। একদিন দু'জন চর পুলিশ ডেকে এনে সেখানে ওদের ধরিয়ে দিল হাতেনাতে। খুব সংক্ষিপ্ত বিচারে দু'জনেরই ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

ওদের ছোট ভাই বাসুদেওকে পুলিশ প্রথম সন্দেহ করেনি। তাকে রোজ হাজিরা দিতে হত থানায়। বাসুদেও'র মাত্র সতেরো বছর বয়েস, হত্যাকাণ্ডের দিন সেও যে সঙ্গে ছিল পুলিশ তা টের পেয়ে গেছে। তবু তাকে আশ্বাস দেওয়া হল, সে রাজসাক্ষী হলে ক্ষমা পেয়ে যাবে।

সহোদর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে বাসুদেও? বরং সে দাদাদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। এক সন্ধেবেলা সে মহাদেও রানাডেকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল সেই বিশ্বাসঘাতকদের বাড়ির সামনে। অমাবস্যার রাত, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, চতুর্দিক অন্ধকার, পথে মানুষজন নেই। বিশ্বাসঘাতকরা দুই দ্রাবিড় ভাই, তারা ভয়ে রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে বেরোয় না। ভেতরদিকের ঘরে লণ্ঠন জ্বেলে তারা তাস খেলছিল। বাসুদেও পুলিশের মতন গলা করে তাদের নাম ধরে ডেকে বলল, থানা থেকে আসছি। তোমাদের পুরস্কারের টাকা এনেছি। সেই দুই ভাই আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাইরে আসতেই বাসুদেও খুব কাছ থেকে গুলি চালাল তাদের বুকে। প্রত্যেকবার গুলি চালাবার সময় সে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগল, নে ইনাম, নে ইনাম!

রাস্তায় পড়ে থাকা লাশ দেখে ওদের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার পর সে আর পালাবারও চেষ্টা করল না। বিচারের সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাসুদেও বলল, হ্যাঁ, দু'জন বিশ্বাসঘাতককে মেরেছি, আমাকে দু'বার ফাঁসি দিতে হবে কিন্তু।

চাপেকররা তিন ভাই এবং মহাদেব রানাডের ফাঁসি হবে পর পর। ওদের যেখানে রাখা হয়েছে, সেই ইয়েরোওডা কারাগারেই অন্য একটি সেলে বন্দি আছেন তিলক। সমস্ত ঘটনাই তাঁর কানে এসেছে, কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান না।

প্রথম ফাঁসি হল বড় ভাই দামোদরের। ভোরবেলা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে সে প্রহরীদের অনুরোধ করে একবার প্রণাম করতে গেল তিলককে। তিলক একখণ্ড ভগবদগীতা তুলে দিলেন তার হাতে, দামোদর সেই বই বুকে চেপে ধরল। তার মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, তার দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই তার পুনর্জন্ম হবে, সে আবার ফিরে আসবে এই দেশের মাটিতে।

তিন চাপেকর ভাই ও মহাদেব রানাডের ফাঁসির সংবাদ শুধু ছাপা হল কাগজে, কিন্তু তাদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী প্রচারিত হতে দেওয়া হল না। ওদের কয়েকজন বন্ধু ও সন্দেহজনক আরও কয়েক ব্যক্তির কারাদণ্ড হল দুই থেকে পাঁচ বছরের বিভিন্ন মেয়াদে। দণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকায় একজনের নাম বি সিং। সে যে আসলে ভরত সিংহ, তা কলকাতায় তার পরিচিতদের মধ্যেও জানতে পারল না কেউ।

সাহেব-হত্যার এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী ও একই পরিবারের তিন নির্ভীক ভ্রাতার ফাঁসির দড়িতে আত্মদানের ঘটনার প্রতিক্রিয়া কলকাতায় হল দু' রকম। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা প্রাজ্ঞ, প্রবীণ ব্যক্তিরা কেউই সমর্থন করলেন না, তাঁদের কাছে এটা মুর্খামি বা গোঁয়ারতুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের জন্যই তো সিডিশান বিল পাশ হল, এখন আর ইংরেজদের কোনও কাজের প্রতিবাদও জানানো যাবে না। বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল

এনে যে দেশীয় কাউন্সিলারদের ক্ষমতা কমিয়ে দিলেন, তার বিরুদ্ধে কিছু লেখালেখি করা গেল? এই ম্যাকেঞ্জি যখন তখন বাঙালিদের গাল পাড়েন।

কিন্তু অল্পবয়েসী যুবা ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিস্ময়ের ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল। ওই মারাঠা ছেলেগুলি ইংরেজ সরকারকে একটা জোর ধাক্কা দিয়েছে, বাঙালিরা পারবে না? অনেক ইংরেজ এ দেশের মানুষদের কুকুর, বাঁদর, কাপুরুষ বলে, এবার ওদের যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। ওরা পিস্তল পেল কোথায়? প্রত্যেকের টিপ নির্ভুল, তবে কি এরা আগে কিছুদিন চাঁদমারি অভ্যেস করেছে? এখানে সে সুযোগ পাবার উপায় আছে?

দামোদরের ফাঁসির দিন সরলা সারাদিন উপবাস করে রইল। সারাদিন সে কথাও বলল না কারুর সঙ্গে। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটল, অথচ তার একটা প্রতিবাদ সভা হল না কলকাতায়? সে কয়েকজন কংগ্রেসী নেতার সঙ্গে আলোচনাও করেছিল, তাঁরা পাত্তাই দেননি। বিকেলবেলা এসে উপস্থিত হল প্রভাত। এই ছেলেটি ইদানীং গল্পটল্প লিখছে, রবিমামাকে প্রায়ই নানা বিষয়ে চিঠিপত্র লেখে, মাঝেমাঝে রবিমামার কাছে বায়না ধরে, আপনি প্লট দিন, তাই নিয়ে আমি গল্প লিখব।

প্রভাত 'ভারতী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, সরলার কাছে ইদানীং প্রায়ই আসে। নিছক সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও সরলার প্রতি তার ঘনিষ্ঠতা অন্যদিকে এগোচ্ছে। সরলা তা টের পায়, সে বিশেষ প্রশ্রয়ও দেয় না, আবার একেবারে বিমুখও করে না। পুরুষরা যখন স্তুতির বন্যা ছুটিয়ে দেয়, তখন সে তা বেশ উপভোগ করে। তার আগেকার কয়েকজন প্রেমিক ধৈর্য হারিয়ে সরে পড়েছে। দেখা যাক, এই প্রভাত মুখুজ্যে কতদিন টেঁকে!

মা কিংবা দিদি এখন সময় দিতে পারে না, 'ভারতী' পত্রিকা এখন সরলাকেই চালাতে হয়। কিন্তু লেখকদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহের ঝক্কি ঝামেলা সে ঠিক সামলাতে পারছে না। প্রভাতের মতন লেখকরা নিজেদের লেখা দেবার ব্যাপারে খুব উৎসাহী, কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব নিতে বললে এড়িয়ে যায়। সরলা তাই রবিমামাকে সম্পাদক হবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে কিছুদিন ধরে। রবিমামা চাইলে অনেকেই ঠিক সময়ে লেখা দেবে। তার চেয়েও বড় কথা পত্রিকা প্রতি মাসে ঠিক সময়ে বেরুতে পারবে, কিছু লেখা না পাওয়া গেলেও কোনও পাতা খালি থাকবে না, সব্যসাচী লেখক রবীন্দ্র নিজেই দু'হাতে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ধারাবাহিক উপন্যাস লিখে অনেকগুলি পৃষ্ঠা ভরিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু রবিমামা সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে সম্মত হচ্ছেন না। তাঁকে বোঝানো হয়েছে যে ছাপাখানার কাজ, কাগজের দাম, গ্রাহকদের কাছে পত্রিকা পাঠানো ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তাঁকে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না, সরলাই সে সব দিক সামলাবে, রবিমামা শুধু সম্পাদকীয় কাজটুকু করে দেবেন। এ পত্রিকার জন্য টাকাপয়সার কোনও সমস্যা নেই, লাভ-লোকসান নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। জানকীনাথ সব খরচ দিয়ে দেন।

একজন দাসী এসে প্রভাতের আগমনবার্তা জানালে সরলা বিশেষ কোনও সাজগোজ করল না। শুধু চুল আঁচড়ে নিয়ে আটপৌরে শাড়ি পরেই নেমে এল বসবার ঘরে। প্রভাত প্যান্ট-কোট পরা, একটি চুরুট ধরিয়ে বসেছিল সোফায়, সরলাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

সরলা উদাসীন মুখ করে বসল তার মুখোমুখি একটা সোফায়। বেশ কয়েক মিনিট কোনও কথাই বলল না।

গলা খাঁকারি দিয়ে প্রভাত জিজ্ঞেস করল, মিস ঘোষাল, আপনার কি শরীর খারাপ?

সরলা মুখ তুলে বলল, আপনাকে বলেছি না, আমাকে মিস ঘোষাল বলবেন না। আমার একটা নাম আছে, আমার নিজস্ব একটা পরিচয়ও আছে। ইংরিজি সম্বোধন আমার পছন্দ হয় না।

প্রভাত বিব্রতভাবে বলল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ভুল হয়ে যায়। আপনার এত সুন্দর নাম। সরলাদেবী, আপনি শুনলে খুশি হবেন, 'ভারতী'র জন্য আমি একটা গল্প নিয়ে এসেছি। অন্য একটি পত্রিকার সম্পাদক খুব ঝুলোঝুলি করছিল, কিন্তু আপনার পত্রিকায় ছাড়া অন্য কোথাও আমার লেখা দিতে ইচ্ছে করে না। লেখাটি আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি কি?

সরলা এবারেও খুশির ভাব দেখাল না। নিস্পৃহভাবে বলল, আপনি বুঝি শোনেননি, রবিমামা

শেষপর্যন্ত সম্পাদক হতে রাজি হয়েছেন। এখন থেকে তাঁর কাছেই গল্প দেবেন, প্রভাতবাবু।

প্রভাত সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, রাজি হয়েছেন ? রাজি হয়েছেন ? অত্যন্ত সুখের কথা। রবিবাবু সম্পাদক হলে সে কাগজের মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। রবিবাবুর তুল্য এখন আর কে আছে ? তবে, দেবী সরলা, গল্প আমি রবিবাবুর কাছে জমা দিলেও আগে আপনাকে একবার শুনিয়ে যাব। আপনার মতামতের মূল্য আমার কাছে অনেকখানি। আজ যেটা এনেছি, সেটা কি শুরু করব ?

প্রভাতের ছোট ছোট গল্পগুলি বেশ আকর্ষণীয়। সরলার ভালই লাগে। তবে সেগুলি শুধুই গল্প। তাতে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনার কোনও ভাব নেই। সরলা আজ গল্প শোনার আগ্রহ বোধ করল না।

সে দেওয়ালের ভারতের মানচিত্রের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, প্রভাতবাবু, আমাদের ভারতমাতার কী হবে ?

প্রভাত চমকে উঠে বলল, ভারতমাতা ? কেন, তার কী হয়েছে ?

সরলা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, পুণার চাপেকর ভাইদের যে ইংরেজ সরকার ফাঁসির দড়িতে ঝোলাচ্ছে, আপনি শোনেননি ?

প্রভাতকুমার চুপসে গেল। এসব ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই। সদ্য লেখা গল্পটি মনের মধ্যে এখনও টগবগ করছে, সেটি কারুকে না শোনাতে পারলে সে স্বস্তি পাবে না। সে বেশ আশা করে এসেছিল, আজকের এই মেঘ মেদুর সন্ধ্যায় সরলার সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে গ্যাসের আলোয় তার গল্পটি পাঠ করবে আর মাঝেমাঝে চোখ তুলে দেখবে সরলার সুন্দর মুখের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আজ এখানকার আবহাওয়া প্রতিকূল। যা বোঝা যাচ্ছে, এখন আর সরলাকে গল্প শোনাবার সম্ভাবনা নেই।

একজন পরিচারক এসে চায়ের পট ও কেক পেস্ট্রি নিয়ে এলেও প্রভাত শুধু এক কাপ চায়ে দু' চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল।

কয়েকদিন পরে সরলা তার অনুগত যুবকবৃন্দকে নিয়ে একটা ছোট সভা ডাকল তাদের বাড়ির মাঠের এক কোণে। এর মধ্যে সে বোম্বাই থেকে কিছু পত্র-পত্রিকা আনিয়েছে, চাপেকর ভাইদের সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেছে। সেই কাহিনী শুনিয়ে সে এই ছেলেদের মনে প্রেরণা জাগাতে চায়।

প্রথমে দামোদরের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করে নীরবতা পালন করা হল দু' মিনিট। তারপর সরলা সবিস্তারে সব বলতে শুরু করল।

তার বক্তব্য শেষ হতে না হতেই একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দিদি, আপনি আমাদের তলোয়ার-লাঠিখেলা শেখবার ব্যবস্থা করেছেন। এসব শিখে কী হবে ? এ তো যেন শখের ব্যাপার। উৎসব করে আমরা লোকজনদের ডেকে সেই খেলা দেখিয়েই খুশি থাকব ? মহারাষ্ট্রের ছেলেরা হাতে পিস্তল তুলে নিয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে যুঝতে গেলে ওদের সমান সমান অস্ত্র দিয়েই লড়াই করতে হবে। আপনি আমাদের পিস্তল জোগাড় করে দিন।

সরলা একটুক্ষণ নতনেত্রে নীরব হয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল, তা হলে তোমরা মনে করছ, লড়াই করার সময় এসে গেছে ? এই মনে হওয়াটাই বড় কথা। তোমরা পুরুষ ছেলে, তোমরা এই অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারো না ? আমাকেই সব জোগাড় করতে হবে ?

তিলককে সাহায্য করার জন্য রবি অনেকটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, বেশ কয়েক জায়গায় ঘুরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। তিলক-মামলা তিনি অনুসরণ করেছেন আগাগোড়া। তিলকের তিনি সমর্থক, কিন্তু চাপেকরদের এই খুনোখুনি তিনি একেবারেই পছন্দ করেননি। সন্ত্রাসবাদ তাঁর মতে ভ্রান্ত পথ। দেশের সব মানুষকে আগে দেশ কাকে বলে তা চেনাতে হবে।

তবু চারজন তরুণ, তারা চোর-ডাকাত নয়, দাঙ্গাকারী নয়, সাধারণ খুনে-বদমাশ নয়, সচ্চরিত্র, তারা নিজের জাতির সম্মান রক্ষার্থে অবলীলায় ফাঁসির দড়ি গলায় দিল, এ কি উপেক্ষা করা যায় ?

রবির হৃদয় বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল।

এরই মধ্যে আবার রথীর উপনয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছে তাঁর এই পৌত্রের উপনয়ন হোক বিশুদ্ধ আর্যমতে, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। অনেক লোকজন সমেত রথীকে আগেই শান্তিনিকেতন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের একটা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল বলেন্দ্র, রথীর পৈতে উপলক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট আর্যসমাজীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাঙালি ব্রাহ্মণদের তুলনায় এঁদের ব্রাহ্মণত্বের গৌরব বেশি।

পৈতে ধারণ বা পরিত্যাগের প্রশ্নটিই ছিল ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। এখন অন্য দুটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে উপনয়ন অনুষ্ঠানই হয় না। হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রাহ্মরা এক নতুন ধর্মের কথা বলেছেন, সেখানে জাতিভেদের কোনও স্থান থাকার কথা নয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ এখনও পুরনো অনেক প্রথাই আঁকড়ে ধরে আছে। শুধু মূর্তিপূজা ছাড়া হিন্দুত্বের আচার-আচরণ থেকে তাদের আর বিশেষ প্রভেদ নেই। রবি ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব মনে মনে স্বীকার করেন না। বিসর্জন নাটকে তাঁর স্পষ্ট সহানুভূতি গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি, তাঁর মুখ দিয়ে ক্ষমতালোভী, দর্পিত ব্রাহ্মণ রঘুপতি সম্পর্কে বলিয়েছেন :

এ সংসারে বিনয় কোথায় ? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা।
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার !

তবু পিতার নির্দেশ এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে সে সমাজের নীতি তিনি লঙ্ঘন করতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ উদার হস্তে টাকা বরাদ্দ করেছেন, মহা ধুমধামের সঙ্গে হল সেই উপনয়ন। কিশোর রথীর মস্তক মুণ্ডন করিয়ে পরিয়ে দেওয়া হল গেরুয়া বসন, দুই কানে সোনার কুণ্ডল। পুরোহিতরা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল, বেদীতে বসে রবি বেদগান গাইলেন। তারপর রথী একটা বেলগাছের ডালের দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সকলের কাছে গিয়ে মঞ্জু কণ্ঠে বলতে বলল, ভবান ভিক্ষাং দেহি।

যেন প্রাচীন ভারতের এক আশ্রমের দৃশ্য।

নতুন ব্রহ্মচারীটিকে এরপর তিনদিন বাকসংযম করে নিরালা কক্ষে কাটাতে হয়, এইসময় কোনও অব্রাহ্মণের মুখ দর্শনও নিষিদ্ধ। ভিক্ষালব্ধ চাল-ডাল-আলু-বেগুন ফুটিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কিছু খেতেও নেই। সারাদিন বেদপাঠ ও গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে আত্মস্থ হতে হবে।

অন্যান্য অতিথিদের জন্য অবশ্য খাওয়াদাওয়ার অঢেল ব্যবস্থা। এপ্রিল মাসের শান্তিনিকেতনে বেশ গরম, দুপুরের বাতাসে যেন আগুনের হলকা ছোটে, তবু এক একদিন কালবৈশাখি ঝড় ওঠে, দিগন্তবিস্তারী সেই ঝড়ের রূপ কলকাতায় বসে তো দেখা যায় না। প্রকৃতির সেই তাণ্ডবের মধ্যেও ফুটে ওঠে এক মাদক সৌন্দর্য, অন্য সবাই দরজা-জানলা বন্ধ করে সেই সময় ঘরে বসে থাকলেও রবি বেরিয়ে আসেন বাইরে, দিনের বেলাতেও কালো হয়ে আসে আকাশ, মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে উড়ে যায় শূন্য দিয়ে, রবি তখন প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে যান।

এক একটা ঝড়ের পর তাপ কমে যায় বেশ কয়েকদিন, তা ছাড়াও রবি গ্রীষ্মের দাহতে কষ্ট পান না। সব কটি ঋতুই তাঁর ভাল লাগে। তিনি ঠিক করলেন, এখন কিছুদিন শান্তিনিকেতনেই কাটিয়ে যাবেন। অন্তত তাঁর জন্মদিন পর্যন্ত।

কিন্তু তা হল না, কলকাতা থেকে এল দুঃসংবাদ।

কলকাতায় এবার ছড়িয়েছে প্লেগ। মহারাষ্ট্র-গুজরাতে প্লেগের তাণ্ডব চলেছে অনেক দিন। এখানেও খুচরো-খাচরা সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল ইতিমধ্যে। এবারে তা সত্যিই সংক্রামক হয়ে পড়ল। পিতৃদেব আছেন পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে, জোড়াসাঁকোয় কার কী অবস্থা কে জানে, সকলের জন্য উদ্বিগ্ন

হয়ে উঠলেন রবি। শান্তিনিকেতনে তাঁর লেখার হাত বেশ খুলেছিল, সব পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরতে হল কলকাতায়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের রেখে এলেন ওখানে।

হাওড়ার সেতু পার হতে হতে তিনি দেখলেন এক বিচিত্র চলচ্ছবি। দলে দলে মানুষ উদভ্রান্ত, ভয়ার্ত মুখে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে রবির মনে পড়ল রোমিও-জুলিয়েট নাটকের একটি অংশ। অভিশপ্ত প্রেমিক-প্রেমিকা রোমিও-জুলিয়েটকে সাহায্য করছিলেন যে পাদ্রি লরেন্স, তিনি পলাতক রোমিও'র কাছে জুলিয়েটের সংবাদ দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠি রোমিও'র কাছে পৌঁছল না, কারণ ইতিমধ্যে প্লেগ শুরু হয়ে গেছে ইটালির কয়েকটি শহরে, পত্রবাহক যে বাড়িতে ছিল, সেই বাড়িতেই একজন লোক প্লেগাক্রান্ত হওয়ায় সন্ত্রস্ত নগরবাসীরা সে বাড়ির দরজা জানলা সব বাইরে থেকে আটকে দিয়ে কারুকেই বেরুতে দিল না।

Where the infections Pestilence did reign,
Sealed the door, and would not let us froth;

সেই মধ্যযুগ থেকে অবস্থা প্রায় বিশেষ কিছুই বদলায়নি। এক একটা ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়িতে আট-দশজন লোক ঝুলছে, পাল্কিগুলো সব ভর্তি। অনেক লোক গাড়ি না পেয়ে হনহন করে ছুটছে নিজেদের মোট মাথায় নিয়ে, ভদ্রঘরের মহিলারা পর্যন্ত ত্রাসে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে।

হাওড়ার দিকে যাচ্ছে অবাঙালিরা, আর শিয়ালদার দিকে প্রাণপণে ছুটছে পূর্ববঙ্গের মানুষ। ছ' আনা-আট আনার ভাড়ার গাড়ি এখন ছ' টাকা-আট টাকা হাঁকছে। শহর জুড়ে বিশৃঙ্খলা। যে সব মানুষের কলকাতা ছেড়ে আর কোথাও আশ্রয় নেই, যাদের কোনও 'দেশের বাড়ি' নেই, তাদের ভীত চকিত অবস্থা।

রবির ভয় হতে লাগল। এতটাই অবস্থা খারাপ নাকি? অনেক সময় রোগের চেয়েও আতঙ্ক বেশি ছড়ায়। রোগে যত না মানুষ মরে, তার চেয়ে বেশি মরে ভয়ে কিংবা বিনা চিকিৎসায়।

প্রথমে বাড়িতে না গিয়ে রবি সোজা গেলেন পার্ক স্ট্রিটে, সেখানে পিতাকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে মেজবউঠান ও ইন্দিরার খবর নিলেন, সে বাড়িতে তখন এমন আড্ডা ও গান-বাজনা চলছে যেন মনে হয় কেউ প্লেগের কোনও খবরই জানে না। পিয়ানো বাজাচ্ছে ইন্দিরা, তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই ভাই, যোগেশ আর প্রমথ। ইন্দিরা আর প্রমথর মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, কিন্তু ইদানীং তার দাদা যোগেশেরই যেন ইন্দিরার প্রতি আকর্ষণ বেশি মনে হয়।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিজের সংসারের কেউ নেই, তবু রবি সেখানেই ফিরে গেলেন। জ্ঞানদানন্দিনী থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু এই প্রথম রবি সেখানে থাকার জন্য উৎসাহ বোধ করলেন না। যুবকেরা ইন্দিরাকে ঘিরে আছে, এখন রবিকা'র সঙ্গে বিশেষ কথা বলার ফুরসত পাবে না সে। সেও তো রবিকাকে থেকে যাবার জন্য পেড়াপিড়ি করল না তেমন। রবি বুঝতে পেরেছেন, এবার ইন্দিরাকে দূরে সরে যেতেই হবে। জ্ঞানদানন্দিনী মেয়ের বিয়ের জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্লেগ রোগের উপদ্রব অশিক্ষিত, গরিবদের বস্তি এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে প্রধানত। মধ্যবিত্ত ও ধনীরা ত্রস্তব্যস্ত হয়ে পড়ে আগে থেকেই নানারকম প্রতিষেধকের ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু গরিবরা যে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিও জানে না। মৃত্যু তাদের কাছে নিয়তি। গরিবরা এই রোগে আক্রান্ত হলে ভদ্রলোকেরা ও সরকার যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তার কারণ গরিবদের প্রতি দরদ নয়। ওই সব বস্তি থেকে রোগের জীবাণু যাতে পাকা বাড়ি ও ইমারতের বাসিন্দাদের মধ্যে না ছড়ায়, সেই চিন্তা।

দামোদর চাপেকরদের পুণায় ফাঁসি হলেও তাদের আত্মা যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল কলকাতায়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকদিন পর।

বাংলার সরকার প্লেগের বিস্তার ঠেকাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বস্তিগুলোতে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করল। রোগ হয়েছে কি হয়নি, যার তিন দিন আগে জ্বর হয়েছিল এমন লোককেও জোর করে টেনে নিয়ে যায় হাসপাতালে। উপার্জনশীল পুরুষদের সরিয়ে নিলে তার পরিবারের সবাই যে অনশনের সম্মুখীন হয়, তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? দরিদ্র ব্যক্তিদের কাছে

অনশনের চেয়ে বেশি ভয়াবহ আর কোনও রোগ হতে পারে না। কিন্তু পুলিশ এসে অত্যাচার করলে তারা শুধু কাঁদতে জানে, প্রতিবাদ জানাবার সাহস তাদের নেই। অত্যাচারীর পা জড়িয়ে ধরে তারা দয়া চাইতে গিয়ে পদাঘাত পায়।

একদিন বেলেঘাটায় এক বস্তিতে পুলিশবাহিনী যখন লাঠি দিয়ে ঘর বাড়ি ভাঙছে, সেই সময় সেখানে উপস্থিত হল একদল যুবক। সদ্য গৃহহীন যারা মাটিতে আছড়ে পড়ে কান্নাকাটি করছিল তাদের রূঢ়ভাবে সরিয়ে দিয়ে সেই যুবকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বড় বড় ইঁটের টুকরো ছুঁড়তে লাগল পুলিশের দিকে।

পুলিশরা হকচকিয়ে গেল প্রথমটায়, কয়েকজনের মাথা ফাটল, কয়েকজন মাটিতে পড়ে গেল। কোথাও এরকম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। ওদিক থেকে ইঁট-বর্ষণ হচ্ছে বৃষ্টিধারার মতন। তারপর পুলিশরা লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসতেই যুবকরা অন্তর্হিত হয়ে গেল চোখের নিমেষে। একটু বাদেই তারা ফিরে এল। এবার সঙ্গে বড় বড় পাথরের টুকরোও নিয়ে এসেছে। অতর্কিতে অনেক কাছে এসে পড়ে মারতে লাগল পুলিশদের।

এবারে পুলিশ সার্জেন্টের হুকুমে চালানো হল কয়েক রাউন্ড গুলি। ছুটোপাটি-ছোটাছুটির মধ্যে গুলিবর্ষণ ও ইট ছোঁড়ার ফলে আহত হয়ে পড়ে গেল দু'জন যুবক, অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরাধরি করে নিয়ে গেল আড়ালে। হঠাৎ ফিরে এল এক তরুণ, হাতে তার একটা বড় ঢেলা, ইংরেজ পুলিশ সার্জেন্টটি পিস্তল তোলার আগেই সে ঢেলাটি ছুঁড়ে সার্জেন্টের কপাল ফুটো করে দিল। তার অকুতোভয় মুখ দেখে মনে হল, তার কাছে পিস্তল থাকলে সে গুলি চালাতে দ্বিধা করত না, বোমা থাকলে তাই ছুঁড়ে মারত।

পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে সরে পড়ল সেই ছেলেরা, ধরা দিল না কেউ। শুধু তাই নয়, পরে শোনা গেল এই একই দিনে, প্রায় একই সময়ে খিদিরপুরে, বাগবাজারে, মানিকতলায় কোথা থেকে যুবকের দল এসে পুলিশকে আক্রমণ করে গেছে। মানিকতলায় একজন ইংরেজ পুলিশের গায়ে তলোয়ারের কোপ পড়েছে। বউবাজারে, পুলিশ নয়, একদল ইওরোপীয়র সঙ্গে হঠাৎ এসে মারপিট করে গেছে একদল দিশি ছেলে।

এরা কারা? শহরের লোকজনরা কিছু বুঝতেই পারল না, কংগ্রেসের নেতারাও দিশাহারা। পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, কংগ্রেসের এরকম নীতি নেই, বরং কংগ্রেস এর ঘোর বিরোধী। কংগ্রেস ছাড়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কে নেবে? কলকাতা শহরে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ দলও নেই, তবে এরা কোথা থেকে এল? হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে একদল যুবক পথে নেমে পড়েছে?

পরদিন পুলিশবাহিনী প্রতিশোধ নিতে পথে যে-কোনও এক দঙ্গল যুবক দেখলেই লাঠি পেটা করতে লাগল, দাঙ্গা বাধার উপক্রম হল। সৌভাগ্যের বিষয়, তা বেশি দূর গড়াল না। সরকার মহারাষ্ট্রের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না বাংলায়। পুলিশবাহিনী ও স্থানীয় ইওরোপীয়দের সংযত হতে বলা হল, প্লেগ নিরোধের নামে অত্যাচার বন্ধ করে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে প্রচার করা হতে লাগল। বৃষ্টি শুরু হবার পর প্লেগের প্রকোপও কমে গেল অনেক।

এর মধ্যেই মৃণালিনী পুত্র-কন্যাদের নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসেছেন জোড়াসাঁকো। একদিন বেলা এগারোটায় রবি যখন 'ভারতী' পত্রিকার জন্য লেখাপত্র সাজাতে বসেছেন, অকস্মাৎ মৃণালিনী সে ঘরে প্রবেশ করে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

রবি মুখ তুলে তাকালেন। মৃণালিনীর চুল খোলা, আঁচল খসে পড়েছে, দু' চক্ষে টলটল করছে কান্না। মুখমণ্ডলে ঝড়ের পূর্বাভাস।

মৃণালিনী বললেন, তোমার অনেক কাজ আমি জানি। সব সময় ব্যস্ত। তুমি এখানে যাও, সেখানে যাও, পৃথিবীর আর সবার জন্য তোমার সময় আছে, আমি কি তোমার স্ত্রী হয়ে দুটো কথা বলারও সময় পাব না?

স্ত্রীর মেজাজ শান্ত করার চেষ্টায় রবি হেসে বললেন, কেন সময় পাবে না? তোমার জন্য আমি সব কাজ সরিয়ে রাখতে পারি। ওই কুরসিটাতে বসো, তারপর বলো।

বসলেন না মৃণালিনী, রাজ্যের অভিমান ভরা কণ্ঠে বললেন, তোমাদের এ বাড়িতে আমি আর থাকব না। একদিনও থাকব না।

রবি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, এ বাড়ি কী করে তোমার অযোগ্য হল?

মৃণালিনী বললেন, এ তোমাদের বড় মানুষের বাড়ি। এখানে আমাকে মানায় না। আমি গেঁয়ো মেয়ে। এতদিন হয়ে গেল, তবু অনেকেই এখানে আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলে। আড়ালে আবডালে ফিসফিস করে, আমি শুনতে পাই, আমি নাকি ঘর সাজাতে জানি না, সর্বক্ষণ রান্নাঘরে থাকলেই আমাকে মানায়, অর্থাৎ আমি শুধু রাঁধুনি... একমাত্র বলু ছাড়া আর কেউ নিজে থেকে আমায় ডেকে একটাও ভাল কথা বলে না, এখানে আমি কেন থাকব?

রবি ধীরস্বরে বললেন, ভাই ছুটি, তুমি কাঁদছ, তা আমারও বুকে বাজছে। তুমি স্থির হয়ে একটু বসো, সব কথা শুনি। এত বড় পরিবারে নানারকম মানুষ থাকবেই।

মৃণালিনী বললেন, আমি আর কিছু শুনতে চাই না। আর এক দণ্ডও আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। তুমি আজই ব্যবস্থা করো।

রবি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সংসারে এক একটা তীব্র সমস্যার করাঘাত যে অকস্মাৎ কখন কোন দিক দিয়ে আসে তার ঠিক নেই। একটা নতুন গানের সুর তাঁর মাথার মধ্যে গুনগুন করছিল, তা কোথায় মিলিয়ে গেল। জীবন শুধু কাব্য আর সঙ্গীতে মগ্ন থাকতে পারে না। কবিকেও প্রায়ই তুচ্ছ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়।

তিনি একটুও ধৈর্য না হারিয়ে বললেন, তোমরা শান্তিনিকেতন থেকে হন্তদন্ত হয়ে চলে এলে কেন? ওখানে এখন বর্ষা নেমেছে, ভুবনডাঙার সারা আকাশ জুড়ে মেঘ জমে থাকে, খোয়াইতে ছুটে যায় কত শত কলকল ধারা, এই সময় কেয়া ফুল ফোটে, ওখানে তোমাদের মন টিকল না?

মৃণালিনী বললেন, আমি শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়ে থাকব, আর তুমি থাকবে এখানে? বৃষ্টি-বাদলা দেখতে দু'একদিনই ভাল লাগে, দিনের পর দিন কারুর ভাল লাগে না। তুমি আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাও?

রবি বললেন, তেমন কথা আমি কখনও ভাবি না। তবু আমাকে তো কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতেই হয়। মাঝে মাঝে যাব তোমাদের কাছে।

মৃণালিনী বললেন, ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে না? শান্তিনিকেতনে ধারে কাছে কোন ইস্কুল আছে? রথী, বেলীরা কত বড় হল, তুমি ওদের কোনও ইস্কুলে দিলে না। রথী শুধু সংস্কৃত আওড়ায়, তাতেই চলবে? ওর বয়েসী ছেলেরা ইংরিজি শেখে। তুমি কত বড় বিদ্বান, কত কিছু জানো, তোমার ইচ্ছে হয় না ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে তাদের সে সব শেখাতে? ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গ পায় কতটুকু!

রবি এবারে কিছুটা ব্যাকুলভাবে বললেন, আমি ওদের সঙ্গে থাকতেই তো ভালবাসি। ওদের মুখের হাসি, ওদের প্রত্যেকটি কথা আমার বুক জুড়িয়ে দেয়।

মৃণালিনী বললেন, তুমি ওদের ভালবাস, মাঝে মাঝে ওদের কোলে নিয়ে আদর করো। ব্যস, ওইটুকুতেই কর্তব্য শেষ! ওদের বুঝি ইচ্ছে করে না, বাবাকে ঘিরে পড়তে বসবে। বাবা ওদের গান শেখাবেন। শোনো, এ বাড়ির পরিবেশে ছেলেমেয়েরাও মানুষ হবে না। তুমি অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া নাও। মেজ-বউঠান যদি বরাবর পৃথক বাড়িতে থাকতে পারেন...

রবি একটুক্ষণ নীরব রইলেন। মৃণালিনীর কথার মধ্যে অপমানবোধ ও বেদনা মিশে আছে। এ বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই তাঁকে বেশ আঘাত দিয়েছে। কিন্তু এ-বাড়ি ছেড়ে যাবেন কোথায়? অন্য দুই দাদা প্রায়ই শখ করে দক্ষিণ শহরে বাড়ি ভাড়া করে থেকেছেন। রবির তেমন টাকার জোর নেই। বলেন্দ্রর সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে অনেক টাকা লগ্নি হয়ে গেছে। বাজারে ধার মেটাতে আবার অন্যের কাছ থেকে ধার করতে হয়েছে, তার আবার সুদ আছে। পুরীতে একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছে আছে, শস্তায় মাত্র তিন হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, সে টাকাও জোগাড় করতে হবে।

হঠাৎ একটা সমাধান তাঁর মনে এল। সপরিবারে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি গিয়ে থাকা যায়। অতি

প্রশস্ত, সুন্দর বাসস্থান আছে। শিলাইদহ তাঁর নিজেরও খুব পছন্দ। শান্তিনিকেতনে বাৎসরিক উৎসব ছাড়া অন্য সময় কোনও কাজ থাকে না, শিলাইদহে আস্তানা গেড়ে আশেপাশের জমিদারি পরিদর্শনের কাজও হবে। সেখানে অবসরও অঢেল, সেই সময়ে তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াবেন। ইস্কুল-পাঠশালার পড়াশুনোর ওপর তাঁর ভক্তি নেই, ওদের ইংরিজি শেখাবার জন্য সাহেব মাস্টার রাখা যেতে পারে। মাঝে মাঝে দু'চারদিনের জন্য কলকাতায় ঘুরে গেলেই চলবে।

আরও একটা সুবিধে এই যে তাঁর শিলাইদহে অবস্থান জমিদারির কাজ হিসেবেই গণ্য হবে এবং সংসারের খরচাপত্রও পাওয়া যাবে সেরেস্তা থেকে।

রবি উঠে এসে মৃণালিনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি আর চিন্তা কোরো না, কটা দিন সময় দাও। তোমাদের আমি খুব ভাল জায়গায় রাখব, আমিও থাকব তোমাদের সঙ্গে।

মৃণালিনী শশব্যস্তভাবে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, এক্ষুনি এখানে কেউ এসে পড়বে। লোকজনদের তো আর আক্কেল নেই!

শিলাইদহে পুরনো কুঠিবাড়িটি নদীগর্ভে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় সেটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার আগে কিছু কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। এরমধ্যে রবিকে একবার ঢাকায় যেতে হল কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে। সেখান থেকে তিনি বেশ নিরাশ হয়েই ফিরলেন। ভূমিকম্প সত্ত্বেও নাটোরের অধিবেশন বেশ জমজমাট হয়েছিল। কিন্তু ঢাকায় সব কিছুই কেমন যেন নিষ্প্রাণ। এবারে প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক কম, স্থানীয় জমিদারও অনেকেই আসেননি। বিশালভাবে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল, তার অনেক কিছুই কাজে লাগেনি, বহু অর্থ নষ্ট হয়েছে। মহারাষ্ট্রের ঘটনা এখানেও ছায়া ফেলেছে। যাঁরা আসব বলেও এলেন না, তাঁরা সব ভয় পেয়ে গেছেন? সরকারের ধর-পাকড় ও দমননীতি দেখেই অনেকের হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে।

ঢাকা থেকে শিলাইদহে ফিরে বাড়িটিকে ঝাড়পোঁছ করিয়ে, সব ব্যবস্থাপত্র সেরে রবি মৃণালিনীদের আনবার জন্য রওনা হলেন কলকাতার দিকে। বজরায় নাগর নদী-পথে আত্রাই স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। সন্ধের পর একটু একটু ঝড় উঠল, বজরা বেশ দুলছে, কিন্তু রবি আজ আর ঝড় দেখছেন না, দাঁড়ি-মাঝিদের কথাবার্তাতেও মন নেই। তাঁর মনে পড়ছে অন্য কথা।

ঢাকায় বিশিষ্ট কংগ্রেস প্রতিনিধিদের একটি স্টিমার পার্টিতে আপ্যায়িত করা হয়েছিল, অঢেল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, ভাগ্যকুলের রাজাদের বাড়ির একটি ছেলে গানও শোনাচ্ছিল। সেই গানবাজনার মাঝখানেই একটি যুবক উত্তেজিত ভাবে বলতে শুরু করল, কংগ্রেস মানে কি শুধু বক্তিমে, খানা-পিনা আর আড্ডা? এতে দেশের কী কাজ হবে বলতে পারেন? এসব কী হচ্ছে? কেন আমরা আমরা এখানে ফুর্তি করছি। সারা দেশে, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, সাহেবদের অত্যাচার, তবু আমরা হাত গুটিয়ে থাকব?

হঠাৎ সে রবির দিকে ফিরে বলেছিল, কবি, আপনি কিছু বলুন, আপনি আমাদের পথ দেখান। আপনার 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' বলে একটা কবিতা পড়ছি:

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি পিছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ...

সব কটা অধিবেশনের বক্তৃতায় তো সেই ভিক্ষেরই সুর। দেখুন না, এখানেও অনেকে ইংরেজের অনুকরণে সুট-টাই পরে আছে এই গরমেও। 'যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে মাতঃ, কী দিবে সম্মান?' দেশ জননী কাঁদছে, এরা কি তা শুনতে পায় না? আপনি বলুন?

যুবকটি এমনই উচ্চকণ্ঠে ক্ষোভ জানাচ্ছিল যে অনেকেই ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। রবি এসব তর্ক-বিতর্কে অংশ নিতে চান না। তাঁর মতামত তিনি শুধু লেখায় প্রকাশ করতে পারেন। তবু ছেলেটির পেড়াপিড়িতে তিনি মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, দেশবাসীকে সচেতন করাই এখন প্রধান কাজ।

বিদেশি প্রভুরা আমাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেবে না, আমাদের আত্মশক্তিতে উঠে দাঁড়াতে হবে, সব অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

যুবকটি বলেছিল, আত্মশক্তি মানে কী? দেশের মানুষ এমনি এমনি জাগে না। তাদের আঘাত দিয়ে জাগাতে হয়। এ-দেশের কোটি কোটি মানুষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সচেতন করতে আরও একটা শতাব্দী কেটে যাবে। ততদিন আমরা সহ্য করব?

রবি বলেছিলেন, অন্য আর কী পথ আছে? আগে দেশকে মা বলে চিনতে হবে, সেই মায়ের ডাক সন্তানদের কানে পৌঁছবেই।

ছেলেটি অস্থির ভাবে বলল, মারাঠা ছেলেরা ইংরেজদের ওপর আঘাত দিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আমরা পারি না? ইংরেজ দু'চারজনকে ফাঁসি দিতে পারে, কিন্তু যারা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েছে তারা আমাদের কাছে প্রকৃত বীরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে। এখন এইভাবে দেশের কাজে আত্মদানের জন্য আমাদের তৈরি হওয়া দরকার। শুধু বক্তৃতায় কিছু হবে না।

রবি অসম্মতিতে মাথা নেড়েছিলেন। তখন কয়েকজন কর্মকর্তা ছেলেটির কাছে এসে রূঢ়ভাবে বললেন, গানের মাঝখানে তুমি হট্টগোল করছ কেন? তোমার যা বলার তা কালকের ওপেন মিটিং-এ বলবে।

তাঁরা ঠেলতে ঠেলতে যুবকটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। অপমানিত হয়ে প্রতিবাদে সে তখনই একটা চলন্ত নৌকো ডেকে নেমে গেল স্টিমার থেকে। ওইভাবে ছেলেটিকে সরিয়ে দেওয়া রবির পছন্দ হয়নি। তিনি বেদনা বোধ করেছিলেন।

সেই ঘটনা ভাবতে ভাবতে রবির কলমে কবিতা ভর করল। এই ভাবেও ছেলেটিকে উত্তর দেওয়া যায়:

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাকো জননী
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে
আঁধারে ঘিরিছে ধরণী।
ডাকো 'চলে আয়, তোরা কোলে আয়'
ডাকো সকরুণ আপন ভাষায়
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়
বেজে উঠে শিরা ধমনী,
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়
সচকিয়া উঠে অমনি...

৪২

নৈনিতাল থেকে ঘোড়ার পিঠে যাত্রা শুরু হল। ভোর-ভোর বেরুতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সকালের দিকে বৃষ্টি পড়েছিল কিছুক্ষণ, তারপর খেতড়ির রাজ পরিবারের লোকজন মধ্যাহ্নভোজ না করিয়ে ছাড়বেন না কিছুতেই। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার পর রাজকীয় ভোজ অবশ্য ভালই লেগেছিল, স্বামীজির জন্য আলাদা ভাবে প্রচুর ঝাল দিয়ে নানা ব্যঞ্জন রান্না করা হয়েছিল। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার ও তরল রুপোর মতন রোদ দেখা দিতেই স্বামীজি সকলকে তাড়া দিয়ে বললেন

চলো, চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে! পথে রাত হয়ে যাবে, সেই জন্য রাজবাড়ির লোকেরা আর একটি দিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, স্বামীজি তাতে কর্ণপাত করলেন না।

অনেক লোকজন এবং প্রচুর লটবহর। চারজন শ্বেতাঙ্গিনী, নিবেদিতা, জয়া ও ধীরামাতা ছাড়াও এঁদের সঙ্গে এসেছেন কলকাতার আমেরিকান কনসালের পত্নী শ্রীমতী প্যাটারসন। এই রমণীটি স্বামীজির পূর্ব পরিচিতা। আমেরিকায় একবার এক শহরে স্বামী বিবেকানন্দকে সব হোটেলেই তাঁর গায়ের রঙের জন্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তখন ইনি তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে জন্য এঁকে এঁর আত্মীয়স্বজনের কাছে নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছিল। ঘটনাক্রমে স্বামীর সঙ্গে এখন ইনি কলকাতায় থাকেন, স্বামীজির সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করেছেন এবং হিমালয় অভিযানের কথা শুনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এঁরা ছাড়াও রয়েছেন যোগীন মা, তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ।

বিদেশিনীরা সবাই ঘোড়ায় চড়তে জানেন, স্বামীজিও জানেন, অন্য গুরুভাইরা কখনও ঘোড়ায় চাপেননি। এই পার্বত্য পথে ঘোড়া ছাড়া আর একমাত্র যানবাহন ডান্ডি তার খরচ অনেক বেশি। গুরুভাইদের মধ্যে স্বরূপানন্দের ক্ষীণ দুর্বল চেহারা, তিনি ঘোড়ায় চাপতেই ভয় পান, তিনি পায়ে হেঁটে যাবেন ঠিক করলেন। যোগীন মা বললেন, আমি বাপু ঘোড়া-টোড়ায় উঠতে পারব না মানুষে বওয়া ডান্ডিরও দরকার নেই, আমিও হেঁটেই যাব। জয়া অর্থাৎ জোসেফিন ম্যাকলাউডের সারাদিন জ্বর জ্বর ভাব, আগের রাত্রে ঘুম হয়নি, স্বামীজি তাঁর জন্য ঘোড়ার বদলে ডান্ডির ব্যবস্থা করলেন।

দলে আর একজন সদস্য বেড়েছে, স্বামী প্রেমানন্দ এসেছেন আলমোড়া থেকে, ওঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। প্রেমানন্দর পূর্বাশ্রমের নাম বাবুরাম, নরমসরম স্বভাব, কাশীপুরের বাগানে থাকার সময় গুরুভাইদের কেউ কেউ তাকে ক্ষেপাবার জন্য বলত, তোর তো প্রকৃতি ভাব রে!

যাত্রার সময় বিবেকানন্দ তাঁকে বললেন, এই রেমো, তোর ল্যাকপেকে চেহারা, তুই ঘোড়ায় যেতে পারবি না! হেঁটে যা!

প্রেমানন্দ বললেন, না রে নরেন, আমি পারব! বাঃ, আলমোড়া থেকে এসেছি না!

বিবেকানন্দ বললেন, সত্যি, তুই কী করে যে এলি, তোর চোদ্দো পুরুষের পুণ্যির জোর আছে! তা কোনও রকমে এসেছিস, আর কেরদানি দেখাবার দরকার নেই। চল, আমিও না হয় হাঁটব তোর সঙ্গে।

প্রেমানন্দ শুনলেন না, তিনি দু'জন মালবাহকের কাঁধে ভর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন। শুরু হল বিচিত্র এক শোভাযাত্রা। শ্বেতাঙ্গিনীরা উত্তম সাজপোশাক পরেছেন, প্রসাধনও তাঁদের পোশাকেরই অঙ্গ, দামি দামি সুটকেশ বইছে মালবাহকেরা। আর সঙ্গের সন্ন্যাসীদলের মুণ্ডিত মস্তক, অঙ্গে মলিন গেরুয়া, মালপত্রের মধ্যে শুধু একটি করে পুঁটুলি আর কমণ্ডলু।

চড়াই পথ, আস্তে আস্তে উঠছে ঘোড়াগুলো। জো ম্যাকলাউডের ডান্ডি চলেছে আগে আগে, বিবেকানন্দ ঘোড়া নিয়ে চলেছেন পদযাত্রীদেরও পেছনে। পথের শোভা অতি সুন্দর, আবার বিপজ্জনকও বটে। বাঘ-ভল্লুকের উপদ্রবের কথা শোনা যায়, এত মানুষজন দেখলে তারা হয়তো কাছে আসবে না, আবার বলাও যায় না। অনেক সময় একেবারে শেষের লোকটিকে বাঘ নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যায়।

কলকাতায় কিছুতেই বিবেকানন্দর শরীর ভাল থাকছে না। প্রায়ই জ্বর ও পেটের পীড়া হয়। শরীরের এই অবাধ্যপনায় তিনি নিজেই বিরক্ত। মাত্র কয়েকটা বছর বিদেশে ছিলেন, এখন দেশের জল-বাতাস তাঁর সহ্য হবে না কেন? কলকাতা ছেড়ে ঠাণ্ডা কোনও জায়গায় গেলে ভাল থাকেন। মাঝখানে শরীর এত খারাপ হয়েছিল যে, বেলুড়ে নিবেদিতা ও অন্য দুজন বিদেশিনীকে রেখে তাঁকে ডাক্তারের পরামর্শে আবার দার্জিলিং চলে যেতে হয়েছিল। কিছুদিন পর কলকাতায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের খবর শুনে হুড়োহুড়ি করে নেমে এসেছিলেন পাহাড় থেকে। ওই রমণীরা তাঁর টানে এদেশে এসেছে, তাদের যেন কোনও বিপদ না হয়।

শুধু তাই নয়। কলকাতায় ফিরে স্বামীজি মিশনের ছেলেদের নিয়ে সেবা কাজে মেতে উঠলেন। দীক্ষিত সন্ন্যাসীদের পাঠাতে লাগলেন বিভিন্ন বস্তিতে। রামকৃষ্ণের নামে মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর বলা যেতে পারে, এটাই তাঁদের প্রথম কাজ। অনেকে এর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। হিন্দুদের মধ্যে গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে পরোপকারের কোনও রীতি নেই। বেশির ভাগ হিন্দুই অতিথিপরায়ণ, তার বাড়িতে কেউ আশ্রয় নিলে তার খুবই সেবাযত্ন করবে, কিন্তু পথের ধারে কোনও অসহায় রুগ্‌ণ ব্যক্তিকে দেখলে ভাববে, সেটা ওর নিয়তি। আর সাধু-সন্ন্যাসীরা ভক্তদের কাছে পাদ্যার্ঘ্য নেবে, তাদের স্পর্শ করারও অধিকার নেই সাধারণ লোকের, এরকমই এতদিন ধরে সবাই দেখতে অভ্যস্ত। এখন এই নব্য সাধুরা জাতি-ধর্ম, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিচারে দরিদ্র-আতুরদের সেবা করতে নেমেছেন, এ দৃশ্য অভিনব। দরিদ্র মানুষদের মধ্যেও যে নারায়ণ আছেন, এটা ছিল এতদিন কথার কথা, বিবেকানন্দ সেই নারায়ণ সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন সকলকে।

খ্রিস্টানদের কাছে এই ধরনের কাজ খুব স্বাভাবিক, তাই নিবেদিতা বিবেকানন্দের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্বামীজিরা অনেকে সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে এই কাজের সম্পর্ক কী ? মহামারী প্রতিকারের দায়িত্ব তো সরকারের ! রামকৃষ্ণ মিশন একটা নতুন সংস্থা, তার সাধ্য কতখানি ! রোগীদের ওষুধ-পত্রের জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা দরকার, তাই বা পাওয়া যাবে কোথায় ? গুরুভাইদের বোঝাতে বোঝাতে এক এক সময় বিবেকানন্দর ধৈর্যচ্যুতি হত, তিনি ধমক দিয়ে বলতেন, মানুষ মরছে, এখন ধর্মের কথা মাথায় থাক ! আর টাকা-পয়সা, যদি শেষ পর্যন্ত না জোটাতে পারি, তা হলে মঠের জন্য বেলুড়ে যে জমি কেনা হয়েছে, সেটা বেচে দেব ! কী হবে মঠ তুলে ?

প্লেগ রোগ তেমন ব্যাপক আকার ধারণ করল না বলে ওই জমি বিক্রি করতে হল না, সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কয়েকদিনের অনিয়ম ও রাত্রি জাগরণে বিবেকানন্দর শরীর আবার দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি ঠিক করলেন কিছুদিন আলমোড়ার সেভিয়ার দম্পতির কাছে কাটিয়ে আসবেন। বিদেশিনী ক'জনও এ দেশ ভ্রমণে খুব আগ্রহী, তাঁরাও সঙ্গী হলেন, গুরুভাইরাও এসেছেন কয়েকজন। কাঠগুদামে ট্রেন থেকে নামবার পর থেকেই বিবেকানন্দ বেশ সুস্থ বোধ করছেন। এখন এই অপরাহ্ণে অশ্বপৃষ্ঠে যেতে যেতে তিনি অনুভব করলেন, যেন আবার তাঁর সেই দুর্জয় স্বাস্থ্য ও মনোবল ফিরে পেয়েছেন।

পাহাড়ে সূর্যাস্ত হয় আগে আগে, হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। নিবেদিতা দূরের বরফ ঢাকা এক একটি শৃঙ্গের ওপর শেষ-বিকেলের রক্তিমাভা দেখছেন মুগ্ধ হয়ে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর শিহরন হচ্ছে। এই হিমালয় ! পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়ের রাজা ? যতখানি কল্পনায় ছিল, হিমালয় যেন তার চেয়েও অনেক বিশাল ও মহান। হিমালয়ের ওপর দিয়ে নিবেদিতা চলেছেন তাঁর রাজার সঙ্গে। এখনও যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। হ্যাঁ, বিবেকানন্দ কারুর কাছে গুরু, কারুর কাছে সন্তানবৎ, কিন্তু নিবেদিতার কাছে তিনি রাজা।

আঁধারে ছেয়ে গেছে দিকদিগন্ত, আকাশে একটি দুটি তারা ফুটি ফুটি করছে। মালবাহকেরা জ্বালিয়েছে মশাল, তারা কয়েকজন আগে আগে যাচ্ছে পথ দেখিয়ে। দু'পাশের বনরাজি থেকে ভেসে আসছে বুনো ফুলের সুগন্ধ। মাঝেমাঝে বাতাসে শোনা যাচ্ছে গাছের পাতায় শিরশিরানি। নিবেদিতা অনেকক্ষণ বিবেকানন্দকে দেখতে পাননি, তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য উতলা বোধ করলেন। যেখানে পথটি কিছুটা চওড়া, সেখানে তিনি তাঁর ঘোড়াটি সরিয়ে নিলেন এক পাশে। অন্যরা এগিয়ে গেল, একেবারে শেষে বিবেকানন্দকে দেখতে পেয়ে তিনি উৎফুল্ল স্বরে বললেন, আমার পরম সৌভাগ্য, আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। মনে হচ্ছে যেন আমরা অনন্তকালের যাত্রী, এ পথের কোনও শেষ নেই।

বিবেকানন্দ গম্ভীরভাবে বললেন, মনে হচ্ছে আজ আলমোড়ায় পৌঁছোনো যাবে না। পথে কোনও বাংলো পেলে থাকতে হবে।

নিবেদিতা বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে, এমন বিস্ময়কর পথে সারা রাত গেলেও আমরা ক্লান্ত

হব না। রাজা, এক একটা পাহাড়ের চূড়া দেখলে হঠাৎ মনে হয় না ধ্যানমগ্ন শঙ্করের মতন।

বিবেকানন্দ সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করে বললেন, তুমি এখানে থেকো না। সামনে চলে যাও।

নিবেদিতা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ? আমি আপনার পাশাপাশি থাকতে চাই।

বিবেকানন্দ বললেন, এটা ইওরোপ নয়, ভারতবর্ষ, এ কথা সব সময় মনে রেখো। মার্গট, এদেশের রীতিনীতি তোমায় মেনে চলতে হবে।

নিবেদিতা বললেন, আমি সে চেষ্টা সব সময় করছি। আপনি আমাকে মার্গট বলে ডাকছেন কেন, আমি এখন নিবেদিতা।

বিবেকানন্দ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, এখনও পুরোপুরি হওনি। এখনও ভেতরে ভেতরে তুমি ব্রিটিশ। ব্রিটেনের পতাকা, তোমার পতাকা।

নিবেদিতা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় খানিক দূরে একটি অশ্বের চিঁহিহি ও হুড়মুড় করে কিছু পতনের শব্দ হল। ওরা দু'জনে জোর কদমে এগিয়ে গেলেন।

স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কোঁ কোঁ শব্দে কাতরাচ্ছেন।

বিবেকানন্দ ধমক দিয়ে বললেন, রেমো, তখনই বলেছিলাম, তুই পারবি না। শালা, তুই শুনলি না ! ওঠ, ওঠ !

প্রেমানন্দ করুণভাবে বললেন, ওরে নরেন, আমার বোধহয় পা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নড়তে পারছি না।

বিবেকানন্দ আরও জোরে বললেন, নড়তে পারছি না। শালা, তোকে কি এখন আমি কাঁধে করে নিয়ে যাব ? বাপের জন্মে ঘোড়ায় চাপিসনি, তোকে কেরদানি দেখাতে কে বলেছিল ?

সমস্যাটি গুরুতর বটে। পাহাড়ি অশ্বগুলি খর্বাকৃতি, দু'জনে চাপা যায় না। প্রেমানন্দ হাঁটতে অক্ষম হলে তাঁকে কে বহন করে নিয়ে যাবে।

এই সময় জো ম্যাকলাউড নেমে এলেন ডান্ডি থেকে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তিনি বললেন, এটা কোনও সমস্যাই নয়। এই স্বামীজি আমার ডান্ডিতে চলুক, আমি এঁর ঘোড়ায় দিব্যি যেতে পারব।

বিবেকানন্দ বললেন, তা কী করে হবে। জো, তোমার গায়ে জ্বর !

ঝলমলে মুখে জো বললেন, পাহাড়ের স্নিগ্ধ হাওয়ায় আমার জ্বর একেবারে সেরে গেছে। ওই ঘেরাটোপের মধ্যে যেতেই আমার বরং অস্বস্তি হচ্ছিল।

তারপর জো তড়াক করে প্রেমানন্দের ঘোড়াটিতে লাফিয়ে উঠে বললেন, এতেই আমার যেতে ভাল লাগবে।

অন্যরা ধরাধরি করে প্রেমানন্দকে তুলে দিল ডান্ডিতে। আবার শুরু হল যাত্রা। জো হাসি-গল্পে সবাইকে মাতিয়ে রাখল। জো ম্যাকলাউডের যখন মর্জি ভাল থাকে, তখন সে হয়ে ওঠে অফুরান আনন্দের উৎস। এমনকী কুলি মজুরদের সঙ্গেও সে নিকট আত্মীয়ের মতন ব্যবহার করে।

মধ্যপথে এক ডাক বাংলোয় রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন মধ্যাহ্নে দলটি পৌঁছল আলমোড়ায়।

সেভিয়ার দম্পতি এখানে টমসন হাউস নামে একটি বাড়ি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিমালয়ের কোলে আলমোড়ার মতন এক একটি ছোট ছোট নির্জন, দৃষ্টিনন্দন স্থান ইংরেজরাই খুঁজে বার করেছে, এখানকার পাকা বাড়ি অধিকাংশই ইংরেজদের। ওকলি হাউস নামে আর একটি বাড়িতে চার বিদেশিনীর থাকার ব্যবস্থা হল।

দুই বাড়ির মধ্যে খানিকটা দূরত্ব আছে। সকালবেলা আর দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ হাঁটতে হাঁটতে ওকলি হাউসে চলে আসেন চা পানের জন্য। এঁদের একসঙ্গে দু'তিন কাপ চা পানের অভ্যেস, অনেকক্ষণ ধরে গল্প হয়। বেদ-উপনিষদ, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, কিছুই বাদ যায় না। বিবেকানন্দ কখনও গৌতম বুদ্ধের কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে যান, কখনও বলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা।

বিকেলের দিকে এক একদিন একসঙ্গে বেড়াতে বেরুনো হয়। হাঁটতে হাঁটতে জনপদ ছাড়িয়ে

অরণ্যে। দিগন্ত ছেয়ে আছে পাহাড়শ্রেণী, এমন নির্মল আকাশ যেন আর কোথাও দেখা যায় না।

বিবেকানন্দ গল্পচ্ছলে গভীর জ্ঞানের কথা বলেন, আবার হাস্য কৌতুকের কথাও এসে পড়ে মাঝে মাঝে। একদিন ভূত-প্রেতের কথা এসে পড়ল। স্বামীজি বিদেশিনীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কখনও ভূত দেখেছ ? সবাই দু'দিকে মাথা নাড়লেন, তাঁদের চোখেমুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস। বিবেকানন্দ হাসতে হাসতে বললেন, কেন, আমেরিকায় তো অনেক ভূত আছে। আমি নিজেও দেখেছি।

সবাই সচকিত হতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার একটি গল্প শোনালেন। আমেরিকাতে তিনি এক জায়গায় কিছুকালের জন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং নিজেই রান্নাবান্না করতেন। সেই বাড়িতেই থাকত শ্রীমতী উইলিয়ামসন নামে একটি মোটাসোটা চেহারার অভিনেত্রী আর একটি দম্পতি। এদের কারবার ছিল লোকের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তাদের ফরমায়েশ মতন ভূত নামানো। স্বামীজি মাঝেমাঝে ওদের এই বুজরুকি কাণ্ডকারখানা উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতেন। একদিন এল একটি ইঞ্জিনিয়ার যুবক। সে কিছুদিন আগে তার মাকে হারিয়েছে, সেই শোক এখনও ভুলতে পারছে না। মায়ের একটা ফটোগ্রাফ এনেছে সে, মাকে একবার সশরীরে দেখতে চায়। ব্যবস্থা হয়ে গেল। আধো অন্ধকার ঘর, ধোঁয়া ও আলোর চকমকি, নানারকম অদ্ভুত শব্দ, তারপর এক সময় পর্দার আড়াল থেকে সেই অভিনেত্রীটি যুবকটির মা সেজে বেরিয়ে এল। যুবকটির মা ছিল রোগা-পাতলা। তবু সে অভিভূত হয়ে চিৎকার করে উঠল, মা, মা, প্রেতলোকে গিয়ে তুমি কত মোটা হয়ে গেছ।

এই যুবকটি তো শিক্ষিত। ইওরোপ আমেরিকায় অশিক্ষিত সাধারণ লোকদের কত যে কুসংস্কার এখনও রয়ে গেছে সে প্রসঙ্গও এসে পড়ে। অতিথিদের মধ্যে বর্ষীয়ান মহিলাটি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, ভারতে এসে সবই ভাল লাগে, শুধু একটা ব্যাপার কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমরা যেখানেই যাই, একদল লোক কাছে এসে হাঁ করে চেয়ে থাকে। শুধু চেয়ে থাকে, কোনও কথা বলে না, এটা যে অসভ্যতা, তা বোঝে না ? ট্রেনে আসার সময় কোনও স্টেশনে থামলেই জানলার কাছে এরকম একদল লোক এসে ভিড় করত।

স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ, এটা সত্য। তোমাদের মতন চেহারার কোনও রমণী, এরকম পোশাক অনেকেই আগে দেখেনি। তাই কৌতূহলে এসে ভিড় করে। শুধু চেয়ে থাকে, আর কোনও অত্যাচার করে কী ? আমার কী অভিজ্ঞতা হয়েছে শোনো। লন্ডনের রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে আলখাল্লা আর মাথায় পাগড়ি, একটা লোক একটা কয়লার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, আমাকে দেখে থমকে গেল। এরকম চেহারা ও পোশাক সে কখনও দেখেনি। কিন্তু সে শুধু হাঁ করে চেয়ে রইল না। একটা কয়লার চাঙড় ছুঁড়ে মারল আমার দিকে।

নিবেদিতা শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার লেগেছিল ?

বিবেকানন্দ শুকনো কণ্ঠে বললেন, আমি ঠিক সময় মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের দেশে দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। তবু তাদের গভীর ধর্মবোধ ও নীতিবোধ আছে। পশ্চিমি দেশের নিচু শ্রেণীর লোকরা ধর্ম ও নৈতিকতার কোনও ধার ধারে না। হাইড পার্কে দিনদুপুরে নারী-পুরুষদের মধ্যে যে রকম অসভ্যতা চলে, তা দেখলে কোনও হতদরিদ্র ভারতবাসীও শিউরে উঠবে।

কিছুদিন ধরেই নিবেদিতা লক্ষ করেছেন, অন্য মহিলাদের তুলনায় তাঁর সঙ্গে স্বামীজির ব্যবহার বেশ অন্য রকম। অন্যদের সঙ্গে তিনি হেসে গল্প করেন, আর তাঁকে মাঝেমাঝেই ধমক দেন। ব্যবহারের কিছুটা তারতম্য হতেই পারে। অন্যরা বেড়াতে এসেছেন, এক সময় ফিরে যাবেন। আর নিবেদিতা পেছনের সব বন্ধন ছিন্ন করে এদেশের সেবার জন্য সর্বস্ব পণ করে এসেছেন। তাঁকে স্বামীজি তৈরি করে নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বসমক্ষে ছাড়া বিবেকানন্দ কক্ষনও কাছাকাছি আসতে চান না, কখনও তাঁকে নিয়ে আলাদা করে বসেন না। তিনি যখন একা থাকেন, তখন নিবেদিতা তাঁর কাছে কোনও প্রশ্ন নিয়ে গেলে তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠেন, যাও, স্বরূপানন্দকে

জিজ্ঞেস করো গে !

স্বরূপানন্দের ওপর নিবেদিতাকে বাংলা ও সংস্কৃত শেখাবার ভার দেওয়া হয়েছে। স্বরূপানন্দ লাজুক মানুষ, তাঁর কাছে খোলাখুলি সব কথা বলা যায় না। স্বরূপানন্দ বেশ পণ্ডিত, কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণকে অবতার মানেন না। অবতারবাদে তাঁর বিশ্বাস নেই। আরও কোনও কোনও ব্যাপারে বিবেকানন্দর সঙ্গে তাঁর মতভেদ আছে। নিবেদিতার মনে হয়, শুধু ভাষা শিক্ষাই তো যথেষ্ট নয়, তিনি বিবেকানন্দকে অবলম্বন করেই এদেশে এসেছেন, ওঁর কাছাকাছি থাকতে চান, একদিন ওঁকে না দেখলেই তাঁর মন উতলা হয়ে ওঠে, তবু উনি তাঁকে এড়িয়ে চলবেন কেন ?

এক একদিন নিবেদিতার সঙ্গে বিবেকানন্দর বেশ তর্ক বেধে যায়। তাঁর মনে হয়, বিবেকানন্দ তাঁর নাম দিয়েছেন নিবেদিতা, সে জন্য তাঁকে তাঁর ব্রিটিশ পরিচয় একেবারে মুছে ফেলে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে যেতে হবে ! এত তাড়াতাড়ি তা কি সম্ভব ? হিন্দুরা যেমন মূর্তি পূজা করে, ইংরেজরাও বাচ্চা বয়েস থেকেই জাতীয় পতাকাকে সম্মান করতে শেখে। এখন সেই পতাকাকে অগ্রাহ্য করতে হবে ? ভারতের তো নিজস্ব পতাকাই নেই। ভারতকে ভালবাসতে গেলে কি ভারতের সব কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসও মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক ! ইংরেজদেরও অনেক গুণ আছে, ইংরেজ পরিচয় বজায় থেকেও কি ভারতের সেবা করা যায় না ? নিবেদিতা এসেছেন এদেশে মূলত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অংশ গ্রহণ করতে, সে ব্যাপারে বিবেকানন্দ এখনও পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেননি।

একদিন চিন দেশের কথা হচ্ছিল। বিবেকানন্দ চিন দেশটির প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল, তাঁর ধারণা চিনে শীঘ্রই নব জাগরণ হবে। শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান হবে সে দেশে। তিনি যখন চিনের প্রশংসা করে চলেছেন, নিবেদিতা ফট করে বলে বসলেন, কিন্তু চিনেরা তো খুব মিথ্যেবাদী হয়। সবাই তাদের এ দোষের কথা জানে।

বাধা পেয়ে দপ দুপ্ করে জ্বলে উঠলেন বিবেকানন্দ। কঠোর স্বরে বললেন, তুমি ইংরেজ বলেই এসব কথা বললে। তোমরা এক একটা জাতির নামে এরকম একটা পরিচয় দেগে দাও ! সত্য আর মিথ্যা কি আপেক্ষিক নয় ? ইংরেজরা ভদ্রতার নামে অনবরত অসত্য বলে না ? কারুকে প্রশংসা করতে গেলে তাদের মনের কথা আর মুখের কথা কদাচিৎ এক হয় !

বিবেকানন্দ অনবরত তাঁকে ধমক দিয়ে চললেন আর কিছু বলতেই দিলেন না।

আর একদিন কথা হচ্ছিল মোক্ষ বা মুক্তিলাভ সম্পর্কে। নিবেদিতা এক সময় বলে উঠলেন, আমি এই ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারি না। হিন্দুরা এ জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায় কেন ? এত ধ্যান এত সাধনা, সবই ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের জন্য। যেন আর পুনর্জন্ম না হয়। কিন্তু কেন ? জীবন এত সুন্দর ! নিজের মুক্তি সাধনের চেয়ে যে সব মহৎ কাজ আমাদের ভাল লাগে, যাতে মানুষের উপকার হয়, তার জন্য বারবার জন্মগ্রহণই কি কাম্য নয় ?

বিবেকানন্দ তার চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে রাগতভাবে বললেন, তোমার এখনও মুক্তি সম্পর্কে কোনও বোধই হয়নি। তুমি ক্রমোন্নতির ধারণাটা এখনও জয় করতে পারোনি। তুমি মানুষের বেশি বেশি ভাল করে নিজে আরও বড় হতে চাও ? কোনও বাইরের জিনিসই ভাল হয় না, তারা যেমন আছে, তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।

নিবেদিতা বললেন, বারবার মানুষের মধ্যে থাকা কি আরও বেশি কাম্য হতে পারে না ? কেন আমরা জীবনবিমুখ হব ?

বিবেকানন্দ বললেন, তোমার এখনও অহংবোধ যায়নি। স্বরূপানন্দের কাছে শাস্ত্র বুঝে নাও !

একদিন দুপুরবেলা জো দেখলেন, নিবেদিতা দুপুরে খেতে আসেননি, নিজের বিছানায় ফুলে ফুলে কাঁদছেন। শ্রীমতী ওলি বুল বয়েসে অনেক বড়, শ্রীমতী প্যাটারসন আপনমনে থাকেন, জো-র সঙ্গেই নিবেদিতার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিবেদিতার অস্থিরতাও তিনি লক্ষ করেছেন।

নিবেদিতার পিঠে হাত দিয়ে তিনি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, মার্গারেট, কীসের জন্য কষ্ট পাচ্ছ, আমাকে বলো !

অশ্রুসজল মুখ ফিরিয়ে নিবেদিতা বললেন, জো, জো আমি এখন কী করব বলো তো। আমার যে আর ফেরার পথ নেই। এখন লন্ডনে ফিরে গেলে সবাই উপহাসের হাসি হাসবে। কিন্তু যাঁর জন্য সব কিছু ছেড়ে এলাম, তিনি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না!

জো বললেন, না, না, তুমি অমন ভেবো না। তিনি তোমায় শিক্ষা দিচ্ছেন বলেই মাঝে মাঝে কঠোর কথা বলেন!

নিবেদিতা বললেন, তিনি হাজার কঠোর কথা বললেও আমি সহ্য করতে পারব। কিন্তু তিনি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তাঁর উদাসীনতা আমার মর্মে মর্মে বেঁধে। তোমরা চলে গেলে, আমি তখন কী করব?

জো বললেন, আহা, আমরা তো এক্ষুনি চলে যাচ্ছি না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি তো সাধারণ মানুষ নন, তাঁকে বুঝতে তোমার সময় লাগবে।

নিবেদিতা জো-কে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আমি তো চেষ্টা করছি। জো, আমি অন্যরকম ভেবে এসেছিলাম, এদেশের জন্য আমি সমস্তরকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজি আছি, তিনি থাকবেন আমার পাশে। তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমার সব শক্তি চলে যায়।

সেদিনই বিকেলে জো বিবেকানন্দকে আড়ালে ডেকে কিছু কথা বললেন। জো বিবেকানন্দর দর্শন ও কর্মপরিকল্পনার সমর্থক, কিন্তু তাঁর শিষ্যা হবার কোনও বাসনা তাঁর নেই। বিবেকানন্দর সঙ্গে যে কোনও বিষয় উত্থাপন করতে তিনি কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তিনি বললেন, সোওয়ামী তুমি ওই আইরিশ মেয়েটাকে এত নির্যাতন করছ কেন?

বিবেকানন্দ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, আমি তাকে নির্যাতন করছি? এদেশে এলে তাকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, কতরকম অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে, এ সব বিষয়ে আমি তাকে আগেই সাবধান করে দিইনি?

জো বললেন, সে সব কষ্টের কথা হচ্ছে না। মার্গারেট আমাকে তোমার লেখা একটা চিঠি দেখিয়েছে। সেই চিঠিখানা সে সব সময় নিজের কাছে রাখে। ঠিক যেন বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছে। সেই চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, 'যদি বিফল হও, কিংবা কখনও কর্মে তোমার বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে। তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ করো আর নাই করো, বেদান্ত ধর্ম ত্যাগ করো আর ধরেই থাকো। ... এই আমার প্রতিজ্ঞা।' তুমি একথা লেখনি।

বিবেকানন্দর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল, তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন হ্যাঁ লিখেছি।

জো বললেন, এই ভরসাতেই সে এসেছে। বেচারি এখন কাজ শুরুই করেনি। অথচ তুমি যদি তার প্রতি উদাসীন থাকো, তা হলে তার মন ভেঙে যাবে না? মেয়েটা বড় কষ্ট পাচ্ছে। তুমি ওর সঙ্গে একটু ভাল করে কথা বলো, প্লিজ। আমরা পশ্চিমি মেয়ে, ত্যাগ, বৈরাগ্য এসব কি সহজে আমাদের মাথায় ঢোকে?

অপরাহ্ণে বেড়াতে বেরুবার সময় বিবেকানন্দ নিবেদিতার পাশে এসে একটু থেমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি আমার কাছে কী চাও?

নিবেদিতা বললেন, তুমি আমার প্রভু, আমার রাজা। আমাকে তোমার পায়ে স্থান দাও।

বিবেকানন্দ আর কিছু না বলে হনহন করে চলে গেলেন অন্য দিকে।

তারপর আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামল, তারপর রাত্রি নামল, বিবেকানন্দ কোথাও নেই। সবাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। মহিলারা ছুটে এলেন টমসন হাউসে, সেখানেও তিনি নেই। একটু পরে শ্রীযুক্ত সেভিয়ার বললেন, আপনারা অযথা চিন্তা করবেন না। তিনি আমাকে বলে গেছেন। তাঁর মন অস্থির হয়ে আছে, তাই তিনি লোকজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গেছেন। সেখানে নির্জনে কয়েকদিন থাকবেন।

কিন্তু চিন্তা না করে কি উপায় আছে? বিবেকানন্দের শরীর এখনও ভাল নয়, হজমের গোলমালে কষ্ট পান। অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তিনি কী খাবেন, কোথায় শোবেন? কে তাঁর দেখাশুনো করবে?

তবু, তিনি একাকী অরণ্যবাসের জন্য গেছেন, এখন তাঁর কাছে যাওয়া সঙ্গত হবে না।

জো বুঝতে পারেন যে, বিবেকানন্দও কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর কঠোরতা তাঁর ঔদাসীন্য সে কষ্টকেই চাপা দিতে চায়। কষ্ট পাওয়া কোনও কোনও মানুষের নিয়তি। নিবেদিতার কান্নাও থামে না।

তিন দিন পর তিনি ফিরে এলেন। ধূলিমলিন শরীর, তপস্যাক্লিষ্ট চক্ষু দুটি জ্বলজ্বল করছে, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। গুরুভাইদের বললেন, দ্যাখ, বিলেত আমেরিকায় গিয়ে আমি একটুও বদলাইনি। এখনও আগের মতন পারি। যখন একা একা সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি, তখন মাঠে ঘাটে শুয়ে থাকতাম। এখনও জঙ্গলে আমার কোনও কষ্টই হল না। দিব্যি ছিলাম।

নিবেদিতা-জো'দের সঙ্গে দেখা হবার পর তিনি এমন প্রশান্ত ব্যবহার করলেন, যেন কিছুই ঘটেনি। প্রত্যেকের শরীর-স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। আবার চা-পানের সময় শাস্ত্র আলোচনা ও বিশ্রম্ভালাপ। মুঘল বাদশাহদের গল্প। শাজাহান ও আকবরের তিনি বিশেষ অনুরাগী। ইসলাম ধর্ম নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেছেন। ভারতের উন্নতির জন্য এই ধর্মের সহায়তারও বিশেষ প্রয়োজন। মহম্মদ সরফরাজ হোসেন নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি চিঠিতে লিখেছেন, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন, কর্ম-পরিণত ইসলাম ধর্মের সাহায্য ছাড়া মানবসাধারণের অধিকাংশের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ দুটি মহান মতের— বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের— সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসনেত্রে দেখতে পাই, এই বিভেদ-বিশৃঙ্খলা ভেদ করে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমাময় ও অপরাজেয় শক্তি নিয়ে জেগে উঠছে।

তাজমহলের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে করতে তিনি আত্মহারা হয়ে যান। তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে এখনও রোমাঞ্চ হয়।

নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কিন্তু কিছুতেই সহজ হয় না। নিবেদিতা হঠাৎ হঠাৎ কোনও প্রশ্ন করলেই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। যেন সব নির্দেশই নিবেদিতাকে বিনা তর্কে মেনে নিতে হবে। কিন্তু পশ্চিমি জগতের এক শিক্ষিতা রমণী তাঁর যুক্তিবোধ সহজে বিসর্জন দিতে পারেন না। প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর তিনি খুঁজবেনই। স্বরূপানন্দ বা অন্য সন্ন্যাসীদের কাছেও তিনি সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যান না। তাঁর সমস্ত আগ্রহ বিবেকানন্দকে ঘিরে। অনেকের মধ্যে বসে থেকে বিবেকানন্দ নিবেদিতার দিকে যখনই চোখ তুলে তাকান, তখনই দেখতে পান নিবেদিতা তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

ভারত নামে এই দেশটির প্রতি নয়, একজন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নিবেদিতার এই যে একাগ্রতা, এই যে মোহ, তা বিবেকানন্দ ছিন্নভিন্ন করে দিতে চান। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধন তিনি কিছুতেই মানতে চাইছেন না। এক এক সময় মনে হয়, তিনি নিজের সঙ্গেই লড়াই করছেন। আবার নিবেদিতার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর ভাষা কর্কশ হয়ে যায়, মুখে ফুটে ওঠে কঠোর ভাব।

নিবেদিতা আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন।

একদিন অনেকের সামনে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে খুব বকাবকি করতে জো তাঁকে বললেন, সোওয়ামী, তুমি ওকে শিক্ষা দিতে চাও, দাও, কিন্তু একটু নরম ভাষায় বলতে পারো না? কখনও কি একটু কোমল ব্যবহার করা যায় না? ও মেয়েটা যে তোমার কাছ থেকে দুটো মিষ্টি কথা শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে।

বিবেকানন্দ কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে চলে গেলেন। একা একা পায়চারি করতে লাগলেন দূরের উদ্যানে। কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করলেন না। তাঁর পদচারণার গতি কখনও দ্রুত, কখনও মন্দ, যেন তিনি ঝড় ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছেন।

খানিক পরে তিনি ফিরে এলেন সকলের মাঝখানে। মৃদু স্বরে বললেন, আমার ভুল, আমাকে আবার কয়েকদিন জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে।

অনেকে মিলে সমস্বরে আপত্তি জানাল।

বিবেকানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তাঁর শরীর যেন অনেক বিশাল হয়ে গেছে, যেন তিনি ঢেকে দিচ্ছেন দূরের পাহাড়ের চূড়া। একটা হাত তুললেন আকাশের দিকে।

তাঁর মুখমণ্ডল এখন প্রশান্ত। সন্ধ্যার আকাশেও একটুও মেঘের মালিন্য নেই। দ্বিতীয়ার চাঁদ দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, দেখো, মুসলমানরা এই দ্বিতীয়ার চাঁদকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। এসো, আমরাও এই নবীন চন্দ্রমার সঙ্গে নবজীবন আরম্ভ করি।

বহুবচনে বললেও কথাগুলিও যেন নিবেদিতাকে উদ্দেশ করেই বলা। নিবেদিতা উঠে এসে তাঁর প্রভুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। বিবেকানন্দ হাত রাখলেন তাঁর মাথায়।

৪৩

শ্রাবণ মাসে যখন তখন বর্ষা নামে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে পদ্মা ও গোরাই নদী। অনেক দিন পর পদ্মাবোটটিকে আগাপাশতলা মেরামত করিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে। বিশাল এই বজরাখানি একটি বিস্ময়কর দর্শনীয় বস্তু, যেন ধপধপে সাদা রঙের একটি অলৌকিক পাখি। ভেতরে রয়েছে দুটি বড় বড় কক্ষ, তাতে আরাম-বিলাসের কোনও উপকরণের অভাব নেই, মেঝেতে গালিচা পাতা, চেয়ার-টেবিল-পালঙ্ক দিয়ে সাজানো, এমনকী ঝাড়লণ্ঠন পর্যন্ত রয়েছে। ওপরের প্রশস্ত ছাদে এক পরিবারের বিশ-পঁচিশজন পর্যন্ত বসতে পারে।

এই বজরাটি তৈরি করিয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ঢাকার অভিজ্ঞ কারিগরদের হাতে গড়া এই শোভনসুন্দর বজরাটি দেখে অন্যান্য জমিদাররা ঈর্ষা বোধ করতেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ এই বজরায় কলকাতা থেকে কাশী-এলাহাবাদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আকারে এত বড় হলেও বারোটা দাঁড় ফেলে এই বজরা চালানো যায় বেশ দ্রুত গতিতে। দেবেন্দ্রনাথ বহুদিন বাড়ি ছেড়ে এই বজরাতেই বাস করেছেন।

এখন বজরাটি বাঁধা থাকে পদ্মাবক্ষে শিলাইদহের ঘাটে। রবি এটির নাম দিয়েছেন পদ্মাবোট। এখন আর এই বোটটি বেশি দূর যায় না। মাঝে মাঝে যখন লোকজনের উপদ্রব খুব বেড়ে যায়, লেখার জন্য নির্জনতার প্রয়োজনে রবি পদ্মাবোটকে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে একা একা রাত্রিবাস করেন।

এবারে রবি শিলাইদহে এসেছেন পুরো পরিবার সঙ্গে নিয়ে। তার জন্য কুঠিবাড়িটিও সাফসুতরো করে কিছুটা অংশ বাড়ানো হয়েছে। এই বাড়িটি কিন্তু নদীর ধারে নয়, বেশ দূরে একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। প্রাক্তন নীলকুঠিটি পদ্মার গ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় সেখানকার বেশ কিছু দরজা-জানলা, কড়িবর্গা খুলে এনে নির্মিত হয়েছে এই নতুন বাড়িটি। পদ্মার ভাঙন অবশ্য নীলকুঠির একেবারে প্রান্তে এসে রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই নীলকুঠির কঙ্কালটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। নতুন বাড়িটি কাছারি বাড়ি থেকেও দূরে, অন্য দিকে খরসেদপুর গ্রাম অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

সবাই মিলে কুঠিবাড়িতেই ওঠা হয়েছে, রবিও সেখানেই থাকেন, আবার এক একদিন চলে আসেন পদ্মাবোটে। পরিবারের অন্য লোকজনদেরও এই বোটে আসা নিষিদ্ধ নয়। লেখা থামিয়ে এক এক সময় তিনি নিজেই ছেলেমেয়েদের ডাকেন। মাধুরী, রথী, রানী, মীরা আর শমী এই পাঁচটি ছেলেমেয়ে, এক ভ্রাতুষ্পুত্র নীতীন্দ্রও সঙ্গে এসেছে। পরপর দু'দিন একটানা বৃষ্টির পর আজকের সকালটি ঝলমল করছে রোদে, সবাই এসে বসেছে বজরার ছাদে, শুধু মৃণালিনী আসেননি। ছেলেমেয়েদের খুব শখ কুমির দেখার, পদ্মায় মাঝে মাঝেই বাজে-পোড়া গাছের মতন কুমির ভেসে

ওঠে, আবার টুপ করে ডুবে যায়। শীতের সময় যখন নদীতে চড়া পড়ে, তখন দেখা যায় বালির ওপর তিন চারটে কুমির এক সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। পাশ দিয়ে কোনও বড় নৌকো গেলে তারা সর সর করে জলে নেমে যায়। দু'দিন আগেও গোরাই নদীর মোহনার কাছ থেকে কুমির একটা ছাগল ধরে নিয়ে গেছে, তাই নিয়ে স্থানীয় ছেলেরা খুব উত্তেজিত। কুমিরগুলোর আকার এত বড় বড় যে, তাদের ধরা কিংবা মারা সহজ নয়।

নীতীন্দ্র কৌতুক করছে খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে। নদীতে কিছু একটা ভেসে যাচ্ছে, সেদিকে আঙুল তুলে বলছে, ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ কুমির! ছোটরা অমনি চোখ বড় বড় করে বলছে, কই, কই?

একটা চেয়ারে বসে রবি ডব্লু. এইচ হাডসানের লেখা 'গ্রিন ম্যানসন্‌স' বইটি পড়ছেন ও মাঝে মাঝে চোখ তুলে সহাস্যে ছেলেমেয়েদের ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতা দেখছেন। তাঁর পরনে শুভ্র ধুতি ও বেনিয়ান, পায়ে লাল রঙের রেশমি চটি।

একটু পরে নীতীন্দ্র বলল, রবিকা, এই রথীটা বড্ড ভিতু হয়েছে। জলের এত ভয়। আমি ওকে বলি, চল জলিবোটে করে দু'জনায় মিলে ওপারে গিয়ে কচ্ছপের ডিম খুঁজে আনি, তা ও যাবে না। ও খালি বলে, যদি নৌকো উল্টে যায়! এত ভয় পেলে চলে?

তিন মাস আগে উপনয়নের সময় ন্যাড়া হয়েছিল রথী। এখন তার মাথাটি কদম ফুলের মতন। সদ্য দশ বৎসর পেরিয়ে এগারোতে পা দেওয়া বালক সে, মুখখানি লজ্জা মাখানো।

রবি বই মুড়ে রেখে উঠে এসে রথীর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, সে কী রে, রথী, তুই জলকে এত ভয় পাস? এ তো জলেরই দেশ। সাঁতার শিখলে ভয় কেটে যাবে। বদন মিঞাকে বলে দেব, কাল থেকে তোকে সাঁতার শেখাবে।

রথী ছটফটিয়ে বলল, না, আমি সাঁতার শিখব না। কুমিরে কামড়াবে।

রবি হেসে বললেন, কুমির কোথায়, নিতু তোদের ভয় দেখাচ্ছে। মানুষজন দেখলে কুমির পালায়। গ্রামের সব ছেলেই তো সাঁতার শেখে।

রথী তবু বলল, না, আমি জলে নামতে পারব না।

রবি বললেন, জলে নামবি না?

তারপরেই তিনি রথীকে দু'হাতে উঁচু করে তুলে ছুঁড়ে দিলেন নদীতে।

সবাই আঁতকে উঠল। ছোট্ট মীরা কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে। কয়েকজন দাঁড়ি-মাঝি নীচ থেকে ব্যস্ত হয়ে বলল, কী হল, কী হল, কেউ পড়ে গেল নাকি?

রবি হাত তুলে বললেন, কিছু হয়নি, আর কেউ জলে নামবে না।

জলের মধ্যে হাঁকু-পাঁকু করছে রথী। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। সে চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা করছে, শোনা যাচ্ছে না।

শমী জড়িয়ে ধরেছে রানীকে, মাধুরীলতা রবির হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগল, বাবা, রথী ডুবে যাবে, রথী ডুবে যাবে!

রবি মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দ্যাখ না, কিছু হবে না।

নীতীন্দ্র বলল, রবিকা, আর ও পারবে না। আমি জলে নামব?

এবার মনে হল রথীকে স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রবি নীতীন্দ্রকে থামিয়ে দিয়ে ঝটিতি নিজের পিরান খুলে ফেললেন, মালকোঁচা বাঁধলেন ধুতিতে, তারপর ঝাঁপ দিলেন জলে। সাঁতার কেটে রথীকে ধরে ফেলেও তক্ষুনি তাকে তুললেন না, এক একবার জলের ওপর ভাসিয়ে দিয়ে আবার ছেড়ে দিয়ে বললেন, হাত-পা এক সঙ্গে ছোড়ার চেষ্টা কর। আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়—

প্রায় আধঘণ্টা জলে দাপাদাপি করে তারপর পাড়ে উঠলেন দু'জনে। রথীর পিঠে চাপড় মেরে বললেন, আর একদিন এ রকম করলেই তুই সাঁতার শিখে যাবি। তারপর আমার সঙ্গে নদী এপার-ওপার করবি তুই।

সত্যিই তাই, আর দু'দিনের মধ্যেই রথী সাঁতার শিখে গেল, তারপর আর সে জল ছেড়ে উঠতেই চায় না। তাকে জোর করে টেনে তুলতে হয়।

চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে জ্যোতিদাদা ও নতুন বউঠানের সঙ্গে থাকবার সময় রবি গঙ্গায় যেমন রোজ সাঁতার দিতেন, এখানে আর তেমনটি হয় না। এখানে তাঁকে জমিদার সেজে থাকতে হয়। তবে তাঁর সাঁতার-কৃতিত্বের কথা এখানেও অনেকেই জানে। কয়েক বছর আগে, রথী যখন আরও ছোট ছিল, তাকে সঙ্গে নিয়ে রবি একবার এসেছিলেন। একদিন এই রকমই বোটের ছাদে বসে সন্ধেবেলা বই পড়ছিলেন। বই পড়ার সময় পা দোলানো তাঁর অভ্যেস, তাঁর পায়ে কটকি চটি। হঠাৎ পা দোলানিতে এক পাটি চটি পড়ে গেল জলে। চটি জোড়া খুব পুরনো হলেও প্রিয়, অনেক পুরনো পোশাক, পুরনো জুতো পরলে বেশি আরাম লাগে। বোট তখন মাঝ নদীতে, জলে প্রবল স্রোত, চটিটা ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে, রবি কোনও কিছু চিন্তা না করেই জামা-কাপড় পরা অবস্থাতেই লাফিয়ে পড়লেন জলে। বজরার অন্য কর্মচারীরা ভীত, সন্ত্রস্ত। কী এমন অমূল্য বস্তুর জন্য জমিদার মশাই নিজে ঝাঁপ দিয়েছেন এই খরস্রোতা পদ্মায়? খানিক বাদে রবি সাঁতরে ফিরে এলেন, তাঁর মুখে বিজয়ীর হাসি, হাতে সেই এক পাটি চটি।

এবারে রবি শুধু জমিদারি পরিদর্শন বা নিজের লেখার জন্যই আসেননি। এবারে তাঁর স্বামী ও পিতার ভূমিকাটাই প্রধান। মৃণালিনী তাঁর সঙ্গ পাবেন, ছেলেমেয়েদের তিনি নিজে লেখাপড়া শেখাবেন। ছেলেমেয়েদের তিনি কোনও স্কুলে ভর্তি করেননি। ইংরেজ-প্রবর্তিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তাঁর একটুও ভক্তি নেই। নিজের যে স্বল্প ইস্কুল-জীবন, তার অভিজ্ঞতাও মধুর নয়। এ দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাপ্রণালী দরকার। বলেন্দ্রর খুব উৎসাহ আছে, সে চায় শান্তিনিকেতনে একটা ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত হোক, যেখানে ভারতের সনাতন আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হবে। রবিও মাঝে মাঝে সেই কথা ভাবেন।

এক একদিন সকালে তিনি কুঠিবাড়িতে গিয়ে ডাকেন, বেলী, রথী, রানী, তোরা সব আয়। আমার সঙ্গে পড়বি। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এসে বাবাকে ঘিরে বসে। মীরা আর শমীও টলটলে পায়ে এসে দাঁড়ায়। রবি শমীকে কোলে তুলে নেন, মীরা তাঁর কাঁধে ভর দেয়। তারপর শুরু হয় গল্প।

রথীকে সাঁতার শেখানোর মতন, লেখাপড়ার ব্যাপারেও রবি ডাইরেক্ট মেথডে বিশ্বাস করেন। ছোটদের যে অজ-আম-ইট মুখস্থ করতে হবে, তার কী মানে আছে, একেবারে প্রথম থেকেই তাদের সাহিত্যরসে দীক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি ওদের রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলেন, সেই গল্পে আকৃষ্ট হবার পর ওদের বঙ্কিম কিংবা মাইকেলের রচনা পড়ে শোনান। ছোটরা এসব বুঝবে না? না বুঝুক! শব্দ-ঝঙ্কারটাও কানে যাওয়া দরকার। শুনতে শুনতে তাদের মুখস্থ হবে, মুখস্থ হবার পর আস্তে আস্তে অর্থটাও হৃদয়ঙ্গম করবে। বড় মেয়ে মাধুরীলতা এরই মধ্যে সংস্কৃত শুনে একটু একটু বুঝতে পারে, তার বাংলা লেখারও হাত আছে। রথীও বেশ মনোযোগী ছাত্র।

নিজে তো পড়াচ্ছেনই। এ ছাড়াও সংস্কৃত ও ইংরিজি ভাল করে পড়াবার জন্য দু'জন শিক্ষক নিযুক্ত হল। শিবধন বিদ্যার্ণব নামে একজন শ্রীহট্টের টোলে পড়া পণ্ডিতকে পাওয়া গেল, যার সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙালিদের মতন নয়, কাশীর পণ্ডিতদের মতন বিশুদ্ধ। রবির ধারণা, ইংরিজি ভাষা কোনও ইংরেজের কাছেই শেখা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে সেরকমও মিলে গেল একজন। লরেন্স নামে এক বাউন্ডুলে ইংরেজ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে, মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতন ও থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে সে পড়াতে রাজি হয়ে গেল। লরেন্স লোকটি ভাল শিক্ষক তো বটেই, তা ছাড়া খুব আমুদে, ছোটদের সঙ্গে সে খুব সহজেই মিশতে পারে, খেলাধুলো করে, প্রাণ খুলে গান গায়। শুধু তার একটি দোষ আছে, সন্ধের পর সে নিজের ঘরে বসে মদ খাবেই এবং মাতাল হবে। লরেন্সের অন্যান্য অনেক গুণের জন্য তার এই দোষটি রবি মেনে নিয়েছেন। পার্শ্ববর্তী জমিদার ও সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটদের আপ্যায়ন করার জন্য রবির কাছে যে মদের বোতলের স্টক থাকে, তার থেকে মাঝে মাঝে লরেন্সকেও বোতল দিতে হয়।

ছেলেমেয়েরা এমন নিবিড়ভাবে বাবাকে আগে কখনও পায়নি। এতখানি খোলা প্রান্তর, এমন সজল আকাশ, কাছাকাছি দু'দুটো নদী, প্রকৃতির এই ক্রীড়াঙ্গনে তাদের শিক্ষার মধ্যে আনন্দের ভাগই বেশি। রবিও এই সাংসারিক ভূমিকা বেশ উপভোগ করছেন, কিন্তু সর্বক্ষণের জন্য নয়। তিনি মূলত এক রোমান্টিক কবি, এই জগতের কাছে এক ব্যাকুল প্রণয়ী, সুন্দরকে ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষায় এক গোপন বিরহী। যখন তিনি কবিতা রচনা করেন, তখন তিনি কারুর পিতা নন, কারুর স্বামী নন, প্রজাদের জমিদার নন। তখন তিনি নিঃসঙ্গ।

রবির মাথার মধ্যে সব কাজের জন্য যেন সুশৃঙ্খল বিভাজন আছে। জমিদারি সেরেস্তার কাজকর্ম যখন দেখেন, তখন তাতে পুরোপুরি মন দেন। আয় বৃদ্ধির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর আছে। আবার দরিদ্র প্রজাদের অভাব-অভিযোগ ও নালিশ তিনি সহৃদয়ভাবে শোনেন, সুবিচারের ত্রুটি রাখেন না। পুত্রকন্যাদের উজাড় করে দেন স্নেহ। মৃণালিনীর মনে যে ক্ষোভ জমেছিল, তা অনেকটা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সবই করে যাচ্ছেন ঠিক মতন, কিন্তু অন্তঃসলিলা টান সব সময় কাগজ-কলম নিয়ে নিভৃতে বসার সময়টার দিকে। প্রতিদিন কিছু না কিছু না লিখলে তাঁর ভাল লাগে না। অক্ষর, শব্দ, ছন্দ, সুর এই নিয়ে যে জীবন, সেটাই যেন তাঁর প্রকৃত জীবন। যে-কোনও একটা লেখা শেষ হলেই ইচ্ছে করে কারুকে শোনাতে। শিলাইদহতে তো সে রকম কেউ নেই। তখন নির্দিষ্ট কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করে। কিংবা ইচ্ছে করে কলকাতায় ছুটে যেতে।

এখানে অতিথি আসারও অবশ্য বিরাম নেই। বলেন্দ্র ও সুরেন্দ্র প্রায়ই আসে। সুরেন তো রবিকাকাকে ছেড়ে থাকতেই পারে না, এক সপ্তাহ দু'সপ্তাহ অন্তর তার আসা চাই। বিবি আসে না। চিঠিও লেখে না। আগে যেমন প্রায় প্রত্যেক দিন বিবি নিজে চিঠি লিখত, রবিকাকার কাছ থেকেও সে রকম চিঠি আশা করত, না পেলে অভিযোগ-অনুযোগ-অভিমান জানাত, রবিও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা চিঠিতে তাঁর সমস্ত অনুভূতির কথা বিবিকেই জানাতেন, তেমন আর নেই, সেই পর্বটি যেন চুকে যেতে বসেছে। বিবি এখন অন্য একজনকে সকালে চিঠি লেখে, আবার বিকেলে চিঠি লেখে, তার কাছ থেকেও লম্বা লম্বা চিঠি পায়। রবিও ওই পত্র বিনিময়ের কথা আভাসে কিছুটা জেনেছেন।

ঠিক ঠিক বন্ধুদের সঙ্গ পেলে রবি উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন, তাঁর নতুন নতুন রচনার স্ফূর্তি আসে। তাদের অনুরোধ মতনও বিভিন্ন আঙ্গিকে লিখতে হয়। যেমন জগদীশ বোস এসেই বলেন, বন্ধু, আজ সন্ধেবেলা কিন্তু একটা গল্প শোনাতে হবে। নতুন গল্প চাই। এর ফলে রবির অনেক ছোটগল্প লেখা হয়ে যাচ্ছে। কাহিনীমূলক কবিতা শুনতেও ভালবাসেন জগদীশ, তাই রবির কলমেও এসে যাচ্ছে বিভিন্ন আখ্যান অবলম্বনে কবিতা। কিছুদিন আগে উড়িষ্যা যাবার সময় নৌকোয় বসে এক ঝড়ের রাতে লিখেছিলেন, 'দেবতার গ্রাস', লেখার পরই মনে হয়েছিল এটা জগদীশকে শোনাতে হবে। তারপর লেখা হল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। এরকম আরও।

রবি বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। পদার্থবিজ্ঞানী জগদীশ সম্প্রতি জড় ও উদ্ভিদ সম্পর্কে ঝুঁকেছেন, রবি তাঁর কাছ থেকে এই সব বিষয়ে শুনতে চান। আর জগদীশ কলেজের ছুটি হলেই এখানে চলে আসেন সাহিত্য রস-তৃষ্ণা মেটাতে। রবির ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও তাঁর বেশ ভাব হয়ে গেছে। বেশি রাত্রে পানাহারের সময়টুকু বাদে, অন্যান্য সময় সাহিত্যের আড্ডায় রবি ছেলেমেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখেন না। ওরাও শুনুক, শিখুক, যতটা বুঝতে পারে বুঝুক। এখন সবটা না বুঝলেও পরবর্তী জীবনে এই সব কথা ওদের মনে পড়বে।

আসেন ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্র, পেশায় তিনি উকিল, রাজশাহিতে প্র্যাকটিস করেন। পুরনো বন্ধু লোকেন পালিত এখন রাজশাহির ডিস্ট্রিক্ট জজ, তিনি আসতে পারেন যখন তখন। কুষ্টিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও আসার কোনও অসুবিধে নেই, হাঁটা পথে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরত্ব।

প্রকৃতি যেখানে অকৃপণভাবে উদার, সেখানে মানুষের স্বভাবও বোধহয় অনেকখানি বদলে যায়। অক্ষয় মৈত্র এখানে এসে ইতিহাসের বদলে রেশমের উৎপাদন সম্পর্কে মাথা ঘামান। তাঁর ধারণা হয়েছে, বাংলার গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য নতুন ধরনের চাষবাস দরকার। গুটিপোকার চাষ করে

রেশম উৎপন্ন করতে পারলে অনেক লাভ করা যায়। পাগলা সাহেব লরেন্সকে তিনি এই ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পেরেছেন। লরেন্স এখন ওই চাষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আবার উৎসাহ আলুর চাষ বিষয়ে। আলু একটি সদ্য প্রচলিত সব্জি, বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি এসেই বলেন, রবিবাবু, আপনার এখানে অনেক জায়গা পড়ে আছে, আপনি আলুর চাষ শুরু করুন না। আমি বিলেত থেকে শিখে এসেছি, আপনাকে ভাল জাতের আলুর বীজ এনে দেব।

কলকাতায় লেবরেটরিতে জড় পদার্থ, গাছপালার বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করলেও শিলাইদহে এসে জগদীশচন্দ্র মেতে উঠেন কচ্ছপের ডিম খোঁজায়। এখানে কচ্ছপ প্রচুর, তারা নদী থেকে উঠে এসে উঁচু ডাঙায় বালি খুঁড়ে ডিম পেড়ে যায়। ঠাকুর বাড়ির লোকেরা কচ্ছপের মাংস কিংবা ডিম খেতে জানে না, কিন্তু জগদীশচন্দ্র পূর্ববঙ্গীয়, তিনি তো ভালবাসেনই, তিনি এ বাড়ির সবাইকে এই উত্তম খাদ্যের স্বাদে দীক্ষা দিলেন। রথীকে তিনি শিখিয়ে দিলেন কীভাবে কচ্ছপের ডিমের সন্ধান পেতে হয়। বিজ্ঞানী হিসেবে দেশবিদেশে যাঁর নাম ছড়িয়েছে, তিনি এখানে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, খালি পায়ে, হাতে একটা খুরপি নিয়ে বালির মধ্যে ঘুরে বেড়ান। নদী থেকে কচ্ছপগুলো যখন উঠে আসে তখন বালির ওপর তাদের পায়ের ছাপ পড়ে। সেই ছাপ অনুসরণ করতে করতে গেলে এক জায়গায় দেখা যায়, সেই ছাপ থেমে গেছে। লোকচক্ষুর আড়াল দেবার জন্য কচ্ছপরা সেখানে গর্ত খোঁড়ে, সেই গর্তের মধ্যে ডিম পেড়ে আবার বালি চাপা দিয়ে দেয়। সারাদিন রোদের তাপে বালি উত্তপ্ত হয়ে থাকে, তাতেই আস্তে আস্তে ডিম ফোটে।

জগদীশ রথীকে নিয়ে বসে খুরপি দিয়ে বালি খুঁড়তে থাকেন। ডজন ডজন ডিম পাওয়া যায়। একদিন রথী ভয় পেয়ে গেল। ওরা মনোযোগ দিয়ে বালি খুঁড়ছে, এমন সময় পেছনে খসখস শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল, দুটো শেয়াল এসে সরু চোখে তাকিয়ে আছে।

জগদীশ হেসে বললেন, ভয় পাসনি। আমরা যে-জন্য এসেছি, ওরাও সেই জন্য আসে। মানুষ আর কটা ডিম পায়, এই শেয়ালরাই কচ্ছপের ডিম বেশি চুরি করে। আমরা চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছি।

এক একদিন আরও উপরি লাভ হয়। ডিম খুঁজতে গিয়ে কচ্ছপ মাতাকেও দেখতে পাওয়া যায়। কচ্ছপের কামড় অতি ভয়ংকর, একবার আঙুল কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে নাকি ছাড়ে না। কিন্তু রথী এখন কচ্ছপ ধরায় এক্সপার্ট হয়ে গেছে। পেছন দিক থেকে কচ্ছপটাকে একবার উল্টে দিতে পারলেই সে একেবারে অসহায়। চিত হওয়া কচ্ছপ কিছুতেই আর উপুড় হতে পারে না, তখন অনায়াসেই তাকে বেঁধে ফেলা যায়।

ছোটদের সবচেয়ে বেশি আমোদ হয় নদিয়া থেকে জগদিন্দ্রনাথ এলে। কত বড় জমিদার, কত ঐশ্বর্য, সবাই তাঁকে বলে মহারাজ। নদিয়ায় যখন থাকেন কিংবা যখন কলকাতায় যান, তখন কত তাঁর জাঁকজমক, অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক, চার ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া চড়েন না। কিন্তু শিলাইদহে তিনি একেবারে অন্য মানুষ।

এখানে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ কিংবা দেহরক্ষী থাকে না, তিনি ছেলেমানুষের মতন হইহই করেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মেশেন, ছোট্ট ডিঙি নৌকো নিয়ে অনেক দূর চলে যান। তিনি যেমন গান-বাজনা ভালবাসেন, তেমনি তাঁর গল্পেরও শেষ নেই।

নাটোরের মহারাজ বিখ্যাত ধনী, কিন্তু তিনি আসলে গরিবের ছেলে। এবং সে কথা স্বীকার করতেও জগদিন্দ্রের কোনও লজ্জা নেই। অপুত্রক বিধবা মহারানি এক দূর সম্পর্কের দরিদ্র আত্মীয়ের বাড়ি থেকে একটি সুদর্শন বালককে দত্তক নিয়েছিলেন। তারপর শুরু হয়েছিল সেই বালকের রাজকীয় শিক্ষা। যখন তখন হাসতে নেই। হাঁটার সময় চিবুক উঁচু রাখতে হবে। সাধারণ লোকের দিকে সোজাসুজি তাকাবে না। কর্মচারীদের কথার মাঝখানে মাঝখানে হাত তুলে থামিয়ে দিতে হবে। চাকর-বাকরদের নাম ধরে না ডেকে, এই কে আছে, বলতে হবে। ইংরিজি বলা শিখতে হবে সাহেবদের সঙ্গে। লেখাপড়া তো শিখতেই হবে, সেই সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালনা; হতে হবে সঙ্গীতের সমঝদার, বাঈজিদের নাচের সময় তাল দিতে হবে ঠিক জায়গায়। খাওয়াদাওয়ারও

স্বাধীনতা নেই। একদিন সেই রাজা-সাজা বালক সারাদিন ধরে লেখাপড়া, ঘোড়ায় চড়া, গান-বাজনার তালিম নিয়ে, ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্ধেবেলা। খবর পেয়ে রাজমাতা এসে ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, এর মধ্যেই ঘুম? এখন খেতেও পাবি না। মহারাজা হয়েছিস, এই সবে সন্ধে, এখন কী খাবি, রাজা-রাজড়ারা রাত তিনটের সময় খেয়ে ঘুমোতে যায়।

এই কাহিনী শোনাবার সময় রথীর দু' কাঁধে হাত রেখে জগদিন্দ্র করুণভাবে বলেছিলেন, রথীরে, মহারাজা যেন কখ্খনো হতে যাস নে!

সাহিত্যপাঠ ও সঙ্গীতের আসর বসে সন্ধের পর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন আসেন, তাঁর হাসির গানের ভাণ্ডার অফুরন্ত, তিনিই সেদিন মাতিয়ে রাখেন, সেই সব দিনে রবি নিজে গান করেন না। অন্যান্য দিনে গল্প-কবিতা ও আড্ডার পর রবিকে গান গাইতেই হয়। পদ্মাবোটের ছাদে চাঁদের আলোয় সেই গানের লহরীতে বাতাস ভরে যায়। সঙ্গে কোনও বাদ্যযন্ত্র থাকে না, নাটোরের মহারাজ উপস্থিত থাকলে তিনি শুধু পাখোয়াজে সঙ্গত করেন। রবির ভরাট গলায় গান শোনার জন্য দূর দূর নৌকোর মাঝিরাও কাজ থামিয়ে দেয়।

জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি প্রিয় গান আছে, সেগুলি শুনতে চান বারবার। রবি নতুন গানও শোনান মাঝে মাঝে। বেশির ভাগ দিনই আগে থেকে ঠিক করা থাকে না, যে-গানটা মনে আসে, রবি সেটাই ধরে ফেলেন।

একদিন গাইছেন, 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।' বেশ গেয়ে চলেছেন আপন মনে, হঠাৎ অন্তরায় এসে, 'আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস' এ পর্যন্ত গেয়ে থেমে গেলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হাসলেন মুখ তুলে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে। জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, থামলে কেন বন্ধু? বড় খাসা গান, বুকে ঘা দেয়।

রবি লাজুকভাবে বললেন, ভুলে গেছি।

জগদীশচন্দ্র বললেন, নিজে লিখেছ, তবু ভুলে গেছ?

রবি বললেন, কথা মনে আছে। কিন্তু সুরটা, আমি নিজেই বুঝতে পারছি, অন্তরায় অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

জগদীশচন্দ্র বললেন, আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। সুরটা তো ভৈরবী।

রবি বললেন, অন্য সুরেও গেয়ে দিতে পারতুম। কম গান তো লেখা হল না। এখন সব সুর নিজের মনে থাকে না। এখন সুর বেঁধেই চট করে অন্য কারুকে শিখিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

তারপর রথীর দিকে চেয়ে বললেন, যা তো ও বাড়ি থেকে অমলাকে ডেকে নিয়ে আয়। ও জানে।

চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলা এখানে এসে প্রায় থাকে। মৃণালিনীর সঙ্গে তার বেশ ভাব। চমৎকার তার গানের গলা, রবির কাছ থেকে সে অনেক গান তুলে নেয়। সে রাঁধেও ভাল। আজ বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বলে অমলা মৃণালিনীকে রান্নাঘরে সাহায্য করছে।

জগদীশচন্দ্র বললেন, অমলা আসুক, ততক্ষণ তুমি অন্য সুরটাই শোনাও না। দুটোই শুনব।

সপ্তাহখানেক এখানে কাটিয়ে বন্ধুরা ফিরে যায় যার যার জায়গায়। তখন কয়েকটা দিন চলে একটানা কাজ, লেখাপড়া। ইদানীং রবির চিঠি লেখায় ভাটা পড়েছে। বিবিকে চিঠি লেখার তাগিদ নেই, অন্য কারুকেও বিশেষ নিজে থেকে লেখেন না। তবে চিঠি পেলে প্রতিটি চিঠির উত্তর দেন। প্রভাত মুখুজ্যে প্রায়ই লেখে, সরলা 'ভারতী'র রচনার জন্য তাড়া দেয়। কলকাতার বাড়িতে যে-সব চিঠিপত্র আসে, সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয় এখানে। রবির ভক্তর সংখ্যা বাড়ছে, অনেকে তার কোনও কোনও রচনায় বিমোহিত হয়ে স্তুতিপত্র লেখে, নিন্দেও করে কেউ কেউ।

একদিন একটি বিচিত্র চিঠি পেলেন। সম্বোধনে আছে, 'হে মানবশ্রেষ্ঠ', কিন্তু তলায় কোনও স্বাক্ষর নেই। ঠিকানা নেই। গোটা গোটা হস্তাক্ষর, একটু মেয়েলি ধরনের, কোনও রমণীর লেখা

বলেই রবির মনে হল, 'আপনাকে আমি আমার জীবনবল্লভ রূপে বরণ করিয়াছি, কিন্তু কদাচ আপনার সম্মুখে যাইব না, আপনার নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিব না'। এই ধরনের কথা কি কোনও পুরুষ লিখবে? দু'পৃষ্ঠার চিঠিটি দু' তিনবার পড়লেন রবি, তিনি আত্মশ্লাঘা বোধ করলেন, কিন্তু উত্তর দেবার কোনও উপায় নেই বলে অস্বস্তিও রয়ে গেল খুব।

তারপর থেকে ওই রকম অস্বাক্ষরিত, ঠিকানাবিহীন ও একই হাতের লেখার চিঠি আসতে লাগল মাঝে মাঝে। সব চিঠিই মধুর ভাবে ভরা। রবির বিভায় মুগ্ধ কেউ একজন দূর থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে তাঁর চরণে নিবেদন করতে চায়। উত্তর দিতে না পারলেও চিঠিগুলি সযত্নে রেখে দেন রবি।

একদিন চিঠি এল জ্ঞানদানন্দিনীর কাছ থেকে। বিবির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

পঁচিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে ইন্দিরার, হিন্দুসমাজ হলে এই অরক্ষণীয়া কন্যার জন্য তার বাবা-মাকে পতিত হতে হত। ব্রাহ্মদের মধ্যেও এত বয়েসে কুমারী থাকা অভূতপূর্ব। পাত্রর নাম দেখে রবির খটকা লাগল। যোগেশ? যোগেশ আর প্রমথ দুই ভাইই ও বাড়িতে প্রায়ই যায়, রবি লক্ষ করেছেন, ছোট ভাই প্রমথর সঙ্গেই বিবির সখ্য বেশি, পরস্পর ওরা পত্র বিনিময় করে, যা সখ্য ছাড়িয়ে প্রণয়েরই লক্ষণ। জ্ঞানদানন্দিনী লিখেছেন, বিবি এই সম্বন্ধে রাজি হয়েছে, এখন তিনি রবির মতামত চান। বিবি যদি রাজি হয়, তা হলে রবির আপত্তি জানাবার কোনও কারণ নেই। পাত্র হিসেবে প্রমথর চেয়ে যোগেশ যোগ্যতর, প্রমথ উচ্চশিক্ষিত এবং সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন হলেও যতটা বাক্যবাগীশ, ততটা কাজে দড় নয়, যোগেশ সার্থক ব্যারিস্টার।

এই বিবাহের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েও ভেস্তে গেল। দেনা-পাওনা, যৌতুক, সজ্জা-অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে সব কিছু পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনীর একটি শর্ত যোগেশচন্দ্র মানল না। বিয়ের পরও কন্যাকে দূরে পাঠাতে চান না জ্ঞানদানন্দিনী, কন্যা-জামাতা তাঁর বাড়িতেই থাকবে, অথবা তাঁর ঠিক করা কাছাকাছি কোনও গৃহে। শ্বশুরবাড়িতে দেওর-ননদ-ভাজ-শাশুড়ির একগাদা ভিড়ের মধ্যে বিবি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। সাধারণ বাঙালি পরিবারের রীতিনীতিও সে জানে না। বালিগঞ্জে জ্ঞানদানন্দিনীর অত বড় বাড়ি, সেখানেই তো যোগেশ তার স্ত্রীকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

কিন্তু যোগেশ স্বাধীনচেতা পুরুষ। সস্ত্রীক সে কোথায় থাকবে, তা সে নিজে ঠিক করবে। শ্বশুর-শাশুড়ির আশ্রিত হয়ে সে থাকতে যাবে কেন? বিয়ের সম্বন্ধই যে শুধু ভাঙল তা নয়, দুই পরিবারের মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হল। লজ্জায় অপমানে ইন্দিরা ছাদের কোণে গিয়ে কাঁদে।

এই সময় সরলা এল বিবির সঙ্গে দেখা করতে। নির্জনে নিয়ে গিয়ে খুব এক চোট বকুনি দিল। সে বলল, তুই কী রকম মেয়ে রে বিবি, তুই মন দিয়েছিস একজনকে, আর বিয়ে করতে যাচ্ছিলি আর একজনকে? প্রমথবাবুকে যে তুই ভালবাসিস, তা কি আমি জানি না? তুই কোন মুখে যোগেশবাবুকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলি?

সরলাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ইন্দিরা বলল, আমি কী করব সল্লি, মা যে বলেছিলেন, মায়ের অমতে কি আমরা কিছু করতে পারি?

সরলা বলল, মা বলেছেন বলেই তুই অন্যপূর্বা হবি? সেই একই বাড়িতে, যাকে ভালবাসিস— সে হবে দেওর, স্বামীর সঙ্গে তুই চিরকাল বঞ্চনা করে কাটাবি ঠিক করেছিলি? এ বিয়ে ভেঙেছে, খুব ভাল হয়েছে, আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি।

বিবি বলল, এখন সবাই আমাকেই দোষ দেবে। বিয়ে ভেঙে গেল, আমার মায়ের অপমান হল কত।

সরলা বলল, যদি সৎ সাহস থাকে তো এখন সব কথা মেজমামিকে খুলে বল।

ইন্দিরা বলল, আমি পারব না। কোনও মেয়ে কি স্বামী হিসেবে বিশেষ কোনও পুরুষের নাম করতে পারে? আমাদের সমাজে তা চলে নাকি?

সরলা বলল, কেন চলবে না? আগে যা চলেনি, এমন অনেক কিছু এখন চালাতে হবে। তুই

এত ইংরিজি-ফরাসি কাব্য পড়িস, একজন পরপুরুষকে 'মন আমি' বলে চিঠি লিখতে পারিস, আর এই প্রথা ভাঙতে পারিস না? ঠিক আছে, তুই না পারলে আমিই মেজমামিমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছি।

জ্ঞানদানন্দিনীর প্রমথকে জামাই হিসেবে পেতে আপত্তি নেই, কিন্তু তাঁর শর্ত মানতে হবে। প্রমথ ব্যর্থ প্রেমিকের মতন ভেবেছিল, ইন্দিরার সঙ্গে তার চিঠি লেখালেখি শেষ, এখন ওই প্রাণেশ্বরীর মুখ-পানে চাইবার অধিকার থাকবে না, শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে বউদিদি বলে ডাকতে হবে, আর দুঃখবিলাসেই বাকি জীবন কাটবে। পরিবর্তিত প্রস্তাবে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে সব শর্তে রাজি।

কিন্তু ঘোর আপত্তি এল চৌধুরী পরিবার থেকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল, সেই মেয়েকেই বিয়ে করবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা? ছি ছি ছি, সমাজে বলবে কী? প্রমথর বাড়ির সবাই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিল।

এদিকে জ্ঞানদানন্দিনী জেনে গেছেন যে তাঁর মেয়ে মনে মনে প্রমথকে বরণ করে বসে আছে। এই বিয়ে সম্পন্ন না হলে ইন্দিরা আর কারুকে বিয়েই করবে না। সারাজীবন সে কুমারী হয়ে থাকবে!

ঘটনাচক্র সবই জানানো হচ্ছে রবিকে। তিনি আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। সব কিছু এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে, এখন আর তিনি কী করবেন? বিবি তো নিজে থেকে রবিকে কিছু লেখেওনি।

একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন শিলাইদহে। অনেককাল পরে। এক সময় তিনিই ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের প্রতিনিধি হিসেবে এখানকার জমিদার। তাঁর প্রতিবার আগমনের সময় কত আড়ম্বর, কত উৎসব হত। দেবতার মতন রূপবান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে জমিদারি পরিদর্শন করতেন, বন্দুক নিয়ে যেতেন বাঘ শিকারে। তাঁকে দেখলেই প্রজারা অভিভূতভাবে মাথা নত করত। সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোনও মিলই নেই। জমিদারি পরিচালনার সব ক্ষমতা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে অনেক আগেই। চেহারারও কী নিদারুণ পরিবর্তন হয়েছে! মুখের স্বর্ণাভ বর্ণ একেবারে ম্লান, দু' চোখে নেই ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, অকাল বার্ধক্যে দীর্ঘ শরীরটা যেন খানিকটা ঝুঁকে গেছে।

প্রজারা দূরের কথা, সেরেস্তার অনেক পুরনো কর্মচারীও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিনতে পারল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিলাইদহে বেড়াতে আসেননি, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সেই পুরনো কালের মতন গান বাজনার চর্চা করতেও আসেননি। তিনি এসেছেন জ্ঞানদানন্দিনীর দূত হয়ে। এখন তিনি বছরের পর বছর মেজ বউঠানের পক্ষপুটের নীচে আশ্রয় নিয়েই আছেন। তার আর বিশেষ সামাজিক গতিবিধি নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন, রবি, এবার তো তোর হস্তক্ষেপ না করলেই নয়। এ বিয়ে না হলে মেজ বউঠান অপমানে কারুকে মুখ দেখাতে পারবেন না। যোগেশ-প্রমথদের বড় ভাই আশু তোর বিশেষ বন্ধু, তাকে তুই একটু বুঝিয়ে বল, তিনি তোর কথা নিশ্চয়ই মানবেন। তুই একবার চল কলকাতায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে আগের মতন আর মন খুলে কথা বলতে পারেন না রবি, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁকে দেখে আবার নতুন বউঠানের কথা মনে পড়ছে। অনেক দিন নতুন বউঠানের উদ্দেশে কিছু লেখা হয়নি। নতুন বউঠান অলক্ষে কোথাও থেকে রবির ওপর নজর রাখছেন, এরকম একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস তাঁর এখনও রয়ে গেছে।

এই বিয়ের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে রবির মন ঠিক সায় দিচ্ছে না। যোগেশ যখন বিয়ে করতে চেয়েছিল, তখনই ইন্দিরা সব কিছু খুলে বলেনি কেন? জ্ঞানদানন্দিনীর শর্তে রাজি হয়ে গেলে এতদিনে যোগেশের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত, তারপর সারাজীবন কি ইন্দিরা দ্বিচারিণী হয়ে থাকত? এর পর প্রমথর সঙ্গে বিয়ে হলেও প্রমথর আত্মীয়-স্বজনরা ওদের কী চক্ষে দেখবে? আড়ালে ধিক্কার দেবে না? রবি নিজে এর আগে যোগেশের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন, এখন আবার কী ভাবে প্রমথর নাম উত্থাপন করবেন!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক অনুরোধেও রবি প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে রাজি হলেন না। তবে বন্ধু আশুতোষ চৌধুরীকে সব বিস্তারিতভাবে জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন। কুড়ি পাতার দীর্ঘ চিঠি। সে চিঠি কলকাতায় পৌঁছবার পর চৌধুরীদের কাছে পাঠাবার আগে ইন্দিরা পড়ে দেখল। সব তথ্য রবিকাকা ঠিক মতন জানেন না বলে সেও আরও কিছু জুড়ে দিল।

সে চিঠিতেও কোনও কাজ হল না। ওঁরা দৃঢ় সংকল্প করে বসে আছেন। চৌধুরী পরিবারে বধূ হিসেবে ইন্দিরাকে আর কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।

প্রমথ কয়েক মাস ধরে কোনও বন্ধুর আতিথ্য ভোগ করছে ভাগলপুরে। চিঠিপত্রে জানছে সব কিছু। সে আর ইন্দিরাকে কিছুতেই ছাড়তে রাজি নয়। ইন্দিরা, ইন্দিরার মতন রমণীরত্নের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, নিজের পরিবার তো অতি তুচ্ছ। ভাইদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েও সে ইন্দিরাকে গ্রহণ করতে চায়।

শেষ পর্যন্ত জ্ঞানদানন্দিনীর জেদেরই জিত হল। তাঁর মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এক গলা ঘোমটা টেনে হিন্দু পরিবারের দাসীর মতন ভাসুর-ভাজদের সেবা করতে হবে না। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মেয়ে বিলিতি আদব কায়দায় মানুষ, সে স্বাধীনভাবে সংসার করবে। প্রমথর নিজস্ব উপার্জন বিশেষ নেই, তাতে কী হয়েছে, তিনি খুব কাছাকাছি অঞ্চলে ওদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেবেন। যতদিন বাড়ি না হয়, ভাড়া বাড়িতে থাকবে. সে ভাড়া জোগাবেন তিনি, ওদের সংসারে কোনও অভাব রাখবেন না। ফাল্গুন মাসে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল।

৪৪

প্রয়োজনে মানুষ কী না করে। নদিয়ার এক গ্রাম্য কন্যা বসন্তমঞ্জরী এখন নিপুণ অশ্বারোহিণী। একা সে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে উঠে যায়। দ্বারিকার বাল্যকালে মাতুলালয়ে একটু আধটু ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস ছিল, এখানে এসে কয়েকদিনেই ভাল রকম রপ্ত করে নিয়েছে। বসন্তমঞ্জরী পারবে কিনা সে ব্যাপারে গোড়ার দিকে তার বেশ সংশয় ছিল, কিন্তু বসন্তমঞ্জরী একটুও লজ্জা বা ভয় পায়নি, মাথার ঘোমটা খুলে ফেলে প্রথম দিন থেকেই দুলকি চালে চলতে শিখেছে, এখন টগবগিয়ে যায়।

একটি সাদা ঘোড়ায় চেপে দ্বারিকার পাশাপাশি যেতে যেতে সে হেসে বলে, আগের জন্মে আমি বোধ করি রাজপুতানী ছিলাম।

এটা অবশ্য রাজপুতানা নয়, পঞ্জাব। ঘুরতে ঘুরতে তারা অনেক দূর চলে এসেছে।

পঞ্জাবে আব্রুর বাড়াবাড়ি নেই, নারীরা অনেক পরিমাণে স্বাধীন। তারা শাড়ি পরে না, ঢিলা পাজামার ওপর তারা ঢলঢলে শেমিজের মতন একটা পোশাক পরে, পায়ে দড়ি বাঁধা এক ধরনের জুতো। লম্বা-চওড়া পঞ্জাবি রমণীরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্ষেতি-জমির কাজ করে, হাট বাজারেও তাদের দেখা যায়। এখানকার পথে ঘাটে দস্যু-তস্করদের উপদ্রব প্রায় নেই-ই বলতে গেলে, পরদেশিদের পঞ্জাবিরা সন্দেহের চক্ষে দেখে না, বরং সহজেই বাড়িতে ডাকে, অতিথিদের আপ্যায়ন করে। হিন্দু, শিখ ও মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে মিলে-মিশে আছে, তাদের আকার-প্রকারে বিশেষ তফাতও করা যায় না। পথে যেতে যেতে দোকানি ও সরাইওয়ালাদের কাছ থেকে গল্প শোনা যেতে লাগল যে, কয়েকদিন আগেই এই সড়ক দিয়ে এক হিন্দু সাধু গেছেন তাঁর দলবল নিয়ে, কাশ্মীরের দিকে। গেরুয়াধারী সেই সাধুটি বড় বিচিত্র, তিনি মুসলমান রমণীর কাছ থেকে জল চেয়ে পান করেছেন, মুসলমান মিঠাইওয়ালার কাছ থেকে মিঠাই

কিনে খেয়েছেন পেট ভরে। অজ্ঞাতসারে নয়, জেনে শুনে, সবাইকে দেখিয়ে তিনি মিঠাইওয়ালাকে বলেছেন, তোমাদের মুসলমানি মিঠাই কী আছে, তাই বেশি করে দাও। সেই সাধু সম্পর্কে আরও অনেক গল্প ছড়িয়েছে লোকমুখে।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মারী পার হয়ে এগোতে লাগল দ্বারিকা। পার্বত্যপথ বেশির ভাগ সময়ই নির্জন, সন্ধ্যার কাছাকাছি সময় তারা কোনও সরাইখানা দেখলে থামে। মাঝে মাঝে সরকারি ডাক বাংলোও পাওয়া যায়। ইংরেজদের প্রকৃতির সৌন্দর্যসন্ধানী চোখ আছে। ডাকবাংলোগুলি নির্মিত হয় মনোহর স্থানে, টিলার ওপরে কিংবা নদীর বাঁকে।

বসন্তমঞ্জরীর মনোভাবের তো ঠিকঠিকানা নেই, কখনও দিনের পর দিন সে ম্লান হয়ে থাকে, কথা বলতে চায় না, আবার কখনও সে হাসি-গানে মেতে ওঠে। এখন কয়েকদিন সে বেশ খোশমেজাজে আছে। অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ সে উপভোগ করছে খুব। প্রথম দু'একদিন নিশ্চিত তার গায়ে ব্যথা হয়েছিল, তাও সে স্বীকার করবে না।

এই পথ দিয়ে বহু সাধু-সন্ন্যাসী যায়। এই সময়ে সকলেই চলেছে পুণ্যতীর্থ অমরনাথ দর্শন মানসে। সাধুদের মধ্যে কারুকে কারুকে দেখে ভক্তির বদলে ভয় জাগে। যদিও এখন গ্রীষ্মকাল, কিন্তু সামান্য বৃষ্টিপাতেই খুব শীত বোধ হয়, সেই শীতের মধ্যেও কোনও কোনও সাধু প্রায় নগ্নদেহে সামান্য কৌপিনধারী, কেউ কেউ একেবারে উলঙ্গ। মাথায় দীর্ঘ জটা ধুলো-কাদায় মাখা, মুখমণ্ডল দাড়িতে ঢাকা থাকলেও চোখ দুটি যেন উগ্র, মায়ামমতা শূন্য।

দ্বারিকা নিষ্ঠাবান হিন্দু, সে সাধুসন্ন্যাসীদের দেখলেই প্রণাম জানায় ও ফলমূল দান করে। হাজার হাজার বছর ধরে একই রকমভাবে এই সন্ন্যাসীর দল সমস্ত রকম জাগতিক সুখ অগ্রাহ্য করে ভ্রাম্যমাণ, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে তারা মুক্তির পথ খুঁজে চলেছে। বসন্তমঞ্জরী কিন্তু ওই সব সাধুদের দেখলেই চোখ বুজে ফেলে। তার শরীর কেঁপে ওঠে। দ্বারিকা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে কাতর কণ্ঠে একবার বলেছিল, দেবতার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তো, ওই সাধুরা অমন বীভৎস সেজে থাকেন কেন? দেবতারা কি তাতে খুশি হন? এই জগৎ কত সুন্দর, পথের ধারে ফুটে থাকা সামান্য ফুলও কেমন নিখুঁত রূপের পাপড়ি মেলে থাকে, তবে মানুষ কেন সুন্দর হবে না?

দ্বারিকা বলে, সুন্দরের বাহ্য-রূপ আমরা মানবিক চোখ দিয়ে দেখি। আর দেবতারা দেখেন অন্তরের রূপ। ওই সন্ন্যাসীরা আত্মনিগ্রহের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিজেদের বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতর করে তুলছেন, আমাদের মতন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা তাই সাধুদের ওপরেই বরাত দিই, সাধুসেবা করলেই আমাদের পুণ্য হয়।

তবু দ্বারিকা যখন কোনও বিশিষ্ট সাধুকে পাদ্যার্ঘ্য দেয় তখন বসন্তমঞ্জরী কাছে আসে না, জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে, দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। তীর্থযাত্রীর দল যখন হঠাৎ হঠাৎ জোর গলায় ধ্বনি দেয়, হর হর বোম বোম, তখনও সে কুঁকড়ে যায়। সে এমনই স্পর্শকাতর যে উচ্চনিনাদও সহ্য করতে পারে না। সে রকম কোনও বড় দল দেখলে সে থেমে গিয়ে পথের ধারে বসে পড়ে কিংবা বনের মধ্যে চলে যায়। অতি সামান্য কোনও ছিরছিরে ঝর্না দেখতে পেলে সে আর যেতেই চায় না, তখন তার দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে মুগ্ধতা। ছোট ছোট ঘাসফুল তুলে দু'হাতের অঞ্জলি ভরে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

ক্রমে তারা এসে পৌঁছল বারমুল্লা নামে একটি স্থানে। এখান থেকে নদীপথে কাশ্মীর উপত্যকায় যাওয়া যায়। বসন্তমঞ্জরীর যদিও অশ্বারোহণে উৎসাহের ভাটা পড়েনি, কিন্তু দ্বারিকা ক্লান্তিবোধ করছে। একটা নৌকো ভাড়া করলে বেশ ধীরে সুস্থে দু'পাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে যাওয়া যাবে। এখানে বজরার মতন বড় বড় নৌকো পাওয়া যায়, তার মধ্যেই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা আছে, রাত্রিবাসেরও কোনও অসুবিধে নেই।

নিজস্ব কর্মচারীদের আগেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে দ্বারিকা, কাশ্মীর রাজ্যে ভ্রমণকারীদের জন্য নানা রকম সুবন্দোবস্ত আছে। এ রাজ্যের রাজা হিন্দু, প্রজারা অধিকাংশ মুসলমান। মুসলমানরাও হিন্দুদের ঠাকুর-দেবতা ও শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তীর্থযাত্রীদের পথ প্রদর্শক প্রায় সবাই

মুসলমান, তারা নানা রকম গল্প শোনায়। এক দল মুসলমান বালক মেষপালক অমরনাথ শৃঙ্গের এক গুহার মধ্যে প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠা একটি তুষারপিণ্ড দেখে ভেবেছিল, এ তো হিন্দুদের শিবলিঙ্গের সদৃশ। তাদের জন্যই অমরনাথের সেই গুহা এখন বিখ্যাত হিন্দু-তীর্থ।

নৌকোয় যাত্রা অতিশয় আরামদায়ক। নদী বেশ স্রোতস্বিনী, সারা দিন ধরে শোনা যায় জলের কল্লোল। দু'দিকের তীর প্রায় বনরাজিতে ঢাকা, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম। দ্বিতীয় দিন থেকেই দেখা যেতে লাগল ধবল তুষারমণ্ডিত একটি পর্বত শিখর। সারাদিন রৌদ্র-ছায়ায় সেই পর্বতগুলির কত রকম রং বদল হয়।

বসন্তমঞ্জরী বেশ খুশির মেজাজে আছে। মাঝে মাঝে সে গুনগুন করে আপন মনে গান গায়। এক একটি পাহাড়ের দিকে সে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে বলে, ঠিক মন্দিরের মতন, নয় গো? আহা, সত্যিই যেন আমরা দেবস্থানে এসে পড়েছি। এখানকার মানুষগুলিও কত সুন্দর।

নৌকোর চালক তিনজন, একজনের পত্নীও সঙ্গে রয়েছে, সেই রান্না করে। সরু চালের ভাত, লাউ-কুমড়োর ঘণ্ট, মুগের ডাল, আর খাঁটি গব্য ঘৃত। জেলেদের কাছ থেকে টাটকা নদীর মাছও পাওয়া যায়। ভোজনবিলাসী দ্বারিকা নিজে দরাদরি করে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি মাছ কিনে ফেলে। বসন্তমঞ্জরী প্রায় কিছুই খেতে চায় না, তার যেন পাখির আহার। দ্বারিকা তাকে পীড়াপীড়ি করলে সে বলে, এত ভাল লাগছে, সবকিছু এত ভাল, এই সময় আমার বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। বেশি খেলে ঘুম পাবে, তা হলে কত কিছু দেখতে পাব না। ওগো, তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসে আমার জীবন ধন্য করলে!

রান্নাঘরের স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে বসন্তমঞ্জরী, কিন্তু ভাষার ব্যবধান বড় বাধা। বসন্তমঞ্জরীর কোনও কথাই সে বোঝে না, সজল চোখে চেয়ে থেকে মিটিমিটি হাসে। দুধে-আলতা গায়ের রং, টিকোলো নাক, দীর্ঘ অক্ষিপল্লব, গাঢ় ভুরু। এখানকার গরিব ঘরের মেয়েরাও যেন রানির মতন রূপসী। কিন্তু রূপ সম্পর্কে তাদের একটুও সচেতনতা নেই। রোজ স্নান করে না। প্রসাধনের কোনও বালাই নেই, ভাল করে চুলও বাঁধে না। বসন্তমঞ্জরী সাজসজ্জা করতে ভালবাসে, সে যখন সোনা-বাঁধানো চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায়, আমিনা নামে সেই রমণীটি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। বসন্তমঞ্জরী বলল, এসো, আমি তোমার চুল বেঁধে দিই। আমিনা লজ্জা পেয়ে আপত্তি জানালে বসন্তমঞ্জরী জোর করে তাকে কাছে টেনে আনে। খুব ভাল করে তার খোঁপা বেঁধে দিয়ে, তার ওপর চিরুনিটা গুঁজে দিয়ে বলে, এটা তুমি নাও।

পুরুষরা তবু ভাঙা ভাঙা উর্দুতে কথাবার্তা চালাতে পারে। দ্বারিকা এক সময় ফার্সি পড়েছিল, উত্তর ভারত পরিক্রমার সময় হিন্দি ও খাড়ি বোলি শুনতে শুনতে অনেকটা শিখে নিয়েছে, তার বুঝতে অসুবিধে হয় না। নৌকোর চালকরা মার্তণ্ড মন্দির, শঙ্করাচার্যের মন্দির, শাহ্ হামদান, চশমাশাহী এই সব বিখ্যাত স্থানগুলির ইতিহাস শোনায়। কিংবদন্তীর ইতিহাস। হরিপর্বত কী করে তৈরি হয়েছে জানেন? হিন্দুদের খুব বড় দেবী দুর্গামাঈ-এর সঙ্গে এক দৈত্যের লড়াই হয়েছিল, দুর্গামাঈ দৈত্যের দিকে একটা মস্ত বড় পাথর ছুঁড়ে মারলেন, তাতেই সেই দৈত্য চাপা পড়ে গেল। সেই পাহাড়টাই হল হরিপর্বত। তার ওপরে এখন দুর্গ আছে। বাদশা আকবর বানিয়েছেন সেই দুর্গ। আর ঝিলম নদীর ধারে যে পাথর মসজিদ আছে, সেটা কে বানিয়েছেন জানেন তো? বেগম নূরজাহাঁ। ভারী সুন্দর সেই মসজিদ। কিন্তু কোনও আওরতের বানানো মসজিদে নামাজ পড়তে নেই। .... মার্তণ্ড মন্দিরের জায়গাটাকে লোকে বলে মাট্টন। আসলে মার্তণ্ড মানে সূর্যদেও। ওই মন্দির আগে আরও অনেক বড় ছিল, খুব আফশোসের কথা, অনেক কাল আগে সিকান্দর বাতসিখান ওই মন্দির বিলকুল চুরমার করতে চেয়েছিল। খোদাতাল্লার দুনিয়ায় এত জায়গা খালি পড়ে আছে, আরও কত মসজিদ বানানো যায়, হিন্দুদের মন্দির ভাঙতে হবে কেন? তাদের প্রাণে দুঃখ লাগবে না?

প্রায় এক বছর ধরে বহু বিখ্যাত স্থান দর্শন করেছে দ্বারিকা, তার মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য যে সবচেয়ে সুন্দর শুধু তাই-ই নয়, এখানকার মানুষদের এমন সাবলীল ও আন্তরিক ব্যবহারের তুলনা নেই।

নৌকো চালকরা শেষ অপরাহ্নে নৌকো থামিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজ আদায় করতে বসে, তারা নিজ ধর্মপরায়ণ, অথচ অন্য ধর্ম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষের স্থান নেই তাদের মনে।

দ্বারিকা সঙ্গে ব্র্যান্ডির বোতল এনেছে, একটু একটু ব্র্যান্ডিতে চুমুক দেয় আর চুরুট টানে, বসন্তমঞ্জরী মৃদুস্বরে গান গায়। দু'পাশে গিরিবর্ত্ম, পশ্চিম দিগন্ত রক্তিম হয়ে আসে, মাথার ওপর দিয়ে কুলায় ফিরছে পাখির ঝাঁক। গ্রীষ্মের বাতাসে ভেসে আসে অরণ্য ফুলের গন্ধ।

এক সময় গান থামিয়ে বসন্তমঞ্জরী অস্ফুটস্বরে বলল, লাল রঙের চুল!

দ্বারিকা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কী বললে?

বসন্তমঞ্জরী বলল, দ্যাখো দ্যাখো একজন মেয়েমানুষের মাথার চুলের রং যেন জবা ফুলের মতন লাল। এমনটি আগে কখনও দেখিনি।

দ্বারিকা একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া হয়েছিল, উঠে বসে ফিরে তাকাল।

নদীর এক প্রান্তে তিনটি নৌকোর একটি বহর নোঙর করে আছে। একটি বড় নৌকোর সামনের দিকে টেবিল-চেয়ার পাতা। চারজন বিদেশিনী মহিলা সেখানে বসে চা-পান করছে। তাদের মধ্যে একজন বয়সে প্রৌঢ়া, অন্য তিনজনই যুবতী। সেই যুবতীদের মধ্যে একজনের মাথার চুল সত্যি সত্যি রক্তাভ।

দ্বারিকা বলল, মেমসাহেব। ওদের চুল নানা রকম হয়। হলদে, সোনালি, বরফের মতন সাদা। ইংরেজদের মেয়ে-বউরাও এখন কাশ্মীরে বেড়াতে আসছে।

বসন্তমঞ্জরী বলল, আমি এত কাছ থেকে মেমসাহেব দেখিনি আগে। আচ্ছা, এরা বেশি ফর্সা, না কাশ্মীরিরা বেশি ফর্সা?

দ্বারিকা বলল, ইংরেজদের চোখে আমরা সবাই কালো। তুই-ও কালো, কাশ্মীরিরাও কালো।

বসন্তমঞ্জরী বলল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, মেমসাহেবদের চেয়েও কাশ্মীরিদের মেয়েদের গায়ের রং বেশি ভাল। ফ্যাটফেটে সাদা নয়, কাঁচা হলুদের মতন।

দ্বারিকা বলল, ওদের সঙ্গে একজন পুরুষও রয়েছে দেখছি। ওই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল্লাদের সঙ্গে কথা বলছে। গেরুয়া আলখাল্লা পরা। কী আশ্চর্য, সাহেবের বাচ্চাও গেরুয়া ধরেছে নাকি?

বসন্তমঞ্জরী বলল, ওই লোকটিও কি সাহেব?

দ্বারিকা বলল, সাহেব না হলে, কোনও নেটিভ কি মেমসাহেবদের অত কাছাকাছি ভিড়তে পারবে? তা ছাড়া, দ্যাখ, লোকটা পাইপে তামাক টানছে। ছোঃ, গেরুয়ার আর জাত রইল না।

দ্বারিকাদের নৌকো খানিকটা এগিয়ে যাওয়ায় ওদের আর দেখা গেল না।

পরের দিন এই নৌকো এসে পড়ল ঝিলম নদীতে। বিখ্যাত শ্রীনগর আর বেশি দূরে নেই। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা যেন চতুর্দিকে ঘিরে আছে। এই নৌকোর চালকদের এত ভাল লেগে গেছে যে এখন আর তীরে গিয়ে কোনও সরাইখানায় আশ্রয় নেবার ইচ্ছে নেই দ্বারিকার। এই নৌকোতে থেকেই দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে আসা যাবে। এক সময় নদী ছেড়ে নৌকোখানি প্রবেশ করল ডাল হ্রদে।

দিন সাতেক শ্রীনগর অঞ্চলে কাটাবার পর সেই নৌকো নিয়েই যাওয়া হল ইসলামাবাদ। এই স্থানটির আর একটি নাম অনন্তনাগ। কাশ্মীর রাজ্যটির অবস্থান অনেক উর্ধ্বে হলেও পূর্ব বাংলার মতনই নদী বহুল। এক নদী থেকে অন্য নদীতে পড়ে জলপথেই বেশ ঘোরা ফেরা যায়। ঘুরতে ঘুরতে দ্বারিকারা চলে এল লিদার নদীর প্রান্তে পহলগাম নামে ক্ষুদ্র একটি গ্রামে। সামান্য গ্রাম হলেও বৎসরের এই সময়টায়, শ্রাবণী পূর্ণিমার আশেপাশে বহু মানুষের ভিড়ে গমগম করে। অমরনাথ তীর্থযাত্রা শুরু হয় এখান থেকে।

পহলগামে ভদ্রগোছের কোনও যাত্রীনিবাস বা সরাইখানা নেই, তাঁবুতে অবস্থান করতে হয়, সে জন্য প্রচুর তাঁবু ভাড়া পাওয়া যায়। দ্বারিকা আগে অমরনাথ তীর্থ পর্যন্ত যাবার কথা ভাবেনি, কাশ্মীর উপত্যকার সৌন্দর্য দর্শনই তার এতদূর আসার উপলক্ষ ছিল। কিন্তু এখানে সহস্র সহস্র যাত্রীর উন্মাদনা দেখে তারও নেশা লেগে গেল। দুর্গম অমরনাথের গুহায় মহাদেবের তুষারলিঙ্গ দর্শনের

অভিজ্ঞতা এ জীবনের এক চরম সম্পদ হয়ে থাকবে। এত কাছে এসেও কি এ সুযোগ ছাড়া যায়? বসন্তমঞ্জরীও বেশ উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল।

অমরনাথ হুট করে কেউ একা একা যায় না। বিপদসঙ্কুল পথ, অনেক লোক অত উঁচুতে উঠতে পারে না, পথেই মারা যায়। যেতে হয় দল বেঁধে, ছড়িদারদের সঙ্গে। যাতে একজন কেউ বিপদে পড়লে অন্যরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। হর-পার্বতীর খোঁজে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তক্ষককে এই অমরনাথে প্রেরণ করেছিলেন, এবং পথের বিপদের কথা চিন্তা করে তাকে সর্ববিঘ্ননাশন এক দণ্ড দিয়েছিলেন। সেই থেকে দণ্ড বা ছড়ি নিয়ে একজন তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যায়। আপাতত সেই যাত্রার আরও কয়েকদিন দেরি আছে।

পহলগামের সৌন্দর্য যেন শ্রীনগর বা অনন্তনাগের চেয়েও বেশি। রাত্রিবেলা অন্য তাঁবুর সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়ে, দ্বারিকাও বেশি রাত জাগতে পারে না, তখন বসন্তমঞ্জরী আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ায়। তাঁবুর মধ্যে অন্ধকারে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরে কী অনাবিল মুক্ত বাতাস। দুধ রঙের জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সারা আকাশ। পর্বতশৃঙ্গগুলি যেন একযোগে তাকেই দেখছে। খরস্রোতা লিদার নদীর ছলছল শব্দ সব সময় শোনা যায় অন্তরাল-সঙ্গীতের মতন। সুন্দরের এমন বিকাশের মধ্যে বসন্তমঞ্জরীর আনন্দে কান্না পেয়ে যায়। স্বপ্ন-চালিতের মতো সে একা একা ঘুরে বেড়ায়।

দিনের বেলা দ্বারিকা অমরনাথ যাত্রার কাজে জিনিসপত্র জোগাড়-যন্ত্রের জন্য ব্যস্ত থাকে। বেশ কয়েক দিনের শুকনো খাবার-দাবার সঙ্গে নিতে হবে। এবং কিছু ওষুধপত্র। মালবাহক পাওয়া দুষ্কর, এখন সুযোগ বুঝে তারা প্রচুর দর হাঁকে। বসন্তমঞ্জরী কখনও জুতো-মোজা পরেনি। কিন্তু প্রবল তুষারের মধ্যে তাকে এখন ওসব পরতেই হবে। শীত বস্ত্রও কিনতে হল অতিরিক্ত কিছু কিছু।

বসন্তমঞ্জরী খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। সে এমনই সুখে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে পানাহার যেন অবান্তর ব্যাপার। তার প্রায় পাগলিনীর মতন অবস্থা। যখন তখন পাহাড়গুলির দিকে চেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আর গান গায়। ভাত কিংবা রুটি সে মুখেই তুলতে চায় না, তবে দ্বারিকা লক্ষ করেছে, গরম গরম দুধ পেলে তবু সে খানিকটা চুমুক দেয়।

চৌপাট্টির একটা দোকানে মস্ত বড় কড়াইতে সর্বক্ষণ দুধ জ্বাল দেওয়া হয়। আগে থেকে এনে রাখলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তাই রাত্তিরে শুতে যাবার আগে দ্বারিকা নিজে গিয়ে বসন্তমঞ্জরীর জন্য বড় এক ভাঁড় গরম দুধ নিয়ে আসে।

সন্ধে হতে না হতেই এখানে বেশ শীত পড়ে যায়। এইটুকু পথ হেঁটে আসতেই দ্বারিকার কাঁপুনি ধরে। বসন্তমঞ্জরীকে দুধ দিয়েই সে বিছানায় ঢুকে পড়ে।

একদিন তার ফিরতে দেরি হল। নদীর দু'পারেই তাঁবু খাটানো হয়েছে, দ্বারিকাদের তাঁবু কিছুটা ওপরের দিকে। হিমেল হাওয়ার জন্য রাত হলে কেউ আর তাঁবুর বাইরে থাকতে চায় না, বসন্তমঞ্জরী একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর। দূরে একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে, তীর্থযাত্রীদের হর হর বোম বোম জিগির নয়, ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। গান থামিয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে বসন্তমঞ্জরী।

দ্বারিকা দ্রুতপদে ফিরে এসে বলল, তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্য চিন্তা করছিলে? একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে এখানে। কোথা থেকে এক সাধু এসেছে, তার সঙ্গে তিন-চারটে ডবকা মাগি। বলে কিনা ওদের নিয়ে অরমনাথ যাবে। আমরা আসার সময় নদীর ধারে যে কয়েকটা মেমকে এক নৌকোয় বসে চা খেতে দেখেছিলুম মনে আছে? মনে হয় সেইগুলোনই এসেছে। সাধুটা নিশ্চয়ই ভণ্ড, একটায় শানায় না, তিন-চারটে সাধনসঙ্গিনী চাই! ফুর্তি মারার কি জায়গার অভাব আছে যে এখানেই আসতে হবে? এখানকার অন্য সাধুরা মহা ক্ষেপে গিয়েছে, তারা কিছুতেই তাদের তাঁবুর পাশে ওদের থাকতে দেবে না। মাগিগুলোন আবার খ্রিস্টান। ইংরেজ মাগিরা এসে হিন্দুদের ধর্মস্থান অপবিত্র করবে, এ বড় আস্পর্ধার কথা নয়! আজ একটা হাঙ্গামা লাগল বলে। ওই

পাইপফোঁকা নেটিভটাও এমন ঠ্যাটা, অন্য জায়গায় যাবে না, এখানেই তাঁবু ফেলতে চায়। সে নাকি কোতোয়ালিতে খবর দিয়েছে। ফট ফট করে ইংরিজি বলে। ইংরিজি ভাল জানে বলেই মেমদের সঙ্গে ফুর্তি করার সুবিধে হয়েছে।

বসন্তমঞ্জরী জিজ্ঞেস করল, তুমি সেই সাধুর সঙ্গে কথা বলেছ?

দ্বারিকা বলল, না। আমি ধারেকাছে যাইনি। ছড়িদার ইউসুফ বলল, ওই সাধুটা নাকি বলেছে যে, দেখি কে আমাকে এখান থেকে সরায়। এখানেই আমার তাঁবু ফেলা হবে। নাগা সাধুরা তাই শুনে গজরাচ্ছে। নাগা সাধুদের জানো তো, রেগে গেলে ওরা ত্রিশূল দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। তাই আমি আর ওদিকে গেলুম নাকো।

বসন্তমঞ্জরী হঠাৎ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, না, না, ওঁর গায়ে কেউ হাত না দেয়। তুমি যাও, তুমি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াও। উনি ভণ্ড নন।

দ্বারিকা অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, তুমি ওকে চেনো?

ধীরে ধীরে দু'দিকে মাথা দুলিয়ে বসন্তমঞ্জরী বলল না, চিনি না। কিছুই জানি না। কিন্তু হঠাৎ যেন এক লহমার মতন মনে হল, আমি দেখতে পেলাম, তুমি আর ওই সাধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছ, উনি তোমার কাঁধে হাত রেখে হেসে হেসে কথা বলছেন। তুমিই নিশ্চয়ই ওকে চেনো।

দ্বারিকা বলল, তুমি দেখতে পেলে মানে? কল্পনা? আমি তো এরকম কোনও সাধুকে চিনি না? তবে কি আমাদের ভরত? সে সাধু হয়ে এসেছে এখানে?

বসন্তমঞ্জরী দ্বারিকাকে দেখছে না, তার মুখখানি একটু পাশ ফেরানো, যেন বাইরের শূন্যতার মধ্যে সে সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে? সে এবার আরও জোরে মাথা নেড়ে বলল, না, না, তিনি নন। তোমার বন্ধু ভরতকে আমি দেখেছি, এঁকে দেখিনি, তবু যেন দেখতে পেলাম।

দ্বারিকা বলল, কী বলছিস বাসি, পাগলের মতন কথা? এরকম ভাবে কিছু দেখা যায় নাকি? তোর জ্বর হয়েছে? তুই ভুল বকছিস।

বসন্তমঞ্জরী এবার ব্যাকুলভাবে দ্বারিকার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ওগো, আর দেরি কোরো না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও, ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াও।

দ্বারিকা সেই কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না। আবিষ্টের মতন ফিরে গেল।

সমবেত সাধুদের মধ্যে উত্তেজনা এর মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। অনেক যাত্রীও তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। খ্রিস্টান মেমদের তারা কিছুতেই এখানে থাকতে দেবে না। পাইপ-ফোঁকা সাধুটি নাকি রাজ প্রতিনিধির কাছে খবর পাঠিয়েছে, কিন্তু পুলিশ এলেও সাধুরা প্রতিরোধ করবে, এই ধর্মস্থান তারা অপবিত্র করতে দেবে না।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল দ্বারিকা। লিদার নদীর ধারে এক জায়গায় গোটা তিনেক তাঁবু, তক্তা, দড়ি দড়া জড়ো করে রাখা হয়েছে, মজদুররা তাঁবু খাটাতে গিয়েও সাধুদের নির্দেশে হাত গুটিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। দুটি বড় বড় মশাল জ্বলছে সেখানে, সেই আলোয় দেখা যায় চারজন মেমসাহেবকে, পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তারা বেশ উচ্চ বংশীয়, মুখে সামান্য উদ্বেগের চিহ্ন থাকলেও তারা ভয় পায়নি, পরস্পর কথা বলছে মৃদু স্বরে। একটু দূরে পায়চারি করছে এক সন্ন্যাসী, গেরুয়া আলখাল্লা পরা, মাথায় একটি কালো টুপি, মুখের রং গৌরবর্ণ হলেও ভারতীয় বলে চেনা যায়। তার বীরত্বব্যঞ্জক পদচারণা দেখে মনে হয়, সে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিছুতেই এখানকার ভূমি ছেড়ে যাবে না।

আর একটু কাছে গিয়ে দ্বারিকা আরও চমকে উঠল। সেই সন্ন্যাসী এখন আর ধূমপান করছে না, অনুচ্চ স্বরে একটা গান গাইছে:

> ভূতলে আনিয়া মাগো, করলি আমায় লোহাপেটা
> আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাশ আমার বুকের পাটা....

এই সন্ন্যাসী বাঙালি? থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে দ্বারিকা বলল, নরেন দত্ত!

তার মনে পড়ল, প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন পড়েছিল, পরে অন্য কলেজে চলে যায়, সেই

নরেন দত্ত দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের শিষ্য হয়েছিল। কয়েক বছর পর আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে খুব নাম করেছে। নামটা বদলে কী যেন হয়েছে? বিবেকানন্দ? ছাত্র বয়েসে হেদুয়ার পার্কে অনেকবার দেখা হয়েছে নরেনের সঙ্গে। বয়েসে নরেন কিছুটা বড় ছিল। ওঁর গানের গলা শুনেই মনে পড়ে গেল। নরেন কলকাতায় ফেরার পর দ্বারিকার একবার দেখা করার ইচ্ছে হয়েছিল, হয়ে ওঠেনি। গত এক বছরের কোনও খবর রাখে না দ্বারিকা। নরেন সাহেবদের দেশে বেদান্তের ঝান্ডা উড়িয়ে এসেছে, এ জন্য তার প্রতি দ্বারিকার শ্রদ্ধার ভাব আছে।

বিবেকানন্দ গান থামিয়ে মুখ ফেরাতেই দ্বারিকা বলল, আমার নাম দ্বারিকা লাহিড়ী, এক সময় তোমার গান শুনেছি অনেকবার। তুমি সিমলে পাড়ায় থাকতে না? কাছেই মানিকতলায় আমার বাড়ি ছিল।

বিবেকানন্দ ঠিক চিনতে পারলেন না, স্মিত মুখে চেয়ে রইলেন।

দ্বারিকা বলল, এখানে গণ্ডগোল হচ্ছে, সাধুরা তোমার নামে অনেক কথা বলছে, আমি বুঝতেই পারিনি যে আমাদের সেই নরেন এখানে এসেছে। ভাই মাপ করো, তোমার সন্ন্যাস জীবনে অন্য নাম হয়েছে, এখন নরেন নামে ডাকা বোধহয় উচিত হবে না!

বিবেকানন্দ এবার এগিয়ে এসে দ্বারিকার কাঁধে হাত রেখে হেসে বললেন, না, না, তুমি আমাকে নরেন বলেই ডাকতে পারো। কতদিন পর বাংলা কথা শুনে ভাল লাগল।

দ্বারিকা কেঁপে উঠল। বিবেকানন্দর স্পর্শের জন্য নয়। বসন্তমঞ্জরী এই দৃশ্যটার কথা বলেছিল। সাধু তার পরিচিত, কাঁধে হাত রেখে হেসে কথা বলবে। কোনও ঘটনা ঘটার আগে কেউ সেই দৃশ্য দেখতে পারে? ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলে সত্যিই কি কিছু হয়।

বিবেকানন্দ মেমসাহেবদের সঙ্গে দ্বারিকার আলাপ করিয়ে দিলেন। তাদের সবার বাংলা নাম, ধীরা মাতা, জয়া, নিবেদিতা। শুধু একজন মিসেস প্যাটারসন। জয়া নামের রমণীটি দ্বারিকাকে জিজ্ঞেস করল, সাধুরা আমাদের এখানে থাকতে দেবে না কেন বলছে? যাত্রীদের মধ্যেও তো আরও মহিলা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

দ্বারিকা উত্তর না দিয়ে বিবেকানন্দর দিকে তাকাল। নিচু গলায় বাংলায় বলল, মহিলা বলে নয়, এঁরা খ্রিস্টান বলেই সাধুরা আপত্তি করছে।

বিবেকানন্দ বললেন, কী অদ্ভুত কথা! এখানে চতুর্দিকে মুসলমানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুসলমানরা সব রকম ব্যবস্থা করছে, মুসলমান ছড়িদার অমরনাথে নিয়ে যাবে, তাতে আপত্তি নেই, খ্রিস্টানের বেলায় আপত্তি?

দ্বারিকা বলল, মুসলমানরা স্থানীয় মানুষ। হিন্দুদের সঙ্গে আত্মীয়তার মতন সম্পর্ক হয়ে আছে। এঁরা বিদেশিনী, তার ওপর খ্রিস্টান, এঁদের আচার-আচরণ বিষয়ে এখানকার কেউ কিছু জানে না।

বিবেকানন্দ বললেন, আমি অমরনাথ দর্শনে যাব। এঁদের এতদূর সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এখন ফিরিয়ে দেব? কিছুতেই না। দেবমন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এটা তো একটা গ্রাম। এখানে সব ধর্মের মানুষেরই থাকার অধিকার আছে।

দ্বারিকা কুণ্ঠিতভাবে বলল, ভাই নরেন, তা বলে সাধুদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষের পথে যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিবেকানন্দ বললেন, সংঘর্ষ আমি চাই না, কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই। কাশ্মীরে সূর্যপূজারী, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান এক সঙ্গে থেকেছে। খ্রিস্টানরাই বা পারবে না কেন?

আরও একটুক্ষণ এই রকম কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ একটু দূরে ঘন ঘন প্রবল জোকার শোনা যেতে লাগল। ওরা মুখ তুলে দেখল, এক দীর্ঘকায় নাগা সন্ন্যাসী, এগিয়ে আসছে এদিকে। তার পরনে সামান্য কৌপিন, সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, হাতে একটা লম্বা ত্রিশূল, মাথায় কুণ্ডলি পাকানো জটা।

দ্বারিকার বুক গুরুগুরু করে উঠল। এখন পুলিশ ডেকেও কোনও লাভ হবে না। পুলিশ দিয়ে এত ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীদের দমন করা যায়!

বিবেকানন্দ বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে দু'হাত রেখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নাগা সন্ন্যাসী কাছে এসে বিবেকানন্দর আপাদমস্তক দেখলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ বোলালেন বিদেশিনীদের মুখে। তারপর আবার বিবেকানন্দর দিকে ফিরে একটা হাত তুললেন।

বিবেকানন্দ এবার হাত জোড় করে বললেন, প্রণাম সাধু মহারাজ।

নাগা সন্ন্যাসী হিন্দিতে গম্ভীরভাবে বললেন, তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি, তুমি যোগী। তোমার যোগবিভূতি আছে। কিন্তু যখন তখন তা প্রকাশ করতে যেয়ো না। প্রথা মাত্রই ভাল নয়, কিন্তু প্রথা ভাঙতে যাওয়ার আগে অনেক বিবেচনা করতে হয়। এখানকার সন্ন্যাসীরা এই ম্লেচ্ছ স্ত্রীলোকদের কাছাকাছি থাকতে চায় না। তুমি বা জেদ করছ কেন? ওই দ্যাখো, পাহাড়ের উচ্চস্থানে অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে। তুমি সেখানে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করো না কেন? কিছুটা দূরত্ব রাখো।

বিবেকানন্দ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আপনার কথা শিরোধার্য। আমি তাঁবু সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু মহারাজ, আমি এঁদের সঙ্গে নিয়ে অমরনাথের পথে অবশ্য যাব।

নাগা সন্ন্যাসী বললেন, যেয়ো। আমি থাকব তোমার পাশে পাশে। এই স্ত্রীলোকদের বলো, ভক্তিভরে সাধুদের সেবা করতে। তাদের তণ্ডুল ও ফল দান করলে তারা খুশি হবে।

বিবেকানন্দ বললেন, এরা ভক্তি নিয়েই এসেছে। নিশ্চয়ই সাধু-সেবা করবে।

সমস্যাটা এত সহজে মিটে যাওয়ায় সকলেই খুশি হল। কিন্তু দ্বারিকা বেশ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ফেরার পথে তার মুখে লেগে রইল অসন্তোষের ক্লিষ্ট ভাব। তার স্ত্রী কি মায়াবিনী? বসন্তমঞ্জরী দিন দিন কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার শরীরটা কাছে থাকে, কিন্তু মনটা ধরাছোঁওয়া যায় না। এ রকম এক রমণীকে নিয়ে সে ঘর করবে কী করে?

বসন্তমঞ্জরী একই জায়গায় বসে আছে। দ্বারিকাকে দেখেই সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, তোমায় চিনতে পেরেছে, তাই না? আমি ঠিক বলিনি।

দ্বারিকা কঠোরভাবে বলল, বাসি, তুই এসব কী করে বলিস, আমি জানতে চাই। তুই জাদু জানিস?

বসন্তমঞ্জরী বলল, না, না। আমি কিচ্ছু জানি না। তবু মাঝে মাঝে এমন দেখতে পাই। বিশ্বাস করো, আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই শিখিনি, তবু হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা মনে আসে। তুমি যখন চলে গেলে তখন আর একটা কথা মনে এল। আমার অমরনাথ যাওয়া হবে না। জুতো, মোজা, কম্বল যা কিনেছ, সব বিলিয়ে দাও।

দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, কেন অমরনাথ যাওয়া হবে না? আমি সব ব্যবস্থা করেছি। নরেনদের দলের সঙ্গে সঙ্গে যাব।

বসন্তমঞ্জরী বলল, অমরনাথ যদি যাই, তবে আমি আর তোমার স্ত্রী থাকব না। আমি হারিয়ে যাব। আমি মহামায়ার মধ্যে মিলিয়ে যাব।

উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছড়িয়ে সে বলল, এই যে এত নির্মল আকাশ, মহান মহান পাহাড়, এত ফুল, এত সুন্দর গন্ধ, এই সুন্দর আর আমার সহ্য হচ্ছে না। এখানে আর বেশিদিন থাকলে সত্যিই আমি হারিয়ে যাব। আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো। সেখানে পাহাড় নেই, এমন বন-জঙ্গলের পাগল করা গন্ধ নেই। সেখানে বাড়ির ঘাড়ে বাড়ি, মানুষের ঘাড়ে মানুষ, সব সময় চেঁচামেচি, রাস্তায় কাদা, গাড়ি ঘোড়ার কর্কশ শব্দ, সন্ধেবেলা উনুনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় জ্যোৎস্না রাত দেখা যায় না, মানুষ মানুষের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করে, নিন্দে করে, আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সেখানে গেলে আমি আবার সাধারণ হয়ে যাব, তোমার বউ হয়ে থাকব, তোমার পদসেবা করব। ওগো আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো—।

৪৫

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, তিনজন বিদেশিনীকে নিয়ে অমরনাথ শিখরে যাওয়া বেশ কঠিন, তাতে অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা। তা ছাড়া এই মহিলাদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। পথ অতি দুর্গম। ইওরোপ-আমেরিকাতে শৈলচূড়াতেও অনেক আরাম-বিলাসের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু এখানকার এই পথ শুধু তীর্থযাত্রীদের জন্য, এ পথের যাত্রীরা যত বেশি কষ্ট সহ্য করে, ততই পুণ্যফল বাড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ একাই যাবেন ঠিক করলেন। বিদেশিনীরা পথের বিঘ্ন অগ্রাহ্য করেও পর্বতারোহণে আগ্রহী ছিলেন, স্বামীজির কথায় তাঁদের মধ্যে দুজন নিবৃত্ত হলেও নিবেদিতা জেদ ছাড়লেন না। তিনি যাবেনই। তিনি এ দেশে এসেছেন স্বামীজির প্রেরণায়, স্বামীজির পাশে পাশে থাকতে চান, তাঁর প্রতিটি কর্ম থেকে নিতে চান নতুন নতুন শিক্ষা, তিনি পহলগাঁও-তে পড়ে থাকবেন কেন? কিন্তু তিনটি রমণীর এক সঙ্গে থাকা, আর একা এক যুবতীর পক্ষে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গিনী হওয়ায় অনেক তফাত। লোকে আরও নানারকম কু কথা বলবে। সাধুদের দল আপত্তি তুলতে পারে। একমাত্র নাগা সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সাধু-সন্ন্যাসীরা এখনও বিবেকানন্দর সঙ্গে এই বিধর্মী রমণীদের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি।

নিবেদিতা কোনও যুক্তি মানবেন না। তিনি চোখ ছলছল করে বসে রইলেন।

তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বালানো হয়েছে, সেই আগুন ঘিরে বসেছেন সবাই। অন্য সব তাঁবুগুলি নীচের দিকে, সেখানেও সাধুরা ধুনি জ্বালিয়ে গান গাইছে, এখান থেকে দেখা যায় সেই সব আগুনের মালা, শোনা যায় খোল-করতালের ধ্বনি। কাল ভোরে যাত্রা শুরু হবে। স্বামীজি একটা চুরুট টানতে টানতে নিবেদিতাকে অনেকক্ষণ ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তারপর এক সময় অধৈর্যভাবে বললেন, লোকনিন্দার কথা না হয় অগ্রাহ্য করা গেল, তুমি এই পাহাড়ি পথে উঠতে পারবে? বারো-চোদ্দো হাজার ফুট উঁচুতে আগে উঠেছ কখনও? তোমাদের দেশে তো এত উঁচু পাহাড়ই নেই।

নিবেদিতা বললেন, আমি আগে যা যা করিনি বা পারিনি, এখন সে রকম অনেক কিছু পারার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

স্বামীজি বললেন, তোমার পায়ে ওই তো শৌখিন জুতো। ওই জুতো পরে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা যায়? খালি পায়ে চলার তো তোমাদের অভ্যেস নেই।

নিবেদিতা বললেন, দরকার হলে খালি পায়ে যাব।

জো ম্যাকলাউড নিবেদিতার সব ব্যাপারেই প্রশ্রয় দিতে চান। তিনি বললেন, স্বামীজি, কয়েক দিন আগেও আপনার শরীর অসুস্থ ছিল। আপনি যদি এই হিমগিরিতে উঠতে পারেন, তা হলে ও পারবে না কেন? আপনার সেবার জন্যও তো একজন কারুর সঙ্গে যাওয়া দরকার।

স্বামীজি গম্ভীরভাবে বললেন, সন্ন্যাসীদের কারুর সেবার প্রয়োজন হয় না।

জো ম্যাকলাউড বললেন, কিন্তু এখানে কয়েকজন বড় বড় সাধুকে যে দেখলাম, শিষ্যদের দিয়ে পা টেপাচ্ছেন, তামাক সাজাচ্ছেন!

এই সময় নিবেদিতার সমর্থনে আর একজন এগিয়ে এল। এই লোকটির নাম শেখ শহীদুল্লা, সরকারের পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রীদের সব রকম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার ওপর। এখানে ইংরেজি জানা লোক পাওয়া দুষ্কর, শহীদুল্লা গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারে। এই কয়েক দিনে তার সঙ্গে

এই তিন বিদেশিনীর বেশ ভাব হয়ে গেছে। বছর বত্রিশেক বয়েস, সে অতি সুদর্শন ও সপ্রতিভ যুবক। আগামীকাল সে পুরো দলটির ছড়িদার হিসেবে যাবে।

শহীদুল্লা বিনীতভাবে বলল, বিবেকানন্দজি, আপনি এত আপত্তি করছেন কেন? এই মেমসাহেব চলুক না আমাদের সঙ্গে। কত দূরদেশ থেকে এসেছেন, আমাদের এই তীর্থস্থান দর্শন করতে চান, এ তো আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা। ওঁর কোনও অসুবিধে হবে না। আমরা দেখাশুনো করব।

বিবেকানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওর দায়িত্ব নিতে পারবে?

শহীদুল্লা বলল, অবশ্যই।

বিবেকানন্দ নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে থাকে যেন, তুমি সর্বসময় আমার দেখা পাবে না। এই শহীদুল্লার ওপরেই তোমাকে নির্ভর করতে হবে।

জো ম্যাকলাউড নিবেদিতার দিকে নিজের রুমালটি এগিয়ে দিয়ে বলল, চোখ মুছে ফেলো, মার্গারেট, শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্কল্পেরই জয় হল।

অশ্রুসজল নেত্রেই এবার হাসলেন নিবেদিতা। তার মুখখানি যেন শিশির ভেজা ফুল্ল কুসুম।

শ্রীমতী প্যাটারসন আগেই ফিরে গেছেন, অপর দুই মার্কিনি মহিলা থাকবেন কোথায়? অমরনাথ শিখর থেকে ফিরে আসতে অন্তত ছ-সাতদিন লাগবে। বিবেকানন্দ প্রস্তাব করলেন, ওঁদের শ্রীনগরেই ফিরে যাওয়া উচিত, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

ওঁরা দুজনেই বললেন, তা কখনও হয়? আপনারা ওই বিপদসঙ্কুল পথে যাবেন, আর আমরা শ্রীনগর শহরে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকব? আমরা এই তাঁবুতেই থেকে যাব, আপনারা পাহাড় থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাব।

কিন্তু কাল সকালে তীর্থযাত্রীরা সবাই চলে গেলে এই পহলগাঁও যে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। দুজন বিদেশিনী শুধু এখানে থাকবেন কী করে!

জো ম্যাকলাউড জোর দিয়ে বললেন, এই ফাঁকা জায়গাতেই তাঁদের থাকতে ভাল লাগবে। ভয়ের কী আছে?

পরদিন ভোরবেলা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে শুরু হল যাত্রা। যাত্রীদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ছড়িদার শহীদুল্লার সঙ্গে জনা দশেক কর্মচারী। নিবেদিতার তাঁবু আর মালপত্র বহন করে নিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত হল তিনজন ভৃত্য। পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে স্বরিকা, তাকে দেখে বিবেকানন্দ কৌতূহলী চোখে তাকাতেই সে বলল, ভাই নরেন, আমার আর অমরনাথ দর্শন হল না। সঙ্গে স্ত্রীকে এনেছি, সে ভয় পাচ্ছে, তার মাথা ঘুরে যাবে, কিংবা কিছু একটা হবে। তাকে ফেলে তো আর যেতে পারি না!

বিবেকানন্দ কিছু না বলে হাসলেন। সাংসারিক লোকের বন্ধন। যাদের নিজেদের মনের জোর নেই, তারাও মাগ-ছেলের নামে দোষ দেয়।

নিবেদিতা আর বিবেকানন্দ রয়েছেন যাত্রীদলের প্রায় শেষের দিকে। কিছুক্ষণ চলার পরেই নিবেদিতা দেখলেন, স্বামীজি তাঁর পাশে নেই। কিছু না বলেই এগিয়ে গেছেন। একটা বাঁক ঘোরার মুখে তাঁর চোখে পড়ল, ওপরের পাকদণ্ডিতে একদল সাধুর মাঝখানে রয়েছেন বিবেকানন্দ, তিনি ওদের-সঙ্গে গলা মিলিয়ে দু হাত তুলে আওয়াজ তুলছেন, হর হর ব্যোম ব্যোম।

প্রথম বিশ্রামস্থল চন্দনবাড়ি, সেখানে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। পহলগাঁওতে ঠাণ্ডা বিশেষ ছিল না, এটুকু পথ উঠতেই শীতের কাঁপুনি লেগে গেল। মালবাহকেরা নিবেদিতার মাথার ওপরে বড় ছাতা মেলে ধরেছে, নিবেদিতা দেখার চেষ্টা করলেন স্বামীজি বৃষ্টিতে ভিজছেন কি না। তাঁকে দেখা গেল না। অধিকাংশ যাত্রীই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মহানন্দে লাফাতে লাফাতে চলেছে।

চন্দনবাড়ি উপত্যকায় তাঁবু ফেলতে হবে, তখনও বিবেকানন্দ দেখা নেই। শহীদুল্লা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, কোনও চিন্তা করবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মিস নোবল, অন্য সব তাঁবুর চেয়ে আপনার তাঁবু একটু দূরে রাখাই ভাল। তাতে আপনার কেউ ব্যাঘাত ঘটাবে না।

শহীদুল্লার নির্দেশে বেশ সুচারুভাবে তাঁবু প্রতিষ্ঠিত হল। তার পেছন দিকেই পাহাড়ের পর পাহাড়। ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সন্ধ্যার আকাশ, কয়েক দিন পরই রাখিপূর্ণিমা, বৃষ্টি থেমে গিয়ে এখন ঝলমল করছে জ্যোৎস্না।

পোশাক বদল করে নিবেদিতা অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি একবারও আসবেন না? কিছুক্ষণও সঙ্গ দেবেন না? নিবেদিতা কী দোষ করেছেন! শুধু নারী হওয়াই কি তাঁর অপরাধ?

তাঁবুর মধ্যে বসে থাকা অসহ্য বোধ হল। নিবেদিতা বেরিয়ে এলেন। দূরের তাঁবুগুলো থেকে একটা কোলাহল ভেসে আসছে। কিছু কিছু দোকানপাটও বসে গেছে এর মধ্যে। এই দোকানিরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। ভিখারি ও চোর-জোচ্চোরও কিছু মিশে থাকে, শহীদুল্লা আগেই সে ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে গেছে।

নিবেদিতা ভাবলেন, তিনি অন্য যাত্রীদের থেকে সবসময় দূরত্ব বজায় রাখবেন কেন? সবসময় কেন মনে রাখতে হবে যে তিনি বিদেশিনী, শ্বেতাঙ্গিনী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে না মিশলে কী করে তিনি ভারতাত্মার সন্ধান পাবেন?

বাজার উজাড় করে জো ম্যাকলাউড অনেক রকম ফল আর প্রচুর চিঁড়ে, খই, গুড় কিনে নিবেদিতার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। একটা ঝোলায় করে সেই সব কিছু কিছু নিয়ে একজন ভৃত্যের সঙ্গে তিনি এগিয়ে গেলেন অন্য তাঁবুগুলোর দিকে। প্রথম একটি তাঁবুতে একজন বড় দরের সাধুকে ঘিরে তাঁর চেলারা বসে গান গাইছে। সাধু মহারাজ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন পা ছড়িয়ে, পিঠের ওপর কম্বল চাপা দেওয়া থাকলেও তাঁর পায়ের উরু পর্যন্ত উন্মুক্ত, সেখানে গরম তেল মালিশ করছে একজন অল্পবয়েসী শিষ্য। নিবেদিতাকে সেখানে এসে দাঁড়াতে দেখে সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল।

নিবেদিতা বাংলা ও সংস্কৃত কিছুটা শিখলেও হিন্দি একেবারেই জানেন না। ভাঙা-ভাঙা বাংলা-সংস্কৃত মিলিয়ে বললেন, আমি মাননীয় সন্ন্যাসীকে পাদ্যার্ঘ্য দিতে এসেছি, তিনি গ্রহণ করলে ধন্য হব।

সবাই নিস্তব্ধ, সাধুটি নিবেদিতার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ছিলিম টানতে লাগলেন।

নিবেদিতা এগিয়ে এসে ফলাহার সমেত একটি পাত্র রাখলেন সাধুর পায়ের কাছে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ভক্তিনম্র ভঙ্গিতে মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন।

সাধু ও তার শিষ্যগণ কখনও কোনও মেমসাহেবকে এমন অবস্থায় দেখেনি। রাজার জাতের রমণী হয়েও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে জানে! সাধুটি আর দ্বিধা করলেন না, নিবেদিতার মাথার কিছুটা ওপরে হাত রেখে আশীর্বাদ জানালেন।

এইভাবে পরপর কয়েকটি সাধুর শিবিরে গিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন নিবেদিতা। তিনি যে শুধু এক বিলেত ফেরত সন্ন্যাসীর সঙ্গে হুজুগে মেতে আসেননি, সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা আছে, এই ধারণাটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। নিবেদিতা অনেকেরই মন জয় করে নিলেন। কিন্তু যিনি তাঁর হৃদয়ের রাজা, তিনি দূরে দূরেই থাকবেন?

তাঁবুতে ফিরে আসার পর নিঃসঙ্গতা যেন তাঁকে আবার পেয়ে বসল। ভারতের মাটিতে পা দেবার পর প্রথম কয়েকটি দিন হোটেলে থাকতে হয়েছিল, তারপর থেকে ওলি বুল ও জো ম্যাকলাউডের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, দুজনেই তাঁকে খুব স্নেহ করেন, বিশেষত জোর সঙ্গে এমনই একটা নিবিড় সম্পর্ক হয়েছে যে সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা তাঁকে বলা যায়। এত দিনের ভ্রমণে আজই প্রথম নিবেদিতাকে সম্পূর্ণ একাকী থাকতে হবে।

হঠাৎ বিবেকানন্দ সেই তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে জপের মালা। ভেতরে এসে তিনি তাঁবুর চারপাশটা দেখলেন, একজন ভৃত্যকে ডেকে বললেন, ওরে, এই কোণে ফাঁক হয়ে রয়েছে কেন, এখান দিয়ে যে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকবে। টেনে বেঁধে দে এক্ষুনি। বোতলে গরম জল ভরে দিদিমণিকে কম্বলের মধ্যে দিবি।

মালা জপ করতে করতে বিবেকানন্দ কাজকর্মের তদারক করলেন। তারপর নিবেদিতার দিকে ফিরে বললেন, তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ো। কাল আবার ভোরে বেরুতে হবে।

বড় জোর মিনিট পাঁচেকের জন্য অবস্থান। নিবেদিতাকে তিনি একটা কথা বলারও সুযোগ দিলেন না।

এরপর কি সহজে ঘুম আসে? চোখে জল এসে যায় বারবার। এই যে ইচ্ছাকৃত ব্যবধান রচনা, এ তো অবহেলারই নামান্তর। স্বামীজি কি তাঁকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে চান? অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে শুয়ে থেকে নিবেদিতা মনে মনে বললেন, ঠিক আছে, আমি দেখতে চাই, উনি আমাকে কত কষ্ট দিতে পারেন?

নিবেদিতা খুব আশা করেছিলেন সকালবেলা যাত্রা শুরু করার আগে বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই একবার আসবেন। তিনি এলেন না। নিবেদিতা ভোর থেকেই তৈরি হয়ে বসেছিলেন প্রতীক্ষায়। মালবাহকরা বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, তাঁবু গোটাব? সব জিনিসপত্র বার করে নেব? নিবেদিতা বলছিলেন, একটু পরে, একটু পরে।

শহীদুল্লা এক সময় এসে বলল, এ কী, এখনও গুছিয়ে নেননি! অনেকে যে এরই মধ্যে এগিয়ে পড়েছে।

নিবেদিতা আর কিছু বললেন না। শহীদুল্লার নির্দেশে দ্রুত সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। শহীদুল্লা বলল, মিস নোবল, ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছেন তো? পথে আর সময় পাবেন না।

নিবেদিতা মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে।

কাল রাত্তিরেও কিছু খাননি, আজ সকালেও তাঁর কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। স্বামীজি কী খাচ্ছেন, কোথায় বসে, কাদের সঙ্গে? নিবেদিতা ঠিক করেছেন, স্বামীজি নিজে এসে না বললে তিনি এই পুরো যাত্রাপথে কিছুই খাবেন না।

বেশ চড়া রোদ উঠেছে, তুষারমণ্ডিত পাহাড়ে যেন সেই রোদ ঠিকরে পড়ে। কাল সন্ধেবেলা এই উপত্যকা একটা অস্থায়ী নগরীর রূপ নিয়েছিল, সেই দোকানপাটের আর একটুও চিহ্ন নেই। কত তাঁবু ছিল। এখন সব ফাঁকা। পড়ে আছে কিছু শুকনো শালপাতা, কিছু উচ্ছিষ্টের ভগ্নাংশ। যাত্রীর দল চলেছে এঁকে বেঁকে, যেন সুবৃহৎ এক সরীসৃপ।

বিষণ্ণ মনে মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলছেন নিবেদিতা। হঠাৎ জলদমন্দ্রে ডাক শুনলেন, মার্গট!

চমকে মুখ তুলে নিবেদিতা দেখলেন, একটা বড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ, চোখাচোখি হতেই তিনি স্মিতহাস্যে বললেন, গুড মর্নিং। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল?

নিবেদিতা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ভাল করে ঘুমিয়েছিলেন?

বিবেকানন্দ বললেন, কতক্ষণে অমরনাথের দর্শন হবে, এই বাসনায় আমি ছটফট করছি। এই অবস্থায় কি ঘুমোনো যায়? আর কোনও তীর্থস্থান সম্পর্কে আমার এমন উতলা ভাব হয়নি। শোনো, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি একটা কারণে। সামনের পথটা দেখ—

পথটা ঢালু হয়ে কিছুটা নেমে গেছে, তারপর অনেকখানি তুষারাবৃত, একটা বরফের নদী বলে মনে হয়। কিছু কিছু যাত্রী ওর ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে, কেউ কেউ যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে।

বিবেকানন্দ বললেন, ওই দেখো, এক বুড়ি কেমন দিব্যি খালি পায়ে এই বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। আমি চাই, তুমিও এই পথটুকু খালি পায়ে হেঁটে পার হও। তুমি সকলের সমান হও। তোমার কষ্ট হবে খুব জানি, কোনওদিন অভ্যেস নেই, তবু—

নিবেদিতা নিচু হয়ে পা থেকে জুতো খুলে ফেলে ছুঁড়ে দিলেন দূরে। তারপর বললেন, আমি আর জুতো পরবই না।

বিবেকানন্দ বললেন, আমি তা বলিনি। অন্য সময় পরতে পারো। শুধু এই পথটা।

নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে বললেন, আমি আর জুতো পরতে চাই না।

বিবেকানন্দ একজন মালবাহককে জুতো জোড়া তুলে নেবার ইঙ্গিত করে সেই বরফের নদীতে পা দিলেন।

হঠাৎ নিবেদিতার মনটা ভাল হয়ে গেল। বাচ্চা বয়েসে বরফ নিয়ে কত খেলা করেছেন। এটাও যেন খেলা। বরফের মধ্যে পড়ে গেলেও তো ক্ষতি নেই, ব্যথা লাগে না। যারা আছাড় খাচ্ছে, তারাও মহানন্দে হো-হো করে হাসছে।

বিবেকানন্দর হাতে রয়েছে একটা লম্বা লাঠি, নিবেদিতার কিছুই নেই, তবু তিনি বেশ সাবলীলভাবে হাঁটতে লাগলেন। বরফ কোথাও ঝুরো ঝুরো, কোথাও পাথরের মতন শক্ত ও পিচ্ছিল। ব্যালে নর্তকীর মতন দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে নিবেদিতা লঘু পায়ে এগোচ্ছেন, বিবেকানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, বাঃ, তুমি বেশ পেরে যাচ্ছ তো ! পায়ে লাগছে না ?

নিবেদিতা বললেন, মাত্র কয়েকটা শতাব্দী আগে আমরা সবাই তো খালি পায়েই হাঁটতাম !

বিবেকানন্দ প্রথম যে বৃদ্ধাকে দেখিয়েছিলেন, সেই বৃদ্ধাটি মাঝপথ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, মুখখানা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি ওর হাত ধরব ? আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।

বিবেকানন্দ বললেন, হঠাৎ করে কারুকে ধরতে যেয়ো না। ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ব্যাপার আছে। কখনও সে রকম হলে আগে জিজ্ঞেস করে নেবে। এ বুড়ি মাগি নিজেই পেরে যাবে মনে হয়, এখন একটু দম নিচ্ছে।

খানিক বাদে নিবেদিতার মনে হল, এই বরফের নদীটা অনেক চওড়া, কিংবা অন্তহীন হল না কেন ? ততক্ষণ স্বামীজি তাঁর সঙ্গে থাকতেন। বরফ শেষ হবার পর আবার খাড়াই পাহাড়ি পথ। বিবেকানন্দ আর কিছু না বলে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

এর পর স্বামীজি সারা দিনে দুবার মাত্র অল্প সময়ের জন্য দেখা করে গেলেন নিবেদিতার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময়টাই কাটালেন অন্য সাধুদের সঙ্গে। প্রচুর কষ্টসাধ্য চড়াই পথ ভেঙে সন্ধেবেলা নিবেদিতা পৌঁছলেন বারো হাজার ফুট উচ্চে, ওয়াবজান নামক এক স্থানে। খটাখট শব্দে তাঁবু খাটানো চলতে লাগল। আজ সকলেই খুব ক্লান্ত। নিবেদিতা কোথাও বিবেকানন্দকে খুঁজে পেলেন না। তাঁর খালি আশঙ্কা হয়, স্বামীজি এত ধকল সহ্য করতে পারবেন তো ? কিছুদিন আগেও মাঝে মাঝেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু এই পথে স্বামীজি তাকে সেবা করার সুযোগ দিতে চান না।

সন্ধেবেলা কিংবা রাত্তিরেও বিবেকানন্দ একবারও তাঁর খোঁজ নিতে এলেন না।

নিবেদিতা একা একাই তাঁবুর বাইরে ঘুরে বেড়ালেন। এখানকার দৃশ্য ভারী মনোহর। অনেক নীচে দেখা যায় শেষনাগ হ্রদ। নিস্তরঙ্গ, নীল জল পড়ে আছে দর্পণের মতন। চতুর্দিকে গোল হয়ে ঘিরে আছে তুষারশুভ্র শিখরগুলি। আজ আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নেই। চরাচর ধুয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়।

সুন্দরের মহিমা কি একা একা উপভোগ করা যায় ? স্বামীজি কিছুতেই কেন কাছে আসবেন না ? তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে গেলে কী দোষ হত ! তিনি কি ভাবছেন না যে এখানে নিবেদিতার সঙ্গে দুটো কথা বলার মতনও কোনও লোক নেই।

পরদিন সকালেও এলেন না বিবেকানন্দ। যাত্রা শুরু করার একটু পরেই এক জায়গায় হইচই শুনে নিবেদিতা কৌতূহলী হলেন। তিনি দেখলেন, পথের ডান পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী, একদল লোক সেখানে স্নান করছে। কেউ কেউ স্নান সেরে উঠে এসে শীতে হি হি করে কাঁপছে, কেউ কেউ জলে নামার আগে সাহস সঞ্চয় করার জন্য ঠাকুর-দেবতাদের নাম উচ্চারণ করছে। সেই স্নানার্থী জনতার মধ্যে বিবেকানন্দকে দেখতে পেলেন নিবেদিতা।

তিনি ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে বললেন, আপনি এ কী করছেন ! এই ঠাণ্ডার মধ্যে আপনি জলে নামবেন ?

বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, হ্যাঁ।

নিবেদিতা বললেন, আপনার শরীর ভাল নেই। ঠাণ্ডা জলে স্নান করার ফল মারাত্মক হতে পারে। আমার অনুরোধ, না, না, আমি মিনতি করছি, আপনি জলে নামবেন না।

বিবেকানন্দ বললেন, তুমি আমাকে এ অনুরোধ কোরো না। অন্যান্য সাধুরা যেসব রীতিনীতি পালন করছেন, আমিও তা মেনে চলব ঠিক করেছি। আমার কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি এগোও।

নিবেদিতা তবু দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বিবেকানন্দ আদেশের সুরে বললেন, এত পুরুষ স্নান করছে, এখানে তোমার থাকাটা ভাল দেখায় না। তুমি যাও।

বুকভরা অভিমান নিয়ে নিবেদিতা আবার চলতে শুরু করলেন। উনি নিজের শরীরের কথাও চিন্তা করবেন না ? যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন ! নিবেদিতার আর হাঁটতে ইচ্ছেই করছে না।

খানিক বাদে একটি কিশোর ছুটতে ছুটতে এসে বলল, আপনাকে এক সাধু অপেক্ষা করতে বলেছেন। আপনি একটু দাঁড়ান।

সেই কিশোরের ভাষা বুঝতে না পারলেও বক্তব্য বোঝা গেল, অন্য যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে নিবেদিতা এক জায়গায় দাঁড়ালেন। কোন সাধু তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছেন ?

এই শীতের মধ্যেও বিবেকানন্দ কোনও উষ্ণ বস্ত্র পরেননি, গায়ে ভিজে কাপড় জড়ানো। উৎফুল্ল মুখে হন হন করে এগিয়ে এসে বললেন, এই দ্যাখো, মার্গট, স্নান করে আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং বেশ চাঙ্গা বোধ করছি। এখন এক ছিলিম তামাক পেলে বেশ হত।

নিবেদিতা বললেন, আপনি এক্ষুনি ভিজে কাপড় ছাড়ুন।

বিবেকানন্দ বললেন, ওসব পরে হবে। কালকের চড়াই পথ বেশ খারাপ ছিল। শুধু রুক্ষ পাথর, মাঝে মাঝে খুব ধারালো। তোমার পায়ের অবস্থা কী, দেখি !

নিবেদিতা সঙ্কুচিতভাবে বললেন, আমার পা ঠিক আছে।

বিবেকানন্দ বললেন, তোমার পায়ের পাতা দুটো দেখাও

নিবেদিতা বললেন, কিছু হয়নি, আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বিবেকানন্দ বললেন, তুমি দেখাবে, না আমি জোর করে দেখব ?

অগত্যা নিবেদিতাকে বসে পড়ে পায়ের পাতা দেখাতেই হল। তা ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্তাক্ত।

বিবেকানন্দ বললেন, আমি ঠিক অনুমান করেছিলাম। সেই হাঁটি হাঁটি পা পা বয়েস থেকে তোমাদের জুতো পরার অভ্যেস। আমি কি তোমাকে পাথরের ওপর খালি পায়ে হাঁটতে বলেছি ? তুমি জেদ করে জুতো পরোনি। আমরা সন্ন্যাসী, তুমি তো সন্ন্যাসিনী নও, তোমার শারীরিক নিগ্রহের প্রয়োজন নেই। আমি শহীদুল্লাকে বলেছি, সে তোমার জন্য ঘোড়া কিংবা ডুলির ব্যবস্থা করবে।

নিবেদিতা বললেন, না, না, আমার সেসব কিছু লাগবে না। আমি পায়ে হেঁটেই যেতে পারব।

বিবেকানন্দ বললেন, তোমার পায়ের ওই সাংঘাতিক অবস্থা, এর পর তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড় ? না, তোমার আর হেঁটে যাওয়া চলবে না। কেউ কেউ তো ঘোড়ায় বা ডুলিতেও যাচ্ছে।

এক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে নিবেদিতা বললেন, আপনি আমার অনুরোধ শুনবেন না, তবু আপনার নির্দেশ মানতে হবে আমাকে ?

বিবেকানন্দ বললেন, হ্যাঁ, এ দেশ সম্পর্কে তোমার যে এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে।

নিবেদিতা বললেন, আমি ডুলিতে চড়ব না। ঘোড়া নিতে রাজি আছি, যদি আপনি এক্ষুনি ভিজে কাপড় ছেড়ে গায়ে একটা কম্বল অন্তত জড়িয়ে নেন।

সারা দিন নিবেদিতা ঘোড়ায় চড়েই গেলেন। দুপায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়েছেন, জুতোও পরতে হয়েছে। এ বার যেতে হবে পঞ্চতরণীর দিকে, কখনও চড়াই, কখনও উতরাই, রাস্তা বেশ সরু। দিনের বেলা ঠাণ্ডা অনেক কমে আসে। রাস্তার ধারে ধারে অনেক ফুল ফুটে আছে। বেশ কিছু ফুল নিবেদিতার চেনা লাগে, ইওরোপেও এইসব ফুল দেখা যায়, মাইকেলমাস ডেইজি, অ্যানিমোন, ফরগেট মি নট, কলাম্বাইন, লিলি অফ দা ফিল্ড আর অজস্র বন্য গোলাপ। এই ফুলগুলোর স্থানীয়

নাম জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কারুকে তো জিজ্ঞেস করার উপায় নেই, কেউ তাঁর ভাষা বোঝে না। বিবেকানন্দ আবার ভিড়ে মিশে গেছেন।

কোনও যাত্রী অসুস্থ হয়ে বসে পড়ছে কিনা তা দেখার জন্য ছড়িদার শহীদুল্লাও একটা ঘোড়ায় করে ঘুরছে। এক সময় সে নিবেদিতার পাশাপাশি চলতে লাগল। নিবেদিতা তাকে পেয়ে খুশি হলেন, তবু এর সঙ্গে দুটো কথা বলা যাবে।

নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি প্রতি বছরই এই তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ওপরে যান ?

শহীদুল্লা বলল, গত চার বছর ধরে যাচ্ছি। আমি নিজে ইচ্ছে করেই সরকারের কাছ থেকে এই দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছি।

নিবেদিতা বললেন, পথ বেশ বিপদসঙ্কুল। মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাণও হারায় নিশ্চয়ই ?

শহীদুল্লা বলল, হ্যাঁ, অনেক বুড়ো-বুড়িও তো আসে। প্রতি বছরই বেশ কয়েকজন আর ফেরে না। দু বছর আগে একসঙ্গে বারোজন একটা ধসে পড়ে মারা যায়। বিপদ তো আছেই।

নিবেদিতা বলল, হিন্দুরা এখানে আসে পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। তারা বিশ্বাস করে, এখানে মৃত্যু হলেও তারা স্বর্গে যাবে। মিস্টার শহীদুল্লা, আপনি বিপদের ঝুঁকি নিয়েও এখানে আসেন কেন ?

শহীদুল্লা একটু হেসে বলল, আমি নিষ্ঠাবান মুসলমান। হিন্দুদের মতন দেব-দেবী মানি না। দেব-দেবীর ব্যাপারটাই বুঝি না। তবু এই পথে আসতে ভাল লাগে। এমনকী জানেন, প্রতিবার ফিরে যাবার পর মনে হয়, হিন্দুদের মতন আমিও কিছু পুণ্য অর্জন করলাম।

নিবেদিতা বললেন, আপনার ওপর সবাই খুব ভরসা করে। দু-দিন ধরে দেখছি তো, যে কোনও খুঁটিনাটি ব্যাপারে যাত্রীরা আপনার কাছে দৌড়ে আসে।

শহীদুল্লা বলল, কত দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। এখানে তো আপনজন কেউ নেই। পথঘাটও চেনে না। আমি এখানে জন্মেছি, সব চিনি, প্রত্যেকটি পথের বাঁক পর্যন্ত জানি। এইসব যাত্রীরা আমাদের অতিথি, মানুষের কিছু সেবা করতে পারলে মনটা ভাল হয়ে যায়।

নিবেদিতা বললেন, আপনি খুব উত্তম ব্যক্তি।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শহীদুল্লা ইতস্তত করে বলল, মিস নোবল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? আপনার মতন কারুকে আগে এ পথে দেখিনি। আপনি এত কষ্ট করতে এসেছেন কেন !

নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, কোনও শ্বেতাঙ্গ আগে আসেনি এই পাহাড় শিখরে ?

শহীদুল্লা বলল, হ্যাঁ এসেছে। সাহেবলোকেরা অভিযান-প্রিয় হয়, পাহাড় জয় করতে ভালবাসে। সে রকম কয়েকজন এসেছে। গত বছরই দুজন ফরাসি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তারা ইংরিজিও জানে কিছুটা, আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারা বলল, এখানকার সৌন্দর্য দর্শনের জন্যই তাদের আগমন। ফটোগ্রাফিতেও তাদের শখ আছে। অমরনাথ গুহায় বরফের লিঙ্গটি সম্পর্কে তারা কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ফুলের ছবি তুলেছে, পাহাড়ের ছবি তুলেছে। এরকম কেউ কেউ আসে। কিন্তু আপনার মতন সঙ্গীবিহীন কোনও মেমসাহেবকে কখনও এখানে আসতে দেখিনি।

নিবেদিতা বললেন, আমি একা আসিনি।

শহীদুল্লা বলল, বলতে চাইছি, আপনার নিজের জাতের কেউ সঙ্গে নেই। আপনি এক হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে এসেছেন, হিন্দুরা এক টুকরো পাথর কিংবা মাটি দিয়ে গড়া মূর্তিকেও দেবতাজ্ঞান করে। তারা বিশ্বাস করে, তাই হয়তো সত্যি সত্যি দেখে। বাল্যকাল থেকেই পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী তাদের এই বিশ্বাস জন্মায়। আপনি খ্রিস্টান হয়েও কি তা বিশ্বাস করতে পারবেন ? তা কি সম্ভব ? আপনি অমরনাথে কি শিব দর্শন করতে চলেছেন ?

নিবেদিতা বললেন, স্বামী বিবেকানন্দকে আমি গুরু মেনেছি। তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমি চলতে চাই। বেদান্তের দর্শনে আমি আকৃষ্ট হয়েছি। তবে, আপনি ঠিকই বলেছেন, শিলাখণ্ড কিংবা মাটির

মূর্তি দেখে কী করে দৈবদর্শন হয়, তা এখনও আমি স্পষ্ট বুঝি না। সে অনুভূতি আমার এখনও আসেনি। কিন্তু আমার গুরু নিশ্চিত আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন, তিনি আমার চক্ষু খুলে দেবেন।

শহীদুল্লা বলল, হিন্দুত্বে বিশ্বাসী না হলে এইসব দেব-দেবীর কোনও মূল্য নেই। আপনার গুরু কি আপনাকে হিন্দুত্বে দীক্ষা দেবেন ? আমি যতদূর জানি, কোনও বিধর্মীর পক্ষেই হিন্দু হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দু ধর্ম ছেড়ে মানুষ বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু নতুন কেউ হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করতে পারবে না, ওদের এই এক অদ্ভুত নিয়ম।

নিবেদিতা বললেন, আমার গুরু বলেছেন, জীব মাত্রই শিব, জীব সেবা মানেই শিব সেবা। আমি সেই পথটাই গ্রহণ করতে চাই। আর কোনও ধর্মে আমার প্রয়োজন নেই।

শহীদুল্লা বলল, জানি না, কোনও মানুষের পক্ষে নিজের ধর্মীয় সংস্কার ত্যাগ করা সম্ভব কি না। আর বেশি দেরি নেই, এবার আমাদের থামতে হবে রাত্রির জন্য। মিস নোবল, এর পরের অংশটুকুই কিন্তু সবচেয়ে কষ্টকর। আপনাকে ঘোড়াও ছাড়তে হবে।

সন্ধের আগেই স্থাপিত হয়ে গেল একটি তাঁবু নগরী। এখানকার পাহাড়ে গাছপালা নেই, কিন্তু আগুন জ্বালার জন্য কাঠ দরকার। মালবাহক ও ভৃত্যরা অনেক খুঁজে খুঁজে জুনিপার গাছের ডাল কেটে আনল। নিবেদিতার তাঁবুর সামনেও তৈরি হল একটি অগ্নিকুণ্ড। সারা দিন স্বামীজির সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ আর নিবেদিতা বৃথা প্রতীক্ষায় বসে থাকতে চান না, তিনি স্বামীজিকে খুঁজে বার করে জিজ্ঞেস করবেন, কেন তিনি এত দূরে দূরে থাকছেন ? দিনের বেলাতেও কেন স্বামীজির সঙ্গ থেকে তাঁকে বঞ্চিতা হতে হবে ?

নিবেদিতা খুঁজতে বেরুলেন। এখানে উপত্যকাটি সুপরিসর নয় বলে তাঁবুগুলি ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে, চতুর্দিকে গিসগিস করছে মানুষ, এর মধ্য থেকে কারুকে শনাক্ত করা দুষ্কর। নিবেদিতা তবু ঘুরতে লাগলেন। শত শত অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বাতাস। নানান ভাষায় চেঁচামেচি করছে মানুষ।

ঘুরতে ঘুরতে নিবেদিতা এক জায়গায় দেখলেন, গোল হয়ে কয়েক শত গেরুয়াধারী বসে আছে, তাদের মাঝখানে ধুনির সামনে দাঁড়িয়ে এক জটাজুট সমন্বিত বৃদ্ধ সাধক একঘেয়ে সুরে বেদগান করে যাচ্ছেন। তাঁর কাছাকাছি বসে আছেন বিবেকানন্দ। দূর থেকেই নিবেদিতা বুঝলেন, বিবেকানন্দকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি অবসন্ন। ওখানে তিনি বসে আছেন কেন ? তিনি স্বয়ং বেদজ্ঞ, যে সাধুটি গান গেয়ে শোনাচ্ছেন, তাঁর গলায় সুর নেই, এমন কিছু আহামরি ব্যাপার হচ্ছে না, এখন স্বামীজি একটু বিশ্রাম নিলেই তো পারতেন। তিনি এমন একটা বেষ্টনীর মধ্যে বসে আছেন যে নিবেদিতার পক্ষে লোকজন ডিঙিয়ে সেখানে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। তিনি ডাকলেও স্বামীজি শুনতে পাবেন না। তবে কি স্বামীজি নিবেদিতাকে এড়াবার জন্য ইচ্ছে করে ওইখানে গিয়ে বসেছেন ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস সেখানকার বাতাসে রেখে ফিরে এলেন নিবেদিতা।

আজও তিনি কিছুই খেলেন না। আজ ঘুমোবারও কোনও প্রশ্ন নেই। রাখি পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্নালোকে রাত্রি দু প্রহরে আবার যাত্রা শুরু হবে, যাতে কাল প্রভাতেই অমরনাথ দর্শন করা যায়।

এখানে ডাণ্ডি আর ঘোড়া রেখে দিয়ে আবার পদব্রজে যাত্রা। প্রথমেই দু হাজার ফুট খাড়া চড়াই, সরু পাকদণ্ডি, এখানে অনেকে পা পিছলে পড়ে যায়, প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। নিবেদিতা আজ আগে আগে বেরিয়ে প্রথম দিকে চলে এলেন, আজ স্বামীজিকে ধরবেনই, শেষ পথটুকু তাঁর সঙ্গে যাবেন। কিন্তু তিনি আজ সামনে নেই, নিবেদিতা যে একটু একটু করে পিছিয়ে আসবেন, তাও সম্ভব নয়, অপ্রশস্ত পথ বলে অন্য যাত্রীরা ঠেলে সামনে নিয়ে যায়।

কয়েকবার চড়াই আর উতরাই-এর পর খানিকটা সমতল স্থান একেবারে বরফে ঢাকা। যাত্রীরা জয়ধ্বনি করে উঠল। এই তুষারবর্ষা দেখেই বোঝা যায়, অমরনাথ গুহা অদূরেই। এই বরফ শেষ হবার পর আর বড় জোর এক মাইল।

অন্য যাত্রীদের পথ ছেড়ে দিয়ে নিবেদিতা একটা পাথরের স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। দলে

দলে যাত্রীরা, কেউ লাফাচ্ছে, কেউ ছুটছে, নিবেদিতা তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজতে লাগলেন স্বামীজিকে। হাজার হাজার মানুষ পার হয়ে গেল, কই স্বামীজিকে তো এখনও দেখা যাচ্ছে না। আশঙ্কায় বুক ধকধক করতে লাগল নিবেদিতার। শেষ পর্যন্ত কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন? আর হাঁটতে পারছেন না?

নিবেদিতা ব্যাকুল হয়ে লোকজনদের জিজ্ঞেস করছেন স্বামীজির খবর। অনেকেই বুঝতে পারছে না, কেউ বুঝলেও সঠিক কিছু বলতে পারছে না। সবাই গুহায় যাবার জন্য ব্যস্ত, শহীদুল্লা অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। নিবেদিতা আবার ভাবলেন, তিনি খুঁজতে যাবেন কি না, কিন্তু যাত্রীদের ভিড় ঠেলে বিপরীত দিকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, সবাই সামনের দিকে ঠেলছে।

প্রায় সমস্ত যাত্রী চলে যাবার পর দেখা গেল বিবেকানন্দ আস্তে আস্তে আসছেন। চোখ-মুখ বিবর্ণ, পথশ্রম সহ্য করতে পারছেনই না, হাঁপাচ্ছেন। নিবেদিতা দৌড়ে কাছে গিয়ে বললেন, আপনি বসুন। একটু বিশ্রাম নিন।

বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে পড়ে দম নিলেন। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, দেরি করা যাবে না, শুভ সময় পেরিয়ে যাবে। আমি নদীতে স্নান করে আসছি।

নদী মানে বরফ গলা জল। অসম্ভব ঠাণ্ডা। নিবেদিতা শিউরে উঠে বললেন, এতখানি হেঁটে এসেছেন, এখন স্নান করা মোটেই উচিত নয়। তাতে হৃদরোগ হয়ে যেতে পারে। স্নানের দরকার নেই।

বিবেকানন্দ বললেন, কত মানুষ স্নান করল দেখোনি? আমি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে যাব ঠিক করেছি।

নিবেদিতা বিবেকানন্দর হাত ধরে কাতরভাবে বললেন, আমি মিনতি করছি, এখন স্নান বাদ দিন।

বিবেকানন্দ তাঁর হাতের ওপর নিবেদিতার নবনীত-কোমল হাতখানির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকালেন। তারপর শুষ্ক স্বরে বললেন, আমাকে ধোরো না, মার্গট। তোমাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়েছি মনে নেই? এরকম ভাবে আমাকে ছুঁয়ে আমার সঙ্কট বাড়িয়ো না।

নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলেন। তাঁদের দেশে কোনও পুরুষ মানুষের হাত ছুঁয়ে কিছু অনুরোধ জানানো অতি সাধারণ ব্যাপার। এ দেশে তা যে অশোভন, তা তিনি জানতেন না। তিনি অপরাধিনীর মতন মুখ নিচু করলেন।

বিবেকানন্দ বললেন, তুমি এগোও আমি আসছি।

নিবেদিতা ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন গুহার দিকে। গুহাটি বিশাল, তার মধ্যে একসঙ্গে বহু লোক ঢুকে পড়েছে, ঠেলাঠেলি চলছে, তুষার লিঙ্গটির সামনে কেউ কেউ আনন্দে পাগলের মতন হয়ে চিৎকার করছে, অনেকে মেঝেতে শুয়ে পড়ে মাথা ঠুকছে, সবাই যেন দৈবদর্শনে আপ্লুত। বহু কণ্ঠে হর হর ব্যোম ব্যোম রবে কানে যেন তালা লেগে যায়।

নিবেদিতা এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিক বাদে বিবেকানন্দ এলেন, পরনে শুধু একটা কৌপিন, খালি গা, মুখচোখ রক্তিমবর্ণ, ভাবোন্মাদের মতন ছুটে গেলেন তুষার লিঙ্গের কাছে, বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগলেন ও উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে রইলেন।

তুষার লিঙ্গটি দেখে নিবেদিতা খানিকটা নিরাশই হয়েছেন। মনে মনে আরও অলৌকিক কিছু কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এ তো গুহার ছাদ থেকে চুইয়ে পড়া জল জমে শক্ত বরফের একটা পিণ্ড হয়েছে, লম্বা ধরনের আকৃতি, বহু মন্দিরে যেরকম পাথরের শিবলিঙ্গের পূজা হয়, অনেকটা সেইরকম। প্রকৃতির খেয়ালে নানা জায়গায় বরফের নানা আকার হয়। অনেক গুহার মধ্যে স্ট্যালাগমাইট জমে জমে অবিকল মানুষের তৈরি শিল্পকর্ম মনে হয়, কিন্তু তার মধ্যে তো অলৌকিক কিছু নেই। এই বরফের পিণ্ডকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করারই বা কী কারণ থাকতে পারে। এরই জন্য এত কষ্ট সহ্য করে আসা। নিবেদিতার মনে একটুও ভক্তিভাব জাগল না।

তিনি দেখলেন, সেই তুষার লিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীজি যেন একটু একটু দুলছেন। মনে হল, এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। দৌড়ে গিয়ে ওঁকে ধরা উচিত, কিন্তু—। বিবেকানন্দ কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন গুহা থেকে। বাইরে গিয়ে

হাঁপাতে হাঁপাতে নিশ্বাস নিতে লাগলেন জোরে।

নিবেদিতা পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে? বুকে ব্যথা?

বিবেকানন্দ কথা বলতে পারলেন না, দুবার মাথা নাড়লেন। আরও কিছুক্ষণ দম নেবার পর বললেন, আর একটু হলে গুহার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতাম।

নিবেদিতা বললেন, শহীদুল্লাকে ডাকব? নিশ্চয়ই দলে কোনও চিকিৎসক আছে।

বিবেকানন্দ এবার জোর দিয়ে বললেন, সে কষ্ট না। ওঃ কী দেখলাম। স্বয়ং মহাদেব আমাকে দেখা দিলেন। কী জ্যোতির্ময় উদ্ভাসন। জীবন সার্থক হল।

বারবার এই কথাই বলতে লাগলেন বিবেকানন্দ, নিবেদিতা চুপ করে রইলেন।

আজ রাখি-বন্ধনের দিন, যাত্রীরা চেনা-অচেনা নির্বিশেষে পরস্পরকে রাখি পরাচ্ছে। অনেকে সকাল থেকে উপবাসে থেকে এখন খেতে বসে গেছেন যত্রতত্র। চতুর্দিকে আনন্দের কোলাহল। পূর্বপরিচিত নাগা সাধুটি একটি বড় পাথরের ওপর বসে ফলাহার করছেন, তিনি হাতছানি দিয়ে বিবেকানন্দকে কাছে ডাকলেন। তাঁর শিষ্যরা বিবেকানন্দর হাতেও অনেক খাবার তুলে দিলেন। তিনি তাঁর কিছুটা নিবেদিতাকে দিয়ে বললেন, তুমিও খাও।

নিবেদিতা যে দিনের পর দিন না খেয়ে রয়েছেন, তা বিবেকানন্দ জানেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল। স্বামীজি নিজে তাঁকে খেতে বলেছেন বলেই তিনি এখন আহার্য মুখে দিলেন।

ফেরার পথে কষ্ট কম। হতিয়ার তালাও-এর সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে তাঁরা পহলগাঁও-এ পৌঁছে গেলেন পরদিন দুপুরের মধ্যেই। পূর্ব-প্রত্যাগত যাত্রীদের মুখে মেমসাহেব ও বাঙালি সাধুর নিরাপত্তার খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন জো ম্যাকলাউড আর ওলি বুল। তাঁরা অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন লিদার নদীর ধারে, দুই শ্রান্ত পর্বত-পথিককে তাঁরা সাদরে নিয়ে গেলেন তাঁবুতে।

গরম গরম চাপাটি ও চা খেয়ে খানিকটা চাঙ্গা হবার পর বিবেকানন্দ পরম পরিতোষের সঙ্গে একটা চুরুট ধরালেন।

দুই আমেরিকান রমণী উদগ্রীব হয়ে আছেন ওঁদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য। কিছুক্ষণ ধূমপান করার পর বিবেকানন্দ বলতে শুরু করলেন, আমি অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করেছি। তুষার লিঙ্গ যে সাক্ষাৎ শিব। সেই দেবদর্শনের মধ্যে তিনি যেন আমাকে নিজের মধ্যে টেনে নিতে চাইছিলেন। তার পরই আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন। গুহার মধ্যে পরিবেশটাও কী সুন্দর, কোনও বামুন পাণ্ডার উপদ্রব নেই, কোনও ব্যবসা নেই, খারাপ কিছুই নেই, শুধু নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোনও তীর্থক্ষেত্রে আমি এত আনন্দ উপভোগ করিনি।

বিবেকানন্দ বেশ কিছুক্ষণ নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর জো নিবেদিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, মার্গারেট, তোমার কেমন লাগল? এ বার তোমার কথা বলো।

নিবেদিতা খানিকটা সঙ্কুচিতভাবে বললেন, সত্যি কথা বলব? যে পথ দিয়ে আমরা গিয়েছি, তার দৃশ্য-সৌন্দর্য অপূর্ব। এত বড় বড় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ তো জীবনে দেখিনি। কী মহিমময় রূপ। পথের ধারে ধারে ফুটে আছে কত রকম বাহারি ফুল। চমৎকার সব ছোট ছোট পার্বত্য নদী, নির্মল জলের হ্রদ। এইসব দেখার জন্যই পথের সব কষ্ট সহ্য করাও সার্থক। জীবনের একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হল। কিন্তু, কিন্তু ওই গুহার মধ্যে তুষারের স্তম্ভটি দেখে আমার কোনও উদ্দীপন হয়নি, কোনও দৈবপ্রেরণা বোধ করিনি। প্রকৃতির খেয়াল ছাড়া ওই বরফের জমাট স্তম্ভটির আর কী যে বিশেষত্ব, তা বুঝতে পারলাম না। স্বামীজি তাঁর অভিজ্ঞতার কোনও অংশেও আমাকে দেননি।

বিবেকানন্দ বললেন, তোমার এখনও চক্ষু ফোটেনি, তাই তুমি দেখতে পাওনি। তোমার মন প্রস্তুত নয়, তাই তুমি কিছু উপলব্ধি করতে পারোনি।

নিবেদিতা বললেন, আমি তা স্বীকার করছি। কিন্তু আপনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবেন, আমাকে শেখাবেন। গুহার মধ্যে আপনার যখন অধ্যাত্ম অনুভূতি হল, তখন আমাকেও যদি অনুপ্রাণিত করতেন। আমি ওখানে গিয়ে হতাশ হয়েছি।

বিবেকানন্দ ধমকের সুরে বললেন, মার্গারেট, তুমি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছ।

নিবেদিতা বকুনি সহ্য করতে পারেন না। পৃথিবীর যে একমাত্র মানুষটির কাছে তিনি নিজেকে নিবেদন করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, তাঁর কাছ থেকে কোনও কঠোর বাক্য শুনলে নিবেদিতার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। জো ম্যাকলাউড তাঁকে জড়িয়ে ধরলেও সে কান্না থামে না। জোর বুকে মুখ লুকিয়ে নিবেদিতা শিশুর মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

জো বিবেকানন্দর দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত দিলেন, নিবেদিতাকে কিছু সান্ত্বনার কথা শোনাবার জন্য।

বিবেকানন্দ বললেন, ও এখন কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু এই তীর্থযাত্রা নিষ্ফল হতে পারে না। পরে কখনও এর সুফল ও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবে।

৪৬

বাল গঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে খোদ লন্ডনেও আলোড়ন শুরু হয়েছিল। তিলক প্রকৃতই দোষী না নির্দোষ? র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকারীরা ধরা পড়েছে, তাদের ফাঁসিও হয়ে গেছে, ওই হত্যাকারীদের সঙ্গে তিলক কোনও রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিনা প্রমাণে একজন বিশিষ্ট, শিক্ষিত নাগরিক ও জননেতাকে শাস্তি দেওয়া ব্রিটিশ রুল অব ল-এর বিরোধী। লন্ডনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিচার-ব্যবস্থার ব্যভিচার সম্পর্কে স্পর্শকাতর।

প্লেগ উপলক্ষে বম্বে গভর্নমেন্ট সাধারণ মানুষের ওপর অহেতুক অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়েছে, নারীদের সম্ভ্রম হরণ করেছে, তিলক তার সমালোচনা করেছেন নিজের পত্রিকায়, সেটা কি অপরাধ? বিলিতি পত্রপত্রিকাগুলি সরকারের সমালোচনা করে না?

স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন নামে একজন উদারপন্থী পার্লামেন্ট সদস্য এই নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। জ্বলন্ত ভাষায় তিনি বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করে বললেন, এই ধরনের অত্যাচার শুধু মানবতা-বিরোধী নয়, এর ফলে জগতের চক্ষে ইংরেজদের মর্যাদাও কি কিছুটা হেয় হয়ে যাবে না?

প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন এর উত্তরে জানালেন যে কলোনিগুলিতে অকারণ দমন-পীড়নের নীতি ইংরেজ সরকারের নেই। ভারতের মহারাষ্ট্রে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তার কোনও রিপোর্টও সরকার পায়নি। সত্যিই যদি এরকম কিছু ঘটে থাকে, তাহলে মাননীয় সদস্য স্যার ওয়েডারবার্ন তথ্যপ্রমাণ পেশ করুন। সেগুলি বিবেচনা করে দেখার পর অবশ্যই বম্বে গভর্নমেন্টকে নির্দেশ পাঠানো হবে।

ভারতের এই ঘটনাগুলির বিষয়ে ওয়েডারবার্ন-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ভারতের বহু সংবাদই লন্ডনে পৌঁছয় না, নেটিভদের পত্রপত্রিকাও স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়া অন্য কেউ দেখে না। ওয়েডারবার্ন এসব শুনেছেন গোখলে নামে ভারতীয় কংগ্রেসের এক নেতার কাছ থেকে। গোখলেই তাঁকে উত্তেজিত করেছেন। এখানকার কয়েকটি পত্রপত্রিকাতেও গোখলের উক্তি ছাপা হয়েছে।

গোখলে কিছুদিন ধরে রয়েছেন লন্ডনে, তিনি নিজেও প্রত্যক্ষদর্শী নন। তাঁকে ওই সব ঘটনা সবিস্তারে লিখে জানিয়েছেন আর এক কংগ্রেস নেতা রানাডে। রানাডে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর বিবরণ অসত্য মনে করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। ওয়েডারবার্ন যখন গোখলের কাছে প্রমাণ চাইলেন, তখন ওই চিঠিখানা দিলেই চুকে যেত, কিন্তু গোখলে অনেক বিবেচনা করে ওই চিঠির কথা প্রকাশ করলেন না। রানাডে কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও পেশায় তিনি

হাইকোর্টের জজ, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত হলে তিনি সরকারের কোপে পড়বেন।

গোখলের মুখের কথাই যথেষ্ট নয়, পরবর্তী পার্লামেন্টের অধিবেশনে ওয়েডারবার্ন তাঁর অভিযোগের তথ্যপ্রমাণ দাখিল করতে না পারায় কিছুটা অপদস্থ হলেন, সে প্রসঙ্গ সেখানেই চাপা পড়ে গেল। এর পর গোখলে যখন স্বদেশে ফিরলেন, তখন জাহাজঘাটাতেই বম্বের পুলিশ কমিশনার এসে দাঁড়ালেন তাঁর মুখোমুখি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বম্বে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লন্ডনে অযথা অপবাদ ছড়িয়েছেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ দাখিল করেছেন। এজন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।

গোখলে বললেন, বিলেতে আমি বম্বে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যা বলেছি, তা আমি নিজে সত্য বলে জেনেছি বলেই বলেছি। কিন্তু তার প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। সে জন্য যদি আমাকে ক্ষমা চাইতে হয়, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই ক্ষমা প্রার্থনার কথা চতুর্দিকে রটে যাওয়ায় অনেকে ছি ছি করতে লাগল। গোখলে নিজে যে-সব ঘটনাকে সত্য বলে মনে করেছেন, তা প্রকাশ করার জন্য তিনি ক্ষমা চাইতে যাবেন কেন? বিলেতে বসে তিনি প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি, কিন্তু মহারাষ্ট্রে পৌঁছনোর পর সেই সব অত্যাচারের প্রমাণ তো সব দিকে জাজ্বল্যমান। অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে গোখলে যখন বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তখন বহুসংখ্যক প্রতিনিধি হিস হিস শব্দ করতে লাগল, অপমানিত হয়ে গোখলে মধ্যপথে বসে পড়লেন।

এই অমরাবতী কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, আমরা তিলককে নিরপরাধ মনে করি। প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত তিলক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও কংগ্রেসের এই অভিমত। কিন্তু তিলককে অবিলম্বে কারামুক্ত করতে হবে, সরকারের কাছে এরকম দাবি জানাবার মতন মনোবল কংগ্রেস নেতাদের নেই। তিলকের জন্য তাঁরা অশ্রুবর্ষণ করতে পারেন মাত্র।

বিলেতের পার্লামেন্টে কোনও সুরাহা না হলেও বুদ্ধিজীবীদের ক্ষোভ মিটল না। তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে ঋষিকল্প পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন জানালেন। তিনি লিখলেন, তিলকের কারাদণ্ড শুধু একজন ব্যক্তি বিশেষকে শাস্তি দেওয়া নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে গ্লানিকর।

মহারানি তাঁর ওই ভারতীয় প্রজাটিকে অবিলম্বে মুক্তি দেবার আদেশ জারি করলেন।

সেই আদেশ বম্বে গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছবার পরও তারা একটা শর্ত প্রয়োগ করতে চাইল। তিলককে বলা হল, তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাঁকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে দেওয়া হবে।

ক্ষমা চাইবেন তিলক? কারাগারে বসেই তিনি গোখলের ক্ষমা প্রার্থনার কথা শুনে মর্মাহত হয়েছিলেন। যারা রাজনীতিচর্চা করে, তাদের যখন তখন বিপদের সম্ভাবনা অনিবার্য। সে জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। যারা জনসাধারণের সেবক, কোনও সঙ্কটের সময় তারা শোচনীয় ভীরুতা দেখালে সেই জনসাধারণের সামনে আর কোনও আদর্শ থাকে না। ইংরেজ সরকার ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ভারতীয় নেতাদের অপমানিত করতে চাইছে। তিলক সরাসরি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।

কিন্তু মহারানির নির্দেশ অমান্য করা যায় না। তিলকের মেয়াদ পূর্ণ হতে তখনও ছ' মাস বাকি, তাঁকে বিনা শর্তে ছেড়ে দেওয়া হল। সসম্মানে, মাথা উঁচু করে তিলক বেরিয়ে এলেন কারাগারের বাইরে।

প্লেগ মামলায় তিলকের মুক্তির পর অন্যান্য কয়েদিদেরও একে একে ছেড়ে দেওয়া হতে লাগল। দু' মাস বাদে ছাড়া পেয়ে গেল ভরত সিংহ।

কারাগারের লৌহদ্বার থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভরত বেশ বিস্মিত হয়েছে। শুধু মুক্তিই পায়নি সে, তার সমস্ত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হয়েছে তো বটেই, একটি নতুন কম্বল এবং বেশ কিছু অর্থও দেওয়া হয়েছে তাকে। জেলখানার বন্দিদের প্রতিদিন ঘানি ঘুরিয়ে তেল বার করার কাজ

করতে হয়, সেই পরিশ্রমের বেতনও নির্দিষ্ট আছে। সেই বেতন হিসেবে ভরত পেয়েছে একশো কুড়ি টাকা। বিচিত্র এই সরকারের নীতি। এরা বিনা অপরাধে মানুষকে জেলে ভরে রাখে, আবার ছেড়ে দেবার সময় অযাচিতভাবে কিছু টাকাও হাতে তুলে দেয়।

এই এক বছরের কিছু বেশি সময়ে ভরত একবারও চুল কাটেনি, মুখ মুণ্ডন করেনি। তার মাথা ভর্তি চুলে জট বাঁধা, মুখখানি দাড়ি গোঁফে প্রায় ঢাকা। জেলখানার বাইরে তার জন্য কারুর অপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না, পুণা শহরের একজন মানুষকেও সে চেনে না, শহরটিও তার অজানা, সে একটা কাপড়ের পুঁটুলি বগলে নিয়ে অনির্দিষ্টভাবে হাঁটতে লাগল। মনে মনে সে ভাবছে, চুল-দাড়ি সব কেটে ফেলবে, না রাখবে? তার ভবিষ্যৎ জীবনের ধারার ওপর সেটা নির্ভর করছে। যদি আগের মতন তীর্থে তীর্থে ভ্রাম্যমাণ হয়, তা হলে এগুলি রেখে দেওয়াই সুবিধাজনক। সাধু হও বা না হও, অঙ্গবস্ত্র গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিলে আর বড় বড় চুল দাড়ি রাখলেই লোকে সাধু বলে ধরে নেয়, কিছুটা মান্য করে, যে-কোনও মন্দিরে আশ্রয় নিলে আহার জুটে যায়। এইভাবে ভ্রমণের একটা নেশা আছে। সংসারচিন্তা নেই, কোনও দায়িত্ববোধ নেই, শোক-তাপ ভোগ করতে হয় না। সারাটা জীবনই ঘুরতে ঘুরতে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

অথবা, সমাজের মধ্যেও ফিরে আসতে পারে ভরত। আপাতত তার অর্থসঙ্কট নেই, নিজের সঞ্চিত কিছু এখনও আছে, উপরন্তু জেলখানা থেকে আরও কিছু পেয়েছে, কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে বৎসরখানেকের মতন তার চলে যেতে পারে। এর মধ্যে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু কোথায় যাবে সে? তার ভাগ্যই যে বিড়ম্বিত। যেখানেই সে ভিত গাড়তে যায়, সেখানেই কিছু না-কিছু বিপদ ঘটে। তাকে যারা জড়িয়ে থাকে, তারাই বিপর্যস্ত হয় বেশি। ত্রিপুরা থেকে সে বিতাড়িত, বাংলাদেশে তার স্থান হল না, ওড়িশায় সে চরম আঘাত পেয়েছে। এই পুণাতেই সে থেকে যাবে? এই অচেনা শহরে সে শুরু করতে পারে নতুন জীবন।

চুলে শুধু জটই পড়েনি, উকুনও হয়েছে। জেলখানায় ঘ্যাস ঘ্যাস করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে একটা একটা উকুন ধরে পুট পুট করে টিপে মারা ছিল সময় কাটাবার একটা উপায়। উকুনগুলি এখন দাড়ির মধ্যেও ঘুরে বেড়ায়। এক চৌরাস্তার মোড়ে একজন ক্ষৌরকারের সামনে দুটি লোককে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখে ভরত মনস্থির করে ফেলল। আপাতত এই কেশরাজি সম্পূর্ণ নির্মূল না করে দিলে উকুন তাড়ানো যাবে না। ভরতও বসে পড়ল সেখানে।

এক ঘণ্টা আগে পরে ভরতের চেহারা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেল। ন্যাড়া মাথায় রোদ পিছলে যাচ্ছে, চকচকে গাল, শুধু গোঁফটি রেখে দিয়েছে, না হলে পুরুষত্ব বজায় থাকে না। শরীর বেশ হাল্কা বোধ হল এবং সাধু হয়ে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেটাও চলে গেল। কারাগারে এই শরীর অনেক নির্যাতিত হয়েছে, এখন কিছুদিন আরাম করা যাক।

গণেশখিণ্ডের কাছে একটি মাঝারি ধরনের হোটেলে সে ঘর ভাড়া নিল।

সেপ্টেম্বর মাস, বাতাসে তাপ নেই। আবহাওয়া অতি মনোরম বলে সাহেব-মেমরা এই শহরটি বেশ পছন্দ করে। সাহেবদের অনেক বাড়ি চোখে পড়ে, এখানে হোটেলের সংখ্যাও কম নয়। বিলিতি কেক-বিস্কুট-পাঁউরুটির দোকান যত্রতত্র। কিছু কিছু ধনী পার্শিও এখানে অট্টালিকা নির্মাণ করেছে, বাদবাকি মহারাষ্ট্রীয় অধিবাসীরা অধিকাংশই বড় গরিব। দু'দিন ধরে পুণার পথে পথে ঘুরে ভরত ঠিক করল হোটেল ছেড়ে সে এখানেই একটা বাসা ভাড়া নেবে। বেশ কয়েকটি বাড়ির দরজায় সে টু-লেট লেখা বোর্ড ঝুলতে দেখেছে।

সেই দিনই সন্ধেবেলা পুলিশের এক সেপাই এসে বলল, ভরতকে একবার কোতোয়ালিতে যেতে হবে। প্রত্যেক হোটেলের রেজিস্ট্রারে পুলিশ এসে নবাগতদের নামধাম পরীক্ষা করে। সাহেব-হত্যার জের এখনও চলছে, চতুর্দিকে গোয়েন্দারা ঘুরছে ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য।

কোতোয়ালিতে নিয়ে আসার পর ভরতকে জিজ্ঞেস করা হল, সে কোথা থেকে এসেছে এবং পুণায় কী উদ্দেশ্যে আগমন।

মিথ্যে কথা বললে আরও জটিলতা বাড়তে পারে, তাই ভরত জানাল যে সে জেলখাটা কয়েদি,

তাকে ধরা হয়েছিল নাগপুরে, চাপেকর ভাইদের সঙ্গে তার কোনও রকম সম্পর্ক প্রমাণিত হয়নি, তাদের সে চেনেও না, সে মারাঠি ভাষা জানে না, তাকে ধরে রাখা হয়েছিল সন্দেহের বশে। সে সদ্য বেকসুর খালাস পেয়েছে।

এখানে অবশ্য ভরতকে মারধর করা হল না। একজন দারোগা মোটামুটি ভদ্রভাবেই তাকে জেরা করতে লাগল। এক সময় সে জিজ্ঞেস করল, তুমি ইংরেজি-জানা যুবক, তুমি ছাড়া পাবার পর কর্মস্থলে ফিরে না গিয়ে পুণায় রয়ে গেলে কেন?

ভরত এবারও সত্য কথা বলল, আমার উপস্থিত কোনও জীবিকা নেই। পুণায় চাকরি খুঁজব ঠিক করেছি।

দারোগাটি বলল, বেশ। তুমি যদি সরকারের বাধ্য প্রজা হয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে চাও, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে তোমাকে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে থানায় হাজিরা দিয়ে যেতে হবে। হোটেল কিংবা বাসা বদল করলে থানায় অবশ্য জানিয়ে যাবে, এর ব্যত্যয় ঘটলে তোমার কপালে আবার দুঃখ আছে।

ভরত জিজ্ঞেস করল, আর আমি যদি পুণা ছেড়ে একেবারেই চলে যেতে চাই, তার অনুমতি পাব কী?

দারোগাটি বলল, অবশ্যই পাবে। তা হলে তো আমাদের ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। এর পর তুমি যেখানে যাবে, সেখানকার পুলিশের দায়িত্ব তোমার ওপর নজর রাখার। আমার পরামর্শ যদি শোনো, মহারাষ্ট্র থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গল। এখানে আবার কোনও গোলযোগ হলে তোমার মতন লোকদেরই প্রথমে সন্দেহ করে ধরা হবে। দিল্লি যাও, লাখনউ যাও, কলকাতা যাও, সেখানে কেউ তোমাকে দাগি বলে চিনবে না।

অতএব পুণার পাট চুকে গেল। আর একটি প্রদেশও ভরতের পক্ষে অপয়া। তা হলে সে কোথায় যাবে? ভরতের মনে পড়ল পাটনার কথা। সেই শহরটি তার ভাল লেগেছিল, সেখানে গিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করলে কেমন হয়?

একপ্রস্থ বিলাতি পোশাক কিনে ভরত ধুতি-কুর্তা ছাড়ল। পুরনো জামা-কাপড়গুলো ফেলেই দিল সে। আগেকার কিছুই আর রাখবে না, পুলিশের নজর এড়াবার জন্য তাকে ভদ্দরলোক সাজতে হবে। ইংরিজিতে কথা বলার জন্যই থানার দারোগাটি তাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে পারেনি।

থার্ড ক্লাসের বদলে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে ভরত পশ্চিম ভারত ছেড়ে রওনা দিল পূর্ব ভারতের দিকে।

ট্রেনের কামরার এক কোণে উপবিষ্ট একটি যুবকের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল প্রথম থেকেই। যুবকটির চেহারায় অবশ্য কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, রোগা-পাতলা, মধ্যমাকৃতি, মুখে অস্পষ্ট বসন্তের দাগ, ঢিলে-ঢালা প্যান্ট ও কোট পরা, মাথায় টুপি। কিন্তু তার ধরন-ধারণ বিচিত্র, সে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে, সঙ্গে দু'তিনখানি বই। একবার একটি বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে আবার অন্য বই খুলছে, কখনও তার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে দেশলাই, কখনও বই খসে পড়ছে, কেউ তার পাশে বসলে সে সঙ্কুচিতভাবে সরে যাচ্ছে এক পাশে, কেউ তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে সে মাথা নেড়ে ইংরিজিতে শুধু বলছে, নো, নো।

ভরত বোঝার চেষ্টা করল, যুবকটির কোন জাত। ট্যাঁস ফিরিঙ্গি? একটা স্টেশনে দু' পয়সার চিনে বাদাম কেনার সময়ও সে বাদামওয়ালার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলেছে। একবার সে বাথরুমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই তার কোল থেকে বইগুলো পড়ে গেল মেঝেতে, সেগুলো তুলতে গিয়ে তার কোটের পকেট থেকে পড়ে গেল রুমাল। তারপর সে যখন ভরতের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ভরত দেখল, তার প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বেরিয়ে অনেকখানি ঝুলে আছে। ভরত বলল, মাইন্ড ইয়োর পার্স।

যুবকটি থমকে দাঁড়িয়ে, মানিব্যাগটা ভাল করে ঢুকিয়ে বলল, থ্যাঙ্কস।

কামরায় বেশি লোক নেই। বাইরের আকাশে শেষ বিকেলের আলো। ট্রেন চলেছে একটা

জঙ্গলের পাশ দিয়ে। ভরত উঠে এসে জানলার পাশে বসল। তারপর যুবকটির রেখে যাওয়া বইগুলির দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। ওপরের বইটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। ট্যাঁস ফিরিঙ্গিরাও এখন বাংলা উপন্যাস পড়ছে নাকি ?

ভরত কতদিন বাংলা পড়েনি। কোনও বইই পড়েনি। বই দেখার পরই তার জেগে উঠল পাঠ-তৃষ্ণা। ইচ্ছে হল প্রিয় লেখকের বইখানি নিয়ে একবার উল্টেপাল্টে দেখতে, কিন্তু না জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত নয়। যুবকটি ফিরে আসার পর ভরত বিনীতভাবে বলল, আমি আপনার এই বইটি কিছুক্ষণের জন্য দেখতে পারি ?

যুবকটি ভরতের কথা বুঝতে না পেরে বলল, হোয়াট ?

এ আবার কী, বাংলা বই সঙ্গে রেখেছে, অথচ বাংলা বোঝে না ? ভরত এবার ইংরিজিতে বলল, মে আই বরো দিস বুক ফর সাম টাইম ?

ভরতের ন্যাড়া মাথা দেখে বোধ হয় যুবকটির একটু খটকা লেগেছে, তাই কয়েক পলক তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, ইয়েস, অফ কোর্স।

তারপর সে ভরতকে জিজ্ঞেস করল, গোয়িং ফার ?

ভরত বলল, আপ টু পাটনা।

যুবকটি এবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আই অ্যাম এ ঘোষ, কামিং ফ্রম বরোদা, গোয়িং টু দেওঘর।

ভরত বলল, আমার নাম ভরতকুমার সিংহ। পুণা থেকে আসছি। আপনি বাঙালি, তা আগে বুঝতে পারিনি। ঘোষ পদবি তো বাঙালি ছাড়া হয় না।

যুবকটি আবার বুঝতে না পেরে বলল, সে দ্যাট এগেইন।

ভরত পুনরুক্তি করার পর সে বলল, ইয়েস, বেঙ্গলি বাই বার্থ।

এবার সে ভরতের দিকে সিগারেটের প্যাকেটটি এগিয়ে দিল।

ভরত এককালে চুরুট টানা অভ্যেস করেছিল, ছেড়েও দিয়েছে অনেক দিন। জেলখানায় বিড়ি জোগাড় করার জন্য অন্য কয়েদিদের কত কাণ্ডই না করতে দেখেছে সে। ভরতের আর নেশা নেই, তবু সে প্রত্যাখ্যান করল না, একটি সিগারেট নিল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে, সে জিজ্ঞেস করল, আপনি বাংলা বই পড়েন, আর বাংলা বুঝতে পারেন না ?

যুবকটি দু' দিকে মাথা নেড়ে বলল, নো।

ভরত তবু বলল, বাংলা না বুঝলে বাংলা পড়েন কী করে ? বাংলা পড়েন, তাও বঙ্কিমচন্দ্রের বই, অথচ বাংলা বলেন না ?

যুবকটি এবারেও ইংরিজিতে বলল, আমি বাংলা ভাষা পড়ে বুঝতে পারি, কিন্তু বলতে গেলে অনেক ভুল হয়। অশিক্ষিতের মতন ভুল-ভাষা বলার চেয়ে না বলাই ভাল। বাঙালিরা বড় দ্রুত কথা বলে, তাই তাদের মুখের ভাষা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়। আমি বহুকাল দেশ ছাড়া।

কথায় কথায় যুবকটির সঙ্গে ভরতের বেশ ভাব হয়ে গেল। তার পুরো নাম অরবিন্দ ঘোষ, বরোদায় বড় চাকরি করে। গাইকোয়াড়ের ব্যক্তিগত সচিব এবং একটি কলেজেও পড়ায়। দেওঘরে সে তার অসুস্থ মাতামহকে দেখতে যাচ্ছে।

ভরত জিজ্ঞেস করল, আপনি কত বছর বরোদায় আছেন ?

অরবিন্দ বলল, এই বছর সাতেক হল।

ভরত বলল, এর মধ্যে বাংলা ভুলে গেলেন ? আমিও প্রায় সাত বছর বাংলার বাইরে আছি।

অরবিন্দ হাসল। তাঁর জীবনকাহিনী অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে।

জীবনে মাতৃস্নেহ কাকে বলে সে জানে না। প্রায় জ্ঞান হবার পর থেকেই সে দেখেছে যে তার মা পাগল। বাবা ছিলেন বিলেত-ফেরত বিখ্যাত ডাক্তার, খুলনার সিভিল সার্জন, আচার-ব্যবহারে পাক্কা সাহেব। সন্তানদের তিনি পুরোপুরি ইংরেজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দর ছ' বছর বয়েসে তাকে তার দুই দাদার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দার্জিলিং-এর লরেটো কনভেন্টে। সেখানে দু'

বছর পড়াশুনো করার পর সমগ্র ঘোষ পরিবার চলে আসে লন্ডনে। সেখানেই জন্মায় অরবিন্দর আর একটি ভাই বারীন্দ্র। সেই শিশুটিকে নিয়ে বাবা-মা ফিরে এলেন দেশে, তিনটি সন্তান ইংল্যান্ডেই রয়ে গেল। অরবিন্দর তখন মাত্র সাত বছর বয়েস। তারপর টানা চোদ্দো বছর অরবিন্দ থেকে গেল ইংল্যান্ডে, মাঝখানে একবারও দেশে ফেরার সুযোগ ঘটেনি, প্রথম প্রথম বাবা টাকা পাঠাতেন, পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে আর কখনও দেখাও হয়নি অরবিন্দর। বিলেতেই পরিচয় হয় বরোদার রাজা গাইকোয়াড়ের সঙ্গে। তিনি চাকরি দিয়ে এই দুর্ধর্ষ ছাত্রটিকে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন।

একেবারে বাচ্চা বয়েসে হাতেখড়ির সময় বাংলা অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল, সেটাকে সে অতি কষ্টে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে। বিলেতে প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর সে ছিল এক ইংরেজ পরিবারে, তখন থেকে আর বাংলায় কথা বলার সুযোগ হয়নি, বরোদাতেও বাঙালি কোথায় ? কথা বলার চর্চা নেই বলে বাংলা বলতে একেবারে ভুলে গেছে, কিন্তু বাংলা বই পড়া সে ছাড়েনি।

এবারে ভরত মুগ্ধ হয়ে বলল, আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য। চোদ্দো বছর বিলেতে থেকেও আপনি বাংলা ভাষা ভোলেননি, অথচ দু'চার বছরের জন্য গিয়েও তো দেখি অনেকে ভুলে যায়।

অরবিন্দ আবার ইংরিজিতেই বলল, বঙ্কিমবাবুর মতন উপন্যাস পৃথিবীতে ক'জন লিখেছেন ? বাংলা সাহিত্য আমাদের গর্বের বিষয়।

ভরত জিজ্ঞেস করল, আপনি রবিবাবুর কবিতা পড়েছেন ?

অরবিন্দ বলল, নাম শুনেছি। এখনও পড়া হয়নি। এবার কলকাতায় গিয়ে গোটাকতক বাংলা বই কিনে আনতে হবে। আপনি পাটনায় কোন কার্যের সঙ্গে জড়িত ?

এবার ভরত আপন মনে হাসল। তার জীবনকাহিনীও কম বিচিত্র নয়। সেও মাতৃস্নেহ পায়নি, পিতৃপরিচয় দেবার উপায় নেই। নিজের জীবনটাকে নিজের সাধ্যে গড়ে তোলার কত চেষ্টা করেছে সে, বারবারই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এসব কথা সদ্য পরিচিত একজনকে শোনাবার কোনও মানে হয় না।

সে বলল, আপাতত কিছু নেই। সেখানে আমি চলেছি জীবিকার সন্ধানে।

অরবিন্দ সরল কৌতূহলে জিজ্ঞেস করল, পাটনা শহরে বুঝি চাকরি-বাকরির অনেক সুযোগ আছে ?

ভরত বলল, না, সে রকম কিছু না। তবে কোথাও তো যেতে হবে, এক সময় পাটনায় কিছুদিন ছিলাম। তাই সেখানে গিয়ে কিছু একটা জোটাবার চেষ্টা করব।

অরবিন্দ উৎসাহের সঙ্গে বলল, আপনি বরোদায় চলে আসুন। সেখানে ইংরিজি-জানা লোকের চাকরির অভাব হয় না। মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তিনি আমার সুপারিশ অমান্য করেন না। আমারও সুবিধে হবে আপনার সঙ্গে বাংলা কথা বলার চর্চা করা যাবে। আপনি বরং আমার সঙ্গেই বরোদা চলুন, দেওঘরে আমার মামার বাড়িতে কয়েকদিন থেকেই আমি ফিরব। আপনিও দেওঘরে আমার মামার বাড়িতে থাকবেন।

ভরত বলল, আমার যে পাটনা পর্যন্ত টিকিট।

অরবিন্দ বলল, তাতে কী, টিকিট পরীক্ষককে বলে সেটা অনায়াসে জসিডি পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়া যায়। খুব ভাল হবে, আমি উত্তমরূপে বাংলা শেখার জন্য একজন লোক খুঁজছিলাম।

ভরত রাজি হয়ে গেলেও আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর সে মত বদলে ফেলল। এই যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে তার মাতুলালয় পর্যন্ত যাওয়া তার মনঃপূত হল না। তা ছাড়া, সে যে একজন জেল-ফেরত দাগি, সে কথাটা জানালে এর কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। সেই পরিচয়টা এখনই জানানো উচিত কি না, সে সম্পর্কেও মনস্থির করতে পারল না ভরত। আবার সে কথা সম্পূর্ণ গোপন করে যাওয়াও ন্যায়সঙ্গত নয়।

ভরত এক সময় বলল, আপনার প্রস্তাব খুবই আকর্ষণীয়, তবে পাটনায় আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজ আছে। আমি পরে কোনও সময় বরোদায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

পাটনায় নেমে গেল ভরত।

অরবিন্দ জসিডি পৌঁছল ভোরবেলা, একটা টাঙ্গা ভাড়া নিয়ে সে চলল দেওঘরের দিকে। সঙ্গে একটি সুটকেস, আর একটি কাগজের বাক্স ভর্তি সিগারেটের প্যাকেট। মাতুলালয়ে পৌঁছে সে স্নান সেরে নিয়ে পোশাক বদল করল। কোট-প্যান্টের বদলে আমেদাবাদ মিলের কর্কশ সুতোর মোটা ধুতি, গায়ে সেরকমই একটা মোটা কাপড়ের মেরজাই, টুপি খোলা মাথায় ইংরেজ কবিদের মতন ঘাড় ছাড়িয়ে যাওয়া লম্বা বাবরি চুল। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট টেনে নিতে নিতে সে এ বাড়ির একজনকে জিজ্ঞেস করল, বারীন কোথায়? তাকে দেখছি না?

লোকটি অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট উল্টে বলল, সে কি বাড়িতে থাকে? ছুটে ছুটে বেরিয়ে যায়। গেছে বুঝি সেই বেশ্যাটার কাছে! সে মাগিটা যে বারবার আসে এখানে।

অরবিন্দ একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই ছোট ভাইটিকে বহু বছর অরবিন্দ চোখেই দেখেনি। দেশে ফেরার পরও দেখা হয়েছে মাত্র দু'-একবার, তাও অল্প সময়ের জন্য। ভাল করে পরিচয়ই হয়নি, তবু তো রক্তের সম্পর্কে নিজের আপন ভাই। বারীন এখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে, দেওঘরে এলেই তার নামে অনেক নালিশ শুনতে হয়।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে অরবিন্দ তার দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকল।

অরবিন্দর মাতামহ রাজনারায়ণ বসু কিছুদিন যাবৎ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। চুল-দাড়ি কাশফুলের মতন সাদা। চেহারাটা ছোট্ট হয়ে গেছে, ডান দিকটা একেবারে অবশ, কোনওরকমে বাঁ হাতটা তুলতে পারেন। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখ দেখলে কে বলবে, তিনি অসুস্থ। সর্বদা হাস্যময়, এখনও যেন তিনি পরিপূর্ণ জীবনরস উপভোগ করে যাচ্ছেন।

নাতিকে দেখে তিনি সোল্লাসে বললেন, কে রে, অরা নাকি, অরা? তুই এসেছিস, আমি খবর পেয়ে গেছি। আয়, আয়, আর একটু কাছে আয়, বোস একটু ছুঁয়ে দেখি। কত বড় বিদ্যাদিগ্‌গজ নাতি আমার।

বৃদ্ধ তাঁর পুরনো স্নেহমাখা বাঁ হাতখানি তুলে দৌহিত্রের চিবুক ছুঁয়ে আদর করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোর বয়েস কত হল রে অরা?

অরবিন্দ বলল, এই সাতাশ চলছে।

রাজনারায়ণ চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, সাতাশ? বলিস কী? এখনও মেয়ের বাপেরা তোকে আস্ত রেখেছে? একে তো বিদ্যের জাহাজ, তার ওপরে রাজ সরকারে চাকরি, এমন সুপাত্রের গলায় কেউ ফাঁস পরায়নি? তুই যে মেম বিয়ে করে আসিসনি, এই আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি। তা হলে তোর জন্যে পাত্রী দেখি! তোর বেশ ধুমধাম করে বিয়ে হবে, অনেক দিন পর কবজি ডুবিয়ে মাংস খাব, অ্যাঁ, কী বল।

অরবিন্দ বলল, এখনও আমার বিয়ে করার সময় হয়নি, দাদামশাই।

রাজনারায়ণ সে কথা শুনতে না পারার ভান করে বললেন, আমাদের সমাজ থেকে তা হলে একটি উপযুক্ত পাত্রী ঠিক করে ফেলা যাক। বাঙালি মেয়েরা এখন অনেকে লেখাপড়া শিখছে, তোর অযোগ্য হবে না। তোর বাপের সঙ্গে তোর মায়ের কত ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিলুম, আমাদের ব্রাহ্মসমাজে অত জাঁকজমকের বিয়ে আগে হয়নি। কত আশা ছিল, তোর বাপ ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা হবে। কিন্তু বিলেতে গিয়ে তার যে কী মতিভ্রম হল, ধর্মকর্ম সব গোল্লায় গেল। তুই যে এত বছর বিলেতে কাটিয়ে এলি, তুই তো সাহেব সাজিসনি। এই তো দিব্যি ধুতি পরেছিস বাপু। তবে, তোকে ভাল করে বাংলা শিখতে হবে। আমার সঙ্গে ইংরিজি বলছিস, তা বলে কি বউয়ের সঙ্গেও বলবি নাকি? বাঙালি মেয়ের সঙ্গে ইংরিজি বাক্যে কি প্রণয় হয়? তুই মাস্টার রেখে বাংলা শিখবি? সুকুমার বলছিল, দীনেন্দ্রকুমার রায় নামে এক ছোকরা পত্রপত্রিকায় লেখেটেখে, তার বড় অভাব, সে কাজ খুঁজছে। তাকে বরোদায় নিয়ে যা না। খোরাকি আর কিছু মাস মাইনে দিবি—

বৃদ্ধ আপন মনে অনেক কথা বলে যেতে লাগলেন। অরবিন্দ শ্রোতা। রাজনারায়ণ শুধু নিছক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কথাই বলেন না, এই অশক্ত শরীরেও দেশ ও সমাজের কথা চিন্তা করেন।

প্রসঙ্গত ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান হাল, তিলকের মুক্তি, স্ত্রীশিক্ষা, দুর্ভিক্ষ এসবও এল। নরেন নামে ছেলেটি বিবেকানন্দ নাম নিয়ে বিদেশে দিগ্‌বিজয় করে এসেছে, সে দেওঘরে প্রায়ই আসে, এলেই দেখা করে যায় একবার, এই তো কিছুদিন আগেই এসেছিল, বারান্দায় নিজে রান্না করে খেল, যেমন তেজস্বী, তেমনি বিনীত ছেলেটি, অরবিন্দ একবার যাক না তার সঙ্গে আলাপ করতে।

কথায় কথায় রাজনারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, অরা, কংগ্রেসের নেতারা তোকে ডাকেনি? সেটা তো ইংরিজি বলিয়ে কইয়েদেরই আখড়া। তোর মতন একজন বিলেতফেরতাকে তারা দলে টেনে নিতে চায়নি?

অরবিন্দ ওষ্ঠ উল্টে বলল, এই কংগ্রেসের দ্বারা দেশের কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার হবে না। এরা সরকারের কাছে শুধু ভিক্ষে চায়।

রাজনারায়ণ বললেন, তুই কি রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করিস নাকি?

অরবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, অনেকক্ষণ কথা বলেছ, দাদামশাই। তুমি ক্লান্ত, এখন একটু ঘুমোও।

বাইরে এসে সিগারেট ধরিয়ে অরবিন্দ ছোট ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বারীন ফিরল প্রায় দুপুরের দিকে। শাসনের সুরে নয়, শান্ত ভাবে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলি ঘুম থেকে উঠেই?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নতমুখো বারীন বলল, রাঙা মার কাছে। আপনি যে আসবেন তা আমাকে কেউ বলেনি।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, তোর আজ ইস্কুল নেই?

বারীন বলল, কী করব, রাঙা মা যে কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়ল না। সেজদা, আমার এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। মামারা আমাকে মারে। বুড়ো দাদু ছাড়া আর কেউ ভাল করে কথা বলে না। আমি রাঙা মা'র কাছে চলে যাব? আপনি বলে দিলে হয়।

অরবিন্দ কোনও উত্তর দিতে পারল না। এই ছোট ভাইটির ভাগ্য তার চেয়েও অনেক বেশি বিড়ম্বিত। বারীন মাতৃস্নেহ তো পায়নি বটেই, তার বদলে পেয়েছে অত্যাচার। মা তার কাছে বিভীষিকা। অনেক চিকিৎসা করেও পাগল বউকে সুস্থ করা গেল না দেখে ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ তার স্ত্রী স্বর্ণলতা আর দুটি ছেলেমেয়েকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আত্মাভিমানবশত বউকে বাপেরবাড়ি পাঠালেন না। এই দেওঘরের কিছুটা দূরে রোহিণীতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া করে স্বর্ণলতার সঙ্গে বারীন ও তার বোনকে রাখার ব্যবস্থা করলেন। উন্মাদিনী সেই দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকেই এক এক সময় অসম্ভব মারধর করতেন, তাদের কান্না দেখলে খল খল করে হাসতেন। কেউ তাঁকে বাধা দিতে সাহস করত না। পাগলি মেমসাহেব বলে সবাই তাঁকে ভয় করত, বাড়ির মধ্যে দৈবাৎ কেউ ঢুকে এলে স্বর্ণলতা ছুরি নিয়ে তাকে তাড়া করতেন। ছেলেমেয়ে দুটির লেখাপড়া শেখাবারও কোনও ব্যবস্থা হল না।

কে. ডি. ঘোষ তখন কলকাতায় একটি রক্ষিতা রাখলেন ও মদের বোতলকে নিত্যসঙ্গী করে নিলেন। অবশ্য খুলনায় গরিবদের মধ্যে কিছু কিছু দানধ্যান করতেন বলে তাঁর বেশ জনপ্রিয়তাও ছিল। শিশু দুটি অনাদরে, অবহেলায় বর্ধিত হতে লাগল আগাছার মতন। তাদের পালাবারও উপায় ছিল না, দারোয়া নদীর বাঁক থেকে, মাঠের মধ্য থেকে সেই ভীত-সন্ত্রস্ত বালক-বালিকা দুটিকে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনা হত।

কে. ডি. ঘোষ মাঝে মাঝে আসতেন রোহিণীতে। ছেলেমেয়ে দুটির অবস্থা দেখে বুঝলেন, এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ক্রমে অকালকুষ্মাণ্ডে পরিণত হবে। তাঁর তিন ছেলে ছাত্র হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করছে ইংল্যান্ডে, আর বাকি দুটি ছেলেমেয়ে লেখাপড়াই শিখছে না। স্বর্ণলতার কাছ থেকে তিনি ছেলেমেয়ে দুটিকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন, স্বর্ণলতা রাজি নন। কৃষ্ণধন মাঝে মাঝে এই প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠান, শেষ পর্যন্ত স্বর্ণলতা কিছু টাকার বিনিময়ে মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু বারীনকে কিছুতেই ছাড়বেন না। পাগল মায়ের কাছে বারীন আরও নিপীড়িত হতে লাগল।

একদিন শীতকালে বারীন বাগানে খেলা করছে, তার পাগল মা বসে আছে অদূরে একটা বেঞ্চিতে, একটা গুণ্ডামতন লোক বাগানে ঢুকে এসে স্বর্ণলতাকে জিজ্ঞেস করল, মেমসাহেব, ফুল লেগা ? সে ঝপ করে এক কোঁচড় ফুল স্বর্ণলতার সামনে ছুঁড়ে দিয়েই বারীনের হাত ধরে টানতে টানতে দে দৌড় দে দৌড়। স্বর্ণলতা ভেতর থেকে একটা লম্বা ছোরা এনে গুণ্ডাটাকে তাড়া করলেন, আরও কিছু লোক ছুটে গেল, গুণ্ডাটা তবু বারীনকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলল, তার মুখ চেপে ধরে তুলে ফেলল ট্রেনে।

সেই গুণ্ডাটি কলকাতায় গোমেস লেনে বালক বারীনকে যখন এনে তুলল, তখন তার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। এক সময় তার শরীরে একটা নরম হাতের স্পর্শ অনুভব করল, এক তরুণী তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলতে লাগল, আহারে বাছার না জানি কত কষ্ট হয়েছে, সোনা আমার, মানিক আমার—। এমন স্নেহপূর্ণ স্বর বারীন কোনও রমণীর কাছ থেকে আগে শোনেনি, এমন আদর সে কখনও পায়নি।

রক্ষিতা তরুণীটিকে কৃষ্ণধন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু বহু ভাগ্যে তিনি এমন একটি রমণীরত্ন পেয়েছিলেন। সেই দীর্ঘাঙ্গিনীটি যেমন রূপসী, তেমনই তার গুণ, তার অন্তরটি দয়ামায়ায় পূর্ণ। আপ্রাণ চেষ্টায় সে কৃষ্ণধনের মদ্যপানের নেশা প্রায় ছাড়িয়ে এনেছিল, অসুখী ডাক্তারটির ছন্নছাড়া সংসারে একটা শ্রী আনার চেষ্টা করেছিল। স্বর্ণলতার ছেলেমেয়ে দুটিকে সে আপন সন্তানের মতন বুকে টেনে নিল। মেয়েটি কিছুটা বড়। সে মুখ গোঁজ করে থাকলেও বারীন জীবনে প্রথম স্নেহ-মমতার স্পর্শ পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরল। তখন থেকে সেই তরুণীটি হল বারীনের রাঙা মা।

কয়েকটি বছর এইভাবে বেশ চলছিল, হঠাৎ কৃষ্ণধনের মৃত্যুর পর সব আবার ওলটপালট হয়ে গেল। কৃষ্ণধন সুবিবেচকের মতন উইল করে গিয়েছিলেন, তার পাগল পত্নীর আজীবন ভরণপোষণের জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রেখে বাকি সব কিছু লিখে দিয়েছেন তার দ্বিতীয় জীবনসঙ্গিনীর নামে, তার তত্ত্বাবধানেই ছেলেমেয়ে দুটি মানুষ হবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সুনীতির ধ্বজাধারীদের এটা পছন্দ হল না। কৃষ্ণধন শেষজীবনে ব্রাহ্মদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখলেও এক সময় তো ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়ে থাকবে এক রক্ষিতার কাছে ? এক ব্রাহ্ম নেতা একদিন সেই রমণীর কাছে এসে অতি স্নেহময় কণ্ঠে বললেন, কৃষ্ণধনের উইলটা একবার দেখাও তো মা! সরল বিশ্বাসে সেই রমণী উইলটি এনে দিলেন। সেটি সঙ্গে সঙ্গে পকেটে ভরে ব্রাহ্ম নেতাটি এবার রক্তচক্ষে ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার, এর কথা আর উচ্চারণও করবে না। তা হলে আদালতে প্রমাণ করে ছাড়ব যে, এই উইল জাল, আর তুমি একটা বাজারের বেশ্যা মাগি। বিষয়সম্পত্তিতে তোমার কোনও অধিকার নেই!

সর্ব বিষয়ে স্ত্রীর মতন হলেও যেহেতু কৃষ্ণধনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়নি তাই সে রমণীকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করা হল। তাঁকে মোট পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হল ছেলেমেয়ে দুটোকে। ছেড়ে যাবার সময় বারীন ও তার রাঙা মা, দু' জনেরই কান্নার অন্ত নেই।

সেই থেকে বারীন আছে দেওঘরের এ বাড়িতে, তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পড়াশুনোয় তার মন নেই। এ বাড়িতে কেউ তার আদরযত্ন করে না। রাঙামা বারীনকে ভুলতে পারেননি, মাঝে মাঝেই তিনি দেওঘরে ছুটে আসেন বারীনকে শুধু একবার চোখে দেখার জন্য। কৃষ্ণধনের মৃত্যুর পর তিনি বিধবার বেশ ধারণ করেছেন, অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আর বারীনই তাঁর সন্তান। এখানে এসে তিনি একটি ধর্মশালায় ওঠেন, যে-কয়েকটা দিন থাকেন, বারীন তাঁর কাছ-ছাড়া হয় না। রাঙা মা'র কাছে গিয়েই সে সত্যিকারের আনন্দে থাকে। কিন্তু বারীনকে সন্তান হিসেবে পাবার আইনসঙ্গত কোনও অধিকার নেই রাঙা মা'র।

অরবিন্দ এই সব ঘটনার কিছু কিছু শুনেছে মাত্র, সব জানে না। রাঙা মাকে সে কখনও দেখেনি। শেষের দিকের কাহিনী শুনিয়ে বারীন ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, সেজদা, আপনি একবার রাঙা মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাবেন ? এই তো কাছেই ধর্মশালা। দেখবেন, তিনি মানুষ নন, দেবী।

অরবিন্দ দু'দিকে মাথা নেড়ে শুকনো গলায় বলল, না, আমি গিয়ে কী করব ? আমি তাঁর কথা বুঝব না, তিনিও আমার কথা বুঝবেন না। তা ছাড়া, তিনি তোর রাঙা মা হতে পারেন, আমার তো কেউ নন। আমি আমার পাগল মায়ের পাগল ছেলে।

৪৭

বাগবাজারে, গঙ্গার প্রায় সন্নিকটে বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন নিবেদিতা। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি, মোটা মোটা দেওয়াল, ঘরগুলির মেঝে লাল রঙের পালিশ করা। আলো-বাতাসের অভাব নেই, পাশেই এক টুকরো খালি জমি ও একটি পুকুর, জানলা দিয়ে দেখা যায় অবিরাম মানুষের আনাগোনা, এ পথ দিয়ে অনেকে গঙ্গাস্নানে যায়। অপরাহ্নের পর পল্লীটি নির্জন হয়ে আসে, তখন অবশ্য শুরু হয় মশার গুনগুনানি।

এ বাড়িতে নিবেদিতা একা থাকেন। প্রথম কয়েক দিন একটি পরিচারিকাও পাওয়া যায়নি। বিধর্মী, ম্লেচ্ছর বাড়িতে কাজ করতে আসবে কে ? শ্বেতাঙ্গ রাজার জাতি সম্পর্কে ভারতীয় হিন্দুদের মনোভাবটি অতি বিচিত্র। যুগপৎ ভয় ও ঘৃণা তারা মনে মনে পোষণ করে। ইংরেজের সামনে পড়লে তারা ভয়ে কাঁপে, সামান্য চোখ রাঙানিতে তারা পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করতেও দ্বিধা করে না, অথচ কোনও ইংরেজ খাতির করে ডাকলেও তার সঙ্গে খেতে বসবে না, তার ছোঁওয়া জল পান করবে না। অন্য কোনও ধর্মের মানুষের সঙ্গে হিন্দুদের পান-ভোজনে আপত্তি আছে তো বটেই, এমনকী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অন্য হিন্দুদেরও স্পর্শ ঘৃণা করে, এই ছুঁৎমার্গের ঐতিহাসিক কারণটি নিবেদিতা এখনও বুঝতে পারেন না। এই ভারতেরই মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু এরকম ছুঁৎমার্গ নেই।

অনেক চেষ্টায় এক বৃদ্ধাকে পাওয়া গেছে, সে প্রায় এক থুনথুনে বুড়ি, তার সাত কুলে কেউ নেই। অভাবের তাড়নায় সে এ বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু দুটি শর্ত দিয়েছে। মেমসাহেব কখনও রান্নাঘরে ঢুকবেন না, এবং কোনওক্রমেই তার উনুন ও জলের পাত্র স্পর্শ করতে পারবেন না। নিবেদিতা তাতেই রাজি। প্রথম দিন নিবেদিতা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নাম কী ? আমি তোমায় কী বলে ডাকব ? বৃদ্ধা বলেছিল, আমার নামের দরকারটা কী। আমি তোমার ঝি, সবাই ঝিকে ঝি বলেই ডাকে! নিবেদিতার বেশ মজা লেগেছিল, ঝি শব্দটা যে দুহিতার অপভ্রংশ তা তিনি এতদিনে জেনে গেছেন, অর্থাৎ এই পরিচারিকাটি বয়েসে তাঁর দ্বিগুণের বেশি হলেও সে হল তাঁর মেয়ে, আর তিনি হলেন ওই বৃদ্ধার মা।

বৃদ্ধাটির কাজে বেশ উৎসাহ আছে। সারা বাড়ি ঘরদোর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখে, অন্য সময় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। নিবেদিতা একা একা বসে লেখাপড়া করেন, কখনও বাইরের দৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকেন। ভারতে এসে এই প্রথম তিনি একলা থাকছেন, তাও একেবারে দেশি লোকদের পাড়ার মধ্যে। স্বামীজি পাহাড় থেকে নেমে আসার পর জো ম্যাকলাউড আর ওলি বুল উত্তর ভারতে আরও বেড়াতে চেয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকার পর নিবেদিতার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আর কোনও বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও আকর্ষণ বোধ করেননি। স্বামীজি থাকবেন কলকাতায় আর তিনি থাকবেন অত দূরে! দুই সঙ্গিনীকে ভ্রাম্যমাণা রেখে নিবেদিতা একাই চলে এসেছেন এখানে। স্বামীজির সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হয় না বটে, তবু তো তিনি এই শহরেই আছেন, তাতেই শান্তি পাওয়া যায়। বেলুড়ে মঠ গড়ার কাজ জোরকদমে চলছে, স্বামীজি কখনও সেখানে পরিদর্শনে যান, কখনও এই বাগবাজারেই বলরাম বসুর বাড়িতে এসে থাকেন। মাঝে মাঝে

চা খেতে চলে আসেন নিবেদিতার কাছে।

বারান্দাতেই নিবেদিতা চা বানাবার একটা নিজস্ব ব্যবস্থা করেছেন। নিবেদিতা কাপে চা ছেঁকে যখন দুধ-চিনি মেশান, তখন ঝিটি একটু দূরে বসে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। আগে কারুকে সে চা পান করতে দেখেনি। নিবেদিতা এক দিন অন্যমনস্কভাবে চায়ের কাপটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ঝি, এর মধ্যে আর একটু গরম জল ঢেলে দাও তো! বৃদ্ধাটি আঁতকে উঠে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। খনিক বাদেই সে ফিরে এল সম্পূর্ণ স্নান করে, ভিজে-কাপড়ে। ম্লেচ্ছ-রমণীর পাত্র ছুঁয়ে ফেললে তাকে স্নান করে পবিত্র হতে হবে না!

বহু জায়গায় এরকম ব্যবহার পেতে পেতে নিবেদিতার এখন আর রাগ কিংবা দুঃখও হয় না। একটা পাত্র শুধু একবার ছুঁলে কী করে মানুষের শরীর অপবিত্র হয় কিংবা ভেতরের পানীয় পানের অযোগ্য হয়ে যায়, এ তার কোনওদিন মাথায় ঢুকবে না। তিনি হেসে বললেন, ওগো মেয়ে, ভুল করেছি, আর তোমায় ছুঁতে বলব না।

তারপর তিনি এঁটো কাপ-ডিশ ধুতে শুরু করলে পরিচারিকাটি গজগজ করে কাছে এসে বলল, শোনো গো মা, এবার থেকে তোমার বাসনপত্র ধুয়ে দেব, কিন্তু আর কোনও সাহেব-মেম এলে তাদের ওসব কিন্তু আমি ছুঁতে পারব না।

নিবেদিতার মনে হল, এটাই একটা বিরাট জয়। এই পরিচারিকাটি তাঁকে শেষ পর্যন্ত আপন বলে গ্রহণ করেছে।

অদূরেই আর একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন সারদামণি। নিবেদিতা মাঝে মাঝেই সেখানে যান, এই রমণীটির সান্নিধ্যে তাঁর মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। সারদামণি সন্তানহীনা, তবু তাঁর শরীরে যেন মা-মা গন্ধ আছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সব শিষ্যের চোখেই সারদামণি মাতৃবৎ। সাধারণ গ্রাম্য এই মহিলাটির প্রখর বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি দেখে নিবেদিতা প্রায়ই বিস্মিত হয়ে যান। স্বামীজির কাছে তিনি শুনেছেন যে, স্বামীর জীবিতকালে সারদামণি থাকতেন প্রায় সকলের দৃষ্টির আড়ালে। তাঁর অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না, এখন রামকৃষ্ণের বড় বড় শিক্ষিত অনুগামীরাও তাঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন। গিরিশ ঘোষ এসে আছড়ে পড়েন তাঁর পায়ের কাছে। আরও বিস্ময়ের কথা, অনেক উচ্চবংশীয় মহিলারাও যে-সব সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি, সারদামণি তা পেরেছেন। তাঁর ছোঁয়াছানির বাতিক নেই, তিনি নিবেদিতার সঙ্গে বসে আহার গ্রহণ করেছেন স্বচ্ছন্দে। মাঝে মাঝে আদর করে নিবেদিতার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন।

বলরাম বসুর বাড়িতেও নিবেদিতা যান মাঝে মাঝে। স্কুল খোলার ব্যাপারে সেখানে আলোচনা হয়। নিবেদিতা এ-দেশে এসেছেন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে, সে কাজ শুরু করা দরকার। মেয়েদের জন্য স্কুল-কলেজ ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে বেশ কয়েকটি, নিবেদিতা আর নতুন কী করবেন? স্বামীজি চান, এখানকার মেয়েদের শুধু বিলিতি ঢঙে শিক্ষা না দিয়ে তাদের প্রাচীন ভারতীয় নারীর আদর্শে গড়ে তোলা হোক। প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট আকারেই একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। বলরাম বসুর বাড়িতে নিবেদিতা যখন তাঁর প্রস্তাবিত স্কুল সম্পর্কে বুঝিয়ে বলছিলেন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে, কখন চুপি চুপি স্বামীজি যে পেছনে এসে বসেছেন, তিনি লক্ষই করেননি। সেদিন বেশ লঘু মেজাজে ছিলেন বিবেকানন্দ, পেছন থেকে কারুকে গুঁতো মারছেন, ফিসফিসিয়ে মসকরা করছেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে নিবেদিতাকে দেখছে এবং তাঁর ইংরিজি বক্তৃতা শুনছে, কিন্তু কেউ কোনও সহযোগিতার প্রস্তাব দিচ্ছে না। মেয়েদের জন্য স্কুল খুলতে গেলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন তো কিছু ছাত্রী জোগাড় করা, কিন্তু বাগবাজারের মতন গোঁড়া হিন্দু পল্লীতে এক খ্রিস্টান মাস্টারনীর কাছে মেয়ে দেবে কে? উপস্থিত ভদ্র ব্যক্তিরা মনে মনে নিবেদিতাকে সমর্থন করলেও পরিবারের আপত্তির কথা ভেবে ভয়ে মুখ খুলছেন না।

বিবেকানন্দ একজনকে খোঁচা মেরে বললেন, ওরে ব্যাটা হরে, তুই মেয়ের বাপ হয়ে মুখ বুঁজে আছিস যে। তোর মেয়েকে মানুষ করবি না? ওই মাস্টারনী কি খালি ঘরে পড়াবে!

উক্ত ব্যক্তির নাম হরমোহন, সে তবু মুখ খোলে না। বিবেকানন্দ আর একজনকে বললেন, ও

মশাই, আপনারও তো মেয়ে আছে, উঠুন, উঠে দাঁড়িয়ে বলুন, আমি মেয়ে দেব!

কেউ মুখ ফুটে এই কথাটি উচ্চারণ করে না। বিবেকানন্দ তখন হরমোহনের কাঁধ খামচে ধরে বললেন, শালা, তোর আজ নিস্তার নেই। শুধু মুখেই বড় বড় কথা, আর কাজের সময় বউয়ের আঁচলে লুকোনো!

গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, ওয়েল, মিস নোবল, দিস জেন্টলম্যান অফারস হিজ গার্ল টু ইউ!

নিবেদিতা প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর ইস্কুলের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে, স্বামীজি কিছু সাহায্য করতে পারবেন না। সেই জন্য নিবেদিতা এখানে বিবেকানন্দর উপস্থিতি আশাই করেননি, কিন্তু তাঁর রাজা তাঁকে ভোলেননি, শত কাজ ফেলে চলে এসেছেন এখানে! নিবেদিতার বক্তৃতা থেমে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে বালিকার মতন খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে করল নাচতে! সত্যি সত্যি নাচের ভঙ্গিতে দুলতে লাগলেন বিবেকানন্দর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে।

নিবেদিতা এখন একা একাই কলকাতা শহরে ঘেরাফেরা করতে পারেন। বাগবাজারের লোক অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, ছাতা মাথায় দিয়ে এক সুন্দরী মেমসাহেব হেঁটে যাচ্ছেন শ্যামবাজারের দিকে। সেখানে ঘোড়াগাড়ির আড্ডা। এখন ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারেন, গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরদাম করতে অসুবিধে হয় না। কলকাতার বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। এখানে যে এত ইংরিজি জানা শিক্ষিত মানুষজনও আছে, সে সম্পর্কে তাঁর ঠিক ধারণা ছিল না। বিলেতে থাকার সময় ভারতীয় নারীদের শোচনীয় অবস্থার কথাই বারবার পড়েছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে, কিন্তু এখানে যে সংস্কারমুক্ত, উচ্চমেধাসম্পন্ন কিছু কিছু রমণীও আছে, তার কোনও উল্লেখ ওইসব সংবাদপত্রে থাকে না।

এখানকার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সমাজে স্পষ্ট দুটি ভাগ নিবেদিতার চোখে পড়ে। একটি হল ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজ, তারা সরকারের উচ্চ-চাকুরে অথবা ব্যারিস্টার, ডাক্তার, জমিদার। তারা বিলিতি আদব-কায়দায় অভ্যস্ত, ইংরিজি ছাড়া কথাই বলে না, নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন নয়, জানেই না কিছু, ইংরেজদের নেকনজরে থাকাটাই তারা পরমার্থ জ্ঞান করে। আর একটি শিক্ষিত সমাজও গড়ে উঠেছে, যারা শুধু স্কুল-কলেজের লেখাপড়া শিখেই ক্ষান্ত হয় না, আরও পড়াশুনো করে, নিজের দেশের গণ্ডির বাইরেও তাদের দৃষ্টি যায়, তাদের বিশ্ব-চেতনা গড়ে উঠেছে, আবার নিজের দেশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কথাও চিন্তা করে। এরা অধিকাংশই কোনও না কোনও ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। এই ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতেই নিবেদিতা বেশি স্বস্তি বোধ করেন। বিবেকানন্দও ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর এই মেলামেশা সমর্থন করেছেন, তিনি মাঝে মাঝেই বলেন, মেক ইনরোডস টু দা ব্রাহ্মজ, ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়ো, তাদের তোমার দলে টানো।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারটিকে দেখেই নিবেদিতা সবচেয়ে বেশি মোহিত হয়েছেন। শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যাওয়া এক বিশাল গোষ্ঠী, বিত্তবান, উচ্চ রুচিসম্পন্ন এবং এই পরিবারের শুধু পুরুষরা নয়, অনেক নারীও যেমন রূপবতী তেমনি বিভিন্ন গুণের অধিকারিণী। এমন একটি পরিবার তিনি ইংল্যান্ডেও দেখেননি। ঠাকুরবংশের মেয়েদের সঙ্গে তিনি মিশে যেতে পারেন সহজে, তাঁর বিশেষ ভাব হয়েছে সরলার সঙ্গে। এই মেয়েটি যেমন বিদুষী, তেমনি তেজস্বিনী, এমন দেশাত্মবোধ তিনি আর কোনও বঙ্গনারীর মধ্যে দেখেননি।

বিবেকানন্দর সঙ্গে সরলার আগেই যোগাযোগ হয়েছে চিঠিপত্রের মাধ্যমে। পশ্চিম জগতে বিবেকানন্দ ভারতাত্মার বাণী প্রচার করে সাড়া জাগিয়ে এসেছেন বলে সরলা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। বিবেকানন্দও সরলার ওজস্বিতা ও মুক্ত মনের পরিচয় পেয়ে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন যে, তার মতন রমণীর বিদেশে গিয়ে বক্তৃতা করা উচিত।

সরলা ও নিবেদিতা পরস্পরের বাড়িতে মাঝে মাঝেই যাতায়াত করেন। নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মানুষজনের সঙ্গেই তাঁর প্রধান যোগাযোগ, তাই সরলার মতন অনেকেরই প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল যে, এই বিদেশিনী বুঝি খুবই ধর্মপ্রাণা এবং বৈদান্তিক আদর্শের

কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু কিছুদিন আলাপ পরিচয়ের পর সরলা বুঝতে পারল যে, নিবেদিতার উৎসাহ ও আগ্রহ আছে নানা দিকে, শিল্প ও চারুকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামাজিক অবস্থা নিয়েও তিনি চিন্তা করেন। এবং তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী। এই ব্যাপারে সরলার সঙ্গে তাঁর খুব মনের মিল হল। সরলা চাইছে, এ দেশের মানুষদের আত্মমর্যাদাজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে, যাতে ভীরুতা ও কাপুরুষতা কাটিয়ে এ দেশের মানুষ নিজেদের ইংরেজদের সমকক্ষ মনে করতে পারে, সে জন্য সে সঙ্ঘ স্থাপন করেছে। নিবেদিতাও তাই চান।

কিছুদিন ঘোরাফেরা করার পর নিবেদিতা বুঝতে পারলেন, বাঙালিদের মধ্যে অনেক দলাদলি। ঠাকুর পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের প্রায় কোনও যোগাযোগ নেই, বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে যে বিপুল সাড়া জাগিয়ে এসেছেন তা নিয়ে একমাত্র সরলা ছাড়া এ পরিবারের আর কেউ উচ্চবাচ্য করে না, বরং যেন একটা সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। ব্রাহ্মদের মধ্যেও আবার তিনটি ভাগ। গোঁড়া হিন্দুরাও রামকৃষ্ণ-অনুগামীদের সুচক্ষে দেখে না। আবার একদল শিক্ষিত মানুষ ব্রাহ্ম এবং কালীসাধকদের মতন দুই সম্প্রদায় থেকেই সমদূরত্ব রক্ষা করে। অথচ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যখন দেশের মানুষকে সংগঠিত করার চিন্তা করা হচ্ছে, তখন দলাদলি ও বিভেদ ঘুচিয়ে একতা আনা তো সর্বপ্রথম কাজ। কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে শুধু বক্তৃতা দিয়ে সে কাজ হবে না, সমাজের সর্বস্তরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।

নিবেদিতা একদিন এই প্রসঙ্গ তুলতেই সরলা উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানাল।

নিবেদিতা বললেন, প্লেগ রোগের সংক্রমণের সময় রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় সেবার কাজে নেমেছিল, স্বামীজি বলেছিলেন, দরিদ্র মানুষের ত্রাণের কাজে টাকার অভাব হলে তিনি বেলুড় মঠ বিক্রি করে দিতেও রাজি আছেন! কিন্তু টাকার অভাব হবে কেন, এ দেশে কি ধনী লোক নেই? তাঁরা তো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না! অন্যরাও কিছু কিছু প্লেগ প্রতিরোধের কাজ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সবাই মিলে একসঙ্গে সংগঠিত হলে কি কাজ আরও ব্যাপক ও সুষ্ঠু হত না?

সরলা বলল, সে কথাও মানি। আপনারাও দেশের মানুষের কল্যাণ চান, আমরাও সেই কাজে ব্রতী হতে চাই। আপনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিতে আমাদের একটাই বাধা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর সতীর্থরা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে অবতার হিসেবে পূজা করেন। এটা আমরা মানি কী করে? কোনও মানুষ তার নিজগুণে কিংবা সাধনায় অসাধারণ বা মহত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু তাকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে গণ্য করার কী দরকার!

নিবেদিতা বিস্মিতভাবে সরলার দিকে চেয়ে রইলেন।

সরলা আবার বলল, হিন্দুদের কি অবতারের অভাব আছে? মাছও অবতার, কচ্ছপও অবতার, আরও অবতার চাই? আমরা অবতারবাদ মানতে পারি না। কালীপুজো নিয়ে বাড়াবাড়ি, পাঁঠা বলি, রক্তারক্তি, বীভৎস ব্যাপার, এ তো বামাচারী তন্ত্র সাধনা! স্বামী বিবেকানন্দ তো প্রায়ই বলেন, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করাই সবচেয়ে বড় ধর্ম, আপনি ওঁকে বলুন না, এখন কিছুদিন রামকৃষ্ণকে অবতার হিসেবে পুজো করা থেকে বিরত থাকতে, তা হলে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে দেশের সেবায় নিযুক্ত হই!

সরলার এই দাবির কথা শুনে স্বামীজি দপ করে জ্বলে উঠলেন। ঠাকুর পরিবারের মেয়েটির এত স্পর্ধা! ওরা দেশের জন্য কী করেছে, শুধু মুখেই বড় বড় কথা! আমরা গুরুর পূজা বন্ধ করলে তবেই ওরা হাত মেলাবেন! দেশহিতৈষী মহাত্মারা সব কেমন মানুষ তা আমার জানতে বাকি নেই। বলি এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড়, আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে? এই সব লোক গ্লাস-কেসের ভেতরে ভাল, কাজের সময় যত ওরা পেছনে থাকে, ততই কল্যাণ!

উঠে দাঁড়িয়ে সিংহের মতন গজরাতে গজরাতে তিনি বলতে লাগলেন, জানি কালীপুজো সম্পর্কে ওদের আপত্তি, মহামায়ার আরাধনার মূল তত্ত্ব ওরা কী বোঝে? আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুলপুজো মানি না, এসব আর চলে না। আমেরিকায় দেখলাম তো, তারা চায় ফিলসফি, লার্নিং,

ফাঁকা গপ্পি আর কেউ শোনে না।

একটু থেমে নিবেদিতার দিকে তীব্র চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বললেন, মার্গট, তোমাকে দিয়ে মা কালীর ওপর আমি বক্তৃতা দেওয়াব! এই কলকেতা শহরের মাথা মাথা লোকদের সামনে তুমি কালী সাধনার দর্শন তত্ত্ব শোনাবে।

নিবেদিতা চমকিত হয়ে বললেন, আমি? আমি কতটুকু জানি!

বিবেকানন্দ বললেন, আমি তোমাকে শেখাব। তুমি আকর গ্রন্থগুলি পড়ে নেবে। তুমি পারবে! 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি'—এই হবে তোমার মূলমন্ত্র।

সরলা শুধু নিবেদিতাকে মুখে বলেই ক্ষান্ত না হয়ে বিবেকানন্দকে চিঠি লিখেও সেই প্রস্তাব জানাল। বিবেকানন্দ পরিহাস-বিদ্রূপপূর্ণ এক উত্তর দিলেন তাকে।

নিবেদিতার মনে হল, অন্য কারুর মাধ্যমে কিংবা চিঠিপত্রে এ বিষয়ের কোনও সুরাহা হতে পারে না। মুখোমুখি আলোচনায় কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। তিনি একদিন সরলাকে নিমন্ত্রণ করলেন নিজের বাড়িতে। সেদিন বিবেকানন্দ নিজের হাতে রান্না করলেন, রান্নার শখ তাঁর কৈশোর বয়েস থেকেই, এখনও মাঝে মাঝে রান্না করতে ভালবাসেন। সেদিন আরও কয়েকজন অতিথি রয়েছে, খাওয়াদাওয়া আর রঙ্গ রসিকতা চলল অনেকক্ষণ ধরে, গুরুতর বিষয়ে আলোচনার সুযোগ হল না।

আহারান্তে নিবেদিতার সমক্ষে সরলা প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে যেতেই বিবেকানন্দ সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে হুকুমের সুরে বললেন, মার্গট, আমার জন্য তামাক সেজে আনো তো!

নিবেদিতা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে স্বামীজির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তামাক কী করে সাজতে হয়, আমি তো জানি না।

বিবেকানন্দ বললেন, একটা কল্কেতে এক গুলি তামাক দিয়ে তার ওপর টিকে চাপিয়ে নারকোল ছোবা দিয়ে ধরাবে। আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে ধরবে। যাও, নিয়ে এসো।

সদ্য নিযুক্ত কোনও দাসীর মতন অপটু হাতে কল্কে ধরিয়ে নিয়ে এলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দ সেই কল্কে হুকোর ওপর চাপিয়ে চোখ বুঁজে আরামের সঙ্গে টানতে লাগলেন।

অনেকের ধারণা, এই যে অনেক বিদেশি শিষ্য-শিষ্যা স্বামীজির চারপাশে এসে জুটেছে, স্বামীজি বুঝি তাদের সঙ্গে সব সময় স্তুতি ও মনোরঞ্জনের সুরে কথা বলে তাদের বশ করেছেন। সরলা ঘোষাল নিজের চক্ষে দেখে যাক, গিয়ে তার পরিবারের লোকজনদের বলুক, সেবা করার অধিকার লাভ করেই এরা ধন্য! এরা সেবা করছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের এক শিষ্যকে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৈত্রী বন্ধনের চিন্তা এর পরেও নিবেদিতা ছাড়লেন না। সরলা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না, তার চেয়েও যাঁরা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত এবং দায়িত্ববান, সেরকম কয়েকজনের সঙ্গে স্বামীজির মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিতে পারলে কেমন হয়?

স্বামীজিকে তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমি অনেক পরিবারে আলাপ-পরিচয়ের জন্য যাই, তাঁরা আমাকে নানাভাবে আপ্যায়ন করেন, আমারও উচিত তাঁদের কিছু প্রতিদান দেওয়া। সেরকম কয়েকজনকে একদিন কি চায়ের আসরে ডাকতে পারি আমার বাড়িতে?

বিবেকানন্দ ভুরু তুলে বললেন, সেখানে বুঝি তোমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের ডাকবে? ঠিক আছে, ডাকো।

নিবেদিতা উৎসাহের সঙ্গে সম্ভাব্য অতিথিদের নামের তালিকা তৈরি করতে লাগলেন। কিছু কিছু নাম লিখেও কেটে দেওয়া হয়, কিছু নতুন নাম যোগ হয়। খুব বেশি লোককে ডাকা যাবে না, তত জায়গা নেই। জানুয়ারি মাস, এখন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে বসা হবে উঠোনে। তারিখ ঠিক করেও পিছিয়ে গেল কয়েকবার, স্বামীজির সময় হওয়াটাই বড় কথা। শেষপর্যন্ত দিন ঠিক হল এ মাসের শেষ শনিবারে।

বলরাম বসুর বাড়ি থেকে চেয়ে আনা হয়েছে কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল। পাতা হয়েছে ধপধপে সাদা টেবিল ক্লথ। নিবেদিতা কয়েকটি ফুলদানিতে সাজিয়েছেন নানা রঙের ফুল। বারবার একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন, সব কিছু ঠিকঠাক হয়েছে কি না। তাঁর রুচি অতি খুঁতখুঁতে, কোনওরকম

বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করতে পারেন না। বেশ শীত পড়েছে, নিবেদিতা পা পর্যন্ত লোটানো দুগ্ধ-ধবল গাউন পরে গায়ে একটা ঘি রঙের শাল জড়িয়ে নিয়েছেন। বুড়ি দাসীটিকেও পরিয়েছেন একটা পরিষ্কার কাপড়, তার জন্য কিনে দিয়েছেন নতুন আলোয়ান।

পাঁচটার সময় অতিথিদের আসবার কথা। ঠিক পাঁচটা বাজতেই একসঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন অনেকে। পি কে রায় এবং তাঁর স্ত্রী সরলা রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষালকে সঙ্গে নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন। রবীন্দ্র পরে এসেছেন কুচোনো ধুতি, সাদা রেশমি পিরান ও রেশমি চাদর, পায়ে মোজা এবং নরম চামড়ার জুতো। আটত্রিশ বছর বয়েস হলেও তাঁর এখনও একটি চুলেও পাক ধরেনি। তবে ইদানীং তিনি একটি সোনালি চশমা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। ঘন কৃষ্ণ চুল মাঝখানে সিঁথি কাটা, ভ্রমরকৃষ্ণ দাড়ি ও গোঁফ সযত্ন বর্ধিত, গৌরবর্ণ এই দীর্ঘকায় পুরুষটির রূপ ও ব্যক্তিত্বের প্রভা দেখে সকলেই প্রথম কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

রবীন্দ্র মৃদুস্বরে নিবেদিতাকে বললেন, আমার বড় ভগিনী স্বর্ণকুমারী ঘোষালের আসার কথা ছিল, বিশেষ কারণে তিনি আসতে পারেননি বলে মার্জনা চেয়েছেন।

নিবেদিতা সযত্নে রবীন্দ্রকে বসালেন। নিবেদিতা আজ খুবই চাঞ্চল্য বোধ করছেন। অতিথি আপ্যায়নের ত্রুটি যাতে না হয় সে চিন্তা তো আছেই, তা ছাড়াও তাঁর স্বামীজি, তাঁর রাজা আজ কীরকম ব্যবহার করবেন, তা ভেবেও খানিকটা উদ্বিগ্ন। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে স্বামীজির মনোভাব এর মধ্যে আরও কঠোর হয়ে গেছে, ঠাকুর পরিবার সম্পর্কেও তিনি তেমন শ্রদ্ধাশীল নন। তাঁর ধারণা, ঠাকুরবাড়ির প্রভাব বাংলাদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। বিবেকানন্দ শক্তির উপাসক, তিনি চান দেশের মানুষের মধ্যে এখন পৌরুষ জাগাতে হবে, আর ঠাকুরবাড়ির লেখকরা প্রেম-ভালবাসার কাব্য লিখে চলেছে, তাতে দেশের কী উপকার হবে? ইন্দ্রিয় রসের বিষ বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর নিবেদিতা তাঁকে বেশ পছন্দ করেছেন। ইনি একজন সত্যিকারের কবি এবং সুগায়ক। এঁর কিছু কিছু কবিতা অনুধাবন করে নিবেদিতা বুঝেছেন যে, ইনি মূলত একজন রোমান্টিক রসের কবি হলেও ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে গভীর জীবনবোধ। কবিতা তো রোমান্টিক হবেই। শুধু আদর্শের কথা, শুধু উচ্চ ভাব ও নীতিকথায় ভারাক্রান্ত হলে তা হয়ে যায় নিছক নিরস অ-কবিতা। নিবেদিতা কখনও রবীন্দ্রবাবুর কবিতার উল্লেখ করলে স্বামীজি অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়েন। ওই সব কাব্য-টাব্যের রস আস্বাদনের সময় তাঁর নেই, রবীন্দ্রনাথের সব রচনা পড়ার সময়ও তাঁর নেই, দেশের মানুষকে জাগাবার জন্য তাঁর মতে এখন দরকার রুদ্র সঙ্গীত, তুরী-ভেরি-দুন্দুভির ডাক। ঠাকুরবাড়ির কবিদের একদল অনুকারকও জন্মেছে, তাদেরও স্বামীজি দু' চক্ষে দেখতে পারেন না, মাঝে মাঝে বিদ্রূপের সুরে বলেন, ওই যে একদল ছেলে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতন বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাসেন হোসেন করেন...। নিবেদিতা যাতে ঠাকুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করেন, এমন ইঙ্গিতও দু'-একবার দিয়েছেন স্বামীজি।

তবে এই টি-পার্টির ব্যাপারে স্বামীজি আপত্তি জানাননি, বরং আগ্রহই প্রকাশ করেছেন, আমন্ত্রিতদের তালিকাও তিনি জানেন। এটাই নিবেদিতার বড় ভরসা।

স্বামীজি আসতে দেরি করছেন, অন্যরা ভদ্রতার বিনিময় করছেন নিজেদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় চুপ করেই আছেন। যদিও ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি হাস্য-পরিহাস ও লঘু আমোদে খুবই পারদর্শী, একাই আড্ডা জমিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু অপরিচিত বা অর্ধ পরিচিতদের মধ্যে তিনি অতিরিক্ত ভদ্র ও নিয়মনিষ্ঠ হয়ে যান, মেপে মেপে কথা বলেন, শিষ্টাচারসম্মতভাবে সামান্য হাসেন।

টেবিলের ওপর নানাবিধ সুখাদ্য সাজানো রয়েছে। সাহেবপাড়া থেকে আনা হয়েছে কেক-পেস্ট্রি, দিশি খাবারও রয়েছে কিছু, বাড়িতে তৈরি নিমকি, বাগবাজারের বিখ্যাত রসগোল্লা। স্বামীজি আইসক্রিম পছন্দ করেন বলে তাও রয়েছে কিছু।

একটু পরে স্বামীজি এসে উপস্থিত হলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সঙ্গে নিয়ে। এই বিখ্যাত চিকিৎসক ও বিজ্ঞানপ্রেমীর সঙ্গে আগেই নিবেদিতার সৌহার্দ্য হয়েছে, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রলালের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে যেতেই মহেন্দ্রলাল বললেন, আরে রাখো রাখো, আমায় চেনে না কে? সব বাড়ির অন্দরমহলেই আমার গতায়াত, এদের সকলেরই নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি!

হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি। তারপর সরলার কাছে এসে তার পিঠে আলতো চাপড় মেরে বললেন, অনেকদিন তুই ইনস্টিটিউটে লেকচার শুনতে আসিস না, কেন রে? মার খাবি আমার কাছে।

নিবেদিতা একে একে সবার সঙ্গে বিবেকানন্দর আলাপ করিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আসার পর দু'জনে হাত তুলে নমস্কার করলেন শুধু, একটি কথাও বললেন না। দু'জনেই যে দু'জনকে আগে থেকে চেনেন, সে কথাও প্রকাশ করলেন না কেউ। অনেকদিন আগে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করত যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সে রবীন্দ্রনাথের গান গাইত, স্বয়ং গীতিকার রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর বিয়ে উপলক্ষে নরেন্দ্রকে গান শিখিয়েছেন কয়েকদিন। এখনকার বিবেকানন্দ সে জীবন থেকে সরে এসেছেন অনেক দূরে, সে জীবনের কথা তিনি আর মনেও আনতে চান না। কিন্তু মেধাবী ও স্মৃতিধর বিবেকানন্দের পক্ষে ঠাকুরবাড়ির সেই অনিন্দ্যকান্তি গানের স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব! রবীন্দ্রনাথেরও মনে আছে সে দৃপ্ত যুবককে, যার গানের ভরাট কণ্ঠস্বর শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। যখন রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের সমাজের বাইরে বিশেষ কেউ জানত না, তখন ওই নরেন্দ্র দত্ত নামে তরুণটি 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি শুনিয়ে তাঁকে অবাক করেছিল। মনে আছে ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে যে যুবক কালীসাধকদের দলে গিয়ে ভিড়েছে, তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আর বিশেষ আগ্রহ নেই।

বিবেকানন্দ অঙ্গে জড়িয়ে আছেন গেরুয়া বসন, শীতবস্ত্র কিছু নেননি, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়েসে ছোট হয়েও তাঁর মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, কিছু কিছু পাক ধরেছে, মুখের গৌরবর্ণ খানিকটা বিবর্ণ, তিনি যে সুস্থ নন, তা এক পলক দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তীব্র তাঁর চোখের জ্যোতি, অসাধারণ মানসিক তেজ প্রতিফলিত হয়ে আছে তাঁর মুখমণ্ডলে।

নিবেদিতা আশা করেছিলেন, এই সব বিদগ্ধ মানুষজনের সমাবেশে উচ্চাঙ্গের আলোচনা হবে, ব্রাহ্ম ও রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মিলন প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উঠবে, কিন্তু সে সব কিছুই হল না, আড্ডা জমছে না, কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। এর মধ্যে এসে গেছেন অবলা এবং জগদীশ বসু, তাঁদের দেখে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাশে বসিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন নিচু গলায়। বিবেকানন্দ বসেছেন অন্য প্রান্তে, তিনি কথা বলছেন মহেন্দ্রলালের সঙ্গে, এদিকে একবার তাকাচ্ছেনও না।

পার্টিতে এরকম নিরুত্তাপ ভাব দেখে নিবেদিতা বললেন, মিস্টার টেগোর, আপনি একটা গান শোনান, নতুন রচিত গান।

জগদীশচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।

রবীন্দ্রনাথ একটু ভেবে নিয়ে শুরু করলেন:

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে লও খেয়ার নেয়ে।...
এসো এসো শ্রান্তি হরা এসো শান্তি সুপ্তি ভরা
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে।

অন্যদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে আরও দুটি গান গাইতে হল। নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বিবেকানন্দর গান তিনি অনেক শুনেছেন, তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের উচ্চগ্রাম ও কালোয়াতি টান সব সময় নিবেদিতার কানে বাজে। কিন্তু এই কবির গান একেবারে অন্যরকম, কেমন মৃদু উদাস সুর। তিনি যেন সুর ও কথার মধ্যে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন, 'এসো শান্তি' যখন উচ্চারণ করছেন, এক

ব্যাকুল আর্তি মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

বিবেকানন্দ আজকাল আর এ সব গান নিজে তো গানই না, পছন্দও করেন না। অত বারবার ইনিয়ে বিনিয়ে 'বেলা গেল' 'বেলা গেল' আর 'এসো এসো' করার কী আছে? তৃতীয় গানটি সমাপ্ত হতেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন, মার্গট, তোমার টি পার্টিতে খাবার তো অনেক রকম রয়েছে দেখছি, কিন্তু এখনও চা এল না? গলা যে শুকিয়ে গেল।

নিবেদিতা লজ্জিতভাবে দৌড়ে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। গান শুনতে শুনতে তিনি চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। বুড়ি ঝি-কে বললেন, শিগগির জল চাপাও—

ঝি বলল, জল গরম করে কী হবে? দুধ যে নেই, তোমাদের ওই জিনিস, চ্যা না কী বলে, তা দুধ ছাড়া কি হয়?

নিবেদিতা বললেন, দুধ নেই? সে কী? কেন নেই?

ঝি বলল, ও বেলার দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে। গয়লা বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছিলুম, তা গয়লা মিনসে তো এখনও দুধ দিয়ে গেল না!

নিবেদিতা গালে হাত দিলেন। সর্বনাশ! এ দেশে সবাই দুধ-চিনি মিশিয়ে চা খায়। অতিথিদের চা দেওয়া যাবে না। মান-সম্মান সব যাবে।

সরলা রায় এই সময় উঠে এসে জিজ্ঞেস করলেন, মিস নোবল, আমি কি চা বানাতে সাহায্য করতে পারি?

নিবেদিতা কাঁদো কাঁদো হয়ে সরলা রায়ের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, মিসেস রায়, দারুণ বিপদে পড়েছি। বাড়িতে দুধ নেই এক ফোঁটাও। চায়ের নেমন্তন্নে আমি চা দিতে পারব না?

সরলা রায় হেসে বললেন, এতে এমন বিপদের কী আছে! চা বানাতে আর কত দুধ লাগে। সব গেরস্ত বাড়িতেই দুধ থাকে। ওগো ঝি, পাশের কোনও বাড়ি থেকে এক বাটি দুধ চেয়ে আনো তো বাছা। দুধ চাইলে কেউ না বলে না।

তারপর নিবেদিতাকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করে চা পাঠাচ্ছি। ওখানে কেউ কোনও কথা বলছে না, আপনার ওখানে গিয়ে বসা উচিত।

বিবেকানন্দ এর মধ্যে একটা লম্বা চুরুট ধরিয়েছিলেন। নিবেদিতাকে ফিরতে দেখে বললেন, চা আসছে?

নিবেদিতা বিনীতভাবে বললেন, একটু দেরি হবে, অনুগ্রহ করে আপনারা অপেক্ষা করুন।

মহেন্দ্রলাল সরকার বললেন, এক পেয়ালা চা খেয়েই উঠব। অনেক কাজ আছে।

তারপর বিবেকানন্দর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ হে নরেন, শুনলুম বেলুড়ে তোমরা একটা মস্ত বড় আখড়া বানাচ্ছ? মেমসাহেবরা টাকা দিয়েছে। সেখানে কী হবে?

বিবেকানন্দ সহাস্যে বললেন, আমার গুরুভাইদের থাকার জন্য একটা আস্তানা তো দরকার। ভাড়াবাড়ি থেকে বারবার খেদিয়ে দেয় আমাদের। আরও অনেক ছেলে আমাদের গুরুর টানে সংসার ছেড়ে আসতে চায়।

মহেন্দ্রলাল বললেন, সেখানে কি গুলতুনি হবে না কি ঠাকুর-ফাকুর বানিয়ে পুজোআচ্চাও চালাবে? ধুমধাম করে কিছু পুজো না করলে তো এ দেশের মানুষদের মন ভরে না। তবে হ্যাঁ, প্লেগের সময় তোমরা দলবল মিলে খুব একচোট সেবা করেছ মানুষের। শাবাশ! মাই হ্যাট্‌স অফ। এই মিস নোব্‌লকে একদিন দেখি নিজে ঝাঁটা নিয়ে বস্তির রাস্তা পরিষ্কার করছে। তাই দেখে লজ্জা পেয়ে একদল ছোকরা ছুটে এসে ওঁর হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে নিজেরা সে কাজ শুরু করল। তখনই তো আমি নিজে থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করেছি।

বিবেকানন্দ বললেন, আজ্ঞে, মানুষের সেবা করাই তো শ্রেষ্ঠ পূজা।

মহেন্দ্রলাল ভুরু তুলে বললেন, বটে! তাই নাকি? অনেকেই তো মুখে এই সব বড় বড় কথা বলে, চমৎকার শোনায়! তবু কোনও একটা মূর্তির সামনে গিয়ে ম্যা ম্যা করে কেঁদে ভাসাতেও তো ছাড়ে না। তুমি আমেরিকায় গিয়ে প্রচুর বক্তৃতা দিয়ে লালমুখো সাহেবদের আমাদের ধর্ম শিখিয়ে

এসেছ। এখন এ দেশে তোমার প্ল্যান কী? এ দেশের গরিবগুরবো লোকদেরও ধর্ম শেখাবে?

বিবেকানন্দ বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক মানুষ দেখেছেন জানি। কিন্তু শহরের বাইরে, গ্রামে-গঞ্জে, সারা ভারত ঘুরে ঘুরে আমি দেখেছি। এ দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা আমি আপনাদের থেকে ভাল জানি। চতুর্দিকে অসহ দারিদ্র, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার। দারিদ্রই সব রোগের মূল। দারিদ্র মানুষকে একেবারে নির্জীব, কাপুরুষ করে দেয়। আমার গুরু বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। আমিও মনে করি, এমনকী এ দেশের একটা কুকুরও যতদিন অভুক্ত থাকবে, ততদিন বেদ-পুরাণ-কোরান-বাইবেল চর্চার প্রয়োজন নেই। দেশবাসীর অন্ন জোগানোর ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনও ধর্মেরও প্রয়োজন নেই।

গভীর বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে মহেন্দ্রলাল বললেন, অ্যাঁ, বলো কী! এমন কথা বাপের জন্মে শুনিনি। আর কোনও মহাপুরুষও তো এই কথা বলেননি।

তারপর বিবেকানন্দর পিঠে একটা চাপড় মেরে তিনি বললেন, নরেন, তুমি যদি এই কাজ শুরু করতে পারো তা হলে বয়েসে অনেক বড় হয়েও আমি তোমার পায়ের ধুলো নেব। তোমার হুকুমের চাকর হয়ে থাকব।

এর মধ্যে চা এসে গেল। আবার সবাই নীরব। সবাই যেন চায়ে চুমুক দিতেই ব্যস্ত।

চা শেষ হল, তবু আর কেউ মুখ খোলে না। নিবেদিতার মনে হল, এখানে যেন একটা মেঘ জমে আছে। থমথম করছে বাতাস।

মহেন্দ্রলাল বললেন, নরেন, তুমি একখানা গান শোনাবে নাকি?

বিবেকানন্দ বললেন, না, আজ থাক।

মহেন্দ্রলাল সাড়ম্বরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে আর বসে থেকে কী হবে! থ্যাঙ্ক ইউ মিস নোব্‌ল, থ্যাঙ্ক ইউ ফর হাই টি।

মহেন্দ্রলাল বিদায় নেবার পর আসর ভঙ্গ হল। সবাই বিদায় নিতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানালেন এবং বিবেকানন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন, নমস্কার।

বিবেকানন্দও বললেন, নমস্কার।

দু'জনের মধ্যে আর একটিও বাক্য বিনিময় হল না।

৪৮

কয়েকদিন হল শীত পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকালটিতেই যেন প্রকৃতিকে পূর্ণ চোখ মেলে দেখা যায়। চোখ ভরে যায় আকাশের নীলিমায়, তাপহীন রোদ্দুর বড় প্রীতি দেয়। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য শীতকালটি বিশেষ পছন্দ করেন। দোতলার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি সামনের দিঘিতে কয়েকটি হংসের জলক্রীড়া দেখছেন। কোন সুদূর অজানা দেশ থেকে এসেছে এই হাঁসগুলি, গ্রীষ্ম একটু চড়া হলেই আবার উড়ে চলে যাবে।

মহারাজ রাধাকিশোরের এই বাসস্থানটিকে রাজবাড়ি বলা যায় না, এমনকী প্রাসাদও নয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর কোনও রাজসভাগৃহ নেই। গত ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হবার পর তা মেরামত করার বদলে নয়া হাভেলিতে নির্মিত হচ্ছে নতুন রাজপ্রাসাদ। ইংরেজ স্থপতির পরিকল্পনায় সে অট্টালিকা হবে সত্যিকারের একটি দর্শনীয় বস্তু। রাজত্ব চালাতে গেলে রাজা-মহারাজাদের দুটি জিনিস অবশ্য দরকার। সাধারণ লোকেদের চেয়ে অনেক লম্বা একটি নাম

আর অন্য সমস্ত প্রজার চেয়ে বড় একটি প্রাসাদ। রাজকোষের অবস্থা সঙ্গীন হলেও এই প্রাসাদ নির্মাণে কার্পণ্য করা যায় না। বস্তুত প্রাক্তন রাজবাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আগরতলায় নতুন একটি রাজধানীই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সে জন্য প্রয়োজন মতন রাস্তা-ঘাটও তৈরি করা দরকার। সে সব কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তাই আপাতত মহারাজ রাধাকিশোর রয়েছেন একটি দ্বিতল ভবনে, এখানে বসেই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন।

মাথায় রাজমুকুট পরলে অনেক রকম সমস্যা তার ওপর চেপে বসে। ভূমিকম্পের ক্ষয়-ক্ষতি মেটাতে অর্থসঙ্কট লেগেই আছে, আত্মীয়স্বজনদের ঈর্ষা-লোভ-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, রাজকর্মচারীরা সব সময় দলাদলিতে মত্ত, তাদের সদলবলে সরিয়েও দেওয়া যায় না আবার খুব ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়াও বিপজ্জনক। বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রনাথ এখনও সিংহাসনের দাবি ছাড়েননি, কে যে কখন তাঁর দলে যোগ দিচ্ছে তা বোঝা দুষ্কর। ইংরেজরাও চাপ দিচ্ছে নানা রকম।

এতসব সমস্যা থাকভেও আজ সকালে রাধাকিশোরের মন প্রসন্ন আছে। ঘুম থেকে ওঠার পর কিছুক্ষণ প্রাতর্ভ্রমণ করে এসেছেন, শীতের বাতাসে শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। রাধাকিশোর তাঁর পিতার মতন ভোজনরসিক নন, তিনি স্বল্পাহারী, এক একদিন সকালে কিছুই খেতে চান না, আজ তিনি দুটি কচুরি ও একটি সিদ্ধ ডিম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছেন। তারপর তিনি একটি কয়েক মাসের পুরনো 'ভারতী' পত্রিকা পাঠ করতে লাগলেন।

এই পত্রিকায় অধিকাংশ রচনাতেই রচয়িতার নাম থাকে না। তবে রাধাকিশোর জানেন, অনেকগুলিরই লেখক কবীন্দ্র রবীন্দ্রবাবু। তিনি কত কাজে ব্যস্ত থাকেন, তবু কী করে এত লেখা লেখেন, তা বড় বিস্ময়কর। এবং একই সঙ্গে কত রকম রসের রচনা। কোনওটি লঘু প্রণয় কাব্য, কোনওটি ঈশ্বর-আরাধনা-গীতি, আবার হাস্যকৌতুক, রাজনৈতিক ভাষ্য ও গুরু প্রবন্ধ। পত্রিকার এক একটি সংখ্যায় কোন কোনটি রবীন্দ্রবাবু রচনা তা চিহ্নিত করা রাধাকিশোরের একটি প্রিয় খেলা।

এই সংখ্যায় 'হতভাগ্যের গান' কবিতাটি অবশ্যই রবীন্দ্র বাবুর। লঘু ভঙ্গিতে লেখা, তির্যক বিদ্রূপে সমসাময়িক চিত্রটি নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

বন্ধু,
কিসের তরে অশ্রু ঝরে
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিশ্বে তারা
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়গো তারা ক্রীতদাস।....

পড়তে পড়তে একটি জায়গায় রাধাকিশোরের মনে হল, এ যেন তাঁরই নিজের কথা : -

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যে চাটু মক্কা কাশী।
আত্মপরের প্রভেদ ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা
থাকবে তুমি থাকব আমি
সমান ভাবে বার মাস...

এমন কৌতুকচ্ছলে যিনি লিখতে পারেন, তিনি আবার আগের সংখ্যায় আর একটি কবিতা লিখেছেন, যা সুগম্ভীর, সুললিত কাব্য সমন্বিত :

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা...

আবার একটি গল্প লিখেছেন 'ডিটেকটিভ' নামে। 'প্রসঙ্গ কথা' ও 'সাময়িক সাহিত্য'-এই লেখারও ভাষা দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রবাবুর না হয়ে যায় না। বাংলা ভাষায় এত বেশি রচনা কি আর কোনও লেখক লিখতে পেরেছেন ? স্বয়ং দেবী সরস্বতী কলমে ভর না করলে এমনটি হতে পারে না।

রাধাকিশোর নিবিষ্টভাবে পড়ছিলেন, একজন ভৃত্য এসে জানাল যে, মহিম ঠাকুর দর্শনপ্রার্থী।

নীচের তলায় হলঘরটিতে রাধাকিশোর বাইরের লোকদের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু মহিম ঘরের লোক। মহিমকে ওপরে নিয়ে আসার জন্য তিনি ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন।

মহিমের হাতে কাগজে জড়ানো একটি বড় মোড়ক আর একটি লেফাফা। রাধাকিশোর কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই মহিম প্রণাম জানাবার পর মোড়কটি খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর বললেন, কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয় এটি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

রাধাকিশোর বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার। এই মুহূর্তে আমি ওঁরই রচনা পাঠ করছিলাম। এটা কী ?

বস্তুটি একটি সাদা রেশমের থান। খুব একটা মসৃণও নয়। কোনও রাজাকে উপহার দেওয়ার মতন কিছু নয়, হঠাৎ রবিবাবু এটা পাঠালেন কেন ! মহারাজের বিস্ময় টের পেয়ে মহিম বললেন, জিনিসটি দেখতে অতি সাধারণ বটে, আপনার যোগ্য নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু এর বিশেষ মূল্য আছে। কবি আমাকে জানিয়েছেন, এটা দিশি রেশম। রেশমের কাপড়ের ব্যবসা সব ইংরেজদের হাতে, এখন আমাদের দেশের মানুষও কিছু কিছু রেশমের উৎপাদন করছে। ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হলে দেশীয় উৎপাদকদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। কবি তাই রাজশাহির রেশম উৎপাদক সমিতির কাছ থেকে এই থান কিনে কিনে বন্ধুবান্ধবদের উপহার পাঠাচ্ছেন। এতে দেশজননীর স্পর্শ আছে।

রাধাকিশোর থানটি তুলে নিয়ে দেখলেন, তারপর মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, যত দেখছি, যত শুনছি, ততই বিস্ময়ের অবধি থাকছে না। এতদিন আমরা জানতাম, কবিরা ঘরে বসে বসে প্রদীপের আলোতে পদ্য লেখেন, আর লোকজনকে তা শুনিয়ে আনন্দ পান। আর ইনি এত বড় কবি। দু'হাতে গদ্য-পদ্য লিখছেন, থিয়েটার করছেন, গান গাইছেন, আবার জমিদারি চালাচ্ছেন, দেশের কথা চিন্তা করছেন। যে-দু চারবার ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, উনি দেশের মানুষের কল্যাণ বিষয়ে আমাকে সচেতন করতে চেয়েছেন। মহিম, দেশ মানে কী, তা কি আমরা জানতাম ? দেশ মানে শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই আমার দেশ, এ দেশের সমস্ত মানুষই আমার স্বজাতি, এমন কথা আমি রবীন্দ্রবাবুরই কাছ থেকেই জেনেছি। তুমি ওঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখে দাও। আমরা, ত্রিপুরায় রেশমের চাষ করতে পারি না ?

মহিম বলল, অবশ্যই পারি। কবি নিজেও নাকি শুরু করেছেন। এই ব্যাপারে একজন কোনও এক্সপার্টকে তা হলে আনতে হয়।

রাধাকিশোর বললেন, আনাবার ব্যবস্থা করো। আজ আমরা পরনের কাপড়টুকুর জন্যও ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল। তুমি কিংবা আমি যে বস্ত্র পরে আছি, এগুলি এসেছে ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে। ছিঃ ! এই রেশমের থান দিয়ে আমার কুর্তা বানাব। সেই কুর্তা পরে আমি লাটসাহেবের দরবারে যাব।

মহিম বলল, মহারাজ, কয়েকখানা পত্র সই করাবার ছিল।

রাধাকিশোর বললেন, আজ ওসব থাক। এই 'ভারতী' পত্রিকাখানা পড়ছি, অন্য কিছু পড়তে চাই

না। আচ্ছা মহিম বলো তো, এ লাইনগুলি কার লেখা ? 'বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ইতিহাস যদি বা বিপর্যস্ত হইয়া থাকে তাহাতে বঙ্কিমবাবুর কোনও খর্বতা হয় না। ... অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ইতিহাসকে মানিবে না তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কী ? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসের একটি বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনও খাতির নাই।'....

মহিম বলল, এ লেখা আমি আগেই পড়েছি। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, রবীন্দ্রবাবু তার সমালোচনা করেছেন। শুনেছি অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রবাবুর বন্ধু লোক, কিন্তু ইতিহাসের তথ্যের ব্যাপারে বড় খুঁতখুঁতে, রবীন্দ্রবাবু এই প্রবন্ধের ব্যাপারে অক্ষয়বাবুকে সমর্থন করতে পারেননি।

রাধাকিশোর বললেন, এই পরের অংশটি শোনো, কী অপূর্ব ভাষামাধুর্য। 'ইতিহাস-ভারতীর উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু তাহা কোনও মতেই সহ্য করিতে পারেন না—কিন্তু মহারানীর খাস হুকুম আছে। ... ইহাতে ইতিহাসের কোনও ক্ষতি হয় না, অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়।'....

পড়া থামিয়ে রাধাকিশোর বললেন, মহিম, রবীন্দ্রবাবুকে একবার ত্রিপুরায় আনা যায় না ? পিতাঠাকুরের আমলে, ওঁকে দু'একবার আনার কথা হয়েছিল, পিতাঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রবাবু দার্জিলিং গিয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর ত্রিপুরায় আসা হয়নি।

মহিম উৎসাহের সঙ্গে বলল, ওঁকে একবার অবশ্যই আনা উচিত। আমাদের এখানে যারা গান-বাজনা আর কাব্য চর্চা করে, তারা অনেক উৎসাহ পাবে।

রাধাকিশোর বললেন, শুধু চিঠি লেখা শিষ্টাচারসম্মত হয় না, ওঁর কাছে গিয়ে আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

মহিম মুখটা বাড়িয়ে বলল, আমি কলকাতায় চলে যাব ? কালই উদ্যোগ করতে পারি।

রাধাকিশোর হেসে বললেন, তুমি তো কলকাতার নাম শুনলেই একেবারে পাঁচ হাতিয়ার বেঁধে তৈয়ার! কেন, আমি নিজে যেতে পারি না ? এই শীতকালে কলকাতায় কত আমোদ-প্রমোদ হয়, সার্কাস, ম্যাজিক, সারা রাত্র ব্যাপী যাত্রা-থিয়েটার, কত কী দেখার থাকে। কলকাতায় দুশো মজা! হ্যাঁ হে মহিম, আর একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। কোনও এক সাহেব নাকি এক আজব জিনিস দেখাচ্ছে, ছবি নড়া চড়া করে ? ছবি দৌড়োয় ? ছবির ঘোড়া সত্যি সত্যি ছোটে। এই আজগুবি ব্যাপার কী করে সম্ভব ?

মহিম বলল, এটা আমিও শুনেছি। আপনি তো ফটোগ্রাফি বিষয়ে জানেন। স্বর্গত মহারাজ ভাল ফটোগ্রাফার ছিলেন। দু'জন ফরাসি সাহেব ফটোগ্রাফ জুড়ে জুড়ে কীভাবে যেন সেগুলি চলন্ত করে দিয়েছেন। একে বলে সিনেমাটোগ্রাফি। ব্যাপারটা যে ঠিক কী করে সম্ভব, তা আমিও বুঝি না, মহারাজ। অমৃতবাজার পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন দেখি। স্টিভেনসন নামে এক সাহেব বায়স্কোপ যন্ত্রে মানুষের নড়াচড়ার ছবি দেখাচ্ছে স্টার থিয়েটারে। এক ইংরেজ বিবির নাচও দেখাচ্ছে সেই ছবিতে।

রাধাকিশোর কিছুটা অবিশ্বাসের সুরে বললেন, তার মানে কী হল ? আমি এখানে এই চেয়ারে বসে আছি, ওই বায়স্কোপে যদি আমার ছবি দেখানো হয়, আমি নিজেই নিজেকে দেখব ? এ কী কখনও হতে পারে ?

মহিম বলল, কেন মহারাজ, আমরা কি আয়নায় দেখি না ? একটা মস্ত বড় আয়না হলে নিজেদের লাফানো-ঝাঁপানো, নাচও দেখতে পারি। ধরে নিন সে রকম একটা ব্যাপার।

রাধাকিশোর প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না, এ তুলনাটা ঠিক হল না। আয়নায় শুধু ঘটমান বর্তমান দেখা যায়। অতীত কি কেউ দেখতে পারে ? ওই বায়স্কোপের ছবি যেদিন তোলা হল, তার এক মাস পরেও আমি দেখতে পাব সেই ছবি। ধরো, আমি বসে আছি এই ঘরের মধ্যে, ছবি তোলা হয়েছিল কলকাতায় গড়ের মাঠে, এখানে বসে আমি দেখতে পাব যে, আমি কলকাতায় হেঁটে-চলে

বেড়াচ্ছি ? একই সঙ্গে নিজের দ্বৈত সত্তা ?

মহিম বলল, শুধু তাই নয়, মহারাজ। মনে করুন, এই যে নর্তকী বিবির ছবি তোলা হয়েছে, দু'চারদিন পরে সে কোনও দুর্ঘটনায় মারা গেল। তবু বায়স্কোপে দেখা যাবে, সে হাসি মুখে জ্যান্ত অবস্থায় নেচে চলেছে।

রাধাকিশোর বললেন, ছবিতে মরা মানুষকে জীবন্ত করে রাখছে ? মাথাটা যে গুলিয়ে যাচ্ছে হে। থমকে যাবে মহাকাল ?

মহিম বলল, বিজ্ঞানের যুগ এসে গেছে। বিজ্ঞান সব অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটাচ্ছে, মহারাজ। গত বর্ষাকালে আমি কলকাতায় গেসলাম, তখন আরও একটা অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করে এসেছি। কিছু কিছু বড় মানুষের বাড়িতে বিজলি বাতি জ্বলছে। আগুন জ্বালতে হয় না, বাতি জ্বলে। গ্যাসের বাতি জ্বালাতেও তো আগুন ধরাতে হত, এই আলোয় আগুনের কোনও কারবারই নেই। কাচের ডুমের মধ্যে আলো জ্বলে, সেই ডুমে হাত দিলেও হাত পোড়ে না, এর নাম ইলেকট্রিসিটি। রেড়ির তেলের প্রদীপ, মোমবাতি কিংবা গ্যাসের বাতি এক সময় নিবে যায়। কিন্তু এই বিজলি সারা রাত্রি জ্বলে, এর কোনও লয় ক্ষয় নেই।

রাধাকিশোর বললেন, আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দাও তো। তেল দিতে হবে না, গ্যাস দিতে হবে না, নিজে নিজে জ্বলবে ? এই আলোর মধ্যে আগুন নেই ?

মহিম বলল, আমি নিজের চক্ষে দেখে এসেছি, মহারাজ।

রাধাকিশোর বললেন, তা হলে আমার কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমিও নিজের চক্ষে এসব দেখতে চাই। রবীন্দ্রবাবুর বন্ধু জগদীশ বসু মহাশয় মস্ত বড় বিজ্ঞানী, তাঁর কাছে সব বুঝে নিতে হবে। বিজ্ঞান যে ভেলকি দেখাচ্ছে হে!

মহিম বলল, সেই ভাল মহারাজ, চলুন, দিন কতক কলকাতায় গিয়ে থেকে আসা যাক। আমাদের তো বাড়ি পড়েই আছে। হাইকোর্টের মামলারও তদারকি করা দরকার। তার আগে এখানকার রাজ সরকারের কিছু কিছু কাজ সেরে নিলে ভাল হয়।

রাধাকিশোর বললেন, কাল থেকে বসব। আজ কী চিঠি সই করতে হবে বলছিলে, দাও।

চিঠিখানি পড়তে পড়তে বিরক্তিতে মহারাজের ভুরু কুঁচকে গেল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, অপদার্থের দল। এ চিঠি কে মকশো করেছে ?

মহিম বলল, আজ্ঞে, চিঠিখানি ড্রাফ্ট করেছেন সচিব মশাই। ভুল নেই তো কিছু, আমি পড়ে দেখেছি। আর একবার পড়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেব ?

রাধাকিশোর রক্ত চক্ষে বললেন, না, বোঝাতে হবে না। এ চিঠি লেখা হচ্ছে আনন্দমোহন বসুকে। তিনি বাঙালি, না বাঙালি নন ? তাঁকে ইংরাজিতে চিঠি লেখা হবে কেন ?

মহিম বলল, কিন্তু মহারাজ, উকিল-ব্যারিস্টাররা তো ইংরাজি ছাড়া কথা বলেন না ? তাঁদের সে ইংরাজিতেই সব কিছু—

রাধাকিশোর বললেন, তা তেনারা ইংরাজি বলুন আর ফার্সিই বলুন, তাতে আমাদের কী আসে যায়! আমাদের রাজ দরবার থেকে যত চিঠি যাবে, সব বাংলাতেই যাবে। তেনারা পড়তে না পারেন, কেরানি-মুনশিদের দিয়ে পড়িয়ে নেবেন। আমার পিতাঠাকুর এই রাজ্যে বাংলা প্রবর্তন করেছিলেন, তার থেকে আমরা বিচ্যুত হব না। আমি লক্ষ করছি, আমার আমলা-কর্মচারীর অনেকেই ইদানীং ইংরাজি-মিশেল দিয়ে কথা বলে। শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। দু'পাতা ইংরাজি পড়েই বাংলা ভুলে যাবে ? তুমিই বা চিঠি ড্রাফট করা বললে কেন ? চিঠি মুসাবিদা বলা যায় না ? ওই যে মনুজেন্দ্র নামে নতুন লোকটি এসেছে কলকাতা থেকে, সে আমাকে বারবার মহারাজ না বলে মহারাজা বলে সম্বোধন করে। তার ভুলটা শুধরে দিতে পারো না।

ধমক খেয়েও মহিম ঠিক বুঝতে পারল না, এই সম্বোধনে ভুল কোথায়।

রাধাকিশোর আবার বললেন, তুমিও বুঝি জানো না ? এই তোমার বিদ্যের দৌড়! রাজা থেকে মহারাজ, যেমন অধিরাজ, সামন্তরাজ ; ইংরেজরা ইংরিজি অক্ষরে লেখার সময় শেষ কালে একটা এ

অক্ষর জুড়ে দেয়। তাই দেখে দেখে দেশের লোকরাও ব্যাকরণ ভুলে গিয়ে মহারাজা বলতে শুরু করেছে। এরপর কি ইংরাজি বানান অনুসারে রাম হয়ে যাবেন রামা, আর কৃষ্ণ হয়ে যাবেন কৃষ্ণা ?

মহিম মাথা নিচু করে রইল। মহারাজের বাংলা সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা সে জানে। কিন্তু আজকাল কথায় কথায় কিছু ইংরেজি শব্দ এসেই যায়। কলকাতা শহরে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই তো পুরো পুরো ইংরেজি বাক্য বলে, কিংবা ইংরেজি-বাংলায় জগাখিচুড়ি করে।

রাধাকিশোর বললেন, সকলকে বলে দেবে, ত্রিপুরা রাজসভায় একমাত্র ভাষা বাংলা, আমরা বাংলা ভাষার সেবক। যে যত ইচ্ছে ইংরাজি শিখুক কিন্তু রাজকার্যে সর্বদা বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে। আর আমার সামনে কেউ যেন ইংরাজি শব্দ ব্যবহার না করে। যাও, এই চিঠি আবার বাংলায় লিখে নিয়ে এসো।

মহিম বিদায় নিতে উদ্যত হলে রাধাকিশোর আবার ডেকে বললেন, দাঁড়াও। তোমাকে রূঢ় কথা বলে ফেলেছি, কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার সুহৃদ। তোমার ওপরে আমি অনেক ব্যাপারেই নির্ভর করি। মহিম, আমি লক্ষ করছি, নতুন নতুন যে-সব কর্মচারী নিযুক্ত হচ্ছে, তারা বাংলা ভাষার ওপর শ্রদ্ধাহীন। বিদ্যালয়ে মন দিয়ে বাংলা শেখেইনি। পাঁচ লাইন শুদ্ধ বাংলা লিখতেও জানে না। আমার সব আমলা-কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিছুদিন উত্তমরূপে শেখাবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ?

মহিম বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। অনেকেরই বাংলা জ্ঞান পোক্ত না। ছ' মাসের জন্য ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে ভালই হবে। এর জন্য কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে।

রাধাকিশোর বললেন, তুমি সে রকম কিছু শিক্ষকের সন্ধান করো। এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার প্রসারের দিকেও মন দিতে হবে। আমি একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করছি কিছু দিন ধরে। রাজকুমারদের শিক্ষার দিকটাও নজর দেওয়া দরকার। আচ্ছা মহিম, তোমার শশিভূষণ সিংহের কথা মনে আছে ? পিতাঠাকুরের আমলে তিনি কুমারদের শিক্ষক ছিলেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। ইংরাজি ও বাংলা দুটি ভাষাতেই তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।

মহিম বলল, হ্যাঁ মহারাজ, তাঁর কথা আমার মনে আছে। এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার দু'একবার দেখা হয়েছে।

রাধাকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে ফিরিয়ে আনা যায় না ?

মহিম বলল, না, তা বোধকরি সম্ভব হবে না। শশিভূষণ সিংহ ত্রিপুরা রাজ্যটিকে ভালবেসেছিলেন। এখানকার মানুষজন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু তিনি আর কখনও ত্রিপুরায় ফিরে আসতে চান না। স্বর্গত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য জীবিত থাকতে শশিভূষণ সিংহের সঙ্গে আমার কিছু কিছু কথা হয়েছিল। কোনও একটি ঘটনায় ত্রিপুরা রাজবংশের ওপর তাঁর সাংঘাতিক বিরাগ জন্মে গেছে।

রাধাকিশোর আগ্রহের সঙ্গে বললেন, কী ঘটনা, শুনি শুনি !

মহিম বলল, তিনি যা বলেছিলেন, তা যদি সত্য হয়, তবে তা আপনার সম্মুখে উচ্চারণ করা কিছুতেই উচিত হবে না।

রাধাকিশোর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কী এমন ঘটনা হতে পারে ? মহিম, আমি কৌতূহল দমন করতে পারছি না। তুমি আমাকে সবিস্তারে সব খুলে বলো।

মহিম তবু ইতস্তত করতে লাগল।

রাধাকিশোর উঠে এসে মহিমের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ ? কেন ? সত্য কথাকে তো আমি ভয় পাই না। শশিভূষণ মাস্টারের সঙ্গে আমার কখনও বিরোধ হয়নি। তিনি আমার সম্পর্কে কী এমন কঠোর অভিযোগ আনতে পারেন ? তুমি জানো, তোমার পরামর্শ ছাড়া আমার চলে না। তুমি আমাকে যে-কোনও কথাই বলতে পারো। বলো।

মহিম মুখ নিচু করে বলল, শশিভূষণ মাস্টারের ধারণা, আপনি ভরতকে হত্যা করার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন।

রাধাকিশোর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রক্তশূন্য মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মহিমের দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, ভরত ! ভরত কে ?

মহিম বলল, সে আপনাদের এক ভাই ছিল। শশিভূষণ মাস্টারের প্রিয় ছাত্র, খুব মেধাবী।

রাধাকিশোর দূরের দৃশ্য দেখার মতন অন্যমনস্ক কণ্ঠে বললেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, রাধারমণ ঘোষ মশাইয়ের বাড়ির একখানা ঘরে থাকত। লেখাপড়ায় মন ছিল, মাস্টারের কাছে সে মাঝে মাঝে একাই পড়তে যেত। হা ভগবান, আমি নিজের হাতে কোনও দিন একটা পক্ষীও মারিনি, রক্ত দেখলে আমার মাথা ঝিমঝিম করে। আমি সেই নিরীহ ছেলেটিকে হত্যা করব কেন ? আমার সঙ্গে বোধকরি জীবনে সে একটা কথাও বলেনি। তার সঙ্গে আমার কীসের শত্রুতা।

মহিম বলল, সে সময় যুবরাজ হিসেবে প্রাসাদের দেহরক্ষী বাহিনীর অধিকর্তা ছিলেন আপনি। আপনার অজ্ঞাতসারে কেউ কি ভরতকে খুন করার দায়িত্ব নিতে পারে ?

রাধাকিশোর অসহায়ভাবে বললেন, মহিম, আমি গীতা ছুঁয়ে শপথ করে বলতে পারি, এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গও আমি জানতাম না। তাকে আমি খুন করব কেন ! সে তো আমার সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেনি। আমার রাজত্বে ভাগ বসাবারও তার কোনও অধিকার ছিল না।

মহিম বলল, আপনার পিতা সেই সময় আর একটি বিবাহ করেছিলেন মনে আছে ? সেই বিবাহের ব্যাপারে ভরতকে নিয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। ভরত নাকি নিজের অধিকার লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছিল। আপনার পিতাকে খুশি করার জন্য আপনি চিরতরে ভরতকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

রাধাকিশোর বললেন, সে বিবাহের সময় আমার নিজেরই যথেষ্ট ভয়ের কারণ ঘটেছিল। ভরতের অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমার কোনও খেয়াল ছিল না। ভরতকে নিয়ে কী জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তাও আমি জানি না। মহিম, তুমি বিশ্বাস করো আমি ওই ভরতের ঘাতক ?

মহিম দৃঢ় স্বরে বলল, না মহারাজ, আমি বিশ্বাস করি না। এটা শুধু আপনাকে তোষামোদের কথা নয়। সিংহাসন অটুট রাখতে গেলে কিছু কিছু লোককে সরিয়ে দিতেই হয়। রাজনীতিতে মায়াদয়া অনেকটা আপেক্ষিক ব্যাপার। কিন্তু আমি আপনাকে বাল্যকাল থেকেই তো দেখছি। আপনার মন বড় কোমল, রক্তারক্তিতে আপনার একেবারেই রুচি নেই। কিছুটা থাকলে বরং আপনি নিষ্কণ্টক হতে পারতেন। ভরতের মতন সামান্য একটি প্রাণীকে হত্যার ব্যাপারে সম্মতি জানানো আপনার পক্ষে অসম্ভব। নিশ্চয়ই অন্য কোনও ষড়যন্ত্র ছিল এবং ইঙ্গিতটা ছিল আপনার দিকে, যাতে এ ব্যাপারে কোনও তদন্ত না হয়।

রাধাকিশোর বললেন, ভরতকে আর দেখিনি বটে, তাকে নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। একবার শুধু ভেবেছিলাম, সে কাছুয়ার সন্তান, রাজকুমারদের ভাতা পাবারও অধিকারী নয়, তাই লেখাপড়া শিখে সে এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে জীবিকার সন্ধানে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আহা, ছেলেটাকে কে মারল ? এতদিন পর তা কি জানার উপায় আছে ? শশিভূষণ মাস্টার আমার সম্পর্কে এই ধারণা করে রেখেছেন, পৃথিবীতে একজন মানুষই বা বিনা অপরাধে আমাকে খুনি ভাববে কেন ?

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, মহিম, মহিম বঙ্গবাসী পত্রিকায় যিনি মাঝে মাঝে নিবন্ধ লেখেন, সেই শশিভূষণ সিংহ আর আমাদের মাস্টারমশাই কি একই ব্যক্তি ?

মহিম বলল, খুব সম্ভবত একই। ওই লেখায় মাঝে মাঝেই ত্রিপুরার প্রসঙ্গ থাকে।

রাধাকিশোর বললেন, কী সর্বনাশ ! যদি কখনও এই কাহিনী লেখেন। লোক চক্ষে আমি হেয় হয়ে যাব। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার ছিদ্রান্বেষণে খুব উৎসাহী। জুম চাষ নিয়ে একবার কত বিদ্রূপ করেছিল মনে নেই ? মহিম, যেমন করে পারো, শশিভূষণ সিংহকে খুঁজে বার করো। তাঁর ভুল ভাঙাতেই হবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে সপারিষদ মহারাজ রাধাকিশোর চলে এলেন কলকাতায়। প্রথমেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দূত পাঠালেন, কিন্তু কবি রবীন্দ্রবাবু বর্তমানে শিলাইদহে রয়েছেন, অচিরে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই রাধাকিশোর কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেল, তিনি স্বয়ং কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সংকোচ বোধ করেন, সুতরাং রবীন্দ্রবাবুর ফেরার অপেক্ষায় থেকে তিনি অন্য কাজে মন দিলেন। মহিমকে তিনি সারাক্ষণ উদ্যোগ করেন শশিভূষণ সিংহকে একদিন এই সার্কুলার রোডের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য।

শশিভূষণের ঠিকানা সংগ্রহ করা কঠিন হল না, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কার্যালয় থেকেই পাওয়া গেল।

চন্দননগরে পাকাপাকি বসতি নিয়েছেন শশিভূষণ, একটি স্কুল চালান, পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে লেখালেখি করেন। জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোনও চাকরি গ্রহণ করেননি, জমা টাকা ব্যাঙ্কে লগ্নি করেছেন, যা সুদ পান তাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যায়। ফটোগ্রাফি চর্চার বিলাসিতা আর নেই। শশিভূষণের বর্তমান চেহারায় আগেকার সেই ছিপছিপে সুদর্শন মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শরীর এখন ভারী হয়ে গেছে, কপাল প্রশস্ত হতে হতে পৌঁছে গেছে মাথার অর্ধেক পর্যন্ত, বাকি চুলেও যেন পাউডারের ছোপ লেগেছে। বছর দু'-এক আগে চন্দননগর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে প্লাটফর্মে আছাড় খেয়ে পড়ে যান, বাঁ পায়ের মালাইচাকি ঘুরে গিয়েছিল, সেই থেকে ওই পায়ে আর জোর পান না, একটা হাঙরমুখো ছড়ি তাঁর সঙ্গে থাকে সব সময়।

চেহারায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেকখানি। পা ভাঙা অবস্থায় যখন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল প্রায় মাস দু'-এক, সেই সময় শশিভূষণ বারবার নিজের জীবন পর্যালোচনা করেছেন। তারই মধ্যে একদিন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, ভূমিসুতার জন্য তিনি অমন পাগল হয়েছিলেন কেন? সমস্ত যুক্তিবোধ ও কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে তিনি ভূমিসুতাকে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থবল, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এমনকী জাতিভেদের সংস্কার বর্জিত ঔদার্য দেখিয়েও যে রমণীর প্রেম পাওয়া যায় না, তা কি তিনি জানতেন না? এত কাব্য-সাহিত্য পাঠ তা হলে বৃথা।

বেশ কয়েক বছর ধরে শশিভূষণ অবুঝ ছিলেন। বেচারি ভরতের চালচুলো ছিল না। পিতৃ-পরিচয় ছিল না, জীবনের স্থিরতা ছিল না, সে শুধু পেয়েছিল ভূমিসুতার প্রেম, সেটুকুও সহ্য করতে পারেননি শশিভূষণ। ভরতের সঙ্গে তাঁর স্নেহ-দয়া-মায়ার সম্পর্ক এক নিমেষে উবে গেল, সে হয়ে উঠল তাঁর দু'চক্ষের বিষ। জীবনে আর তাঁর মুখ দর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অথচ ভরতের কী দোষ ছিল?

ভূমিসুতাকে তিনিও পাননি, ভরতও পায়নি। সেই ভূমিসুতাই যে নাম বদল করে থিয়েটারের অভিনেত্রী হয়েছে, সে খবরও এক সময় জেনে গিয়েছিলেন শশিভূষণ। তিনি দুটি সন্তানের জনক, তাঁর কোমল স্বভাবা স্ত্রী সংসারটিকে সুশ্রী করে রেখেছেন, পাড়া প্রতিবেশীরা তাঁকে অতি ভদ্র ও রুচিবান গৃহস্থ হিসেবে জানে, কিন্তু তাঁর বুকের মধ্যে যে এখনও ভূমিসুতাকে পাবার তীব্র বাসনা ধক ধক করে, তা কেউ টের পায় না। ভূমিসুতা অভিনীত একই নাটক তিনি বারবার দেখতে গেছেন। আর কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপ তাঁর কানে যায়নি, নাটকের কী কাহিনী তা তিনি গ্রাহ্য করেননি, প্রথম সারির মাঝখানে দর্শকদের আসনে বসে শশিভূষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন ভূমিসুতার দিকে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বারবার মনে হত, এই রমণীকে পেলে তাঁর জীবনে অন্য রকম হয়ে যেতে পারত। শান্ত ভদ্র গৃহস্থ নয়, তিনিও হতে পারতেন এক উদ্দাম শিল্পী।

থিয়েটারের রমণীদের কোনও না কোনও ধনী ব্যক্তি দখল করে রাখে। সে-রকম কারুর রক্ষিতা হয়েও তাদের থাকে আর একজন গোপন পিরিতের মানুষ। যে-সব মঞ্চনারী কিছুটা তেজস্বিনী হয়, তারা একজনের অধীনে বেশিদিন থাকে না, মাঝে মাঝে বাবু বদলায়। সুন্দরী নৃত্য-গীত পটীয়সীদের বারাঙ্গনা হওয়াই নিয়তি। শশিভূষণ গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলেন, ভূমিসুতা ওরফে নয়নমণি কোনও বড় মানুষেরই বশীভূত নয়, ভরতও ধারে কাছে কোথাও নেই। কোনও পুরুষই ভূমিসুতার কাছ ঘেঁষতে পারে না। একদিন শশিভূষণ শো-এর শেষে মঞ্চের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ভূমিসুতাকে ঠিক কী বলবেন তা ভেবে যাননি। ভূমিসুতা তাঁকে দেখে কী রকম ব্যবহার করবে, সেটাই জানতে চেয়েছিলেন। অমর দত্তর স্টেজের খুব রমরমা, তার নায়িকা নয়নমণি সত্যিই বহু

দর্শকের নয়নমণি, তার অঙ্গুলিহেলনে বহু পুরুষ ছুটে আসবে, এতদিন পর সুযোগ পেয়ে ভূমিসুতা অনায়াসেই শশিভূষণকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারে। গ্রিনরুমের দরজার কাছে শশিভূষণকে দেখে ভূমিসুতা থমকে দাঁড়াল, না-চেনার ভান করল না, উদ্ধত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিল না, আস্তে আস্তে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। অঙ্গে জরির পোশাক, মুখে রাজনন্দিনীর মেক আপ, খোঁপায় মুক্তোর মালা জড়ানো, তবু শশিভূষণের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে প্রণাম জানাল। শশিভূষণ কেঁপে উঠেছিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে একটি বাক্যও নিঃসৃত হয়নি, হঠাৎ চক্ষু জ্বালা করে উঠেছিল। এতকালের অবরুদ্ধ বাসনার বেগ তিনি সামলাতে পারছিলেন না। সেই অবস্থা ভূমিসুতার কাছ থেকে গোপন করার জন্য তিনি দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

তারপর থেকে শশিভূষণ ভাবতেন, চেষ্টা করলে ভূমিসুতার সঙ্গে দেখা করা যায়, সে অপমান করে ফিরিয়ে দেবে না, কিন্তু তিনি তাকে কী বলবেন? কী চাইবেন তার কাছে। সে বিষয়ে কিছুতেই মনস্থির করতে পারেননি বলে শশিভূষণ আর ভূমিসুতার জন্য মঞ্চের পেছন দিকে যাননি, কিন্তু দর্শকের আসনে নিয়মিত বসতেন। পা ভাঙার সময় একদিন লাঠিতে ভর দিয়ে স্নানের ঘরে যেতে যেতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওকে আমি কী বলব? আয়নার মুখখানিতে পাঁচ দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, চোখ দুটি ফোলা ফোলা, মধ্য বয়েসের ছাপ অতি স্পষ্ট। আর মঞ্চে সেই নারী এখনও যৌবনের প্রতিমূর্তি। শশিভূষণ বললেন, ওকে কি আমি বলতে পারি, এই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত সংসার ছেড়ে আমি তোমার কাছে চলে আসতে চাই! কিংবা এ সবও রইল, গোপনে তুমি আমাকে তোমার শয্যার অংশীদার করে নাও।

আয়নায় সেই মুখখানি হাসতে আরম্ভ করেছিল। কী অদ্ভুত, অবাস্তব শোনাচ্ছিল কথাগুলি। একা একা বেশ কিছুক্ষণ তিনি হাসলেন, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার মতন সেই থেকে তাঁর ভূমিসুতার ঘোর কেটে গেল। ভূমিসুতাকে নিয়ে তিনি একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বেশিদিন টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না, বয়েস যে কারুকে ক্ষমা করে না।

তারপর থেকে আর থিয়েটার দেখতে যান না শশিভূষণ, কোনও থিয়েটারই না। ঘোর কেটে যাবার পর মনে বেশ একটা প্রশান্তি এসেছে। ভরতকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন একবার ভরতের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরতেন। কিন্তু কোথায় ভরত!

মহিম ঠাকুর যখন চন্দননগরে দেখা করতে এসে একবার মহারাজ রাধাকিশোরের সন্নিধানে যাবার জন্য অনুরোধ জানাল, শশিভূষণ সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, মহিম, আমি ছিলাম বর্তমান মহারাজের বাবার কর্মচারী, ইনি তখন ছিলেন রাজকুমার, আমার কাছে দু'চারবার পড়া জানতেও এসেছিলেন, এক হিসেবে তিনি আমার ছাত্র, তখন তুমি বলতাম, এখন তাঁর সামনে গিয়ে আপনি-আজ্ঞে করে কুর্নিশ জানাতে পারব না।

মহিম বলল, সে সব নাহয় নাই করলেন। মহারাজ নিছক প্রথার ওপর জোর দেন না।

শশিভূষণ বলেন, তা বললে কী হয়! সিংহাসনের অধিকারীর একটা সম্মান তো অবশ্যই প্রাপ্য। তা ছাড়া ওসব পর্ব আমার জীবন থেকে চুকে গেছে। আর গিয়ে কী হবে?

মহিম আসল কথাটাই জানাল না। বিনীতভাবে বলল, আপনি পত্রপত্রিকায় মাঝে মাঝে ত্রিপুরার প্রসঙ্গ লেখেন, তাতে মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট। এখানকার অনেকেই তো ত্রিপুরা রাজ্য বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানে না, মনে করে ওটা একটা পাণ্ডববর্জিত দেশ। মহারাজ সেই বিষয়েই আলোচনা করতে চান, আর আপনার ওপরে কখনও যদি অবিচার হয়ে থাকে, মহারাজ তারও প্রতিকার করবেন।

শশিভূষণ হাসলেন। বললেন, হুঃ, অবিচার যদি কিছু হয়েও থাকে, মহারাজ এতদিন পর তার কী প্রতিকার করবেন? তা ছাড়া অবিচারের প্রশ্ন ওঠে না, মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের কাজে আমি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছি। কেউ বাধ্য করেনি।

মহিম তবু বলল, আপনি বর্তমানে কোনও কর্মে যুক্ত নন। আমাদের রাজ সরকার থেকে কেউ অবসর নিলে তাঁকে মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা আছে। মহারাজ সে ব্যাপারেও—

তাকে থামিয়ে দিয়ে শশিভূষণ বললেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি পৈতৃক সম্পত্তির যা ভাগ

পেয়েছি, তাতেই আমার বাকি জীবন কেটে যাবে। আমার প্রয়োজনও তেমন বেশি নয়। তুমি বোধহয় জানো না, ত্রিপুরায় যে আমি শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলাম, তা জীবিকার জন্য নয়, সেটা ছিল আমার শখ। মহারাজকে বোলো, রাজ্যে তো গরিব দুঃখীর অভাব নেই, আমাকে যা দিতে চান তা যেন ওদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

মহিমের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনেও রাধাকিশোর নিরস্ত হলেন না। তিনি বললেন, শশিভূষণ মাস্টার যদি আসতে না চান, আমি যাব তাঁর কাছে। তোমরা সেই ব্যবস্থা করো।

কিন্তু সেটাও সম্ভব নয়। একজন রাজার পক্ষে অনাহূতভাবে কোনও প্রাক্তন কর্মচারীর বাড়ি যাওয়া শোভা পায় না। তা ছাড়া শশিভূষণ থাকেন ইংরেজ রাজত্বের বাইরে, ফরাসডাঙায়। হুট করে সেখানে যাওয়াটা সুনজরে দেখবে না ইংরেজ সরকার। যত ছোটই রাজ্য হোক, তবু রাধাকিশোর সেখানকার স্বাধীন রাজা তো বটে। ফরাসি এলাকায় যেতে হলে তাঁর মান-মর্যাদা সহকারেই যাওয়া উচিত।

মহিম নিজ বুদ্ধিবলে এর পরেও উভয়ের সাক্ষাৎকারের একটা ব্যবস্থা করে ফেলল।

শশিভূষণ বঙ্গবাসী পত্রিকার কার্যালয়ে মাঝে মাঝে রচনা জমা দিতে আসেন। সেখানে কিছু সাহিত্যিকের সঙ্গে গল্পগুজবও হয়। একদিন সন্ধ্যাকালে বঙ্গবাসী দফতর থেকে বেরিয়ে শশিভূষণ দেখলেন, সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে মহিম। পাশের একটি জুড়িগাড়িতে মহারাজ রাধাকিশোর উপবিষ্ট।

রাজারা কারুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন না। রাধাকিশোর গাড়ি থেকে নেমে সসম্মানে হাত জোড় করে বললেন, নমস্কার মাস্টারমশাই।

শশিভূষণও প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললেন, মহারাজের জয় হোক। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল তো?

রাধাকিশোর বললেন, মাস্টারমশাই, আগে আপনি আমায় তুমি বলে সম্বোধন করতেন। আমি তো আগের সেই রাধাকিশোরই আছি।

মহিম বলল, আপনারা দু'জনে গাড়িতে উঠে কথা বলুন বরং।

একটু ইতস্তত করে শশিভূষণ উঠে বসলেন। তারপর বললেন, আমাকে গঙ্গার ওপারে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই।

রাধাকিশোর বললেন, চলুন আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

শশিভূষণ বললেন, তার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মহিম, তুমি মহারাজকে এখানে নিয়ে এসেছ। গুরুতর কোনও কারণ ঘটেছে নাকি?

মহিম বলল, নতুন সংখ্যা 'বঙ্গবাসী' আমরা আজই সকালে পড়েছি। সম্পাদকীয়তে তীব্র কশাঘাত করে লেখা হয়েছে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে মহারাজ মাথা বিকিয়ে দিতে যাচ্ছেন। সেই লেখা পড়ে মহারাজ খুব উদ্বিগ্ন। অভিযোগ একেবারেই সত্য নয়।

শশিভূষণ বললেন, এ পত্রিকার সম্পাদকীয় আমি রচনা করি না। সম্পাদকমশাই আমার মতামতে প্রভাবিত হবেন না। এ ব্যাপারে আমার কোনও হাত নেই। তবে সম্পাদকের এটুকু উদারতা আছে তিনি আমার রচনায় হস্তক্ষেপ করেন না, আমি স্বাধীনভাবে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারি।

তারপর তিনি রাধাকিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন মহারাজ, আমি নিজে কখনও ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কিছু লিখব না, এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শুধু ত্রিপুরার নুন খেয়েছি বলেই নয়, রাজ্যটি আমার ভারী পছন্দের। সেখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সরল আন্তরিক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। এতগুলি জাতি, এতগুলি ভাষা, তবু সবাই মিলেমিশে আছে, এমন দৃষ্টান্তই বা আর কোথায়!

রাধাকিশোর বলেন, মাস্টারমশাই, আপনার মনে কোনও ক্ষোভ নেই তো?

শশিভূষণ বললেন, না। সে রকম কোনও কারণ ঘটেনি তো। তা ছাড়া, এই বয়েসে আমি মনে কোনও ক্ষোভই পুষে রাখিনি। মহারাজ রাধাকিশোর, আমি কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা ত্রিপুরার কোনও অপকার কখনও হবে না। এবারে গাড়ি থামাতে বলো, আমি নেমে যাই।

রাধাকিশোর ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে মহিমের দিকে তাকালেন।

মহিম বলল, মাস্টারমশাই, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা আপনাকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেব। আর একটা কথা মহারাজ নিজের মুখে বলতে পারছেন না। আমি বলি?

শশিভূষণ কৌতূহলী হয়ে বললেন, হ্যাঁ, বলো।

মহিম বলল, মাস্টারমশাই, অনেকদিন আগে আপনি ত্রিপুরার রাজবাড়িতে একটা গুরুতর ঘটনার কথা আমাকে বলেছিলেন, সেটা আমি এতদিন গোপন রেখেছিলাম। কিছুদিন আগে আমি কথায় কথায় সেটা মহারাজের সমক্ষে প্রকাশ করে ফেলেছি। মহারাজ তাতে খুবই আহত হয়েছেন। আপনার কাছে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত না হলে তিনি কিছুতেই শান্তি পাবেন না। আপনি বলেছিলেন, ভরত নামে একটি ছেলেকে খুন করা হয়েছে এবং সেজন্য, এই মহারাজ তখন যুবরাজ ছিলেন, তিনিই দায়ী।

রাধাকিশোর ঝুঁকে পড়ে আবেগের সঙ্গে বললেন, মাস্টারমশাই, আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে, আমি দায়ী নই। আমি ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতাম না।

শশিভূষণ মহারাজের মুখের দিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর মহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে আমি এ কথাটা বলেছিলাম? কবে বলো তো?

মহিম বলল, এঁর পিতা, আমাদের স্বর্গত মহারাজ যখন প্রথমবার কলকাতায় এসে সার্কুলার রোডের বাড়িতে উঠেছিলেন, আমি তখন কলকাতায় ছাত্র ছিলাম—

শশিভূষণ বললেন, হুঁ, তোমাকে বলেছিলাম, তার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

রাধাকিশোর বললেন, ভরতকে হত্যা করার নির্দেশ আমি দিইনি। আমি যে-কোনও শপথ নিয়ে বলতে পারি।

শশিভূষণ বললেন, এখন আমি বিশ্বাস করি। নরহত্যা তোমার স্বভাবধর্ম নয়। কিন্তু কোন্ অপবাদে জানি না, কারুর নির্দেশে ভরতকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেহরক্ষী বাহিনী ও সেপাইদের কর্তৃত্ব তখন তোমার হাতে ছিল, তাই তোমার নির্দেশে কিংবা জ্ঞাতসারে এই কাণ্ডটি ঘটেছিল, এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

রাধাকিশোর বললেন, মাস্টারমশাই, আমাদের প্রাসাদে ষড়যন্ত্রকারীর অভাব তখনও ছিল না, এখনও নেই। এখনও আমি অনেকের বিষ নিশ্বাস টের পাই।

শশিভূষণ বললেন, মহিম, তোমাকে আমি ওই ঘটনা বলেছিলাম, যাতে তুমি অন্যদের জানিয়ে দাও যে ভরতের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটেছে। কেউ আর তার খোঁজ করবে না। ভরতকে খুন করার অতি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা হলেও এক চমকপ্রদ উপায়ে সে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে। সে বেঁচে আছে।

রাধাকিশোর বললেন, অ্যাঁ! সে বেঁচে আছে?

শশিভূষণ বললেন, হ্যাঁ, সেই অবস্থা থেকে বেঁচে সে কলকাতায় চলে এসেছিল। এখানে লেখাপড়া শিখে কৃতবিদ্য হয়েছে। সুতরাং মহারাজ, তার হত্যার অপরাধের বোঝা তোমাকে বহন করতে হবে না।

রাধাকিশোর উদ্ভাসিত মুখে বললেন, ভরত তবে বেঁচে আছে। সে আমার ভাই। তাঁকে আমি ত্রিপুরা ফিরিয়ে নিয়ে যাব। উচ্চ পদ দেব। সে কোথায় আছে বলুন, আমি এখনি তার কাছে যেতে চাই।

দু'দিকে মাথা নেড়ে শশিভূষণ ধীরভাবে বললেন, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও সে যেত কি না তাতে সন্দেহ আছে। সে যাই হোক, সে কোথায় আছে আমি জানি না। কোনও কারণে আমার ওপর তার প্রবল অভিমান হয়েছে। হয়তো এ জীবনে আর সে কখনও আমার সঙ্গে দেখা করবে না।

৪৯

সারাদিন ধরে একটা গানের কলি মনের মধ্যে ঘুরছে। এক-এক দিন হয় এ রকম। কোথা থেকে চলে আসে একটা গান, তারপর ভোমরার মতন ঘুরতেই থাকে, অন্য কোনও গানকেও আর কাছে আসতে দেয় না। সংসারের শত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও সেই গান ঠিক খুঁটি ধরে বসে থাকে, স্নানের সময় জলের ধারাপাতেও শোনা যায় সেই সুর, এমনকী রান্নাঘরের ছ্যাঁকছোঁকানি শব্দের মধ্যেও সেই গান গুঞ্জরিত হয়।

নয়নমণি গানটি শুনেছিল তিন দিন আগে। যাদুগোপালের বাড়িতে ওদের দশম বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তাকে যেতে হয়েছিল। নয়নমণি থিয়েটারের নটী, তার মতন মেয়েদের কোনও সামাজিক জীবন থাকতে নেই। সমাজের সব স্তরের মানুষ থিয়েটার দেখতে আসে, নট-নটীদের অভিনয়-ছলাকলা দেখে মুগ্ধ হয়, হাততালি দেয়, কিন্তু কেউ তাদের বাড়িতে ডাকে না। বিলাসী ধনীরা সুন্দরী নটীদের রক্ষিতা রাখতে চায়, উৎসবে-অনুষ্ঠানে কোনও নৃত্যগীত পটিয়সীকে মুজরো দিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশনে আর পাঁচজনের মতন নিমন্ত্রণ করে পঙ্‌ক্তিভোজে কিছুতেই বসাবে না। নয়নমণি সেই যে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, মঞ্চের বাইরে আর কোথাও সে কারুকে নাচ দেখাবে না, গানও শোনাবে না, সে প্রতিজ্ঞা এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তাকে মুজরো দেবার কথা বলতেও কেউ সাহস করে না।

কিন্তু যাদুগোপালের পরিবারের সঙ্গে তার প্রায় আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়ে গেছে। সেখানে তাকে মাঝে মাঝে যেতেই হয়। ওরা সমাজের অনেক রীতিনীতিরই তোয়াক্কা করে না, নয়নমণিকে ওরা নাচ-গানের জন্যও ডাকে না, অন্যান্য আমন্ত্রিতদের মতনই এক টেবিলে খানা খেতে বসায়, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় সুনেত্রা নয়নমণির হাত ধরে বলে, আমরা বকুল ফুল পাতিয়েছি।

বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন ছাড়াও আরও নানারকম অনুষ্ঠান হয় যাদুগোপালদের বাড়িতে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্মদিন পালন করে, স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবার্ষিকীর দিনটিতে আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে সবাই মিলে গান-বাজনায় মেতে ওঠে, অনেক খাওয়া-দাওয়া হয়। এই সব অনুষ্ঠানের কথা নয়নমণি আগে কখনও শোনেইনি।

দোতলার বড় হল ঘরটিতে কার্পেট পাতা হয়েছিল সেদিন। যাদুগোপাল আদালতে যায়নি, মক্কেলদেরও বাড়িতে আসতে মানা করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য দিন যাদুগোপালকে সাহেবি পোশাক ছাড়া দেখাই যায় না, সেদিন পরেছিল কোঁচানো ধুতি আর সিল্কের কুর্তা, হাতে জড়ানো গোড়ের মালা। জনা চল্লিশেক অতিথি, তাদের সাজ-পোশাক দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বোঝাই যায় যে, তারা সমাজের ওপর মহলের মানুষ। নয়নমণি গিয়েছিল একটা গরদের শাড়ি পরে, মঞ্চের বাইরে সে শরীরে কোনও অলঙ্কার ধারণ করে না।

সবাই সে কার্পেটের ওপর বসেছিল গোল হয়ে, তারপর দু'ঘণ্টা ধরে চলেছিল গান ও কাব্যপাঠ। বড় ভাল লেগেছিল নয়নমণির, যেন সর্ব অঙ্গ দিয়ে সে সেই ভাল-লাগা অনুভব করেছিল। সে যে একজন থিয়েটারের অভিনেত্রী তা নিশ্চয়ই চিনেছিল অনেকে, কিন্তু কেউ কোনও ভাবান্তর দেখায়নি, সহজ সুরে কথা বলেছে তার সঙ্গে। গান-কবিতার ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গ-রসিকতাও করছিল কেউ কেউ, কিন্তু সবই উঁচু তারে বাঁধা, স্থূল রুচির কোনও চিহ্ন ছিল না। যাদুগোপালের অনুরোধে নয়নমণিও গান গেয়েছিল, থিয়েটারের গান নয়, তার পূর্ব জীবনে শেখা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ, সবাই

খুব তারিফ করেছিল।

সেই আসরে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরীর দুটি গান সবচেয়ে ভাল লেগেছিল নয়নমণির। কিশোরীটির যেমন অপরূপ মুখের লাবণ্য, তেমনই তার বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বর। যে-কোনও গান একবার শুনলেই তুলে নিতে পারে নয়নমণি। এই গানটির সুর তেমন কঠিন কিছুও নয়, অনেকটা কীর্তনাঙ্গের।

> নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে
> হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে⋯

এই গানটি বেশ বড়, পরের কথাগুলি নয়নমণির মনে নেই। দ্বিতীয় গানটি ছোট, অনবদ্য, যেন একটি হিরের টুকরো। এরকম গান জীবনে শোনেনি নয়নমণি। খেয়াল-ঠুংরির মতন নয়, তাল নেই, অন্তরা নেই, মাত্র চারটি পঙ্‌ক্তি, যেন কারুর হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি মিশে আছে সুরের ঝরনাধারায় :

> বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে
> বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে।
> সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে,
> অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে।

শুনতে শুনতে চোখ বুজে গিয়েছিল নয়নমণির, সে একটু একটু দুলছিল। তার মনে হচ্ছিল, এরকম একটি গানের তুলনায় আর সব কিছু তুচ্ছ। কেউ যদি বলে, তোমার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি, টাকা পয়সা সব কিছু দিতে পারো এই গানের বিনিময়ে, সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবে।

এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল গানটি। আর নেই? সে সহজভাবে চেয়ে রইল কিশোরীটির দিকে। কিশোরীটি তানপুরা সরিয়ে রাখল, আর গাইবে না। নয়নমণি তার পাশে বসা সুনেত্রাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, এই গান কে রচেছেন?

সুনেত্রা বলল, প্রথমটা তো জানি, দ্বিতীয়টা আমি আগে শুনিনি। কী জানি, জ্যোতিকাকার নাকি। ওটা কার রে মণি?

কিশোরীটি বলল দুটোই রবিকাকার।

সুনেত্রা বলল, আমাদের রবিকাকা কে জানো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাম করা কবি। নিজেদের কাকা বলে বলছি না, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও ওঁর প্রশংসা করেছেন। তুমি হয়তো ওঁর নাম শোনোনি, তোমাদের থিয়েটারে কিন্তু ওঁর একখানা নাটক চলেছিল কিছু দিন।

নয়নমণির মুখমণ্ডলে এক ঝলক রক্ত এসে গেল। রবীন্দ্রবাবুকে কি তাকে চেনাতে হবে? সে এর মধ্যে ওঁর সব বই পড়ে ফেলেছে, ওঁর নাম শোনা মাত্র চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সেই দেবদুর্লভ কান্তি। তিনি যে নয়নমণির আরাধ্য দেবতা। নয়নমণি এর মধ্যে নিজের নাম না দিয়ে কত চিঠি লিখেছে তাঁকে।

নয়নমণি মুখ নিচু করে রইল একটুক্ষণ! তার মনের মধ্যে এখন কী যে চলছে, কী প্রণয়ানুভূতির আলোড়ন, তা কেউ বুঝে ফেলবে না তো!

একটু পরে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ওঁর গান কে শেখান?

সুনেত্রা বলল, উনি নিজেই শেখান। একটা গান লিখে, সুর বসিয়ে রবিকাকা কাছাকাছি যাকে পান তাকে শিখিয়ে দেন। প্রতিভাদিদি, সরলাদিদি, ইন্দিরাদিদি এঁরা অনেক গান সঞ্চয় করে রেখেছেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেককেও রবিকাকা নিজের গান শিখিয়েছেন। তার বাইরে আর তো বিশেষ কেউ ওঁর গান জানে না। রবিকাকার গানের মজা কী জানো, উনি পত্র-পত্রিকায় গানগুলোকে কবিতা হিসেবে ছাপিয়ে দেন, সেগুলোর যে সুর আছে তা পাঠকরা বুঝতে পারে না। আমরা জানি, নিজেদের মধ্যে আনন্দ করে গাই।

নয়নমণি বলল, যারা এই গান শোনে না, তারা যে কত বঞ্চিত হয়ে রইল!

সুনেত্রা একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল নয়নমণির দিকে। তারপর ভেতর থেকে কেউ

ডাকাডাকি করতে সে উঠে গেল, আর কথা হল না।

এর পর দু' দিন দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত টানা রিহার্সাল ছিল বলে ওই গানের কথা নয়নমণির আর মনে আসেনি। আজ সকাল থেকে প্রথম গানটি তাকে পেয়ে বসেছে। 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে'— নয়ন মানে কার নয়ন ? নয়নমণির নয়ন, তাঁর দেখা না পেলেও তিনি যে রয়ে গেছেন নয়নমণিরই নয়নে নয়নে ! তিনি নয়নমণির হৃদয়ে এত গোপনে রয়েছেন যে তিনি নিজেও তা জানেন না।

গানের বাকি কথাগুলি মনে নেই। দুটি পঙক্তিই ঘুরে ঘুরে আসছে।

পরের গানটা মনে পড়ছে না কেন ? 'বঁধু, তোমায় করব রাজা—', তারপর, তার পর, যে গানটি সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছিল, সেটাই মনে নেই ! মনের এ কী বিচিত্র স্বভাব ? সুরটা অস্পষ্ট মনে আসছে, অথচ বাণী হারিয়ে গেছে, বিস্মৃতির গহন থেকে সেই বাণীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে নয়নমণি।

আজও রিহার্সালে যাবার কথা, একটু পরে গাড়ি আসবে, কিন্তু নয়নমণির একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। ওই গানের জন্য নয়নমণি থিয়েটার ছেড়ে দিতেও পারে।

ব্রাহ্মরা রবিবাবুর গান জানে। নয়নমণি সে রকম ব্রাহ্ম পাবে কোথায়, থিয়েটারের সংস্রবে ব্রাহ্মরা আসে না। অজানা-অচেনা কোনও পুরুষের কাছে গান শিখতেও যাবে না নয়নমণি। স্বয়ং রবিবাবুর কাছাকাছি সে কোনও দিনই যেতে পারবে না। যাদুগোপালের বাড়িতে মণি নামে যে কিশোরীটি গান শোনাল, তার কাছে শেখা যায় না ? হোক না সে অল্পবয়সী, তবু তার কাছ থেকে গান তুলে নিতে নয়নমণির কোনও লজ্জা নেই। সেদিন ওই গান দুটি শোনার পর অন্য সব গান নয়নমণির কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে।

যাদুগোপালের বাড়িতে নয়নমণি নিজে থেকে কখনও যায় না। উৎসব-অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুনেত্রা লোক পাঠায়। না, হুট করে অযাচিতভাবে যাওয়া চলে না। যাদুগোপাল ব্যস্ত মানুষ, তিনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন। যাদুগোপাল অবশ্য সব সময়ই নয়নমণির সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করেন, বরং তাঁর ব্যবহারে নয়নমণিই মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করে। নয়নমণিকে দেখলেই কোনও না কোনও প্রসঙ্গে ভরতের নাম উচ্চারণ করেন যাদুগোপাল, যেন নয়নমণি তাঁর চোখে এখনও ভূমিসুতা, এবং তাঁর বন্ধুর পত্নী। ছি ছি ছি। ভরত যে ভূমিসুতাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছে, তা কেউ জানে না। সে কথা কি কারুকে জানানো যায় ! সেই গ্লানির বোঝা নিয়ে ভূমিসুতা বাঁচত কী করে ! তাই ভূমিসুতাকে মুছে ফেলে সে এখন নয়নমণি হয়েছে। এখন ভরত তার কেউ না !

মণি নামের ওই কিশোরীটি কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই থাকে ? সেখানে কি নয়নমণির মতন এক থিয়েটারের নটীর প্রবেশ অধিকার আছে ? হায় রে দুরাশা ! সবাই জানে, থিয়েটারের নটী মানেই কলঙ্কিনী। নামের সঙ্গেই উল্কি দাগা আছে। এ জীবনে নয়নমণির আর সেই কলঙ্ক ঘুচবে না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দেউড়ি সে পার হতে পারবে না কখনও।

সারা শরীর ভরে সে অনুভব করতে লাগল সেই গানের তৃষ্ণা।

শরীর খারাপ বলে সে রিহার্সালে যাবে না জানিয়ে গাড়ি ফিরিয়ে দিল, সেই গাড়িতে আবার স্বয়ং নেপা বোস এল তাকে নিতে। লাল-নীল-হলুদ রং মেশানো সঙের মতন পোশাক পরা নেপা বোস হাত-পা নেড়ে বলল, তুই কি পাগল হয়েছিস নয়ন ? আর তিনদিন বাদে নতুন প্লে নামবে। তুই মহড়ায় যাবিনি ? সবাই হাঁ করে বসে আছে। কীসের শরীর খারাপ তোর ? গিরিশবাবু কতবার এক গা জ্বর নিয়ে স্টেজে নেমেছেন। 'কুসুমকুমারীর সেই যে পা মচকে গেল মনে নেই ? ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পার্ট করতে পারবে না বলে কেঁদে ফেলেছিল। কেলোবাবু তবু কি তাকে ছেড়েছিল ? ডায়ালগের মধ্যে তার পা মচকাবার কথা জুড়ে দিল, ব্যাস, বেশ রিয়েলিস্টিক হয়ে গেল ! তোর এমন কী হয়েছে ? থিয়েটার থেকে ছুটি নেবার দুটোই মাত্র উপায়, যখন দর্শক ছ্যা ছ্যা করবে, আর যখন যমদূত এসে ডেকে নেবে। চ, শিগগির তৈরি হয়ে নে !

অগত্যা যেতেই হল নয়নমণিকে ! মহড়ায় একবার জুড়ে গেলে মন খারাপের অবকাশ থাকে না। ক্লাসিকে এখন চলছে 'দেলদার' নাটক, শীঘ্র শুরু হবে বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অবলম্বনে 'ভ্রমর'। নাট্যরূপ দিয়েছে অমর দত্ত নিজে। দত্ত বাড়ির এই বয়াটে ছেলেটির যে এত গুণ তা কে জানত ! ভাল অভিনয় করে, জোরালো কণ্ঠস্বর, চেহারা সুন্দর, এসব ছাড়া সে নাটকও লিখতে পারে ! 'ভ্রমর' নাটকে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হবে, ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে আসবে অমরেন্দ্রনাথ, বারুণী দিঘিতে নিমজ্জমানা রোহিণীকে সে উদ্ধার করবে !

অমর দত্তর সঙ্গে নয়নমণির বেশ একটা খেলা চলছে। অভিনেতা ও থিয়েটারের ম্যানেজার হিসেবে অমরেন্দ্রনাথ মহড়ার সময় কিংবা মঞ্চে সংযত থাকে। কিন্তু ছুটির দিনে তার উচ্ছৃঙ্খলতা সব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। যেন একই মানুষের দুটি সম্পূর্ণ আলাদা রূপ। মানিকতলার বাগানবাড়িতে নেশায় উন্মত্ত হয়ে, চক্ষু লাল করে বিকৃত কণ্ঠে সে যখন রাশি রাশি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে, তখন বিশ্বাসই করা যায় না যে, এই মানুষটিই আদর্শ নায়ক রূপে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার দর্শকের চিত্ত জয় করতে পারে। অমরেন্দ্রনাথ নিজেই বলে যে মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল না হয়ে গেলে তার মাথায় সৃষ্টি ক্ষমতা ঠিক বিকশিত হয় না।

যে-সব দিন থিয়েটার বন্ধ থাকে, সে সব দিনে এক একটি অভিনেত্রীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলাও তার শখ। অনেক মেয়েই তাতে স্বেচ্ছায় রাজি হয়, যাদের তেমন ইচ্ছে থাকে না তারাও অমরেন্দ্রনাথের দাপটের ভয়ে রাজি হয়ে যায়। একমাত্র নয়নমণিকেই সে আজও বাগে আনতে পারেনি, এই পরাজয়টাও সে মেনে নিতে পারছে না। নয়নমণি জানিয়ে দিয়েছে, সে আর কোনও দিনই মানিকতলার বাগানবাড়িতে মহড়া দিতে যাবে না। নয়নমণিকে জব্দ করার কোনও উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না অমরেন্দ্রনাথ। এ মেয়েকে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দেখিয়েও কোনও লাভ নেই। যে-কোনও দিন সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে রাজি। টাকা-পয়সার লোভ দেখালে সে ঠোঁট বাঁকায়, স্বর্ণালঙ্কার দিতে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কী চায় এই মেয়ে, কীসে সে আকৃষ্ট হবে, তা বোঝা যায় না কিছুতেই।

জোর-জুলুম করার বদলে কাকুতি-মিনতিও করেছে অমরেন্দ্রনাথ, তাতেও কোনও ফল হয়নি। সে বলেছিল, নয়ন, মা কালীর দিব্যি করে বলছি, তোর গায়ে আমি হাতও ছোঁয়াব না। তুই শুধু আমাকে এক সন্ধেবেলা একা একা নাচ দেখাবি, ব্যস, আর কিছু না।

নয়নমণি বলেছিল, অর্থাৎ তুমি সবাইকে জানাতে চাও, আমিও অন্যদের মতন একা একা তোমার বাগানবাড়িতে গেছি, তাই না ? নইলে, আমার নাচ তো স্টেজেই তুমি কতবার দেখেছ !

অমরেন্দ্রনাথ বলেছিল, স্টেজের নাচ আর একা একা নাচ কখনও এক হয় ? আমি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ব্র্যান্ডি পান করব, আর তুই একা আমার জন্য শুধু নাচবি, দেখতে দেখতে আমার চক্ষে ঘোর লাগবে, তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাব, আহা, সেই বেশ মজা হবে।

নয়নমণি বলেছিল, কেন এই কথা বার বার বলো ? অন্যরা তোমায় নাচ দেখায়, তাতে তোমার সাধ মেটে না ? আমি তো বলেইছি, আমার শপথ আছে, আমি কখনও বাইজিদের মতন নাচ-গান করব না। আমি নাচ দেখাতে পারি শুধু আমার প্রাণের ঠাকুরকে আর আমার মনের মানুষকে। আমার ঘরে কেষ্টঠাকুরের একটা মূর্তি আছে, সেই মূর্তির সামনে আমি রোজ নাচি।

অমরেন্দ্রনাথ বলেছিল, তা নাচিস, বেশ করিস ! আমি সব খবর রাখি, তোর মনের মানুষ তো কেউ নেই। তোর ঘরে কেউ যায় না। আমি তোর মনের মানুষ হতে পারি না ?

নয়নমণি হেসে ফেলে বলেছিল, ঘরে এলেই বুঝি মনের মানুষ হয় ? কী বুদ্ধি ! তুমি আমার থেকে বয়েসে ছোট, তুমি কী করে আমার মনের মানুষ হবে ?

অমরেন্দ্রনাথ চটে উঠে বলেছিল, খবরদার, আমার বয়েসের কথা কখনও তুলবি না। বয়েসে কী আসে যায় ! আমি সবাইকে বলি, আকবর বাদশা আমার চেয়েও ছোট বয়েসে এত বড় হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হয়েছিল। আকবর বাদশার হারেমে কত বয়সের কত মেয়েমানুষ ছিল।

নয়নমণি বলেছিল, তুমিও হারেম বানাও না, অনেককে পেয়ে যাবে। আমি সামান্য স্ত্রীলোক,

আমাকে বাদ দাও !

অমরেন্দ্রনাথ বলেছিল, তুই বুঝি কুসুম-টুসুমদের বলে বেড়াস, যে তুই মানিকতলায় কখনও যাস না ? তোর বড় গুমোর !

নয়নমণি বলেছিল, বুঝেছি, ওইখানেই তোমার আঁতে ঘা লাগে। তোমার থিয়েটারের একজন মাত্র মেয়ে তোমাকে ভয় পায় না। তোমার খেয়াল মেটাতে রাজি হয় না। এটাই তুমি সহ্য করতে পারো না ! না, আমি কারুকে কিছু বলে বেড়াই না। তবে না বললেও তো অনেকে অনেক কিছু জেনে যায়। অমরবাবু, তুমি বরং এক কাজ করো। আমি ইচ্ছে করলে কাল থেকেই তোমার থিয়েটার ছেড়ে দিতে পারি। তুমি সবার সামনে তর্জন-গর্জন করে আমাকে ছাড়িয়ে দাও, লোকে ভাববে আমি ইচ্ছে করে যাইনি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাতে তোমার মান বাড়বে।

অমরেন্দ্রনাথ বলেছিল, খবরদার, ও কথা একবারও উচ্চারণ করবি না। ক্লাসিক এখন জমজমাট। এখন কেউ ছেড়ে যাবে না। তোর পার্টে দর্শকদের ঘন ঘন ক্ল্যাপ পড়ে। আমার থিয়েটারের কোনও ক্ষতি আমি সহ্য করব না। আচ্ছা নয়ন, তুই বয়সের কথা তুললি। এই থিয়েটারে সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়, তা হলে তো সবাইকেই আমার আপনি-আজ্ঞে করে চলতে হয়। শিল্পীদের কোনও বয়স নেই, জাত নেই। তুই আর আমি নায়ক-নায়িকা সাজি না ? তখন কে বয়েসের কথা ভাবে ?

নয়নমণি বলেছিল, তখন আমরা মুখে রং মাখি, কত রকম বেশ বদলাই। কখনও রাজা-রানি সাজি, কখনও চাকর-চাকরানি, তখন তো আমরা নকল মানুষ। অমরবাবু, একটা কথা বলব ? যখন প্রথম ক্লাসিকে যোগ দিই, তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগত। তুমি অন্যদের মত ন নও। আমি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হবে। তখনও আমি তোমার মানিকতলার বাগানবাড়ির কথা জানতাম না। এখন বুঝেছি, পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না।

অমরেন্দ্রনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, কোনও মেয়েমানুষের মুখে আমি এরকম অদ্ভুত কথা শুনিনি। বন্ধুত্ব আবার কী ! পুরুষে পুরুষেই বা বন্ধুত্ব হয় কোথায় ? সামনা সামনি একরকম, পেছন ফিরলেই আর এক মূর্তি। ওসব ছেঁদো কথা বাদ দে। হ্যাঁ রে নয়ন, তুই একদিন বলেছিলি, কেউ তোর ওপর জোর করতে গেলে তুই তাকে খুন করবি। তুই অবলা মেয়েমানুষ, তুই কী করে পুরুষদের সঙ্গে পারবি ? গায়ের জোর আর টাকার জোরে পুরুষমানুষরা সব কিছু পেতে পারে। মেয়েমানুষ তো কোন ছার ! যদি সত্যি সত্যি আমি তোর ওপর একদিন জোর করি ?

নয়নমণি বলেছিল, গায়ের জোরে আর টাকার জোরে সব কিছু পাওয়া যায় ? কী জানি। আমাকে অবলা ভেবো না, আমার কাছে সব সময় একটা ছুরি লুকোনো থাকে, তার ডগায় বিষ মাখানো, গোখরো সাপের বিষ। কেউ আমার ওপর জবরদস্তি করতে এলে তার বুকে আমি সেই ছুরি বসিয়ে দেব। তারপর ফাটকে যাবার আগে আত্মঘাতিনী হব।

অমরেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলেছিল, সত্যি সত্যি, কই দেখা তো ছুরিটা একবার !

নয়নমণি বলেছিল, না, না, দেখতে চেয়ো না। পাঞ্জাবের শিখ বীরপুরুষদের কথা জানো ? তাদেরও সঙ্গে সব সময় কৃপাণ থাকে। খাপ থেকে একবার সেই কৃপাণ বার করলে রক্ত দর্শন না করে আর কোষবদ্ধ হয় না। আমারও সেইরকম।

অমরেন্দ্রনাথ বলেছিল, বাপ রে, তোর কি মত্র দেশে জন্ম নাকি রে ?

এই সব কথা একদিনে হয়নি। মাঝে মাঝেই অমরেন্দ্রনাথের ঝোঁক চাপে, নয়নমণিকে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে নিজের আর্জি জানায়। মহড়া দেবার সময়ও সে হঠাৎ নয়নমণির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কিন্তু তার অন্তর্দৃষ্টি নেই, এই রমণীর মানসলোকে সে প্রবেশ করতে পারে না।

সখীদের সঙ্গে একটা নাচের দৃশ্য মহড়া দিচ্ছে নয়নমণি, এক সময় নেপা বোস ধমক দিয়ে বলল, আজ তোর কী হয়েছে রে, নয়ন ? সব সময় মাটির দিকে চোখ, মুখখানা দেখাই যাচ্ছে না। একে নাচ বলে !

নয়নমণি লজ্জা পেয়ে গেল। সত্যি সে আজ বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। নাচের সঙ্গে গান হচ্ছে একরকম, আর সে মনে মনে গাইছে, 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে...'।

কুসুমকুমারী ঠেস দিয়ে বলল, তা কী হবে বাপু ! শরীল খারাপ হলে তো তোমরা রেহাই দেবে না। নয়নের বোধহয় মাথা ধরেছে। হ্যাঁ লা নয়ন, কে তোর মাথা ধরল ! আমাদের তো কেউ মাথা ধরে, গাল টেপে, হাত ধরে টানে, তোর তো সে রকম কেউ নেই বলেই জানি !

সখীরা খিলখিল করে হেসে উঠল। কুসুমকুমারী আবার বলল, ওই ন্যাপাদাদা, এবার ক্ষ্যামা দাও। নয়ন স্টেজে মেরে দেবে। ওর মহড়া লাগে না।

নয়নমণি নৃত্য শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বলল, নাও, আবার শুরু করো।

অমরেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে বলল, সখীরা এখন বসুক। আগে শুধু নয়নের নাচটা তুলে দাও। ও একলা নাচুক।

নয়নমণি অমরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর পায়ের ঘুঙুর ঝমঝমিয়ে এগিয়ে গেল মঞ্চের একেবারে সামনে। প্রেক্ষাগৃহ আধো অন্ধকার, দর্শকদের সব আসনগুলি শূন্য। তবু সেদিকে তাকিয়ে সে দু'হাত জোড় করে প্রণাম জানাল। কল্পনায় সব আসনগুলি সে পূর্ণ দেখতে পেল, এবং একেবারে শেষে দেয়াল ঘেঁষে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি। নাচ শুরু করল নয়নমণি। প্রথম থেকেই বিদ্যুৎ গতির নাচ, যেন তার শরীরটা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে, মঞ্চে যেন একটা ঘূর্ণি ঝড় বইছে, আর সবাই স্তম্ভিত, স্তব্ধ হয়ে রইল।

শেষ হবার পর নেপা বোস বলল, এ কী নাচ নাচলি রে নয়ন ! তোর মতন আর কেউ পারবে না। এত দ্রুত লয়, সখীরা পা মেলাতে হিমসিম খেয়ে যাবে।

নয়নমণি বসে পড়ে বলল, আজ আর থাক।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, দশ মিনিটের বিরতি। তারপর অন্য সিন হবে।

একটি বাচ্চা ছেলে এসে মাটির খুরিতে চা দিয়ে গেল। গল্প-গুজব শুরু করে দিল অনেকে, কেউ বা গা এলিয়ে দিল মেঝেতে। অমরেন্দ্রনাথ একটা কৌটো থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে বলল, আমি আর একটা নতুন নাটকের কথা ভেবেছি। কাল রাত্তেই আইডিয়াটা এসেছে মাথায়, তাতে একটা ডাকাতের দল থাকবে। একটা-দুটো দৃশ্যে সেই ডাকাতরাও লাঠি-তরোয়াল নিয়ে নাচবে। আমি যতগুলো প্লে দেখেছি, সবগুলোতেই মেয়েদের নাচ থাকে। কেন, ছেলেরা কি নাচতে জানে না ? আজকাল তো কিছু কিছু মেয়েমানুষও নাটক দেখতে আসছে, তারা পুরুষদের নাচ দেখলে খুশি হবে।

নেপা বোস বলল, দারুণ আইডিয়া। কোনও সমস্যা নেই। আমি কটা ব্যাটাছেলেকেও নাচ শিখিয়ে দেব। ক'জন চাই ?

অমরেন্দ্রনাথ বলল, ডাকাতের দল, মালকোচা মারা ধুতি পরে থাকবে, খালি গা, তেল চকচকে বুক, কিন্তু সে রকম বুক আর হাতের গুলি থাকা চাই। আমাদের এখানে যারা পার্ট করে, হয় রোগা হাড় ডিগডিগে, নয় তো ভুঁড়িওয়ালা। ডাকাতের চেহারা পাব কোথায় ? আর এরা কি লাঠি খেলা শিখতে পারবে ?

ধর্মদাস সুর বলল, বঙ্কিমবাবু লিখে গেছেন না, হায় লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে। বাঙালি লাঠি খেলা ভুলে গেছে কবে। এখন শেখাবারও লোক পাওয়া দুষ্কর। গ্রামে-ট্রামে হয়তো হাঁড়ি-বাগদিরা কিছুটা জানে।

অমরেন্দ্রনাথ বলল গ্রামে-গঞ্জে তো এখনও ডাকাতি হয়। তারা লাঠি-তরোয়াল নিয়েই তো আসে। জমিদারদেরও পাইক-লেঠেল থাকে। খোঁজ নাও না, কোনও গ্রাম থেকে যদি গোটা দশেক ওই রকম তাগড়া-জোয়ান আনা যায়।

ধর্মদাস বলল, গ্রামের লোক এনে তুমি থিয়েটারে নামাবে ? তারা কোনও দিন বিজ্‌লি বাতি দেখেনি, মঞ্চে উঠে ভিরমি খাবে !

নেপা বোস বলল, আর এক জায়গাতে চেষ্টা করা যেতে পারে। কলকাতাতেই একটা আখড়া

আছে শুনেছি।

এই সময় প্রচার সচিব প্রমথ দাস এসে বলল, কেলোবাবু, কাল থেকেই তো হ্যান্ডবিল ছাড়তে হবে। বিজ্ঞাপনের বয়ানটা ঠিক মতন সাজানো হয়েছে কি না, একবার দেখে দেবেন?

অমরেন্দ্রনাথ হ্যান্ড বিলের প্রুফটা নিয়ে একবার চোখ বুলোলো। খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বলল, বাঃ, বেশ হয়েছে, শুধু শেষ লাইনটা বড় টাইপ দিয়ে দাও। তোমরা শুনবে কী লিখেছি? ইংরিজি-ফিংরিজি নয়, বাংলা।

দু'তিনজন বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ে শোনান।

অমরেন্দ্রনাথ উচ্চস্বরে পড়ল:

হই হই রই রই ব্যাপার!
নাট্যজগৎ স্তম্ভিত!
নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে মানবজীবন দোদুল্যমান!
সারি সারি সখীর সারি!
নাচে গানে ধুল পরিমাণ!
ষোড়শী রূপসীর যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ!!

সখীরা ষোড়শী, ষোড়শী বলে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল। প্রমথ তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে বলল, ওরকম দিতে হয়। আগে গিরিশবাবুদের নাটকে ইংরিজি বিজ্ঞাপন দিয়ে বিদ্যে ফলাতেন। কেন রে বাপু, বাংলা নাটক, বাঙালিরা দেখবে, তার বিজ্ঞাপন ইংরিজি হবে কেন?

অমরেন্দ্রনাথ বলল, সাহেবদের কাছে জাতে ওঠার চেষ্টা। ইংরিজি কাগজে ক্লাসিকের কী সমালোচনা বেরুল না বেরুল তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি বিজ্ঞাপনের জোরে দর্শক টেনে আনব।

প্রমথকে বিদায় দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ নেপা বোসকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, তুমি কী বলছিলে? কলকাতায় লাঠি খেলার আখড়া আছে?

নেপা বোস বলল, আছে। সরলা ঘোষালের আখড়া। ভদ্রঘরের ছেলেরা সেখানে লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা শেখে। শরীর চর্চা করে।

অমরেন্দ্রনাথ ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, মেয়েছেলে আখড়া খুলেছে? বাপের জন্মে এমন কথা শুনিনি। সরলা ঘোষাল কে? বয়েস কত?

নেপা বোস বলল, বাঃ, সরলা ঘোষালের নাম শোনেননি? দেবেন ঠাকুরের নাতনি, ওর বাপের নাম জানকীনাথ ঘোষাল, কংগ্রেসের বড় লিডার। সরলার বয়স এই আমাদের নয়নমণির মতনই হবে, এখনও বিবাহ করেননি।

অমরেন্দ্রনাথের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে আবার বলল, বলিস কী রে! অত উঁচু ঘরের মেয়ে, এত বয়স পর্যন্তও বিয়ে শাদি করেনি! এমন হয় নাকি? সেই সরলা ঘোষাল হঠাৎ লাঠি খেলার আখড়া খুলতে গেল কেন খামোকা? অমন মানী বংশ, ওর বাপ-মা অ্যালাও করল কী করে?

নেপা বোস বলল, ও মেয়ে কারুর কথা শোনে না। তবে ওটা সাধারণ আখড়া নয়। সরলা ঘোষাল বিয়ে না করে দেশোদ্ধারের ব্রত নিয়েছে। এ দেশের মানুষ অস্ত্র ধরতে ভুলে গেছে। তাই উনি চান, ছেলে ছোকরারা বাজে আড্ডা-মস্করায় সময় নষ্ট না করে শরীর গঠন করুক। লাঠি-তরোয়াল চালাতে শিখুক। দেশের জন্য প্রাণ দিতে তৈরি হোক। সরলা ঘোষালের মধ্যে জাদু আছে, তার কথায় দলে দলে ছেলে ওঠে বসে।

অমরেন্দ্রনাথ এবার সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, এমন মেয়েও আমাদের দেশে জন্মায়? টাকা পয়সার অভাব নেই, বিলাসব্যসনের অসুবিধে নেই, তবু দেশের কথা ভাবে? আখড়া চালাবার খরচা কে দেয়?

নেপা বোস বলল, উনিই দেন। মাঝে মাঝে উৎসব করেন। ওই আখড়া থেকে গোটা কতক

ছেলেকে আনা যেতে পারে। বেশি শেখাতে হবে না। শহরের ছেলে, স্টেজে উঠে ঘাবড়াবে না।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, শুনে ওনার ওপর ভক্তি হচ্ছে রে। মেয়েমানুষ হয়েও পুরুষের ওপর টেক্কা দিলে দেখছি। কিন্তু উনি কি রাজি হবেন, দেশের কাজের জন্য যারা তৈরি হচ্ছে, তারা থিয়েটারে নামতে চাইবে কেন?

নেপা বলল, বাঃ, থিয়েটারও কি দেশের কাজ নয়? আমাদের থিয়েটারে নাচ গান থাকে বটে, দেশের গৌরবের কথাও কি ফুটে ওঠে না? ওনার সঙ্গে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, উনি কি দেখা করেন সকলের সঙ্গে? বনেদি বাড়ির মেয়ে, এখনও কুমারী, ব্রাহ্ম না হয়ে হিন্দু হলে সমাজ থেকে কবে পতিত করত ওঁর বাপ-মাকে।

নেপা বোস বলল, আমি যতদূর শুনেছি, ঘোষালদের বাড়ি অবারিত দ্বার। কত উটকো লোক পকেটে এক তাড়া পদ্য গুঁজে সরলা ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে যায়। উনি যে একটা পত্রিকাও চালান।

নয়নমণি প্রথম দিকটায় নিরাসক্তভাবে দূরে বসেছিল। সরলা ঘোষাল সম্পর্কে আলোচনা শুনে আকৃষ্ট হয়ে কাছে চলে এল। সুনেত্রার কাছে সে বেশ কয়েকবার তার সরলাদিদির কথা শুনেছে। সেই সরলা কি এই সরলা ঘোষাল? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি যখন, তখন নিশ্চিত সেই। কিন্তু সুনেত্রার সরলাদিদি তো গায়িকা, রবীন্দ্রবাবুর অনেক গান জানেন, তিনিই আবার বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানীর মতন একদল লাঠিয়ালের নেত্রী? ঠিক যেন মেলানো যায় না। ভদ্রঘরের মেয়েরা অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথাই বলে না, আর ইনি যে-কোনও অচেনা লোকের সঙ্গেও দেখা করেন।

বাড়ি ফেরার পথে নয়নমণি আবার গুনগুন করতে লাগল, নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে— । পরের গানটা কী? বঁধু, তোমায় করব রাজা— তারপর? ছোট গান, সবটাই সে তুলে নিয়েছিল, তবু মনে পড়ছে না কিছুতেই। গানটা যেন হৃদয়ের অনেক গভীরে কোথাও বন্দিনী হয়ে আছে, কিছুতেই বেরুতে পারছে না। সরলা ঘোষালের কাছে অনুরোধ করলে তিনি গানটা শিখিয়ে দেবেন না? এ রকম আরও গান।

দু'দিন বাদে নয়নমণি নেপা বোসকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো, সেই যে লাঠিয়াল ছেলে জোগাড় করার জন্য তোমাদের যাওয়ার কথা ছিল সরলা ঘোষালের কাছে, গিয়েছিলে?

নেপা বোস বলল, দাঁড়া, এখুনি কী? সবে একটা নতুন প্লে নেমেছে, এটা জমুক আগে। কেলোবাবু যে-নাটকটার কথা বলেছিল, সেটা তো এখনও লেখাই হয়নি। চরিত্র কটা, কটা নাচ, আগে সেসব দেখে নিই।

নয়নমণির যেন গরজ বেশি। সে প্রায়ই নেপা বোসকে তাড়া দেয়। মাসখানেক বাদে সত্যি নেপা বোস ও প্রমথ গেল অমরেন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে। ফল হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সরলা ঘোষাল এই প্রস্তাবে তো রাজি হয়নি বটেই, উল্টে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করার কোনও অসুবিধে হয়নি ঠিকই, কিন্তু চিঠিটি পড়া মাত্র সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে। না, সে তার আখড়ার ছেলেদের কোনওক্রমেই থিয়েটারের সংস্পর্শে যেতে দিতে রাজি নয়। এখানকার যুবকরা শুধু লাঠি-তরোয়াল চালনা শিখছে না, তারা মহৎ আদর্শে দীক্ষিত। উচ্চ নৈতিকতা ছাড়া সে আদর্শ ধরে রাখা সম্ভব নয়। থিয়েটারের আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত। গিরিশবাবু-অর্দ্ধেন্দুশেখররা তবু নাটকে কিছুটা দেশাত্মবোধের কথা প্রচার করতেন, কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটার শুধু পয়সা রোজগারের জন্য নাটক জমাচ্ছে। নিম্নরুচির প্রশ্রয় দিচ্ছে। ক্লাসিকের একটা হ্যান্ডবিল হাতে এসেছে সরলার। ছি ছি ছি, পাবলিক থিয়েটার এত নীচে নেমে যাচ্ছে। দেশের মানুষের কাছে কদর্য, স্থূল রুচির আমোদ-প্রমোদ পরিবেশন করছে!

সরলা নিজের মুখে উচ্চারণ না করে হ্যান্ডবিলের শেষ লাইনটির ওপর আঙুল রেখেছিল। 'ষোড়শী রূপসীর যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ!' আরক্ত হয়ে গিয়েছিল তার মুখ, ক্রোধ ও দুঃখ মেশানো কণ্ঠে সে বলেছিল, নারীর শরীর প্রদর্শন করা যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের ছেলেরা কেউ ওই সব নাটক দেখতেও যাবে না।

এই বিবরণ শুনে বেশ দমে গেল নয়নমণি। পাবলিক থিয়েটারের ওপর সরলার এত বিতৃষ্ণা! তা হলে তার কাছে যাওয়া যাবে কী করে? শেখা হবে না ওই গান?

দোতলায় গঙ্গামণি পল্লীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখায়। সেই গানের সুর ওপরে উঠে আসে, নয়নমণির কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। 'ফুটলো কলি, জুটলো অলি, ছুটলো নতুন প্রেমের ধারা'—এই ধরনের গান তার আর একেবারেই শুনতে ভাল লাগে না। 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে—', এ গানের কাছে পুরনো সব গানই যেন নস্যাৎ হয়ে গেছে। এ গান কত সহজ, অথচ কত গভীর!

দু'দিন পর নয়নমণির মনে হল, সে থিয়েটারের অভিনেত্রী হতে পারে, তার বাইরেও তো সে একজন মানুষ। সেই পরিচয়ে কি সরলা ঘোষালের কাছে যাওয়া যায় না? সে তো থিয়েটারের জন্য ওই গান শিখতে চাইছে না, সে শিখতে চায় প্রাণের তাগিদে। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী। বড়জোর প্রত্যাখ্যান করবে, সে অপমান গায়ে মাখবে না নয়নমণি।

একটা ঠিকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে একদিন বিকেলবেলায় ঘোষালদের বাড়িতে চলে এল নয়নমণি। দেউড়ির সামনে জটলা করছে চার পাঁচজন যুবক। নয়ন একটা নীল পাড় সাদা শাড়ি পরে এসেছে, মাথা অর্ধেক ঘোমটায় ঢাকা। গাড়ি থেকে সে নামতেই যুবকেরা তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল, ফিসফিস করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। সরলা ঘোষাল যা-ই বলুক, তার আখড়ার যুবকরা অনেকেই নিয়মিত থিয়েটার দেখতে যায়, তারা দেখা মাত্র নয়নমণিকে চিনেছে।

নয়নমণি দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, শ্রীমতী সরলা ঘোষালের সঙ্গে একবার দেখা করা সম্ভব হবে কী? যদি তিনি অনুগ্রহ করে সামান্য সময় দেন—

যুবকের দল বলল, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। তিনি অবশ্যই দেখা করবেন, ভেতরে আসুন।

যুবকেরা তাকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

সরলা বৈঠকখানা ঘরের পাশের একটি ছোট ঘরকে ভারতী পত্রিকার দফতর বানিয়েছে। সম্পাদকের টেবিলে সে বসে আছে, সেখানেও তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন পুরুষ। অন্য যুবকরা সমস্বরে বলে উঠল, দিদি, আপনার কাছে নয়নমণি এসেছে, নয়নমণি।

সরলা মুখ তুলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

পাশের একটি কেদারায় বসে আছে ভারতী পত্রিকার নিয়মিত লেখক ও সরলার প্রণয়প্রার্থী প্রভাত মুখুজ্যে। মুখে জ্বলন্ত চুরুট। সে বলল, দ্যাট রিনাউনড্ অ্যাকট্রেস। স্টার অফ ক্লাসিক থিয়েটার।

থিয়েটারের কথা শুনেই সরলার ললাটে ভাঁজ পড়ল।

নয়নমণি একটুক্ষণ দেখল সরলাকে। প্রায় তারই সমবয়সিনী, গৌরবর্ণা, টানা টানা চোখ, মুখমণ্ডলে অভিজাত সুলভ খানিকটা দুরত্ব রক্ষার ভাব। সরলা লাল রঙের শাড়ি বেশি পছন্দ করে, মহীশূর থেকে, সে ওই রঙের কয়েক ডজন সিল্কের শাড়ি এনেছে।

নয়নমণি গলায় আঁচল জড়িয়ে বিনীত ভাবে বলল, নমস্কার।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে সরলা খানিকটা রূঢ় গলায় বলল, ক্লাসিক থিয়েটার থেকে আপনাকে পাঠিয়েছেন? কোনও লাভ হবে না। আমার উত্তর আমি জানিয়ে দিয়েছি। আমার মতের কোনও নড়চড় হবে না।

প্রভাত মুখুজ্যে নয়নমণিকে বলল, বসুন, আপনি বসুন।

নয়নমণি তবু দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, আমি থিয়েটারের পক্ষ থেকে আসিনি। আমাকে কেউ আসতে বলেনি।

সরলা অন্যদিকে চেয়ে বলল, আমার কাছে একজন অ্যাকট্রেসের আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে, তা তো বুঝতে পারছি না। আপনি কী জন্য এসেছেন বলুন।

হঠাৎ নয়নমণির নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। সে যেন নিতান্তই এক অকিঞ্চিৎকর প্রাণী, এত বড় প্রাসাদে, এই সুসংস্কৃত পরিবেশের সে সম্পূর্ণ অযোগ্য। থিয়েটারের সময়টুকু ছাড়া সে আপন মনে নিজের ঘরে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে মেশে না, সেটাই তো তার ভাল ছিল। কেন সে এখানে

এল?

তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুল না। তার বুকের মধ্যে অসম্ভব একটা চাপ লাগছে, নিজেকে আর সে সামলাতে পারছে না, চোখ ফেটে তার জল বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে সে আঁচল দিয়ে চাপা দিল মুখ।

অভিনেত্রীরা ইচ্ছে মতন যখন তখন কাঁদতে পারে, আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠতেও পারে। তাদের কান্না মানেই কৃত্রিম। নয়নমণিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা এখন আরও বেশি।

সরলা কয়েক পলক তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর ঘরের অন্য পুরুষদের ইঙ্গিত করল বাইরে যাবার জন্য। নয়নমণির কাছে এসে সে খুব কোমল কণ্ঠে বলল, তোমার কী হয়েছে বোন? তুমি বসো, আমাকে তোমার সব কথা বলো—।

চোখ মুছে, নিজেকে খানিকটা সামলে নেবার পর নয়নমণি বলল, আমায় ক্ষমা করুন, এমনভাবে এসে পড়া আমার উচিত হয়নি। আমি চলে যাই।

সরলা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন এসেছিলে, সে কথা বলবে না?

নয়নমণি বলল, গ্রহের ফেরে আমি থিয়েটারের নটী হয়েছি, কিন্তু তা ছাড়াও তো আমি একজন সামান্য রমণী।

সরলা বলল, তা তো অবশ্যই। মেয়েরা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কত রকম পরিবেশে পড়তে বাধ্য হয়, তা কি আমি জানি না? এ দেশের নারীরা পুরুষদের হাতের পুতুল। তোমার ওপর প্রথমেই রাগ করা আমার ভুল হয়েছে। তোমার কী হয়েছে বলো।

নয়নমণি বলল, আমাদের মতন মেয়েদের অযাচিতভাবে কোথাও যেতে নেই, তা আমি জানি। এর আগে আমি এমনভাবে কারুর বাড়িতে যাইনি। কিন্তু শুনেছি, আপনি অন্যদের মতন নন, আপনি অসাধারণ। তাই আপনার কাছে এসেছিলাম একটা প্রার্থনা নিয়ে।

সরলা বলল, কী চাও, বলো। যদি তুমি কোনও বিপদে পড়ে থাকো, আমার সাধ্য মতন প্রতিকারের চেষ্টা অবশ্যই করব।

নয়নমণি বলল, না, বিপদ কিছু নয়। আপনার কাছে এসেছি একটা প্রার্থনা নিয়ে। আপনি আমাকে একটি-দুটি গান শেখাবেন?

সরলা অবাক হয়ে বলল, গান? আমি তো থিয়েটারে গাওয়ার মতন গান গাই না।

নয়নমণি বলল, থিয়েটারের গান নয়, অন্য গান। 'বঁধু, তোমায় করব রাজা—'

সরলা আরও অবাক হয়ে বলল, এ তো রবিমামার গান। তাঁর গান তিনি কোনও নাটকে ঢোকাতে দেবেন কি না, তা তো জানি না। মনে হয়, রাজি হবেন না।

নয়নমণি ব্যাকুল মিনতির সুরে বলল, আপনাকে আমি আবার বলছি, বিশ্বাস করুন, কোনও নাটকের জন্য নয়, স্টেজে গাইবার জন্য নয়, শিখতে চাই শুধু নিজের জন্য। এমনকী অন্য কারুকেও শোনাব না, একা একা ঘরে বসে গাইব। তাতে আমার মনটা জুড়োবে।

৫০

ছিলেন শৈব, হয়ে গেলেন শাক্ত। অমরনাথ তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ করছেন নিবেদিতা। আগে যখন তখন আপন মনে বলে উঠতেন, শিব। শিব। এখন বলেন মা, মা। যেন সেই মাকে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

স্বামীজির আচার-আচরণ দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছিল, তিনি শিবের অবতার। বেলুড়ে

দীক্ষার দিনে স্বামীজি মহাদেব সেজেছিলেন, কিন্তু কালীর কথা তাঁর মুখে বিশেষ শোনা যায়নি। ইংল্যান্ডে বক্তৃতার সময় তিনি ছিলেন বৈদান্তিক, মূর্তিপুজার কথা, তান্ত্রিক মতের কথা উল্লেখ করতেন না। কিন্তু ক্ষীরভবানী দর্শনের আগে তিনি এক রাত্রে ঘোরের মাথায় লিখে ফেললেন ইংরেজিতে এক কবিতা, 'কালী দা মাদার'। কী সাঙ্ঘাতিক সেই কবিতার বর্ণনা, বাঙালির অতি পরিচিত মাতৃরূপা কালী তো তিনি নন। উগ্র রৌদ্ররস বাঙালির ঠিক যেন সয় না, তাই শ্যামাসঙ্গীতে, রামপ্রসাদের গানে কালী অনেক ঘরোয়া, তিনি মনোমোহিনী, সদানন্দময়ী, সুধা তরঙ্গিণী। তিনি তো প্রলয়ঙ্করী নন। বিবেকানন্দর কবিতায় উদ্ভাসিত কালী মূর্তি যেন ধ্বংসের দেবী, যেন চণ্ডিকার ভ্রূকুটিকুটিল ললাট থেকে আবির্ভূতা চামুণ্ডার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। সেই করালদ্রংষ্ট্রা মূর্তির সঙ্গে ঘনান্ধকার ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে ঘূর্ণিবাত্যায় গর্জে ফিরছে প্রমত্ত প্রেত পিশাচপাল। এই কবিতা লেখার পর স্বামীজি ভাবের আবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি নাপিত ডেকে মস্তক মুণ্ডন করলেন। তারপর তিন বিদেশিনীর কাছে সেই 'কালী দা মাদার' কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে বললেন, এর প্রত্যেক কথাটি সত্য,— দেখো, আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।

মৃত্যুচিন্তা। মাঝে মাঝেই এই চিন্তা এখন বিবেকানন্দর মনে ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু তাঁর তো স্বেচ্ছামৃত্যু। নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন, অমরনাথের শিব তাঁকে অমর হবার বর দিয়েছেন, এর পর স্বেচ্ছায় ভিন্ন মৃত্যু নেই তাঁর। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন, ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন এ শরীর আর রাখবে না।

এখনও কত কাজ বাকি আছে। এই তো সবে শুরু। সবে মাত্র সঙ্ঘ গড়া হয়েছে। এর পর সারা ভারত কাঁপিয়ে দিতে হবে। তবু শরীর যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অমরনাথে লিঙ্গ দর্শনের আগে বরফ গলা ঠাণ্ডা জলে স্নান করেছিলেন জেদের বশে, তারপর শরীর এমন অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল যে হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতে পারতেন। একজন ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেছেন, সেই সময় তাঁর হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার সম্ভাবনা ছিল, তারপর থেকেই হৃৎপিণ্ডটি বর্ধিতায়তন হয়ে ঝুলে গেছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

মৃত্যুচিন্তা থেকেই কি কালীর প্রতি এই টান এসেছে!

কলকাতায় যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব। চতুর্দিকে মহা অমঙ্গলের সংকেত, দাঙ্গা হাঙ্গামার আতঙ্কে একটা অশুভ ছায়া ছড়িয়ে আছে সারা দেশে, তখন একদিন স্বামীজি বলেছিলেন, কিছু লোক কালীর অস্তিত্ব নিয়ে তামাশা করে। এখন বুঝুক! মহাকালী আজ বেরিয়ে পড়েছেন জনগণের মধ্যে। পাগলের মতো ভয়ে পালাচ্ছে তারা। সৈন্য ডাকতে হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে। কে বলে, ঈশ্বর শুভের মতই অশুভেও নিজেকে মেলে ধরেন না। কিন্তু শুধু হিন্দুই তাকে অশুভ রূপেও পুজা করতে সাহসী।

এর মধ্যে বিবেকানন্দ নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সন্তানকে পাশে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন জননী। তারপর বললেন, হ্যাঁ রে বিলে, তুই এত পরিশ্রম করিস, এদিকে শরীর যে ভেঙে যাচ্ছে! মুখখানা এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

বিবেকানন্দ বললেন, ও কিছু না। ডাক্তার-বদ্যি দেখাচ্ছি তো নিয়মিত। ডাক্তারদের কথা শুনে খাওয়াদাওয়া কত কমিয়ে দিয়েছি জানো? মিষ্টি খাই না, নুন খাই না।

জননী বললেন, অত কম খেলে কি শরীর টেঁকে! আজ আমি নিজের হাতে রান্না করে তোকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াব, আমার সামনে বসে খাবি। বিলে, তোকে আর একটা কথা বলব? ছোটবেলায় তোর একবার খুব অসুখ করেছিল। তখন কালীঘাটের মা কালীর কাছে মানত করেছিলুম, তুই মন্দিরে গিয়ে চাতালে তিনবার গড়াগড়ি দিয়ে মাকে প্রণাম করবি। তখন সেই রোগ সেরে গেল, আর মানত রক্ষা করা হয়নি। তাতে পাপ হয় না? সেই জন্যই কি তোর এখন শরীর খারাপ হচ্ছে? একবার কালীঘাটের মন্দিরে যাবি আমার সঙ্গে?

বিবেকানন্দ খানিকটা ইতস্তত করেছিলেন। মায়ের এ সামান্য অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি অরাজি নন। কিন্তু কালীঘাটের মন্দিরে কি তাঁকে প্রবেশ করতে দেবে?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর যৌবনের উপবন, তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, তাঁর গুরুর লীলাস্থল, সেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তিনি আর যেতে পারবেন না। তিনি শূদ্র হয়েও সন্ন্যাসী হয়েছেন, এই তাঁর অপরাধ। সন্ন্যাসী হয়েও পাহাড়-পর্বতের গুহা-কন্দরে না থেকে কালাপানি পাড়ি দিয়েছেন, সেখানে গিয়েও ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বসে অপবিত্র, নিষিদ্ধ বস্তু আহার করেছেন। সে কথা বলে বেড়াতেও তাঁর লজ্জা নেই। ফিরে আসার পরেও প্রায়শ্চিত্ত না করে তিনি এখনও ম্লেচ্ছদের সঙ্গে প্রকাশ্যে আহার-বিহার করছেন, তাঁর অপরাধ কি কম? যেমন প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা, তেমনি রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁর বিপক্ষে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর চেলাদের সম্পর্কে মথুরবাবুর ছেলে ত্রৈলোক্যর কোনও ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবও বন্ধ। রামকৃষ্ণ ছিলেন ওখানকার মন্দিরের পাঁচ টাকা মাইনের পূজারি বামুন, মৃত্যুর আগেই তাঁকে মন্দির চত্বর থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর আবার জন্মোৎসব কীসের।

তবু মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে বিবেকানন্দ একদিন গেলেন কালীঘাটের মন্দিরে। আশ্চর্য ব্যাপার, এখানকার কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন না, বরং অভ্যর্থনা করলেন সাদরে। আদিগঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে তিনি মন্দিরের চাতালে গড়াগড়ি দিলেন তিনবার, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন, তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন দেবীমূর্তিকে। প্রাঙ্গণে বসে যজ্ঞ করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

মানত রক্ষা হল, কিন্তু শরীর সারল না। মাঝে মাঝেই বুক ধড়ফড় করে, অবসন্ন বোধ হয়। বিকেলবেলার দিকে প্রায়ই মনে হয়, শরীর আর বইছে না, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। অবশ্য বাইরের কেউ বুঝবে না, তিনি বুঝতেও দেন না। শুধু মাত্র আত্মবিশ্বাসের তেজে তিনি দৃপ্ত রয়েছেন, যখন তিনি বেলুড়ে গিয়ে মঠের কাজ পরিদর্শন করেন কিংবা নতুন শিষ্যদের শাস্ত্র পড়ান কিংবা তন্ময় হয়ে শ্যামাসঙ্গীত গান করেন, তখন বোঝার কোনও উপায় নেই য, তাঁর শরীরে কোনও রোগ-ব্যাধি আছে।

তাঁর এই সাম্প্রতিক কালীভক্তি ও মাতৃবন্দনা নিয়ে রসিকতাও করেন মাঝে মাঝে। একদিন সহাস্যে বলে উঠলেন, শরীর ভাল থাকলে ব্রহ্ম চিন্তা করি, পেট কামড়ালে 'মা মা' বলে ডাকি।

নিবেদিতাকে স্বামীজি শিবের কাছে উৎসর্গ করেছেন। স্বামীজিই নিবেদিতার চক্ষে সাক্ষাৎ শিব। অমরনাথে বরফের লিঙ্গ দেখে তিনি অভিভূত হননি, কিন্তু স্বামীজিকে দেখে শিবের মহিমান্বিত রূপ তিনি উপলব্ধি করেছেন। তবু মা কালীর বন্দনার তাৎপর্য তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম, পরে সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে অজ্ঞেয়বাদী এবং বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করলেও পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। হিন্দুদের দেবদেবী পুজার ব্যাপারে কালীমূর্তি নিয়েই মিশনারিরা আক্রমণ করেছে বারবার। ঘোর কৃষ্ণকায় এক নগ্নিকা দেবী, এক পুরুষের বুকের ওপর দণ্ডায়মান, গলায় নরমুণ্ডের মালা, এক হাতে ছিন্ন মুণ্ড, অনেকখানি বেরিয়ে আছে জিভ, ডাকিনী-যোগিনীরা সেই মূর্তির সঙ্গিনী, তার সামনে ছাগবলি দেওয়া হয়, থকথক করে রক্ত, এই ভয়ংকর দৃশ্যটি নিরাকারবাদীদের পক্ষে মেনে নেওয়া অবশ্যই শক্ত। নিবেদিতাও এক সময় ওই মূর্তি সম্পর্কে ভয় বা বিতৃষ্ণা অনুভব করতেন। পুজা কিংবা আরাধনার সঙ্গে পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, কালীমূর্তি যেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে আসার পর, তাঁর ব্যক্তিত্বে ও দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে নিবেদিতার জন্মান্তর ঘটে গেছে। পূর্ব সংস্কার সব মুছে যাচ্ছে অতি দ্রুত। এখন তিনি জানেন, হিন্দুরা আসলে পুতুল পুজা করে না, দেব-দেবীর মূর্তিগুলি এক একটি প্রতীক, সেই প্রতীকেরই পুজা হয়। মূর্তিগুলির মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের এক একটি রূপের প্রকাশ। মূর্তিগুলির সামনে একটি জলপূর্ণ ঘট থাকে, সেই ঘটেই নিরাকারের আরতি হয়, আর ভক্তি-প্রাবল্যে কেউ যদি মূর্তিগুলিকেই জীবন্ত মনে করে, তাতেই বা ক্ষতি কী! তবু হিন্দু ধর্মের দর্শনের প্রতি নিবেদিতা যতটা আগ্রহী ছিলেন, ততটা এই সব মূর্তি বা প্রতীকের প্রতি নয়। এখন স্বামীজি, তাঁর প্রভু, তাঁর রাজা যখন কালী-ভাবে ভাবিত হয়ে উঠেছেন, তখন তিনিও কালীমূর্তির বন্দনার তাৎপর্য আরও ভাল করে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন।

স্বামীজির পথই তাঁর পথ।
একদিন স্বামীজি বললেন, মার্গট, আমি ব্যবস্থা করছি, কলকাতার একটা প্রকাশ্য জনসভায় তোমাকে কালী পুজো নিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে।
নিবেদিতা হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, সে কী! আমি বক্তৃতা দেব কী করে? আমি কতটুকু জানি? আমার সংস্কৃত জ্ঞান নেই।
স্বামীজি বললেন, পড়াশুনো করো। নিজেকে তৈরি করো। মাসখানেক সময়ের মধ্যে তুমি সারদানন্দের কাছে শাস্ত্র জেনে নাও।
নিবেদিতা বললেন, তবু আমি কলকাতার বিদগ্ধ, সংস্কৃতিবান মানুষের সামনে নতুন কী বলতে পারি?
স্বামীজি বললেন, তুমি মা কালীমূর্তির এবং মা কালীর সাধনার মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে। লোকের মনে যে-সব ভুল ধারণা আছে, তার নিরসন হবে।
গুরুর আদেশ সব সময়েই শিরোধার্য। তবু নিবেদিতা ইতস্তত করে বললেন, এর কি খুব দরকার আছে? মা কালী বিষয়ে স্বয়ং আপনি কিংবা আপনার কোনও গুরুভাই অনেক ভাল বলতে পারবেন আমার চেয়ে।
স্বামীজি জোর দিয়ে বললেন, না, না, তোমাকেই বলতে হবে। তোমার মুখ থেকেই শুনুক ওরা।
তিনি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। শুধু মিশনারিরাই যে কালীমূর্তি নিয়ে ঘৃণা বিদ্রূপ প্রচার করে তাই-ই না, এ দেশের ব্রাহ্মরা এবং তথাকথিত প্রগতিশীলরাও কালী পূজার ঘোর বিরোধী। এবার রাজার জাতের প্রতিনিধি, একজন শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গিনীর মুখ দিয়ে কালী মাহাত্ম্যের প্রচার শুনে তারা কী রকম হতচকিত হয়ে যাবে, তা ভেবেই বেশ মজা পেতে লাগলেন স্বামীজি।
অ্যালবার্ট হল ভাড়া নিয়ে রাখা হল। সংবাদপত্রেও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মিস মার্গারেট ই. নোবল (সিস্টার নিবেদিতা) নামে এক ইংরেজ লেডি, যিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনে উচ্চশিক্ষিত, তিনি কালী-ভজনা বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেবেন। শহরের বুদ্ধিজীবীমহল অবশ্যই আসবেন দলে দলে।
প্রকাশ্য বক্তৃতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ইংরেজ সমাজে তো বটেই। এ দেশেও। অপ্রস্তুত অবস্থায় অতি সাধারণ কথাবার্তা চলে না, জ্ঞান-বুদ্ধি ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক। নিবেদিতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনো শুরু করলেন। সারদানন্দের কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, স্বামীজিকে কাছে পেলেও নানান প্রশ্ন করতে ছাড়েন না। স্বামীজির সামনে তিনি স্কুলের ছাত্রীর মতন খাতা-পেনসিল নিয়ে বসেন, স্বামীজির উত্তরগুলো টুকে নেন।
স্বামীজি একদিন বললেন, আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী এবং দেবদেবীতেও বিশ্বাসী। আর কিছুতে নয়।
নিবেদিতা বললেন, কিন্তু আপনি এক সময় কালীকে মানতেন না।
স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক। ওঃ! কালীকে আর কালী ব্যাপারটাকেই কী ঘৃণাই যে করতাম। ছ' বছর ধরে চলেছিল সেই লড়াই, কিছুতেই কালীকে মানতে চাইনি।
নিবেদিতা বললেন, কিন্তু এখন আপনি তাঁকে বিশেষভাবে মেনে নিয়েছেন, তাই না?
স্বামীজি বললেন, মানতে বাধ্য হয়েছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন যে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও মা আমাকে চালিত করেন। তিনি আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করান। সত্যি, কতদিন ধরে যে লড়াই চালিয়েছি। আমি ভালবাসতুম, বুঝলে, তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমি অনুভব করেছিলুম, এ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছি, তার মধ্যে তিনিই পবিত্রতম ব্যক্তি। আরও বুঝেছিলুম, আমাকে তিনি এত ভালবাসেন, সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ-মায়েরও নেই।
নিবেদিতা অধোমুখে একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? এত সুযোগ পেয়েও আপনি এত দীর্ঘদিন মা কালী সম্পর্কে সন্দেহ করেছেন, তা হলে ব্রাহ্মরাও যে করবে, তাতে

আর আশ্চর্য কী?
স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু ওরা তো আমার গুরুর মধ্যে ওই সীমাহীন পবিত্রতা কখনও দেখতে পায়নি, আর সে ভালবাসার স্বাদও পায়নি।
নিবেদিতা বললেন, আমার কী মনে হয় জানেন, তাঁর বিরাটত্বই তাঁর ভালবাসাকে এত দুশ্ছেদ্য করে তুলেছিল আপনার কাছে।
স্বামীজি বললেন, তাঁর বিরাটত্ব সম্পর্কে বোধ কিন্তু তখনও আমার মধ্যে জাগেনি। সেটা এল পরে, আত্মসমর্পণের পরে। তার আগে শ্রীরামকৃষ্ণকে খ্যাপা শিশুর মতন ভাবতুম, সব সময় এই দেখছেন, সেই দেখছেন, দেবদেবীদের চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন, আরও কত কী। সেসব জিনিসকে ঘৃণা করতুম। কিন্তু তার পরে আস্তে আস্তে সেই সব কিছুকেই, এমনকী কালীকেও মেনে নিতে হল।
নিবেদিতা বললেন, কেন মেনে নিতে হল আপনাকে, তা কিন্তু এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবেন, কীসে আপনার অত বিরোধিতা চূর্ণ হল?
স্বামীজি বললেন, না, বোঝানো যাবে না। সে রহস্য আমার সঙ্গেই চলে যাবে। সে সময় আমার চরম দুর্ভোগের দশা চলছে। বাবা মারা গেছেন, অভাব-অনটনের দুর্বিপাক; মা দেখলেন এই তো সুযোগ—আমাকে গোলাম করার। মা'র একেবারে মুখের কথা, 'তোকে গোলাম করে রাখব।' আর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর হাতেই আমাকে তুলে দিলেন।
নিবেদিতা বললেন, আমার ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কালীর অবতার।
স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই, মা কালীই শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। দ্যাখো মার্গট, আমি বিশ্বাস না করে পারি না, কোথাও একটা মহাশক্তি আছে যা নিজেকে নারী-প্রকৃতি বলে অনুভব করে—কালী বা মা নামে নিজেকেই আখ্যাত করে। আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।
নিবেদিতা বললেন, এটাকে বলা যেতে পারে বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য ঐক্য।
স্বামীজি বললেন, তাই কি! কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে ভিন্নতার কারণ কী? ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, আবার দেবদেবীও...সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী, আবার দেবদেবীতেও বিশ্বাস না করে পারি না। এই বিশ্বাসের যন্ত্রণা কী কম! তিনি এক এক সময় আমায় কী যন্ত্রণাই না দেন! তখন আমি তাঁর কাছে চোটপাট করে বলি, খুব তো মা হয়েছিস, যদি তুই এই এই জিনিসগুলো আগামীকালের মধ্যে আমাকে না দিবি, তা হলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। তারপর থেকে আমি শ্রীচৈতন্যের পুজো করব।
একটু থেমে, হেসে স্বামীজি বললেন, সেই জিনিসগুলো আমি ঠিক ঠিক পেয়ে যাই!
নিবেদিতা চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, সত্যি?
স্বামীজি বললেন, সত্যি তো বটেই। কিন্তু মনে রেখো, এসব কথা আর কারুকে জানাবার নয়।
নিবেদিতা বললেন, তার মানে আপনি বলছেন, এই আলাপ পৃথিবীর আর কেউ জানবে না?
স্বামীজি বললেন, কক্ষনও না। তিনি উঠে চলে যাচ্ছেন, নিবেদিতা বললেন, আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, এই যে পাঁঠা বলির ব্যাপারটা, কালীমূর্তির পুজো চলছে, ভক্তরা মন্ত্র পাঠ করছে, তার মধ্যে একটা নিরীহ পশুকে টেনে এনে বলি দেওয়া, রক্ত ছিটকে যায় চার দিকে, এই বীভৎস ব্যাপারটা কি খুব প্রয়োজনীয়?
স্বামীজি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, ছবিটা সম্পূর্ণ করতে একটু রক্ত থাকলেই বা ক্ষতি কী?
স্বামীজি চলে গেলেন। নিবেদিতার আর একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা বলা হল না। স্বামীজি শিবের অবতার, আর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর অবতার। স্বামীজি তা হলে কালীকে মা মা বলেন কেন? এঁদের মধ্যে তো মাতা-পুত্রের সম্পর্ক হতে পারে না। নিবেদিতার ধারণা, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ, এঁরা দেবদম্পতি।
ফেব্রুয়ারি মাসের তেরো তারিখে অ্যালবার্ট হল সন্ধে ছ'টার আগেই দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে

গেল। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বজ্জনেরা অনেকেই এসেছেন। নিবেদিতা নিজে তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, অনেকেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু শুনে আসতে চাননি, রবীন্দ্রনাথ অন্য ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকাকেন্দ্রিক বৈষ্ণবরাও আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন, তাঁদের পত্রিকার কোনও প্রতিনিধিও পাঠাননি। ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে শিষ্টতা রক্ষার জন্য এসেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গে তাঁর ভাগনি সরলা ঘোষাল। সত্যেন্দ্রনাথের মেয়ে ইন্দিরাও কৌতূহলবশে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু আর কয়েক দিন পরেই তার বিবাহ, এ সময় তার বাড়ির বাইরে যাওয়াটা শোভা পায় না।

জরুরি রুগি দেখা সেরে একেবারে শেষ মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। প্রবেশপথে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ঠেলেঠুলে তিনি চলে এলেন একেবারে সামনে। কোনও আসন খালি নেই, একজন সসম্ভ্রমে নিজের আসন ছেড়ে দিল তাঁকে। মহেন্দ্রলাল ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার করে সময় দেখলেন।

স্বামীজি আসেননি। মঞ্চের ওপর দুটি চেয়ার, একজন অনামা সভাপতির পাশে বসে আছেন নিবেদিতা। দুগ্ধধবল সিল্কের গাউন পরা, কাঁধের ওপর কারুকার্যময় কাশ্মীরি শাল, মুখে যৌবনের দীপ্তি, চক্ষু দুটি ঈষৎ চঞ্চল। নিবেদিতাকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করাবার কোনও প্রয়োজন নেই, তবু নিয়মরক্ষার জন্য সভাপতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

তারপর উঠে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। সহজ, সরল ইংরেজিতে প্রথমেই বিনীতভাবে বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে কালীপূজা বিষয়ে বক্তৃতা করার অধিকার আমার তেমন নেই, সে বিষয়ে আমি সচেতন। সংস্কৃত-জ্ঞান কিংবা ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান খুব বেশি নয়...ভারতে আমি মাত্র এক বছর এসেছি...

সারাজীবন ধরে আমি কালীপুজোর কথা শুনে আসছি, কালী বা তাঁর পূজকদের সম্পর্কে সেসব মোটেই ভাল কথা নয়। এখন আমি এর সংস্পর্শে এসেছি, এবং বুঝেছি যে বাল্যকালে আমি যা শুনেছি, তা অর্ধসত্য, পূর্ণসত্য নয়। পূর্ণসত্যের সন্ধানই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। তা ছাড়া, একজন ইংরেজ রমণী হিসেবে আমার ক্ষমা প্রার্থনারও অধিকার আছে। আমার দেশের মানুষরা অন্য একটি দেশের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করে যে সব কুৎসা রটনা করেছে, তার জন্য আমি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে পারি।

...ঈশ্বর উপলব্ধির প্রকাশ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে। কেউ ব্যাকুলভাবে ডাকেন, হে প্রভু! সেমেটিকরা ভাবাবেশে ঈশ্বরকে বলেন, আমাদের পিতা।...ভারতবর্ষ মধুরতম নামে ঈশ্বরকে ডাকে 'মা' বলে। ঈশ্বর—জননী!

...মাতৃরূপিণী ঈশ্বরের তিনটি রূপ: দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী। দিগ্বাসিনী দুর্গা, প্রকৃতিরূপে বিকাশশীল মহাশক্তির তিনি প্রতীক। জগদ্ধাত্রীর মধ্যে রক্ষয়িত্রীর ভাব কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীর কাছেই—ভয়ঙ্করী, অগ্নিরসনা, অগ্নিবদনা, মৃত্যু-শ্মশানের মধ্যে আসীনা যিনি—তাঁর কাছেই আত্মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আর উচ্চারণ করে সেই পরম শব্দটি—মা।

নিবেদিতা খুব বিস্তৃতভাবে ঈশ্বরের মাতৃভাবের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর তত্ত্ব বর্ণনা করে তিনি বললেন, ঈশ্বর জীবন দিয়েছেন সত্য। কিন্তু নিহন্তাও তিনি। ঈশ্বর কালাতীত নিত্য—এই ভাবের সঙ্গে জেগে ওঠে নাকি মহাকালের কৃষ্ণচ্ছায়া, যার শুরু ও শেষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যে?...সেই জন্যই, তাঁর ধ্বংসলীলার মধ্যে কি তাঁকে অর্চনা করব না—সেই শ্মশানই কি একমাত্র স্থান নয়, যেখানে নতজানু হয়ে আমরা বলতে পারি—মা, মাগো!

যুগে যুগে মা কালী ভারতকে মানুষ দিয়েছেন। প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, শিখেরা—এঁদের দিয়েছেন তিনি। যদি বাংলা দেশ, মাতৃপূজার এই আদিপীঠ, মাতৃসাধকদের এই জন্মভূমি—মাতৃপূজা ত্যাগ করে, তা হলে নিজ পৌরুষকেই ত্যাগ করবে। প্রাচীন পূজাকে দশগুণ বেশি ভক্তির সঙ্গে এখন করতে হবে,—না করলে এ দেশের চির দুর্দশা ও অপমান...

সভাস্থল নিস্তব্ধ, সবাই গভীর মনোযোগ ও বিস্ময়-কৌতূহলের সঙ্গে শুনছে। হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের

মূল সত্যগুলির কথা এমন গভীর অথচ সাবলীলভাবে ইদানীং আর কারুকে বুঝিয়ে বলতে শোনা যায়নি। এক দল উচ্চ কণ্ঠে গা-জোয়ারিভাবে নিজের ধর্মের প্রচার করে, অন্য দল নিন্দা বা অপপ্রচার করে। কোনও পক্ষই যুক্তির ধার ধারে না। সেই হিন্দু ধর্মের পক্ষ নিয়ে সবচেয়ে সারগর্ভ কথা বলছে কি না একজন মেমসাহেব! শ্রদ্ধা ও ভক্তির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর মুখ।

হঠাৎ ঘুমন্ত সিংহের জেগে ওঠার মতন দাঁড়িয়ে পড়লেন মহেন্দ্রলাল। বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বললেন, এখানে হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ? এক বিলিতি বিবি আমাদের কালীপুজো শেখাবে! আরও দশগুণ বেশি কালীপুজো করতে হবে? এখনই যা বেলেল্লা চলছে, তার ওপর দশগুণ! মিস নোবল, আমার ধারণা ছিল, তুমি এদেশে এসেছ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সদুদ্দেশ্য নিয়ে, বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে তোমার প্লেগের রুগিদের সেবাব্রত দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এখন এসব কী শুরু করলে? দেশটাকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চাও?

বিচলিত না হয়ে নিবেদিতা মৃদুহাস্যে বললেন, ডক্টর সরকার, ধর্মকে বাদ দিয়ে কি কোনও বড় কাজ হয়? আমি ধর্মের মূল তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করছি, এখনও আমার বলা শেষ হয়নি।

মহেন্দ্রলাল ধমক দিয়ে বললেন, রাখো তোমার তত্ত্ব! তত্ত্বের তুমি কী বোঝো! এত প্রাচীন এক ধর্ম, তার সংস্কৃতি, এক বছর মাত্র এদেশে এসে কিছু মুখ শোঁকাশুঁকি করে তার তত্ত্ব বোঝা যায়? এত সহজ! তুমি তো তোতাপাখির মতন কতকগুলি শেখানো বুলি বলছ। তত্ত্ব হল এক ব্যাপার, তার প্রয়োগ কতরকম হয়, তার তুমি কী জানো? যত রাজ্যের মাতাল, গেঁজেল, চোর, ডাকাতরাও কালী পুজো করে। তারা কোন তত্ত্বটা মানে?

নিবেদিতা বললেন, অপপ্রয়োগ দেখে মূল বিষয়ের বিচার করা যায় না। বাগানে অনেক আগাছা জন্মায়, তার জন্য পুরো বাগানটা নস্যাৎ করা কি ঠিক? মূল তত্ত্ব যদি ভালভাবে প্রচার করা যায়—

তাকে বাধা দিয়ে মহেন্দ্রলাল গর্জে উঠলেন, এসব পুজোফুজোর মূল তত্ত্বটাই তো ভণ্ডামি! কতকগুলো তান্ত্রিক নিজেদের ভোগ-লালসা মেটাবার জন্য একটা ল্যাংটা মাগির মূর্তি গড়েছে, তার সঙ্গে যতরাজ্যের বামাচার, মদের ছড়াছড়ি, বলি দেওয়া পাঁঠার মাংসের ভোজ, এইগুলোকেই শুদ্ধ করার জন্য বড় বড় তত্ত্বের বুলি কপচানো হয়েছে, সব ভণ্ডামি! ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়—

নিবেদিতা বললেন, কালীপূজা বিষয়ে এক শ্রেণীর মানুষের আপত্তির কথাও আমি জানি। যেমন, প্রতিমা পূজা অনেকে মানেন না। এই প্রতিমাটির আকার বীভৎস। এই পুজোয় পশুবলি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। একে একে আমি এই বিষয়গুলিরও ব্যাখ্যা করতে চাই।

মহেন্দ্রলাল বললেন, কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি? সবই পালিশ করা ভণ্ডামির মুখোশ। শেষেরটা, ওই পাঁঠাবলির কথাটাই আগে বলো শুনি!

নিবেদিতা বললেন, মূর্তিপূজার মতন ওই বলিও তো প্রতীক। সব ধর্মের সাধকরাই শব্দ-প্রতিমা নির্মাণ করেন। হিন্দু সাধকরা সেই শব্দ-প্রতিমার বর্ণনা দিয়ে মূর্তি গড়েছেন। কালী প্রতিমার সামনে প্রকৃত সাধক নিজেকেই নিবেদন করতে চান, তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে আরাধনা করতে চান। যত দিন না সে জন্য তিনি পুরোপুরি তৈরি হন, তত দিন পশুবলি দিতে হয় সেই রক্তের প্রতীক হিসেবে।

হা হা শব্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন মহেন্দ্রলাল। দু'হাত তুলে বললেন, বলেছিলাম না, ভণ্ডামির ব্যাখ্যা! আজ অবধি কোন সাধক তার বুকের রক্ত দিয়েছে, অ্যাঁ? তার খোঁজ রাখো? বড় বড় জমিদাররা কালী পুজো করায়, তারা বুকের রক্ত দিতে চায়? ডাকাতগুলো কালী পুজো করে গিয়ে অন্যের গলা কাটে। দেবতার নামে উচ্ছুগ্যু করা মাংস খাবার ধান্দা? কালীপুজোর সময় ছেলেপুলে আর বুড়োরা পর্যন্ত হাঁ করে বসে থাকে, কখন মাংস খাবে। কসাইখানাগুলোতেও একটা কালী মূর্তি বসিয়ে পাঁঠাবলি হয়! অমন তত্ত্বের মুখে ঝাঁটা মারি!

পেছন দিক থেকে একজন কেউ চেঁচিয়ে উঠল, চোপ! এই বুড়ো ভাম, তোর কথা কেউ শুনতে চায় না। বসে পড়, বসে পড়!

অমনি একটা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। অনেকে মিলে বলতে লাগল, বসে পড়ুন, মশাই। বসে পড়ুন।

মহেন্দ্রলাল পেছন ফিরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, না, আমি বসব না। আমরা চেষ্টা করছি, দেশটাকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে, বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে। আমরা চাই দেশের মানুষ ভণ্ডামিকে ঘৃণা করতে শিখুক। বাইরে থেকে এক মেম এসে কতকগুলো ভুল তত্ত্ব আর কদর্য আচার-অনুষ্ঠানের কথা প্রচার করবে, তা আমরা কিছুতেই মেনে নেব না!

একজন বলল, তুমি মানতে না চাও, গেট আউট! আমরা শুনব।

আর একজন বলল, তুমি একলা একলা ডিস্টার্ব করছ কেন? আর কেউ তোমাকে সাপোর্ট করছে না।

মহেন্দ্রলাল কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন। আহতভাবে তাকালেন সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে। ভাঙা গলায় বললেন, আর কেউ নেই? এখানে আর কেউ আমাকে সমর্থন করছেন না?

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরভাবে বললেন, আমিও মনে করি, এই বক্তৃতায় কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

আরও কয়েকজন যুবকও উঠে দাঁড়াল, সংখ্যায় আট দশজনের বেশি না।

পেছন থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বেম্ম রে, বেম্ম! হিন্দুদের পুজোর কথা শুনলেই ওদের গা জ্বালা করে। তোরা এসেছিস কেন, যা, যা বেরিয়ে যা।

মহেন্দ্রলাল বললেন, আমি ব্রাহ্ম নই। আমি বিজ্ঞানী, আমি যুক্তিবাদী।

আর একজন বলল, ও মশাই, আপনারা তো মাত্তর ক'জন! আমরা অনেক বেশি লোক, আমরা শুনতে চাই, আমাদের ভাল লাগছে! বাধা দিচ্ছেন কেন?

মহেন্দ্রলাল বললেন, বেশি লোক! বেশির ভাগ লোকই তো ইডিয়েট, আর ভেড়ার পাল! যারা নতুন কথা বলে, যারা সমাজের ব্যাধি দূর করতে চায়, যারা দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, চিরকালই তাদের সংখ্যা কম হয়। শেষ পর্যন্ত তারাই জেতে। বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, তখনও বেশির ভাগ লোকই তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

এই কথায় অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। গোলমাল উঠল চরমে, গালাগালি ও কটূক্তিতে কান পাতা যায় না। একদল লোক ধেয়ে গেল মহেন্দ্রলালকে মারবার জন্য।

নিবেদিতা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল মিনতির সুরে হাত জোড় করে বললেন, আপনারা শান্ত হোন, অনুগ্রহ করে বসুন। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আমার পরিচিত। ওঁর আপত্তির কথা উনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন। আপনারা সংযত হন।

তারপর মহেন্দ্রলালকে উদ্দেশ করে বললেন, ডক্টর সরকার, আমি কি আমার বক্তৃতার বাকি অংশ শেষ করতে পারি?

মহেন্দ্রলাল বললেন, শোনাও, তোমার যা খুশি শোনাও এদের।

সদর্পে তিনি সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

তার পরেও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নিবেদিতা বলে গেলেন, স্বামী বিবেকানন্দের 'কালী দা মাদার' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, রামপ্রসাদের অনেকগুলি গান অনুবাদ করে শোনালেন। শেষ হবার পর তুমুল করতালি ধ্বনিতে যেন ফেটে পড়ল বাতাস। অনেকে ছুটে এল মঞ্চের দিকে নিবেদিতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

যথাসময়ে এই বিবরণ শুনে খুবই হৃষ্ট বোধ করলেন স্বামীজি। নিবেদিতার শ্রম সার্থক, নিবেদিতা জয়ী হয়েছেন। আরও একটা খুব বড় আনন্দের সংবাদ এই যে, কালীঘাট মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মন্দির চত্বরে নিবেদিতাকে আর একবার এই বক্তৃতা দেবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটাও অবশ্যই আর একটি বড় জয়। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিলে কী হয়, হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রধান দুর্গ, কালীঘাটের সুপ্রাচীন কালী মন্দিরের দ্বার শ্রীরামকৃষ্ণপন্থিদের কাছে অবারিত। এমনকী এক ম্লেচ্ছ রমণীকেও তাঁরা স্থান দিতে প্রস্তুত।

সংবাদপত্রগুলি নিবেদিতার এই বক্তৃতাকে বিশেষ আমল দিল না বটে, কিন্তু লোকের মুখে মুখে হিন্দু ধর্মের জোরালো সমর্থনকারী এই মেমসাহেবটির কথা ঘুরতে লাগল।

ব্রাহ্মদের কাছে নিবেদিতার যাতায়াত অবশ্য বন্ধ হল না। বুদ্ধিজীবী ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী ব্রাহ্মদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে তাঁর ভাল লাগে। ব্রাহ্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণপন্থীদের মিলিয়ে দেবার ইচ্ছেটা তিনি এখনও ছাড়েননি। সেদিনের বক্তৃতার পর সরলা ও তার ভাই সুরেন নিবেদিতার আরও ভক্ত হয়ে উঠেছে। একদিন তিনি স্বামীজিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সদ্য তরুণ বয়েসে স্বামীজি একবার গিয়েছিলেন ব্যাকুল প্রশ্ন নিয়ে। ব্রাহ্ম নেতা বলে নয়, মহাপুরুষোপম এই মানুষটির প্রতি স্বামীজির এখনও বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। একগুচ্ছ রক্তগোলাপ নিয়ে দু'জনে এলেন দেবেন্দ্রনাথের তিনতলার ঘরে। সকাল নটা বাজে, একটা আরামকেদারায় আধশোওয়া হয়ে আছেন দেবেন্দ্রনাথ। আশি বছর পেরিয়ে গেছে কবে, এখনও তাঁর চক্ষু ও কর্ণ সজাগ। বিবেকানন্দ সামনে এগিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্যই ইতিমধ্যে নরেন্দ্রর বিবেকানন্দ স্বামীতে রূপান্তরের কাহিনী শুনেছেন, তিনি চিনতে পারলেন ও হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন। নিবেদিতা এর আগেই একবার দেখা করে গিয়েছিলেন, তিনি ফুলের স্তবক রাখলেন দেবেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে।

দেবেন্দ্রনাথ বললেন, বসো মা, বসো। তোমরা দু'জনেই আমার সামনে একটু বসো।

তারপর দেবেন্দ্রনাথ খুবই মৃদু কণ্ঠে, প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বিবেকানন্দকে কিছু বলতে লাগলেন বাংলায়, নিবেদিতা তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। বিবেকানন্দই বা কী বুঝলেন কে জানে, মাথা নেড়ে যেতে লাগলেন। একটু পর দেবেন্দ্রনাথ একেবারে চুপ। কেউ কোনও কথা বলছে না। মিনিট দশেক কেটে যাবার পর স্বামীজি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা এবার উঠি? আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।

দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করে ওঁদের আশীর্বাদ জানালেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্বামীজি দেখলেন, একজন দীর্ঘকায় পুরুষ যেন ওঁদের দেখেও না দেখার ভান করে অন্যদিকে চলে গেল। কে? দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কবিবর নাকি? আরও দু' একজন উদাসীন ভাব দেখাল। স্বামীজির মনে হল, তিনি অনাহূতভাবে নিবেদিতার কথায় এসেছেন, যেন অবাঞ্ছিত। তিনি নিবেদিতাকে বললেন, চল, এক্ষুনি চলে যাই।

দোতলার ঘর থেকে একটি তরুণী বেরিয়ে এসে বলল, সে কী, এর মধ্যেই চলে যাবেন কেন? একটু চা খেয়ে যাবেন না?

স্বামীজি বললেন, না, আমার চা পান করার ইচ্ছে নেই এখন।

কিন্তু নিবেদিতার আরও কিছুক্ষণ থেকে যাবার ইচ্ছে। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে স্বামীজির দিকে তাকালেন। স্বামীজি বুঝতে পেরে বললেন, তুমি যদি চাও, চা খেতে পারো।

ঘরের মধ্যে একটি সোফায় বসলেন স্বামীজি। ক্রমে আরও কয়েকজন এল, তারা নিবেদিতার সঙ্গেই গল্প করতে লাগল। মেয়ে মহলের খুব কৌতূহল নিবেদিতা সম্পর্কে। স্বামীজি চুপ করে বসে রইলেন, তাঁর অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে।

কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, স্বামীজি, আপনি চাও খাচ্ছেন না, আপনার জন্য তামাক এনে দিতে বলব?

স্বামীজি এবার সম্মতি জানালেন। সঙ্গে চুরুট আনেননি বলে উসখুস করছিলেন। একজন ভৃত্য গড়গড়া সেজে নিয়ে এল, স্বামীজি নলটি হাতে নিয়ে তামাক টানতে লাগলেন। অন্যরা কালীমূর্তি নিয়ে তর্ক জুড়ে দিল নিবেদিতার সঙ্গে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ওঠা হল। বাইরে বেরিয়ে এসে স্বামীজি বললেন, আমাদের নিজেদের অনেক কাজ আছে। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশা করে কী লাভ? মিছিমিছি এদের সঙ্গে তর্ক করেই বা কী হবে? কালীপুজো সম্পর্কে ওদের ছুঁৎমার্গ কিছুতেই যাবে না। তুমি আর ঠাকুরবাড়িতে এসো না।

নিবেদিতা অপরাধীর মতন একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আর আসব না?

ইন্দিরা ওর আইবুড়ো ভাত আর বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, আসব না তা হলে ? হিন্দু বিয়ের উৎসব আমার খুব দেখার ইচ্ছে ছিল।

স্বামীজি গম্ভীর হয়ে গেলেন। হুঃ, ভারী তো বিয়ে ! অশাস্ত্রীয় ছেলেখেলা। শালগ্রাম শিলা নেই, যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় না, ব্রাহ্মদের বিয়ে আবার বিয়ে নাকি ?

তবু তিনি বললেন, ঠিক আছে, বিয়েতে যেয়ো !

ইন্দিরার বিয়ের কটি দিন, বৌভাত পর্যন্ত অনেকখানি করে সময় কাটালেন নিবেদিতা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে। বিজ্ঞানী জগদীশ বোসও প্রায় সর্বক্ষণ ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও অনেক গল্প হল। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব বন্ধুত্ব। এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে এক কবির এমন সখ্যও বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারি কুঠিতে জগদীশচন্দ্র প্রায়ই যান, বিশাল পদ্মা নদীর তীরে শস্যশ্যামল প্রান্তর, গ্রামের সরল মানুষজন দেখতে জগদীশচন্দ্রের কত ভাল লাগে, সেই কথা বলছিলেন তিনি। শুনতে শুনতে নিবেদিতার খুব লোভ হল। একসময় নিজে বলেই ফেললেন, সেখানে একবার আমি যেতে পারি না ?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, অবশ্যই যেতে পারেন। এই তো জগদীশ সস্ত্রীক আবার যাচ্ছেন আমার সঙ্গে, আপনিও তখন যেতে পারেন। আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

তখনই দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল। নিবেদিতা যাবার জন্য কথা দিয়ে ফেললেন।

কয়েকদিন পর স্বামীজির সঙ্গে দেখা হলে নিবেদিতা উৎসাহের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি কবির সঙ্গে শিলাইদহে গিয়ে গ্রাম বাংলার রূপ প্রত্যক্ষ করতে চান।

স্বামীজি কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললেন, মার্গট, আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। আমেরিকায় গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে, ঠাণ্ডার দেশে গেলে আমি ভাল থাকি। তার চেয়েও বড় কথা, বেলুড় মঠ ও মিশনের জন্য টাকা তুলতে হবে। আমার শরীরের অবস্থা যা-ই হোক, ওখানে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আবার টাকা তোলা যাবে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

নিবেদিতা বললেন, সে কী, আপনার একারই তো যাবার কথা ছিল। আমার এখানকার কাজের কী হবে ?

স্বামীজি বললেন, সে কাজ অন্যরা দেখবে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিশেষ দরকার। তুমি এখানকার আরব্ধ কাজের কথা বিদেশে প্রচার করবে। ওখানে তোমারও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে, তাতেও বেশ কিছু টাকা উঠতে পারে। যাবার জন্য তৈরি হও।

একটু থেমে, কঠিন কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশা করার কী দরকার ? শিলাইদহের হুজুগ এখন বাদ দাও !

৫১

জানুয়ারি মাসের এক অপরাহ্ণে কলকাতায় ঘনঘন তোপধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা থেকে কামান দাগা হয়, তার গুপুস গুপুস শব্দ শোনা যায় অনেক দূর পর্যন্ত। একবার, দু'বার, তিনবার....লোকেরা গুনতে থাকে। সিপাহি বিদ্রোহের পর বেয়াল্লিশ বছর কেটে গেছে, তারপর এদিকে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ, গুলি-গোলা চলেনি। মাঝে মাঝে রুশ আক্রমণের হুজুগ শোনা যায় বটে, তাও হিমালয় পেরিয়ে বাংলা দেশে পৌঁছনোর সম্ভাবনা প্রায় অলীক বলা যায়। এখন চতুর্দিকে শান্তি।

সময় জানাবার জন্য দিনের বেলা তোপ পড়ে। দুপুর বারোটায় তোপ শোনার জন্য অনেকে কান

খাড়া করে থাকে, ওই তোপধ্বনি হলেই খিদে পায়। ইংরেজ সরকারের কেষ্টবিষ্টু কেউ এলে তাদের সম্মানেও কামান দাগা হয়, দেশীয় রাজ্যের রাজারা এলেও সেই প্রথা আছে। কিন্তু আজ যে থামতেই চাইছে না। আঠাশ, উনত্রিশ, তিরিশ, একতিরিশ। একসঙ্গে এত তোপধ্বনি তো সহসা শোনা যায় না। কার সম্মানে এত, স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়া এলেন নাকি ? চল্লিশ বছরেরও বেশি তিনি ভারতের রাজেন্দ্রাণী, কখনও তাঁর ভারতীয় প্রজাদের দেখতে আসেননি, তিনি তো আর অকস্মাৎ না জানিয়ে-শুনিয়ে আসবেন না, কয়েকমাস ধরে প্রস্তুতি চলবে। তবে কে এলেন ?

গঙ্গার ধারে বাবুঘাট-কয়লাঘাট লোকে লোকারণ্য। না, বিলেত থেকে কোনও জাহাজ আজ এই বন্দরে ভেড়েনি। হাওড়ার রেলওয়ে স্টেশন থেকে মহাসমারোহে আসছেন একটি দম্পতি। ধবল রঙের চারটি ঘোড়ায় টানা স্বর্ণখচিত গাড়িতে বসে আছেন তাঁরা দু'জন, সামনে পেছনে সুদৃশ্য পোশাক পড়া দেহরক্ষীর দল, পথের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যবাহিনী, তাদেরই ফাঁক দিয়ে সাধারণ মানুষেরা একঝলক দেখে নিয়ে চক্ষু সার্থক করতে চাইছে। সমস্ত বাড়ির বারান্দা ও ছাদেও দাঁড়িয়ে আছে অজস্র মানুষ, সহর্ষে হাত নাড়ছে তারা। সত্যিই, চক্ষু সার্থক করার মতনই ব্যাপার বটে। এমন রূপবান, এমন সুশ্রী দম্পতি যেন কলকাতার মানুষ আগে দেখেনি। সুঠাম শরীর ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন পুরুষদেরই দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচন করা হয়, কিন্তু তাদের সবার চেয়ে সুঠাম ও সুন্দর এই ঘোড়াগাড়িতে উপবিষ্ট পুরুষটি। দীর্ঘকায়, নবনীবর্ণ, তীক্ষ্ণ নাসা, টানা টানা চোখের মণি দুটির রং সমুদ্রের মতন নীল। তিনি বসে আছেন মেরুদণ্ড সোজা করে, ওষ্ঠাধরে সামান্য হাসির চিহ্ন থাকলেও মুখমণ্ডলে স্পষ্ট অহংকারের ছাপ। পাশের রমণীটিও অসামান্য রূপসী, তাঁর মুখখানি যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় মাখা, তাঁর দু'চক্ষে অবশ্য অহংকারের বদলে বিস্ময়ই বেশি।

জর্জ এবং মেরি। ভারতে মহারানির সর্বোচ্চ প্রতিনিধি, ভাইসরয় লর্ড জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন এবং তাঁর পত্নী ভাইসরিন মেরি কার্জন। কলকাতার মানুষ এর আগে আরও অনেক বড়লাট ও বড়লাট পত্নী দেখেছে, কিন্তু এত সুন্দর ও যৌবনবন্ত কোনও দম্পতি আগে দেখেনি। এই তো, বিদায়ি ভাইসরয় লর্ড এলগিন, বেঁটেখাটো, কোলকুঁজো, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, সাদামাটা চেহারা। তাঁর স্ত্রীটিও এমন কিছু আহামরি নয়। লর্ড কার্জনের মতন এত তরুণ ভাইসরয়ও আগে আসেননি, এঁর বয়েস এখনও চল্লিশ পূর্ণ হয়নি।

শোভাযাত্রাটি বড়লাট ভবনের সিংহদ্বারের কাছে এসে থামল। এখান থেকে ভেতরের বিশাল সিঁড়ি পর্যন্ত লাল কার্পেট পাতা। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামবার সময় লর্ড কার্জন মৃদু স্বরে তাঁর পত্নীকে বললেন, মেরি, এই প্রাসাদটি বাইরে থেকে দেখে নাও ভাল করে, এর বিষয়ে একটা মজার কথা তোমাকে পরে বলব !

এরপর আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর চলল কিছুক্ষণ ধরে। প্রশস্ত সিঁড়িটির একেবারে তলার ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর বা ছোটলাট, সিঁড়ির দু'ধারে রয়েছেন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষেরা, সৈন্য ও নৌবাহিনীর সেনাপতিরা, ধর্মযাজক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা। অশ্বেতাঙ্গ ভারতীয় শুধু কয়েকজন দেশীয় রাজ্যের রাজা, কাশ্মীরের মহারাজ। গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা ইত্যাদি রাজ্যের রাজা। নিজেদের বিশিষ্টতা বোঝাবার জন্য তাঁরা পরে আছেন হিরে-জহরত খচিত পোশাক। তাদের দু' হাতের আঙুলের আংটি ও গলার হারের বহুমূল্য মণি-মাণিক্য দেখে লেডি কার্জনের চক্ষু বিস্ফারিত হতে হতে সীমা ছাড়িয়ে গেল।

সিঁড়ির একেবারে উপরিভাগে দাঁড়িয়ে আছেন বিদায়ি ভাইসরয়, লর্ড এলগিন। লেফটেনান্ট গভর্নর লর্ড ও লেডি কার্জনকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এসে প্রথা অনুযায়ী লর্ড এলগিনের সঙ্গে এঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। লর্ড এলগিন অভ্যর্থনার জন্য হাত বাড়াতেই বেজে উঠল কাড়া-নাকাড়া, ভেঁপু ও জগঝম্প।

বেশ কিছুক্ষণ পর নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে, পোশাক বদলাবার জন্য লোকচক্ষুর আড়াল হতেই লর্ড কার্জন বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বোম্বাই থেকে দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় এবং বারংবার সরকারি আনুষ্ঠানিকতায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, শরীরে বিষম ব্যথা। এমন সুগঠিত শরীর, যৌবন প্রাচুর্যে

ভরপুর হলেও লর্ড কার্জন প্রায় সর্বক্ষণ একটা ব্যথায় কষ্ট পান। অল্প বয়েসে একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড চোট পেয়েছিলেন, আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না, এমনই অবস্থা হয়েছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শে এখন জাগ্রত অবস্থায় সর্বক্ষণ একটা লোহার খাঁচা তাঁর পোশাকের নীচে পরে থাকতে হয়। সেটা পরে থাকা বেশ কষ্টকর, মাঝে মাঝেই তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়, তিনি মুখ বুজে সহ্য করেন, কারুকে কিছু বুঝতে দেন না। ব্যাপারটা অতিশয় গোপন, নিজের স্ত্রী ছাড়া আর মাত্র দু'চারজন জানে। লোকজনের সমক্ষে এই ব্যথা শুরু হলে তিনি কঠিন মুখ করে থাকেন, অন্য কেউ কথা বললে হাসেন না। হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছু বলেন না। সেইজন্যই অনেকে মনে করে, এই লোকটি অতি রূঢ় এবং দাম্ভিক। এতদিনেও কেউ যে তাঁর পোশাকের নীচে ঢেকে রাখা দুর্বলতার কথা জানতে পারেনি, তার কারণ এরকম অবস্থা নিয়েও লর্ড কার্জন অসাধারণ পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন বারবার। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা চেয়ার টেবিলে বসে লিখতে থাকেন, অশ্বারোহণে বা পায়ে হেঁটে ঘুরতে দ্বিধা বোধ করেন না, দারুণ বিপদসঙ্কুল স্থানে তিনি অনেকবার গেছেন অকুতোভয়ে। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে মরুভূমি পার হয়েছেন, ঘুরেছেন পাহাড়ে-জঙ্গলে।

মেরি জিজ্ঞেস করলেন, জর্জ, তুমি এই লাটভবনটি সম্পর্কে কী বলবে বলছিলে ?

লর্ড কার্জন বললেন, এই প্রাসাদটি প্রথম দর্শনে তোমার কিছু মনে হল না ? মনে হয় নি যে, এটা ঠিক আমাদের কেড্‌লস্টন হল বাড়িটার মতন ?

মেরি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তো। দেখেই আমার মনে হয়েছিল আমাদের ওই বাড়ির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

লর্ড কার্জন হাসলেন। গভীর পরিতৃপ্তির হাসি।

সাদৃশ্যটি অবশ্যই বিস্ময়কর। মেরি কার্জন এই প্রথম ভারতে এলেন, কিন্তু লর্ড কার্জন অনেক দিন আগে ভারত ভ্রমণ করে গেছেন, কলকাতাতেও এসেছিলেন, এই সরকারি প্রাসাদটির অভ্যন্তরে এসেও ঘুরে দেখেছেন।

খুব অল্প সংখ্যক মানুষের জীবনেই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হুবহু মিলে যায়। বারো বছর আগে জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন উঠেছিলেন একটি হোটেলে। কলকাতা শহরটি তাঁর পছন্দ হয়েছিল, মনে হয়েছিল ইওরোপের কোনও শহরের মতনই, পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়। যদিও কার্জনের মতন অধিকাংশ ভ্রমণার্থীই লাল দিঘি সন্নিহিত অঞ্চল, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড ও পার্ক স্ট্রিট মিলিয়ে যে সাহেবপাড়া সেইটুকু ঘুরেই চলে যায়, এদেশের মানুষদের পল্লীগুলি কিছুই দেখে না। কার্জন তৎকালীন ভাইসরয়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করতে গিয়ে লাটভবনটির সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক প্রাসাদটির আকৃতি ও গঠনগত মিল দেখে চমকে উঠেছিলেন। কলকাতার এই প্রাসাদটির নির্মাণ শেষ হয় ১৮০৩ সালে, ইংল্যান্ডের ডার্বিশায়ারের কেড্‌লস্টন গ্রামে কার্জনদের প্রাসাদটি আরও পুরনো। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির যে স্থপতি কলকাতার এই অট্টালিকাটির নকশা বানিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই কোনও সময়ে কেড্‌লস্টনের বিখ্যাত বাড়িটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল।

সেই প্রথমবার কলকাতার এই রাজপ্রাসাদটি দেখে বেরিয়ে আসার সময় দেউড়ির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে কার্জন মনে মনে বলেছিলেন, একদিন কেড্‌লস্টন ছেড়ে আমি এই বাড়িটাতে এসে থাকব, আমি ভারতের ভাইসরয় হব !

এই আকাঙ্ক্ষা এতই অবাস্তব যে একে আকাশকুসুম রচনার পর্যায়ে ফেলা চলে। সেই সময় কার্জন ছিলেন আঠাশ বৎসরের এক যুবক, এবং একবার হেরে যাওয়ার পর সদ্য পার্লামেন্টের টোরি দলের নির্বাচিত এক অকিঞ্চিৎকর সদস্য, রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় অচেনা। সেখান থেকে ভাইসরয়ের পদ বহু দূরের পথ। মাত্র বারো বছরের মধ্যেই তবু যে কার্জনের সেই স্বপ্ন সফল হল তা যেন নিতান্তই নিয়তির খেয়ালে।

কার্জনের জীবনে নিয়তি বা ভাগ্যচক্রের ভূমিকা অনেকখানি। তা বোঝাতে গেলে অনেকখানি পিছিয়ে শুরু করতে হয়। এক প্রাচীন, অভিজাত পরিবারে কার্জনের জন্ম, বংশ লতিকাটিতে আটশো

বছর অতীতে যাওয়া যায়, সেই উইলিয়াম দা কংকোয়ারের সময়ে। কিন্তু কার্জনের পিতা কিংবা পিতামহ কেউই পরিবার-প্রধান ও জমিদারির উত্তরাধিকারী ছিলেন না। ইংল্যান্ডের আইনে শুধু জ্যেষ্ঠ পুরুষ সন্তানই সমস্ত সম্পত্তি ও বংশমর্যাদার অধিকারী হয়, অন্যান্য সন্তানেরা কিঞ্চিৎ মাসোহারা পায়, জীবিকার জন্য তাদের অন্য পেশার সন্ধান করতে হয়। কার্জনের বাবা ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান, ঠাকুরদা ছিলেন সপ্তম সন্তান।

নিয়তির খেলাটি শুরু হয় ঠাকুরদার বাবার আমলে। প্রপিতামহ সেই দ্বিতীয় ব্যারন ছিলেন বাউণ্ডুলে স্বভাবের এবং জুয়াড়ি। বিবাহের পর তাঁর একটি সন্তান জন্মেছিল কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়। তারপর তিনি প্রচণ্ডভাবে জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হলেন, এবং হারতে হারতে এমন অবস্থায় পৌঁছোলেন যে পাওনাদাররা তাঁকে প্রায় ছিঁড়ে খাবার জোগাড় করেছিল। একদিন শিশু পুত্রটিকে ফেলে, জমিদারি ছেড়ে তিনি সবার অলক্ষ্যে চম্পট দিলেন। ভাগ্যান্বেষণে তিনি ঘুরতে লাগলেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এক সময় একটি অল্পবয়েসী বেলজিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়লেন। ইওরোপে তখন নৈতিকতাবোধ অতি শ্লথ, লাম্পট্য ব্যভিচার সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে, কোনও কুমারী মেয়ে সন্তানের জন্ম দিলে কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। দ্বিতীয় ব্যারন মহাশয় তাঁর সেই প্রেমিকার গর্ভে ছ'টি সন্তান উৎপন্ন করলেন। তারপর তাঁর কী খেয়াল হল, তিনি এই প্রেমিকাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাইলেন, হামবুর্গ শহরের কাছে এক গির্জায় এঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। এর পরেও এই দম্পতির আরও চারটি সন্তান হয়, সপ্তম সন্তানটিই লর্ড কার্জনের ঠাকুরদা। তাঁর পক্ষে জমিদারির উত্তরাধিকারী হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাই থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয় ব্যারন চক্ষু বুজলে এই দশটি সন্তানকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের পুত্রটিই সবকিছু পাবার ন্যায্য অধিকারী। তিনিই হলেন তৃতীয় ব্যারন। এই তৃতীয় ব্যারন বিবাহ করেননি এবং তিনি অকালে প্রয়াত হলেন। স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী উত্তরাধিকারী তাঁর পরের ভাই। তখনই ডাক পড়ল দ্বিতীয়পক্ষের সপ্তম সন্তানের। এ পক্ষের দশটি ভাই বোনের যদিও একই পিতার ঔরসে ও একই মাতার গর্ভে জন্ম, কিন্তু প্রথম ছ'জন কুমারী মাতার সন্তান, তাই আইনের চক্ষে তারা অবৈধ। অভাবনীয়ভাবে সপ্তম সন্তানটি হয়ে গেলেন সব সম্পদের অধিকারী এবং তৃতীয় ব্যারন।

এই তৃতীয় ব্যারনের পুত্র সংখ্যা মাত্র দুটি। জর্জ এবং অ্যালফ্রেড। ছোট ভাই অ্যালফ্রেড ধরেই নিলেন তিনি সম্পত্তি পাবেন না, কোনও সুপরিচিত, ধনী বংশের কন্যাকে বিবাহ করার সামর্থ্যও তাঁর নেই। অভিজাত পরিবারের প্রথা এই যে মেয়ের বাবা বেশ কিছু টাকা যৌতুক দিয়ে মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাবে, আর স্বামীকেও দেখাতে হবে যে স্ত্রী বিধবা হলে তাকে মোটা টাকার মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা আছে। অ্যালফ্রেড তা দেখাবেন কী করে ? তাই গির্জায় যোগ দিয়ে ধর্মযাজক হলেন।

যথাসময়ে বড় ভাই জর্জ হলেন চতুর্থ ব্যারন। ইনি বিবাহ করলেন না, তার বদলে রক্ষিতা-গমন বা লাম্পট্যকে প্রশ্রয় দিলেন না, বরং হয়ে গেলেন ব্যর্থ প্রেমিক। এঁর এই ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকা নিয়ে একটি কৌতুককাহিনী প্রচলিত ছিল। কেড্‌লস্টনের এই জমিদার মহাশয় প্রায়ই চুপিচুপি চলে যেতেন লন্ডনে এবং ঘুরে বেড়াতেন হাইড পার্কের আশেপাশে। উঁচু ঘরের নারী-পুরুষরা বিকেলবেলা একবার পার্কে বেড়াতে আসবেনই, এটা একটা সামাজিক কেতা। হাইড পার্কের এক অংশে ধনী ও বিলাসী পরিবারের নারী পুরুষদের নিত্য আনাগোনা। মেয়েরা তাদের শ্রেষ্ঠ পোশাকে, দারুণ প্রসাধনে সেজেগুজে রঙিন ছাতা নিয়ে ঘোরে, কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছড়ায়। কুমারীরা অবিবাহিত যুবকদের দিকে নয়নবাণ হানে। যুবকেরা ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বন করে বিভিন্ন ওষ্ঠের মধু পান করে।

এদের থেকে একটু দূরে কোনও গাছের আড়ালে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করেন জর্জ ন্যাথানিয়েল স্কারসডেল। তিনি যৌবনবয়েসী হলেও এখানে সমাগত রূপসীদের সঙ্গে মেলামেশা, এমনকী কথা বলতেও যান না। তিনি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন শুধু একজনই রমণীর দিকে। এই রমণীর তিনি প্রণয়প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু সে বরমাল্য দিয়েছে অন্য এক জনের কণ্ঠে। সেই ব্যর্থতার জ্বালা জর্জ ন্যাথানিয়েল ভুলতে পারছেন না, বারবার সেই পূর্ব প্রেমিকাকেই দেখতে আসেন, এখনও

তাঁর কৃপা পাবার আশা ত্যাগ করেননি। কেড্‌লস্টনের চতুর্থ ব্যারন সামান্য কোনও বঞ্চিত কবির মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন দূর থেকে।

এই কৌতুককাহিনীর শেষ পরিণতি অবশ্য খুবই করুণ। অনেক দিনই মনে হত, সেই প্রেমিকাটি যেন জর্জ ন্যাথনিয়েলকে দেখেও দেখতে পেত না। হঠাৎ একদিন যেন জর্জের মনে হল, তাঁর হৃদয়েশ্বরী একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে ফিক করে হেসেছে এবং ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার সময় তাঁর উদ্দেশে হাতছানি দিয়েছে। তা দেখে এমনই অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি যে প্রত্যুত্তর দেবার কথাও মনে পড়ল না। যখন খেয়াল হল, তখন গাড়িটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ অন্ধের মতন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন সেদিকে। একটা গাছের ডালে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল, সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মৃত্যু।

অকস্মাৎ গ্রহের ফেরে ধর্মযাজক অ্যালফ্রেড হয়ে গেলেন কেড্‌লস্টনের প্রাসাদ-জমিদারির মালিক এবং পেয়ে গেলেন লর্ড খেতাব।

এইসব নাটকীয় ঘটনাবলি ঘটে গেছে কার্জনের জন্মের আগে। তিনি তাঁর পিতার প্রথম সন্তান। বড় ভাইয়ের স্মৃতিতে অ্যালফ্রেড তাঁর এই পুত্রটির নাম রেখেছেন জর্জ। অল্প বয়েস থেকেই এই বালকটি জানে, সে এই পারিবারিক সম্পত্তির ভবিষ্যৎ-অধিকারী। অভিজাত সমাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য অন্যান্য ভাইবোনের তুলনায় কার্জনের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হল। পিতা কিছুটা স্বভাবকৃপণ হলেও এই ছেলের নানারকম দাবি ও আবদার প্রায় সবই মেনে নেন। অতি সুদর্শন ও তেজি বালকটিকে সকলেই পছন্দ করে।

অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় কার্জনকে। প্রথমে হ্যাম্পশায়ারের উইক্সেনফোর্ড স্কুলে, তারপর প্রখ্যাত ইটন-এ। এই ইটনের ছাত্ররাই প্রাপ্ত বয়েসে ইংলন্ডের রাজনীতি ও সমাজজীবনে শীর্ষ স্থান দখল করে, সমসাময়িককালে অন্তত চারজন প্রধানমন্ত্রী এই স্কুলের ছাত্র। ইটন স্কুলের চত্বর সুবিস্তৃত হলেও প্রাচীর বেষ্টিত, ছাত্ররা এই দেয়ালঘেরা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, বাইরের জগতের বিশেষ কিছুই তাদের জানতে দেওয়া হয় না। লেখাপড়া ছাড়াও তাদের শেখানো হয় শিষ্টাচার, আভিজাত্যের গরিমা, স্বাজাত্যবোধ এবং কিছু কিছু কুসংস্কার, যেমন সারা পৃথিবীতে ইংরেজরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। নানান কূটকৌশলে এবং অস্ত্রের জোরে বিভিন্ন দেশ জয় করে যে সাম্রাজ্য বানানো হয়েছে, সেটা নিছক পররাজ্যলোলুপতা নয়, সেটা ইংরেজ জাতির পবিত্র অধিকার। অশ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি শিক্ষাদীক্ষাহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত, শারীরিকভাবে দুর্বল, বর্বর সামাজিক প্রথা মেনে চলে, ধর্মের পথে কদাচারে মেতে থাকে, নিজেদের দেশ পরিচালনার ক্ষমতা নেই, সেই জন্যই তো এদের সুশৃঙ্খলভাবে শাসনের ভার বর্তেছে ইংরেজদের ওপর। এটা একটা মহান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব, এই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়াও যে-কোনও ইংরেজের পক্ষে গৌরবের ব্যাপার।

ইংরেজরা ইওরোপীয় জাতি হলেও, যে-হেতু দ্বীপবাসী, তাই অন্যান্য ইওরোপীয় রাজ্যগুলি থেকে অনেকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। অন্য কোনও ইউরোপীয় রাজ্যের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব নেই। বিশ্বজয়ের শক্তি পরীক্ষায় ইংরেজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফরাসিরা, ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করার পর সেই ফরাসিদেরও মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। ভারতে ফরাসিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে বলা যায়, এখন সেখানে তারা কোণঠাসা। ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে এখন একমাত্র রাশিয়া সম্পর্কেই খানিকটা উদ্বেগের কারণ আছে, কিন্তু রাশিয়াও এখন দূর প্রাচ্যে জাপানকে নিয়ে বিব্রত। জাপানিরা এশীয় জাতি হলেও তারাও দ্বীপবাসী, বাকি এশীয়দের সঙ্গে তাদের চরিত্রগত তফাত আছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মানুষরা অসঙ্ঘবদ্ধ, কাপুরুষ, মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে না, কিন্তু আত্মাভিমানী জাপানিরা রাশিয়ার মতন এক প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে উদ্যত হয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ এখন ইংরেজদের অধীনে। এই জাতির ইতিহাসে এমন সুসময় আগে কখনও আসেনি। শুধু অস্ত্রের জোরই নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যেও তাদের আধিপত্য অবিসংবাদিত। তারা আবিষ্কার করেছে স্টিম ইঞ্জিন, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রেললাইন

বসাচ্ছে চতুর্দিকে, সেতু নির্মাণের কৃতিত্বে অনেক দুর্গম হয়েছে সুগম। মহারানি ভিক্টোরিয়ার মাথার মুকুটে উজ্জ্বলতম রত্নটির নাম ভারতবর্ষ।

ইটন থেকে কার্জন চলে আসে অক্সফোর্ডের বেলিওল কলেজে। ছাত্র হিসেবে মেধাবী কিন্তু কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্দান্ত প্রকৃতির, পোশাক-পরিচ্ছদ, শৌখিন মুখমণ্ডলে আভিজাত্যের গরিমা, সে যে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। বিতর্ক সভায় সে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ছাত্র রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের পাণ্ডা হয়ে ওঠে। ইংলন্ডে তখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন গ্ল্যাডস্টোন, কার্জন ডিজরেইলির সমর্থক। তখন থেকেই কার্জনের একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে একমাত্র অভিজাত শ্রেণীই দেশ ও সাম্রাজ্যের শাসনভার পাওয়ার উপযুক্ত। শ্রেণী স্বাতন্ত্র্যে সে ঘোর বিশ্বাসী। লন্ডনের জাঁকজমকের তুলনায় ইংল্যান্ডের গ্রামগুলি অনেক নিষ্প্রভ, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য রয়েছে যথেষ্ট। কার্জনের ধারণা, চাষা-ভুষো, শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা যে যার জায়গাতেই থাকবে, সেটাই তাদের নিয়তি। আর অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, স্বাভাবিকভাবেই দেশশাসনের দায়িত্ব তারাই নিয়ে থাকবে।

কলেজ ছাড়ার পর প্রথমবার পার্লামেন্টের নির্বাচনে কার্জন হেরেছিলেন কারণ সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞানই ছিল না। কেড্‌লস্টন হলের ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর মতন একজন পুরুষ সভাস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেই প্রজারা আভূমি নত হবে। কিন্তু দিনকাল বদলে যাচ্ছে। ডিজরেইলি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নানা কারণে রক্ষণশীল দল অনেকখানি জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। এর মধ্যে ভোটারের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই কার্জনদের প্রজা নয়। বক্তৃতামঞ্চে উঠে কার্জন দেখলেন, সামনে যত রাজ্যের কুলি আর কারখানার মজুর বসে আছে, তাদের কালিঝুলি মাখা চেহারা, তাদের মুখে কোনও শ্রদ্ধার ভাব নেই। অক্সফোর্ডের এই নামকরা ছাত্রটির উচ্চাঙ্গের বাগ্মিতার তারা মূল্যই দিল না।

সাতাশ বছর বয়েসে, দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে জয়ী হলেন কার্জন। ইংলন্ডের ভোটদাতাদের স্বভাবই এই, তারা এক জনকে বেশি দিন ক্ষমতায় রাখে না। উদারনৈতিক গ্ল্যাডস্টোনের পতনের পর এখানে এখন রক্ষণশীল হাওয়া বইছে, তাতেই কার্জন পার হয়ে গেলেন, এবং দলনেতা লর্ড সল্‌সবেরির সহকারী ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ চালাতে লাগলেন।

কার্জন তাঁর শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে সাম্রাজ্যবাদী। ধর্মচিন্তা কিংবা নারীকে জয় করার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও সাম্রাজ্য সুরক্ষার দায়িত্ব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে দায়িত্ব এই তরুণ পার্লামেন্টারিয়ানকে কেউ দেয়নি, তিনি নিজেই সেটা নিয়ে বসে আছেন। সাম্রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোনওরকম নমনীয়তা প্রদর্শন তাঁর মনঃপূত নয়। সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা দেখার জন্য তিনি নিজের উদ্যোগে বেরিয়ে পড়লেন ভ্রমণে। ভারতে এসে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর মনে হল, এই বিশাল জনবহুল দেশটির যা-কিছু উন্নতি ঘটছে তা ব্রিটিশদেরই উদ্যোগে। কলকাতা তো এশিয়ার বুকে বসিয়ে দেওয়া একটা ইওরোপীয় শহর। এই দূরদেশের যেখানেই নিজ জাতির কোনও কীর্তিস্তম্ভ দেখেন, তাতেই তাঁর মন ভরে যায়। একমাত্র আগ্রার তাজমহল দেখে তিনি থমকে গিয়েছিলেন, তাজমহলের সৌন্দর্য যেন অপার্থিব। ইংলন্ড বা ইওরোপের কোনও কীর্তির সঙ্গে এর তুলনাই চলে না। তাজমহল সম্পর্কে কার্জন আগেই অনেক কিছু শুনেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল, সেটি বড় জোর স্পেনের আলহামব্রা প্রাসাদের মতন হবে। কিন্তু স্বচক্ষে দেখার পর তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, নাঃ, এ যে অতুলনীয়, অবর্ণনীয়!

কিন্তু ইংরেজদের সাহায্য ছাড়াই ভারতীয়রা এমন একটা বিস্ময়কর শিল্প গড়তে সক্ষম হয়েছিল এটা কার্জনের ঠিক মানতে ইচ্ছে করে না, স্মৃতি সৌধটিতে কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটি ইংরেজ সংযোগ আবিষ্কার করলেন। তাজমহল সংলগ্ন উদ্যানটির সংরক্ষক একজন শ্বেতাঙ্গ, কার্জন আলাপ করে জানলেন যে সে ইয়র্কশায়ারের লোক, তার নাম স্মিথ, সে কুড়ি বছর ধরে উদ্যানটি দেখাশুনো করছে। কার্জন উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বাগানটিতে তাজমহলের সৌন্দর্য অনেক বেশি খুলেছে, একজন ইংরেজের হস্তক্ষেপের জন্যই তো তাজমহল এত দর্শনীয়।

শুধু ভারত নয়, দুর্গম আফগানিস্তান, বোখারা, কোরিয়া, কম্বোডিয়া, আন্নাম, হংকং, মধ্য এশিয়া, পারস্য, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি দেশে কার্জন পাড়ি দিয়েছেন একাধিকবার। অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন শারীরিক কষ্ট। আতিথ্য পেয়েছেন এক একটা দেশের রাজা বা সুলতান বা প্রধানমন্ত্রীর আলয়ে। কার্জনের তেমন কিছু পদমর্যাদা না থাকলেও তাঁর কন্দর্প-কান্তি ও রাজকীয় হাবভাব দেখে সবাই মুগ্ধ। কথিত আছে, কোরিয়ার এক মন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহাশয়, আপনি কি ইংলন্ডের রানির পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত? কার্জন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, না। তবে আমি এখনও বিয়ে করিনি!

মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা এবং রাশিয়ার আগ্রাসী শক্তি কতখানি তা পর্যবেক্ষণ করে কার্জন একাধিক বই লিখেছেন। 'রাশিয়া ইন সেন্ট্রাল এশিয়া,' 'প্রবলেমস অফ দা ফার ইস্ট', 'পারশিয়া অ্যান্ড দা পারশিয়ান কোয়েশ্চেন', এর মধ্যে শেষোক্ত বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা তেরো শো।

এই সব ভ্রমণ অভিযান ও কেতাব রচনার সুফলও তিনি পেয়েছেন যথা সময়ে। স্ত্রীভাগ্যেও তিনি বিশেষ সৌভাগ্যবান। অল্প বয়েস থেকেই কার্জনের প্রতি অনেক মহিলা ও পুরুষ আকৃষ্ট হয়েছে। ইটন স্কুলে পড়ার সময় একজন শিক্ষকের সঙ্গে তার অতি ঘনিষ্ঠতা নিয়ে অনেক গুজব ছড়িয়েছিল। প্রখ্যাত লেখক এবং শেষ জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বিত ও এক কলঙ্কজনক অভিযোগে অভিযুক্ত অস্কার ওয়াইল্ডও তরুণ কার্জনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বড় ঘরের মহিলারা কার্জনকে দেখে প্রায় মূর্ছা যেত। অনেক রূপসী রমণীর সঙ্গেই কার্জনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যারা জীবন সম্পর্কে পরিকল্পনা ছকে রাখে, তারা হুট করে আবেগের মাথায় বিয়ে করে না, প্রেমকেও প্রাধান্য দেয় না। কার্জনের পারিবারিক বংশগৌরব যতখানি, তত অর্থসম্পদ নেই। এই সব অভিজাতরা স্ত্রীভাগ্যে ধন কথাটায় খুব বিশ্বাসী।

কার্জনের স্ত্রী মেরি আমেরিকান। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকায় ধনীর সংখ্যা প্রচুর। সেই সব ধনীদের সন্তানেরা যদৃচ্ছ অর্থ ব্যয় করে বিলাসী জীবনযাপন করতে পারে, কিন্তু যতই অর্থ থাকুক, দু'-এক পুরুষে বংশগৌরব পাওয়া যায় না। আমেরিকার ধনী দুহিতারা ইওরোপে এসে কোনও পড়ন্ত বনেদি বংশের যুবককে বিবাহ করে লেডি কিংবা কাউন্টেস হবার জন্য খুবই লালায়িত। লন্ডনে এক পার্টিতে মেরির সঙ্গে কার্জনের প্রথম দেখা, তারপর বছর পাঁচেক ধরে ইওরোপে ও আমেরিকায় কয়েকবার সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্র বিনিময়ের পর কার্জন মনস্থির করলেন এবং অনেক ইংরেজ কুমারীর বুক শেলবিদ্ধ করে কার্জন এই আমেরিকান যুবতীটিকেই পত্নী হিসেবে নির্বাচন করলেন।

মেরির পিতা আমেরিকার এক ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী। মেরিও চমকপ্রদ রকমের রূপসী। একেবারে যেন রাজযোটক, স্বামী ও স্ত্রী দু'জনে— যা চেয়েছিলেন, ঠিক তাই পেলেন। মেরি তার পিতার কাছ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ পাউন্ড যৌতুক পেল; শ্বশুর তাঁর জামাতার জন্যও পাঁচ শো পাউন্ড মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন আজীবন। তিনি চান, লন্ডনের উচ্চ সমাজে মেলামেশা করার জন্য কন্যা জামাতাকে যেন কখনও কার্পণ্য না করতে হয়।

কার্জন ততদিনে বৈদেশিক দফতরে আন্ডার সেক্রেটারির পদে উন্নীত হয়েছেন মাত্র। সুতরাং ভারতের ভাইসরয় পদ থেকে লর্ড এলগিনের অবসর নেবার সংবাদ যখন প্রচারিত হল, তখন সেই পদের জন্য দাবিদার অনেক, এবং তাঁরা সবাই কার্জনের চেয়ে উচ্চপদস্থ। এমনকী মহারানির এক নাতিও এই পদের প্রার্থী। ইংলন্ডের রাজা-রানি ও প্রধানমন্ত্রীর পরেই ভারতের ভাইসরয়ের পদটি গুরুত্বপূর্ণ। বয়েস এবং পদমর্যাদার দিক থেকে কার্জনের দাবি নগণ্য হলেও অন্য এক দিক থেকে কার্জন নিজেকে যোগ্য করে তুলেছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী সল্সবেরিকে চিঠি লিখে আবেদন জানালেন, আমি দশ বছর ধরে ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছি, চারবার সে দেশে গিয়ে ঘুরে ঘুরে স্বচক্ষে দেখেছি, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির শাসকদের সঙ্গেও আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, ভারত শাসনের জন্য এইসব কি খুব প্রয়োজনীয় নয়?

বিবাহের পর কার্জন এত বড় বড় সব পার্টি দিয়েছেন যে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সবাই তাঁকে

চেনে, স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ পেয়ে মহারানি ভিকটোরিয়াও একবার এই দম্পতিকে দেখতে চাইলেন। ভাইসরয়ের পত্নীকেও নানা রকম আদব-কায়দা পালন করতে হয়, এই আমেরিকার মেয়েটি তা পারবে তো? মেরির সঙ্গে কথাবার্তা বলে মহারানি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। মেয়েটি সুন্দরী তো বটেই, বুদ্ধিও আছে। অন্যান্য প্রার্থীদের স্তম্ভিত করে ঘোষিত হল কার্জনের নাম।

ভারত সাম্রাজ্যে ভাইসরয় সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি। কিন্তু লন্ডন থেকে কলকাতা প্রায় সাত হাজার মাইল দূরে। এখানে ভাইসরয়ই যেন সম্রাট। কার্জন এক সময় নিজের কাছে শপথ করেছিলেন, কলকাতার এই লাটভবনে আমি অধিষ্ঠান করব। নিয়তির দুর্জ্ঞেয় খেলায় সে শপথ পূর্ণ হয়েছে। আজ কার্জন একজন পরিতৃপ্ত মানুষ। আসমুদ্র হিমাচলের রাজকর্মচারীরা টের পাবে ক'দিনের মধ্যেই যে কে এসেছে ভাইসরয় হয়ে। সাম্রাজ্য শাসনে তিনি কারুকেই এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল হতে দেবেন না।

সকালবেলা পাশাপাশি দুটি ঘোড়ায় চেপে সস্ত্রীক কার্জন চলে আসেন ময়দানে। লন্ডনের হাইড পার্কের মতনই এক বিশাল প্রান্তর সবুজ, অল্প অল্প কুয়াশা মাখা, দূরের গাছপালাগুলিকে অরণ্যের মতন মনে হয়। এই দম্পতির সঙ্গে থাকে শুধু কয়েকজন পার্শ্বচর। এ সময়ে কোনও স্থানীয় মানুষদের ময়দানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

খানিকক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে এঁরা শীত কাটিয়ে নেন, তারপর গঙ্গার ধারে এসে নদীর শোভা দেখেন। মেরিকে একটা একটা করে দ্রষ্টব্য স্থান চিনিয়ে দেন তাঁর স্বামী। নদীটি বড় সুন্দর। স্টিমার যাওয়া-আসা করছে অনবরত, ছোট ছোট দিশি নৌকোগুলি ঢেউয়ের সঙ্গে দোল খায়। অস্পষ্টভাবে শোনা যায় সেইসব নৌকোয় মাঝিদের গান।

একদিন বেশ খানিকটা দূরে চলে যাওয়া হল। খিদিরপুর ছাড়লেই আর জনবসতি নেই, বেশ জমাট জঙ্গল। এখানে নানারকম জন্তু-জানোয়ার আছে, শিয়াল প্রচুর। শিকার করা যায় না? দেহরক্ষীরা জানাল, অবশ্যই যায়, অনেক প্রধান প্রধান রাজপুরুষ এখানে শিকার করে গেছেন, বিশেষত শিয়াল-শিকার ইংরেজদের প্রিয় ব্যসন। তবে লর্ড এলগিন শিকার পছন্দ করতেন না। কার্জন বললেন, তা হলে শীঘ্রই এখানে একদিন শিকারে আসতে হবে।

এক জায়গায় গোটা দশ-বারোজন লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে একজন লোক হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে। সাহেব সম্প্রদায়কে দেখেই বক্তাটি থেমে গেল, অন্যান্যরা জড়ামড়ি করে ভিতু চোখে চেয়ে রইল।

মেরি কৌতূহলী চোখে তাদের দেখলেন। এই শীতের মধ্যেই কেউ কেউ পরে আছে শুধু ধুতি, একদিকের খুঁট গায়ে জড়ানো, কেউ কেউ বুকে জড়িয়ে রেখেছে একটা গামছা। এরকম বিচিত্র শীতের পোশাক মেরি আগে কখনও দেখেননি। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকগুলি কী জাত?

কার্জন বললেন, প্রিয়তমে, আমরা এখন বেঙ্গলে আছি, এই লোকগুলিকে বলে বাঙালি।

তারপর ঈষৎ নাসিকা কুঁচকে আবার বললেন, পুরুষগুলোকে দেখো, পুরুষোচিত কোনও ভাবই নেই। ওদের দিকে তাকাতেই বিশ্রী লাগে। এই বাঙালিরা আর কিছু পারে না। শুধু সর্বক্ষণ বকবক করে। চলো, ফেরা যাক।

দুটি তেজোবান অশ্ব ধুলো উড়িয়ে চলে গেল ময়দানের দিকে।

৫২

মানুষ সবচেয়ে কম দেখে নিজেকে। প্রতিদিন দর্পণে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালেও মানুষ লক্ষ করে না নিজের পরিবর্তন। শুধু আকৃতি নয়, মানুষের প্রকৃতিও যে অনেক বদলে যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তা যেন মানুষ ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না। নিজের মনের গহনে ডুব দিতে অধিকাংশ মানুষই ভয় পায়। মানুষের জীবনে যৌবনই শ্রেষ্ঠ সময়, তবে যৌবনকালে মনে হয় বুঝি যৌবনই চিরস্থায়ী।

পাটনায় রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে ভরত দেখতে পায় তার পূর্বপরিচিত গাছগুলি অনেক বড় হয়ে গেছে, গোলঘরের কাছে একটি মস্ত ডালপালা মেলা গুলমোর বৃক্ষ ছিল, সেটি আর নেই। আর একটা বাজ-পড়া মৃত গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যে কী গাছ ছিল ভরতের মনেই পড়ে না। কিছু কিছু সুদৃশ্য প্রাসাদের দেয়ালগুলি এখন মলিন। আবার কোথাও বস্তি-মহল্লা বিধ্বস্ত করে গড়ে উঠেছে নতুন অট্টালিকা। অনেক পরিচিত মানুষের মুখে পড়েছে বয়েসের ছাপ। একদিন বিষ্ণু সহায়কে দেখে সে দারুণ চমকিত হয়েছিল। লয়েডস ব্যাঙ্কের এই ক্যাশিয়ারটি ছিলেন এক হাসিখুশি, তৃপ্ত মানুষ। অনেকগুলি পুত্র-কন্যার জনক, স্বাস্থ্যটি বেশ ভাল ছিল, পারিবারিক ধনসম্পদ প্রচুর, ব্যাঙ্কের ওই চাকরি ছিল তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তির অঙ্গ। ওই বিষ্ণু সহায়জির বাড়িতে ভরত কতদিন ভূরিভোজন করে এসেছে। সেই মানুষটির এত পরিবর্তন! সমস্ত শরীর যেন একটা বৃহৎ বেলুনের মতন ফুলে গেছে, পেটটি একটি জালার মতন, নিজের নাভি নিজে ছুঁতে পারবেন কি না সন্দেহ। তিনি ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসছেন। দু'জন লোক ধরে ধরে নিয়ে আসছে, অপেক্ষমাণ টাঙ্গায় তাঁকে তুলে দিতে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, বিষ্ণু সহায় পা তুলতেই পারেন না, সহকারী দু'জনের গলদঘর্ম অবস্থা, ঘোড়াটা পর্যন্ত চি হি হি হি করে ডেকে উঠল। এই অবস্থাতেও বিষ্ণু সহায় চাকরি করতে আসেন সেটা যেন আরও বিস্ময়কর।

পুণা শহরে জেল থেকে বেরিয়ে মস্তক মুণ্ডন করেছিল, এখন আবার চুল গজিয়ে গেছে, তবে পূর্বের মতন টেরি কাটে না, বাবরি রেখেছে। গোঁফটিও মোটা। নানান অভিজ্ঞতার পরতে পরতে তার মুখে সারল্য ও বিস্ময়বোধ চাপা পড়ে গেছে। শরীরে মেদ নেই, তাকে দেখলেই বলশালী পুরুষ বলে মনে হয়। কোনও মানুষকে সে সহজে বিশ্বাস করে না। সদ্য পরিচিতদের সঙ্গে ভরত কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে, পূর্বপরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়নি।

তার জীবিকার সমস্যা খুব সহজেই মিটে গেছে। সে ইংরিজি জানে এবং ব্যাঙ্কের কাজকর্মে রীতিমত অভিজ্ঞ। তার পক্ষে একটা চাকরি জুটিয়ে নেওয়া শক্ত ছিল না, দু'-একটি ব্যাঙ্কের নতুন নতুন শাখা এখানে খোলাও হচ্ছে, কিন্তু ভরতের আর চাকরি করার মন নেই। সে সংসারী নয়, খুব বেশি অর্থেরও প্রয়োজন নেই তার, তা হলে প্রতিদিন দশটা-পাঁচটার দাসত্ব করতে যাবে কেন? পাটনায় অনেকগুলি চালের আড়ত, বহু লোক চালের ব্যবসায়ে যুক্ত। সারা দেশে এখন দুর্ভিক্ষের অবস্থা, সেই জন্যই চাল-ব্যবসায়ীদের লাভের অন্ত নেই, ভরত একবার ভেবেছিল তার যাবতীয় মূলধন বিনিয়োগ করে এই ব্যবসায় নেমে পড়বে। দু'-চারদিন চালের বাজারে ঘোরাঘুরি করে তার এই ইচ্ছেটাও মিলিয়ে গেল। দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে মানুষ মরছে, আর ব্যবসায়ীরা ধান-চাল গুদামজাত করে রেখে অনবরত দাম বাড়াচ্ছে। ভরতের অত লাভের স্পৃহা নেই, সে শত শত মানুষের শেষনিশ্বাস কেড়ে নিতে চায় না। বাল্যকালে সে দেখেছে, ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ হলে রাজবাড়ি থেকে বিনামূল্যে শস্য বিতরণ করা হত, মন্দিরে মন্দিরে বহু মানুষের জন্য খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা হত,

এখানে সে রকম কোনও উদ্যোগ নেই। এ শহরের পথে পথে এখন অসংখ্য ভিখারি।

ব্যাঙ্কে কাজ করার সময় ভরত অনেক ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে এসেছিল। সে দেখেছিল, ব্যবসায়ীরা অনেক উপার্জন করে বটে, কিন্তু নিজেরা কিছু ভোগ করতে পারে না। কী করে আরও বেশি লাভ হবে, এটাই তাদের প্রধান চিন্তা। চাকুরিজীবীরা দশটা-পাঁচটায় শ্রম দেয়, আর ব্যবসায়ীরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজের কাজেই বন্দি।

পাটনা শহরে নিত্য-নতুন স্কুল গজাচ্ছে। তার মধ্যে অনেকগুলি পুরোপুরি স্কুল নয়, সব বিষয় পড়ানো হয় না, শুধু কথ্য ইংরিজি শেখাবার ব্যবস্থা। সেখানকার ছাত্ররা সব বয়স্ক পুরুষ। চতুর্দিকে এখন ইংরিজি শেখার হুজুগ। যারা কখনও স্কুল-কলেজে পড়েনি কিংবা টোল-মাদ্রাসায় পাঠ নিয়ে শিক্ষিত হয়েও ইংরিজি শেখেনি, অথচ নানা রকম বৈষয়িক কর্মের সঙ্গে যুক্ত, তারা এখন দেখছে যে সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সব সময় কর্মচারী-নির্ভর হতে হলে সমূহ ক্ষতি। কর্মচারীরা সত্য-মিথ্যা কখন কী বুঝিয়ে দেয়, তার ঠিক নেই। কোনও সংস্থায় মালিক হিসেবে সাহেবদের সামনে দাঁড়িয়ে দু'-চারটি ইংরিজি বাক্য বলতে পারলে মর্যাদা বাড়ে, সাহেবরা পিঠ চাপড়ে দেয়।

আধা-ফিরিঙ্গি, ট্যাঁস-ফিরিঙ্গিরা কলকাতা থেকে এসে পাটনার মতন শহরগুলিতে এই ধরনের কথ্য ইংরিজি শেখাবার স্কুল খুলে প্রচুর আয় করছে। অ্যান্ড্রুজ সাহেবের স্কুলের এমনই রমরমা যে সেখানে ভর্তি হতে গেলে ছ' মাস অপেক্ষা করতে হয়। কয়েকটা স্কুল ঘুরে দেখার পর ভরত নিজেই একটা স্কুল খুলে ফেলল। ছাব্বিশ টাকায় সে ভাড়া নিল একটি দোতলা বাড়ি, এক তলায় পড়াবার ব্যবস্থা, ওপরে তার বাসস্থান। বাইরের সাইনবোর্ডে সে নিজের নাম লিখল, ভরতকুমার সিংহ, বি-এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। একে তো সে সত্যি সত্যি বি-এ পাস, তায় প্রেসিডেন্সি কলেজের গন্ধ, অচিরেই আকৃষ্ট হল অনেক ছাত্র।

ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ভরতের চেয়ে বয়েসে বড়। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ মহাজন, কেউ জমিদার তনয়। বিচিত্র তাদের পোশাক। দু'জন টিকি ঝোলানো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও নিয়মিত আসেন। পাটনা শহরে গো হত্যার প্রশ্নে দু'-একবার দাঙ্গা হয়েছে বটে, তবু হিন্দু-মুসলমানের বিভেদরেখা প্রকট নয়। সামাজিক স্তরে মেলামেশা আছে, বাংলার মতন এখানে ছুঁৎমার্গ নেই, হিন্দু-মুসলমান সহজ ভাবেই পাশাপাশি বসে। ভরতের ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান। ইংরিজি শিক্ষায় মুসলমানরাই বেশি পিছিয়ে আছে।

বয়স্ক ছাত্রদের পড়ানো মোটেই সহজ কাজ নয়। কিছুতেই জিভের আড় ভাঙতে চায় না, এ অক্ষরটিই উচ্চারণ করতে পারে না কিছুতে। ব্যাট, ক্যাট, র‍্যাট-এর উচ্চারণ হয় বলবে র‍্যায়ট্টা, ক্যায়ট্টা, ব্যায়ট্টা; অথবা বেট, কেট, রেট।

ভরত ধৈর্য হারায় না। সে মজা পায়। তার মনে পড়ে, শশিভূষণ মাস্টারমশাই তাকে কত যত্ন করে শিখিয়েছেন। অনেক দিন পর্যন্ত সে বাংলা ভাষা ভালই পড়তে-লিখতে জানত, ইংরিজির জ্ঞান এক অক্ষরও ছিল না। শশিভূষণই তার ইংরিজি শিক্ষার ভিত তৈরি করে দিয়েছেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই ভরতের স্কুল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু ভরত আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে, ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশের বেশি হবে না। সকালবেলা শুধু নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত দু' দফায় ক্লাস, তারপর স্কুল বন্ধ, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা সে নিজের জন্য রাখতে চায়। বেতন পাঁচ টাকা, পঞ্চাশ জন ছাত্রেই তার উপার্জন যথেষ্ট, আর বেশি তার চাই না। এতেও তার বেশ কিছু অর্থ জমে যেতে লাগল, কারণ ছাত্ররা শুধু বেতন দেয় না, শিক্ষককে কিছু না কিছু গুরুপ্রণামি বা উপঢৌকন দেবার প্রথা এখনও বজায় আছে। কেউ নিয়ে আসে এক কাঁদি কলা, কেউ এক হাঁড়ি প্যাঁড়া বা বরফি, কেউ এক বস্তা দাদখানি চাল, একজন প্রথম দিন এসে ভরতের পায়ের কাছে একটি আকবরি মোহর রেখে প্রণাম করেছিল। নাগরার জমিদার জগদেও বাহাদুর লোক মারফত বলে পাঠালেন যে ভরত যদি স্কুলের অন্যান্য ছাত্রদের বাদ দিয়ে শুধু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে পড়ায়, তা হলে তিনি মাসিক তিনশো টাকা দিতে রাজি আছেন। ভরত সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, সেও তো এক ধরনের চাকরি।

ছাত্ররা সবাই বিবাহিত, কুড়ি-একুশ বছরের মধ্যে বিবাহ হয় না এমন যুবক এ রাজ্যে দুর্লভ। অনেকেরই দশ-বারো বছর বয়েসের মধ্যেই ও কাজটা সেরে ফেলা হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেকেরই পত্নীর সংখ্যা একাধিক, অর্থবল থাকলে এর পরেও থাকে রক্ষিতা। ভরতের স্ত্রীও নেই, রক্ষিতাও নেই, নারীসঙ্গবিহীন জীবন সে কী করে কাটায় দিনের পর দিন, তার ছাত্রদের কাছে এ এক বিস্ময়। কেউ কেউ সরাসরি প্রশ্নও করে ফেলে, ভরত উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। প্রশ্নকারীদের মনোভাব এরকম যে, ভরত ইচ্ছা প্রকাশ করলে তারা তাদের কৃপাধন্য কোনও নারীকে এখনই শিক্ষক মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

নীচের তলার জন্য চেয়ার বেঞ্চি কিনতে হয়েছে, ওপর তলায় একটি চৌকি ছাড়া কোনও আসবাব নেই। জল তোলা, রান্না করার জন্য ভরত একজন লোক রেখেছে। বিকেল-সন্ধ্যা-রাত্তিরে ভরতের কোনও কাজ নেই, কিন্তু এই সময়টা সে নিজের জন্য কী ভাবে ব্যয় করবে, তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি।

মাঝে মাঝে সে সূর্যাস্তের সময় গঙ্গার ধারে বসে থাকে। প্রবাহিত জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে চেষ্টা করে নিজের ভবিষ্যৎ। স্কুলের পরিকল্পনাটি সফল হয়েছে, তার গ্রাসাচ্ছদনের কোনও অভাব হবে না, কিন্তু এই ভাবেই কি কেটে যাবে সারা জীবন? মৃত্যু তাকে তাড়া করেছে বারবার, অহেতুকভাবে সে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়েছে, আবার এ কথাও ঠিক, প্রত্যেকবারই সে আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছে। ঈশ্বর নামে যদি কেউ থেকেও থাকেন, তা হলে সেই ঈশ্বরের যেন জাতক্রোধ আছে ভরতের ওপর। কেন ভরতের স্বপ্নসৌধ তিনি চুরমার করে দেন প্রত্যেকবার? দুর্বলচিত্ত ভক্তরা বলবে, এ সবই হল ঈশ্বরের পরীক্ষা! কীসের পরীক্ষা? কোনও নির্দোষ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়াটা পরীক্ষা, না নিষ্ঠুর খেলা? মহিলামণিকে অকালে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল কেন? ভরত তার চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখেনি, নিজে সে মন্দিরে-মন্দিরে হত্যে দিয়েছে, কোনও দেব-দেবীর কাছেই সে কাতর মিনতি জানাতে বাকি রাখেনি, তবু মহিলামণি বাঁচল না। না, এসব যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনা, গুরুর কৃপা, এ সবই মিথ্যে। বহু তীর্থস্থানে, বহু দেবালয়ে ঘুরেছে ভরত, এই পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে আর কোনও চিহ্ন সে দেখতে পায়নি। ঈশ্বর যদি তাকে নিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন, ঈশ্বরকেও কম পরীক্ষা করেনি সে!

হঠাৎ যেন বড় বেশি নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসেছে ভরতকে। অতি নিঃসঙ্গ মানুষরাই ধর্ম এবং ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরতে চায়। যুক্তি যখন সান্ত্বনা দিতে পারে না, অন্ধ বিশ্বাস তখন আশ্রয় দেয়। ভরত কিছুতেই যুক্তি বিসর্জন দিতে পারবে না। কলেজের বন্ধু ইরফানের কাছে সে ডারউইন সাহেবের তত্ত্বের কথা শুনেছিল, এখন ক্রমশ তার মনে হয় সেই তত্ত্বই বিশ্বাসযোগ্য। এই বিশ্বের সব কিছুই পদার্থের বিবর্তন। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেননি, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। ডানাওয়ালা ঘোড়া, অগ্নিস্রাবী ড্রাগন, সমুদ্র লঙ্ঘনকারী হনুমানের মতনই ঈশ্বর এক কাল্পনিক প্রাণী।

মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়। পুরুষ চায় নারীকে, নারী চায় পুরুষকে। আসঙ্গলিপ্সা ভরতকে প্রায়ই উতলা করে। সে কি আবার বিয়ে করবে? ভূমিসূতার জন্য তার বুক এখনও মাঝে মাঝে টনটন করে। কিন্তু সে জানে ভূমিসূতাকে আর পাবার আশা নেই, সে হারিয়ে গেছে চিরতরে। ভূমিসূতার মতন মুখের আদল দেখেই সে মহিলামণির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অনেক ভালবাসা, অনেক যত্ন, অনেক ব্যাকুলতা দিয়েও সে মহিলামণিকে ধরে রাখতে পারল না। তার বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে কোনও নারীকে জড়ালে তারাও সব দিক থেকে বঞ্চিত হয়, হারিয়ে যাওয়াই তাদের নিয়তি। সেই জন্যই ভরত আবার বিয়ে করতে ভয় পায়।

তা হলে কি বাকি জীবন তাকে রমণী সান্নিধ্য বঞ্চিত হয়ে কাটাতে হবে? নারীর কোমলতার স্পর্শ না পেলে পুরুষের জীবন বড় রুক্ষ হয়ে যায়। এই পাটনা শহরের এক প্রান্তে বারবণিতাদের এক বিশাল পল্লী আছে। নানা রকম সাজগোজ করে, মুখে রং মেখে স্ত্রীলোকেরা সন্ধের পর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। ভরত এক একবার ভেবেছে, সেখানে গেলে কেমন হয়? জীবনের সঙ্গে না জড়িয়ে শুধু এক রাত্রির সঙ্গ! বারীন নামে এক চায়ের দোকানের ছোকরার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, সে

প্রায়ই নিজের প্রেমের গল্প করে। ভরতের মনে হয়, প্রেম নামে বস্তুটি সে আর কখনও অনুভব করবে না। দু'-দুটি নারীকে সে তার সমস্ত প্রেম উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। প্রেমহীন পুরুষের শরীরও নারীর শরীর চায়। কিন্তু পণ্যা নারী। ভরত এক সময়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, এখন তার মন থেকে ধর্মটর্ম সব ঘুচে গেছে, সে আর কিছুতেই বিশ্বাসী নয়, ব্রাহ্মধর্মের ধরন-ধারণও তার কাছে হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মদের রুচিবোধ গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছে তার মানসিকতায়। তাই সে কিছুতেই বারবণিতা পল্লীতে নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য যেতে পারবে না।

একাকী থাকার জন্যই কি সে তবে যাবজ্জীবন দণ্ডিত? কালস্রোতের মতন নদীর স্রোতে সে দেখতে পায় না তার ভবিতব্যের ছবি।

এক একদিন সন্ধ্যার পর সে একটি চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। দোকানটি কিছুটা অভিনব। পাটনায় খাবারের দোকান অনেক আছে, লাড্ডু, প্যাঁড়া, জিলাবি, কচৌরি বেশ ভাল পাওয়া যায়। সে সব দোকানে গরম দুধ মেলে, রাবড়িও অতি সুস্বাদু। কিন্তু টেবিল-চেয়ার পাতা কলকাতার মতন চায়ের দোকান আগে ছিল না। সবে মাত্র একটি খুলেছে। বলাই বাহুল্য, দোকানটির পরিচালক এক বাঙালি যুবক। পাটনায় বাঙালির সংখ্যা কম নয়। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও কেরানি অধিকাংশই বাঙালি, শুধু তারাই নয়, বিহারিরাও এই দোকানে আসে।

ভরত বরাবরই চায়ের ভক্ত। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও সে ঠিক কলকাতার চায়ের মতন স্বাদ পায়নি। অনেকেই মনে করে, জল বিনা খাঁটি দুধের মধ্যে চায়ের পাতা সিদ্ধ করে মুঠো মুঠো চিনি দিলেই বুঝি ভাল চা হয়। অনেক দিন পর এই দোকানে হালকা সোনালি রঙের পাতলা চা পেয়ে সেই টানে ভরত প্রায়ই আসে। চা ছাড়া আলুর চপ, মোচার চপ ও পেঁয়াজিও পাওয়া যায়, সেগুলিও বড় সুস্বাদু।

দোকানটির আরও বৈশিষ্ট্য আছে। যে সুদর্শন তরুণটি চা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে, তাকে দেখলে ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। এই দোকানের সব কিছুর মধ্যেই এক নারীর স্পর্শ টের পাওয়া যায়, অন্তরালবর্তিনী এক রমণীকেও ভরত দু'-একবার দেখেছে। সেই প্রৌঢ়া রমণীটিকে দেখলেই বোঝা যায়, এককালে তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন। যুবকটি ওই রমণীকে রাঙামা সম্বোধন করে। কোনও ভদ্র বাঙালি পরিবারের মা ও ছেলে চায়ের দোকান চালিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছে, এমনটি আর আগে দেখা যায়নি।

যুবকটির নাম বারীন। সে কথা বলতে ভালবাসে। ভরতের কৌতূহল থাকলেও সে ওদের সম্পর্কে কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেনি। ভরতের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হবার পর বারীন নিজেই তাদের পারিবারিক ইতিহাস জানিয়ে দেয়। শৈশবেই সে পিতৃহীন, এই প্রৌঢ়া তার গর্ভধারিণী নন, পালিকা মা। আত্মীয়দের চাপে এই রাঙামার সঙ্গে তার বসবাস করা নিষিদ্ধ ছিল। দাদামশাইয়ের বাড়িতে আশ্রিত ছিল বারীন, সেই দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর মামা-মামিরা আর তার ভার নিতে চাননি, বারীনকে তারা গলগ্রহ মনে করত। এই পৃথিবীতে বারীনকে একমাত্র ভালবাসেন এই রাঙামা, শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই পালিয়ে চলে গিয়েছিল বারীন। কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, জীবিকার কোনও পথ নেই। কলকাতায় রাঙামা'র একটা বসতবাটি ছিল, কিন্তু শুধু বাড়ি থাকলেই তো আহার জোটে না। তাই সেই বাড়ি বিক্রির মূলধনে এই চায়ের দোকান খুলেছে। রাঙামা'র হাতের রান্না অপূর্ব, যে একবার খাবে, তাকে বারবার ছুটে আসতেই হবে।

সব শুনে ভরত জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা ভাই, তুমি কলকাতায় চায়ের দোকান না খুলে পাটনা এলে কেন? কলকাতায় তো আরও বেশি সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল। কলকাতা অত বড় শহর, সেখানকার মানুষ চায়ের দোকানে যেতে অভ্যস্ত। আমাদের কলেজজীবনে দেখেছি, জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকানে সর্বক্ষণ ভিড়।

বারীন বলল, তা ঠিক। কিন্তু কলকাতায় আমার রাঙামাকে নিয়ে এ ব্যবসা শুরু করার কোনও উপায় ছিল না। বাপ-ঠাকুরদার মানসম্মানের একটা ব্যাপার আছে না? আমার দাদামশাইকে এক ডাকে দেশের মানুষ চেনে। বাবা ছিলেন নাম করা ডাক্তার। বড় বড় দাদারা সবাই বিলাত ফেরত,

বিদ্যাদিগ্‌গজ, উঁচু পদে চাকরি করেন, তাঁরা কেউ আমার খাওয়া-পরার ভার নিতে চান না। কিন্তু চায়ের দোকানের মতন ছোট কারবার শুরু করেছি শুনলেই তাঁরা সব রে-রে করে তেড়ে আসতেন। তাই তাঁদের চোখের আড়ালে অনেক দূরে চলে এসেছি। আমার কোনও লজ্জা নেই। ব্যবসায় আবার ছোট-বড় কী! বাঙালির ছেলেরা ব্যবসা করে না বলেই তো আজ এ জাতের এমন দুর্দশা।

ব্যবসার ব্যাপারে বারীনের যতই উৎসাহ থাক, কিন্তু তার এই দোকানটি যে বিশেষ লাভের মুখ দেখছে না, তা ভরত কিছু দিনের মধ্যেই বুঝে গেল। কারবার খুলে বসলেই হয় না, একটা ব্যবসায়িক মনোভাব থাকা চাই। কোনও খরিদ্দার যদি আলুর চপ খেয়ে বিগলিত হয়ে বলে, বাঃ, তোফা, তোফা, এমনটি আর খাইনি, অমনি বারীন বলে ওঠে, ভাল লেগেছে যখন, আরও দুটো খান। ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে আরও এক প্লেট ভর্তি চপ চলে আসে। খরিদ্দার হাত নেড়ে বলে, না, না, আর থাক, আমার জেবে আর পয়সা নেই, বারীন তাকে আশ্বস্ত করে বলে, তাতে কী হয়েছে, পয়সা না হয় কাল দেবেন! বঙ্গ রমণীরা অতিথি পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত, রাঙামা'র কাছে সব খরিদ্দারই যেন অতিথি, নিজের হাতে রান্না করা খাবারের জন্য পয়সা নিতে হয় বলে তিনি যেন খুব কুণ্ঠিত, না নিতে পারলেই ভাল হয়। বারীনের মধ্যেও একটা ঔদার্য দেখানোর ভাব আছে, দু'-চার টাকা যেন তার হাতের ময়লা। কোনও খদ্দেরের ধার বাকি পড়লে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বা হাত নেড়ে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিতে হবে না। সুযোগ বুঝে একদল ছোকরা সন্ধেবেলা এসে টেবিল জাঁকিয়ে বসে, ইচ্ছেমতন খায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক ও হাসিমস্করা করে, বারীনকেও গল্পে জড়িয়ে নেয়, যাবার সময় দশ আনার খেয়ে দু' আনা টেবিলে রেখে অম্লান বদনে চলে যায়।

বারীন ভরতের থেকে বয়সে অনেকটা ছোট। এই বয়েসেই সে প্রেমের ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ। অনেক রসালো গল্প জানে। তার এক অতি নিকট আত্মীয়া কিশোরীর প্রেমে সে একসময় হাবুডুবু খেয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হওয়া অসম্ভব বলে সে আর বিয়েই করবে না ঠিক করেছে। সেই মেয়েটিকে সে এখনও লম্বা লম্বা চিঠি লেখে, তবে সে জন্য যে অন্য কোনও মেয়ের প্রতি আসক্ত হওয়া চলবে না, এমন কোনও কথা নেই। এখানেও এক হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোকের ওপর তার নজর পড়েছে।

একদিন বারীন বলল, দাদাগো, বাড়ি বিক্রি করে ন' হাজার টাকা পেয়েছিলাম, তা সবই প্রায় শেষ হয়ে এল। এ ব্যবসায়ে মার নেই, ক্রমশ নাম ছড়ালে আরও খদ্দের বাড়বে। তার জন্য দোকানটি আরও বাড়ানো দরকার, আরও সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর করতে হবে, গোটা কয়েক লোক নিয়োগ করতে হবে। আরও টাকা চাই। তুমি দাদা কেন আমার পার্টনার হও না? কিছু টাকা ঢালো, লাভের বখরা সমান সমান!

ভরত চুপ করে থাকে। এর মধ্যে তার কিছু টাকাকড়ি জমেছে ঠিকই, কিন্তু ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া এমন লোকসানের কারবারে স্বেচ্ছায় মাথা গলাবার মতন মূর্খ সে নয়। বারীনের স্বভাব দেখেই সে বুঝেছে যে আরও কয়েক হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়েও সে অনায়াসে বলতে পারে, এরকম তো হয়েই থাকে।

দু'-চার দিন ভরতকে খুঁচিয়েও আশানুরূপ কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে বারীন বলল, ভাবছি একবার বরোদায় চলে যাব। আমার সেজদা সেখানে খুব মান্যগণ্য লোক, মহারাজের সঙ্গেও দহরম-মহরম আছে। দাদাদের মধ্যে সেজদাই আমাকে একটু ভালবাসে, ওঁর কাছ থেকে যদি কিছু টাকা আদায় করা যায়—।

বারীনের সেজদার নাম শুনে ভরত চমকে উঠল। বরোদার এই অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে ট্রেনে একবার তার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। ঢিলেঢালা, অন্যমনস্ক, লাজুক প্রকৃতির মানুষ, কিছুক্ষণ কথাবার্তা শুনেই বোঝা গিয়েছিল, বেশ বিদ্বান। বাংলা ভাল বলতে পারে না, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আছে। এতদিনে ভরত জানতে পারল যে সেই মানুষটিরই আপন ভাই এই বারীন ঘোষ। দুই ভাইয়ে এত অমিল?

ভরত বলল, তোমার দাদাকে আমি চিনি। আমাকে বরোদা যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন।

সেখানে গেলেই নাকি চাকরি পাওয়া যায়। আমাকে বাংলা শেখাবার জন্য ধরেছিলেন। আমি তখন মাস্টারি করার কথা ভাবিনি, এখন অবশ্য এখানে সেই মাস্টারিই করতে হচ্ছে।

বারীন সোৎসাহে বলল, চলো চলো, আমরা দু'জনে একসঙ্গে যাই। বরোদায় অঢেল সুযোগ। সেখানেও তুমি স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস খুলতে পারো। অন্যদের ইংলিশ শেখাবে, আর আমার সেজদাকে শেখাবে বাংলা।

ভরত বলল, এখন যে এখানে জড়িয়ে গেছি। হঠাৎ যাই কী করে?

বারীন তবু লেগে রইল। মাঝে মাঝেই ভরতকে বরোদায় যাওয়ার জন্য উত্ত্যক্ত করে।

পুরনো পরিচিতদের সঙ্গে ভরত যোগাযোগ করেনি বটে, তবে একদিন সে শহিদ কা মকবরার পাশের রাস্তাটি দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে একটি বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াল। লোহার বল্টু বসানো প্রকাণ্ড দরজাটি বন্ধ। এক অভিশপ্ত রাতে ভরত এই দরজার সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। পিছনে তাড়া করে আসছিল নির্ঘাত মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত কে তাকে বাঁচিয়ে দিল, ভগবান? প্রাণের ভয়ে ভরত ভগবানের শরণ নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু হিন্দুর ভগবান কি এক মুসলমান দারোগা ছাড়া আর কোনও প্রতিনিধি পেলেন না? ভগবানও নয়, আল্লাও নয়, ভরতকে সে রাতে রক্ষা করেছিল একজন মানুষ। মানুষই মানুষকে বাঁচায়, মানুষই মানুষকে মারে। মানুষই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে, আবার মানুষই এই বিভেদের রেখা মুছে ফেলতেও পারে।

কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। তবু ভরত একবার মীর্জা খোদাবন্দ সাহেবের কুশল সংবাদ নেবার জন্য সেই দরজায় করাঘাত করল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সশব্দে খুলল সেই দরজা, এক বৃদ্ধ দারোয়ান মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, কী চাই।

ভরত বিনীতভাবে বলল, এ বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। তিনি আমার নাম শুনলে চিনতে পারবেন না। তিনি একবার আমাকে এ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এইটুকু শুনলে যদি তাঁর কিছু মনে পড়ে।

দারোয়ানটি আপন মনে বিড়বিড় করে উর্দুতে বলল, এ বাড়িতে তো হুদো হুদো লোক আশ্রয় পায় আর দু'বেলা গাণ্ডেপিণ্ডে গেলে, তাদের মধ্যে কার কথা মালিকের মনে থাকবে?

তবু সে ভিতরে গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল, এবং দরজার এক পাল্লা খানিক ফাঁক করে ভরতকে প্রবেশ করতে দিল।

ভরতের যতদূর মনে আছে, বাড়িটি দো মহলা বা তিন মহলা, ঘরের সংখ্যা প্রচুর, দুটো তিনটে উঠোন, অনেক মানুষজনের কণ্ঠস্বর শোনা যেত। আজ যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ, অনেক ঘরে বাতি জ্বলেনি। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

এক জায়গায় মখমল বিছানো চৌকিতে বসে দাবা খেলছে দু'জন যুবক। তাদের মধ্যে একজন মুখ তুলে ভরতকে কয়েক পলক দেখে নিয়ে বলল, ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

ভরতের বুকটা ধক করে উঠল। তা হলে কি মীর্জা সাহেব আর ইহলোকে নেই? তা হলে আর এখানে এসে কী লাভ হল!

ভরত সংক্ষেপে ঘটনাটি জানাল।

যুবকটি ভুরু তুলে সব শুনল, তার মুখে কোনও স্মৃতির রেখা ফুটল না। ভরতের সামনে সে বলল, তুমি হিন্দু? এ বাড়িতে এক সময় ছিলে? আশ্চর্য কিছু না। আমার পিতা বরাবর নিষ্ঠাবান মুসলমান। প্রতিদিন পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়েছেন। পুলিশের বড় কর্তা ছিলেন, ডিউটির সময়েও নিষ্ঠার সঙ্গে রোজা রাখতেন, প্রতি বৎসর শবে বরাতের সময় আড়াই-তিন শো গরিব-আতুরকে খাদ্য বস্ত্র দান করেছেন নিজের হাতে। একমাত্র শরাব পান করা ছাড়া আর কোনও গুণাহ ছিল না। খাঁটি মুসলমান হয়েও অন্য ধর্মের প্রতি কোনও বিদ্বেষ পোষণ করেননি, আগ বাড়িয়ে অনেক হিন্দুকে সাহায্য করেছেন, এ জন্য তাঁকে মূল্যও দিতে হয়েছে। আমাদের মোল্লারা এক সময় রটিয়ে দিয়েছিল, মীর্জা খোদাবক্স কাফেরদের পা চাটে।

ভরতের জিজ্ঞাসু চক্ষু দেখে সে আবার বলল, আমার পিতা এখন জীবন্মৃত। এক আততায়ীর

আক্রমণে চিরকালের মতন পঙ্গু হয়ে গেছেন। একটা পা অ্যামপিউট করতে হয়েছে, অন্য পায়েও শক্তি নেই, বিছানা ছেড়ে নিজে উঠতেই পারেন না। আপনি দেখা করতে চান, যান, তিনি হয়তো খুশিই হবেন।

সে হাঁক দিয়ে বলল, আবদুল, এই মেহমানকে আব্বাজানের কাছে নিয়ে যা।

এই বারমহলেই অন্য একটি ঘরে একটা মস্ত বড় পালঙ্কে সর্বাঙ্গ চাদর ঢাকা দিয়ে আধশোওয়া হয়ে আছেন মীর্জা খোদাবক্স। একটা ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে, কক্ষটি আলোকোজ্জ্বল, সেই আলোতে মীর্জা সাহেব একটি বই পড়ছেন, অন্য হাতে আলবোলার নল। পাশের ছোট টেবিলে মদের বোতল ও গেলাস। আগে মীর্জা সাহেবের দাড়ি ছিল না, ভয় জাগানো মস্ত গোঁফ ছিল, এখন মুখভর্তি চাপ দাড়ি, মাথায় সাদা রঙের ছোপ লেগেছে।

মীর্জা সাহেব প্রথমে চিনতে না পারলেও ভরতের মুখে দু'-তিনটি বাক্য শুনেই ঘটনাটি স্মরণ করতে পারলেন। তিনি বললেন, ও সেই গো হত্যার বখেরা ? সে তো এখনও মেটেনি। গো হত্যাও বন্ধ হয়নি, হিন্দুর দল আর মুসলমানদের দলও তাদের জেহাদ ছাড়েনি। মাঝখান থেকে সেবারের দাঙ্গায় পাঁচ-সাতজন নিরীহ লোকের প্রাণ গেল ! গোরুর নামে মানুষের প্রাণ যায় !

হঠাৎ তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সেবার তোমার মাথায় চোট লেগেছিল না ? সেই থেকে নিশ্চয়ই তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে কেন ? আমি তোমার কোনও উপকার করিনি, কর্তব্য পালন করেছিলাম মাত্র। উপকারীকে দ্রুত ভুলে যাওয়াই তো এ দুনিয়ার নিয়ম।

ভরত লজ্জিতভাবে বলল, আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেবারে আমি ভয় পেয়ে কটক শহরে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর অনেক দেশ ঘুরে—

মীর্জা সাহেব বললেন, বেশ করেছ। কটক শান্ত জায়গা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় না। পাটনায় এসেছ, সাবধানে থেকো। এখানে আবার যে-কোনও দিন দাঙ্গা বাধতে পারে। তোমার ব্যাঙ্ক বুঝি তোমায় আবার পাটনায় বদলি করেছে ?

ভরত বলল, জি না। সে চাকরি আমি অনেক দিন আগে ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি স্পোকেন ইংলিশ শেখাবার স্কুল খুলেছি।

পাশ ফিরে তিনি ভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্পোকেন ইংলিশ ? তুমি ইংরেজি ভাল জানো ? শেক্সপীয়ার পড়েছ ?

ভরত বলল, যৎসামান্য।

মীর্জা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, হ্যামলেট-এর শেষ লাইনটা বলতে পারো ?

ভরতের মনে পড়ল না।

মীর্জা সাহেব তাঁর দু' হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে বললেন, অ্যান্ড দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স। তারপর চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

ভরত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এবার কি তার বিদায় নেওয়া উচিত। মীর্জা সাহেব কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছেন। যাওয়ার আগে কিছু একটা বলা উচিত, সেই কথাটা ভরত খুঁজে পাচ্ছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মীর্জা সাহেব বললেন, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ ঠিক করে বলো তো ? কোনও কারণে পুলিশের সাহায্যের দরকার ? আমি তো আর নেই, তবে এখনও কেউ কেউ আমার কথা মানে।

ভরত বলল, না, আমি সে রকম কোনও প্রয়োজনে আসিনি। শুধু আপনাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হল।

মীর্জা সাহেব বললেন, এই তো দেখলে। দিন গুনছি। ব্যাটারা আমাকে একেবারে খতম করে দিল না কেন ?

শরাবের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, আমার আততায়ীরা ছিল মুসলমান। গুণ্ডা-বদমাশ

সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। আমাকে যদি কোনও হিন্দু গুণ্ডা মারত, তা হলে ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক রং পেয়ে যেত। কিছু হিন্দুর ওপর বদলা নেওয়া হত, আমার পরিবারের লোকদের সমস্ত হিন্দুদের ওপরই জাতক্রোধ জন্মে যেত। একজন আধজনের দোষে সমগ্র জাতটাকে ঘৃণা করা চরম অশিক্ষার লক্ষণ। তুমি একটু শরাব পান করবে নাকি, তা হলে গেলাস আনতে বলি।

ভরত বলল, আজ্ঞে না, আমার অভ্যেস নেই। আমি বরং এবার যাই।

মীর্জা সাহেব বললেন, খোদা হাফেজ। যদি ইচ্ছে হয়, আবার এস। ভাল করে শেক্সপীয়ারের একখানি গ্রন্থ পড়ে এসো তা নিয়ে কথা বলা যাবে।

বাইরে বেরিয়ে আসার পর ভরতের মনে পড়ল, সেলিনা নাম্নী পরিচারিকাটির কথা জিজ্ঞেস করা হল না। সে তাকে বড় মমতাভরে সেবা করেছিল। তাকে আর একবার দেখলে ভাল লাগত।

মীর্জা সাহেবের কাছে ভরত মাঝে মাঝে আসবে ঠিক করলেও আর যাওয়া হয়ে উঠল না। শেক্সপীয়ারের কথা বলে মীর্জা সাহেব ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। তেমন ভাবে সে ওই ইংরেজ মহাকবির রচনা পড়েনি, আবার কি নতুন করে পড়াশুনো শুরু করতে হবে ? মন যে বড় অস্থির হয়ে আছে। মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য সে ব্যাকুল, মীর্জা সাহেবের মতন একজন অসুস্থ মানুষের কাছে গিয়ে বসলে কি সে অভাব মিটবে ?

ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারটাতেও একঘেয়েমি এসে গেছে। বয়স্ক ছাত্রদের কারুরই প্রকৃত লেখাপড়া শেখার আগ্রহ নেই। তারা হিন্দি বা উর্দুতে কিছু কিছু বাক্য তৈরি করে আনে, শুধু সেগুলিরই ইংরেজি আগে ভাগে জেনে নিতে চায়। আই অ্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস, আই অ্যাম ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট স্যার, মাই হোল ফ্যামিলি ইজ অ্যাট ইওর মার্সি...এর বাইরে অন্য কোনও বিষয় বা বইপত্র নিয়ে কথা বলতে গেলে ছাত্ররা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, হঠাৎ বিদায় নিতে চায়।

তার স্কুলের সুনাম অবশ্য বেড়েই চলেছে। ছাত্রসংখ্যা বাড়াবার জন্য নানান মহল থেকে চাপ আসে। অনেক সময় কঠিন কথা বলে কোনও কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও ফিরিয়ে দিতে হয়। তার একার পক্ষে আর বেশি পড়ানো সম্ভব নয়। আরও শিক্ষক নিয়োগ করে রীতিমতন একটা স্কুল চালাবারও ইচ্ছে নেই তার। এদিকে অ্যান্ড্রুজ সাহেবের স্কুল থেকে প্রস্তাব এল, ভরত সেখানে যোগ দিলে অনেক বেশি টাকা পাবে, ভরত সে প্রস্তাবও উড়িয়ে দিল।

একদিন আর একজন পূর্বপরিচিত এসে হাজির হল ভরতের বয়স্ক পাঠশালায়। শিউপূজন সহায়, কংগ্রেসের নেতা এবং ইদানীং একজন বড় ব্যবসায়ী। গোহত্যা বন্ধ আন্দোলনের একজন জোরালো প্রবক্তা হিসেবে এ অঞ্চলের বহু মানুষ তাকে চেনে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের অধিবেশনে উকিল-ব্যারিস্টারদেরই প্রাধান্য, তাঁরা ইংরেজি বক্তৃতার বান ছোটান। শিউপূজন ইংরেজি জানে না, সে বুঝেছে যে ইংরেজি না শিখলে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে স্থান পাবার কোনও আশা নেই।

ভরতকে চিনতে পেরে শিউপূজন খুবই আহ্লাদিত। আবেগের বশে কোলাকুলি করে ফেলল। ভরত যে আর ছাত্র নিতে চায় না, সে কথা এর মুখের ওপর বলে কী করে ? সে বলল, শিউপূজনজি আপনাকে শেখাবার মতন ইংরিজি আমি জানি না। বক্তৃতা দেবার মতন ইংরিজি শিখতে হলে আপনি সাহেবদের স্কুলে যান।

শিউপূজন বলল, সাহেবদের আমি ঘৃণা করি। দৈবাৎ সাহেবদের সঙ্গে গায়ের ছোঁয়া লেগে গেলে আমি গঙ্গায় স্নান না করে কিছু খাই না। আমি কি বেঞ্চিতে বসে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে ইংরিজি শিখব ? সিংহজি, তোমায় যখন পেয়েছি, আমি তোমার বাড়ি আসব, তুমি আমার বাড়িতে যাবে, আমরা সর্বক্ষণ ইংরেজিতে বাতচিত করব। এইভাবে তুমি আমায় শেখাবে। তুমি নাকি সুরয প্রসাদের ছেলেকে শেখাতে রাজি হওনি, এখান থেকে হঠিয়ে দিয়েছ ? ওরা কিন্তু খুব রগচটা লোক। অনেক ক্ষমতা।

ভরত বলল, একজন মাস্টার কাকে শেখাবে না শেখাবে, সে ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে না ?

শিউপূজন বলল, ওসব কথা ছাড়ো ! এখন থেকে তুমি প্রতি সন্ধেবেলা আমার বাড়ি খেতে যাবে। মাছ খাওয়াতে পারব না, খাঁটি ঘি আর মালাই পাবে। হ্যাঁ ভাল কথা, শিগগিরই কলকাতায়

কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে, তুমি সেখানে যাচ্ছ তো ? আমরা একসঙ্গে যাব ।

ভরত বলল, না, আমি কলকাতা যাব না ।

শিউপূজন বলল, সে কী, কেন যাবে না ? তুমি তো কংগ্রেস সম্পর্কে আগ্রহী ছিলে । কলকাতায় খুব বড় অধিবেশন হবে ।

ভরত বলল, এখন আর আমার কংগ্রেস সম্পর্কে আগ্রহ নেই ।

শিউপূজন অবাক হয়ে বলল, কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশ ছড়াচ্ছে, এখনই তো আরও বেশি মানুষের যোগ দেওয়া উচিত । তোমার কলকাতা যাবার ভাড়া আমি দিয়ে দেব । তোমাকে ডেলিগেট করে নেব আমি । শীতকালে সব স্কুল বন্ধ থাকে । একজন বাঙালি সঙ্গে থাকলে আমারও সুবিধে হবে ।

ভরত বলল, আমি বাঙালি নই, আসামের মানুষ ।

শিউপূজন বলল, বাংলা ভাষাটা তো জানো । তোমার সঙ্গে কথা বলে বলে ইংরিজির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাটাও ঝালিয়ে নেব ।

শিউপূজন ছাড়ল না, সে প্রায়ই আসে, ভরতকে জোর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় । কলকাতায় যাবার পরিকল্পনা করে । ওদিকে বারীনও তাকে বরোদায় নিয়ে যাবার জন্য লেগে আছে । কলকাতা যাবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই ভরতের, শিউপূজনের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য সে বরং বরোদা যেতে রাজি আছে ।

একদিন মধ্য রাতে প্রবল শোরগোল শুনে ভরতের ঘুম ভেঙে গেল । কিছু লোকজন আগুন আগুন বলে চিৎকার করছে । এই শীতকালে শহরের এখানে সেখানে প্রায়ই আগুন লাগে । শীত কাটাবার জন্য অনেকে ঘরের মধ্যে কাঠের ধুনি জ্বালে, তারপর অসাবধানতায় সেই আগুন ছড়িয়ে যায় । আজ আবার কোথায় লাগল ?

ভরত উঠে দেখতে গেল জানলা দিয়ে । দোতলায় সে একা থাকে । তার পরিচারকটি রাত্রে নিজের বাড়ি চলে যায় । ঘরের দরজা বন্ধ, তাই ভরত কিছুক্ষণের জন্য টেরই পেল না যে আগুন লেগেছে তারই বাড়িতে । দরজা খুলে যখন সে দেখতে গেল, তখন সিঁড়ির অনেকখানি আগুন উঠে এসেছে ।

বাঁচার সহজাত প্রেরণায় সে ছুটে বেরুতে গেল সেই আগুন ভেদ করে । খানিকটা গিয়েও থমকে গেল সে । একেবারে খালি হাতে যাবে ? কিছু টাকা পয়সা সে জমিয়েছে, কয়েকখানা গিনি ও মোহর সে রেখেছে একটি ছোট টিনের বাক্সে । সে বাক্সটা আবার এক কাঠের আলমারিতে তালা বন্ধ । অতি হুড়োহুড়িতে চাবি খুঁজে পাওয়া যায় না । চাবি পেলেও ঠিক খুলতে চায় না । শেষ পর্যন্ত বাক্সটা যখন সে বার করল, ততক্ষণে আগুন পৌঁছে গেছে ওপরের দরজা পর্যন্ত । কাঠের রেলিংটা দাউ দাউ করে জ্বলছে । এর মধ্য দিয়ে যাওয়া অসম্ভব । বাক্সটার লোভে ভরত জীবন বিপন্ন করে ফেলেছে ।

অনেক বিপদ পার হয়ে এসেছে ভরত, বেঁচে থাকার জেদ সে কখনও ছাড়েনি । বাঁচতে তাকে হবেই । বাক্সটা বগলে নিয়ে সে দৌড়ে পাশের ছাদে গিয়ে পাঁচিল টপকে ঝাঁপ দিল অন্ধকারে । পায়ে দারুণ চোট লাগলেও সে মরল না, হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর করে সরে গেল খানিকটা দূরে, কয়েকজন লোক এসে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে গেল আরও নিরাপদ দূরত্বে ।

সেখানে বসে বসে সে দেখতে লাগল অগ্নির লীলা । তার স্কুলের সব আসবাব সমেত বাড়িটা জ্বলছে । ওখানে তো কোনও আগুন ছিল না, কেউ কোনও দাহ্য পদার্থ বা তেল ছড়িয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়েছে ? এত তাড়াতাড়ি আগুনে সবটা গ্রাস করে নিল ।

পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও ভরত হাসল । ভগবানের পরীক্ষা ? আবার তাকে একটা পরীক্ষায় ফেলা হল ? সারা জীবন যদি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েও বাঁচতে হয়, তবু সে আর কোনও বিগ্রহের কাছে মাথা নোওয়াবে না ।

৫৩

কবিকেও কখনও কখনও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভূমিকা নিতে হয় । একাকী লেখার টেবিলে তিনি মুক্ত বিহঙ্গ, সেই টেবিল ছেড়ে উঠে এলেই তিনি টের পান যে আসলে তিনি সংসারে আবদ্ধ জীব । অনেক সময় সেই কল্পনাবিহারী মন বাস্তবের মাটিতে এসে আছড়ে পড়ে, ক্ষত-বিক্ষত হয় । কর্তব্য, দায়-দায়িত্বের বোঝা নিতে কবি পরাঙ্মুখ হন না, সবাইকে দেখিয়ে দিতে চান যে আমিও এসব পারি, তবু অকস্মাৎ কখনও কখনও সেই বোঝা কাঁধ থেকে পিছলে পড়ে যায়; কিংবা উত্তরে যাবার কথা, কবি চলে যান দক্ষিণে ।

মাধুরীলতা বেশ ডাগরটি হয়েছে । রূপে-গুণে এক অদ্বিতীয়া কিশোরী । চোদ্দো বছর পার করে পনেরোয় পা দিয়েছে, এখনও তার বিয়ের ব্যাপারে পিতার হুঁশ নেই । এরপর যে সে অরক্ষণীয়া হয়ে যাবে ! স্বামী কল্পনাবিলাসী বলে স্ত্রীকে বেশি বেশি বাস্তববাদী হতে হয়, স্ত্রীকেই ধরতে হয় সংসারের হাল । কবিপত্নী প্রায়ই কন্যার পাত্র খোঁজার জন্য তাড়া দেন স্বামীকে । রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গা করেন না । জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রতি বছরই দু'তিনটি বিয়ে হয়, ঘটক-ঘটকিরা নিয়মিত যাতায়াত করে, তারা নানা রকম সম্বন্ধ নিয়ে আসে । আর বেশি দেরি করলে মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে যাবে বলে তারা মৃণালিনীর কান ভারী করে । মৃণালিনীও সরলা ও ইন্দিরার অবস্থা দেখেছেন, নিজের কন্যাকে সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে চান না । মেয়ের বয়স বেশি হয়ে গেলে তার জন্য আর সুপাত্র পাওয়া যায় না সহজে । ইন্দিরার বিয়ে হয়েছে বটে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তা নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি । সরলার তো এখনও বিয়ের নামগন্ধ নেই, সে ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়ায়, একাধিক পুরুষ তার কাছাকাছি ছুঁকছুঁক করে, ঠাকুরবাড়ির ধারা সে একেবারেই মানে না ।

কিন্তু ঘটকের মারফত পাত্র নির্বাচন রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় না । দফায় দফায় বিভিন্ন পাত্র-পক্ষ এসে মেয়ে দেখে যাবে, তাদের খাতির যত্ন করতে হবে, তারা কোনও অসমীচীন প্রশ্ন করলেও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, এবং সহ্য করতে হবে প্রত্যাখ্যান । মাধুরীলতা তাঁর বড় আদরের, কত যত্ন করে তাকে শিখিয়েছেন বাংলা, ইংরিজি, সংস্কৃত । অতি চমৎকার তার লেখার হাত । চর্চা করে গেলে সে কালে একজন বড় লেখিকা হতে পারে । এমন কন্যারত্নকে কি যার তার হাতে দেওয়া যায় !

নিজেই যে উদ্যোগী হয়ে পাত্র খুঁজবেন, সে সময়ও নেই রবীন্দ্রনাথের । এখন তাঁর খ্যাতি অনেক ছড়িয়েছে, বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রায়ই তাঁর ডাক পড়ে, ভাষণ দিতে হয়, গানও গাইতে হয়, লেখালেখির চাপও বেড়ে গেছে, লিখতেও হচ্ছে প্রচুর । ভারতী পত্রিকার দাবি তো মেটাতে হচ্ছেই, এর ওপর আবার নব পর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব প্রায় জোর করেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর ওপর । রবীন্দ্রনাথ এ দায়িত্ব নিতে চাননি, কেননা পাঠক ও সমালোচক পদে পদে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করবে, সম্পাদক বঙ্কিমের কৃতিত্ব এখনও পর্যন্ত তুলনাহীন । দায়িত্ব যখন নিতেই হয়েছে, তখন পত্রিকার মান যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাই রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা দিয়েই প্রায় ভরিয়ে দিচ্ছেন প্রতিটি সংখ্যা । প্রত্যেক সংখ্যায় থাকে তাঁর রচিত গান ও কবিতা, প্রবন্ধ, ধারাবাহিক উপন্যাস, সমসাময়িক পর্যালোচনা । লিখতে তাঁর ক্লান্তি নেই । 'ভারতী' পত্রিকায় লিখছেন ধারাবাহিক 'চিরকুমার সভা' ও 'নষ্টনীড়', 'বঙ্গদর্শন'-এ শুরু করলেন 'চোখের বালি' উপন্যাস । এক সঙ্গে তিনটি ধারাবাহিক লেখার কথা এর আগে কোনও বাঙালি লেখক কল্পনাও করেননি ।

এই সবের ওপর জমিদারির কাজ দেখাশুনোর দায়িত্ব তো আছেই ।

একদিন প্রিয়নাথ সেন কথায় কথায় বললেন, বন্ধু, তোমার বড় কন্যাটির বিবাহের কথা কিছু ভাবছ নাকি ? শুনলাম, বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরতের বিয়ের উদ্যোগ চলছে। ছেলেটি বেশ উপযুক্ত। ওরা আমার প্রতিবেশী তো, আমি অনেক দিন যাবৎ ওদের চিনি।

রবীন্দ্রনাথ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বিহারীলাল নতুন বউঠানের প্রিয় কবি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও এক সময় ওঁর লেখা পছন্দ করতেন। দুই কবির পরিবারের মধ্যে কুটুম্বিতার চেয়ে আদর্শ আর কী হতে পারে ! ছেলেটিও বেশ যোগ্য, উচ্চ শিক্ষিত, মুঙ্গের শহরে ওকালতি শুরু করেছে। কলকাতা ছেড়ে মুঙ্গেরের মতন দূর শহরে যাওয়ার যৌক্তিকতা আছে। বর্তমানে বাঙালির মধ্যে উকিল ব্যারিস্টারের সংখ্যা অনেক। কলকাতায় সবাই মিলে প্রতিযোগিতার মধ্যে না পড়ে খোঁজ খবর নেয় যে, ভারতের কোন কোন শহরে এখনও তেমন আইনজ্ঞ নেই। কলকাতার উকিলরা সেখানে গিয়ে বিনা প্রতিযোগিতায় জাঁকিয়ে বসে। এইভাবে ভারতের প্রায় সব শহরেই বাঙালি ছেলেরা ওকালতি-ডাক্তারি-শিক্ষকতার পদগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। শরৎ যখন মুঙ্গেরে গেছে, তখন অবিলম্বেই পশার জমিয়ে ফেলবে নিঃসন্দেহে !

ছেলেটিকে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলেন না রবীন্দ্রনাথ, তক্ষুনি সম্মতি জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ অত্যুৎসাহে মৃণালিনীকে খবরটা জানাতেই তিনি কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি দেখলে না শুনলে না, ছেলেটি কানা না খোঁড়া জানলে না, আগেই কথা দিয়ে এলে !

রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে। সে কখনও কানা খোঁড়া হতে পারে ? সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হেসে ফেলে আবার বললেন, না না, তা নয়। প্রিয়নাথ আমার বিশেষ শুভার্থী বন্ধু, সে কখনও জেনেশুনে বেলার সঙ্গে কানা খোঁড়া ছেলের সম্বন্ধ দিতে পারে ? তার ওপর আমি খুব ভরসা করি। জানো, বিহারীলাল খুব সরল, সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, তাঁকে আমার খুব পছন্দ।

মৃণালিনী বললেন, আমি কি শুধু শ্বশুরকে পছন্দ করে মেয়ের বিয়ে দেব নাকি ? তুমি আগে ছেলেকে একবার দেখার ব্যবস্থা করো।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, পাত্র-পক্ষের বাড়িতে গিয়ে তো দেখার রীতি নেই। তা ছাড়া শরৎ থাকে মুঙ্গেরে। ঠিক আছে, প্রিয়নাথকে বলে তার একখানা ফটোগ্রাফ জোগাড় করা যায় কি না দেখছি আমি।

মৃণালিনী বললেন, তুমি কত জায়গায় যাও। একবার মুঙ্গেরে গিয়েও তো তাকে দেখে আসতে পারো। পাত্র-পক্ষের বাড়ির অবস্থা, অনেকগুলি অবিবাহিতা ননদ আর বিধবা জা আছে কিনা, এসবও খোঁজখবর নিতে হয় !

বিহারীলাল চক্রবর্তী বেশ কয়েক বছর আগে গত হয়েছেন। বাড়ির অবস্থা সাধারণ। কন্যার পিতা হয়েও রবীন্দ্রনাথ গলায় চাদর ঝুলিয়ে পাত্রপক্ষের দ্বারস্থ হতে দ্বিধান্বিত হলেন, প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে উভয়পক্ষের কথা শুরু হল। পাত্রের এক ভাই ঋষিবর অতি সুপুরুষ, একে দেখেই বোঝা যায়, শরৎও মাধুরীলতার অনুপযুক্ত হবে না।

প্রথমেই পাত্র-পক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পণ চেয়ে বসল। রবীন্দ্রনাথ খুব দমে গেলেন। অত টাকা তিনি পাবেন কোথায় ? ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে, সদ্য নিজের জন্য একটা বাড়ি বানিয়েছেন, হাত একেবারে শূন্য। বিয়ের আনুষঙ্গিক খরচ নিয়ে চিন্তা নেই। পিতা দেবেন্দ্রনাথই এখনও সমস্ত নাতি-নাতনিদের বিবাহের ব্যয় বহন করেন, মৃণালিনীর গহনা থেকে যৌতুকও দেওয়া যাবে যথেষ্ট, কিন্তু পণের ক্যাশ টাকা জোগাড় করা যে অসম্ভব।

তবু, এমন সুপাত্রকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলে না। বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলেকে নিজের জামাতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে ধরেই নিয়েছেন। নতুন বউঠান বেঁচে থাকলে, এই বিয়ের সম্বন্ধতে তিনি নিশ্চয়ই খুব উৎসাহিত হতেন। মৃণালিনী বিহারীলালের নামের মর্ম কিছুই বোঝেন

না, তিনি বুঝতেন। 'নষ্টনীড়' লিখতে লিখতে ইদানীং নতুন বউঠানের কথা আবার খুব মনে পড়ছে। এমনকী 'চোখের বালি' লেখার সময়েও।

বিয়েতে পণ দেওয়া যে গরু-ছাগল কেনা বেচার সমান, এই কুপ্রথা সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেকবার ভেবেছেন, দেবেন্দ্রনাথ এই প্রথার ঘোর বিরোধী, এসব ভুলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিহারীলালের ছেলেকে জামাতা হিসেবে পাওয়ার জন্য পণ দিতেও রাজি। শুরু হল গো-হাটার দরাদরি। কুড়ি হাজার থেকে নামতে নামতে দশ হাজারে পৌঁছে পাত্রপক্ষ অনড় হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাতেই সম্মতি জানালেন, তখন পাত্র-পক্ষ আবার কৌশলে মুঙ্গের থেকে শরতের যাওয়া-আসা ও বরযাত্রীদের রাহা খরচ বাবদ আরও দু'হাজার বাড়িয়ে নিল। মোট বারো হাজার !

রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিয়ের তারিখ ঠিক করবার ভার আপনাদের ওপর। তবে আমাদের একটি পারিবারিক প্রথা আছে। বিবাহের কয়েকদিন আগে পাত্রকে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষা নিতে হবে।

প্রিয়নাথ বললেন, সে কথা আমি ওঁদের আগেই জানিয়েছি। শরৎ ব্রাহ্ম হতে রাজি আছে।

ঋষিবর বলল, ঠিক আছে, দাদাকে কয়েকদিন আগেই আসার জন্য তার করব। যেদিন দীক্ষা হবে, সেদিনই আপনারা পণের টাকাটা দিয়ে দেবেন। ওই টাকাটা আমাদের আগেই চাই।

রবীন্দ্রনাথ আড়ষ্টভাবে বললেন, আগেই দিতে হবে ?

ঋষিবর বললেন, হ্যাঁ। মা সেই কথাই বলে দিয়েছেন। তিনদিন আগে বা পরে দেওয়া তো একই কথা।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, তা ঠিক। সেই ব্যবস্থাই হবে।

পণের ওই বারো হাজার টাকা দেবার সংস্থান রবীন্দ্রনাথের নেই। কিন্তু তিনি জানেন, প্রতিটি বিবাহের পর কন্যা-জামাতা যখন দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাতে যায়, তিনি তাদের বেশ কয়েকটি গিনি দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সেই গিনিগুলির মূল্য বারো হাজারের কম হবে না।

পিতাকে সব জানাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ গেলেন ওপর মহলে। ধ্যানভঙ্গ করে দেবেন্দ্রনাথ সব শুনলেন, পাত্রের পারিবারিক অবস্থা, কটি ভাই বোন, কতদিন ধরে ওকালতি শুরু করেছে সব জেনে নিলেন খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে, তারপর বললেন, বেশ তো, খাজাঞ্চিকে বলে দাও সব বন্দোবস্ত করতে, আতিথেয়তার যেন ত্রুটি না থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, খাজাঞ্চিমশাইকে আশীর্বাদী গিনিগুলি সংগ্রহ করে দিতে বলব ? ওঁরা আগে চেয়েছেন।

নিষ্পলকভাবে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারপর অতিশয় ধীরভাবে বললেন, ওই যৌতুক তো আমার আশীর্বাদস্বরূপ। আগে দিতে হবে কেন ? ওঁরা কি আমায় বিশ্বাস করেন না ? বিবাহের পূর্বেই যৌতুক চাইবার কী কারণ, তা তো বুঝতে পারলাম না।

রবীন্দ্রনাথের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। ছি ছি ছি, এ কী করেছেন তিনি ? এ যে তাঁর পিতার প্রতি চরম অপমান। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন মানুষের বদান্যতায় অবিশ্বাস ! রবীন্দ্রনাথ কী করে এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন, কোন মূঢ়তা তাঁকে পেয়ে বসেছিল !

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি বেরিয়ে গেলেন মুখ নিচু করে।

পুরো একটা দিন তিনি বাড়িতে বসে রইলেন চুপচাপ। এই সঙ্কটের কথা তিনি স্ত্রীকেও বলতে পারেন না। এমন অসম্মানজনক শর্ত শুনে মৃণালিনীও দারুণ চটে উঠবেন নিশ্চিত। শর্ত বদলের কথাই বা তিনি এখন বলেন কোন মুখে, প্রিয়নাথকে সাক্ষী রেখে তিনি নিজেই যে রাজি হয়ে এসেছেন।

কাজের ছুতো দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন শিলাইদহে। যাবার আগে প্রিয়নাথকে ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, অন্য কোনওভাবে এই সঙ্কট নিরসন করা যায় কি না তার উপায় খুঁজতে। সে সম্ভাবনা খুবই কম। পাত্রপক্ষেরও মানে লেগেছে। ভাবী শ্বশুর রবীন্দ্রনাথ নিজেই কথা দিয়ে কথার খেলাপ করছেন, এ কী রকম ব্যাপার ? ঠাকুর বাড়ির পারিবারিক প্রথা আছে, তাদেরও বুঝি কিছু প্রথা থাকতে

পারে না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছাড়া আর কি কোথাও পাত্রী পাওয়া যাবে না ? শরতের মতন পাত্রের জন্য শত শত মেয়ের বাপ ছুটে আসবে !

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ এবারে একা। মন ভাল নেই। কন্যার বিবাহের জন্য উতলা হয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে দরাদরি। আগে দেওয়া, পরে দেওয়া এইসব চিন্তা করলেই মনে কেমন যেন গ্লানির ভাব আসে। এই সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে, না হলে কিছু লেখা যাবে না। লেখাটাই তো তাঁর আসল কাজ।

জ্যোৎস্নাময় রাত্রে বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। নদীর ছলোচ্ছল শব্দ বাজতে থাকে সঙ্গীতের মতন। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, কে আমি, কী আমার পরিচয় ? কারুর চোখে আমি ধনীর নন্দন, সংসারী, পাঁচটি পুত্রকন্যার জনক। কেউ ভাবে, আমি এক বিশিষ্ট জমিদার। কারুর কাছে আমি সম্পাদক, লেখক, গায়ক-কবি। একই মানুষের অনেক পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু যখন আমি সম্পূর্ণ একা, তখন আমি শুধুই কবি। একজন কবির প্রকৃত পরিচয় কি কোনও মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ?

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন মনে এসে যায় কয়েকটা কবিতার লাইন :

বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে···

নীচে নেমে এসে লণ্ঠনের আলোয় ঝরঝর করে অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি লিখে ফেলার পর একটু থামেন। কবিতা-পাঠককে ধাঁধার মধ্যে ফেলা রাখা কি ঠিক হবে ? কবির একটা নিভৃত পরিচয় আছে, সে কথা কিছুটা আভাসে বলে দেওয়াও যায়।

যে আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে···

পরদিন সকালেই আবার চিন্তার ভার মাথায় চেপে বসে। কন্যার বিয়ের ব্যাপারটা উপেক্ষা করা যায় না। বিহারীলালের ছেলের সঙ্গে মাধুরীলতার সম্বন্ধের কথাটা অনেকটা জানাজানি হয়ে গেছে, এখন এটা কাঁচিয়ে গেলে লোকে হাসবে।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি মুঙ্গেরে শরৎকুমারকেই একটা চিঠি পাঠালেন সব ব্যাপারটা খোলাখুলি লিখে। সে শিক্ষিত, আধুনিকমনস্ক যুবক, সে নিশ্চিত পণপ্রথা সমর্থন করবে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই শরতের কাছ থেকে ঝটিতি উত্তর এসে গেল। আগাগোড়া শ্রদ্ধা ও বিনয়পূর্ণ বচনে লেখা। সে জানিয়েছে যে, সে পণপ্রথা সমর্থন করে না, তার নিজের দিক থেকে টাকাপয়সার কোনও দাবি নেই। ঠাকুর পরিবারের কন্যাকে স্ত্রী রূপে পেলে সে গর্বিত বোধ করবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্য পাবার জন্য সে আগ্রহী। কিন্তু সে তার জননী ও ভাইদের বিরুদ্ধ মতে গিয়ে কোনও কাজ করতে পারবে না। পরিবারের লোকদের মনঃক্ষুণ্ণ করে বিবাহ করতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে তার মা-ভাইদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

চিঠিখানি পড়ে রবীন্দ্রনাথ অখুশি হলেন না। তাঁর নিজেরও পুত্রসন্তান আছে। তাঁর পুত্র যদি বাবা-মায়ের মতামত অগ্রাহ্য করে বউয়ের পরিবারের সব কথা মেনে চলে, তাতে কি তিনি খুশি হবেন ? এ ছেলেটির নিজের গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, এটাও তো একটা ভাল গুণ।

তা হলে বুঝি এই সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। ওরাও পণের টাকা আগে না পেলে ছাড়বে না, দেবেন্দ্রনাথও বিয়ের আগেই আশীর্বাদী যৌতুক দিতে কিছুতেই রাজি হবেন না।

হঠাৎ একটি সমাধানের সূত্র এল প্রিয়নাথ সেনের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের হাতে টাকা নেই। যদি কোনও বন্ধু দীক্ষার দিনে ওই টাকাটা দিয়ে দেয়, তা হলেই তো হল। পরে বিয়ে টিয়ে চুকে গেলে যৌতুকের টাকা থেকে সেই বন্ধুকে শোধ করে দেওয়া যেতে পারে। প্রিয়নাথ নিজেই সেই দশ-বারো হাজার টাকা জোগাড় করে ফেলতে রাজি আছেন।

এ প্রস্তাবে খুবই উৎফুল্ল বোধ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই হল খাঁটি বন্ধুর মতন কাজ। প্রিয়নাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে গেল। প্রিয়নাথের যেমন সাহিত্যবোধ আছে, সংসার সম্পর্কেও সেই রকম অভিজ্ঞ। প্রিয়নাথের অনেক কবিতার সমালোচনা যেমন রবীন্দ্রনাথ মেনে নেন, তেমনি মাধুরীলতার বিয়ের ব্যাপারটাতেও তার ওপরেই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে। নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন, এক্ষুনি কলকাতায় ফেরা দরকার।

কলকাতায় প্রিয়নাথ আরও ভাল খবর দিলেন। দীক্ষার দিনে নগদ টাকাটা হাতে হাতে তুলে না দিলেও চলবে। সব ব্যাপারটা তিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে খুলে বলেছিলেন। কৃষ্ণকমল দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত এবং বিহারীলালেরও বন্ধু ছিলেন, ও পরিবারের সবাই তাঁর কথা মানে। তিনি বলেছেন, দেবেন্দ্রনাথের বদলে অন্য কারুর টাকা দিয়ে দেওয়াটা ভাল দেখায় না। এ সংবাদ কোনওক্রমে দেবেন্দ্রনাথের কানে পৌঁছলে তিনি দুঃখ পাবেন। তাঁর মতন মানী লোকের নাতনির বিয়ের টাকা দেবে অন্য লোক ! শরৎরা টাকা চেয়েছে, সেটা পেলেই তো হল ! কৃষ্ণকমল নিজে এই টাকার জন্য জামিন থাকবেন।

বাঃ, তা হলে তো সব সমস্যা মিটেই গেল। এবার শুভকাজের দিন ঠিক করে ফেললেই হয়। প্রিয়নাথ বললেন, মাঝখানে অবশ্য একটা অনুষ্ঠান বাকি আছে। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে তো মেয়েকে এখনও দেখাই হল না। ছেলের মা-মাসিরা একবার পাত্রীকে দেখতে চান। পাকা-দেখা নামে একটা ব্যাপার থাকে। হিন্দু বাড়ির শাশুড়িরা কখনও জামাই বাড়ি যান না। মেয়েকে একবার নিয়ে আসতে হবে শরৎদের বাড়িতে। প্রিয়নাথ বললেন, বন্ধু, তুমি তোমার গাড়িতে করে মাধুরীলতাকে নিয়ে আসবে, বেশিক্ষণের ব্যাপার নয়, ঘণ্টা খানেক লাগবে, মেয়েকে তো পছন্দ হবেই জানা কথা, ওঁরা ধান-দুর্বো দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করবেন।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভূমিকায় আর একবার প্রচণ্ড ভুল করলেন কবি। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি এই প্রস্তাবেও রাজি হয়ে গেলেন।

কবিপত্নী এই কথা শোনা মাত্র যেন খণ্ডপ্রলয় শুরু হয়ে গেল ! ঠাকুরবাড়ির মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হবে পাত্রের বাড়িতে ! মেয়ে কি জলে পড়ে গেছে নাকি যে রাজি হতে হবে এমন অপমানজনক শর্তে ! এই পরিবারের অনেক মেয়েকে বিয়ের পরেও শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হত না, আর মাধুরীলতাকে পাঠাতে হবে বিয়ের আগে ?

মৃণালিনী দুঃখ-বেদনা ক্রোধে অধীর হয়ে স্বামীর কাছে এসে আঙুল নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলেন, কেন তুমি ওদের এমন প্রস্তাবে রাজি হলে ? কেন, কেন ? এতে তোমাদেরই বংশের যে কত অসম্মান, তা তুমি ভেবে দেখলে না ? চিরটাকাল বরপক্ষের লোক আসে কন্যাপক্ষের বাড়িতে। মেয়েকে আগ বাড়িয়ে পাঠাতে হবে, এমন কথা তুমি জগতে শুনেছ ? অতি গরিব ঘরের মেয়ের বাপও নিজের বাড়িতেই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে, আর তুমি নির্লজ্জের মতন মেয়েকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে ও বাড়ি যাবে ? এতে তোমার নিজের সম্মান, তোমাদের বংশের সম্মান যে ধুলোয় লুটোবে, তা একবারও ভেবে দেখলে না ? ওই পাত্র ছাড়া কি আমাদের মেয়ের আর বিয়ে হবে না ! ওদের সব উদ্ভুট্টি আবদার আমাদের মেনে নিতে হবে ?

রবীন্দ্রনাথ লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে, অপরাধবোধে যেন দারুভূত হয়ে গেলেন। সত্যিই তো, বাঙালি সমাজে অনূঢ়া কন্যাকে ভাবী স্বামীর গৃহে কখনও নিয়ে যাওয়া হয় না। বাবামশাই শুনতে পেলে আবার অপমান বোধ করবেন। এটাও তাঁর মনে পড়েনি। পাত্রপক্ষের কাছে বারবার নত হতে গিয়ে তিনিই সব গোলমাল পাকিয়ে ফেললেন। তাঁর স্ত্রী বিরূপ, মাধুরীলতাও সব জানতে পারলে মনে আঘাত পাবে।

মৃণালিনী ভেঙে পড়া গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন মেনে নিলে ? কেন রাজি হলে ?

রবীন্দ্রনাথ অস্ফুট গলায় বললেন, তার কারণ আমি একটা নিতান্ত গর্দভ। তুমি আমাকে যা খুশি গঞ্জনা দিতে পারো। তোমার কথাই ঠিক, আমি নির্বোধের মতন কাজ করেছি।

কিন্তু পাত্রপক্ষের সামনে রবীন্দ্রনাথ নিজে কথা দিয়ে এসেছেন, এখন প্রত্যাহার করবেন কী করে ? সেও তো আর এক অপমানজনক ব্যাপার।

একটু পরে সব রাগ গিয়ে পড়ল প্রিয়নাথ সেনের ওপর। সে-ই তো ভুল পরামর্শ দিয়েছে, এই কি বন্ধুর কাজ ? রবীন্দ্রনাথ না হয় সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, সব দিক বিবেচনা করে দেখতে পারেন না, এই প্রথম মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু প্রিয়নাথ সেন তো যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি, এর আগে নিজের দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্বশুর হয়েছেন, তিনি কী করে এরকম আচার গর্হিত প্রস্তাব মেনে নিতে বললেন পাত্রপক্ষের সামনে ? রবীন্দ্রনাথ ভুল করলেও তাঁর কি সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না ? বিয়ের আগেই দু'পক্ষের মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হতে চলেছে।

প্রিয়নাথকে একখানা কড়া চিঠি লিখলেন, রবীন্দ্রনাথ, তারপর সব কিছু অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেন দার্জিলিং।

ত্রিপুরার রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য এখন দার্জিলিং-এ অবস্থান করছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে আগেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন, তবু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ যেন কলকাতা ছেড়ে পলায়ন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে রাধাকিশোরের উৎসাহ যেন তাঁর পিতার চেয়েও বেশি। তাঁর পিতা অবশ্য নিজে গান ও কবিতা রচনা করতে পারতেন, রাধাকিশোরের সে ক্ষমতা নেই, তবু কাব্য উপভোগ করার সময় তিনি বিভোর হয়ে যান।

রাধাকিশোর দার্জিলিং-এর মোলায়েম ঠাণ্ডায় বিশ্রাম নিতে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গও তাঁর বিশেষ কাম্য। কিন্তু এবারে যেন কবিতা পাঠ ও গানের সময় বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন কবি। যত আদরেরই হোক, মেয়েকে চিরকাল নিজের কাছে রাখা যায় না, আবার মেয়ের বিয়ে যদি উপযুক্ত পরিবারে না দেওয়া যায়, তা হলে সারাজীবন অশান্তিতে দগ্ধ হতে হবে। শরৎ পাত্র হিসেবে অবশ্যই সুযোগ্য, কিন্তু সে তার মা-ভাইদের মতের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই করবে না। সুতরাং ওই পরিবারের সঙ্গে প্রথম থেকেই সম্পর্ক ঘুলিয়ে তোলা একেবারেই অনুচিত। এতদূর এগিয়ে আবার অন্য পাত্র খোঁজার চেষ্টাও যুক্তিযুক্ত নয়।

মহারাজকে ঘুণাক্ষরেও এই সংকটের কথা জানাতে চান না রবীন্দ্রনাথ। টাকা পয়সার ব্যাপারে মহারাজ অতি উদার, দানে তিনি মুক্তহস্ত। রবীন্দ্রনাথের কন্যার বিয়েতে পণের টাকা নিয়ে কিছু অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে শুনতে পেলেই তিনি সব টাকা দিয়ে দেবেন, আরও অতিরিক্ত কিছু দিয়ে তিনি পাত্রপক্ষকে অভিভূত করে ফেলবেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশের এক কন্যার বিয়ে হবে অন্যের টাকায় ? এ যেন কিছুতেই না হয়। চামড়ার ব্যবসা করতে গিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা ধার না হয়ে গেলে কবিকে এত ভাবনাচিন্তা করতেই হত না।

কাব্য বা সঙ্গীত নয়, অন্য একটি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ জড়তা ভেঙে অতি উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

রাধাকিশোর তাঁর পিতার মতন কাজ চালানো গোছের ইংরিজিও জানেন না। শশিভূষণ মাস্টার বিদায় নেবার পর রাজ পরিবারে ইংরিজি শিক্ষার চল প্রায় উঠেই গেছে। শুধু ত্রিপুরায় কেন, অন্যান্য অনেক দেশীয় রাজ পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়া না শিখে ভোগবিলাসে মেতে থাকে অল্প বয়েস থেকেই। ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টদের এতে খুব অসুবিধে হয়, রাজা বা রাজপুত্রদের সঙ্গে সরাসরি কোনও কথাই বলা যায় না। সেইজন্যই ইংরেজ সরকার আজমিরে লর্ড মেয়ো'র নামে একটি কলেজ স্থাপন করেছে, এবং সমস্ত রাজকুমারদের সেখানে ইংরিজি শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে।

রাধাকিশোর তাঁর পুত্রকে অত দূরে পাঠাতে চান না। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ চাওয়া হতেই তিনি বললেন, কক্ষনও পাঠাবেন না।

মেয়ো কলেজ শুধু দূর বলেই না, সেখানে ইংরিজি শিক্ষার নামে বিলিতি আদবকায়দা শিখিয়ে রাজকুমারদের নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত করা হবে। তারা হবে ইংরেজের ধামাধরা এক ধরনের ট্যাস ফিরিঙ্গি, এটাই সরকারের মতলব। ভারতীয় রাজকুমারদের কাছে ভারতীয় ঐতিহ্যই সবচেয়ে বড় হওয়া উচিত, তাদের জানা উচিত প্রাচীন রাজধর্ম।

কিছুদিন ধরেই রবীন্দ্রনাথের মন বিলিতি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হতে হতে ক্রমশ পিছোচ্ছে, পিছোতে পিছোতে প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছে, এমনকী বর্ণাশ্রম এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বেও বিশ্বাসী হয়েছেন। বলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করেছিল, তার অকালমৃত্যুতে সেটা চাপা পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ আবার সেই পরিকল্পনাটি লালন করছেন মনে মনে।

রবীন্দ্রনাথ রাজাকে বললেন, ইংরিজি শেখাতে হবে তা ঠিক কথা। ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে গেলেও ওই ভাষা শিক্ষা অনিবার্য। তার জন্য মেয়ো কলেজে যেতে হবে কেন ? ওরা যে চরিত্রটাই বদলে দেবে। বিলিতি হাব-ভাব শিখিয়ে মর্কট বানাবে। নিজের রাজ্যেই সাহেব মাস্টার নিযুক্ত করে রাজকুমারদের ইংরিজি শেখানো যায়, সেই সঙ্গে স্বদেশের আদর্শও তাদের শিক্ষা দিতে হবে।

কিন্তু সেরকম সাহেব মাস্টার পাওয়া যাবে কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথের লরেন্সের কথা মনে পড়ল। এই ভবঘুরে ইংরেজটিকে তিনি নিজের পুত্রকন্যার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। নির্বাচনে ভুল হয়নি, মানুষটি পড়ায় ভাল, নিজের ভাষা ছাড়াও অনেক কিছু জানে, বহু ব্যাপারে উৎসাহী ও গুণী। কিন্তু একাকী চাঁদ যেমন সমস্ত অন্ধকারকে হত্যা করে, সেইরকমই লরেন্সের একটি দোষ তার সব গুণরাশি ঢেকে দিয়েছে। সে মদ্যপায়ী এবং তার মদের নেশা দিনদিনই বাড়ছে। নিজের কাছে না থাকলে সে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে মদের বোতলের জন্য জ্বালাতন করে। মানুষটির ওপর রাগও হয়, আবার ভাল না বেসেও পারা যায় না।

মাধুরীলতার বিয়ের কথাবার্তা চলছে জেনে লরেন্স খুব ক্ষুব্ধ। এত অল্পবয়েসী মেয়েকে বিয়ে দেবার প্রস্তাব সে মেনে নিতে পারছে না। মাধুরীলতা মেধাবিনী, সে তো আরও লেখাপড়া শিখতে পারত। মাধুরীলতার প্রতি লরেন্সের খুব টান। ওদের দু'জনের মধ্যে যে সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথ জানেন, তা নির্মল ও নির্দোষ, কিন্তু অন্য লোকে অন্যরকম ধারণাও করতে পারে। এ দেশের অধিকাংশ মানুষই তো নারী-পুরুষের মধ্যে শুধু খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। মাধুরীলতা একটু বড় হবার পর তার সঙ্গে লরেন্সের ঘনিষ্ঠতা ভাল চোখে দেখেন না মৃণালিনী। তিনি মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিতে চান। মাধুরীলতার বিয়ের প্রস্তাব শুনে লরেন্স বারবার এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিবাদ জানায়, মৃণালিনী তাতেও বিরক্ত। মুঙ্গেরে গিয়ে স্বামীর ঘর করা মেয়ের পক্ষে সেই হিসেবে ভালই।

মুশকিল হচ্ছে এই, লরেন্সকে বিতাড়িত করার কোনও উপায় নেই। তাকে বকুনি দিলেও সে হাসে। কখনও দু'চারদিনের জন্য অন্য কোথাও চলে যায়, আবার ফিরে আসে। মদ ছাড়া তার আর অন্য কোনও বিলাসিতার দাবি নেই। তাকে ত্রিপুরার রাজকুমারদের শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে দিতে পারলে ভালই হত, কিন্তু জেনেশুনে কোনও শুভার্থীকে কি একটি মাতাল গছিয়ে দেওয়া যায় ?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার বন্ধু জগদীশ বসু বিলেতে আছেন। তাঁকে লিখতে পারি, যাতে তিনি দেখেশুনে একজন নিরপেক্ষ, প্রকৃত বিদ্বান ইংরেজকে এদেশে পাঠাতে পারেন। কিংবা কুচবিহারের রাজা... হ্যাঁ, তিনিও তাঁর সন্তানদের জন্য ইংরেজ শিক্ষক রেখেছেন, তিনি সন্ধান দিতে পারবেন।

কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এখন দার্জিলিং-এ আছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিন পথে দেখাও হয়েছে। নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে রাধাকিশোরের পরিচয় নেই, যদিও তাঁরা দুই প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা। যুদ্ধের সময় ছাড়া রাজায় রাজায় কদাচিৎ মোলাকাত হয়। রাজা-রাজড়ারা সাধারণ মানুষের মতন ছুট করে একে অন্যের কাছে যেতে পারেন না, অনেক রকম বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ভড়ং ছাড়া তাঁদের চলে না। এই দু'জনের সাক্ষাৎকারের জন্য কারুর মধ্যস্থতার প্রয়োজন।

তাতে কোনও অসুবিধা নেই। কুচবিহারের রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এখন কুটুম্বিতার সম্পর্ক। স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ বিয়ে করেছে এই রাজ পরিবারের এক কন্যাকে। নববিধান ও আদি ব্রাহ্ম সমাজ, এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গেই কুচবিহার রাজবাড়ির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

কুচবিহারের রাজা ও রাজপুত্ররা শিক্ষিত তো বটেই, জীবনযাত্রায় অনেকটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। তবে কলকাতা, দার্জিলিং বা লন্ডনে তাঁদের মহিলারা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেও, কুচবিহার রাজ্যে তাঁরা পর্দানশীন, সেখানে বংশানুক্রমিক রীতিনীতি মেনে চলেন। রাধাকিশোর ত্রিপুরা ও বাংলার বাইরে কোথাও যাননি, নৃপেন্দ্রনারায়ণের কাছে ইওরোপ পর্যন্ত জলভাত। রাধাকিশোর অন্তর্মুখী, মৃদুভাষী এবং কিছুটা ঘরকুনো, নৃপেন্দ্রনারায়ণ বহির্মুখী, খেলাধুলো ও শিকারে দক্ষ। কেশব সেনের কন্যা, মহারানি সুনীতি দেবীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একাধিক গল্প বানিয়ে শুনিয়েছেন। এখনও দেখা হলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ভূতের গল্প শোনবার বায়না করেন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে এসে রবীন্দ্রনাথ কথায় কথায় দেশীয় রাজাদের মধ্যে একতাবন্ধনের বিষয়টি তুললেন। এখন তো আর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশ্ন নেই, মাঝখানে ইংরেজ চোখ রাঙিয়ে আছে, এখন বরং দেশীয় রাজারা যদি পরস্পরকে সাহায্য করেন, তা হলে তাঁদেরই শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ এসব ব্যাপার নিয়ে কখনও মাথা ঘামাননি, সুনীতি দেবী রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব শুনে বললেন, ঠিকই তো। ত্রিপুরা রাজ্যটি এত কাছে, অথচ ওদের সম্পর্কে আমরা কত কম জানি। রবিবাবু, শুনি তো ওখানকার রাজার সঙ্গে আপনার খুব সৌহার্দ্য, আপনি ত্রিপুরায় গেছেন?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, শীঘ্রই যাবার ইচ্ছে আছে।

সুনীতি দেবী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কুচবিহারে আসবেন না?

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ডাকলেই ছুটে যাব। রাজসভার আহ্বান পেলে কোন কবি উপেক্ষা করতে পারে?

একটু পরে তিনি আবার বললেন, বেয়ান, আপনার স্বামী ব্যস্ত মানুষ, সাহেব-সুবোদের সঙ্গে সবসময় ঘোরা ফেরা করতে হয়। দুই রাজার সম্মিলন হওয়া বিশেষ দরকার। আপনিই তার উদ্যোগ নিন না।

সুনীতি দেবী বললেন, অবশ্যই। তা হলে একটা শুভদিন ঠিক করা যাক।

সেই শুভদিন পর্যন্ত অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করতে পারলেন না। দার্জিলিং থেকেই প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে চিঠি চালাচালি চলছিল, প্রিয়নাথ এক চিঠিতে জানালেন যে, মেয়ে দেখার ব্যাপারে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেটে গেছে। এবার পাত্র স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেছে, প্রিয়নাথের অনুরোধে সে জানিয়েছে যে পাত্র-পক্ষই ঠাকুরবাড়িতে যাবে, সেখানে পাকাদেখার অনুষ্ঠান হবে। এবার রবীন্দ্রনাথের দ্রুত ফেরা দরকার।

বিবাহ-বাসর হল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে। ইংরেজি শতাব্দী শেষ হতেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এই এক নতুন আলো, বিদ্যুৎ। শুধু আলো নয়, এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগাবার অসীম সম্ভাবনা। অনেকে বিস্ময়ে বলাবলি করছে, এই নতুন শতাব্দী হবে বিদ্যুতের যুগ।

ঠাকুর বাড়িতে আর কোনও উৎসবে এমন আলোর ঝলমলানি দেখা যায়নি। এই উৎসবের রাতে কন্যার পিতাই যেন সবচেয়ে তৃপ্ত মানুষ। শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা হয়েছে, সব কিছুই সম্পন্ন হল সুষ্ঠু ভাবে। ঋজু স্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র জামাইটিকেও তাঁর খুব পছন্দ হল।

এরপর মাস দেড়েক যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার বিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। ঠাকুরবাড়িতে ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম নয়, হঠাৎ যেন তাদের বিয়ের একটা ধুম পড়ে গেছে। এই বছরেই হুড়োহুড়ি করে এত বিবাহের কারণ কী?

প্রকৃত কারণটি স্বার্থগত, তা অবশ্য কেউই স্বীকার করবে না প্রকাশ্যে। কিংবা চিন্তাটি হয়তো অনেকেরই অবচেতনে সুপ্ত। এখন পর্যন্ত এ পরিবারের সকলেরই বিবাহের খরচ দেন দেবেন্দ্রনাথ

তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে। অশীতিপর দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি হঠাৎ কবে চলে যাবেন তার ঠিক নেই। তিনি চক্ষু বুজলেই ভাইদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যাবে, তখন সব খরচই প্রত্যেকের নিজস্ব। দেবেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে পারলে বেশ কয়েক হাজার টাকা বাঁচানো যায়।

প্রেমতোষ বসু এক প্রেসের মালিক, রবীন্দ্রনাথের বই যত্ন করে ছাপেন। তিনি একদিন বললেন, তাঁর এক বন্ধুর ভাইপো ডাক্তার, সে আবার হোমিওপ্যাথি পড়বার জন্য বিলাত যেতে চায়। সেখানে যাবার সঙ্গতি নেই, তাই কোনও উচ্চ পরিবারে বিয়ে করার জন্য উৎসুক। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য নামে সেই ছেলেটিকে দেখতে চাইলেন, কথাবার্তা শুনে পছন্দ হয়ে গেল, ছেলেটিকে বিলেত পাঠাবার ও সেখানে পড়াশুনো চালাবার খরচ জোগানোর শর্তে রাজি হয়ে সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন। টাকা তো যাবে পিতার তহবিল থেকে। মাত্র তিন দিন পরেই তারিখ।

মাধুরীলতার বিবাহ হয়েছিল ১লা আষাঢ়, রেণুকার বিবাহ হল ২১ শে শ্রাবণ। রেণুকার বয়েস মাত্র সাড়ে দশ। যে-কবি এক সময় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছিলেন, এখন প্রয়োজনের তাগিদে তা বিস্মৃত হলেন। কবি নয়, কন্যার পিতা হিসেবে তাঁর এবারের ব্যবস্থা নিখুঁত ও সার্থক।

কবিকে তার মূল্যও দিতে হল। পরের দু'তিন মাস তাঁর মাথায় একটাও কবিতা এল না, কণ্ঠে এল না নতুন গান। শুধু গদ্য!

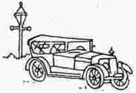

৫৪

লম্বা রেল গাড়ির বাষ্পীয় ইঞ্জিন দৈত্যের মতন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে এসে থামল হাওড়া স্টেশনে। থামার পরেও সে ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করতে লাগল। থামার সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে সাধারণ যাত্রীদের নামার নিয়ম নেই, দরজা খোলা হয় না। আগে ফার্স্ট ক্লাশ থেকে সাহেবলোকেরা অবতরণ করবে, তাদের মালপত্র কুলিরা নিয়ে যাবে, তারপর সাধারণ যাত্রীদের পালা। তৎক্ষণাৎ হুড়োহুড়ি, শোরগোল শুরু হয়ে গেল। যারা পৌঁছাল এবং যারা এই ট্রেনে যাবে, সেই দুই দলের চলতে থাকে ধাক্কাধাক্কি, একদল কামরা থেকে নামবার আগেই অন্য দল ওঠার চেষ্টা করে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টিকিট পরীক্ষক এই ঠেলাঠেলি দেখে বক্রভাবে হাসছেন। এই নেটিভদের মধ্যে কিছুতেই শৃঙ্খলা আনা যাবে না। শৃঙ্খলাবোধ জিনিসটাই ভারতীয়দের জাতিগত চরিত্রে নেই। সেই জন্যই তো বারবার এরা সংখ্যালঘু বিদেশি আক্রমণকারীদের কাছে মস্তক বিক্রয় করে।

ভরতের বুকের মধ্যে যেন ধক ধক শব্দ হচ্ছে। বর্ধমান ছাড়াবার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা বোধ করছে সে। অনেকদিন পর তার কলকাতায় ফেরা। তাও সে স্বেচ্ছায় আসতে চায়নি, শিউপূজনের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গী হতেই হল। ভরত অনেকবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও কলকাতায় না আসার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ সে দেখাতে পারেনি। সে রকম কোনও কারণও তো নেই, সে এই শহর থেকে বিতাড়িতও হয়নি, কোনও রকম অপরাধ করেও পালায়নি।

শিউপূজনের আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিউপূজন অনেক সাহায্য করেছে তাকে, আগুনে সব পুড়ে যাবার পর ভরতকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। একটা পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙে গিয়েছিল, প্রায় দু'মাস শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল ভরত, তখন শিউপূজনের বাড়ির লোকজনই তো সেবা করেছে তার। এখন সুস্থ হলেও মাঝে মাঝে বাঁ হাঁটুর মালাইচাকি টনটন করে।

প্ল্যাটফর্মে টেবিল পেতে বসে আছে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা। এই ট্রেনে উত্তর ভারতের নানা রাজ্য থেকে বহু প্রতিনিধি এসেছে, তারা লাইন দিচ্ছে এক একটা টেবিলের সামনে। শিউপূজন ভরতকে নিয়ে এক জায়গায় যেতেই একজন স্বেচ্ছাসেবক বলল, কোন স্টেট থেকে এসেছেন? বিহার? বিহারের ডেলিগেটদের থাকার জায়গা হয়েছে রিপন কলেজে। সুরেন বাড়ুজ্যের রিপন কলেজ কোথায় চেনেন তো? না চিনলে শেয়ালদা স্টেশনের কাছে চলে যান। ওখানে যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।

জাহাজ চলাচলের জন্য হাওড়ার সেতু এখন খুলে রাখা হয়েছে, তাই গঙ্গা পেরুতে হল নৌকায়। গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বুক ভরে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল ভরত। অনেক দিন পর তার বুকে এল বাংলার বাতাস। তার নিয়তি তাকে এখানে টেনে এনেছে। আবার কী ঘটবে কে জানে!

এপারে এসে ওরা একটা ফিটন গাড়ি ভাড়া করল। শিউপূজন ধনী ব্যবসায়ী, সে ইচ্ছে করলেই হোটেলে উঠতে পারে। কিন্তু সে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই থাকবে ঠিক করেছে। অনেক বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টারও সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে থাকা-খাওয়া করছেন। নেতা হতে গেলে প্রথম প্রথম এই সব প্রতিনিধিদের সম পর্যায়ে নেমে এসে তাদের মন জয় করতে হয়।

ফিটনের জানলা দিয়ে ভরত উৎসুকভাবে দেখছে দু'পাশের দৃশ্য। এই ক'বছরে কলকাতা শহরের বহিরঙ্গের বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি, বাড়িঘরগুলি একই আছে। প্রায় দশ বছর পর। ছাত্র বয়েসে এই সব রাস্তা দিয়ে কতবার পায়ে হেঁটে ঘুরেছে ভরত।

হঠাৎ পাশ দিয়ে পঁক পঁক শব্দ করে কী একটা গাড়ি যেতেই ওরা চমকে উঠল। শিউপূজন জিজ্ঞেস করল, ওটা কী?

ভরত একটু সামলে নিয়ে ভাল করে দেখে বলল, এটাই মনে হচ্ছে মটোরকার, অর্থাৎ অটো বা অটোমোবিল! ইদানীং এই গাড়ির কথা খুব শোনা যাচ্ছে।

শিউপূজন বলল, এই সেই গাড়ি? এঃ কী বিচ্ছিরি!

গাড়িটার ওপর ও চারদিক খোলা। একটি গোল স্টিয়ারিং ধরে টুলের ওপর বসে আছে চালক। গাড়ি চালাবার জন্য তার কোনও পরিশ্রম নেই, সে এক হাতে একটি রবারের বলের মতন বস্তু টিপে পঁক পঁক শব্দ করছে অনবরত। গাড়িটা চলছে ধক ধক করে কেঁপে কেঁপে। অবশ্য গতি আছে বেশ।

শিউপূজন জিজ্ঞেস করল, কেউ ঠেলছে না, কিংবা কিছুতে টানছে না, তা হলে এ গাড়ি চলছে কী করে?

ভরত বলল, আমরা যে রেলগাড়িতে এলাম, তা কি কেউ ঠেলেছে বা টেনেছে, বাষ্প-যন্ত্র টেনে নিয়ে এল। এ গাড়িও টানছে সে রকম কোনও যন্ত্র।

শিউপূজন নাসিকা কুঞ্চিত করে বলল, কিন্তু ভরতভাইয়া, আমাদের দু'ঘোড়ার জুড়িগাড়ি কত সুন্দর। কিংবা চার ঘোড়ার গাড়ি যখন ঝমঝমিয়ে চলে, তখন মনে হয় না যে রাজা-মহারাজদের এই রকম গাড়িই মানায়! তার সঙ্গে এই ন্যাড়া গাড়িগুলোর কোনও তুলনা চলে? আমি বলে রাখলাম দেখো, এ গাড়ি চলবে না! কেউ নেবে না।

ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াগুলোও এই অদ্ভুত দর্শন মটোর গাড়ির দিকে অবজ্ঞার চক্ষে তাকাচ্ছে।

রিপন কলেজ ছুটি দিয়ে কলেজের ঘরগুলিতে বেশ কিছু প্রতিনিধিদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে অব্যবস্থার চূড়ান্ত। যত লোক এসেছে, সেই তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম। চেয়ার-বেঞ্চগুলি বারান্দায় জড়ো করা ছিল, অনেকে সেইগুলিও সাজিয়ে বারান্দায় খানিকটা অংশ দখল করে প্রায় সংসার সাজিয়ে ফেলেছে। তার ফলে পদে পদে বাধা পড়ছে যাতায়াতের পথে। কিছু আগে জল ঢেলে ঘরগুলি ধোওয়া হয়েছিল, এখনও জল থিকথিক করছে চারদিকে। এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ স্বপাকে খাবার জন্য ছোট ছোট উনুন ধরিয়ে ফেলেছে, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে।

শিউপূজন ও ভরত হাওড়া স্টেশনের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে একটি কুপন এনেছিল, সেটির জোরে একটি ঘরের দখল পেল। তখন তাদের মনে পড়ল, তারা তো বিছানা আনেনি। গরমকাল হলে তবু কথা ছিল, এখন বেশ শীত, বিছানা-কম্বল ছাড়া তো রাত কাটানো যাবে না! অন্য ঘরে অনেকেই বিছানা পাততে শুরু করেছে, তারা সবাই কি বিছানা এনেছে? পাশের ঘরটিতে উঁকি মেরে সে কথা জিজ্ঞেস করতেই জানল যে, দু'চারজন বুদ্ধি করে বেডিং সঙ্গে এনেছে বটে, তবে অনেকেই আনেনি। তা হলে কি নতুন বিছানা কিনতে হল? না, তারও দরকার নেই, এখানে বিছানা ভাড়া পাওয়া যায়, মশারি সমেত, মোড়ের মাথায় হোটেলের উল্টো দিকে ডেকরেটার্সের দোকান।

শিউপূজন বলল, আজব শহর, এখানে বিছানাও ভাড়া পাওয়া যায়।

একজন কেউ টিপ্পনি কাটল, শুধু বিছানা কেন, চাইলে সারা রাতের জন্য শয্যাসঙ্গিনীও ভাড়া পাওয়া যেতে পারে এই শহরে।

কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছে বলে যে রঙ্গ-রসিকতা করতে পারবে না, এমন কোনও কথা নেই। কেউ কেউ এর চেয়ে অনেক গাঢ় রসের কথা বলতেও দ্বিধা করে না।

কোনওভাবে রাত্রি কেটে গেল, সকালবেলা আর এক বিপর্যয়। এত মানুষ প্রাতঃকৃত্য সারবে কোথায়? স্কুল-কলেজের শৌচালয় এমনিতেই অপরিচ্ছন্ন থাকে, এখন এত মানুষের ব্যবহারে তা নরককুণ্ডের রূপ ধারণ করেছে। দুর্গন্ধে কাছেই যাওয়া যায় না। কোনও ধাঙড়ের টিকিরও দেখা নেই। শিউপূজন কানে পৈতে লাগিয়ে, হাতে গাড়ু নিয়ে নীচে নেমে এসে এই অবস্থা দেখে আমসিপানা মুখ করে ভরতকে বলল, কী সর্বনাশ, এখানে থাকা যাবে কী করে!

নানা প্রদেশের, নানা ভাষার মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাষায় অভিযোগ শুরু করেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, দূর থেকে শোনা যায় শুধু একটা কলরোল। অভ্যর্থনা সমিতির একজন সদস্য সকালের চা-জলপানের ব্যবস্থা করতে যেই এলেন, অমনই সকলে হই হই করে ঘিরে ধরল তাঁকে। তিনি আসলে যাচ্ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলকের সেবাযত্ন করতে, তিলক আছেন এই বাড়ির অন্য অংশে, প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে, সেখানে ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই। বিব্রতভাবে তিনি বলে উঠলেন, তাই তো, কেউ সাফাইয়ের ব্যবস্থা করেনি, সে কী কথা! ভলান্টিয়াররা কোথায়? ভলান্টিয়ার, ভলান্টিয়ার—

হাঁকডাক করে একজন স্বেচ্ছাসেবককে আনা হল। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য তাকে বললেন, ওহে হরদুলাল, শিগগির ধাঙড়ের ব্যবস্থা করো। এই সব ভদ্রলোকদের কত কষ্ট হচ্ছে, এঁরা বাইরে থেকে এসেছেন—

তিনি হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন তিলকের কাছে। হরদুলাল চেঁচিয়ে বামাচরণ, বামাচরণ বলে একজনকে ডাকল। বামাচরণ এলে হরদুলাল বলল, ওহে বামাচরণ, শিগগির দু'চারটি মেথর ডেকে আনো, প্রতিনিধিরা পাইখানায় যেতে পারছেন না। আমার অন্য কাজ আছে। হরদুলাল সরে পড়তেই বামাচরণ আবার হাঁক দিল, ওহে ভক্তিভূষণ, একবার এদিকে এসো তো, এই পাইখানা-পেচ্ছাবখানাগুলো কী করে সাফ করা যায় একটু দেখো তো, ধাঙরপট্টি থেকে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে এসো, এনাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে, আমাকে আবার ফুল জোগাড় করতে হবে, অনেক ফুল

এই অবস্থার মধ্যেও ভরত হাসি দমন করতে পারছে না। বাঙালিদের সে ভাল করেই চেনে, নিজেরা কোনও কাজে হাত লাগাবে না, দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যাপারে তারা খুব পটু। স্বেচ্ছাসেবকরা একজন আর একজনের নাম হাঁকাহাঁকি করছে, সারা দিনেও কোনও ব্যবস্থা হবে কিনা সন্দেহ!

বেগ সামলাতে না পেরে শিউপূজন বসে পড়েছে উঠোনের এক কোণে। লজ্জার মাথা খেয়ে এরকম আরও কয়েকজন এখানে সেখানে বসে পড়ে। ভরত কোন দিক থেকে যে চোখ ফেরাবে তা বুঝে পায় না। শুধু যে অস্বস্তি লাগে, তাই না, হঠাৎ ঝাঁকুনি লাগার মতন গা ঘিনঘিন করে ওঠে। ভরত তখনই ঠিক করে নিল, এখানে আর থাকা চলবে না।

এই সময় একটি অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। একজন লোক হাতে একটি নতুন ঝাঁটার বাণ্ডিল ঝুলিয়ে নিয়ে এসে জটলার মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে, প্রথমে হিন্দিতে, তারপর ইংরেজিতে বলল, ভাই ও বন্ধুরা, আমার একটি নিবেদন অনুগ্রহ করে শুনুন। দেখাই যাচ্ছে,

অভ্যর্থনা কমিটি মেথর-মুদ্দোফরাস নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ঠিক মতন করেননি বা করতে পারেননি। আগামীকাল নিশ্চয়ই করবেন। শৌচালয়গুলি অত্যন্ত নোংরা, দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। শৌচালয় ব্যবহার না করে শহরের সভ্য সমাজে জীবনধারণ করা যায় না, দেশোদ্ধারও করা যায় না। সুতরাং এগুলি আমাদেরই পরিষ্কার করে নিতে হবে। আমি বৈঠকখানা বাজার থেকে চারটি নতুন ঝাঁটা কিনে এনেছি। আমার সঙ্গে হাত লাগাবার জন্য আরও তিনজন অন্তত এগিয়ে আসুন!

সবাই স্তম্ভিত! এই লোকটা বলে কী! ভদ্রঘরের ছেলেরা নিজেরা ঝাঁটা হাতে নিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করবে! তাতে জাত যাবে না! কলিকাল বলে কি বামুন-কায়েত আর মেথর এক হয়ে যাবে?

সেই লোকটি ধুতি ও ফতুয়া পরা, চেহারায় তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই, শ্যামবর্ণ, মধ্যম আকৃতি, নাকটা একটু লম্বা, বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ। তার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাস। ঠোঁটে মৃদু হাসি। তার ইংরেজি উচ্চারণ খুব পাক্কা। তবে তাকে এখানে অন্য আর কেউ চেনে না।

সে আবার বলল, আপনারা কি এ কাজটা ঘৃণ্য মনে করছেন? আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যেই তো খানিকটা করে পুরীষ ও প্রস্রাব জমে থাকে। তা হলে তো নিজের শরীরটাকেই ঘৃণা করতে হয়! উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা কারুর শরীরই পুরীষ-প্রস্রাব মুক্ত নয়। তা হলে? আসুন, হাত মেলান, দেখবেন নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে বিশেষ আনন্দ আছে।

তবু কেউ এগিয়ে গেল না।

লোকটি তাতেও রাগ করল না বা আর কথা বাড়াল না। হাত জোড় করে নমস্কার জানাল সবাইকে। তারপর একটি ঝাঁটা নিয়ে সে মল-মূত্র ঝাঁট দিতে শুরু করে দিল।

ভরত আস্তে আস্তে সরে যাবার উপক্রম করছিল, হঠাৎ তার খুব বিবেক-দংশন হল। এতগুলি মানুষের মধ্যে ওই একজন শুধু একদিকে, বাকি সকলে অন্য দিকে। ওই লোকটি যেন এক অসম সাহসী যোদ্ধার মতন, আর অন্যরা সবাই কাপুরুষ।

সে ছুটে গিয়ে একটা ঝাঁটা তুলে নিল। লোকটি সস্মিতভাবে বলল, এসো বন্ধু। আমি গুজরাত থেকে আসছি। এই প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে এলাম। আমার নাম এম কে গান্ধী। আর তুমি?

ভরত বলল, আমার নাম ভরতকুমার সিংহ, আমি .... আমি এসেছি পাটনা থেকে।

গান্ধী বলল, আমরা কিন্তু সব কটা শৌচালয় পরিষ্কার করবো না। কেউ যেন মনে না করে, আমরা বিনা খরচের মেথর। সবাইকে বোঝাতে হবে, এটা তাদেরই কাজ। আমি ঠিক মতন উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি বলে অন্য আর কেউ হাত লাগাতে আসেনি।

গান্ধী ও ভরত যে দু'টি শৌচালয় পরিষ্কার করে দিল তা ব্যবহার করবার জন্য অন্যদের মধ্যে আবার ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। এবং এই ব্যবহারকারীরাই পরে নির্লজ্জের মতন ঘৃণার চোখে তাকাতে লাগল ওই দু'জনের দিকে। যদিও ওরা দু'জন স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরেছে, তবু যেন ওরা অস্পৃশ্য। কেউ চিঁড়ে মুড়ি খেতে বসে হঠাৎ গান্ধী বা ভরতকে দেখতে পেলে মুখ ফিরিয়ে বসে। এমনিতেই এখানে বারো জাতের তেরো হাঁড়ি। এক প্রদেশের প্রতিনিধিরা অন্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের হাতের ছোঁওয়াও খাবে না। এর পরেও আছে একই প্রদেশের মানুষের মধ্যে জাতের ভাগাভাগি। তামিলদের ছুঁৎমার্গ সবচেয়ে বেশি। খাদ্য গ্রহণের সময় অন্য কোনও জাতের মানুষকে দেখলেই তাদের সব কিছু দূষিত হয়ে যায়। তাই উঠোনের মাঝখানে খানিকটা জায়গা চ্যাঁচার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে তামিল গোষ্ঠীর জন্য, সেখানেই তাদের রান্না বান্না, খাওয়া দাওয়া, হাত ধোওয়া, সব কিছু চলে। ভেতরটা অত্যন্ত নোংরা ও রাশি রাশি মাছি ভনভন্ করে। তবু অন্য মানুষের দৃষ্টি বাঁচিয়ে তাদের পবিত্রতা রক্ষা হয়।

গান্ধী নামে যুবকটির সঙ্গে ভরতের বেশ ভাব হয়ে গেল। সে অতি স্বল্পাহারী ও নিরামিষাশী, কিন্তু শরীরে আলস্য বলে কোনও বস্তু নেই। অতি ভোরে উঠে প্রাতর্ভ্রমণ করে আসে কয়েক মাইল,

ফিরে এসে প্রতিদিনই শৌচালয় ঘটিত সমস্যা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। সারাদিন ধরে সে ঘুরে ঘুরে কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, লোকমান্য তিলক কিংবা গোখলের মতন প্রখ্যাত নেতাদের কাছে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা শোনে। এতেও তার কর্মতৃষ্ণা মেটে না। কংগ্রেস অধিবেশনের আরও কয়েক দিন বাকি। সারা ভারত থেকে যত প্রতিনিধি এসেছে, তারা এই ক'দিন শুধু খাবেদাবে আর গালগুজব করে সময় কাটাবে কেন, তাদের প্রত্যেককেই কোনও না কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত।

গান্ধী এর আগেও একবার কলকাতায় এসেছিল বছর চারেক আগে। সেবার এসেছিল সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে, এখানে পরিচিত কেউ ছিল না। উঠেছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে, অঙ্গে ছিল সাহেবি পোশাক, মাথায় শোলার টুপি পর্যন্ত। এবার সে এসেছে কংগ্রেসের একজন সাধারণ প্রতিনিধি হিসেবে। সে যে একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার সে পরিচয়টাও কাউকে জানাতে চায় না। এখন সে রাস্তায় বেরুবার সময় প্যান্টালুনের ওপর পার্শিদের মতন গলাবন্ধ কোট পরে, মাথায় পাগড়ি।

লোকটিকে খানিকটা মজারও মনে হয় ভরতের। এমন জোর দিয়ে এক একটা বিষয়ে কথা বলে যেন বিশ্ব সংসারে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ওপর কী সব অবিচারের কথা সে বারবার উত্থাপন করে। এদেশে ইংরেজের অত্যাচার-অবিচারের শেষ নেই, দক্ষিণ আফ্রিকার কলোনিতে তার ব্যতিক্রম আর কী হবে!

গান্ধী কলকাতা শহর ঘুরে ঘুরে দেখতে চায়, ভরত তাকে রাস্তা চিনিয়ে সঙ্গে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। গান্ধী ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে একা পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখবে, মাঝে মাঝে পথ ভুল করলেও ক্ষতি নেই, পায়ে হেঁটে না ঘুরলে শহর চেনা যায় না।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে কালীঘাটের মন্দিরে পৌঁছে যাবার পর গান্ধীর এই শহর দেখার শখ অনেকটাই ঘুচে গেল। এই বিখ্যাত মন্দিরের কথা গান্ধী আগেই শুনেছিল। কাছাকাছি যেতে যেতেই দেখল পাল পাল পাঁঠা-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মন্দিরের দিকে। রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ হয়ে বসে আছে ভিখিরিরা, কতরকম তাদের কৃত্রিম আর্তরব। কিছু কিছু সাধুসন্ন্যাসীও ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণে গড়াচ্ছে রক্তস্রোত, কোথাও জমে থাকা রক্ত চাটছে কুকুর, হাঁড়িকাঠে আর একটি ছাগবলির উদ্যোগ চলছে, ঢাক-ঢোল কাঁসির শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সেই অসহায় পশুটির মৃত্যুচিৎকার। কোথাও একটুও আধ্যাত্মিক পরিবেশ নেই, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য নেই। এই দেবস্থানে শুধু বীভৎসতা আর হিংস্রতার প্রকাশ। গান্ধীর মাথা ঘুরতে লাগল, দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল।

এক সাধু হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, এই বেটা, কোথা যাচ্ছিস, বোস এখানে!

গান্ধী এক বাড়ির রকে বসে ঘন ঘন নিশ্বাস নিয়ে খানিকটা সুস্থ হল। বাপরে বাপ, এরকম রক্তারক্তির দৃশ্য সে জীবনে কখনও দেখেনি, বাকি জীবনে ভুলতে পারবে না বোধহয়। মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, সাধু মহারাজ, এই পশুবলির সঙ্গে ধর্মের কী সম্পর্ক। আমায় একটু বুঝিয়ে দেবেন?

সাধুটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, এর আবার বোঝাবার কী আছে? কোনও সম্পর্কই নেই। পশুবলি-টলির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। যে সব হিন্দুরা নিজেরা মাছ মাংস খায়, তারাই দেবতার নামে পশুবলি দেয়। আর যে সব হিন্দু নিরামিষাশী, তাদের কখনও পশুবলি দিতে দেখেছ?

গান্ধী বলল, তা হলে আপনারা এই পশুবলির বিরুদ্ধে প্রচার করেন না কেন?

সাধুটি বলল, কিছু প্রচার-টচার করা আমাদের কাজ নয়। আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য সংসার ছেড়েছি।

গান্ধী বলল, তা হলে এই রক্ত-ক্লেদ মাখা পরিবেশ ছেড়ে আপনারা পবিত্র কোনও স্থানে ঈশ্বরের আরাধনা করতে যেতে পারেন না!

সাধুটি দু'হাত উল্টে বলল, আমাদের কাছে সব জায়গাই সমান।

পাশে দাঁড়িয়ে একটি কলেজে-পড়া ছেলে এই কথাবার্তা শুনছিল। সে এবার টিপ্পনি কাটল, হ্যাঁ। সাধুদের কাছে সব জায়গাই সমান। তবে, যে-সব সাধুরা মদ-মাংস-মাগি নিয়ে সাধনা করে তারাই এই রকম মন্দিরের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। আজকাল আর হিমালয়ে সাধুদের মন টেকে না।

সাধুটি চিমটে তুলে ছোকরাটিকে মারতে তাড়া করল।

সারাদিন মন ভার হয়ে রইল গান্ধীর। বারবার চোখে ভেসে ওঠে সেই বীভৎস রক্তের দৃশ্য। পশুবলির কথা সে আগে শুনেছে বটে, কিন্তু তার এই রূপ, তা সে জানত না। সদ্য কাটা পশুর ধড় তখনও ছটফট করছে, তার পাশেই দাঁড়িয়ে নির্বিকার মুখে হাসি-গল্প করছে অন্য লোকেরা। এই বলির ব্যাপারটা বাংলা দেশেই বেশি হয়।

সন্ধেবেলা এক বাঙালিবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হল গোখলের সঙ্গে। রুচিশীল পোশাক পরিচ্ছদ পরা সব ব্যক্তি, দু'একজন মহিলাও সকলের সামনে বসে গান গাইলেন। অনেকেই বেশ শিক্ষিত, বাঙালিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আরাম পাওয়া যায়। তারা অনেক কিছু জানে, এমনকী দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখে।

গান্ধী ভাবল, এই সব ভদ্র, সুসভ্য মানুষেরা কি জানে না যে ধর্মের নামে তাদের মন্দিরগুলিতে অসহায় পশুদের কী নৃশংসভাবে বলি দেওয়া হচ্ছে!

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেই তিনি অবহেলার সঙ্গে বললেন, ওতে কী হয়, পাঁঠা-ছাগলদের তো ব্যথার বোধই নেই। বলি দেবার সময় এত জোরে জোরে ঢাক-ঢোল বাজানো হয় যে, পাঁঠারা মৃত্যু-যন্ত্রণাও টের পায় না।

এমন অদ্ভুত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গান্ধী কখনও শোনেনি। পাঁঠারা কি মানুষদের জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের ব্যথা-ট্যাথা লাগে না, মৃত্যুর কষ্টও তারা বুঝতে পারে না। তারা শুধু শুধু আর্ত চিৎকার করে!

গান্ধী বলল, তা হলেও... দেবস্থান পবিত্র স্থান, সেখানে জীবহত্যা, অত রক্তের ছড়াছড়ি, দেখতেও তো খারাপ লাগে!

ভদ্রলোক অধর উল্টে বললেন, কে ওসব বলি-টলি দেখতে যায়! আমি যাই না। হ্যাঁ, মাংস খেতে ভাল লাগে তা ঠিকই, তা কোথায় সে পাঁঠা কাটা হল, দোকানে না ঠাকুরের সামনে, তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

গান্ধী বুঝতে পারে না, এটা নির্লিপ্তি না উদাসীনতা, না সূক্ষ্মবোধের অভাব?

রাত্রে রিপন কলেজে ফিরে এসে সে অনেকক্ষণ ভরতের সঙ্গে গল্প করে। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। অধিকাংশ প্রতিনিধিই তাড়াতাড়ি শয্যায় আশ্রয় নেয়। গান্ধীর ঘুম কম। সে ঘুমোতে যায় সকলের শেষে, জেগে ওঠে সকলের আগে। ভরত আর সে অন্য কোথাও স্থান না পেয়ে সিঁড়িতে বসে সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলে।

কালীঘাট মন্দিরের দৃশ্যের বর্ণনা দিতে দিতে বারবার শিহরিত হচ্ছে গান্ধী। ভরত অবশ্য বলিদান অনেক দেখেছে। ত্রিপুরাতেও অনেক মন্দিরেই নিয়মিত বলি হয়। ওড়িশায় কিন্তু তেমন চল নেই। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রেও বিশেষ চোখে পড়ে না। কালীঘাট মন্দিরে অনেকেই মানতের বলি দিতে আসে, এক একদিন দুশো-আড়াইশো ছাগবলিও হয়।

গান্ধী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাই, একটা বিষয়ে একটু বুঝিয়ে দাও তো। এই বাঙালি জাতি এত বিদ্যোৎসাহী, এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আবার আবেগপ্রবণও বটে, সমাজ ও ধর্মসংস্কারের জন্য তারা কত কী করেছে, তাদের গান-বাজনা কত সুন্দর, তবু এই বাঙালিরাই ধর্মের নামে পশুবলির মতন এমন বর্বর প্রথা মেনে নিতে পারে? কেউ প্রতিবাদ করে না!

ভরত বলল, বাঙালিরা কী রকম জাত তুমি শোনো তা হলে। বাঙালিরা ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে, ধর্মসংস্কারের ব্যাপারে কেউ কিছু বললেই গেল গেল রব তোলে, কিন্তু এই বাঙালিরাই ব্যক্তি জীবনে ধর্মের প্রায় কোনও নির্দেশই মানে না। সততা, পবিত্রতা, সেবা, এই সব ব্যাপারে তারা প্রায় অধার্মিক। বাঙালিরা খুব পরের সমালোচনা করে, পরনিন্দা করে কিন্তু আত্মসমালোচনা করে না।

বাইরে খুব উদার মত প্রচার করে, নিজের পরিবারের মধ্যে অতি রক্ষণশীল। খবরের কাগজে তর্জন গর্জন দেখলে মনে হবে খুব সাহসী, আসলে অত্যন্ত ভীরু। নিজের মা-বোন-স্ত্রীকে যদি কোনও দস্যু চোখের সামনে ধর্ষণ করে যায়, তা হলেও বাধা দিতে সাহস করবে না। বাঙালিদের কিছু কিছু গান-বাজনা সত্যি ভাল বটে, কিন্তু কত রকম বিকট শব্দকে যে এই সমাজ প্রশ্রয় দেয়, তার ঠিক নেই। তুমি তো এখনও মাঝরাতে 'বল হরি হরি বোল' রব শোনোনি। হরির নাম শুনলে ভয়ে পিলে চমকে ওঠে। মোট কথা হল, বাঙালিরা বাইরে যতই উদার, শিক্ষাভিমানী, রুচিশীল ভাব দেখাক, আসলে তারা ভেতরে ভেতরে ভণ্ড! মুখে যা বলে, নিজে তা বিশ্বাস করে না। এমন ভণ্ড তুমি আর কোথায় পাবে!

গান্ধী বিস্মিতভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ভরতের দিকে। তারপর বলল, বাঙালিদের ওপর তোমার খুব রাগ দেখছি। তুমি বুঝি বাঙালি নও?

ভরত ইদানীং সর্বত্র বলে, আমি বাঙালি নই, আমি আসামের মানুষ। এখন অবশ্য তা বলল না। সে হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, শরীরে খুব রাগ এসে গিয়েছিল, রাগের কারণ সে নিজেই বুঝতে পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নাঃ, আমিও ওদেরই একজন, আমারও এই সব দোষ আছে।

গান্ধী বলল, কিন্তু তুমি তো বেশ আত্মসমালোচনা করলে। বাংলায় এত বড় বড় মানুষ আছেন, কেউ কি এই বলিদান বন্ধ করার কথা বলেননি? এতে যে মহান হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেই অন্যদের ভুল ধারণা হবে।

ভরত বলল, বড় বড় লোকদের কথা জানি না। তবে আমাদের একজন কবি বারবার প্রতিবাদ করেছেন, একটা উপন্যাসে, তারপর নাটকে, 'বিসর্জন' নাটকটির অভিনয়ও হয়েছে, তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আমি পড়েছি, বড় অপূর্ব। ত্রিপুরা রাজ্য নিয়েও বাংলার কেউ আগে এমন কিছু লেখেননি। কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তুমি নাম শুনেছ?

গান্ধী বলল, না শুনিনি। উনি কি শুধু বাংলায় লেখেন? ইংরিজিতে কিছু অনুবাদ হয়েছে?

ভরত বলল, তা আমি জানি না। ইংরিজিতে কিছু বেরিয়েছে বলে তো মনে হয় না।

গান্ধী বলল, আমি তো বাংলা জানি না, অনেকদিন ভারতেই ছিলাম না। বাঙালি কবির লেখা পড়ব কী করে, বলো। এই কবি প্রতিবাদ করেছেন?

ভরত বলল, এই কবির বাবা আরও বিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনেকে তাঁকে এখন মহর্ষি বলে!

গান্ধী এবার উৎসাহিত হয়ে বলল, অবশ্যই তাঁর নাম জানি। বিলেতে থাকার সময় ... ওখানে অনেক ব্রাহ্মদের কথা শুনেছি। আমি ব্রাহ্মদের সম্পর্কে ভাল করে জানতে আগ্রহী। প্রতাপ মজুমদারের বক্তৃতা শুনেছি একবার।

ভরত বলল, উনি তো কেশব সেনের দলের। ব্রাহ্মদের এখন অনেকগুলি ভাগ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গুরু

গান্ধী বলল, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব নিশ্চিত। কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেলে আরও কয়েকদিন থেকে যাব ভাবছি। কলকাতা শহরটা ভাল করে দেখব, বাঙালিদের ভাল রূপে চিনব।

পরদিন গান্ধী আর নগর পরিক্রমায় না বেরিয়ে সোজা চলে এল কংগ্রেস অফিসে। অভ্যর্থনা সমিতি দু'বেলা খাওয়াচ্ছে, তার বদলে সে কিছু শ্রমদান করতে চায়। কিন্তু কার কাছে সে প্রস্তাব দেবে?

অনেক বড় বড় নেতা এসেছেন এবারের সমাবেশে যোগ দিতে। সভাপতি হয়েছেন দিনশা ওয়াচা, তা ছাড়া এসেছেন ফিরোজ শা মেটা, চিমনলাল শেতলবাদ। গোখলে ও তিলককে নিয়ে মহারাষ্ট্রের দলটি বেশ প্রবল। সভাপতিকে হাওড়া স্টেশন থেকেই বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট একটি বাড়িতে। স্বেচ্ছাসেবকদের দৌরাত্ম্যে তাঁর কাছে এখন আর পৌঁছনোই যাবে না। ফিরোজ শা মেটা প্রায় রাজকীয় বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত, তিনি বম্বে থেকে

এসেছেন নিজের খরচে, ট্রেনে নিজস্ব সালুন ভাড়া নিয়ে, এখানে এসেও উঠেছেন বড় হোটেলে।

একমাত্র তিলকই রয়েছেন সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে রিপন কলেজে। বহিরাগত নেতাদের মধ্যে তিলকই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তিনি বিলাসী নন, সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, কিন্তু রাজা-মহারাজদের মতন প্রতিদিনই যেন নিজের কক্ষে একটা দরবার বসান। বিছানার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে থাকেন তিলক, লোকজনের নানান প্রশ্নের উত্তর দেন একটুও দ্বিধা না করে তীক্ষ্ম ভাষায়, চক্ষু দুটি যেন ঝকঝক করে। একমাত্র তাঁর মুখে হাসি ফোটে তাঁর বন্ধু মতিলাল ঘোষ এলে। মতিলাল সদাহাস্যময় পুরুষ।

তিলকের চেয়ে গোখলের সান্নিধ্যেই গান্ধী বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে। দু'জনের চরিত্র একেবারে বিপরীত, গোখলে ধীর স্থির, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। আর তিলক কথায় কথায় দপ করে জ্বলে ওঠেন, স্বভাবে উগ্র ও চরমপন্থি। এই দু'জনের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাবও রয়েছে। গান্ধী গোখলের কাছে কাজের প্রস্তাব দিতে তিনি বললেন, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও জানকীনাথ ঘোষাল হলেন এবারের কংগ্রেসের দুই সম্পাদক, তুমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলো।

আর তিনদিন পর অধিবেশনের উদ্বোধন, দুই সম্পাদকই খুব ব্যস্ত। ভূপেন্দ্রনাথ গান্ধীর কথা শুনে বললেন, আমি তো ভাই তোমায় কোনও কাজ দিতে পারছি না, তুমি ভাই ঘোষালবাবুর কাছে গিয়ে বলে দেখো তো, উনি যদি কিছু পারেন।

একটা প্রকাণ্ড টেবিলের এক পাশে বসে আছেন জানকীনাথ, প্রায় মুখ ডুবিয়ে আছেন কাগজের স্তূপে। পুরো দস্তুর সাহেবি পোশাক, এখন অবশ্য কোটটি চেয়ারে ঝোলানো, জামার বোতামগুলি খোলা। মুখ তুলে তিনি এই শ্যামলা রঙের রোগা যুবকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, নাম কী?

গান্ধী বলল, এম কে গান্ধী।

জানকীনাথ বলল, এম কে মানে? মুরলিকৃষ্ণ?

গান্ধী বলল, আজ্ঞে না, মোহনদাস করমচাঁদ।

জানকীনাথ বললেন, ওহে মোহনদাস, তুমি নিজে থেকেই কাজ করতে চাইছ, এ তো ভাল কথা। কিন্তু আমি যে কাজ দিতে পারি, তা অতি সাধারণ কেরানির কাজ। তুমি তাতে রাজি?

গান্ধী বলল, অবশ্যই। আমার সাধ্যমতন যে-কোনও কাজ করতেই আমি রাজি আছি।

জানকীনাথ বললেন, বাঃ, এই তো চাই! যুবকদের এ রকম মনোভাব থাকলে দেশের অনেক উপকার হয়।

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে ডেকে বললেন, ওহে, শোনো শোনো, এই ছোকরাটি কী বলছে, কোনও রকম কাজেই এর আপত্তি নেই, নিজে থেকে কাজ চাইতে এসেছে।

গান্ধীর আকৃতি, বেশভূষা দেখে স্বেচ্ছাসেবকরা খুব একটা মুগ্ধ হল না।

জানকীনাথ এক তাড়া কাগজের স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, মোহনদাস, এখানে রাশি রাশি চিঠি জমে আছে। ওই চেয়ারটায় বসে এগুলো পড়তে শুরু করো। শত শত লোক রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আমি কী করব বলো তো? অত লোকের সঙ্গে দেখা করে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবার মতন সময়ই বা কোথায়, চিঠিগুলিই বা পড়ি কখন? আমার সাহায্যের জন্য কোনও লোক দেওয়াও হয়নি। তুমি চিঠিগুলো পড়ে দেখো, যেগুলো খুব প্রয়োজনীয় মনে হবে, আমাকে দিয়ো।

গান্ধী বেশ খুশি হয়েই প্রতিটি চিঠি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল।

নানারকম লোকজন আসছে যাচ্ছে, তাতেও তার মনোযোগ বিঘ্নিত হল না। জানকীনাথ এক একবার উঠে চলে যাচ্ছেন কোথাও। যাবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়াতেই একজন আদালি ছুটে এসে তাঁর জামার বোতাম লাগিয়ে, কোট পরিয়ে দিচ্ছে। অপরাহ্নের দিকে তিনি একবার উঠে দাঁড়িয়ে আদালি, আর্দালি বলে হাঁক দিলেন। সেই লোকটিকে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। জানকীনাথ নিজের জুতোও পরতে পারেন না, একটা কাগজ নিয়ে পড়ছেন, টেবিলের তলা থেকে

জুতো খুঁজতে খুঁজতে ডাকছেন আদালিকে।

গান্ধী সকৌতুকে তাকিয়ে রইল জানকীনাথের দিকে। এ দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী হতে আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে!

উঠে গিয়ে সে নিজেই আর্দালির বদলে জানকীনাথের জামার বোতাম লাগিয়ে, কোট পরিয়ে দিল। জানকীনাথ অন্যমনস্কভাবে বললেন, তোমার কি আরও বাকি আছে? আমি চলি, কাল দেখা হবে।

পরদিন জানকীনাথ এসে দেখলেন, গান্ধী আগে থেকেই উপস্থিত হয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে কাজ শুরু করে দিয়েছে। জানকীনাথকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার। আপনার জন্য কয়েকটি চিঠির উত্তর মুসাবিদা করে রেখেছি—

জানকীনাথ গান্ধীর মুখের দিকে একটুক্ষণ অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খানিকটা লজ্জিতভাবে বললেন, কাল রাতে গোখলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি যে একজন ব্যারিস্টার, সে কথা আমাকে বলনি কেন? দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন করছে, তুমিই সেই গান্ধী! আরে ছি ছি, তোমাকে দিয়ে আমি কেরানি আর আর্দালির কাজ করিয়েছি! কী লজ্জার কথা! কিছু মনে কোরো না।

গান্ধী বিনীতভাবে বলল, না, না, আমি কিছু মনে করিনি। আপনারা কংগ্রেসের কাজ করতে করতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছেন, আমাদের অল্প বয়েস, আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, আমাদের সব রকম কাজই শেখা উচিত। আপনাদের কিছু সেবা করার সুযোগ পেলেও আমরা ধন্য হব।

জানকীনাথ মুগ্ধভাবে বললেন, তোমার মতন যদি সবাই বুঝত! কংগ্রেসের সৃষ্টির সময় থেকে আমি আছি। মিস্টার হিউমের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কিছুটা কৃতিত্ব নিতে পারি। তবে তোমাকে দিয়ে জামার বোতাম লাগানোটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার! তুমি দেখলে তো, কংগ্রেসের সেক্রেটারিকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নিজের জামার বোতাম আটকাবারও সময় পান না।

দুজনেই এবার হেসে উঠলেন এক সঙ্গে।

আগের দিন জানকীনাথ প্রায় কথাই বলেননি গান্ধীর সঙ্গে, আজ কাজের বদলে গল্পই করতে লাগলেন শুধু। দুপুরে খাবার সময় ওকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। তাকে খাইয়ে অবশ্য আনন্দ পাওয়া যায় না। অনেক কিছুই সে খায় না, আমিষ তো ছোঁয় না বটেই, নিরামিষের পরিমাণও যৎসামান্য।

কংগ্রেসের মূল অধিবেশন দেখে গান্ধী বেশ হতাশই হল। দারুণ সাজানো গোছানো মঞ্চ, উদ্বোধনের জাঁকজমকও চোখ ধাঁধানো, তবু সব কিছুই যেন অন্তঃসারশূন্য। সব মিলিয়ে যেন তিন দিন ব্যাপী এক বিরাট তামাশা। বড় বড় নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছেন ইংরিজিতে, এত ইংরিজির প্রাবল্য গান্ধীর পছন্দ হল না। ক'জন শুনছে আর ক'জন বুঝছে? দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই অধিবেশনের যেন কোনওই যোগ নেই।

শেষ দিকে একটার পর একটা রেজোলিউশন পাস হয়। আগের দিকে বক্তৃতায় এত বেশি সময় নষ্ট হয় যে শেষের দিকে তাড়াহুড়ো করে সারতে হয় সব কাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ে গান্ধীর নিজেরও একটা প্রস্তাব আছে, কিন্তু সেটা উত্থাপন করার জন্য সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না। গান্ধী গোখলেকে ধরে বসে আছে।

মূল সভাপতি, সাবজেক্ট কমিটির সভাপতি ও অন্য সবাই এখন শেষ করার জন্য ব্যস্ত। ফিরোজ শা মেটা মাঝে মাঝেই বলছেন, আর কিছু নেই তো? আর কিছু নেই তো? একবার গোখলে বললেন, এম কে গান্ধীর একটা রেজোলিউশন আছে, আমি পড়ে দেখেছি, সেটা বেশ যুক্তিসঙ্গত। ফিরোজ শা বললেন, তুমি যখন দেখেছ, ভাল বলছ, তখন আর আমাদের দেখার দরকার নেই। পাস করিয়ে দাও।

সভাপতি ওয়াচা বললেন, গান্ধী, এ বিষয়ে বলার জন্য তুমি ঠিক পাঁচ মিনিট সময় পাবে—

গান্ধী উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেছে, দু'তিন মিনিট যেতে না যেতেই সভাপতি টং টং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। গান্ধী থেমে গেল, হঠাৎ তার খুব অভিমান হল। এই ক'দিন সে দেখেছে, অনেক বক্তা 'আর একটা কথা বলব' বলে লাগিয়ে দিয়েছে আধ ঘণ্টা, তখন তাদের থামানোর জন্য বেল বাজানো হয়নি, আজ তার ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েও তা পূর্ণ হতে দেওয়া হল না! কিংবা এটা ওয়ার্নিং বেল? সে যাই হোক, গান্ধী আর একটাও কথা না বলে বসে পড়ল।

সবাই এক সঙ্গে হাত তুলে বলে উঠলেন। এই প্রস্তাব পাস, পাস!

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পরেও গান্ধী রয়ে গেল কলকাতায়।

কালীঘাট মন্দিরের সেই অভিজ্ঞতা তার মনে আছে। এর মধ্যে সে জেনেছে যে ব্রাহ্মরা ধর্মের নামে পশুবলির সম্পূর্ণ বিরোধী। গান্ধী ঘুরে ঘুরে ব্রাহ্ম সমাজের তিন দলের নেতাদের সঙ্গেই দেখা করতে চাইল। আলাপ হল শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে কেশব সেনের জীবনী গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়ে নিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি গিয়েও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল না অবশ্য, স্বাস্থ্যের কারণে তিনি আর বাইরের লোকদের সঙ্গে দেখা করছেন না। কিন্তু সেখান থেকে গান্ধী খুব তৃপ্তি নিয়ে ফিরল। যথারীতি এবারেও ঠাকুর বাড়িতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য। বাংলা গানগুলি কী মধুর, শ্রুতিসুখকর। দূর থেকে দেখা গেল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গায়কের ভূমিকায়।

ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার পর গান্ধী ভাবল, এই শহরে অনেক ক্রিশ্চানও আছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও জানা দরকার। স্থানীয় ক্রিশ্চানদের মধ্যে কালীচরণ ব্যানার্জি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ভারতীয় ক্রিশ্চানরা কংগ্রেসে যোগ দেয়নি, অনেকেই নিজেদের রাজার জাতের লেজুড় মনে করে। হিন্দু-মুসলমানদের সঙ্গে মেশে না। কালীচরণ সে রকম নন, তিনি কংগ্রেসের একজন উৎসাহী নেতা।

বাড়িতে কালীচরণ ধুতি-কুর্তা পরে থাকেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সঙ্গে কোনও তফাত নেই, বিনয়ী ও ভদ্র মানুষ। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে অতি কট্টর, গান্ধীর সঙ্গে প্রায় তর্কই লেগে যায় তাঁর। তাঁর মতে, হিন্দু ধর্মে মানুষের মুক্তি সম্ভব না, জন্মের আদি পাপ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় যিশুর শরণ। কালীঘাটের মন্দিরের উল্লেখ করে তিনি বললেন, ওই তো হিন্দু ধর্মের চেহারা!

এবার হিন্দু সমাজের একজন নেতার সঙ্গে দেখা করা দরকার। অন্য নেতাদের কাছে ঘোরাঘুরি না করে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যদি দেখা করা যায়, তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের জয়ধ্বজা তুলে এসেছেন। শুধু ভক্তি দিয়ে নয়, তাঁর মতন ইদানীং কালে প্রবল বিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে হিন্দুধর্মের কথা আর কে বলতে পেরেছে! গান্ধী দূর থেকে মনে মনে বিবেকানন্দর অনুরাগী।

বেলুড়ে মঠ স্থাপিত হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে থাকেন। বেলুড় জায়গাটা ঠিক কত দূরে সে সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা নেই, লোকের কথা শুনে ভেবেছিল হাওড়া স্টেশনের পাশেই। গঙ্গা পেরিয়ে সে হাঁটতে লাগল। এক সময় হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছে গেল বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে। বুক দুরুদুরু করছে। স্বামীজি কি দেখা করবেন তার সঙ্গে! তিনি এখন বিশ্ববিখ্যাত, কত ব্যস্ত মানুষ।

অন্য একজন সাধুকে দেখতে পেয়ে গান্ধী তাঁকে নিজের উদ্দেশ্য জানাল।

সাধুটি বললেন, ইস, খানিক আগে এলেন না? এই তো দশ মিনিট আগে স্বামীজি নৌকো করে চলে গেলেন কলকাতায়। ওঁর শরীর ভাল নয়, চিকিৎসার জন্য ওখানেই কয়েক দিন থাকবেন।

একটুর জন্য বিবেকান্দর সঙ্গে গান্ধীর দেখা হল না।

১৯০১

৫৫

বাতাসে স্পষ্ট একটা পরিবর্তনের গন্ধ পাওয়া যায়। পথ দিয়ে চলতে চলতে কেমন যেন হালকা হালকা লাগে। ছ-সাত বছর আগের দেখা কলকাতার সঙ্গে এখনকার এই কলকাতার যেন অনেক তফাত। বাইরের চেহারাটা তো কিছু কিছু বদলে গেছে বটেই, মানুষজনও যেন অন্যরকম।

এই পরিবর্তনের কারণ কি এক শতাব্দীর অবসান, নতুন শতাব্দীর শুরু? সেই একত্রিশে ডিসেম্বর ভরত পাটনায় ছিল। কলকাতার সঙ্গে পাটনার তুলনা চলে না। সেখানে ইংরেজের সংখ্যা অনেক কম, তবু সেখানেও উৎসবের আড়ম্বর দেখে সকলের তাক লেগে গিয়েছিল। রাত্রি বারোটার পর বুঝি কোনও সাহেব-মেমই আর ঘরে ছিল না, পথে পথে নাচ-গান-হল্লা, অজস্র রঙিন বাজিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল রাত্রির আকাশ, সেইসঙ্গে তোপধ্বনি। এ ছাড়াও অনেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে জ্বলে উঠেছিল আগুন, ইংরেজরা ছুটে ছুটে বাড়ি থেকে পুরনো কাগজপত্র, পোশাক, ভাঙা আসবাব ইত্যাদি টেনে এনে ছুঁড়ে দিচ্ছিল সেই আগুনে। হিন্দুদের হোলি উৎসবে চাঁচর পোড়ানোর মতন, নতুন শতাব্দীর সূচনায় পুরনো শতাব্দীর অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছিল। প্রকাশ্যে ইংরেজদের এমন লাগামছাড়া, মাত্রাছাড়া ফুর্তি করতে আগে দেখা যায়নি। বিংশ শতাব্দীকে বরণ করার জন্য ইংরেজদের উৎসাহের অবধি ছিল না, এমন ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল যেন এক শতাব্দী পার হয়ে অন্য শতাব্দীতে বিচরণ করা দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ইংরেজ-তোষক সরকারি কর্মচারী ও কিছু কিছু ব্যবসায়ীও এই উৎসবে মেতেছিল, সাধারণ ভারতীয়রা এই শতাব্দী-পরিবর্তনের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অনেকে এখনও ইংরেজি মাস-তারিখের গণনাই জানে না। অধিকাংশ গ্রামের মানুষেরই অমাবস্যা-পূর্ণিমার হিসেবে জীবন চলে। ভরত তার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সাহেব-মেমদের সেই উদ্দীপনা দেখতে দেখতে ভেবেছিল, শতাব্দী তো মানুষেরই তৈরি একটা কাল নির্ণয়ের মাপকাঠি, তাতে তো প্রবহমান মহাকাশের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে না। এই অনাদি-অনন্তকালকে কি শতাব্দী দিয়ে মাপা যায়? মানুষের জীবন অতি ক্ষুদ্র। মানুষের ইতিহাসেরও তো এই সেদিন শুরু। বিশাল অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক কাল পেরিয়ে এসে মানুষ এই সবেমাত্র সভ্যতার আলো দেখতে পেয়েছে। তাই একশোটা বছর মনে হয় বড় একটা সীমানা।

পাটনার চেয়ে কলকাতায় সেই উৎসবের ঘনঘটা কত বেশি হয়েছিল, তা ভরত জানে না। এই শহরের বহু মানুষও তো এখনও লেখাপড়া শেখে না। ইংরিজি এক দুই গুনতেও জানে না, তারা ইংরিজি শতাব্দী বদলে প্রভাবিত হবে কেন? কিন্তু পরিবর্তনটা যে একটা ঘটেছে, তা পথচলতি মানুষদের মুখ-চোখ দেখলেও টের পাওয়া যায়।

ভরত একা একাই এসব কথা ভাবে। আলোচনা করার মতন কোনও সঙ্গী-সাথি নেই। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর রিপন কলেজের ক্যাম্প ছেড়ে এসে শিউপূজন আর সে বউবাজারে 'অজন্তা' হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে শিউপূজনকে ভারতের রাজধানীতে আরও কিছুদিন থাকতে হবে, ভরতকেও সে ছাড়তে চায় না। ভরতেরও অবশ্য পাটনায় ফেরার কোনও তাড়া নেই। আর আদৌ সে পাটনায় ফিরবে কি না তাও সে ভেবে দেখছে।

কলকাতায় সে অনেক বছর আসতে চায়নি, কেমন যেন ভীতির ভাব ছিল। এখন সে বুঝতে পারছে, সেই ভয় অমূলক। কেউ যদি আত্মগোপন করে থাকতে চায়, তা হলে কলকাতার মতন বড় শহরই তার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান। এখানে কেউ কারুকে চেনে না, অহেতুক চিনতেও চায় না। রাস্তা

দিয়ে মানুষ ছোটে, অন্য মানুষদের মুখের দিকে চেয়েও দেখে না একবার।

তা ছাড়া আত্মগোপন করারও তো কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ভরত চুরি-ডাকাতি করে পলায়ন করেনি এ শহর থেকে। শুধু আছে চক্ষুলজ্জা। শশিভূষণ মাস্টারের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে চায় না সে। পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের কথা মনে পড়ে, এখনও কারুর খোঁজ করেনি। কংগ্রেসের অধিবেশনে ভিড়ের মধ্যে তার দু-তিনজন কলেজের সহপাঠীকে দেখেছে, এদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, মুখ চেনা ছিল, ভরত নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেনি, তারাও চিনতে পারেনি। ভরতের চেহারায় নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগ্রহও বোধহয় করেনি ভরত, তবু বেশ কয়েকদিন এই শহরের পথে পথে সে ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু একজনও কখনও বলল না, আরে ভরত না? এজন্য সে খানিকটা বেদনাও অনুভব করে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত সে একসময় চষে বেড়িয়েছে, অনেক দোকানদারও তার নাম ধরে ডাকত, হেসে কথা বলত, এখন একজনও চেনে না!

'অজন্তা' হোটেলের অদূরেই রাস্তার বিপরীত দিকে হাড়কাটার গলি। ওই গলির মুখ দিয়ে যাবার সময় ভরতের মনে পড়ে, এখানে এক বাড়িতে তার বন্ধু দ্বারিকার সঙ্গে সে এসেছিল বসন্তমঞ্জরীর কাছে। এখনও কি বসন্তমঞ্জরী ওখানে থাকে? এর মধ্যে একবার ওদের দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এলাহাবাদে, তখন ভরতের মাথার ঠিক ছিল না, সে কিছু না জানিয়েই ওদের আশ্রয় ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দ্বারিকা খুব উপকারী বন্ধু!

কিন্তু ওই গলিতে প্রবেশ করে না ভরত। সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। বসন্তমঞ্জরী এখন দ্বারিকার স্ত্রী, দ্বারিকা তাকে এই কুখ্যাত পল্লীতে রাখবে কেন? মানিকতলার কাছে দ্বারিকার একটি বাড়ি ছিল, একদিন তার সামনে দিয়ে যেতে গিয়েও ভরত দেখেছে যে সে বাড়িতে অন্য মানুষ থাকে, নীচের তলায় অনেক দোকানপাট বসেছে। অনেক কিছুই আর আগের মতন নেই। ভরত যে-কলকাতা শহরটা দেখে গিয়েছিল, সেই স্মৃতির সঙ্গে অনেক জায়গারই মিল খুঁজে পায় না।

শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের ঠিক বাইরেই একটি মুচিকে দেখে ভরত বেশ কৌতুক বোধ করে। ছাত্র বয়েসেও ওই মুচিটিকে ওই একই জায়গায় বছরের পর বছর বসে থাকতে দেখেছে। লোকটির যেন লয়-ক্ষয় নেই, একই চেহারার, একই ময়লা ফতুয়া পরা, মুখ গুঁজে জুতো সেলাই করে চলেছে। দেখলে মনে হয়, মহাকালও ওকে পাশ কাটিয়ে যায়।

শিউপূজন কিছু পরিচিত ব্যক্তিকে পেয়েছে বড়বাজারে, রোজই দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত সেখানে কাটায়। ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন হয় কিছু কিছু, ভরতের সাহায্যের আর তার প্রয়োজন হয় না। ভরত আপন খেয়ালে একলাই ঘুরে বেড়ায়।

আজ সকালে অনেকেই ছুটেছে খিদিরপুরের দিকে। সেখানে একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হবে। কয়েকদিন ধরেই লোকের মুখে মুখে কথাটা আলোচিত হচ্ছে, বেশ কিছু হ্যান্ডবিলও বিলি হয়েছে। শিউপূজন বেরিয়ে যাবার পর ভরত একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করে খিদিরপুরে উপস্থিত হল।

বন্দর এলাকার ঠিক বাইরেই একটি গোলাকার স্থান সাজানো হয়েছে অজস্র ফুল ও হরেক রকম বেলুন দিয়ে। লাল শালু দিয়ে ঘেরা একটি ছোটখাটো মঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে চেয়ারে বসে আছে দু'জন ইংরেজ ও এক বাঙালিবাবু। মঞ্চের নীচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি ব্যান্ড পার্টি। সামনে বিগ ড্রাম, মাঝখানে কেট্‌ল ড্রাম, পেছনে বিউগল। একটু পরেই শুরু হবে ট্রাম গাড়ির নতুন ভেলকি। হাজার কয়েক মানুষের ভিড় জমেছে সেখানে।

সাহেবরা বলে ট্রাম, দেশি লোকরা সেটাকেই ট্রাম বানিয়েছে। প্রথমে চালু হয়েছিল শিয়ালদা স্টেশন থেকে টাটকা তরিতরকারি-সবজি তাড়াতাড়ি সাহেব পাড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য। এখন মানুষজনই বেশি চাপে। কলকাতা শহরে অফিস-কাছারি চালু হয়েছে প্রচুর, কিন্তু সেখানকার কর্মীদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা ভাল নেই। ছ্যাকড়া গাড়িতে গাদাগাদি করে

পাঁচ-ছ'জন ওঠে, জীর্ণশীর্ণ অর্ধভুক্ত ঘোড়ারা সেই সব গাড়ি টানে, রাস্তার মাঝখানে যখন তখন এক একটা ঘোড়া চোখ উল্টে পড়ে যায়। ট্রামগাড়ির ঘোড়াগুলি অবশ্য রাজকীয় ধরনের, দিশি নয়, অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি, বেগবান ও তেজস্বী, কিন্তু রাজা-রাজড়াদের মতনই মেজাজি ও খেয়ালি। তিন কামরার ট্রাম টানে ছটা ঘোড়া, আর দু কামরার ট্রামে চারটি ঘোড়া। কামরা টইটুম্বুর মানুষজন নিয়ে বেশ ঝমঝমিয়ে চলে বটে, তবে হঠাৎ কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে থেমে যায়, কখনও রাস্তা জুড়ে বিশাল চেহারার ষাঁড় দাঁড়িয়ে থাকলে ঘোড়া আর কাছে এগোয় না, পথের ধারে ধারে জলপান পাত্র দেখলে ঘোড়ারা নিজেদের মর্জিমতন দাঁড়িয়ে পড়ে জল পান করার জন্য। এই সব কারণে অফিসে পৌঁছতে যে দেরি হয়ে যায়, তা তো বড় সাহেবরা বুঝবেন না। তাঁরা তো আসেন নিজস্ব ল্যান্ডো গাড়িতে, পাঁচ-দশ মিনিট লেট হলেই কেরানিদের বকুনি দেন। অনেকে সে জন্য গাড়ি-ঘোড়ার তোয়াক্কা না করে পাঁচ সাত মাইল দূর থেকেও পায়ে হেঁটেই অফিসে চলে আসে।

ঠিক এগারোটার সময় একটা চার ঘোড়ার ট্রাম এসে পৌঁছল মঞ্চের সামনে। আজ ঘোড়াগুলি যেন বেশি বেশি সুসজ্জিত, পিঠের ওপর ঝালর দেওয়া মখমলের পোশাক, মাথায় রঙিন পালক। ঘোড়াগুলি খুব জোরে জোরে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ছে, সহিসরা ঘোড়াগুলোকে খুলে নিয়ে গেল।

মঞ্চে উপবিষ্ট একজন ইংরেজ উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর বাঙালিবাবুটি তার তর্জমা করে দিল এই মর্মে: কলিকাতা শহরের অধিবাসীগণ, আপনাদের সেবার জন্য ট্রাম কোম্পানি সদা তৎপর। গত বৎসর হইতে প্রথম শ্রেণীতে চামড়ার গদিযুক্ত সিট যুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাদানি ছিল না বলিয়া অনেকের অসুবিধা হইত, তাহাও দূর করা হইয়াছে। দুপুর দ্বাদশ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন তিন ঘটিকা পর্যন্ত টিকিটের দাম শস্তা করা হইয়াছে। বিলাত হইতে সদাশয় ট্রাম কোম্পানির বড় সাহেব মহোদয় আসিয়া এই শহরের ট্রাম পরিচালনার এক অভিনব পরিবর্তন সূচনা করিতেছেন। চমকপ্রদ, অভাবনীয় এই ব্যবস্থা। যাত্রীসাধারণ এখন হইতে যাতায়াতের নিখুঁত সময় রক্ষা করিতে পারিবেন। এই নতুন ব্যবস্থা আজই আপনারা চাক্ষুষ করুন...

ব্যান্ড পার্টি এ বার বাজনা শুরু করে দিল। সুসজ্জিত ঘোড়াগুলিকে এনে ঘোরানো হতে লাগল মঞ্চের চার দিকে। সার্কাসে যেমনটি দেখা যায়। ক্লাউনের মতন সেজেগুজে একজন ঘোড়াগুলির সঙ্গে লাফাচ্ছে। কয়েকবার পাক খাওয়াবার পর ঘোড়াগুলিকে নিয়ে যাওয়া হল ট্রামগাড়িটির কাছে, যেখানে তাদের জুতে দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঘোড়াগুলিকে বাঁধবার বদলে সেই ক্লাউনটি নাচ শুরু করল। একটা ঘোড়া থেকে সে অন্য ঘোড়ায় লাফিয়ে চলে যায়। পাশ দিয়ে নামবার বদলে সে ল্যাজের দিক দিয়ে সরসর করে নামে। এই রকম কিছুক্ষণ কসরত দেখাবার পর সে একটা ছপটি নিয়ে ঘোড়াগুলিকে মারতে লাগল। ঘোড়াগুলোর খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা, এ রকম অকারণে তাদের মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই। তারা বিদেশ থেকে আমদানি করা, কোম্পানির পেয়ারের পোষ্য। প্রথম প্রথম মার খেয়েও তারা নড়তে চাইল না, এই মারটাও খেলার অঙ্গ কিনা তারা বুঝতে চাইছে। ক্লাউনটি এবার বেশ জোরে শপশপ করে কষাতে লাগল ছপটি। ঘোড়াগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে দূরে সরে যেতে লাগল।

অকস্মাৎ থেমে গেল ব্যান্ড বাজনা। নাচ থামাল ক্লাউনটি। একটুক্ষণের নীরবতা। মঞ্চের দ্বিতীয় ইংরেজটি এ বারে উঠে দাঁড়িয়ে একটা পিস্তল বার করে বলে উঠল, রেডি, স্টেডি, গো! দুম করে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দ হল।

ও মা, আশ্চর্য না, আশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, ঘোড়াবিহীন সেই দু কামরার ট্রামগাড়িটি দিব্যি চলতে লাগল গড়গড়িয়ে। ধোঁওয়া উড়ল না, ধুলো উড়ল না, ঘ্যাসঘেসে শব্দও হল না। একটু আধটু গড়িয়ে যাওয়া নয়, অনেক দূর চলে গেল সেই ট্রামগাড়ি, প্রায় চোখের আড়ালে। মিনিট সাতেক বাদে আবার ফিরেও এল। সামনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে চালকটি, আনন্দে সে টুপি খুলে নাড়ছে।

হাজার হাজার দর্শক চটাপট চটাপট শব্দে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল তাকে।

বিজ্ঞানের এই নবতম কীর্তি দেখে যত না বিস্মিত হল ভরত, তার চেয়েও সে বেশি বিস্মিত হল জনতার ব্যবহার দেখে। এই অলৌকিক কাণ্ডটি দেখে কেউ ভয়ে ছুটে পালাল না, কেউ ভক্তিতে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণামও জানাল না। এ দেশের মানুষ এত পরিণত-মনস্ক হয়ে উঠল কবে? এই কি যুগ পরিবর্তনের হাওয়ার ফল? ভয়, কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়েছিল এ দেশের আপামর জনসাধারণ, বিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে তারা আধুনিক পৃথিবীর উপযুক্ত নাগরিক পদবাচ্য হল? বিজ্ঞানকে মেনে নিচ্ছে এত সহজভাবে!

চোখের সামনে দেখলেও ভরত নিজেই এখনও বিজ্ঞানের বিজয় অভিযানের সব রহস্য অনুধাবন করতে পারে না। এত হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ জেনে এসেছে যে আগুন ছাড়া আলো হয় না। এখন ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে, তার জন্য একটি দেশলাইয়ের কাঠিও খরচ করতে হয় না। এবং সেই আলোতে হাত রাখলে হাত পুড়ে যায় না। এ সবই বিদ্যুতের কেরামতি। আকাশের বিদ্যুৎ নয়, মানুষের তৈরি বিদ্যুৎ। আকাশের বিদ্যুৎ দু-এক মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর মানুষ বিদ্যুৎকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দি করে রেখে দিতে পারে। আকাশের দেবতার চেয়েও মানুষের শক্তি বেশি। সেই বিদ্যুৎ দিয়েই আবার চালানো হচ্ছে এই ট্রাম গাড়ি। একটি প্রবন্ধে ভরত পড়েছে যে, এই বিদ্যুতের শক্তির যে কী অসীম সম্ভাবনা, তা সব এখনও জানা যায়নি। এই নতুন শতাব্দী হবে বিদ্যুতেরই শতাব্দী!

এবারে ট্রাম কোম্পানির বাঙালিবাবুটি ঘোষণা করল যে আজ এখন থেকেই এই ঘোড়াবিহীন বৈদ্যুতিক ট্রাম যাত্রীবহন শুরু করবে। খিদিরপুর থেকে যাবে চৌরঙ্গির রাস্তা পর্যন্ত। এই নতুন গাড়িতে অবশ্য ভাড়া কিছু বেশি লাগবে। আগে ভাড়া ছিল ছ পয়সা, এখন দু আনা দিতে হলেও সময় লাগবে অর্ধেক। হঠাৎ বর্ধিত ভাড়া দিয়ে সময় বাঁচাতে নিশ্চয়ই সকলেই রাজি হবেন।

দৌড়োদৌড়ি শুরু হতে ভরতও দ্বিধা করল না, সেও ছুটে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসল। এই ঐতিহাসিক দিনটির অভিজ্ঞতা সেও সঞ্চিত করতে চায়। জানলার ধারেই একটা আসন পেয়ে গেল সে।

ট্রাম গাড়িটিতে সদ্য সাদা রং করা হয়েছে। মাটিতে রেলগাড়ি চালাবার মতন লোহার লাইন পাতা হলেও ট্রামকে ঠিক ক্ষুদে ট্রেন বলা যায় না, দেখায় যেন ছোট ছোট স্টিমারের মতন। জলে ও স্থলে মানুষ গতির নতুন বাহন পেয়ে গেছে। এতকাল গাড়ি টানার জন্য গোরু-ঘোড়া-মোষ-উট-হাতি এই রকম কত পশুকে দিয়ে গাড়ি টানানো হয়েছে। এমনকী মানুষকেও পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ির সঙ্গে। কোনও জীবিত প্রাণী টানবে না, অথচ গাড়ি চলবে, এত কালের মানব সভ্যতায় কেউ তা কি কল্পনাও করতে পেরেছে? সেই কবে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখে সভ্য হতে শুরু করেছিল, এতকাল পর বাষ্প ও বিদ্যুতের শক্তি কাজে লাগিয়ে সেই সভ্যতা যেন একলাফে অনেকটা এগিয়ে গেল।

ট্রাম ছাড়ার আগে ভরত দূরে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলোকে দেখছিল। অদ্ভুত, বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওরা তাকিয়ে আছে। ওরা বুঝতেই পারছে না, ওদের গতিশক্তি ছাড়া কী করে গাড়িটা চলবে। ওরা জানে না, আজ থেকে ঘোড়াদের গৌরবের দিন শেষ হল। রেলগাড়ি আর ঘোড়ায় টানা গাড়ি এসে পালকিগুলিকে হটিয়ে দিয়েছিল। রেলে অনেক নিরাপদে ও কম খরচে চাপা যায়, তার বদলে পালকি চাপতে আর কে চায়? এবারে বিদ্যুতে টানা ট্রাম এসে ঘোড়াগুলোকে বিদায় করে দিল। এর ওপর আবার এসে গেছে মোটর কার বা অটোমোবিল। এবার কোনও মানুষ যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার বদলে ওই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ময়দানের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রাম। দু পাশে বড় বড় গাছ, ফাঁকে ফাঁকে পড়েছে ধপধপে শীতের রোদ। এক অপূর্ব অনুভূতি হল ভরতের। এই ট্রামগাড়ির যাত্রার সঙ্গে অন্য কোনও যানবাহনের তুলনাই চলে না। এত মসৃণ, এত আরামপ্রদ, যেন সে হাওয়ায় ভাসছে। রেলগাড়িতে যাবার সময় জানলা খুলে রাখলে কয়লার গুঁড়ি আর ধোঁয়া এসে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, পোশাক নোংরা হয়ে যায়, ঘোড়ায় টানা ট্রামে ঝাঁকুনি ছিল খুব। জলযান স্টিমারে এমন শব্দ হয় যে কান ভোঁ ভোঁ করে, কিন্তু এই ট্রাম সকলের শ্রেষ্ঠ। আধুনিকতার জয়ধ্বজাবাহী এই ট্রাম যেন তাকে নিয়ে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

সন্ধেবেলা হোটেলে ফিরে এসে ভরত শিউপূজনকে তার এই অভিজ্ঞতার গল্প করতে গিয়ে তেমন কোনও আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারল না। আজ সারাদিন বড়বাজার অঞ্চলে এই ভেলকিবাজি ট্রামের গল্প হয়েছে, শিউপূজন সেখানেই শুনেছে। বড়বাজারের বড় বড় ব্যবসায়ীরা কেউই তেমন মুগ্ধ নয়। শিউপূজন জোর দিয়ে বলল, তোমার ওই সব বিদ্যুৎ টিদ্যুৎ টিকবে না। বরাবর মানুষ ঘোড়ার ওপর ভরসা করে এসেছে, ঘোড়াই আবার ফিরে আসবে। ওই কলে টানা ট্রামে মানুষ চাপবে কেন, ভাড়া বেশি না?

ভরত তর্কের মধ্যে গেল না। এই হচ্ছে কলকাতা শহর আর অন্য জায়গার মানুষের তফাত। নাগরিক স্বভাব, নাগরিক মনোবৃত্তি অন্য ব্যাপার, বাইরের লোকেরা তা সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। বড় শহরের অধিকাংশ নাগরিকরা অনেক নতুন জিনিসকে তবু সহজে মেনে নিতে পারে, বাইরের বেশিরভাগ মানুষই যে কোনও নতুন জিনিস দেখলেই সন্দেহ করে, পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। অনেক গ্রামের লোক এখনও মনে করে কাঠের আঁচের বদলে কয়লার উনুনের রান্না খেলে পেটের রোগ হয়। এ দিকে শহরে কাঠের রান্না প্রায় উঠেই যাচ্ছে!

'অজন্তা' হোটেলের খাদ্যদ্রব্য অখাদ্য। কাছাকাছি অনেক আহারের স্থান আছে, ওরা দুজনেই প্রতি রাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনও খাবারের দোকান খুঁজে নেয়। শিউপূজন খায় নিরামিষ, ভরতেরও নিরামিষে আপত্তি নেই, তবে মাঝে মাঝে একটু মাছের জন্য মন কেমন করে। এখন শীতকাল, ইলিশের সময় নয়, কিন্তু এই সময়টায় কলকাতায় অতি উত্তম, টাটকা চিংড়িমাছ পাওয়া যায়। কলকাতার হোটেলগুলির চিংড়িমাছের মালাইকারি অতি বিখ্যাত, ভারতের আর কোথাও এমনটি পাওয়া যাবে না। কিন্তু শিউপূজনের ঘোর আপত্তিতে সেই দেবভোগ্য ভোজ্য আস্বাদন করার উপায় নেই। যে দোকানে চিংড়ি মৎস্য ভর্জিত হয়, সে দোকানের কাছাকাছি গেলেই শিউপূজন বিকট গন্ধ পায়। মানুষ কী বিচিত্র প্রাণী! একই বস্তুতে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া। কোনও বিশেষ খাদ্যের ঘ্রাণে একজন মানুষের আহ্লাদে জিহ্বা সিক্ত হয়, আবার কোনও মানুষের ঘৃণায় বমি আসে।

খাওয়া-দাওয়ার পর হজম প্রক্রিয়ার সুবিধার জন্য খানিকক্ষণ পদব্রজে ভ্রমণের অভ্যেস আছে শিউপূজনের। বউবাজারের দিকটায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত দোকানপাট খোলা থাকে, আলোয় ঝলমল করে। হাড়কাটার গলির কাছে অনেক গাড়ি এসে থামে, তার থেকে নেমে বাবুরা হাতে ফুলের মালা জড়িয়ে হেলতে দুলতে এক একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। অন্য দিকে, লালবাজার অঞ্চলে অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। নামে লালবাজার হলেও সেখানে কোনও বাজার নেই। দিনের বেলা দেখা যায় সারি সারি দাঁতের ডাক্তারদের চেম্বার, সন্ধ্যার পর সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

ওই অঞ্চলেই এক একটি বাড়িতে ওপর তলায় বাতি জ্বলে। সেখান থেকে ভেসে আসে গানের কলি কিংবা নূপুরের শিঞ্জন, হঠাৎ হঠাৎ হাসির ফোয়ারা। বেশ আমোদ-প্রমোদ চলছে বোঝা যায়। ওই সব শুনে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে শিউপূজনের। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় বেশ কয়েকদিন সে এই ব্যাপারে ভরতকে কিছু বলতে পারেনি।

মূল অধিবেশনের তিনদিন এবং তার আগে-পরে দু চারদিন, এই কটি দিনই কংগ্রেসের নেতারা কংগ্রেসি হয়ে থাকেন। এই কদিন তাঁরা দেশের নানা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান। সারা বছরের বাকি সমস্ত দিন তাঁদের নিজেদের পেশা বা ব্যবসায়ের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। তা ছাড়া তাঁরা রক্ত মাংসের মানুষ, শরীর-মনের অন্যান্য দাবিও আছে। প্রবাসে গেলে অনেক বাসনা যেন লাগাম ছাড়া হয়ে যায়।

শিউপূজন একদিন বলেই ফেলল, ভরতভাইয়া, কী রোজ রোজ আমরা রাত্তির নটা বাজতে না বাজতেই হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ি! পাটনা শহরেও তো আমরা এর অনেক পরে ঘুমোতে যাই, আর

কলকাতা শহরে এসে...আমাদের ওদিকে একটা কথা চালু আছে, যদি ভোর দেখতে চাও তো মুঙ্গেরে যাও, দুপুর দেখতে এসো পাটনায়, গোধূলি দেখে মুগ্ধ হবে বেনারসে, আর রাতের রোশনাই দেখার জন্য চলে যাও কলকাতায় ! তা এই কদিনে আমরা তো রাতের রোশনাই কিছুই দেখলাম না। তুমি এই শহরের মানুষ, তুমি আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও।

ভরত ফিকে হেসে বলল, শিউপূজনজি, আমি দিনের কলকাতা ভাল চিনি, রাতের শহরটা চিনি না। দিনের বেলা আপনি ব্যস্ত থাকেন

শিউপূজন বলল, দিনের বেলা আর কী দেখার আছে। রাতের রোশনাইটাই আসল। এই যে বাড়িটা থেকে ঘুংঘুটের রিনিঝিনি শোনা যাচ্ছে, এখানে নিশ্চয়ই কোনও বাঈ নাচছে। এখানে আমরা নাচ দেখতে যেতে পারি না ? পয়সার জন্য কোনও পরোয়া করবেন না।

ভরত বলল, কিছু কিছু লোক তো বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। আপনি যেতে পারবেন না কেন, চলে যান !

শিউপূজন চক্ষু কপালে তুলে বলল, আমি একেলা যাব ? আপনি যাবেন না ? কেন, বাঈজির নাচ-গান শুনতে যাওয়া কি অন্যায় ?

ভরত একটুক্ষণ চিন্তা করে, খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে বলল, না, অন্যায় কেন হবে। অনেকেই তো যায়। তবে আমার কখনও যেতে ইচ্ছা করেনি, এখনও ইচ্ছা হয় না।

শিউপূজন বলল, আপনি আমার জন্য যাবেন, আমার সঙ্গে থাকবেন।

ভরত চুপ করে রইল। তার নিজের কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, তবু শিউপূজনের আগ্রহে তার সঙ্গে বাঈজির ঘরে যাওয়া অনেকটা দালালির পর্যায়ে পড়ে না ? শিউপূজন তার উপকার করেছে, সে জন্য রূঢ়ভাবে তাকে আঘাত করাও যায় না।

শিউপূজনের ব্যগ্র দৃষ্টি দেখে সে আবার বলল, এক কাজ করা যেতে পারে। আপনি তো বাঙালি থিয়েটার দেখেননি কখনও। কলকাতায় থিয়েটারের খুব সুনাম আছে। কাল সন্ধের সময় আমরা ভাল কোনও থিয়েটার দেখতে যাব।

ভরত এক সময় বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে থিয়েটার দেখতে যেত। উত্তর কলকাতার রঙ্গালয়গুলির সবকটিই সে চেনে। পরদিনই সে শিউপূজনকে নিয়ে গেল থিয়েটার পাড়ায়। এর মধ্যে দু-একদিন সে ট্রামের যাত্রীদের অল্প আলাপ আলোচনা শুনে বুঝেছে যে 'নল-দময়ন্তী' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুটি নাটকই এখন শহরে জমজমাট। ভরতের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দেখার আগ্রহই বেশি, বঙ্কিমের এই উপন্যাসটি তার প্রিয়, কিন্তু সে ভাবল, 'নল দময়ন্তী'র মতন পৌরাণিক কাহিনীই শিউপূজনের বেশি ভাল লাগবে।

আগে যেটি ছিল 'বেঙ্গল থিয়েটার', এখন সেটিই নাম পাল্টে হয়েছে 'অরোরা থিয়েটার'। দেওয়ালে রঙের পলেস্তারা পড়েছে, সামনের গেট সাজানো হয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে। নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর যোগ দিয়েছেন এই থিয়েটারে।

আজ যে শিবরাত্রি তা ভরতের জানা ছিল না। শিবরাত্রির ব্রত যারা পালন করে, তারা সারাদিন সারারাত উপবাসে থাকে, তাদের জাগিয়ে রাখার জন্য সারারাত্রব্যাপী অভিনয় হয় অনেক রঙ্গালয়ে। আজ তাই 'অরোরা থিয়েটার' এ পরপর তিনটি পালা হবে, 'নল-দময়ন্তী', 'আবু হোসেন' এবং 'জেনানা ওয়ার'। এক টিকিটে তিন নাটক, শিউপূজন মহা খুশি। নাটক দেখতে দেখতেও সে মোহিত হয়ে গেল, পাটনাতে এ রকম কিছু দেখার সৌভাগ্য হয় না। 'নল-দময়ন্তী'-তে দময়ন্তীরই মুখ্য ভূমিকা, সেই ভূমিকায় অভিনয়ে তারাসুন্দরী একাই একশো। এ নাটকে কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর মঞ্চে অবতরণ করলেন না, তাঁকে দেখার জন্য ভরত ছটফট করছে। তাঁকে দেখা গেল পরের নাটকে। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর অর্ধেন্দুশেখরকে দেখে যেমন পুলকিত হল ভরত, তেমন কিছুটা নিরাশও হল। এর মধ্যে এত বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি ! বয়েস তো খুব বেশি হবার কথা নয়, তবু যেন চেহারাটা ভেঙেচুরে গেছে। অভিনয়ের সময় অবশ্য সেই বুড়ো হাড়েই জাদু দেখালেন, নেচে-গেয়ে-লম্ফঝম্প দিয়ে দেখালেন, এখনও সিরিও-কমিক রোলে তাঁর জুড়ি নেই। যখন চুপ

করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখনই বোঝা যায়, তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়েছে, ললাটে শ্রান্তির বলিরেখা।

তৃতীয় নাটিকাটি অবশ্য একেবারেই ভাঁড়ামি, রাতের শেষ প্রহরে দর্শকদের জাগিয়ে রাখার চেষ্টা।

সব নাটকেই নাচ-গান থাকবেই। পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক বা দেশাত্মবোধক নাটক, যেখানে নায়িকার পক্ষে চটুল নাচ বা গান একেবারেই মানায় না, সেখানেও সখীদের দৃশ্য থাকে। কিংবা এক খল, লম্পটের চরিত্র আমদানি করা হয়, সে জোর করে মেয়েদের নাচায়, সে সব দৃশ্যে নর্তকীদের নিতম্বের আন্দোলন বেড়ে যায়, বক্ষের আঁচল খসে পড়ে বারবার। ভরতের মনে হল, বাঈজিদের বাড়িতে এই ধরনের নাচ দেখতে যেতে অনেক পয়সা লাগে, অনেক সাধারণ মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়, যদিও বাসনা বা লোভ থাকে। থিয়েটারের মালিকরা সেই জন্যই সব নাটকে এ রকম একটা দৃশ্য ঢুকিয়ে দেয়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে।

এখন প্রতিদিনই এক একটি নতুন নাটক। ওই অরোরা থিয়েটারই পরদিন 'রিজিয়া'। বাইরে পোস্টারে রয়েছে এই নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর ও তারাসুন্দরী। শিউপূজন এমনই মজা পেয়েছে যে পরের দিনের টিকিট সে আগেই কেটে নেবার ব্যবস্থা করল।

রিজিয়াও বেশ জমজমাট নাটক, নামভূমিকায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করছেন তারাসুন্দরী, কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর কোথায় ? দৃশ্যের পর দৃশ্য চলে যাচ্ছে, অর্ধেন্দুশেখরের দেখা নেই। অন্যান্য পুরুষ চরিত্রে সব অচেনা অভিনেতা। আজ কি তা হলে অর্ধেন্দুবাবু অনুপস্থিত ? হঠাৎ এক সময় মঞ্চে প্রবেশ করল একজন কুৎসিত দর্শন মানুষ, পোড়া কয়লার মতন রং, মুখে দগদগে ঘা, পোশাকের রংও কালো, মাথায় আবার একটা লাল ফেট্টি বাঁধা। হাতে একটা বাঁকা, লকলকে ছুরি। সে একজন ঘাতক, মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের দৃশ্যে তার অভিনয়। আর সে কী অভিনয়, সে একজন হিংস্র ঘাতক, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে চকিত ভয়, অতি সামান্য সংলাপ, তাও কেমন যেন স্খলিত, হাঁটার ভঙ্গি কাঠের পুতুলের মতন, শরীর হাঁটছে, মন নেই। তার প্রস্থানের পর দর্শকদের হাততালি আর থামতেই চায় না। ওই বীভৎস আকৃতির মেকআপ দেখে অর্ধেন্দুশেখরকে চেনবার উপায় নেই। যিনি এক খ্যাতমান অভিনেতা, স্বয়ং এই নাটকের পরিচালক, তিনি ওই অকিঞ্চিৎকর অত ক্ষুদ্র ভূমিকা নিলেন ? এবং দেখিয়ে দিলেন, ওইটুকু সময়েও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়।

ভরতের পাশের আসনের একজন লোক বলল, আরে মোসাই, অর্ধেন্দুবাবুর ওই অ্যাক্টোটুকু দেখার জন্যই এই থ্যাটারে এই নিয়ে পোঁয়োরো বার এলুম !

একদিন নাটক দেখে ফেরার পথে বৃষ্টি এল এবং দুজনকেই ভিজতে হল। অসময়ের বৃষ্টি, সঙ্গে নিয়ে আসে সর্দি-সান্নিপাতিক। শিউপূজনের কিছু হল না, ভরত জ্বরে পড়ে গেল।

অগত্যা হোটেলের ঘরে একা শুয়ে থাকতে বাধ্য হল ভরত। শিউপূজন এক কবিরাজকে ডেকে এনে দেখিয়েছে, কবিরাজ কয়েকটি বড়ি ও পাচন দিয়ে গেছে। ওষুধের অনুপান মধু, পানপাতা ও গোলমরিচও কিনে এনেছে, এর বেশি আর সে কী করবে, সারাক্ষণ তো ঘরে থাকতে পারে না। সে থাকতে চাইলেও ভরত আপত্তি করত।

একা থাকতে ভরতের খারাপ লাগবার কথা নয়। তীর্থযাত্রী হিসেবে সে অনেক দেশ ঘুরে বেরিয়েছে, বহু সরাইখানা-ধর্মশালায় সে তো একাই কত দিনরাত্রি অতিবাহিত করেছে। এমন হয়েছে, সারাদিন একটাও কথা বলেনি কারুর সঙ্গে। কিন্তু সে সব জায়গা ছিল অচেনা, সেখানে একা থাকাই স্বাভাবিক। এটা কলকাতা শহর, রাস্তাঘাট সব পরিচিত, তার নিঃসঙ্গতা এখানে বড় প্রকট হয়ে চেপে ধরে। একদিন পরেই ভরত বড় উতলা বোধ করতে লাগল।

শিউপূজন কিছুটা প্রমোদের স্বাদ পেয়েছে, শুধু থিয়েটার দেখে তার মন ভরে না। আরও দু-চারজন বন্ধু জুটিয়েছে, হোটেলে ফেরে বেশ গভীর রাতে।

তৃতীয় দিনে জ্বর কিছুটা কমে গেলেও শরীর বেশ দুর্বল, মুখ একেবারে বিস্বাদ, চিত হয়ে শুয়ে ভরত আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। এরপর তার জীবন কোন দিকে যাবে ? কলকাতাতেই থাকবে, না ফিরবে পাটনায় ? পাটনায় তার বাড়ির আগুন নিছক দুর্ঘটনা নয়, কেউ লাগিয়েছে বলেই শিউপূজনের দৃঢ় বিশ্বাস। ভরতের সঙ্গে কে এবং কেন শত্রুতা করবে, সে তো কারুর পাকা ধানে মই

দেয়নি ! তবু বারবার এই রকম হয় । পাটনার প্রতি তার বিতৃষ্ণা জমে গেছে । কলকাতা শহরই এখন নানারকম ঘটনার কেন্দ্র, থাকলে এখানেই থাকা উচিত । অন্য কোথায়ই বা সে যাবে !

হোটেলের পাশের কক্ষে এক স্ত্রীলোকের প্রগলভ কলহাস্য শোনা যাচ্ছে । শুনলেই বোঝা যায়, কোনও ভদ্র নারীর কণ্ঠস্বর নয় । বাজারের পাশে হোটেল, এখানে কেউ বউ-ঝি নিয়ে আসে না, হোটেলের বাসিন্দারা সবাই পুরুষ । সন্ধ্যার পরপরই এই এলাকার পথে পথে বাতিস্তম্ভগুলির নীচে বারাঙ্গনারা দাঁড়িয়ে থাকে । লোকে ওদের বলে পতিতা, কুলটা । আসলে সহায়-সম্বলহীন বালবিধবা কিংবা স্বামী-শ্বশুরকুল দ্বারা বিতাড়িত অসহায় বাঁজা নারী, নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে পথে নেমেছে । সেই রকমই কোনও রমণীকে কেউ হোটেলের ঘরে তুলে এনেছে । ভরত একবার ভাবল, অনেককাল আগে তার বন্ধু দ্বারিকা বুঝিয়ে ছিল যে এরা সবাই অসহায় নারী, বসন্তমঞ্জরীকে দেখেই তো তা বোঝা যায়, কিন্তু অসহায়, দুঃখী হলে এমন তীক্ষ্ণ গলায় হাসে কেন ? কথার ভঙ্গিতে কেন লাস্য জড়ানো ? তবে কি, সবই কৃত্রিম ? হাসি না থাকলে, নকল ছলাকলার ভাব না দেখালে কেউ মূল্য দেবে না ।

এক সময় ভরতের অসহ্য লাগল, জামা গলিয়ে নেমে এল রাজপথে । মাথাটা একটু টনটন করছে, না হাঁটলেই হল, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে । একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে কাছে, সেটার দিকে এগোতে এগোতে ভরত প্রথমে ভাবল, গঙ্গার ঘাটের দিকে গেলে হাওয়া খেয়ে এলে কেমন হয় ? নতুন নতুন বড় বড় জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ছে, সাদা, কালো, খয়েরি, হলুদ কত রকমের মানুষ সেই সব জাহাজ থেকে নামে, সে সব দেখতেও তো ভাল লাগে ।

গাড়িতে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে ভরত মত বদল করে আবার ভাবল, বরং তার বদলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নাট্যরূপ দেখে আসা যাক । অমর দত্ত নামে এক তরুণ অভিনেতা নাকি এতে ফাটাফাটি অভিনয় করছে, ভরতরা ছাত্র বয়েসে এই অমর দত্তের নামও শোনেনি ।

ভরতের নিয়তি যেন তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল ক্লাসিক থিয়েটারের দিকে ।

ক্লাসিকের দ্বার প্রান্তে নেমে ঘোড়ার গাড়ি থেকে যখন নামল ভরত তখন টিকিট প্রায় শেষ হয়ে গেছে । বারো টাকা দামের টিকিট দুটি একটি বাকি আছে মাত্র, গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে সে কাউন্টারে এসে শেষ টিকিটটি পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে ।

শো শুরু হতে আরও মিনিট সাতেক দেরি আছে, সবে মাত্র ফার্স্ট বেল পড়েছে, অনেক লোক অপেক্ষা করছে বাইরে । থিয়েটারের দর্শকরা ভাল সাজগোজ করে আসে, এটাই প্রথা । শীতকালের পোশাকে অনেক রঙের বাহার থাকে । সৌখিন বাবুদের গায়ে কাশ্মীরি শাল, জামেয়ার এবং মলিদার যেন প্রদর্শনী চলছে, চতুর্দিক ভুরভুর করছে আতর এবং ফরাসি পারফিউমের গন্ধে । তুলনায় ভরতের বেশবাস মলিন, সে হঠাৎ উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে, মুখে তিনদিনের দাড়ি, এই কদিন স্নানও করেনি, কোটরে বসে গেছে চক্ষু । গায়ে একটা সাধারণ চাদর জড়ানো, তবু একটু শীত শীত করছে । আবার বুঝি জ্বর আসবে ।

ভরত দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে । হঠাৎ পেছন থেকে তার কাঁধে একজন চাপড় মারল । ফিরে দাঁড়িয়ে কিছুটা বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করল, তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ । একজন হোমরা-চোমরা মৌলবি, শেরওয়ানি ও জরির চুমকি বসানো কোট পরা, মাথায় ঝালর লাগানো ফেজ, মুখের দাড়িতে লালচে রং মাখানো । নিশ্চয়ই ভরতকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করেছে ।

ভরত কিছু বলার আগেই সে বলল, কী রে ভরত, চিনতে পারছিস না ?

ভরত সত্যিই পারছে না চিনতে । কলকাতা শহরে এই প্রথম হঠাৎ তাকে কেউ নাম ধরে সম্বোধন করল, অথচ বুঝতে না পারছে না সে কে । ভরত ভেবেছিল, এতদিন বাদে তাকে চেনাই শক্ত ।

ভরত কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না দেখে সেই লোকটি আবার হেসে বলল, আমি একটু মুটিয়েছি, তা বলে কি চেনা যাবে না ? আমি ইরফান রে, ইরফান !

ভরত এবার আনন্দময় বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, ইরফান, তুই ?

দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হল ।

প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যাবার পর, কুশল প্রশ্নাদি সেরে ভরত জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার রে, ইরফান, তুই যে খুব মুসলমান সেজেছিস ? সেইজন্যই তোকে দেখে ধারণাও করতে পারিনি ।

ইরফান বলল, সে কী ভায়া, মোছলমানের ছেলে মোছলমান হব না কি হিঁদু হব ?

ভরত বলল, তা বলছি না । তুই ডারউইন সাহেবের খুব ভক্ত ছিলি । তোর সঙ্গে আমার যখন শেষ দেখা হয়, তুই আমাকে অনেকক্ষণ ধরে ডারউইন তত্ত্ব বুঝিয়েছিলি, আমার এখনও মনে আছে ।

ইরফান উদারভাবে হেসে বলল, তাই বুঝি ? ডারউইন তত্ত্ব, তা হবে !

ভরত বলল, তুই তখন তোর একটা সংশয়ের কথাও বলেছিলি । ডারউইন তত্ত্ব অভ্রান্ত, এবং সেটা মানলে ঈশ্বর-আল্লা বা মানুষের কোনও সৃষ্টিকর্তাকে মানা যায় না । তা হলে আর আমরা কেউ হিন্দু বা মুসলমান থাকি না ।

ইরফান বলল, ছাত্র বয়েসে ও রকম এক একটা থিয়োরি নিয়ে মাথা গরম হয় । তুই এখনও ও সব মনে করে রেখেছিস ? ডারউইন তত্ত্ব অভ্রান্ত কে বলেছে ? যত্তসব গাঁজাখুরি । ওরে ভাইরে, ধর্ম না আঁকড়ে ধরলে কি সমাজে টেকা যায়, না উন্নতি করা যায় ? তুই যদি ধর্ম না মানিস, তা হলে তুই কে ? হিঁদুও না, মোছলমানও না, কুষ্ঠরোগীর মতন অস্পৃশ্য । আমি এখন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, এই শরীরে আল্লার করুণার স্পর্শ পাই । ভাল কথা, তুই কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলি ? যাদুগোপালের কাছে একদিন তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেও কোনও সন্ধান জানে না ।

ভরত বলল, একটা চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছিলাম কটকে ।

ইরফান বলল, এখনও সেখানে থাকিস ? কলকাতায় কাজে এসেছিস ?

ভরত বলল, না, কংগ্রেসের অধিবেশন দেখতে এসেছিলাম ।

মুখের মধ্যে যেন হঠাৎ একটা গন্ধ-পোকা ঢুকে গেছে, এই ভাবে ওষ্ঠ বিকৃত করে ইরফান বলল, কংগ্রেস ! তুই বুঝি কংগ্রেসি হয়েছিস শালা ? আর মোছলমানরা যাতে কংগ্রেসে যোগ না দেয়, আমি সেটাই প্রচার করছি ।

শেষ বেল বেজে উঠল, আর সময় নেই, এখনি নাটক শুরু হয়ে যাবে । দুজনের বসার আসনও এক জায়গায় নয় ।

ভেতরের দিকে যেতে যেতে ইরফান বলল, তুই একদিন আয়, ভরত, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে । বড় ভাল লাগল তোকে দেখে । সৈয়দ আমির আলির যে বাড়িতে আমি একসময় আশ্রিত ছিলাম, তোর মনে আছে ? সেই বাড়িটা আমি কিনে নিয়েছি । ওদের অবস্থা পড়ে গিয়েছিল, বেশ সস্তাতেই পাওয়া গেছে । মুর্শিদাবাদের পাট চুকিয়ে দিয়েছি, এখন এখানেই আমার আস্তানা ।

তারপর ভরতের দিকে তাকিয়ে ইরফান নিঃশব্দে এমনভাবে হাসল, যে-হাসির মর্ম কলেজ জীবনে দরিদ্র, পরাশ্রয়ী ইরফানকে যারা দেখেছে, তারাই শুধু বুঝবে ।

বারো টাকার সবচেয়ে দামি আসনে অন্যান্য দর্শকদের মাঝখানে ভরতকে বড়ই বেমানান লাগে । আর সকলেরই অঙ্গে ঐশ্বর্যের তকমা লাগানো, তারা আড়চোখে হংসদের মধ্যে বকের মতন ভরতকে দেখছে । ভরত ভ্রূক্ষেপ করল না ।

ড্রপসিন ওঠার পর থেকেই বোঝা যায় ক্লাসিকের সঙ্গে অন্যান্য থিয়েটারের কত তফাত । মঞ্চসজ্জা, আলো, পশ্চাৎপট সবই নতুন ধরনের । কনসার্ট বাজনাও শ্রবণ-সুখকর । লোকে মুখে মুখে কৃষ্ণকান্তের উইল বললেও এই নাটকের নাম 'ভ্রমর' । নাট্যরূপ দিয়েছে স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নায়ক গোবিন্দলালের চরিত্রেও সে নিজে । রোহিণীর ভূমিকায় নয়নমণি, ভ্রমর সেজেছে তিনকড়ি দাসী । এই সব নট-নটীই ভরতের অপরিচিত ।

কিছুক্ষণ নাটক চলার পর প্রথম বিস্ময়ের আঘাতটা তেমন তীব্র ভাবে আসেনি । রোহিণীর অভিনয় দেখতে দেখতে তার একসময় মনে হল, মুখের আদলটা কেমন যেন চেনা চেনা । একটু পরে সে বুঝতে পারল, এ রকম মনে হবার কারণ কী । তার স্ত্রী মহিলামণির সঙ্গে এই রমণীর মুখের

বেশ মিল আছে, বিশেষত এক পাশ ফিরলে মহিলামণিই মনে হয়।

অন্যমনস্ক হয়ে গেল ভরত, নাটক দেখার দিকে আর মন রইল না। মনে পড়তে লাগল তার পরলোকগতা স্ত্রীর কথা। বড় বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল মহিলামণির। জীবনটাকে সে বেশ সুন্দর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে চেয়েছিল, প্রবল ঝড়ের ফুৎকারে সব উড়ে গেল! ভরতের সঙ্গে যদি নিজের ভাগ্যটা জড়িয়ে না নিত, তা হলে মহিলামণিকে হয়তো পৃথিবী থেকে অত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হত না। ভরতের জীবনটাই যে অভিশপ্ত! একটি পুত্র সন্তান রেখে গেছে মহিলামণি, মামাদের বাড়িতে সে বর্ধিত হচ্ছে, সে কেমন আছে কে জানে! ভরত ইচ্ছে করেই তাকে দেখতে যেতে চায় না।

মঞ্চের রোহিণী একটা গান গেয়ে উঠতেই ভরতের বুকে কে যেন সজোরে একটা মুষ্ট্যাঘাত করল। এতক্ষণ কী ভুল ভাবছে সে! মহিলামণিকে সে চিতায় পুড়ে যেতে দেখেছে। রোহিণীবেশী এই রমণীর সঙ্গে মিল তো ভূমিসুতার। ভূমিসুতার মতন মুখের আদল দেখেই তো সে মহিলামণির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

ভূমিসুতা! এক অপমানিতা মানবী, দুঃখে-অভিমানে-ক্রোধে সে একদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এই কি সেই ভূমিসুতা? সে নাচ জানত, গান জানত। ভরতের মতনই সে ছিল ভাগ্যহীনা, রূপ-গুণ ছিল তার অভিশাপ। এই দুই ভাগ্যহীন-ভাগ্যহীনা এক সঙ্গে মিলতে চেয়েছিল, পৃথিবীর আর সব মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিয়েছে।

পাশের দর্শকটির দিকে ফিরে ভরত জিজ্ঞেস করল, মহাশয়, রোহিণীর পার্টে যে নেমেছে, ওর নাম কী?

করুণ দৃশ্য দেখে লোকটির চোখ ছলছল করছে, সে ধরা গলায় বলল, চুপ, চুপ। নয়নমণিকে চেনেন না, মোসাই নতুন বুঝি কলকেতায়? বাঙালদেশ থেকে আসচেন?

আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন বলে উঠল, সাইলেন্ট, নয়নমণির গানটা শুনতে দিন।

নয়নমণি না ছাই, এ নির্ঘাত ভূমিসুতা। ভরতের ভুল হতেই পারে না। ওই কণ্ঠস্বর কি সে জীবনে ভুলতে পারে?

ভরত বসে আছে দোতলায়, তার ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে রেলিং ধরে সে চিৎকার করে ডাকে, ভূমিসুতা, ভূমিসুতা! এই যে আমি এখানে।

কিন্তু এ রকম কিছু করলে লোকে তাকে পাগল বলবে, ঘাড় ধরে বার করে দেবে। সে অধীরভাবে নাটক শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই লাজুক, নতমুখী ভূমিসুতা এমন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছে, এই রূপান্তর এক একসময় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আবার এক একবার মনে হয়, ভূমিসুতা যেন ভরতকে দেখতে পেয়েছে, ওপরের দিকে মুখ তুলে ভরতের দিকে তাকিয়েই পার্ট বলে যাচ্ছে।

মঞ্চে অনেক রকম কেরামতি দেখাল অমর দত্ত। মস্তবড় একটা ঘোড়ায় চড়ে এল একবার, দর্শকদের মাতালো, কাঁদালো। পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে গেল রোহিণী, সেখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে উদ্ধার করতে গেল গোবিন্দলাল, জল ছিটকে এসে স্টেজ ভিজিয়ে দিল। ভরত এ সব কিছুই দেখছে না। সে থরথর করে কাঁপছে। আবার ভূমিসুতাকে ফিরে পাবার সম্ভাবনাই যেন তার কাছে আশাতীত মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি ফিরে পেলে কী হবে?

নাটক শেষ হল, দর্শকরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল বেশ কয়েক মিনিট ধরে। ভিড় ঠেলে সহজে নীচে নামা যায় না। ধাক্কাধাক্কি করতে গেলে বিরক্ত হয়। ভরতকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রিন রুমে পৌঁছতেই হবে। প্রথম চারিচক্ষু মিলনের পর তাকে কী বলবে ভূমিসুতা?

গ্রিন রুম পর্যন্ত যেতে হল না। আজ যেন বিশেষ তাড়া আছে নয়নমণির, ভাল করে মুখের রং না ধুয়েই সে বেরিয়ে পড়েছে, সারা শরীরে একটা কালোরঙের শাল জড়ানো, মুখখানিও অনেকটা ঢাকা। তবু অনেক দর্শক ছুটছে তার পিছুপিছু, দু-তিনজন যুবক হাত ধরাধরি করে তাকে আড়াল করে আছে।

গেটের ঠিক সামনেই অপেক্ষমাণ একটি সুসজ্জিত জুড়িগাড়ি। ভরত সে দিকে ছুটে গেল। ভক্ত দর্শকরা নয়নমণিকে ভাল করে দেখবার জন্য রীতিমতন হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে, চ্যাঁচাচ্ছে, ভরত সেই ভিড় ভেদ করতে পারছে না, সে ভূমিসুতার নাম ধরে ডাকলেও তা শুনতে পাবার কথা নয়।

একটি অতি সুদর্শন যুবক নয়নমণির হাত ধরে তুলল সেই জুড়িগাড়িতে, তারপর নিজেও সে বসল তার মুখোমুখি। দেহরক্ষীরা ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিল সকলকে। নয়নমণি একবার ভরতকে দেখতে পেল কি পেল না বোঝা গেল না। চলতে শুরু করল গাড়ি।

ভরতকে কেউ যেন একটা থাপ্পড় কষিয়েছে। অপমানে বিবর্ণ তার মুখ। কী ভুল সে করতে যাচ্ছিল! এই নয়নমণি যদি সেই ভূমিসুতা হয়, তা হলে তার সামনে সে দাঁড়াবে কোন পরিচয়ে? ভূমিসুতাকে সে একদিন চরম অপমান করেছিল। সেই ভূমিসুতা আজ কত সার্থক, রূপ আরও খুলে গেছে, কত জনপ্রিয় সে! সেই তুলনায় ভরত সব দিক থেকে একজন ব্যর্থ মানুষ, জীবনের কাছে পরাজিত। ভূমিসুতার কাছে এখন তার ক্ষমা চাওয়ারও কোনও মূল্য নেই।

একটু পরে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। তবু কিছুক্ষণ সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ভরত। রাত হয়েছে অনেক, কাছাকাছি একটাও ভাড়ার গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। ঈষৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ভরত। শুনশান পথ, সে একাই হাঁটছে।

৫৬

প্রতিদিন সকালবেলা বাধ্য, সুশীল ছাত্রের মতন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পাঠ নিতে বসে অরবিন্দ। সে শিক্ষা করছে মাতৃভাষা। দীনেন্দ্রকুমার রায়কে আনানো হয়েছে কলকাতা শহর থেকে, যদিও শিক্ষকতার কোনও অভিজ্ঞতাই তার নেই। দীনেন্দ্রকুমার এক দরিদ্র বাঙালি লেখক, কলকাতার কল-কোলাহল ও সাহিত্য-পরিবেশ ছেড়ে এই নিস্তরঙ্গ বরোদায় এসে পড়ে থাকার কোনও বাসনা তার ছিল না, কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। বাংলা গল্প-প্রবন্ধাদি লিখে পয়সা পাওয়া যায় না, তাই বাধ্য হয়ে গৃহ-শিক্ষকতার কাজ নিতে হয়েছে। এমন ছাত্র পাওয়াও অবশ্য ভাগ্যের কথা। ছাত্রটি মাস্টারের থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং স্বয়ং একজন অধ্যাপক। বরোদা রাজ-কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে এর মধ্যেই অরবিন্দর বেশ নাম ছড়িয়েছে।

ছাত্র হিসেবে অরবিন্দ শুধু যে মনোযোগী তা-ই নয়, অতি খুঁতখুঁতে। বাংলা তার মাতৃভাষা হলেও শৈশব থেকেই সে মাতৃসঙ্গ বঞ্চিত, এই ভাষাতে সে কথা বলতেও পারে না। কিন্তু এখন সে উত্তমরূপে বাংলা শেখার জন্য বদ্ধপরিকর। এক একখানি বাংলা বই ধরে ধরে সে প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে নিতে চায়।

আজ সকালে পড়ানো হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'। তার এক জায়গায় রয়েছে একটি রসের ছড়া:

মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচকচ
মাসীর পিরীতে মামা হ্যাঁকচ প্যাঁকচ...

দীনেন্দ্রকুমার ছড়াটি পড়ে শোনাতেই অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, হোয়াট ইজ হ্যাঁকচ প্যাঁকচ?

দীনেন্দ্রকুমার মুচকি হেসে বলল, সব কথার অনুবাদ হয় না। ওটা বুঝে নিতে হবে। বুকে হাত বুলোলেই টের পাওয়া যায়।

অরবিন্দ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, রঙ্গ-রসিকতার বিশেষ ধার ধারে না। সে বলল, প্রত্যেকটি শব্দেরই নিশ্চয়ই একটা কিছু অর্থ থাকবে। কেন অনুবাদ করা যাবে না?

ছাত্রের ধমক খেয়ে শিক্ষক প্রথমে মাথা চুলকে বলল, হ্যাঁকচ প্যাঁকচ মানে, ইয়ে, মানে...। তারপর দীনেন্দ্রকুমার এক গেলাস জল পান করে গোঁফ টানতে টানতে বিড়বিড় করে বলল, হ্যাঁকচ প্যাঁকচ ইজ, ইজ, ইট মিন্‌স, নাঃ মশাই, এর ইংরিজি করা আমার বাপের সাধ্যেও কুলোবে না। অনেক বাংলা কথা আছে, তার ইংরিজি হয় না।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, যেমন, যেমন? আর কোন বাংলা কথার ইংরেজি হয় না?

দীনেন্দ্রকুমার বলল, যেমন ধরুন আড্ডা, গুলতানি। ইংরেজরা আড্ডাও দেয় না, এর ইংরিজিও হয় না! আমাদের স্ত্রীলোকেরা কথায় কথায় অভিমান করে, মেমসাহেবদের অভিমানের বালাই নেই, তাই 'অভিমান' শব্দটার ইংরিজিও কখনও শুনিনি। তারপর ধরুন, ন্যাড়া নেড়ীদের ধেই ধেই নেত্য! এই ধেইধেইয়ের কী ইংরেজি করব বলুন!

অরবিন্দ তবু ভুরু কুঁচকে বলল, বাট আই ডোন্‌ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাঁকচ প্যাঁকচ!

বাইরের বারান্দায় বসে শীতের রোদ পোহাতে পোহাতে বারীন্দ্র একটা বাংলা নভেল পড়ছিল। সে হো-হো করে হেসে উঠল।

দীনেন্দ্রকুমার বলল, আপনি পিরীত কথাটার মানে বুঝেছেন তো? কারুর সঙ্গে পিরীত হলে তবেই ওই কথাটার মানে বোঝা যায়। আপনি বরং এক কাজ করুন, এবারে ঝটপট একটা বিয়ে করে ফেলুন!

এ কথায় ক্রুদ্ধ, বিরক্ত বা লজ্জিত হল না অরবিন্দ। সোজাসুজি দীনেন্দ্রকুমারের চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, নট এ ব্যাড আইডিয়া। আমি বিবাহের জন্য মনস্থির করে ফেলেছি।

দীনেন্দ্রকুমার বলল, খুব ভাল কথা। দেখেশুনে একটি বুদ্ধিমতী বাঙালি মেয়েকে ঘরনি করে আনুন, দিব্যি গড়গড় করে বাংলা শিখে যাবেন। মাস্টার রাখার আর দরকার হবে না।

অরবিন্দ একটুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। নিজের জীবন সম্পর্কে তার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। এই একটি দেশীয় রাজ্যে সারাজীবন অধ্যাপনা করে কাটিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁর নেই। ভারতের রাজধানী সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র, সেখানে একসময় তাকে পৌঁছতেই হবে। তার আগে প্রস্তুতির প্রয়োজন। আপাতত জীবনের এই পর্বে তাকে সংসারী হতে হবে, নারীবিহীন সংসার সংসারই নয়।

কিন্তু কে তার বিবাহের ব্যবস্থা করবে? পিতা নেই, মা থেকেও নেই, মাতামহ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, পিতৃ-মাতৃকুলের আর কারুর সঙ্গে বিশেষ সংস্রব রাখেনি অরবিন্দ, তার দুই দাদাও খোঁজখবর নেয় না। এ তো আর ইংল্যান্ড নয় যে নাচের আসরে রূপসী যুবতীদের সঙ্গে পরিচয় হবে, বিশেষ কোনও একজনকে পছন্দ হলে তার সঙ্গে কোর্টশিপ চলবে কিছুদিন, তারপর একদিন বিবাহের প্রস্তাব। মাঝখানে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি থাকে না। কিন্তু এ দেশে তো সে সুযোগ নেই, অবিবাহিতা তরুণীরা সব গৃহবন্দিনী, এ দেশের দু'জন নারী-পুরুষ বিবাহ করে না, তাদের বিবাহ দিতে হয়। ইংল্যান্ডে থাকার সময় এডিথ আর এস্টেল নামে দুটি রমণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাদের যে-কোনও একজনকে অনায়াসে জীবনসঙ্গিনী করে নেওয়া যেত, কিন্তু অরবিন্দ তখনই ঠিক করে নিয়েছিল, ইংল্যান্ড নয়, ভারতই তার যোগ্য স্থান, সুতরাং কোনও ভারতীয় নারীই হবে তার স্ত্রী।

বারীন্দ্র বই মুড়ে রেখে ঘরের মধ্যে এসে সাগ্রহে বলল, সেজদা, আপনি বিয়ে করবেন? এখানে আসার আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম, বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে একদিন চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। সে বাড়িতে একটি মেয়েকে দেখেছি, অতীব সুশ্রী, লেখাপড়ায় নাকি ফার্স্ট হয়, ভাল গান জানে, তরতরিয়ে ইংরিজিতে কথা বলতে পারে। তাকে দেখেই মনে হয়েছিল, আহা, এই মেয়েটি আমার সেজোবউদিদি হলে বেশ মানাত। এতদিন ভয়ে এই কথাটা আপনাকে বলতে পারিনি। চলুন না, একবার সবাই মিলে কলকাতায় তাকে দেখতে যাই! ব্রাহ্মবাড়ির মেয়ে, নিঃসঙ্কোচে সামনে কথাবার্তা বলতে পারে।

অরবিন্দ ওষ্ঠ বক্র করে বলল, ব্রাহ্ম? ওই যারা পায়ে মোজা পরে হাঁটে, পিয়ানো বাজায়, নকল

গলায় কথা বলে, ভাসা ভাসা প্রণয়ের ভাব করে, ওই সকল মেয়ে আমার দু' চক্ষের বিষ! কোনও ব্রাহ্ম মেয়েকে আমি কদাচ বিবাহ করব না!

বারীন্দ্র অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমরাই তো ব্রাহ্ম!

অরবিন্দ বলল, বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন, আমি নই। শুনেছি বাবাও শেষ জীবনে ব্রাহ্মধর্মের রীতিনীতি কিছুই মানেননি। আমিও মানি না। ইংরিজি জানা স্ত্রীও আমি চাই না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যেমন সব রমণীদের বর্ণনা আছে, সেই সব হিন্দু মেয়েদের একনিষ্ঠতা, কোমলতা, প্রেমের গভীরতা, সেবাপরায়ণতা, আহা কী অপূর্ব সব চরিত্র, তেমন কারুকে পেলে এক্ষুনি বিবাহ করি।

দীনেন্দ্রকুমার সহাস্যে বলল, ওসব তো মশাই সব কাল্পনিক চরিত্র।

অরবিন্দ বলল, বাস্তবে হিন্দু পরিবারে অমন নারী নেই? আমি বিশ্বাস করি, অবশ্যই আছে।

দীনেন্দ্রকুমার বলল, থাকলেও কোনও মানসম্পন্ন হিন্দু পরিবার আপনাকে মেয়ে দেবে কেন? একে ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম, তারপর বিলেতে কাটিয়েছেন চোদ্দো বছর। আপনার তো জাত গেছে!

অরবিন্দ বলল, প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু সমাজে ফেরা যায় না? শুনেছি এমন হয়!

দীনেন্দ্রকুমার বলল, তা হতে পারে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলে আপনাকে গোবর খেতে হবে। পারবেন?

অরবিন্দ দৃঢ়স্বরে বলল, কেন পারব না? গোবরই খাব। এক কাজ করা যাক, সংবাদপত্রে পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না? আপনি একটি বিজ্ঞাপনের খসড়া মুসাবিদা করুন!

এরপর কয়েকদিন ধরে চলল বিবাহের আলোচনা।

এ বাড়িতে সর্বক্ষণই যেন হট্টমালা চলে। প্রচুর ঋণগ্রস্ত অবস্থায় পাটনার দোকানটি তুলে দিয়ে বারীন্দ্র এখানে এসেছিল কিছু মূলধন সংগ্রহের আশায়। কিন্তু ছোট ভাইয়ের ব্যবসায়িক উদ্যমের ব্যাপারে অরবিন্দর কোনওরকম আগ্রহ নেই। অরবিন্দর উপার্জন কম নয়, কিন্তু বেহিসেবি স্বভাবের জন্য তার সঞ্চয় কিছু নেই। পাগল মায়ের চিকিৎসার জন্য সে নিয়মিত টাকা পাঠায়। এখানকার কেউ সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এলে সে সত্যমিথ্যা যাচাই না-করেই অকাতরে দান করে। কোনও কোনও মাসের শেষে তাকেই ধার করে চালাতে হয়।

দীনেন্দ্রকুমার মজলিশি স্বভাবের মানুষ! বারীন্দ্র তার রাঙা মাকে বিপদের মুখে ফেলে এসেছে, আর সেখানে ফেরার নাম করে না। এখানেই সে কোনও জীবিকার সন্ধানে আছে। স্থানীয় কিছু কিছু ব্যক্তি যখন তখন এসে পড়ে গল্পগুজবের জন্য, কেউই না খেয়ে ফেরে না। শশিকুমার হেস নামে একজন চিত্রকর এ বাড়িতে নিয়মিত অতিথি। সে-ও আসে আড্ডার লোভে। শশিকুমারকে দেখে বাঙালি বলে বোঝাই যায় না, সে অতি গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ। তার গোঁফ দাড়ির রংও কটা, সবসময় সাহেবি পোশাকে থাকে, মাথার টুপিটিও খোলে না। চিত্রকলা শিক্ষার জন্য শশিকুমার বহু বছর ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে কাটিয়েছে, তাকে ইতালিয়ান বলে চালিয়ে দিলে কেউ অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু চেহারা বা পোশাক যে-রকমই হোক, শশিকুমার মনেপ্রাণে বাঙালি, ইংরেজি ভাষাটিও সে ভাল জানে না। এক ফরাসি প্রণয়িনীকে সে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতারা এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সঙ্গে এই বিবাহ সমর্থন করেননি। বরোদায় কেউ তাঁর সঙ্গে ওই রমণীর সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামায় না।

একদিন আর একটি ব্যক্তি এক বিচিত্র আবেদন নিয়ে উপস্থিত হল। সে বাংলায় কথা বললেও তাকে দেখেও বাঙালি বলে মনে করার উপায় নেই। অতি দীর্ঘকায় বলশালী এক যুবা, মুখে মস্ত বড় গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, হাতে একটি প্রকাণ্ড লাঠি। বৈঠকখানা ঘরে অরবিন্দ তখন অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, সেই লোকটি সরাসরি ঢুকে এসে, প্রথমেই অরবিন্দকে চিনে নিয়ে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, আমি অনেক ঘুরে ঘুরে আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে সাহায্য করতেই হবে। বাঙালিকে বাঙালি সাহায্য করে না, এই অপবাদ আপনি ঘুচাতে পারেন অবশ্যই। আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে আমার আর গতি নেই, আমি এখানেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকব।

লোকটি এমন ঝড়ের বেগে কথা বলতে লাগল যে সমস্ত বাংলা বুঝতে পারল না অরবিন্দ। সে

তাকাল দীনেন্দ্রকুমারের দিকে।

দীনেন্দ্রকুমারের প্রথমেই মনে হল, লোকটি ছদ্মবেশী গোয়েন্দা নয় তো ! পুণায় দু'জন সাহেব খুনের জের এখনও চলছে, পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে আর কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র চলছে কি না। এই লোকটির ধরন ধারণ সন্দেহজনক। এমনও হতে পারে, এ নিজেই কোনও ষড়যন্ত্রকারী।

দীনেন্দ্রকুমার জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কী ? আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

লোকটি বলল, সবাইকে বলি, আমার নাম যতীন উপাধ্যায়। আসল নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামুনের ছেলে, বাংলাদেশের এক গ্রামে আমার জন্ম। ছেলেবেলা থেকে আমার খুব সাধ, আমি সৈনিক হব। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করব। কিন্তু আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, কিন্তু বাঙালি শুনলে ইংরেজ সরকার তো সেনাবাহিনীতে নেবেই না, কোনও দেশীয় রাজ্যও সুযোগ দিতে চায় না। আমি শুনেছি, এখানকার সেনাপতি মশাই স্যারের বন্ধু, স্যার যদি আমার হয়ে একটু বলেন—

দীনেন্দ্রকুমার বললেন, বাঙালিকে নিতে চায় না, এটা এমন কিছু আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু কোনও বাঙালি যে স্বেচ্ছায় সৈনিক হয়ে লড়াই করতে চায়, এমন পরম আশ্চর্য কথা কখনও শুনিনি। আপনার এরকম উদ্ভট শখ হল কেন ?

যতীন উঠে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, আমার হাতে লাঠি থাকলে দশটা লোককে একসঙ্গে সামাল দিতে পারি। আমি তলোয়ার খেলা জানি। কুস্তিতে বড় বড় পালোয়ানদের হার মানিয়েছি। একবার অযোধ্যার জঙ্গলে একটা বাঘের মুখে পড়েছিলাম। এই দেখুন, আমার পিঠে থাবার দাগ। বাঘ কিন্তু আমাকে ঘায়েল করতে পারেনি, নিজেই পিঠটান দিয়েছে। আমি বন্দুক চালাতেও পারি। আমার যোগ্যতা কম কীসে বলতে পারেন ? শুধু বাঙালি বলে আমার চাকরি হবে না ?

এবার অরবিন্দ বলল, বাঙালির মধ্যে যে এরকম বীরপুরুষ আছে, তা দেখে বড় সন্তুষ্ট হলাম। আমি মাধবরাওকে বলে আপনাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করাবার চেষ্টা করব অবশ্যই। এখানে আপনি উঠেছেন কোথায় ?

যতীন বলল, ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে।

অরবিন্দ বলল, আপাতত দু'-চারদিন আমার এখানেই থাকুন। এখন স্নান করে নিন, মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে গেছে।

অতগুলি বছর বিলেতে কাটিয়ে এলেও অরবিন্দ সাহেবি খানা খায় না। সে প্রাণপণে বাঙালি হতে চায় বলে বাড়িতে ধুতি-কামিজ পরে, ডাল-ভাত-মাছের ঝোল আহারই তার পছন্দ। একজন রান্নার ঠাকুর আছে বটে, কিন্তু সে রান্নার কিছুই জানে না। ভাতে পোড়া লাগায়, ডালে নুন বেশি, মাছের ঝোল হয় কালিবর্ণ। প্রত্যেকদিন খেতে বসে দীনেন্দ্রকুমার বলে, উঃ, এই খাদ্য খেয়ে কি মানুষ বাঁচে ? এর মধ্যেই আমার পাগল হবার উপক্রম। গৃহিণী না থাকলে কি সংসার চলে ?

যতীন মাছের ঝোলমাখা ভাত মুখে দিয়েই থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল। মুখ বিকৃত করে বলল, এই রান্না মানুষে খায়। কাল আমি আপনাদের রান্না করে খাওয়াব। দেখবেন আমার হাতের গুণ। এই হাতে আমি তলোয়ারও চালাতে পারি, আবার সবরকম রান্নাও পারি।

সত্যিই পরের দিন যতীনের হাতের রান্না খেয়ে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। লোকটি গুণী বটে। এ বাড়ির মজলিশে সে শিরোমণি হয়ে উঠল দু' দিনেই। অফুরন্ত তার গল্পের ভাণ্ডার। বারীন্দ্র অবিলম্বে তার চ্যালা হয়ে গেল। যতীনের রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে শুনতে দীনেন্দ্রকুমারও মুগ্ধ।

অরবিন্দ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তার উপস্থিতিতে ঠিক আড্ডা জমে না। দুপুরবেলা অরবিন্দ কলেজে চলে গেলে তখন সবাই মন খুলে কথা বলে। ছবি আঁকা ছেড়ে শশিকুমারও এসে উপস্থিত হয়।

কলকাতার কয়েকটি পত্রিকায় পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে, চিঠিপত্র আসতে শুরু

করেছে। গিরীশচন্দ্র বসু নামে এক ভদ্রলোক দু'-তিনখানা চিঠি লিখেছেন, তিনি ঘটকালি করছেন তাঁর এক বন্ধুর কন্যার জন্য। বন্ধুটির নাম ভূপাল বসু, কন্যাটির নাম মৃণালিনী, চোদ্দো বৎসর বয়েস, বেশ সুশ্রী, চোখ দুটিতে কোমলতা মাখানো। ভূপাল বসুও বিলেতে ছিলেন বেশ কিছুদিন, সেইজন্য বিলেত-ফেরত জামাতায় তাঁর আপত্তি নেই।

বংশ ভাল, কন্যাটিও উপযুক্ত। গিরীশবাবু বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ, সুতরাং তাঁর কথার মূল্য আছে। অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বন্ধু-কন্যার বিবাহ দিতে তিনি খুবই আগ্রহী। এই বিবাহ যদি রেজিস্ট্রিমতে হয়, তা হলে আর প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন নেই। কিছুদিন আগে চিত্তরঞ্জন দাশ নামে এক বিলেতফেরত ব্যারিস্টার রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। এখন অনেক বিলেতফেরতই শাস্ত্রমতে, পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে করছে না। হিন্দু সমাজ যাদের জাতিচ্যুত করতে চায়, তারা সমাজের বিধানকে কলা দেখিয়ে সহজ সরল রেজিস্ট্রি বিবাহ সেরে নিচ্ছে।

কিন্তু অরবিন্দ প্রথম থেকেই গোঁ ধরে বসে আছে, খাঁটি হিন্দুমতে, নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে, যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে বিবাহ করবে। হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, সে বঙ্কিমের ভক্ত, ব্রাহ্মদের বা সংস্কারপন্থিদের সে দু' চক্ষে দেখতে পারে না। শুধু ফোটোগ্রাফ দেখেও পাকা কথা দেওয়া হবে না, কলকাতায় গিয়ে সে পাত্রী দেখে নির্বাচন করবে। আগামী সপ্তাহে কলকাতায় যাওয়ার একটি দিন ধার্য হয়েছে।

সন্ধের সময় এ বাড়িতে হই-হট্টগোল একেবারে বন্ধ থাকে। কলেজ থেকে ফেরার পর চা পান সেরে অরবিন্দ লিখতে বসে। এই সময় কোনওরূপ গোলমাল তার সহ্য হয় না। অরবিন্দ চলে যায় দোতলায়, নীচের বৈঠকখানায় দীনেন্দ্রকুমার-বারীন্দ্র-যতীনরা ফিসফিস করে কথা বলে কিংবা নিঃশব্দে তাস খেলে।

ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করে অরবিন্দ। ছাত্র বয়েসে সে ভেবেছিল, শুধু কবিতাই রচনা করবে সারাজীবন, আর কোনও জীবিকা গ্রহণ করবে না। যদি সেই সঙ্কল্পই বজায় থাকত, তা হলে আর বোধহয় ভারতে ফেরাই হত না। ইংরেজ কবিদের মতন সে বড় বড় চুল রেখেছে, টাইবিহীন পোশাক পরেছে, কফিখানায় বা বিভিন্ন পানশালায় সে তরুণ কবিবৃন্দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্য আলোচনা ও তর্কবিতর্কে অংশ নিয়েছে। কিন্তু একটা সময় সে বুঝতে পেরেছিল, সে কিছুতেই ইংরেজ কবিদের সমকক্ষ হতে পারবে না। যতই অন্তরঙ্গতা থাক, তবু যেন বন্ধুদের সঙ্গে রাজা-প্রজার সম্পর্ক উঁকি মারে। বিপ্লবোত্তর ফরাসি দেশ কিংবা বিসমার্কের জার্মানি সম্পর্কে কোনও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গেলে বন্ধুরা এমনভাবে তাকাত, যেন বলতে চাইত, তুমি তো পরাধীন দেশের মানুষ, তোমার এসব বিষয়ে কথা বলার কী অধিকার আছে !

আইরিশরাও পরাধীন, তবু আইরিশ কবি-লেখকদের ইংরেজরা সমীহ করে। কারণ আইরিশরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে, মাঝে মাঝে চোরাগোপ্তা আক্রমণে সরকারকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে সেখানে, কে যে সেইসব সমিতির সদস্য, আর কে নয়, তা বলা শক্ত। ভারতে তো স্বাধীনতা আন্দোলনের চিহ্নমাত্র নেই। ভারতীয়রা যেন চিরকালের জন্য পরাধীন থাকতেই প্রস্তুত।

শুধু কবিতা লিখে টিকে থাকা যাবে না বুঝতে পেরেই অরবিন্দ আই সি এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে তার চৈতন্যোদয় হল। সিভিল সার্ভিসের অফিসার হয়ে ভারতে ফিরলে তাকে ইংরেজের সরাসরি দাসত্বই করতে হবে। ওপরওয়ালা হবে সব ইংরেজ, তাদের অঙ্গুলিহেলনে চলতে হয় নেটিভ অফিসারদের। তাই ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা না-দিয়ে অরবিন্দ আই সি এস হবার বাসনায় জলাঞ্জলি দিল। বরোদার রাজার সচিবের চাকরি নিয়ে সে দেশে ফিরেছে, কোনওদিনই ইংরেজের অধীনে চাকরি করবে না, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

এ ছাড়াও তার আরও পরিকল্পনা আছে। সব শুরু হবে ধীরে ধীরে।

কবিতা লিখতে লিখতে অরবিন্দ এক একসময় চুপ করে বসে থাকে। মনের মধ্যে এক মধুর শিঞ্জিনী ধ্বনি শুনতে পায়। এবার একজন জীবনসঙ্গিনী আসছে। এখন কিছুদিন অন্য প্রবাহে

বইবে এ জীবন।

বিবাহের পর এ বাড়ির এই আড্ডা ভেঙে দিতে হবে। বাংলা শিক্ষকের আর প্রয়োজন নেই। যতীনের চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু বারীন কোথায় যাবে ? নবোঢ়া পত্নীকে নিয়ে মধুযামিনী যাপন করার সময় সে ছোট ভাইকে সঙ্গে রাখতে চায় না।

একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে, কবিতার লাইন আর মাথায় আসছে না। কিশোরী বধূটির মুখখানি স্পষ্ট নয়, সে চপল পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ি, তার লেখার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, এই ছবিটিই চোখে ভেসে উঠছে বারেবারে।

একসময় কলম বন্ধ করে অরবিন্দ তরতর করে নেমে এল নীচে। অন্য তিনজন তাস খেলছে মেঝেতে বসে, সে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁরে বারীন তুই নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনা করেছিস ? এইভাবে তো সারাজীবন চলবে না, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিসনি কিছু ?

অতর্কিত প্রশ্নে বারীন্দ্র একটু দিশেহারা হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, মানে, পাটনায় আমার চায়ের দোকানটা প্রথমে ভালই চলছিল। কিছু টাকা পেলে ওই দোকানটাই আবার চালাতে পারি।

অরবিন্দ বলল, সে জন্য আমি টাকা দেব না। আমার ভাই সারা জীবন চায়ের দোকান চালাবে, সেটাও আমি চাই না।

দীনেন্দ্রকুমার বলল, ভদ্রলোকের ছেলে চায়ের দোকান চালাবে কী ! সে ভারী বিদঘুটে ব্যাপার।

বারীন্দ্র মাথা চুলকে বলল, আর তো কিছু শিখিনি। লেখাপড়াও তেমন হল না।

অরবিন্দ বলল, আমি ভাবছি, তোকে দেশের কাজে লাগাব।

বারীন্দ্র উৎসাহিত হয়ে বলল, স্বদেশি ভাণ্ডার ? তা পারব, তাঁতের কাপড়, মাদুর, গামছা বিক্রি করব। কলকাতায় এরকম গোটাকতক ভাণ্ডার হয়েছে শুনেছি।

অরবিন্দ ধমক দিয়ে বলল, আবার বিক্রির কথা ! ওই বুঝি দেশের কাজ ? দেশের কাজ মানে হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি।

বারীন্দ্র আবার অবাক হয়ে বলল, স্বাধীনতা ? তার মানে ?

অরবিন্দ বলল, স্বাধীনতার মানে বুঝিস না ? স্বাধীনতা মানে পরাধীনতার অবসান। ইংরেজদের দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আমরা স্বাধীন জাতি হব।

দীনেন্দ্রকুমার বলল, সে কী মশাই ! ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে তারপর আমরা যাব কোথায় ? তাতে যে আবার নতুন বিপদ আসবে। এ দেশটা একবার দখল করে নিল পাঠানরা। তারপর এল মোগল। মোগলদের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নিল ইংরেজ। এখন ইংরেজ যদি চলে যায়, তা হলে আবার নতুন কোনও রাজশক্তি আসবে। সীমান্তের কাছে থাবা উঁচিয়ে আছে রুশ ভাল্লুক। ওরা এসে যদি রাজা হয়, তা হলে ইংরিজি ভুলে গিয়ে আমাদের আবার রুশি ভাষা শিখতে হবে।

অরবিন্দ বলল, আবার কারুকে আসতে দেব কেন ? আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি না ? নিজেরা দেশটা চালাতে পারি না ?

দীনেন্দ্রকুমার হেসে ফেলে বলল, কী যে বলেন মিঃ ঘোষ ! আমাদের কি সে শক্তি আছে ? ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার ! ইংরেজদের আমরা তাড়াবই বা কী করে, আর নতুন কেউ রাজত্ব করতে এলে তাকে রোখবারই বা কী সাধ্য আছে ? কেন, ইংরেজদের অধীনে আমরা দিব্যি আছি ! রুশদের সঙ্গে লড়াই ফড়াই ওরাই করবে। আমাদের ওসব ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার দরকার কী ? কোনও না কোনও বিদেশি রাজার অধীনে আমরা থাকব, এটাই ভারতের নিয়তি।

অরবিন্দ বলল, যারা কাপুরুষ, তারাই এরকম নিয়তিবাদী হয়। সারা দেশটা কাপুরুষে ভরে গেছে। বিদেশি শাসকরা আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। ইতালি, জার্মানি কেমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমেরিকা ইংরেজশাসন বন্ধনমুক্ত হয়ে নিজেরাই দেশ চালাচ্ছে, আমরা পারব না কেন ?

দীনেন্দ্রকুমার বলল, ওরা সাহেবের জাত। ওদের লড়াই করার অভ্যেস আছে। আমরা কি অস্ত্র ধরতে শিখেছি কখনও ?

অরবিন্দ বলল, ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সেপাইদেরই সংখ্যা বেশি। তারাই তো লড়াই করে।

দীনেন্দ্রকুমার বলল, যাই বলুন আর তাই বলুন মশাই, আপনার প্রস্তাব রূপকথার মতন শোনাচ্ছে। বাঘা বাঘা সব বিদেশি শক্তি অস্ত্র উঁচিয়ে আছে, তার মধ্যে আমরা দেশ চালাব ? হুঃ ! কংগ্রেসের কোনও অধিবেশনেও তো কেউ কখনও স্বাধীনতার কথা বলে না ! কিছু চাকরি বাকরির সুবিধে আর করপোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটিগুলোতে দুটো-চারটে দেশীয় প্রতিনিধিত্ব চাওয়া হচ্ছে, ইংরেজ সরকার তাই-ই দিতে চায় না।

অরবিন্দ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, কংগ্রেস ! ও তো কিছু বড়লোক আর উকিল-ব্যারিস্টারদের আড্ডাখানা। চোস্ত ইংরিজিতে ভিক্ষে চাওয়া। কংগ্রেসকে দিয়ে কিস্যু হবে না। অন্যভাবে তৈরি হতে হবে। বারীন, তুই কলকাতায় যেতে রাজি আছিস !

বারীন্দ্র বলল, হ্যাঁ, যাব। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোন কাজ শুরু করব, সেজদা ?

অরবিন্দ বলল, অল্পবয়সী, স্বাস্থ্যবান ছেলেদের নিয়ে দল গড়তে হবে, তাদের শরীর গড়া আর অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে হবে। তারপর তারা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা নেবে। এসবই করতে হবে খুব গোপনে গোপনে। দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতে এরকম অনেক গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছে। বাঙালিরাই শুধু পিছিয়ে থাকবে ?

দীনেন্দ্রকুমার বলল, অল্পবয়সী ছেলেদের ধরে ধরে না হয় দল গড়া হল। তাদের কী বোঝানো হবে ? তারা যদি জিজ্ঞেস করে স্বাধীনতার মানে কী ? ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করা যাবে কী করে ? শুধু শুধু ছেলেভুলানো কথা বললে তো চলবে না।

অরবিন্দ বলল, তাদের বোঝাবেন যে, ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে যে সব হাজার হাজার ভারতীয় সেপাই আছে, স্বাধীনতার আহ্বান শুনে তারা সবাই বেরিয়ে আসবে। দেশীয় রাজ্যগুলি একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। পাহাড়ে অরণ্যে যত আদিবাসী আছে, তারা ক্রোধে ফুঁসছে, তাদের ওপর তো অবিচার অত্যাচার কম হয়নি। স্বাধীনতার ডাকে তারাও অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসার জন্য প্রস্তুত।

দীনেন্দ্রকুমার বলল, সত্যিই এরা সবাই ছুটে আসার জন্য তৈরি, নাকি এসব আপনার স্বপ্ন ?

অরবিন্দ বলল, স্বপ্নও একসময় সত্যি হয়। পৃথিবীর সমস্ত মহৎ ব্যাপারই আগে স্বপ্নের স্তরে থাকে। এই স্বাধীনতার যজ্ঞে আমাদের যুবসমাজ যদি পিছিয়ে থাকে, তার চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কী হতে পারে !

যতীন মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল , এবার সে বলে উঠল, এই স্বপ্নের কথা শুনে আমার শিহরন হচ্ছে। ইচ্ছে করছে এখনই কলকাতায় ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে দল গড়ি।

অরবিন্দ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার সম্পর্কেও আমি সেই কথা ভেবে রেখেছি। এখানকার সেনাবাহিনীতে সামান্য একজন সৈন্য হয়ে তুমি পড়ে থাকবে কেন ? তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার অস্ত্রবিদ্যা তুমি নিজের দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগাও। বারীনের সঙ্গে তুমিও কাজে লেগে পড়তে পারো। বারীন ছেলেদের জুটিয়ে আনবে, তুমি তাদের লাঠি-তলোয়ার চালনা শেখাবে।

বারীন্দ্র বলল, আমি কালই যেতে রাজি আছি। কিন্তু সেজদা, টাকা-পয়সা জুটবে কোথা থেকে ? কিছু তো খরচ লাগবেই।

অরবিন্দ বলল, প্রথম কিছুদিন আমি তোর খরচ চালাব। তারপর সমিতি বড় হলে অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

বারীন্দ্র বলল, ঠিক আছে, চাঁদা তুলব। বড় বড় লোকদের কাছে গিয়ে স্বাধীনতার ব্রতের কথা বলে টাকা চাইব।

অরবিন্দ রূঢ়ভাবে বলল, না, চাঁদা তুলে দেশ উদ্ধার করা যায় না। তা ছাড়া সব সময় মনে রাখতে হবে যে, কাজ চলবে গোপনে। সমিতির সভ্যদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হবে। আর কেউ যেন কিছু টের না পায়।

বারীন্দ্র কিছুটা হতাশভাবে বলল, চাঁদা না তুললে টাকা আসবে কী করে ?

অরবিন্দ বলল, অন্যান্য দেশে গুপ্তসমিতিগুলো কী করে টাকা তোলে তোরা জানিস না ? প্রয়োজনে তারা ডাকাতি করে। আমাদেরও তাই করতে হবে।

দীনেন্দ্রকুমার আঁতকে উঠে বলল, সে কী মশাই! ভদ্রলোকের ছেলে ডাকাতি করবে কী! তাতে পাপ হবে না ?

অরবিন্দ বলল, স্বাধীনতার যুদ্ধে ভদ্রলোক-অভদ্রলোক বলে কিছু নেই। সবাই সমান। স্বাধীনতা এমনই পবিত্র প্রাপ্তি যে, তা অর্জনের জন্য কোনও পন্থাই পাপ নয়।

একটু থেমে, একটা সিগারেট ধরিয়ে অরবিন্দ এবার বলল, এইসব কথা আমি অনেকদিন যাবৎ চিন্তা করেছি। আর কারুকে বলিনি। আজ হঠাৎ বলে ফেললাম। তোমাদের তিনজনকেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, ঘুণাক্ষরেও কারুকে কিছু জানাবে না। দীনেন্দ্রবাবু, আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ, এই সব বিষয় নিয়ে আপনি কারুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না, কিছু লিখবেন না।

কয়েকদিন পরেই যতীন ছাড়া আর সবাই চলে এল কলকাতায়। ভূপাল বসুর কন্যা মৃণালিনীকে দেখে সকলেরই পছন্দ হয়ে গেল। বিয়ের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল বৈঠকখানা রোডে। বিয়ের একদিন আগে পুরোহিত ডেকে ভাবী জামাতা ও ভাবী শ্বশুর দু'জনেই খানিকটা করে গোবর মুখে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হল।

তারপর খাঁটি হিন্দুমতে, সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে অরবিন্দর সঙ্গে মৃণালিনী বসুর শুভ বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়ে গেল। নবদম্পতি মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য চলে গেল নৈনিতাল পাহাড়ে। বারীন্দ্র রয়ে গেল কলকাতায়।

৫৭

দ্বারিকার পুত্রটির বয়েস দেড় বৎসর। ফুটফুটে রং, টানাটানা চক্ষু, হাস্যময় মুখখানি দেখলে দেবশিশু মনে হয়। তাকে দেখলেই সকলে আদর করতে চায়। দোতলার বারান্দায় সুন্দর একটি দোলনায় শোওয়ানো হয়েছে বাচ্চাটিকে, এক ক্রিশ্চান ধাত্রী পাশে বসে তাকে দোল খাওয়াচ্ছে। সেই বারান্দায় সারসার ঝোলানো রয়েছে পাখির খাঁচা।

ভরতকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে দ্বারিকা বলল, জেগে আছে ? খোকা জেগে আছে ?

ঝপ করে সে তার সন্তানকে বুকে তুলে নিল। সন্তানগর্বে তার মুখখানি উদ্ভাসিত। তাকে নিয়ে প্রায় নাচতে লাগল দ্বারিকা, একবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল। শিশুটি ভয় না পেয়ে খটখট শব্দে হাসছে।

হঠাৎ ভরতের দিকে সন্তানকে বাড়িয়ে দিয়ে দ্বারিকা বলল, নে!

ভরত ইতস্তত করতে লাগল। সে শিশুদের আদর করতে পারে না। সে খুব অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের এড়িয়ে চলে। কিছু কিছু মানুষ বাচ্চাদের সঙ্গে সহজে ভাব জমিয়ে ফেলতে পারে, ভরতের সে ক্ষমতা নেই। শিশুদের প্রকৃতি অতি বিচিত্র, কখন কাঁদবে, কখন হাসবে তার ঠিক নেই, কারুকে দেখে অকারণে ভয়ে আর্তচিৎকার করে ওঠে, কারুকে দেখে সহর্ষে গলা জড়িয়ে ধরতে

চায়।

আড়ষ্টভাবে ভরত খোকাকে একবার বুকে তুলে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রাখল। অস্ফুটভাবে বলল, বাঃ ভারী সুন্দর ছেলে!

শিশুটিকে স্পর্শ করা মাত্র তার বুকের মধ্যে একটা ব্যথাবোধ জেগে উঠল। দ্বারিকা গদগদ স্বরে অতটুকু ছেলের নানা গুণপনার কথা বলে চলেছে, সে-সব কিছুই ভরতের কানে প্রবেশ করছে না। তার নিজের একটি সন্তান ছিল, এক সময় সেই পুত্রটিকে নিয়েও তার স্বপ্নের অবধি ছিল না। মাতৃহীন সেই বালক কত বছর তার পিতার মুখ দেখেনি। ভরত তাকে তার মাতৃকুলের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে, আর কোনওদিন সে কটক শহরে ফিরে যাবে না। তবু এমনই হয় রক্তের টান, সেই সন্তানকে তো কিছুতেই পুরোপুরি ভুলতে পারা যায় না।

এতদিন যে সে একবারও সেই পুত্রের খোঁজখবর নেয়নি, সে কি শুধুই তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বা স্বার্থপরতা ? ভরতের ধারণা হয়ে গেছে, তার অভিশপ্ত জীবনের সংস্পর্শে থাকলে ওই শিশুটিও জীবিত থাকত না। সর্বনাশ তাকে পদে পদে অনুসরণ করে, তার আপনজনদের কেড়ে নেয়, শুধু তাকে বাঁচিয়ে রাখে আরও কোনও সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য।

দ্বারিকা বলল, জানিস ভরত, আমার মায়ের হাত দেখে এক জ্যোতিষী বলেছিল, আমাদের কোনও বংশধর থাকবে না। আমার ভাগ্যে কোনও ছেলেপুলে নেই। তাই নিয়ে মায়ের মনে কত দুঃখ ছিল। সারা ভারতে ঘুরে বেড়ানোর সময় কতবার কত জ্যোতিষীদের হাত দেখিয়েছি। এক এক ব্যাটা এক এক রকম কথা বলে। তিনজন বলেছিল, আমার শুধু কন্যাভাগ্য। ছয় সাতটি মেয়ের বাবা হব। কাশীর এক জ্যোতিষী বলেছিল, রাজা দশরথের মতন ধুমধাম করে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে আশা আছে। খরচ হবে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা।

তারপরেই হা-হা শব্দে হেসে উঠে দ্বারিকা আবার বলল, আরে, আমার ঘরেই যে এক পাক্কা জ্যোতিষী আছে, সেটা খেয়ালই করিনি। আমার গিন্নি অনেক বড় বড় জ্যোতিষীর নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারে। মাঝে মাঝে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করে যে পিলে চমকে যায়। একদিন তাকে কথায় কথায় বলেছিলাম, আমার নিজের ছেলে হোক না-হোক আমি পরোয়া করি না। দত্তক নেব। আমার আপন বোনের সাতটি ছেলেমেয়ে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে দত্তক নেব। সেই ভবিষ্যতে এই সম্পত্তি রক্ষা করবে। তা শুনে বউ কী বলেছিল জানিস ? শুধু বলেছিল, হরিদ্বারে তুমি পুত্রমুখ দেখবে। তখনই যে সে অন্তঃসত্ত্বা তাও টের পাইনি। হরিদ্বারে এসে বাসা ভাড়া নিলাম। ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় বসন্তমঞ্জরী এই ছেলের জন্ম দিল। ভরত, বড় ভাগ্য করে আমি এমন বউ পেয়েছি। এখন এই ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ভরত বলল, বাঁচবে, নিশ্চয়ই বাঁচবে।

দ্বারিকা বলল, অবিকল আমার মুখের আদল। আমি যদি বাঁচি, ও কেন বাঁচবে না ? বসন্তমঞ্জরী আর একটা অদ্ভুত কথা বলে, প্রায়ই বলে, ও তোমার ছেলে, আমার নয়। এর মানে কী রে ? সন্তানের ওপর দাবি তো মায়ের বেশি!

ভরত বলল, এটা কথার কথা।

দ্বারিকা বলল, এই যে তোর সঙ্গে আবার দেখা হল, আমার লোক গিয়ে তোকে পাকড়াও করে আনল, সেও তো বসন্তমঞ্জরীর জন্য। সেও ভারী অদ্ভুত। এলাহাবাদে সেই যে দেখা হয়েছিল মনে আছে ? সেবারেও আমার গিন্নিই তোকে দেখিয়ে দিয়েছিল। তোর সম্পর্কে ওর একটা টান আছে।

ভরত মুখ নিচু করে বলল, আমি তাকে তো একবারই মাত্র দেখেছি। তাও অল্প সময়ের জন্য।

দ্বারিকা বলল, তিনতলায় একটা ঢাকা বারান্দা আছে। বিকেলবেলায় আমরা দু'জনে প্রায়ই ওখানে বসি। এক সঙ্গে চা খাই। কলকাতায় থাকার সময় বসন্তমঞ্জরী বাড়ি থেকে বেরুতেই চায় না, তিনতলা থেকে নামেই না। ওই বারান্দায় বসে পথের মানুষের স্রোত দেখা যায়, পথের মানুষরা অবশ্য আমাদের দেখতে পায় না। তো বারান্দায় বসে দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছি, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, বসন্তমঞ্জরী গুন গুন করে একটা গান গাইছিল। ওর গানটাও মেজাজের ব্যাপার। দিনের

পর দিন গায় না, অনেক সাধ্যসাধি করলেও গাইতে রাজি হয় না, আবার হঠাৎ এক এক সময় নিজেই গেয়ে ওঠে। আমি লক্ষ করেছি, যখন গান গায়, তখনই ওর অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, সামনের দিকে তাকিয়ে অনেক দূর দেখতে পায়, শুধু দূরত্ব নয়, সময় পেরিয়ে যায়। আজ এক সময় আচমকা গান থামিয়ে বলল, রাস্তার অন্য দিকে ওই যে ছাতা মাথায় একজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, ওই তো তোমার বন্ধু ভরত।

ভরত বলল, আমি তোদের এই নতুন বাড়িটার কথা জানতাম না। জানলে নিজেই এসে দেখা করতাম।

দ্বারিকা বলল, আরে শোন না ব্যাপারটা। তুই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিস, তোকে আমার বউ প্রথম দেখতে পেল। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। বসন্তমঞ্জরী যখন প্রথম ওই কথাটা বলল, আমি বিশ্বাস করিনি। রেলিং-এ ঝুঁকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জন? তারপর লোকটিকে দেখতে পেয়ে মনে হল, ঠিকই তো, এ তো আমাদের ভরত। এলাহাবাদে কিছু না বলে চুপি চুপি পালিয়েছিলি। আমাদের চাকর নকুল ওপরেই ছিল, তাকে ডেকে বললাম, শিগগির ছুটে যা, ওই ছাতা মাথায় লোকটিকে ধরে আন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি নকুলকে নির্দেশ দিচ্ছি, নকুল লোকটিকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ডেকে আনল। অনেকটা মুখের আদল তোর মতন হলেও সে অন্য লোক। বাঙালিই না।

ভরত বলল, এরকম ভুল তো হতেই পারে।

দ্বারিকা বলল, আলবাত ভুল হতে পারে। মানুষেরই ভুল হয়। আমি বউয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম। সে কিন্তু হাসল না, চুপ করে বসে রইল। যেন হার মানবে না কিছুতেই। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আর একটি ছাতা-মাথায় লোককে হেঁটে যেতে দেখে বসন্তমঞ্জরী জোর দিয়ে বলল, আর একবার নকুলকে পাঠাও। তোমার বন্ধুকে ডেকে আনো! নকুল দৌড়ে গিয়ে যাকে ধরল, সে সত্যিই ভরত সিংহ। যেন ম্যাজিক! দূর থেকে রাস্তার একজন মানুষকে দেখে চেনা কোনও লোকের মতন মনে হতেই পারে। কিন্তু একজন মিলল না বলে পরের একজন মিলে যাবে, এটা কী করে হয়? তুই একে কী বলবি?

ভরত বলল, কাকতালীয় ছাড়া আর কী!

দ্বারিকা বলল, আমার যেন মনে হয়, একবার মিলল না বলে বসন্তমঞ্জরী মন্ত্রশক্তিতে তোকে ডেকে আনল। কোনও ব্যাখ্যা নেই। ও নিজেও কিছু ব্যাখ্যা দিতে পারে না, খুব চাপাচাপি করলে অসহায়ভাবে বলে, মাঝে মাঝে আমার এরকম হয়। কেন হয়, জানি না। মাস কয়েক আগে গঙ্গায় একটা জাহাজডুবি হল, তুই তখন এখানে ছিলি? আরমানি ঘাটের কাছে একটা মালবোঝাই মস্ত বড় বিলিতি জাহাজ আস্তে আস্তে কাত হয়ে ডুবে গেল, সারা শহরের লোক ছুটে গিয়েছিল সে দৃশ্য দেখার জন্য। জাহাজটা ডুবতে শুরু করল বেলা তিনটের সময়, তার অন্তত এক ঘণ্টা আগে, স্নান সেরে বেরিয়ে এসে বসন্তমঞ্জরী ফ্যাকাসে গলায় আমাকে বলেছিল, ওগো, একটা জাহাজ ডুবছে। কত মানুষের বিপদ। আমাদের এ বাড়ি থেকে গঙ্গা কত দূরে, তবু আমার বউ আগাম সে দৃশ্য দেখতে পায় কী করে!

ভরত বলল, প্রাচীন ভারতে খনা, লীলাবতীদের মতন কিছু কিছু রমণীদের মধ্যে অলৌকিক শক্তি ছিল শোনা যায়। হয়তো বউঠাকুরানীও সে রকম ক্ষণজন্মা।

দোতলাতেও একটা প্রশস্ত বসবার ঘর আছে। দুই বন্ধু সেখানে বসে গল্প করল বেশ কিছুক্ষণ। বসন্তমঞ্জরী কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও দেখা দিল না, দ্বারিকও ভরতকে তিনতলায় নিয়ে যাবার কথা উচ্চারণ করল না একবারও। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল।

দ্বারিকা একবার বলল, ভরত, তুই প্রয়াগে আমাদের বাসাবাড়ি থেকে কেন কিছু না বলে উধাও হয়ে গেলি, সেটা আমি এখনও বুঝলাম না। তোর থাকতে ইচ্ছে না হলে তুই ডেকে আমাকে সে কথা জানিয়ে যেতে পারতি না? আমি কি তোকে জোর করে আটকে রাখতে পারতাম?

ভরত বলল, সত্যি কথা বলব? সেই সময় কিছুদিনের জন্য আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল।

সামাজিক রীতি-নীতি কিছুই মনে থাকত না। আমার সেই উন্মাদ দশা কাটিতে এক-দেড় বছর সময় লেগেছিল। পাগল ছাড়া বন্ধুর বাড়ির আরাম, আদরযত্ন ছেড়ে কেউ হুট করে চলে যায়? পরে আমি ভেবে দেখেছি, তোর বাড়ি থেকে যদি আমি চলে না যেতাম, তা হলে পুণাতে আমায় জেল খাটতেও হত না। নিয়তি!

দ্বারিক হেসে বলল, ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে শেষ পর্যন্ত তুই জেল খাটতে গেলি! তুই যে চুরি-ডাকাতি করিসনি, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

ভরত বলল, আমাকে এ শহরে কে চেনে? কেউ অবিশ্বাস করলেও আমার কিছু আসে-যায় না।

দ্বারিকা বলল, তুই কলকাতায় কোনও চাকরি জুটিয়েছিস?

ভরত বলল, নাঃ। এ শহরে থাকব কি না, এখনও ঠিক করিনি। কংগ্রেসের অধিবেশন দেখতে এসেছিলাম।

দ্বারিকা বলল, তুই ভবঘুরের মতন আর কতদিন ঘুরে বেড়াবি? ঘর-সংসার করতে হবে না? প্রথম থেকে চেষ্টা করলে তুই অনায়াসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি পেয়ে যেতিস। আমাদের সহপাঠী সারদা আর নীলমণি, দু'জনেই এখন ডেপুটি, ছাত্র হিসেবে আমাদের চেয়ে নিরেস ছিল, মনে আছে? যাদুগোপালের তো ব্যারিস্টার হিসেবে খুব রমরমা। শোন ভরত, তুই আর সরকারি চাকরি পাবি না, তোর জেল খাটার কথা জানাজানি হয়ে যাবেই। আমার জমিদারির জঙ্গিপুর কাছারিতে একজন ম্যানেজার দরকার। দায়িত্বশীল, বিশ্বাসী লোক তো পাওয়াই শক্ত। তুই যদি এই ভারটা নিস আমি বেঁচে যাই। ওখানে ভাল থাকার জায়গা আছে, টাকা-পয়সা নিয়ে তোর কিছু চিন্তা করতে হবে না।

এক মুহূর্তও না ভেবে ভরত বলল, ও কাজ আমি পারব না।

দ্বারিকা বলল, কিছুদিনের জন্য গিয়েই দ্যাখ না, ভাল লেগে যেতে পারে। ওখানে খাবার-দাবার বেশ সরেস, টাটকা মাছ, দুধ যেন ক্ষীর।

ভরত বলল, জমিদারির কাছারির নায়েবি বা ম্যানেজারি মানেই বিভিন্ন রকমের মানুষদের সামলে চলা। কারুকে চোখ রাঙানি, কারুর দিকে দেঁতো হাসি। আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি কোনওদিন মফস্বলেও থাকিনি।

দ্বারিকা বলল, মফস্বলে যেতে চাস না, তা হলে কলকাতায় আমার পত্রিকাটার ভার নে তুই। পত্রিকাটা চালাচ্ছি বটে, কিন্তু নিজে সময় দিতে পারি না, বন্ধ করে দিতেও ইচ্ছে করে না। তুই সম্পাদনার দিকটা দেখাশুনো কর।

ভরত এবারেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, পত্রিকা সম্পাদকের যোগ্যতা আমার নেই।

দ্বারিকা বলল, তুই কত পড়াশুনো করেছিস। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলতে পারতি... সেই যে একবার ... মনে নেই?

ভরত বলল, বই মুখস্থ করলেই কি লেখক হওয়া যায়? কোনওদিন কিছু লিখিনি আমি। অনেক বছর বাংলার বাইরে কাটিয়েছি বলে বাংলা বইয়ের সঙ্গেও সংস্রব নেই। এসব কাজ আমি পারব না দ্বারিকা।

দ্বারিকা কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, বুঝেছি! তুই আমার কাছ থেকে কোনও টাকা-পয়সা নিতে চাস না। বন্ধুর অধীনে চাকরি করতে তো মানে লাগবে। আমার বাড়িতে এতগুলি ঘর ফাঁকা পড়ে আছে, এখানে এসে থাকতে বললেও তুই থাকবি না, তোকে বউবাজারের ওই এঁদো হোটেলেই থাকতে হবে। তোকে নিয়ে আমি কী করি!

ভরত হেসে বলল, আমাকে নিয়ে এত চিন্তার কী আছে, আমি তো জলে পড়িনি! আমার ভালই দিন চলে যাচ্ছে।

দ্বারিকা ওষ্ঠ উল্টে বলল, একে ভাল চলা বলে? চাল নেই, চুলো নেই, নারীসঙ্গ বর্জিত জীবন। তুই কোনও কাজকর্ম না করে দিনের পর দিন হোটেলে কাটালে লোকে নির্ঘাত বলবে, তোর কাছে ডাকাতির টাকা জমা আছে।

ভরত কিছু বলার আগেই সে আবার বলল, হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। যাদুগোপাল একদিন

বলছিল, থিয়েটারের একজন অ্যাকট্রেস খুব নাম করেছে, নয়নমণি, সে নাকি তোদের বাড়ির সেই ভূমিসুতা নামে মেয়েটা ? অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ! সেই রোগা রোগা লাজুক মতন মেয়েটা স্টেজে ধেই ধেই করে নাচে ! আমি একদিন দেখেও চিনতে পারিনি। যাদুগোপাল বলল, ওদের বাড়িতে নাকি সে মেয়েটির যাতায়াত আছে। তুই নয়নমণির কথা জানিস ?

ভরত মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ শুনেছি।

দ্বারিকা বলল, ছিঃ ভরত ! তুই এত কাপুরুষ। ও মেয়ে তো ছাইগাদার মানিক। হাড়কাটা গলির নরক থেকে আমি বসন্তমঞ্জরীকে উদ্ধার করে এনেছি। সমাজের পরোয়া করিনি। আর তুই ওই ভূমিসূতাকে থিয়েটারে গিয়ে নষ্ট হতে দিলি ? ধরে রাখতে পারলি না ?

ভরত বলল, আমার সাধ্য ছিল না। তুই জমিদার, তোর পক্ষে যা সম্ভব, তা কি আমাদের মতন সাধারণ মানুষরা পারে ?

দ্বারিকা ধমক দিয়ে বলল, বাজে কথা বলিস না। সাধারণ মানুষের পুরুষকার থাকে না ? এখনও সময় আছে। ভ্যাগাবন্ডের মতন ঘুরে না বেরিয়ে তুই মঞ্চ থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আয়।

ভরত বলল, কী যে বলিস। সে হয়তো আমাকে এখন চিনতেই পারবে না।

দ্বারিকা বলল, তা বটে। খানিকটা নামডাক হলেই খুব হেক্কড় বেড়ে যায়। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তা ছাড়া এর মধ্যে সে আর কারুর সঙ্গে কণ্ঠিবদল করে বসে আছে কি না তাই বা কে জানে ! দাঁড়া—

গলা তুলে সে ডাকল, নকুল, নকুল, একতলা থেকে বরদাকান্তকে ডেকে আন তো শিগগির। হাতে যাই কাজ থাক, চলে আসতে বলবি।

ভরতের দিকে ফিরে বলল, বরদা আমার পত্রিকার নাট্য সমালোচক। সব অ্যাকটর-অ্যাকট্রেসদের হাঁড়ির খবর নাট্য সমালোচকদের নখদর্পণে থাকে। কারুর নামে দু'লাইন প্রশংসা ছাপিয়ে দেবার জন্য অনেক নাট্য সমালোচক টাকা খায়, কিন্তু বরদা সে পদের নয়। খুব অনেস্ট। ভাষা যেন চাবুক। সুরেশ সমাজপতি মশাই ওকে ভাঙিয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছেন।

এই বাড়িরই সামনের দিকে দ্বারিকার পত্রিকার কার্যালয়। সেখান থেকে ওপরে উঠে এল বরদাকান্ত মজুমদার। ধুতির ওপর ঝ্যালঝেলে সিল্কের পিরান। গলায় মুগার চাদর, বেঁটেখাটো মানুষটির মাথা জোড়া টাক, এত বেশি নস্যি নেয় যে নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে তার জামায় ও চাদরে।

দ্বারিকা একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, বসো বরদা, তোমার কাছ থেকে একজন অভিনেত্রীর কিছু খবরাখবর জানতে চাই। তুমি নয়নমণিকে ব্যক্তিগতভাবে চেনো ?

বরদাকান্ত পর্যায়ক্রমে ভরত ও দ্বারিকার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, নয়নমণিকে রাঁড় রাখছেন ? সে গুড়ে বালি। অন্য কোনও মেয়ের কথা ভাবুন।

দ্বারিকা চমকে বলে উঠল, রাম কহো। রাম কহো। বরদা তুমি এতদিনে আমাকে এই চিনলে ? কোনওদিন আমার এই দোষ দেখেছ ?

বরদাকান্ত বলল, পুরুষ মানুষের মন বদলাতে কতক্ষণ লাগে ? আপনার পুত্রসন্তান জন্মে গেছে তো ! এই সময়েই বড় মানুষেরা বউকে ছেড়ে রাঁড়ের বাড়ি যাতায়াত করে। তবে কি আপনার এই বন্ধুটি ?

দ্বারিকা উগ্র মেজাজে বলল, তেমন চরিত্রের লোকেরা আমার বন্ধুও হয় না। ওসব কিছু না, আমরা মেয়েটি সম্পর্কে জানতে চাই।

বরদাকান্ত এক টিপ নস্যি নাকে ঠেসে মুখস্থ বলার ভঙ্গিতে গড় গড় করে বলতে লাগল, নয়নমণি ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করে অর্ধেন্দুশেখরের দলে। কিছুদিন ছেলে ছোকরার ভূমিকায় করেছে। তারপর তালিম পেয়েছে গিরিশবাবুর কাছে। নাচ জানে, গান জানে। গানের গলাটি অতি সরেস। বাঁ গালে তিল আছে। আজ অবধি কখনও পার্টে মুখস্থ ভুল বলেনি। সবচেয়ে বেশি ক্ল্যাপ পেয়েছে

'বিল্বমঙ্গল' নাটকে। বাজারদর খুব ভাল।

দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, ও মেয়েটির কি বিয়ে হয়েছে ?

বরদাকান্ত বললেন, হাসালেন স্যার। এরা হচ্ছে গোবর গাদায় পদ্মফুল। এদের কেউ বিয়ে করে না। সবাই গন্ধ শুঁকে চলে যায়। থিয়েটারে যোগ দেবার আগে ওর বিয়ে হয়েছিল কি না তা জানা যায় না, নয়নমণি ওর আগের জীবনের কথা কখনও বলে না, ওর বাপ-মায়েরও হদিশ নেই।

দ্বারিকা আবার জিজ্ঞেস করল, ওদের তো একজন করে বাঁধা বাবু থাকে। এর বাবুটি কে ?

বরদাকান্ত বলল, এখন ক্লাসিকে আছে। সবাই জানে, অমর দত্ত কাঁচাখেগো দেবতা। সব অ্যাকট্রেসকেই একবার দু'বার খায়, কারুকেই বেশিদিন ধরে রাখে না। নয়নমণির সঙ্গে এদানি অমর দত্তর সম্পর্ক ভাল নয়, ক্লাসিক ছাড়বে ছাড়বে করছে। মিনার্ভা বোর্ডে যেতে পারে শোনা যাচ্ছে, এখনও ঠিক নেই, ঠিক হলে আমি খবর পেয়ে যাব। বাঁধা বাবু নেই কেউ। এ মেয়ের নজর খুব উঁচু। যাদুগোপাল রায় নামে এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে আশনাই আছে।

দ্বারিকা বাধা দিয়ে বলল, ধ্যাৎ, বাজে কথা। যাদুগোপালের বউ ওর সঙ্গে সখী পাতিয়েছে আমি জানি।

বরদাকান্ত একটুও দমে না গিয়ে বলল, জানকী ঘোষালের মেয়ে সরলা দেবীর কাছে প্রায়ই যায়। ঠাকুরবাড়ির দুটি ছোড়া ওই নয়নমণিকে কব্জায় আনার জন্য খুব কোস্তাকুস্তি করছে। ও মেয়ে দু'জনকেই খেলাচ্ছে। মশাই, থিয়েটারের জগতে অনবরত এই সব খেলা চলে। মঞ্চে যে নাটক দেখা যায়, তার আড়ালের নাটকই বেশি জমজমাট। সে সব শুধু আমরা জানি।

দ্বারিকা বলল, বরদা, তুমি একটা সরল প্রশ্নের সাফসুফ জবাব দাও তো। মেয়েটা কেমন ?

বরদাকান্ত আবার নস্যি নিয়ে একটুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, সরল না, এটা অতি কঠিন প্রশ্ন। অ্যাকট্রেস কেমন, তা জিজ্ঞেস করলে অনায়াসে উত্তর দেওয়া যেত। মেয়েটা কেমন ? মরালিস্টিক বিচার আর আর্টিস্টিক বিচার, দুটো দু'রকম। আমাদের মধ্যবিত্ত মরালিটি দিয়ে থিয়েটারের মানুষদের বিচার করা ঠিক নয়। ট্যালেন্ট আছে কি না সেটাই প্রধান বিচার্য। তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেন আমরা মাথা ঘামাতে যাব ! নয়নমণি কারুর সঙ্গেই বেশি কথা বলে না। আমাকেও পাত্তা দেয় না। কোনও দিন ওর নামে প্রশংসাবাক্য লিখতে আমাকে অনুরোধ করেনি। আমি নিজে থেকে লিখলেও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে যায়নি। তা হলেই বুঝে দেখুন, দেমাকিও বলতে পারেন, নির্লোভও বলতে পারেন।

দ্বারিকা বলল, ঠিক আছে, তুমি যাও। শোন ভরত, যাদুগোপালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই ঠিক হবে। যাদুগোপাল অনুরোধ করলে, সে নিশ্চয়ই ও বাড়িতে এসে দেখা করবে।

ভরত বলল, তার দরকার নেই।

দ্বারিকা বলল, দরকার নেই মানে ? তুই সব ব্যাপারেই না না বলবি ! এবার তোকে ছাড়ছি না। যাদুগোপাল একটা মামলার কাজে ঢাকায় গেছে, দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরবে। আমি তোকে নিয়ে যাব ওর বাড়িতে।

হোটেলে ফিরে ভরত বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে লাগল। দ্বারিকা আজ তাকে বেশ বড় একটা আঘাত দিয়েছে। ছাত্র বয়েসে দ্বারিকাকে লঘু চরিত্র, উন্মার্গগামী মনে হত। তার সান্নিধ্য খুব একটা কাম্য ছিল না। কিন্তু সে তো অসাধারণ একটা কাণ্ড করে বসল শেষপর্যন্ত। পতিতাপল্লী থেকে সে উদ্ধার করে এনেছে বসন্তমঞ্জরীকে, তাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে, কী সুন্দর একটি পুত্রসন্তান পেয়েছে। দ্বারিকার মতন এমন সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে ক'জন মানুষ ! ভালবাসার জন্য সে আর কোনও কিছুরই পরোয়া করেনি। বসন্তমঞ্জরীর একেবারে নষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবার কথা ছিল, এখন সে জমিদারের ঘরনি।

দ্বারিকা তাকে বলেছে কাপুরুষ। সবাই তাই বলবে। ভূমিসূতাকে সে ভালবেসেছিল, সেই ভালবাসার কণামাত্র মর্যাদা পায়নি ভূমিসূতা।

এখন আর ভূমিসূতার সঙ্গে যোগাযোগ করা অর্থহীন। নিয়তির পাশাখেলায় ভূমিসূতাই এখন

অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। এখন সে অনায়াসে ভরতকে অপমান করতে পারে, সবচেয়ে বড় অপমান হবে, ভরতকে চিনতেই না পারা। ভরতের এই সঙ্গতিহীন ব্যর্থ জীবনকে ওরকম একজন খ্যাতিময়ী নটী কেন মূল্য দিতে যাবে?

দ্বারিকা ছাড়বে না, সে ঝুলোঝুলি করবে। যাদুগোপালের সাহায্য নিয়ে সে ভরতকে ভূমিসুতার সামনে একবার দাঁড় করাবেই। যেচে অবজ্ঞা অপমান সইতে যাবে কেন ভরত? দ্বারিকা কিংবা যাদুগোপাল বুঝবে না, ওরা দু'জনেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত, টাকা পয়সার অকুলান নেই। ধরা যাক, ভূমিসুতা তাকে চিনতে পারল, অপমান না করে কান্নাকাটি শুরু করল, তারপরেও ভরত তাকে কী বলবে? ভরতের কী বলার আছে? এখন ভালবাসার কথাও হাস্যকর শোনাবে।

নাঃ, কলকাতা শহরে তার স্থান নেই। দ্বারিকার হাত ছাড়িয়ে তাকে পালাতে হবে আবার।

অসহ্য যন্ত্রণায় ভরতের সারা রাত ঘুম এল না। চোখের জলে ভিজে গেল বালিশ। বরদাকান্তর কথাবার্তা শুনে ভূমিসুতার যে প্রতিচ্ছবি গড়ে উঠেছিল, সেই ভূমিসুতা এখন অনেক দূরের মানুষ। তবু তার কথা শোনার পর বুকের মধ্যে যেন অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

পরদিন সকালে জানবাজারে তার সাক্ষাত হয়ে গেল বারীন্দ্রের সঙ্গে। আনন্দে বিস্ময়ে সে ভরতের হাত চেপে ধরে বলল, ভরতদাদা, কী সৌভাগ্য আমার! ক'দিন ধরে আপনার কথাই ভাবছি!

বারীন্দ্র কি এখনও ভরতকে তার ব্যবসার অংশীদার করার আশা পুষে রেখেছে? ভরতের সঞ্চিত টাকাকড়ি যে প্রায় শেষ। সে বলল, কী ব্যাপার, তুমি কি কলকাতা শহরে চায়ের দোকান খুলতে চাও নাকি?

বারীন্দ্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে বলল, না, না। চায়ের দোকানফোকান না। অনেক বড় কাজে হাত দিয়েছি। দেশের কাজ। সারা দেশের কাজ।

তারপর ভরতের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা যাবে না। আমরা একটা গুপ্ত সমিতি গড়েছি। তাতে আপনার সাহায্যের বিশেষ দরকার।

৫৮

যে কোনও প্রাণীই কাজ করতে করতে, অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আবার কাজের স্ফূর্তি দেখা যায়। জড় পদার্থেরও কি এরকম হতে পারে? যদি হয়, তা হলে প্রাণ ও জড় পদার্থের সীমারেখা কোথায়?

জগদীশচন্দ্র এই অত্যাশ্চর্য, অবিশ্বাস্য পরীক্ষাতেই এখন মেতে আছেন।

ইতালির বৈজ্ঞানিক গ্যালভানি দেখেছিলেন, একটা ঝোলানো ব্যাঙের শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে তার পায়ের মাংসপেশি কেঁপে কেঁপে ওঠে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তির প্রবাহে প্রাণিদেহকলা উত্তেজিত হয়। জগদীশচন্দ্র একটা যন্ত্র বানিয়েছিলেন। একটা ধাতুর পালিশ করা পাতের ওপর সূক্ষ্ম সূচের মুখ স্পর্শ করে আছে এক গ্রাহক যন্ত্র, বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালালে সেই যন্ত্রে সাড়া পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র লক্ষ করলেন, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতে করতে সেই গ্রাহক যন্ত্র আস্তে আস্তে কম সাড়া দিচ্ছে। যন্ত্রটা কিন্তু অকেজো হয়ে যাচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা কাজ থামিয়ে রাখলে আবার ঠিক প্রথমবারের মতন সাড়া দেয়। এটা কী ব্যাপার? ধাতুর যন্ত্রটা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে? কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে আবার কাজের ক্ষমতা ফিরে পায়?

পরীক্ষিত সত্য হলে বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। জগদীশচন্দ্র বারবার পরীক্ষা করে

একই ফল পেলেন, গ্রাফ আঁকলেন। প্রমাণিত হল যে, ঠিক যেমন প্রাণীর শরীরযন্ত্র কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তার কর্মশক্তি ফিরে পায়, তেমনি ধাতুর তৈরি গ্রাহক যন্ত্রও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কাজের শক্তি আবার ফিরে পায়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক প্রয়োগে এই আবিষ্কারের ফল সুদূরপ্রসারী।

প্যারিসে শতাব্দী পূর্তির আন্তর্জাতিক মেলার সঙ্গে একটি পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসেরও আয়োজন হয়েছিল, সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সামনে তিনি তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করলেন, নিজের তৈরি যন্ত্রে রেখাচিত্রগুলি দেখালেন। বিদ্বৎ সমাজে এই প্রতিক্রিয়া হল অত্যন্ত মিশ্র ধরনের। কেউ কেউ মুগ্ধ, অভিভূত। অনেকে বললেন, বুজরুকি, হতেই পারে না। কেউ বলল, মৌলিকতার দিক থেকে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-প্রবন্ধটিই সর্বশ্রেষ্ঠ, কেউ বলল, এটা বিজ্ঞানের এলাকাতেই পড়ে না।

বিজ্ঞানীর চেয়েও যেন কিছুটা উঁচুতে উঠে গিয়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতন জগদীশচন্দ্র বললেন, এখন কোথায় সীমারেখা টেনে বলব যে পদার্থবিদ্যার নিয়ম এখানে শেষ হল, আর এইখান থেকে শারীরবৃত্তের নিয়মের শুরু? এ রকম ভেদরেখা নেই।

পরাধীন দেশের একজন মানুষ এরকম চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেখাবে, এটাই অনেকে মানতে পারে না। বহু শতাব্দী ধরে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফিজিকস বা পদার্থবিদ্যা ভারতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। সেখান থেকে একজন ভুঁইফোড় বৈজ্ঞানিক উঠে আসবে কী করে? সমকক্ষ বৈজ্ঞানিকদের এরকম মনোভাব হলেও সাধারণ মানুষ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে কৌতূহল ও শ্রদ্ধা বোধ করে। জগদীশচন্দ্র ও অবলা যেখানেই যান অনেকে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে প্যারিস শহরে আইফেল টাওয়ার নামে এক বিশাল ধাতুর গম্বুজ তৈরি হয়েছে, তার ওপর উঠলে এই সুন্দরী নগরীটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র ও অবলা একদিন সেখানে ওঠার জন্য টিকিট কাটতে যাচ্ছেন, দ্বাররক্ষক সসম্মানে দ্বার খুলে দিয়ে বলল, আপনাদের টিকিট কাটতে হবে না, আপনারা ফ্রান্সের সম্মানিত অতিথি।

প্যারিসের পর লন্ডন। সেখানে ওই একই বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে বক্তৃতা দিলেন। 'দা ইলেকট্রিসিয়ান' নামে নামজাদা পত্রিকায় ছাপা হল সেই প্রবন্ধ। এখানেও প্রতিক্রিয়া একেবারে দু-রকম। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বন্ধু ব্যবস্থা করে দিলেন, রয়াল ইনস্টিটিউশানের সুবিখ্যাত ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবরেটরিতে তিন মাস গবেষণা করে তাঁর পরীক্ষাগুলি আরও সুদৃঢ় করবেন।

জগদীশচন্দ্র অতিকষ্টে ছুটি নিয়ে এসেছেন বাংলা শিক্ষা বিভাগ থেকে, কিন্তু বিদেশে থাকার খরচপত্র জোগাড় হবে কোথা থেকে। আসবার সময় জাহাজের টিকিট কাটার সময়ই টাকার টানাটানি হয়েছিল। এখন তাঁর কাজ নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে, এই সময় ইওরোপে বেশ কিছুদিন থেকে গেলে তিনি তাঁর গবেষণার অনেক উন্নতি করার সুযোগ নিতে পারেন, কিন্তু পরাধীন দেশের এই সন্তানকে নিরন্তর অর্থ সংগ্রহের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবে কে? তাঁর কৃতিত্বে দেশের অনেক মানুষই গৌরব বোধ করে, পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়, কিন্তু তাঁর অসুবিধেগুলি দূর করার চেষ্টা কেউ করে না। একবার প্রস্তাব উঠেছিল, ভারতীয়দের মধ্যেও তো ধনীর অভাব নেই, জগদীশচন্দ্রের জন্য চাঁদা তুলে দু'লক্ষ টাকার একটা তহবিল সংগ্রহ করা হোক। কিন্তু কেউ সে উদ্যোগ নেয় না। স্বামী বিবেকানন্দও প্যারিসে জগদীশচন্দ্রের গৌরব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, একজন বাঙালি যুবার এই কৃতিত্বে মাতৃভূমিকে ধন্য মনে করেছিলেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত সুবিধে-অসুবিধের কথা খেয়াল করেননি। অবশ্য তাঁর নিজেরও অন্য অনেক চিন্তা ছিল।

জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এক কবি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের নিয়মিত পত্রবিনিময় হয়। শুধু বন্ধু নন, দু'জনে দু'জনের সৃষ্টিকর্মেরও পরম ভক্ত। শুধু জগদীশচন্দ্রকে শোনাবার তাগিদেই এক সময় প্রতি সপ্তাহে একটি করে ছোটগল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, এ ছাড়া কত কবিতা, কত গান শুনিয়েছেন। আবার জগদীশচন্দ্রের গবেষণার প্রতিটি স্তর গভীর আগ্রহে শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ, তা

নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন। জগদীশচন্দ্র চান রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে লন্ডনে ছাপা হোক, সারা বিশ্বের মানুষ বাংলার এই কবিকে জানুক।

এবারে ইওরোপে জগদীশচন্দ্রের সাফল্যের সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু আবেগ ভরে কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি, স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করেছেন, কীভাবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সুবিধের জন্য তাঁকে আরও বেশি দিন ইওরোপে রাখা যায়। জগদীশচন্দ্রের কাছে নানা রকম লোভনীয় চাকুরির প্রস্তাব এসেছে ওদেশে, হয়তো এক সময় বাধ্য হয়ে সে রকম কোনও চাকরি নিতেই হবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে কিছুতেই রাজি নন। ওদেশে চাকরি নিলে জগদীশচন্দ্র আর স্বাধীন বৈজ্ঞানিক থাকবেন না, ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবেন না। রবীন্দ্রনাথ বারবার লিখে জানান, তুমি চাকরি নিয়ো না, আমি তোমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করব।

অর্থের জন্য রবীন্দ্রনাথকে আর এক বন্ধুর দ্বারস্থ হতে হয়। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাধাকিশোরের অগাধ বিশ্বাস। ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদের শেষ নেই, এখনও মামলা-মোকদ্দমা চলছে, কলকাতার কোনও কোনও পত্রিকায় রাধাকিশোরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ সব সময় রাধাকিশোরের পক্ষ সমর্থন করেছেন, কলকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাধাকিশোরের পক্ষে আনবার চেষ্টা করেছেন। অনেক রাজকার্যে এবং যুবরাজদের শিক্ষার ব্যাপারেও মহারাজকে পরামর্শ দেন রবীন্দ্রনাথ।

বিদেশ যাবার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র যখন অনেকের সমক্ষে 'জড়ের অনুভবশক্তি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন ও পরীক্ষাগুলি দেখান, সেই সভায় বিনা আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে অবাক হয়ে যান এবং রাধাকিশোরের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন।

জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন ইংরেজিতে। রাধাকিশোরের ইংরেজি জ্ঞান যৎসামান্য, বাংলা সাহিত্য ছাড়া আর কিছু পড়েননি। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কেও কোনও ধারণা ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মূল ব্যাপারটি তিনি বুঝে ফেললেন এবং সেদিন থেকেই বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হলেন।

তারপর থেকে জগদীশচন্দ্রের অর্থাভাবের কথা রবীন্দ্রনাথের মারফত জানতে পারলে রাধাকিশোর বিনা দ্বিধায় পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথকে এরকম বহুবারই ছুটে যেতে হয়।

ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবার পর নতুন করে আগরতলার নয়া হাভেলিতে গড়ে উঠছে রাজধানী। রাজ কোষাগার প্রায় শূন্য, এর মধ্যে আবার যুবরাজের বিবাহের উদ্যোগ চলছে, তাতেও অনেক খরচপত্র আছে। রবীন্দ্রনাথকে বারবার টাকা দেওয়াটা রাজকর্মচারীদের পছন্দ হয় না। একবার রবীন্দ্রনাথের সে রকম চিঠি আসার পর মহিম ঠাকুর বলল, আপনি তো অনেক দিয়েছেন, এখন তো আর দেওয়া যাবে না। এবারে বরং কবিকে বলুন, অন্য কোথাও থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিন। রাধাকিশোর মহিমের মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, আমার ভাবী বধূমাতার জন্য দু'এক পদ অলঙ্কার না হয় না-ই হবে। তার বদলে, জগদীশবাবু সাগরপার থেকে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করবেন, তার তুলনা কোথায়!

অনেক সময় চিঠির বদলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাধাকিশোরের সঙ্গে দেখা করে টাকা চেয়ে আনেন। এজন্য একবার তিনি আগরতলাতেও ছুটেছিলেন। জগদীশচন্দ্র কাজ অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরতে বাধ্য হবেন, তা কখনও মেনে নেওয়া যায়! বন্ধুর জন্য রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষুকের মতন প্রার্থী হতেও রাজি।

রাজকর্মচারীরা যে আড়ালে রবীন্দ্রনাথের নামে কটুকাটব্য করে, তিনি তা জানেন। কিছু কিছু মন্তব্য তাঁর কানেও এসেছে। তাদের ধারণা, উদার, সরলপ্রাণ এই মহারাজটিকে কথার মোহে ভুলিয়ে ওই কবি বারবার টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিপুরার টাকা চলে যাচ্ছে কলকাতায়। বাংলার কোন লেখক অসুস্থ, কোন পত্রিকা চলছে না, কোন লেখক বই ছাপাতে পারছেন না, সে জন্য ত্রিপুরার রাজা

অর্থসাহায্য করতে যাবেন কেন? জগদীশবাবুর জন্য যে কত টাকা চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। রবিবাবু নিজেও তো খুব ধনীর সন্তান, ওঁদের কতবড় জমিদারি, ওঁর বন্ধুর জন্য উনি নিজে পাঁচ-দশ হাজার টাকাও দিতে পারেন না! মহারাজকে দোহন করার কি শেষ নেই?

এ সব মন্তব্য কানে এলে রবীন্দ্রনাথ আঘাত পান বটেই, কোনও উত্তর দেন না। তিনি ধনীর সন্তান ঠিকই, কিন্তু নিজে ধনী নন। এখন তিনি প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় পৌঁছেছেন। জমিদারি তদারকির জন্য তিনি মাসোহারা পান তিনশো টাকা। তাতে তাঁর সংসার চলে। পৃথক ব্যবসা করতে গিয়ে এক মারোয়াড়ির কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন, সে ব্যবসা ফেল পড়েছে। মহাজনকে বার্ষিক শতকরা সাত টাকা সুদ দেওয়া চলছিল, সম্প্রতি সে মারোয়াড়ি এক সঙ্গে পুরো টাকা শোধ করতে বলায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কোথায় পাওয়া যাবে অতগুলি টাকা! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মহারাজ রাধাকিশোরের কাছে কখনও ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেননি তাঁর এই ব্যক্তিগত ঋণের কথা। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি কখনও মহারাজের কাছ থেকে একটি পয়সাও নেননি, এইখানেই তাঁর জোর।

এর ওপর তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য স্কুল চালাবার দায়িত্ব। তার খরচ চালাতেও দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এক এক সময় তাঁর মনের মধ্যে কেউ যেন প্রশ্ন করে, তুমি তো কবি, শিলাইদহে নির্জন নদীর বুকে বজরায় গভীর নিশীথে মোমবাতি জ্বালিয়ে কবিতা কিংবা গান রচনা করতেই তুমি সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পাও। স্কুল স্থাপনের মতন গুরুতর কাজের দায়িত্ব নিতে গেলে কেন তুমি?

কবি নিজেই উত্তর দেন, বিদেশি শাসকরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাচ্ছে, তা কী করে মেনে নেব? এ তো দাস-তৈরির শিক্ষা। আমাদের দেশের বর্তমানের শিক্ষিত সমাজ শাসককুলের কৃপাপ্রার্থী, সামান্য একটু অনুগ্রহ পেলেই ধন্য হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতের আদর্শে শিক্ষা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা, সবই কি শেষ হয়ে যাবে! বিদেশি শাসকদের সঙ্গে বাহুবল কিংবা অস্ত্রবলে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারব না। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মই আমাদের আত্মশক্তি। সেই আদর্শেই আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছি।

মন থেকে আবার প্রশ্ন ওঠে, এ দায়িত্ব অন্য কেউ নিতে পারত না? দেশে আরও তো কত বড় মানুষ রয়েছেন। এটা কি কবির কাজ!

কবি উত্তর দেন, অন্য কেউ নিলে তো ভালই হত। সে রকম কোনও উদ্যোগ দেখছি না, সবাই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, সরকারি স্কুলগুলি থেকে শিক্ষিত বেকারের উৎপাদন হচ্ছে। তাই আমি এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম চালাতে বদ্ধমূল হয়েছি। কবি কি শুধু গগনবিহারী হবে? যত বাধাই আসুক, দায়িত্ব গ্রহণে আমি কখনও পরাঙ্মুখ নই।

সেই অদৃশ্য প্রশ্নকারী বলে, ওহে কবি, এত বড় দেশ, কোটি কোটি মানুষ, অশিক্ষার অন্ধকারে প্রায় গোটা দেশ ছেয়ে আছে, তুমি প্রাচীন আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন করে কতজনকে শিক্ষা দিতে পার?

কবি জেদের সঙ্গে বলে ওঠেন, আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকুই আমি করে যেতে চাই। আমার এই বিদ্যালয় নিয়ে আমি অধিক গোল করতে চাই না। এখানে অল্প ছাত্রই পড়বে। এখন আছে বারোজন, বড় জোর কুড়ি জনের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। শহরের বিষদৃষ্টি থেকে অনেক দূরে, শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় এরা যদি মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তাই বা কম কীসে!

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন অনেকটা জেদেরই বশে।

এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল বলেন্দ্রনাথের। কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনে এই উদ্দেশ্যে একটি বাড়িও তৈরি হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে সব কিছু থেমে যায়।

নিজের ছেলে রথীকে রবীন্দ্রনাথ কোনও স্কুলে পাঠাননি, তাকে নিজে পড়িয়েছেন, তার জন্য একাধিক গৃহশিক্ষকও রাখা হয়েছে। শিলাইদহের নিরিবিলি পরিবেশে রথীর পুথিগত বিদ্যা ও

প্রকৃতিপাঠ দুটোই বেশ ভালভাবে চলছিল, কিন্তু রথীর মা বেশিদিন শিলাইদহে থাকলে হাঁপিয়ে ওঠেন। কবিকেও নানান জায়গায় ঘোরাফেরা করতে হয়। রথীর এখন চোদ্দো বছর বয়েস, এই সময়ে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে তার পড়াশুনোর বন্দোবস্ত না করতে পারলে সে এন্ট্রান্স পাস করবে কী করে? শমীকেও ভালভাবে পড়াতে হবে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এখন দুই ছেলের উপযুক্ত শিক্ষা সম্পর্কে পিতাকে চিন্তা করতেই হয়।

শুধু নিজের ছেলে দুটিই নয়, আরও কিছু ছাত্রকে নিয়ে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা আস্তে আস্তে রবীন্দ্রনাথের মনে দানা বাঁধে। মাধুরীলতাকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে শান্তিনিকেতনে নেমে দু'একদিন থাকতে থাকতে তাঁর মনে হয়, এই শান্তিনিকেতনেই তো প্রাচীন ভারতের তপোবন হতে পারে। যদিও শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি বেশ রুক্ষ, চতুর্দিকে যত দূরে তাকানো যায় শুধু ঊষর প্রান্তর, মাঝে মাঝে এক পায়ে খাড়া দৈত্যের মতন কিছু কিছু তালগাছ, আর বিশেষ গাছপালা নেই। কিন্তু যখন আকাশ ছেয়ে ধেয়ে আসে ঝড়, যখন উঁচু-নিচু কংকরময় ভূমির ফাঁকে ফাঁকে কলকল করে ছুটে যায় বৃষ্টি ধারা, রাত্রির আকাশ সহস্রদল পুষ্পের মতন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, সেই সব দৃশ্য-সৌন্দর্যের মধ্যে যেন পবিত্রতার সৌরভ আছে। এখানে আগেই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বৎসর উৎসব হয়, একটা বাড়িও খালি পড়ে আছে, এখানে তো একটা স্কুল শুরু করে দেওয়া যেতেই পারে।

কিন্তু ছাত্র জোটানোও সহজ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন আর উন্নত ধরনের মানুষ হওয়া নয়, কোনও রকমে ডিগ্রি সংগ্রহ করে জীবিকার সুযোগ পাওয়া। পরীক্ষায় পাশ করাটাই প্রধান কথা। কোন অভিভাবক তার সন্তানকে এরকম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে চাইবে! নিজের বাড়ি ছেড়ে কেউ সন্তানকে দূরে পাঠাতেও চায় না। উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করাও সহজ নয়। নিছক একটা স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নয়, যারা সনাতন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে, ব্যক্তিগত জীবনেও যারা সব রকম আড়ম্বর বর্জন করতে সক্ষম হবে, সে রকম শিক্ষক চাই।

সোফিয়া নামে একটি পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের খুব প্রশস্তি করেছিলেন। তারপর টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি পত্রিকাতেও তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" গ্রন্থখানি তাঁর খুব প্রিয়। প্রথমে চিঠিপত্র বিনিময়ের পর এই ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় হল, কবি এঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মানুষটি বিচিত্র। আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সময় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখন রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান হয়েছেন। খ্রিস্টান হয়েও নাম নিয়েছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী। ব্রহ্মবান্ধব কিছুদিন সুদূর সিন্ধু প্রদেশে গিয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এখন কলকাতার সিমলা অঞ্চলে প্রাচীন আদর্শে একটি বিদ্যালয় চালাচ্ছেন, তাঁর বিশেষ অনুগত এক ধনী ব্যবসায়ী কার্তিকচন্দ্র নানের পরিবারের ছেলেরাই প্রধানত সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র। রেবাচাঁদ নামে তাঁর এক শিষ্য ওই বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক।

ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর রবীন্দ্রনাথ দু'একদিন ব্রহ্মবান্ধবের এই বিদ্যালয় দেখতে গেলেন। দু'জনের উদ্দেশ্য একই। ব্রহ্মবান্ধব একদিন বললেন, আপনি বোলপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করলে আমার এ স্কুল তুলে দিতে পারি। আমার ছাত্রদের আপনার বিদ্যালয়ে পাঠাব।

দেবেন্দ্রনাথের এখন পঁচাশি বছর বয়েস, তবু সব ইন্দ্রিয় সজাগ। কনিষ্ঠ পুত্রের প্রস্তাব শুনে তিনি শুধু সম্মতিই জানালেন না, মাসিক দুশো টাকার অনুদানের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই অনুযায়ী ট্রাস্ট ডিড হল।

উদ্বোধনের দিন ছাত্র সংখ্যা মাত্র পাঁচজন, ক্রমে বেড়ে বেড়ে এখন বারোজন। এদের জন্য পাঁচজন শিক্ষক। এ বিদ্যালয় সম্পূর্ণ অবৈতনিক তো বটেই, ছাত্রদের খাওয়া থাকার ভারও নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রহ্মবান্ধব বেশ কয়েকজন ছাত্র এনেছেন, তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ এখানে ইংরেজি পড়াবেন। ব্রহ্মবান্ধব নিজে এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবেন না। যখনই আসেন কয়েকটা ক্লাসে

পড়িয়ে যান, যেমন রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এসে যে-কোনও ক্লাসে ঢুকে পড়ান, সন্ধেবেলায় সবাইকে নিয়ে গল্পের আসর বসান।

ব্রহ্মবান্ধব সকলের সামনে একদিন রবীন্দ্রনাথকে বললেন, আপনি এই আশ্রমের গুরুদেব। এখন থেকে সবাই আপনাকে গুরুদেব বলে ডাকবে।

কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হয় ছাত্রদের। প্রতিদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় ভোর সওয়া পাঁচটায়। তাদের প্রথম কাজ ঘর ঝাঁট দিয়ে নিজেদের জিনিসপত্র ও শয্যা গুছিয়ে রাখা। তারপর প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য মাঠে যাওয়া। ছাত্ররা তার নাম দিয়েছে 'মাঠ করা'। শৌচাগার তো নেই-ই। স্নানাগারও নেই, স্নান করতে যেতে হয় ভুবনডাঙার বাঁধে। বর্ণাশ্রমকে বর্ণে বর্ণে পালন করার জন্য ছাত্রদের পোশাকও বিভিন্ন। ব্রাহ্মণদের সাদা, বৈদ্য ও কায়স্থদের জন্য লাল এবং বৈশ্যদের জন্য হলুদ আলখাল্লা। শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাত্ররা কায়স্থ শিক্ষকদের পায়ে হাত দেবে না, শুধু নমস্কার জানাবে। ব্রহ্মবান্ধবেরও এই ব্যবস্থা খুব পছন্দ।

স্নানের পর গাছতলায় এসে সংস্কৃত মন্ত্র সহযোগে উপাসনা। ব্রহ্মবান্ধব এক একদিন পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন, ছাত্রদের উচ্চারণ ভুল হচ্ছে কি না। উপাসনার পর হালুয়া ভক্ষণ। তারপর আধ ঘণ্টা মাটি কোপানো। এরপর পড়াশুনো শুরু। তাও আগে ছাত্র ও শিক্ষকরা সমবেতভাবে একবার উপাসনা সেরে নেবেন। দশটায় ক্লাস শেষ, এখন কিছুক্ষণ কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখবে, কেউ গল্পের বই পড়বে। সাড়ে এগারোটায় মধ্যাহ্নভোজন, ডাল-ভাত ও একটা কিছু সবজির ঘ্যাঁট, বিশুদ্ধ নিরামিষ। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা এক পঙ্ক্তিতে না বসে বসবে খানিকটা দূরে, ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে। প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব থালা-বাটি, খাওয়ার পর নিজেদেরই মেজে-ধুয়ে রাখতে হয়। সাড়ে বারোটায় আবার ক্লাস শুরু, তিনটের সময় মাত্র পনেরো মিনিটের বিশ্রাম, আবার সাড়ে চারটে পর্যন্ত। এরপর খেলাধুলোর ছুটি। ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে কিছুক্ষণ ফুটবল পেটাপিটি করে। প্রাচীন ভারতের আশ্রম-বিদ্যালয়ে ফুটবলের তুল্য কোনও ক্রীড়াবস্তু হয়তো ছিল না, এখানে এটুকু ব্যতিক্রম করতে হয়েছে। সন্ধে হতে না হতেই হাত পা ধুয়ে এসে আবার উপাসনা। এরপর, যে-সময় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকেন তখন তিনি সবাইকে নিয়ে বসেন। গল্প-কবিতা-গান শোনান, নানা রকম মজার মজার খেলাও উদ্ভাবন করেন। তিনি যখন থাকেন না, তখন আর বিশেষ কিছু করার থাকে না, আবার নিরামিষ আহার শেষ করে রাত্রি নটার মধ্যে শয্যাগ্রহণ।

স্কুলটি শুরু হল তো বেশ ভালভাবেই, কিন্তু এর মধ্যে একটা মজার বৈপরীত্য আছে। 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি রচনার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের নেশায় মেতে আছেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থের ভেদাভেদের মতন একটা কুপ্রথাকেও মেনে নিয়েছেন। এবং তাঁর প্রধান সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব একজন কট্টর খ্রিস্টান! শিক্ষক রেবাচাঁদও খ্রিস্টান, তিনি নাকি ছেলেদের বাইবেলের গল্পও শোনান। ক্রমে এই নিয়ে ফিসফাস শুরু হল, ব্রহ্মচর্যাশ্রম কি শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের আখড়ায় পরিণত হবে? রবীন্দ্রনাথের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ খ্রিস্টধর্মের ঘোর বিরোধী। ইংরেজ সরকার সারা ভারতে রবিবার ছুটির দিন হিসেবে চালিয়েছেন, কিন্তু রবিবার তো খ্রিস্টানদের স্যাবাথ ডে, অন্যরা তা মানতে বাধ্য হবে কেন? সেই জন্যই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে ছুটির দিন হবে ব্রাহ্মদের পুণ্য দিন, বুধবার। সেই তিনি শান্তিনিকেতনে খ্রিস্টানদের কর্তৃত্বের কথা শুনলে তো বিরক্ত হবেনই।

রবীন্দ্রনাথ দো-টানায় পড়লেন। পিতার মতামত তাঁকে মানতেই হবে, আবার ব্রহ্মবান্ধবকেও তিনি চলে যেতে বলতে পারেন না। ব্রহ্মবান্ধব চলে গেলে তাঁর অনুগত ছাত্রদেরও নিয়ে যাবেন। আবার খ্রিস্টানদের আধিপত্যের কথা যদি কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা হলে হিন্দু পরিবার থেকে নতুন ছাত্র জোটানো শক্ত হবে। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে কিছু বলতে হল না, রেবাচাঁদ টের পেয়ে গেলেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে একটা ঘোঁট পাকানো চলছে। তিনি ব্রহ্মবান্ধবকে সে কথা জানাতেই ব্রহ্মবান্ধব জ্বলে উঠলেন। ব্রহ্মবান্ধব আবেগ-তাড়িত মানুষ, উত্তেজিতভাবে তর্ক বিতর্ক করলেন

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, সে তর্কের কোনও মীমাংসা হবার আগেই রেবাঁচাদকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন চিরতরে।

এই ধাক্কা সামলাবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হল। এবার অচিরেই তিনি টের পেলেন, তিনি তাঁর সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। যখন তখন খরচের ধাক্কা। দেবেন্দ্রনাথ মাসিক দুশো টাকা বরাদ্দ করেছেন, তাতে কী করে কুলোবে! শিক্ষকদের বেতন আছে, ছাত্রদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থার ত্রুটি থাকলে চলে না। ছোট্ট একটি বাড়িতে সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না, আরও বাড়ি বানাতে হচ্ছে। শিক্ষকরা অল্প বেতনে পড়াতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মাথার ওপর আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে তো! এদিকে রবীন্দ্রনাথের হাত একেবারে খালি। এমনই অবস্থা যে স্ত্রীর কয়েকটি গয়নাও বন্ধক দিতে হয়েছে। মৃণালিনীর কাছ থেকে বারবার চাইতেও লজ্জা হয়।

একটা নতুন স্কুল বাড়ির গাঁথনি হয়ে গেছে, ওপরে কাঠের ফ্রেম করে টালি বসানো দরকার। সে খরচ কে দেবে? যে-কোনও দিন বর্ষা এসে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। সর্বক্ষণ অর্থচিন্তা!

মৃণালিনী স্বামীর মুখ দেখেই বুঝতে পারেন, কোনও একটা সমস্যায় তিনি পীড়িত। বারবার কারণ জিজ্ঞেস করেন, রবীন্দ্রনাথ বলতেই চান না। শেষ পর্যন্ত বলেই বসলেন, নতুন বাড়ির জন্য কাঠের ফ্রেম ও টালির অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। টাকা না পাঠালে ওরা সেগুলি ডেলিভারি দেবে না। এতগুলি টাকা আমি এখন কোথায় পাব!

মৃণালিনী নিজের হাত থেকে এক জোড়া মকরমুখো বালা খুলে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে বললেন, না, না, ওগুলো দিয়ো না। ও আমার মায়ের গহনা। পারিবারিক জিনিস, ও দুটো তোমার প্রথম পুত্রবধূকে দিয়ো।

মৃণালিনী বললেন, ভাগ্যে থাকলে রথীর বউয়ের জন্য আবার গহনা হবে। এখন এই দিয়ে কাজ চালাও।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, তোমার হাত খালি করে দেবে? ও আমি নিই কী করে!

মৃণালিনী বললেন, মেলার সময় অনেক সুন্দর সুন্দর বেলোয়ারি চুরি পাওয়া যায়, তাতেই আমার হাত ভরে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, অনেকে বলে, এই ইস্কুলটা চালানো আমার একটা উৎকট শখ। তুমি যে আমার এই শখের বিরূপতা করোনি, আমার তালে তাল মিলিয়েছ, এ জন্য আমি যে কতখানি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এই শেষ, তোমার কাছ থেকে আর চাইতে হবে না।

মৃণালিনী মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। স্বামীকে না জানিয়েও তাঁকে কিছু কিছু গয়না বিক্রি করতে হয়েছে। ইস্কুল নিয়ে স্বামী এমনই ব্যস্ত যে সংসার কী করে চলছে, সেদিকেও খেয়াল রাখেন না।

রথী স্কুলে অন্য ছেলেদের সঙ্গেই খাবার খায়। প্রতিদিন এক ঘেয়ে নিরামিষ খাদ্য, পরিমাণও যথেষ্ট নয়। উঠতি বয়েসের ছেলে, এখন পেট ভরে ভাল করে না খেলে কি স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে? এই কথা ভাবলেই মায়ের বুক ফেটে যায়। চুপি চুপি নিজের ছেলেকে বাড়িতে ডেকে এনে সুখাদ্য খাওয়ানোটাও অতি বিসদৃশ ব্যাপার। মৃণালিনী তাই প্রায়ই স্কুলের সব কটি ছেলেকেই নিমন্ত্রণ করে পঞ্চ ব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়ান। মায়ের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে রথীও যখন তখন সহপাঠীদের বাড়িতে এনে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘরের সব কিছু সাফ করে দেয়। এতগুলি ছেলের খাদ্য জোগানোর খরচ কি কম।

একটা সমস্যা মিটলেই আবার একটা অন্য সমস্যা দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথ কখনও সখনও কিছু অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেন বটে, কিন্তু বারবার তাঁর কাছ থেকে অর্থ আদায় করার বিপদও আছে। ব্রহ্ম বিদ্যালয়, রবির নিজস্ব উদ্যোগ, অন্য ভাইরা এতে উৎসাহ দেখাননি। দেশের সরকারের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হয়, আর রবীন্দ্রনাথ শুধু বিনা বেতনে নয়, ভরণপোষণেরও দায়িত্ব নিয়েছেন। বারোজন ছাত্রের জন্য পাঁচজন শিক্ষক! এমন শখের স্কুল চালাবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের তহবিল থেকে অনবরত ব্যয় করলে অন্যান্য শরিকদের ভাগে কম পড়ে

যাবে না!

তবু সকালবেলা ছাত্ররা সার বেঁধে যখন উপাসনা শুরু করে, তখন সেদিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন ভরে যায়। কয়েকজনের সমালোচনা শোনার পর এখন আর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-শূদ্র ছাত্রদের বিভিন্ন রঙের পোশাক নয়, সকলের জন্যই গেরুয়া আলখাল্লার ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্দীপনাময় কচি কচি মুখগুলিতে যেন ভবিষ্যতের ছবি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য আত্মস্থ করে, পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত হয়ে এরা মানুষের মতন মানুষ হবে। স্বাবলম্বী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক, এরাই দেশ গড়বে।

রবীন্দ্রনাথ একটানা বেশিদিন শান্তিনিকেতনে থাকতে পারেন না। শিলাইদহে জমিদারি তদারকিতে যেতে হয়, কলকাতাতেও নানান সভায় বক্তৃতা ও গান করতে হয়, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কাজও আছে। সেখানে ধারাবাহিক উপন্যাস 'চোখের বালি' ও অন্যান্য প্রবন্ধাদি লিখতে হচ্ছে। পত্রিকার খরচ ওঠে না, সে দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের না হলেও চিন্তা তো হয়ই। মহারাজ রাধাকিশোর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একশো টাকা করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'বঙ্গদর্শন'-কে সাহায্য করলে সরলা ঘোষালের 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন সাহায্য দেওয়া হবে না, তা নিয়েও কেউ কেউ মনঃক্ষুণ্ণ।

বন্ধু-শুভার্থীরা অনেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে স্কুলটি দেখতে চায়। রবীন্দ্রনাথও অনেককে নিয়ে গিয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডটি দেখাতে আগ্রহী, না হলে ভবিষ্যতে আরও ছাত্র সংগ্রহ হবে কী করে? কারুকে কারুকে তিনি যাতায়াতের ভাড়া দিয়েও নিয়ে যান। এতেও আছে অতিরিক্ত খরচের ধাক্কা।

বন্ধুরা সকলেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যোগটি সমর্থন করেন না। দু'-একজনের মতে, রবীন্দ্রনাথ জোর করে অতীতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। স্কুলের ছাত্রদের আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীর মতন হতে হবে কেন? তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু হিন্দু বাতিক হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে মুসলমানদের স্থান কোথায়? মুসলমানরা কি ভারতবাসী নয়! কোনও মুসলমান ছাত্র ওই স্কুলে যোগ দিতে চাইলে তাকেও কি বেদমন্ত্র পাঠ করতে হবে? অন্য ছাত্রদের সঙ্গে সে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসতে পারবে? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি এর মধ্যেই বহু সংখ্যক মুসলমান বিরূপ হয়ে গেছে। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মতন আরও কিছু প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠলে তো মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ক্রমশ। মুসলমানদের মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রদের স্থান নেই, হিন্দুরাও যদি শুধু হিন্দুদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে থাকে, তা হলে ছাত্রসমাজের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি হবে। ভবিষ্যতে এই ছাত্ররা কী আদর্শ ভারতীয় নাগরিক হতে পারে!

রবীন্দ্রনাথ তবু মনে করেন, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার বিকল্প হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মৃত প্রাচীন ব্যাপারকে মন্ত্রবলে জীবিত করে তোলা যায় না, কিন্তু অতীতের যে সব ধারা প্রচ্ছন্নভাবে অথচ বেশ প্রবলরূপে বর্তমান, অন্ধের মতন তাকে অস্বীকার করতে গিয়েই আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। অন্য দেশের আধুনিকতাকে এ দেশের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়াও ক্ষতিকর।

অনেকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ বন্ধু প্রিয়নাথ সেন কিছুতে শান্তিনিকেতন যেতে রাজি হলেন না।

স্কুল ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সংসার এখন শান্তিনিকেতনে, তাই এখানে ঘন ঘন আসেন। মৃণালিনীর শরীর ভাল যাচ্ছে না, স্বামীর কাছে তা তিনি গোপন করে যান। এখানে এসেই রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সারাদিন অনেক লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, মৃণালিনী যে মাঝে মাঝেই শুয়ে থাকেন, তা তাঁর নজরে পড়ে না।

একদিন রাত্রিবেলা, সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি পত্রিকার জন্য প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখতে বসেছেন, বেশ খানিকটা লেখার পর থেমে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, অনেক দিন তিনি কোনও প্রেমের কবিতা লেখেননি। ইন্দিরার বিয়ে হবার পর তেমন অন্তরঙ্গ চিঠিও লেখেননি কারুকে। উপন্যাস লিখছেন বলে কবিতা কমে আসছে।

কলম হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলেন, প্রেম তাঁকে ছেড়ে গেল। নতুন বউঠানের কথাও মনে

আসেনি অনেকদিন। সেই মুখখানি যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন তিনি শুধু কাজের মানুষ। যে-সব কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, বক্তৃতা করা, লেখালেখি, এখানে সেখানে ছুটে বেড়ানো, দেশ উদ্ধার করবার ফিকির, এগুলো কি সত্যি তাঁর কাজ। প্রেম কি এসব কিছুর চেয়ে বড় নয়। প্রেম ছাড়া জীবনটাই তো শুষ্ক। ছিলেন প্রেমিক কবি, হয়ে গেলেন এক আশ্রমের গুরুদেব।

আকাশে আজ পূর্ণ চাঁদের মায়া, বারান্দায় একটা মসলিনের চাদরের মতন ছড়িয়ে আছে জ্যোৎস্না। এখনকার স্তব্ধতার সঙ্গে শহরের রাত্রির কোনও তুলনাই হয় না। বাতাসে ভেসে আসছে কোনও ফুলের সুগন্ধ।

বাইরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বিষণ্ণভাবে বসে রইলেন। যে-সব দায়িত্ব নিয়েছেন, তা কোনওটা থেকেই বিচ্যুত হবেন না। কিন্তু কবিতা রচনাই তাঁর প্রধান কাজ। আবার লিখতে হবে।

এক সময় ঘোর ভাঙল। অনেক রাত হয়ে গেছে। কটা বাজে দেখার জন্য তিনি পকেট ঘড়িটা বার করলেন। তারপর ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। এটা তাঁর বিয়ের সময় যৌতুক পাওয়া সোনার ঘড়ি। একটা বোতাম টিপলে ওপরের ডালা খুলে যায়। ডালার ভেতর দিকে ইংরেজি অক্ষরে তাঁর নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা।

আবার বাস্তবতা তাঁকে আঘাত করেছে। ঘড়িটাতে সময় দেখার বদলে অন্য কথা তাঁর মনে পড়েছে। স্কুলের শিক্ষকদের এ মাসের বেতনের টাকার সংস্থান করা যায়নি এখনও। নির্দিষ্ট দিনে মাস-মাইনে দিতে না পারলে সম্মান রক্ষা করা যাবে না। টাকা সংগ্রহের কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না। মৃণালিনীর কাছ থেকেও আর গয়না চাওয়া যায় না।

এবারে এই ঘড়িটা বিক্রি করে দিলেই কাজ চলে যাবে।

৫৯

বিশাল পদ্মানদীর এপার ওপার দেখা যায় না। চৈত্র মাসের আকাশে কোথাও কোথাও গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ জমেছে, যে-কোনও সময় ঝড়ের সম্ভাবনা। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ ভাঙছে স্টিমারের গায়ে। স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। নদীর এমন রূপ আর কোন দেশে দেখা যায়? স্বামীজিও এর আগে পূর্ববঙ্গে আসেননি।

নদীতে মোচার খোলার মতন দুলছে প্রচুর জেলে ডিঙি, মাছ ধরা চলছে। এখন ইলিশের সময়, সরস্বতী পুজো পার হয়ে গেলে ইলিশ তোলা শুরু হয়। স্টিমারের প্রায় লাগোয়া কয়েকটি নৌকোয় উঠছে ইলিশ মাছ, জাল টেনে তোলার পর ইলিশ একবার দুবার লাফিয়েই নিস্পন্দ হয়ে যায়। এ মাছ বড় স্পর্শকাতর, জল থেকে তোলার পর ওপরের বাতাসে কয়েক মুহূর্তের বেশি বাঁচে না। স্বামী বিবেকানন্দ এরকমভাবে, এত কাছ থেকে মাছ ধরা কখনও দেখেননি, জীবন্ত ইলিশ দর্শন করা তো দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। মাছের কী রূপ, যেন ঝকঝকে একটা রূপোর পাত। যেন নদীর অলঙ্কার।

অনেক মাছই স্বামীজির প্রিয়, বিশেষত ইলিশ। শরীর ভাল নেই, চিকিৎসকরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ জারি করেছেন। শরীরটা কিছুতেই সারছে না, মাঝে মাঝেই শ্বাসকষ্ট হয়, হাঁপানির টান ওঠে। তা বলে কি এমন টাটকা ও নিখুঁত গড়নের ইলিশ দেখে লোভ সংবরণ করা যায়!

পাশের এক শিষ্যকে বললেন, ওরে কানাই, গোটাকতক ইলিশ কেন না। বেশ পাতলা ঝোল হবে। দু-একখানা পেটির মাছ ভাজা!

শিষ্য কুণ্ঠিতভাবে বলল, আপনার কি ইলিশ সহ্য হবে?

স্বামীজি বললেন, সহ্য হবে কি না আমি বুঝব। চোখের সামনে এমন ইলিশ দেখেও কেউ চলে যেতে পারে? তোরা দর করতে গেলে দাম বেশি চাইবে, ভাববে বিদেশি লোক, সারেঙসাহেবকে বল, তিনি ঠিক দর জানবেন।

এই ইলিশের স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছে আরও অনেকের ছিল, স্বামীজির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কেউ মুখ খোলেনি। এবার কয়েকজন মহা উৎসাহে গিয়ে সারেঙকে ধরল। সারেঙসাহেব ভোঁপ ভোঁপ শব্দে কয়েকবার সিটি বাজিয়ে জেলে ডিঙিগুলোকে সচকিত করলেন, তারপর হাতছানি দিয়ে দু-তিনজনকে কাছে ডাকলেন।

অনেক দর কষাকষির পর ঠিক হল, চার পয়সায় এক একটি ইলিশ পাওয়া যেতে পারে। বেশ বড় বড় মাছ, কোনওটারই ওজন দেড় সের, পৌনে দু সেরের কম নয়। স্বামীজির সঙ্গী দলটিতে রয়েছে সাত আটজন, কানাই তাই বলল, তিনটি কিংবা চারটি কিনি, তাতেই কুলিয়ে যাবে।

স্বামীজি ধমক দিয়ে বললেন, দূর বোকা, আমরা কজনে মিলে খাব, আর এই স্টিমারের খালাসি-মাল্লারা চেয়ে চেয়ে দেখবে? কিপটেমি করিসনি, পুরো এক টাকা দিয়ে গোটা ষোলো মাছ কিনে ফেল, আজ সকলে মিলে ভোজ হবে।

নৌকো থেকে বেছে বেছে মাছ তোলা হচ্ছে, স্বামীজি মুগ্ধভাবে দেখছেন। একসময় অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে বললেন, ওরে কানাই, তামাক দে।

কানাই দৌড়ে গিয়ে হুঁকো-কল্কে সেজে নিয়ে এল।

দ্বিতীয়বার স্বামীজি আমেরিকা গিয়েছিলেন প্রধানত মিশনের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও নিজের চিকিৎসা করাবার জন্য। কোনওটাতেই বিশেষ সফল হননি। জোসেফিন কত যত্ন করেছে, ডাক্তার হেলমার নামে একজন বড় চিকিৎসককে ডেকে এনে দেখিয়েছে। ডাক্তার হেলমারের মতে, বহুমূত্র ও হাঁপানি ছাড়াও স্বামীজির হৃৎপিণ্ড ও মূত্রাশয়ও কিছুটা জখম হয়েছে, তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন এখনও নিরাময়ের অতীত নয়, তিনি স্বামীজিকে আগেকার মতন সুস্থ করে তুলতে পারবেন। কই পারলেন না তো! অবশ্য সেরকম বিশ্রামও নেওয়া হল না। ডাক্তার বলেছিলেন, ধূমপান আস্তে আস্তে কমিয়ে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। স্বামীজি ছাড়তে পারেননি। কখনও উত্তেজিত বা প্রফুল্ল বোধ করলে, কিংবা গভীর চিন্তার সময় ধূমপানের জন্য অন্তরাত্মা ছটফট করে।

তামাক টানতে টানতে স্বামীজির আর একটি সাধ জাগল। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাক বড় তোফা হয়। অনেকদিন খাওয়া হয়নি। পুঁইশাক পাওয়া যাবে কোথায়? স্টিমার ভেড়ানো হল এক গ্রামের ঘাটে, সেখান থেকে শুধু পুঁইশাক নয়, খুব ভাল জাতের চাল সংগ্রহ করা হল। ভূরিভোজের সময় স্বামীজি স্বয়ং সারেঙ ও মাল্লাদের আপ্যায়ন করে খাওয়াতে লাগলেন।

এই সব সময়ে শরীর খারাপের কথা একেবারেই মনে থাকে না। অনেকেই এই দেখে বিস্মিত হয়, আজ যে মানুষটি রোগে কাতর, পরদিন তিনিই কী করে সাগ্রহে চলে যান হিমালয়ে, কিংবা কোন শক্তিতে বক্তৃতা করেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মঠের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন, পোষা পশুপাখিদের পরিচর্যা করেন নিজের হাতে!

খানিক বাদে বিশ্রম্ভালাপের সময় একজন কৌতুক করে বলল, স্বামীজি, আপনি খিচুড়ির গন্ধ পেয়ে বেলুড় মঠের গেট ডিঙিয়েছিলেন মনে আছে?

স্বামীজি হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, খিচুড়ির গন্ধ পেয়ে, ঠিক বলেছিস! শুধু গেট ডিঙোনো নয়, আমেরিকা থেকেই লাফিয়ে চলে এসেছি।

বেশিদিন আগের কথা নয়, এবারে আমেরিকায় গিয়ে এক এক সময় এমন মনে হত যে বুঝি হঠাৎ মরেই যাবেন। তখন ব্যস্ত হয়ে ভাবতেন, যদি সেরকমই হয়, তা হলে স্বদেশে গিয়ে দেহরক্ষা করাই ভাল। আবার দু-একদিনের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠলে সে কথা মনে থাকত না। আমেরিকায় তাঁর সঙ্গিনী ধনী মহিলাদের ভ্রমণের নেশা, এ ছাড়া তাঁদের অন্য কাজও তেমন কিছু নেই। স্বামীজিও ভ্রমণে খুব উৎসাহী। আমেরিকা ছেড়ে তিনি প্যারিসে এলেন, সেখানে ধর্মমহাসভায় যোগ দেওয়ার

ব্যাপার ছিল। শিকাগোর ধর্ম মহাসভার সঙ্গে অবশ্য এই মহাসভার কোনও তুলনাই চলে না। প্যারিসে বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী কালভে মিশরে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা করে স্বামীজিকে আমন্ত্রণ জানালেন, স্বামীজিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

ভ্রমণসূচি হল এইরকম: বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে ভিয়েনা হয়ে কনস্টান্টিনোপল। তারপর জাহাজে গ্রিস, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইজিপ্ট, সেখান থেকে এশিয়া মাইনর হয়ে জেরুজালেম। কিন্তু ইজিপ্ট ঘুরে দেখার সময় মন আবার উতলা হয়ে উঠল, শরীরও যেন বইছে না। পথসঙ্গীরা যখন ইজিপ্ট ছেড়ে আবার অন্যত্র পাড়ি দেওয়ার কথা চিন্তা করছে, তখন স্বামীজি বললেন, তোমরা যদি কিছু না মনে করো, আমি এখান থেকেই দেশে ফিরে যেতে চাই। স্বামীজির ইচ্ছেতে কেউ বাধা দিতে চান না। কয়েকবার থেকে যাওয়ার অনুরোধ করে শ্রীমতী কালভে স্বামীজির জন্য ভারতমুখী জাহাজের প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে দিলেন। স্বামীজির আর জেরুজালেম দেখা হল না।

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফেরার সময় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কী বিপুল জনসমাগম হয়েছিল, পথের বিভিন্ন নগরে কত সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়বার এলেন নিঃশব্দে। বম্বের জাহাজঘাটায় যখন নামলেন, কেউ তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে নেই, কেউ তাঁকে চেনে না। সাধারণ যাত্রীর মতন নিজের মালপত্র বয়ে নিয়ে রেল স্টেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরলেন। ট্রেনের কামরাতেও সাহেবি পোশাক পরা এই মানুষটির প্রকৃত পরিচয় কেউ জানতে পারল না, তিনি এক কোণে বসে আপনমনে চুরুট টানছিলেন। অনেকক্ষণ পর একজন বাঙালি ভদ্রলোক উঠে এসে জিজ্ঞেস করলেন, মাপ করবেন, আপনাকে চেনা চেনা লাগছে, আপনি কি মিস্টার নরেন দত্ত?

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তা না করে স্বামীজি একটা গাড়ি ডেকে সোজা চলে এলেন বেলুড় মঠে। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। দিনাবসানে মঠের বাগানের গেটে তালা পড়ে যায়। বাগানের মালি দূর থেকে দেখে ভাবল, সত্যি বুঝি এক সাহেব এসেছে, সে ভয় পেয়ে ছুটে গেল ভেতরে খবর দিতে। স্বামীজি শুনতে পেলেন, ভেতরে ঘন্টা বাজছে। তিনি বুঝতে পারলেন, মঠবাসীরা এখন সবাই মিলে খেতে বসবে। তাঁর আর তালা খোলবার সবুর সইল না। গেট বেয়ে উঠে লাফিয়ে পার হয়ে দ্রুত পদে তিনি চলে এলেন খাওয়ার ঘরে।

মঠবাসীরা হতভম্ব। প্রথমে অনেকে চিনতেই পারল না, গুরুভাইরা চিনতে পেরেও যেন নিজেদের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। সবাই জানে, স্বামী বিবেকানন্দ এখন বিদেশে রয়েছেন, বিনা আড়ম্বরে, বিনা অভ্যর্থনায় তিনি সশরীরে এখানে উপস্থিত, এও কী হতে পারে। সঙ্গীসাথী কেউ নেই, জয়ধ্বনি নেই।

স্বামীজি হাতে হাত ঘষে বললেন, আঃ চমৎকার খিচুড়ির গন্ধ বেরিয়েছে। শেষ হয়ে গেল নাকি? ওরে দে দে, আমার জন্য একটা পাত পেড়ে দে! কাঁচালঙ্কা আছে তো? কতদিন খিচুড়ি খাইনি!

দ্বিতীয়বারের ফেরাটা যে একেবারে অন্যরকম হয়েছে, শুধু তাই নয়, দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে তাঁর কিছু কিছু মোহভঙ্গও হয়েছে। প্রথমবার সে দেশের সমৃদ্ধির ভাল দিকগুলিই চোখে পড়েছিল। অনেক কিছু দেখেই চমক লাগত। এবারে সেই বিস্ময়বোধ ছিল না, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ওই সমৃদ্ধির মূলে আছে শোষণ। আমেরিকানরা পরিশ্রমী ও উদ্যমী জাত, উদ্ভাবনী শক্তিও আছে, সেই সঙ্গে আছে লোভ ও স্বার্থপরতা। মানবিক সম্পর্কের চেয়েও বেশি প্রকট ব্যবসাদারি মনোভাব। ছোট ছোট কারবারিদের গিলে খায় বড় বড় কারবারিরা।

সতীর্থ ও শিষ্যদের কাছে এবারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে করতে স্বামীজি এক একবার বিরক্তিতে বলে ওঠেন, নরক, নরক!

অবশ্য স্বামীজি ওদেশে অনেক উন্নতমনা, সদাশয় বন্ধুও পেয়েছেন। সেরকম বন্ধু অতি দুর্লভ।

স্টিমার একসময় পৌঁছে গেল নারায়ণগঞ্জ। আগে থেকেই খবর জানা ছিল বলে এখানে বেশ কিছু লোক স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত। নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা

আসা যায়, সেখানে এক জমিদারের বাড়িতে সদলবলে স্বামীজির আতিথ্যের ব্যবস্থা হয়েছে।

ঢাকায় পৌঁছেই স্বামীজি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মা এসেছেন?

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, স্বামীজির মা এসে পৌঁছবেন আরও দু দিন পরে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সব ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ববঙ্গে স্বামীজি বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি। খানিকটা ভ্রমণ, খানিকটা মায়ের সাধপূরণ। সন্ন্যাসী হয়েও নরেন্দ্রনাথ পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ত্যাগ করেননি। মায়ের প্রতি তাঁর বরাবর দুর্বলতা। যে মানুষ নিজের মাকে ভালবাসে না, মাতৃস্নেহ উপেক্ষা করে, তার পক্ষে কি মানুষের সেবা করা সম্ভব! মায়ের অনেক বয়েস হয়েছে, তিনি যাতে কষ্ট না পান সেদিকে স্বামীজি সবসময় লক্ষ রাখেন। শ্রীমতী ম্যাকলাউড স্বামীজির হাতখরচের জন্য প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি মাঝে মাঝে আরও টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, স্বামীজি তার থেকে মায়ের জন্য একশো টাকা ও এক বোনের জন্য পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা পাঠান।

দেশে ফিরে পরপর অতি প্রিয় দুজনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্বামীজি খুব আঘাত পেয়েছেন। সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত সেভিয়ার হিমালয়ের মায়াবতীতে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, তিনি হিন্দুত্ব বরণ করে বেদান্ত প্রচারের বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেভিয়ারের অসুস্থতার সংবাদ স্বামীজি বিদেশে থাকতেই পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের আগেই সেভিয়ার শেষনিশ্বাস ফেলেছেন। শ্রীমতী সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও স্বামীজি চলে গেলেন হিমালয়ে।

খেতরির রাজা অজিত সিং নরেন্দ্রনাথ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বামীজির অকৃত্রিম ভক্ত হিসেবে তিনি কতভাবে যে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই খেতরির রাজার কী মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু ঘটে গেল! সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধিভবনটি একটি শিল্পমণ্ডিত স্থাপত্য, রক্ষণাবেক্ষণের অমনোযোগে সেটি জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অজিত সিং নিজ ব্যয়ে সেটি সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, অত্যুৎসাহী হয়ে তিনি মেরামতির কাজ নিজে দেখতে যেতেন। একদিন তিনি একটা সুউচ্চ গম্বুজের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় দমকা বাতাস উঠল, সেই বাতাসের ধাক্কায় রাজা পড়ে গেলেন কয়েকশো ফুট নীচে।

এই দুজনের মৃত্যুশোক স্বামীজির বুকে খুব জোর ধাক্কা দিয়েছিল। শরীর দুর্বল থাকলে মনও দুর্বল হয়ে যায়। বাইরে ঘোরাঘুরি করলে তবু কিছুটা ভাল থাকেন, বেলুড় মঠে থাকতে শুরু করলেই স্বাস্থ্য ভাঙে। মঠের পরিচালন ব্যবস্থা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়েছেন। কার্যত তাঁর কথাতেই সব চলে বটে, কিন্তু আইনত তাঁর নাম আর কোথাও নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বেলুড় মঠ ও সংলগ্ন জমিকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পত্তি বলে গণ্য করেনি, খাতায়পত্রে এসব ছিল নরেন দত্তর বাগানবাড়ি। সম্প্রতি স্বামীজি কয়েকজনের নামে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে তাদের নামে সব সম্পত্তি তুলে দিয়েছেন, ব্রহ্মানন্দ সেই ট্রাস্টের সভাপতি।

শরীর ভাল থাকে না বলেই মাঝে মাঝে মঠ ছেড়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে হয়। পূর্ববঙ্গ আসাম কখনও দেখা হয়নি, এর মধ্যে মা একবার তীর্থদর্শনের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। মায়ের এই শেষ বয়েসের সাধ আর অপূর্ণ থাকে কেন।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে লাঙ্গলবন্ধ একটি বিখ্যাত তীর্থ। বুধাষ্টমীর সময় এখানে পুণ্যস্নানে বহু দূর দূর থেকে মানুষ আসে। কথিত আছে যে পরশুরাম এখানে স্নান করে মাতৃবধের পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। এই লাঙ্গলবন্ধে এবার এক গৃহী মাতা ও তাঁর সন্ন্যাসী পুত্র একসঙ্গে স্নান করবেন।

ঢেঁকি-পাড়ানিকে যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানতে হয়, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দ যেখানেই যাবেন, বক্তৃতা না দিলে ছাড়ানছুড়িন নেই। ঢাকাতেও অনেকে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চেপে ধরল, শারীরিক অসুস্থতার কথা কেউ গ্রাহ্যই করে না। স্বামীজি বললেন, দাঁড়া বাবা দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নিই, মাকে নিয়ে তীর্থস্থানটা ঘুরে আসি, তারপর ঢাকায় থাকব দু-চারদিন।

মা একা এলেন না, সঙ্গে তাঁর মেয়ে, এক বোন ও আর কয়েকজন মহিলা। একটা বড় নৌকো

ভাড়া করে স্বামীজি সকলকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। বুড়িগঙ্গা নদী ধরে কিছুটা গেলে নারায়ণগঞ্জের কাছে শীতলক্ষা নদীতে পড়া গেল। সেই নদী থেকে ধলেশ্বরী, তারপর ব্রহ্মপুত্র। নদীমাতৃক দেশ, চতুর্দিকেই জল, মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন এক একটি গ্রাম। জলের এই রূপ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এ দলের অধিকাংশই কলকাতার মানুষ, কখনও নৌকায় বেশি দূরের পথ পাড়ি দেয়নি, তাদের কাছে এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

লাঙ্গলবন্ধে পৌঁছে কিন্তু আবার অন্যরকম হয়ে গেল। তীর্থস্থানগুলিতে সৌন্দর্যের বদলে কুশ্রীতাই প্রকট। লক্ষ মানুষের ভিড় এখানে, চতুর্দিকে কোলাহল এবং আবর্জনা। এটা ব্রহ্মপুত্রের মূল ধারা নয়, পুরনো খাত, জল খুবই অগভীর, পারে থিকথিক করছে কাদা। তীর্থযাত্রীরা অস্থায়ী উনুনে রান্না করে খাচ্ছে, ধোঁয়া ও এঁটোকাঁটা ছড়ানো। এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যখন তখন কলেরা শুরু হয়ে যেতে পারে। জল এত ময়লা যে তাতে স্নান করতেই ভক্তি হয় না, এখানে স্নান করলে পুণ্য অর্জন হবে, এরকম বিশ্বাস করাই শক্ত, তবু অনেকে বিশ্বাস করে।

স্বামীজি পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব পিটপিটে। ঘাটের অবস্থা দেখে তিনি সবাইকেই সাবধান করে দিলেন। এখানকার জল কারুর খাওয়া চলবে না। অনেকে পুণ্য সলিল মনে করে ঘটি-বাটিতে তুলে তুলে জল খাচ্ছে, কেউ কেউ বোতলে ভরে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার থেকে কাছেই একটা টিউবওয়েল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। স্বামীজি নির্দেশ দিলেন, ওই টিউবওয়েলের জল সকলকে পান করতে হবে, স্নানান্তে ওই জলেই ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে হাত-পা।

পুজো সেরে নিয়ে স্বামীজি সবাইকে নিয়ে নদীতে নামলেন। সযত্নে জননীর হাত ধরে বললেন, আমার সঙ্গে এসো মা, পারের কাছটা বড় নোংরা, মাঝনদীতে তোমাকে ডুব দেওয়াব।

মা বললেন, ওরে বিলে, আমি তো সাঁতার জানি না, ডুবে যাব না তো রে!

স্বামীজি বললেন, মা, আমি খুব ভাল সাঁতার জানি। হেদোতে কত সাঁতার কাটতুম তোমার মনে নেই?

মা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

স্বামীজি ব্যস্ত হয়ে বললেন, কী হল, কী হল, পায়ে তোমার কিছু ফুটেছে?

মা বললেন, তা নয় রে। আজ আমার বড় সুখ। তুই আমার হাত ধরেছিস। ভেবেছিলাম আমার এই ছেলেটা জন্মের মতো হারিয়ে গেল—

স্বামীজি বললেন, হারাব কেন মা। আমি তো মনে মনে একদণ্ডও তোমাকে ছাড়িনি। আমি তোমার কাছেই আছি।

মা বললেন, দূর বিদেশে গিয়ে বছরের পর বছর থাকিস, কোনও খবর পাই না। আবার কোথাও চলে যাবি না তো?

স্বামীজি বললেন, নাঃ, আর কোথাও যাব না!

লোকজনের ভিড় থেকে সরে এসে মধ্যনদীতে মাকে কয়েকটি ডুব দেওয়ালেন স্বামীজি। তারপর সাবধানে তাঁকে তীরে পৌঁছে দিয়ে নিজে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটলেন। এখানেও তাঁকে কেউ চেনে না, মনে করেছে আরও অনেকের মতন একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। আগেকার মতন সাঁতার কাটার আর দম নেই। পা ভারী হয়ে গেল, একটুক্ষণের মধ্যেই তিনি হাঁপিয়ে গেলেন।

তীর্থস্থানে বেশিক্ষণ না থেকে শুরু হল ফেরার পথে যাত্রা। নৌকো চলতে শুরু করার পর স্বামীজি জনে জনে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ নদীর জল একফোঁটাও খাওনি তো? সত্যি করে বলো!

সবাই দৃঢ়বাক্যে স্বীকার করল, তারা অক্ষরে অক্ষরে স্বামীজির নির্দেশ পালন করেছে।

স্বামীজি মুচকি হেসে বললেন, আমি কিন্তু ডুব দিয়ে এক ঢোঁক জল খেয়ে নিয়েছি। কী জানি বাবা, কোথা দিয়ে পুণ্য ঢুকে পড়ে কে জানে! যদি এই জলে আমার হাঁপানিটা সেরে যায়।

তাঁর বলার ভঙ্গি দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

ঢাকায় ফিরে আবার চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে আসামের

কামাখ্যা। কিন্তু এর মধ্যেই ঢাকার ভক্তরা কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করে ফেলেছে। সুতরাং কয়েকদিন থেকে যেতেই হবে। একদিন জগন্নাথ কলেজে আর একদিন পাগোজ স্কুলের প্রাঙ্গণে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হল। তাও ইংরেজিতে। সাধারণ লোক সব বুঝুক না বুঝুক, তারা ইংরেজিতেই শুনতে চায়, ইংরেজি না হলে উচ্চাঙ্গের কিছু বলে মনে হয় না।

ইংরেজি বলা সাধুর নামও ছড়ায় তাড়াতাড়ি। স্বামীজির ঢাকায় আগমনের খবর খুব বেশি লোক জানত না, এই বক্তৃতার ফলে বহু লোক জানল, তারা দলে দলে ছুটে এল তাঁর বাসভবনে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন, কেউ উপদেশ চায়, কেউ চায় সান্ত্বনা। সারাদিন জনসমাগম লেগেই আছে, কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে যান স্বামীজি, তবু নিস্তার নেই।

একদিন অনেক লোকের সঙ্গে কথা সেরে দুপুরবেলা স্নানাহারের জন্য যাওয়ার আগে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন স্বামীজি। নীচে একটি ফিটন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে কয়েকজন লোক উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছে। এ গৃহের একজন কর্তা একটি লাঠি তুলে ভয় দেখাচ্ছেন যেন কাকে। স্বামীজি কৌতূহলভরে ওপর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে রে কানাই?

কানাই বলল, ও কিছু নয়। আপনি ভেতরে যান।

ফিটন গাড়ি থেকে এক রমণী মুখ বার করে ওপরের দিকে তাকাল। সেই মুখখানি দেখেই স্বামীজি ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। সে মুখ কোনও সাধারণ গৃহস্থ রমণীর নয়। গাল গোলাপি বর্ণে রঞ্জিত, ভুরুতে কাজল, চোখ দুটিতে সুর্মা টানা, দৃষ্টিও কেমন ভাসা ভাসা। এ রমণী নিশ্চিত কোনও বাঈজি বা বারবনিতা।

এই কয়েক দিনে ঢাকা শহর সম্পর্কে পরিচিত হয়েছেন স্বামীজি। কলকাতার চেয়েও অনেক পুরনো শহর এই ঢাকা, তবু এখানে গ্রামীণ ও নাগরিক সভ্যতা এখনও সহাবস্থান করে আছে। কিছু কিছু পাকা বাড়ির পাশাপাশি প্রচুর খোলার ঘর ও বস্তি। বুড়িগঙ্গার ধারে অনেকগুলি সুদৃশ্য অট্টালিকা আছে জমিদার, অভিজাত ও ব্যবসায়ীদের, নদীবক্ষ থেকে ওই সব প্রাসাদমালা দেখে মুগ্ধবোধ হলেও ভেতরে ভেতরে রয়ে গেছে অনেক নোংরা ও কদর্য স্থান। রমনা নামে স্থানে ঢাকেশ্বরীর একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে, কিন্তু সে স্থানে এমনই গভীর জঙ্গল যে বন্য জীবজন্তুর ডাক শোনা যায় দিনেদুপুরে।

এ শহরে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা কিছু বেশি। মুসলমানদের মধ্যে কিছু অতিশয় ধনী ও অভিজাত থাকলেও অধিকসংখ্যকই অতি দরিদ্র ও শ্রমজীবী। সে তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে। তবে মহরম, ইদ, জন্মাষ্টমী ও দুর্গোৎসবে হিন্দু মুসলমান মিলেমিশে যোগদান করে।

শহরতলীর দিকে ওয়ারি নামে এক অঞ্চলের জঙ্গল সাফ করে নতুন নতুন ঘরবাড়ি নির্মিত হচ্ছে প্রধানত সরকারি কর্মচারীদের জন্য। সরকার নগরায়ণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঋণও দিচ্ছে। সেই নতুন ঢাকায় এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন স্বামীজির দুই সঙ্গী। ফেরার সময় রাত্রি হয়ে যায়, পথ হারিয়ে তাঁরা কোনদিকে গিয়ে পড়েছিলেন ঠিক নেই, হঠাৎ যেন দেখতে পেলেন আলো ঝলমল এক মায়াপুরী, ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে নূপুরের নিক্কণ, হাসির হররা, উন্মত্ত হল্লোড়, আলুথালু বেশে এক বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক যুবতী, তাকে তাড়া করে এল দুজন পুরুষ। সেই দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসীদ্বয় চোঁ-চাঁ দৌড় লাগিয়েছিলেন।

পরে তাঁদের মুখে সেই ভয়-কাহিনী শুনে হেসেছিলেন স্বামীজি। সব শহরেই কিছু অতিরিক্ত অর্থবান ও বাবু শ্রেণীর লোক থাকে, প্রমোদ বিলাসিতা ছাড়া যারা অন্য কিছু জানে না। জমিদাররা প্রজার অর্থ শোষণ করে নিজেদের ভোগবাসনার জন্য অজস্র ব্যয় করে। তাদের লালসা মেটাবার জন্যই অজস্র সাধারণ ঘরের মেয়েদের বারবনিতায় পরিণত করা হয়। স্বামীজি নিজেও কায়রো শহরে ভুল করে এরকম এক পতিতাপল্লীতে গিয়ে পড়েছিলেন। ভয় পাওয়ার কী আছে? নিজেদের দোষে তো নয়, সমাজের দোষেই এরা পতিতা। অদ্ভুত এই পুরুষদের সমাজ। রাতেরবেলা যেসব রমণীদের কাছে পুরুষরা ছুটে যায়, দিনেরবেলা সেই রমণীদের দেখলেই দুর দুর ছাই ছাই করে। যেন

তারা অস্পৃশ্য।

স্বামীজি বললেন, কানাই, যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, ওপরে পাঠিয়ে দে।

স্ত্রীলোক একজন নয়, দুজন। একজন বেশ বয়স্কা, অন্যজন পরিপূর্ণ যুবতী এবং অতীব রূপসী। এই দিনের বেলাতেও তার সাজগোজের কিছুমাত্র ঘাটতি নেই। রূপোর চুমকি বসানো নীল রেশমের শাড়ি পরা, সর্বাঙ্গে হীরে-মুক্তোর গহনা। সে অবশ্য মুখখানি নত করে আছে। বোঝাই যায়, এরা মা ও মেয়ে।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বয়স্কা মহিলাটি বললেন, সাধু মহারাজ, বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি। আমরা অভাগিনি, আমাদের এরা ঢুকতে দিতে চাইছিল না, কিন্তু ভগবান কী অভাগিনিদের দয়া করেন না?

স্বামীজি স্মিতহাস্যেই চেয়ে রইলেন।

স্ত্রীলোকটি আবার বলল, এই আমার মেয়ে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু মেয়ে আমার খুবই অসুস্থ। হাঁপানির টান এক-এক সময় এত অসহ্য হয় যে যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি করে। মা মা বলে কাঁদে। মহারাজ, আপনি একে উদ্ধার করুন।

স্বামীজি এবার একটু চওড়া করে হাসলেন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না! তাঁকেও তো দেখে অনেকেই বোঝে না যে তিনি কত অসুস্থ। অনেকেই এখনও মনে করে, তাঁর শরীরে সিংহের বিক্রম!

তিনি মৃদু স্বরে বললেন, মা, আমি আপনার মেয়েকে কী করে উদ্ধার করব বলুন তো! আমি মানুষের মনের শুশ্রূষা করতে তবু কিছুটা পারি, মানুষের শরীরের রোগ সারাবার কোনও ক্ষমতা তো আমার নেই। আমার গুরুরও ছিল না। আপনি ভুল সাধুর কাছে এসেছেন।

স্ত্রীলোকটি বলল, না, না তা কী হয়! কত লোক বলাবলি করছে যে ঢাকায় মস্ত বড় এক সাধু এসেছেন। আমি ভিক্ষা চাইছি মহারাজ, এ মেয়ের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। আপনি মন্ত্র পড়ে একটা ওষুধ দিন।

স্বামীজি বললেন, আমি কী ওষুধ দেব? সেরকম মন্ত্রও আমি জানি না। আমার নিজেরই হাঁপানির অসুখ আছে। সেটাই তো সারাবার হদিশ পেলাম না আজ পর্যন্ত!

স্ত্রীলোকটি অবিশ্বাসের সঙ্গে কান্না মেশানো দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বললেন, প্রভু, আমাদের সঙ্গে ছলনা করছেন! সাধু-সন্ন্যাসীদের কখনও রোগভোগ হয় না।

স্বামীজি বললেন, মা, তা ঠিক নয়। সাধুরাও মানুষ। তাঁরাও রোগ-ভোগ, জরা-মৃত্যুর অধীন। তাঁদেরও সময় ফুরোলে দেহরক্ষা করতে হয়। নইলে তো অমর সাধুতে দেশটা ভরে যেত।

তবু মানতে চান সে রমণী, বারবার একই অনুরোধ করে যেতে লাগলেন। হাপুস নয়নে কেঁদে লুটোলেন মাটিতে। শেষ পর্যন্ত বললেন, মহারাজ, ওষুধ না দিন, আপনি আমার মেয়েকে ছুঁয়ে একবার আশীর্বাদ করে দিন, তাতেই কাজ হবে।

এতক্ষণ পর মেয়েটি বলল, মা, চলো, এখানে বসে থেকে ওঁকে বিরক্ত করে আর লাভ নেই। আমরা পাপী, উনি আমাদের স্পর্শ করবেন না।

স্বামীজি এবার ডান হাত তুলে মেয়েটির মাথায় রেখে বললেন, আমি আশীর্বাদ করলে যদি তোমার রোগ নিরাময় হয়, তা হলে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি। সেই সঙ্গে আমার একটা অনুরোধ আছে। যদি অন্য কোনও সাধু কিংবা ডাক্তার-বদ্যির কাছ থেকে সত্যিই হাঁপানির কোনও ওষুধ পাও, তা হলে আমাকেও একটু দিয়ে যেয়ো। আমিও ওই রোগে বড় কষ্ট পাই।

মা-মেয়ে প্রস্থান করার পর স্বামীজি বড় একটা নিশ্বাস ফেললেন। অনেকক্ষণ ধরে নম্র, ভদ্র ব্যবহার করারও একটা ক্লান্তি আছে। অবুঝদের কী করে বোঝানো যায়! সম্প্রতি এই এক উৎপাত শুরু হয়েছে। অনেকেই এসে কোনও না কোনও রোগের ওষুধ চায়। এদেশের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা আর কতজনের, অধিকাংশই অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। তারা মনে করে, সাধু হলেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। যার অলৌকিক ক্ষমতা নেই, সে আবার সাধু কীসের?

কিছু কিছু সাধুর নামে নানান আষাঢ়ে গাল-গল্প ছড়ায় বলেই এই বিপত্তি।

স্বামীজি উঠতে যাচ্ছেন, দেখতে পেলেন দরজার কাছে দেওয়াল ঘেঁষে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। কখন সে ঢুকেছে তিনি খেয়াল করেননি। বেশ ছিপছিপে, ফর্সা, সুদর্শন ছোকরাটি, স্বামীজির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত কপালে ছুঁইয়ে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম।

স্বামীজি বললেন, তোমার আবার কী চাই?

ছেলেটি লাজুক লাজুক ভাব করে বলল, তেমন কিছু না। আপনাকে একটু দেখতে এসেছি।

স্বামীজি এবার খানিকটা রুক্ষ স্বরে বললেন, এখন তো দেখার সময় নয়। তোমরা কি আমাকে খাওয়া-দাওয়া করতেও দেবে না। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

যুবকটি বলল, আপনি খেয়েদেয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করব।

স্বামীজি বললেন, খাওয়ার পরেও আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব।

যুবকটি বলল, তা হলে বিকালবেলা... আমি থাকব ধারেকাছেই।

স্বামীজি আর ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেলেন অন্দরমহলে। সারাদিন ধরে অনর্গল বকবক করতে হয়। মানুষকে ফেরাতেও ইচ্ছে করে না। গুরুর একটা কথা মনে পড়ে, একটাই তো ঢাক, তার আর কত বাজাবে! হঠাৎ ফেঁসে যাবে না!

স্বামীজি খেতে না বসলে মাও খাবেন না। বহুকাল বাদে মা আর ছেলে একসঙ্গে বসবেন খেতে, মা মাঝে মাঝে এক একটা গেরাস তুলে দেন ছেলের মুখে। শিশুর মতন আহ্লাদ হয় স্বামীজির। মায়ের সুখ দেখেই তাঁর সুখ।

খাওয়ার পর মাকে আগে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, তারপর নিজে বিছানায় শুয়ে তামাক টানলেন কিছুক্ষণ। একসময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। কোনওদিন তাঁর দিবানিদ্রার অভ্যেস ছিল না। এখন শরীর বিশ্রাম চায়।

বেশিক্ষণ ঘুমোলেন না। কীসের যেন একটা অস্বস্তি, হঠাৎ মনে পড়ল মুসলমান ছেলেটির কথা। সে কি এখনও বসে আছে?

তিনি উঠে চলে এলেন দোতলার বৈঠকখানায়। সে ঘরে আর কেউ নেই, ঠিক একই জায়গায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুবকটি।

স্বামীজি কৌতূহলী হয়ে বললেন, কী ব্যাপার তোমার বলো তো! কী চাও আমার কাছে?

যুবকটি আমতা আমতা করে বলল, কী চাই, মানে, কিছুই চাই না। হুজুর, আমার নাম আবদুল সাত্তার। পাগোজ স্কুলের ময়দানে আপনার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম, আপনার সব কথা বুঝিনি, কিন্তু তারপর কী যে হল, খালি মনে হয়, আপনাকে আবার দেখি, আপনার কাছে বসে থাকি। আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী, আপনার কাছে আমি কী কথাই বা বলতে পারি! অথচ মনে আমার অনেক প্রশ্ন।

স্বামীজি ফরাসের ওপর চাপড় মেরে বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখানে কাছে এসে বসো আবদুল। আমি শুধু হিন্দু সন্ন্যাসী তো নই, আমি ভারতীয় সন্ন্যাসী। বিদেশে যখন যাই, তখন ভারতীয় হিসেবে যাই। মুসলমানদের বাদ দিয়ে কী ভারত হতে পারে? তোমরা জানো না, এবারেই তো আমেরিকার এক জায়গায় আমার বক্তৃতায় বিষয় ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী'। কাগজে সেরকম বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল। মঞ্চে উঠে শেষ মুহূর্তে আমি বিষয়টা বদলে দিলাম, 'মহম্মদ ও তার বাণী'।

আবদুল বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল, কেন, বদলালেন কেন?

স্বামীজি বললেন, বদলালাম, তার কারণ, একটু আগে ওখানে একজন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে একটা বিশ্রী মন্তব্য করেছিল। ওরা তো অনেক বিষয়েই অজ্ঞ। কিছুই জানে না। খ্রিস্টানরা সেই যে মুসলমানদের সঙ্গে ক্রুসেড লড়েছিল, তারপর থেকে এখনও অনেক ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে। তাই মনে হল, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তো অনেক বলেছি, এবারে ইসলামের সমভ্রাতৃত্ব, উচ্চ আদর্শের কথা এদের বুঝিয়ে বলি।

আবদুল বলল, কোনও মৌলবি তো হিন্দু ধর্মের প্রশংসা করবে না, আপনি কেন করলেন ?

স্বামীজি বললেন, সকলে করে না বটে, তবে এরকম দু একজন শিক্ষিত মৌলবিও আমি দেখেছি, যাঁরা অন্য ধর্মের মহত্ত্বের কথাও স্বীকার করেন।

আবদুল জিজ্ঞেস করল, আপনার ওই বক্তৃতা খ্রিস্টান সাহেবরা শুনল ? মানল ?

স্বামীজি বললেন, শুনেছে, মেনেছে কি না জানি না। দু-চারজন অবশ্য গর্দভের মতন প্রশ্ন করছিল। বহুবিবাহে ওদের ঘোর আপত্তি। মহম্মদ কেন অতগুলি বিয়ে করেছিলেন, সেটা ওরা কিছুতে মানতে পারে না।

আবদুল সভয়ে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বলল, এটা তো আমারও প্রশ্ন। আমাদের পয়গম্বর এতগুলি বিবাহ করে আমাদের সামনে কী দৃষ্টান্ত রাখলেন ? নিজের ভাই-বেরাদারদের কাছে এ প্রশ্ন তোলাই যায় না, তা হলে খুন করে ফেলবে। আপনি আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ?

স্বামীজি গম্ভীরভাবে বললেন, মহাপুরুষদের জীবন ওভাবে বিচার করতে নেই। মহাপুরুষদের চরিত্র রহস্যাবৃত, তাঁদের কার্যধারা দুর্জ্ঞেয়। তাঁদের বিচার করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অনুচিত। ওদেশের খ্রিস্টানদের আমি বুঝিয়েছি, দুর্জনরা সদাই দোষত্রুটি খোঁজে। মাছি হোয়ো না, মৌমাছি হও। মহাপুরুষ দুশো পত্নী গ্রহণ করতে পারেন, উল্টোদিকে তোমাদের মতন ভূতকে একটি পত্নীও গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যায় না। খ্রিস্টই মহম্মদের বিচার করতে সমর্থ, তুমি আমি কে ? শিশুমাত্র ! এই সকল মহাপুরুষকে কী করে বুঝব !

কথায় কথায় ইসলামের গৌরব কাহিনী, ভারতের বিজয়ী শাসক মুসলমান ও সাধারণ ধর্মান্তরিত মুসলমানের তফাত ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বোঝাতে লাগলেন স্বামীজি। তারপর একসময় বললেন, শেষ পর্যন্ত আমরা মানবজাতিকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই।

আবদুল মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, এইখানে আবার ভয় পেয়ে বলল, সর্বনাশ, এ কথাটা বলবেন না, কোরান নেই, এমন অবস্থাটা মুসলমানরা সহ্য করবে না।

স্বামীজি বললেন, আহা, কোরান নেই মানে কী, কোরান মুছে ফেলা নয়। বেদ-বাইবেল-কোরানের সমন্বয়েই হবে মানব ধর্ম।

আবদুল দু দিকে সজোরে মাথা নেড়ে বলল, উঁহুঃ, এটাও বিপজ্জনক কথা। অন্য ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কোরানকে মিশিয়ে ফেলার কথাও না-পাক।

স্বামীজি বললেন, আমি যা বলতে চাই, তা তুমি বুঝতে পারছ না বোধ হয়। সমগ্র মানবজাতির কথা ছেড়ে দাও, আমাদের এই দেশের পক্ষে, এ দেশের উন্নতি ঘটাতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম, এই দুই মহান মতের সমন্বয়, বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ, একমাত্র আশা।

আবদুল বলল, হিন্দুদের মাথা বললেন আর মুসলমানের দেহ ! তার মানে মুসলমানদের বুদ্ধি নেই, শুধু শক্তি, এ আপনি কী বলছেন স্বামীজি !

স্বামীজি বললেন, আরে দুর, এইভাবে অর্থ হয় নাকি ! এ দুটোই হল প্রতীক।

আবদুল বলল, প্রতীক কজন বুঝবে ?

স্বামীজি তাঁকে প্রতীক বোঝাতে লাগলেন। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন এক জায়গায়। উৎকর্ণ হয়ে বললেন, রাস্তায় একটা ফেরিওয়ালা হাঁকছে। কী বিক্রি করছে দেখো তো !

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে আবদুল বলল, চানা ছোলা।

স্বামীজি বলল, যাও, খানিকটা কিনে আনো তো ? অনেক জ্ঞানের কথা হয়েছে। এখন একটু ছোলাভাজা খাওয়া দরকার। বেশ করে ঝাল দিয়ে নিয়ে এসো—

৬০

এ দেশের সমাজে বড় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে কিছু মোসাহেব দরকার। নিজের মুখে নিজের গুণকীর্তন বার বার ভাল শোনায় না, লোকেও ঠিক বিশ্বাস করে না। চতুর, বাক্যবাগীশ মোসাহেবরা তাদের বাবুর নানান কীর্তিকাহিনী অতিরঞ্জিতভাবে ছড়িয়ে দেয়, তিনি কারুকে পাঁচ টাকা দান করলে সেটা হয়ে যায় পাঁচশো টাকা।

তা অমর দত্তও এখন বড় মানুষ হয়েছে। ক্লাসিক থিয়েটারের দারুণ রমরমা, সেই তুলনায় অন্য সব থিয়েটার প্রায় কুপোকাত বলতে গেলে। অমন গৌরবময় স্টার থিয়েটার, সেখানে যদি বা কোনওদিন ফুল হাউজ হয়, তাতে ওঠে বড় জোর আট-ন' শো টাকা। আর ক্লাসিকের ফুল হাউজে ওঠে বাইশ-তেইশ শো টাকা। এটা নিছক বাগাড়ম্বর না সত্য, তা পরীক্ষা করার জন্য অন্য থিয়েটারের লোকেরা গোপনে টিকিট কেটে ক্লাসিকের শো দেখতে আসে। অবস্থা দেখে তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বর্ধিত মূল্যের টিকিটে সব আসন পূর্ণ তো বটেই, বহু দর্শক আসন না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও রাজি।

অমরেন্দ্রর হাতে এখন প্রচুর টাকা, সে টাকা ব্যয় করতেও তার কার্পণ্য নেই। সঞ্চয়ের মধ্যে কোনও গরিমা নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি দু'হাতে টাকা ছড়ায়, তার চরিত্র অনেক বেশি বর্ণময় হয়ে ওঠে। অমরেন্দ্র তার দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রায়ই বেতন বৃদ্ধি করে। নানান উৎসবে থোক টাকা দেয়, বাইরের কোনও অভাবী মানুষ এসে সাহায্য চাইলেও সে উদার হস্ত।

এক সময় বখামি-নষ্টামিতে যার জুড়ি ছিল না, যে ছিল তার বংশের কলঙ্কস্বরূপ, ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে নেশা ও ব্যাভিচারে মত্ত হয়ে বহু জনের কাছে নিন্দিত হয়েছে। আজ সে সার্থক ও ধনবান, মুছে গেছে তার পূর্বের সব কলঙ্ক। এখন সে যদিও মাত্র ছাব্বিশ বছরের যুবা, তবু সমাজের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছে, শুধু জনপ্রিয় নট নয়, সে এখন সাহিত্যিক ও সম্পাদক, বিদ্বজ্জনের সভায় সে আমন্ত্রণ পায়। যে-কোনও বিষয়ে তার মতামতের বিশেষ মূল্য আছে।

অল্প বয়সে তার সঙ্গী-সাথী ছিল কিছু মাতাল ও লম্পট, এখন বিশিষ্ট ভদ্রজনেরা তার বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠেছে, তারা নিয়মিত তার সঙ্গে এসে আড্ডা দেয়। উত্তম পান-আহার সব অমরেন্দ্রনাথের খরচায় তো বটেই, তা ছাড়াও অমরেন্দ্র অনেকেরই যাওয়া-আসার গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত দিয়ে দেয়। চুনিলাল-মানিকলাল-মদনলাল নামের এইসব শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাটুকারিতা অতি সূক্ষ্ম, প্রশংসার প্রলেপে থাকে তোষামোদ, পরামর্শ দেবার ছলে এরা অপরের নিন্দায় অমরেন্দ্রর কানভারী করে।

অমরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা কিছুতেই খর্ব করা যাচ্ছে না দেখে শত্রুপক্ষের কেউ কেউ তাকে অন্যভাবে নষ্ট করার জন্য তার মোসাহেবদের দলে ভিড়ে পড়েছে। ঠিক সময়ে দংশন করার জন্য তারা সুযোগের সন্ধানে আছে।

বাংলা রঙ্গালয়ের প্রখ্যাত নট-নটীদের মধ্যে একমাত্র অর্ধেন্দুশেখর ছাড়া আর সকলেই একে একে যোগ দিয়েছেন ক্লাসিকে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র চুক্তিতে আবদ্ধ, তিনি শুধু ক্লাসিকের জন্যই নাটক লিখবেন, এখানেই অভিনয় করবেন। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে বেছে নাট্যরূপ দিলেন তার প্রতিটিই দারুণ জনপ্রিয় হল। পরবর্তী মৌলিক নাটক 'পাণ্ডব গৌরব' আরও সার্থক, দর্শকরা যেন ছুটে ছুটে আসছে। অমরেন্দ্রনাথ একই দিনে দুটি শো-এর প্রবর্তন করলেন, দুটি শো-তেই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ।

গিরিশচন্দ্র-অমরেন্দ্রনাথ এই যুগলবন্দী অন্য থিয়েটারওয়ালাদের আরও চক্ষুশূল হল। এই জুটি

ভাঙা দরকার। চুনিলাল নামে একজন মোসাহেব একদিন গিরিশচন্দ্রকে গিয়ে বলল, ও মশাই, কালে কালে হল কী ? ইন্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় কী লিখেছে দেখেছেন ?

গিরিশচন্দ্র নিজ গৃহের বৈঠকখানায় তাঁর আর পাঁচজন চাটুকার নিয়ে বসেছিলেন। মুখ তুলে বললেন, না দেখিনি, কী লিখেছে ?

চুনিলাল পকেট থেকে সংবাদপত্রখানা বার করে বলল, এই দেখুন, লিখেছে যে, বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাইটলি কল্‌ড বাই দা থিয়েটার গোয়িং পাবলিক, দা গ্যারিক অফ দা বেঙ্গলি স্টেজ...

অন্নদা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, গ্যারিক অফ দা বেঙ্গলি স্টেজ, অ্যাঁ !

এককালে ইংল্যান্ডের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিকের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রেরই তুলনা দেওয়া হত, তাঁকে বলা হত বঙ্গের গ্যারিক।

চুনিলাল বলল, স্টেজে লম্প-ঝম্প করলেই বুঝি গ্যারিকের তুল্য অ্যাকটর হওয়া যায় ? অমর দত্ত কি আপনার নখের যুগ্যি ?

গিরিশচন্দ্র বললেন, না, না, অমর বেশ ভালই করে। বয়েসটা কত কম, চেহারায় ছিরি-ছাঁদ আছে, আমাদের এখন বুড়ো হাড়ের খেলা।

এবার অন্য একজন বলল, তা বলে আপনার খেতাব ওর মাথায় কি মানায় ? আপনিই বঙ্গের গ্যারিক, চিরকাল তাই থাকবেন। অমর দত্ত আজ আছে, কাল টিকবে কি না কেউ জানে !

গিরিশচন্দ্র বললেন, কাগজে এখন ছেলে-ছোকরারা লেখে, ওরা বিশেষ কিছু জানে না। অজ্ঞদেরই তো পণ্ডিতি করার দিন এসেছে।

চুনিলাল সঙ্গে সঙ্গে বলল, জানলেও জ্ঞানপাপী। অমর দত্ত তো বলে বলে লেখায় ! এই যে চতুর্দিকে অমরবাবুর এত প্রশংসা বেরুচ্ছে, সবই তো টাকা খাইয়ে লেখানো ! ক্লাসিকের যে-সব হ্যান্ড-বিল বেরোয়, তাতেও বড় বড় করে নিজের নাম লেখা থাকে, আপনার নাম থাকে ছোট অক্ষরে, কোনও কোনওটায় থাকেই না—

আর একজন বলল, সেদিনকে দেখি, খুব গরমের জন্য হলের মধ্যে হাত-পাখা বিলি হচ্ছে। সেই হাত-পাখার একদিকে অমর দত্তর ছবি, আর একদিকে নয়নমণির ছবি। আপনি বুঝি কেউ না !

চুনিলাল বলল, আস্পর্ধা কেমন বেড়েছে জানেন ! আমি নিজের কানে শুনেছি। অমরবাবু একদিন বলছিল, গিরিশবাবুর নাটকই হোক আর যার নাটকই হোক, টিকিট তো বিক্রি হয় আমার নামে ! গিরিশবাবুকে এমনিই রেখেছি, আমি নিজে নাটক লিখলেও সমান চলত !

গিরিশের ভক্তরা হই হই করে উঠল।

একজন বলল, অতি দর্পে হতা লঙ্কা ! সেই যে কথায় আছে না, অতি বাড় বেড়ো নাকো ঝড়ে পড়ে যাবে—অমর দত্তরও সেই অবস্থা হবে !

বিদায় নেবার আগে একটা মোক্ষম টিপ্পনী দিল চুনিলাল। সে গিরিশচন্দ্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, আপনি ক্লাসিকে সামান্য মাস মাইনেতে বাঁধা থাকবেন, এটা একটা লজ্জার কথা নয় ? অমর দত্তর পকেটে টাকা ঝমঝম করছে। আপনার উচিত লভ্যাংশ দাবি করা।

কথাটা গিরিশচন্দ্রের মনে লেগে গেল।

চুনিলাল সন্ধেবেলাতেই গুটি গুটি করে যোগ দিল অমর দত্তের মজলিশে। সেখানে পারিষদরা অমরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চুনিলালও এক কাঠি ওপরে গলা তুলে দিল। বাংলা থিয়েটারে অমর দত্ত যা কীর্তি রেখে যাচ্ছে, তা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

খানিক বাদে চুনিলাল লক্ষ করল, মানিকলাল নামে এক স্যাঙাৎ বুদ্ধিতে আর সবাইকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে। এই মানিকলাল নিশ্চিত মিনার্ভা থিয়েটারের চর। কথার মারপ্যাঁচে সে অমর দত্তর মুখ দিয়ে ইংরেজ সরকার বিরোধী কোনও মন্তব্য বার করার চেষ্টা করছে।

অমর দত্ত কট্টর ইংরেজভক্ত। কথায় কথায় সে বলে, আমি রাজানুরক্ত প্রজা। আজ বুয়র যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠেছে। এখন এ আলোচনা সর্বত্র। বুয়র যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে বটে, কিন্তু দিগ্বিজয়ী ইংরেজের অতুলনীয় পরাক্রমের যে ভাবমূর্তি ছিল, তাতে ধাক্কা লেগেছে প্রচণ্ড।

উর্বর ভূমি ও মূল্যবান খনিজের আকর্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছে দু-তিন শতাব্দী ধরে। একদল ওলন্দাজ সেখানে যায় প্রথমে, স্থানীয় হটেনটট মেয়েদের বিয়ে করে সেখানে একটি মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়, তাদেরই বলে বুয়র। পরে কিছু কিছু দেশত্যাগী জার্মান, ফরাসি, সুইডিশও এদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর ইংরেজরা গিয়ে সেখানে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। স্বাধীনতাপ্রিয় বুয়ররা ইংরেজদের অধীনে থাকতে রাজি হয়নি, তারা ইংরেজ এলাকা থেকে সরে গিয়ে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভাল-এ নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছিল। বেশ কিছুকাল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন অরেঞ্জ নদীর তীরে পাওয়া গেল একখণ্ড হিরে, আরও কিছু বছর পর ট্রান্সভালে পাথুরে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একদল দেখতে পেল ঝকঝক করছে স্বর্ণরেণু। হিরে ও সোনার লোভে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যেতে লাগল ভাগ্যান্বেষীরা। ইংরেজরা এবার ওইসব অঞ্চলেরও দখল নিতে চাইল। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে মহা শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীকে দু' দু'বার পরাজয় স্বীকার করে পিছু হটে আসতে হয়েছিল। তাতেই সারা বিশ্ব সচকিত হয়ে ওঠে। জার্মানি থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে বটে, তবু সামান্য বুয়রদের এত পরাক্রম ! শেষ পর্যন্ত লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে বিশাল ইংরেজ বাহিনী বুয়রদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, নারী ও শিশুদেরও হত্যা করতে করতে এগিয়েছে। বেশ কয়েক মাস গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি বুয়রেরা। অতি সম্প্রতি তারা শান্তির আবেদন জানিয়ে সন্ধি করতে চেয়েছে।

যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে বটে ইংরেজরা, কিন্তু তাদের গৌরবে লেগেছে অনেকখানি কালির দাগ। ভারতীয় নেতৃবর্গ বরাবর সমর্থন করেছে ইংরেজদের, কলকাতায় যুদ্ধ চালাবার সাহায্য হিসেবে চাঁদাও তোলা হয়েছে অনেক টাকা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্টার মোহনদাস গান্ধী ইংরেজ প্রভুদের পক্ষে গঠন করেছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কিন্তু সম্প্রতি অন্য একটি চিন্তার তরঙ্গও খেলে যাচ্ছে কিছু কিছু ভারতীয়ের মনে। সামান্য বুয়ররা যদি ইংরেজ শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, তা হলে এত বড় ভারতবর্ষের মানুষ তা পারবে না কেন ? ভারতীয়রা এককাট্টা হয়ে ইংরেজদের এক দারুণ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলতে পারে না ? এরকম চিন্তা আগে কেউ প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেনি।

মানিকলাল বলল, মশাই, এই বুয়ররা ইংরেজদের জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছে। খড়ের দেবতা, বুঝলেন, বাইরে এত জাঁকজমক, ভেতরে ভুষি মাল। অনেক দিন ধরে আমাদের সীমান্তে রুশ আক্রমণের কথা শুনে আসছি। রুশ জুজুর কথা উঠলেই ইংরেজরা কেমন ভয় পায় দেখেছেন ? রুশদের শক্তি নির্ঘাত বেশি ! ওদিকে ফরাসিদের সঙ্গে লড়ালড়ি করতে গিয়ে ইংরেজরা মাঝে মাঝেই লেজেগোবরে হয়। আর একটা নেপোলিয়ান আসুক, ইংরেজদের একেবারে দুরমুশ করে দেবে। জার্মানিরাও মুখিয়ে আছে। আমাদের দেশে ইংরেজরা আর কতদিন লাঠি ঘোরাবে।

অমর জিভ কেটে বলল, আরে ছি ছি, অমন কথা উচ্চারণও করবেন না। ইংরেজ আমাদের লক্ষ্মী। ইংরেজ রাজত্বে আমরা শান্তিতে খেয়ে পরে বেঁচে আছি। এ রাজত্বে সুবিচার আছে। এক হতচ্ছাড়া লর্ড মেয়োকে হত্যা করল, বিচারপতি নর্মানকে একজন মারল, ভাবুন তো স্পর্ধা, রাজার জাতের গায়ে হাত ! সরকার কিন্তু খুনিদের কুকুরের মতন গুলি করে মারেনি। বিচারের পর শাস্তি দিয়েছে। তা হলেই বুঝুন !

মানিকলাল বলল, ওসব ন্যায় বিচার তো দেখানেপনা। গ্রামে গঞ্জে কত যে অত্যাচার চলছে, তার খবর ক'জন রাখে ?

অমর বলল, রাজার জাতের কি অত খুঁটিনাটি দোষ ধরতে আছে ! আমাদের জমিদাররা অত্যাচার করে না ! আপনার আমার বাড়ির চাকর যদি ঠ্যাঁটাপনা করে, আমরা তাদের চাবকে, লাথিয়ে দূর করে দিই না ? সেই তুলনায় ইংরেজ সরকার আর কতটা অত্যাচার করে ?

অমরের মুখ দিয়ে ইংরেজ-বিরোধী কথা বার করা যাচ্ছে না দেখে মানিকলাল অন্য চাল দিল। সে পরম হিতৈষীর ভাব করে বলল, অমরবাবুর সঙ্গে তো অনেক সাহেবসুবোর আলাপ আছে। বড় বড় ইংরেজরা আপনাকে যা খাতির করে, এমনটি আর কোনও অ্যাক্টর-ম্যানেজারের ভাগ্যে

জোটেনি। এটা আমাদের গর্ব। কী বলো হে, তাই না ?

অন্যরা সকলেই বলল, বটেই তো, বটেই তো।

অমর বলল, একটা ভোজসভায় লাটসাহেবের পাশে আমায় বসতে দিয়েছিল। লাটসাহেব আমাকে বাংলা থিয়েটারের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আপনারা বোধ করি জানেন না। প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রানসিস ম্যাকলিন বাহাদুর আমাদের অভিনয় দেখেছেন, প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছেন ?

মানিকলাল বলল, তা হলে এক কাজ করুন না। একদিন ক্লাসিক থিয়েটারে লর্ড কার্জনকে অভিনয় দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান। লর্ড কার্জন আপনার অভিনয় দর্শন করতে এলে আপনার সুনাম, ক্লাসিকের সুনাম দশ গুণ বেড়ে যাবে !

অমর আমতা আমতা করে বলল, লর্ড কার্জন ! তাঁকে কখনও স্বচক্ষে দেখিনি। শুনেছি তাঁর খুব দেমাক, হবে না কেন, কত বড় বংশের মানুষ ! নেটিভদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন না। আমি লাটসাহেব বলতে বুঝিয়েছি ছোটলাট, স্যার জন উডবার্ন। কী মিষ্টভাষী, কী সহৃদয় মানুষ, প্রায় তিন কোয়ার্টার কাল তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

মানিকলাল বলল, তা হলে ছোটলাটকেই আনার বন্দোবস্ত করুন। তিনিই তো বঙ্গেশ্বর।

অমর বলল, এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর এক গাঁয়ে মাথা ব্যথা। হচ্ছিল রাজনীতির আলোচনা, এর মধ্যে আবার ক্লাসিককে টেনে আনলেন কেন ?

মানিকলাল আর পাঁচজনের সমর্থন নিয়ে জোর দিয়ে বলতে লাগল, না, না, ছোটলাটকে আনতেই হবে। আপনি বললে তিনি অবশ্যই রাজি হবেন। ক্লাসিকে দলবল নিয়ে ছোটলাটবাহাদুর এলে অন্য সব থিয়েটারের থোঁতা মুখ আরও ভোঁতা হয়ে যাবে। আমরা তা দেখে মজা লুটব।

সকলের উৎসাহবাক্যে অমরও উত্তেজিত হয়ে উঠল।

চুনিলাল প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি, মানিকলালের আসল মতলবটা কী ? ছোটলাটকে এনে ক্লাসিকের মান বাড়াবার জন্য তার এত গরজ কেন ? একটু পরে কারণটা বুঝতে পেরে সে আড়ালে মুখ মুচকে হাসতে লাগল।

অমর একবার গোঁ ধরলে ছাড়ে না। কথা যখন উঠেছে, তখন ছোটলাটকে আনতেই হবে। ইন্ডিয়ান মিরার-এর সম্পাদককে ধরে ছোটলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হল। বেলভেডিয়ারে স্যার জন উডবার্ন অমর দত্তকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, পূর্ব পরিচিতের মতন অন্তরঙ্গভাবে কথা বললেন তার সঙ্গে। স্যার জন উডবার্ন ক্লাসিক থিয়েটারে শেক্সপিয়ারের নাটকের বাংলা নাট্যরূপ দেখতে যেতে রাজি।

গিরিশচন্দ্র অনূদিত ম্যাকবেথের অভিনয় হবে। একটি দিন নির্দিষ্ট হবার পর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল বড় করে। শহরের দেওয়াল ছেয়ে গেল পোস্টারে, হ্যান্ডবিল বিলি হল হাজার হাজার।

এইবার শুরু হল মানিকলালদের তৎপরতা। বেনামে গোছা গোছা চিঠি যেতে লাগল ছোটলাটের দফতরে। সেই সব চিঠি ক্লাসিকের নিন্দা-কুৎসাপূর্ণ। ক্লাসিক থিয়েটারের পরিবেশ যে কত দূষিত, সেখানে অভিনয়ের নামে যে শুধু বেলেল্লাপনা চলে, কোনও ভদ্রশ্রেণীর দর্শক সেখানে যায় না, এইসব লেখা হতে লাগল সাত কাহন করে।

বেলভেডিয়ার থেকে স্যার জন উডবার্নের বকলমে একটা চিঠি এল। সেক্রেটারি লিখেছে, বাংলার গভর্নর অবগত হয়েছেন যে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীগণ ভদ্র বংশসম্ভূতা নহে, তারা সব চরিত্রহীনা যুবতী। এই রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। এ সব সংবাদ সত্য কিনা অবিলম্বে জানানো হোক, আপাতত ছোটলাট বাহাদুরের পক্ষে থিয়েটার দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়।

চিঠি পেয়ে অমর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। শুধু যে ছোটলাটের আগমনবার্তা বহুল-বিজ্ঞাপিত হয়েছে তাই-ই নয়, এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, বাকি সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে তিন দিন আগে। এখন অমর দত্তর মান-সম্মান ধুলোয় লুটোবে,

সকলেই মনে করবে, সে মিথ্যেবাদী। আনন্দে নৃত্য করবে তার শত্রুপক্ষ।

থিয়েটারের মেয়েরা চরিত্রহীনা ! ভদ্রঘরের মেয়েরা রঙ্গমঞ্চে নাচতে আসবে নাকি ? খোদ ইংল্যান্ডের থিয়েটারের মেয়েরা বুঝি সব সতীসাধ্বী ? ঢের জানা আছে। নাট্যকলা ও অভিনয় দর্শনের সময় নট-নটীদের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী ? বিলিতি সমাজেও এই একই অবস্থা।

রাগে-অপমানে একা একা ফুঁসতে লাগল অমর। তার চাটুকারেরা এখন আর কেউ ধারে কাছে নেই। এই বৃহস্পতিবারের অভিনয়ে ছোটলাট যে আসবেন না, সে সংবাদ এর মধ্যেই রটনা হয়ে গেছে।

ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল নয়নমণি, সে একটি দশ-এগারো বছরের বালিকার হাত ধরে আছে। সে এসব বিষয়ে কিছুই জানে না।

নয়নমণিকে ইদানীং খানিকটা সমীহ করে অমর। এ যুবতীকে নিজের অঙ্কশায়িনী করার অনেক চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়েছে। সে বুঝে গেছে, নয়নমণি অন্য ধাতুতে গড়া। এখন অনেকটা বন্ধুর মতন সহজ সম্পর্ক। নয়নমণি সরলা ঘোষালের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করে, সেই সুবাদে ঠাকুর পরিবারের অনেকেই এখন ক্লাসিকে থিয়েটার দেখতে আসে।

নয়নমণি বলল, অমরবাবু, এই মেয়েটির নাম পুঁটি। একে আপনার থিয়েটারে একটা কাজ দিতে হবে।

অমর বালিকাটিকে দেখল ভাল করে। মাথায় উস্কোখুস্কো চুল ধুলোমাখা, খুব সম্ভবত উকুনে ভর্তি। অতিশয় রোগা, না খেতে পাওয়া চেহারা ; একটা শতচ্ছিন্ন শাড়ি শরীরে জড়ানো, শুধু চক্ষু দুটি হরিণীর মতন ডাগর, ভয়ে সে যেন কুঁকড়ে আছে।

অমরের মাথায় এখন অনেক চিন্তা, অন্য কেউ এ সময়ে তাকে বিরক্ত করতে এলে, সে 'দূর হয়ে যা' বলে চিৎকার করে উঠত। কিন্তু নয়নমণির সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করা যায় না। মেজাজ দমন করে সে জিজ্ঞেস করল, একে কোথায় পেলি ?

নয়নমণি বলল, রাস্তায় ভিক্ষে করছিল। আজই আসার পথে দেখে গাড়িতে তুলে নিলাম। মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে ওর বাড়ি। সাত বোন, তিন ভাই। মা নেই, ওর বাবা ওকে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। তিন দিন ধরে রাস্তাতেই আছে মেয়েটা।

অমর বলল, বেড়াল পার করে গেছে। তা এরকম তো আরও কত আছে। রাস্তা থেকে কোনও মেয়েকে তুলে আনলেই কি তাকে থিয়েটারের কাজ দেওয়া যায় !

নয়নমণি বলল, আমিও তো রাস্তা থেকেই এসেছি। ওকে আমি শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব। গলার আওয়াজ ভাল।

অমর বলল, এ মেয়েকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। এত রোগা মেয়ে থিয়েটারে চলে না। তোর যদি দয়া হয়ে থাকে, ওকে অন্য কাজ দিচ্ছি। আমার বাড়িতে বাসন মাজার জন্য একজন দরকার। আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দে। খেয়ে পরে থাকবে।

নয়নমণি দৃঢ় স্বরে বলল, না। একবার দাসী-বাঁদির কাজ জুটিয়ে দিলে সেই কাজই করতে হবে সারাজীবন। ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে কি না দেখা যাক না চেষ্টা করে। যদি গুণ থাকে— একটু ভাল করে খেতে দিতে পারলেই রোগা চেহারা সেরে যাবে। আমিও এক সময় অমনি রোগা ছিলাম।

অমর জিজ্ঞেস করল, যতদিন নিজের পায়ে না দাঁড়ায়, ততদিন থাকবে কোথায় ?

নয়নমণি বলল, আমার কাছে রেখে দেব। কেউ যাতে ওকে নষ্ট না করে, তা আমি দেখব।

অমর এবার হো-হো করে হেসে উঠল। অকস্মাৎ সেই হাসির মর্ম বুঝতে পারল না নয়নমণি, বিস্মিতভাবে চুপ করে গেল সে।

অমর বলল, তোর মতন মেয়েও তো আছে থিয়েটারে। তা ক'জন জানে ? এই পত্রখানা দ্যাখ, ও তুই তো ইংরেজি পড়তে পারবি না, এতে কী লিখেছে জানিস ? ক্লাসিকে ছোটলাটের আসার কথা

ছিল, উনি আসতে পারছেন না, তার কারণ, উনি শুনেছেন, ওঁকে শোনানো হয়েছে, আমাদের বাঙালি চুকলিখোররা ওঁর কান ভাঙিয়েছে যে এখানকার সব অ্যাকট্রেসরা কুলটা। ইচ্ছে করে, তোকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখাই। এ মেয়ে যদি কুলটা হয়, তবে সতী কে?

নয়নমণি মৃদু স্বরে বলল, থিয়েটারের মেয়েরা যদি কুলটা হয়, তবে পুরুষরা কী? তাদের নিয়ে বুঝি প্রশ্ন ওঠে না?

অমর আবার হাসতে হাসতে বলল, পুরুষমানুষরা সব কুকুরে পেচ্ছাপ করা ধোওয়া তুলসিপাতা।

নয়নমণি বলল, পুরুষ ছাড়া কি মেয়েরা নষ্ট হতে পারে? এক হাতে তালি বাজে? এসব কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। লাটসাহেব না এলেই বা ক্ষতি কী? তাকে খাতির করে ডেকে আনবারই বা কী দরকার! আপনার থিয়েটারে কি দর্শক কমেছে?

ঘরে আরও দু'তিনজন লোক ঢুকে পড়ায় সেদিনকার মতন আর কথা হল না।

বৃহস্পতিবার দিন অভিনয় শুরু হবার আগে অমর দত্তকে মঞ্চে এসে ক্ষমা চাইতে হল। বেলভেডিয়ার থেকে পূর্বে প্রেরিত আরও দু'-তিনখানা পত্র থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করে তাঁকে প্রমাণ দাখিল করতে হল যে ছোটলাট সত্যিই আসার জন্য কথা দিয়েছিলেন, মাত্র দু'দিন আগে বাতিল করেছেন। অন্য থিয়েটারের ভাড়া করা কিছু লোক দর্শকদের মধ্যে মিশে থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ধ্বনি তুলল।

এ রাতের অভিনয়ও তেমন জমল না। নির্দিষ্ট কয়েকটা জায়গায় হাততালি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু যারা অভিনয় করে, তারা ঠিক বোঝে, কোথায় তাল কেটে যাচ্ছে। নিজের অভিনয় আশানুরূপ না হলেই অমর দত্তর মেজাজ খিঁচড়ে যায়।

লাটসাহেবের হুজুগ তুলে অমর দত্তকে অপদস্থ করায় মানিকলালের দল খুশি। এবার শুরু হবে চুনিলালের খেলা। এখন অমরের মন দুর্বল হয়ে আছে, মেজাজ ক্ষিপ্ত, এই তো সময়!

নিজের ঘরে মদের বোতল খুলে একা বসে আছে অমর, এই সময় চুপিচুপি চুনিলাল সেখানে হাজির। গলায় মধু মিশিয়ে সে বলল, মাত, একেবারে মাত। আমি তো গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিলুম, দর্শকদের সব কথা শুনেছি। সবাই বলতে বলতে গেল, অমর দত্ত একাই একশো। অমর দত্তর কী রূপ, কী তেজ, কী কণ্ঠস্বর, এমনটি আর আগে কখনও দেখিনি। টিকিটের পাই-পয়সা পর্যন্ত উসুল হয়ে যায়। দু-চারজন যে গণ্ডগোল করেছিল, তারা মিনার্ভার ভাড়া করা লোক!

অমর ভুরু কুঁচকে বলল, মিনার্ভা থেকে তাদের পাঠিয়েছে?

চুনিলাল বলল, আলবাত! আমি নিজের কানে শুনেছি। অন্য দর্শকরা তাদের এই মারে কি সেই মারে। আর একটু হলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। এখন সর্বত্র আপনার জয়জয়কার। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখলেন, গিরিশবাবু আজ আসেননি?

অমর বলল, উনি তো রোজ আসেন না। এখন পার্টও করেন না।

চুনিলাল বলল, তবু আজকের দিনে, তাঁরও কি উচিত ছিল না স্টেজে আপনার পাশে দাঁড়ানো? উনি ক্লাসিকের মাইনে খান, সংকটের সময় দায়িত্ব নেবেন না? গিরিশবাবুর ভাবখানা যা দিন দিন দেখছি, উনি মনে করেন, ক্লাসিকের উঠতি-পড়তি যা হয় হোক, মাস গেলে ওঁর টাকাটা পেলেই হল। বছরে চারখানা নতুন নাটক দেবার চুক্তি, ক'খানা দিয়েছেন?

অমর বলল, দেখুন চুনিবাবু, গিরিশবাবুর ভরসায় এখন আমার এই থিয়েটার চলে না। ওনাকে রেখেছি, তার কারণ, উনি বাংলা থিয়েটারের আদি গুরু, ওঁকে সম্মান দেখানো উচিত। বয়েস হয়েছে, এখন আর তেমন লিখতে পারেন না, অভিনয়েও তেমন দাপট নেই, তাতেই বা কী আসে যায়। উনি আছেন থাকুন, এই তো যথেষ্ট। ওঁকে টাকা দিতে আমার গায়ে লাগে না।

চুনিলাল ভাবাচ্ছন্ন হয়ে বলল, আপনি কত বড় উদার মানুষ, তাই এই কথা বললেন আহা! এমন নিঃস্বার্থ কথা এ যুগে কে বলে? তবে গিরিশবাবু কী বলে বেড়াচ্ছেন জানেন? তাঁর নামের জোরেই নাকি দর্শক আসে। উনি বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু কূটবুদ্ধি কম নয়। আপনাকে নতুন নাটক দেন

না, কিন্তু গোপনে গোপনে মিনার্ভাকে নাটক লিখে দিচ্ছেন ঠিকই। 'পাণ্ডব গৌরব'-এর রিহার্সালের সময় উনি ভীমের পার্টটা ওঁর ছেলে দানিকে দিতে চেয়েছিলেন মনে আছে?

অমর বলল, এ নাটকে ভীমের পার্ট সব চেয়ে বড় পার্ট। সে পার্টে দর্শকরা আমাকেই চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

চুনিলাল বলল, উনি কিন্তু আপনাকে দমিয়ে নিজের ছেলে দানিকে এখন ওপরে তোলার জন্য ব্যস্ত!

অমর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে বলল, দানি রাগ করে স্টারে চলে গেছে। সেখানে গিয়ে সে যদি কেরদানি দেখাতে পারে তো দেখাক। কিন্তু গিরিশবাবু মিনার্ভার জন্য নাটক লিখে দিচ্ছেন, আপনি ঠিক জানেন?

চুনিলাল বলল, এ আবার নতুন কথা নাকি? এক দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, অথচ গোপনে গোপনে অন্য দলের জন্য নাটক লিখে দিয়েছেন, এমন কতবার হয়েছে! আপনি খবর নিন অমরবাবু, মিনার্ভা অনেক টাকা ঢালছে। গিরিশবাবু সেখানে গেলেন বলে!

অমর নিজের মাথার চুল মুঠো করে চেপে ধরে বলল, বটে! আমার সঙ্গে ফেরেববাজি! ওই বুড়ো ভামকে আমি দেখাচ্ছি মজা।

পরের দিনই এলেন গিরিশবাবু। তাঁর জন্য একটি পৃথক ঘর থাকে, ইদানীং তিনি মহড়াতেও অংশ নেন না, অভিনয় শিক্ষা দেবার দায়িত্বও অমরের ওপর, গিরিশবাবু এসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে চলে যান। অমর সে ঘরে ঢুকে আরও যে তিনজন আড্ডাধারী ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে কঠোরভাবে বলল, ওঁর সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে, আপনারা সরে পড়ুন।

গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে টানতে টানতে গিরিশচন্দ্র বললেন, বসো অমর, হঠাৎ এমন কী জরুরি কাজ পড়ল?

বসল না অমর, একটা চেয়ারের পেছন ধরে দাঁড়িয়ে, বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করল, আপনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিচ্ছেন?

গিরিশচন্দ্র একগাল হেসে বললেন, ও, এই কথা? কারা এসব রটায়? দেখো, যখনই কেউ নতুন করে একটা নতুন থিয়েটারের দল খোলে, তখন প্রথমেই তারা আমার কাছে এসে সাধাসাধি করে। এ রকম তো কতকালই চলছে!

অমর বলল, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। মিনার্ভায় যোগ দিচ্ছেন?

গিরিশচন্দ্র হাসিটি বজায় রেখে বললেন, আমি পেশাদার থিয়েটারওয়ালা। এক দলে কাজ করছি, অন্য দল এসে যদি বেশি টাকার থলে নিয়ে চোখের সামনে নাড়ায়, তা হলে কি মাথার ঠিক রাখা যায়? একজন পেশাদারের পক্ষে তাতে রাজি হওয়াও দোষের কিছু নয়। তুমি আমায় বড় কম টাকা দিচ্ছ, অমর!

অমর ভুরু তুলে বলল, কম টাকা! তিনশো টাকার বেশি কোনও থিয়েটারে আর কেউ পায়? তার বিনিময়েই বা আমি কী পাচ্ছি? বছরে চারখানা নাটক দেবার কথা, কটা দিয়েছেন? পুরনো নাটক দিয়ে প্রায়ই আমাকে চালাতে হয়।

গিরিশচন্দ্র বললেন, অনেক লিখেছি। স্টেজে অনেক দাপাদাপি করেছি। এখন আর ওসব করতে হবে কেন? আমার নামটাই তো যথেষ্ট। আমার নামে দর্শকরা আসে। অমর, আমার ওই মাস মাইনেতে পোষাচ্ছে না। তুমি এখন থেকে আমাকে অংশীদার করে নাও, লাভের একটা অংশ আমার চাই।

অমর আহত বিস্ময়ে বলল, লাভের অংশ! অনেক খেটেখুটে, নিজের রক্ত জল করে আমি ক্লাসিককে দাঁড় করিয়েছি। যে-কোনও নাটক জমিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার আছে। লোকে আমাকে দেখতে আসে। আমার জ্বরজ্বারি হলে দু-তিন নাইট অ্যাপিয়ার করতে না পারলে টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। আপনার নামে দর্শকরা আসে? হুঃ! এসব কে বুঝিয়েছে আপনাকে? আপনাকে আমি রেখেছি, সম্মান দেখাবার জন্য। আপনি নটগুরু, আমি সাষ্টাঙ্গে আপনার পায়ের

ধুলো চাটতেও রাজি আছি। আপনি ওই সম্মানের আসনেই থাকুন, জনপ্রিয়তার খোয়াব দেখবেন না।

গিরিশচন্দ্র বললেন, সম্মান কি আমি ধুয়ে খাব ? তুমি যদি লাভের বখরা দিতে না চাও, যে আমায় বেশি টাকা দিয়ে ডাকবে, আমি সেখানেই যাব।

রাগে জ্বলে উঠে অমর বলল, না, আপনি যেতে পারেন না। আমার সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি আছে, মাস মাস তিনশো টাকা ছাড়াও আপনাকে গুচ্ছের বোনাসের টাকা দিয়েছি। চুক্তি ভাঙলে আপনি আইনের ফাঁসে পড়বেন !

গিরিশচন্দ্র বললেন, ওসব আইন-টাইন আমি কখনও গ্রাহ্য করিনি।

অমর বলল, আর একটা সত্যি কথা বলব ? আপনার নাটক তো অন্য থিয়েটারেও চলে, সেখানে ক্লাসিকের মতন দর্শক যায় না কেন ? আপনি বরাবরই দল ভাঙাভাঙিতে ওস্তাদ। এ পর্যন্ত কতবার কত দল ছেড়েছেন, তার ইয়ত্তা আছে ! আপনার অত সাধের স্টার থিয়েটার, প্রায় আপনার নিজের হাতে গড়া, সেখানেও আপনি টিকতে পারেননি কেন ? অন্য কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে আপনার সহ্য হয় না। ষড়যন্ত্র করে আপনি বড় বড় দলগুলো ভেঙেছেন, কত মালিকের সর্বনাশ হয়ে গেছে, কত নটনটী পথের ভিখিরি হয়েছে, কিন্তু আপনার গায়ে কখনও আঁচড়ও লাগেনি ! এখন মিনার্ভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্লাসিককে চোরাগোপ্তা দিতে চান, তাই না ?

গিরিশচন্দ্র বললেন, অমর, তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আজকাল তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করো। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ, ভুলে যাচ্ছ।

অমর বলল, না, মোটেই ভুলিনি। আপনি নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আমি সামান্য অভিনেতা হিসেবে আপনাকে মাথায় তুলে রাখতে রাজি আছি। কিন্তু ম্যানেজার হিসেবে আপনার অন্যায় আবদার বরদাস্ত করতে রাজি নই। ভাল কথা বলছি শুনুন, আপনাকে আর খাটাখাটনি করতে হবে না, থিয়েটারেও আসতে হবে না। বাড়িতে বসে বিশ্রাম নিন। নাটক লিখতে ইচ্ছে হয় লিখবেন, নয়তো লিখবেন না। মাস মাস আপনার মাইনের টাকা বাড়িতে ঠিক পৌঁছে যাবে। এ বুড়ো বয়েসে আর অন্য দলে যোগ দিয়ে ধাস্টামো করতে যাবেন না !

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস পায়নি কেউ কখনও। তাঁর চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ ধারণ করল, বৃদ্ধ সিংহের মতন তিনি একবার মাথা ঝাঁকালেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি যদি আজই চলে যাই, অন্য দলে যোগ দিই, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে ?

অমর দর্পের সঙ্গে বলল, তা হলে চুক্তিভঙ্গ করার দায়ে আমি আপনার নামে মামলা করতে বাধ্য হব।

গিরিশচন্দ্র ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন, অমরের কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, ঠিক আছে, অমর, এরপর তোমার সঙ্গে আমার আদালতে দেখা হবে।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র। এতক্ষণ দু'জনেরই কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠেছিল বলে সমস্ত নাট্যকর্মীরা ভিড় করে এসে শুনছিল। তারা আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল গিরিশচন্দ্রের দিকে। যে যে-থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত থাকুক না কেন, গিরিশচন্দ্রের সামনে সকলেই শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে। আজ গিরিশচন্দ্রের এবংবিধ অপমানে তারা জড়বৎ হয়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র কারুর দিকে তাকালেন না, হাতের ছড়িটি ঘোরাতে ঘোরাতে রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অমরও গটগটিয়ে চলে এল নিজের কক্ষে। এ সময় তার সামনে যাওয়া আর তোপের মুখে পড়া একই কথা। এখন সে কিছুক্ষণ নিজের মনে গজরাবে। দু'এক ঢোঁক মদ্যপান করতে করতে আয়নার সামনে মুখবিকৃতি করবে নানা রকম। আজ আর কেউ কোনও কাজের কথাও বলতে যাবে না তাকে।

একমাত্র নয়নমণিরই সাহস আছে, সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। অমরের ঘরে ঢুকে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। অমর মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, রাগে ফেটে পড়ল না, চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। মঞ্চে

অভিনয়ের সময় ছাড়া মহড়াতেও সে সাজগোজ বা প্রসাধন করে না। একটা কস্তা ডুরে ডুরে শাড়ি পরা, আঁচলটা কাঁধে জড়ানো, মাথার চুল খোলা, চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট। হাত দুটি নিরাভরণ, একটি হাত টেবিলের ওপর রাখা, নর্তকীর লাবণ্যময় আঙুল, শুধু আঙুলগুলিই দেখতে ভাল লাগে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমর বলল, তুই বুঝি আমাকে বকতে এসেছিস ?

নয়নমণি বলল, না, আমি, আমরা সকলে কষ্ট পেয়েছি, তাই জানাতে এলাম। আপনি থিয়েটারের মালিক, যাকে খুশি রাখবেন, যাকে খুশি তাড়াবেন। কিন্তু ইনি গিরিশবাবু, আমাদের সবার পিতার মতন, তাঁকে কি এমনভাবে বিদায় করে দেওয়া যায় ?

অমর কাতরভাবে বলল, আমি কিছু অন্যায্য কথা বলেছি ? কিছু কাজ করবেন না, শুধু টাকা নেবেন, আরও বেশি টাকা চাইবেন, তলে তলে আমার সর্বনাশ করার চেষ্টা চালাবেন, সব আমি সহ্য করব ! আর কারুর নাম-ডাক হলে উনি সহ্য করতে পারেন না। আমি নিজের চেষ্টায় এতখানি উঠেছি, এবার আমি নিজে নাটক লিখব, সেই নাটকও দেখার জন্য দর্শকরা হামলে পড়বে। দেখিস, এটা আমার চ্যালেঞ্জ !

নয়নমণি বলল, আপনার সঙ্গে ওঁর মন কষাকষি, সে সব কথা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বলতে পারতেন। সবার সামনে ওঁকে অপমান করা কি ঠিক হল ?

অমর বলল, তুই কি সবার হয়ে আমাকে ধমকাতে এসেছিস ? সবাই এখন আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবে !

নয়নমণি বলল, সে রকম কিছু না। আমার নিজেরই ভেতরটা কেমন করছে, আমি কেন ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ে পড়লুম না। ওর পা আঁকড়ে ধরে বলতে পারতাম, আপনি যাবেন না, আমাদের ছেড়ে যাবেন না !

অমর বলল, তুই পায়ে ধরলেও উনি ঠেলে দিতেন। ওঁর দয়া মায়া নেই। টাকার গন্ধ পেয়েছেন যে ! ক্লাসিক থেকেও উনি টাকা কি কম পেয়েছেন ? তবু ক্লাসিকের ওপর ওঁর কোনওদিনই টান হয়নি। সেদিনকে, ছোটলাট বাহাদুরের যে আসার কথা ছিল, এলেন না, আমায় কত অপমান সহ্য করতে হল, সেদিন তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন না ? আমাকে দুটো সান্ত্বনা বাক্যও তো বলতে পারতেন !

নয়নমণি বলল, আপনি যে ছোটলাটকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেটা হয়তো ওঁর পছন্দ হয়নি। ছোটলাটকে ডাকার আগে কি গিরিশবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

অমর বলল, আগে জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু পরে জেনেও তো উনি আপত্তি জানাননি !

নয়নমণি বলল, তখন আর আপত্তি জানিয়েই বা কী লাভ ? তখন আপনি মেতে উঠেছেন, চতুর্দিকে বিজ্ঞাপন, লাটবাহাদুর আসবেন বলে কত রকম আদিখ্যেতা। আমাদের বাংলা থিয়েটারে সাহেব-সুবোদের ডাকাডাকির এ হ্যাংলামি কেন ? আপনি যেচে এ অপমান গায়ে মাখলেন।

অমর একটুক্ষণ চেয়ে রইল নয়নমণির মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুই আগের দিনও এই কথাটা বলেছিলি ! ছোটলাটকে ডাকা হল, এটা তুইও চাসনি ?

নয়নমণি দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, শুনেই আমার কেমন ঘেন্না ঘেন্না করছিল। কেন সাহেবদের করুণার ভিখিরি হতে হবে আমাদের ?

অমর বলল, তুই বুঝি সরলা ঘোষালের কাছে যাতায়াত করে এই সব কথা শিখেছিস ? কথাটা হয়তো ঠিক। কে আমাকে উস্কে দিল, অমনি আমি নেচে উঠলাম। নয়ন, তোর সঙ্গে আগে পরামর্শ করলে আমাকে এমন গুখুরির কাজ করতে হত না। এখন থেকে তোর বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে চললে হয়তো আমার ভালই হবে। তোর তো কোনও স্বার্থজ্ঞান নেই।

নয়নমণি বলল, স্ত্রীলোকের পরামর্শ নিয়ে আবার কোনও পুরুষমানুষ চলে নাকি ? আমি এক তুচ্ছ নারী, আমার আর কী বুদ্ধি আছে ! আজকে আমার কথা শুনে একটু নরম হয়েছেন, কাল আপনার পাঁচজন বন্ধু আবার আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে !

অমর হতাশভাবে বলল, কে যে বন্ধু, কে যে শত্রু, আজও চিনলাম না ! নয়ন, বলতে পারিস, যার

আমি কোনও ক্ষতি করিনি, বরং যথাসাধ্য যত্নআত্তি করি, সেও কেন আমার শত্রুতা করে ?

নয়নমণি চুপ করে রইল।

মদের বোতলে একটা চুমুক দিয়ে অমর জিজ্ঞেস করল, তোর সেই কুড়ুনি মেয়েটা কোথায় গেল ? সেই পুঁটি, সে আছে এখনও ?

নয়নমণি বলল, তাকে আমার কাছে রেখেছি। দুটো একটা গান শেখাচ্ছি। মনে হয় পারবে।

অমর বলল, নিয়ে আসিস, সখীদের দলে ভিড়িয়ে দেব, তুই অনুরোধ করেছিস যখন—।

একটু থেমে সে আবার বলল, নয়ন, জানি কোনও দিন তোর ধরা-ছোঁওয়া পাব না। তোর মনেরও তল পেলাম না। তুই ভগবানের এক বিচিত্র সৃষ্টি।

নয়নমণি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এবার যাই।

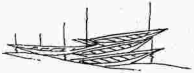

৬১

শরৎ নামে একজন শিষ্য একটি প্রকাণ্ড রুইমাছ নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে। বেলুড় মঠের ঘাটে এসে ভিড়েছে নৌকো, শরতের ভৃত্য ঝুড়িতে করে সেই মাছ মাথায় নিয়ে নামছে। ঘাটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ, তিনি সেই মাছ দেখে আঁতকে উঠলেন। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে তিনি ফিসফিস করে শরৎকে বললেন, মশাই করেছেন কী ? এত বড় মাছ এনেছেন, আপনার গুরুর শরীর কী রকম খারাপ জানেন না ? মাছ খাওয়া একেবারে নিষেধ। কেউ যেন দেখতে না পায়, ফিরিয়ে নিয়ে যান, ফিরিয়ে নিয়ে যান।

শরৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, ভোগের নাম করে এনেছি, ফেরত নিয়ে যাব ?

প্রেমানন্দ বললেন, আজ রবিবার, আজ মাছ-ভোগ দেওয়া হয় না, ও মাছ লাগবে না।

শরৎ তাঁর ভৃত্যকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেবার জন্য উদ্যত হলেন, কিন্তু এর মধ্যে যাঁর দেখার তিনি দেখে ফেলেছেন।

অদূরে একটা গাছতলায় বই হাতে নিয়ে বসে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি চোখ তুলে বললেন, ওটা কী রে, শরৎ কী এনেছে ?

কাছে এসে উৎফুল্ল বিস্ময়ে বললেন, এত বড় রুই, কী টাটকা, গা একেবারে চেকনাই দিচ্ছে, মুখের কাছটা লালমতন, এমন খাসা জাতের রুই অনেক দিন দেখিনি। রাখ রাখ, এমন মাছ ফেরত দিতে আছে !

প্রেমানন্দ সভয়ে বললেন, তুমি এই মাছ খাবে নাকি ?

প্রেমানন্দের ভয় পাবার কারণ আছে। স্বামীজির শরীর মাঝে মাঝে খুব খারাপ হয়ে পড়ে বলে এখন এক বিচিত্র কবিরাজি চিকিৎসা চলছে। একুশ দিন ধরে স্বামীজিকে শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হবে, অন্য সব কিছু খাওয়া নিষেধ, এমনকী এক ফোঁটা জল কিংবা এক বিন্দু নুনও খাওয়া চলবে না। জুন মাসের প্রচণ্ড গরম, এমনিতেই স্বামীজি ঘণ্টায় চার-পাঁচ গেলাস জল পান করেন, টানা একুশ দিন নির্জলা কাটাতে হবে। স্বামীজি রাজি হয়ে গেছেন, এখন ভুল করে জলের গেলাস তুললেও জল মুখের মধ্যে যায় না। কষের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, এমনই তাঁর মনের জোর।

কিন্তু এমন মাছ দেখলে কি চোখ ফেরানো যায় ?

স্বামীজি বললেন, আমি খাব কেন ! কোনও ভক্ত যদি ভোগ দেবার সঙ্কল্প করে কিছু আনে, তা দেওয়াই উচিত।

প্রেমানন্দ বললেন, কিন্তু আজ যে রবিবার।

স্বামীজি বললেন, অত দিন মানামানির কী আছে ! ভক্তিটাই আসল কথা।

মাছ-বাহকের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজিও চললেন রান্নাঘরের দিকে।

প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে আলাদা ভোগ রান্না হয়। সেই ভোগের জন্য কয়েক টুকরো মাছ সরিয়ে রাখা হল, বাকি মাছ দিয়ে মঠবাসীদের মহাভোজ হবে।

স্বামীজি প্রেমানন্দকে বললেন, অনেক দিন আমি রাঁধিনি, আজ তোদের রেঁধে খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। মশলাপাতির জোগাড় কর তো !

প্রেমানন্দ আবার ভয় পেয়ে গেলেন। মস্ত বড় উনুন, এত জনের জন্য রান্না কি সোজা কথা ? অসুস্থ শরীর নিয়ে গনগনে আঁচের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

স্বামীজি সে আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে এককালে আমার রান্নার কত শখ ছিল, তোরা জানিস না। দ্যাখ না, আজ তোদের নতুন রকম মাছের ঝোল খাওয়াব। দুধ চাই, দই চাই। ভার্মিসেলি আছে না ?

নবীন সন্ন্যাসীরা ভিড় করে এল স্বামীজির রন্ধনপ্রণালী দেখার জন্য। আজ তাদের কত সৌভাগ্য !

যথাসময়ে মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা বাজল। ব্রহ্মানন্দ এসে বললেন, হ্যাঁ রে নরেন, তুই এত করে রাঁধলি, তুই নিজে খাবি না, এটা কেমন কথা ? আমরা খাই কী করে ?

চামচ দিয়ে যৎসামান্য মাছের ঝোল তুলতে তুলতে স্বামীজি বললেন, রাঁধুনিকে একটু চেখে দেখতে হয়, নুন-টুন ঠিক হল কি না—। বাঃ, সব ঠিক আছে, আমার এই যথেষ্ট।

খাওয়ার ব্যাপারে সব রকম বিধিনিষেধ এখন মেনে চলছেন স্বামীজি, কিন্তু অন্যদের তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন দৃশ্য দেখতে তাঁর ভাল লাগে। নিজে না খেয়েও রান্না করে তিনি আনন্দ পান।

স্বাস্থ্যের কারণে এখন তাঁর বাইরে যাওয়া-আসা বন্ধ। বেলুড় মঠেই কাটাচ্ছেন দিনের পর দিন। কোথাও বক্তৃতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন না। সারাদিন পঠন-পাঠনেই কেটে যায়। হয় নিজে পড়ছেন কিংবা মঠের ব্রহ্মচারীদের বেদ ও গীতাভাষ্য পড়াচ্ছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ বাড়ছে দিন দিন।

জাপানে যাওয়া হল না। শিকাগোর মতন টোকিও শহরেও একটি বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন চলছে, সেখান থেকে স্বামীজির আমন্ত্রণ এসেছে বারবার। জো ম্যাকলাউডেরও খুব ইচ্ছে, তিনি জাপানে কাটিয়েছেন অনেক দিন। ওকাকুরা নামে জাপানের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি চিঠি লিখলেন, এমনকী জাহাজ ভাড়া পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় জাপানের রাজপ্রতিনিধিও একদিন ওই অনুরোধ জানাতে এলেন মঠে।

স্বামীজি প্রথমে রাজি হয়েছিলেন। জাপান ভারী সুন্দর দেশ, ফুলের দেশ, ছবির দেশ। জাপান স্বাধীন দেশ, শক্তিশালী দেশ, শিল্পোন্নত দেশ, এশিয়ার গর্ব। জাপানের সঙ্গে ভারতের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন বিশেষ জরুরি। কিন্তু মাঝে মাঝে শরীর আর বইতে চায় না বলে স্বামীজি আবার দমে যান। মৃত্যুচিন্তা মাঝে মাঝেই মনোলোকে কালো ছায়া ফেলে। যদি মরতেই হয়, তা হলে বিদেশ-বিভুঁইতে তিনি মরতে চান না। কেমন যেন ধারণা হয়ে গেছে, তাঁর আয়ু চল্লিশ পেরুবে না।

আবার মাঝে মাঝে শরীরটা চাঙ্গা বোধ করলেই তাঁর ভেতরের পরিব্রাজক সত্তাটি জেগে ওঠে। তখন মনে হয়, জাপানে যাওয়াটা যেন তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এর মধ্যে জো ম্যাকলাউড সেই ওকাকুরা নামে ভদ্রলোকটিকে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। বেলুড় মঠে দেখা করতে এলেন ওকাকুরা, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে স্বামীজির বেশ ভাল লাগল। ওকাকুরা জাপানের সামুরাই বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি, সজ্জন, সৌজন্যমণ্ডিত, স্বল্পবাক। তিনি একজন শিল্প-পণ্ডিত, চিন্তাবিদ ও কবি। ওকাকুরার সঙ্গে এসেছে হোরি নামে আর একটি তরুণ, সে অল্প বয়েসেই ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করেছে, ভারতে সে বেশ কিছু দিন থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করতে চায়। আর ওকাকুরা চান বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান, জাপানের শিল্প-সংস্কৃতির প্রেরণা এসেছে যে ভারত

থেকে, সেই দেশটিকে ভাল রকমভাবে দেখতে ও জানতে।

জো ম্যাকলাউড এই ওকাকুরা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। প্রাচ্য প্রীতির টানে তিনি ভারত পরিক্রমা তো করছেনই, তারপর জাপানে গিয়ে ওকাকুরার সংস্পর্শে আসেন। এবং এঁর প্রতি মুগ্ধ হন। জো-র ধারণা, ওকাকুরার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দর যোগাযোগ ঘটলে একটা দারুণ সমন্বয় হবে।

ওঁদের দেখে স্বামীজির আবার জাপানে যাওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল। ওকাকুরা বোধগয়া ও বারাণসী দেখতে চান, স্বামীজি সদলবলে তাঁর সঙ্গী হলেন। বোধগয়ায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ বোধি লাভ করে গৌতম বুদ্ধ হন, আর বারাণসীর সন্নিকটে এক স্থানে তিনি প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেন, এই দুটি স্থান বৌদ্ধদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। বোধগয়ায় কাটানো হল সাত দিন। তারপর সেখান থেকে কাশী।

বোধগয়ার মন্দির নিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিবাদ আছে। বোধগয়ার মোহান্ত স্বামীজিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন, ওকাকুরার সঙ্গে লর্ড কার্জনের একটা চিঠি ছিল বলে সরকারি কর্মচারীরা তৎপর, সেখানে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বারাণসীতে এসে সারনাথ স্তূপ দর্শনে কোনও বাধা না থাকলেও কাশীর প্রধান আকর্ষণ যে বিশ্বনাথ মন্দির, সেখানে তো ওকাকুরা যেতে পারবেন না। স্বয়ং লর্ড কার্জনকেও পুরীর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

স্বামীজির কৌতুকপ্রবণ মনটি নেচে উঠল। ওকাকুরার তিনি আড়ালে নাম দিয়েছেন অক্রুর খুড়ো। অক্রুর যেমন মথুরা থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, সেই রকম ওকাকুরাও স্বামীজিকে জাপানে নিয়ে যেতে এসেছেন, সুতরাং নামের মিল ছাড়া এই মিলটাও আছে। এখন এই অক্রুর খুড়োকে হিন্দু সাজালেই হয়। স্বামীজি কালাপেড়ে কোঁচানো ধুতি পরিয়ে দিলেন ওকাকুরাকে, গায়ে মেরজাই, মাথায় সিল্কের পাগড়ি, আর পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা। সবাই তা দেখে হেসে বাঁচে না। হাসতে হাসতেও সবাই স্বীকার করল, মানিয়েছে ভারী সুন্দর। মনে হয় যেন নেপালের রাজবংশের কোনও প্রতিনিধি।

স্বামীজি বললেন, দেখো খুড়ো, ওখানে গিয়ে যেন আবার মুখ খুলো না।

বিশ্বনাথের গলি দিয়ে হেঁটে গিয়ে ওকাকুরা দিব্যি মন্দির দর্শন করে এলেন।

কাশীর পর ওকাকুরা ভারতের আরও মন্দির, স্থাপত্য, শিল্পকীর্তি, অজন্তার গুহাচিত্র এই সব দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু বারাণসীতেই স্বামীজির স্বাস্থ্য টিকল না, শরীর আবার দুর্বল, তিনি ওই দলটি ছেড়ে ফিরে এলেন কলকাতায়।

মঠের প্রাঙ্গণে বড় আমগাছটির তলায় একটি ক্যাম্প খাট পাতা থাকে। স্বামীজি বিকেলবেলা সেখানে এসে বসেন, গল্প করেন শিষ্যদের সঙ্গে। কখনও গভীর ভাবের কথা, কখনও হাস্য পরিহাস। কবিরাজি ওষুধে তাঁর খানিকটা উপকার হয়েছে, মুখের পাণ্ডুর ভাব কেটে গেছে অনেকখানি।

কাল খুব একচোট বৃষ্টি হয়েছিল, আজ আকাশ গুমোট, সকলের গায়েই দরদর ঘাম। স্বামীজি বসে আছেন কৌপীন পরে, খালি গায়ে, হাতে হুঁকো। শিষ্যদের তিনি গ্রিক ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনা করে বোঝাচ্ছেন, এমন সময় একজন এসে বলল, ও স্বামীজি, আপনার বড় হাঁসটি যেন কেমন করছে। মনে হচ্ছে আর বাঁচবে না।

স্বামীজি তৎক্ষণাৎ কথা থামিয়ে চঞ্চল হয়ে নেমে পড়ে বললেন, সে কী রে, চল তো দেখে আসি!

এর মধ্যে মঠে স্বামীজির অনেক পোষ্য জন্তু-জানোয়ার জুটেছে। গরু তো আছেই, তা ছাড়া অনেকগুলি হাঁস, কুকুর, ছাগল, হরিণ, সারস। একটা মাদি ছাগলের নাম 'হংসী', তার দুধে সকালবেলা স্বামীজির চা হয়। এক-একদিন তিনি সেই মাদি ছাগলটিকে মিনতি করে বলেন, হংসী মা, আমাকে একটু দুধ দিবি! আর একটি ছোট্ট ছাগলছানার নাম 'মটরু', তার পায়ে ঘুঙুর পরানো, সে সব সময় স্বামীজির পায়ে পায়ে ঘোরে। স্বামীজি কথা বললে সে যেন ঠিক বোঝে। স্বামীজি অনেককে বলেন, এই মটরুটা আগের জন্মে নিশ্চয়ই আমার কেউ হত। হরিণটাকে নিয়েও প্রায়ই দুর্ভোগ হয়, মাঝে মাঝেই সে মঠের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায়। একবার তো দিন তিনেক তাকে

পাওয়া গেল না, স্বামীজির দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে ধরে আনা হল।

স্বামীজি গিয়ে দেখলেন, রাজহংসটি কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে ঠিক সর্দি ঝাড়ার মতন শব্দ করছে।

স্বামীজি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, ইস, কাল সারাদিন বৃষ্টির মধ্যে বাইরে ছিল, তাই ঠাণ্ডা লেগে গেছে বোধ হয়!

একজন বৃদ্ধ সাধু তা শুনে বললেন, হায় রে, কী দিনকালই পড়েছে। ঘোর কলি! বৃষ্টি ভিজলে যদি হাঁসেরও সর্দি লাগে, ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী!

স্বামীজি হেসে উঠলেন।

কিন্তু অনেক সেবা-যত্নেও রাজহংসটিকে বাঁচানো গেল না। তার শেষ মুহূর্ত আসার পর স্বামীজি চুপ করে ঠায় বসে রইলেন। এই মৃত্যুদৃশ্য তাঁকে উদাস করে রাখল অনেকক্ষণ।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ মঠের ব্যবহারের জন্য একটি তরিতরকারির খেত করেছেন, স্বামীজির ছাগল-হাঁস-হরিণেরা তা নষ্ট করে দেয়, সে জন্য সেখানে একটা বেড়া বাঁধতে হবে। মঠের জমি সাফ করা ও মাটি কাটার কাজ করে একদল সাঁওতাল নারী-পুরুষ। তাদের কয়েকজনকে বেড়া বাঁধার কাজ দেওয়া হল, স্বামীজি নিজে তদারকি করতে লাগলেন। পোষ্য প্রাণীগুলির ওপর কেউ রাগারাগি করলে তাঁর সহ্য হয় না।

সাঁওতালরা কাজে ফাঁকি দিতে জানে না। সকাল থেকে একটানা কাজ শুরু করে, দুপুরে একটুক্ষণের বিরতিতে কিছু খাবার খেয়ে নেয়, আবার কাজ। ওরা নিজেদের খাবার সঙ্গে নিয়ে আসে। পুঁটুলিতে বাধা শুধু চিঁড়ে আর খানকয়েক বাতাসা। স্বামীজি ওদের খাওয়া দেখতে দেখতে ভাবেন, পোলাও-মাংস, লুচি-পরোটা, সন্দেশ-রসগোল্লা, আর কত রন্ধন শিল্পের উৎকৃষ্ট সব নমুনা আছে এ দেশে, এই মানুষগুলো কোনও দিন তার স্বাদও পেল না। অথচ এরাই প্রকৃতপক্ষে দেশটা চালায়। এরা চাষ করে, কল-কারখানায় খাটে, পথ তৈরি করে, সেতু বানায়। প্রতিদিন এরাই ঘাম ছড়াচ্ছে ভূমিতে। এমনকী মেথর-মুদ্দফরাসরাও দু'-এক দিন কাজ বন্ধ করলে শহরগুলিতে হাহাকার পড়ে যাবে। অথচ এরা চিরকালের গরিব। যারা জাতির মেরুদণ্ড, তারাই কিনা নিচু জাত, পতিত, অস্পৃশ্য! অদ্ভুত এই দেশ। এদের উন্নতি ঘটাতে না পারলে গীতা, বেদ, বেদান্ত-ফেদান্ত সব মিথ্যে হয়!

স্বামীজি ভাবলেন, একদিন এদের উত্তম সব সুখাদ্য রেঁধে খাওয়ালে কেমন হয়?

ওদের সর্দারের নাম কেষ্টা, তার সঙ্গে স্বামীজির বেশ ভাব হয়ে গেছে ক'দিনে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের ঘর-সংসার ও সমাজের কথা জিজ্ঞেস করেন। কাজের সময় গল্প করা অবশ্য কেষ্টার পছন্দ নয়, সে কখনও আপত্তি করে বলে, ওরে স্বামীবাপ, তুই আমাদের কামের সময় এখানকে আসিস না। তোর সঙ্গে কথা বললে কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়ো বাবা আমাদের বকবে।

স্বামীজি হাসতে হাসতে বলেন, না রে, আমি থাকলে বুড়ো বাবা বকবে না!

একদিন ওরা যখন চিঁড়ে-বাতাসা ভোগ দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারছে, তখন স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন, কেষ্টা, আমি একদিন রান্না করব, তোরা খাবি!

কেষ্টা একটুক্ষণ চিন্তা করে মাথা নেড়ে বলল, না, তা তো পারব না। আমরা তোদের মতন সাধুদের ছোঁওয়া খাই না। এখন বিয়ে হয়ে গেছে, তোদের ছোঁওয়া নুন খেলে আমাদের জাত যায় রে বাপ!

এ কথা শুনে স্বামীজি যেমন চমকে উঠলেন, তেমন মজাও পেলেন। ছুঁৎমার্গের তা হলে একটা অন্য দিকও আছে! জাত্যভিমানী বামুন-কায়েতরা এদের নিচুবর্ণ মনে করে, এদের হাতের ছোঁওয়া খায় না। এরাও আবার তথাকথিত সেইসব উঁচু জাতের হাতের ছোঁওয়াকে অপবিত্র বোধ করে! বেশ হয়েছে! এদেরও আত্মসম্মান বোধ প্রবল।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তাই তো, নুন খেলে তোদের জাত যায়! নুন ছাড়া কোনও খাবার খেতে পারিস!

কেষ্টা তাতে সম্মতি জানাল। কিন্তু বিনা নুনে কিছু রান্না করা কী করে সম্ভব? তাই স্বামীজি আর সে দিকে গেলেন না, তিনি ওদের জন্য লুচি, মিহিদানা, রাজভোগ, সন্দেশ, দই আনালেন প্রচুর, সবাইকে পাত পেতে বসিয়ে বললেন, একেবারে পেট ভরে খেতে হবে, যে-যত পারবি।

স্বামীজির এই নতুন খেয়াল দেখার জন্য অনেকে ভিড় করে এল। সেই সাঁওতাল শ্রমজীবীরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে, আর একটা একটা খাবার মুখে তুলছে। বেশির ভাগগুলিরই তারা নাম জানে না, কখনও চোখেও দেখেনি। কিন্তু তারা লোভী, বুভুক্ষুর মতন হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছে না, এক-একটা বস্তু মুখে তুলে আগে স্বাদ নিচ্ছে, তারপর মাথা নাড়ছে।

স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, ভাল লাগছে? কোনওটাতেই নুন নেই।

কেষ্টা বলল, হ্যাঁ রে বাপ, নুন ছাড়াও ভাল জিনিস হয় বটে!

স্বামীজি আপনমনে বললেন, নারায়ণ, নারায়ণ! আমার জীবন্ত নারায়ণের ভোগ হল আজ!

সাঁওতালরা চলে যাবার পর একজন শিষ্য বলল, লোকগুলি কেমন আনন্দ করে খেল। দেখে বড় ভাল লাগল।

স্বামীজি বললেন, এক-এক সময় ইচ্ছে করে মঠ-ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরিব-দুঃখী-দরিদ্র নারায়ণদের সব বিলিয়ে দিই। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের তো গাছতলাই ভাল, দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না, আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? দেখ, এরা কেমন সরল, এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কী হল?

দু'-চারটে দিন শরীর ভাল থাকার পরেই আবার হঠাৎ হাঁপানির টান ওঠে। একটু হাঁটতেও কষ্ট হয়। বহুমূত্রের প্রকোপে একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় গেছে। এই সময় চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত, কিন্তু স্বামীজির পাঠের নেশা দিন দিন বাড়ছে। মঠের গ্রন্থাগারের জন্য এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কেনা হয়েছে, তাই তিনি পড়ে যাচ্ছেন খণ্ডের পর খণ্ড। শিষ্যদের নিয়ে যখন শাস্ত্র পড়াতে বসেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। ছাত্ররা অস্থির হয়ে উসখুস করে, শিক্ষকের হুঁশ নেই।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেকগুলি স্থান সফর করে জো ম্যাকলাউড ও ওকাকুরা ফিরে এসেছেন কলকাতায়। প্রায়ই মঠে আসেন দু'জনে, ইংরিজি জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য ওকাকুরা বিশেষ কথা বলেন না, জো ম্যাকলাউডই বাক্যালাপ চালান, এই জাপানি বন্ধুটি সম্পর্কে জো উচ্ছ্বসিত। প্রায় সমবয়েসী এই মানুষটিকে স্বামীজিরও ভাল লাগে, মঠে সকলের সঙ্গে সাধারণ আহার তিনি তৃপ্তি করে খান, কাছাকাছি জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। একদিন তো এক কাণ্ডই হল। গঙ্গাবক্ষ দিয়ে সদলবলে বেলুড় মঠে আসছিলেন ওকাকুরা। হঠাৎ সেই নৌকো উল্টে গেল। খবর পেয়ে স্বামীজি হন্তদন্ত হয়ে ঘাটের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে সবাইকে বললেন, 'ওরে শিগগির দ্যাখ দ্যাখ ওক্কুরখুড়ো ডুবে গেল কি না, সাঁতার জানে কি না তাই বা কে জানে!'

কিঞ্চিৎ হাবুডুবু খেয়ে ওকাকুরা বেঁচে গেলেন সে যাত্রা। তাঁর মুখমণ্ডলে অবশ্য আতঙ্কের লেশমাত্র নেই। আগের মতনই গম্ভীর, যেন কিছুই ঘটেনি। স্বামীজি তাঁর ভিজে পোশাক ছাড়িয়ে নিজের একপ্রস্থ পোশাক পরিয়ে দিলেন।

জাপানে আর যাওয়া হবে না, এ বিষয়ে স্বামীজি এখন মনস্থির করে ফেলেছেন। ওকাকুরা তবুও অনির্দিষ্টকাল ভারতে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। মাঝে মাঝে স্বামীজির খটকা লাগে, শুধু তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো কিংবা ভারতের শিল্প পুরাকীর্তিগুলি দর্শনই নয়, ওকাকুরার আরও যেন কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা তিনি খুলে বলেন না। ওকাকুরার জীবনযাত্রা ভোগী পুরুষদের মতন, দামি ইজিপশিয়ান সিগারেট খান অনবরত, স্বামীজিকেও খাওয়ান, স্বামীজির অনুরোধে একদিন হুঁকো টেনে দেখতে গিয়ে কাশতে কাশতে দম আটকে যাবার উপক্রম, সেটা তাঁর সহ্য হয়নি। স্বামীজি শুনেছেন, ওকাকুরার মদ্যপানের অভ্যেস আছে। জাপানে অবশ্য বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসীরাও মদ্যপান করেন, সেখানে এটা কিছু দোষের মনে করা হয় না। ওকাকুরার সাজপোশাকও খুব দামি, সেই জন্য কেউ কেউ তাঁকে প্রিন্স ওকাকুরা, কিংবা কাউন্ট বা ব্যারনও বলে। এমন মানুষ বেলুড় মঠে এসে কী

পাবেন, এখানে তো শুধু ত্যাগ। জো ম্যাকলাউডের উৎসাহের আতিশয্যই কি এখানে ঘন ঘন আসার কারণ?

প্রায় পৌনে দু' বছর বাদে দেশে ফিরে এলেন নিবেদিতা। ব্রিটানিতে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছে, তারপর নিবেদিতা ফিরে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে, স্বামীজি বেরিয়ে পড়েছিলেন ইউরোপ পরিভ্রমণে। এর মধ্যে নিবেদিতার মনোজগতে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার অল্পই আভাস পেয়েছেন স্বামীজি। এ নিবেদিতা আর স্বামী বিবেকানন্দর সেই ছায়া-অনুগামিনী নন। এখনও এই নিবেদিতা অবশ্যই স্বামীজির ভক্ত এবং শিষ্যা, কিন্তু আগে যিনি ছিলেন নিবেদিতার রাজা, যিনি ছিলেন প্রভু, এখন তিনি গুরু, এখন তিনি পিতার মতন।

স্বামীজিকে এতদিন পর দেখে নিবেদিতার চক্ষে জল এসে গেল। যাঁর ছিল দেবদুর্লভ রূপ, তাঁর এ কী চেহারা! এক চক্ষু প্রায় কানা, পা দুটো ফোলা ফোলা, গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে গেছে, শরীরের আকৃতি কেমন যেন বেঢপ।

স্বামীজি শিষ্যার অবস্থা দেখে কৌতুক করে বললেন, কী, আমাকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মতন দেখাচ্ছে না?

নিবেদিতা কিছু বলতে পারলেন না।

স্বামীজি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললেন, আবার স্কুলটা চালু করো, কবে থেকে পড়াতে শুরু করবে?

নিবেদিতা মৃদুস্বরে বললেন, সামনেই সরস্বতী পুজো। ভাবছি, স্কুলে সরস্বতী পুজো করে সবাইকে ডাকব।

স্বামীজি বললেন, খুব ভাল, খুব ভাল, ধুমধাম করে পুজো লাগিয়ে দাও! জানো তো, আমরা গত বছর বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করেছি ঢাক ঢোল পিটিয়ে। এখন আর কেউ সহজে আমাদের ম্লেচ্ছ-ঘেঁষা বলতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে ওকাকুরা ও জো ম্যাকলাউড এসে গেলেন। স্বামীজি ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন নিবেদিতার। ওকাকুরা বিশেষ শিষ্টতার সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে নিবেদিতার একটি হাত গ্রহণ করে অভিবাদন জানালেন।

নিবেদিতা মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইলেন ওকাকুরার দিকে। যেন তিনি তাঁর স্বপ্নের পুরুষকে দেখছেন।

নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার এই প্রথম সাক্ষাৎকার। তবু নিবেদিতার এমন ভাবাবিষ্ট অবস্থা দেখে কৌতূহলী হয়ে স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, তোমাদের আগে দেখা হয়েছে নাকি?

নিবেদিতা বললেন, না। আগে দেখিনি, তবে ওঁর বিষয়ে আমি অনেক কিছু পড়েছি। জো আমাকে জাপান থেকে অনেক কাগজপত্র পাঠিয়েছে বিলেতে। ওঁর কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ে আমি জানি।

স্বামীজি অনুভব করলেন, তাঁর জানা ও নিবেদিতার জানার মধ্যে যেন অনেক তফাত।

জো বলল, স্বামীজি, আমাদের ধীরামাতা, শ্রীমতী ওলি বুলও ফিরে এসেছেন, তিনি পরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তিনি উঠেছেন আমেরিকান কনসুলেটে। সেখানে এই সপ্তাহের শেষে তিনি একটা পার্টিতে মাননীয় ওকাকুরার সঙ্গে কলকাতার বিশিষ্ট মানুষদের পরিচয় করিয়ে দিতে চান। অনেককে ডাকবেন। আপনাকে তিনি বিশেষ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

স্বামীজি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, না, আমি আর কোথাও যাই না। যদি বা কখনও গঙ্গা পেরোই, তা হলে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে আর আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

জো বলল, এটা তো ঠিক সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। ভারত ও জাপানের মৈত্রী বন্ধনের জন্য, ...আপনি মধ্যমণি হয়ে থাকবেন।

স্বামীজি বললেন, এ দেশে অনেক বড় বড় মানুষ আছেন, তাঁদের ডাকো। আমাকে বাদ দিলেও

চলবে। আমি তো আর বেশিদিন নেই!

জো বলল, আপনার মুখে ওই কথা শুনতে চাই না।

নিবেদিতা জো'র দিকে তাকালেন। স্বামীজি একবার না বললে তাঁকে আর রাজি করানো প্রায় অসম্ভব, তা তিনি জানেন। ওকাকুরা গঙ্গার দিকে চেয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন আপনমনে, যেন এ আলোচনায় তাঁর কোনও অংশ নেই।

৬২

ভারতবর্ষ থেকে কিছুদিন দূরে থেকে নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালভাবে চিনতে পারলেন। স্বামী বিবেকানন্দর কাছ থেকেও কিছুদিন তাঁর দূরে থাকার প্রয়োজন ছিল। স্বামীজির প্রবল ব্যক্তিত্ব হিমালয় পর্বতকেও আড়াল করে দিতে পারে।

প্রথমবার নিবেদিতা ভারতে এসেছিলেন ধর্মীয় তৃষ্ণায়। ব্যর্থ প্রেমে বিদীর্ণ হৃদয়ে সহসা স্বামী বিবেকানন্দর মতন এক অসাধারণ পুরুষের সান্নিধ্যে এসে ভেবেছিলেন, ইনিই তাঁকে সারা জীবনের পথ নির্দেশ করবেন। ভারতে অবস্থানের সময় দেখেছিলেন, এ দেশের মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অসহায়তার মধ্যেও কত সরলতা, কত সহৃদয়তা। তিনি ঠিক করেছিলেন, স্বামীজির দূতী হিসেবে এইসব মানুষদের সেবা, এখানে শিক্ষাবিস্তারই হবে তাঁর জীবনের ব্রত। তারপর আরও কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসে, ভারত ভ্রমণের সময় নিজেরও কিছু কিছু অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের কোটি কোটি মানুষের মুখে লেখা রয়েছে পরাধীনতার জ্বালা, বেদনা, অপমান। এ দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুর মূলে আছে পরাধীনতা। একটা ইস্কুল খুলে পনেরো, কুড়িটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে কিংবা রোগ-মহামারীর সময় দু'চারটে বস্তিতে সেবাকর্ম চালিয়ে সেই মূল সমস্যার গায়ে একটি আঁচড়ও কাটা যাবে না। বিদেশি শাসকদের দূর করে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনই এখন প্রথম ও প্রধান কাজ।

কিন্তু বেদান্তের চর্চায় কিংবা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান প্রচেষ্টায় কি স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সম্ভব? সে কি ঝড়ের সময় উটপাখির বালিতে মুখ গুঁজে থাকার মতন নয়? তলোয়ার-বন্দুক-কামানে সশস্ত্র শাসকশ্রেণী এই মূর্তিপূজকদের ধর্মের উত্থান-পতনের তোয়াক্কা করে না। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দুদের যুদ্ধ-ক্ষমতার কোনও ইতিহাস নেই, তারা অস্ত্র ধরতেই ভুলে গেছে। মুসলমানরা যোদ্ধজাতি হলেও তারা এখন নিরস্ত্র ও অবদমিত, যেন অনেকটা নেশার ঘুমে আচ্ছন্ন, তাই শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা নিশ্চিন্তে এই সাম্রাজ্য শোষণ করে চলেছে।

নিবেদিতা একসময় দেবী কালীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। 'কালী দা মাদার' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এবারে বিলেতে অবস্থানের সময় তাঁর উপলব্ধি হল, ওসবের এখন প্রয়োজন নেই, এখন তাঁর একটা নতুন বই লেখা উচিত, সেই বইয়ের নাম হবে 'স্বাধীনতা'।

স্বাধীনতা! স্বাধীনতার রূপ যে কী রকম তাই-ই যে অধিকাংশ ভারতবাসী জানে না। বহু বছর ধরে পরাধীনতার অপমান সইতে সইতে তারা স্বাধীনতার স্বাদই ভুলে গেছে। শিক্ষিত লোকেরাও মনে করে, ইংরেজরা যেন দেবতাদের মতন অপরাজেয়, তাদের বিতাড়ন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং ইংরেজি ভাষায় তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন-ভিক্ষা চেয়ে কিছু সুযোগ-সুবিধে আদায়ের চেষ্টা করাই শ্রেয়।

স্বাধীনতা বিষয়ে ভারতীয়দের এই নিস্পৃহ ভাবটা নিবেদিতাকে ব্যথিত করে। আত্মমর্যাদা জ্ঞান না থাকলে কোনও জাতি কি বড় হতে পারে? একটা ঘটনা মনে পড়লে নিবেদিতার শুধু দুঃখ বেশি নয়,

রাগও হয়।

ইংল্যান্ডে এখন বেশ কিছু ভারতীয় আছে, তাদের কয়েকটি সমিতিও আছে। কয়েক বছর আগে কেমব্রিজের ইন্ডিয়ান মজলিস নামে একটি সমিতি সভা ডেকে দুজন ভারতীয়কে সংবর্ধনা জানিয়েছিল সাড়ম্বরে। সেই দুজন ভারতীয় কে কে? অতুল চ্যাটার্জি ও রণজিৎ সিংজি। অতুল চ্যাটার্জি আই সি এস পরীক্ষায় সমস্ত ইংরেজ পরীক্ষার্থীদের ডিঙিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আর ভারতের এক দেশীয় রাজ্যের রাজকুমার, বিলেতেই প্রতিপালিত রণজিৎ সিংজি ক্রিকেট খেলায় শত রান করেছে। এই এঁদের কৃতিত্ব! ভারতীয় আই সি এস-রা ইংরেজদের উচ্চ বেতনের ভৃত্য, আর রণজিৎ সিং ক্রিকেট খেলায় নিজের দেশের কিছুমাত্র গৌরব বৃদ্ধি করেননি, তিনি ইংলন্ডের দলের একজন ভাড়াটে খেলোয়াড়মাত্র। সে যাই হোক, ওই দুজনের গলায় মালা পরানো হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু সেই সময় লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র বসু এসে রয়েছেন, দেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই দুই সন্তানকে সংবর্ধনা জানাবার কথা ওই ইন্ডিয়ান মজলিসের একবারও মনে পড়েনি! এমনকী স্বামী বিবেকানন্দ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তবু কেউ তাঁর কণ্ঠে মালা দেয়নি। সংবর্ধনার ভাষণে ইংরেজ তোষণের সুর ঝরে পড়ছিল।

পরাধীন দেশ বলে ভারতকে পৃথিবীর অন্য দেশগুলি যে কত অবজ্ঞা করে, তা কি ভারতীয়রা বোঝে না?

নিউ ইয়র্কে বিপিনচন্দ্র পাল নামে এক ব্রাহ্ম নেতার সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয়েছিল। তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করতে গিয়েছিলেন সেখানে। লোকটি বড় তার্কিক। নিবেদিতার সঙ্গে এক একদিন তাঁর প্রায় ঝগড়া লেগে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী কালীপূজকদের ব্রাহ্মরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। ঝগড়া হলেও প্রত্যেকবারই শেষের দিকে হাসি মুখেই বিদায় নিতেন বিপিন পাল, তাঁর ভদ্রতা বোধ আছে।

এই বিপিন পালের একটি অভিজ্ঞতার কথা শুনে মনে বেশ দাগ কেটেছিল নিবেদিতার। কোনও এক স্থানে বিপিনচন্দ্র বেশ উদ্দীপনার সঙ্গে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, শেষ হবার পর এক সৌম্যদর্শন আমেরিকান তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, ভদ্রমহোদয়, আপনি পরাধীন দেশের মানুষ, ইংরেজের দাস, আপনি এখানে ধর্মের কথা শোনাতে এসেছেন, তাতে কে গুরুত্ব দেবে? আমেরিকানরা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীন হয়েছে, তারা মনে করে, আপনাদের যেটা আসল কাজ সেটাই করছেন না। আগে আপনার দেশ স্বাধীন হোক, তারপর তত্ত্বকথা শোনাতে আসবেন।

কথাটা শুনে বিপিনচন্দ্রের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকান ভদ্রলোকটির বাক্যে উগ্রতা ছিল না, বন্ধুত্বের ভাব ছিল, তাঁর বক্তব্যের স্পষ্ট সত্যতা ধাক্কা মেরেছিল বিপিনচন্দ্রের বুকে। পরাধীন মানুষের মুখে বড় বড় কথা মানায় না। এখানকার লোক আড়ালে হাসে? স্বামী বিবেকানন্দ যে এত বক্তৃতা দিয়ে গেলেন, তার ফল শেষ পর্যন্ত কী হল? বক্তৃতা সভায় কিছু কৌতূহলী ও হুজুগপ্রিয় লোকেরা এসে ভিড় জমায়। সংবাদপত্রে তাঁর বাগ্মিতা ও চেহারার প্রশংসা ছাপা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কত জন তাঁর অনুগামী হয়েছে? দশ-বারো জনের বেশি নয়। তাঁর প্রধান ভক্ত তো গুটিকতক বিধবা ও কুমারী মহিলা। বিপিনচন্দ্র ঠিক করলেন, ধর্মের তত্ত্বকথা প্রচার আপাতত মুলতুবি থাক। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে অংশ নেবেন। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে প্রকাশ করবেন নিজস্ব পত্রিকা।

পরাধীনতার জ্বালা এবং শোষিত নিষ্পেষিত ভারতীয় জনগণের অবস্থা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ সচেতন। প্রথম প্রথম ভারতে গিয়ে নিবেদিতা সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হতেন, ভারতে চুরি-ডাকাতি-নরহত্যার সংখ্যা খুব কম দেখে নিবেদিতা একদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, ভারতীয়রা কী শান্তিপূর্ণ জাতি! তা শুনে স্বামীজি শ্লেষ ও বিষাদ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন, মৃতের সাত্ত্বিকতা! এ জাতটা এমনই নির্জীব হয়ে গেছে যে ভাল করে গুণ্ডামি-ডাকাতিও করতে পারে না!

আর একদিন তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, আমি ফুটবল খেলা পছন্দ করি। তার কারণ তাতে লাথির বদলে লাথি দেওয়া যায়। এ কথায় কি একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল না? তিনি আঘাতের বদলে

প্রত্যাঘাতে বিশ্বাসী।

স্বামীজি আরও বলেছেন, ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজদের পক্ষে এত সহজ হয়েছিল কেন? যেহেতু তারা একটা সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তা ছিলাম না। ...এখন জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। এরকম কথা স্বামীজি বারবার বলেছেন, ভারতের জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে।

কিন্তু সে দায়িত্ব কে নেবে? নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা স্বামী বিবেকানন্দর চেয়ে আর কার বেশি? তিনি ভাষায় আগুন ছোটাতে পারেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার অসীম ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তাঁর পরিচিতি, অনেক দেশীয় রাজা তাঁর ভক্ত। তিনি যদি দেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান, তবে হাজার হাজার মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। তাঁর নির্দেশে ইংরেজকে তাড়াবার জন্য তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। নিবেদিতা যেন কল্পনায় এ-দৃশ্য দেখতে পান, বিশাল জনতার মাঝখানে অগ্নিশিখার মতন স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান, তিনি স্বাধীনতার আহ্বান জানাচ্ছেন, আর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতন জনসমষ্টি গিয়ে ধাক্কা মারছে ইংরেজ রাজশক্তিকে।

কিন্তু এ কল্পনা দিবাস্বপ্নের মতন অলীক। নিবেদিতার গুরু এ দায়িত্ব নেবেন না। তিনি যে সন্ন্যাসী। তাঁর মতে, জগতের সেবা ও ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বেলুড় মঠ স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য অন্নদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান। এইসব দান সারা দেশে পৌঁছতে কত যুগ, কত শতাব্দী লেগে যাবে? নেতা-স্থানীয় অনেকেই বলেন, আগে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তারপর স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যাবে। এটা একপ্রকার পলায়নী মনোবৃত্তি নয়? পরাধীন অবস্থায় প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার সম্ভব? শাসকশ্রেণী তা দেবে কেন? এখন ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা যৎসামান্য, তাতেই বড়লাট লর্ড কার্জন উচ্চ শিক্ষা সংকোচের উদ্যম নিয়েছেন। আগে দেশ স্বাধীন হলে তবেই নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা সম্ভব! স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে করতেই মানুষের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগবে।

ধর্মসাধনা না স্বাধীনতার জন্য সাধনা, এখন দেশের পক্ষে কোনটা বেশি জরুরি? নিবেদিতা দ্বিতীয়টির পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছেন। এবং বুঝে গেছেন, এ ব্যাপারে তিনি তাঁর গুরুর সাহায্য পাবেন না। জাতীয় নেতা হিসেবে যাঁকে সবচেয়ে বেশি মানায়, তিনি এখন, এমনকী মঠের নেতৃত্ব থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কেমন যেন নির্বেদ এসে গেছে তাঁর। মৃত্যু সম্পর্কে প্রাচ্য ধারণা ও পাশ্চাত্য ধারণায় অনেক তফাত আছে, নিবেদিতা এর ঠিক সামঞ্জস্য করতে পারেন না। হিন্দু-বৌদ্ধরা পরজন্মে বিশ্বাসী, তাই মৃত্যুকে তারা সহজভাবে নেয়, প্রকৃত মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই নিজেকে তৈরি করে নেয়, অনেকে স্বেচ্ছায় মৃত্যু কামনা করে। পাশ্চাত্যের মানুষ মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকে, মৃত্যুর কোনও মহত্ত্ব নেই তাঁদের কাছে। মানুষের রোগ-ভোগ থাকেই, চিকিৎসায় তার উপশমও হয়। স্বামীজি আরও পাঁচ কি দশ বছর যে বাঁচবেন না, তা কে বলতে পারে? কিন্তু এর মধ্যেই তিনি কেমন যেন নিরুদ্যম হয়ে পড়েছেন।

ভারতে ইংরেজরা যে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য নিবেদিতা ব্যক্তিগতভাবে অপরাধ বোধ করেন। তিনি জাতে আইরিশ, আইরিশদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ চলছেই কিন্তু ভারতীয়দের কাছে তিনি ব্রিটিশ। তিনি শাসক সমাজেরই একজন। ব্রিটিশ পতাকার প্রতি একসময় তাঁর আনুগত্য ছিল, এখন সেই পতাকা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। মাঝে মাঝেই তিনি আপন মনে কাতরভাবে বলে ওঠেন, হে ভারত! ভারত! আমার জাতি তোমার যে ভয়ানক ক্ষতি করেছে, কে তার অপনোদন করবে? হে ভারত! তোমার সন্তানদের মধ্যে যারা অতীব সাহসী, যারা তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন, যারা শ্রেষ্ঠ, তাদের ওপর এই যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অপমান বর্ষিত হচ্ছে—কে তার একটিরও প্রায়শ্চিত্ত করবে, বলো?

নিবেদিতাই সে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। ভারতে জ্ঞানী, গুণী, চিন্তাশীল মানুষের অভাব নেই, ইংরেজদের চেয়ে তাঁরা কোনও অংশে কম নন, তবু প্রতিনিয়ত তাঁদের কত অপমান

সইতে হয়! এবারে ইংল্যান্ডে এসে জগদীশচন্দ্র বসুর ব্যাপারেই নিবেদিতা তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখলেন।

জগদীশচন্দ্র যে পৃথিবীর একজন প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তিনি মূলত পদার্থবিদ, সম্প্রতি প্রবেশ করেছেন শরীরতত্ত্বে। জীবজগৎ ও জড়ের মাঝখানের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাঁর গবেষণায়। এরকম একজন বৈজ্ঞানিককে ভারত সরকারের উচিত ছিল সর্ববিষয়ে সাহায্য করা, তার বদলে তিনি পেয়েছেন ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা ও প্রতিরোধ। বিদেশের বিজ্ঞান সভাগুলিতে অংশগ্রহণ ও উন্নত গবেষণার সুযোগ নেবার জন্য তাকে দেশের কয়েকজন ব্যক্তির অর্থ সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়।

প্যারিস কংগ্রেসে প্রভূত প্রশংসা পাবার পর জগদীশচন্দ্র চলে এসেছিলেন লন্ডনে। এখানেও তিনি রয়াল সোসাইটিতে তাঁর গবেষণা পাঠের আমন্ত্রণ পান। তারপরই শুরু হয়ে যায় একশ্রেণীর ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্র। রয়াল সোসাইটি সেই গবেষণাপত্রটি ছাপিয়েও কিছু বৈজ্ঞানিকদের প্রতিরোধে তার প্রচার বন্ধ করে দিল। ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রের ডেপুটেশন বৃদ্ধি করতে না চেয়ে তাকে চাপ দিল ভারতে ফিরে আসার জন্য। এইরকম সংকটের সময় হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন জগদীশচন্দ্র।

নিবেদিতা এই বসু দম্পতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন অনেক আগেই। তিনি লন্ডনে তাঁদের এই অসহায় অবস্থার মধ্যে দেখে শুধু যে সেবার জন্য এগিয়ে এলেন তাই-ই নয়, কিছুদিনের জন্য ওই দুজনকে এনে রাখলেন তাঁর মায়ের বাড়িতে।

শুধু বৈজ্ঞানিক হিসেবেই নয়, জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের একটি দৃঢ়তার দিকের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র মনে-প্রাণে ভারতীয় এবং স্বদেশপ্রেমী। তিনি যা-কিছু করছেন, সবই ভারতের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। বিদেশে তিনি একাধিক লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন, তাতে তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতা তো ঘুচে যাবেই, তিনি অত্যাধুনিক লেবরেটরিতে গবেষণারও সুযোগ পাবেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র একটাও গ্রহণ করতে সম্মত হননি। অন্য দেশে চাকরি নিলে তাঁর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার তো সে দেশেরই হবে। প্রতিরোধ, বিড়ম্বনা, দারিদ্র্য সহ্য করেও তিনি ভারত মায়ের সন্তানই থাকতে চান। এমনকী জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবারও প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল তো সর্বসাধারণের জন্য, তিনি নিজে তার থেকে লাভবান হতে চান না। নিবেদিতার মনে হয়, এরকম ত্যাগ শুধু কোনও ভারতীয়ের পক্ষেই সম্ভব।

ভারত স্বাধীন না হলে তার এইসব সুসন্তান পৃথিবীতে যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে কী করে?

বিলেতে আর একজন ভারতীয়ও নিবেদিতার মনে স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা উস্কে দিল। রমেশচন্দ্র দত্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী নন, রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন না, কিন্তু তিনি ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিশ্লেষণ করে ইংরেজদের শোষণের রূপটি প্রকট করে দেন। ইংরেজরা ভারতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের বড়াই করে, কিন্তু তাদের শাসনেই যে ভারতে বারবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে, সে সম্পর্কে তাদের বিবেকে কোনও আঁচড় কাটে না?

ধর্ম বিপ্লবের বদলে রাজনৈতিক বিপ্লবের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা। বিলেতে বসে থেকে কোনও কাজ হবে না, ভারতে গিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই সময় জো ম্যাকলাউডের কাছ থেকে তিনি জাপানের দূত ওকাকুরার সংবাদ পেলেন। দুজনের পত্র বিনিময়ে অনেক তথ্য উন্মোচিত হল। ওকাকুরা শুধু শিল্প পণ্ডিত নন, ধর্মসভার প্রতিনিধি নন, তিনি স্বাধীনতার প্রবক্তা। একটি অশ্রুতপূর্ব তত্ত্ব এনেছেন তিনি, এশিয়া মহাদেশের ঐক্য। এশিয়ার সব দেশগুলি একযোগে ইওরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি প্রস্তুত, ভারতকে সহযোগী হিসেবে পাওয়া বিশেষ দরকার। ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করলেই ওই সব দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। ওকাকুরা সেই বার্তা নিয়েই ভারতে এসেছেন। প্রয়োজনে অন্য দেশ থেকে অস্ত্র আসবে, টাকাকড়ি আসবে।

এরকম স্বর্ণ সুযোগ আর কবে পাওয়া যাবে ? ওকাকুরার সঙ্গে দেখা করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। কলকাতায় ফিরে আসার পর নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হল, স্বল্পভাষী ওকাকুরার সহযোগী হয়ে গেলেন নিবেদিতা প্রথম দর্শন থেকেই।

ওলি বুলের পার্টিতে আহ্বান জানানো হল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সুবোধ মল্লিক প্রমুখ অনেকেই এলেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন ও আরও অনেকে। মস্ত বড় একটি হলঘরে সমবেত হয়েছেন আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, ঠিক মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন ওকাকুরা, তাঁর দু'পাশে ওলি বুল ও নিবেদিতা। ওকাকুরা মাঝারি উচ্চতায় বলিষ্ঠকায় এক পুরুষ, কালো সিল্কের কিমোনো পরিহিত, তার ওপরে পারিবারিক প্রতীক চিহ্ন হিসেবে পাঁচ পাপড়ির একটি ফুল কাজ করা। গরমের জন্য তিনি একটি সুদৃশ্য পাখায় হাওয়া খাচ্ছেন, সেই পাখাতেও রক্তপিঙ্গল রঙের পল্লবগুচ্ছের অলঙ্করণ, জাপানি কাপড়ের মোজায় পা ঢাকা, পরে আছেন ঘাসের চটি। চোখের পাতা ভারী, যৎসামান্য গোঁফ, গায়ের রং লালচে, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে আসীন। তিনি নীরবে ইজিপশিয়ান সিগারেট টেনে যাচ্ছেন, একটার পর একটা, সব কথাই বলে যাচ্ছেন নিবেদিতা। এদেশের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় করাবার ভার তিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছেন। ওকাকুরা একটি বই লিখছেন 'আইডিয়ালস অব দা ইস্ট' নামে। তাতে তিনি দেখাচ্ছেন এশিয়ার দেশগুলির মানুষদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কতখানি মিল, সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলেন নিবেদিতা। এই বইয়ের তিনি পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছেন, ইংরিজি ভাষায় সুষ্ঠু রূপ দিচ্ছেন, এই বই সম্পর্কেও তাঁর দারুণ উৎসাহ।

নিবেদিতা পরে আছেন দুগ্ধ-ধবল সিল্কের লম্বা পোশাক, মাথার চুলগুলি চুড়ো করে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁর রূপ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আগে তাঁর পরিচয় হয়নি, তারা নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত এক সন্ন্যাসিনী হিসেবেই জানত। তারা খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই অনুভব করল যে নিবেদিতা তাঁর গুরু কিংবা অধ্যাত্ম বিষয়ে কিছুই বলছেন না, এই জাপানি ভদ্রলোকটির গুণপনা সম্পর্কেই উচ্ছ্বসিত।

সভাভঙ্গের পর খাদ্য পানীয় এসে গেল। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্ররা উঠে পড়লেন, নিবেদিতা তাঁদের পাশে এসে কুশল বিনিময়ের পর সুরেন্দ্রকে বললেন, তুমি আর একটু থেকে যাবে ? জাপানি ভদ্রলোকটি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

এত সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে শুধু সুরেন্দ্রর সঙ্গেই কেন তিনি আলাদা কথা বলতে চান তা বোঝা গেল না। সমাগত অতিথিদের মধ্যে সুরেন্দ্রের বয়েসই সবচেয়ে কম। নিবেদিতাও তাকে খুবই স্নেহ করেন। সুরেন্দ্র রয়ে গেল।

ওকাকুরা বড় হলঘরটা ছেড়ে উঠে গিয়ে বসেছেন পাশের একটি কাচ বসানো ছোট বারান্দায়। সেখানে একটি মাত্র টেবিল ও দুটি চেয়ার। একটি চেয়ারে বসে তিনি ধূমপান করে যাচ্ছেন, আগেকার মতনই অটল গাম্ভীর্যে পূর্ণ। নিবেদিতা সুরেন্দ্রর পরিচয় দিতেই ওকাকুরা বয়ঃকনিষ্ঠ সুরেন্দ্রকে সমমর্যাদায় অভিবাদন জানালেন এবং পাশের চেয়ারটিতে বসবার ইঙ্গিত করলেন। কিমোনোর ঢোলা হাতার ভেতর থেকে জাদুকরদের মতন বার করলেন এক টিন সিগারেট, তার থেকে একটি দিলেন সুরেন্দ্রর দিকে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের সামনে ধূমপান করার কোনও প্রশ্নই নেই, তাই সুরেন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করল সবিনয়ে।

ওকাকুরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুরেন্দ্রর মুখের দিকে। যেন তিনি কিছু বলতে চান, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। সুরেন্দ্র নিবেদিতার দিকে মুখ ফেরাল। তখনই ওকাকুরা স্পষ্ট অথচ ধীর স্বরে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, নব্য যুবক, আপনার দেশের জন্য আপনি কী করতে চান বলুন ?

প্রথমেই এমন একটি প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল সুরেন্দ্র। দেশের জন্য কে আবার আলাদা ভাবে কী

করে ? সবাই নিজের নিজের কাজ করে যায়।

প্রশ্নটির প্রকৃত অর্থ বোঝায় সাহায্যের জন্য সুরেন্দ্র তাকাল নিবেদিতার দিকে। নিবেদিতা মিটি মিটি হাসছেন।

ওকাকুরা আবার বললেন, আপনার এই দেশটির নাম ভারতবর্ষ। কী মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন এই দেশ। এখান থেকেই বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়েছে সারা পৃথিবীতে, এককালে হিন্দুরা শিল্পে-ভাস্কর্যে কত সমুন্নত ছিল। সেই দেশ আজ শৃঙ্খলিত, পরাধীন। এই ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য সমস্ত যুবসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সে জন্য আপনি কি কিছু চেষ্টা করেছেন ?

সুরেন্দ্র ধনী বংশের সন্তান। তাদের পরিবারে সে আবাল্য স্বদেশি আবহাওয়া দেখে এসেছে। দেশের গান, দেশের সাহিত্য, শিল্পকলার উন্নতির জন্য এই পরিবার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজদের কুক্ষিগত, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যুবসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব কে নেবে। সে রকমভাবে তো বাইরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশাই হয় না।

সে দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, দেশের যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ, মানে, কী করে তা হবে, ইংরেজ সরকার তা দেবে কেন ? কিছু করতে গেলে নিশ্চিত বাধা আসবে। আমরা সাধ্যমতন নিজেদের কাজ করে যাচ্ছি...ভবিষ্যতে যদি কখনও, মানে, যখন সময় আসবে...

ওকাকুরা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, বাধা আসবে ? কাজ শুরুর আগেই বাধার চিন্তা। এ দেশের তরুণদের মধ্যে নৈরাশ্যের সুর দেখে আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি। বাধা এলে প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। একটা দেশের হাজার হাজার যুবক যখন নিজেদের প্রাণ বলি দেবার জন্য তৈরি হয়, তখনই স্বাধীনতা আসে।

কথা থামিয়ে সিগারেটে কয়েকটা টান দিলেন ওকাকুরা। ভেতর থেকে একজন পরিচারক তাঁর জন্য একটি পানপাত্রে সুরা এনে দিল, তাতে একটি চুমুক দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করলেন, আপনি কখনও আপনার চোখের সামনে একজন লোক আর একজন লোকের বুকে ছুরি বসাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখেছেন ?

সাঙ্ঘাতিক চমকে উঠে সুরেন্দ্র বলল, না। না দেখিনি!

ওকাকুরা আবার বললেন, চোখের সামনে কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখেননি ?

সুরেন্দ্র আবার প্রবলভাবে দু'দিকে ঘাড় নাড়ল। হিন্দুরা দুর্গাপূজা-কালীপূজার সময় পাঁঠা বলি দেয় বলে ব্রাহ্মরা ঘৃণায় সেদিকে তাকায় না। তারা দেখবে মানুষ মারার দৃশ্য!

এবারে চেয়ারে হেলান দিয়ে সহাস্যে ওকাকুরা বললেন, আপনারা ঘেরাটোপে মানুষ হয়েছেন। কঠোর বাস্তবতা দেখতে চান না। সেই জন্য আপনাদের মন নরম, দুর্বল। আমাদের জাপানে কোনও ব্যক্তি খুব অপমানিত হলে কিংবা নিজের কোনও অপরাধ বোধ করলে সর্বসমক্ষে নিজে ছুরি দিয়ে নিজের পেট ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আবার কেউ যদি তার পরিবারের অসম্মান করে, তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। আমার ছেলেবেলায় কী একটি দৃশ্য দেখেছিলাম শুনুন। তখন আমি বেশ ছোট। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার, বাড়ি ভর্তি অনেক লোকজন। একদিন বাইরের দিকের একটি ঘরে কী নিয়ে যেন কয়েকজনের মধ্যে প্রবল বাগবিতণ্ডা শুরু হয়েছিল। জাপানিরা জানেন তো, এমনিতে কম কথা বলে, অনেক সময় চুপচাপ থাকে, কিন্তু উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হলে খুব জোরে চেঁচায়। সেই রকম চেঁচামেচি শুনে আমি কৌতূহলী হয়ে সেই ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি কী, একটা চেয়ারে বসে আছে আমার কাকার মুণ্ডহীন ধড়, মুণ্ডুটা গড়াচ্ছে মেঝেতে, আর গলা দিয়ে ফিনকি দিয়ে উঠছে রক্তের ফোয়ারা!

সুরেন্দ্র শিউরে উঠে হতবাক হয়ে গেল।

নিবেদিতা বললেন, জাপানিরা খুব কোমল প্রাণ, সামান্য ছোটখাটো ব্যাপারেও তাদের শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রয়োজনে তারা কঠোরস্য কঠোর হতে পারে।

ওকাকুরা বললেন, আপনি ভারতীয়, আমি জাপানি। কোথাও একটা মিল আছে আমাদের

মধ্যে। হিমালয় পর্বত দুটি শক্তিশালী সভ্যতাকে পৃথক করে রেখেছে, এক দিকে চিনের কনফুসিয়াস-পন্থী সাম্যবাদ, আর ভারতের বৈদিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কিন্তু সেই তুষারমণ্ডিত পর্বতও কখনও এই দুই সভ্যতার মধ্যে মৌল বিভেদ ঘটাতে পারেনি। এশিয়ার সব জাতির মধ্যেই আছে ভালবাসার ঐক্য। আপনাকে কয়েকটা ঘটনা বলি শুনুন। জাপানের সম্রাট তাকাকুরা এক দারুণ শীতে রাতে তাঁর গা থেকে লেপ কম্বল ফেলে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন অনেক গরিব প্রজার বাড়িতে সে রাতে তুষারপাত হচ্ছে, তারা শীতে কাঁপছে। কিংবা আর একজন, তাইসো, তিনি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ায় গরিব লোকদের খাবার জুটছিল না। এই যে ত্যাগের আদর্শ, যেখানে রাজা-প্রজা এক জায়গায় মিলে যায়, তা কি আমরা বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে পাইনি? ভারতের সঙ্গে আমাদের সমভ্রাতৃত্বের বন্ধন, ভারতের পরাধীন অবস্থার দুর্দশা দেখলে আমাদের বুকে ব্যথা বাজবে।

নিবেদিতা বললেন, সুরেন, আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, তাতে তোমাকে অংশ নিতে হবে।

ওকাকুরা বললেন, আপনার মতন যুবকদের সাহায্য চাই। অস্ত্রবিদ্যা শিখতে হবে, প্রয়োজনে চরম আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সুরেন এবার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমার এক পিসতুতো বোন সরলা, শ্রীমতী সরলা ঘোষাল ছেলেদের নিয়ে একটা সমিতি গড়েছেন। সেখানে অনেকে লাঠি, তলোয়ার খেলা শেখে।

নিবেদিতা বললেন, সে কথা জানি। সরলার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। এ রকম আরও কয়েকটি ছোটখাটো দলের সন্ধান পেয়েছি। বৃদ্ধ ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রও একটি সমিতি পরিচালনা করেন। এ দেশের বেশির ভাগ ব্যারিস্টারই কংগ্রেসের মিটিং-এ গিয়ে বক্তৃতার তোড়ে গগন ফাটায়, নিজেদের জাহির করে। মিস্টার মিত্র ওসব বক্তৃতায় বিশ্বাস করেন না, নিজেকে আড়ালে রাখেন। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। একজনের কাছে শুনলাম, অনেক দিন আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তখনই ওই ব্যারিস্টার মিত্র পরিকল্পনা করেছিলেন, জেল ভেঙে সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে আনবেন। সেটা তখন সম্ভব হয়নি, কিন্তু মানুষটির সাহস আছে বলতেই হবে। এখন তিনি একটি যুবক দল তৈরি করছেন। নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকা এইসব গুপ্ত সমিতিগুলিকে বাঁধতে হবে একতা সূত্রে।

ওকাকুরা বললেন, শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতেই এই যোগাযোগ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে। তার আগে, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। কাক-পক্ষীতেও যেন কিছু টের না পায়। মিঃ টেগোর, আপনি এই গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নিতে পারবেন তো?

নিবেদিতা সুরেন্দ্রর দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলেন।

সুরেন্দ্র মাথা নুইয়ে বলল, অবশ্যই পারব!

৬৩

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে
তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে কে হাতে পায়...

হঠাৎ থেমে গেলেন স্বামীজি। একটু গলা তুললেই হাঁপানির টান আসে। মঠবাড়ির দোতলায় গঙ্গার ধারের দক্ষিণ পূর্ব কোণে স্বামীজির নিজস্ব প্রশস্ত কক্ষ। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে চেয়ে স্বামীজি আপন মনে গান গাইছিলেন। আগে কতবার হয়েছে, কয়েকখানি গান গাইলেই মনের প্রফুল্লভাব ফিরে আসে। কিন্তু গান যেন তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। ঠিক মতন সুর না লাগলে তিনি নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

বিকেলের আকাশে ঘনিয়ে আসছে বজ্রগর্ভ মেঘ। গঙ্গার ওপর এখন অনেক নৌযান। এদিককার লোকজনেরা কলকাতায় বিষয়কর্ম সেরে ঘরে ফিরছে। ঝড় ওঠার আগে সবাই পৌঁছে গেলে হয়। একখানি খেয়ার নৌকো আসছে মঠের ঘাটের দিকে। স্বামীজি উদগ্রীব হয়ে তাকালেন। নৌকোয় অন্য কয়জন যাত্রীর মাঝখানে নিবেদিতা বসে আছে না?

নিবেদিতা অনেকদিন আসেনি। আজ সে এই অবেলায় আসছে কেন? ঝড়-বাদল শুরু হয়ে গেলে সে ফিরবে কী করে, এই মঠে তো তার থাকার ব্যবস্থা নেই। নিজের ভুল বুঝতে পেরে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসছে?

নৌকোটি এসে পাড়ে ভিড়ল। জোর বাতাসে উত্তাল হয়ে উঠেছে নদী, যাত্রীরা নামছে একে একে, স্বামীজির আশঙ্কা হল, নৌকোটা উল্টে না যায়। সকলের তাড়াহুড়োয় তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে।

না, যাত্রীদের মধ্যে নিবেদিতা নেই, স্বামীজির দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছিল। একটা চোখ তো প্রায় গেছে, দূরের সব কিছুই এখন খানিকটা ঝাপসা। নিবেদিতা তবে আজও এল না। সে নতুন হুজুগ নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। ধুলোর ঝড় আটকাবার জন্য স্বামীজি জানলা বন্ধ করে দিলেন।

একদিকে একটা খাওয়ার টেবিল। স্বামীজির খাওয়া-দাওয়া এখন খুবই নিয়ন্ত্রিত, তাই অন্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাধারণ ভোজনাগারে আর প্রায়ই খেতে বসেন না, ওখানে ওরা মশলা দেওয়া তরকারি ও মাছ খায়, তিনি নিজের ঘরেই যৎসামান্য আহার সেরে নেন। আর একদিকে তাঁর লেখার টেবিল, কয়েকটি চেয়ার, আলমারি, বিছানা, জপের আসন, একটি তানপুরা ও মৃদঙ্গ—সারা ঘরে চক্ষু বুলিয়ে এই সবই তাঁর হঠাৎ যেন অলীক মনে হল। যে কোনও নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। চক্ষু বুজলে আর কিছুই থাকে না।

নিবেদিতা কী নিয়ে মেতে আছেন, তা তিনি প্রথম প্রথম জানাতে না চাইলেও স্বামীজি ঠিকই জেনে গেছেন। তাঁর কাছেও কিছু কিছু যুবক আসে, যারা ঠিক আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। হঠাৎ সম্প্রতি বেশ কিছু যুবকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব দেখা যাচ্ছে। বুয়র যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রাথমিক ধাক্কা খাওয়ার পরেই যেন এটা ঘটছে। এই সব যুবকেরা নিবেদিতার কাছেও যাতায়াত করে। নিবেদিতা আর জাপানি পণ্ডিত ওকাকুরা মিলে এদের কানে স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য উস্কানি দিচ্ছে। ওদের ধারণা, এক বছরের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা

প্রাপ্তি সম্ভব ! ওরা দুজনে জো ম্যাকলাউডকে দলে টেনেছে, টাকা সাহায্য নিচ্ছে তার কাছ থেকে। ওলি বুলের কাছেও অর্থ সাহায্যের আবেদন করেছে কিনা কে জানে ! ওঁরা দুজনেই ছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সবচেয়ে বড় শুভার্থী !

স্বাধীনতা যেন ছেলের হাতের মোয়া ! স্বামীজি নিজে পরাধীনতার অপমানের কথা অনেকবার বলেননি ? এমনকী তিনি বোমা বানাবার কথাও বলেছেন। আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত, দেশের জন্য ত্যাগ, এমনকী প্রাণদানের মতন সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা তাঁর আগে কে বলেছে ? হ্যাঁ, স্বাধীনতার জন্য দেশকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে, কিন্তু সেই প্রস্তুতির জন্য নেতৃত্ব দেবে এক জাপানি আর এক আইরিশ রমণী, সাহায্য করবে দুই আমেরিকান ? এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কী হতে পারে ! এ দেশে আর মানুষ নেই ?

নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর এই নিয়ে মন কষাকষি, এমনকী বিবাদ পর্যন্ত হয়ে গেছে।

ওকাকুরাকে স্বামীজি বেশ পছন্দই করেছিলেন প্রথম দিকে। না হলে কি আর তাঁর সঙ্গে এই অসুস্থ শরীর নিয়েও বোধগয়া যেতেন ? লোকটি যথার্থ পণ্ডিত ও অনেক বিষয়ে গুণী, শিল্প সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান আছে। এশিয়ার মানুষদের একাত্মতা এবং মর্যাদাবোধ—এই বিষয়ে এই মানুষটির মতন আগে কেউ বলেননি। বাংলার এক কবি হেম বাঁড়ুজ্যে জাপান সম্পর্কে কী খারাপ কথাই লিখেছেন, তা জানতে পারলে ওকাকুরা নিশ্চিত দুঃখ ও আঘাত পাবেন। স্বাধীন ও উন্নত দেশ জাপান, সেখানকার মানুষ একই সঙ্গে দুঃসাহসী ও শিল্পপ্রিয়, হেমচন্দ্র জাপান সম্পর্কে কিছু না জেনেই অমন কথা লিখেছেন। এমন অজ্ঞতা কবিদের সাজে না।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই ওকাকুরা সম্পর্কে মনোভাব বদলে যাচ্ছে স্বামীজির। লোকটির যতই গুণ থাক, ওঁর মধ্যে ত্যাগের লেশমাত্র নেই। বরং অধিকমাত্রায় ভোগবাদী। ত্যাগ ছাড়া কি কোনও মহৎ কাজ সম্ভব হতে পারে ? ত্যাগ ত্যাগ, এখন শুধু সর্বস্ব ত্যাগ চাই। কংগ্রেসের এক সর্বভারতীয় নেতা কিছুদিন আগে স্বামীজির প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে একটা খোঁচা মেরে বলেছিলেন, বিবাহ না করে সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করাটাকেই কেউ কেউ আদর্শ পথ বলেন কেন ? প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরা তো সকলেই বিবাহ করতেন। নারীদের তাঁরা জীবন থেকে বাদ দেননি, সাধনপথের অন্তরায়ও মনে করেননি। কথাটা শুনে স্বামীজির হাড়-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা হয় ? তোরা বিয়ে করে এক গুষ্ঠি কাচ্চাবাচ্চার জন্ম দিবি, সংসার চিন্তা, অর্থ চিন্তা, তারপর দেশ সেবা ? যত সব অপোগণ্ডের দল !

ওকাকুরা এমনিতে স্বল্পভাষী, কিন্তু স্ত্রীলোকদের কাছে বেশ বাক্‌পটু। নিবেদিতার ওপর যেন কুহক বিস্তার করেছেন। নিবেদিতা এখন আর অন্য কোনও কথাই শুনতে বা বুঝতে চায় না।

মাস দেড়েক আগে নিবেদিতা দেখা করতে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল মায়াবতী যাওয়ার জন্য স্বামীজির কাছে অনুমতি চাওয়া। হঠাৎ মায়াবতী আশ্রম পরিদর্শন করার জন্য নিবেদিতার মন উথলে উঠল কেন ? সঙ্গে আর কে কে যাচ্ছে ? হ্যাঁ ঠিক, ওকাকুরা অন্যতম সঙ্গী। স্বামীজি প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার স্কুলের কাজ ভাল করে শুরু হল না, এখনই তোমাকে অতদূরে যেতে হবে কেন ? ওকাকুরাও কিছুদিন আগে উত্তর ভারত ভ্রমণ করে এলেন।

নিবেদিতা স্কুলের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, আমরা যে কাজ শুরু করেছি, তার কিছু গোপন শলাপরামর্শের জন্য একটা কোনও নিভৃত স্থানে যাওয়া দরকার।

স্বামীজি বলেছিলেন, তুমি কী কাজ শুরু করেছ, তা আমি জানি। ও রকম মরীচিকার পেছনে ছোটার চেষ্টা ছাড়ো, মার্গট। নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই তোমার আসল কাজ।

কথাটা মনঃপূত হয়নি নিবেদিতার। গুরুর কথায় তিনি প্রতিবাদ করেন না, মুখে মুখে তর্কও করেন না, তবু চক্ষু নত করে বলেছিলেন, আমার কাছে এখন স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করাই আরও বড় কাজ। প্রধান কাজ। স্বাধীন না-হলে এ দেশের মানুষের পক্ষে কোনও উন্নতিই সম্ভব নয়।

স্বামীজি বলেছিলেন, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু তার জন্য দেশকে আগে তৈরি হতে হবে। এই জাত-পাত, ছুঁৎমার্গ, কুসংস্কার আর অশিক্ষায় ভরা দেশ, এখানে এমনি

এমনি স্বাধীনতা আসতে পারে ?

নিবেদিতা মৃদু স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, এই সব ভেবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে তো কোনওদিনই স্বাধীনতা আসবে না। এখনই প্রকৃষ্ট সময়। ইংরেজকে আচমকা আঘাত দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে ধরাশায়ী করা যেতে পারে।

স্বামীজি বিদ্রুপের হাসি দিয়ে বলেছিলেন, বাতুলতা ! ও সব উদ্ভট চিন্তা ছাড়ো তো ! ওকাকুরার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করো। ও লোকটার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

নিবেদিতা যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজি ওকাকুরার মতন মানুষের সম্পর্কে এইভাবে কথা বলছেন ? এই ওকাকুরাকেই স্বামীজি একদিন নিজের ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলেন না ? অন্যদের কাছে এঁর কত গুণপনার উল্লেখ করেছেন। আর আজ এই কথা বললেন। তবে কি স্বামীজির মনে ঈর্ষা জন্মেছে ? না না, তা কেমন করে হবে, তাঁর গুরুর মতন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই ঈর্ষা-বিদ্বেষের মতন সাধারণ মানসিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে।

তবু, শারীরিক দুর্বলতার কারণেই হয়তো, সম্প্রতি স্বামীজি মাঝে মাঝে এমন কথা বলেন, যার মধ্যে ঠিক সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনও কখনও মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। তাঁর মেজাজের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতামতের পরিবর্তন ঘটে। জগদীশ বোস সম্পর্কেও হঠাৎ একদিন এ রকম কথা বলে তিনি নিবেদিতাকে হতবাক করেছিলেন। যে-জগদীশচন্দ্রের প্যারিসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে সাফল্য দেখে স্বামীজি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, যাঁকে ভারতের সুসন্তান বলে তিনি গর্ব বোধ করেছিলেন, সেই জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে তিনি এমন কথা বলেছিলেন, যা মনে হতে পারে ঈর্ষা-সঞ্জাত। সেদিন নিবেদিতা অবশ্য জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে একটু বেশি কথাই বলছিলেন। রামায়ণে আছে, ঋদ্ধিমান পুরুষ কোনও নারীর মুখে অপর পুরুষের বেশি প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। এমনকী স্বয়ং রাম তাঁর নিষ্কলঙ্ক ভ্রাতা ভরতের প্রশংসাও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেননি সীতার মুখে। স্বামীজিও নিবেদিতার ওপর হঠাৎ ফেটে পড়ে বলেছিলেন, ও লোকটা তো গৃহী। গৃহীর মুক্তি নেই। যদি তোমার সঙ্গে থাকে, এ কথা ওকে জানিয়ে দিয়ো। তাকে বোলো, ত্যাগ চাই, ত্যাগ। যদি বিরাট কোনও ত্যাগ না করতে পারে, তা হলে কখনও বড় ধরনের শক্তি আয়ত্ত করতে পারবে না। বিয়ে জিনিসটা জঘন্য। যারা বিয়ে করে ফেলে, তাদের দ্বারা আর কী হবে ? তুমি জগদীশকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা করো কেন ?

ফ্রান্সে সেই দিনটিতে নিবেদিতা স্বামীজির এত রাগের কারণ বুঝতে পারেননি। বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই ওপর তাঁর রাগ। তা-হলে কি জগতে আর কেউ বিয়ে করবে না ? জগদীশচন্দ্রের শিক্ষিতা স্ত্রী তো স্বামীকে সব কাজে অনেক সাহায্য করেন। স্বামীজি বড়ই উগ্র ও অযৌক্তিক হয়ে পড়েছিলেন সেদিন। জগদীশচন্দ্র যদিও স্বামীজি সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম, তিনি কালীপূজা এবং গুরুবাদের বিরোধী, সেটাই কি রাগের কারণ ? কিংবা বিবাহিত মানুষদের সম্পর্কে স্বামীজির এত উগ্র ক্রোধের কারণ কি তাঁর নিজেরই অবচেতনের কোনও অপরাধবোধ ?

নিবেদিতাকে নিঃশব্দ দেখে স্বামীজি আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি যে স্বাধীনতার লড়াই শুরু করতে চাও, ইংরেজরা কি কচি খোকা ? পৃথিবীতে তারা সবচেয়ে শক্তিশালী জাত। শুধু বক্তিমে দিয়ে তাদের ঘায়েল করা যাবে না। বোমা চাই, কামান-বন্দুক, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, প্রচুর টাকাকড়ি, এ সব কোথায় পাবে, কে দেবে ?

নিবেদিতা বলেছিলেন, সে সবের তো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। জাপান সাহায্য করবে। কোরিয়াও প্রস্তুত আছে। এশিয়ার অন্য সব দেশ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, এ দেশের যুব সমাজকে এখন সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারলেই হয়।

স্বামীজি অট্টহাস্য করে বললেন, এশিয়ার সব দেশ সাহায্যের জন্য তৈরি ? এটা কি স্বপ্ন, না উদ্ভট কল্পনা, না কি গাঁজাখুরি গপ্পি ? অ্যাঁ ?

নিবেদিতা ব্যথা পেলেন। ওকাকুরা সম্পর্কে এ রকম অশ্রদ্ধেয় উক্তি তিনি মেনে নিতে পারেন না। তিনি কি মিথ্যে কথা বলবেন !

নিবেদিতা বললেন, নোগু নিজে আমাকে এ সব কথা বলেছে।
স্বামীজি ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন, নোগু ? নোগুটা আবার কে ?
কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে নিবেদিতা বললেন, নোগু ওকাকুরার ডাকনাম। আমি অনেক সময় ওকে এই নামে ডাকি।
এবার ক্রোধে স্বামীজির চক্ষু বিস্ফারিত হল। তিনি বললেন, ও, এতদূর ? তুমি জগদীশ বোসকেও মাঝে মাঝে খোকা, খোকা বলো। অথচ সে তোমার চেয়ে বয়েসে বড়। তুমি ব্রিটিশ, তুমি শ্বেতাঙ্গিনী, এই পরিচয় কিছুতে ভুলতে পারো না, না ? তোমরা নিজেদের সব সময় বড় ভাবো। প্রাচ্য দেশের দু-একটা উঠতি গুণীদের তোমরা খানিকটা প্রশ্রয় দিয়ে বাচ্চাদের মতন পিঠ চাপড়াও, তাই না ? নইলে ওকাকুরার মতন একজন বিশিষ্ট মানুষকে তুমি ডাকনাম ধরে ডাকো কোন সাহসে ? কদিন মাত্র তোমাদের পরিচয় ! কোনও ইংরেজকে এ দেশের কেউ হ্যারি-ল্যারি-গ্যারি বলে ডাকতে পারে ?
নিবেদিতার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল মুখমণ্ডল। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, এ আপনি কী বলছেন ? আমি শ্বেতাঙ্গিনী, বিদেশিনী ? আমি তো ভারতেরই কন্যা, আমার আর সব পরিচয় মুছে গেছে। আপনিই তো আমাকে এ দেশের কাজের জন্য নিবেদন করেছেন, তাই আমি নিবেদিতা।
স্বামীজি বললেন, না। তোমাকে আমি দেশ নামে কোনও ভাবমূর্তির কাছে নিবেদন করিনি। তোমাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়ে নিবেদন করেছি ভগবানের চরণে, আমার গুরুর কাজে। তোমাকে মানবসেবায় বুদ্ধের পথ অনুসরণ করতে বলেছিলাম। তুমি শ্রীশ্রী মায়ের কন্যা।
নিবেদিতা বললেন, সে পথ থেকে তো আমি এক মুহূর্তের জন্যও সরে যাইনি। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা কি মানবসেবা নয় ?
স্বামীজি বললেন, শোনো মার্গট, এ বার তোমাকে স্পষ্ট কথা জানাবার সময় এসেছে। আমরা সন্ন্যাসী, রাজনীতি আমাদের পথ নয়। তোমাকে আমি এ দেশে এনেছি, সকলেই জানে তুমি শ্রী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। তুমি এখন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে সে দায় আমাদের ওপরও অর্শাবে। তোমাকে এ বার তোমার পথ বেছে নিতে হবে। তুমি মাঝে মাঝে এক একটা হুজুগ নিয়ে মেতে ওঠো। প্রথমে তোমার ছিল ব্রাহ্ম-ঝোঁক, ওদের সঙ্গে খুব মেশামেশি করতে। তারপর হল ঠাকুরবাড়ির ঝোঁক। ওখানে নিয়মিত যাতায়াত, ওদের সঙ্গে গলাগলি। এখন হয়েছে এই ওকাকুরা-ঝোঁক। আশা করি এটাও তোমার কেটে যাবে, তুমি স্থিত হবে।
নিবেদিতা নীরব রইলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কি নিছক হুজুগ বা ঝোঁক ? শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনুগামী হলে কি অন্যদের সঙ্গে মেশা যাবে না ? ব্রাহ্মদের মতবাদ জানা দোষের কেন হবে ? ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতিবান পুরুষ-নারীরা কেউ শিল্পী, কেউ কবি, কেউ দার্শনিক। আর কোন পরিবারের মহিলারা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন ? সরলা ঘোষালের মতন যুবতী সমগ্র বাংলায় আর একটিও আছে কি ? এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কি অপরাধ ? নিবেদিতার উদারনৈতিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় এটা ঠিক মেলাতে পারেন না। যদিও গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি ও ভালবাসা তাঁর এক চুলও টলেনি। গুরুর কোনও নির্দেশ লঙ্ঘন করার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন না। কিন্তু আইরিশ রক্ত রয়েছে তাঁর শরীরে, স্বাধীনতার স্পৃহা তাঁর জন্মগত, বিপ্লবী ক্রোপটকিনের চিন্তাধারায় তিনি উদ্বুদ্ধ, ওকাকুরা বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন, সংগ্রাম শুরু করার এখনই তো সুবর্ণ সুযোগ। এখন তিনি এ পথ থেকে সরে যাবেন কী করে ? ইস, এ সময় যদি স্বামীজি দেশের বাইরে থাকতেন, তা হলে কী ভালই হত, নিবেদিতাকে এই সঙ্কটে পড়তে হত না। স্বামীজি সংগ্রামে অংশ নেবেন না, এখন ভারতে তাঁর উপস্থিতিই দেশসেবার পরিপন্থী।
নিবেদিতার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে স্বামীজি আবার গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি তোমার পথ বেছে নাও, আজই মনস্থির করো।
স্বামীজি নির্দেশ দেননি, পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তা হলে তো নিবেদিতার আর

কোনও দ্বিধা রইল না।
নীরবতাই উত্তর ধরে নিয়ে স্বামীজি বললেন, যদি রাজনীতির হুজুগ নিয়েই মেতে থাকতে চাও, তা হলে মঠের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। এখানে তোমার যাওয়া-আসা আর ঠিক হবে না। মঠের ওপর পুলিশের নজর পড়ুক এটা আমরা কেউ চাই না !
নিবেদিতা গুরুকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তারপর সত্যি সত্যি ওকাকুরার সঙ্গে চলে গেলেন হিমালয়ে।
স্বামীজি পরে অনুভব করেছিলেন, তিনি প্রিয় শিষ্যার ওপর বেশি কঠোর হয়ে পড়েছিলেন সেদিন। নিবেদিতার স্বাধীনতার লড়াই এখনও পর্যন্ত শুধু আলোচনা পর্বেই রয়েছে, ওকাকুরা আর নিবেদিতা মিলে কিছু লোকজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিটিং করে, সরলার দল ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বোধহয়, এখনও এমন কিছু ঘটেনি, যাতে নিবেদিতার এই মঠে আসা-যাওয়া বন্ধ করতে হবে। মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে নিবেদিতাকে নিয়ে যে একটা চাপা গুঞ্জন চলছে, তা স্বামীজি টের পান। নিবেদিতা যে এখন ধর্মচর্চার বদলে রাজনীতিচর্চাই বেশি করছেন, তা এখানকার অনেকেই জেনে গেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দও একদিন অনুযোগ করছিলেন এ বিষয়ে। তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বামীজি।
নিবেদিতা আর এখানে আসবে না ? মায়াবতী থেকে ফিরে এসেছেন নিবেদিতা, স্বামীজি সে খবর পেয়েছেন। ফেরার পর একবার দেখা করতেও এল না ? স্বামীজির মেজাজ মাঝে মাঝে খুব গরম হয়ে যায় সবাই জানে, আগেও তো কয়েকবার নিবেদিতাকে বকাবকি করেছেন। এবার তার অভিমান এত তীব্র ? নিবেদিতা বাগবাজারের বাড়িতেই রয়েছেন, স্বামীজি হঠাৎ একদিন সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর মুখের অবস্থা কী রকম হবে ? কিংবা বলরাম বসুর বাড়িতে গিয়ে স্বামীজি ওঁকে ডেকে পাঠাতে পারেন। কিন্তু শরীর যে আর বয় না, গঙ্গা পার হতে আর ইচ্ছে করে না। এক-একদিন দোতলা থেকে আর নীচেই নামেন না সারাদিন। না ডাকলে নিজে থেকে আর আসবে না নিবেদিতা !
শরৎ নামে সেই গৃহী শিষ্যটি প্রতিদিনই দেখা করতে আসে কলকাতা থেকে। সঙ্গে কিছু না কিছু আনে। আগে কলকাতার বিখ্যাত দোকানগুলির মিষ্টি নিয়ে আসত। এখন স্বামীজির একদানা চিনি খাওয়াও সম্পূর্ণ বারণ। মিষ্টি খেতে তিনি কী ভালই বাসতেন। কতদিন আইসক্রিম খাওয়া হয়নি। আর কি খাওয়া হবে এ জীবনে ? শরৎ এখন নানারকম ফলমূল আনে।
শরৎ ঘরের কাছে এসে দেখল, সন্ধে হয়ে এলেও ঘরে বাতি জ্বালা হয়নি, প্রায়ান্ধকারে স্বামীজি খাটের ওপর চুপ করে বসে আছেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। শরৎ নিঃশব্দে ভেতরে এসে বসে রইল।
একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বামীজি বললেন, এসেছিস ! আজ শরীরটা বড় বেজুত হয়েছে রে ! পা ফুলে গেছে, হাঁটতে পারছি না ভাল করে, ঘরের বাইরে যাইনি।
শরৎ জিজ্ঞেস করল, একটু পা টিপে দেব ?
স্বামীজি বললেন, দে। একটু তামাক সেজে দে, অনেকক্ষণ খাইনি।
স্বামীজি বিছানায় বসলেন, শিষ্য তাঁর পদসেবা করতে লাগল। স্বামীজি তাঁর নানান প্রশ্ন ও কৌতূহলের উত্তর দেন, আবার তাঁর কাছ থেকে কলকাতার অনেক খবরও শোনেন।
একটু পরে স্বামীজি মেঝেতে নেমে আসতেই শরৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। স্বামীজি বললেন, দ্যাখ, সারাজীবন কত কষ্ট করেছি, গাছ তলায় শুয়ে রাত কাটিয়েছি। এখন আমেরিকানরা আমার আরামের জন্য খাট-বিছানা-গদি করে দিয়েছে। এ রকম বিছানায় শুলে এক একসময় আমার গায়ে ব্যথা হয়, শরীর তো জলে ভরে গেছে। কিছুক্ষণ মেঝেতে শুলেই বরং আরাম হয়। মাঝে মাঝে ভাবি কী জানিস, এ সব মঠ ফঠ করার বদলে বোধহয় আমাদের গাছতলায় ফিরে যাওয়াই উচিত ছিল।
মেঝেতে শুয়ে চক্ষু বুজে বললেন, লোকের গুলতোন দেখে আর কী হবে ? আজ তুই আমার কাছে থাক।
শরৎ ধন্য হয়ে বলল, আপনার সঙ্গে থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও আমার ইচ্ছে হয় না।

স্বামীজি আস্তে আস্তে বললেন, সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।

একটু পরে স্বামীজি ঘুমিয়ে পড়লেন।

জেগে উঠলেন রাত চারটের সময়। ব্যস্ত হয়ে শরৎকে ঠেলে তুলে বললেন, ওঠ, ওঠ, জপে বসতে হবে না? সবাইকে গিয়ে জাগা। দেরি হয়ে গেছে। একটা ঘণ্টা নিয়ে যা, ওটা বাজিয়ে সবাইকে ডাকবি। ব্রহ্মানন্দটা বেশি ঘুম-কাতুরে, ওর কানের কাছে জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাবি।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, পাখি ডাকেনি। গ্রীষ্মকালে শেষ রাত্তিরেই ভাল ঘুম হয়, হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি শুনে অনেকে কাঁচা ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠল। ব্রহ্মানন্দ কোনও বিপদের আশঙ্কায় ত্রস্তে উঠে বসলেন, তারপর শরৎকে দেখে বললেন, আ মোলো যা, এ বাঙালের জ্বালায় যে মঠে থাকাই দায় হল! তোরা কি রাত পোহাতেও দিবি না!

প্রতিদিন প্রত্যূষে ঠাকুর ঘরে রামকৃষ্ণের ছবির সামনে জপ-ধ্যান করা সমস্ত মঠবাসীর জন্য বাধ্যতামূলক। স্বামীজি এক একদিন সকলের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। কোনওদিন নীচে নামতে না পারলে তিনি নিজের ঘরেই একাকী ধ্যানে বসেন।

আজ কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর স্বামীজি আস্তে আস্তে ঠাকুর ঘরে নেমে এলেন। ঘর প্রায় খালি। অনেকেই আবার বিছানায় ফিরে গেছে, ধ্যান করছে মাত্র দুজন। সে দৃশ্য দেখা মাত্র স্বামীজির মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। তিনি চিৎকার করে বললেন, শরৎ, বাকিরা কোথায় গেল? ডাক, সবাইকে এক্ষুনি আমার সামনে আসতে বল।

সেখানে একটা বিচার সভা বসিয়ে দিলেন স্বামীজি। সন্ন্যাসীরা একে একে চোখ মুছতে মুছতে আসছে, স্বামীজি তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করছেন। কেউ কেউ অপরাধীর মতন চুপ করে রইল, কেউ কেউ অজুহাত খোঁজার জন্য বলল, পেট ব্যথা করছিল, কাল একটু জ্বর জ্বর হয়েছিল। স্বামীজি প্রচণ্ড বকাবকি করতে লাগলেন সবাইকে। তারপর বিচারের রায় দিলেন, যা, আজ তোরা কেউ মঠে খেতে পাবি না। ভিক্ষে করতে বেরো। ভিক্ষে করে যা পাবি, তাই খেয়ে থাকবি।

ব্রহ্মানন্দ দেখলেন, অসুস্থ শরীরে এ রকম রাগারাগি করা স্বামীজির পক্ষে ভাল নয়। তিনি কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে বললেন, ভাই নরেন, তুই এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন, শান্ত হ। বাইরে এখনও ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, এর মধ্যে বেচারারা উঠবে কী করে? সবার তো আর তোর মতন স্বল্প ঘুম নয়!

স্বামীজির মেজাজ এমনই তিরিক্ষি হয়ে আছে যে বাল্যবন্ধুকেও রেয়াত করলেন না। চোখ গরম করে বললেন, তুই খুব সর্দারি হয়েছিস, তাই না? যা, আজ তোরও মঠে খাওয়া বন্ধ। তোকেও মাধুকরী করে খেতে হবে।

স্বামীজির হুকুম কে অগ্রাহ্য করবে? এ মঠের পরিচালনা ভার তিনি নিজেই ছেড়ে দিয়েছেন, তবু তিনিই সর্বেসর্বা। সবাই আড়ষ্ট মুখে বেরিয়ে যেতে লাগল। স্বামীজি আবার হেঁকে বললেন, তা বলে কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাওয়া চলবে না। অচেনা মানুষের কাছে ভিখ মাঙবি, মনে থাকে যেন!

তারপর স্বামীজি সারাদিন গ্রন্থ পাঠে ডুবে রইলেন। বিকেলের দিকে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল। জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ খেয়া নৌকোগুলি দেখলেন। নিবেদিতা আজও এলেন না।

আজ মঠের সন্ন্যাসীদের তিনি কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। যদিও সন্ন্যাসীদের পক্ষে মাধুকরী নতুন কিছু নয়। বরানগরে থাকার সময় তাঁদের অনেকদিনই ভিক্ষান্ন খেতে হয়েছে। কিন্তু এখন তো সেই ছেঁড়া কাঁথায় পাঁচজন শুয়ে থাকার দিন আর নেই। নতুন নতুন সন্ন্যাসীরা কি আর লোকের কাছে মুখ ফুটে ভিক্ষে চাইতে পারবে? আহা, ছেলেগুলি যদি আজ না খেয়ে থাকে—

স্বামীজি নীচে নেমে এলেন। একটা ঘরে প্রচুর হাসাহাসি হচ্ছে, স্বামীজি সেখানে উপস্থিত হতেই ব্রহ্মানন্দ বললেন, আজ বিবেকানন্দ স্বামী আমাদের কী উপকারটাই না করলেন সবাই বল। ভাই নরেন, তোর দয়ায় আজ মঠের রাঁধুনির একঘেয়ে রান্না খেতে হল না, চমৎকার স্বাদ বদল হল।

স্বামীজি কৌতূহলী হয়ে বললেন, কী পেলি রে, কী পেলি?

ব্রহ্মানন্দ বললেন, আমাদের রাঁধতেও হয়নি। এই তো মাইল তিনেক দূরে সালকের মোড়ের কাছে এক মাড়োয়ারির বাড়ি। তারা ডেকে যত্ন করে কত কী ভাল ভাল জিনিস খাওয়াল।

স্বামীজি সহাস্যে বললেন, তাই নাকি? তা হলে তো আমারও যাওয়া উচিত ছিল, কী কী ছিল রে?

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে যে দলটি গিয়েছিল, তারা সবাই উত্তম সুখাদ্য পেয়েছে। বাকি সকলের এমন সৌভাগ্য হয়নি। কেউ কেউ চাল ডাল পেয়ে ফুটিয়ে খিচুড়ি বানিয়েছে, কেউ কেউ গৃহস্থদের কাছ থেকে পেয়েছে মুখঝামটা। যারা কিছু পায়নি, তাদের সঙ্গেও হাসাহাসি করতে লাগলেন স্বামীজি। তারপর বললেন, যা দ্যাখ ভাঁড়ারে চিঁড়ে-মুড়ি কী আছে, তাই-ই এখন খেয়ে আয়।

তাঁর শেষ রাত্রের উগ্র মূর্তির সঙ্গে এখনকার প্রসন্নতার কত তফাত।

গল্প করতে করতে স্বামীজি এক সময় ব্রহ্মানন্দকে বললেন, হ্যাঁ রে রাখাল, এই অমাবস্যায় মঠে কালীপুজো করলে হয় না?

ব্রহ্মানন্দ বললেন, তা কী করে হবে, আগে বলিসনি। অমাবস্যা তো এসে গেল।

স্বামীজি তবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, তাতে কী! এই ক দিনেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। লাগিয়ে দে। খুব গান হবে সে দিন।

অন্য সকলেই রাজি। এরপর কদিন কালীপুজোর প্রস্তুতি চলতে লাগল।

মঠে কালীপূজা হবে, আর নিবেদিতা আসবেন না? তাঁকে খবরও দেওয়া হবে না? দুর্গা পুজোর সময় তিনি এ-দেশে ছিলেন না। নাঃ, মেয়েটার এবার মান ভাঙাতেই হবে। শরৎকে স্বামীজি বললেন, আজ ফেরার পথে নিবেদিতাকে একবার খবর দিয়ে যাস তো যে আমি তাকে মঠে ডেকেছি।

একটু পরেই তাঁর মনে হল, শুধু মুখে খবর পাঠাবার বদলে চিঠি লিখে দিলে ভাল হত না? জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন, শরৎ নৌকোয় উঠতে যাচ্ছে। তিনি হাঁক দিলেন, শরৎ, শরৎ, একটু দাঁড়া, উঠিসনি—

খালি গায়ে ছিলেন, শুধু একটা চাদর জড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এলেন স্বামীজি। বাইরে এসে বললেন, চল, আমিও তোর সঙ্গে ওপারে যাব।

শরৎ বিস্মিত হয়ে বলল, সে কী! আপনার শরীর ভাল নেই, সন্ধে হয়ে এসেছে, এখন কেন যাবেন? ফিরবেন কখন?

স্বামীজি হাত তুলে বললেন, ওসব তোকে চিন্তা করতে হবে না।

বাগবাজারের ঘাটে নেমে বললেন, তোকে আর আসতে হবে না। তুই বাড়ি যা।

ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া না করে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন স্বামীজি। বোসপাড়া লেন বেশি দূর নয়।

সবে মাত্র দিনের তৃতীয়বার স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেশবিন্যাস করছেন নিবেদিতা, দরজায় একটা শব্দ শুনে চমকে তাকালেন। পরিচারিকাটি অসুস্থ, নীচে কারুর সাড়া না পেয়ে স্বামীজি একেবারে ওপরে উঠে এসেছেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না নিবেদিতা, হাতে যেভাবে চিরুনিটা ধরা ছিল, সেইভাবেই হাত থেমে গেল, তিনি যেন চিত্রার্পিত হয়ে রইলেন। তারপর ঘোর ভেঙে অস্ফুট স্বরে বললেন, আমার প্রভু!

স্বামীজি সহাস্যে বললেন, কেমন আছ, মার্গট?

যেন ঠিক আগের মতন, মাঝখানে কিছুই ঘটেনি।

নিবেদিতা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন।

স্বামীজি বললেন, না, বেশিক্ষণ থাকব না। মঠে ফিরতে হবে। তুমি কেমন আছ, দেখতে এলাম।

নিবেদিতা বললেন, আপনি আমাকে বিশুদ্ধ আনন্দের সন্ধান দিয়েছেন। আমি আর কখনও

খারাপ থাকি না।

সত্যিই আর বেশিক্ষণ রইলেন না স্বামীজি। হঠাৎ হাঁপানির টান এসেছে, সেটা তিনি নিবেদিতাকে জানাতে চান না। নিবেদিতা বিশেষ কথা বলতে পারলেন না, শুধু স্থির দৃষ্টিতে স্বামীজিকে দেখছেন।

যাবার আগে স্বামীজি বললেন, শিগগির একদিন মঠে এসো।

কয়েকদিন পরই ভোরবেলা নিবেদিতা এসে উপস্থিত। গুরুর পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। নিবেদিতা পরেছেন কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লুটোনো সাদা রঙের গাউন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

স্বামীজি সকৌতুকে বললেন, না ডাকলে বুঝি তুমি আর আসতে না?

নিবেদিতা বললেন, মায়াবতী থেকে ফিরেই আমি এখানে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তখন জানতে পারলাম আপনি নদিয়ার কোন গ্রামে গেছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ গিয়েছিলাম বটে বড় জাগুলিয়ায়, আমার এক শিষ্যা মৃণালিনী বসু খুব করে ডেকেছিল। ভেবেছিলাম, গ্রামে গিয়ে থাকলে শরীর সারবে, এক সপ্তাহ রইলাম, বিশেষ কিছু সুবিধে হল না।

নিবেদিতা বললেন, আপনি সর্বক্ষণ আমার হৃদয়ে রয়েছেন। অনেক দূরে থাকলেও আপনাকে খুব কাছে অনুভব করি।

স্বামীজি বললেন, তুমি তো প্রাতরাশ খেয়ে আসোনি, দাঁড়াও, তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করি।

নিবেদিতা উঠে গিয়ে সাহায্য করতে গেলে স্বামীজি আবার তাঁকে বললেন, তুমি চুপটি করে বসো, আমি নিজের হাতে তোয়ের করব।

স্বামীজি তাঁদের মতভেদ, ওকাকুরা প্রসঙ্গ একেবারেই উত্থাপন করলেন না। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে খাদ্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। কাঁঠালের বিচি সেদ্ধ, আলুসেদ্ধ। দু চামচ সাদা ভাত আর পাথরের গেলাসে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দুধ।

টেবিলের ওপর একটি পিরিচে সে সব সাজিয়ে দিলেন। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, এ কী, আপনি আমার সঙ্গে খেতে বসবেন না?

স্বামীজি বললেন, আজ যে একাদশী, আমার উপোস। আজ মঠে নিরামিষ, তাই তোমাকে আর কিছু দিতে পারলাম না।

নিবেদিতা বললেন, আপনি নিজের হাতে যা দেবেন, তা-ই অমৃত। নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার আমার খুব পছন্দ।

যেন মাঝখানে কিছুই হয়নি, আগেরই মতন সব কিছু, স্বামীজি রঙ্গ রসিকতা করতে লাগলেন নিবেদিতার সঙ্গে। আহার শেষ হবার পর নিবেদিতা হাত ধোবার জন্য একটি জলের জগ তুলে নিতেই স্বামীজি হা-হা করে উঠে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি তোমার হাত ধুইয়ে দেব।

নিবেদিতার উচ্ছিষ্ট মাখা হাতে জল ঢেলে দিতে লাগলেন স্বামীজি। তারপর একটি পরিষ্কার সাদা তোয়ালে দিয়ে মুছতে শুরু করলেন সেই নরম, চম্পকবর্ণ আঙুলগুলি। নিবেদিতা বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজির মুখের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, এ কী করছেন? এ সব তো আপনার জন্য আমারই করার কথা!

স্বামীজি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন মনে নেই?

নিবেদিতার চক্ষে জল এসে গেল। যিশু তো ওই কাজ করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দিনে। এ কী অলক্ষুণে কথা বলছেন স্বামীজি?

উদ্গত অশ্রু কোনওক্রমে চেপে নিবেদিতা বললেন, আপনি কয়েক মাস আগে জো ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, আপনি চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচবেন না। তা শুনে জো কী বলেছিল, আপনার মনে আছে? আপনি গৌতম বুদ্ধের ভক্ত, বুদ্ধের জীবনের বড় কাজ তো তাঁর চল্লিশ বছর বয়েস থেকে আশি বছর বয়েসের মধ্যেই হয়েছিল। আপনি এর মধ্যে এ সব কথা ভাবছেন কেন?

আপনার জীবনের অনেক কাজ বাকি!

স্বামীজি ধীর স্বরে বললেন, আমার যা দেবার ছিল তা দিয়ে ফেলেছি, এখন আমাকে যেতেই হবে।

নিবেদিতা ব্যাকুল ভাবে বললেন, আপনি আরও অনেক কিছু দিতে পারেন। আপনার মতন আর কে পারবে?

দূরের দিকে তাকিয়ে স্বামীজি অনেকটা আপন মনে বললেন, বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বাড়তে দেয় না। তাদের জায়গা করে দেবার জন্যই আমাকে যেতে হবে। আমি চলে গেলেও কাজ থেমে থাকবে না। এই বেলুড়ে যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা দেড় হাজার বছর ধরে চলবে। তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে কোরো না, এটা আমার নিছক স্বপ্ন বা কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

এরপর নিবেদিতার সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটালেন, শরীরে কোনও অসুস্থতা বোধ করলেন না। কিন্তু পরদিনই শরীর আবার বেশ দুর্বল হয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না। তবু জোর করে উঠলেন। কালীপূজার অনেক ব্যবস্থা বাকি আছে। ব্রহ্মানন্দকে আবার দু দিনের জন্য কলকাতা যেতে হবে।

নীচে এসে বসলেন সকলের সঙ্গে। গতকাল সারাদিন উপবাস ছিল, তবু আজ কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। শুধু এক গেলাস ঠাণ্ডা দুধ চেয়ে নিলেন। অন্য দিন তিনিই মধ্যমণি, অন্যরা তাঁর কথা শোনে। আজ তিনি চুপ, বাকি সবাই কথা বলে যাচ্ছে। দুধ পান শেষ হয়ে গেছে, এই সময় একটু তামাক খেতে ইচ্ছে করে, সে জন্যও কারুকে অনুরোধ করলেন না, শূন্য কাচের গেলাসটা হাতে ধরে তিনি বসে রইলেন উদাসীন মুখে।

এক সময় তাঁর মনে হল, সকলে যেন বড় বেশি কথা বলছে। এত কথা কেন? তাঁর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বাইরে পাখি ডাকছে, পোষা হাঁসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাঘা নামের কুকুরটা একবার উঁকি দিয়ে গেল, আকাশে কালো মেঘের পাশে পাশে রুপোলি রেখা, সে সব দিকে কারুর মন নেই, শুধু কথা আর কথা!

স্বামীজির হাত থেকে কাচের গেলাসটা খসে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

সেই সঙ্গে সবাই চকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে নরেন, শরীর খারাপ লাগছে?

স্বামীজি কোনও উত্তর দিলেন না। ব্রহ্মানন্দ প্রায় জোর করে স্বামীজিকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন, ব্রজেন নামে একটি তরুণ শিষ্য সঙ্গে গেল তাঁর সেবার জন্য। নিজের ঘরে গিয়ে স্বামীজি জোর করে গ্রন্থপাঠে মন বসাবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে লাগলেন বার বার।

আশ্চর্য মানুষের শরীর। পরদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তেরও আগে স্বামীজির ঘুম ভাঙা মাত্র নিজেকে খুব টাটকা মনে হল, শিরা-উপশিরা সব চাঙ্গা, ব্যাধি বালাইয়ের চিহ্নমাত্র নেই। হাঁটতে গিয়ে দেখলেন, পায়ে ব্যথা করছে না। চোখের দৃষ্টিও যেন আবার উজ্জ্বল।

ধ্যান-জপ করলে মন একাগ্র হয়, তাতে শরীর আরও ভাল থাকে। আজ তিনি ঠাকুরের ঘরে বসে তন্ময় হয়ে চক্ষু বুজে রইলেন প্রায় তিন ঘণ্টা। তারপর চোখ মেলতেই তাঁর খুব ক্ষুধা বোধ হল। না খেয়ে খেয়ে শরীরটা আরও জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজি ঠিক করলেন, আজ কোনও নিয়ম মানবেন না, আজ নুন, তেল, মশলা দিয়ে রান্না ব্যঞ্জন খাবেন ভাতের সঙ্গে। অম্বল খাবেন।

সোনায় সোহাগার মতন আজই জুটে গেল ইলিশ। গঙ্গার ইলিশ মাছ ধরা হচ্ছে, স্বামী প্রেমানন্দ মঠের জন্য ইলিশ কিনছেন, স্বামীজি খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইলিশ দেখে মন উচাটন হয় না, এমন বাঙালি কজন আছে? স্বামীজি নিজে মাছ পছন্দ করতে লাগলেন। পদ্মা নদীতে ইলিশ মাছ ধরা দেখেছিলেন, সেই তুলনায় গঙ্গার ইলিশ যেন আকারে আরও বড়, আর অপ্সরাদের মতন আকৃতি!

ব্রজেন নামে শিষ্যটি পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে বাঙাল, তোদের

দেশে এত ভাল ইলিশ পাওয়া যায় !

ব্রজেন জাঁক করে বলল, আমাদের পদ্মার ইলিশ আরও বড় হয় !

স্বামীজি বললেন, ইস, আমি দেখিনি বুঝি ! গঙ্গার ইলিশের মতন স্বাদ ওই ইলিশের হয় না। হ্যাঁরে, তোদের বাঙাল দেশে নাকি ইলিশ মাছের পুজো হয় ?

ব্রজেন বলল, সে তো সরস্বতী পুজোর পর। দুর্গা পুজোর বিজয়া দশমীর পর ইলিশ মাছ খাওয়া নিষেধ, আবার সরস্বতী পুজোর পর জোড় ইলিশ ঘরে আনতে হয়।

স্বামীজি বললেন, মঠের জন্য এ বছর তো এই প্রথম ইলিশ কেনা হল, কী দিয়ে তোরা পুজো করিস কর না।

তারপর প্রেমানন্দকে বললেন, আজ মঠে লোক কম, শুধু ঝোল করতে বলিস না, গোটা কতক ইলিশ ভাজাও খাব। ভাজার মাছ আর ঝোলের মাছের স্বাদই সম্পূর্ণ আলাদা। আর একটু মাছের অম্বল করতেও বলে দিস।

তারপর স্বামীজি আবার ঠাকুরের ঘরে গিয়ে পুজায় বসলেন। এবার একা, দরজা-জানলা পর্যন্ত বন্ধ।

বেলা সাড়ে এগারোটায় বেরিয়ে এলেন সে ঘর থেকে। বেশ জোরে জোরে একটা গান ধরলেন, 'মা কি আমার কালো রে, কালরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো রে...'। আজ আর কণ্ঠের জড়তা নেই, হাঁপানি নেই। গান থামিয়ে প্রেমানন্দকে বললেন, হ্যাঁরে বাবুরাম, কালীপুজোয় কি পাঁঠা বলি হবে ? বলি না হলে কি মায়ের পুজো পূর্ণাঙ্গ হয় ?

প্রেমানন্দ বললেন, মাতা ঠাকুরানী কি মত দেবেন ? সেবারে আপত্তি করেছিলেন।

স্বামীজি বললেন, সে তো দুর্গাপুজোয়। কালীপুজোয় রাজি হন কি না ওঁর কাছে একবার জেনে আসলে হয়। এবার অনেক লোককে ডাকতে হবে। আমার বাড়ির লোকদের আনার ব্যবস্থা করা দরকার।

এর মধ্যে খাবার ঘণ্টা বেজে উঠল। স্বামীজি ব্যস্ত হয়ে বললেন, চল, চল, ইলিশ মাছের ঝোল ঠাণ্ডা করা মহাপাপ। দ্বিতীয়বার গরম করলেও সেই স্বাদ থাকে না।

অনেকদিন বাদে বেশ তৃপ্তি করে খেলেন স্বামীজি। ইলিশ মাছ ভাজার তেল দিয়ে মেখে ভাত খেলেন, তারপর ডালের সঙ্গে মাছভাজা। ঝোল তেমন ঝাল হয়নি বলে নিজেরটায় আরও কাঁচা লঙ্কা ডলে নিলেন, আঙুলে অম্বল চাটতে চাটতে প্রেমানন্দকে বললেন, একাদশী করতে করতে কী রকম খিদে হয়েছে দেখছিস ! থালা-বাটি-গেলাসও যে খেয়ে ফেলিনি, এই রক্ষে।

খাওয়ার পর বিশ্রাম করতে গিয়েও ফিরে এলেন এক ঘণ্টার মধ্যে। প্রেমানন্দকে ডেকে তুলে বললেন, ওঠ, ওঠ, সন্ন্যাসীর পক্ষে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার আজ ঘুমই এল না। মাথাটা একটু ব্যথা ব্যথা করছে কেন বল তো ? খুব বেশিক্ষণ ধ্যান করা হয়েছে, তাই ব্রেন উইক লাগছে। চল পড়াশুনো করি, তাতে মাথা ঠিক হয়ে যাবে।

দু'জনে এলেন লাইব্রেরি ঘরে। সেখানে কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসী পাঠে নিমগ্ন। স্বামীজি বললেন, কী করছিস তোরা সব ? ভাল করে বেদ পড়বি। গীতার নিজস্ব ভাষ্য তৈরি করে নিতে হবে। তার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণটা আগে ভাল করে শেখা দরকার। পাণিনি ছাড়া গতি নেই। আয় সকলে মিলে আজ পাণিনি পড়ি।

তাদের পাণিনির ব্যাকরণ পড়াতে লাগলেন স্বামীজি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। অত কঠিন বিষয়, যাতে সহজে দন্তস্ফুট করা যায় না, তা নিয়েও সরস আলোচনা করতে লাগলেন। এক সময় প্রেমানন্দ এসে বললেন, আর কত পড়ানো হবে ? তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, তোমার না মাথা ব্যথা করছিল ?

স্বামীজি বই নামিয়ে রেখে দু' হাত ছড়িয়ে বললেন, তাই নাকি, এতক্ষণ ? তা হলে এখন একটু মুক্ত বায়ু সেবন করা দরকার।

বাইরে এসে প্রেমানন্দের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন স্বামীজি। মঠের চত্বর পেরিয়ে রাস্তায়।

খানিকটা যাবার পর প্রেমানন্দ বললেন, এবার ফেরা যাক। অনেকদিন তো এতটা হাঁটোনি।

স্বামীজি হেসে বললেন, ইলিশ মাছ খেয়ে আজ যেন নবযুবকের মতন শক্তি এসেছে। একটুও কষ্ট হচ্ছে না। চল, আরও যাই।

চলে এলেন বেলুড় বাজার পর্যন্ত। প্রেমানন্দ এবার ফেরার জন্য জোর করতে লাগলেন। স্বামীজি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, দ্যাখ বাবুরাম, কদিন ধরে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। আমাদের এখানে একটা বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। যেখানে শুধু বেদ পড়ানো হবে।

প্রেমানন্দ বললেন, এখন এই যুগে এত বেদ পড়ে কী হবে ?

স্বামীজি বললেন, আর কিছু না হোক, কুসংস্কারগুলো দূর হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই তো বেদ গ্রন্থখানি চক্ষেও দেখেনি। মুসলমান-বাড়িতে কোরান থাকে, খ্রিস্টান-বাড়িতে বাইবেল থাকে, কটা হিন্দুর বাড়িতে বেদ থাকে বলতে পারিস ? অশিক্ষিত পুরুতগুলো কথায় কথায় বলে, বেদে অমুক আছে তমুক আছে, নিজেরা বেদ কখনও পড়েও দেখেনি। আমাদের দেশে এই যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ করে, মেয়েদের শিক্ষা দেয় না, এ তো বেদ-বিরুদ্ধ। এ সব পরবর্তী স্মৃতির অনুশাসনের ব্যাপার। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পুজা নেই, সে দেশ কোনও কালে বড় হতে পারে না। পুণা থেকে বেদের মূল সংস্করণ আনাতে হবে। চল, আজই গিয়ে চিঠি লিখে ফেলি।

এবারে দ্রুত পদে ফিরতে লাগলেন। এক ধনী-পরিবারের বাড়ি-সংলগ্ন বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, হায় রে, বাগানের কী ছিরি ! আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ বাগানের মর্ম বোঝে না। বাড়ি করার সময় ক'জন বাগান রাখার কথা ভাবে ? বাগান থাকলেও যত্ন নেয় না। ইওরোপ-আমেরিকায় ছোট ছোট বাড়ির সঙ্গেও এক চিলতে বাগান অন্তত থাকবেই। বাড়ির মালিক নিজের হাতে আগাছা ছাঁটে। আমেরিকায় লেগেট সাহেবের বাড়িতে আমি অতিথি ছিলাম, আহা কী বাগান, যেন স্বর্গোদ্যান, শুধু পারিজাত বৃক্ষটি নেই। ওদের দেশের বড় বড় বাগানের যত্ন করার জন্য গুচ্ছের মালি রাখতে হয় না, মেশিন দিয়ে ঘাস কাটা যায়, পাইপে জল দেয়। আমি সেই বাগানে যখন ঘুরে বেড়াতাম...

একটু আগে বেদ পাঠ সম্পর্কে নানা কথা বলছিলেন, এখন বাগানের আলোচনায় মেতে উঠলেন। আজ যেন তাঁকে কথায় পেয়ে বসেছে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর।

ফিরে এসে দু' একজন অভ্যাগতর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালেন কিছুক্ষণ। সন্ধ্যার উপাসনার সময় এসে গেলে তিনি গাত্রোত্থান করলেন, ব্রজেনকে ডেকে নিয়ে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ব্রজেনের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, শরীরটা বড় হালকা লাগছে, আজ বেশ আছি। তুই আমার জপের মালাদুটো দিয়ে বাইরে বসে থাক। দরকার হলে তোকে ডাকব।

খানিকবাদেই হাঁক পাড়লেন, ব্যাজা, এই ব্যাজা !

ব্রজেন এসে তাঁর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, এত গরম লাগছে কেন রে, আকাশে মেঘ জমেছে বুঝি ? এত গুমোট।

ব্রজেন বলল, না, আজ তো মেঘ নেই। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

স্বামীজির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত। তিনি বললেন, জানলাগুলো সব খুলে দে। আমাকে একটু বাতাস কর।

ব্রজেন দৌড়ে একটা হাতপাখা নিয়ে এল। স্বামীজি বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন, পা দুটো আবার ভার ভার লাগছে। অনেক হেঁটেছি তো। বেশ করে টিপে দে তো।

ব্রজেন এক হাতে পা টিপে দিতে দিতে অন্য হাতে বাতাস করতে লাগল। একটু পরেই শান্ত হলেন স্বামীজি। স্নেহের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে ব্যাজা, তুই যে বাড়িঘর ছেড়ে এত দূরে এসে এই মঠে পড়ে আছিস, তোর কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো ?

ব্রজেন বলল, মোটেও না। এত আনন্দ, সব সময় মনে হয় নিজেদের লোকেদের সঙ্গেই আছি। তবে দু'একটা কথা মনে হয় বটে। কখনও কারুকে বলিনি, এখন বলব ?

স্বামীজি বললেন, বল।

ব্রজেন বলল, সেই যে একবার এক পণ্ডিত এসেছিল উত্তর ভারত থেকে, আপনার সঙ্গে বেদান্ত বিচার করতে। আপনি তাকে বলেছিলেন, পণ্ডিতজি, সর্বত্র যে ভয়ংকর হাহাকার উঠছে। প্রথমে তার নিরসনের জন্য—এক মুষ্টি অন্নের জন্য স্বদেশবাসীর আর্তনাদ বন্ধ করার জন্য কিছু করুন, তারপর আমার সঙ্গে বেদান্ত বিচার করতে আসবেন। বেদান্ত-ধর্মের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, অন্নের অভাবে মুমূর্ষু জনগণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে হবে।... আমরা কি তা পেরেছি ?

স্বামীজি অন্যমনস্কভাবে বললেন, হ্যাঁ, ত্যাগ আর সেবা, ত্যাগ আর সেবা!

শিষ্য আবার বলল, আর একবার সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে দু'জন পঞ্জাবি ভদ্রলোক এসেছিলেন। পঞ্জাবে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল, তবু তাঁরা সে কথা না তুলে শাস্ত্র আলোচনায় আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। আপনার সঙ্গে তর্ক বেঁধে গেল। সেদিনে আপনার একটি কথা আমার মনে গেঁথে আছে। আপনি বলেছিলেন, মশাই, যে পর্যন্ত আমার দেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো ও তার যত্ন নেওয়া— আর যা কিছু তা হয় ধর্মধ্বজিতা, নয় অধর্ম! স্বামীজি, তাই-ই যদি হয়, তা হলে আমরা মঠে সারাদিন ধরে জপ-তপ আর শাস্ত্র পাঠ করছি কেন ? এখনও তো দিকে দিকে ক্ষুধার্তের হাহাকার। দেশটা আরও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে।

স্বামীজি বললেন, আরও জোরে বাতাস কর। গরমে ঝাঁ ঝাঁ করছে শরীর। ওরে, আমরা সন্ন্যাসী, সারা দেশের অবস্থা বদলাবার ভার কি আমরা নিতে পারি ?

ব্রজেন বললেন, আপনি এত বড় মানুষ, আপনি ডাক দিলে সারা দেশের মানুষ সে কথা শুনবে। বিভিন্ন জায়গায় সভা করে যদি আপনি বলেন...

স্বামীজি বললেন, ওসব কথা এখন থাক। আমি বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। মুখের রক্ত তুলে তুলে অনেক বক্তৃতা দিয়েছি।

ব্রজেন বলল, স্বামীজি, আপনি যে দেশ-বিদেশে এত পরিশ্রম করে গেলেন, তার ফল কী হল ?

স্বামীজি মৃদু স্বরে, টেনে টেনে বললেন, শরৎও একদিন ওকথা জিজ্ঞেস করেছিল। ফল কী হয়েছে তার কিছুটা অন্তত তোরা দেখে যাবি। কালে এই পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতেই হবে, তার সূচনা হয়ে গেছে। এই প্রবল বন্যার মুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।

ব্রজেন বলল, মঠ প্রতিষ্ঠার সময় আপনি বলেছিলেন, সর্বমতের, সর্বপথের আচণ্ডালব্রাহ্মণ—সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন আদর্শ দেখতে পায় তা করতে হবে। সাহেবরা বেদ পড়ে, কিন্তু এ দেশের কোনও চণ্ডাল কি আজও বেদ পাঠের অধিকার পেয়েছে ?

স্বামীজি যেন আর সেসব শুনতে পেলেন না, তাঁর দুই চক্ষু বুজে এসেছে, নিশ্বাসে ঘুমের শব্দ।

শিষ্য নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুর সেবা করে যেতে লাগল। জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট রাত্রির আকাশ। বাতাস বইছে উথাল-পাথাল। এ সময় মঠ একেবারে শান্ত। গঙ্গাবক্ষে কোনও নৌকোয় কে যেন ভাটিয়ালি গান ধরেছে। দূরদেশি কোনও নাবিকের জন্য তার প্রেমিকার বিচ্ছেদ-বেদনার গান। কাছাকাছি এক মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। একটু বাদে ভোঁ দিতে দিতে চলে গেল এক যাত্রীবাহী স্টিমার। ঢেউগুলি ছলাৎ ছলাৎ করে এসে লাগছে তীরে, সেই শব্দ এখান থেকেও শোনা যায়।

জীবন বয়ে চলেছে প্রতিদিনের নিয়মে। রাত প্রায় ন'টা, বিশ্বের এই ভূখণ্ডে আজকের জীবনযাত্রা প্রায় শেষ হতে চলল। আবার রাত্রি প্রভাত হবে, আবার শুরু হবে সংসারের কলরোল। সারাদিন ঠা ঠা পোড়া রোদ গেছে, রাত্রির বাতাস শান্তি এনে দিয়েছে, আজ সকলের ভাল ঘুম হবে।

ব্রজেন ঠায় বসে আছে, পা টেপা বন্ধ করে পাখা নেড়ে যাচ্ছে একমনে। স্বামীজি খানিকবাদে ডান দিকে পাশ ফিরলেন, তারপর শিশুরা যেমন ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, সে রকম একটা শব্দ বেরুল তাঁর মুখ থেকে, ডান হাতখানা একবার কেঁপে উঠল। একটা গভীর নিশ্বাস পড়ার পর মাথাটি গড়িয়ে গেল বালিশ থেকে।

ব্রজেন সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি তুলে দিয়ে নিজের মুখটা ঝুঁকিয়ে আনল কাছে। স্বামীজি কি কিছু বলতে চাইছেন ? তিনি রাত্রে কিছু খেলেন না, খিদে পায়নি ? ঘরেই দুধ এনে রাখা আছে, মাঝে

মাঝে রাত্রে শুধু এক গেলাস দুধ খান। আজ দিনের বেলা পেট ভরে খেয়েছেন অবশ্য। তাঁর ইলিশ মাছের প্রীতি বাঙালদেরও হার মানায়।

দু' মিনিট বাদে স্বামীজি আবার পাশ ফিরে চিত হলেন। এবারেও খুব গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর আর কোনও শব্দ নেই।

মানুষের প্রতিদিনের ঘুম আর শেষ ঘুম কি এক হতে পারে ? দৃশ্যত একই রকম হলেও কিছু তফাত থাকে নিশ্চয়ই। নইলে ব্রজেন তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে উঠবে কেন ? স্বামীজি, গুরুদেব বলে সে কয়েকবার ব্যাকুলভাবে ডাকল। লণ্ঠনটি খুব কাছে নিয়ে এসে দেখল। স্বামীজির চোখের মণি দুই ভুরুর মাঝখানে স্থির, বুকে নিশ্বাসের ওঠা-পড়া নেই।

ব্রজেন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল নীচে। ঠিক তখনই খাবার ঘণ্টা পড়েছে, সন্ন্যাসীরা খেতে বসার উদ্যোগ করছিলেন, দৌড়ে ওপরে এলেন প্রেমানন্দ ও আরও কয়েকজন। কেউ নাড়ি দেখতে লাগলেন, কেউ আগে থেকেই কান্না শুরু করে দিলেন। এ কী ভাবসমাধি, না মহাসমাধি ? দু' একজন নিঃস্পন্দ বিবেকানন্দর কানের কাছে বারবার শোনাতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ আজ রাতে কলকাতায় থাকবেন। তখুনি লোক ছুটল বরানগর থেকে ডাক্তারকে ধরে আনার জন্য, কানাই গেল বলরাম বসুর বাড়িতে ব্রহ্মানন্দকে খবর দিতে। কাছেই নিবেদিতার বাসস্থান, কিন্তু তাঁকে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না কেউ।

পরদিন সকালে এল সেই ভগ্নদূত। তার হাতে সারদানন্দের চিঠি। সেই চিঠি পাঠ করা মাত্র নিবেদিতার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, যেন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। সব শেষ ? এ যে অসম্ভব। তাঁর গুরু মাঝে মাঝেই মৃত্যুর কথা বলতেন বটে, কিন্তু নিবেদিতার মনে মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, আরও অন্তত তিন-চার বছর স্বামীজি নিশ্চয়ই বাঁচবেন। দু'দিন আগেও তিনি তাঁকে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখে এসেছেন।

পরনে যা পোশাক ছিল তার ওপর একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে তক্ষুনি বেলুড় রওনা হলেন নিবেদিতা। দোতলায় স্বামীজির ঘরে তখন কয়েকজন চিকিৎসক ও সন্ন্যাসী-ভক্তদের বেশ ভিড়। কেউ কেউ পাগলের মতন হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি করছে। শিয়রের কাছে এসে বসলেন নিবেদিতা, তাঁর গুরুর মুখ একটুও বিকৃত হয়নি, কিন্তু চক্ষুদুটি জবা ফুলের মতন টকটকে লাল, নাক ও মুখের দু'পাশে রক্তের রেখা। একজনের কাছ থেকে তুলো চেয়ে নিয়ে নিবেদিতা সেই রক্ত মুছে দিলেন। তারপর পাখার বাতাস করতে লাগলেন আস্তে আস্তে।

ঘরের মধ্যে অন্যরা কে কী করছে, তা লক্ষই করলেন না নিবেদিতা। তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন গুরুর মুখের দিকে। তাঁর চোখে অশ্রু নেই। তাঁর কান্না কেউ বুঝবে না। স্বামীজির সঙ্গে কত কথা বাকি রয়ে গেল! ঘরের মধ্যে যদিও অসহ্য গরম, তবু নিবেদিতা বোধ করতে লাগলেন নিদারুণ নিঃসঙ্গতার শৈত্য। যদি এ সময় জো ম্যাকলাউডও পাশে থাকত! জো কী ভালই না বাসে স্বামীজিকে। জো দীক্ষা নিয়ে স্বামীজির শিষ্যা হতে চায়নি, সে সবসময় বলত, আমি স্বামীজির বন্ধু। এ রকম বন্ধু ক'জন পায় ? নিবেদিতার সঙ্গে শেষ দেখার দিনেও জো'র প্রসঙ্গ একবার উঠতে স্বামীজি বলেছিলেন, ও পবিত্রতার মতন পবিত্র, প্রেমের মতন প্রেমময়ী। সেই জো কিছুই জানল না। ইংলন্ডে সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক দেখার জন্য গত মাসে ইওরোপ চলে গেছে। ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে স্বামীজি চলে গেলেন, তাঁর কত আমেরিকান বন্ধু ও ভক্ত আছে, তারা এখন স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে মেতে আছে।

বেলা দুটোর সময় একজন নিবেদিতাকে বলল, এবার উঠতে হবে।

নিবেদিতা সরে গেলেন। স্বামী বিবেকানন্দর দেহকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে, নতুন গৈরিক বস্ত্র পরিয়ে, রাশি রাশি পুষ্পমালা দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নীচে। সামনের চত্বরে বেলগাছটির নীচে প্রস্তুত হয়েছে চিতা। যখন মন্ত্র পাঠ হচ্ছে, তখন নিবেদিতা লক্ষ করলেন, স্বামীজির ব্যবহৃত জিনিসপত্রও শবদেহের ওপরে দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে একটা চাদর, সেটা এই পরশুদিনও

নিবেদিতা দেখেছিলেন তাঁর গুরুর গায়ে। তিনি সারদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই চাদরটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিলে হয় না?

সারদানন্দ বললেন, পরিধেয় সব বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলাই নিয়ম। তবে তুমি যদি রাখতে চাও, তা হলে ওটা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি।

নিবেদিতা কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। অন্য কেউ কিছু নিচ্ছে না, তাঁর পক্ষে চাদরটা নিয়ে নেওয়া আদিখ্যেতা হয়ে যাবে না তো? কে আবার কী মনে করবে, বরং থাক। অন্তত একটা টুকরোও যদি জো ম্যাকলাউডের জন্য কেটে নেওয়া যেত। সঙ্গে কোনও কাঁচি বা ছুরিও নেই। কারুর কাছে চাইতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।

চন্দনকাঠের চিতায় ঢালা হল প্রচুর ঘি। জ্বলে উঠল আগুন। কাল এই সময় যে মানুষটি মহা উৎসাহে শিষ্যদের পাণিনির ব্যাকরণ পড়াচ্ছিলেন, আজ তিনি নেই। আজকের সংবাদপত্রে তাঁর তিরোধান সংবাদ ছাপা হয়নি বলে বেশি লোক জানতে পারেনি, তবু মুখে মুখে খবর ছড়াচ্ছে, এখনও নৌকোয় করে দলে দলে লোক আসছে।

মনুষ্য শরীর দাহ করার দৃশ্য আগে দেখেননি নিবেদিতা। আজ প্রথম দেখছেন, এবং দেখছেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির নশ্বর শরীর শেষ হয়ে যাচ্ছে। নিবেদিতার বুক এমনই শূন্য, যে অশ্রুও নেই। তিনি বসে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেউ বিশেষ কথা বলছে না তাঁর সঙ্গে। একটা সান্ত্বনা বাক্যও কেউ বলেনি, যেন তিনি এখানকার কেউ না। নিবেদিতা অবশ্য এসব ভ্রূক্ষেপও করছেন না। শুধু দেখছেন আগুন।

ক্রমে বেলা পড়ে এল, সূর্যাস্তে বর্ণাঢ্য হল আকাশ। তখনও চিতার আগুন লকলক করছে। হঠাৎ এক সময় নিবেদিতার এক হাতে কী যেন লাগল। তিনি চমকে পাশে তাকালেন। স্বামীজির সেই চাদরখানির একটা টুকরো চিতা থেকে উড়ে এসে পড়েছে তাঁর কাছে।

৬৪

ট্রেন থেকে নেমে গরুর গাড়িতেও যেতে হল অনেকখানি পথ। খড় বিছিয়ে তার ওপর একটা চট পাতা, দিব্যি বিছানার মতন, শুয়ে যাওয়া যায়। একটানা ক্যাঁচর-কোঁচর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুম আসে, বারীন্দ্র প্রথম থেকেই ঘুমোচ্ছে, ভরত জেগে আছে। উপুড় হয়ে শুয়ে দেখছে পথের দৃশ্য। বাংলার গ্রাম দেখার অভিজ্ঞতা তার বিশেষ নেই। মাটির রাস্তাটি খানাখন্দে ভরা, দু পাশে ধানখেত। এখনও ধান পাকার সময় হয়নি, দিগন্ত পর্যন্ত সবুজের ঢেউ। অনেক দূরে দূরে গ্রাম, চাষের খেতই বেশি। এত ফসল দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে এ দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গেছে, এই তো ইংরেজ শাসনের সুফল।

রাস্তাটা এক একবার যাচ্ছে কোনও গ্রামের পাশ দিয়ে। এদিককার গ্রামে একটাও পাকা বাড়ি দেখা যায় না, সবই মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি। কোনও লোকের গায়েই জামা নেই, অবশ্য এখন গ্রীষ্মকাল, শীতেও এদের অতিরিক্ত পরিধান কিছু থাকে বলে মনে হয় না। ভরত উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চল কিছু কিছু দেখেছে, প্রায় একই রকম প্রকৃতি, তবে কটক ছাড়ালেই কিছু পাহাড়-টিলা চোখে পড়ে। বাংলার এই অঞ্চল একেবারে সমতল।

হঠাৎ এক জায়গায় জোর ঝাঁকুনি লাগতেই বারীন্দ্র ধড়মড় করে উঠে বসল। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় এলাম? মেদিনীপুর শহর আর কত দূর?

গাড়োয়ান জানাল, আর বেশি দূর নেই, ক্রোশ খানেক হবে।

বারীন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বলল, থামাও থামাও, আমরা এখানেই নামব।

পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে দুজনে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হল। ঠা-ঠা রোদ, গরম হাওয়া বইছে। কাছেই একটা পুরনো বট গাছ, তার তলায় কিছু পোড়া কাঠ ও ভাঙা হাঁড়ি-কলসি ছড়ানো, সম্ভবত সেটা স্থানীয় শ্মশান। সেখানকার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বারীন্দ্র বলল, শোনো ভরতদাদা, এখান থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি, আমরা একসঙ্গে শহরে ঢুকলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। নতুন মানুষ দেখলেই লোকে সন্দেহ করে। এই শহরে আমার এক মামা থাকে, সত্যেন মামা, আমি গিয়ে উঠব তার বাড়িতে। তুমি যার বাড়িতে থাকবে, তার নাম হেমচন্দ্র কানুনগো, আমাদের সমিতির খুব বড় একজন কর্মী। আগে থেকে বলা আছে, তোমার ওখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ভরত জিজ্ঞেস করল, তার বাড়ি আমি চিনব কী করে? মানুষটাকেও চিনি না।

বারীন্দ্র বলল, চেনা খুব সহজ। শহরে ঢুকে তুমি প্রথমে পোস্ট অফিসের খোঁজ করবে। পোস্ট অফিস পেয়ে গেলে সেখানে জিজ্ঞেস করবে কানুনগোদের বাড়িটা কোথায়। মোটামুটি কাছেই হবে। দিনের বেলা আর আমাদের দেখা হবে না, সন্ধের পর কোনও গোপন জায়গা ঠিক করা থাকবে, সে তুমি খবর পেয়ে যাবে। ও ভাল কথা, আমরা আর কেউ কারুর নাম ধরে ডাকব না, এখন থেকে তোমার নাম ঙ-বাবু!

ভরত বলল, ঙ-বাবু! সে আবার কী রকম নাম?

বারীন্দ্র বলল, ক-খ-গ-ঘ এই চারটে অক্ষর যে আগেই খরচ হয়ে গেছে। আমাদের লিডার, মানে দলনেতা হচ্ছেন ক-বাবু। কখনও তার আসল নাম জানতে চাইবে না, জানলেও উচ্চারণ করবে না। আমি হলাম গ-বাবু।

ভরত বলল, ঙ-বাবু কেমন যেন বিচ্ছিরি শোনাবে। কাঁদুনে ছোট ছেলের মতন। আমি তবে ভ-বাবু হয়ে যাই!

বারীন্দ্র বলল, আরে না, না, আসল নামের আদ্যক্ষর চলবে না। তা হলে তো সহজেই বোঝা যাবে। ঠিক আছে, ঙ পছন্দ না হলে তুমি চ-বাবু হয়ে যাও। এখন আমি আগে যাচ্ছি, তুমি খানিকক্ষণ বাদে রওনা হয়ো!

বারীন্দ্র নিজের পুঁটলি কাঁধে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। সে বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গেলেও ভরত দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সম্পূর্ণ একজন অচেনা মানুষের বাড়িতে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। তার চেয়ে কোনও হোটেল-সরাইখানায় উঠলে হত না? অবশ্য এ সব জায়গায় সে রকম আছে কি না তাই-ই বা কে জানে! রেল স্টেশনে নামার পর পুলিশের এক সেপাইকে দেখে বারীন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, দাদা, ও দিকে তাকিয়ো না, আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না, আমাকে না চেনার ভান করে গেটের বাইরে চলে যাও!

ভরত এ রকম উত্তেজনার কারণ বুঝতেই পারেনি। সে সেপাইটি খৈনি টিপতে টিপতে একজন ফেরিওয়ালার সঙ্গে গালগল্প করছিল। পুলিশ তাদের সন্দেহ করবে কেন? এই ক মাসে তো সার্কুলার রোডে এক আখড়ায় মাঝে মাঝে কুস্তি আর লাঠিখেলা হয়েছে। এ রকম শরীরচর্চায় তো কোনও সরকারি নিষেধ নেই! তাও সেই আখড়ায় শরীরচর্চা যত না হয়েছে, তার চেয়ে গুলতানিই হয়েছে বেশি। এখানেও ট্রেন থেকে অনেক লোক নামল, শুধু তাদের দু জনকে আলাদা করে কেউ সন্দেহ করতে যাবে কেন?

হেমচন্দ্র একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের বিবাহিত ব্যক্তি। ভরতকে সে মান্য অতিথির মতন অভ্যর্থনা জানাল এবং পৃথক একটি ঘর দিল। কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর ভরত বুঝতে পারল, হেমচন্দ্র একজন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ, বিজ্ঞান থেকে শিল্পকলা পর্যন্ত বহু বিষয়ে তার আগ্রহ। কলেজ জীবনে এফ এ পড়তে পড়তে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজে। কিছুদিন পর ডাক্তারি পড়তে আর ভাল লাগল না, খুব ছবি আঁকার ঝোঁক হল, ভর্তি হল গিয়ে সরকারি আর্ট স্কুলে। বছর দু-এক পরে মনে হল, ওখানেও আর কিছু শেখার নেই। তারপর থেকে

ছাত্রজীবন ঘুচে গেল। জীবিকার জন্য হেম এখন একটা ইস্কুলে ড্রয়িং শেখায়, আর একটা কলেজে কেমিস্ট্রির ডেমনস্ট্রেটর। এর পরেও সময় পেলেই একা একা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।

ভরতের আশ্চর্য লাগল দেখে যে হেমচন্দ্র বিবাহিত, সংসারী মানুষ। ছেলেমেয়ে আছে, তবু কেন সে গুপ্ত সমিতি গড়ার ঝুঁকি নিয়েছে? বারীনের আখড়ায় যে কজন জুটেছে, তারা সবাই নিতান্ত ছেলে-ছোকরা, বিয়ে-থা করেনি, বাড়ির কোনও দায় দায়িত্ব নেই। ভরতের কথা আলাদা, তার বয়েস এদের থেকে বেশি, কিন্তু তার কোনও চালচুলো নেই, কোনও পিছুটান নেই। সে অনেকটা কৌতূহলের বশেই এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হেম একরোখা ধরনের মানুষ, খুব পড়ুয়া, সংসারের অবস্থা তেমন সচ্ছল না হলেও সে প্রচুর বই কেনে। তার বিশেষ আগ্রহ ইতিহাসে; বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করে তার ধারণা হয়েছে যে পরাধীন অবস্থায় জীবন ধারণ করাই বৃথা। যে কোনও দেশেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বেশ কয়েক হাজার যুবককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, হেম ঠিক করেই নিয়েছে যে সে দেশের জন্য প্রাণ দেবে। এই সিদ্ধান্ত তার নিজস্ব। বাড়ি ঘর, স্ত্রী-সন্তান-সংসারের প্রতি তার একটুও মায়া নেই। বিপ্লব শুরুর দিকে যারা প্রাণ দেয়, তাদের অনেকেরই ইতিহাসে নাম থাকে না, কেউ তাদের কথা জানতে পারে না, হেম সে সম্পর্কেও সচেতন, এবং সে নাম-যশের কাঙাল নয়। সে হাসতে হাসতে বলে, যারা মিষ্টি খেতে ভালবাসে, তারা এক বাটি রাবড়ি খেলে যে রকম চরম আনন্দ পায়, আমার কাছে প্রাণ দেওয়াটা সে রকম চরম আনন্দের।

দুদিন ভরতকে বাড়ি থেকে বেরুতেই দেওয়া হল না। উঠোনের এক কোণের ঘরে সে দরজা বন্ধ করে থাকে, হেম ছাড়া আর কেউ সে ঘরে আসে না, হেমই তার খাবার এনে দেয়। যেন সে এক পলাতক ও আত্মগোপনকারী। ভরতের মজাই লাগে, সে কিছুই করেনি, অথচ তাকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে কেন? এটাই নাকি ক-বাবু অর্থাৎ নেতার নির্দেশ। সেই প্রধান নেতাকে ভরত এখনও চোখেই দেখেনি।

দুপুরবেলা হেম কাজে চলে যায়, ভরত বাইরের দিকে একটা জানলা একটু ফাঁক করে বসে থাকে। দুপুরে তার ঘুমোনোর অভ্যেস নেই, হেমের কাছ থেকে সে বেশ কিছু বই চেয়ে নিয়েছে, ভরত বই পড়ে, ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবলডির জীবনী পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। খুব কাছেই একটি পোড়ো বাড়ি, শখ করে কেউ একটা দোতলা বাড়ি বানিয়েছিল, এখন দরজা-জানলা নেই, এক দিকের ছাদ ধসে পড়েছে, হয়তো বাড়ির সবাই এক সঙ্গে ওলাওঠা কিংবা পান বসন্ত রোগে নিঃশেষ হয়ে গেছে। গ্রামের দিকে এই সব বাড়িকে ভূতের বাড়ি বলে। বেশ কিছু আম-জাম-কাঁঠালের গাছ আছে সে বাড়ির বাগানে, পেছনে একটা পানাপুকুর। রোজই দুপুরে গোটা চার-পাঁচ বালক এসে সেখানে হুটোপাটি করে, হনুমানের মতন গাছে চড়ে লাফায়। এই সময় দশ-বারো বছর বয়েসী বালকদের স্কুলে থাকার কথা, কিন্তু এরা বোধহয় স্কুল-পালানো, বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো ছেলের দল। এরা ভুতুড়ে বাড়িকেও ভয় পায় না।

খেলতে খেলতে ওই ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে দেয়। তখন গালাগালির বন্যা ছোটে, হাতাহাতির পর তারা নিষ্ঠুরের মতন ইঁট-পাথর ছুঁড়ে পরস্পরকে আঘাত হানে। ভরতের ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে ওদের ছাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তার বাইরে বেরুনো নিষেধ।

মারামারির সময় একটি ছেলে থাকে এক দিকে, বাকি চার পাঁচজন এক দলে। একলা রোগা পাতলা ছেলেটির তেজ দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, সে অসীম সাহসে রুখে দাঁড়ায়, খুব মার খেলে একেবেঁকে ছোটে, কিন্তু কিছুতেই হার মানে না। কতকগুলো কাঁচা আম সে পেড়েছে, অন্যদের ভাগ দিতে রাজি নয়, ইঁটের ঘা খেয়ে তার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, তবু সে ছুটে পালাল।

পরের দিন আবার ওই ছেলেরা খেলতে এল একসঙ্গে, যেন আগের দিন কিছুই ঘটেনি। কিছুক্ষণ বাদেই অবশ্য মারামারি শুরু হয়ে যায়। আজও রোগা ছেলেটির সঙ্গে অন্যদের লড়াই। এই ছেলেটির নাম খুদি, তার বন্ধুরা ওই নামে চ্যাঁচায়। আজ ওই খুদি এমন একটা কাণ্ড করল, যাতে ভরতেরই বুক ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। খুদির পরনে মালকোঁচা মারা খাটো ধুতি, খালি গা, ধুতির

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কোঁচড়ে অনেক আম বাঁধা, অন্যদের তাড়া খেয়ে পালাতে না পেরে সে সরসর করে পুকুরের ধারের একটা তালগাছের ডগায় চড়ে বসল। অন্যরা তাল গাছ বেয়ে উঠতে পারে না, তারা এই শালা খুদি, এই শুয়োরের বাচ্চা খুদি বলে গালাগাল দিতে লাগল প্রাণ ভরে, তারপর ঢেলা ছুঁড়তে লাগল। তালগাছের মাথায় লুকিয়ে বসে থাকলে ঢিল লাগে না, কিন্তু সেখানে একটা চিলের বাসা, এক ঝাঁক চিল এসে ঠোকরাতে লাগল খুদিকে। তখনও সে গাছ বেয়ে নীচে নামল না, এক লাফ দিল পুকুরে। ভরত আঁতকে উঠল, অত উঁচু থেকে লাফ দিলে কেউ বাঁচে? খুদি কিন্তু হাঁসের মতন দ্রুত সাঁতার কেটে চলে গেল পুকুরের অন্য পারে।

ভরত নিজের কথা ভাবে। ওই বয়েসে সে কত ভিতু আর লাজুক ছিল। তার কোনও খেলার সঙ্গী ছিল না। শুধু কয়েক দিনের জন্য খেলতে এসেছিল মনোমোহিনী, সেই মেয়েটি তার জীবনপ্রবাহ সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে গেল।

দু'দিন দুঃসহ গরমের পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে আকাশে ঘনিয়ে এল কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। শুরু হল গুরুগুরু গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলক। হেমের সঙ্গে এই ক'দিন আলাপ-আলোচনায় ভরতের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, হেম তাকে বন্ধু বলেই সম্বোধন করে। হেম এসে বলল, চলো বন্ধু, আজ বেরুতে হবে।

ভরত সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ঘরে বসে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। সে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। দুজনে বাড়ির বাইরে আসার পর ভরত জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?

হেম সংক্ষেপে উত্তর দিল, কোথাও না।

ভরত বিস্মিত হল। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এই কি বেড়াবার সময় নাকি!

হেম বলল, নির্দেশ এসেছে, আজ আমাদের বৃষ্টি ভিজতে হবে।

ভরত বলল, তার মানে! শুধু শুধু বৃষ্টি ভিজব কেন?

হেম বলল, যতক্ষণ বৃষ্টি পড়বে ততক্ষণ বৃষ্টি ভিজব। যখন আমাদের অ্যাকশন শুরু হবে, তখন এ রকম ঝড়জলের মধ্যেও আমাদের বেরুতে হবে। সেই জন্য অভ্যেস করা দরকার। শরীরকে সইয়ে নিতে হবে।

ঝড়ের তোড়ে মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছের ডাল। প্রবল বাজ পড়ার শব্দে পিলে পর্যন্ত চমকে যায়, অন্ধকারে পথ দেখা যায় শুধু অশনি সঙ্কেতে। ভরতের ভয় করছে না, বরং আনন্দই হচ্ছে। এই বৃষ্টি ভেজাটাই দেশের কাজ!

হেম বেশি কথা বলে না। দু'জনে প্রায় দেড় ঘণ্টা ভিজে, বৃষ্টি একেবারে থেমে গেলে, বাড়ি ফিরে এল। হেমের খালি পা, ভরত ভুল করে জুতো পরে গিয়েছিল, সেই জুতো একেবারে কাদায় মাখামাখি। গায়ের জামা-কাপড় সপ সপ করছে।

পরদিন সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার, চড়া রোদ। রবিবার, হেমের স্কুল ছুটি, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরই হেম বলল, এখন আমরা ঘুরতে যাব।

এমন রোদে ছাতা ছাড়া কেউ বেরোয় না, গরিব চাষারাও মাথায় টোকা দেয়। হেম ছাতা নিল না। আজ তাদের রোদ্দুর সহ্য করার পরীক্ষা। দু ঘণ্টা রোদে ঘুরতে হবে। কাল রাতে বৃষ্টি ভিজতে কষ্ট হয়নি, মাথায় বাজ পড়ার আশঙ্কা ছিল শুধু। আজ একটু পরেই দরদরিয়ে ঘাম শুরু হল, মুখের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। আজ জুতো পরে আসেনি ভরত, মাটিতে পা রাখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ ঘোরার পর ভরত বলল, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কোনও বাড়ি থেকে একটু জল চেয়ে খেলে হয় না?

হেম বলল, জল খাওয়া নিষেধ। হয়তো এমন জায়গায় আমাদের যেতে হবে, যেখানে জল পাওয়া যাবে না!

অদূরেই একটা খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি। কালো রঙের স্থূলাঙ্গিনী এক যুবতী মাটির কলসিতে করে কোথা থেকে যেন জল এনে ঢুকছে সেই বাড়িতে। অন্য দিক থেকে ছুটে এল একটি দশ-বারো বছরের ছেলে। এ সেই খুদি, আজ সে একটু খোঁড়াচ্ছে।

ভরত সেদিকে তাকিয়ে বলল, ওঃ, এই ছেলেটার সাহস আছে বটে।

হেম বলল, ক্ষুদিরাম ? গোটা মেদিনীপুর শহরে ওর মতন দুর্দান্ত ছেলে আর দুটি নেই। সাঙ্ঘাতিক বিচ্ছু ! কত রকম দস্যিপানা যে করে ! যত ওকে মারো ধরো, ও মুখে টু শব্দটি করবে না। ওকে শায়েস্তা করাও যাবে না।

ভরত বলল, কাল দেখলাম, তাল গাছের মাথা থেকে পুকুরে ঝাঁপ দিল, ওর প্রাণের ভয়ও নেই।

হেম বলল, ছোটবেলা থেকে এত মার খেয়েছে, এত বকুনি, ওর বাপ মা নেই, বুঝলে, দিদি জামাইবাবুর বাড়িতে দুটো খেতে পেত, তার বদলে কত যে লাথি ঝ্যাঁটা, তাতেই শরীরটা ওর দড়কচ্চা হয়ে গেছে।

স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করে ভরত জিজ্ঞেস করল, ওই ওর দিদি ?

হেম বলল, নাঃ, দিদির বাড়ি থেকে ও পালিয়েছে। ওই স্ত্রীলোকটি, আমাদের সমাজে যাদের পতিতা বলে, তাই। এক বাবুর রক্ষিতা। কিন্তু প্রকৃত দেবী বলা যায় এদেরই। ক্ষুদিরামকে শুধু যে খেতে পরতে দেয় তাই নয়, ওর কাছ থেকেই ক্ষুদিরাম একমাত্র স্নেহের স্বাদ পেয়েছে। ও ছেলেকে সামলানো তো সোজা কথা নয়, সব সময় দুষ্টু বুদ্ধি, প্রত্যেকদিন মারামারি করে ঘরে ফেরে— ।

একটু থেমে হেম আবার বলল, এই রকম ছেলেদেরও ঠিক পথ দেখালে দেশের কাজে লাগতে পারে।

ভরত বলল, ও তো এখনও খুব ছোট !

হেম অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হুঁ।

কয়েকদিন পর পর এ রকম রৌদ্রে ঘোরাঘুরি ও বৃষ্টি ভেজা চলল। হেমের অভ্যেস আছে, কিন্তু সর্দি জ্বর হয়ে গেল ভরতের। নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়। এটুকু সে পারছে না, তা হলে দেশের সৈনিক হবে কী করে ? জ্বরে ঝাঁ ঝাঁ করছে শরীর, তবু সে বিছানায় শুয়ে থাকতে চায় না।

এরই মধ্যে একদিন খবর এল, দলের নেতা ক-বাবু এসেছেন মেদিনীপুরে।

এ পর্যন্ত এই নেতাকে কখনও দেখেনি ভরত। শুনেছে, তিনি বাংলার বাইরে কোথাও থাকেন। বারীন্দ্র কেমন যেন একটা রহস্যের আবরণ দিয়ে রাখে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে। কলকাতায় সার্কুলার রোডের আখড়ায় ক-বাবু কখনও আসেননি, সেখানকার দল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আছেন খ-বাবু। তাঁর নাম ভরত জেনেছে, যতীন বাড়ুজ্যে, এক সময় নাকি কোনও সেনাবাহিনীতে ছিলেন, তলোয়ার-বন্দুক চালাতে জানেন। তাঁর মুখে প্রায়ই টাকাপয়সার কথা শোনা যায়। বিপ্লবের প্রথম প্রয়াস অর্থ সংগ্রহ করা, কিন্তু ধনী ব্যক্তির কাছে চাঁদা চেয়েও সুবিধে হয়নি, সকলকে আসল উদ্দেশ্য খুলে বলাও যায় না। ডাকাতি করা ছাড়া টাকা তোলার অন্য উপায় নেই, যতীন বাড়ুজ্যের এই মত, অনেক পরিকল্পনাও হয়েছে, এ পর্যন্ত অভিযান অবশ্য হয়নি। যতীনের সঙ্গে বারীন্দ্রের প্রায়ই ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাধে। যতীনের নির্দেশ বারীন মানতে চায় না। এ আখড়ায় যতীনের সঙ্গে একটি যুবতী মেয়ে থাকে, তাকে নিয়েও ফিসফিসানি শুরু হয়েছে, যতীন তাকে নিজের ভগিনী বলে পরিচয় দেয়, তা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বয়স্থা মেয়ে, কেন তার বিবাহ হয়নি, কেন সে তার দাদার সঙ্গে থাকে ? তা ছাড়া সেই যুবতীর চক্ষে আছে গুপ্ত ঝিলিক, ওষ্ঠে আছে রসের ইঙ্গিত, মাঝে মাঝেই সে বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে দু বাহু তুলে দাঁড়ায়।

একদিন সন্ধের পর স্বয়ং ক-বাবু এলেন হেমের বাড়িতে। তাঁকে দেখে ভরত চমকে উঠল। এঁকে তো সে চেনে, একবার ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়েছিল, মিস্টার এ ঘোষ। তবে সেবার ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল, খানিকটা ভুলোমনা, বাস্তবজ্ঞানহীন বই-সর্বস্ব মানুষ, সরাসরি কারুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না, একটার পর একটা সিগারেট খান। এর মধ্যে অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে, গাম্ভীর্যমাখা মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ, আগে বাংলা বলতে পারতেন না প্রায়। এখন বেশ ভাল বাংলা শিখে নিয়েছেন। সিগারেট অবশ্য টানছেন আগেরই মতন।

অরবিন্দ অবশ্য ভরতকে চিনতে পারলেন না। একটা চেয়ারে বসতে দেওয়া হল তাঁকে। সঙ্গে এসেছে বারীন আর সত্যেন। প্রথমেই কাজের কথা শুরু করার ভঙ্গিতে তিনি হেমকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের এখানকার সমিতির সদস্য ক'জন ?

মেদিনীপুরে হেমচন্দ্রের সমমনস্ক আরও কয়েকজন মানুষ আছে, তারা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করে বিশ্ব রাজনীতি এবং ভারতের অবস্থা নিয়ে। সে রকম নিয়মবদ্ধ সমিতি কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অরবিন্দর সঙ্গে এখানকার এই গোষ্ঠীর যোগাযোগ হয়েছে সত্যেনের সূত্রে। সত্যেন অরবিন্দ ও বারীনের আত্মীয়।

অরবিন্দ হেমের মুখে বিবরণ শুনে বললেন, ওভাবে হবে না। কঠোর বিধিনিষেধ মেনে সিক্রেট সোসাইটি স্থাপন করতে হবে। মহারাষ্ট্রে এ রকম সিক্রেট সোসাইটি আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, বাংলা পারবে না ? প্রত্যেক জেলায় জেলায় এ রকম সমিতি গড়া চাই। আমি যে ক'দিন থাকব, তার মধ্যে নতুন নতুন সদস্য জোগাড় করুন, আমি দীক্ষা দিয়ে যাব। দেশ আজ জেগে উঠেছে, এমনকী পাহাড়ে পাহাড়ে আদিবাসীরাও অস্ত্র নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, এই সময় বাংলা ঘুমিয়ে থাকবে !

এরপর অরবিন্দ দীক্ষার শপথগুলি শোনালেন। সোসাইটির তরফ থেকে যখন যা আদেশ করা হবে, প্রত্যেক সদস্যকে তা পালন করতেই হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড। দেশের শত্রুদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনে ডাকাতি করতে হবে। সোসাইটি যদি কোনও সদস্যকে অন্য কোথাও যাবার নির্দেশ দেয়, তা হলে আত্মীয়-বন্ধুদের তা জানানো চলবে না, কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে যেতে হবে। দেশের কাজে সর্বস্ব সমর্পণ করতে হবে, নিজের বিষয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ির ওপরেও অধিকার থাকবে না। ধরা পড়লে দ্বীপান্তর বা ফাঁসি বা দীর্ঘ কারাবাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, বিচারের সময় সহকর্মীদের সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করা যাবে না।

পরদিনই দীক্ষার ব্যবস্থা হল হেমের বাড়িতেই রাত্রিবেলা। হেম আগে থেকে আরও বেশ কয়েকটি যুবককে দলে টানার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু শপথগুলির কথা শুনে তারা অনেকেই ভয়ে আসতে রাজি হল না। একজন একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসে ঘরের মধ্যে বসেছিল, অরবিন্দ হাতে একটি তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতেই সে বলল, একটু পেচ্ছাপ করে আসছি। তারপর বোধহয় সে পৃথিবীর শেষতম প্রান্তে ওই কার্যটি সারতে চলে গেল, আর ফিরে এল না।

দীক্ষা হল মোট পাঁচজনের। এক হাতে গীতা, অন্য হাতে তলোয়ার ছুঁয়ে প্রত্যেকে শপথ বাক্য উচ্চারণ করল। শেষ ব্যক্তি ভরত, অরবিন্দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যুবক, দেশের জন্য প্রাণ দিতে তোমার মনে কোনও দ্বিধা নেই তো ?

ভরত বলল, না।

অরবিন্দ বিলেতি কায়দায়, রাজা-রানিরা যে ভাবে নাইটহুড প্রদান করেন সেই ভাবে ভরতের কাঁধে তলোয়ারটি রাখলেন।

তারপর বললেন, তলোয়ারটি আসলে প্রতীক। এ কালের যুদ্ধ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে হয় না। পিস্তল-বন্দুক ব্যবহার রপ্ত করতে হবে সকলকে। এখানে কি কেউ একটা বন্দুক জোগাড় করতে পারবে ? তা হলে আমিই শিখিয়ে দিয়ে যেতাম।

হেম সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিই জোগাড় করব। দুদিন সময় দিতে হবে।

অস্ত্র আইনে কোনও ভারতবাসীরই বাড়িতেই বন্দুক-পিস্তল রাখার অধিকার নেই। দেশীয় রাজা-রাজড়া বা জমিদারগণ তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে দু'চারটি আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারেন, হেমের মতন একজন স্কুল মাস্টার বন্দুক পাবে কোথায় ? অথচ সে সংক্ষিপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিল এবং সত্যিই পরের দিন একটা বন্দুক সংগ্রহ করে আনল। কোথা থেকে কিংবা কী করে পেল, সে সম্পর্কে সে কিছু বলতে চায় না।

এই বারই প্রথম পুলিশের নজরে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। কেননা, বন্দুক চালাতে গেলে শব্দ হবেই, এবং এ শব্দ অন্য কোনও শব্দেরই মতন নয়। বন্দুকটা হাতে ধরলেই একটা বেআইনি কাজ করার উত্তেজনায় শরীর থরথর করে কাঁপে।

সত্যেন একটা উপযুক্ত স্থানের সন্ধান নিয়ে এল। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক উষর

প্রান্তরের মধ্যে বড় একটি খাদ আছে। সেখানকার ভূমি ছোট ছোট নুড়ি পাথরে ভর্তি। রেল কোম্পানির প্রয়োজনে সেখান থেকে ওই নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বছর খানেক ধরে। খুঁড়তে খুঁড়তে একটা বিশাল খাদ হয়ে গেছে, বর্ষার সময় সেই খাদ জলে ভরে যায়, এখন খরার সময়ে সেটা একেবারে শুষ্ক। অতি প্রত্যূষে, কাক-পক্ষী জাগার আগে সেই খাদে নেমে বন্দুক চালালে সেই শব্দ কেউ শুনতে পাবে না।

উত্তেজনায় সারা রাত ঘুমই হল না, রাত শেষ না হতেই বেরিয়ে পড়ল দলটি। নিঃসাড়, ঘুমন্ত সব বাড়ি, এরা সঙ্গে কোনও বাতি নেয়নি, আকাশে রয়েছে ফ্যাকাসে চাঁদের আলো।

সেই খাদটি বেশ বড়, তার এক প্রান্তে একটি চাঁদমারি তৈরি করা হল। কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই। ভোরের আলো না ফুটলে নিশানা ঠিক করা যাবে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে করতে অরবিন্দ বললেন, অস্ত্রের অভাব হবে না। দেশীয় রাজ্য থেকে অনেক অস্ত্র পাওয়া যাবে, বিদেশ থেকেও আসবে। সারা ভারতে একসঙ্গে হাজার হাজার বন্দুক গর্জে উঠবে ইংরেজের বিরুদ্ধে। অন্য সব রাজ্যগুলি তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে। কলকাতা ভারতের রাজধানী, প্রথম আঘাত হানতে হবে এই কলকাতা থেকেই।

প্রথমে শোনা গেল একটা কুবো পাখির ডাক, পূর্ব দিগন্তে দেখা গেল আলোর আভা। অরবিন্দ বন্দুকটি নিয়ে তৈরি হলেন। কুঁদো বুকে চেপে, ট্রিগারে হাত দিয়ে, মাছিতে চোখ রেখে তিনি বললেন, প্রথমে এই ভাবে শক্ত করে চেপে ধরে, নিশানার দিকে মনটাকে একাগ্র করে নিতে হবে। প্রথম প্রথম একটু সময় লাগবে, কিন্তু একবার অভ্যেস হয়ে গেলে...

অরবিন্দ ট্রিগার টেপার পর গুলিটা কোথায় গেল বোঝা গেল না, কিন্তু উল্টো ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়লেন, বন্দুকটাও খসে গেল হাত থেকে। সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে অরবিন্দকে তুলে ধরল।

তার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে, বুকে বেশ জোরেই ব্যথা লেগেছে মনে হয়। তিনি মস্ত বড় বিদ্বান ও পণ্ডিত বটে, কিন্তু বোঝা গেল, বন্দুক চালনার অভিজ্ঞতা তাঁর একেবারেই নেই। তিনি আর চেষ্টাও করলেন না।

বারীন বন্দুকটা একবার তুলে নিয়ে তাক করতে গিয়েও আবার নামিয়ে রেখে বলল, থাক, যতীনদাকেই ডাকতে হবে দেখছি।

ভরত বলল, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি?

বন্দুক-পিস্তল ভরতের কাছে খুব অচেনা বস্তু নয়। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নানা রকম আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের শখ ছিল, তিনি নিজে উত্তম শিকারি ছিলেন। অন্য রাজকুমাররাও শিকারে যেত। ভরত সে সুযোগ কখনও পায়নি বটে, কিন্তু দেখেছে অনেক। তার শিক্ষক শশিভূষণও ছিলেন দক্ষ বন্দুক চালক। একবার রাজবাড়ি সংলগ্ন দিঘির ওপারে যে জঙ্গল, সেখানে কয়েকটি হায়না এসে পড়েছিল, শশিভূষণ গুলি চালিয়ে একটাকে মেরেছিলেন, তখন ভরত ছিল তাঁর পাশে।

ভরত কখনও তলোয়ার চালনাও শিক্ষা করেনি। কিন্তু একবার কটকে আসার পথে ডাকাতদের খাল্লায় পড়ে মরিয়া হয়ে সে তলোয়ার হাতে নিয়ে নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

সেই ভরসাতেই সে বন্দুকটি হাতে তুলে নিল। কুঁদোটা চেপে নিল বগলে, একটুক্ষণ তাক করে ট্রিগার টিপল। চাঁদমারিতে লক্ষ্যভেদ হল না বটে, গুলিটা একটু দূরে আঘাত করে পাথর ছিটকে দিল, সে নিজেও ধরাশায়ী হল না।

অন্য সকলে উচ্ছ্বসিতভাবে সাবাশ সাবাশ বলে পিঠ চাপড়াতে লাগল ভরতের।

অরবিন্দ বললেন, তা হলে তো আপনিই আমাদের শেখাতে পারবেন।

ভরত লজ্জা লজ্জা মুখ করে নীরব রইল। সে যে এই প্রথমবার ট্রিগার টিপেছে, সে কথা আর জানাল না।

বারীন বলল, ভরতদাদা, আর একবার চালাও তো দেখি।

এবার ভরতের অনেকটা আত্মবিশ্বাস এসে গেছে। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল চাঁদমারির মাত্র এক বিঘত দূরে।

অরবিন্দ বললেন, যতীনকে পাঠাতে হবে না। আপনিই হবেন এখানকার শিক্ষক।

অরবিন্দ এবং বারীন সেদিনই ফিরে গেলেন কলকাতায়। ভরতের কোনও তাড়া নেই। তার পক্ষে কলকাতায় থাকা কিংবা মেদিনীপুরে থাকা সমান, কোনও জায়গাতেই তার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না। মেদিনীপুরে তার ভালই লাগছে। শুধু একটা ব্যাপারে তার অস্বস্তি হয়, হেমের বাড়িতে সে দিনের পর দিন অন্ন ধ্বংস করছে, এর তো একটা খরচ আছে! কারুর বাড়িতে দু-তিন দিনের বেশি অতিথি হয়ে থাকা উচিত নয়। হেমকে কিছু টাকাপয়সা দেবার প্রস্তাব করলে সে হেসে উড়িয়ে দেয়।

অনেক চেষ্টা করেও গুপ্ত সমিতির সদস্যসংখ্যা বিশেষ বাড়ানো গেল না। আর দুটি যুবককে কোনওক্রমে জোটানো গেছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কেমন যেন চঞ্চল ভাব। তারা লাঠি খেলা শিখতে আগ্রহী, কিন্তু বন্দুক ছুঁতে ভয় পায়। কেউ কেউ স্পষ্ট বলে, স্বাধীনতার জন্য এত হ্যাঙ্গাম করার দরকার কী, ব্রিটিশ রাজত্বে আমরা তো বেশ আছি! সাহেবদের নেকনজরে পড়লে চাকরি পাওয়া যায়, সাহেবরা না থাকলে যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, তা কে সামলাবে?

প্রতি রাত্রেই হেমের সঙ্গে ভরতের নানান কথা হয়। দু'জনের মনেই একটা খটকা লেগেছে। এখানে গুপ্ত সমিতির সদস্যসংখ্যা সাকুল্যে সাতজন, কাছাকাছি অন্যান্য জেলাতে কিছুই গড়ে ওঠেনি। তা হলে বাংলার যুবসমাজকে স্বাধীনতার সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে আরও কত বছর, কত যুগ লাগবে? প্রধান নেতা অরবিন্দ ঘোষ বলে গেলেন, ভারতের আর সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম প্রস্তুতি চলছে, বাংলা তাতে অংশগ্রহণ করবে কী করে?

ভরত বলল, আমি ভারতের বেশ কটি রাজ্যে ঘুরেছি, কোথাও এ রকম প্রস্তুতি দেখিনি। অবশ্য নিশ্চিত সবই খুব গোপন। পাহাড়ের লোকরা যে জাগল, তাদের কে জাগাল, কোথায় সেই নেতা?

হেম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বন্ধু, এক কাজ করলে হয় না? বেশি লোককে জানাবার দরকার নেই, শুধু তুমি আর আমি মিলে যদি কোনও বড় ইংরেজ রাজপুরুষকে খুন করি, তবে কেমন হয়? তাতে গোটা ভারতে সাড়া পড়ে যাবে। সবাই জানবে বাঙালি ঘুমিয়ে নেই। হয়তো তাতে আমরা ধরা পড়ে যাব, প্রাণ যায় যাবে, তবু তো অনেকের টনক নড়বে। তুমি কী বলো?

ভরত বলল, আমার আপত্তি নেই।

হেম বলল, শোনা যাচ্ছে ছোটলাট শিগগিরই এই অঞ্চল পরিভ্রমণে আসবেন। সেই সময়...আমি সামনে থাকব, ধরা যদি দিতেই হয়, আমি প্রথম ধরা দেব, তুমি পালাবার চেষ্টা করবে।

ভরত হেসে বলল, তোমার তো বউ ছেলে অছে, আমার তো ও সব বালাই নেই। প্রাণ দেবার দাবি আমারই বেশি।

এই পরিকল্পনা অবশ্য বেশিদূর এগোল না, আপাতত স্থগিত রাখতে হল। কলকাতার সমিতি থেকে নির্দেশ এল, ভরতকে কলকাতায় ফিরতে হবে অবিলম্বে, যোগাযোগ করতে হবে শ্রীমতী সরলা ঘোষালের দলের সঙ্গে।

৬৫

টাকা, টাকা, টাকা! সবসময় টাকার চিন্তা। শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ঝোঁকের মাথায়। এখন আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না। কিন্তু বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়ানো, তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা ঠিক রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই। শিক্ষকদের তো প্রতি মাসে বেতন দিতে হবেই। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতিটি ছাত্রের জন্য মাসে অন্তত পনেরো টাকা খরচ

পড়েই। বছরে একশো আশি টাকা। ভর্তির সময় অভিভাবকদের জানানো হয়েছিল যে এই আদর্শ বিদ্যালয়টি অবৈতনিক, যেমন প্রাচীনকালে গুরুর আশ্রমে শিষ্য-ছাত্রদের কোনও খরচ দিতে হত না। এখন হঠাৎ অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া যায় কী করে? রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, তাঁর এই শুভ উদ্দেশ্য দেখে বন্ধু ও শুভার্থীরা স্বেচ্ছায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। ত্রিপুরার মহারাজা মাসিক পঞ্চাশ টাকা পাঠান, আর দু-একজন কখনও কিছু সাহায্য করেন বটে, কিন্তু তা সিন্ধুতে বিন্দুর মতন। যদি দেশের এক একজন ধনী ব্যক্তি এক একটি ছাত্রের দরুন বছরে একশো আশি টাকা দিতেন, তা হলে কোনও সমস্যা থাকত না। সেই মর্মে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজনের কাছে আবেদনপত্রও পাঠিয়েছিলেন, আশানুরূপ সাড়া মেলেনি।

প্রতি মাসের শেষেই রবীন্দ্রনাথকে দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হয়। শিক্ষকদের বেতন চুকিয়ে দিতে না পারলে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। ছাত্রদের প্রতিদিনের খাদ্য সরবরাহ যদি ঠিকমতন না হয়। আরও কত টুকিটাকি খরচ থাকে, ঝড়ে হঠাৎ কোনও বাড়ির চাল উড়ে গেলে বড় খরচের ধাক্কা এসে পড়ে। সব দায়িত্ব একা রবীন্দ্রনাথের। সামনের বছর থেকে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতেই হবে, উপায়ান্তর নেই।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঋণও কম নয়। যতবার ব্যবসা করতে গেছেন, ততবারই প্রথমে কিছুদিন একটু সোনালি রেখা দেখতে পাওয়ার পরই ক্ষতি শুরু হয়েছে। সুরেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ ব্যবসায় নেমে এক মারোয়াড়ির কাছ থেকে ঋণ করতে হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, যথা সময়ে অনাদায়ে সেই মহাজন কবি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে জেল খাটাবার উপক্রম করেছিল। তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে সেই মারোয়াড়ির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া গেছে। কিন্তু এটাও তো ঋণ, এ বাবদে রবীন্দ্রনাথকে নিজের অংশেই মাসিক সুদ দিতে হয় একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তের আনা চার পাই! প্রতি মাসে সেই অর্থ জোগাড়ের দুশ্চিন্তাও মাথায় রাখতে হয়। এত টানাটানির মধ্যেও মৃণালিনী নিজের সংসার চালাচ্ছেন কোন মন্ত্রবলে কে জানে!

অভাব, সংসারের চিন্তা বারবার মন কেড়ে নিলেও তারই মধ্যে লিখতে হয়। ভারতী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, সঙ্গীত প্রকাশিকা ইত্যাদি পত্রিকায় লেখা দিতে হয় নিয়মিত, এর মধ্যে বঙ্গদর্শনের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ভরানোর দায়িত্ব তাঁর। শুধু দায়িত্ব নয়, কাগজ-কলম তাঁকে চুম্বকের মতন টানে। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই মুক্তি। একটা গান রচনা করতে পারলে মন উধাও হয়ে যায় সুরলোকে।

'চোখের বালি' ধারাবাহিক উপন্যাসটি এবার শেষ করতে হবে। দুজন পুরুষ, তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের মাঝখানে এক রহস্যময়ী বিধবা রমণী, বিনোদিনী। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের চেয়ে মানব-হৃদয়ের জটিলতাই এ কাহিনীর প্রধান অবলম্বন। মহেন্দ্র বিবাহিত তবু সে বিনোদিনীর প্রেমে উন্মত্ত, বিহারীও বিনোদিনীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তীব্রভাবে কামনা করেছে, কিন্তু তার প্রাণাধিক বন্ধু যার কাছে প্রণয় নিবেদন করেছে, তাকে কি সে নিজের করে পেতে পারে কখনও? কাহিনীটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে, প্রতি সংখ্যা প্রকাশের পরই অনেকে লেখককে জিজ্ঞেস করেছে, এর পরিণতি কী হবে?

তিপ্পান্নটি পরিচ্ছেদ লেখা হয়ে গেছে, এবার শেষ করার পালা। লিখতে লিখতে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। কাহিনীতে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে, তার সুষ্ঠু সমাধানের একমাত্র উপায়, বিনোদিনীকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া। কথাশিল্পীরা সকলেই অহিংস হত্যাকারী। কলম নামে অস্ত্রের সামান্য কয়েকটি খোঁচায় তাঁরা অবলীলাক্রমে যে-কোনও নারী অথবা পুরুষের মৃত্যু ঘটাতে পারেন। কিন্তু এতদিন ধরে লিখতে লিখতে বিনোদিনী চরিত্রটির ওপর তার স্রষ্টার বড় মায়া পড়ে গেছে। কেন সে মরবে! প্রেম কি অপরাধ? বিধবা বলে কি তার হৃদয়ের প্রেমানল জ্বলে উঠতে পারে না! অন্য অনেক সমাজে এ রকম তরুণী বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয়। হিন্দুদের মধ্যেও এখন বিধবা বিবাহে আইনের সমর্থন আছে।

মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মী বিহারীকেও সন্তানের মতন স্নেহ করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হয়েছে, মহেন্দ্রর কাম-ক্রোধ-উন্মত্ততা অনেকখানি প্রশমিত। সে ফিরে এসেছে তার স্ত্রীর

কাছে। এখন বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ দিতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু তাতে কি অতিসরলীকরণ হয়ে যায় না? শেষ পর্বে মিলন দৃশ্য দেখালে পাঠক-পাঠিকারা খুশি হয়, কিন্তু সাহিত্যে একটা ঔচিত্যবোধ থাকে, পাঠক-পাঠিকাদের খুশি করার জন্য রসের হানি করা যায় না। এখন বিহারী বিনোদিনীকে বিয়ে করলেও কি ঈর্ষার কাঁটাটি দূর হবে! বিনোদিনীও কি বিহারীকে ভালবাসতে পারবে পুরোপুরি! বিহারী বিবাহের প্রস্তাব করলেও বুদ্ধিমতী বিনোদিনীর পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করাই স্বাভাবিক।

বিহারী কলকাতা থেকে দূরে সরে গিয়ে গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাড়িতে গরিবদের চিকিৎসার জন্য একটি আশ্রম খুলবে মনস্থ করেছে। এরকম একটা মহৎ আদর্শে মনোনিবেশ করাই তাকে এখন মানায়। বিনোদিনীও যদি থাকতে চায় সেখানে, আশ্রমের কাজে সাহায্য করবে, অন্তত সকলের জন্য রেঁধে দিতেও তো পারবে?

না, এটাও ঠিক হবে না। প্রেম তো সহজে মরে না। বিনোদিনীর প্রতিদিনের সান্নিধ্যে যদি বিহারীর মনে আবার দপ করে জ্বলে ওঠে কামনা! যদি মহেন্দ্র আবার সেখানে ছুটে যেতে চায়! কাহিনী তা হলে চলতেই থাকবে।

আজকের ডাকে কয়েকটি চিঠি এসেছে। একজন ভৃত্য এসে কবির লেখার টেবিলে রেখে গেল। লিখতে লিখতে থেমে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠিগুলি নেড়েচেড়ে দেখলেন। একটি চিঠি এসেছে শিলাইদহ থেকে, আর একটি চিঠির ঠিকানা রথীর হাতের লেখা, আর একটি চিঠি বিলেতের। চিঠি পাওয়ামাত্র খুলে পড়া অভ্যেস, তবু আজ খুললেন না রবীন্দ্রনাথ। বিলেতের চিঠিটা পাঠিয়েছে তাঁর দ্বিতীয় জামাতা সত্যেন, সেটা দেখেই রবীন্দ্রনাথের বিরক্তির উদ্রেক হল। এই জামাতাটি তাঁকে নানাপ্রকারে দোহন করে চলেছে, ইংলন্ডে তার পড়ার খরচের জন্য নিয়মিত মাসোহারা পাঠাতে হয়, তাও যখন-তখন নানা ছুতোয় অতিরিক্ত অর্থ চেয়ে বসে। এ ছাড়াও তার মাকে সাহায্য করার জন্য প্রতি মাসে পাঠাতে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা। শান্তিনিকেতনের চিঠিতেও হয়তো টাকার তাগাদা আছে। এখন এসব চিঠি পড়লে লেখাটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কাহিনী শেষ করতে হলে বিনোদিনীকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একেবারে মৃত্যুর মতন কঠিন শাস্তি না দিয়ে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিলেও চলে। মহেন্দ্রর কাকিমা অন্নপূর্ণা কাশীতে গিয়ে শেষজীবন কাটাবেন ঠিক করেছেন, বিনোদিনী তার সঙ্গে চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে। বাংলার অনেক বিধবার তো কাশীবাসী হওয়াই নিয়তি।

বিদায়ের আগে বিহারী বিনোদিনীর কাছ থেকে কোনও একটা চিহ্ন রেখে দিতে চাইল। তার একগুচ্ছ চুল। এ বিলিতি প্রথা বিনোদিনীর একেবারে পছন্দ নয়। আঁচলের প্রান্ত খুলে সে দুখানি হাজার টাকার নোট বার করল। এই টাকা সে বিহারীর সৎকাজের জন্য দিয়ে যেতে চায়, এটাই তার চিহ্ন।

লিখতে লিখতে রবীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। লেখককে কেউ এভাবে টাকা দেয় না। কিন্তু লেখক ইচ্ছে করলেই বিনোদিনীর আঁচলে দু হাজার কেন, পাঁচ হাজার টাকাও বেঁধে দিতে পারতেন।

উপন্যাসটি শান্ত রস দিয়ে শেষ করা দরকার। হতভাগিনী বিনোদিনী কি কিছুই পাবে না? সে অন্তত ক্ষমা তো পেতে পারে? সমাজের চোখে সে কুলটা হয়েছিল, তবু রাজলক্ষ্মী এবং অন্নপূর্ণা তাকে ক্ষমা করেছেন। বাকি রইল মহেন্দ্রর স্ত্রী আশা। নিজের স্বামীর এই প্রণয়িনীটিকে সে দু চক্ষে দেখতে পারত না, কিন্তু এখন বিনোদিনী চিরবিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে বলে তার মন নরম হয়ে এল। সজল হয়ে এল তার চক্ষু। মহেন্দ্রও অশ্রুভরা চোখে বিনোদিনীকে প্রণাম করে বলল, বউঠান, মাপ করিয়ো।

সমাপ্তিরেখা টানার পর রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস লিখতে লিখতে চরিত্রগুলি খুব জীবন্ত, বড় আপন হয়ে যায়। তারা হয়ে থাকে প্রতি দিনের সঙ্গী। এবার এদের ত্যাগ করতে হবে। উপন্যাস শেষ করার পর ঠিক যেন প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনা বোধ

করতে হয়।

বেশিক্ষণ বসে থাকার উপায় নেই, অনেক কাজ, এখনই সংসারের ডাক পড়বে। লেখার কপি প্রেসে পাঠাতে হবে আজই। রবীন্দ্রনাথ চিঠিগুলি খুলতে লাগলেন।

দুঃসংবাদ, শুধু দুঃসংবাদ। জামাইয়ের চিঠিটা তিনি যতখানি খারাপ আশঙ্কা করেছিলেন, তার চেয়েও খারাপ। শ্রীমান সত্যেনকে খরচপত্র দিয়ে হোমিওপ্যাথি শেখবার জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মাঝপথে সে লন্ডনে নেমে পড়ে। যাই হোক, সেখানেই সে হোমিওপ্যাথি পড়া শুরু করেছিল, পাস করে ফিরে এলে সে স্বাবলম্বী হবে, এই ছিল আশা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের এখন এদেশে খুব কদর। রবীন্দ্রনাথও এই চিকিৎসা পদ্ধতি পছন্দ করেন। কিন্তু সেই আশার মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। সত্যেন জানিয়েছে যে বিলিতি আদব-কায়দা তার পছন্দ হচ্ছে না, ডাক্তারি পড়তেও ভাল লাগছে না, সে দেশে ফিরতে চায় অবিলম্বে। অর্থাৎ তাকে প্রতি মাসে যে দশ পাউন্ড করে পাঠাতে হত, আরও পোশাক কেনা, ভ্রমণ ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত দাবি ছিল তার, সেই সব টাকাই জলাঞ্জলি গেল। এখন তাকে দেশে ফেরার টিকিট পাঠাতে হবে, তার মানে আরও অন্তত পঁচাত্তর পাউন্ডের ধাক্কা! রাগ করার উপায় নেই। যেমন করে হোক টিকিটের টাকা সংগ্রহ করতেই হবে, রেণুকার মুখ চেয়ে সন্তুষ্ট রাখতেই হবে জামাইকে। রেণুকারও শরীর ভাল নয়, তার ঘুষঘুষে কাশি লেগেই আছে, মাঝে মাঝেই জ্বর হয়। সত্যেনকে টিকিট পাঠাতে যত দেরি হবে, ততই বাড়বে ঋণের বোঝা।

শিলাইদহ থেকে নায়েববাবু লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের একবার সেখানে যাওয়া দরকার। আদায়পত্র ভাল হচ্ছে না। বাবুমশাইয়ের উপস্থিতিতে এ অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

রথীর চিঠিখানিই সবচেয়ে মারাত্মক। পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মৃণালিনী দেবী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, একেবারে শয্যাশায়ী। ঠিক কী রোগ হয়েছে, তা রথী লেখেনি, তবে গুরুতর কিছু না হলে সে নিশ্চয়ই বাবাকে জানাত না। মৃণালিনীই বারণ করতেন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। মৃণালিনী এতদিন পর শুধু স্ত্রী বা গৃহিণী নয়, সহধর্মিণী হয়ে উঠছিলেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত। দূরে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই ভরসা ছিল, মৃণালিনী যখন আছেন, শান্তিনিকেতনের ছেলেরা অন্তত না খেয়ে থাকবে না।

মৃণালিনী কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বা, এই সময় তাঁর অসুখ...।

পরদিনই শান্তিনিকেতন থেকে একজন লোক এল, তার কাছে মৃণালিনীর রোগের বিবরণ পাওয়া গেল। বোলপুরের এক মুন্সেফবাবু মৃণালিনী ও রথী-শমীদের একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিন প্রবল বর্ষা, ভাদ্র মাসের আকাশ ফাটিয়ে ধারাবর্ষণ হচ্ছে, তারই মধ্যে যেতে গিয়ে সেই মুন্সেফবাবুর বাড়ির সামনে মৃণালিনী দেবী জোর আছাড় খেয়েছেন। তারপর থেকে তাঁর পেটে অসহ্য ব্যথা। উঠতে পারছেন না, কোনও খাদ্যেও রুচি নেই।

কলকাতায় অনেকগুলি কাজ না করলেই নয়, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এখনই শান্তিনিকেতনে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি স্ত্রীর জন্য ওষুধপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

এখন রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তার মধ্যে প্রধান কোনটি, অর্থ সংগ্রহ, না স্ত্রীর ব্যাধি? স্বাভাবিক উত্তর এই যে, দুটোই সমান। কিংবা, এর চেয়েও বড় একটা সমস্যা আছে, তার নাম বিনোদিনী। 'চোখের বালি'র এই নায়িকাকে রবীন্দ্রনাথ তিল তিল করে নির্মাণ করেছেন। সে এখন বড় বেশি জীবন্ত, কিন্তু উপন্যাস শেষ হয়ে গেলে তো এই চরিত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তবু সে মাথা জুড়ে থাকে। চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। এই ভরা যৌবনে সে কাশীতে গিয়ে থাকবে কেমন করে!

বিনোদিনীকে মাথা থেকে তাড়াতে না পারলে অন্য কিছু লেখা যাবে না। এমনকী অর্থচিন্তা কিংবা স্ত্রীর রোগের উৎকণ্ঠা থেকেও বারবার মন সরে যাবে। বিনোদিনী, তুমি যাও, তুমি অলীক, তুমি এখন থেকে শুধু ছাপার অক্ষরেই নিবদ্ধ থাকো।

সারা দিন ঘোরাঘুরির পর বাড়িতে এসে স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধরে। যেদিন বৃষ্টি বন্ধ থাকে, সেদিনই সারা শরীরে কুলকুল করে ঘাম বয়। স্নানের পর সারা শরীরে খানিকটা গোলাপজল ছিটিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েরা সবাই শান্তিনিকেতনে, এখানকার বাড়ি শূন্য। রবীন্দ্রনাথ ওপরের ঘরে গিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। বিজলি বাতি এসে গেছে, এখন রাত্রে লেখার খুব সুবিধে।

সম্পূর্ণ অন্য কিছু লিখতে হবে। গদ্য নয়, অনেক দিন কবিতা লেখা হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে থাকতে তিনি নিজের মনটাকে সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে নিলেন। এখন তিনি কারুর স্বামী নন, কারুর শ্বশুর নন, শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় চালাবার দায় যার স্কন্ধে, সে অন্য রবীন্দ্রনাথ। এখন তিনি কে? সামনে একটা সুদীর্ঘ পথ, সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একাকী পথিক।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুটি লাইন লিখলেন:

'পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো ওগো সেইভালো—'

একবার শুরু করলে আর কোনও বাধা আসে না। কলম যেন নিজেরই গতিতে তরতর করে এগিয়ে যায়:

কোনো মান তুমি রাখনি আমার
সেই ভালো ওগো, সেই ভালো।
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো।
পাথেয় যে-ক'টি ছিল কড়ি
পথে খসি কবে গেছে পড়ি...

কবিতাটি শেষ করার পর তেমন মনঃপূত হল না। তখনই শুরু করলেন আর একটি। তারও পরে একটি নতুন গানের কয়েক পঙ্‌ক্তি গুনগুন করতে করতে মন বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মৃণালিনীর শরীর সুস্থ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। শান্তিনিকেতনে তাঁর সেবা করবে কে? মৃণালিনীর সম্পর্কে এক বিধবা পিসি রাজলক্ষ্মী তবু সংসারটা সামলাচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনোর ভার নিয়েছেন। সঠিক চিকিৎসার জন্য মৃণালিনীকে কলকাতায় নিয়ে আসা দরকার। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শান্তিনিকেতন যেতে পারছেন না। তাঁর সমস্ত কবিতাগুলি 'কাব্যগ্রন্থ' নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করার উদ্যোগ চলছে, সম্পাদনার ভার যদিও নিয়েছেন মোহিতচন্দ্র সেন, তবু রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলি পরপর সাজানোর ব্যাপারটা নিজে দেখে নিতে চান, মুখবন্ধ হিসেবে কিছু কিছু নতুন কবিতাও লিখে দিতে হচ্ছে।

মৃণালিনীর এক ভাই নগেন আছে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ শ্যালককে চিঠি লিখে দিলেন মৃণালিনীকে নিয়ে আসার জন্য। রথীও সঙ্গে আসবে।

মৃণালিনীর শরীর খুবই দুর্বল। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর। এপর্যন্ত কোথাও ঠিক গুছিয়ে সংসার করতে পারেননি, অনেকবার ঠাঁই-নাড়া হতে হয়েছে তাঁকে। জোড়াসাঁকোয় অত আত্মীয় পরিজনের মধ্যে তাঁর থাকতে ইচ্ছে হয় না। শিলাইদহ বেশ পছন্দ হয়েছিল, সেখান থেকে পুরো পরিবারটিকে রবীন্দ্রনাথ আবার উপড়ে এনেছেন শান্তিনিকেতনে। এখানে তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। এখানকার সংসারের তিনিই ছিলেন পুরোপুরি কর্ত্রী। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে আবার জা-ননদ-ভাজদের খুঁত ধরা দৃষ্টির সামনে পড়তে হবে।

কিন্তু বাধা দেওয়ার মতন মনের জোরও আর অবশিষ্ট নেই মৃণালিনীর। ধরাধরি করে তাঁকে ট্রেনের কামরায় এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, মাথার কাছে বসে আছে রথী। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা যায়, কত তালগাছের শ্রেণী, কত বুনো খেজুরের ঝোপ। আম-জাম গাছ ও বাঁশঝাড়ে ঘেরা এক একটি শান্ত পল্লীগ্রাম, সদ্য ফসল কাটা খেত, মস্ত বড় মহিষের পিঠে চেপে একটি বাচ্চা ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে। জনশূন্য এক মাঠের মধ্যে একটা পাড় ভাঙা, আধ বোজা পুকুরে ছেয়ে আছে অজস্র সাদা পদ্মফুল। ছেলেমানুষি উৎসাহে রথী বলল, মা, মা, দেখো, কত পদ্ম!

কোনওক্রমে হাতে ভর দিয়ে উঠলেন মৃণালিনী, তার দুই চক্ষু জলে ভরে এল। তাঁর অনবরত মনে হচ্ছে, এই সব দৃশ্য তিনি আর কখনও দেখবেন না।

জোড়াসাঁকোয় যখন পৌঁছলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে নেই। তাঁকে প্রকাশকের কাছে যেতে হয়েছে। ফিরলেন সন্ধেবেলা, ঘর্মাক্ত কলেবরেই সোজা চলে এলেন স্ত্রীর শয্যার পাশে। মৃণালিনীর রক্তহীন পাণ্ডুর মুখখানি দেখে তিনি নিদারুণ বিমর্ষ বোধ করলেন। অবস্থা যে এতখানি খারাপ হয়েছে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

মৃণালিনী ক্লিষ্টভাবে হেসে বললেন, এইবারে ভাল হয়ে যাব। তোমার যে পিঠ ভিজে গেছে। যাও, জামাকাপড় ছেড়ে এসো।

রবীন্দ্রনাথ একটা হাতপাখা নিয়ে স্ত্রীকে বাতাস করতে করতে বললেন, কলকাতায় গরম পড়েছে সাঙ্ঘাতিক। শান্তিনিকেতনে কি এর চেয়ে বেশি ছিল?

মৃণালিনী বললেন, শান্তিনিকেতনে কষ্ট হয় না। সন্ধেবেলা কী সুন্দর হাওয়া দেয়। শোনো, সত্যেন নাকি ফিরে আসছে?

রবীন্দ্রনাথ শুষ্কভাবে বললেন, হ্যাঁ, তাকে টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, রওনাও হয়েছে জানি, দু-এক দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

মৃণালিনী বললেন, ভালই হয়েছে। এবারে রেণুর ফুলশয্যার ব্যবস্থা করো।

রেণুকার বয়েস এখন সাড়ে এগারো বছর, সে সদ্য ঋতুমতী হয়েছে। নিতান্ত বালিকা বয়েসে যাদের বিবাহ হয়, তাদের দ্বিতীয় বিবাহ ও ফুলশয্যার রীতি আছে ঠাকুর পরিবারে। কিন্তু এই অপদার্থ জামাইটিকে নিয়ে আদিখ্যেতা করার ইচ্ছে নেই রবীন্দ্রনাথের। তা ছাড়া এসব করা মানেই তো আবার খরচের ধাক্কা! তবু রুগ্‌ণ স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক আছে, ব্যবস্থা করা যাবে।

মৃণালিনী বললেন, মুঙ্গেরে বেলি আর শরৎকেও চিঠি লিখে দাও, ওরাও চলে আসুক। কতদিন ওদের দেখিনি। শিগগিরই তো পুজোর ছুটি পড়ে যাবে।

এখন বাড়ি আবার লোকজনে ভরে যাবে, সব সময় হইহল্লা হবে। এ দেশের মানুষ রুগিকেও শান্তিতে একলা থাকতে দেয় না, তার ঘরে বসেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। এসব রবীন্দ্রনাথের পছন্দ নয়। সত্যেন্দ্র-রেণুকার ফুলশয্যার উদ্যোগ চলতে লাগল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে সময় এখানে থাকতে চাইলেন না। তাঁর মন ছটফটিয়ে উঠল। তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু মৃণালিনীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া সহজ নয়, তিনি স্বামীকে চক্ষু-ছাড়া করতে চান না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, নাটোরের রাজা জগদীন্দ্র যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। এ সময় কি আমার না গেলে চলে? অনেক দিন আগে থেকেই কথা দেওয়া আছে।

নাটোরের রাজা পারিবারিক বন্ধুই শুধু নন, এই ধরনের ধনী ব্যক্তিদের শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ড দেখাতে পারলে অনেক রকম সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, মৃণালিনী তা জানেন।

শমীকে নিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ।

নাটোরের রাজা শান্তিনিকেতন সফর শেষ করে বিদায় নেওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথের ফেরা হল না। একবার এসে পড়লে অনেক কাজ, অনেক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। তার মনেও ওই ভিড়ের বাড়িতে ফেরার জন্য কোনও তাগিদ নেই। তবে একটা স্বস্তির ব্যাপার এই যে মুঙ্গের থেকে মাধুরীলতা এসে গেছে। সে যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই কাজের মেয়ে। সে থাকতে তার অসুস্থ মায়ের সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি হবে না।

টাকাপয়সার সমস্যা ছাড়াও এক-একটা এমন অদ্ভুত সমস্যা এসে পড়ে, যার সামাল দেওয়া কম কঠিন নয়। ছাত্রদের জন্য রান্না ও পরিবেশনের কাজে দুটি লোককে নিযুক্ত করা হয়েছে। পাচকটি ব্রাহ্মণ হলেও পরিবেশকটি ব্রাহ্মণ নয় বলে জানা গেছে। অব্রাহ্মণ পরিবেশকের হাতের ছোঁওয়া কি ব্রাহ্মণ ছাত্ররা খেতে পারে?

ঠাকুরবাড়িতে এসব শুচিবাই নেই। অব্রাহ্মণ শুধু নয়, অহিন্দুর হাতের রান্না খেতেও কেউ

আপত্তি করেন না। বিলেতে গেলে কাদের হাতের রান্না খেতে হয়? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানি। একবার এখানে খ্রিস্টানি ভাবধারা প্রচারের অভিযোগ উঠেছিল। ব্রাহ্মদের আদর্শে নয়, সনাতন হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সমাজ যা মানে না, তেমন কিছু এখানে করতে গেলে ছাত্র পাওয়া দুর্ঘট হবে।

পরিবেশকটিকে বরখাস্ত করে এক ব্রাহ্মণকে খুঁজে আনা হল। অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন, কদাকার যাই হোক, ব্রাহ্মণ তো বটে!

এর পরের সমস্যা একজন অধ্যাপককে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিয়ম করেছেন যে প্রতিদিন ছাত্ররা অধ্যাপকদের প্রণাম করে পাঠ শুরু করবে। কিন্তু অন্যতম অধ্যাপক কুঞ্জলাল ঘোষ ব্রাহ্মণ নন, তাঁকেও কি ব্রাহ্মণ ছাত্ররা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে? হিন্দু সমাজে এ রীতি নেই। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ বালকেরও পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন অনেক প্রবীণ অব্রাহ্মণ ব্যক্তি, কিন্তু একজন অব্রাহ্মণ যতই জ্ঞানী বা গুণী হন, কোনও ব্রাহ্মণ তাঁর পা স্পর্শ করবে না।

তা হলে ছাত্ররা কি অন্য অধ্যাপকদের প্রণাম করবে, কুঞ্জলাল ঘোষকে বাদ দিয়ে? তা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত একটা সমাধানের পথ রবীন্দ্রনাথের মনে এল। কুঞ্জলাল ঘোষকে অধ্যাপনার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করা হলে তাঁর সঙ্গে ছাত্রদের আর গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকবে না। তিনি খাওয়াদাওয়া ও অফিস পরিচালনার কাজ দেখবেন।

শান্তিনিকেতনে থেকে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর চিকিৎসার খবরাখবর নিচ্ছেন। কিন্তু ফেরা আর হচ্ছে না। এখানে নিরিবিলিতে তাঁর নিজের লেখার অনেক সুবিধে। বঙ্গদর্শনের জন্য অনেকগুলি রচনা লিখতে হয়। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরতে হল অন্য কারণে।

জগদীশচন্দ্র বসু পাশ্চাত্যে যশের মুকুট পরিধান করে দেশে ফিরছেন। চিঠির পর চিঠি লিখছেন কবিকে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি উন্মুখ। এই বন্ধুর জন্যই প্রায় দু বছর ইওরোপে কাটিয়ে আসা তাঁর পক্ষে অনেকটা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বন্ধুর কৃতিত্বে বিশেষ গর্বিত। জগদীশচন্দ্র হাওড়া স্টেশনে নেমেই কবিকে খুঁজবেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে তো যেতেই হবে।

মৃণালিনীর পেটের ব্যথা কিছুতেই কমছে না। পেটের অভ্যন্তরে যে কী ঘটছে, তা জানার তো কোনও উপায় নেই। এই ব্যথার জন্য ঘুমও আসে না। তাতে শরীর আরও বিশীর্ণ, মলিন হয়ে যাচ্ছে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও কাজ হচ্ছে না দেখে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের ডাকলেন।

সত্যেন ঘরজামাই হিসেবে এ বাড়িতেই আস্তানা নিয়েছে। তার বাবুয়ানার শেষ নেই, তাকে মাসে দেড়শো টাকা হাতখরচ দিতে হয়, তা ছাড়াও যখন-তখন সে গাড়ি ভাড়া বাবদ আরও টাকা চেয়ে নেয়। এখন সে আবার একটা নতুন বায়না ধরেছে। ডাক্তারি শেখা তার হল না, সে একটা ওষুধের দোকান খুলতে চায়। একটা ডিসপেনসারি সাজাতে গেলে অন্তত দু হাজার টাকার দরকার, সে টাকাও দিতে হবে শ্বশুরকে।

তাড়াহুড়ো করে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এখন তাঁকে তার ফলভোগ করতে হচ্ছে। ওইটুকু মেয়ে রেণুকা, সেও তার বাবার মনের অবস্থা বোঝে। সে সবসময় বিষণ্ণ হয়ে থাকে। তার স্বামীটি যে একটি অপোগণ্ড, বিলেতে শুধু শুধু গুচ্ছের টাকা খরচ করে এল, কাজের কাজ কিছুই শিখল না, তা নিয়ে বাড়ির লোকেরা আড়ালে আবডালে টিপ্পনী কাটে। কিছু কিছু রেণুকার কানে আসে, সে অপমান তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। শরীর এমনিতেই ভাল নয়, এর মধ্যে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। তার কাশির সঙ্গে একটু একটু রক্ত পড়ে।

বাবা কখনও পাশে এসে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে রেণুকা হু হু করে কেঁদে ওঠে, মুখে কিছু বলে না। রবীন্দ্রনাথের বুক মুচড়ে ওঠে। এ মেয়েকে তিনি কী বলে সান্ত্বনা দেবেন? তাঁরও চোখ ভিজে আসে। সন্তান যেন নিজের আত্মারই একটা টুকরো। একটা বিশেষ টুকরো। মানুষ নিজে অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে। কিন্তু সন্তানের কষ্ট দেখলে বুক একেবারে আথালি পাথালি করে। সবচেয়ে অসহায় লাগে যখন সেই কষ্ট দূর করার কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইচ্ছে থাকলেও কন্যার পাশে বেশিক্ষণ বসে থাকারও উপায় নেই। আজ জগদীশচন্দ্র এসে পৌঁছবেন।

দুবার তারিখ বদল হয়েছে বলে জগদীশচন্দ্রের আগমনবার্তা বেশি লোক জানতে পারেনি। তবু হাওড়া স্টেশনে শতাধিক লোক অপেক্ষমাণ। ট্রেন কিছুটা বিলম্বে আসছে। ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। কাছেই পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক পরা এক বিশাল চেহারার ব্যক্তি একা একা চুরুট টানছেন, বয়েস অন্তত সত্তরের কাছাকাছি হবে, মাথার চুল সব সাদা, মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ, হাতে একটা ছড়ি। মানুষটিকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগল অথচ ঠিক মনে করতে পারছেন না।

একবার ভদ্রলোক এদিকে মুখ ফেরালেন, দু জনের চোখাচোখি হল। তিনি নিজেই ছড়িতে ভর দিয়ে ঈষৎ পা টেনে টেনে এগিয়ে এসে বললেন, কবিবর যে! সংবাদ সব কুশল!

কণ্ঠস্বর শোনামাত্র রবীন্দ্রনাথ চিনতে পারলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার! অনেককাল দেখা হয়নি। এর মধ্যে ওঁর মুখে বড় বেশি বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গেছে! শরীরটিও যেন বেশ ক্লান্ত।

রবীন্দ্রনাথ নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনাকে অনেক দিন কোনও সভা-সমিতিতে দেখা যায়নি।

মহেন্দ্রলাল বললেন, শরীর আর বইছে না। কাজের নেশায় দিনরাত্তিরের খেয়াল থাকত না। এখন তার দাম দিতে হচ্ছে। আজ না এসে পারলাম না। তোমার কথা জানি, অবলা চিঠি লিখে জানিয়েছে, দুঃসময়ে তুমি ওদের প্রচুর সাহায্য করেছ, অনেক টাকাপয়সা জোগাড় করে দিয়েছ। ত্রিপুরার রাজাটিকে ধরে তুমি এবার জগদীশের জন্য একটা লেবরেটরি বানিয়ে দাও। এখানে বসে কাজ করবে, বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা এখানে আসবে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। তবে আমার একার চেষ্টায় তো হবে না।

মহেন্দ্রলাল বললেন, ত্রিপুরার আগের মহারাজকে আমি চিনতাম। বেশ রগুড়ে মানুষ ছিলেন। তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। শোনো, একটা মজার কথা বলি। আমি কবিতা-টবিতা বিশেষ পড়িনি, সময় পেতাম না। জগদীশ নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে কী করে কাব্য-সাহিত্য পড়ার সময় পায় কে জানে! তোমার লেখাও আমি আগে পড়িনি। এর মধ্যে আমার এক চেলা একদিন এসে বললেন, স্যার, রবি ঠাকুরের এই কবিতাটি পড়ে দেখুন। বড় বড় অক্ষরে লিখে এই কবিতাটা সব কলেজের ক্লাসরুমগুলিতে টাঙিয়ে রাখা উচিত। আমি বললাম, হ্যাঁ হে, কবিতা পড়তে বলছ, বোঝা যাবে তো? এখনকার বেশির ভাগ কবিতারই তো মর্ম বোঝা দায়!

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আপনার মতন ব্যস্ত লোককে আবার বিরক্ত করা কেন?

ভুরু তুলে মহেন্দ্রলাল বললেন, তোমার সে কবিতা শুধু যে বোঝা গেছে তাই নয়, দুবার পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে। বড় খাসা কবিতা! খুবই উপযুক্ত কথা লিখেছ। আমার মুখস্থ শুনবে?

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চির শিশু করে আর রাখিও না ধরে।...

একটু থেমে তিনি আবার বললেন,

পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে...

তারপর কী যেন? না, না, তুমি বোলো না। আমার ঠিক মনে পড়বে। ছাত্র বয়েসে গড়গড়িয়ে শেক্সপীয়র মুখস্থ বলতে পারতাম!

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করো নি।

শেষ লাইনটি দুবার বলে তিনি অট্টহাস্য করে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথের কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি! বড় খাঁটি কথা লিখেছ। গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া না হলে এ পোড়ার জাতের কোনও আশা নেই। আহা গো, নরেন ছেলেটা মারা গেল। ওই যে বিবেকানন্দ স্বামী। তার কী চিকিৎসা হয়েছিল কে জানে!

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাঁকে দেখতে যাননি?

মহেন্দ্রলাল বললেন, নাঃ, আমি চিকিৎসা করা ছেড়ে দিয়েছি। মানুষের রোগভোগ আর দেখতে পারি না। চোখে জল এসে যায়। তার মানে বুঝলে, চোখটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই চোখ নিয়ে ডাক্তারি করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন, তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠ ডাক্তার এই মহেন্দ্রলালকে একবার ডাকবেন, কিন্তু তা আর হবে না।

ট্রেন এসে গেছে, ঝমঝম শব্দে কাঁপছে প্ল্যাটফর্ম। মহেন্দ্রলাল বললেন, কবি, এরকম আরও লেখো। দেশের মানুষকে জাগাও!

অনেকেই ফুলের তোড়া ও মালা নিয়ে এসেছে। তারা আগে ধেয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র হাত জোড় করে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহেন্দ্রলাল ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে জগদীশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বেঁচে থাকো, আরও অনেকদিন বেঁচে থাকো, জগদীশ। তুমি আমার স্বপ্ন সার্থক করেছ!

তারপর অবলার থুতনি ধরে আদর করে বললেন, খুকি, তুই ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলি বলে একদিন কত বকেছিলাম মনে আছে? আজ বুঝেছি, সে তোর আত্মত্যাগ। তোর মতন যোগ্য সহধর্মিণী না পেলে জগদীশ এত বড় হতে পারত না!

অবলা নিচু হয়ে মহেন্দ্রলালকে প্রণাম করে বললেন, কাকা, আপনার মুখ দিয়ে বকুনি শুনতেই বেশি ভাল লাগে।

জগদীশচন্দ্র এদিক ওদিক তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজছিলেন। দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। রবীন্দ্রনাথ মুখে বেশি উচ্ছ্বাস জানাতে পারেন না, স্মিতহাস্যে কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর অন্য অনুরাগীদের সরিয়ে রবীন্দ্রনাথের কানের কাছে মুখ এনে বললেন, বন্ধু, নতুন গল্প লিখেছ তো? আগেই ফরমায়েশ পাঠিয়েছিলাম। তোমার কাছ থেকে লেখা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।

এতদিন পর জগদীশচন্দ্র ফিরেছেন, এখন প্রতিদিনই খাওয়া-দাওয়া, অন্তরঙ্গ গল্প, সংবর্ধনা চলতে লাগল। সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে দুজন রোগিণী। মাধুরীলতা স্বামীর সঙ্গে ফিরে গেছে মুঙ্গেরে। রথী সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ, তার সর্বক্ষণ বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগবে কেন? সে এখন একা একা বেরুতে পারে, সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ায়। শমীকে সারা বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে কোনও নিরিবিলি কোণ খুঁজে কিংবা ছাদে গিয়ে বই খুলে বসে থাকে। মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবে। এই বয়েসের এমন ভাবুক ও পড়ুয়া বালক খুব কমই দেখা যায়। আর মীরা তো খুবই ছোট, তাকেই বা দেখে কে! সে মায়ের ঘরে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, মা তাকে আদর করতে পারেন না। রেণুকার ঘরে গেলেও তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই বালিকাটি কারুর না-কারুর সঙ্গ চায়, কিন্তু তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার কারুর সময় নেই।

সংসার ও বাইরের পৃথিবীর মধ্যে একটা দোটানায় পড়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ইচ্ছে করে স্ত্রীর পাশে বসে থাকতে, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। কিন্তু বাইরে থেকে এমন কিছু কিছু আহ্বান আসে, যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। রোগ পুরনো হয়ে গেলে তার গুরুত্ব কমে আসে।

মৃণালিনী শয্যাশায়িনী, তাঁর শিয়রের কাছে রবীন্দ্রনাথকে সর্বক্ষণ বসে থাকতে হবে কেন ? পাখার বাতাস করার জন্য কি অন্য লোক পাওয়া যায় না ?

রবীন্দ্রনাথকে প্রায় প্রতিদিনই বাইরে বেরুতে হয়। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার কাজ আছে। তাঁর নিজের কবিতাসংগ্রহ ছাপা হচ্ছে, প্রতিটি ফর্মা নিজে দেখে না দিলে তাঁর স্বস্তি হয় না। জগদীশচন্দ্র রোজই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চান। তাঁকে যেসব বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সেসব জায়গায় রবীন্দ্রনাথেরও সঙ্গে থাকা চাই। জগদীশচন্দ্রকে শোনাবার জন্য ছোটগল্পও ভাবতে হয় তাঁকে। মৃণালিনীর সেবার জন্য তাই একজন নার্স ও দাইকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বেরুবার সময় মৃণালিনীর পাশে বসে দুটো-একটা কথা বলে যান, ফিরে এসেই আবার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধেও বিশেষ ফল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জেদ ধরে আছেন, অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের বিষগুলো আর স্ত্রীকে খাওয়াবেন না।

এক বিকেলে রবীন্দ্রনাথ এলেন মৃণালিনীর ঘরে। শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে মৃণালিনীর, কণ্ঠার হাড় প্রকট, মুখখানি রক্তশূন্য, নির্জীবের মতন চিত হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। রাতের পর রাত তাঁর ঘুম আসে না। পেটের যন্ত্রণার জন্য খেতেও ইচ্ছে করে না কিছু। রবীন্দ্রনাথ শিয়রের কাছে এসে পত্নীর একটি হাত মুঠোয় ভরে বললেন, চোখ চেয়ে থাকো কেন সর্বক্ষণ ? চোখ বুজে থাকলে ঘুম আসতে পারে।

মৃণালিনী তবু স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর দিকে। আস্তে আস্তে তাঁর চোখ জলে ভরে গেল।

রবীন্দ্রনাথ এক আঙুল দিয়ে মুছে দিলেন সেই অশ্রু।

মৃণালিনী ধীর স্বরে বললেন, তুমি শমীকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলে ? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে না ?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, স্কুল খুলে গেছে, ওর এখানে পড়াশুনোর সুবিধে হচ্ছিল না। যাওয়ার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করে গেছে, দুবার তোমাকে ডেকেছিল, তুমি শুনতে পাওনি। তুমি তখন একটু ঘোরের মধ্যে ছিলে, তাই বেশি ডাকাডাকি করিনি।

মৃণালিনী বললেন, শমী কখনও আমাকে ছেড়ে থাকেনি। ও শান্তিনিকেতনে কী করে একা একা থাকবে ?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, একা কেন ? ওখানে ওর বয়েসী আরও ছাত্র আছে, তারা যেমন থাকে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে শমী।

মৃণালিনী বললেন, আমি চলে যাব। শমীর সঙ্গে আর দেখা হবে না ?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, বালাই ষাট। ও কথা বলছ কেন ? তুমি এবার ভাল হয়ে উঠবে। আমরা সবাই মিলে কোনও পাহাড়ে বেড়াতে যাব বরং। তাতে তোমার শরীর সারবে। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করে দেখো না।

মৃণালিনী পাশ ফিরলেন। বেরিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ।

ফিরলেন রাত নটার মধ্যেই। তখনই মৃণালিনীর ঘরে এসে দেখলেন মৃণালিনী আগেরই মতন চোখ খুলে শুয়ে আছেন। একজন নার্স পাশের টুলে বসে হাতপাখায় বাতাস করছে। কার্তিক পেরিয়ে অগ্রহায়ণ মাস এসে গেল, তবু গরম কমার নাম নেই। এ বছর কি শীত পড়বেই না ? পাশেই গগনেন্দ্র বাড়ি তুলেছেন, তাই এদিককার ঘরগুলিতে বাতাসও আসে না।

নার্সকে সরে যাবার ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ নিজে টুলে বসে হাতপাখাটি তুলে নিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, আজও ঘুম এল না ?

মৃণালিনী উত্তর দিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, খেয়েছ কিছু ? একটুখানি গরম দুধ দিতে বলব।

মৃণালিনী শুধু চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টে। আবার দু চক্ষু জলে ভরে এল।

রবীন্দ্রনাথ ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কষ্ট হচ্ছে কিছু ? বেড প্যান দিতে হবে ?

মৃণালিনী কোনও কথারই উত্তর দিচ্ছেন না। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, ওঁর অভিমান হয়েছে। তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, শমীকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করব। শমী পারে, তুমিই ওকে ছেড়ে থাকতে পারো না। ছেলেমেয়েদের তো বেশিদিন ধরে রাখতে পারি না আমরা, তারা দূরে সরে যাবেই।

মৃণালিনী তবু নিঃশব্দ, নিষ্পলক।

রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অনুতপ্ত স্বরে বললেন, জানি, আমার সম্পর্কে তোমার অনেক অনুযোগ আছে। পুরোপুরি স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে পারিনি সব সময়, তোমাদের জন্য সময় দিতে পারিনি। আমার অনেক ত্রুটি আছে। ওগো, আমি ক্ষমা চাইছি। এবার থেকে দেখো, তুমি সেরে ওঠো, আমি আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না—

মৃণালিনী কিছুতেই সাড়াশব্দ করছেন না দেখে রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন, ওঁর অভিমান খুব গভীর। শমীকে পাঠিয়ে দেওয়া খুবই ভুল হয়েছে।

তিনি উঠে গিয়ে রথীকে ডেকে বললেন, তোর মায়ের পাশে গিয়ে একটু বস তো।

রথী এসে ডাকল, মা—

ছেলের ডাকেও সাড়া দিলেন না মৃণালিনী। তাঁর দুই চোখ দিয়ে শুধু বয়ে যাচ্ছে জলের ধারা।

অবিলম্বেই বোঝা গেল, মৃণালিনীর বাক্‌ রোধ হয়েছে।

ডাক্তারদের ডাকার জন্য ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। তারপর সারা রাত আর সারা দিন রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর খাটের পাশ ছেড়ে নড়লেন না। বারবার মনে হচ্ছে, বুক ভরা অভিমানের জন্যই কি মৃণালিনীর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল ?

অনেক দিন পর ইন্দিরা আর প্রমথ এসেছে এ বাড়িতে। মৃণালিনীর অবস্থা দেখে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে সবার মুখে। এ বাড়ির অনেকেরই হোমিওপ্যাথিতে তেমন বিশ্বাস নেই। ইন্দিরাও বলল, রবিকা, এই অবস্থায় তো হোমিওপ্যাথিতে কাজ হয় না। একজন অ্যালোপ্যাথকে ডাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ দু'দিকে মাথা নাড়লেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মধ্য পথে থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ধৈর্য ধরতে হয়।

শমীকে আনানো হয়েছে শান্তিনিকেতন থেকে। চার ছেলেমেয়েকে এক সময় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল মায়ের খাট ঘিরে। শুধু মাধুরীলতা রয়েছে মুঙ্গেরে।

মৃণালিনী তাদের সম্ভাষণ করলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে আর একটি শব্দও বেরুলো না। শুধু চেয়ে রইলেন অপলক। আস্তে আস্তে তাঁর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে এবার উঠে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। কারুকে কিছু না বলে উঠে গেলেন ছাদে। কেউ যাতে ডাকতে না আসে সে জন্য দরজা বন্ধ করে দিলেন। চেয়ে রইলেন তারা ভরা আকাশের দিকে। মেঘশূন্য, অমলিন, জ্যোৎস্নাময় আকাশ, ঝিকমিক করছে অজস্র গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ, সেদিকে তাকিয়ে থাকলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

৬৬

নয়নমণি এখন সারা সকাল পুঁটিকে নিয়ে কাটায়। মেয়েটা বড় ঘুমকাতুরে, তবু নয়নমণি সূর্য ওঠার আগেই তাকে ডেকে তোলে। দুজনেই পর পর স্নান সেরে নেয়। তারপর নয়নমণি নিজের হাতে পুঁটিকে শাড়ি পরিয়ে দেয়, মুখে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায়। পুঁটি প্রথমে এসেছিল একেবারে

হাড় জিরজিরে অবস্থায়, এখন শরীরে কিছুটা গত্তি লেগেছে, ভরাট হয়েছে চোয়াল, চোখে মানুষের তাড়া খাওয়া বন্য পশুর মতন ভয়ার্ত ভাবটা আর নেই। মুখে কথা ফুটেছে।

সাজগোজের পর শুরু হয় পুঁটির অগ্নিপরীক্ষা। নয়নমণি তাকে নাচ শেখাবেই। যতক্ষণ না পুঁটির পায়ের তাল ঠিক হয়, ততক্ষণ তার নিস্তার নেই, নয়নমণির সময়জ্ঞানও থাকে না। নয়নমণি নিজে গান গেয়ে গেয়ে হাতচাপড়ি দেয়, পুঁটি ঘুঙুর পরা পায়ে নাচে, নেচেই চলে, নাচতে নাচতে সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়, বসে পড়তে চায়, এমনকী কান্নাও শুরু করে, তবু দয়া নেই নয়নমণির। সে আবার হাত ধরে তাকে টেনে তুলে বলে, একটা বোল একেবারে ঠিকঠাক না করতে পারলে তুইও খেতে পাবি না, আমিও কিছু খাব না।

নয়নমণির মুখ চেয়ে অমরেন্দ্রনাথ তার থিয়েটারে পুঁটিকে সখীর দলে ভর্তি করে নিয়েছিল। বেতন সাড়ে পাঁচ টাকা। সব নাটকেরই গোড়ার দিকে একদল সখীর নাচ থাকে। অন্য থিয়েটারে সখীর দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য নতুন মেয়েরা চার টাকা মাইনে পেলেই বর্তে যায়। সেই তুলনায় পুঁটির ভাগ্য ভাল। কিন্তু দিন দশেক বাদেই নয়নমণি তাকে ছাড়িয়ে এনেছে। পুঁটি কিছুই নাচ জানে না, প্রথম থেকেই বেতালা বেখাপ্পা দলের সঙ্গে মিশে গেলে ওর জীবনে উন্নতি হবে না। নাচ কি এতই সোজা! নিষ্ঠা ও পরিশ্রম ছাড়া কোনও কিছুই শেখা যায় না। পুঁটির গলা বেসুরো নয়, মোটামুটি গাইতে পারে। যার ভেতরে সুর আছে, তার তালজ্ঞানও এসে যাবে নিশ্চিত। গান পরে ভাল করে শিখে নিলেও চলবে, নাচ শেখার জন্য এই দশ-এগারো বছর বয়েসটাই প্রকৃষ্ট। বয়েস বেড়ে গেলে পায়ের আড় ভাঙতে চায় না।

ঘরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে, তার সামনে অনেক বেলা পর্যন্ত চলে নাচের সাধনা।

পুঁটির আর অন্য কোনও নাম নেই। তার বাবা মা তার একটা ভাল নামও দেয়নি। পুঁটির মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা আর একটি শয্যাসঙ্গিনী এনেছে, প্রথম পক্ষের এগারোটি ছেলেমেয়ের দায়িত্ব সেই দ্বিতীয়পক্ষের পত্নী নিতে যাবে কেন? তার ওপর বয়স্থা মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সমস্যা আছে, ঋতুমতী হওয়ার পর সেই কন্যাদের আর অনূঢ়া রাখা চলে না, তা হলে সমাজে পতিত হতে হয়। দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালকদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করে পুঁটির বাবা হরিশ্চন্দ্র পাল তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একদিন শহর দেখাবার ছল করে বেরিয়ে পড়েছিল। পুঁটিদের গ্রামের নাম গাবখালি, শুধু ওই নামটাই পুঁটি জানে, কোন থানা, কোন মহকুমা তা তাকে কেউ শেখায়নি। গ্রাম থেকে কিছু দূর হেঁটে গেলে এক নদী, সেখান থেকে শুরু হয়েছিল নৌকো যাত্রা, এক বেলা নৌকোয় কাটাবার পর স্টিমার, তাতে সারা রাত। সকালবেলায় তারা চেপেছিল রেলগাড়িতে। জীবনে সেই প্রথম রেলগাড়ি দেখা, পুঁটিরা তিন বোন রোমাঞ্চিত বিস্মিত হয়ে দেখছে জানলার পাশ দিয়ে গাছপালা দৌড়ে যায়, গরু-ছাগল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তবু মাটি সরে যাচ্ছে, পুকুরগুলো দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায়। রেলগাড়িতে ওঠার আগে বাবা তাদের স্টিমারঘাটার হোটেলে খাইয়েছে, একখানা করে ডুরে শাড়ি কিনে দিয়েছে, পিতৃস্নেহের এমন পরিচয় ওই তিন কন্যা আগে কখনও পায়নি। সারাটা পথ একটাও রূঢ় কথা বলেনি বাবা, বরং মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেছে। যেন দ্বিতীয় পক্ষের সামনে আগের ছেলেমেয়েদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না বলেই বাবা তাদের নিয়ে যাচ্ছে এত দূরে।

কলকাতায় এসে হরিশ্চন্দ্র নিজেই হকচকিয়ে গিয়েছিল, সেও আগে কখনও এত বড় শহর দেখেনি। এত মানুষজন, এত গাড়িঘোড়া, ঘোড়াহীন মোটরগাড়ি হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধেয়ে আসে, তা দেখলে আতঙ্ক হয়। হরিশ্চন্দ্র দুই মেয়ের হাত ধরেছে, এক মেয়ে জড়িয়ে ধরে আছে তার কোমর, এইভাবে তারা হেঁটেছে কলকাতার রাস্তায়, এক দোকান থেকে তারা গরম জিলিপির মতন এক অনাস্বাদিতপূর্ব সুখাদ্য খেয়েছে। আর এক জায়গায় কিনেছে রকমারি কাচের চুড়ি। মেয়েদের হাতে চুড়ি পরাতে গিয়ে কয়েকটা ভেঙেও গেছে, কী আশ্চর্য দোকানি তার জন্য রাগও করেনি অতিরিক্ত পয়সাও নেয়নি। কলকাতায় সব কিছুই এত ভাল।

দুপুরের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তারা বিশ্রাম নিতে বসেছিল পান্তির মাঠে একটা বড় তেঁতুলগাছের

ছায়ায়। সঙ্গে এক ধামা মুড়ি আর বাতাসা। মহানন্দে সেই মুড়ি-বাতাসা খাওয়া হতে লাগল, সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষের স্রোত চলেছে, কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না তাদের দিকে। একসময় পুঁটিরা লক্ষ করল, তাদের বাবা নিঃশব্দে কাঁদছে, দু চোখ দিয়ে অঝোরে গড়াচ্ছে জল। তিন কন্যা অবোধের মতন চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কোনও বয়স্ক মানুষকে তারা কখনও আপন মনে কাঁদতে দেখেনি।

পুঁটির বড় বোন টেঁপি এক সময় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, বাবা, তোমার কী হয়েছে?

হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিল না। কেঁদেই চলল, কান্নার দমকে কাঁপতে লাগল তার শরীর। খানিক বাদে সে ধুতির খুঁটে চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টেঁপির দিকে তাকিয়ে বলল, বড় বিপদ হয়েছে রে। আমার সব টাকাপয়সা হারিয়ে ফেলেছি। এখন কী উপায় হবে? বাড়ি ফিরব কী করে?

টেঁপি বলল, আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে। তুমি যে আমায় পাঁচ টাকা দিয়েছিলে রাখার জন্য।

হরিশ্চন্দ্র বলল, পাঁচ টাকায় তো হবে না। সকলের গাড়ি ভাড়া লাগবে, খেতে হবে। বিপদ আপদের জন্যও হাতে দুটো পয়সা বেশি রাখতে হয়। তোরা এখানে বসে থাক, আমি টাকার সন্ধান করে আসি।

উঠে দাঁড়িয়েও একটু ইতস্তত করেছিল হরিশ্চন্দ্র, তারপর মেয়েদের মাথায় হাত রেখে কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, মা, ভগবান তোদের রক্ষা করবেন।

যাওয়ার সময় সে আর পিছন ফিরে তাকায়নি, ফিরেও আসেনি।

অনেকবার ধরে এই কাহিনী শুনেছে নয়নমণি। পুঁটির সঙ্গে সে তার জীবনের মিল খুঁজে পায়। ভূমিসূতা তার মা ও বাবা দুজনকেই হারিয়েছিল অকালে, অসহায় অবস্থায় তাকে তার আত্মীয়স্বজনরা বিক্রি করে দিয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র তার তিন মেয়েকে বিক্রি করার সাহস বা সুযোগ পায়নি, কলকাতায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। পুঁটি অবশ্য এখনও ভাবে, তার বাবা ইচ্ছে করে তাদের ফেলে যায়নি, নিজেই সে হারিয়ে গেছে এত মানুষের ভিড়ে। আবার কোনওদিন নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে।

ওরা তিন বোন কয়েকদিন মাত্র একসঙ্গে ছিল। টেঁপির পাঁচ টাকায় ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও অসুবিধে ছিল না। চিঁড়ে-মুড়ি-কলা সর্বত্রই পাওয়া যায়। টেঁপিই প্রথম অদৃশ্য হয়ে গেল, তার আঁচলে বাঁধা বাকি টাকা-পয়সা কটি নিয়ে। সে নিজেই গেল, না কেউ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তা জানা যায়নি। এক সকালে ঘুম ভেঙে পুঁটি দেখল যে তার দিদি নেই পাশে। ছোট বোন বুঁচির বয়েস ন বছর, তার মুখখানাই সবচেয়ে সুন্দর, রঙটাও মাজা মাজা, তাকে এক সন্ধেবেলা দুজন লুঙ্গি পরা লোক জোর করে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। পুঁটি মাঝের বোন, খুব রোগা, খিদের জ্বালায় সে রাস্তার অন্যান্য কাঙালি ছেলেদের দেখাদেখি ভিক্ষে শুরু করেছিল।

শুধু বাবার নাম আর গ্রামের নাম ছাড়া আর কিছু জানে না পুঁটি। কথার টান শুনে বোঝা যায় পূর্ববঙ্গের মেয়ে। এমনকী যে নদীতে প্রথম নৌকোয় চেপেছিল, সে নদীর নামও মনে নেই। ও এত কম জানে কেন? এই বয়েসে নয়নমণি অনেক বেশি কিছু জানত। অবশ্য তার বাবা তাকে যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। পুঁটির মতন মেয়েরা আগাছার মতন অযত্নে শুধু বেড়েই চলে, কিছু শেখে না।

নয়নমণি পুঁটির নাম দিয়েছে চারুবালা। পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মেছে, একটা মানুষের নাম ওর প্রাপ্য, শুধু মাছের নাম হয়ে থাকবে কেন? প্রথমে নাম রেখেছিল সুহাসিনী, কিন্তু সে নাম পুঁটি নিজেই উচ্চারণ করতে পারে না, সে বলত ছুয়াছিনি। তারপর নাম রাখা হল বীণাপাণি, তাও পুঁটি কিছুতেই বীণা বলতে পারে না, বলে বেনা, বেনাপাণি। চারুবালাতে তেমন গণ্ডগোল নেই। এখনও এই নামে সে ঠিক রপ্ত হয়নি, চারুবালা বলে ডাকলে অনেক সময় সাড়া দেয় না। তখন পুঁটি পুঁটি বলেই চ্যাঁচাতে হয়।

দুপুরবেলা খেতে বসে দুজনে একসঙ্গে। নয়নমণি নিরামিষ আহারই বেশি পছন্দ করে, নানা জাতীয় শাক ও আলু-ঝিঙে-করলা সেদ্ধতেই তার চলে যায়। অর্ধেন্দুশেখর তাকে মাঝে মাঝে মাংস খাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই কথা মনে রেখে সে এখন পুঁটির জন্য পাঁঠার মাংস এনে রান্না

করে। পুঁটির উঠতি বয়েস, এখন স্বাস্থ্য ভাল না হলে সে সারা জীবনই দুর্বল থাকবে। এই এগারো বছরের জীবনে পুঁটি একবারই মাত্র মাংস খেয়েছে, তাও নিজেদের বাড়িতে নয়, তাদের গ্রামের এক ধনী পরিবারের দুর্গাপূজার সময় অষ্টমীর দিনে পাঁঠা বলি হয়, গ্রামসুদ্ধ সবাই সে বাড়িতে গিয়ে পাত পেড়ে বসে গিয়েছিল। পুঁটির ভাগ্যে শুধু একটুকরো হাড় আর অনেকখানি ঝোল জুটেছিল, তবু সেই স্বাদ তার মনে আছে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও দুজনে এঁটো হাতে গল্প করে অনেকক্ষণ। লাল রঙের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে নয়নমণি, তার অঙ্গে একটা তুঁতে রঙের আলগা শাড়ি জড়ানো, কৃশ কোমর, ঈষৎ ভারী উরুদ্বয়। পুঁটি খাটের পায়ায় হেলান দেয়, দক্ষিণীদের মতন মালকোচা মেরে শাড়ি পরা, পায়ের ঘুঙুর এখনও খোলেনি, বহুক্ষণ নাচের পরিশ্রমে ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসে। বাইরে ঝকঝক করে দুপুরের রোদ, পাঁচিলে দুটি কাক অবিশ্রান্তভাবে ডেকে চলে।

নয়নমণি এই সময় পুঁটিকে জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। সচ্ছল পরিবারে, বাপ মায়ের আদরে যারা লালিত, তাদের অনেক কিছু না জানলেও চলে, কিন্তু যাদের কোনও সহায় সম্বল নেই, বেঁচে থাকার জন্য যাদের সর্বক্ষণ লড়াই করতে হয়, জীবনের ভয়ঙ্কর দিকগুলি তাদের না জানলে, না বুঝলে চলে না।

নয়নমণি বলল, মেয়েমানুষ মরে কেন জানিস চারু? কীভাবে বাঁচতে হয়, তারা যে তাই-ই জানে না। তাদের আত্মসম্মানবোধ নেই। মেয়েমানুষরা ভাবে অন্যের কথা শুনেই তাদের সারা জীবন চলতে হবে।

চারুবালা জিজ্ঞেস করল, দিদি, তুমি একা একা থাকো কী করে?

নয়নমণি বলল, আরও কিছুদিন যাক, সে কথা আস্তে আস্তে বুঝে যাবি। আগে তোর কথা ভাব। মনে কর, কোনওরকমে খুঁজে খুঁজে তোকে তোর গ্রামের বাড়িতে আবার পৌঁছে দেওয়া হল। সেখানে তোর সৎ মায়ের সংসারে তুই টিকতে পারবি?

চারুবালা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

নয়নমণি বলল, তোর বাপ-মা তোকে ফেরত নেবে না, তোর গ্রামের মানুষও তোকে দেখে দুর দুর করবে। তারা বলবে, তুই এতদিন কলকাতা শহরে একা একা থেকেছিস, হাজার পুরুষমানুষ তোকে ছুঁয়েছে, তুই নষ্ট হয়ে গেছিস। তোর জাত-ধর্ম সব গেছে। সমাজে আর তোর ঠাঁই নেই। এটা তুই বুঝিস?

চারুবালা বলল, আমায় তো কোনও পুরুষমানুষ ছোঁয়নি!

নয়নমণি বলল, তাতে কী, কেউ তোর কথা বিশ্বাস করবে না। বাপ-দাদার সংসার বা স্বামীর সংসারের বাইরে মেয়েমানুষের একটা রাতও কাটাবার অধিকার নেই। পুরুষ ছেলেদের দোষ হয় না, তারা যেখানে খুশি যায়, যেদিন ইচ্ছে ফিরে আসে। হারানো ছেলে ফিরে এলে বাড়িতে সবাই আনন্দে নেচে ওঠে। পাড়াপড়শিদের ডেকে ভোজ দেয়। হারানো মেয়েদের ফিরে আসার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ।

চারুবালার চক্ষু জলে ভরে এল। সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আমি আর কোনওদিন বাড়ি যাব না?

নয়নমণি দুদিকে আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, না, তোর আর বাড়ি নেই। মেয়েদের বাপের বাড়ির মেয়াদ বড় জোর দশ-বারো বছর। যেসব বাপের সাধ্য থাকে, তারা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পার করে দেয়। তারপর বেশিরভাগ মেয়েই সারাজীবন আর বাপের বাড়ি যায় না। মা-ভাইবোনদের চোখে দেখে না। শ্বশুরবাড়িতে লাথি ঝাঁটা খেয়েও মুখ বুঁজে থাকতে হয়। তোর বাপ তোদের তিন বোনের বিয়ে দিতে পারেননি, তাই এত দূর দেশে এনে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

চারুবালা এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারে না, তাই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

নয়নমণি বলল, তোর অন্য দুই বোনের কী গতি হয়েছে জানিস? অল্পবয়েসী সব মেয়েরাই পুরুষমানুষের খাদ্য। পুরুষরা কামড়ে, চিবিয়ে, চুষে খায়। খেতে খেতে যখন একঘেয়ে হয়ে যায়,

তখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এক জাতের পুরুষ আবার অন্য জাতের পুরুষদের এই খাদ্য জোগায়। সেই রকম পুরুষরাই তোর অন্য দুই বোনকে তুলে নিয়ে গেছে। কলকাতা শহরের অলিগলিতে এমন অনেক বাড়ি আছে, যেখানে ওই সব গুণ্ডারা মেয়েদের ভাড়া খাটায়। যাতনা সহ্য করে মেয়েরা, রোজগার করে পুরুষ। তোরও নির্ঘাত ওই গতি হত।

চারুবালা বলল, টেঁপি-বঁইচিকেও আর কোনওদিন দেখতে পাব না?

নয়নমণি বলল, দৈবাৎ দেখতে পেলেও চিনতে পারবি কি না সন্দেহ। হয় ওদের দিনের পর দিন পিষে, শুষে কঙ্কালসার করে দেবে, অথবা ভাগ্যে থাকলে যদি কোনও বড় মানুষের নেকনজরে পড়ে যায়, তা হলে দামি দামি শাড়ি-গয়নায় মুড়ে বাঁদরি সাজিয়ে রাখবে। তোর মতন মেয়েদের বাঁচার আর একটা উপায় আছে, কোনও বাড়িতে দাসী বাঁদি হয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে যাওয়া। কোনওদিন মুখ তুলে একটাও কথা বলতে পারবি না। কাজে সামান্য ত্রুটি হলে, এমনকী ত্রুটি না হলেও মারবে, মুখঝামটা দেবে, অন্ধকারে ঠেসে ধরবে, তবু কারুর কাছে সুবিচার চাইতে পারবি না। বিড়াল-কুকুরেরও অধম সেই জীবন। এমন বাড়িও আছে, যে বাড়ির গিন্নি পোষা পাখির সঙ্গেও মিষ্টিভাবে কথা বলে, কিন্তু দাসী-বাঁদিদের মনে করে হারামজাদি। তোকে আমি এই সব কথা বলতে পারছি কী করে জানিস, আমি নিজেও যে এই সবের মধ্যে দিয়ে গেছি। আমিও একসময় ক্রীতদাসী ছিলাম।

চোখ বড় বড় করে চারুবালা জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

নয়নমণি বলল, সে গল্প পরে শুনবি। তোকে আমি নাচ শেখাবার জন্য এত কষ্ট দিচ্ছি কেন? আমি তো আর সারাজীবন তোকে দেখব না। কেউ কারুর ওপর সারাজীবন নির্ভর করেও থাকতে পারে না। তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে একটা কোনও গুণ থাকা দরকার। সেই গুণটাই যোগ্যতা। মেয়েমানুষের অনেক গুণ থাকলেও সহজে কেউ দাম দেয় না, তার রূপ, তার শরীরটাকেই দেখে। এমনকী মেয়ে মানুষরা লেখাপড়া শিখলেও তাদের বাড়ির বার হতে দেয় না। বাইরে সবাই যেন তাকে খেয়ে ফেলার জন্য ওত পেতে আছে। একমাত্র থিয়েটারের মেয়েদের সে ভয় নেই। তারা সমাজের তোয়াক্কা করে না, তারা নিজেরা রোজগার করে, তারা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে।

চারুবালা বলল, তা হলে, তা হলে তুমি কেন আমাকে থিয়েটার থেকে ছাড়িয়ে আনলে?

নয়নমণি বলল, থিয়েটারে যোগ দিলেই তো হল না। যোগ্যতা থাকা চাই। যোগ্যতা না থাকলে কদিন বাদেই তাড়িয়ে দেবে। তখন এক থিয়েটার থেকে আর এক থিয়েটারে যেতে হবে, দিন দিন কদর কমে যাবে, তারপর বদ লোকদের খপ্পরে পড়তে হবে। এমনভাবে থিয়েটারের কত মেয়ে হারিয়ে গেছে। তোকে খুব ভাল নাচ শিখতে হবে, গান শিখতে হবে, নকল হাসি, নকল কান্না, নকল রাগ দেখানো শিখতে হবে, উচ্চারণ শুদ্ধ করতে হবে, তোকে আমি তেমনভাবে তৈরি করব চারু। তুই কারুর কাছে দয়া চাইতে যাবি না, তোকে পাওয়ার জন্য থিয়েটারওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে, তবে না তোর মান বাড়বে। নিজের গুণের জোরে তুই সবার ওপরে উঠবি। তখনও অনেক বড় মানুষ টাকার থলি নিয়ে, গয়নার বাক্স নিয়ে তোর কাছে আসবে। তখন তুই নিজে ঠিক করবি, বাক্স ভর্তি গয়নার চেয়েও আত্মসম্মানের দাম বেশি কি না। গুণের বিনিময়ে অর্থ, না শরীরের বিনিময়ে। বুঝতে পারছিস আমার কথা? ওমা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি, চারু, চারু, এই পুঁটি, ওঠ। কাকে বলছি এত সব কথা।

ঘুমন্ত চারুবালাকে টেনে তুলে নয়নমণি তার হাত ধুইয়ে দেয়। তাকে বিছানায় শুইয়ে সে নেমে আসে নীচে।

গঙ্গামণি এখন বাতব্যাধিতে পঙ্গু। শয্যা ছেড়ে উঠতেই পারে না। একজন মাদ্রাজি দাই রাখা হয়েছে তার জন্য, এমন গাঁট্টাগোট্টা তার শরীর যে একাধিক পুরুষকেও সে কুপোকাত করে দিতে পারবে। একদিন রাতে চোর এসেছিল, পার্বতী নামে সেই দাইটি লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছিল চোরটিকে।

পার্বতী গঙ্গামণিকে স্নান করিয়ে এনে ধরে ধরে শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর বড় পাথরের বাটিতে দুধ-মুড়ি-কলা মেখে নিয়ে এল। গঙ্গামণির আঙুলগুলো এমনই শক্ত হয়ে গেছে যে খাবারও মুখে তুলতে পারে না। তার শিয়রের কাছে বসে নয়নমণি দাইকে বলল, দাও, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

চামচে করে একটু একটু করে সে গঙ্গামণির মুখে খাবার তুলে দিতে লাগল।

খেতে খেতে গঙ্গামণি বলল, নয়ন, তুই খাইয়ে দিচ্ছিস, তাই আজ যেন বেশি খিদে পাচ্ছে। ওই পার্বতী বেটির গায়ে বড় রসুনের গন্ধ। ওকে বল না ভাল করে সাবান মেখে স্নান করে আসতে।

নয়নমণি বলল, প্রায় শেষ হয়ে এল। আর একটু খাবে?

গঙ্গামণি বলল, সন্দেশ কিনে রাখা আছে। আমায় দুটো দে, তুইও খা।

নয়নমণি বলল, আমি এখন পারব না। ভাত খাওয়া হয়ে গেছে।

গঙ্গামণি বলল, ভাত খাওয়ার পর বুঝি সন্দেশ খাওয়া যায় না? তোকে খেতেই হবে।

নয়নমণি তবুও আপত্তি জানাতে গঙ্গামণি বালিকার মতন অভিমানভরে বলল, তা হলে আমিও খাব না। ছুঁড়ে ফেলে দে। ওই মাদ্রাজি রাক্ষুসিটা সব খেয়ে নিকগে।

নয়নমণি বলল, আহা, অমন করে বোলো না। ও তোমার জন্য কত সেবা করে।

গঙ্গামণি বলল, সেবা না ছাই! কত পয়সা সরাচ্ছে কে জানে! পরের হাতে কখনও সেবা হয়? নিজে নড়তে চড়তে পারি না। এমনভাবে বেঁচে থাকার মুখে আগুন, ভগবান আমার মরণ দেয় না কেন?

হঠাৎ থেমে গিয়ে গঙ্গামণি একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নয়নমণির দিকে। তারপর ধীর স্বরে বলল, দুদিন ধরে একটা কথা ভাবছি। কোনদিন হঠাৎ আমি চোখ বুজব ঠিক নেই। তখন আমার এই বিষয় সম্পত্তির কী হবে? আমার তিন কুলে কেউ নেই, পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে। তুইও বিপদে পড়বি। বরং একটা উকিল ডাকার ব্যবস্থা কর, তোর নামে সব লিখে দিই আগে থেকে।

নয়নমণি বলল, না, না, আমার নামে কেন?

গঙ্গামণি বলল, তুই যে আগের জন্মে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলি নয়ন! তোর মতন আমার আপন তো আর কেউ নেই।

নয়নমণি এবার হেসে বলল, আগের জন্মের সম্পর্ক কি আর এ জন্মে খাটে! আমি একলা অবলা নারী, তোমার এত বড় বাড়ি, নীচে তিন ঘর ভাড়াটে, কত লোক এসে হুজ্জোত করে, তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়েও সব সামলাতে পারো। আমায় কেউ মানবে না।

গঙ্গামণিও হেসে বলল, তুমি বাছা একলা হতে পারো, কিন্তু তোমায় অবলা বলবে কোন বাপের ব্যাটা? পুরুষমানুষেরা ভয়ে তোর আঁচলের ছায়াও মাড়ায় না। দেখলাম তো এতদিন।

নয়নমণি বলল, দিদি, তুমি চোখ বোজার নামও করবে না। বাতের অসুখ আবার অসুখ নাকি, ওতে কেউ মরে না। তুমি নাচ ছেড়ে দিলে বলেই তো এমন হল।

গঙ্গামণি বলল, শোনো মেয়ের কথা! বুড়ি মাগি হয়েও ধেই ধেই করে নাচব নাকি! বড় সাধ ছিল একবার তীর্থ দরশনে যাব।

নয়নমণি বলল, একটা কাজ করতে পারো। এই বাড়ি বেচে দিয়ে তুমি কাশী কিংবা বৃন্দাবন চলে যাও। সেই টাকায় তোমার বাকি জীবন দিব্যি চলে যাবে। তীর্থস্থানেও থাকা হবে।

গঙ্গামণি বলল, ভারী বুদ্ধি দিলি তুই! বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে থাকব, কারুকে চিনি না, একদিন কেউ আমার বুকে ছুরি মেরে সব কিছু নিয়ে পালাবে। সব তীর্থস্থানেই চোর-ডাকাতরা গিসগিস করে।

একটু থেমে গঙ্গামণি বলল, তোকে ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারব না। তুই আমায় কী মায়ার বাঁধনেই যে বেঁধেছিস! আরও একটা কথা কী জানিস, থিয়েটারে আর যেতে পারি না, তবু মন টানে। এখানে থিয়েটারের লোকজন আসে, তোর মুখে গল্প শুনি, তাতেই কত ভাল লাগে। থিয়েটার ছাড়া আর তো কিছু জানিনি। এখনকার থিয়েটারের কর্তারা আমাকে ভুলে গেছে, দর্শকরাও আমাকে মনে রাখেনি, কিন্তু আমি যে থিয়েটারের কথা ভুলতে পারি না।

নয়নমণি বলল, কী যে বলো দিদি! তুমি বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর পার্ট কী দুর্দান্ত করেছিলে, বিনোদিনীকে পর্যন্ত হারিয়ে দিয়েছিলে, সে কথা সবাই এখনও বলাবলি করে।

কোনওক্রমে মাথাটা উঁচু করে ব্যাকুলভাবে গঙ্গামণি জিজ্ঞেস করল, বলে, বলে? লোকে মনে রেখেছে?

নয়নমণি বলল, মনে রাখবে না? ওই পার্টে অন্য কেউ নামলেই তোমার সঙ্গে তুলনা হয়।

গঙ্গামণি লাজুকভাবে বলল, বিল্বমঙ্গল পালায় বিনোদিনী ক্ল্যাপ পেত বড়জোর পাঁচটা-ছটা। আমি পেতাম দশটা-এগারোটা। গানের সময় পাবলিক এনকোর এনকোর বলত!

এরপর কিছুক্ষণ থিয়েটারের গল্পে মেতে রইল গঙ্গামণি। নয়নমণিকে উঠতে হবে। আজ তার থিয়েটার নেই, মহড়াতে না গেলেও চলে, কিন্তু বালিগঞ্জে সরলা ঘোষালের বাড়িতে যাওয়ার কথা আছে।

সে বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই গঙ্গামণি বলল, ও শোন নয়ন, আর একটা কথা। তুই যে মেয়েটাকে রেখেছিস, পুঁটি না খুঁটি, সন্ধেবেলায় তুই না থাকলে সে নীচের তলায় এলোকেশীর ঘরে যায় কেন?

নয়নমণি ভুরু কুঁচকে তাকাল।

গঙ্গামণি বলল, এলোকেশী মেয়ে সুবিধের নয়। তার একটার বদলে দুটো বাঁধা বাবু। তারাও প্রায়ই সন্ধের পর ইয়ারবক্সি নিয়ে আসে। সেখানে ও মেয়ে গিয়ে বসে থাকবে কেন? তোকেও বাপু বলিহারি, রাস্তা থেকে হুট করে একটা মেয়ে তুলে আনলি, কোন অজাত-কুজাতের মেয়ে তার ঠিক নেই। যদি চোর ছ্যাঁচোড় হয়!

নয়নমণি গম্ভীরভাবে বলল, দিদি, আমিও রাস্তার মেয়ে। একজন আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ঋণ শোধ করতে হবে না? আর জাতের কথা বলছ, আমাদের নিজেদেরই কি জাতের ঠিক আছে? আমরা থিয়েটারের মেয়ে বলে সমাজ আমাদের আগেই পতিত করে দেয়নি? আমরা অন্যের জাত নিয়ে এখনও মাথা ঘামাব?

গঙ্গামণি জিভ কেটে বলল, অ্যাই! তাই তো। ওটা কথার কথা, লোকে বলে তাই আমারও মুখে এসে গেছে। আমাদের আবার জাত নিয়ে মাথা ব্যথা! নয়ন, তোর কাছে আমার এখনও কত কিছু শেখার বাকি আছে। আর কোনওদিন কারুকে জাত তুলে কথা বলব না।

নয়নমণি বলল, ও মেয়ে যাতে এলোকেশীর ঘরে আর না যায়, আমি নিষেধ করে দেব। নীচের তলাতেই যাওয়ার দরকার নেই।

গঙ্গামণি চোখ পাকিয়ে বলল, কেন যাবে না? এটা আমার বাড়ি, তোর ওই মেয়ে বাড়ির যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে। এলোকেশী নালিশ করতে এলে ওর থোতা মুখ আমি ভোঁতা করে দেব। ওকে বলে দিতে হবে, এ বাড়িতে ওসব বেলেল্লাপনা করা চলবে না।

নয়নমণি বলল, দিদি, তোমাকে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। ওর নাম পুঁটি কিংবা খুঁটি নয়, এখন থেকে ওর নাম চারুবালা। তুমি চারু বলে ডেকো। ও যদি কখনও চুরিচামারি করে, দেখো, তোমার সামনেই ওকে কীরকম শাস্তি দেব।

গঙ্গামণি বলল, নয়ন, তুই একটু দাঁড়া তো, তোকে দেখি। তুই দিনদিন কী সুন্দর হচ্ছিস রে! আমি মেয়েমানুষ, তবু আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। কুসুমকুমারী-তারাসুন্দরীরা তোর ধারেকাছে লাগে না। আমি পুরুষ হলে জোর করে তোকে বিয়ে করতাম!

এবারে লজ্জা পেয়ে নয়নমণি বলল, যাঃ, কী যে বলো! আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে!

চারুবালাকে কঠিন শাসন করার ইচ্ছে নিয়ে নয়নমণি উঠে এল ওপরে। সে এখনও ঘুমোচ্ছে দেখে তাকে আর জাগাল না। নিঃশব্দে পোশাক বদল করে সে বেরিয়ে পড়ল।

বিকেল হয়ে এসেছে, পথে অনেক মানুষজন। ঘোড়ার গাড়িতে বসে জানলার এক পাশ দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে সে মনে মনে একটা গান গাইছে: 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে,

রয়েছো নয়নে নয়নে....'। সরলা ঘোষালের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গান শেখা হয়ে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু আসল মানুষটির দেখা পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত।

সরলা ঘোষাল নয়নমণিকে অনেকখানি আপন করে নিয়েছে। থিয়েটারের অভিনেত্রী বলে কেউ তাকে অবজ্ঞা করে না ও বাড়িতে। বরং দুটি যুবক তার প্রতি বেশি বেশি উৎসাহ দেখায়। সরলা ঘোষালের এক মামাতো ভাই, খোদ ঠাকুরবাড়ির সন্তান, থিয়েটারে নয়নমণিকে দেখার জন্য প্রায় প্রতিটি শো-তে উপস্থিত থাকে। শোয়ের শেষে তার জুড়িগাড়িতে নয়নমণিকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চায়। তার উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। নয়নমণি দু-তিনবার তার গাড়িতে উঠেছে, এখন কৌশল করে এড়িয়ে যায়। সে একা ফেরে না। অভিনয়ের শেষে আর তিন-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে সাজঘর থেকে বেরোয়। ওই ঠাকুরবাড়ির যুবকটির সঙ্গে সে রূঢ় ব্যবহারও করতে পারে না, আহত হয়ে সে যদি সরলা ঘোষালের কাছে গিয়ে কানভাঙানি দেয়, তাতে নয়নমণির বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। সরলা ও ওই বাড়ির অন্যদের সান্নিধ্য নয়নমণির বড় প্রিয়।

প্রত্যেকবার বালিগঞ্জের বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় নয়নমণির বুক এক আকাঙ্ক্ষায় কাঁপে। আজ কি তিনি আসবেন? এ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এক সময় ঘন ঘন আসতেন, সরলার কাছে সে গল্প শুনেছে নয়নমণি। কিন্তু ইদানীং আর তিনি আসেন না। নয়নমণি এক দিনও তাঁর দর্শন পায়নি।

দেখা না হলেও নয়নমণি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখে। অনেকগুলিই মনে মনে, কিন্তু কিছু কাগজে-কলমে লিখেও ফেলেছে। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে তিনটি চিঠি পাঠিয়েছে সে, তার অন্তর উজাড় করে দিয়েছে, কিন্তু কোনও চিঠিতেই সাক্ষর নেই, ঠিকানা দেওয়ারও প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ চিঠিগুলি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকেন নিশ্চয়ই, এই দৃশ্যটি কল্পনা করেই নয়নমণি গভীর আনন্দ পায়।

বালিগঞ্জে ঘোষালবাড়ির সামনে এসে নয়নমণি দেখল, আর একটি গাড়িও ঠিক তখনই সেখানে থেমেছে, তার থেকে নামছে এক বিদেশি ও এক বিদেশিনী। নারীটি শ্বেতাঙ্গিনী, পুরুষটির গায়ের রং ঘি-মাখনের মতন, চোখ দুটি ছোট ছোট, খুব সম্ভবত চিনা বা জাপানি। নয়নমণি ইতস্তত করতে লাগল। এ সময়ে তার যাওয়া কি ঠিক হবে? সরলা সব সময় নয়নমণিকে নিজের পাশে বসায়, অন্য আগন্তুকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই সাহেব-মেমদের সঙ্গে সে কথা বলবে কী করে? বাল্যকালে তার বাবা তাকে কিছু ইংরেজি শিখিয়েছিলেন, এখনও নয়নমণি বানান করে করে দু-চার ছত্র ইংরেজি পড়তে পারে, ক্যাট মানে বিড়াল, র‍্যাট মানে ইঁদুর আর ম্যাট মানে মাদুর এই সব সে জানে, কিন্তু মন থেকে বানিয়ে ইংরেজি বাক্য বলার ক্ষমতা তার নেই। সরলা দিব্যি গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলে, সেরকম লেখাপড়ার সুযোগ তো নয়নমণি পায়নি। একবার ক্লাসিক থিয়েটারে স্টেটসম্যান নামে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক একটা প্লে দেখতে এসেছিলেন, কবে আসবেন তা জানিয়েছিলেন আগে থেকে। অমরেন্দ্রনাথ সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ডেকে বলেছিল, বিলিতি কেতা অনুযায়ী সম্পাদকমশাই নাটক দেখার পর সকলের সঙ্গে পরিচয় করতে চাইবেন, তোমরা অন্তত নিজের নামটা ইংরেজিতে বলা শিখে নাও। সবাই পার্ট মুখস্ত করার মতন নিজের নাম বলা মুখস্থ করেছিল। নয়নমণি অবশ্য আগে থেকেই বলতে পারে, মাই নেইম ইজ নয়নমণি দাসী।

তা হলে তার ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু সরলা যে আসতে বলেছিল আজ বিকেলে। সরলার কাছে প্রায়ই নানারকম মানুষ আসে, তাদের কথাবার্তা শুনতে সে দারুণ আগ্রহ বোধ করে। সে নিজে কিছু না বললেও তৃষ্ণার্তের মতন ওই সব আলোচনা শোনে: এ যেন এক অন্য জগৎ। এদের কত বিদ্যা, কত জ্ঞান, এরা পৃথিবীর কথা বলে, দেশের কথা বলে, স্বাধীনতার কথা বলে। থিয়েটারের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এই বৃহত্তর জগতে প্রবেশের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করে নয়নমণি। কিন্তু সে যোগ্যতা যে তার নেই, না আছে বংশগৌরব, না আছে শিক্ষাদীক্ষা, সে যে শুধুই এক নটী।

কৌতূহল দমন করতে পারল না নয়নমণি, গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিল। এ বাড়ির দরোয়ান ও পরিচারকরা তাকে চিনে গেছে, আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে সে চলে এল বৈঠকখানায়।

পাশের একটি ছোট ঘরে সরলা তার অফিস বানিয়েছে, তার দলের ছেলেরা ও বাইরের লোকেরা এখানেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। বড় বড় কাগজে দেশাত্মবোধক কবিতা লেখা পোস্টার সাঁটা রয়েছে সব দেওয়ালে। বড় টেবিলের চার পাশে আট দশটি চেয়ার, সরলা যেখানে বসে তার ঠিক পেছনের দেওয়ালে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র।

সরলার পাশে বসে আছে এক মহিলা, এর নাম প্রিয়ংবদা, নয়নমণি আগে একে দু-একবার দেখেছে। মহিলাটি বিধবা এবং একজন কবি। বিধবা হলেও সে লাল পাড় শাড়ি পরে, মুখখানি বেশ সুশ্রী। সরলা নয়নমণিকে দরজার কাছে দেখে বলল, এসো বোন, এখানে এসে বসো।

বিদেশি দুজন বিপরীত দিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। সরলা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি মিস মার্গারেট নোবল, স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে এসেছিলেন এ দেশের সেবা করার জন্য, নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। আর উনি জাপান থেকে এসেছেন, কাউন্ট ওকাকুরা, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা।

জাপানি ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালেন, মেমসাহেবটি বাংলায় বললেন, নমস্কার।

নয়নমণির পরিচয় জানার পর ওকাকুরা বললেন, হোয়াট এ চার্মিং লেডি!

এরপর ওঁরা সকলে ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন, নয়নমণি চুপ করে বসে রইল। সে সব কথা বুঝতে পারছে না। কিছু কিছু অনুমান করতে পারছে। শীঘ্রই সরলার উদ্যোগে প্রতাপাদিত্য উৎসব ও বীরাষ্টমী ব্রত উদযাপন হবে, তার প্রস্তুতি চলছে, বিদেশি দুজন সেই সম্পর্কেই কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন মনে হল।

নীরবে নয়নমণি পর্যবেক্ষণ করছে সকলকে। ওকাকুরার চক্ষু দুটি ঈষৎ রক্তাভ ও ছলছলে। কিছুটা নেশা করে আছেন মনে হয়। মাঝে মাঝে তিনি গাঢ় চক্ষে তাকাচ্ছেন প্রিয়ংবদার দিকে। ওই দৃষ্টির অর্থ বোঝে নয়নমণি। প্রেমিক-প্রেমিকারা মনে করে অনেক লোকের মাঝখানে তাদের চকিত চক্ষুর মিলন অন্য কেউ দেখতে পায় না। আসলে সকলেই বুঝে যায়। প্রিয়ংবদার সঙ্গে এই জাপানি ভদ্রলোকের ঘনিষ্ঠতা হল কবে? মেমসাহেবটিই কথা বলছেন বেশি, তিনি মাঝে মাঝে এক একটা শব্দের ওপর বেশি জোর দেন, কেমন যেন উত্তেজিত ভাব, এঁর ওষ্ঠে একবারও হাসি ফোটেনি।

প্রিয়ংবদা একবার উঠে গেল বাড়ির অন্দরমহলে। তখন ওকাকুরা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন নয়নমণিকে। একবার নিবেদিত কথা থামিয়ে নয়নমণির দিকে ইঙ্গিত করে কী যেন বললেন অনেকখানি। ওকাকুরা-সরলাও তাতে যোগ দিলেন। একটু পরে নিবেদিতা নয়নমণিকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদের সব কথা বুঝতে পারছেন কী?

নয়নমণি লজ্জিতভাবে দুদিকে ঘাড় নাড়ল।

নিবেদিতা বললেন, অমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। শ্রীমতী সরলা দেবী যুবকদের নিয়ে একটা দল গড়েছেন। আপনি জানেন নিশ্চয়ই। উনি নিজে একজন রমণী হয়ে যে এরকম একটি সংগঠন করতে পেরেছেন, তা অতি প্রশংসার বিষয়। আমাদের জাপানি বন্ধুটি বলছিলেন যে মেয়েদের নিয়েও সেরকম সংগঠন নেই কেন? দেশের কাজে মেয়েরা কি পিছিয়ে থাকবে? নারীজাতিকে অন্তঃপুরে আগলে রাখলে কোনও জাতিই জাগতে পারে না। আপনার মতন নারীরাই সেরকম সংগঠনের ভার নিতে পারেন। প্রথমে কিছু বালিকা সংগ্রহ করে তাদের গান শেখাবেন, তারপর আস্তে আস্তে তাদের মনে দেশাত্মবোধ ঢুকিয়ে দিতে হবে।

নয়নমণির হৃদয় নেচে উঠল। এরকম কাজের ভার দিলে সে এক্ষুনি নিতে রাজি আছে। যদি থিয়েটার ছেড়ে দিতে হয়, তাতেও আপত্তি নেই। এরকম দায়িত্ব পেলে সেও এদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সরলা কিংবা প্রিয়ংবদার নাম যখন কেউ বলে, তখন তারা হয়ে যায় দেবী। আর নয়নমণির মতন মেয়েরা হয় দাসী। এই সমাজের মেয়েদের গান শেখাবার ভার নিলে সেও কি দাসী থেকে দেবীতে উন্নীত হতে পারবে না?

সরলা কিন্তু এই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। কেমন যেন চিন্তিতভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে

রইল নয়নমণির দিকে। তারপর বলল, আচ্ছা সে কথা পরে ভেবে দেখা যাবে।

পরিচারকরা রূপোর রেকাবিতে নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও জলখাবার নিয়ে এল। আবার কথাবার্তা শুরু হল ইংরেজিতে। ওকাকুরা মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে হাসছেন, নিবেদিতা একবারও হাসলেন না।

একজন পরিচারক এসে খবর দিল, মিস্টার অরবিন্দ ঘোষের কাছ থেকে খবর নিয়ে দুজন ব্যক্তি সাক্ষাৎপ্রার্থী। সরলা বলল, একটু অপেক্ষা করতে বলো।

চা পান শেষ করার পর ওকাকুরা ও নিবেদিতা বিদায় নিলেন। প্রিয়ংবদা তাদের এগিয়ে দিতে গেল দ্বার পর্যন্ত।

এরপর ঘরে এসে ঢুকল দুজন যুবক। সরলাকে নমস্কার করে তারা নিজেদের নাম জানাল, হেমচন্দ্র কানুনগো এবং ভরতচন্দ্র সিংহ। হেম বলল, সরলাদেবী, আমরা বরোদার মিস্টার ঘোষের কাছ থেকে এসেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কথা আপনাকে আগে জানিয়েছেন।

সরলা খানিকটা গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ। বসুন।

ভরত নয়নমণির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। এই কি ভূমিসুতা, না নয়নমণি? নয়নমণি এখন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী, ঘোষাল পরিবারের মতন উচ্চ সমাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ। ভূমিসুতা নাম সে মুছে ফেলেছে, পুরনো জীবনের সব কিছুই নিশ্চয়ই সে মুছে ফেলতে চায়। ভরত সেই পুরনো জীবনের প্রেত। আর কিছু না, ভরত শুধু ভূমিসুতার কাছে একবার ক্ষমা চাইতে চায়। কিন্তু ভূমিসুতা তাকে চেনার কোনও চিহ্ন দেখাল না। পুরনো পরিচয় যদি সে অস্বীকার করে? কথা বলতে গেলেই যদি ক্রুদ্ধ হয় কিংবা অপমান করে?

ভদ্র বাড়ির মেয়েদের দিকে বারবার তাকানো বেয়াদপি, তাই ভরত নয়নমণির দিকে আর চাইল না, একটি কথাও বলল না। মুখ নিচু করে বসে রইল।

ভরতকে দেখা মাত্র নয়নমণির বুকের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করেছে। আকস্মিকতার একটা ধাক্কা লেগেছে বটে, কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হয়নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন ভরতের সঙ্গে তার আবার দেখা হবেই। তার প্রতীক্ষা কি ব্যর্থ হতে পারে! কিন্তু এই কি সেই ভরত! একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল, তা কি ঘৃণায়? সে কি জেনে গেছে যে ভূমিসুতা এখন মঞ্চের নটী? জানাটা আশ্চর্য কিছু নয়। সকলেই জানে, নটীরা দেহোপজীবিনী। নটীদের দিকে পুরুষরা হয় লালসার দৃষ্টিতে চায়, অথবা ঘৃণা করে। ভরত তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেবে না, একটা কথাও বলবে না? সে নারী হয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলাটা মোটেই শোভন নয়। এই মানুষটির প্রণয়স্পর্শ না পেলে ভূমিসুতা হয়তো সারাজীবন সিংহবাড়ির দাসী হয়েই থাকত। ভরতই তাকে জাগিয়েছে, আর অন্তত একবার ভরত তার নাম ধরে ডাকবে না!

যুবক দুটিকে দেখে যে সরলা খুশি হয়নি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। সে নয়নমণির দিকে তাকিয়ে বলল, বোন, তুমি আর প্রিয় একটুক্ষণ ভেতরে গিয়ে বসো, এদের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

নত মুখে, নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নয়নমণি।

৬৭

শোকের সময়ও পেলেন না নিবেদিতা। শোকের বদলে যেন বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ক্ষোভ আর অভিমান। তাঁর প্রভু কেন এভাবে চলে যাবেন? না, না, এ সময়ে তাঁর চলে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি। তাঁর এত প্রিয় এই দেশ, এই দেশের মানুষ, এখানে অবিলম্বে কত কী ঘটতে

যাচ্ছে, স্বামীজি নিজে তখন উপস্থিত থাকবেন না? স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হবে, তার নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেছিলেন স্বামীজি, কিন্তু নিবেদিতা ঠিক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি করাতেনই। এই নেতৃত্বের যোগ্যতা স্বামীজির চেয়ে আর কার বেশি? পরাধীনতার মর্মবেদনায় এক এক সময় তাঁকে ক্ষিপ্তের মতন হয়ে যেতে কি দেখেননি নিবেদিতা? যদি বা স্বামীজি প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিতে রাজি নাও হতেন, তবু তাঁর উপস্থিতিই এক বিশাল প্রেরণা।

তিনি কাছে নেই, তবু কোথাও আছেন, তাতেই অনেক জোর পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি নেই, আর একেবারেই নেই, এ যে মেনে নেওয়া অসম্ভব। তিনি সত্যিই নেই? বিলীন হয়ে গেছেন পঞ্চভূতে? হিন্দুরা পরলোকে বিশ্বাস করে। মৃত্যুলোকের ওপারে কোথাও বিরাজ করে মানুষের আত্মা। কেউ কেউ মৃত ব্যক্তিদের কখনও কখনও সশরীরে দেখতে পায়। মহাপুরুষরা মাঝে মাঝে দর্শন দিতে আসেন। আজন্ম সংস্কারে নিবেদিতার পক্ষে এসব মানা সম্ভব নয়, আবার পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কই, দশদিন কেটে গেল, তবু তো স্বামীজি একবারও তাঁর প্রিয় শিষ্যাকে দর্শন দিলেন না। নিবেদিতার বিশ্বাসের তীব্রতা নেই, সে জন্য তিনি দেখতে পান না?

এমন নিঃসঙ্গতা আগে কখনও বোধ করেননি নিবেদিতা। বিশ্ব[illegible]ও ভরা নিঃসঙ্গতা। এ দেশে তাঁর আর কে আছে? কথা বলারও আর কেউ নেই। কারুর মৃত্যু হলে আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক এমন অনেক কিছু ঘটতে থাকে যে, সেই দিকেই মন চলে যায়, শোক করার সময় থাকে না।

এর মধ্যে নিবেদিতা কয়েকবার বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী ও গুরুভ্রাতাদের ব্যবহার তাঁর কাছে বড় অদ্ভুত মনে হয়েছে। দিনের পর দিন ধরে প্রায় সকলেই কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করে চলেছেন। অথচ এখনই তো কাজের সময়, কাজের মধ্য দিয়েই শোক দমন করতে হয়, স্বামীজি প্রতিষ্ঠিত এই মঠ ও কর্মপন্থাকে সচল রাখা, আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তো স্বামীজির স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। সেদিকে যেন কারুর মন নেই। নিবেদিতা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেও কেউ ঠিক উত্তর দেয় না। এমনকী নিবেদিতার এমন সন্দেহও হয় যে, সন্ন্যাসীরা যেন তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। একদিন ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, ওকাকুরাও স্বামীজির আকস্মিক তিরোধানে খুব আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, মঠের কেউ ওকাকুরার উপস্থিতি গ্রাহ্য করল না, কেউ কথাও বলল না। ওরা দুজনে মঠের বাইরে স্বামীজির চিতাস্থলের কাছে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। গঙ্গায় চলমান জলযানগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, জীবনের স্রোত একইরকম বয়ে চলেছে, শুধু স্বামী বিবেকানন্দ নেই। তাঁর উপস্থিতি অতি প্রবল ছিল বলেই তাঁর না-থাকাটা একেবারে অসহনীয় মনে হয়।

দু দিন পরে নিবেদিতা মঠে গিয়েছিলেন একা। সেদিনও অন্যদের নিস্পৃহ ভাব দেখে তিনি সারদানন্দের পাশে গিয়ে বসলেন। সারদানন্দের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে, ইনি ইংরিজি ভাল জানেন বলে কথাবার্তা সহজে বলা যায়। নিবেদিতা সরাসরি সারদানন্দকে প্রশ্ন করলেন, বেলুড় মঠের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কোনও পরিকল্পনা করব না? স্বামীজির আরব্ধ কাজের দায়িত্ব এখন আমাদেরই ভাগ করে নিতে হবে।

সারদানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সরাসরি নিবেদিতার মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেলে বললেন, হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমরা অনেক চিন্তা করেছি। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তোমার বিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। আমাদের সবার প্রিয়, বন্ধু এবং গুরু নরেন এখন নেই, তার অবর্তমানে অনেক কিছুই বদলে গেছে। তুমি বরং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলে নাও।

ব্রহ্মানন্দকে খবর দেওয়া হল, তিনি ওপরতলায় স্বামীজির ঘরের পাশের বারান্দায় নিবেদিতাকে নিয়ে বসলেন। সেখানে কয়েকজন সন্ন্যাসী চক্ষু বুজে, জপ-তপ-ধ্যান করছেন, তাঁদের বলা হল নীচে চলে যেতে। স্বামীজির ঘরের জানালা খোলা, দেখা যাচ্ছে তাঁর খাটটি। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বৃষ্টির ধারায় গঙ্গানদী এখন ঝাপসা।

আর কেউ নেই, তবু ব্রহ্মানন্দ কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে রইলেন। যেন তিনি আরম্ভের বাক্যটি খুঁজে পাচ্ছেন না। নিবেদিতা কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। নীরবতা কাটছে না

দেখে তিনিই ব্রহ্মানন্দকে প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাকে কিছু বলবেন না ?

মুখ তুলে ব্রহ্মানন্দ বললেন, ভগিনী, তুমি কি এই বেলুড় মঠকে ভালবাস ? আমাদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মঙ্গল চাও ?

নিবেদিতা চমকে ভুরু তুলে তাকালেন। এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন ! স্বামীজির প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করার জন্যই তিনি এ দেশে এসেছেন। স্বামীজির নিজের হাতে গড়া এই মঠ, এই সঙ্ঘ, এর জন্য স্বামীজি কত পরিশ্রম করেছেন, নিবেদিতা কি সব সময় স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে থাকেননি ? এখানে এক সময় মাঠ ছিল, বিদেশি ভক্তদের টাকায় জমি কেনা হল, আস্তে আস্তে গড়ে উঠল এত বড় মঠ, স্বামীজির চেষ্টা., স্বামীজির ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই টাকা এসেছে বিদেশ থেকে, নিবেদিতাও কি সেই অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করেননি ? স্বামীজি দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকায় গেলেন, তখন নিবেদিতাকেও কি বহু জায়গায় এই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়নি ? এখন এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিনি এই মঠকে ভালবাসেন কি না ?

ব্রহ্মানন্দ আবার বললেন, জানি, তুমি মন প্রাণ দিয়ে এখানকার সব কিছু ভালবাস, তবু, বলতে আমার খুবই খারাপ লাগছে, কষ্ট হচ্ছে, তা হলেও বলতেই হবে, তুমি আর এখানে এসো না। তুমি এলে আমাদের ক্ষতি হবে !

নিবেদিতা আর্ত স্বরে বলে উঠলেন, আমি এলে ক্ষতি হবে ?

ব্রহ্মানন্দ বললেন, তোমার কাজের ধারা বদলে গেছে, তুমি এখন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছ, আমরা সন্ন্যাসী, আমরা রাজনীতির সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখতে চাই না। তুমি ওকাকুরা সাহেবকে সঙ্গে করে আনো, তিনিও কী সব উগ্র মতবাদ প্রচার করেন শুনেছি। আমরা বেলুড় মঠকে রাজনীতির আখড়া বানাতে চাই না।

নিবেদিতা বললেন, সে প্রশ্নই ওঠে না। মঠের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোনও সম্পর্ক নেই। সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বামীজির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কথা হয়েছে, তর্ক হয়েছে, কিন্তু তিনি তো আমাকে আসতে বারণ করেননি। মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাকে মঠে আসতে বললেন, আমি এলাম, তিনি নিজের হাতে আমাকে আহার্য প্রস্তুত করে দিলেন—

ব্রহ্মানন্দ বললেন, নরেন ছিল পাহাড়ের মতন, সে অনেক কিছু সামলাতে পারত, এখন মঠের ওপর যদি পুলিশের নজর পড়ে তা হলে সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে। এখানে আর কেউ আসবে না। এমনিতেই গোঁড়া হিন্দুরা আমাদের নামে অনেক কিছু বলে—

নিবেদিতা বাধা দিয়ে বললেন, স্বামীজি কোনওদিনই গোঁড়া হিন্দুদের মতবাদ কিংবা হীন কুৎসা তোয়াক্কা করতেন না। সন্ন্যাসীরা নির্জন জঙ্গলে কিংবা গিরিকন্দরে আশ্রম বানিয়ে বসবাস করলে শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে পারেন। কিন্তু লোকালয়ের মধ্যে এরকম মঠ বানিয়ে থাকলে আশেপাশের মানুষদের সম্পর্কে কি উদাসীন থাকতে পারে ? মানুষের অভাব, অনাহার, দুর্বলের ওপর শক্তিমানের উৎপীড়ন, পরাধীনতার গ্লানি, এই সব বিষয়ে স্বামীজি স্বয়ং বিচলিত হতেন না ? এই সব দূর করার চেষ্টাই কি রাজনীতি ?

ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতার কথায় কান না দিয়ে বললেন, সঙ্ঘ, মঠের জন্য তুমি যত টাকাপয়সা তুলেছ, এখনও তোমার নামে অনেক চেক ও ড্রাফট আসে, সে সব মঠেরই প্রাপ্য। সেগুলি তুমি এখানে জমা করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়ো অবিলম্বে। এ যাবৎ তোমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত অর্থ ন্যায়ত মঠেরই প্রাপ্য। তোমার মঠে আসা-যাওয়া বন্ধ করাই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন সংবাদপত্রে তোমার একটা বিবৃতি দেওয়া দরকার যে তুমি বেলুড় মঠের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছ।

নিবেদিতার সমস্ত অন্তরাত্মা চিৎকার করে বলতে চাইল, না, না, আমি এ সব মানি না। এই মঠের ওপর আপনাদের যতখানি অধিকার আছে, আমার অধিকারও কোনও অংশে কম নয়। আমি কেন সেই অধিকার ছাড়ব ? আমি যখন ইচ্ছে আসব। যে-কক্ষে আমার প্রভু, আমার স্বামীজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমি সেখানে বসে থাকব। তিনি আমাকে কখনও ছেড়ে যাবেন না

বলেছিলেন, ওই ঘরটায় বসলে তবু আমি তাঁর কিছুটা সাহচর্য পাব।

ব্রহ্মানন্দ বললেন, মঠের সঙ্গে তোমার আর সম্পর্ক না থাকলেও তোমার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে—

নিবেদিতা আর কিছুই শুনলেন না। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে, তিনি তরতর করে নেমে এলেন নীচে। অন্য দিন কেউ না কেউ তাঁকে নৌকোর ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, শেষের দিকে স্বামীজি নিজে না এলেও সঙ্গে কোনও লোক দিতেন আর ওপরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন, আজ কেউ এল না। নিবেদিতা বৃষ্টির মধ্যে একা দৌড়ে চলে গেলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গার ওপর দিয়ে নৌকো চলেছে বাগবাজার ঘাটের দিকে। নিবেদিতার দু' চক্ষু দিয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু। আজই তিনি প্রথম কাঁদলেন।

বাড়ি ফিরে তাঁর মনে হল, এই সিদ্ধান্ত কি ব্রহ্মানন্দের একার, না মঠের সকলের ? ব্রহ্মানন্দ মঠাধ্যক্ষ হলেও এরকম সময়ে নিশ্চয় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। স্বামী বিবেকানন্দর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যাপার সবাই মেনে নেবে ? তিনি আশা করতে লাগলেন, অন্য কেউ এসে বলবে, না, না, ও সব ভুলে যাও, তুমি আগের মতনই মঠে আসবে, কাজের ব্যাপারে পরামর্শ দেবে। সেরকম কেউ এল না, তবে কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল যে নিবেদিতা যদি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বর্জন করেন, সেই ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাও বন্ধ করে মঠের নির্দেশ মেনে চলেন, তা হলে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ কথা শুনলেও নিবেদিতার মেজাজ দপ করে জ্বলে ওঠে। এরা ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য বোঝে না। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি অন্য অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছেন, এখন নিজে পিছিয়ে আসবেন ? না, তা হতেই পারে না।

দিনকতক পরে ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে গম্ভীর সরকারি ধরনের চিঠি এল। নিবেদিতা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা তিনি জানতে চান। সংবাদপত্রের বিবৃতির ব্যাপারে তিনি আর দেরি করতে চান না।

সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানির উত্তর না দিয়ে নিবেদিতা স্নান করতে গেলেন। তারপর ধ্যানে বসলেন, মুদ্রিত চক্ষুর অন্ধকারে বারবার ভেসে উঠছে স্বামী বিবেকানন্দর মুখ, অসুস্থ হবার আগেকার সেই দিব্যকান্তি, উজ্জ্বল দুই চক্ষু। কিন্তু শুধুই মুখচ্ছবি, তা সবাক নয়, স্বামীজি তাঁর প্রিয় শিষ্যাকে কোনও নির্দেশ দিলেন না।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকবার পর নিবেদিতার মন প্রশান্ত হয়ে গেল। বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর কোনও প্রকার মতবিরোধ বাইরে জানাজানি হলে বহু লোক মজা পাবে, হাসাহাসি করবে। মঠের কোনও প্রকার ক্ষতি হয়, এমন কাজ তিনি কিছুতেই করতে পারেন না। ব্রহ্মানন্দ যা চান তাই হবে, মঠের ওপর অধিকার তিনি ত্যাগ করবেন। টাকাপয়সা যা আছে, তা পাইপয়সা পর্যন্ত হিসেব করে চুকিয়ে দেবেন মঠের কাছে।

কাগজ কলম নিয়ে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন এর পর। একটি চিঠিতে ব্রহ্মানন্দকে সশ্রদ্ধভাবে জানালেন, যতই বেদনাদায়ক হোক, তবু আপনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান, তা আমি মেনে নিলাম। প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমার প্রিয় গুরুর ভস্মাবশেষের বেদীমূলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভুলবেন না।

সংবাদপত্রের জন্যও একটি বিবৃতিতে লিখলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্পূর্ণ তাঁরই ব্যক্তিগত, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নির্দেশের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। কাছেই অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস, বিবৃতিটি পাঠিয়ে দিলেন সেখানে।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেও সম্পর্ক রইল না, এখন আর কেউ নেই। কার কাছে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবেন ? জগদীশ আর অবলা এখন কলকাতায় রয়েছেন বটে, কিন্তু ওঁরাও রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে চান না।

নিবেদিতার এখন চলবে কী করে ? তাঁর নিজস্ব সম্বল কিছু নেই। স্বামীজির সহযোগিনী হিসেবে কাজ করছিলেন বলে বিদেশি ভক্তরা তাঁর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য মাসে মাসে টাকা দিতেন, এখন

নীতিগতভাবে সে টাকা তিনি নিতে পারেন না, সব টাকাই সঙ্ঘের প্রাপ্য। একটি অনাথ আশ্রম ও একটি বিধবা আশ্রম খোলার জন্য বিদেশ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে এনেছিলেন, ওই সব চালাবার অধিকারও আর তাঁর নেই, সে টাকাও সঙ্ঘকে ফেরত দিতে হবে। তা হলে নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কী? দেখা যাক, বই লিখে কিছু কিছু উপার্জন করা যায় কি না। কিছুতেই তিনি হার মেনে ফিরে যাবেন না, এই ভারতই তো তাঁর দেশ।

মাঝে মাঝে অন্য লোকজন কিছু কিছু আসে। স্বামীজির ছোট ভাই ভূপেন এলে তাঁর ভাল লাগে, এর মুখের গড়নে, পাশ ফিরে তাকানোয় স্বামীজির কিছুটা আদল আছে। কিন্তু ছেলেটিকে পছন্দ করা শক্ত, তার ব্যবহার উদ্ধত ধরনের, অল্প বয়েস, তবু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। একদিন দীনেশচন্দ্র সেন নামে একজন লেখকও এসে উপস্থিত হয়েছিল। নিবেদিতা তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন, ইনি স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই। ভূপেন অমনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, আমাকে সব সময় বিবেকানন্দর ভাই বলতে হবে কেন, আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এই পরিচয়টাই যথেষ্ট!

ভূপেনের মধ্যে তবু দেশপ্রেমের আঁচ আছে, দীনেশের মধ্যে তাও নেই। সে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান ও নানা লোককাহিনী খুঁজে খুঁজে বার করছে, সেটা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। একদিন দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতা বাগবাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন, হঠাৎ একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় তাড়া করে এল। অমনি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য চোঁ চোঁ করে দৌড় মারল দীনেশ, নিবেদিতার কী হল, তা ফিরেও দেখল না। এই কি পুরুষমানুষ, এ যে অবলা নারীরও অধম! এক-এক সময় দীনেশ রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে যায়, তখন বোঝা যায়, এ বিষয়ে তার সামান্য জ্ঞানও নেই। মাঝে মাঝে নিবেদিতা ধমক না দিয়ে পারেন না, তিনি বলেন, আপনি চুপ করুন তো। যে বিষয়ে কিছু জানেন না, সে বিষয়ে কথা বলবেন না। বরং সাহিত্য বিষয়ে যা বলার আছে, বলুন।

একদিন সকালবেলা সাইকেলে চেপে একজন ইংরেজ যুবক এল দেখা করতে। কৃশকায় দীর্ঘ শরীর, বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিতে কিছুটা সারল্যও রয়েছে, এ দেশের অধিকাংশ ইংরেজের মতন অহংকারী ভাব-ভঙ্গি নেই। নিবেদিতা একটু বিস্মিত হলেন। শহরবাসী ইংরেজ সমাজের আমন্ত্রণে তাঁকে মাঝে মাঝে দু'-একটা আসরে যেতে হয় বটে, কিন্তু তিনি যে শাসক শ্রেণীর কেউ নন তা বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি সাহেবপাড়ায় থাকেন না, উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি গলির মধ্যে এ বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। এখানে সচরাচর কোনও ইংরেজ পুরুষ রমণী তাঁর কাছে আসে না।

যুবকটি বিনীতভাবে জানাল যে, আগে থেকে খবর না দিয়ে চলে আসার জন্য সে দুঃখিত। তার নাম স্যামুয়েল কে র‍্যাটক্লিফ, সে দা স্টেটসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, লন্ডন থেকে কিছুদিন মাত্র আগে এ দেশে এসেছে। সে নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চায়।

নিবেদিতা বললেন, আমার এখনও প্রাতরাশ হয়নি, তুমি আমার সঙ্গে যোগ দাও। তুমি আমার কথা জানলে কী করে?

র‍্যাটক্লিফ বলল, কয়েক দিন আগে লাউডন স্ট্রিটে একটি চায়ের আসরে আপনাকে দেখেছি। অনেক লোকজন ছিল, আপনি হয়তো আমাকে লক্ষ করেননি। সেখানে আপনাকে কিছু বলতে বলা হয়েছিল, আপনার বক্তৃতা শুনে আমি দারুণ চমকে গেছি। এ দেশে এসে এরকম কথা আমি আগে আমার কোনও স্বদেশবাসীর মুখে শুনিনি। আমি নতুন এসেছি, সবাই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে এ দেশের লোকরা কত খারাপ, মিথ্যেবাদী ও ভণ্ড, মেয়েদের ওপর সাঙ্ঘাতিক অত্যাচার করে, মেয়েরাও অবোধ ও কুসংস্কারগ্রস্ত! আপনি অতগুলি ইংরেজ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার সামনে অকুতোভয়ে বললেন, ইংরেজরাই কিছু বোঝে না। এ দেশের নারীদের গৌরবময় ঐতিহ্য, সেবার আদর্শ ও মানবিকতার দিকগুলি গভীরভাবে জানার চেষ্টাও করে না, ওপর ওপর কিছু ব্যাপার দেখে নিন্দে করে। শুধু তাই নয়, শাসকশ্রেণী ভারতীয় সমাজের অনেক ভাল ভাল রীতি ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি শুনে একেবারে স্তম্ভিত।

নিবেদিতা স্মিতহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ঠিক কী কাজ করো?

র‍্যাটক্লিফ বলল, প্রধানত সম্পাদকীয় লেখানোর জন্য আমাকে আনানো হয়েছে।

নিবেদিতা বললেন, তুমি যদি পার্ক স্ট্রিট-লাউডন স্ট্রিটের সমাজে ঘোরাফেরা করো, তা হলে এ দেশ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। সরকারি বক্তব্য ও ইংরেজ সমাজের একপেশে মন্তব্যই তোমার লেখায় ফুটে উঠবে। সেটা কি যথার্থ সাংবাদিকতা! সম্পাদকীয় লেখক এ দেশের মানুষ, তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিযোগের কথা জানবে না?

র‍্যাটক্লিফ বলল, জানবার চেষ্টা করছি। সেই জন্যই আমি সময় পেলেই বাইসাইকেল নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াই। নেটিভ পাড়াতেও আসি। গ্রামাঞ্চলেও যাবার ইচ্ছে আছে।

নিবেদিতা বললেন, ইংরেজদের পত্র-পত্রিকাগুলি সবই সরকারের ধামাধরা। লর্ড কার্জন কী সব কাণ্ড-কারখানা শুরু করেছেন, তুমি তা সমর্থন করো? লোকটা কী সাঙ্ঘাতিক অহংকারী! এ দেশের মানুষদের মানুষ বলেই মনে করে না। ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, ইংরেজরা যেন আরও এক হাজার বছর এই দেশ শাসন করবে। কলকাতা কর্পোরেশনের কী হাল করল! দেশীয় লোকদের হাতে আরও কিছু ক্ষমতা দেবার বদলে বরং উল্টে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিল। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সরকারি চাপে রাখতে চায়। দিল্লিতে আবার দরবার বসতে চলেছে, শুধু শুধু কত টাকার অপব্যয় হবে, সব এ দেশেরই টাকা!

র‍্যাটক্লিফ বলল, আপনি আমাদের পত্রিকায় লিখবেন?

নিবেদিতা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আমি! আমাকে তোমাদের পত্রিকায় লিখতে দেবে?

র‍্যাটক্লিফ বলল, আমি ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে আপনার দু'-একটি রচনা আমি পড়েছি। আপনার ভাষার জোর আছে।

নিবেদিতা খুশিই হলেন এ প্রস্তাবে। স্টেটসম্যান অতি শক্তিশালী পত্রিকা, তার মাধ্যমে নিজের কথা বলতে পারলে শাসকশ্রেণীর কিছুটা টনক নড়বে। তাঁর জীবিকারও খানিকটা সুরাহা হবে।

চায়ের টেবিলে বসে নানা রকম গল্প হল। কলকাতার ইংরেজ সমাজে র‍্যাটক্লিফের মতন মুক্ত-মনা মানুষ দুর্লভ। এরকম মানুষের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়।

ওকাকুরা কয়েক দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে আসতেই তাঁর সঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার ব্যাপারটা তাঁর প্রাণে খুব বেজেছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না, কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তবু সেটা ভোলা যায়। আর যে-জন্য সঙ্ঘের গুরুভাইদের সঙ্গে মতভেদ, সেই কারণটাকেই সার্থক করে তুলতে হবে। শুধু আধ্যাত্মিকতার পরিপোষণ নয়, এখন এ দেশের পক্ষে বেশি প্রয়োজন পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি। তার জন্য চাই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি। তার জন্য শুধু সভা-সমিতি বা বক্তৃতায় হবে না, চাই সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

ওকাকুরার এশিয়ার ঐক্য নীতি অনেককেই নাড়া দিয়েছে। ভারত পরাধীন, কিন্তু তার সংগ্রামের সাথি হিসেবে অন্য দেশগুলি পাশে এসে দাঁড়াবে, তারা অস্ত্র দেবে। সমগ্র এশিয়ার দেশগুলি একজোট হলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি ভয়ে পালাবে। এশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে এশিয়াবাসীরাই। এ জন্য অচিরেই দরকার ভারতের সর্বাত্মক প্রস্তুতি।

নিবেদিতা ওকাকুরাকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির আখড়ায়। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের অনুশীলন সমিতির ছেলেরা যথেষ্ট উৎসাহী। প্রমথ মিত্র এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু দেশোদ্ধারের তেজ একটুও কমেনি। কলকাতা ছাড়া বরিশালেও তাঁর সংগঠন আছে। সার্কুলার রোডে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেলারা দেশের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। অভিজাত শ্রেণীদের মধ্যেও কেউ কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে গোপন সমর্থন জানাচ্ছেন। একজন ধনী ব্যক্তি, নিজের নাম না জানিয়ে লোক মারফত ঘোষণা করেছেন যে, গুপ্ত সমিতির ছেলেরা যদি অন্তত একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকেও খুন করতে পারে, তা হলে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। অর্থাৎ তিনি বিপ্লবীদের শক্তি পরীক্ষা করতে চান। যতীন ব্যানার্জির দলের দু'-চারজন যুবক এখনই এ

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চায়।

সরলা ঘোষালের মনোভাব নিবেদিতা এখনও বুঝতে পারছেন না। সরলার দল যে উৎসব অনুষ্ঠানেই বেশি আগ্রহী, লাঠি খেলা, ছোরা খেলার চর্চা যে চলছে, তা যেন অনেকটা শখের। প্রদর্শনীর জন্য! সরলা এক সময় রুডিয়ার্ড কিপলিঙ-কে ডুয়েল লড়ার জন্য আহ্বান জানাতে চেয়েছিল। একটি গল্পে কিপলিং বাঙালিদের ভীরু, কাপুরুষ, গিদ্দর বলে গালি দিয়েছিল, এক বাঙালি আই সি এস অফিসার পাঠান বিদ্রোহের সময় ভয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারপর তার মুণ্ডু কেটে বর্শা ফলকে গেঁথে ঘোরানো হয়েছিল এক শহরের পথে পথে। সেই গল্প পাঠ করে সরলার রক্ত টগবগ করে ফুটেছিল, কিপলিংকে সে চিঠি লিখেছিল, পাঁচ বছর বাদে একজন বাঙালি যুবকের সঙ্গে কিপলিং এসে বন্দুক, তলোয়ার অথবা যে-কোনও অস্ত্রে লড়ে যাক। সে চিঠি অবশ্য পাঠানো হয়নি, তারপর পাঁচ বছর কেটেও গেছে, কিন্তু সরলা এখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা উঠলেই ইতস্তত করে।

বরোদার অরবিন্দ ঘোষ যতীন ব্যানার্জির দলটির মন্ত্রগুরু। সেই দলের বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, ভরত নামে যুবকদের সঙ্গে নিবেদিতা ও ওকাকুরার প্রায়ই আলোচনা হয়। এরা প্রায়ই প্রশ্ন করে, কবে শুরু হবে সংগ্রাম? কোনও ইংরেজের ওপর আঘাত হানার জন্য এরা অস্থির। শুধু হেমচন্দ্র একদিন সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, আমরা যে শুনেছিলাম, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গুপ্ত সমিতিগুলি এমন কি পাহাড়ের আদিবাসীরাও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, বাংলাতেই তেমন কিছু সংগঠন এখনও নেই, কিন্তু মিস নোবল, তার প্রমাণ কোথায়? অন্য কোনও অঞ্চলের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তো আমাদের যোগাযোগ হল না এখনও!

ওকাকুরা তাদের আশ্বাস দিলেন। অন্য প্রদেশের দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তিনি এক মাসের সফরে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন সুরেন ঠাকুরকে। যাত্রার সময় তিনি সহাস্যে নিবেদিতাকে বললেন, যদি আমি পথে খুন হয়ে না যাই, তা হলে অবশ্যই সফল হয়ে ফিরে আসব। যদি ফিরে না আসি, আমার কার্যের সব ভার তুমি নেবে।

এ কথা শুনে নিবেদিতার বক্ষ কেঁপে উঠল। না, না, চরম প্রস্তুতি পর্বে এই বীর নায়কের খুন হওয়া কিছুতেই চলবে না। ওকাকুরা যাতে সাবধানে থাকেন, ভাল হোটেলে অবস্থান করতে পারেন, এ জন্য নিবেদিতা তাঁর হাতে তুলে দিলেন এক হাজার টাকা।

এই টাকা মঠের নয়, নিবেদিতার নিজস্বও নয়। জো ম্যাকলাউড তাঁকে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন। একমাত্র জো-কেই নিবেদিতা অকপটে নিজের সব কথা জানাতে পারেন চিঠিতে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামীজির মৃত্যুর পর এখনও কান্নাকাটি ও পূজা-প্রার্থনায় ডুবে আছে। স্বামীজি অসুস্থ অবস্থায় ও ঝোঁকের মাথায় রাজনীতির বিরুদ্ধে যা বলেছিলেন, সেটাকেই ওরা ধরে বসে আছে, এ দেশের জন্য স্বামীজির সামগ্রিক চিন্তা ওদের মাথায় নেই। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা এখন কোন ব্যাপারে জড়িত তা জো ম্যাকলাউড জানেন। ওকাকুরার জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল, সে খরচ জোগাতে জো-র আপত্তি নেই।

ওকাকুরা 'আইডিয়ালস অফ দা ইস্ট' নামে আর একটি বই লিখছেন, সে কাজেও সাহায্য করছেন নিবেদিতা। বাইরে যাবার আগে ওকাকুরা পাণ্ডুলিপি রেখে গেলেন নিবেদিতার কাছে, তিনি তার ভাষা আদ্যোপান্ত সংশোধন করতে লাগলেন। এই বইতেও আছে এশিয়ার একাত্মতার আদর্শের কথা, এরকম বইয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বিপ্লবীদের কাছে।

লেখাপড়া ও বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের কাজ করে যাচ্ছেন নিবেদিতা, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁর অতি প্রিয় গুরুর কথা ভোলেননি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনসর্বস্ব। নিবেদিতার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এখনও যা কিছু করছেন, সবই তাঁর গুরুর কাজ। এ দেশের মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন, এ দেশের মানুষের পরাধীনতার মোচন কি তিনি চাইতেন না?

ওকাকুরা ফিরে এলেন নির্বিঘ্নেই। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের বিপ্লব প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চান না। সব কিছুই রহস্যময় করে রাখার দিকে তাঁর ঝোঁক। জিজ্ঞেস করলেই বলেন, সব

ঠিক আছে, বারুদের আগুনের মতন এখানে একবার আগুন লাগলেই সারা ভারতে দপ করে আগুন জ্বলে উঠবে একসঙ্গে। কিন্তু এখানে শুরু হবে কবে?

ওকাকুরার চরিত্রের আর একটা দিকও নিবেদিতার নজরে পড়ল। নিবেদিতার মন একমুখী, এখন বিপ্লব চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু তাঁর মাথায় নেই। কিন্তু ওকাকুরা শিল্পরসিক, বিপ্লবের কথা বলতে বলতে এক-এক সময় তিনি আবার শিল্প বিষয়ক আলোচনায় মগ্ন হয়ে যান। ঠাকুরবাড়ির গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্রের সঙ্গে অনেক সময় কাটান। বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হলে যে জীবনের অন্য উপভোগ বাদ দিতে হবে, এমন তিনি মনে করেন না। ব্র্যান্ডি ও সিগারেটের জন্য তাঁর অনেক টাকা খরচ হয়। নারীদের সঙ্গ তিনি বিশেষ পছন্দ করেন।

বালিগঞ্জে সরলাদের বাড়িতে গেলে ওকাকুরা আর উঠতেই চান না। ওখানকার ছেলেরা ওকাকুরাকে যেন মাথায় করে নাচে। কী করে যেন রটে গেছে, ওকাকুরাই এ যুগের কল্কি অবতার। পীত দেশ থেকেই তো কল্কির আসার কথা। কেউ কেউ তাঁকে কৃষ্ণ বলতেও শুরু করেছে।

এ সব নিবেদিতার আগে ভালই লাগত। কিন্তু এখন সরলা ঘোষালের সাহচর্য আর তাঁর পছন্দ হয় না। ও বাড়িতে বসে শুধু কথার ফুলকি ছড়ানো যেন সময়ের অপব্যয়।

ওকাকুরা চৌরঙ্গিতে এক বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন। সুন্দর সাজানো গোছানো প্রকোষ্ঠ, সেখানে বিলাসিতার কোনও দ্রব্যেরই অভাব নেই। একদিন সেখানে নিবেদিতা এসেছেন 'আইডিয়ালস অফ দা ইস্ট' গ্রন্থটির পরিমার্জনা বিষয়ে আলোচনা করতে। ওকাকুরা ব্র্যান্ডি পান করতে করতে শুনছেন, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। নিবেদিতার সাহায্যের জন্য তিনি উচ্ছ্বসিত। নিবেদিতার ইংরেজি ভাষায় বক্তব্যগুলি অনেক সুবোধ্য ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ এক সময় হাতের সিগারেট নিবিয়ে ওকাকুরা উঠে গিয়ে নিবেদিতার দু' কাঁধে হাত রাখলেন। মৃদু টান দিলেন নিজের বুকের দিকে।

পাংশু হয়ে গেল নিবেদিতার মুখ। ছিটকে সরে গিয়ে বললেন, এ কী!

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ওকাকুরা বললেন, না, না, আমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই!

নিবেদিতা আরও সরে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বললেন, আপনি, আপনি আমাকে স্পর্শ করলেন?

ওকাকুরা বললেন, তোমার এই অপূর্ব রূপ দেখে, তোমার মুখে বিকেলের রোদ পড়েছে, দেবী প্রতিমার মতন তুমি সুন্দর...মিস নোবল, আমার কোনও কুমতলব নেই, তুমি, তুমি আমাকে বিবাহ করবে? আমি নতজানু হয়ে তোমার পাণিপ্রার্থী।

নিবেদিতার দুই চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। বলে কী লোকটা! তিনি কে, তা কি এই জাপানি ভদ্রলোকটি জানে না? তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর নিবেদিতা। বিবেকানন্দর মতন মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যে এসেছে, সে কখনও অন্য পুরুষকে কামনা করতে পারে! প্রথম প্রথম স্বামীজিকে অতি আপন করে পেতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তখনও সন্ন্যাসীর জীবন সম্পর্কে তাঁর সঠিক জ্ঞান ছিল না। স্বামীজির সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধুই গুরু শিষ্যের, এমনি নারী-পুরুষের মতন হতে পারে না? একদিন সোজাসুজি প্রায় কেঁদে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজিকে, আমরা সাধারণ নারী পুরুষের মতন হতে পারি না?

সে প্রশ্নের গূঢ়ার্থ বুঝেছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতা যেন বলতে চেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তো বিবাহিত ছিলেন, তাতে তাঁর সাধনায় তো কোনও বাধা হয়নি।

স্বামীজি গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, আমি তা পারি না মার্গট, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই!

আরও কিছু কথা হয়েছিল। স্বামীজি বারবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন নিবেদিতার মুখ থেকে। তাঁর মনের মধ্যে যে ঝড় বইছে, তা বোঝা যায়, বারবার মাথা নেড়ে বলছিলেন, না, না না। তা হয় না মার্গট। এদেশের মানষু বুঝবে না।

এর পর স্বামীজি তাঁকে আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকার দীক্ষা দিয়েছিলেন। তার থেকে বিচ্যুত হবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

নিবেদিতা একটুক্ষণ ওকাকুরার দিকে চেয়ে রইলেন। নিশ্বাস অতি উষ্ণ। তীব্রভাবে বললেন, আপনি বিবাহ করতে চান ? এর আগে আর কতজনের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন ? সরলাদের বাড়িতে প্রিয়ংবদার সঙ্গে আপনার প্রেম প্রেম ভাব কি আমার নজরে পড়েনি ? ও বাড়িতে নয়নমণি নামে একটি অভিনেত্রীকে দেখেও আপনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাকে বারবার দেখার জন্যই ওখানে যান। এমনকী সরলার কাছেও আপনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে রাজি হয়নি শুনেছি। আপনি কি এ দেশে বিপ্লব করতে এসেছেন, না প্রেম করতে এসেছেন !

ওকাকুরা কিছু বলতে যেতেই নিবেদিতা তাঁকে বাধা দিয়ে আবার বললেন, বিপ্লবের এত উদ্যোগ আয়োজন, সবই আপনার কথার কথা ? এত দিনে কতটুকু এগিয়েছি আমরা ? কোন কোন দেশ আমাদের অস্ত্র সাহায্য করবে ? কোনও চিহ্নই নেই, সবই আপনার গল্প। এশিয়ার একাত্মতার যে তত্ত্ব, তাও আসলে ইউরোপিয়ানদের তাড়িয়ে দিয়ে জাপানের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, তাই না ? জাপান সব চেয়ে বড় হবে, জাপান হবে এশিয়ার প্রভু !

নিবেদিতার ক্রুদ্ধ বাক্যাবলির তোড়ে ওকাকুরার সব যুক্তিই দুর্বল হয়ে গেল। তিনি বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না।

এক সময় থেমে গিয়ে নিবেদিতা বললেন, আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

সত্যিই আর দেখা হল না। সমস্ত বিপ্লব উদ্যোগে জলাঞ্জলি দিয়ে ওকাকুরাও কয়েকদিন পরই ফিরে গেলেন জাপানে।

৬৮

সার্কুলার রোডের বাড়িটির একতলায় দুটি দোকানঘর। একটি দশকর্ম ভাণ্ডার, অন্যটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের, সারাদিন খরিদ্দারদের ভিড় লেগে থাকে। দুটি দোকানের মাঝখান দিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, অন্ধকার মতন, রেলিং ভাঙা। বেশ পুরাতন আমলের বাড়ি, গৃহস্বামী এক সময় দোতলায় থাকতেন, এখন আর একটি গৃহ নির্মাণ করে বউবাজারের সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে উঠে গেছেন, আপাতত কয়েক মাস যাবৎ সমগ্র দোতলাটি তালাবন্ধ অবস্থাতেই রয়েছে। তিনতলায়, আপাতদৃষ্টিতে একটি সাধারণ, নিরীহ ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। স্বামী, স্ত্রী ও ভগিনীকে নিয়ে ছোট সংসার, আর রয়েছে সর্বক্ষণের ফরমাশ-খাটা এক বালক ভৃত্য। ঘর রয়েছে চারখানা, সামনে ও পেছনে দুটি বারান্দা, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, স্নানের ঘর, ভাড়া বারো টাকা। কেউ জানে না, এটাই গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র। সমিতির সদস্যরা নিজেরা নাম দিয়েছে, আখড়া।

দিনের বেলা পারতপক্ষে কেউ আসে না। আনাগোনা শুরু হয় সন্ধ্যার কিছুটা পরে। যখন দোকান-ঘরগুলি বন্ধ হয়ে যায়। দিনের বেলা যদি কারুকে আসতে হয়, তবে আসে ফুলবাবুটি সেজে, গিলে করা পাতলা কামিজ পরে ও ধুতির কোঁচাটি হাতে ধরে, যেন তিনতলার যতীনবাবুর আত্মীয়।

যতীনবাবুর লম্বা-চওড়া বলশালী দেহ হলেও গলায় পৈতে ও রুদ্রাক্ষের মালা ঝোলে, কপালে চন্দনের তিলক, মাঝে মাঝে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান, এই পল্লীর মানুষ তাকে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বলেই জানে। ভরত প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিন যতীন একটা ফাঁকা ঘরে, মালকোচা মেরে ধুতি পরে, খালি গায়ে একটা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন রামায়ণ-মহাভারতের কোনও চরিত্র।

ভরত এখানে হেমচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ই আসে। অন্যদের মধ্যে আসে বারীন্দ্র, তার মামা সত্যেন্দ্র, দেবব্রত বসু নামে একজন বেশ শিক্ষিত যুবক, ভূপেন্দ্র দত্ত, রাখহরি সরকার, অমিতবিক্রম গোস্বামী ও আরও কয়েকজন। এই আখড়ায় অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আছে দু'খানি তলোয়ার, গোটা দশেক লাঠি ও একটি পিস্তল। এই সব অস্ত্র চালনায় প্রাক্তন সৈনিক যতীনই সবচেয়ে দক্ষ। মাঝে মাঝে সে একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে অন্য সদস্যদের বলে, কে কতখানি শিখলে, তার পরীক্ষা দাও। আমার সঙ্গে লড়ো। ভরতকেও লড়তে হয়েছে কয়েকবার, বলাই বাহুল্য, একটু পরেই সে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। অন্য কেউ যতীনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। জয়ী হয়ে যতীন সগর্বে উরু চাপড়ায়। ভরতের মনে হয়, অন্যদের অস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষা দেবার বদলে যতীন যেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যই বেশি ব্যস্ত।

আজ সারাদিন বৃষ্টি, সন্ধ্যার পর পথ একেবারে জনমানব শূন্য। বাতাসে বেশ শীত শীত ভাব। হেম উঠেছে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এক আত্মীয়ের বাড়িতে, কাছাকাছি একটি মেস বাড়িতে জায়গা করে নিয়েছে ভরত। এই মেসের লোকেরা অফিস-কাছারি থেকে ফিরে আসার পর কেউ লুঙ্গি, কেউ ঠেঙো-ধুতি পরে নেয়, তারপর সময় কাটাবার জন্য বদ রসিকতায় মেতে ওঠে। কেউ কেউ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নাচে। মেসবাসীদের নারীবর্জিত জীবন, তাই তাদের অধিকাংশ কথাবার্তাই নারীঘটিত, আদিরসাত্মক। ভরতের এসব খুবই অরুচিকর লাগে, বিকেলের পর তার আর এখানে মন টেঁকে না। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এল হেমচন্দ্রের বাড়িতে, সেখানে কোনও বসার জায়গা নেই, তাই দু'জনে আবার বেরিয়ে পড়ল আখড়ার উদ্দেশে।

এমন দুর্যোগের দিনেও সেখানে কয়েকজন উপস্থিত হয়েছে আগেই। অমিতবিক্রম প্রায় রোজই আসে। এই ছেলেটির বাড়ি শ্রীরামপুর, বিত্তশালী পরিবারের সন্তান, মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জীবিকার সন্ধানেও মন নেই। দেশোদ্ধার ব্রত যেন তার কাছে কোনও রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, প্রায়ই অস্থির হয়ে বলে, কই কিছু শুরু হচ্ছে না কেন, চলো একবার বেরিয়ে পড়ি, অন্তত একটা সাহেব মেরে আসি। হাসিখুশি স্বভাবের যুবাটিকে সকলেরই ভাল লাগে।

দেবব্রত একখানি বই এনেছে, তার থেকে অংশবিশেষ পড়ে শোনাচ্ছে। রমেশ দত্তের লেখা 'ইকনমিক হিস্টি অফ ইন্ডিয়া'। শাসনের নামে ইংরেজরা এ দেশকে কত রকমভাবে শোষণ করেছে, তার মর্মন্তুদ বিবরণ। বঙ্কিমবাবুর গানে যে দেশকে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বলা হয়েছে, সে দেশ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে এখন মলিন, নিষ্প্রাণ। ইংরেজ রাজপুরুষরা গর্ব করে বলে, মুঘল আমলের তুলনায় বর্তমান সুশাসনে ভারতে চুরি-ডাকাতি, খুন সন্ত্রাস কত কমে গেছে। রমেশ দত্ত দেখিয়েছেন, তার বদলে মানুষের দারিদ্র্য কত বেড়েছে, অর্ধাহারে মানুষগুলো দুর্বল হয়ে গেছে। এই শান্তি যেন শ্মশানের শান্তি!

পড়তে পড়তে দেবব্রত বলল, ভাই, একজন সমালোচক বলেছেন, কংগ্রেসের এক গরুর গাড়ি ভর্তি বক্তৃতার চেয়ে রমেশ দত্তর অর্থনৈতিক লেখা অনেক বেশি মূল্যবান।

হেমচন্দ্র বলল, এই বক্তব্যের অনেক কিছুই আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও জানি, গ্রামেগঞ্জে ঘুরে দেখেছি। কিন্তু এর প্রতিকারের উপায় কী ? রমেশবাবুও তো ইংরেজদের তাড়াবার কথা বলেন না।

বারীন বলল, বিপিন পালও কী গরম গরম লিখছেন দেখেছ ? ওঁকে বোধ হয় আমাদের দলে পাওয়া যাবে।

অমিতবিক্রম একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিল, তড়াক করে উঠে পড়ে বলল, এসব বিষয়ে আমারও অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু তার আগে এমন বর্বরি দিনে এক পাত্তর চা হলে হয় না ?

যতীন মুখ গোঁজ করে বলল, একবার তো চা খেয়েছ।

অমিতবিক্রম বলল, ভরতদা, হেমদারা পরে এল, ওদের জন্য বলছি। সেই সঙ্গে যদি আমারও এক ভাঁড় জুটে যায়।

বারীন বলল, লোহাকলের পাশের দোকানটায় খুব ভাল তেলেভাজা পাওয়া যায়। যতীনদা, তুমি

ভেতরে চায়ের কথা বলে দাও, কিছু মুড়ি-তেলেভাজা আনানো যাক। সবাই দু' পয়সা করে চাঁদা দাও।

যতীন বলল, আর চায়ের খরচটা কে দেবে?

সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। কোনও গৃহস্থ বাড়িতে এসে পয়সা দিয়ে চা খাওয়া সম্ভব নাকি? কাছাকাছি কোনও চায়ের দোকানও নেই।

বারীন বলল, চায়ের জন্য আর কতটুকু খরচ, ওটা তুমিই দাও যতীনদা। ঠিক আছে, তোমাকে মুড়ির জন্য চাঁদা দিতে হবে না।

বালক ভৃত্যটির নাম খেলারাম। সে দৌড়ে চলে গেল মুড়ি-টুড়ি আনতে। একটু পরেই ভেতর থেকে একটা বড় থালায় কাপ সাজিয়ে চা নিয়ে এল কুহেলিকা। যতীনের স্ত্রী একেবারে পর্দানশীনা, ভেতরের কোন ঘরে বসে থাকে কে জানে, এখানকার আড্ডাধারীরা তাকে একবারও চক্ষে দেখেনি। কুহেলিকা সবার সামনে আসে, সে যতীনের বোন। আপন বোন, না দূর সম্পর্কের তা অবশ্য জানা যায় না। বয়েস কুড়ি-বাইশের বেশি হবে না, শরীরটি গড়াপেটা, মুখে জলুস আছে, ঠোঁটের কোণে লেগে থাকে মিটিমিটি হাসি। আগে ধারণা হয়েছিল সে বয়স্থা কুমারী, এখন শোনা গেছে যে, সে বালবিধবা।

কুহেলিকা সকলকে চা দেবার পর দাঁড়িয়ে রইল। অমিতবিক্রম বলল, আপনিও আমাদের সঙ্গে বসুন না।

যতীন কঠোরভাবে বলল, না, ও এখানে বসবে না। তুই ভেতরে যা।

অমিতবিক্রম বলল, অন্তত দু' গাল মুড়ি খেয়ে যাক।

যতীন বলল, মুড়ি ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আবার আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ভরত নিজের চায়ের কাপটি নিয়ে উঠে গেল জানলার ধারে।

এ বাড়ির পাশেই একটা বস্তি। জানলা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। একটি বড় বাড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভরত। আগে ওই অঞ্চলে ওরকম বাড়ি একটিই ছিল, এখন কাছাকাছি আরও দুটি বাড়ি উঠেছে, তবু এ বিশেষ বাড়িটি চিনতে ভরতের ভুল হয় না। ওই প্রাসাদে এক সময় থাকতেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। যদিও পরিচয় দিতে পারে না, তবু তিনিই তো ভরতের পিতা। এখনও ওই বাড়ি ত্রিপুরার রাজ সরকারেরই ভাড়া নেওয়া আছে, ভরত একদিন কাছাকাছি ঘুরে দেখে এসেছে, ওখানে বর্তমানে বিশেষ কেউ নেই।

ভরতকে ওই বাড়ি এখনও টানে, বাবার জন্য নয়, ওখানে এক সময় থাকত ভূমিসুতা। ভেতরে ভরতের প্রবেশ অধিকার ছিল না, তবু এক এক রাত্তিরে চোরের মতন সে এসে পাঁচিলের চার পাশে ঘুরেছে। এতদিন পর আবার কেন দেখা হল ভূমিসুতার সঙ্গে? এই রমণীর সঙ্গে সারাটা জীবন তার শুধু দুঃখের সম্পর্কই থেকে যাবে? কটকে থাকার সময় সে যখন মহিলামণিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিল, তখনই ভরত ঠিক করেছিল, ভূমিসুতা তার জীবন থেকে নিঃসৃত হয়ে যাবে। সে চিরতরে হারিয়েই গেছে। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে যখন যাযাবরের মতন ভ্রাম্যমাণ ছিল, তখনও ভূমিসুতাকে ফিরে পাওয়ার আশা করেনি। তার সারা জীবনটাই উদ্দেশ্যহীন, তবু অরবিন্দ ঘোষ, বারীন, হেমচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে সে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ। এর মধ্যে ভরত বিভিন্ন দেশের বিপ্লব ও স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বই পড়ে ফেলেছে। ভগিনী নিবেদিতা সংগ্রহ করে দিয়েছেন এরকম অনেক গ্রন্থ। সে সব পড়ে ভরত বুঝতে পেরেছে, বিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীদের প্রাণ দিতেই হয়। ফরাসি বিপ্লবেই তার উদাহরণ প্রকট। রেভেলিউশান ডিভাউরস ইট্স ওউন চিলড্রেন। ভরতও প্রাণ দেবার জন্য তৈরি হয়ে অনেকটা স্বস্তি বোধ করেছিল। আর তাকে অন্য কোনও পথ খুঁজে বিড়ম্বিত হতে হবে না।

তবু কেন এর মধ্যে কেন এসে পড়ল ভূমিসুতা? ভরত কি ভূমিসুতাকে ভালবাসে? সে নিজেই

বুঝতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত একটা অপরাধবোধই তাকে পীড়া দিয়েছে, সে এক সংকটের মুহূর্তে ভূমিসুতার সঙ্গে পুরুষোচিত ব্যবহার করেনি, বরং ভূমিসুতার আত্মনিবেদনকে সে অপমান করেছে। সে সব তো কতকাল আগেকার কথা। জীবনের নানান সংঘাতে ওসব তুচ্ছ হয়ে যায়। ভূমিসুতা এখন কত উচ্চে উঠে গেছে, সে শুধু খ্যাতনামী নটী নয়, ঠাকুর পরিবারের পুরুষেরা তার প্রণয়প্রার্থী, ভরতকে সে মনে রাখবে কেন? মনে যে রাখেনি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে, একবারও ভরতের দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত করেনি।

যাকে পাওয়া যাবে না, তার জন্যও বুকের মধ্যে মৃদু ব্যথা সব সময় ছড়িয়ে থাকে কেন? এ যেন এক রহস্য। ভরত কি ইচ্ছে করলে আবার বিবাহ করতে পারত না। এখনও পারে। এ দেশে কোনও পুরুষের জন্যই কখনও পাত্রীর অভাব হয় না। কিন্তু অপর কোনও নারীর জন্য সামান্য টানও অনুভব করে না ভরত। ভূমিসুতার সঙ্গে আর কখনও দেখা করবে না, থিয়েটার দেখতে যাবে না, সরলা ঘোষালের বাড়িতে যাবে না, এমন একটা শপথ সে নিয়েছে মনে মনে। তবু কেন মন থেকে মুছে দিতে পারছে না ওই মুখ? ছাত্র বয়েসে ভরত যে ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা পড়েছিল, এখনও কি রয়ে গেছে সেই প্রভাব? সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম মানে শারীরিক সান্নিধ্য উপভোগ, আর ইউরোপীয় রোমান্টিক কাব্যে দূরত্বের হা-হুতাশ।

ভরতের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, মন, আমাকে ভূমিসুতার চিন্তা থেকে মুক্তি দাও। আমি দেশমাতৃকাকেই ধ্যানজ্ঞান করতে চাই।

দূরের ওই বাড়িটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভরতের আর একটা কথাও মনে আসে। সে কি আর কখনও ত্রিপুরায় ফিরতে পারবে না? ভূমিসুতার মতন তার জন্মভূমিও তার কাছে চিরকাল অলভ্য থেকে যাবে? এত দিন হয়ে গেল, তবু সে ভুলতে পারে না, তার শরীরে আছে ত্রিপুরার রাজরক্ত, সেই রাজ্যটির প্রতি টান এখনও রয়ে গেছে। এখনকার রাজা রাধাকিশোরকে সে অল্পই দেখেছে, তখন সে নরম প্রকৃতির ছিল, এখন সিংহাসনে বসার পর সে কেমন মানুষ হয়েছে কে জানে! অমৃতবাজার পত্রিকায় পড়েছে, আগরতলায় নির্মিত হয়েছে নতুন রাজধানী। গড়া হয়েছে নতুন রাজপ্রাসাদ। ভরতের একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করে। সে ত্রিপুরায় গেলে কেউ কি তাকে চিনতে পারবে?

এ দিকে তর্ক জমে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে তিলক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব বাংলাতেও অনুষ্ঠিত হবে ধুমধামের সঙ্গে। সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে এক বাংলা জানা মারাঠি এর প্রধান উদ্যোক্তা, অনেক গণ্যমান্য লোক তাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছেন। আবার সরলা ঘোষাল প্রতাপাদিত্য-উদয়াদিত্য উৎসবও পালন করতে চান। এই দলের মধ্যে কেউ কেউ শিবাজীর বদলে প্রতাপাদিত্য উৎসবেরই বেশি সমর্থক। বাঙালিরা কি মারাঠা শিবাজীকে আদর্শ বীর বলে মেনে নেবে? বর্গির আক্রমণ ও লুঠতরাজের স্মৃতি এখনও বাঙালিদের মধ্যে রয়ে গেছে। কেন, বাংলায় কি বীর নেই? প্রতাপাদিত্য যখন মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করার সাহস দেখিয়েছিলেন, তখন মুঘল সাম্রাজ্য প্রবল শক্তিমান। আর শিবাজী যখন যুদ্ধ করেছিলেন, তখন মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশ হীনবল হয়ে যাবার মুখে। প্রতাপাদিত্যকে যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুনি বলে থাকেন, তা হলে শিবাজীর ছুরিতে আফজল খান হত্যাও কম কলঙ্কজনক নয়। বাংলা মঞ্চে এখন প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে নাটক চলছে, দর্শকরা মুহুর্মুহু করতালিতে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

জানলা থেকে ফিরে এসে ভরত জোর দিয়ে বলে উঠল, না, সরলা ঘোষালের উৎসবে আমাদের যোগ দেওয়া উচিত নয়।

সত্যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

ভরত ঠিক যুক্তি দিতে পারল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। সেদিন ভূমিসুতাকে ও বাড়িতে দেখার পর থেকেই সে ঠিক করেছে, সরলা ঘোষালের দলের সঙ্গেই সে আর কোনও সংস্পর্শ রাখবে না। কিন্তু সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

সে আবার বলল, শিবাজী উৎসবে যোগ দেওয়াও আমাদের পক্ষে অর্থহীন।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করল, আমরা এই সব উৎসব থেকে দূরে সরে থাকব ?

ভরত বলল, অবশ্যই। উৎসব মানে তো লাঠি নিয়ে ধেই ধেই নাচ আর মরচে পড়া তলোয়ার ঘোরানো। আর গানের পর গান। এই নিয়ে আমরা কতকাল কাটাব ? কাজের কাজ কিছুই শুরু করছি না।

দেবব্রত বলল, জনগণকে সচেতন করার জন্য এই ধরনের উৎসবের সার্থকতা অবশ্যই আছে। অধিকাংশ মানুষই তো এখনও জানে না, কাকে বলে দেশ।

হেমচন্দ্র বলল, ভরত ঠিকই বলেছে। নিজেদের জীবনযাত্রার সব দিক ঠিকঠাক রেখে যাঁরা ওইভাবে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তারা তাই নিয়ে থাকুন। কিন্তু আমরা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি, ঘর ছেড়ে চলে এসেছি, আমরাও নাচ-গান করে দিন কাটাব ? এই করতে করতে যে বুড়ো হয়ে যাব।

অমিতবিক্রম বলল, একখানা পিস্তল আর দু'খানা ভোঁতা তলোয়ার আমাদের সম্বল। এই নিয়ে বিপ্লব হবে ? জাপানি সাহেবটি যে বলে গেলেন বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আসবে, সে সব কোথায় বাবা ?

সবাই মিলে একসঙ্গে কথা বলা শুরু করলে যতীন হাত তুলে বলল, চুপ, চুপ। আমার কথা শোনো। টাকা পেলে অনেক অস্ত্র জোগাড় করা যাবে। পগেয়াপট্টির একটা চিনেম্যানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, টাকা দিলে সে হংকং থেকে অনেক পিস্তল আর টোটা এনে দিতে পারে। কিন্তু টাকা কোথায় ? বারীন, তোমাকে যে আমি মল্লিক বাড়িতে যেতে বলেছিলাম কিছু চাঁদা আদায়ের জন্য, তুমি গিয়েছিলে ?

বারীন বলল, আমি যাব কেন ? আমার ওপর দায়িত্ব দলের জন্য বিশ্বস্ত সদস্য জোগাড় করা। টাকার ব্যবস্থা করবে তুমি।

যতীন বলল, আমি আর কত করব ? কোনওরকমে তো চালাচ্ছি। বড়লোকেরা আমাদের কিছু কাজ না দেখলে আর সাহায্য করতে চাইছে না।

হেমচন্দ্র বলল, আমরা কীভাবে কাজে নামব আগে সেই পরিকল্পনা করো। টাকার চিন্তা পরে হবে।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে এলোমেলো বাতাস। নতুন করে আবার বজ্রগর্জন শুরু হল।

অমিতবিক্রম অনেকটা আপন মনে বলল, আজ বাড়ি ফিরব কী করে কে জানে। আহা এমন রাতে যদি খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খাওয়া যেত !

সত্যেন বলল, যতীন, আজ তোমার বাড়িতেই খিচুড়ি লাগাও না, সবাই মিলে আনন্দ করে খাই। তোমার বোন বুঝি রান্না করে, একদিন খেয়েছিলাম, ওর রান্নার হাতটি বড় সরেস।

সবাই মিলে একসঙ্গে খিচুড়ি খিচুড়ি বলে চেঁচিয়ে উঠল।

যতীন আবার হাত তুলে সকলকে থামিয়ে বলল, বেশ, খিচুড়ি হতে পারে। প্রত্যেকে একটা করে টাকা দাও।

অমিতবিক্রম বলল, সে কী যতীনদা, একদিন তোমার বাড়িতে খিচুড়ি খাব, তাও কিনে খেতে হবে ? তা হলে সে খিচুড়ির স্বাদ থাকবে না।

যতীন রেগে উঠে বলল, আমি কি দানছত্তর খুলেছি নাকি ! আমি পাব কোথায় ? বরোদা থেকে অরবিন্দবাবু মাসে তিরিশটি টাকা পাঠান, তাও গত মাসে আসেনি। এই টাকায় বাড়ি ভাড়া, সংসার খরচ, সমিতির খরচ—এত কিছু চলে ?

হেমচন্দ্র বলল, যতীনদা, একজন মানুষ তার মাইনের টাকা থেকে কিছু সাহায্য পাঠাবে, তাতে বিপ্লব হয় না ! অনেক টাকা সংগ্রহ করে একটা ফান্ড করা দরকার। সেই টাকা সংগ্রহের একটা উপায় তো আমি বলেছিলাম।

যতীন বলল, তাতে তো আমি রাজি আছিই। তুমি অন্যদের মত নাও। আমি অরবিন্দবাবুকেও

চিঠি লিখেছি।

দরজার বাইরে অলঙ্কারের রিনিঝিনি শব্দ শোনা গেল।

অমিতবিক্রম উৎসুকভাবে সেদিকে তাকিয়ে বলল, খিচুড়ি খাওয়ার জন্য চাঁদা তোলার দরকার নেই। আমি দশটা টাকা দিচ্ছি, ব্যবস্থা করে ফেল।

সত্যেন বলল, দশ টাকা। তা হলে শুধু ডিম ভাজা কেন, তপসে মাছও হয়ে যাক।

যতীন বলল, এত রাতে তোমার জন্য তপসে মাছ যেন কেউ সাজিয়ে বসে আছে। গ্রাম থেকে আজ পাঁচ গণ্ডা হাঁসের ডিম দিয়ে গেছে, সেই ডিমই খাও।

না ডাকতেই কুহেলিকা মুখ বাড়িয়ে বলল, আমাকে কিছু বলছ ?

অমিতবিক্রম বলল, যতীনদা, আজ শ্রীরামপুর ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব। রাত্তিরটা তোমার এখানেই থেকে যাব ?

যতীন কঠোরভাবে বলল, না, ওসব চলবে না। তোমরা এখানে রাত্রে থাকা শুরু করলে পাড়ার লোকে সন্দেহ করবে। শ্রীরামপুরে ফিরতে না পারো, ভরতের মেসে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

এরপর আরও দিন দশেক আলাপ-আলোচনার পর প্রথম কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হল।

চাঁদপাল ঘাট থেকে ভাড়া করা হল একটা নৌকো। চাঁদনি রাতে অনেকেই গঙ্গায় প্রমোদভ্রমণে যায়, এই দলটি ঠিক সেরকম নয়। নৌকোটি নেওয়া হয়েছে সাত দিনের কড়ারে এবং দাঁড়ি-মাঝিদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। যতীনের অনেক গুণ, সে নৌকো চালাতেও জানে। হেমচন্দ্রও পারে বৈঠা বাইতে। সাতজন যুবককে নিয়ে নৌকোটি ভেসে চলল গঙ্গার মোহনার দিকে।

আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছে যে কোনও বিশাল ধনীর বাড়িতে হানা দেওয়া হবে না। কারণ, সেসব বাড়িতে অনেক লোক-লস্কর-দ্বারবান থাকে। প্রথমেই কোনও সংঘর্ষের পথে যাওয়া ঠিক নয়। টাকাকড়ি কম পাওয়া গেলেও কোনও মধ্যবিত্ত, ছোট পরিবারকে লক্ষ করাই সুবিধাজনক। বারীন ও হেম এর আগেই ডায়মন্ড হারবার অঞ্চল ঘুরে দেখে এসেছে। একটি গ্রামের এক ব্যবসায়ীর বাড়ি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেই গ্রাম থেকে থানা অন্তত এগারো মাইল দূরে।

ট্রেনযোগে একসঙ্গে সাতজন যুবকের যাওয়া ও আসা সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। সেই জন্যই নৌকোর ব্যবস্থা। যতীন এর মধ্যেই মাঝি সেজে ফেলেছে, তার পরনে চেক লুঙ্গি। ভাটার টানে নৌকো এগিয়ে চলল বেশ তরতর গতিতে।

হীরক বন্দর ও কাক দ্বীপের মাঝামাঝি এক জায়গায় নোঙর করা হল নৌকো। দিনের বেলায় শুধু রান্না, খাওয়াদাওয়া ও ঘুম। পূর্ণিমা চলছে, বড় বেশি জ্যোৎস্না বলে প্রথম রাতটায় অভিযান বাতিল করা হল। পরদিন বিকেল থেকে মেঘলা। চাঁদের দেখা নেই, এই রাতটিই ঠিক উপযুক্ত। অমাবস্যার সময় এলেই ভাল হত। কিন্তু সে হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

প্রথম থেকেই যারা উৎসাহে টগবগ করছিল, সন্ধের পর দেখা গেল তারা যেন কেমন ম্লান হয়ে পড়েছে। নৌকোর ছইয়ের মধ্যে দেবব্রত পুজোয় বসে গেছে। যে-কোনও কাজ শুরু করার আগে সে তার আরাধ্য দেবতার নির্দেশ পেতে চায়। আরও দুজন ঈশ্বরের নাম জপ করছে। ভরত লক্ষ করল, একমাত্র হেমচন্দ্রই কোনওরকম প্রার্থনার ধার ধারে না।

বারীন এক সময় শরীর মুচড়ে বলল, আমি বলছিলাম কী উপেনদা, সবাই মিলে কি যাবার দরকার আছে ? দু'একজন কি নৌকোয় থাকলে হয় না ? ধরো যদি এদিক থেকে কোনও পুলিশের নৌকো আসে, আমি দৌড়ে গিয়ে তোমাদের সাবধান করে দিতে পারব।

হেমচন্দ্র বলল, ওসব চলবে না। আমরা সাতজন এসেছি, একসঙ্গে সব দায়িত্ব নিতে হবে। এতে যদি কোনও পাপ থাকে, তাও যেন সকলকেই অর্শায়।

বারীন বলল, আহা সে কথা বলছি না। দায়িত্বও তো ভাগ করে নিতে হয়। ধরো, আমি যদি নৌকোয় থেকে সব দিক সামলাই, সেনাপতি তো নিজে যুদ্ধের মধ্যে যায় না, দূরেই থাকে।

যতীন শ্লেষের সঙ্গে বলল, তোমাকে আবার সেনাপতি বানাল কে ? সব ব্যবস্থা তো আমিই করেছি।

হেমচন্দ্র বলল, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বৃষ্টি আসার আগে বেরিয়ে পড়াই ভাল।

অমিতবিক্রম নৌকোর গলুইতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি উদাস। সে অন্য কারুর কথাও শুনছে না।

যতীন তাকে তাড়া দিয়ে বলল, কী রে বিক্রম, তুই তৈরি হবি না?

আস্তে আস্তে উঠে বসল অমিতবিক্রম। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, যতীনদা, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষ পর্যন্ত চুরি-ডাকাতিতে নামতে হবে? বংশের নাম ডোবাব?

এটা অনেকেরই মনের কথা। অর্থ সংগ্রহের অন্য কোনও পথ দেখা যাচ্ছে না। বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনে হাতে রক্ত মাখতে হবে, এটাও ঠিক, তবু মন থেকে দ্বিধা যায় না। সবাই চুপ করে রইল।

অমিতবিক্রম আবার বলল, আমি নিজের জীবন নিয়ে যা খুশি করতে পারি, কিন্তু আমার বাপ-ঠাকুরদা তো কোনও দোষ করেনি, আমি যদি ধরা পড়ি, জানাজানি হবেই, আমার বাড়ির মানুষ লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। মানী বংশে কলঙ্ক লেপন হবে!

হেমচন্দ্র বলল, সাধারণ চোর ডাকাতদের মতন আমরা তো নিজেদের স্বার্থে কিছু করছি না। টাকা-পয়সা যা পাওয়া যাবে, তার থেকে এক কানাকড়িও নিজেদের জন্য ব্যয় করব না, সবই লাগবে দেশের মঙ্গলের জন্য। এতে তো কোনও কলঙ্ক নেই।

যতীন বলল, কাজে নামতে-যদি কেউ ভয় পায়, তা হলে এখনও ফিরে যেতে পারে।

হেমচন্দ্র বলল, উঁহুঃ, ফিরে যাবার আর প্রশ্ন নেই। দীক্ষা নেবার সময় আমরা প্রত্যেকেই শপথ করেছি, দলের নির্দেশ কেউ অমান্য করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

যতীন বলল, তবু, বিক্রম যখন ভয় পাচ্ছে, ওকে আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি।

অমিতবিক্রম এবার লাফিয়ে উঠে হুংকার দিয়ে বলল, ভয়? একটা ছুরি দাও, এক্ষুনি আমার বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটা তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি কি না দেখ।

এবার হেমচন্দ্র হেসে উঠল। অমিতবিক্রমের কাঁধে চাপড় মেরে বলল, তোমার হৃৎপিণ্ডটা আমাদের কোনও কাজে লাগবে না। বরং জামাটা খুলে ফেল, তোমাকে আমি এমনভাবে সাজিয়ে দেব, কেউ আর ভদ্দরলোক বলে চিনতে পারবে না। ছোটবেলায় একবার আমাদের পাড়ায় এক স্বর্ণকারের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, চেঁচামেচি শুনে আমরা ঘুম ভেঙে বাইরে এসেছিলাম। ডাকাতরা যখন ছুটে পালায়, তখন একজনকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। সেইজন্যই আমি জানি, ডাকাতদের কেমন দেখতে হয়।

হেমচন্দ্রের নির্দেশে সবাই জামা খুলে ফেলে ধুতিতে মালকোঁচা আঁটল। সর্বাঙ্গে ছপছপে করে মাখা হল সরষের তেল, কেউ জাপটে ধরতে গেলেও পিছলে যাবে। ভাত রান্নার মাটির হাঁড়ির গা থেকে ভুষো কালি নিয়ে মাখা হল মুখে। মাথায় বাঁধা হল গামছা। এরপর হাতে লাঠি নেবার পর শ্রীরামপুরের গোঁসাই বাড়ির অমিতবিক্রমের এ রূপ দেখে তার মা-বাবাও বোধ করি চিনতে পারবেন না।

যতীনের কাছে পিস্তল, দুটি তলোয়ারের একটি হেমচন্দ্রের হাতে, অন্যটি নিল ভরত। নৌকো থেকে নেমে কিছুটা অগ্রসর হবার পর যতীন বলল, একটা কথা শুনে রাখো, প্রথমেই বেগতিক দেখলে সরে পড়তে হবে, বেশি বেশি সাহস দেখাবার দরকার নেই। খুন জখমের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। দৈবাৎ কেউ ধরা পড়লেও কিছুতেই দলের অন্যদের নাম বলবে না।

হেমচন্দ্র বলল, প্রথমে বাড়ির মধ্যে ঢুকব আমি, তোমরা পেছনে থাকবে। অনেক বাড়িতে রামদা কিংবা বর্শা থাকে, যদি তা নিয়ে আক্রমণ করে, প্রথমটা আমার ওপর দিয়ে যাবে।

ভরত বলল, না হেম, ও দায়িত্বটা আমি নিতে চাই। আমার চালচুলো নেই, তুমি সংসারী মানুষ।

হেমচন্দ্র বলল, বিয়ে করলেও সব মানুষ সংসারী হয় না। সন্তানের জন্ম দিলেও সবাই পিতা হয় না। আমি যা বলছি, তাই শোনো।

বারীন বলল, হ্যাঁ, হেমই প্রথমে যাবে।

যতীন বলল, না, না, আমার কাছে আসল অস্তর, আগে যাব আমি! হেম আমার পাশে থাকবে।

সাধারণত ডাকাতরা আসে মশাল নিয়ে, হা-রে-রে-রে আওয়াজ তুলে! আগে থেকেই ভয় জাগিয়ে দেওয়াই থাকে উদ্দেশ্য। এরা এল অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে। বাড়িটাকে ঘিরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। খুব কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। এ বাড়ির অধিবাসীরাও ঘুমন্ত মনে হল। আগেই খবর নেওয়া হয়েছে, দুজন প্রৌঢ় ও একজন ভৃত্য ছাড়া এ বাড়িতে কোনও জোয়ান পুরুষ নেই। দুই ছেলে শহরে চাকরি করতে গেছে।

উঠোনটা দেওয়াল ঘেরা নয়, চ্যাঁচার বেড়া দেওয়া। সেই বেড়া টপকে প্রথমে ঢুকে পড়ল চার জন। অমনি একটা কুকুর তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কিন্তু দেশি সারমেয় দূর থেকেই চেঁচায়, কাছে আসে না। তার দিকে লাঠি বাগিয়ে রইল অমিতবিক্রম।

লম্বা একটা মাটির দাওয়ার ওপাশে পর পর কয়েকটা ঘর। সেই দাওয়াতে শুয়ে আছে এ বাড়ির ভৃত্য। যতীন বলল, ভরত, তুমি এর বুকে পা দিয়ে চেপে রাখো।

আচমকা জেগে উঠে ভৃত্যটি তলোয়ারধারী এক মূর্তি দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। যতীন আর হেমচন্দ্র দম দম করে লাথি মারল একটা বন্ধ দরজায়। যতীন কঠোর স্বরে বলল, কে আছ, দরজা খোলো শিগগির, নইলে আগুন লাগিয়ে দেব।

দরজা খুলে দিল এক বুড়ি। সম্ভবত বিধবা পিসিমা-টিসিমা হবে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে সে ধমকে উঠল, এত রাতে, হারামজাদা, মুখপোড়া, তোরা কারা?

অন্য একটি ঘরের দরজা খুলে গেল। ছোট একটি লাঠি নিয়ে এক খর্বকায় প্রৌঢ় বেরিয়ে আসতে চাইলেও পেছন থেকে তার স্ত্রী কাছা টেনে ধরে বলতে লাগল, ওগো, যেয়ো না, যেয়ো না, ডাকাত! মেরে ফেলবে! হে ভগবান, হে ভগবান...

যতীন পিস্তল তুলে বলল, চেঁচিয়ো না কেউ। প্রাণে মারব না। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি যা আছে বার করে দাও! দেরি করলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেব। ধনে প্রাণে পুড়ে মরবে।

বেশ সহজভাবেই, তৎপরতার সঙ্গে কাজ হয়ে গেল। প্রতিরোধের কোনও প্রশ্নই নেই। অন্যদের হাতে লুণ্ঠিত সামগ্রী দিয়ে চলে যেতে বলে অসমসাহসী যতীন একা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ। যাতে ওরা আর্তরব তুলে পাড়া-পড়শিদের জোটাতে না পারে। যতীনের হাতের পিস্তল দেখে বাড়ির সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। তারপর তাদের সারা রাত মুখ না খোলার নির্দেশ দিয়ে যতীন এক লাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে দৌড় লাগাল, বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল ভরত, দুজনেই নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল নৌকোয়। অবিলম্বে নৌকো ভেসে গেল মাঝ নদীতে।

বারীন, সত্যেন, দেবব্রতরা টাকা পয়সা গুনে দেখছে। মোট ছ'শো বাহাত্তর টাকা। আর চুড়ি দুল আংটি মিলিয়ে যা স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গেছে, তার দাম হবে বড় জোর হাজার খানেক টাকা। ও বাড়িতে আরও কিছু হয়তো ছিল, কিন্তু সে জন্য জোর করা হয়নি, যা পাওয়া গেছে, তাই যথেষ্ট।

ডাকাতি করা এত সোজা, একটা লাঠির বাড়িও মারতে হল না কারুকে।

অমিতবিক্রম আবার শুয়ে পড়েছে। একসময় সে আপন মনে হা হা করে হেসে উঠল। অন্যরা নিজেদের কথায় মত্ত, প্রথমে কেউ গ্রাহ্য করল না। কিন্তু অমিতবিক্রম হেসেই চলেছে দেখে যতীন জিজ্ঞেস করল, কী রে, তুই একা একা হাসছিস কেন? পাগল হয়ে গেলি নাকি!

অমিতবিক্রম বলল, আমি ... একটা কুকুর

যতীন বলল, আরে, এ ছেলেটা বলে কী?

অমিতবিক্রম হাসতে হাসতেই বলল, আমার কাজ হল শুধু একটা কুকুরকে ... ভবিষ্যতে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তুমি দেশের জন্য কী করেছ? আমাকে বলতেই হবে, আমি শুধু একটা খেঁকি কুকুর সামলেছি।

এবার সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন চুপচাপ রইল ওরা। এই ঘটনার কোনও প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না। সংবাদপত্রেও দূর মফস্বলের এত ছোটখাটো ডাকাতির খবর স্থান পায় না। দিন সাতেক পরে সমিতির সদস্যরা আবার জমায়েত হল আখড়ায়। প্রাথমিক দ্বিধা ও গ্লানি কেটে গেছে, আবার একটি এরকম কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সকলেই উৎসাহী।

শুরু হয়ে গেল পরবর্তী অভিযানের শলাপরামর্শ। কুহেলিকাকে ডেকে ঘন ঘন চায়ের জন্য অনুরোধ করে অমিতবিক্রম। দ্বিতীয় কাপ চায়ের কথা উঠতেই যতীন বলল, কে খরচ দেবে? সেদিন আমরা যা পেয়েছি, সব জমা থাকবে, তার থেকে এক কানাকড়িও নিজেদের জন্য খরচ হবে না, মনে নেই? আমি কি গাঁটের পয়সায় তোমাদের এতবার চা খাওয়াব?

অমিতবিক্রম বলল, না, না, ও পয়সায় খাব না। তোমাকেও দিতে হবে না। চাঁদার পয়সায় চা, তোমার বাড়ির চায়ের স্বাদই আলাদা।

বর্ষা শুরু হয়ে গেছে, একদিন অমিতবিক্রম বাগবাজার ঘাট থেকে টাটকা জোড়া ইলিশ নিয়ে এল হাতে ঝুলিয়ে। সকলে মিলে খাওয়া হবে। সেদিন কুহেলিকার রান্না খেয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগল সবাই।

কুহেলিকা চা এনে দেয়, খাদ্য পরিবেশন করে, অন্য সময়েও সে ঘোরাঘুরি করে এই কক্ষের আশেপাশে। সে এদের আলোচনায় যোগ দিতে চায়, কিন্তু তাতে যতীনের ঘোর আপত্তি। প্রায়ই কুহেলিকাকে ধমক দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ভেতরে। অমিতবিক্রম বা সত্যেন কুহেলিকার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করলেও সে চোখ গরম করে।

পরবর্তী অভিযান হল তারকেশ্বরে। এবারেও নৌকোয় যাওয়া হল, হানা দেওয়া হল সুদের কারবারি এক মহাজনের বাড়িতে। এবারে টাকা পয়সা পাওয়া গেল অনেক বেশি, বিঘ্নও হয়েছিল যথেষ্ট। ইংরেজ সরকারের আদেশে কোনও পরিবারই বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে না, এ ব্যাপারে ওরা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু মহাজনের বাড়িতে একজন ভোজপুরি দরোয়ান ও সড়কি-বল্লম, লাঠিসোঁটা ছিল যথেষ্ট, সেই দিনই মহাজনের দুই ষণ্ডামার্কা শ্যালকও বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। তাদের প্রতিরোধ অবশ্য বেশিক্ষণ টেকেনি, যতীন পিস্তলের গুলি শূন্যে চালিয়েছিল দুবার, তাতেই তারা হাতিয়ার ফেলে দেয়। শেষের দিকে দুজন তাড়া করে এসেছিল, ভরত আর হেমচন্দ্র তলোয়ার হাতে নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করে। লড়াই হয়েছিল সংক্ষিপ্ত।

গুপ্ত সমিতির কেউ ধরা পড়েনি, আহতও হয়নি। নৌকোয় উঠে ভরত চুপি চুপি হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিল, শেষকালে যে লোকটার ঘাড়ে আমরা তলোয়ারের কোপ দিলাম ও লোকটা কি শেষ পর্যন্ত মরেই যাবে, না বাঁচার আশা আছে?

হেমচন্দ্র উত্তর দিয়েছিল, জানি না, জানতেও চাই না। না মারলে ওরা আমাদের মারত। ও চিন্তা মন থেকে একেবারে মুছে ফেল!

এবারেও কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। পুলিশ এসব ঘটনাকে সাধারণ ডাকাতি বলেই ধরে নিয়েছে। কোনও বিপ্লবী দলের অস্তিত্বের কথা সরকারি মহলের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। সকলেরই ধারণা, শিক্ষিত বাঙালি মানেই বাক্যবাগীশ, কোনওরকম বিপদের ঝুঁকি নেবার কথা তারা কল্পনাও করে না।

পুলিশ বা সরকারি মহল টের না পেলেও বাংলার রাজনৈতিক মহলে এই সব অভিযানের কথা জানাজানি হয়ে গেল। কেউই সমর্থন করলেন না। সুরেন বাঁড়ুজ্যে নরমপন্থী নেতা। তিনি ব্রিটিশ রাজের কাছে আবেদন-নিবেদন চালিয়ে কিছু কিছু অধিকার আদায় করতে চান, গুপ্ত সমিতি, বিপ্লব এসবে বিশ্বাস করেন না। চুরি-ডাকাতি-নরহত্যা তো অতি ঘৃণ্য কাজ। বিপিনচন্দ্র পাল পত্র-পত্রিকায় উগ্র মতামত প্রচার করছেন বটে, তবু তিনিও এর বিরোধী। তাঁর আপত্তি অবশ্য নৈতিক নয়, তিনি মনে করেন, এ সবের এখনও সময় আসেনি। পুলিশ একবার জানতে পারলে এমন ধর-পাকড় অত্যাচার শুরু করবে যে, দু দিনেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তার চেয়ে দেশের মানুষকে সজাগ করার কাজই এখন চালিয়ে যেতে হবে বেশ কিছুদিন।

সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ল সরলা ঘোষাল। সে সম্ভ্রান্ত ঘরের বিদুষী মহিলা, দেশের যুবকদের বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত নিয়েছে, তার জন্য সে নিজস্ব উদ্যম ও অর্থব্যয় করছে অকাতরে। কিন্তু বাংলার যুবকরা চুরি-ডাকাতির মতন নীচ কাজে মেতে উঠছে! এত হীন পন্থায় কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে? সরলা ঘোষাল যতীন ও বারীনের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি, কিন্তু তার নিজের দলের কিছু কিছু ছেলে সরে পড়ছে দেখে সে প্রথমে বিচলিত হয়ে পড়ে। অন্যদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানল, তার দলের কিছু কিছু ছেলে যতীনের আখড়ায় যাতায়াত করে, তাদের কাছেই শোনা গেছে ডাকাতির খবর।

যে-কোনও উপায়ে এসব বন্ধ করতেই হবে। বাঙালি জাতির সম্মান এরা ধূলিসাৎ করতে চলেছে।

সরলার কী করে যেন ধারণা হল, যতীন বাঁড়ুজ্যের এই গুপ্ত সমিতির নির্দেশ আসছে বাংলার বাইরের কোনও নেতার কাছ থেকে। বাংলায় এদের কাজের সমর্থক কেউ নেই। বাইরের কে হতে পারে, বারীনের দাদা অরবিন্দ ঘোষকে কেউ নেতা বলে মানে না। বরোদা কলেজের এই ইংরেজির অধ্যাপকটির নামই অনেকে শোনেনি। বাংলার বাইরে সর্বজনমান্য নেতা আছে মহারাষ্ট্রে। গোখলে এবং তিলক।

গোখলের সঙ্গে সরলার বিশেষ হৃদ্যতা আছে। উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ধীর স্থির, সংস্কারমুক্ত এই মানুষটি অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য। বাঙালিদের প্রতি গোখলের বিশেষ মুগ্ধতা আছে। বিপত্নীক এই মানুষটির বাঙালি রমণীদের প্রতি মুগ্ধতা আরও বেশি। অন্দরমহল ছেড়ে যেসব যুবতী বৈঠকখানায় এসে বসে, অনাত্মীয় পরপুরুষদের সঙ্গে চা পান করে, গান শোনায়, হাস্য-পরিহাসে অংশগ্রহণ করে, তেমন যুবতীদের তো কলকাতা শহরেই দেখা যায়। গোখলে এজন্য ঘন ঘন কলকাতায় আসেন, এলেই ঘোষাল বাড়িতে কয়েক সন্ধে কাটিয়ে যান। কেউ কেউ আড়ালে কানাকানি করে, সরলা ঘোষাল রাজি হলে গোখলে তাকে বিবাহ করেও ধন্য হতে পারেন। সরলা ঘোষালের অবশ্য সেদিকে মন নেই।

রাজনীতিতে গোখলেও অতি নরমপন্থী, তাঁর সঙ্গে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্রব থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। বরং তিলকের সঙ্গেই থাকা সম্ভব। তিলক চাপেকর ভাইদের ইংরেজ-হত্যায় প্রচ্ছন্ন সমর্থক ছিলেন। চিঠি লেখারও ধৈর্য রইল না, সরলা তিলকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সোজা চলে গেল পুণায়।

তিলক যেমন গোঁড়া, একরোখা, তেমনি কূটবুদ্ধিতেও তাঁর তুলনা নেই। সব শুনে তিনি সহাস্যে বললেন, না, বেটি তুমি যা ভেবেছ, তা ভুল। বাংলায় গুপ্ত সমিতি আমি চালাই না, আমি তাদের কোনও নির্দেশও পাঠাই না।

সরলা বলল, আপনি এই চুরি-ডাকাতি, এই ডাকাতির নামে নিরীহ মানুষ হত্যা, এসব সমর্থন করেন?

তিলক দুদিকে মাথা নেড়ে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, না, আমি এসব সমর্থন করি না।

সরলা খুশি হয়ে বলল, আপনার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। এই শোনার জন্যই তো এতদূর ছুটে আসা! এই বিপথগামী যুবকদের নিবৃত্ত করতেই হবে। এই কাজ আমাদের দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব কিছুর বিরোধী। আপনি প্রতিবাদ করুন, আপনি জানিয়ে দিন যে এটা ভ্রান্ত পথ। আপনার নির্দেশ সবাই শুনবে। আপনি লিখে দিন, আমার পত্রিকায় ছাপব।

তিলক এবার বললেন, না। আমি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাব না। পুলিশ এখনও কিছু জানে না। আমি কিছু লিখলে পুলিশ সজাগ হয়ে যাবে। তারপর এদের ঠিক ধরে ফেলবে। তা আমি চাই না।

সরলা বলল, তা হলে কি এরকম চলতেই থাকবে? আপনাকে কারুর নাম করতে হবে না, আপনি যুবকদের সামনে অন্য আদর্শের কথা তুলে ধরুন।

তিলক বললেন, কেউ কেউ যদি মনে করে, এটাই ঠিক পথ, এতেই দেশের কাজ হবে, আমি

তাদের বাধা দিতে চাই না। আমি তাদের সমর্থনও করব না, প্রতিবাদও করব না।

নিরাশ হয়ে শূন্য হাতে সরলাকে ফিরে আসতে হল।

কিন্তু সার্কুলার রোডের আখড়ায় ভাঙন এল অন্য দিক দিয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল বারীন ও যতীনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। যতীনের হাবভাব দেখে মনে হয়, সে-ই এ দলের নেতা। বারীন তা মানতে রাজি নয়। মাঝে মাঝেই ওদের দুজনের তিক্ত তর্ক শুরু হয়, তখন অন্যরা নির্বাক থাকে।

একদিন বারীন বলল, যতীনদা, টাকা পয়সাগুলো সব তোমার কাছে থাকবে? তুমি খরচ চালাবার জন্য কিছু রেখে বাকি সব টাকা আমাকে দিয়ে দাও।

যতীন বলল, কেন, আমার কাছে থাকলে অসুবিধা কী?

বারীন বলল, নিয়ম মতে আমাদের প্রধান নেতার কাছেই সব গচ্ছিত রাখা উচিত। তিনি এখানে নেই, এ দায়িত্ব নিতেও চান না। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আমার কাছেই রাখা সঙ্গত নয়?

যতীন বলল, তুমি কী করে প্রধান নেতার প্রতিনিধি হলে? তাঁর ভাই বলে? এখানে আমরা সবাই সমান, সবাই ভাই-ভাই নয়? আমি পাই পয়সা পর্যন্ত হিসেব রাখব, সেজন্য কারুকে চিন্তা করতে হবে না।

তর্কে ও যুক্তিতে হেরে গিয়ে বারীন অন্য পথ দিল। একদিন পটলডাঙার এক চায়ের দোকানে কয়েকজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে বলল, ওই আখড়ায় আমার আর যেতে ইচ্ছে করে না। ওই যতীন বাঁড়ুজ্যেটা কী দুশ্চরিত্র, তোমরা দেখতে পাওনা? ওই যে কুহেলিকা বলে মেয়েটা, ও কি ওর সত্যিকারের বোন, না রক্ষিতা? মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখেছ? অন্য কেউ ওই মেয়েটার সঙ্গে কথা বললেই যতীন বাঁড়ুজ্যে কী রকম খেঁকিয়ে ওঠে।

ভরত বলল, কিন্তু...তুমি যা বলছ, ওখানে তো যতীনদার স্ত্রীও রয়েছেন।

বারীন বলল, লোকে দুটো বউ নিয়ে থাকে না! বউটা নিশ্চয় গোবেচারা ভালমানুষ, তাকে ও দাবিয়ে রেখেছে। মেয়েটা আমাদের অন্য বন্ধুদেরও মাথা খাচ্ছে।

হেমচন্দ্র বলল, অমিতবিক্রমের ওই মেয়েটিকে খুব পছন্দ। আমার মনে হয়, সে বিধবা বিবাহ করতেও অরাজি হবে না।

বারীন বলল, একবার বলে দেখো না, যতীন বাঁড়ুজ্যে তাতেও রাজি হবে না। নিজের ভোগের জিনিস কে ছাড়ে! কুহেলিকা! কুহেলিকা কোনও মেয়ের নাম হয়? ভেবেছিল সবটাই কুহেলিকা করে রাখবে? আমি সব জানি! তোমাদের কী বলব, আমার মামা সত্যেন, সেও প্রায়ই দিনের বেলা একা একা ও বাড়িতে যায়, শুয়ে থাকে। আমাদের সবাইকে ও নষ্ট করবে। সত্যি কথা বলতে কী, মেয়েটার শরীরের দোলানি দেখো, আমারও মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে যায়। নেহাত দেশের কাজের জন্য আমি আর নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হব না ঠিক করেছি...

বারীন লম্বা অভিযোগপত্র পাঠাল তার দাদার কাছে। তদন্ত করার জন্য অরবিন্দ চলে এল কলকাতায়। বারীন ততদিনে গ্রে স্ট্রিটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আলাদা আখড়া খুলে ফেলেছে। অরবিন্দ বারীনের মুখে সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে রায় দিয়ে দিল। যতীনের সঙ্গে আর সমিতির কোনও সম্পর্ক রাখা হবে না। নতুন আখড়া হবে এই গ্রে স্ট্রিটে। সত্যেনও দলচ্যুত হল।

বিচার হল একেবারেই একতরফা। যতীনের কোনও কথাই শোনা হল না। কুহেলিকা নামের মেয়েটিরও যে কিছু বলার থাকতে পারে, সে চিন্তাও করল না অরবিন্দ।

প্রধান নেতার এই নির্দেশ শুনে রেগে আগুন হয়ে গেল যতীন। কয়েকজনকে ডেকে এনে তাদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল টাকার থলি। কুহেলিকার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে ওদের সামনে বসিয়ে দিল জোর করে। পায়ের ওপর থেকে খানিকটা শাড়ি তুলে যতীন বলল, দেখো, সবাইকে দেখো।

যতীন নিজেরও পা রাখল পাশে। দুজনেরই পায়ের গড়নে খানিকটা বৈশিষ্ট্য আছে। দুজনেরই এক রকম, বুড়ো আঙুলে দুটো স্পষ্ট ভাঁজ। যতীন বলল, মায়ের পেটের ভাই বোন ছাড়া এ রকম

হতে পারে? বিধবা বোনটাকে নিজের কাছে না রেখে জলে ভাসিয়ে দেব?

অরবিন্দর নিজের ভাইয়ের প্রতি এরকম পক্ষপাতিত্ব অনেকেরই পছন্দ হল না। সত্যেন মিত্র স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করলেন, তিনি এ দলটির আগাগোড়া সমর্থক ছিলেন, এখন বারীনকে ত্যাগ করলেন।

বারীনের সূত্রেই এই দলটির সঙ্গে ভরতের পরিচয়, তাই ভরত বারীনকে ছাড়তে পারেনি। যদিও এই দল ভাঙাভাঙি তার ভাল লাগেনি একেবারেই। গ্রে স্ট্রিটের আখড়ায় প্রায় কেউই আসে না। একদিন সে সার্কুলার রোডে যতীনের আখড়ায় গেল। সেখানে তালা বন্ধ। সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যতীন কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না।

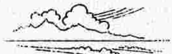

৬৯

সিংহল, বর্মা সমেত এই যে ভারতবর্ষ নামের দেশটি, এ দেশের প্রকৃতি বড় সুন্দর। লর্ড কার্জনের এ দেশটিই বড় পছন্দ। এত বড় দেশটির ভূ-প্রকৃতির মধ্যে কত বৈচিত্র্য, এক দিকে গগনচুম্বী পর্বত, আর প্রায় তিন দিকে নীল সমুদ্র। মধ্যে কত নদী, কত অরণ্য, কত প্রাচীন জনপদ। ঐতিহাসিক সম্পদও রয়েছে প্রচুর। কত মন্দির, মসজিদ, মিনার, স্তম্ভ, সেগুলির শিল্পগুণ লর্ড কার্জনকে আকৃষ্ট করে। ওই সব অনেক পুরাকীর্তি ভেঙে পড়েছে, ধ্বংসোন্মুখ, লর্ড কার্জন সেগুলিরও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে চান। তাজমহল সারা বিশ্বের সপ্ত বিস্ময়ের অন্যতম, সেই তাজমহল সম্পর্কেও কার্জনের মুগ্ধতার শেষ নেই, বার বার দেখতে ইচ্ছে হয়। তিনি ঠিক করেছেন, ভারতবর্ষকে আর একটি নতুন তাজমহল উপহার দেবেন, সেটি হবে সদ্য স্বর্গগতা মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ, প্রতিষ্ঠিত হবে রাজধানী কলকাতায়।

এ দেশের অনেক কিছুই ভাল, শুধু এ দেশের মানুষগুলি সম্পর্কে কার্জনের উচ্চ ধারণা নেই। অধিকাংশই গরিব, তারা নিরীহ, শান্ত, তাদের ভাষা নেই, তারা ঠিক আছে। কিন্তু যারা লেখাপড়া শিখেছে, ইংরেজি জানে, গড়ে তুলেছে একটা মধ্যবিত্ত সমাজ, তাদের আচরণ মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্তিকর মনে হয়। এরা শুধু কথাতেই দড়, বক্তৃতায় তুফান তোলে, অথচ কর্মোদ্যম নেই। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে উকিল-ব্যারিস্টার, চিকিৎসক-অধ্যাপক, আমলা বেরিয়ে আসছে প্রচুর, তা হোক, তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এরা এখন শাসন কার্যে অংশ নেবার আবদার ধরেছে। নাগরিক পুরসভায়, আইন পরিষদে এরা এদের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়াতে চায়। কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে বছরে একবার কোনও শহরে সম্মিলিত হয়, তাতে এই সব দাবি তুলে চ্যাঁচামেচি করে। নেটিভ সংবাদপত্রগুলিতেও অনবরত এই বিষয়ে লেখালেখি হয়। না, এই দাবির ব্যাপারে লর্ড কার্জনের সম্মতি নেই। দেশ-শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে নেটিভদের মাথা ঘামাবার দরকারই বা কী? ইংরেজরাই তো রয়েছে। ইংরেজরা এ দেশে দৃঢ়, ন্যায়সম্মত প্রশাসন উপহার দিয়েছে। প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী এই ভারতবর্ষে অরাজকতা চলছে, ভারতীয়রা শাসন কার্যের কী বোঝে? যে-কোনও একজন ভারতীয়ের তুলনায় একজন ইংরেজ অনেক বেশি দক্ষ।

কার্জনের ধারণা, শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ই এই রকম শোরগোল তুলেছে, সুতরাং তাদের কথায় কান দেবার দরকার নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষ ইংরেজ-শাসনেই সুখী, তারা পেয়েছে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা। এই সব মানুষদের ওপর কোনও অত্যাচার বা অবিচারও পছন্দ করেন না কার্জন। ইংরেজরা ভদ্র, সুসভ্য জাতি, তারা সাধারণ, দরিদ্র, নিরস্ত্র মানুষের ওপর অত্যাচার করবে কেন? শুধু তাই নয়, এ দেশে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়ার মতন ভয়াবহ রোগ মাঝে মাঝেই

মহামারীর রূপ ধারণ করে। সেই সব রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাও করা দরকার। দুর্ভিক্ষের সময় নিরন্ন মানুষকে সাহায্য করাও রাজশক্তির দায়িত্ব। এ দেশ শাসন করার বিনিময়ে ইংরেজ সরকার কর নিচ্ছে, হাজার হাজার ইংরেজ কর্মচারী এ দেশে বেতন পায়, বিপদের সময় সাধারণ মানুষের পাশে তাদের দাঁড়াতে হবে।

কার্যভার বুঝে নিয়ে কলকাতায় কিছুদিন কাটাবার পর লর্ড কার্জন তাঁর স্ত্রী মেরিকে নিয়ে বেরুলেন ভারত দর্শনে। তিনি এ দেশটা আগে থেকেই চেনেন। কিন্তু মেরি তো কিছুই জানেন না। মেরির কাছে ভারত একটা রূপকথার দেশ।

মেরি প্রথম থেকেই খুশিতে ডগোমগো হয়ে আছেন। এত আড়ম্বর, এক খাতির যত্ন তিনি জীবনে দেখেননি। রাজকীয় সম্মান বললেও যেন কম বলা হয়। মেরি সবচেয়ে বেশি অভিভূত হয়েছে সেবাদাসদের সংখ্যা দেখে। ভাইসরয়ের এই প্রাসাদে ভৃত্যের সংখ্যা প্রায় চারশো জন! স্নানের সময় একজন জল গরম করে। একজন বাথটব এনে দেয়, একজন সেই বাথটাবে জল ঢালে, আর একজন পরে সেটা পরিষ্কার করে। প্রত্যেক কাজের জন্য এক একজন নির্দিষ্ট।

মেরি আমেরিকান, তার দেশে এই গৃহভৃত্য প্রথাটি প্রায় উঠে যাচ্ছে। ক্রীতদাস প্রথা রহিত হবার পর কৃষ্ণাঙ্গ দাস-দাসী পাওয়াও দুষ্কর। লন্ডনে যখন কার্জন আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন, তখন সেখানে সংসার পেতে বসার পর কয়েকটি ভৃত্য ছিল বটে, কিন্তু ইংরেজ ভৃত্যরা অতিশয় বেয়াদপ। একদিন একটু বকাবকি করলেই ইচ্ছে করে রান্না এমন খারাপ করে দেবে যে মুখে দেওয়া যাবে না। কলকাতায় ভৃত্য-খিদমতগাররা পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পোশাকে সেজে-গুজে থাকে, তারা মুখফুটে একটা কথা বলে না, ছায়ার মতন তাদের অস্তিত্ব, সামান্য ইঙ্গিতেই তারা কাজের কথা বুঝে যায়। এক একদিন নৈশ ভোজের জন্য যখন অতিথিদের আমন্ত্রণ করা হয়, তাদের সংখ্যা দেড়শো-দু'শো জন হলেও তাদের প্রত্যেকের চেয়ারের পেছনে একজন করে খিদমতগার নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে, যাতে কোনও অতিথিকেই নিজের হাতে গেলাসে জল পর্যন্ত ঢালতে না হয়।

কার্জন দম্পতির ট্রেন ভ্রমণের সময়ও শত শত ভৃত্য সঙ্গে যায়। ট্রেনটি যেন চলন্ত এক প্রাসাদ। সম্পূর্ণ ট্রেনটি সাদা ও সোনালি রঙ করা। শুধু মেরির জন্যই আছে পালঙ্ক সজ্জিত মস্ত এক শয়নকক্ষ, একটি পোশাক-পরিবর্তন কক্ষ, একটি খাসকামরা, বাথটাব সমেত স্নানের ঘর, দু'জন ইওরোপীয় দাসীর জন্য একটি ঘর। আর বড় লাটের নিজস্ব অংশে এই সব কিছুর সঙ্গে আছে একটি গ্রন্থাগার।

কিছুদূর অন্তর অন্তর কার্জন দম্পতি এক একজন দেশীয় রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এরকম দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা কম নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের পাঁচ ভাগের দু' ভাগ দেশীয় রাজাদের অধীনে। ইংরেজ রাজশক্তি অবশ্য এক একটি থাপ্পড়ে এই সব দেশীয় রাজাদের মুণ্ড উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছে করেই এদের পুষে রাখা হয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিং সুপারিশ করে গেছেন, এই সব দেশীয় রাজ্যগুলি টিকিয়ে রাখা হোক। এদের যে রত্নখচিত সিংহাসনে পুতুলের মতন বসিয়ে রাখা হচ্ছে, সেই কৃতজ্ঞতায় এরা চিরকাল ইংরেজদের প্রতি অনুগত থাকবে, আবার কখনও যদি দৈবাৎ ঝড় ওঠে, তখন এদের সাহায্য পাওয়া যাবে।

ত্রিপুরা ছাড়া আর কোনও দেশীয় রাজ্যই স্বাধীন নয়। ত্রিপুরাও নামেমাত্র স্বাধীন। রাজারা ইংরেজ সরকারের অঙ্গুলিহেলনে ওঠে-বসে। প্রত্যেকবার উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ইংরেজ সরকার নাক গলায়, এমনকী রাজকুমারদের লেখাপড়ার কী রকম ব্যবস্থা হবে, সে বিষয়েও ইংরেজ সরকারের নির্দেশ নিতে হয়।

এইসব রাজাদের বিলাসিতা, উৎকট খেয়াল ও লালসা-প্রবৃত্তির বহু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়ায়। এদের যুদ্ধ করার অধিকার নেই, নিজেদের দেশ আক্রান্ত কখনও হলে ইংরেজ সামলাবে, আর কোনও দায়-দায়িত্বও নেই, তাই ধনরত্নের অপব্যয়েই এরা সময় কাটাবার শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করে। কেউ অনবরত ঘোড়া কেনে, গাড়ি কেনে, কেউ বাঁদরের বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, কেউ হারেম পোষে, কেউ সিঁড়ির দু'পাশে নগ্ন নারীদের দাঁড় করিয়ে রাখে, কেউ বাঘ শিকার করতে

গিয়ে জ্যান্ত বাচ্চা ছেলেকে বেঁধে রাখে টোপ হিসেবে।

যারা লেখাপড়া শিখেছে, তারা প্রায়ই ইওরোপে পাড়ি দেয়। লন্ডনে এইসব রাজা-মহারাজারা এক একখানা বাড়ি কিনে রেখেছে, কেউ কিনেছে প্রমোদ তরণী। গণ্যমান্য অতিথিদের ডেকে কোনও প্রসিদ্ধ নর্তকী বা অভিনেত্রীকে জয় করবার জন্য ইওরোপীয় ধনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে নিঃস্ব হয়। রানিরাও বাদ যায় না। ভারতে, নিজের রাজ্যে এই সব রানিরা অন্তঃপুরবাসিনী, কিন্তু ইওরোপে গিয়ে তারা একেবারে লাগাম ছাড়া। সেখানে গিয়ে তারাও খোলামেলা পোশাকে পার্টিতে নাচে, মদ্যপান করে বেসামাল হয়, জুয়ার আড্ডায় নায়িকা সাজে। মহারাজা, মহারানি এই সব শব্দগুলি এখন ইওরোপের সব দেশেই পরিচিত, এর প্রতিশব্দ হল দারুণ ঐশ্বর্যশালী নির্বোধ।

এই সব দেশীয় রাজাদের অতিথি হয়ে কার্জন দম্পতি বিপুল সমাদর পান। বিগলিত রাজন্যবর্গ তাঁদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। স্টেশনে পাতা থাকে লাল কার্পেট, ট্রেন থামা মাত্র বড় লাটের অভ্যর্থনায় শোনা যায় তোপধ্বনি। বাইরে যেখানে চার ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, সেই পর্যন্ত কার্পেটের ওপর পা ফেলে ফেলে মেরির বাহু ধরে এগিয়ে যান কার্জন, ঘোড়াগুলির অঙ্গসজ্জা সব সোনার। পথের কিছুদূর অন্তর অন্তর স্বাগতম তোরণ। দু' পাশে সার বেঁধে থাকে হাজার হাজার বিহ্বল মানুষ। এই সব কিছুই মেরিকে মুগ্ধ করে, কার্জনের অহমিকা প্রদীপ্ত হয়। ইংল্যান্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে তাঁকে প্রায় কেউ চিনবেই না, আর এই ভারতের মতন বিশাল দেশে তিনি যেখানেই যাবেন, সেখানেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও তিনি ইংলন্ডেশ্বরের একজন কর্মচারী, তবু এখানকার মানুষ তাঁকে সম্রাটের সম্মান দেয়। কার্জনের ভাবভঙ্গিও ব-কলমে সম্রাটেরই মতন।

মাঝে মাঝে কৌতুকের উপাদানও পাওয়া যায়। পথের তোরণগুলিতে অনেক কিছুই লেখা থাকে ইংরিজিতে। কিন্তু যে কারিগররা ওই সব নির্মাণ করে, তারা এক অক্ষরও ইংরিজি জানে না। মাঝে মাঝে হাস্যকর ভুল চোখে পড়ে। এক জায়গায় লিখতে চাওয়া হয়েছিল A Gala Day, তার বদলে লেখা হয়েছে A Gal a day! তা দেখে কার্জন মেরির দিকে একচক্ষু টিপলেন।

প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ অংশে থাকতে দেওয়া হয় তাঁদের, ফরাসি দেশ থেকে পাচক ও সর্বোৎকৃষ্ট সুরা আনানো হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, দু' ধরনেরই নৃত্যের ব্যবস্থা থাকে প্রতি সন্ধ্যাকালে। কার্জন দম্পতির এক পয়সাও ব্যয় হয় না, বরং অনেক মণি-মাণিক্য উপহার পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে যাওয়া হয় শিকার অভিযানে, সেও বেশ অদ্ভুত ধরনের শিকার। হাজার খানেক লোক জঙ্গলে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা বাঘকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। বেচারি বাঘটি এক সময় কোনঠাসা হয়ে যায়, উঁচু করে বাঁধা মাচার ওপরে নিরাপদ স্থানে বসে কার্জন গুলি করে সেই বাঘের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন। তারপর নেমে এসে মৃত বাঘটির মাথায় পা দিয়ে সদর্পে তিনি সম্মুখীন হন ক্যামেরার।

কোথাও কোথাও গুলি খাওয়ার পরেও অকৃতজ্ঞ বাঘটা পালিয়ে যায়। যেমন হয়েছিল গোয়ালিয়রে। সেখানে শিকারের ব্যবস্থা এলাহি রকমের। জঙ্গলের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে ইন্দ্রপুরী, ফুলের বাগান, ফোয়ারা, বিশ্রামের কক্ষ, বহু রকম খাদ্য-পানীয়ও মজুত। গোটা দশেক হাতির পিঠে চেপে এসেছে বিরাট একটি দল, বাজনা বাজিয়ে, ঝোপঝাড় পিটিয়ে একটা বাঘকে তাড়িয়ে আনা হল কাছাকাছি, তার হলুদ-কালো ডোরাকাটা শরীরটাও দেখা গেল, কার্জন সাহেব বন্দুক তাক করে গুলি চালালেন, অন্য সকলে দেখল, নির্ঘাত সেই গুলি বাঘের পিঠ ভেদ করে চলে যাবার কথা। তবু চোখের নিমেষে এক লম্ফ দিয়ে সেই বাঘ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর খোঁজ খোঁজ খোঁজ, বহুলোক ছড়িয়ে পড়ল বনে, কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না সেই আহত বাঘের।

কার্জন সাহেব রীতিমতন ক্ষুব্ধ। মানুষের মতন, এই ভারতের পশুরাও তো ব্রিটিশের প্রজা। এই বাঘটা মহামান্য বড় লাটকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সাহস পেল কী করে? গোয়ালিয়রের মহারাজও তটস্থ, তাঁর রাজ্যের এত বড় অতিথি যদি শিকারে অসার্থক হয়ে ফিরে যান, তবে সেটা যেন তাঁরই অপরাধ, তাঁরই গাফিলতি। ভোজ্য-পেয়'র দিকে আর মন না দিয়ে সস্ত্রীক লর্ড কার্জন ফিরে গেলেন প্রাসাদে। কয়েক ঘন্টা পরে, কার্জন মনের দুঃখে বিছানায় শুয়ে আছেন, মেরি জানলা দিয়ে দৃশ্য

উপভোগ করছেন। হঠাৎ মেরির দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, জর্জ, জর্জ, শিগগির এসে দেখে যাও!

একটা চার ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে দুরন্ত বেগে, তার ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দে প্রায় নৃত্য করছেন গোয়ালিয়রের মহারাজ। তাঁর সর্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, পেছন দিকে দু' দুটো বিশাল মৃত বাঘ! এর মধ্যে কোনটি বা কোনওটিই কার্জনের গুলিতে আহত বাঘ কি না তা নির্ধারণ করা অসম্ভব, তবু ধরেই নেওয়া হল যে, কার্জনের বাঘটি পাওয়া গেছে, এবং সংশয়ের অবকাশ না রাখার জন্য একটির বদলে দুটি বাঘ মেরে আনা হয়েছে!

ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, ভোপাল, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র এবং আরও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের আতিথ্য নিতে নিতে চললেন এই দম্পতি। মহারাজ-মহারানিদের অলঙ্কার, রত্নসম্ভার, পায়রার ডিমের মতন হীরক, দেখেই মেরি বেশি অভিভূত। নিজেরও সংগ্রহ হল কিছু কিছু। কার্জন নিজে এক ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত বংশের সন্তান, ঐশ্বর্যের জাঁকজমক তাঁর বেশ পছন্দ। কিন্তু কার্জন কর্মদ্যোগেও বিশ্বাসী। ভোগ-বিলাস থাকবে, তার সঙ্গে কাজও করতে হবে। এই রাজাগুলি কাজের ব্যাপারে একেবারে অপদার্থ, কোনও কাজই করে না, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে না, কেউ কেউ প্রায় সারা বছরই বিলেতে কাটিয়ে আমোদের স্রোতে গা ভাসায়, এটা কার্জনের পছন্দ নয়। মাঝে মাঝে তিনি এদের ধমক ও উপদেশ দিতেও ছাড়েন না।

এই সফরের সময় কার্জন লক্ষ করলেন, এ দেশে মানুষ রাজাদের দৈবনিযুক্ত বলে মনে করে। রাজার সামনে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম জানায়। রাজার সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করে না। সারা জীবনে কেউ একবার রাজার দর্শন পেলে ধন্য হয়ে যায়। গোটা ভারতবর্ষের আসল রাজা তো ইংলন্ডের রাজা। তাঁকে তো ভারতীয় প্রজারা কখনও চর্মচক্ষে দেখতে পায় না। একবার ইংলন্ডেশ্বরকে আনতে পারলে এই সাম্রাজ্যের প্রজাদের আনুগত্য ও রাজভক্তি আরও দৃঢ় করা যায়। দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণকেও বোঝাতে হবে যে তাদের এই সব রাজারাও আসলে ইংলন্ডের রাজার ভৃত্য।

তখনই এক রাজদরবার বসাবার পরিকল্পনা কার্জনের মাথায় এল। কলকাতার বদলে দিল্লিই হবে তার প্রকৃষ্ট স্থান। দিল্লিতে মুঘল সম্রাটদের মহা আড়ম্বরময় দরবারের সঙ্গে পাল্লা দেবে এই ইংরেজ দরবার। এক সময় মুঘল সম্রাটরা ছিলেন ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি, ভারতীয়রা এবার দেখবে, সেই দিল্লির মসনদে বসেছেন ব্রিটিশ সম্রাট।

মহারানি ভিক্টোরিয়ার পক্ষে শেষ বয়েসে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এখন সম্রাট হয়েছেন সপ্তম এডোয়ার্ড, তাঁকে সরাসরি চিঠি লিখে কার্জন তাঁর প্রস্তাবটি সবিস্তারে জানালেন। সেই সঙ্গে চলতে লাগল দরবারের প্রস্তুতি।

শেষ পর্যন্ত সপ্তম এডোয়ার্ড আসতে পারলেন না। তাঁর বদলে এলেন তাঁর ভাই ডিউক অফ কনট। এতে কার্জন-দম্পতি গোপনে দারুণ উল্লাস বোধ করলেন। রাজার ভাই সিংহাসনের অধিকারী নন, ভারতের মাটিতে পদমর্যাদায় তিনি কার্জনের নীচে। সুতরাং দিল্লি দরবারের প্রধান পুরুষ হবেন লর্ড কার্জন।

বিশাল সেই উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ নিজে তত্ত্বাবধান করে নিখুঁত ভাবে সাজালেন কার্জন। আমন্ত্রণ জানানো হল, দেশের সব কটি দেশীয় রাজ্যের নবাব ও রাজাদের, বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের, ইওরোপীয় সমাজের গণ্যমান্যদের। খুঁজে খুঁজে আনা হল ভারতের সবচেয়ে বড় হাতিটি, তার হাওদা স্বর্ণ-খচিত, সেখানে বসলেন কার্জন, তাঁর মাথায় সোনার ছত্র। সহস্র কণ্ঠের সহর্ষ ধ্বনির মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল হাতিটি, কার্জন একটা হাত তুলে রইলেন, যেন তিনিই সম্রাট। আর মখমলের পোশাক পরা, হিরে-মুক্তোর গয়নায় মোড়া, যাত্রাদলের রাজা-সাজা বড় বড় দেশীয় রাজ্যের রাজা ও নবাববৃন্দ বিগলিতভাবে, মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন সেই রাজ-ভৃত্যকে।

যারা সেই দরবারে এল না, সেই শিক্ষিত সমাজ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বদেশপ্রেমিকগণ সম্ভ্রান্ত ভারতীয়দের এই করুণ বিদূষকের ভূমিকা দেখে লজ্জায় অধোবদন হল। পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

চলল বেশ কিছুদিন।

গ্রীষ্মকালে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় সিমলায়। বছরের অন্য সময় কার্জন সারা ভারত ঘুরে ঘুরে কার্য পরিদর্শন করেন। নিয়ম শৃঙ্খলায় সামান্য গাফিলতি তিনি সহ্য করেন না। তিনি নিজেও যেমন পরিশ্রম করেন, অন্যরাও তেমন পরিশ্রম করুক, তিনি চান। সরকারি কাগজপত্র দেখার জন্য রাত্রি জাগরণেও তাঁর দ্বিধা নেই। তাঁর পিঠের ব্যাথাটা মাঝে মাঝেই চাড়া দিয়ে ওঠে, তিনি গ্রাহ্য করেন না, কোনও কাজ তিনি পরের দিনের জন্য ফেলে রাখেন না। দিল্লির দরবারে অত বড় হাতির পিঠ থেকে নামার সময় তিনি পিঠে শূল বেঁধার মতন ব্যথা অনুভব করেছিলেন, কেউ তা বুঝতে পারেনি।

কলকাতার শীত বেশ মৃদু। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস নেই, তুষারপাত নেই, এই রকম শীতই মেরির পছন্দ। শীতের কয়েকটা মাস কার্জনদম্পতি কলকাতায় কাটান।

একদিন সকালবেলা ছোটহাজরি খেতে খেতে মেরি বললেন, আচ্ছা জর্জ, আমরা ভারতে এসেছি প্রায় চার বছর হয়ে গেল, বহু জায়গায় ঘুরেছি, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছি। কলকাতাতেও তো বাঙালিদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী আছে, তাদের কারুর বাড়িতে তো আমরা কখনও যাইনি? তারা কি আমাদের ডাকবে না?

কার্জন মুখ তুলে বললেন, ডাকবে না কেন? অনেকেই ডাকে। আমরা গেলে তারা ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

মেরি বললেন, কেন? চলো না, একবার অন্তত গিয়ে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন দেখে আসি!

কার্জন বললেন, না!

এই বাঙালি জাতিটিকে কার্জন কিছুতেই পছন্দ করতে পারেন না। দিন দিন তাঁর মনোভাব আরও কঠোর হয়ে আসছে। বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু আর মুসলমান, এই দুটি জাতি আছে। এদের মধ্যে বাঙালি বলতে যেন হিন্দুদেরই বোঝায়। শিক্ষিত হিন্দুরা সবাই বাঙালিবাবু। এই হিন্দুগুলোই বেশি বক্তৃতাবাজ, কলমবাজ, বেশি বিরক্তিকর। কার্জন মুসলমানদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারেন, এরাই ছিল কিছুকাল আগে এ দেশের শাসক শ্রেণী, ইংরেজ আমলে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তারা এখন আহত সিংহের মতন ক্ষতস্থান চাটছে, আপাতত তারা নীরব। ইংরেজ সরকারের উচিত এদের শুশ্রূষা করা। এদের ক্ষোভ নিরসনের ব্যবস্থা করা।

আর হিন্দুরা? বহু শতাব্দী ধরে তারা অন্যের পদানত, না জানে যুদ্ধবিদ্যা, না জানে কূটনীতি। এখন দু'পাতা ইংরেজি পড়ে কিংবা লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে যে গলাবাজি শুরু করেছে, তা সহ্য করা হবে কেন?

কার্জন গোপন রিপোর্ট পেয়েছেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানরা খুব কম সংখ্যায় যোগ দেয়। কংগ্রেসে হিন্দু-প্রাধান্যের জন্য বেশ কিছু মুসলমান ক্ষুব্ধ। আর কংগ্রেসের হিন্দুদের মধ্যেও অধিকাংশ বাঙালিবাবুই জায়গা জুড়ে আছে। এই বাঙালিবাবুদের হীনবল করে দেবার জন্য কৌশলে মুসলমান সমাজকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়াই সরকারি নীতি হওয়া উচিত।

মেরি বললেন, জর্জ, তুমি একটা মজার গল্প জানো? এখানকার পুরনো কর্মচারীদের কাছে শুনেছি। এক সময় এখানে গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ডাফরিন। তিনি নাকি বাঙালি রান্না খেতে খুব ভালবাসতেন। আর লেডি ডাফরিন খুব রূপসী ছিলেন বুঝি? একদিন তিনি এক বাঙালির বাড়িতে গেছেন, অমনি সে বাড়ির মহিলারা তাঁকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর গাউন খুলিয়ে শাড়ি পরিয়ে দিল। তুমি জানো, বাঙালিরা টেবল চেয়ারে বসে খায় না, মাটিতে বসে খায়। কাঁটা-চামচ ব্যবহার করে না, আঙুল দিয়ে খাবার তোলে, অদ্ভুত না? মেঝেতে বুদ্ধের মতন পা মুড়ে বসতে হয়। লেডি ডাফরিনকে একটা রূপোর থালার মাঝখানে ভাত, আরও কী সব দিল, তিনি নাকি দিব্যি হাত দিয়ে তুলে তুলে সেইসব খেলেন। সবাই বলেছিল, উনি ঠিক বাঙালিদের মতনই খেতে জানেন!

গল্পটা শেষ করে মেরি বললেন, শাড়ি জিনিসটা কী রকম করে পরে? আমি শাড়ি পরলে আমাকে

মানাবে ?

মেরি হাসছেন, জর্জ ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, তুমি নেটিভদের পোশাক পরবে ? ছিঃ !

কলকাতায় মেরিকে এই সরকারি প্রাসাদেই আবদ্ধ থাকতে হয়, অনেক বাঙালি অভিজাতদের বাড়ির সান্ধ্যভোজের উৎসব-আসরের কথা তাঁর কানে আসে, কিন্তু কার্জন কোথাও যেতে রাজি নন।

বাঙালিবাবুদের জব্দ করার জন্য এর মধ্যেই কার্জন কিছু কিছু কাজ শুরু করে দিয়েছেন। প্রথম কোপটা পড়েছিল, ভারতে এসে পৌঁছবার কিছুদিনের মধ্যেই।

কিছু কিছু কাজে ভারতীয়দের জনপ্রতিনিধিত্ব রাখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল কয়েক বছর আগে থেকেই। যেমন কলকাতা করপোরেশান পরিচালনা। নগর উন্নয়ন এবং নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থাপনার জন্য করদাতাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হত। ফলে দলে দলে বাঙালিবাবু করপোরেশানের কমিশনার হতে লাগল, এরা আলোচনা সভায় চ্যাঁচামেচি করে, নীতি-নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করতে চায়। সরকারি নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কার্জন আসার আগেই ছোট লাট ম্যাকেঞ্জি একটি সংশোধনী বিল আনতে চেয়েছিলেন। কার্জন এসে সব দেখে শুনে মনে করলেন, সেই সংশোধনী বিলও যথেষ্ট কড়া নয়। দেশের রাজা ইংরেজ, রাজধানী কলকাতার নগর পরিচালনার ব্যাপারে মাথা গলাবে এ দেশের মানুষ ? তা কখনও হয় ? খচাখচ করে কেটে তিনি বিলের অনেক ধারা বদলে দিলেন। করদাতাদের প্রতিনিধিদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে নেমে গেল পঁচিশে, এক্সিকিউটিভ কমিটিতেও তাদের সংখ্যা হয়ে গেল এক তৃতীয়াংশ, সরকারি প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়ে গেল। অর্থাৎ করপোরেশন পরিচালনার পুরোপুরি ক্ষমতা চলে গেল সরকার ও ইওরোপীয় প্রতিনিধিদের হাতে, বাঙালি পুঙ্গবরা বড়জোর সেখানে কিছু গলাবাজি করতে পারবে।

প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমেত আঠাশজন কমিশনার পদত্যাগ করেছিলেন। কার্জন ভ্রূক্ষেপ করেননি। এদেশের কীসে ভাল হয়, তা ইংরেজদের চেয়ে কি দেশীয় লোকরা ভাল বুঝবে ? তিনি যা করেছেন, ঠিক করেছেন।

এরপর শিক্ষা। শিক্ষাখাতে সরকারের বহু অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু দিন দিন দেখা যাচ্ছে শিক্ষানীতির ব্যাপারে সরকারি লাগাম ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে, বেসরকারি কলেজ গজিয়ে উঠছে চতুর্দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিকাংশ সদস্যই নেটিভ। এ দেশে এত উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা কী ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ঢুকে পড়েছে বাংলার বহু রাজনৈতিক নেতা, সেখান থেকে তারা বাংলার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়ে আসছে। আই সি এস-দের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। প্রথম দিকে যারা, আই সি এস পাশ করেছিল, সেই চারজনই বাঙালি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত। এখনও আই সি এস-দের মধ্যে বাঙালিদেরই প্রাধান্য। ইংরেজি-পড়া উচ্চশিক্ষিত বাঙালিবাবুরা দেশাত্মবোধের কথা ছড়াচ্ছে। সুতরাং উচ্চশিক্ষার জন্য টাকা খরচ করা তো সরকারের পক্ষেই ক্ষতিকর। তার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিই ভাল।

সরকার পক্ষ থেকে সিমলায় একটি শিক্ষা কমিশন বসানো হল। ছ'জন সদস্যের সেই কমিশনে চারজন ইংরেজ আর দু'জনের নাম সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী আর নবাব ইমাদ-উল-মুলক। এ যেন কার্জন সাহেবের কৌতুক। ভারতে শিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দুরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাধিক, অথচ শিক্ষা কমিশনে একজনও হিন্দু নেই !

সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ ও সংবাদপত্রগুলিতে প্রচুর লেখালেখির ফলে কার্জন হিন্দুদের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি নিতে সম্মত হলেন কোনও ক্রমে। এলেন বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমিশনের সুপারিশ লর্ড কার্জনের অনুজ্ঞারই প্রতিধ্বনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরকারি আধিপত্য বজায় রাখতে হবে। সেনেটগুলিতে দেশীয় ব্যক্তিদের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ইংরেজ সদস্য সংখ্যা

বৃদ্ধি পাবে। বেসরকারি কলেজে আইন পড়ানো চলবে না। সমস্ত স্কুল-কলেজের অনুমোদন কিংবা অনুমোদন প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকবে কাউনসিলের হাতে। কিছু কিছু কলেজ বন্ধ করে দেওয়া এখনি দরকার। এ দেশের ছাত্রদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধে কমিয়ে দেবার জন্য বেতন বৃদ্ধি ও পাশ মার্ক বাড়াতে হবে। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুপারিশের প্রতিবাদ করেন, তা অগ্রাহ্য করা হল। বড় বড় শহরগুলিতে সরকারের এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অনেক সভা-সমিতি হল, ছাত্ররা মিছিল করে বেরুল রাস্তায়। কার্জন তাতে মজাই পেলেন বেশ। সেক্রেটারি অফ স্টেট-কে একটা চিঠিতে সকৌতুকে লিখলেন, টাউন হল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ঘামে-ভেজা, গলা-ফাটানো গ্রাজুয়েটেরা জমায়েত হয়ে গিসগিস করছিল, আমার নাম করে তারা বারবার ধিক্কার দিয়েছে, যেন আমিই ভারতে উচ্চশিক্ষার ধ্বংসকারী !... তবে বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে নেটিভদের চ্যাঁচামেচিতে আপনি বিচলিত হবেন না। এর বেশির ভাগই কৃত্রিমভাবে বানানো !

বাঙালি ভদ্রলোকদের জব্দ করার আর একটি মারাত্মক অস্ত্র কার্জন আকস্মিকভাবে পেয়ে গেলেন।

পুলিশ বিভাগের বড় কর্তা অ্যান্ড্রু ফ্রেজার কার্জনের খুব ঘনিষ্ঠ। একদিন সান্ধ্য আসরে পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে সে কার্জনকে বলল, সম্প্রতি আমি ঢাকা, মৈমনসিং ইত্যাদি অঞ্চল ঘুরে এলাম। ওখানকার লোকদের মতিগতি সুবিধের নয়। এক শ্রেণীর বাঙালিবাবু নানান আলাপ-আলোচনায় রাজদ্রোহিতা ছড়াচ্ছে। সারা বাংলা জুড়েই উত্তপ্ত রাজনীতির আবহাওয়া। এখনও সে রকম বড় কিছু হয়নি, তবে এই ধরনের বিষবৃক্ষের বিনাশ অঙ্কুরেই করা উচিত।

কার্জন বললেন, সেটা তো তোমারই কাজ।

ফ্রেজার বলল, এখনই ধরপাকড় করে আমি কোনও সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাই না। অন্য একটা ভাল উপায় আছে। পুলিশের কর্তা হিসেবে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে না পড়লেও, আমার মনে হয়, ঢাকা আর মৈমনসিং এই জেলা দুটোকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অসমের সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয় ? কিংবা অন্যভাবেও বাংলাকে ভাগ করা যায়। বাঙালিদের দুর্বল করে দিতে হলে বাংলাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়।

কার্জন ভ্রূকুঞ্চিত করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বাংলা ভাগ করলে কী লাভ হবে ?

ফ্রেজার বলল, মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে যদি আলাদা রাজ্য গড়া যায়, মুসলমানরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে না, তারা ইংরেজ বিরোধী নয়, তাতে হিন্দু-বাঙালিদের শক্তি কমে যাবে। এদিককার রাজ্যটি ছোট হয়ে গেলে বাঙালিবাবুদের কণ্ঠস্বর সারা ভারতে গুরুত্ব পাবে না।

এবারে কার্জন উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, হিন্দু আর মুসলমানদের পৃথক করে দেওয়ার এ একটা ভাল উপায় বটে, কিন্তু বাংলাকে ভাগ করা হবে কোন যুক্তিতে ?

ফ্রেজার বলল, কেন, যুক্তি তো তৈরি আছেই। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি রাজ্য হিসেবে বড্ড বড়, তাতে শাসনকার্য চালাবার খুব অসুবিধে। সিভিলিয়ানরা অনেক দিন থেকেই এ ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছে। বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব আগেও অনেকবার তোলা হয়েছে। এমনকী, আপনার আগে যিনি ছিলেন, সেই লর্ড এলগিনের কাছে একটা পরিকল্পনা পেশ করাও হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কিছুই করলেন না।

কার্জন জিজ্ঞেস করলেন, কেন লর্ড এলগিন সেটা বিবেচনা করলেন না, তা আমার জানা দরকার।

ফ্রেজার বললেন, তিনি হ্যাঁ-ও বলেননি, না-ও বলেননি। লর্ড এলগিনের এই তো এক দুর্বলতা ছিল, তিনি সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করতেন।

কার্জন টেবিলে এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন। লর্ড এলগিন আর লর্ড কার্জন এক নন। সিদ্ধান্ত নিতে লর্ড কার্জনের কখনও সাহসের অভাব হয় না। ডিভাইড অ্যান্ড রুল। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে

বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে, তার জন্য চাই পর্যায়ক্রমে নিখুঁত পরিকল্পনা। বাংলা ভাগ অতি উত্তম প্রস্তাব।

ফ্রেজার এবার উৎসাহ পেয়ে বলল, প্রায় বছর তিরিশেক আগে অসমকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সিলেট, কাছাড় আর গোয়ালপাড়া এই তিনটে বাংলাভাষী রাজ্য বাংলা থেকে কেটে অসমে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে বাঙালিরা আপত্তি করেনি। এখন শাসন কার্যের সুবন্দোবস্তের কথা বলে পূর্ব বাংলার জেলাগুলি নিয়ে আলাদা রাজ্য গড়লে বাঙালিরা বিশেষ আপত্তি জানাবার যুক্তি খুঁজে পাবে না।

কার্জন বললেন, আপত্তি জানালেই বা কানে তুলতে হবে কেন ? দেশ শাসন করছে কে, ইংরেজরা। তাদের ওপর বাঙালিবাবুদের কথা বলার কী অধিকার আছে ! তুমি ভাল করে পরিকল্পনা তৈরি করো।

এতই খুশি হলেন লর্ড কার্জন যে অবিলম্বে ফ্রেজারের পদোন্নতির আদেশ দিলেন। পুলিশের বড় কর্তা থেকে এক লাফে লেফটেনান্ট গভর্নর বা ছোট লাট হয়ে গেল অ্যান্ড্রু ফ্রেজার।

কার্জন স্বয়ং বেরুলেন পূর্ববঙ্গ পরিদর্শনে। প্রথমে এলেন মৈমনসিংহে, এখানকার প্রধান জমিদার সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরীকে লোকে বলে মহারাজ। এই প্রথম এক বাঙালি হিন্দুর প্রাসাদের আতিথ্য নিলেন লর্ড কার্জন। মেরিকে সঙ্গে আনেননি, এবারে তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনার সমর্থন আদায় করা। সরকারের এই উদ্দেশ্য বা চক্রান্তের কথা ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়ে গেছে, অধিকাংশ লোকেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বাঙালিদের মতামত না-নিয়েই বঙ্গদেশকে ভঙ্গ করা হবে ? বাংলার এক দিকে শুধু মুসলমান, এক দিকে শুধু হিন্দুরা থাকে, এমন তো নয়। হিন্দু ও মুসলমান সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে, কোনও কোনও জেলায় কোনও এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য। জন্মসূত্রে, ভাষার সূত্রে সবাই বাঙালি।

মৈমনসিং-এর মানুষ শত শত আবেদনপত্র জমা দিল কার্জনের কাছে। মহামান্য বড় লাটের কাছে তারা মিনতি জানাচ্ছে এই প্রস্তাব রদ করার জন্য। কার্জন সেই সব আবেদনপত্র বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। তাঁর কাছে এসবই যেন অবোধ শিশুদের কান্নাকাটি।

মহারাজের প্রাসাদে লর্ড কার্জনের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের সময় কার্জন যখন সূর্যকান্তকে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞেস করলেন সূর্যকান্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, তিনি এ পরিকল্পনা একেবারেই সমর্থন করেন না। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোথাও অশান্তি নেই, এই বিচ্ছেদ নীতি কোনও বাঙালিই মেনে নেবে না।

সূর্যকান্তর কথা শুনে এমনই বিরক্ত হলেন লর্ড কার্জন যে, সেই প্রাসাদে রাত্রিবাস করতেও রাজি হলেন না আর। সকালে এসে পৌঁছেছিলেন, বিকেলেই রওনা দিলেন ঢাকার দিকে।

ঢাকার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবাব সলিমুল্লা। তিনিও প্রকৃতপক্ষে নবাব নন। তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন অতি ধনী ব্যবসায়ী, ঢাকা এবং সন্নিহিত এলাকায় প্রচুর ভূসম্পত্তিতে অর্থলগ্নি করেছিলেন। তাঁর অনেক সদ্‌গুণ ছিল, তিনি হিন্দুদের কাছেও ছিলেন খুব জনপ্রিয়। তিনি হাসপাতাল ও অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, সেই সব কারণে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাধারণ মানুষই তাঁকে নবাব উপাধি দিয়েছিল। বর্তমান নবাব অবশ্য সেসব গুণের অধিকারী নন, উপরন্তু কিছু কিছু অবিবেচনার ফলে ঋণভারে জর্জরিত।

নবাবের এই ঋণগ্রস্ত অবস্থার কথা অ্যান্ড্রু ফ্রেজার আগেই লর্ড কার্জনকে জানিয়ে দিয়েছিল। কার্জন ঢাকায় এসেই নবাবকে সরকারের পক্ষ থেকে এক লক্ষ পাউন্ড ধার দেবার প্রস্তাব দিলেন। দেশের আর কোনও ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে এরকম অযাচিত ঋণ কখনও পায়নি। লর্ড কার্জনের এরকম অভূতপূর্ব উদারতার পেছনে উদ্দেশ্যটি প্রকট। নবাব সলিমুল্লা একেবারে বিগলিত হয়ে বড় লাটের আজ্ঞাবহ হয়ে গেলেন।

বঙ্গভঙ্গ খুব দ্রুত কার্যকর করা অবশ্য কার্জনের পক্ষে সম্ভব হল না। এর জন্য সেক্রেটারি অফ স্টেটের অনুমোদন প্রয়োজন। চিঠিপত্র চালাচালি চলছে, এর মধ্যে মেরিকে পাঠাতে হল ইংল্যান্ডে,

তিনি সন্তানসম্ভবা, তৃতীয়বার জননী হবেন। কিছুদিন পরেই সংবাদ এল, আর একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন বটে মেরি, কিন্তু তিনি নিজে গুরুতর অসুস্থ, তাঁর জীবনসংশয়। কিন্তু খবর পেলেও তৎক্ষণাৎ পৌঁছবার তো কোনও উপায় নেই। ভারত থেকে জাহাজে ইংল্যান্ডে পৌঁছতে অন্তত সতেরো দিন লাগে। এর মধ্যে কিছু অঘটন ঘটল না।

কার্জন ইংল্যান্ডে গিয়ে বসলেন স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে।

৭০

অসুস্থ শরীরে থিয়েটার দেখতে এসেছেন মহেন্দ্রলাল সরকার। থিয়েটার তাঁর নেশা। যখন নানারকম ব্যস্ততায় তাঁর নিশ্বাস ফেলারও সময় থাকত না, তখনও কোনও নতুন নাটক শুরু হলেই তিনি অন্য কাজ ফেলে রঙ্গালয়ে এক সন্ধ্যা ব্যয় করতেন। শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে থাকলে কর্মক্ষমতাই ধীরে ধীরে কমে যায়। মাঝে মাঝে মন অন্য দিকে ফেরাতে হয়। উত্তম নাট্য-অভিনয় দর্শনে মহেন্দ্রলালের মনে স্ফূর্তি আসে, কর্মের উদ্যম বাড়ে।

এখন অবশ্য মহেন্দ্রলাল এক এক করে বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিচ্ছেন। রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ, তাঁর অতি প্রিয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানেও আর নিয়মিত যেতে পারেন না। শরীর অশক্ত, হাঁটু দুটি দুর্বল হয়ে গেছে, তবু নাটক দেখতে আসা বন্ধ হয়নি।

এক হাতে ছড়ি, অন্য হাতে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাঁধে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন মহেন্দ্রলাল। দীনেন্দ্র এখন বসুমতী নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে, সেও নাটক-পাগল। মহেন্দ্রলালকে কলকাতার সব কটি রঙ্গমঞ্চের মালিক, ম্যানেজাররা বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তিনি আসবেন এই খবর পেলেই তাঁর জন্য দোতলার একটি বক্স রিজার্ভ করা থাকে।

ক্লাসিক থিয়েটার সম্প্রতি আবার নতুন করে সজ্জিত হয়েছে। পুরনো আসনের বদলে গদি মোড়া নতুন আসন, দেওয়ালে নতুন রং এবং একটি চমকপ্রদ অভিনব সংযোজন—বৈদ্যুতিক পাখা ! বৈদ্যুতিক আলো আগেই এসে গিয়েছিল, প্রেক্ষাগৃহ এখন আলোয় ঝলমল করে, এই স্বয়ংক্রিয় পাখা এসে একেবারে দর্শকদের শরীর জুড়িয়ে দিয়েছে। বিদ্যুতের নব নব ব্যবহার দেখে বিস্ময়ের আর অবধি নেই। এ যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দৈত্য, মানুষের হুকুমে বড় বড় কল-কারখানার বিশাল বিশাল যন্ত্রগুলি পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেয়। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, বড়লাটভবনে লর্ড কার্জন নাকি একটি যন্ত্র বসিয়েছেন, তার নাম লিফ্‌ট। সেই যন্ত্রটির মধ্যে একটি খোপ আছে, সেখানে মানুষজন ঢুকে দাঁড়ায়, আর যন্ত্রটি ওপরে উঠে যায়। সিঁড়ি না ভেঙেও দোতলায়, তিনতলায় ওঠা ! এর পর কোনও যন্ত্র বুঝি মানুষকে আকাশেও ওড়াবে। ইতিমধ্যে নড়া চড়া ছবি নিয়েও এক অদ্ভুত কীর্তি শুরু হয়েছে। মানুষ হাঁটছে, দৌড়চ্ছে, ঘোড়া ছুটছে, ঝরনা থেকে জল পড়ছে, সবই চলন্ত ছবিতে দেখা যায়। এমনকী যে মানুষটা মরে গেছে, তাকেও জীবন্ত দেখা যেতে পারে, সে হাসছে, কাঁদছে। থিয়েটারওয়ালারা অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে পাঁচ-দশ মিনিট সেই চলন্ত ছবি দেখায়।

আসন গ্রহণ করার পর কোটের বোতাম খুলে হাওয়া খেতে খেতে মহেন্দ্রলাল ওপরে ঘূর্ণমান বৈদ্যুতিক পাখার দিকে তাকালেন। মুগ্ধভাবে বললেন, হ্যাঁ হে দীনেন্দ্র, আগে আমরা থিয়েটার দেখতুম কী করে ? গরমে গতর সেদ্ধ হয়ে যেত।

দীনেন্দ্র বললেন, আগে যখন এ জিনিস ছিল না, এর অভাববোধও ছিল না। গরম লাগত ঠিকই। কত রাজা-মহারাজা, যাঁদের বাড়িতে টানা পাখার তলায় থাকা অভ্যাস, তাঁরাও তো গরম

সহ্য করে থিয়েটার দেখতে আসতেন।

মহেন্দ্রলাল বললেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুর মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে আসতেন, আহা দরদর করে ঘেমে নেয়ে একসা হতেন।

তারপর আপনমনে হেসে উঠে বললেন, তখন গরমের কষ্ট ভোলবার জন্য নাটকের মাঝে মাঝেই ধেই ধেই করে সখীদের নাচ জুড়ে দিত। সব নাটকেই ছ' সাতখানা মাগি নাচবেই। এখন লক্ষ করেছ, নাচ কত কমে গেছে। অকারণে আর নাচ থাকে না। নাটকগুলো বেশি সিরিয়াস হচ্ছে। তা হলে, তোমাদের এই সব নাটক যদি আর্ট হয়, তাকে প্রভাবিত করছে বিজ্ঞান।

দীনেন্দ্র বলল, আপনার এই থিয়োরিটা আগে ভেবে দেখা হয়নি।

বাজনা বেজে উঠল, মঞ্চের সামনের ভারী পর্দাটা একটু একটু করে গোটাতে শুরু করল। অপূর্ব দৃশ্যপট, যেন সত্যিকারের এক নিবিড় অরণ্য, তার মধ্যে এক ভগ্ন মন্দির। মঞ্চসজ্জা দেখেই দর্শকরা চটাপট হাততালি দিয়ে উঠল।

ক্লাসিক থিয়েটার এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। উচ্চাভিলাষী অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা থিয়েটারও দখল নিয়ে এক সঙ্গে দুটি রঙ্গমঞ্চ চালাচ্ছে। নাট্যজগতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গিরিশচন্দ্রকে সে ফিরিয়ে এনেছে, ফিরে এসেছে দানি। শুধু নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক নন, গিরিশচন্দ্র আবার অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয়ও করছেন।

নাটকের নাম 'ভ্রান্তি'। কাহিনীর পটভূমিকা ঐতিহাসিক, রাজশাহির জমিদার উদয়নারায়ণ বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, কিন্তু সেই ইতিহাস এখানে প্রাধান্য পায়নি। মানব চরিত্রের জটিলতাই এর মূল উপজীব্য। মানুষের জীবনের কত অশান্তি, কত দ্বন্দ্ব, কত অবিশ্বাস, কত আত্মযাতনা তৈরি হয় নিছক ভুল বোঝাবুঝির জন্য, সেটাই ঘটনা পরম্পরায় প্রতিফলিত হয়েছে।

নিরঞ্জন আর পুরঞ্জন নামে দুটি যুবকের চরিত্রে নেমেছে অমরেন্দ্রনাথ আর দানিবাবু, গিরিশচন্দ্র সেজেছেন রঙ্গলাল। সেই নায়ক দু'জনের সঙ্গে যেন সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র। নাটক দেখতে দেখতে শুধু মুগ্ধ নন, খানিকটা অবিশ্বাস মিশ্রিত বিস্ময়ও বোধ করলেন মহেন্দ্রলাল, এ কী চরিত্র রচেছেন গিরিশ! সাধারণত করুণরস, ভক্তিরস কিংবা রুদ্ররসেই তাঁর হাত খোলে। পরপর দু' তিনটি নাটকে টিকিট বিক্রি আশানুরূপ না হলে তিনি একটি ভাঁড়ামির পঞ্চরংও নামিয়ে দেন। কিন্তু এই রঙ্গলাল যে সম্পূর্ণ অন্যরকম, যেন এক উদাসীন, আত্মসুখবিমুখ মানুষ, এ চরিত্রে জনপ্রিয় হবার মতন কোনও গাঢ় রং নেই।

এক দৃশ্যে গঙ্গা নাম্নী এক বারবনিতাকে নিয়ে রঙ্গলাল এসেছে মন্দিরে। দেবীমূর্তির সামনে বসেছে দু'জনে। এই বারবনিতাকে প্রকৃত মানবীর সম্মান দিয়েছে রঙ্গলাল। দেবীমূর্তির সামনে বলছে, অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না। ...আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়; আমার দেবতার প্রাণ আছে; আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না। সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর!

গঙ্গা প্রশ্ন করল, কে তোমার দেবতা শুনি!

রঙ্গলাল বলল, মানুষ আমার দেবতা!... আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ— যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞেস করতে হয় না, ভাল করেছি না মন্দ করেছি। যে দেবতার পূজায় কোনও শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই।

মহেন্দ্রলালের দু' চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে।

তিনি ধরা গলায় বললেন, ওহে, গিরিশের হল কী! সে কট্টর কালীসাধক, এখন মূর্তিপূজার বদলে মানবসেবার কথা বলছে! তার এ কী পরিবর্তন?

দীনেন্দ্র বললেন, আজ্ঞে, এ তো নাটকের সংলাপ! নাট্যকারকে কত রকম চরিত্র তৈরি করতে হয়। তাদের মুখে মানানসই কথা বসিয়ে দেয়, তা বলে কি নাট্যকার নিজের জীবনে সব মানে?

মহেন্দ্রলাল বললেন, না, না, এ যেন গিরিশেরই মনের কথা। অভিনয় করছে মনে হয়? গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছে।

দীনেন্দ্র বললেন, দেখুন গে, এখনও হয়তো উনি রোজ পুজো আচ্চা করেন!

এর পরেও, রঙ্গলাল যখন অন্যের জন্য প্রাণ দিতে যাচ্ছে, তখন বিস্মিত মুর্শিদকুলি খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার ধর্মের জন্য এরকম প্রাণ দিচ্ছ? তার উত্তরে রঙ্গলাল বলল, নবাব সাহেব, যে ধর্মের জন্য পরের কাজ করে, সে নিজেকে ঠিক মতন বিলিয়ে দিতে পারে না।

নাটক শেষ হতেই মহেন্দ্রলাল বললেন, দীনু, চলো চলো, গিরিশের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

গিরিশ ইদানীং আর সকলের সঙ্গে দেখা করেন না। প্রত্যেকদিন অভিনয়ের শেষে কিছু দর্শক ভিড় করে আসে, ওদের চাটুকারিতা শোনার ধৈর্য বা লোভ গিরিশের নেই। মঞ্চে দাপাদাপি করার পর তিনি ক্লান্ত বোধ করেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন নিজস্ব একটি ছোট কক্ষে। বিশিষ্ট লোকদেরও সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু মহেন্দ্রলালকে আটকাবে কে? বৃদ্ধ হলেও তো সিংহের জাত তিনি। ওহে গিরিশ, গিরিশ কোথা গেলে। এই হুংকার শুনে গিরিশচন্দ্র নিজেই দরজা খুলে দিলেন।

ঘরের মধ্যে এসে মহেন্দ্রলাল বললেন, সুরার পাত্র কোথায়? শুধু তামাক টানছ দেখছি?

গিরিশ বললেন, কেন, তোমার পান করবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি? তা হলে আনাই।

মহেন্দ্রলাল বললেন, হুং, এতকাল ধরাতে পারোনি, এখন মরার কালে এসে মাতাল হব?

গিরিশ বললেন, আমিও আজকাল আর প্রত্যহ খাই না। আমারও তো বয়েস কম হল না।

মহেন্দ্রলাল বললেন, বাঃ, বেশ কথা। তোমার সত্যি সত্যি পরিবর্তন হয়েছে দেখছি। নাটকখানিতেও নতুন কথা বলেছ!

গিরিশ বললেন, বসো, বসো! নাটক কেমন দেখলে বলো।

মহেন্দ্রলাল বললেন, অতি সরেস। প্রাণ জুড়িয়েছে। এখনও তোমার লেখার বেশ জোর আছে। এখনও তুমি টায়ার্ড হওনি। রঙ্গলাল আর গঙ্গাবাঈ-এর চরিত্রজুটি একেবারে অরিজিনাল। রঙ্গলালের মুখ দিয়ে তুমি কী কথা শোনালে! চোখে জল এসে গিয়েছিল গো।

গিরিশ হেসে বললেন, ডাক্তার, তোমাকে খুশি করা অতি সহজ। তোমার মতামতের কোনও দাম নেই। তুমি তো নাটক দেখতে বসলেই হাপুস নয়নে কাঁদো। আজও দেখছি তোমার কোটের আস্তিন ভিজে গেছে।

মহেন্দ্রলাল বললেন, নাটক দেখে মোটেই কাঁদি না। কাঁদি আমি গান শুনে। অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখে কাঁদি। অভিনয় যখন সত্যিকারের আর্ট হয়ে ওঠে, তখন তা আমাকে কাঁদায়। তোমাদের নাটকগুলি অধিকাংশই রাবিশ! ভেতরে ভুষিমাল। হয় ছেঁদো প্রণয়, নয় ভক্তিরসের বাড়াবাড়ি। তবে এ নাটকখানির বাঁধুনি ভাল। মন দিয়ে লিখেছ, তাই না? আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করো, সঙ্গে দীনু এসেছে, যে সে লোক নয়, সুসাহিত্যিক, একখানা ম্যাগাজিনের এডিটর। তার কেমন লেগেছে শোনো?

দীনেন্দ্রকুমার বললেন, সত্যি অপূর্ব হয়েছে। রঙ্গলাল চরিত্রটি আপনার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। এমন স্বার্থত্যাগ, বাঙালি একবার চোখ খুলে দেখবে কি! একদিকে স্বার্থ-হিংসা দ্বেষ, আর একদিকে স্বর্গের পবিত্রতা। এই রঙ্গলালের চরিত্রের কাছে অধঃপতিত বাঙালির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। রঙ্গলালের একটা সংলাপ আমার একবার শুনেই মুখস্থ হয়ে গেল, শুনবেন? 'সংসার যে সাগর বলে, একথা ঠিক। কূলকিনারা নাই। তাতে একটি ধ্রুবতারা আছে, দয়া। দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে কেউ নবাবও হয় না, বাদশাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটি প্রত্যক্ষ, তর্ক-যুক্তির দরকার নাই!'

গিরিশ বললেন, সত্যি মুখস্থ করেছেন দেখছি।

মহেন্দ্রলাল ঝুঁকে গিরিশের কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, তোমার কী হল হে? মাঝখানে ধর্ম নিয়ে খুব পাগলামি করেছিলে, পুজো-আচ্চা, অবতারবাদ এই সব নিয়ে কত মুখামিই না করেছ। কতবার বলেছি, কালী নামে ওই ন্যাংটা মাগিটার পুজো বন্ধ করো। লেখাপড়া শিখেও বর্বরের মতন একখানা

ওই বীভৎস মূর্তির সামনে নাচানাচি করতে তোমাদের লজ্জা ছিল না। হঠাৎ কী করে তোমার এমন সুমতি হল! মূর্তিপূজার বদলে মানবধর্ম। মানবসেবা!

গিরিশ বললেন, ডাক্তার, তোমার এই এক দোষ। তোমার মুখের লাগাম নেই। অসংখ্য লোক যে মূর্তিকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে, তা নিয়ে অত খারাপ কথা বলতে যাও কেন? তুমি মানো না, ঠিক আছে। সেটা তোমার মনের মধ্যে রাখো!

মহেন্দ্রলাল হুংকার দিয়ে বললেন, না, আমি বলবই! আমার যা বিশ্বাস, তা আমি বলতে ছাড়ব কেন? এত ঠাকুর-দেবতায় ভক্তিই তো দেশটার সর্বনাশ করছে! তুমি আর একটা কথাও বড় খাসা লিখেছ। ধর্মের নামে যারা সেবা করে তারা নিঃস্বার্থ নয়। অনেকে মনে করে, কিছু দান-ধ্যান, মানবসেবা করলে ধর্মকর্ম হবে। পুণ্য হবে। সেই পুণ্যের জোরে স্বর্গে যাবে। স্বর্গে গিয়ে দেবীদের পাশে বসতে পাবে, উর্বশী-মেনকা-রম্ভার মতন স্বর্গের বেশ্যারা এসে কোলে শোবে। যত্ত সব ধ্যাস্টামো!

গিরিশ বললেন, আমার নাটক দেখে কি আর মানুষ শোধরাবে? আমার মনে এসেছে, তাই লিখে গেছি!

মহেন্দ্রলাল বললেন, সেইজন্যই তো বলছি, তোমার মনের একটা পরিবর্তন এসেছে।

দীনেন্দ্র বললেন, গানগুলিও অনবদ্য হয়েছে। 'নেই তো তেমন বনে কুসুম, মনে যেমন ফোটে ফুল', আহা!

মহেন্দ্রলাল বললেন, হ্যাঁ হে গিরিশ, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব, অনেকদিন ধরে ভাবছি। তুমি আবার ক্লাসিকে ফিরে এলে কোন মুখে? থিয়েটারের নট-নটীদের কি মানসম্মান থাকতে নেই। ক্লাসিকের মালিক এই অমর ছোঁড়াটার সঙ্গে তোমার মামলা মোকদ্দমা হল, সে তোমায় কত গালমন্দ করল, কত কুচ্ছিত কটু-কাটব্য, কাদা ছোঁড়াছুড়ি, এখন দেখছি দুজনে আবার বেশ গলাগলি!

গিরিশ বললেন, কী করব, অমর নিজেই মামলা তুলে নিল, আমার বাড়িতে গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল।

মহেন্দ্রলাল বললেন, তার এত দেমাক, তবু সে ক্ষমা চাইতে গেল কেন হঠাৎ!

গিরিশ বললেন, আমার কাছে তার সব দেমাক চূর্ণ হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে গিয়ে যখন কান্নাকাটি করতে লাগল, তখন আমি বললুম, শুধু চুপিচুপি আমার বাড়িতে এসে ক্ষমা চাইলে তো হবে না, পাঁচজনকে জানাতে হবে। সর্বসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে। তখন সে হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করলে। পাছে সে আবার ভুলে যায়, সেইজন্য ওই দ্যাখো দেওয়ালে সেই একখানা হ্যান্ডবিল সেঁটে রেখেছি।

বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হ্যান্ডবিলটিতে লেখা রয়েছে: নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাংলায় যে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র! প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত! তাহার মধ্যে আমি একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া, নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম—বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আমাকে আবার টানিয়া লইয়াছেন। ...

গিরিশচন্দ্র বললেন, কেন অমর আমার কাছে ক্ষমা চাইতে গেল, তা নিয়ে আমার মনেও খটকা ছিল। আসল কারণটি পরে জেনেছি। একটি মেয়ে তাকে জোর করে পাঠিয়েছিল।

মহেন্দ্রলাল বললেন, মেয়েমানুষের কথা পুরুষে শোনে? এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার। বউ নয় নিশ্চয়, বাঙালি ব্যাটাছেলেরা তো বউদের গ্রাহ্যই করে না। বউদের লাথি-ঝাঁটা মেরে বীরত্ব ফলায়। কোনও পেয়ারের মাগি বুঝি?

গিরিশচন্দ্র বললেন, না, তাও নয়। সে বেটি এই থিয়েটারেরই একজন অ্যাকট্রেস। তুমি নাম শুনলেই চিনবে। সে বড় আজব চিড়িয়া। আমি এত বছর ধরে থিয়েটারের কত মেয়েমদ্দকে চরিয়েছি, এমনটি কখনও দেখিনি। তার রূপ-যৌবন আছে, তবু সে কারুর রক্ষিতা হয় না। কোনও পুরুষের সঙ্গে ঢলানি করে না। অথচ তার কী তেজ! সে অমরকে বলেছিল, গিরিশবাবুকে অপমান করার ফলে ক্লাসিকের স্টেজ অপবিত্র হয়ে গেছে, সে নিজেও এখানে আর পা দেবে না। যতদিন আমি বাইরে ছিলাম, সেও অ্যাক্টিং করেনি, বাড়িতে বসে ছিল। তাতেই অমরের টনক নড়ল, টিকিট বিক্রি কমে আসছিল। সেই মেয়েটার জেদের জন্যই অমর ছুটে গেল আমার কাছে।

দীনেন্দ্র বলল, ওদিকে মিনার্ভার মালিকের সঙ্গেও তো আপনার আর বনছিল না। মিনার্ভার তখন পড়তি অবস্থা।

মহেন্দ্রলাল বললেন, সে মেয়েটি কে? শুনি, শুনি।

গিরিশ বললেন, তাকে ডাকব? দেখি ইতিমধ্যে সে বাড়ি চলে গেছে কি না। ওরে কে আছিস, একবার নয়নমণিকে এখানে আসতে বল তো!

নয়নমণি ততক্ষণে মেক আপ ধুয়ে, বসন বদল করে বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল, লোকজনদের হাঁকডাকে তাকে ফিরতে হল। গিরিশচন্দ্রের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল, শরীরে একটিও অলঙ্কার নেই, সাধারণ শাড়ি পরা। এখন তাকে মঞ্চনটী বলে মনে করার কোনও উপায় নেই।

দীনেন্দ্র বলল, এ তো দুর্দান্ত অভিনয় করে, আজকের নাটকেও ফাটিয়েছে!

মহেন্দ্রলাল চশমা খুলে নয়নমণির সর্বাঙ্গ ভাল করে দেখলেন। তারপর কপট বিষাদের সঙ্গে বললেন, আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তবু এমন রমণীরত্ন দেখলে আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। সে কী আর আমার অদৃষ্টে আছে! কী গো, এই বুড়োকে বিয়ে করবে?

নয়নমণি ফিক করে হেসে বলল, হ্যাঁ। রাজি আছি।

মহেন্দ্রলাল ভুরু তুলে বললেন, অ্যাঁ রাজি? মন্তর পড়ে তো আর বিয়ে করতে পারব না। বাড়িতে একখানা জাঁহাবাজ গিন্নি আছে, সে ঝাঁটাপেটা করবে। তাহলে বলো, দমদমের দিকে একটা বাগানবাড়ি কিনি, সেখানে গান্ধর্বমতে মালাবদল হোক! কী?

নয়নমণি বলল, তাতেও রাজি!

মহেন্দ্রলাল সগর্বে গিরিশের দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে? তবে? তুমি যে বললে, ও কারুর সঙ্গে থাকতে রাজি হয় না!

গিরিশ বললেন, তুই যে আমাকে ডোবালি নয়ন! শুনেছি এতকাল ধরে কোনও পুরুষকেই তোর পছন্দ হয়নি। আর আজ এই বুড়োকে দেখে তোর মন মজে গেল? তুই ওঁকে চিনিস?

নয়নমণি বলল, ওঁকে কে না চেনে? উনি যেদিন থিয়েটার দেখতে আসেন, সবাই তটস্থ হয়ে থাকে, কারুর অ্যাক্টিং-এ সেদিন খুঁত থাকে না। ওঁর মতন এমন বিরাট মানুষ তো আর কেউ আমার মতন সামান্য মেয়েকে আগে চাননি!

মহেন্দ্রলাল ডান বাহু ভাঁজ করে মাস্‌ল টিপে বললেন, এখনও তাগদ আছে। ইচ্ছে করলে এই বুড়ো হাড়েই ভেলকি দেখাতে পারি, বুঝলে গিরিশ! তা হলে ওইটাই ঠিক থাকল তো?

নয়নমণি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

দীনেন্দ্রকুমার প্রাণ খুলে হাসছেন।

মহেন্দ্রলালও এবার হাসতে হাসতে বললেন, এ বেটির রসবোধ আছে। আমার কথা শুনে প্রথমেই চক্ষু ছানাবড়া করেনি! হ্যাঁ গা, গিরিশবাবুর হয়ে তুমি নাকি অমরবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে? থিয়েটারের নট-নটীদের মধ্যে এমন গুরুভক্তির কথা তো আগে কক্ষনও শুনিনি!

গিরিশ বললেন, আমি ওর তেমন গুরু নই। ও অর্ধেন্দুর হাতে গড়া।

নয়নমণি বলল, আপনি সকলের গুরু।

মহেন্দ্রলাল বললেন, থিয়েটারের মেয়েদের নিয়ে কত লোকে এখনও কত কুকথা বলে। অথচ এমন মেয়েও তো আছে! অভিনেত্রী হলেই কদর্য জীবন যাপন করতে হবে কেন? বিদ্যেসাগরমশাই

বেঁচে থাকলে এই নয়নমণিকে একবার তাঁর সামনে নিয়ে গিয়ে দেখাতুম !

গিরিশ বললেন, এ মেয়েটাকে এত প্রশংসা করবেন না। ওর দোষও আছে। ওর সামনে একটু মুখ আলগা করার উপায় নেই। আমাদের শ-কার ব-কার করা বরাবরের অভ্যেস, যখন তখন মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। ভাল করে ধাতানি না দিলে এখানে অনেকে বোঝেও না। নয়নমণির সামনে একটু মুখ খিস্তি করলেই ও মুখ ভার করে উঠে যায়। রিহার্সালও দিতে চায় না। ওকে বুঝিয়ে দাও যে থিয়েটারের অন্দরমহলটা বেম্মদের আখড়া নয় !

মহেন্দ্রলাল বললেন, এটা ওর দোষ হল !

গিরিশ বললেন, ওর আর একটা দোষ, ও পুরুষদের সঙ্গে মেশে না, মেয়েদের নিয়ে ঘোঁট পাকায়। অন্য কোনও মেয়েকে বকাবকি করলেও নয়নমণি আগ বাড়িয়ে এসে বলে, কেন, কেন, ও কী অন্যায় করেছে ? একদিন অমর গুলফম হরিকে একটা থাবড়া মেরেছিল। মাঝে মাঝে এক কথা সাতবার বললেও না বুঝলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। আমিও দু-একটা চড় থাপ্পড় মারি। নয়নমণি তাতেই গোঁসা করে বসল। মেয়েছেলের গায়ে কেন হাত তোলা হয়েছে ? বোঝো মজা, থাবড়া খেল গুলফম হরি, সে রাগ করল না, কিন্তু এই নয়ন বেঁকে বসে থাকল, সেদিন সে স্টেজে নামবে না।

মহেন্দ্রলাল মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ, এটাও একটা দোষের কথা বটে !

গিরিশচন্দ্র বললেন, সেদিনের শো বন্ধ হওয়ার উপক্রম। নয়নমণি না থাকলে দর্শক খেপে যাবে। আমি যত বোঝাই কিছুতে শোনে না। শেষ পর্যন্ত অমরকে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হল।

দীনেন্দ্রকুমার বললেন, শুনে ভারী আশ্চর্য লাগছে। অমরেন্দ্রনাথকে দর্পী মানুষ বলেই সবাই জানে। কথায় কথায় কতজনকে তাড়িয়ে দেয়। অনেক সামান্য কারণে নাম করা নট-নটীদের দূর করে দিয়েছে। তবু সে নয়নমণির কথা বারবার শোনে কেন।

গিরিশ বললেন, এ মেয়েকে যে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা উচ্চারণও করা যায় না। নিজে থেকেই বার বার বলে, চলে যাব, চলে যাব ! যে শাস্তির ভয় পায় না, তাকে শাস্তি দেওয়া বড় শক্ত !

মহেন্দ্রলাল উঠে এসে নয়নমণির থুতনি ধরে উঁচু করে বললেন, তোর তো দেখছি অনেক দোষ। তুই থিয়েটারে কেন যোগ দিতে এলি পাগলি ? তোর তো যোগিনী সন্ন্যাসিনী হওয়ার কথা ছিল !

নয়নমণি কপালে একটা আঙুল ছুঁয়ে নম্র কণ্ঠে বলল, নিয়তি আমাকে এখানে টেনে এনেছে।

মহেন্দ্রলাল বললেন, হয় তোর জেদের জন্য এই থিয়েটারের ভেতরকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, নয়তো তুই আর বেশিদিন এখানে টিকতে পারবি না। আর একদিন এসে তোর নিয়তির গপ্পো শুনব। এখন আর দেরি করতে পারছি না, বাড়িতে গিয়ে গাদাগুচ্ছের ওষুধ খেতে হবে। কই হে দীনু, চলো এবার।

গিরিশও উঠে এলেন মহেন্দ্রলালকে খানিকটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য।

ফাঁকা মঞ্চটা পার হয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেন মহেন্দ্রলাল। তাঁর হাতের ছড়িটা খসে পড়ল, ধপ করে বসে পড়ে তিনি জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন।

কী হল, কী হল, বলে সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল। ছুটে এল আরও অনেকে। কেউ বলল, শুয়ে পড়ুন ! কেউ বলল, ডাক্তার ডাক। কেউ বলল, অমরবাবুকে খবর দে।

চক্ষু মুদে রয়েছেন মহেন্দ্রলাল। নিজের বুকে হাত বুলোচ্ছেন। নিশ্বাস পড়ছে হাপরের মতন। একটু পরে চক্ষু খুলে দম নিতে নিতে বললেন, ডাক এসে গেছে বুঝতে পারছি। শরীর আর বইছে না।

গিরিশ বললেন, সারাটা জীবন অন্য মানুষদের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গেলে, নিজের শরীরটার দিকে নজর দাওনি। এত রাত্তিরে তো ডাক্তার পাওয়া যাবে না, তুমিই বলে দাও, এখন কী করা উচিত। এই অবস্থায় কি বাড়ি ফেরা ঠিক হবে ?

নয়নমণি মহেন্দ্রলালের পায়ের কাছে বসে পড়েছে।

তার দিকে চেয়ে, এই অবস্থাতেও হাসার চেষ্টা করে মহেন্দ্রলাল বললেন, ব্যথা হচ্ছে আমার বুকে, তুই আমার পা টিপে কী করবি ? তাতে কিছু সুরাহা হবে ?

নয়নমণি বলল, আপনি কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমরা আপনার একটু সেবা করতে পারি না ?

মহেন্দ্রলাল বললেন, আমি কারুর সেবা চাই না। আমি যখন মরব, তখন কোনও নিরালা নির্জন স্থানে একা গিয়ে শুয়ে থাকব। কেউ জানবে না। মানুষের কান্নাকাটি, আহা-উহু, ফোঁসফোঁসানি আমি সহ্য করতে পারি না একেবারে !

কোনওক্রমে তিনি আবার উঠে দাঁড়ালেন। ছড়িতে ভর দিয়ে খানিকটা টলমলভাবে এগিয়ে গেলেন বাইরের দিকে।

৭১

সার্কুলার রোডের আখড়া তো ভেঙে গেছে বটেই, একদিন গ্রে স্ট্রিটের আড্ডা থেকেও বারীন্দ্র অদৃশ্য হয়ে গেল। কারুকে কিছু জানিয়ে যায়নি সে, তবু যত দূর মনে হয় সে বরোদায় তার দাদার কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে গেছে। গুপ্ত সমিতির বাকি সদস্যদের দিশাহারা অবস্থা, কর্ণধারহীন তরণীর মতন সে সমিতি টলমল করতে লাগল, ডুবতে বেশি দেরি হল না। অরবিন্দ ঘোষ আর কোনও নির্দেশ পাঠায়নি, সে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

দেশের কাজ করার জন্য যে-সব যুবকেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারা একে একে ফিরতে লাগল ঘরে। কেউ কেউ জীবিকার সন্ধানে ব্যাপৃত হল, যাদের সে সমস্যা নেই, তারা ভাবল, এবার একটা বিবাহ করলে মন্দ হয় না। ঘরেই যদি ফিরতে হয়, তা হলে আর সংসারধর্ম গ্রহণ করতে আপত্তি কী !

শুধু ভরতেরই কোনও ঘর নেই, তার ফেরার কোনও নির্দিষ্ট স্থান নেই।

হেম কানুনগো ফিরে যাচ্ছে মেদিনীপুরে, সে ভরতকে বলল, বন্ধু, তুমিও চল আমার সঙ্গে। একা একা আর কোথায় ঘুরবে ? কলকাতা শহরটা একা থাকার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়।

ভরত বলল, তোমার বাড়িতে গিয়ে কি সারাজীবন অতিথি থাকব ? সেটা কিছু দিন পরেই উপদ্রবের মতন মনে হবে।

হেম বলল, আমি উপদ্রব মনে করি বা না করি, বেশি দিন অতিথি থাকা তোমার আত্মসম্মানের পক্ষেই হানিকর। আমি অন্য একটা প্রস্তাব দিতে পারি। মেদিনীপুর শহরের ঠিক বাইরেই আমাদের একটি খামারবাড়ি আছে। কিছুটা ধানজমি, ফলের বাগান, একটা ছোট বাড়ি। পৈতৃক সম্পত্তি, ওটা আমার ভাগে পড়েছে। তুমি ওখানে গিয়ে থাকো না কেন।

ভরত কিছু বলতে যেতেই তাকে বাধা দিয়ে হেম আবার বলল, না, না, দান নয়, আতিথ্যও নয়। ওই খামারে আমার বিশেষ যাওয়া হয় না, দেখাশুনো করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অনেক দিন ধরেই ওটা বেচে দেবার কথা ভেবেছি। তুমিই কিনে নাও বরং, সব টাকা একসঙ্গে দিতে না পারলে ক্রমে ক্রমে শোধ করবে।

ভরত ইতস্তত করে বলল, ভাই হেম, আমি গ্রামে কখনও বসবাস করিনি। কিছু দিন পরেই যদি মন উচাটন হয় ?

হেম বলল, মেদিনীপুর শহরটাকেও তুমি গ্রাম ভাবো নাকি ? ওই খামার থেকে শহর মোটে আধ ঘণ্টার পথ। শহরে অনেক শিক্ষিত লোক আছে, ভাল লাইব্রেরি আছে। তা ছাড়া আমাদের

মেদিনীপুরের সমিতি তো ভাঙেনি, সেখানে তুমি কথা বলার লোক অনেক পাবে।

ভরত তবু রাজি হল না। সে বলল, কয়েকটা দিন ভেবে দেখি। তুমি যাও, তোমাকে আমি চিঠি লিখব।

কিন্তু কলকাতার মেসবাড়িতে কয়েকদিনের মধ্যেই ভরতের মন ছটফটিয়ে উঠল। এখানকার একটি লোকের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা হয়নি। সে নিজেই কারুর সঙ্গে মেশে না বলে অন্যরা তার দিকে বাঁকা চোখে চায়। সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে দু'-একজন নিচু গলায় মন্তব্য করে। সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যেও তো বসে থাকা যায় না! মাঝে মাঝে ট্রামে চেপে ঘুরে বেড়ায়। ট্রামের জানলার ধারে বসে নগর-দর্শন করে এখন অনেকেই।

ত্রিপুরা থেকে ভরত যখন প্রথম কলকাতায় আসে, তখন কলকাতা শহরের যে রূপ ছিল, তার সঙ্গে এখনকার কত তফাত! অথচ খুব বেশি দিনের তো কথা নয়। নতুন শতাব্দী এসে হঠাৎ যেন সব কিছু বদলে দিয়েছে। তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছিল বটে, কিন্তু বেশি লোক চড়ত না। দু' ঘোড়ায় টানা ছ্যাকড়াগাড়িগুলো ছুটত আরও জোরে। মহিলাদের ট্রামে ওঠার প্রশ্নই ছিল না, তারা যেত পাল্কিতে। ধনী ব্যক্তিদের ছিল জুড়িগাড়ি, চৌঘুড়ি গাড়ি। এখন বৈদ্যুতিক ট্রাম খুব জনপ্রিয়, দুপুরের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া ফাঁকা পাওয়াই যায় না। পাল্কির সংখ্যা খুবই কমে গেছে, ছ্যাকড়া গাড়িগুলোরও নাভিশ্বাস উঠেছে। বড়মানুষেরাও এখন ঘোড়ার গাড়ির বদলে মোটর গাড়ি চড়ে।

হাজার হাজার ঘোড়া বাতিল হয়ে যাচ্ছে, এগুলোর কী হবে? কাজে লাগাতে না পারলে ঘোড়াদের তো কেউ দানাপানি দেবে না! শুধু ঘোড়া কেন, বিদ্যুৎ এসে কত মানুষকেও বেকার করে দিয়েছে। সংবাদপত্রে বেরোয়, কত ছ্যাকড়া গাড়ির মালিকদের গালে হাত, কয়েক হাজার গাড়োয়ান পথে বসেছে। পাল্কিবাহকরাই বা এখন কী করবে? শুধু তাই নয়, যে-কোনও সচ্ছল পরিবারের বৈঠকখানাতেই ছিল টানা-পাখা, অন্তত দু'জন পাংখাপুলার নিযুক্ত করা হত, তারা পালা করে পাখা টানত। সেই সব পেল্লায় টানা-পাখা খসিয়ে এখন ঘরে ঘরে বসানো হচ্ছে বৈদ্যুতিক পাখা। পাংখাপুলারদের মাইনে দিয়ে রাখার চেয়ে বৈদ্যুতিক পাখার খরচ অনেক শস্তা। শুধু তাই নয়, পাংখাপুলাররা কাজে গাফিলতি করে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু বিদ্যুৎ ক্লান্ত হয় না, ঘুমোয় না, মাথার ওপর এই পাখা সর্বক্ষণ বনবন করে ঘোরে। রাত্রে অনেক রাস্তায় এখনও গ্যাসের বাতি জ্বলে বটে, কিন্তু কোনও কোনও রাস্তায়, বিশেষত সাহেব পাড়ায়, সন্ধে হতে না হতেই ঝলমল করে বৈদ্যুতিক বাতি।

ট্রামে চেপে ঘুরতে ঘুরতে ভরত অনুভব করে, বিদ্যুৎ নামে পরমাশ্চর্য শক্তিটি এসে অনেক লোকের জীবিকা হরণ করেছে বটে, কিন্তু কলকাতা শহরটি আগের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে। আগে পাল্কি, ছ্যাকড়া গাড়ি আর ঝাঁকামুটেদের দৌড়োদৌড়িতে রাস্তাঘাটে সব সময় বিশৃঙ্খলা থাকত, এখন যানবাহন অনেক দ্রুত গতিতে চলে। ফুটপাথ বাঁধানো হচ্ছে বলে পথচারীরা তার ওপর দিয়ে হাঁটে, জনস্রোতের প্রবাহ অনেক সুশৃঙ্খল মনে হয়।

দিনের পর দিন তো আর ট্রামে বসেও সময় কাটানো যায় না। একদিন থিয়েটার দেখতে গেল, সে অভিজ্ঞতাও সুখকর হল না ভরতের। ক্লাসিক থিয়েটারে সে কিছুতেই যাবে না, গিয়েছিল স্টার থিয়েটারের প্রতাপাদিত্য পালা দেখতে। কিন্তু প্রধানা অভিনেত্রীকে দেখেই তার মনে পড়ে গেল ভূমিসুতার কথা! এ নায়িকার সঙ্গে ভূমিসুতার মুখশ্রীর মিল নেই, কিন্তু একই রকম সাজপোশাক, কথা বলার ভঙ্গিতেও যেন বিখ্যাত অভিনেত্রী নয়নমণির অনুকরণ। মাঝপথে উঠে চলে এসেছিল ভরত।

ভূমিসুতা তার সঙ্গে কথা বলেনি, তার দিকে চক্ষু তুলে চায়নি পর্যন্ত। ভূমিসুতা তার কেউ না। আর কোনও দিন তার সঙ্গে দেখা হবে না। তবু বুক পোড়ে কেন! কেন হঠাৎ হঠাৎ চক্ষু জ্বালা করে ওঠে!

এই লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন নিয়ে ভরত কী করবে?

এই একটা বছর গুপ্ত সমিতির সঙ্গে মেতেছিল, বেশ একটা উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। মনে

হয়েছিল, একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনটা যদি হঠাৎ চলেও যায় তো যাবে। এত উদ্যোগ অতি তুচ্ছ রেষারেষিতে নষ্ট হয়ে গেল!

ভরত গ্রামে যেতে পারেনি, কিন্তু শহরের জীবনের সঙ্গেও সে খাপ খাওয়াতে পারছে না। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চিন্তা করলেই একটা দারুণ সঙ্কোচ তাকে পেয়ে বসে। যাদুগোপাল এখন ব্যস্ত ব্যারিস্টার, তার কাছে গেলে তাকে বিব্রত করা হবে। দ্বারিকা সমৃদ্ধ জমিদার, সে অবশ্য তেমন ব্যস্ত নয়, দেখা হলে খাতির করে, কিন্তু দ্বারিকার স্ত্রীর রহস্যময় কথাবার্তা শুনলেও অস্বস্তিবোধ হয়। তা ছাড়া, দ্বারিকার কাছে গেলে সে ভূমিসুতার প্রসঙ্গ তুলবেই। অন্য বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়ে গেছে ঠিক নেই।

একদিন ট্রামে যেতে যেতে ভরত শুনল সামনের দু'জন ব্যক্তি দার্জিলিং বিষয়ে আলোচনা করছে। শিগগিরই তারা দল বেঁধে দার্জিলিং বেড়াতে যাবে, কখন ট্রেন ছাড়ে, কত রাহাখরচ, দার্জিলিঙে গিয়ে থাকার সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল। এমন অনেক কথা মানুষকে শুনতে হয়, যাতে তার কোনও প্রয়োজন নেই। জনসাধারণের গাড়িতে দু'জন পরিচিত ব্যক্তি কারুর অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে এমনভাবে চেঁচিয়ে আলোচনা করে, যা অন্যরা শুনতে বাধ্য। এই লোক দুটি দার্জিলিং যাবে, তার বিবরণ ভরত শুনতে যাবে কেন? কান বন্ধ করারও তো কোনও উপায় নেই।

শুনতে শুনতে এক সময় ভরতের মনে হল, তা হলে আমিও দার্জিলিং ঘুরে আসতে পারি। যাওয়া তো শক্ত কিছু নয়। এই লোক দুটির কাছ থেকে যে অযাচিত জ্ঞান পাওয়া গেল, তা কাজে লাগানো যাক। এই সুযোগে হিমালয় দর্শনও হয়ে যাবে। ভরতের যাযাবর সত্তাটি আবার জেগে উঠল।

রেলপথে টানা দার্জিলিং যাওয়া যায় না। মধ্যে গঙ্গানদী পেরুতে হয়, একটি স্টিমার পার করে দেয়। ওপারের হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার ট্রেন। শিলিগুড়িতে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আর একটি ছোট ট্রেনে চাপতে হয়। তবু দার্জিলিং পৌঁছনো গেল না, কার্শিয়াং স্টেশনে সে ট্রেন থেমে রইল, ঘুম নামক কোনও স্থানে ধস নেমেছে, ট্রেন আর এগোতে পারবে না।

কার্শিয়াং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে ভরত, খানিক দূরে দেখল এক জায়গায় ভিড় জমেছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সে চিনতে পারল। বিভিন্ন সভাসমিতিতে সে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও গান শুনেছে, একবার সামান্য আলাপও হয়েছিল, কিন্তু প্যান্ট-কোট পরা পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক পরিহিত কবিবরকে সে আগে কখনও দেখেনি। তবু তাঁর দীপ্তিমান চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখটি কালো দাড়িতে ঢাকা হলেও টিকোলো নাকটি স্পষ্ট, ওষ্ঠে স্মিতহাস্য দেখলেই চেনা যায়।

কবি এই ট্রেনে পৌঁছেছেন, না এখান থেকে ফেরার জন্য ট্রেনে উঠতে এসেছেন, তা ঠিক বোঝা গেল না। ট্রেন ছাড়ার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। কবির সঙ্গে কথা বলার জন্য ভরত এগিয়ে গেল, তখন ডাণ্ডাধারী দু'জন সান্ত্রী ধরনের লোক চেঁচিয়ে বলল, হঠো হঠো, রাস্তা ছেড়ে দাও, রাজাবাহাদুরের জন্য রাস্তা ছেড়ে দাও!

ভরতের কৌতূহল হল, রাজাবাহাদুরটি আবার কে! কলকাতা শহরে গণ্ডায় গণ্ডায় রাজা-মহারাজ ঘুরে বেড়ায়, গ্রীষ্মকালে তারা সবাই দার্জিলিং বেড়াতে আসে। ইনি কোন রাজা?

সান্ত্রীদের এড়িয়ে আরও কাছাকাছি গিয়ে ভরত চমকে উঠল। এ তো রাধাকিশোর! পিতৃপদ পেয়েও তার চেহারার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কবি রবীন্দ্রবাবুর পাশে রাধাকিশোরকে খর্বকায় মনে হয়, তার মুখমণ্ডলে তেমন কোনও রাজকীয় ভাব নেই। বীরচন্দ্র মাণিক্যকে যে কোনও অচেনা লোকও দেখলে বুঝতে পারত ইনি একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি। রাধাকিশোরের পরিধানে লম্বা কোটটি স্বর্ণখচিত, গলায় দু' সেট মণি-মুক্তার মালা, এরকম মূল্যবান বসন-ভূষণ না থাকলে তাকে নেহাত একজন সাধারণ মানুষ মনে হত।

ভরতের মনের মধ্যে বিচিত্র ভাবের খেলা চলতে লাগল। অনেকদিন পর তার মনে পড়ল, সেও

একজন রাজকুমার! এই রাধাকিশোর আর সে একই পিতার সন্তান। সহোদর না হলেও রাধাকিশোর কি তার বড় ভাই নয়? আগের রাজার আমলে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, এখনও কেন তাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে! ত্রিপুরায় যাওয়া কি এখনও তার জন্য নিষিদ্ধ?

একবার সে ভাবল, সরাসরি রাধাকিশোরের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেবে। তারপর দেখা যাক না কী হয়! এখানে ইংরেজের রাজত্ব। এখানে ত্রিপুরা সরকারের কোনও জারিজুরি খাটবে না।

আবার সে ভাবল, এতকাল পরে রাজকুমার সাজার মতন নিচু ধরনের লোভ তার হচ্ছে কেন? তার কোনও পিতৃপরিচয় নেই, বংশপরিচয় নেই, সে স্বয়ংসিদ্ধ, এটাই কি বেশি গৌরবের নয়!

তবু কোথাও একটা টান থেকে যায়। জন্মভূমির টান, রক্তের টান। মনে পড়ে যায় রাজবাড়ির কথা, কমলদিঘির পারে বসে একা একা বই পড়া। অন্য রাজকুমাররা তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও রাধাকিশোর কখনও তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেনি। কোনও চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার নেই, শুধু রাধাকিশোরের সঙ্গে দুটো কথা বলা যায় না! কেমন আছে ত্রিপুরার আর সবাই? মনোমোহিনী নামে সেই রানি?

রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন স্টেশনের বাইরের দিকে। রাজাদের অন্য দিকে তাকাতে নেই। তিনি ভরতকে দেখতে পেলেন না। দেখলেও চিনতে পারতেন কি না সন্দেহ। ভরত যখন ত্রিপুরা ছেড়ে চলে আসে, তখনই রাধাকিশোর ছিলেন পূর্ণবয়স্ক, তাঁকে চিনতে অসুবিধে নেই। কিন্তু ভরতের তখনও কৈশোর কাটেনি, ত্রিপুরা ত্যাগ করার পর সেই কিশোরটির জীবনে নানান উত্থান-পতনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, স্বপ্নময় চোখ দুটি এখন অনেক কঠিন বাস্তবতায় অভ্যস্ত। অবশ্য রাধাকিশোরের তুলনায় ভরত অনেক সুপুরুষ।

চুম্বক আকৃষ্টের মতন ভরত ওদের সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর গেল। স্টেশনের বাইরে পা দেবার পর হঠাৎ তার শরীর কেঁপে উঠল ভয়ে। ভাই? রাজাদের ভ্রাতৃস্নেহ বলে কোনও বস্তু থাকে নাকি! রাধাকিশোর এক সময় নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন, কিন্তু সে তো সিংহাসনে বসার আগে। রাজা হওয়া আর না-হওয়ার মধ্যে যে অনেক তফাত। সব রাজারাই তাদের ভাইদের অবিশ্বাস করে, ভাই মানেই তো সিংহাসনের দাবিদার, যে-কোনও মুহূর্তে আড়ালের ষড়যন্ত্রকারী। কিছু দিন আগেই ভরত এক ইতিহাস গ্রন্থে পড়েছে যে অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতানরা কোনও ভাইকেই জীবিত রাখতেন না। এক সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেই তার উনিশজন ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতার কাহিনীও সুবিদিত। হিন্দু রাজারাও কম যান না। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজাদের ভ্রাতৃবিরোধে কণ্টকিত হয়ে আছে। এই রাধাকিশোরের সঙ্গেই তাই বৈমাত্রেয় ভাই কুমার সমরেন্দ্রর মামলা-মোকদ্দমা হয়নি? জ্যেষ্ঠ পুত্র না হতে পারলে রাজপুত্র হয়েও সুখ নেই।

ভরতকে দেখেই যদি রাধাকিশোরের মনে হয়, সে কোনও মতলবে এসেছে? এই পাহাড় অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন নয়, কিন্তু এখানেও গুপ্তঘাতক নিয়োগ করা যেতে পারে।

ভরতের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল। নিয়তি? কলকাতার ট্রামে দু'জন অচেনা মানুষের মুখে দার্জিলিঙের কথা শুনেই সে ট্রেনে চেপে বসল। নিয়তি তাকে বারবার বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। সেই নিয়তিই তাকে এখানে টেনে এনেছে আবার কোনও কৌতুক করার জন্য? না, এবার আর ভরত সেই ফাঁদে পা দেবে না।

দার্জিলিং যাওয়া হল না, ভরত ফিরে এল কলকাতায়। দু'দিন পরে কোনও চিঠি না লিখেই সে রওনা হল মেদিনীপুরের দিকে। হেমচন্দ্র একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু, তার কাছাকাছি থাকাই ভাল।

হেম যেন তার প্রতীক্ষাতেই ছিল, কোনও প্রশ্ন না করেই বলল, চল, তোমাকে খামারবাড়িটা দেখিয়ে আনি। দেখো তোমার পছন্দ হয় কি না।

এখানে বিদ্যুৎ আসেনি, মোটর গাড়ি আসেনি। এখনও গরুর গাড়িই সম্বল, শহরের মধ্যে এক ঘোড়ায় টানা এক্কা গাড়ি পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানুষ নিজের দুটি পায়ের ওপরই নির্ভর করে।

প্রথম দিনের জন্য একটা এক্কা গাড়িই নিতে হল। খামারবাড়িটিতে পৌঁছবার পর ভরত বুঝতে

পারল, সেটা সত্যিই খুব দূরে নয়, হেমের বাড়ি থেকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হেঁটে আসা যেত।

বাড়িটি বহুদিন মেরামত হয়নি, জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বাগানে গাছপালা রয়েছে অনেক, কিন্তু বিশেষ শ্রী নেই, কেউ যত্ন করে না, একটি মধ্যম আকারের পুকুর আছে, সেটি পানায় ভরা, বাঁধানো ঘাটটি দেখলে বোঝা যায় এককালে কেউ শখ করে বানিয়েছিল।

সিদ্ধিরাম নামে একজন মালির থাকার কথা এখানে, অনেক ডাকাডাকি করেও তাকে পাওয়া গেল না। তালা খুলে ঢোকা হল একতলা বাড়িটার মধ্যে। ভেতরে মাকড়সার জাল, ইঁদুর দৌড়োদৌড়ি করছে, সাপখোপ থাকাও বিচিত্র নয়। মেঝেতে যে ধুলো জমে আছে, তাতে বহুদিন কোনও পায়ের ছাপ পড়েনি।

হেম জিজ্ঞেস করল, দমে গেলে নাকি বন্ধু? খানিকটা সাফ-সুতরো করে নিলেই চেহারা খুলে যাবে। শুনেছি, আমার ঠাকুরদা এখানে এক পশ্চিমা রক্ষিতা পুষেছিলেন। সে নাচ-গান জানত। আমার বাবা পেটরোগা মানুষ ছিলেন, তাঁর ওসব সামর্থ্য ছিল না। তোমার ভূতের ভয় নেই তো?

ভরত মুখ তুলে তাকাল।

হেম বলল, মাঝে মাঝে নাকি রাত্তিরের দিকে নূপুরের আওয়াজ শোনা যায়। নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি—আমাদের বাড়ির লোকজন কেউ কেউ নাকি শুনেছে, সেই থেকে কেউ আর এখানে আসতে চায় না। আমি দু'-এক রাত শুয়ে দেখেছি, আমার ভাগ্যে তেনারা দেখা দেননি। ভূতে ধরা আর ভূতের নজর লাগা কাকে বলে জানো? ভূতে ধরলে তো বুঝেই গেলে। আর তুমি ভূত দেখতে পেলে না, কিন্তু ভূত তোমায় দেখল, তাতেই নজর লেগে গেল, এরপর তুমি যেখানেই যাও, দিন দিন শুকিয়ে যাবে, অসুস্থ হয়ে পড়বে, ভূত তোমাকে মৃত্যুলোকের ওপারে নিয়ে যাবে।

ভরত বলল, মৃত্যু আমাকে অনেকবার ছুঁয়েছে, আমি সহজে যাচ্ছি না। তা হলে একটা ধাঙড় ডেকে ঘরগুলো পরিষ্কার করাতে হয়।

হেম বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব, তুমি দুটো দিন আমার ও বাড়িতেই অতিথি হয়ে থাকো। দু'দিন থাকলে তোমার মান যাবে না।

ভরত বলল, টাকাপয়সার কথা কিছু হল না। এ খামারের দাম বোধ হয় অনেক হবে, আমার সাধ্যের বাইরে।

হেম বলল, এখনই আমার টাকার প্রয়োজন নেই। ওসব কথা পরে হবে। তুমি বরং মাস মাস আমাকে পনেরো টাকা হিসেবে ভাড়া ধরে দিয়ো। কয়েকটা মাস থেকে দেখো তোমার পোষায় কিনা।

দিন সাতেকের মধ্যে ভরত জায়গাটার সঙ্গে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিল। সিদ্ধিরাম মালি তাকে রান্না করে দেয়, সে বাগানের কাজ বিশেষ কিছুই জানে না কিংবা সে কাজে মন নেই, তবে রান্না করতে ভালবাসে। সন্ধের পর সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। তা যাক, সম্পূর্ণ শব্দহীন, আলোহীন এই নির্জনবাস সে বেশ উপভোগ করছে। বহুকাল আগে মৃতা কোনও নর্তকীর আত্মা এসে এখনও তাকে দেখা দেয়নি।

সারাদিন ভরত বাগানে কাটিয়ে দেয়। সে মাটি খোঁড়ে, ফুলগাছের যত্ন করে, বড় গাছের শাখা-প্রশাখা ছেঁটে দেয়। পুকুরের পানা পরিষ্কার করে। জল-কাদা মাখতে তার আপত্তি নেই, শুধু লুঙ্গি পরা, খালি গা, এখানে এসে সে দাড়ি কামানোও বন্ধ করে দিয়েছে। নতুন চেহারায় নতুন জীবন।

বিকেলের দিকে প্রায় হেম আসে, সঙ্গে থাকে আরও দু'-একজন। পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসা হয়। নানারকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপচারি চলে অনেকক্ষণ।

গুপ্ত সমিতির অন্য সদস্যেরা ঘরে ফিরে গিয়ে কে কী রকম আছে তা জানে না ভরত, কিন্তু হেমকে দেখলেই বোঝা যায়, সে কিছুতেই সংসারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। সে অশান্ত, অস্থির। সে সত্যিই দেশের কাজ করার জন্য চাকরি ও বাড়িঘর ছেড়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না, ঘাড় নিচু করে ফিরে আসতে হল, এ ব্যর্থতা সে মানতে পারছে না কিছুতেই। অরবিন্দ ঘোষ ও

বারীন্দ্রের ওপর তার যথেষ্ট ক্ষোভ।

একদিন সে বলল, দেখো ভরত, আমরা গীতা ও তলোয়ার স্পর্শ করে শপথ নিয়েছিলাম, দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকব। সে শপথ আমরা রাখতে পারলাম কই ? অরবিন্দবাবু নিজে শপথ নেননি, তাই না ? আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, যিনি নেতা, তাঁর শপথ নেবার প্রয়োজন নেই। অথচ তিনিই দলটা ভেঙে দিলেন। ছি ছি ছি !

ভরত বলল, শুধু বারীনের কথা শুনে তিনি যতীনদাকে বিতাড়িত করলেন, এটা ঠিক হয়নি। যতীনদার বক্তব্য তাঁর শোনা উচিত ছিল।

হেম বলল, একটা বিধবা অবলা মেয়ে, তার জন্য একটা এত বড় মহৎ উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে ! সে মেয়েটার তো আমি কোনও দোষ দেখিনি। সে একটু আমাদের কাছাকাছি এসে বসতে চাইত, আমাদের কথা শুনতে চাইত, তাতে দোষের কী হল ? তাকে দলে নিয়ে নিলেই হত। মেয়ে বলে কি সে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে পারে না ? সরলা ঘোষালের সঙ্গে যদি আমরা হাত মেলাতে পারি, তা হলে ও মেয়ে কেন অচ্ছুত হবে ? সরলা ঘোষাল ধনীর দুলালী, পেছনে ঠাকুরবাড়ির জ্যোতি রয়েছে, সেই জন্য তার বেশি খাতির !

সরলা ঘোষালের প্রসঙ্গ উঠলেই তার বৈঠকখানা ঘরের দৃশ্যটি ভরতের চোখে ভেসে ওঠে, সে কোনও কথা বলে না।

হেম আবার বলল, অরবিন্দবাবু একজন উচ্চশিক্ষিত, পণ্ডিত লোক, তিনি আমাদের আজগুবি, অলীক গল্প শোনাবেন, এ-কী আশা করা যায় ? তোমার মনে আছে, উনি বলেছিলেন, সারা ভারতে আর সবাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, এমনকী পাহাড়-জঙ্গলেও আদিবাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য অস্ত্র শানিয়ে বসে আছে, শুধু বাঙালিরাই কিছু করছে না। কোথায় কী ! এসব ডাহা মিথ্যে কথা ! ভারতের আর কোনও রাজ্যের আর কোনও দলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল ? সে রকম কোনও দলের অস্তিত্বই নেই। সারা ভারত এখনও ঘুমিয়ে আছে। পরাধীনতার অপমানের জ্বালা বোধ করার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই এ দেশের মানুষের।

ভরত বলল, বারীন এবং যতীনদাও এরকম কথা বলেছিল। একে ঠিক মিথ্যে বলা যায় না। আমাদের উৎসাহিত করার জন্য, আমাদের চটপট কাজে নেমে পড়ার জন্যই বোধহয় অরবিন্দবাবু সারা ভারতের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছিলেন।

হেম উগ্র ভাবে বলল, তা বলে তিনি রূপকথা শোনাবেন ! আমরা কি ছেলেমানুষ ! মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে কিছু গড়তে গেলেই তা এত সহজে ভেঙে যায়।

ভরত বলল, বরোদা থেকে আর কোনও নির্দেশ আসছে না। সব চুপচাপ। এরপর আমরা কী করব, যে-যার কোটরে সেঁধিয়ে থাকব !

হেম বলল, মোটেই না। আমাদের মেদিনীপুরের দল মোটেই দমে যায়নি, নিরাশও হয়নি। আমরা আগেকার মতন কাজ চালিয়ে যাব। প্রথমে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক দরকার। আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে ইংরেজ শাসন ও শোষণের কথা বোঝাব। সাধারণ মানুষের সমর্থন না পেলে বিপ্লব হতে পারে না। কিছু লেখাপড়া জানা ছেলে হঠাৎ হুড়ুম হুড়ুম করে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু করে দিল, দেশের অধিকাংশ মানুষ তার মর্ম কিছুই বুঝল না, তা কখনও সার্থক হতে পারে ? আমরা আবার গোড়া থেকে কাজ শুরু করব। দেখবে, এই মেদিনীপুরের দলই এক সময় বাংলার নেতৃত্ব দেবে !

সত্যেনও ফিরে এসেছে মেদিনীপুরে। সত্যেনের নামে নারীঘটিত দুর্বলতার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, বারীন্দ্র তার নিজের মামাকেও ছাড়েনি। হেম অবশ্য সত্যেনের ওপর একটুও বিরূপ না। তার মতে, যতীনদার বিধবা বোনটির প্রতি সত্যেনের যদি কিছুটা দুর্বলতা জন্মেও থাকে, তাতে দোষের কী আছে ? বিপ্লবীরা কি সন্ন্যাসী নাকি ? তা হলে তো কোনও বিবাহিত লোকই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নয়। হেম নিজে বিবাহিত, স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষও বিবাহ করেছেন। বিবাহ সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনও নারীর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত কি না, সে নৈতিকতা বিচারের দায় সমাজের। বিপ্লবীরা সমাজ বহির্ভূত, তাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যার হৃদয়ে প্রেম

নেই, সে কি দেশপ্রেমিক হতে পারে !

সত্যেন নিজে অবশ্য খানিকটা অনুতপ্ত। সে নিঃশব্দে আবার সংগঠনের কাজ শুরু করেছে। বেছে বেছে কিছু যুবককে সংগ্রহ করে তাদের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের কাহিনী পড়ে শোনায়। এ দেশের অর্থনৈতিক অধঃপতনের কথা বুঝিয়ে বলে। গোপনে গোপনে নাকি অস্ত্রশিক্ষার কাজও চলছে।

সত্যেন একদিন এখানে এসে ভরতকে বলে গেল, এই খামারবাড়িটা সে সমিতির কাজে লাগাতে চায়। প্রয়োজনে কয়েকটি ছেলেকে এখানে আশ্রয় দিতে, ভরতকে তাদের পড়াশুনোর ভার নিতে হবে। অর্থাৎ ভরতকে এখানে শুধু গাছপালার পরিচর্যা আর পুকুর পরিষ্কারে ব্যাপৃত থাকলে চলবে না।

হেম মাঝে মাঝে ভরতকে দূর দূর গ্রামাঞ্চলে টেনে নিয়ে যায়। দুটো বাইসাইকেল জোগাড় হয়েছে, সকালে বেরিয়ে সন্ধের সময় ফেরে। হেম সাধারণত কোনও গ্রামে গিয়ে সেখানকার কয়েকজন স্কুল মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের সঙ্গে ভাব জমায়। এই সব জায়গায় খবরের কাগজ পৌঁছোয় না, মাস্টাররা নিজেদের গণ্ডির বাইরের কিছু খবরই রাখে না। হেম নিজের টাকায় সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বইটির অনেকগুলো কপি আনিয়েছে, মাস্টারদের এক-একখানা সেই বই দেয়। এই সব শিক্ষকদের যদি সচেতন করা যায়, তা হলে এদের মাধ্যমে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা যাবে।

হেমের ধৈর্য ও নিষ্ঠা এবং মানুষকে বোঝাবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় ভরত। কিন্তু হেমের নেতা হবার কোনও অভিলাষ নেই। মেদিনীপুরের সমিতিতে বরং সত্যেনের অনেকটা প্রাধান্য আছে, হেম থাকতে চায় আড়ালে। নিজের পরিবারের প্রতি সব দায়িত্ব অবহেলা করে হেম দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, এটা যেন তার একটা ব্রত।

একদিন খুব একচোট বৃষ্টির পর রাস্তায় এমন কাদা হয়েছে যে বাইসাইকেল চালানো মুশকিল, ওরা নেমে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। কথা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে। বাংলা দেশটা ভাগ হবেই এমন হম্বিতম্বি শোনা যাচ্ছিল ইংরাজ সরকারের পক্ষ থেকে, হঠাৎ যেন তা থেমে গেছে। বাঙালিবাবুদের আপত্তি ও প্রতিবাদের বহর দেখে লর্ড কার্জন পিছিয়ে গেলেন ? তিনিও তবে জনমতকে ভয় পান ! কিংবা তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে !

সবাই এতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও হেম মোটেই খুশি নয়। তার মতামত উল্টো। সে বলল, বাংলা ভাগ হলেই ভাল হত !

ভরত বলল, সে কী ! বাংলা এখন ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য। বাঙালিদের কথা সারা ভারত শোনে। এই বাংলাকে টুকরো টুকরো করে দিলে বাঙালিদের শক্তি অনেক কমে যাবে না ! তা ছাড়া, এটা যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা, তা তুমি বোঝো না ?

হেম দৃঢ়স্বরে বলল, বুঝি, সবই বুঝি। তবু ইংরেজ সরকার যদি জোর করে ছুরি দিয়ে বাংলাকে খণ্ড খণ্ড করে দিত, তা হলে আমি খুশি হতাম। অত্যাচার যত বাড়বে, ততই আমাদের কাজের সুবিধে হবে। এ জাতটা ঘুমিয়ে আছে, মড়ার মতন ঘুমিয়ে আছে, শিরদাঁড়ায় আঘাত না করলে জাগবে না !

আলোচনা আর বেশি দূর এগোল না। মোড়ের গাছতলায় কয়েকটি ছেলে বসে গুলতানি করছিল, তার মধ্য থেকে একজন ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল। ছেলেটিকে চেনা চেনা মনে হল ভরতের। আগেরবার দেখেছে, এ সেই দুর্দান্ত, ডানপিটে কিশোরটি, যার দুরন্তপনার শেষ নেই। কী যেন এর নাম, ক্ষুদিরাম ?

ছেলেটি বলল, হেমদা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

সে এমনভাবে ভরতের দিকে তাকাল, যেন দ্বিতীয় ব্যক্তির সামনে সে কথাটা বলা যাবে না। হেম তা অগ্রাহ্য করে জিজ্ঞেস করল, কী রে ক্ষুদি, কী হয়েছে ?

ক্ষুদিরাম বলল, হেমদা, আমায় একটা পিস্তল দিতে হবে। আপনার বাড়ি যাব ?

হেম ভুরু কুঁচকে চেয়ে থেকে বলল, পিস্তল ! সেটা কি খেলনা নাকি ! পিস্তল দিয়ে তুই কী করবি ?

ক্ষুদিরাম বলল, একটা সাহেবকে গুলি করব ! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এখানে একজন আদালিকে চড় মেরেছে। কেন মারবে ? সাদা চামড়া বলে যা খুশি তাই করবে ? কেন, আমরা শোধ নিতে পারি না ?

হেম বলল, তা বলে তুই সাহেবকে মারতে যাবি ? সাহেবদের কত ক্ষমতা তা বুঝিস ! পুলিশ ঠিক তোকে ধরে ফেলবে, তারপর ফাঁসি দেবে কিংবা কুকুরের মতন গুলি করে মারবে !

ক্ষুদিরাম বলল, ওসব আমি গ্রাহ্য করি না !

হেম এবার বিরাট ধমক দিয়ে বলল, আমার কাছে পিস্তল আছে তোকে কে বলল ? বখামি করার আর জায়গা পাসনি ! খবরদার, আর ওই সব কথা আমার সামনে বলবি না !

ক্ষুদিরাম ক্ষুণ্ণভাবে ফিরে যাবার পর হেম বলল, ভরত দেখলে ? এ ছেলেটাকে কিন্তু সত্যেন এখনও দীক্ষা দেয়নি। তবু এই ধরনের ছেলেদের মধ্যে রক্তে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এ রকম কয়েক হাজার ছেলে তৈরি হলে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাঁপিয়ে দিতে পারব না ?

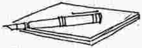

৭২

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—

প্রথম পঙক্তিটি আসে আকাশ থেকে সহসা অশনিপাতের মতন। কোনও পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না, মনের গহন কোণেও যেন এই চিন্তার অস্তিত্ব ছিল না। পর পর ঠিক এই চারটি শব্দ আগে কেউ সাজায়নি, যদিও কোনও শব্দই নতুন নয়।

বজরার জানলা দিয়ে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়, চৈত্র মাসের রাত্রির আকাশ প্রায় পরিষ্কার, তবে এখনও চাঁদ ওঠেনি, কয়েকটি তারা ফুটেছে, অমাবস্যা গেছে ক'দিন আগে। এই তরল আঁধারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় পৃথিবীর অস্তিত্ব। শোনা যায় জলের ছলছল শব্দ।

অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ক'দিন ধরেই রাত্তিরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর তিনি কুঠিবাড়ি ছেড়ে চলে আসেন বজরায়, এখানে একা থাকেন। অন্যদের তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেও রাত্রি-জাগরণ তাঁর অভ্যেস। একা বসে থাকেন চুপ করে, হঠাৎ কেন যেন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

মানুষের মন কী ? নিজের মন কি নিজের বশীভূত নয় ? তা কি লাগাম-ছাড়া হয়ে যেমন খুশি রূপ নিতে পারে ? রবীন্দ্রনাথ নিজের মনকে সব সময় দমন করতে চান। স্বপ্নের কথা আলাদা, জাগ্রত সময়ে মন আর চেতনা এক পথে চালিত হবে। বিশেষত যে মন খারাপের কারণ বোঝা যায় না, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। অল্প বয়সের সেই ভাবালুতা, সেই যখন তখন মন খারাপের উপভোগ, সে সব দিন কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন কত দায়িত্ব, কত ব্যস্ততা, এর মধ্যে মন খারাপ যেন অবাঞ্ছিত বিলাসিতা।

হ্যাঁ, দুশ্চিন্তার অনেক কারণ থাকতে পারে, আছেও, কিন্তু দুশ্চিন্তা আর মন খারাপ তো এক নয়। শোকতাপের সঙ্গেও এ রকম মন খারাপের কোনও সম্পর্ক নেই। দুশ্চিন্তা বা শোকের কারণগুলি অতি প্রত্যক্ষ।

মন খারাপের সঙ্গে শরীর খারাপের সম্পর্ক আছে ? হ্যাঁ, কিছুদিন ধরেই শরীর বেশ খারাপ। প্রায় প্রতিদিনই জ্বর হচ্ছে। একটা গুরুতর রোগের আশঙ্কা জমছে আস্তে আস্তে। একজন স্পেশালিস্ট দেখানো দরকার, কিন্তু তার সময় কোথায় ! জ্বরের জন্য শরীর দুর্বল লাগে, তা কারুকে জানানো হয়নি। পুরুষ মানুষের অসুখের কথা মা এবং স্ত্রীর কাছে লুকোনো যায় না। দু' জনের কেউই নেই।

না, ঠিক শরীর খারাপের জন্যও নয়। এর চেয়ে আরও বেশি শরীর খারাপ তুচ্ছ করে রবীন্দ্রনাথ অনেক কাজের মধ্যে ব্যাপৃত থেকেছেন, অথচ এবারে শিলাইদহে আসার পর থেকেই মনটা কেমন যেন অসাড় হয়ে আছে। বিশেষত সন্ধের পর আর কিছুই ভাল লাগে না। মনে হয়, এই যে এত কর্মোদ্যোগ, এত দায়িত্ব, এ সবই যেন তুচ্ছ। কী হবে এত কিছুর মধ্যে জড়িয়ে থেকে ? যদিও কেউ তাঁর ওপর জোর করে এই সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি, সবই তাঁর স্বকৃত, এসব তাঁর ভাল লাগে। ভাল লাগে, তবু এক একসময় মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে, এই বৈপরীত্যের জন্য দায়ি ওই মন খারাপ !

মাত্র গতকালই যেন এর কারণটা তাঁর কাছে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। অল্প বয়েসে কোনও বিশেষ নারীর প্রতি আকুলতায় মন খারাপ হত। প্রেম নামে একটা বায়বীয় ধারণায় মত্ত হয়ে থাকা যেত সারাক্ষণ। এখন সে সব কোথায় ! ইদানীং তাঁর জীবন নারী-বর্জিত। এমনকী কৌতুক-হাস্য পরিহাস করার মতনও কেউ নেই। সেই জন্যই কি দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, একটাও কবিতা লেখা হচ্ছে না। একটা নতুন গানের লাইন গুনগুন করে না মাথার মধ্যে। কবিতা আর গান জীবন থেকে বাদ হয়ে গেলে তিনি যেন আর আসল মানুষ থাকেন না। একটা নকল মানুষের মতন কাজ করে যান।

গতকাল খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসেছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, কলম হাতে ধরা রইল। মাথা জুড়ে রইল রাজ্যের চিন্তা। যে-মানুষের কলম হাতে এলেই অনর্গল লেখা হয়ে যায়, একই দিনে পাঁচ ছ'টি কবিতা-গানও লিখে ফেলেছেন অনেকবার, সেই মানুষটি একটি লাইনও লিখতে পারলেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, এক সময় বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন, তারপর অনেকক্ষণ ঘুম এল না।

আজ আর লেখার সরঞ্জাম নিয়েই বসেননি। মন প্রস্তুত না হলে মিছে এই বিড়ম্বনা। আর কোনওদিনও কি কবিতা লিখতে পারবেন ? যদি বাগ্‌দেবী বিমুখ হন, তার পরেও কি বেঁচে থাকতে হবে ? এক একজন মানুষের জীবনের এক এক রকম আনন্দ ও পূর্ণতা বোধ থাকে। এক দিকে জমিদারি পরিচালনা, আর এক দিকে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য হয়ে থাকাই কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের পূর্ণতা ! যখনই একা হয়ে থাকেন, তখনই কি তাঁর মনে হয় না, কবিতা রচনাতেই তার প্রধানতম আনন্দ ? 'ভাল যদি বাসো সখি, কী দিব গো আর— কবির হৃদয় এই দিব উপহার', এ গান কে রচনা করেছিল ?

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু এই ধরণী যেন তাঁর দিকেই চেয়ে রয়েছে।

এক সময় এসে গেল সেই পঙক্তি : 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' !

মন খারাপের যেমন কারণ থাকে না, স্বপ্নের যেমন যুক্তি নেই, তেমনি শিল্প সৃষ্টিরও উৎস বোঝা যায় না। কেউ কোথাও নেই, তবু মনে এল, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। এখানে প্রতিটি শব্দ অমোঘ। 'আঁখির আগে'র বদলে 'নয়ন সমুখে' হতে পারে না।

এর পরের পঙক্তিটি কী ? ভাবতে হল না, সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল, 'তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে'। এর আগে কি একটা 'যেন' দিলে ভাল হত ? না, দরকার নেই। 'দৃষ্টি' শব্দটা আছে বলেই তার পরে

'হৃদয়ে' দিতে হয়েছে। এখানে 'হৃদয়ে'র বদলে 'মরমে' চলে না।

রবীন্দ্রনাথ আকাশের দিকে তাকালেন। এর মধ্যে চাঁদ উঠেছে, অন্ধকারকে অনেকখানি ধবল করে ফেলেছে জ্যোৎস্না।

তৃতীয় পঙক্তিটি চিন্তা করার আগেই একটা নিছক বাস্তব চিন্তা তাঁকে আঘাত করল। আজ একটি ছাত্রের জ্বর এসেছে, তার আবার বসন্ত রোগ দেখা দিল না তো! রবীন্দ্রনাথ নিজের জ্বরের চেয়েও ছাত্রদের জন্য বেশি উদ্বিগ্ন।

শান্তিনিকেতন থেকে বিদ্যালয়টি তুলে আনা হয়েছে শিলাইদহে। এখানেও নানা রকম আশঙ্কার অবধি নেই।

মৃণালিনীর মৃত্যু নিয়ে বিশেষ শোক করার অবকাশই পাননি রবীন্দ্রনাথ। তখন রেণুকাকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল প্রধান কাজ। মৃতদের থেকে জীবিতের দাবি বেশি। বরাবরই শীর্ণ আর দুর্বল রেণুকা, কিন্তু মনটি সূক্ষ্ম, অনুভূতিপ্রবণ, তার দিকে তাকালেই মায়ায় বুক টনটন করে ওঠে। যতই অর্থসংকট থাক, তবু রেণুকার চিকিৎসার জন্য কার্পণ্য করেননি রবীন্দ্রনাথ। চিকিৎসকরা হাওয়া বদলের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাই সদলবলে রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন আলমোড়ায়। জামাতাটি অপদার্থ, তাকে দিয়ে তো কোনও সাহায্যই হয় না, বরং তার জন্যও অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাহাড়ে গিয়েও রেণুকার জ্বর কমেনি, কাশি কমেনি। এক সময় সে নিজেই ফিরে যেতে চাইল।

এমনই ব্যাধি, যার কোনও ওষুধ নেই। শরীরটা একটু একটু করে ক্ষয় হয়ে যায়। গায়ে রোদ লাগলে উপকার হতে পারে শুনে রবীন্দ্রনাথ বাড়ির ছাদে মেয়ের জন্য একটা কাচের ঘর বানিয়ে দিলেন। সেখানে তিনি মেয়ের পাশে বসে থাকতে চান, রেণুকাই তাতে আপত্তি করে, সে বারবার তাড়া দিয়ে বলে, বাবা, তোমার কত কাজ, তুমি যাও, তুমি আমার জন্য সময় নষ্ট কোরো না।

রেণুকা টের পেয়ে গিয়েছিল, তার সময় আর বাকি নেই। একদিন সে বাবার হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলেছিল, বাবা, ওঁ পিতা নোহসি বলো। আমার কানে কানে শোনাও।

সেই দিনই সে চলে গেল। শেষের দিকে তো বোঝাই গিয়েছিল যে তাকে আর ধরে রাখা যাবে না, বরং সে কষ্ট পাচ্ছে দেখে কারুর কারুর মনে হয়েছিল, তার চলে যাওয়াই ভাল। ক্ষয় রোগ ছোঁয়াচে, অন্য ছেলে মেয়েদের রক্ষা করার জন্য পরিশুদ্ধ করা হল সারা বাড়ি।

সন্তান বিয়োগের ব্যথা কারুকে বোঝানো যায় না। অনেকেই অবাক হয়েছিল, রেণুকার মৃত্যু তার পিতা এমন শান্তভাবে মেনে নিলেন কী করে? এ যেন বিধাতার অভিপ্রায় জেনে তার জন্য শোক করতে নেই। বরং এর পরেই সতীশের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ বেশি উতলা হয়ে পড়লেন।

সতীশচন্দ্র রায়ের মতন এমন প্রাণবন্ত যুবা, সর্বক্ষণ কত রসে মাতোয়ারা, রবীন্দ্রনাথের এত বড় ভক্ত কমই আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাবার জন্য সে স্বল্প বেতনে শিক্ষক হয়ে যোগ দেয় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। শিক্ষক হিসেবেও সে একটি অমূল্য রত্ন, ছাত্রদের সঙ্গে তার বন্ধুর মতন সম্পর্ক, ক্লাসের বাইরেও সে ছাত্রদের কত বই পড়ে শোনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই রকম শিক্ষকই চান। সতীশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনা নিয়ে উৎসাহে লাফালাফি করে, নিজেও সে ভাল কবিতা লেখে, সেই সতীশ কোথা থেকে বসন্ত রোগ বাধিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। সতীশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশের সেবা করার জন্য শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন অজিতকে তিনিই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যাবার আগে দু' একটা কাজ সেরে নিতে হবে।

দেরি হয়ে গেল, তাতেই খুব দেরি হয়ে গেল। বসন্ত রোগের প্রকোপ যে কী সাঙ্ঘাতিক হতে পারে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি। শেষ দেখাও হল না, ওঁরা পৌঁছবার আগেই সতীশ শেষ বারের মতন অজিত অজিত বলে আর্ত চিৎকার করে ঢলে পড়ল। রেণুকা চলে গিয়েছিল ভাদ্র মাসে, সতীশ গেল মাঘ মাসে।

অজিত বন্ধুর ওই আকুল আহ্বানের কথা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শোক করার সময় নেই। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু এরই মধ্যে এখান থেকে সব কটি ছাত্রকে সরাবার

ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পরের বাড়ির ছেলে সব, বাপ-মা ভরসা করে পাঠিয়েছে, একবার যেখানে বসন্ত রোগ ঢোকে সেখানে সংক্রমণের পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে।

স্কুল বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তাই ছাত্র ও শিক্ষকদের আনা হয়েছে শিলাইদহে। বীরভূমের রুক্ষ মাটির বদলে পদ্মা পারের এই বৃক্ষময় দেশে এসে ছাত্ররা খুব ফুর্তিতে আছে। এত বড় নদীও তারা দেখেনি। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন, আশ্রম-বিদ্যালয়টিকে শান্তিনিকেতন থেকে পাকাপাকিভাবেই সরিয়ে নেওয়া যায় কি না। শান্তিনিকেতনের জমি তাঁর নিজস্ব নয়, দেবেন্দ্রনাথের সম্পত্তি। তাঁর অন্য ভাই ও ভ্রাতুস্পুত্ররা কেউ কেউ সেই সম্পত্তির দাবিদার মনে করে, সেই হেতু বিদ্যালয়টির ওপর অযাচিত খবরদারি করারও যেন তাদের অধিকার আছে। দু-একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার এর মধ্যে ঘটে গেছে।

এর মধ্যে শিলাইদহের কাছাকাছি গ্রামেও বসন্ত রোগ শুরু হয়ে গেছে। যে-কোনও সময় এই রোগ মহামারীর রূপ ধারণ করতে পারে।

জ্বরাক্রান্ত ছেলেটির কথা চিন্তা করতে করতে রবীন্দ্রনাথ আবার মন ফেরালেন। এতদিন পর আবার মাথায় কবিতা আসছিল, এখন অন্য চিন্তা থাক না। ছেলেটির শুধু জ্বর হয়েছে। আর কিছু না। বাচ্চাদের তো জ্বরজারি হয়ই মাঝে মাঝে।

আকাশের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই এসে গেল পরের কয়েকটি পঙক্তি :

সমুখ-আকাশে চরাচরলোকে
এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে...

'আকুল আলোকে' কি ঠিক হল? অপরূপ-এর পর আবার দুটি অ দিয়ে শব্দ। কয়েকবার পঙক্তি দুটি উচ্চারণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিকই শোনাচ্ছে, আকুল শব্দটি এখানে দরকার। কূল কিনারাহীন এই আলোর ব্যপ্তি।

এটা কবিতা, না গান? মনের মধ্যে একটু একটু বেহাগের সুর এসে যাচ্ছে। যেন গান হওয়াই এর দাবি। দাঁড়াও, আমার আঁখির আগে...না, কমা দেবার দরকার নেই। সে এসে দাঁড়িয়েছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি!

আবার বাধা পড়ল, কে যেন ডাকল, গুরুদেব, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

সেরেস্তার কর্মচারীরা সবাই জানে, রাত্রে জমিদারমশাই লেখালিখি করেন, সে জন্য কেউ কোনও কাজের কথা নিয়েও বিরক্ত করতে আসে না। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে যে শিক্ষকরা এসেছেন, তাঁরা জানেন না।

কোনও দুঃসংবাদ এসেছে ভেবে রবীন্দ্রনাথ তড়িঘড়ি বাইরে চলে এলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল নামে শিক্ষকটি বললেন, গুরুদেব একটা খবর দিতে এলাম—

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, আপনি এই আশ্রমের গুরুদেব। সবাই আপনাকে গুরুদেব বলেই সম্বোধন করবে। কিন্তু তখন তা বিশেষ চলেনি। সতীশ এসে গুরুদেব বলা শুরু করেছিল। ছাত্রদেরও সে বলত, তোমরা ওঁকে কী বলে ডাকবে? রবীন্দ্রবাবু তোমাদের মুখে মানায় না, তোমাদের রবীন্দ্রদাদাও হতে পারেন না। আর রবীন্দ্রকাকা কিংবা রবীন্দ্রজ্যাঠাও বিদঘুটে শোনাবে। তোমরা সবাই বলবে গুরুদেব! এখন সেই ডাকটিই চালু হয়ে গেছে। তাই শুনে বন্ধু প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সে কী, ছিলে কবি, হয়ে গেলে গুরুদেব; কবিকে কি গুরুর ভূমিকায় মানায়? এর পরে প্রণয় কাব্য লিখবে কী করে?

রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে? কী হয়েছে? ছেলেদের কারুর—

ভূপেন্দ্র বললেন, আজ্ঞে না। ছেলেরা সব ঠিকই আছে। তবে মোহিতবাবু নদীর ঘাটে পা ধুতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। খুব কাতরাচ্ছেন। বোধহয় পা ভেঙেছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন না, হাসলেন পর্যন্ত। এই নিয়ে তিনজন হল। ছাত্রদের

নিয়ে উদ্বেগ থাকার কথা, তার বদলে শিক্ষকরাই নানান কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। নদী-নালার দেশে ঘোরাফেরার অভ্যেস নেই, এর আগে আরও দু' জন শিক্ষকের পা মচকেছে। পদমর্যাদার প্রতি শিক্ষকদের এই অবহেলা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

মোহিতবাবুর পা ভেঙেছে না মচকেছে তা দেখার জন্য এই রাত্রে রবীন্দ্রনাথের ছুটে যাবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। আপাতত তিনি নিজেই নিজের পদসেবা করুন। এই কথাটা বুঝিয়ে দেবার পরও ভূপেন্দ্র নড়লেন না। তাঁর বোধহয় ব্যাঙ ও ঝিঁঝির ডাকে ঘুম আসছে না। তিনি একটু গল্পগুজব করতে চান। শুরু করলেন, এ কথা সে কথা।

রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই কারুকে চলে যেতে বলতে পারেন না। কারুকেই বলতে পারেন না, এখন আমি ব্যস্ত আছি, আপনি পরে আসবেন। এমনই তাঁর সৌজন্যবোধ যে অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর কথাবার্তা শোনার সময়েও সামান্য বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে না তাঁর মুখে। এখন তার মনের মধ্যে যে একটি অসমাপ্ত কবিতা পাখির মতন ছটফট করছে, সে কথা কী করে এই ব্যক্তিকে বোঝাবেন!

ভূপেন্দ্র বাজারদর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যন্ত নানা কথা বলে যেতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথ হুঁ, তাই তো, সে তো বটেই বলে দায় সারছেন। এক সময় ভূপেন্দ্র বললেন, আচ্ছা গুরুদেব, ইংরেজরা যে এই বাংলাকে ভাগ করতে চলেছে, এতে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে না! আপনি কী মনে করেন?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, সে বিষয়ে তো আর উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। মনে হয়, ইংরেজ সরকার ভুল বুঝতে পেরেছেন। লর্ড কার্জন ইংল্যান্ডে রয়েছেন, আর তো বঙ্গভঙ্গের সম্ভাবনা দেখি না। ও বিষয়ে উত্তেজিত না হয়ে এখন আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি বোধহয়।

শেষ ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে ভূপেন্দ্র নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

নিজের কক্ষে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কবিতাটি এর মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। লাইনগুলি মনেই পড়ছে না। কাগজে লেখেননি, মনে মনে রচনা করছিলেন, তবে কি চিরতরে হারিয়েই গেল? না, অনেক সময় আবার ফিরে আসে। 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', এই প্রথম লাইনটি মনে গেঁথে গেছে, পরে কবিতাটা আবার লিখতে হবে।

এবার তিনি একতাড়া কাগজ ও কলম নিয়ে বসলেন। কবিতা অতি সূক্ষ্ম শিল্প, জোর করে লেখা যায় না। গদ্য তবু সম্ভব। বঙ্গদর্শনের জন্য নৌকাডুবি উপন্যাসের কিস্তি লেখা যে বাকি পড়ে যাচ্ছে।

লিখতে লিখতে লেখার টেবিলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়। হ্যাজাক বাতিটা জ্বলতেই লাগল এক পাশে।

পরদিন সকালেই খবর পাওয়া গেল, সেই ছাত্রটির জ্বর কমেনি, মুখে বসন্তের গুটি উঠেছে। তা হলে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। অচিরেই পাততাড়ি গুটিয়ে দলবল নিয়ে ফিরতে হবে কলকাতা।

৭৩

স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই খুব বাসনা ছিল, দুটি কন্যার পর তাঁদের তৃতীয় সন্তানটি হবে পুত্র। পুত্রই বংশের ধারা বহন করে নিয়ে যায়। অভিজাত বংশে পুত্রই খেতাব ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কার্জন তাঁর ভাবী পুত্র-সন্তানের নামও ঠিক করে রেখেছিলেন। ভারী সুন্দর নাম, ইরিয়ান ডোরিয়ান। কিন্তু হায়, নিয়তির বিচিত্র কৌতুক কে বুঝতে পারে! যথাসময়ে মেরি আবার একটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। মেরি তখন ইংল্যান্ডে, কার্জন কলকাতায়। খবর পেয়ে কার্জন নিজে তো

নিরাশ হয়েছিলেন বটেই, কিন্তু আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন স্ত্রীর জন্য। মেরির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবার তিনি পুত্রবতী হবেনই, এই ব্যর্থতায় তিনি বোধ হয় ভেঙে পড়বেন। কার্জন মেরিকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলেন, মেয়েরও একটি মিষ্টি নাম রাখলেন নালডেরা। অধিকাংশ ইংরেজ পরিবারেই দশ-বারোটা নাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখা হয়, জর্জ আর মেরি, স্মিথ আর জুলি, হ্যারি আর পামেলা প্রায় প্রতি ঘরে। কার্জনের ঝোঁক অপ্রচলিত, অসাধারণ নামের দিকে।

আতুর অবস্থা কাটিয়ে ওঠার কিছুদিন পরেই অজ্ঞাত এক রোগের বীজাণু সংক্রমণে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মেরি। কার্জন যখন লন্ডনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন মেরির একেবারে মরণাপন্ন অবস্থা, চিকিৎসকরা কোনও ভরসা দিতে পারছেন না। পত্নীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট কার্জনকে দেখে তাঁর পূর্বপরিচিতরা প্রায় চিনতেই পারে না। কোথায় সেই অহংকারী, বলদৃপ্ত পুরুষ? কার্জনের মুখখানি রক্তশূন্য, চোখ দুটি বিপন্ন বালকের মতন। মেরি অকালে চিরবিদায় নিলে কার্জনও যেন আর বাঁচবেন না। এ শুধু তীব্র ভালবাসা নয়, পরম নির্ভরতা। কার্জনের স্বভাবই এমন। এ পর্যন্ত কারুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়নি। স্কুল কলেজ জীবনের সাথিদের সঙ্গেও খোলামেলা কথাবার্তা বলতে পারেননি, সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার কেতাব-দুরস্ত, কঠিন ভদ্রতায় মোড়া, তিনি তাঁর আত্মম্ভরিতা কখনও চাপা দিতে পারেন না। একমাত্র মেরিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, তাঁর নর্মসঙ্গিনী। মেরির কাছে তাঁর কোনও কথাই গোপন থাকে না, মেরির সামনে তিনি অনায়াসে ছেলেমানুষি করতে পারেন।

মেরি চলে গেলে তিনি বাঁচবেন কী করে? চিকিৎসকদের কথাতেও কার্জনকে হাসপাতালে মেরির কক্ষ থেকে সরানো যায় না। কার্জন এক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকেন মেরির মুখের দিকে। মেরির দু' চক্ষু বোজা, কথা বলারও শক্তি নেই, কিছুই খেতে পারছেন না। যেন যে-কোনও মুহূর্তেই প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাবে।

এক সময় মনে হল, মেরি ফিসফিস করে কী যেন বলছেন আপন মনে।

কার্জন ব্যস্ত হয়ে নিজের কান ঝুঁকিয়ে দিলেন মেরির ঠোঁটের কাছে।

খুব-অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন, মেরি বলছে, ইরিয়ান-ডোরিয়ান, আমাদের ছেলে, সে এল না। তোমাকে আমি পুত্রসন্তান দিতে পারলাম না।

কার্জন ব্যাকুলভাবে বললেন, ডারলিং, ও নিয়ে একদম চিন্তা কোরো না। নালডেরা তো এসেছে। কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, ওকে নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। ইরিয়ান-ডোরিয়ান পরে আসবে।

মেরি মাথা নাড়াবার চেষ্টা করে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, না, আর সে আসবে না। আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। শেষ।

কার্জন বললেন, আমরা দুজনেই একদিন শেষ হয়ে যাব। আমরা চলে যাবার পর আমাদের ছেলে রইল কি মেয়ে রইল, তাতে কী আসে যায়!

মেরি বললেন, আমি আগে চলে যাব। তোমাকে ছেড়ে—

কার্জন বললেন, তা হলে আমারও বেশি দেরি হবে না। মেরি, প্রিয়তমে, যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে, সেখানে গিয়ে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো?

মেরি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, হ্যাঁ জর্জ, আমি অপেক্ষায় থাকব। আমাদের দুজনের সমাধি হবে পাশাপাশি, মার্বেল পাথরের দুটি মূর্তি গড়াতে বলে দিয়ো, সেই মূর্তি দুটি চেয়ে থাকবে মুখোমুখি।

তারপর মেরি চোখ বুজলেন।

এর পরেও নিয়তির বিচিত্র খেলা চলল। নিয়তিই যেন একেবারে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনল মেরিকে। চিকিৎসকদের হতবাক করে দিয়ে হঠাৎ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন মেরি। সঙ্কট কেটে গেল।

কার্জন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। লন্ডনের অভিজাত সমাজ তাঁকে পাবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল, কার্জন শুরু করলেন মেলামেশা।

কার্জন যদিও দ্বিতীয় বারের জন্য ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে নিয়োগপত্র পেয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর পরিচিতরা অনেকে বলাবলি করতে লাগল, কার্জনের আর ভারতে ফিরে না যাওয়াই উচিত। ওই অস্বাস্থ্যকর দেশে বেশিদিন থাকার দরকার কী ? মেরির যা শরীরের অবস্থা, তাঁর পক্ষে এখন কলকাতায় ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। কার্জনের শরীর ভাল থাকে না মাঝে মাঝে। লন্ডনে থাকলে শুধু যে স্বাস্থ্যোদ্ধার হবে তাইই নয়, আরও বড় কাজের জন্য তিনি চেষ্টা চালাতে পারবেন। কার্জন কি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না ? তাঁর যোগ্যতা কম কীসে ? শুধু গভর্নর জেনারেল হয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন কেন ? প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি সমস্ত গভর্নর জেনারেলদের চালনা করতে পারবেন।

মেরিরও সেরকমই ইচ্ছে। তাঁর মতে, তাঁর স্বামীই প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। মেরি জানেন, তিনি আমেরিকান বলে ইংল্যান্ডের অভিজাত সমাজের অনেক মহিলারা তাঁর আদব-কায়দার জ্ঞানের অভাব কিংবা বাড়াবাড়ি দেখে আড়ালে হাসাহাসি করে। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হলে আর কেউ পরিহাস করার সাহস পাবে ?

কার্জন অবশ্য ভারতে ফেরার জন্য বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর আছে অবশ্যই, কিন্তু তার জন্য ব্যস্ততার কী আছে ? কোনও কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে ফেলে চলে আসা কার্জনের স্বভাববিরুদ্ধ। ভারতে তাঁর আরব্ধ কার্যগুলি সম্পন্ন করতেই হবে। সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, অর্থাৎ বঙ্গদেশ টুকরো টুকরো করার যে প্রস্তাব তোলা হয়েছে, তাও কার্যকর করতে হবে। তিনি এমন একটা ব্যবস্থা করে আসতে চান, যাতে ভারতবাসী চিরকালের জন্য মনে করে যে সেখানে ইংরেজ শাসন অতি আদর্শ এবং দৈব আশীর্বাদ। তা ছাড়া সেনাবাহিনীর প্রধান লর্ড কিচনারের সঙ্গে তাঁর যে মতবিরোধ শুরু হয়েছে, তার মীমাংসা না করে ভারত ছেড়ে চলে এলে সেটা পরাজয়ের মতন মনে হবে না ! কোনও ব্যাপারেই পরাজয় স্বীকার করা জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জনের ধাতুতে নেই।

নিয়তি কার্জনকে নিয়ে যে পাশা খেলছে তার একটি অতি শক্তিশালী ঘুঁটি হল ভারতের সেনাধ্যক্ষ লর্ড কিচনার। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধজয়ী এই কিচনার আপামর ইংরেজ জনসাধারণের কাছে জাতীয় বীরের সম্মান পায়। কার্জন নিজেই কিচনারকে ভারতের সেনাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইংরেজরা যাকে এত বড় বীর মনে করে সে কার্জনের অধীনে কাজ করবে, এতে কার্জনের অহমিকা তৃপ্ত হবে।

কিন্তু কিচনার কারুর অধীনে থাকার পাত্র নন। দম্ভ ও আত্মাভিমানে তিনি কার্জনের চেয়ে মোটেই কম যান না। বরং বলা যায়, কূটবুদ্ধি ও মানবচরিত্র বোঝার ক্ষমতা কার্জনের চেয়েও তাঁর বেশি। এই দুজনের চেহারা ও চরিত্র যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। কার্জন রূপবান ও সুপুরুষ, আর কিচনার এক প্রবল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রায় সওয়া ছ' ফুট লম্বা, সেই রকমই স্বাস্থ্যবান, কিচনার যেন প্রায় একটি দৈত্য, মস্ত বড় মুখখানিতে প্রধান দ্রষ্টব্য তাঁর গোঁফ। কার্জন কথা বলেন শান্ত গম্ভীর স্বরে, প্রতিটি শব্দ মেপে আর কিচনারের কণ্ঠে যেন বাঘের গর্জন। কার্জন অভিজাত ভদ্রতার প্রতিমূর্তি আর কিচনারের নিষ্ঠুরতার বহু কাহিনী প্রচলিত। খারটুম জয় করে সেখানকার নেতা মেহদির মুণ্ড কেটে আনার পর কিচনার সেটাকে রেখে দিয়েছিলেন নিজের টেবিলে। করোটিটা পরিষ্কার করে সোনা বা রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে তারপর সেটা দিয়ে একটা দোয়াতদান বা পানপাত্র বানাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। খবর পেয়ে স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়া সেই মুণ্ডটিকে কবর দেবার অনুরোধ জানান।

কার্জন বিবাহিত এবং পত্নী-প্রেমে মুগ্ধ, কিচনার বিবাহ করেননি, কিন্তু অনেক রমণী পরিবৃত হয়ে থাকতে পছন্দ করেন। ইংলন্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পুত্রবধূর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব আছে। সিমলা ও কলকাতায় কিচনারের দুটি আস্তানা। এই দুটি প্রাসাদই প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী দিয়ে সজ্জিত। কার্জন যেমন মাঝে মাঝে বড় বড় পার্টি দেন, তাঁকে টেক্কা দিয়ে কিচনার আরও বেশি আড়ম্বর ও ব্যয়বহুল

পার্টি দিতে শুরু করেছেন। যেদিন বিশেষ অন্তরঙ্গ পাঁচ-ছ'জনকে নেমন্তন্ন করেন, সেদিন বেরোয় সোনার সেট। কাপ, প্লেট, থালা, গেলাস, কাঁটা-চামচ সব খাঁটি সোনার। সমস্ত অর্থই খরচ হয় সেনাবাহিনীর তহবিল থেকে। হিসাবরক্ষকরা আপত্তি জানালে কিচনার তা তোয়াক্কা করেন না। কিচনারের নিজস্ব জুড়িগাড়িটি টানে দুটি বিশালকায় কুচকুচে কালো ঘোড়া, অমন ঘোড়া এদেশে বুঝি আর একটিও নেই। সহিস রাখেন না। প্রায়ই কিচনার নিজেই সে গাড়ি চালিয়ে হাওয়া খেতে যান, এক হাতে রাশ ধরা, অন্য হাতে চুরুট, কিচনার যখন প্রচণ্ড জোরে সেই গাড়ি হাঁকিয়ে যান, কলকাতার নাগরিকরা শঙ্কামিশ্রিত মুগ্ধতায় হাঁ করে চেয়ে থাকে।

এ হেন কিচনারের সঙ্গে কার্জনের যে সংঘাত বাধবে তা যেন অবধারিত।

কিচনার আসবার আগে থেকেই কার্জন সেনাবাহিনীকে চটিয়ে রেখেছেন। অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যই ভারতীয়দের মানুষ বলেই গণ্য করে না। সব সময় মনের মধ্যে একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে রাখাই যেন একটা দেশকে পদানত করার সফলতম উপায়। কুকুর-বিড়ালকে যেমন যখন-তখন লাথি মারা যায়, সেইরকম ভারতীয় কর্মচারীদেরও লাথি-চড়-ঘুঁষি মারতে বিবেকের কোনও দায় নেই। আর্দালি, পাচক, সহিস শ্রেণীর লোকরা এই রকম মার খেয়ে কখনও কখনও মরেও যায়, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। অনেক দিন থেকেই এরকম চলে আসছে, লেফটেনান্ট গভর্নর বা ভাইসরয়ের মতন উচ্চ পদাধিকারীদের কাছে এসব খবর পৌঁছায় না, পৌঁছলেও কান দেন না। কিন্তু প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে কার্জনের নজর, ইংরেজদের কোনও রকম বর্বর ব্যবহার তিনি সহ্য করতে রাজি নন। কার্জনের মতে, ইংরেজরা তো শুধু এ দেশ শাসন বা শোষণ করতে আসেনি, তারা এই মূর্খ, দরিদ্র দেশের মানুষদের সভ্যতা দান করতে এসেছে। এ দেশের শিল্প-পুরাকীর্তিগুলি দেখলে বোঝা যায়, এককালে এরা সম্পন্ন ছিল, সভ্য ছিল, এখন একেবারে অধঃপতিত হয়ে গেছে। নিজেদের দেশ শাসন করার ক্ষমতাও এদের নেই, তাই তো ইংরেজরা দেশ শাসনের দায়িত্ব বহন করতে এসেছে, এদের আবার সভ্য করতে এসেছে। শ্বেতাঙ্গরা স্বেচ্ছায় এই কৃষ্ণাঙ্গদের দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছে। এদের সামনে ইংরেজরা যদি অভদ্র, অশোভন বা বর্বরোচিত ব্যবহার করে, তাতে তো ইংরেজ জাতিরই দুর্নাম হয়। ইংরেজরা যে শিক্ষায়, সভ্যতায়, ভদ্রতায় চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করছে, তা এদের সব সময় বোঝানো দরকার। তা ছাড়া, ইংরেজ সরকার এ দেশে উপহার দিয়েছে একটা সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা, সেখানে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদেরও শাস্তি পেতে হবে। নইলে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা থাকবে কী করে ?

ইংরেজ কর্মচারী, সেনাবাহিনী বা চা-বাগানের মালিকরা কারুর ওপর নৃশংস অত্যাচার করেছে শুনলেই কার্জন ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বুটের আঘাতে কোনও নিরীহ মানুষকে মারার জন্য কোনও ইংরেজকে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করা হয় না। সে রকম ঘটনা ঘটলে ইংরেজ সৈন্যও নিস্তার পাবে না। চা বাগানের মালিকরা নিজেদের এলাকাটাকে নিজস্ব সাম্রাজ্য মনে করে, কুলিরা যেন ক্রীতদাস, তাদের বেত্রাঘাত করা কিংবা কুলি রমণীকে উলঙ্গ করিয়ে ঘোরানোর কথা প্রায়ই শোনা যায়, কার্জন সঙ্গে সঙ্গে ওইসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন।

এই নিয়ে সেনাবাহিনী ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কার্জনের খুব কাছাকাছি লোকরাই যে তাঁর এত বাড়াবাড়ি পছন্দ করছেন না তা তিনি বুঝতে পারেন না। চূড়ান্ত ব্যাপার ঘটেছিল, নবম ল্যান্সার বাহিনীর একটি ঘটনায়।

এই অশ্বারোহী বাহিনী অতি সুখ্যাত ও সেনাবাহিনীর গর্ব। ব্রিটেনের বনেদি বড় বড় ঘরের ছেলেরা ছাড়া অন্য কেউ এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ পায় না। প্রতিটি স্বাস্থ্যবান তরুণের পোশাক স্বর্ণখচিত, বহুমূল্য ও উজ্জ্বল, তাদের বীরত্বেরও প্রসিদ্ধি আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদের বিরুদ্ধে তারা সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তারা সরাসরি এসেছে ভারতে, তাদের স্থান হয়েছে শিয়ালকোট সেনাবাসে। প্রথম দিন দীর্ঘপথ পেরিয়ে পৌঁছবার পর শুরু হয়েছিল দারুণ খানাপিনা। সেই সঙ্গে নাচ-গানের হুল্লোড়। কিছুটা নেশা হবার পর কয়েকজন যুবকের মনে হল, ভারতের মেয়েরা কী রকম ? একটু চেখে দেখলে হয় না ? দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের

সময় প্রচুর নারীর ওপর বলাৎকার করা হয়েছে, ভারতের নারীরা কি তাদের চেয়ে আলাদা ?

আটু নামে একজন আর্দালি ছিল সেখানে, তাকে হুকুম করা হল, এই, কয়েকটা মেয়ে জোগাড় করে আন তো।

আটু রাজি হল না। যতই নিচু পদের হোক, সেও একজন সরকারি কর্মচারী। ওপরওয়ালার লালসা মেটাবার জন্য নারী সংগ্রহ করা তার কাজ নয়। গোঁয়ারের মতন মুখের ওপর বলে দিল সে কথা। তাকে ভীতি প্রদর্শন, বখশিসের লোভ দেখিয়েও কাজ হল না। তখন শুরু হল মার। দু' তিনজন তরুণ সেনানী আটুকে ঘিরে ধরে লাথি আর ঘুঁষি চালাতে লাগল। আটুর একটা চোখ উপড়ে বেরিয়ে এল, ভেঙে গেল পাঁজরের বেশ কয়েকটা হাড়, সে অচৈতন্য হয়ে যাবার পরেও কিছুক্ষণ চলল প্রহার। তারপর রক্তাপ্লুত অবস্থায় সে বারান্দায় পড়ে রইল সারা রাত। পরদিন বেলা বাড়ার পর আটুকে হাসপাতালে পাঠানো হল বটে, কিন্তু আটু বাঁচল না।

এই সব ঘটনা চাপা দেওয়া মোটেই শক্ত না। একজন নেটিভ মারা গেছে, তাতে কী হয়েছে ? কারুর কোনও শাস্তি হল না। এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার, ভারতের বড়লাটের কর্ণগোচর হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু লর্ড কার্জন নিজের নামের প্রতিটি চিঠি খুলে পড়েন, নিজে উত্তর দেন। আটুর কয়েকজন আত্মীয় সরাসরি ঘটনাটি জানিয়ে সুবিচারের আবেদন করে। সে চিঠি পড়েই কার্জন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এ তো খুন! খুনিরা শাস্তি পাবে না ? ভারতীয়রা তা হলে ইংরেজ শাসকদের শ্রদ্ধা করবে কেন ? শ্বেতাঙ্গ হলেই কোনও কালো মানুষকে যখন তখন হত্যা করেও নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, এটা কার্জন কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নন !

কার্জন তদন্তের আদেশ দিলেন। তখন তাঁকে জানানো হল যে আটুর মৃত্যুর পর একটা কোর্ট অব এনকোয়ারি হয়েছিল, কারুর কোনও দোষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওটা একটা দুর্ঘটনা। কার্জন বুঝলেন এটা একটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা মাত্র। তিনি তখন সেনা বাহিনীর প্রধানকে বলেছিলেন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। দুই সেনাধ্যক্ষের ওপর আবার নতুন করে তদন্তের ভার দেওয়া হল। তাতেও একটি অশ্বডিম্ব প্রসব হল।

কার্জন আগেও কয়েকবার দেখেছেন, ভারতীয়দের ওপর অন্যায় অত্যাচার করলে কোনও শ্বেতাঙ্গকেই শ্বেতাঙ্গ বিচারকরা শাস্তি দেবার সুপারিশ করে না। বরং নিজের জাতভাইদের আড়াল করার চেষ্টা করে সব সময়। আর ভারতীয় বিচারকদের মানবেই না শ্বেতাঙ্গরা। এবারেও জানানো হল যে নবম ল্যান্সার বাহিনীর কোনও দোষই নেই, ওই আটু লোকটা ছিল একটা মাতাল, লম্পট, মিথ্যেবাদী, ওই রাতে সে ওই সেনা শিবিরে ছিলই না।

কার্জন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা তাঁর বীজমন্ত্র। সেনাবাহিনী যদি এরকম যদৃচ্ছ কারবার চালিয়ে যায়, তাদের শাস্তি না হয়, তা হলে কোনও ভাইসরয়ই তাদের শৃঙ্খলা আরোপ করার সাহস পাবে না। নবম ল্যান্সার বাহিনীতে ডিউক, আর্লদের ছেলেরা রয়েছে তো কী হয়েছে, তাদের যে-কোনও বাঁদরামি সহ্য করতে হবে ? প্রকৃত দোষীদের নাম কেউ প্রকাশ করল না বলে কার্জন স্বয়ং ওই পুরো রেজিমেন্টকেই শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। আগামী ছ' মাসের জন্য সকলের ছুটি বন্ধ, যারা ছুটিতে ছিল, তাদেরও ডেকে এনে ছুটি বাতিল করা হল।

শুধু সৈনিকেরাই নয়, ভারতের সকল শ্রেণীর ইংরেজই কার্জনের এই উগ্রতায় অসন্তুষ্ট হল। সুখ্যাত নবম ল্যান্সার বাহিনীকে এমনভাবে অপদস্থ করা মোটেই উচিত হয়নি। তাও কিনা সামান্য একটা আর্দালির জন্য। কার্জনের এত নেটিভ-প্রেম কেন ? লর্ড ক্যানিংয়ের মতন, লর্ড রিপনের মতন, এই লর্ড কার্জনও 'নিগার'দের প্রতি ভালবাসায় গদগদ ?

এইসব বার্তা লন্ডনেও পৌঁছল, সেখানেও অনেকেই মনে করল, কার্জনের ঔদ্ধত্য যেন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেনাধ্যক্ষদের অগ্রাহ্য করে কার্জন নিজের আধিপত্য জাহির করেছেন। সম্রাটও এই বিবরণ শুনলেন এবং জানালেন যে কার্জন অহেতুকভাবে কঠোর শাস্তি দিয়ে ঠিক করেননি। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় রইলেন কার্জন।

এরপর কিচনার সেনাপতি হয়ে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেলেন যে ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর মধ্যে কতখানি ক্ষোভ রয়ে গেছে। তিনি সরাসরি কার্জনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গেলেন না। এমনি বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রইল, কার্জন দম্পতিকে তিনি নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, মেরির সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করেন। কিন্তু কিচনার প্রথম থেকেই ঠিক করে নিয়েছেন, তিনি তাঁর ওপরে অন্য কারুর কর্তৃত্ব মানবেন না। সেনাবাহিনীর সব অফিসারদেরও তিনি দলে পেয়ে যাবেন। কিচনারের চেহারা অত বিশাল হলেও তাঁর আক্রমণ পদ্ধতি খুব সূক্ষ্ম।

এতকাল ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সেনাপতিরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। প্রধান সেনাপতি যুদ্ধনীতি ঠিক করবেন, কোন বাহিনীকে কোথায় পাঠানো হবে কিংবা পদোন্নতি, শৃঙ্খলারক্ষা ইত্যাদির দায়িত্বও তাঁর, কিন্তু অর্থ বরাদ্দ, রসদ সংগ্রহ ইত্যাদি ঠিক করেন ভাইসরয়ের একজন সামরিক উপদেষ্টা। এই সামরিক উপদেষ্টাটি পদমর্যাদায় প্রধান সেনাপতির অনেক নীচে, কিন্তু ইচ্ছে করলে তিনি প্রধান সেনাপতির কিছু কিছু চাহিদা বাতিল করে দিতেও পারেন।

কিচনার বললেন, ওই সামরিক উপদেষ্টার পদটি তুলে দেওয়া হোক। কার্জন তাতে রাজি হতে পারেন না, তা হলে প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা একেবারে লাগাম ছাড়া হয়ে যায়। কিচনার প্রকৃতপক্ষে সেটাই চান। কার্জন তাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিচনার অনড়। মোক্ষম চাল চাললেন কিছুদিন পর। সামরিক উপদেষ্টা স্যার এডমন্ড এলিশ একটা খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, কিচনার তাতে অসম্মতি জানিয়ে সই দিতে রাজি হলেন না। এমনকী পদত্যাগেরও হুমকি দিলেন।

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। লর্ড সলসবেরির পর তাঁরই আত্মীয় লর্ড বেলফুর প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বয়েসে কার্জনের চেয়ে কিছুটা বড় হলেও তিনি অনেক দিনের পরিচিত, কার্জনের প্রায় বন্ধুস্থানীয় বলা যায়। সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া হয়েছেন সেন্ট জন ব্রডরিক, ভারত শাসনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এঁরই মতামত নিয়ে চলেন। এই ব্রডরিক কার্জনের সহপাঠী, কার্জনদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েও থেকেছেন কয়েকবার। সুতরাং কার্জন এই ভেবে নিশ্চিন্ত রইলেন যে প্রধানমন্ত্রী এবং ভারত সচিব তাঁকেই সমর্থন করবেন।

কার্জন নিজের রূপ-গুণ-ক্ষমতায় নিজেই এত মুগ্ধ যে তাঁর আত্মরতি অনেকটা নার্সিসাসের মতন। তিনি অন্যের দিকে তাকান না। তিনি খেয়ালই করেননি যে রাজনীতিতে বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রী হবার আগেকার বেলফুর আর পরের বেলফুর এক মানুষ নন। ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্জনের নাম যদি কেউ ফিস ফিস করেও উচ্চারণ করে, তবে তা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সহ্য করবেন কেন ? কার্জনের ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ বেলফুর মোটেই সুনজরে দেখছেন না। বাল্য সখা ব্রডরিকও এখন কার্জনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। কার্জন মনে করেন ভারত শাসনের সম্পূর্ণ রাশ তাঁর হাতে, তাঁর ভাবভঙ্গি মোগল সম্রাটদের মতন, কিন্তু ভারত সচিবের সম্মতি ছাড়া কোনও নীতিই কি বিধিবদ্ধ হতে পারে ? দূর থেকে সমস্ত কলকাঠিই তো নাড়ছেন ব্রডরিক। কার্জনকে বেশি উঁচুতে উঠতে দিতে তিনি রাজি নন।

তা ছাড়া, কিচনারের পদত্যাগের হুমকি লঘুভাবে নেওয়া যায় না। কিচনার একজন জাতীয় বীর। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। তিনি সত্যিই পদত্যাগ করলে এই সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষ রুষ্ট হতে পারে, পরবর্তী নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে, ভোট অনেক কমে যেতে পারে।

মেরি কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর কার্জন যখন বাইরে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলেন, তখন আস্তে আস্তে টের পেলেন, কিচনার ওপর মহলে গোপনে চিঠি চালাচালি করছেন। এটা গর্হিত কাজ। সেনানায়কের চিঠিপত্র ভাইসরয়ের দফতর মারফত আসা উচিত। তবু কার্জন আত্মবিশ্বাসে অটল রইলেন। তাঁর ধারণা, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কখনও ভাইসরয়ের চেয়ে সেনাপতির দাবিকে গুরুত্ব দিতে পারে না।

কার্জনের অনুপস্থিতিতে মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড অ্যান্টাহিল অস্থায়ী ভাইসরয় হিসেবে কাজ

চালাচ্ছেন। কার্জন চিঠিপত্রে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। ভারতের খবরাখবর পান। একদিন কার্জন পিকাডেলি সার্কাস দিয়ে গাড়িতে আসতে আসতে ভাবলেন, অনেক দিন লন্ডনের রাস্তা দিয়ে হাঁটা হয়নি। আসন্ন শীতে ক্রিসমাসের প্রস্তুতি চলছে, শহর খুব সুন্দরভাবে সেজেছে, পায়ে হেঁটে না ঘুরলে এই রূপ ঠিক উপভোগ করা যায় না।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে কার্জন হাঁটতে লাগলেন। বিকেল হতে না হতেই আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে কুয়াশা। দোকানগুলিতে বিজলি বাতি জ্বলছে। টিপি টিপি বৃষ্টি শুরু হল। কার্জনের কাছে ছাতা নেই, রেন কোট আনেননি, তবু হাঁটতে ভালই লাগছে তাঁর। বৃষ্টি কিছুটা জোরালো হতে তিনি একটি বাড়ির পোর্টিকোয় এসে দাঁড়ালেন। আরও অনেক পথ চলতি লোক জমেছে সেখানে, কিছুটা ঘেঁষাঘেঁষি করতে হচ্ছে।

হঠাৎ কার্জন খেয়াল করলেন, তাঁকে এখানে কেউ চেনে না। লন্ডনের রাস্তায় অন্য সব সাধারণ মানুষের মতনই তিনি একজন। কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না তাঁর দিকে, এমনকী দু' একজন তাঁকে ঠেলাঠেলি করে সরিয়ে দিচ্ছে। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের যে কোনও অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকলে কী হত? ভৃত্য-খিদমতগার-দেহরক্ষী মিলিয়ে অন্তত তিন চারশো জন ঘিরে থাকত তাঁকে। পুলিশ ও প্রশাসন কর্মীরা তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করত। এখানে তাঁর পাশে যেসব লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারা জানে না, তিনি লর্ড কার্জন, ভারতবর্ষের মতন বিশাল উপনিবেশের তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, রাজা-মহারাজ-নবাবরা তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে।

কার্জন ঠিক করলেন, তিনি ভারতে ফিরে যাবেন। কলকাতার মৃদু শীত অতি মনোরম। মেরির সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে ক্রিসমাস কাটিয়ে যাবারও ধৈর্য ধরতে পারলেন না।

কার্জন যদি ইংল্যান্ডেই থেকে যেতেন, দ্বিতীয়বার ভাইসরয় হিসেবে ভারতে ফিরে না আসতেন, তা হলে তাঁর নিজের ভাগ্য এবং ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য অন্য কোন দিকে প্রবাহিত হত কে জানে!

ডিসেম্বর মাসে কার্জন একা ফিরে এলেন কলকাতায়। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। কিচনারের সঙ্গে মতবিরোধ আপাতত ঝুলে রইল, অন্য একটি গুরুতর ব্যাপারে তাঁকে মনোনিবেশ করতে হল।

কার্জন যতদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন, তার মধ্যে ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার আর স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলি এই দু'জনে মিলে মনের আনন্দে বাংলার মানচিত্র কাটাকুটি করেছেন। বাংলা ভাগের যে পরিকল্পনা কার্জন দেখে গিয়েছিলেন, তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে অনেকখানি। প্রস্তাবিত নতুন রাজ্যটিতে উত্তর বাংলার আরও কয়েকটি জেলা জোড়া হয়েছে, মুসলমান প্রধান সব অঞ্চল ঢুকে গেছে এর মধ্যে, আরও সঙ্কুচিত হচ্ছে মূল বাংলা। সারা ভারতে আর কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্য গড়া হয়নি, বাংলা ভাগ করার সময় এই ধর্মের প্রশ্নটি এসে পড়ায় দৈবাৎ যেন অনেক সুফল পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মুসলমানরা প্রায় সকলেই এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে রাতারাতি ইংরেজ ভক্ত হয়ে গেছে, বাক্যবাগীশ হিন্দু বাঙালিরা হীনবল হয়ে যেতে বাধ্য।

বঙ্গভঙ্গের প্রধান রূপকার কার্জন নন, রিজলি ও ফ্রেজার, এই দুই রাজকর্মচারী। কার্জন ফিরে এসে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত এই নতুন রাজ্যটির পরিকল্পনা দেখে আপত্তি জানালেন না। ভারত সচিব ব্রডরিকের সম্মতি ছাড়া এটা কার্যকর হবে না, ব্রডরিক এখনও মত স্থির করতে পারেননি, তবু এরই মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। কার্জন তাতেই বেশ উৎসাহ বোধ করছেন। সরকারিভাবে ঘোষণার পর আন্দোলন নাকি তীব্র হবার সম্ভাবনা আছে, গোয়েন্দা বিভাগ এই রিপোর্ট দিয়েছে। বাঙালিরা কতটা আন্দোলন করতে পারে কার্জন তা দেখতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাঙালিদের উদ্দীপনা দু' দিনেই মিইয়ে যাবে। এ দেশের গরিব মানুষদের সম্পর্কে কার্জনের যতই সমবেদনা থাক, শাসনকার্যের ব্যাপারে এদেশীয়দের কোনও অধিকার দেওয়া দূরে থাক, কোনও সমালোচনাও তিনি সহ্য করতে রাজি নন।

সন্ধের পর কার্জনের বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। গৃহকর্ত্রী না থাকলে বাড়িতে লোকজনদের আমন্ত্রণ

জানানো যায় না। তিনি নিজেও অন্য কোথাও যেতে চান না। মেরি নেই, মেয়েরা নেই, এত বড় বাড়িটাকে একেবারে শূন্য মনে হয়। ফিরে আসার পর মেরির শয়নকক্ষে কার্জন একদিনও ঢোকেননি। একদিন সেই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, অকস্মাৎ তাঁর চোখে জল এসে গেল। কত যত্ন করে মেরি ঘরগুলি সাজিয়েছে, আর কি সে এখানে কখনও ফিরে আসবে! বছরের পর বছর কার্জনকে একাকী কাটাতে হবে রাত।

একজন কর্মচারী কিছু একটা বলতে আসতেই কার্জন চট করে চোখ মুছে ফেললেন। তাঁর কোনও দুর্বলতার পরিচয় অন্যরা জানতে পারে না। আবার তাঁর মুখমণ্ডল হয়ে গেল কঠোর অহংকারীর মতন। তিনি ভুরু তুলে বললেন, কী ব্যাপার?

কর্মচারীটি জানাল যে স্যার হেনরি কটন তাঁর দর্শনপ্রার্থী। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। জরুরি প্রয়োজনের কথা বলছেন।

কার্জন ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। হেনরি কটন? সেই নিমকহারামটা! এই হেনরি কটন কিছুকাল আগেও ছিল আসামের চিফ কমিশনার। ব্রিটিশ রাজকর্মচারী। এখন অবসর নিয়ে ভারত দরদি হয়ে উঠেছেন, এমনকী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কার্জন যে-কংগ্রেসকে ধ্বংস করে দিতে চান, তার প্রধান হয়েছেন হেনরি কটন, অর্থাৎ তাঁর প্রতিপক্ষ। হেনরি কটন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিপক্ষে। শাসনকার্যের সুবিধের জন্যই বঙ্গদেশ ভাগ করার প্রথম প্রস্তাব উঠেছিল, সেই শাসনকার্যের ব্যাপারে হেনরি কটনের দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং এ প্রস্তাব রদ করার জন্য তিনি সরকার পক্ষকে বুঝিয়ে বলতে চান।

বাঙালিদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন হেনরি কটন। তিনি কি চান একদিন একজন বাঙালিবাবু এসে গভর্নর হয়ে বসবে? সেটাই কার্জন চিরকালের মতন রুদ্ধ করে দিয়ে যাবেন।

কার্জন গম্ভীরভাবে বললেন, কটনকে বলে দাও, দেখা হবে না!

১৪

জানলা দিয়ে ভোরের আলো দেখা গেলেই ভরত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। রাত্রেও তার মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। একেবারে একলা কোনও বাড়িতে রাত্রি যাপন করলে একটানা ঘুম হয় না, মস্তিষ্ক বোধহয় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। যদিও এ বাড়ি সম্পর্কে ভূতের বাড়ি বলে যে রটনা ছিল, তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভরত পায়নি, কোনও অলৌকিক দর্শন হয়নি তার। ভরত অবশ্য প্রথম দিকে অনেক দিন ধরেই আশা করেছিল, কিছু একটা দেখা গেলে মন্দ হয় না। এই জীবন-সীমার পরপারে সত্যিই আর কিছু আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন বা ধন্দ কিছুতেই মেটে না। এর মধ্যে একবার মাত্র একটি চোর ঢুকে পড়েছিল, ঠিক সময়ে জেগে উঠে ভরত তাকে ধরেও ফেলেছিল প্রায়, সর্বাঙ্গে তেলমাখা চোরটি কোনওক্রমে পিছলে পালিয়ে যায়। সে যাই হোক, এর সঙ্গে অলৌকিকের কোনও সম্পর্ক নেই, চোরেরা অতিমাত্রায় লৌকিক।

ঘুম ভাঙার পর একটা নিমডাল দিয়ে দাঁতন করতে করতে ভরত বাগানে চলে আসে। নিজের হাতে সে যে-সব গাছ পুঁতেছিল, সেগুলি এর মধ্যে অনেকটা বড় হয়েছে। প্রত্যেকটি গাছের সামনে ভরত দাঁড়ায়, পাতায় হাত বুলোয়, গভীর তৃপ্তিতে তার বুক ভরে যায়।

এ পর্যন্ত ভরত হরেক রকম জীবিকা গ্রহণ করেছে, এবারেই নিজেকে সবচেয়ে সার্থক মনে হয়। এইসব গাছপালা তার নিজের সৃষ্টি। এক এক সময় ভারী আশ্চর্য লাগে। একটা গাছ এখানে ছিল না, ফাঁকা মাটি ছিল, ভরত একটা বীজ পুঁতেছিল, নিজে প্রতিদিন জল দিয়েছে, কয়েক বছরের মধ্যেই

সেখানে শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা করবী ফুলের গাছ, তাতে ফুল ফুটছে, সেই ফুলের মধু খেতে মৌমাছি-ভ্রমর আসছে, বাতাসে ছড়াচ্ছে মৃদু সৌরভ, এ সবই যেন ম্যাজিকের মতন। একটা কলাগাছে কত বড় মোচা বেরিয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কলাগাছের ডগা থেকে গোল হয়ে যে নতুন পাতা বেরোয়, সে রকম নরম সবুজ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি ? গাছগুলো যখন বাতাসে দোলে, তখন মনে হয় যেন ওরা হাসতে হাসতে কী সব বলাবলি করছে। হয়তো সত্যিই ওরা কিছু বলে, মানুষ সে ভাষা বোঝে না।

হেমচন্দ্রও আশা করেনি যে ভরতের মতন একজন যাযাবর সত্যি সত্যি মেদিনীপুরের এই খামারবাড়িতে স্থায়ী হয়ে বসবে এবং অতি যত্নের সঙ্গে বাগান গড়ায় মন দেবে। এখন ভরত ফলপাকুড় ও শাকসবজি বিক্রি করে ভাল পয়সা পায়, হেমচন্দ্রের সব ধার সে শোধ করে দিয়েছে। বাগানের প্রতি তার এমন টান যে ইদানীং সে গ্রামের দিকে স্বদেশি প্রচার করতেও বিশেষ যায় না। মানুষের বদলে গাছপালার সংসর্গেই যেন সে বেশি স্বস্তি বোধ করে। সারা দিন রোদে পুড়ে পুড়ে তার গায়ের রং ময়লা হয়ে গেছে, কিন্তু শরীর বেশ মজবুত।

আজও দু'জন মালিকে সঙ্গে নিয়ে ভরত বাগানের পরিচর্যা করছে, বেলা এগারোটার সময় একটি কিশোর এসে তাকে একটি চিরকুট দিল। হেমচন্দ্র এখনই তাকে একবার তাঁতশালায় যেতে বলেছে। খুব জরুরি।

হাতপায়ের ধুলোমাটি ধুয়ে ভরত গায়ে একটা জামা গলিয়ে নিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে।

তাঁতশালাটি মেদিনীপুর শহরের অন্যপ্রান্তে কাঁসাই নদীর ধারে। হজরত পীর লোহানির সমাধিক্ষেত্রর কাছে খাপরার চাল দেওয়া একটা লম্বা ঘর, তার দু'পাশে কয়েকটি ছোট ঘর আর চৌকো একটা উঠোন। বড় ঘরখানায় তিনখানা তাঁত আছে, তাতে দেশি কাপড় উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। আসলে এই তাঁতশালা গুপ্ত সমিতির একটি আখড়া, যে-সব বেকার ছেলে নিজেদের বাড়িতে থাকতে চায় না, দেশের কাজ করতে চায়, তাদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। হেমচন্দ্রই প্রধানত এটা চালায়।

হেমচন্দ্র বিবাহিত ও কয়েকটি সন্তানের পিতা হলেও নিজের বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকে। ভরত এসে দেখল, তাঁতঘরের মেঝেতে বড় বড় কাগজ ছড়িয়ে হেম রং-তুলি নিয়ে কী সব আঁকছে। ভরত পাশে গিয়ে বসতেই হেম বলল, ব্রাদার, অনেকদিন এখানে আসোনি, খবর শোনোনি বোধহয় ?

ভরত জিজ্ঞেস করল, কী খবর ?

হেম বলল, সত্যেনদা কলকাতা থেকে ফিরেছেন কাল। অনেকগুলি পত্রপত্রিকা নিয়ে এসেছেন। ইংরেজ সরকার সত্যি সত্যি এবার বাংলাকে টুকরো টুকরো করে দিতে উদ্যত হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম কী জানো, বাঙালির যা স্বভাব, মনের দুঃখে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে আর ইংরেজদের পায়ে ধরে কাকুতিমিনতি করবে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তা হয়নি ! সত্যেনদা দেখে এসেছেন, কলকাতায় প্রতিদিন প্রতিবাদ সভা হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে, ছাত্ররা সাহেব-পুলিশদের চোখ রাঙানি দেখেও ভয় পাচ্ছে না।

হেম সহজে উত্তেজিত হয় না, আবেগ প্রকাশ করে না। আজ তাকে বিচলিত দেখে ভরত বিস্মিত হল। নিরীহভাবে সে জিজ্ঞেস করল, ইংরেজ এ দেশ শাসন করছে, পুলিশ তার হাতে, সৈন্যবাহিনী তার হাতে, সে যদি ইচ্ছেমতন রাজ্যগুলি ভাঙাভাঙি করে, তাতে আমাদের আপত্তি জানাবার কী অধিকার আছে, আপত্তি জানিয়েই বা লাভ কী।

হেম বলল, ভারতে এতগুলি ভাষা, এতগুলি রাজ্য, আর কোনও রাজ্য ভাগ করেনি, শুধু বাংলাকেই ভাগ করতে চায়। কেন ? বাঙালিকে সে একটা শিক্ষা দিতে চাইছে। বাঙালির জীবনে এই একটা চরম পরীক্ষার সময়। বাঙালি মাথা নিচু করে এই শাস্তি মেনে নেবে, না রুখে দাঁড়াবে ? এইবার প্রমাণিত হবে, এই জাতির মেরুদণ্ড আছে না একেবারেই গেছে।

ভরত বলল, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার ! বাঙালি কী নিয়ে প্রবল শক্তিমান

ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে ? বাঙালির হাতে অস্ত্র আছে ?

অন্য একটি ছেলে বলল, ঠিকই বলেছেন, শুধু মিটিং করে কী হবে ? পুলিশ তাড়া করলেই পালাবে সবাই। অস্ত্র ছাড়া কোনও জাত উঠে দাঁড়াতে পারে না।

হেম বলল, আমারও এতকাল সেই ধারণাই ছিল। এই রাজশক্তিকে পাল্টা আঘাত হানা দরকার। তার জন্য অস্ত্র জোগাড় করতে হবে, শত শত তরুণকে ট্রেনিং দিতে হবে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন চুপ করে বসে থাকব ? আমার মা-বোনকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেলেও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব ? অস্ত্র অনেক রকম হতে পারে। সঞ্জীবনী কাগজে কৃষ্ণকুমার মিত্র সেইরকম একটা অস্ত্রের কথা লিখেছেন, তার নাম বয়কট। সেটা কী জানো।

অন্যরা চুপ করে আছে দেখে হেম আবার বলল, ইংরেজরা বেনের জাত। তাদের বাণিজ্যে আঘাত লাগলেই তারা সবচেয়ে বেশি আহত হবে। এখন থেকে আমরা সাহেবদের তৈরি সব রকম জিনিস বয়কট করব, মানে, ওদের কিছুই কিনব না। বিলিতি জুতো পরব না, বিলিতি কাপড় ব্যবহার করব না, ওদের চিনির বদলে আমাদের গুড় খাব—

ভরত বাধা দিয়ে বলল, আমাদের জুতো হয় নাকি ? কাপড়-চোপড় সবই তো আসে ম্যানচেস্টার-ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে।

হেম বলল, খড়ম পায়ে দেব কিংবা খালি পায়ে থাকব। বোম্বাই মিলের দিশি কাপড় পরব। দিশি কাপড়ের চাহিদা বাড়লে আবার গ্রামে গ্রামে তাঁত চালু হবে, লোকদের সিগারেট-চুরুট ছেড়ে বিড়ি খেতে বলব, বিলিতি মদের দোকানে পিকেটিং করতে হবে, মোট কথা, বিলিতি সব জিনিসের বিক্রি বন্ধ করতে হবে এদেশে। এটাই আমাদের অস্ত্র। আমাদের সমিতির কর্মীদের এই কাজে লেগে পড়তে হবে। তার আগে, কলকাতায় এত সভা আর মিছিল হচ্ছে, মেদিনীপুরে একটা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভা করতে পারব না ? সেই সভাতেই ঘোষণা করতে হবে বয়কটের কথা।

দুদিনের মধ্যেই কর্নেলগোলার একটা ফাঁকা মাঠে হয়ে গেল সেই সভা। লোক সমাগম হল আশাতিরিক্ত। হেম কিন্তু মঞ্চে উঠল না, সে সব কিছু সংগঠন করে আড়ালে থাকতেই ভালবাসে।

সভা যখন চলছে, তখন জনতার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে হেম ভরতকে বলল, এই আগস্ট মাসের সাত তারিখে কলকাতার টাউন হলে একটা বিরাট সভা হবে শুনেছি। বহু গণ্যমান্য লোক সেখানে উপস্থিত থাকবেন, সেখান থেকে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হবে কার্জন সাহেবের কাছে। আমি সেই সভায় যাব ঠিক করেছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কলকাতায় ?

ভরত একটু ইতস্তত করতে লাগল। আবার কলকাতায় ? না, তার ইচ্ছে করে না। এখনও কলকাতার নাম উচ্চারিত হলেই তার একটা পুরনো ক্ষতে জ্বালা ধরে। তার চেয়ে তার বাগানে অনেক শান্তি। গাছপালা মানুষকে আঘাত দেয় না। গাছপালার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয় না। পুকুরের জলে প্রতিদিন অবগাহনে শরীর জুড়িয়ে যায়, দুপুরবেলা লিচুগাছের ছায়ায় শুয়ে থাকলে ঘুম হয় বড় আরামের। এই সব ছেড়ে কলকাতার ধুলো-ধোঁওয়া আর মানুষের ঠেলাঠেলির মধ্যে যেতে কার ভাল লাগে ?

ভরত বলল, নাঃ, আমি কলকাতায় যাব না।

হেম ভ্রূ কুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর আপন মনেই বলল, পত্র-পত্রিকা পড়ে, সত্যেনদার কাছে সব শুনেটুনে মনে হল, এবার বড় কিছু একটা ঘটবে। একটা যেন বিস্ফোরণ হবে। এই সময় কলকাতা ছেড়ে দূরে বসে থাকার কোনও মানে হয় ? এতদিন ধরে আমরা এই রকম কিছুরই তো প্রতীক্ষায় ছিলাম।

ভরত বলল, তুমি ঘুরে এসো, তোমার কাছে সব শুনব।

হেম বলল, এই মেদিনীপুরেই তোমার শিকড় গেঁথে গেল ? তবু তো বিয়ে-থা করনি।

হেমের কণ্ঠস্বরে যে শ্লেষের আভাস আছে, তা গ্রাহ্য করল না ভরত। সে বলল, অনেক তো ঘুরলাম, অনেক জায়গায় থিতু হবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। এখানে কিছু গাছপালা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আর বোধহয় তাদের ছেড়ে কোথাও যাওয়া হবে না।

হেম বলল, আমরা তলোয়ার আর গীতা ছুঁয়ে শপথ নিয়েছিলাম, দেশের কাজের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করব না।

ভরত এবার বেশ বিস্মিত হয়ে বলল, সেই শপথের এখনও কোনও গুরুত্ব আছে নাকি? যিনি আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরই তো প্রায় দু' তিন বছর কোনও সাড়াশব্দ নেই। তা ছাড়া সভা-সমিতিতে বক্তৃতা শোনা কি দেশের কাজ নাকি?

হেম রাগতভাবে বলল, ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না।

খামারবাড়িতে ফিরে এল ভরত। সে হেমচন্দ্রর রাগের কারণ ঠিক বুঝতে পারে না। ইংরেজ সরকার ঠিক করেছে বাংলা ভাগ করবে, বাংলা থেকে অনেকগুলি জেলা কেটে নিয়ে জুড়ে দেবে আসামের সঙ্গে। এটা সরকারি নীতি, কার্যকর হবেই। সভা-সমিতি করে তা আটকানোর চেষ্টাটাই হাস্যকর। সাধারণ মানুষ সভায় এসে গরম গরম বক্তৃতা শুনতে ভালবাসে, তারপর বাড়ি ফিরে সব ভুলে যায়। এই যে মেদিনীপুর শহরে সভা হল, কত মানুষ এসেছিল, তার ফলটা কী হল? পুলিশ গ্রাহ্যই করেনি। সভায় যারা এসেছিল, তারা আবার যে-যার কাজে ফিরে গেছে। বয়কট? যার পয়সা আছে, সে বিলিতি জুতো পরবে না, খালি পায়ে হাঁটবে? দিশি নুন না পাওয়া গেলে আলুনি খাবে? জামা না পরে খালি গায়ে থাকবে? অসুখ-বিসুখে বিলিতি ওষুধ না কিনে মরবে? যত সব উদ্ভট চিন্তা। হেম তো আগে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করত না।

একটা আমগাছের গোড়ায় উই লেগেছে। বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে, তাতে কিলবিল করছে উইপোকা। একটা খুরপি নিয়ে সেই গর্তগুলো খুঁড়ছে ভরত। বাগানের মালি তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, এই সব উইয়ের গর্তে সাপ ঢুকে বসে থাকে অনেক সময়। সাপ আর সন্ন্যাসী, এদের নিজস্ব বাসা থাকে না, পরের বাসায় আশ্রয় নেয়। এই বর্ষাকালে প্রায়ই সাপ দেখা যায়। একটা কেউটে সাপকে ভরত কয়েক দিন আগে ডান্ডা দিয়ে মারতে গিয়েছিল, খানিকটা চোট লাগলেও সাপটা মরেনি, পালিয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই আছে আশেপাশে কোথাও।

সাইকেলের শব্দ শুনে ভরত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। গেট ঠেলে ঢুকছে ক্ষুদিরাম। ওর নিজের সাইকেল নেই, কাকুতি-মিনতি করে অন্য কারুর সাইকেল চেয়ে নিয়ে ছেলেটো প্রায়ই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, এখানেও আসে মাঝে মাঝে। ছেলেটা অসম্ভব ছটফটে ও জেদি ধরনের, তবু ওকে পছন্দ করে ভরত। লেখাপড়ার দিকে মন নেই ক্ষুদিরামের, তবে সে হেমের কাছে দেশ-বিদেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ আর বিপ্লবের গল্প শুনতে চায়। ভাল-মন্দ খেতে পায় না বলে ভরত ওকে বাগানের ফলটল দেয়, এক এক দিন দুপুরে নিজের সঙ্গে বসিয়ে পেট ভরে মাছের ঝোল ভাত খাওয়ায়।

আজ ওর ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে ভরত জিজ্ঞেস করলে, কী ব্যাপারে রে খুদি? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস মনে হচ্ছে!

সাইকেলটাকে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে ক্ষুদিরাম ভরতের পাশে এসে উবু হয়ে বসল। কোনও রকম ভূমিকা না করে বলল, দাদা, আমাকে কুড়িটা টাকা দেবে?

ভরত সকৌতুকে বলল, এক টাকা দু' টাকা নয়, একেবারে কুড়ি টাকা? এত টাকা দিয়ে কী করবি? জমি কিনবি নাকি?

ক্ষুদিরাম বলল, না, কলকাতায় যাব!

—হঠাৎ কলকাতায় যাবি কেন? সেখানে তোর কে আছে?

—কেউ নেই। আমার আবার কে থাকবে?

—তা হলে তুই যেতে চাইছিস কেন?

—বাঃ, সবাই তো কলকাতায় যাচ্ছে। সত্যেনকাকা, হেমদাদা, অবনীদাদা, আরও অনেকে। আমায় কেউ সঙ্গে নিতে চায় না। তাই আমি ঠিক করেছি, নিজেই যাব!

—কলকাতা কী রকম জায়গা তুই জানিস? কত মানুষ, কত গাড়িঘোড়া, তাতে লোকে চাপা পড়ে মরেও যায়। একবার রাস্তা হারালে আর খুঁজে পাবি না। সেখানে জিনিসপত্রের কী সাঙ্ঘাতিক দাম! একটা ডিমের দাম দু'পয়সা। হোটেলে ভাত খেতে গেলে ছ'পয়সার কমে পেটই ভরবে না। কলকাতায় তুই থাকবি কোথায়? হোটেলে থাকতে গেলে কুড়ি টাকায় আর ক'দিন চলবে?

—রাত্তিরে রাস্তায় শুয়ে থাকব। তাতে তো আর পয়সা লাগবে না?

—কলকাতায় রাস্তায় কারুকেই শুতে দেয় না। সেপাই এসে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে যায়। রাস্তায় পায়খানা-পেচ্ছাপ করলেও পুলিশে ধরে, ফাইন করে কিংবা জেলে ভরে রাখে। হঠাৎ কলকাতায় যাবার শখ চাপল কেন তোর!

—কলকাতায় কী যেন হচ্ছে। অনেকে দেখতে যাচ্ছে, আমি যাব না কেন?

—তোর মুশকিল কী জানিস খুদি, তুই যে এখনও ছোট, সে কথা তোর মনে থাকে না। কলকাতায় যারা হুজুগ দেখতে যাচ্ছে, তাদের বয়েস তোর অন্তত ডবল। তোর এখন ইস্কুলে পড়ার কথা। তোর বাপ-মা বেঁচে থাকলে তোকে কিছুতেই যেতে দিত না।

—ভরতদাদা, আমার আর ছোট থাকতে ভাল লাগে না! আমি কাজ চাই, কাজ!

—লেখাপড়া না শিখলে তোকে কাজ দেবে কে?

ক্ষুদিরামের মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ল। এই ধরনের উপদেশের কথা শুনতে শুনতে তার কান পচে গেছে। সে বলল, তুমি টাকা দেবে না!

ভরত বলল, এই বয়েসে তোকে আমি কলকাতায় যেতে দিতে পারি না। আর একটু বড় হ, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব!

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও হঠাৎ সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুদিরাম। ভরতকে ঠেলে সরিয়ে দিল এক পাশে।

হিস হিস শব্দ করে ফণা তুলেছে একটা সাপ। সেই আহত সাপটা ফিরে এসেছে, কিংবা অন্য সাপও হতে পারে। ভরত সাপ দেখে ভয় পাবার পাত্র নয়, বাল্যকাল থেকে অনেক সাপ তার দেখা আছে, কিন্তু এত কাছে, যদি ছোবল দিত? একবার ভরতের বুকটা কেঁপে উঠল।

ক্ষুদিরাম চেঁচিয়ে বলল, তুমি সরে যাও দাদা, আমি ব্যাটাকে সাবাড় করে দিচ্ছি।

সে এক মুঠো মাটি ছুঁড়ে দিল সাপটার মুখে। সাপটা রেগে গিয়ে আরও লম্বা হয়ে উঠে মাথা দোলাতে লাগল।

ভরত অনেকটা পিছিয়ে এসে বলল, তুইও সরে আয় খুদি, আমি একটা লাঠি আনছি।

ক্ষুদিরাম সে কথা শুনল না। সে সাপটার চারপাশে ঘুরতে লাগল, যেন সে এক দক্ষ সাপুড়ে। মাঝে মাঝে মাটি ছুঁড়ে আরও রাগিয়ে দিচ্ছে সাপটাকে, সাপটা কিন্তু তেড়ে যাচ্ছে না। ক্ষুদিরাম যেদিকে যাচ্ছে, সেও সেদিকে মাথা ঘোরাচ্ছে।

ভরত আমগাছটার একটা ডাল ভেঙে নিল। কিন্তু সেটা দিয়ে মারবার আগেই সাপটা পশ্চাৎ অপসারণ করে মাথা ঢুকিয়ে দিল একটা গর্তে।

সাপ যতই হিংস্র প্রাণী হোক, আসলে নির্বোধ। শত্রুপক্ষের সামনে থেকে পালাতে গিয়ে সে গর্তের মধ্যে প্রথম ঢোকায় মাথা। খুব দ্রুত সে ঢুকতে পারল না, ক্ষুদিরাম খপ করে চেপে ধরল তার লেজ।

ভরত জানে, এই ছেলেটা দারুণ দুঃসাহসী ও ডাকাবুকো। কিন্তু এই ধরনের দুঃসাহসী ছেলেদেরই আকস্মিক বিপদ হয়। সে বলল, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

ক্ষুদিরাম শুনল না, সাপটাকে টেনে বার করে মাথার ওপর ঘোরাতে লাগল বনবন করে। তারপর, মাটিতে আছাড় মারল কয়েকবার। হাড়গোড় ভেঙে সাপটা অক্কা পেয়ে গেছে।

ক্ষুদিরাম বলল, এখনও এ ব্যাটা মরেনি, মটকা মেরে পড়ে আছে। এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। না পোড়ালে বিশ্বাস নেই।

চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছে বাগানের মালি।

ভরত ক্ষুদিরামের কাঁধে চাপড় মেরে বলল, তুই বীরত্ব দেখাতে গেলি কেন রে? আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস, সে জন্য কুড়ি টাকা তোর প্রাপ্য, তাই না? আমি কিন্তু তবু তোকে কলকাতায় যাবার

জন্য টাকা দেব না। আশ্রয়দাতা কেউ না থাকলে তোর বয়েসী ছেলে কলকাতায় গিয়ে কত কষ্টে পড়বে, তা আমি হাড়েহাড়ে জানি।

ক্ষুদিরাম বলল, মোটেই আমি টাকার জন্য সাপটাকে মারিনি।

ভরত বলল, আমার বাগানের সাপ, দরকার হলে আমি মারব। তোকে এত কেরদানি দেখাতে কে বলল ?

ক্ষুদিরাম বলল, আমাদের এখানে সব সময় যে আগে দেখে, সে-ই সাপ মারার চেষ্টা করে। কার বাগানের সাপ, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি।

ভরত বলল, তুই আগেও সাপ মেরেছিস এ রকম ?

ক্ষুদিরাম বলল, হ্যাঁ। সাপ দেখলেই আমার মারতে ইচ্ছে করে। তুমি উইয়ের গর্তের অত কাছে বসে ছিলে কেন ?

ভরত বলল, তুই এসে কথা বলতে শুরু করলি, তাই তো অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। সাপটা ছোবল দিলে মরে যেতেও পারতাম। কিন্তু তুই তো আমায় মুশকিলে ফেলে দিলি ক্ষুদিরাম। তুই কুড়িটা টাকা চেয়েছিলি, তারপর আমার প্রাণ বাঁচালি, এখন আমি যদি টাকাটা না দিই তা হলে আমি নিমকহারাম হয়ে যাব, তাই না ? অথচ টাকাটা দিয়ে তোর ক্ষতি করতেও ইচ্ছে করছে না। বরং পাঁচটা টাকা দিচ্ছি, তোর বন্ধুদের সঙ্গে পেট ভরে কাঁচাগোল্লা কিনে খা গিয়ে।

ক্ষুদিরাম বলল, এ কী সাপ মারার জন্য বখশিস নাকি ? আমার এক পয়সাও চাই না।

ভরত বলল, সেই ভাল। তোর হাতে পাঁচ টাকা দিলেও তুই তা নিয়ে ট্রেনে চেপে বসতে পারিস। বরং আমি নিজে একদিন মিষ্টি কিনে তোকে খাওয়াব। আর কথা দিচ্ছি, বছর দু'এক পরে, যদি ঠিকমতন লেখাপড়া করিস, তা হলে তোকে কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে যাব।

ওষ্ঠ উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ক্ষুদিরাম বলল, আমার বয়ে গেছে ! আমি মোটেই বেড়াতে যেতে চাই না।

ক্ষুদিরাম সাইকেলে উঠতে যাচ্ছে, ভরত আবার বলল, দাঁড়া। এই সাইকেলটা কার ?

সাইকেলটার সিটের ওপর দিয়ে একটা সিল্কের কাপড় জড়ানো। এই সাইকেল ভরতের চেনা। সে বলল, এটা তো হেমের সাইকেল। সে তো কারুকে ব্যবহার করতে দেয় না। তুই আনলি কী করে ?

ক্ষুদিরাম বলল, তুমি কি ভাবছ চুরি করে এনেছি ? হেমদাদার কি আর সাইকেল চড়ার ক্ষমতা আছে ? পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে না ?

ভরত সবিস্ময়ে বলল, হেমের পা ভেঙেছে ? কবে ? তুই এতক্ষণ সে কথা আমাকে বলিসনি ?

ক্ষুদিরাম বলল, তুমি কি জিজ্ঞেস করেছ ? তোমার বন্ধুর পা ভাঙার খবর তুমি জানবে না তা আমি বুঝব কী করে ? কাল সকালে হেমদাদা নদীর ধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। মাথাতেও লেগেছে। খুব বেশি না, কিন্তু ডান পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।

বিকেলবেলা হেমের বাড়িতে চলে এল ভরত। বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে হেম। তার মাথায় পট্টি বাঁধা, ডান পায়ের পাতা ফুলে হাঁড়ির মতন হয়ে আছে, সেখানে চুন-হলুদ লাগানো। কথা কাটাকাটি চলছে তার স্ত্রীর সঙ্গে। হেম জেদ ধরে বসে আছে, এই অবস্থাতেও আগামীকাল ভোরের ট্রেনে সে কলকাতায় যাবেই যাবে। সত্যেন ও অন্যান্যরা চলে গেছে আজ, হেম যাবে একা।

পাশে বসে পড়ে ভরত জিজ্ঞেস করল, কেন, কলকাতায় যেতেই হবে কেন ?

হেম গম্ভীরভাবে বলল, আগে থেকে যাব ঠিক করেছি, তাই।

ভরত বলল, কিন্তু এরকম ভাঙা পা নিয়ে গিয়েই বা তুমি কী করবে ? হাঁটতে পারবে না, কোথাও যেতে পারবে না। এ তো পাগলামি।

হেম বলল, যদি পাগলামি মনে করো তো তাই। গোঁয়ার্তুমিও বলতে পারো। তবু আমি যাবই। তা নিয়ে অন্য কারুর মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই।

দরজার আড়ালে দাঁড়ানো স্ত্রীর উদ্দেশে সে বলল, কলকাতায় গিয়ে ভাল ডাক্তার দেখাব, এখানে কি সে রকম ডাক্তার আছে ?

ভরত বলল, সেটা অবশ্য ঠিক। কলকাতায় ডাক্তার দেখালে পা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি একা ট্রেনে যাবে, হাওড়ায় ট্রেন থেকে নেমে ছ্যাকড়া গাড়ির স্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছতে অনেকটা হাঁটতে হয়, তুমি একলা পারবে কী করে ?

হেম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, এর চেয়ে ঢের বেশি শক্ত কাজ মানুষকে একা একা করতে হয়, তা বুঝি জানো না ?

ভরত বলল, জানি। কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় দেখেও যদি একা আমি যেতে দিই, তা হলে আমার নিজেরই মনে হবে যে আমি অমানুষ ! সত্যি করে বলো তো হেম, তুমি কি আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যই ইচ্ছে করে পা ভাঙলে ?

হেম প্রায় গর্জন করে উঠে বলল, খবরদার, তুমি যাবে না ! তুমি কলকাতায় যেতে চাওনি, আমার জন্য কেন যাবে ? আমি তোমার সাহায্য চাই না। তুমি কিছুতেই যাবে না।

ভরত বলল, যেতে আমাকে হবেই। বুঝলাম, নিয়তি আমাকে আবার টানছে কলকাতার দিকে।

হেম বলল, ওসব নিয়তিটিয়তি বাজে কথা ! তোমাকে যেতে হবে না। তুমি বাগান নিয়েই থাকো। আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে রাজি নই।

ভরত বলল, তুমি রাজি হও বা না হও, আমি ট্রেনে চাপলে তুমি আটকাতে পারবে ? ন্যায্যভাবেই আমি তোমার সঙ্গে এক কামরায় বসতে পারি। হাওড়া স্টেশনে তোমার পাশাপাশি হাঁটারও অধিকার আছে আমার ! তুমি কি পুলিশ ডেকে বলতে পারবে, এই লোকটা কেন যাচ্ছে আমার সঙ্গে ?

নিজের রসিকতাতে নিজেই হেসে উঠল ভরত।

পড়ে রইল নিজের হাতে লাগানো গাছগুলি, না-ফোটা ফুলের কলি, কলাগাছের মোচা, পুকুরের মাছ। একটা ছোট ব্যাগে কয়েকটি জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে ভরত বাগানে এসে দাঁড়াল। একটা ঝুপসি গাছের পাতার আড়ালে বসে একটা পাখি চোখ গেল, চোখ গেল ডেকে যাচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে। পাখিটাকে দেখা যায় না। কাঠচাঁপা ফুলগাছটাকে ঘিরে গুনগুন করছে দুটো ভোমরা, তালগাছ বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে একটা চেন্না কাঠবিড়ালি, কামিনী গাছটার নীচে ঝরে পড়া ফুলগুলি সাদা চাদরের মতন বিছিয়ে আছে।

ভরত অস্ফুট স্বরে বলল, বেশি দিন না, দিন সাতেকের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।

একটুও বাতাস নেই। অন্য দিন গাছের পাতাগুলো দুলতে দুলতে কিছু কথা বলে, আজ তারা ভরতকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল না।

হেমকে নিয়ে ভরত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল বিকেলের দিকে। হাতে যদিও একটা লাঠি নিয়েছে, তবু হেমের নিজে নিজে হাঁটার ক্ষমতা নেই। ভরত হেমের একটা হাত নিজের কাঁধে তুলে ওর শরীরের ভার অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে, তবু প্রতিটি পদক্ষেপে হেমের মুখ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে, মুখে সে কোনও শব্দ করছে না।

ছ্যাকড়া গাড়ির আড্ডার দিকে যেতে যেতে ভরত জিজ্ঞেস করল, তুমি একা আসতে চাইছিলে, কী করে গাড়িতে গিয়ে উঠতে ?

হেম বলল, হামাগুড়ি দিয়ে যেতাম !

ভরত বলল, এত লোকের ভিড়ের মধ্যে তুমি হামাগুড়ি দিতে ?

হেম জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ যেতাম ! আমি কারুর সাহায্যের তোয়াক্কা করি না।

ভরত হেমকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা সরে গিয়ে বলল, দেখি তো কেমন হামাগুড়ি দিতে পারো ?

হেম সত্যিই বসে পড়ল। চার পাশ দিয়ে ব্যস্ত মানুষ ছুটছে, কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকালেও কেউ থামছে না। এর মধ্যে হেম হামাগুড়ি দিতে উদ্যত হলে ভরত দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলল, জোর করে টেনে তুলল। তারপর ক্ষোভের সঙ্গে বলল, হেম, তুমি আমাকে এখনও বন্ধু বলে মনে করো না ! বন্ধু কি বন্ধুর কাছে সাহায্য চায় না ?

হেম বলল, কী করব বলো ! আমার স্বভাবটাই এরকম। আমি কারুর ওপর কখনও নির্ভরশীল হতে চাই না। অন্যের ব্যাপারেও মাথা গলাই না। এই জন্য অনেকে আমাকে হৃদয়হীন মনে করে।

ভরত বলল, তোমার সম্পূর্ণ হৃদয় তুমি দেশ নামে এক ভাবমূর্তিকে দিয়ে বসে আছ ! তাই কোনও মানুষকে আর তুমি ভালবাসতে পারো না। কিন্তু মানুষ নিয়েই তো দেশ !

হেম বলল, দেশ আমার কাছে ভাবমূর্তি নয়। বঙ্কিমবাবুর দেশজননীও আমার চোখে ভাসে না। আমার কাছে দেশ মানে কোটি কোটি পরাধীন মানুষের অপমানিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মুখ।

ভরত একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করল, প্রথমেই হেমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। হেম আগেই বলে দিয়েছে, সে হাসপাতালে গিয়ে শুয়ে থাকতে রাজি নয়, আগামীকালের প্রতিবাদ সভা সে দেখতে যাবেই। তা হলে কোনও ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। ভরতের মনে পড়ল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কথা। শশিভূষণ মাস্টারের সঙ্গে সে মহেন্দ্রলালের চেম্বারে কয়েকবার গেছে, জায়গাটা তার চেনা।

গাড়ি নিয়ে ভবানীপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। আগে ভরত এই চেম্বারের সামনে প্রচুর রোগীর ভিড় দেখেছিল, এখন মাত্র দু'জন অপেক্ষা করছে। তাদের হয়ে যাবার পর ভরত চেম্বারের মধ্যে প্রবেশ করেই চমকে গেল। চামড়ায় মোড়া গদিওয়ালা যে বড় চেয়ারটিতে বিশালকায় মহেন্দ্রলাল বসতেন, সেখানে এখন বসে আছেন একজন সরু চেহারার মাঝবয়েসী ব্যক্তি। পেছনের দেওয়ালে টাঙানো মহেন্দ্রলালের একটি বাঁধানো ছবি।

ভরত জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নেই ?

ডাক্তারটি চোখ থেকে চশমা খুলে বললেন, আপনারা বুঝি বিদেশি ? তাই খবর শোনেননি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার গত বছর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম, আমিও ডাক্তার সরকার।

ভরত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। ডাক্তাররা অমর নন, তাঁদেরও রোগ-ভোগ আছে, মহেন্দ্রলালের বয়েসও যথেষ্ট হয়েছিল, তবু তাঁর চলে যাওয়াটা যেন বিশ্বাস্য মনে হয় না।

এই ডাক্তার যতক্ষণ হেমের মাথার ক্ষত ও পা-টা পরীক্ষা করতে লাগলেন, ভরত বসে বসে ভাবতে লাগল মহেন্দ্রলালের কথা। অমন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব, তাও একদিন শূন্যে মিলিয়ে যায়। একেবারে সব শেষ ! মহেন্দ্রলাল প্রথম দিন ভরতকে একটা মন্ত্র শিখিয়েছিলেন, ভরত মনে মনে বারবার সেটা বলতে লাগল, পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ! পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ! তা হলে পঞ্চভূত দিয়ে গড়া মানুষের এই শরীরটাই আসল, এই শরীর না থাকলে ব্রহ্মট্রহ্ম কিছুই থাকে না !

ডাক্তারটি মলম মাখিয়ে ভাল করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন পায়ে, মাথায় আর কিছু দরকার হল না। হেমকে দশদিন টানা শুয়ে থাকতে হবে। বাড়ি থেকে বেরুনোও নিষেধ।

এর পর শিয়ালদা অঞ্চলের পূর্বপরিচিত একটি মেসবাড়িতে হেমকে নিয়ে উঠল ভরত। সৌভাগ্যবশত একতলায় ঘর পাওয়া গেল, তাতে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। একতলার বড় হলঘরটিতে মেসের বাসিন্দারা প্রতিদিন সন্ধেবেলা জমায়েত হয়ে গাল-গল্প করে। হেম বিছানায় শুয়ে আছে, ভরত শিয়রের চেয়ারে বসে বাইরের সব কথাবার্তাই শুনতে পাচ্ছে। না শুনে উপায় নেই, বাইরের আড্ডাধারীদের কণ্ঠস্বর এমনই উচ্চগ্রামে যে দরজা বন্ধ করলেও সব শোনা যায়।

আগেরবার এই মেসে থাকার সময় ভরত অন্য কারুর সঙ্গে মেলামেশা করেনি, কিন্তু খাবারঘরে কিংবা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় অনেকের কথা তার কানে এসেছে। সে সবই অতি সাধারণ কথা, অনেক সময় নিম্নরুচির কথা। এরা অধিকাংশই অফিস-চাকুরে, অফিসের কথা, খাওয়াদাওয়ার কথা, বাজার-দর ও স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে লালসাময় রসিকতা ছাড়া যেন আর কিছু জানেই না। আজ এদের আলোচনার বিষয় শুনে ভরতের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবাই উত্তেজিত

বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে। কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে কারুর কারুর বাড়ি পূর্ববঙ্গে, কারুর কারুর হুগলি, মেদিনীপুরে, সকলেই বাংলা ভাগের ঘোর বিরোধী। আগামীকাল টাউন হলের সভাতেও যোগ দিতে অনেকে বদ্ধপরিকর। আজ বৃষ্টি হচ্ছে দেখে, কালও যদি বৃষ্টি হয় তা হলে মিছিল পণ্ড হয়ে যেতে পারে, এই নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। দু'চারটি খিস্তিখেউড় যা শোনা গেল, তা কোনও নারী সম্পর্কে নয়, লর্ড কার্জন সম্পর্কে !

হেম বলে বটে এ দেশের কোটি কোটি মানুষের মুখে পরাধীনতার অপমান ও বঞ্চনার জ্বালা রয়েছে, কিন্তু ভরত তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। ওটা শুধু হেমের মনের কথা। আসলে এ দেশের শতকরা নব্বই জন মানুষ স্বাধীন না পরাধীন তা নিয়ে মাথাই ঘামায় না, দিব্যি হাসছে, খেলছে, খাচ্ছেদাচ্ছে বংশ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করে, ইংরেজ শাসন ভারতের পক্ষে আশীর্বাদ। মহারানি ভিকটোরিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে কত লোক কেঁদে ভাসিয়েছে। যারা বঞ্চিত, যারা দরিদ্র, তারা কাছাকাছি কিছু লোককে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে, দেশের সামগ্রিক অবস্থা বোঝে না। আজ হঠাৎ এত লোক ইংরেজ সরকারের একটা সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়ে উঠল কী করে ? বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা ? বেশির ভাগ শিক্ষিত বাঙালিই তো বাংলা-ইংরিজি মিশিয়ে একটা জগাখিচুড়ি ভাষা বলে ! বাংলা বই-ই বা ক'জন পড়ে ? আর অশিক্ষিত লোকদের ভাষা-সচেতনতাই নেই। তবে ?

পরদিন সকালেই মেসের এক ভৃত্য খবর দিল, এ পল্লীর সমস্ত দোকানপাট আজ বন্ধ। কেউ হরতালের ডাক দেয়নি, তারা নিজেরাই বন্ধ করেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে পথে পথে লোকে লোকারণ্য, সব দিকে কী হয় কী হয় ভাব ! মাঝে মাঝে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি শোনা যাচ্ছে বন্দে মাতরম !

বঙ্কিমবাবুর বন্দে মাতরম গানটি আগে শুনেছে ভরত, কিন্তু তার প্রথম শব্দ নিয়ে এমন স্লোগান সে আগে শোনেনি। কোনও স্লোগানই শোনেনি আগে। এটা শুনতে ভাল লাগছে, বেশ জোরালো এবং আবেগময়। কে বন্দে মাতরম স্লোগান বানাবার নির্দেশ দিল ?

আগেই শোনা গিয়েছিল, প্রথম জমায়েতটি হবে কলেজ স্কোয়ারে। সেখান থেকে মিছিল যাবে টাউন হলের দিকে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরেই হেম বলল, ব্রাদার, একটা গাড়ি ডাকো, আমি কলেজ স্কোয়ারে যাব, প্রথম থেকে সব দেখব।

ভরত বলল, ডাক্তার তোমাকে ঘর থেকে বেরুতেই বারণ করেছেন যে—

হেম সে কথায় পাত্তাই দিল না। এক হাতে ঝাপটা দিয়ে বলল, তুমি যদি না ডাকো, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমি নিজেই যাব।

বেলা দুটো বাজে, এর মধ্যেই ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে কলেজ স্কোয়ারের দিকে এগোনোই যায় না। সব যানবাহন বন্ধ হয়ে গেছে। চতুর্দিকে গিসগিস করছে মানুষ, অনেকের হাতে কালো পতাকা। গাড়িটাকে অ্যালবার্ট হলের সামনে থামিয়ে রাখা হল।

ভরত বলল, হেম, এত যে মানুষ আসছে, এত লোক সভায় যোগ দেবে, এদের সংগঠন করল কে ? জাতীয় কংগ্রেস তো সভার ডাক দেয়নি। লোকে এমনি এমনি আসছে ?

হেম বলল, বেশ হয়েছে ! এর জন্য দায়ি ইংরেজ সরকার। না বুঝে এই সরকারও অতি সাধারণ মানুষদেরও রাজনীতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাঙালির আঁতে ঘা দিয়েছে, তাই যারা কোনওদিন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না, তারাও এখন নেমে পড়েছে রাস্তায়।

ভরত বলল, ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি দেখছি। ছাত্ররাই ভিড় সামলাচ্ছে।

হেম বলল, ছাত্ররাই তো আসল শক্তি। ছাত্ররা খেপে উঠলে এই আন্দোলন দীর্ঘদিন চলবে। সাধারণ মানুষের সংসারের চিন্তা থাকে, তাতে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বেশিদিন টেনে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু ছাত্ররা অদম্য, তারা ইচ্ছে করলে সারা দেশের জীবনযাত্রা অচল করে দিতে পারে।

ভরত বলল, আমি এক সঙ্গে এত মানুষ আগে কখনও দেখিনি। কোনও সংগঠন নেই, তবু অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসছে, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে।

হেম বলল, আন্দোলনটা টেনে নিয়ে যেতে হলে এর পর আমাদেরই সংগঠনের কাজে লাগতে হবে। বঙ্গভঙ্গ দেখছি সত্যিই শাপে বর হল। ইস, এই সময়েই আমার পা ভাঙল!

একটু পরে মিছিল চলতে শুরু করল। মুহুর্মুহু গর্জন শোনা যেতে লাগল, বন্দে মাতরম! বঙ্গ ভঙ্গ চাই না চাই না! বঙ্গ ভঙ্গ হবে না হবে না! কালো পতাকা ছাড়াও কারুর কারুর হাতে রয়েছে নীল রঙের ফেস্টুন, তাতে লেখা, বাংলা অখণ্ড।

রাস্তার এক এক জায়গায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোর্খা পুলিশ, মধ্যে মধ্যে গোরা সার্জেন। ছাত্ররা তাদের দেখে প্রবল উৎসাহে নাচতে শুরু করছে, কেউ কেউ টিটকিরি দিচ্ছে। সব ভয় ভেঙে গেল কী করে?

গাড়িটা চলেছে মিছিলের পেছনে পেছনে, ভরত অনেকখানি শরীর বাইরে ঝুঁকিয়ে দেখে দেখে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে হেম বলল, আমার দুর্ভাগ্য, আমি এই ঐতিহাসিক পদযাত্রায় অংশ নিতে পারলাম না। কিন্তু তুমি গাড়িতে বসে থাকবে কেন? নামো। হাঁটো ওদের সঙ্গে।

ভরত নেমে পড়ে মিছিলে যোগ দিল। কত রকমের মানুষ এক সঙ্গে হাঁটছে। কারুকে কারুকে দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, তাদের পাশাপাশি কেরানি, দোকানদার বা ফেরিওয়ালা শ্রেণী, ছাত্রদের সঙ্গে মিশে আছে শিক্ষক-অধ্যাপক। মিছিলের মাঝামাঝি একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি সবাইকে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বন্দে মাতরম ধ্বনি দিচ্ছে, তার দিকে সকলেরই চোখ পড়ে। অত্যন্ত সুদর্শন, শাল-প্রাংশু মহাভুজ ব্যক্তিটিকে বাঙালি বলে মনেই হয় না। তবে কি অবাঙালিরাও বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। কথায় কথায় জানা গেল, ওই ব্যক্তিটি বাঙালিই বটে, ওঁর নাম রমাকান্ত রায়, সদ্য জাপান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরেছেন। মিছিলে মুসলমানদের সংখ্যা কম, কিন্তু একজন দাড়িওয়ালা মৌলভি মহা উৎসাহে সকলের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন, অনেকেই এঁকে চেনে, ইনি মৌলভি লিয়াকৎ হোসেন।

টাউন হলের কাছে পৌঁছে দেখা গেল অন্য দিক থেকেও আরও মিছিল এসে সে স্থানটি এর মধ্যেই এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। মানুষ, মানুষ, অসংখ্য মানুষ। এই শহরের ইতিহাসে আগে কখনও এক সঙ্গে এত মানুষ পথে নামেনি, একই উদ্দেশ্য নিয়ে এক জায়গায় মিলিত হয়নি। এত কলকোলাহলের মধ্যে মিটিং হবে কী করে? অথচ একটা মিটিং হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। শুধু প্রতিবাদ নয়, আন্দোলন চালিয়ে যাবার পথনির্দেশ চায় সাধারণ মানুষ। এবং সেই নির্দেশ কোনও মান্যগণ্য নেতার মুখ থেকে শোনাই কার্যকর হবে। বড়দরের নেতার অভাব নেই, অনেক রাজা-মহারাজাও এখানে সমবেত হয়েছেন, কিন্তু এমন কে আছেন যাঁর কণ্ঠস্বর এত সহস্র মানুষ শুনতে পাবে? তা অসম্ভব!

নেতারা দ্রুত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। মিটিং হবেই, তবে একটি নয়, তিনটি, এবং তা চলবে একযোগে। টাউন হলের দোতলায় হলঘরে একটি, একতলায় একটি এবং সামনের মাঠে একটি। তিনটি সভাতে যাতে একই রকম ঘোষণা হয়, তাও ঠিক করে নিলেন তিন সভাপতি। কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রথম সভার সভাপতি, অন্য দুটির ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। অনেক দুঁদে উকিল ব্যারিস্টার রয়েছেন তাঁদের পাশে।

সবিস্তারে পটভূমিকা আলোচনা করার পর মূল প্রস্তাব দাঁড়াল দুটি। বাংলাকে ভাগ করার জন্য সরকারের অযৌক্তিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। যতদিন না প্রত্যাহৃত হয়, ততদিন চলবে প্রতিরোধ আন্দোলন। আর প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র বয়কট। কেউ বিদেশি দ্রব্য কিনবে না, কেউ বিদেশি পণ্য ব্যবহার করবে না।

বক্তৃতার মাঝে মাঝেই জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে লাগল। বয়কট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাততালি দিয়ে উঠল, সেই শব্দ যেন পৌঁছে গেল শহরের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

হেম বলল, ব্রাদার, শুধু সমর্থন করলে হবে না, এখনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে! তোমার পায়ের বিলিতি জুতো খুলে ফেল!

ভরত বলল, জুতো খুলে... খালি পায়ে যাব?

হেম জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ। জুতো খুলে শূন্যে ছুঁড়ে দাও!

ভরত দুই লাফে ঘোড়া গাড়ির ওপরে উঠে দাঁড়াল। পা থেকে জুতো খুলে চিৎকার করে বলল, বন্ধুগণ, বিদেশি বর্জন এখন থেকেই শুরু হোক। এই আমি আমার বিলিতি জুতো ত্যাগ করলাম!

অমনি হাজার হাজার লোক নিজেদের জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। অনেকে খুলে ফেলল গায়ের জামা। সামনের একটা গোলা থেকে খড়-পাটকাঠি টেনে এনে তৈরি হল লর্ড কার্জনের মস্ত এক কুশপুত্তলিকা। তাতে আগুন ধরিয়ে দেবার পর এতগুলি কণ্ঠের বন্দে মাতরম ধ্বনি যেন বিদীর্ণ করে দিল গগন।

জনকণ্ঠের সেই গর্জন বড় লাটভবন থেকে শোনা যায়। লর্ড কার্জন গোয়েন্দা মারফত দশ মিনিট অন্তর মিছিল ও সমাবেশের খবর নিচ্ছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই, বরং হাসছেন। তিনি তো জানেনই, এ বঙ্গে বালখিল্যদের দাপাদাপি। দু'চারদিন চেঁচালেই ওদের গলা ভাঙবে, তারপর চুপ করে যাবে। এই দুর্বল, অক্ষম জাতির সাধ্য আছে সরকারের নীতি বদলাবার?

টাউন হলের সভার গর্জন যখন প্রবলতর হল, তখন কার্জন পাশ ফিরে ফ্রেজারকে সকৌতুকে বললেন, Conceive the howls! They will almost slay me in Bengal.

৭৫

বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই একটি অস্থায়ী মন্দির বানিয়েছেন অরবিন্দ। দেখতে সাধারণ কুটিরের মতন। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বগলা মূর্তি। সোনায় মোড়া এই মূর্তিটি অরবিন্দ নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়েছেন। সিংহাসনে উপবিষ্টা এই দেবী পীতবর্ণা, পীত আভরণ ও পীতবর্ণ মালা পরে আছেন গলায়। গম্ভীর আকৃতি, যেন সব সময় মদোন্মত্তা, স্তনযুগল দৃঢ় ও স্থূল, দেবীর ডান হাতে মুগুর, অন্য হাতে এক প্রতিস্পর্ধীর জিভ টেনে ধরে আছেন। মুগুরের আঘাতে তিনি শত্রুকে দমন করার জন্য উদ্যত।

একজন ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হয়েছে, তা ছাড়া অরবিন্দ নিজে প্রতিদিন অতি ভোরে উঠে স্নান সেরে নিয়ে সেই দেবীমূর্তির সামনে ধ্যানে বসেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, তখন যেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। দুপুরবেলা কলেজে পড়াতে যান বটে, কিন্তু সন্ধের পরই আবার সেই কুটিরে বসে পূজারীটির নির্দেশে তন্ত্রমতে সাধনা শুরু করেন।

ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান, প্রায় আবাল্য ইংলন্ডে লালিত পালিত অরবিন্দ এখন ঘোরতর হিন্দু। শরীর-মন থেকে বিলিতি গন্ধ পুরোপুরি মুছে ফেলতে চান। মাঝে মাঝেই শরীরে ছাই মাখা জটাজুটধারী যোগীরা আসেন তাঁর কাছে, তিনি নিভৃতে শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁদের সঙ্গে।

বরোদায় অরবিন্দর পরিচিত দু-চারজন ব্যক্তি আগে মাঝে মাঝেই গল্পগুজব করতে আসতেন এ বাড়িতে। কাব্যশাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক হত, পেয়ালার পর পেয়ালা চা ও প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া উড়ত, এখন তাঁরা এসে অরবিন্দকে প্রায় সব সময় পূজার ঘরে দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে যান।

হিন্দুর ছেলে আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবু কয়েকজন বলাবলি করেন যে হিন্দু ধর্মে এত দেব-দেবী থাকতে অরবিন্দ হঠাৎ ভয়ংকরী বগলা মূর্তি পূজায় মেতে উঠলেন কেন? দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত এই বগলামুখী দেবীর আরাধনা সাধারণত গৃহস্থবাড়িতে হয় না। তান্ত্রিকেরা এই মূর্তির সামনে সাধনা করেন শত্রু বধের জন্য। অরবিন্দ ঘোষের তেমন শত্রু কে? এই নিরীহ, শান্ত, লাজুক, মৃদুভাষী অধ্যাপকটির কোনও শত্রু থাকতে পারে বলে বিশ্বাসই হয়

না।

ব্যক্তিগতভাবে অরবিন্দর কোনও শত্রু নেই। মাতৃস্নেহবঞ্চিত অরবিন্দ এই দেশকেই মা বলে মেনেছেন। দেশের শত্রুই তাঁর চিরশত্রু। যতদিন না এই শত্রুকে বিতাড়িত করা যায়, ততদিন তাঁর মনে এক ফোঁটা শান্তি নেই। অরবিন্দর এই যে ধর্মাচরণ, তা নিছক নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য নয়, দেশজননীকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করাই তাঁর পরম উদ্দেশ্য। কয়েকবছর আগে বারীন ও যতীনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে। অরবিন্দ তবু হাল ছেড়ে দেননি। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি বুঝেছেন, এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ বা ধর্মভীরু, সাধারণভাবে ডাক দিলে অনেকে সমবেত হবে না, দু-চারজন এলেও দলাদলি, ঝগড়া শুরু করবে। কিন্তু ধর্মের নামে অনেককে একত্র করা যায়, ধর্মের নামে অনেক মানুষ যে-কোনও শপথ নিতেও প্রস্তুত।

অরবিন্দ অনেকদিন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত। আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার মূর্তি বর্ণনা করেছেন, সেই মূর্তির পদতলে বসে সংগঠিত হয়েছিল সন্তান সৈন্যদল। অরবিন্দ দুর্গার বদলে বগলামুখী দেবীকে বেছে নিয়েছেন, তার কারণ এই দেবী আরও হিংস্র, আরও ক্ষিপ্র! আনন্দমঠ প্রায় একটি কল্পিত কাহিনী, অরবিন্দ চান কোনও গোপন স্থলে সত্যি সত্যি একটি ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হোক, সেখানে সাধনা-আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে শত শত যুবককে দেওয়া হবে অস্ত্রশিক্ষা। দেবীমূর্তির সামনে দেশের জন্য জীবন দান করতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, তারপর ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবের আগুন। এই পরিকল্পনা নিয়ে অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' নামে একটি পুস্তিকা লিখতেও শুরু করেছেন।

বারীন এখন এখানেই থাকে। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়, আবার ফিরে আসে। কাজকর্ম কিছু করে না, তবে বারীনের লঘু স্বভাবের কিছুটা বদল হয়েছে। সে অনেক বইপত্র পড়ে, কিছু লেখালিখিও করে।

বাড়িতে কোনও নারী না থাকলে সংসারের শ্রী থাকে না। বিবাহ করলেন বটে, তবু অরবিন্দর বিবাহিত জীবন ঠিক পরিপূর্ণতা পেল না, মৃণালিনী থাকতে চান না বরোদায়। বাপের বাড়িতেও মৃণালিনীর স্বস্তি নেই। কেউ কেউ তাঁর স্বামীর নামে আভাসে-ইঙ্গিতে খোঁটা দেয়। সবাই বলে, মৃণালিনীর স্বামী প্রকাণ্ড বিদ্বান ও অসাধারণ পুরুষ, কিন্তু তিনি সারাজীবন বরোদার মতন একটি ছোট জায়গায় অধ্যাপকগিরি করে যাবেন? এতে অসাধারণত্ব কোথায়? কলকাতায় এলে অন্য চাকুরিতে কত উন্নতি হতে পারত, অরবিন্দর উন্নতির কোনও চেষ্টাই নেই। অধ্যাপকগিরিতে কতই বা উপার্জন হবে!

মৃণালিনী অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লেখেন। সে চিঠি পড়ে হাসতে হাসতে মাথা নাড়েন অরবিন্দ। উন্নতি? না, কোনও দিন হবে না। তাঁর মাথায় যে একটা পোকা ঢুকে আছে, চাকরির উন্নতির চেষ্টা করার জন্য তিনি জন্মাননি।

স্ত্রীকে বোঝাবার জন্য অরবিন্দ এক দিন একটা লম্বা চিঠি লিখলেন : প্রিয়তমে মৃণালিনী, তুমি যে রকম উন্নতি চাও, তা আমার হবে কী করে? আমার মাথায় যে তিনটে পাগলামি আছে!

প্রথম পাগলামি হচ্ছে, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতন খেয়ে পরে থেকে আমার উপার্জনের বাকি টাকা আমি দেশের অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাই। এ দেশে আমার তিরিশ কোটি ভাইবোন আছে, তাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরছে। অধিকাংশই দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে কোনও রকমে টিকে থাকে। তাদের হিত করব না!

দ্বিতীয় পাগলামিটা সম্প্রতি আমার ঘাড়ে চেপেছে। যে-কোনও উপায়ে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে হবে। ...ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করবার, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কোনও না কোনও পথ অবশ্যই থাকবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সে পথে যাবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে বসেছি।

আর তৃতীয় পাগলামিটা কী জানো? অনেক লোকই স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ, খেত, বন, পর্বত, নদী বলে জানে। আমি স্বদেশকে মা বলে জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মায়ের

বুকের ওপর বসে যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তা হলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে খাওয়া দাওয়া করতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতে বসে, না মাকে উদ্ধার করার জন্য দৌড়ে যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করার বল আমার আছে, শারীরিক বল নয়, তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। জ্ঞানের বল। ক্ষাত্র তেজ একমাত্র তেজ নয়, ব্রহ্মতেজও আছে। সেই তেজ জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শেষ দিকটা একটু ধোঁয়াটে করে রাখলেন অরবিন্দ। শুধু জ্ঞান নয়, তিনি যে তলোয়ার-বন্দুক নিয়েও যুদ্ধ শুরু করার পক্ষপাতী, সে কথা আর জানালেন না। মৃণালিনীর পিতা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কোনওক্রমে এই চিঠি তাঁর হাতে পড়লে বিপর্যয় হতে পারে।

বারীনের তেমন পুজো-আচ্চায় মতি নেই। দাদার ধর্মাচরণ সে খানিকটা কৌতূহলের চোখে দেখে। দাদার সঙ্গে ইদানীং কথাবার্তারও সুযোগ ঘটে না। একদিন সে অরবিন্দকে বলল, সেজদা, তুমি 'পাইয়োনিয়ার' পত্রিকাটি পড়েছ? সত্যি সত্যি বাংলা দু' ভাগ হয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ে কলকাতায় ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়েছে।

অরবিন্দ কাগজ পড়েননি, কিন্তু কলেজ লাইব্রেরিতে এই আলোচনা শুনে এসেছেন। অন্য অধ্যাপকরা বলাবলি করছে যে বাঙালিরা সরাসরি ইংরেজ বিরোধিতায় নেমে পড়েছে, সমস্ত বিদেশি দ্রব্য বর্জন শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজদের দোকানপাটে কেউ যায় না, বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। কেউ বিদেশি পোশাক পরে রাস্তায় বেরুলেও অন্য লোকেরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এমনকী ছাত্ররাও বলে দিয়েছে, তারা সরকারি স্কুল কলেজে আর পড়তে যাবে না। এমন কাণ্ড ভূ-ভারতে কখনও হয়নি। বাঙালিরা এত সাহস পেল কী করে?

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলেন, এই আন্দোলন কারা চালাচ্ছে? পেছনে কোন দল আছে?

বারীন বলল, সব কাগজেই এই আন্দোলনের খবর ছাপছে। কোনও দলের তো উল্লেখ দেখি না। কংগ্রেস থেকে কোনও প্রস্তাব নেওয়া হয়নি। কোনও কোনও নেতা অবশ্য প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছেন, কেউ কেউ আড়ালে আছেন। সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে তো জানোই, যতটা নরম, ততটা গরম হতে পারেন না। স্বদেশি আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী, কিন্তু ছেলেরা সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন করুক তা তিনি চান না।

অরবিন্দ বললেন, অবশ্যই বর্জন করা উচিত। ও সব জায়গায় তো গোলামির শিক্ষা দেওয়া হয়। ওরকম শিক্ষা না পেলেও ক্ষতি নেই!

বারীন বলল, একটা কাগজে একটা অদ্ভুত ঘটনা লিখেছে। বাগবাজারের একটা বাড়িতে একটা ছ' বছরের ছেলের খুব অসুখ। তার বাবা ডাক্তার ডেকে এনে দেখাবার পর তাকে যেই ওষুধ খাওয়াতে গেছেন, অমনি ছেলেটা চিৎকার করে উঠল, না, বিদেশি ওষুধ খাব না, কিছুতেই খাব না, কবিরাজি ওষুধ খাব। ...ওইটুকু ছেলেও যদি এরকম কথা বলে, তা হলে ব্যাপারটা কতখানি ছড়িয়েছে ভেবে দ্যাখো!

অরবিন্দ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ইদানীং তিনি সিগারেট কম খান, ব্রান্ডি পানও কমিয়ে দিয়েছেন। চক্ষু মুদে যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থা। তারপর চোখ খুলে বললেন, কলকাতায় এ রকম কাণ্ড ঘটছে, তুই এখানে বসে থেকে কী করবি? তুই কলকাতায় চলে যা।

বারীন বলল, আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। মনটা উতলা হয়ে আছে। বয়কট আন্দোলন স্বচক্ষে দেখতে চাই।

অরবিন্দ বললেন, শুধু দেখলে চলবে না। পুরনো সঙ্গী-সাথিদের আবার জোগাড় কর। আন্দোলন যেন ঝিমিয়ে না পড়ে, সব সময় তাতিয়ে রাখতে হবে!

বারীন জিজ্ঞেস করল, সেজদা, তুমি যাবে না? তোমার যেতে ইচ্ছে করছে না?

অরবিন্দ বললেন, ইচ্ছে তো করছে অবশ্যই। মনের মধ্যে একটা নির্দেশ পেয়েছি, বরোদা ছেড়ে আরও বৃহত্তর কেন্দ্রে আমাকে যেতে হবে। এখানকার সব কিছু গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করি, কলকাতার আন্দোলন আরও জোরদার হলে আমি অবশ্যই গিয়ে উপস্থিত হব। তুই কাল-পরশুই

রওনা হ।

বারীন বলল, কলকাতায় গিয়ে থাকব কোথায় ?

অরবিন্দ বললেন, প্রথমে গিয়ে আমার শ্বশুরবাড়িতেই উঠতে পারিস। তারপর অন্য আস্তানা খুঁজে নিবি।

বারীন বলল, সেজদা, আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম। নিজেদের একটা কাগজ বার করলে কেমন হয় ? এখন প্রকাশ্যেই অনেক কথা ঘোষণা করা দরকার।

অরবিন্দ বললেন, সেও খুব ভাল কথা। দেখ যদি পারিস। একা তো কাগজ চালানো যায় না, দলবল জোগাড় করতে হবে। দুটো কাগজ বার করা দরকার, একটা ইংরেজি, একটা বাংলা।

বারীন কলকাতায় পৌঁছল বেলা এগারোটায়। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে তাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। জাহাজ চলাচলের জন্য হাওড়া ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন ওপারে যাওয়া যাবে না। যাত্রীরা গঙ্গার ধারে ভিড় করে আছে, ফেরিওয়ালারা চিনেবাদাম, ফুটকড়াই, গোলাবি রেউড়ি বিক্রি করছে ঘুরে ঘুরে। এক জায়গায় গোটা চারেক যুবক, মনে হয় কলেজের ছাত্র, গান জুড়েছে সমস্বরে। তাদের খালি পা, পরনে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে জামা নেই, শুধু একটা চাদর জড়ানো।

বারীন কৌতূহলী হয়ে সেখানে গিয়ে উঁকি দিল। ভদ্র বংশের ছেলেদের এমন ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান গাইতে আগে সে কখনও দেখেনি। গানটিও নতুন, অশ্রুতপূর্ব।

আমার সোনার বাংলা, আমি
তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে, ও মা আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি....

গানটির সরল আবেগ সোজাসুজি বুকে এসে ধাক্কা দেয়। এ গানের সুরেও যেন বাংলার বাতাস হিল্লোলিত হচ্ছে। বারীন পাশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ মশাই, এ গানটি কার রচনা ?

লোকটি বলল, জানেন না! কবিবর রবীন্দ্রবাবু বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এই গানটি লিখে দিয়েছেন।

বারীন বিস্মিত হল। রবীন্দ্রবাবুর কিছু কিছু গান সে আগে শুনেছে, সেগুলি ভক্তিগীতি কিংবা প্রেমগীতি। প্রধানত ব্রাহ্মরাই তাঁর গান গায়, এখন তাঁর গান রাস্তায় ছড়িয়ে গেছে ?

একটু পরে বারীন নিজেই অস্ফুট স্বরে গাইতে লাগল, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি...

ব্রিজ যুক্ত হওয়ায় বারীন চলে এল এপারে। সঙ্গে মালপত্র বিশেষ নেই, সে হেঁটেই যাবে। কিছুদূর যাবার পর বড়বাজারে সে দেখল আর এক দৃশ্য। একটা মস্ত বড় দোকানের সামনে ভিড় জমে আছে। একদল তরুণ হাতে হাত ধরে শৃঙ্খল রচনা করে ঘিরে আছে সেই দোকান, কোনও খরিদ্দারকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না। দোকানের কর্মচারীরা পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, লাঠি হাতে দু'জন সেপাইও রয়েছে ভিড়ের পেছনে।

এখানেও মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধা একজন লোক নেচেনেচে গান জুড়েছে :

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।

ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই
আমরা এমনি পাষাণ
তা ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই...

গানের মাঝখানেই ছুটতে ছুটতে চলে এল আরও কয়েকজন সেপাই, সঙ্গে একজন গোরা পুলিশ। হঠো হঠো হঠো বলে ভিড় সরিয়ে ভেঙে দিল সেই মানব-শৃঙ্খল। জনতা কোনও প্রতিবাদ করল না। সরে গেল একটু দূরে।

গায়কটি সেখান থেকেই আবার গান ধরল :

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই
তবু, তাই বেচে কাচ-সাবান-মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।

আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই
পরের জিনিস কিনবো না যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই...

অনেক বক্তৃতার চেয়েও একটি গানের আবেদন বেশি তীব্র। লোকেরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে, কেউ কেউ সুর মেলাচ্ছে নিজেদের গলায়। একটা গান শেষ হলেই অনুরোধ আসছে আর একটা, আর একটা।

দোকানের সামনেটা পরিষ্কার হয়ে যাবার পর একজন মাত্র খরিদ্দার এগিয়ে গেল সেদিকে। লোকটির পরনে ঠেঙো ধুতি, গায়ে চায়না কোট। সে দোকানের সিঁড়িতে পা দেওয়া মাত্র এদিকের জনতা চেঁচিয়ে উঠল, দুয়ো, দুয়ো, দুয়ো!

লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কম্পিত গলায় বলল, বাবাসকল, আমাকে মাপ করে দাও! আমার কন্যাদায়। আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে। জামাইয়ের একখানাও ধুতি কেনা হয়নি।

কয়েকজন বলে উঠল, জামাইকে বিলিতি ধুতি দিতে হবে ? কন্যা বুঝি মেমসাহেব ?

লোকটি বলল, বিবাহের বস্ত্র কি আজেবাজে দেওয়া যায় ? ইয়ে, মানে, দিশি ধুতি বা পাই কই ? কোনও দোকানে মেলে না।

একজন জানাল, পটলডাঙার স্বদেশি ভাণ্ডারে চলে যান, সেখানে অনেক গুজরাটি ধুতি মজুদ আছে।

লোকটি তবু অনুনয় করে বলল, এবারের মতন একখানা ভাল ধুতি কিনতে দাও বাবাসকল। মেয়ের মাকে কথা দিয়ে এসেছি!

একজন বলল, ম্যাঞ্চেস্টারের ধুতিটি ভাল ধুতি কে বলেছে ?

আর একজন বলল, বরকে বিলিতি ধুতি পরালে পুরুত মন্ত্র পড়াতে রাজি হবে না। আপনার বাড়িতে ধোপা-নাপিত যাবে না!

আর একজন বলল, শালিরা বরের কাছা খুলে দেবে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

লোকটি করুণভাবে একবার দোকানের দিকে তাকিয়ে নেমে এল গুটিগুটি। অমনি মুহুর্মুহু করতালি। একদল লোক ছুটে গিয়ে লোকটিকে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল।

রাস্তায় কয়েক পা যেতে যেতে এই রকমই দৃশ্য। সারা শহরে যেন একটা উৎসব লেগে গেছে। কলকাতার এই রূপ বারীন আগে কখনও দেখেনি। কোথাও কোথাও কৌতুকরস বেশি গাঢ়। বিলিতি পাম্প শু পরে সেজেগুজে যাচ্ছেন এক ভদ্রলোক, একদল ছেলে তাকে ঘিরে ধরে নেচে নেচে হাততালি দিতে লাগল। অন্য পথচারীরা থমকে গিয়ে হাসছে। শেষ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক পা থেকে জুতো জোড়া খুলে ফেললেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ছেলেরা বলতে লাগল, জামাটা, জামাটাও তো বিলিতি ? আর ওই রিস্ট ওয়াচ ?

এই বয়কটের সময়ই ঠিক মতন অনুভব করা গেল ইংরেজদের শোষণের স্বরূপ। পায়ের জুতো থেকে মাথার চিরুনি পর্যন্ত বিলেত থেকে আমদানি করতে হয়। দেশে কিছু কিছু যাও বা তৈরি হয়, তা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। এ দেশে কল-কারখানা শিল্প স্থাপনে ইংরেজ আগ্রহী নয়, তাতে তাদের মুনাফায় টান পড়বে। গায়ে মাখা সাবান, দেশলাই সব বিলিতি। ট্রেনে চাপো, ট্রামে ওঠো, ইংরেজকে পয়সা দাও !

একটা দোকানের পিকেটিং থেকে বেরিয়ে এসে একদল যুবক বলল, চল, জোড়াসাঁকো ঘুরে আসি। রবিবাবু যদি নতুন গান বাঁধেন, সেটা শিখতে হবে !

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামনে প্রতিদিনই দলে দলে লোক আসে। তারা রবীন্দ্রনাথের গান চায়। তাঁর গান গেয়ে ও শুনিয়ে জোরদার হয় আন্দোলন। পাড়ায় পাড়ায় গানের স্কুল খোলা হয়েছে, সেখানে শেখানো হচ্ছে এই সব গান।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব যখন ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সাড়া দেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ওটা একটা চমক দেবার চেষ্টা। ইংরেজ কি এতটা জবরদস্তি করতে পারে ! চতুর্দিকে যখন প্রতিবাদসভা ও মিছিল শুরু হয়ে গেল, তার কোনওটিতেই যোগ দেননি রবীন্দ্রনাথ। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলমও ধরেননি। তাঁর এই অমনোযোগ অনেককে বিস্মিত করেছিল।

এই সময় অন্য ব্যাপারেও ব্যস্ত থাকতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। বছরের গোড়ার দিকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ। সাতাশি বছর বয়েস হলেও দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু শুধু তিনটি ব্রাহ্মসমাজেই নয়, সারা বাংলাতেই মহাগুরু নিপাতের মতন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শেষ উইলে এক্সিকিউটর হিসেবে অন্য জীবিত পুত্রদের বাদ দিয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নিযুক্ত করেছেন, সঙ্গে আর দু'জন নাতি দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ পুত্র ছাড়া অন্য পুত্রদের ওপর ভরসা রাখতে পারেননি পিতা। এ জন্য সম্পত্তির হিসেবনিকেশ, জোড়াসাঁকোর অত বড় বাড়ির ব্যবস্থাপনা, এ সব নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মাথা ঘামাতে হয়েছে। ত্রিপুরার রাজপরিবারে একটা সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল, তা থেকেও বিযুক্ত থাকতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। মহারাজ রাধাকিশোর তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র, মহারাজও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শের ওপর নির্ভর করেন। এর মধ্যে শরীরও বিশেষ ভাল নয়, অর্শের ব্যথা শুরু হয়েছে, তাই নিয়েও শান্তিনিকেতনে যাতায়াত তো আছেই। মাঝে মাঝে গিরিডিতে গিয়ে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল বোধ করেন, গিরিডির জল-বাতাস সুস্থতা এনে দেয়।

বঙ্গভঙ্গ সত্যি সত্যি কার্যকর হতে যাচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। বাংলা সত্যি খণ্ড বিখণ্ড হবে, এ কি সত্যি সম্ভব ! বাঙালি তা মেনে নেবে ! বাঙালির মধ্যে যে একটা জাতীয়তাবোধ জেগে উঠছে সেটা ভেঙে দেওয়াই ইংরেজদের উদ্দেশ্য। শাসনকার্যের সুবিধের জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মতন এত বড় রাজ্যকে ভাগ করতে হলে বিহার ও ওড়িশাকে পৃথক করে দেবার যুক্তি বোঝা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী জেলাগুলিকে কেন জুড়ে দেওয়া হবে আসামের সঙ্গে ? স্যার হেনরি কটন ইংরেজ সরকারেরই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তিনিও বলেছেন, এই বঙ্গভঙ্গ অন্যায়।

এ যেন বাঙালির ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত। বাংলা ভাষার প্রসারের বিরুদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল প্রতিবাদ গুমরে উঠল। সেই প্রতিবাদ প্রথম ধ্বনিত হল গানে। এর আগে তিনি রচনা করছিলেন 'তবু পারি না সঁপিতে প্রাণ' কিংবা 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে'র মতন গান। শান্তিনিকেতনে এক নির্জন রাত্রে তাঁর বুক থেকে উৎসারিত হল অন্য রকম গানের কলি, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। শিলাইদহের গগন হরকরা নামের ডাকপিওনটি প্রায়ই

তাঁকে গান শোনাত, তার একটি গান 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে', এর সুরটি রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দ হয়েছিল। সেই সুর লাগিয়ে দিলেন সোনার বাংলা গানটিতে। দু'-একজনকে শোনাবার পরই গানটি মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল। তাঁর আর কোনও গান এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়নি, মিছিলে মিছিলে শোনা যায় এই গান।

এর পর গিরিডিতে গিয়ে রচনা করতে লাগলেন একটার পর একটা দেশাত্মবোধক গান : 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে', 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে', 'আমি ভয় করবো না ভয় করবো না, দু'বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না', 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি', 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী', 'আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে ?', 'আমাদের যাত্রা হল শুরু এবার ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান !' এ রকম আরও অনেক গান।

প্রতিবাদ আন্দোলন বা বিপ্লবের সময় যে-যার নিজস্ব অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। কবির অস্ত্র তাঁর কবিতা। কলমের বদলে তাঁর অপটু হাতে বন্দুক মানায় না। তবু কবিকেও কখনও কখনও রণক্ষেত্রে যেতে হয়, যেতে হয় সভা-সমিতিতে, মিছিলে। এখন আর সভা-সমিতির ডাক উপেক্ষা করতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ, গিরিডি থেকে মাঝে মাঝেই কলকাতায় এসে মিটিং-এ যোগ দেন, প্রবন্ধ পাঠ করেন, গান শোনাতে হয়। তিনি বয়কটেরও সমর্থক। তিনি মনে করেন, ইংরেজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বর্জন করে এই জাতি আত্মশক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠুক। এমনকী সংবাদপত্রে কালো বর্ডার দিয়ে বঙ্গভঙ্গের খবর ছাপা কিংবা সভায় দর্শকদের করতালিও তিনি পছন্দ করেন না, এগুলোও বিদেশের অনুকরণ।

সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ আইন অনুযায়ী বলবৎ হবে। দেশের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্যই দিল না ইংরেজ প্রভুরা। দেশের মানুষও বুঝিয়ে দেবে তাদের ক্রোধ। ওই দিন রাজধানী কলকাতায় হরতাল ডাকা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আর গিরিডিতে থাকতে পারলেন না, ওই দিন তাঁকে কলকাতায় উপস্থিত থাকতেই হবে।

রাত্রিবেলা ট্রেন ছুটে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের ঘুম আসছে না। আর মাত্র সাত দিন পরে দ্বিধাবিভক্ত হবে বাঙালি জাতি ? কিছুতেই যেন এটা সহ্য করা যায় না। খাতা খুলে রচনা করতে লাগলেন আর একটি নতুন গান :

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে...

১৬ অক্টোবর কলকাতায় হরতাল ডাকা হয়েছে। বিভিন্ন সভায় নেতারা ঘোষণা করেছেন, সেদিন কোনও বাড়িতে উনুনও জ্বলবে না, বাঙালিরা অরন্ধন পালন করবে। শাসনের ছুরি দিয়ে মানচিত্র বদলালেও বাঙালির ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশজুড়ে হবে রাখি-বন্ধন। উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ পরস্পরের হাতে হলুদ রঙের তিন সুতোর রাখি বেঁধে দেবে, তার মন্ত্র হবে : ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।

ঘোষণা তো করা হয়েছে, কিন্তু সব মানুষ মানবে তো ? সর্বস্তরে এমন হরতালের কথা আগে কেউ কখনও শোনেনি। একটা দিন ভাত না খেয়ে থাকতে রাজি হবে সবাই ? রাখিবন্ধন উপলক্ষে যদি ধর্মীয় বিশ্বাসের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় !

ওই দিনটি পালনের জন্য ঠাকুরবাড়িতে দারুণ সাড়া পড়ে গেছে, মেতে উঠেছে পরিবারের

সবাই। রাশি রাশি রাখি জড়ো করা হয়েছে, কলকাতার বাইরে যে-সব পরিচিত মানুষরা থাকে, তাদের জন্য খামে ভরে ডাকে পাঠানো হচ্ছে একটি করে রাখি। এমনকী বাড়ির মেয়েরাও রাখি বানাচ্ছে, খামে ঠিকানা লিখতে লেগে গেছে। মস্ত বড় পশ্চিমের বারান্দা জুড়ে চলেছে এই যজ্ঞ। সেই সঙ্গে চলেছে গান।

সেদিনের জন্য নতুন গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি একলা গাইলে তো চলবে না, মিছিলের সকলকে গাইতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বাড়ির বাইরে সমবেত যুবকদের সে গানটি শিখিয়ে যাচ্ছেন এক-একবার এসে, তারা আবার অন্যদের শেখাবে। গানটির ছাপা কপি বিলি হচ্ছে হাজার হাজার।

ঠাকুর পরিবারের শুধু একজন মানুষের এই কর্মযজ্ঞে কোনও উৎসাহ নেই। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আর ভুলেও কখনও পা দেন না। তিনি থাকেন বালিগঞ্জে জ্ঞানদানন্দিনীর আশ্রয়ে। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুধু বই পড়ে যান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যায়, আলো জ্বালবার উৎসাহ পান না, বিছানা ছেড়ে উঠে এসে চুপ করে বসে থাকেন জানালার ধারে। বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও বয়কটের কথা তাঁর কানে এসেছে ঠিকই। কত দিন আগে তিনি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে স্টিমার সার্ভিস চালিয়েছিলেন, সেদিন যদি দেশের মানুষ ইংরেজদের স্টিমার পুরোপুরি বয়কট করত, তা হলে তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হত না। টিকিটের দাম কমিয়ে দিলেন, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ত্রুটি করেননি, তবু সেই দেশি কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করল না দেশের মানুষ। আজ বিলিতি কাপড় বর্জন করার জন্য স্থাপিত হচ্ছে দেশি কাপড়ের কল, ইংরেজদের বাণিজ্যে ধাক্কা দেওয়াই যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র তা অনেকে বুঝেছে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর একটুও উদ্যম অবশিষ্ট নেই। কিছুই ভাল লাগে না। শুধু সময় কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে গান-বাজনা নিয়ে ভুলে থাকেন, কিছু কিছু লেখা অনুবাদ করেন, এই পর্যন্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তিনি এলেন না। সেদিন ভোর হতে না হতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের সমস্ত পুরুষদের ডেকে তুললেন। সুরেন সারারাত প্রায় ঘুমোয়নি, তার উৎসাহ সব চেয়ে বেশি। একটু একটু শীত পড়েছে, ভোরের দিকে ঘুমটা ভাল জমে, সুরেন ঘরে ঘরে গিয়ে সবার গা থেকে চাদর সরিয়ে নিয়ে নিতে লাগল।

প্রথমে সবাই মিলে যাবে গঙ্গার ঘাটে। সেখানে স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে নিয়ে তারপর শুরু হবে রাখি বন্ধন উৎসব।

তৈরি হতে হতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ একটা ধুতি পরে গায়ে একটা মুগার চাদর জড়িয়ে নিলেন। খালি পা। সবাইকে নিয়ে বেরুতে যাবেন, হঠাৎ অবনীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কী অবন, তুই জুতো পরেছিস যে! খোল, খোল!

অবনীন্দ্র শৌখিন ধরনের মানুষ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুতো খুলে ফেলে বলল, গাড়ি জুততে বলেছি। তুমি কি আমার গাড়িতে যাবে?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, গাড়ি! গাড়ি কী হবে? আজ সকলে মিলে একসঙ্গে হেঁটে যাব!

এবার অবনীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে ভুরু তুলে বলল, খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব? তুমি বলো কী রবিকা? কত কাঁটাকুটো, পেরেক, কাচ।

অবনীন্দ্রর বিস্ময়ের কারণ আছে। ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের মোজা ছাড়া বাড়ির বার হওয়াই অমর্যাদাকর, জুতো ছাড়া রাস্তা দিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু তাই নয়, রাস্তায় সাধারণ পাঁচপেঁচি লোকের পাশাপাশি তারা হাঁটবে।

বাড়ির সামনে এর মধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নিজের বাড়ির লোকজনদের নিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে গেলেন। চতুর্দিক থেকে আরও মিছিল আসছে, সারা শহর উত্তাল। একটাও দোকান খোলেনি। কেরাঞ্চি গাড়ি, ঠেলা গাড়ি নেই রাস্তায়। মুটেমজুররাও কাজ বন্ধ করেছে। বাজার বন্ধ। কোনও বাড়ি থেকেই দেখা যাচ্ছে না উনুনের ধোঁয়া। ট্রাম কোম্পানি

ট্রাম চালাচ্ছে বটে, তাতে একজনও যাত্রী নেই।

জোর জবরদস্তি নেই, এ হরতাল স্বতঃস্ফূর্ত। বাড়ি ছেড়ে সব মানুষ বেরিয়ে আসছে পথে। রবীন্দ্রনাথ দু' হাত তুলে গান ধরেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাইছে সহস্র কণ্ঠ:

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

কবি আজ চারণ হয়েছেন। তাঁর উজ্জ্বল নয়ন, প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে অনেকে বেশি বেশি প্রেরণা পাচ্ছে। কিছু লোক ঠেলাঠেলি করে সামনে আসছে তাঁকে দেখবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ গান থামাতে পারছেন না, একবার শেষ হলেই জনতার দাবি উঠছে, আবার, আবার!

গঙ্গার কুলে গিসগিস করছে মানুষ। সারা শহর যেন আজ এখানে ভেঙে পড়েছে। সেই ভিড়ের মধ্যেই নেমে জলে কয়েকটা ডুব দিলেন রবীন্দ্রনাথ, তারপর ভিজে ধুতি বদলে নিলেন। একটি যুবক ছুটে এসে বলল, প্রথমে আপনাকে আমি রাখি পরাব!

শুরু হয়ে গেল উৎসব। এ ওকে রাখি বেঁধে দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে গগনভেদী স্লোগান উঠছে, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই!

অবনীন্দ্র তার রবিকার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এ কী অদ্ভুত পরিবর্তন! রবীন্দ্রনাথ চেনাশুনো মহলে হাসিঠাট্টা করেন, কিন্তু বাড়ির বাইরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন না। কথা বলেন মেপে মেপে, এত বেশি ভদ্রতা দেখান যে তা কৃত্রিমতার পর্যায়ে চলে যায়। কখনও অন্যের সামনে তাঁর আবেগের প্রকাশ ঘটে না। আজ তাঁর এ কী হল! সামনে যাকে পাচ্ছেন তাকেই জড়িয়ে ধরছেন। রাখি পরাবার সময় সে মেথর-মুদ্দোফরাস না অভিজাত, তা বিন্দুমাত্র বিবেচনা করছেন না। মহা উৎসাহে রাখি পরিয়ে চলেছেন। এমনকী পুলিশদেরও বাদ দিচ্ছেন না। পুলিশদের ডেকে ডেকে বলছেন, এসো ভাই, এসো, তুমিও তো বাঙালি। বাঙালি না হও, আমারই দেশের মানুষ!

এক জায়গায় প্রথম বাধা পড়ল। একজন সেপাইকে রবীন্দ্রনাথ যে-ই রাখি পরাতে গেলেন, সে কাচুমাচু মুখে বলল, হুজুর মাপ করবেন, আমি মুসলমান!

রবীন্দ্রনাথ থমকে গেলেন। মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তিনি মৃদু স্বরে বললেন, আচ্ছা থাক!

পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক পরস্পরবিরোধী খবর আসছে। সেখানেও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন যেমন চলছে, তেমনি এক শ্রেণীর মুসলমান বঙ্গভঙ্গের প্রবল সমর্থক। কোথাও কোথাও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের মারামারিও হয়েছে।

সেপাইটির প্রত্যাখ্যানের পরই একটি দাড়িওয়ালা লোক ছুটে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলল, আমিও মুসলমান, আমার আপত্তি নেই, আপনি আমাকে রাখি পরিয়ে দিন।

অমনি জয়ধ্বনি উঠল : ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।

গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরার পথে রাস্তার দু'পাশের লোকদের রাখি পরাতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ। ঘোড়ার গাড়ির সহিস, ভিস্তিওয়ালা, ফিরিঙ্গি, পাদ্রি সবাই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, অনেকে রবীন্দ্রনাথকেও রাখি পরাচ্ছে।

জোড়াসাঁকোয় নিজেদের বাড়ির মোড়ের কাছে এসে রবীন্দ্রনাথকে অবনীন্দ্র বলল, রবিকা, কী অবস্থা হয়েছে তোমার, শরীরে ওজন বেড়ে গেছে ?

সত্যিই তাই, রবীন্দ্রনাথের দু'হাতে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা করে রাখি বাঁধা। কব্জি ছাড়িয়ে উঠে গেছে কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত।

হাসতে হাসতে তিনি রাখি খুলতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে যেন দুষ্টুবুদ্ধি ঝলসে উঠল। বললেন, অবন, একটা কাজ করলে হয় না ? কাছেই তো নাখোদা মসজিদ, চল না, সেখানকার মোল্লা সাহেবদের রাখি পরিয়ে আসি।

অবনীন্দ্র চোখ কপালে তুলে বলল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি রবিকা ! ওখানে গেলে দাঙ্গা বেঁধে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কেন, অনেক তো মাথায় ফেজ টুপি পরা মুসলমান রাখি বাঁধতে আপত্তি করল না। একবার গিয়েই দেখা যাক না।

অবনীন্দ্র বললেন, খবরদার ও কর্ম কোরো না। চলো বাড়ি চলো !

রবীন্দ্রনাথ তবু যেতে চান। জোর জারির তো কিছু নেই, মোল্লারা রাজি না হলে ফিরে আসবেন।

অবনীন্দ্রর তবু সাহসে কুলোল না। সে সরে পড়ল। সুরেন ও আরও কয়েকজন রয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। দুপুর সাড়ে তিনটের সময় সার্কুলার রোডে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। অল্প কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ হেঁটে চললেন নাখোদা মসজিদের দিকে।

বিশাল মসজিদটি অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। কাছাকাছি এসে সুরেন বলল, আমার মনে হয়, আগেই ওখানকার লোকদের রাখি পরাতে শুরু না করে ইমামের অনুমতি নেওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক বলেছিস !

দ্বাররক্ষীকে দিয়ে ইমামের কাছে খবর পাঠানো হল।

ভেতরের একটি ছোট কক্ষে চার পাঁচজন মোল্লা সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন বৃদ্ধ ইমাম। তাঁর সাদা ধপধপে চুল, সেই রকমই সাদা দাড়ি, গৌরবর্ণ, বয়েসের তুলনায় চক্ষু দুটি বেশ উজ্জ্বল, অঙ্গে মখমলের পোশাক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী শুনে তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন, ভেতরে নিয়ে এসো।

একটু পরে সে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর দিকে যে-কেউ এক পলক তাকালেই বুঝতে পারে, ইনি সাধারণ মানুষ নন।

রবীন্দ্রনাথ আদাব জানিয়ে বললেন, ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ করেছে বলে অনেকে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। দেশ ভাগ হোক বা না হোক, বাঙালির একতা কিছুতেই নষ্ট হবে না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ভাই। ঈদের দিনে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে কোলাকুলি করে। বিজয়া দশমীর দিনে হিন্দু মুসলমানকে আলিঙ্গনে জড়ায়। আজকের দিনটিতে সেই ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হিসেবে আমরা পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিতে চাই।

ইমাম সাহেব তাঁর সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকালেন। কেউ কোনও কথা বলল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিকর নীরবতা।

তারপর বৃদ্ধ ইমাম প্রশান্ত মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, আইয়ে ! তিনি একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের দিকে।

৭৬

বউবাজারের বাড়ি থেকে থিয়েটারে যাবার সোজা পথ ছেড়ে নয়নমণি প্রায়ই ঘুরপথে যায়। এখন তার একলার জন্যই গাড়ি আসে, অন্য অভিনেত্রীদের তুলতে হয় না। নয়নমণি সহিসকে বলে, রহমত মিঞা, চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে চলো। গাড়ির জানলা দিয়ে সে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে। কী দেখে সে ? নয়নমণি নিজেই বোঝে যে, দিন দিন এটা তার বাতিকের মতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে যাঁর দেখা পেতে চাইছে, এ ভাবে তাঁর দর্শন পাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। তবু হৃদয় সব সময় যুক্তি মানে না, মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চায়। নয়নমণির আশা, কোনও না কোনওদিন জোড়াসাঁকোর গলি দিয়ে বেরিয়ে আসবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সে তাঁকে এক ঝলক অন্তত দেখে চক্ষু সার্থক করবে।

রবীন্দ্রনাথ যে স্ত্রী বিয়োগের পর বছরের বেশির ভাগ সময়ই আর এ বাড়িতে থাকেন না, সে খবর জানে না নয়নমণি। সে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি বারবার পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছে, জোড়াসাঁকোর প্রাসাদটিও সে দূর থেকে দেখেছে। সে মনে মনে কল্পনা করে, ওই বাড়ির কোনও নিভৃত কক্ষে বসে রবীন্দ্রনাথ ওই সব অমূল্য কবিতা, গান, গল্পগুলি লিখে যাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গান সে সরলা ঘোষালের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। থিয়েটারে এই সব গান চলে না, কিন্তু নয়নমণি একা একা এই গান গেয়ে গভীর আনন্দ পায়। গান গাইবার সময় তার চোখ বুঁজে আসে, মনশ্চক্ষে সে দেখতে পায় গানের স্রষ্টাকে।

ভরতকে সে ভুলে যায়নি। ভরতের সঙ্গে আর দেখা হোক বা না হোক, তার জীবনে আর কোনও পুরুষের স্থান নেই। সে ধরেই নিয়েছে ভরতের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। সরলা ঘোষালের কক্ষে একদিন সেই আকস্মিক সাক্ষাৎকার, ভরত চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, কথা বলতে ঘৃণা বোধ করেছে। খুব সম্ভবত নয়নমণিকে এড়াবার জন্যই সরলা ঘোষালের কাছে আর কখনও আসেনি ভরত। ও বাড়িতে বিভিন্ন ব্যক্তিদের আলাপ-আলোচনা শুনে নয়নমণি বুঝতে পেরেছে যে, ভরত কোনও গুপ্ত দলের সঙ্গে জড়িত। সেই দলটিকে সরলা ঘোষালও আর পছন্দ করে না, ওরা বন্দুক পিস্তলের কারবার করে। ভরতকে সে যে-ভাবে দেখেছে, তাতে তার এই ভূমিকা যেন কল্পনাও করা যায় না। সে ভরত যা-ই করুক, তার বিচার করতে চায় না নয়নমণি, ভরত তাকে ভুলে যায় যাক, তবু একবার ওই ভরতকে সে তার হৃদয় সমর্পণ করেছিল, দ্বিতীয় আর কারুকে সে হৃদয় দিয়ে দ্বিচারিণী হতে পারবে না।

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্যই এই ব্যাকুলতা কেন ? তিনি কোনওদিন জানতে পারবেন না। তবু তো তাঁকে মন-প্রাণ সব দিয়ে চায় নয়নমণি ! অনেক ভেবে ভেবে নয়নমণি এর একটা উত্তরও খুঁজে পেয়েছে। কোনও নারী যখন নিবিষ্টভাবে তার দেবতার আরাধনা করে, তখন কি সে তার স্বামী বা দয়িতকে ভুলে যায় ? নারীর দেহ-মন সব কিছুরই মালিক তার স্বামী, তারপরেও দেবতাকে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়া যায়। এ হল ভাব-সর্বস্ব, যাতে বস্তু জগতের কোনও ছোঁয়া নেই। নারীর জীবনে তার স্বামী বা একজন পুরুষ থাকার যেমন প্রয়োজন, তেমনই একজন দেবতা থাকারও প্রয়োজন। পুরুষ তাকে পরিত্যাগ করতে পারে, কিন্তু দেবতা যে-হেতু কখনওই কাছে আসবেন না, তাই পরিত্যাগেরও প্রশ্ন নেই। একা একা সেই দেবতার কথা চিন্তা করে, তাঁকে হৃদয়ের ব্যথার কথা

নিবেদন করেই অনেক পরিশুদ্ধ হওয়া যায়। আগে নয়নমণি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে ধ্যান করত, এখন রবীন্দ্রনাথই তার জীবন্ত দেবতা।

দেবতা কখনও কাছে আসবেন না জেনেও একটা দুর্বলতা কিছুতেই দূর করা যায় না। একবার অন্তত চর্মচক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে। নয়নমণির সেই অভাবনীয় সৌভাগ্য ঘটে গেল।

রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন রচনাগুলি পড়ার জন্য নয়নমণি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটির গ্রাহক হয়েছিল। সেখানে কবির অনেক কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, মজার রচনা থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। প্রতি মাসের কিস্তি পড়ার জন্য সে অধীর হয়ে থাকে, কোনও মাসে পত্রিকা প্রকাশে দেরি হলে যেন তার দিন কাটতে চায় না। এই উপন্যাসটি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ। কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে! রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসটি তার অতি প্রিয়, কতবার যে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। মহেন্দ্র ও বেহারী এই চরিত্র দু'টির সঙ্গে সে যেন শশিভূষণ ও ভরতের মিল খুঁজে পায়। তবে কি সে বিনোদিনী? না, না, তা কেন হবে, সে অতি সামান্যা নারী। মহেন্দ্র ও বেহারীর মতন মানুষ সে আরও দেখেছে, সরলা ঘোষালের বাড়িতে খুব বেশি।

একদিন সে অমর দত্তকে বলেছিল, রবিবাবুর 'চোখের বালি' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়ে স্টেজে নামানো যায় না?

অমর কয়েক পলক তাকিয়ে ছিল নয়নমণির মুখের দিকে।

ক্লাসিক থিয়েটারে বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে। নিজ দোষে অমর দত্ত দ্রুত ডেকে আনছে তার পতন। বয়েস বাড়লেও তার মধ্যে এখনও একটি বেহিসেবি, বেপরোয়া বালক রয়ে গেছে, লোকে যাতে তা না বুঝতে পারে তাই যখন তখন সে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য ও কটূক্তি করে সেটাকে চাপা দিতে চায়। তার আত্মম্ভরিতায় অনেকে যেমন বিরক্ত, অনেকে আবার সেই সুযোগে সামনা সামনি অতিরিক্ত চাটুকারিতা করে আড়ালে তার সর্বনাশ করতে চায়। কয়েক বছরের অসাধারণ সাফল্যে সে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। বরাবরই আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করার দিকে তার ঝোঁক, দানের ব্যাপারেও তার কার্পণ্য নেই। অনেক চাটুকার মিথ্যে কথা বলেও তার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে যায়।

মিনার্ভা থিয়েটারের অবস্থা সে সময় খারাপ হয়ে পড়ার পর অমর দত্ত সে থিয়েটার চালাবারও ভার নিয়ে নেয়। একসঙ্গে ক্লাসিক ও মিনার্ভা দু'টি থিয়েটার চালাবার দৃষ্টান্ত আগে আর নেই। অমর সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। তার একার পক্ষে দু'টি জায়গায় সর্বক্ষণ নজরদারি করা সম্ভব নয়, নির্ভর করতে হয় কর্মচারীদের ওপর, তারা টাকাপয়সা সরিয়ে ফাঁক করে দিতে লাগল। মিনার্ভায় শুধু ক্ষতির পর ক্ষতি, ক্লাসিকের লভ্যাংশ দিয়ে মিনার্ভা চালাবার চেষ্টা করেও সুফল হল না। অচিরকালের মধ্যেই ভরাডুবি হল মিনার্ভার। অমরের প্রচুর অর্থদণ্ড গেল।

এক বিপদ যেন আর এক বিপদকে টেনে আনে। মিনার্ভার ক্ষতি সামলে নেবার জন্য ক্লাসিকে সাড়ম্বরে নামানো হল গিরিশবাবুর নতুন নাটক 'সৎনাম'। ঐতিহাসিক নাটক, প্রচুর ব্যয়বহুল সেট ও সাজসজ্জা। হিন্দুদের কাছে বহু নিন্দিত, সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই নাটকের কেন্দ্রচরিত্র। তিন-চার রাত্রি চলার পরই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় কয়েক হাজার লোকের এক উত্তেজিত জনতা এসে ঘিরে ধরল ক্লাসিক থিয়েটার। তারা সবাই মুসলমান, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তারা দাবি জানাতে লাগল, এই নাটকে মুসলমানদের সম্পর্কে কুৎসা ছড়ানো হয়েছে, অবিলম্বে বন্ধ না করলে তারা থিয়েটারে আগুন ধরিয়ে দেবে। দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় আর কি! অবিলম্বে পুলিশ এসে দাঁড়াল মাঝখানে। অমর দত্ত রঙ্গালয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে 'সৎনাম' নাটক বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত জানাল।

'সৎনাম' গেল, তার সঙ্গে জলাঞ্জলি গেল বহু টাকা। এর পরেও কোনও নাটক আর জমতে চায় না। ও দিকে স্টার আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। হস্তান্তরিত মিনার্ভাতেও শুরু হয়েছে নাটক। অমর বারবার নাটক বদল করেও দর্শক টানতে পারছে না। তখন সে দর্শকদের উপহার দিতে শুরু করল। বই উপহার। একখানা টিকিট কাটলেই সেই দর্শক ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলি বা মধুসূদন গ্রন্থাবলি বা গিরিশচন্দ্র গ্রন্থাবলি উপহার পাবে। প্রথম প্রথম একটি বই, তারপর একাধিক। দর্শকদের ভারী

মজা, টিকিটের দামের চেয়ে উপহার পাওয়া বইয়ের দাম অনেক বেশি। কেউ কেউ টিকিট কিনে উপহারের বইগুলি নিয়ে বাড়ি চলে যায়, নাটক দেখতে ঢোকে না।

ক্ষতি সামলাবার জন্য অমর দত্ত চতুর্দিকে ধার নিতে লাগল। দু' এক বছর আগেও যে অমর দত্ত ধনকুবেরের মতন মুঠো মুঠো টাকা ছড়াত, এখন সেই তাকেই অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। এবং ঋণ ক্রমশ বাড়তেই থাকে।

এই রকম দিশেহারা অবস্থায় অমর যখন বারবার নাটক বদলাচ্ছে, তখন নয়নমণির প্রস্তাব শুনে সে উড়িয়ে দিতে পারল না। নয়নমণির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার মন আর্দ্র হয়ে এল। ফুটো জাহাজ ছেড়ে যেমন অনেকেই পালায়, সেই রকমই অমরের বিপদের সময় অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। চতুর্দিকে পাওনাদার। কিন্তু নয়নমণি অন্য থিয়েটার থেকে বারবার প্রলোভনের ডাক পেয়েও যায়নি। অমর তাকে তিন চার মাসের বেতন দিতে পারেনি, নয়নমণি মুখ ফুটে একবারও সে কথা উচ্চারণ করে না।

অমর অস্ফুট স্বরে বলল, চোখের বালি, চোখের বালি! দেখা যাক, তোর কথা মতন যদি এই নাটকে টিকিট ঘর চাঙ্গা করা যায়।

গিরিশবাবুর ওপর নাট্যরূপের ভার দেওয়া হল। এ উপন্যাস সম্পর্কে গিরিশবাবু খুব একটা উৎসাহী নন। তিনি দু'-চার পাতা লিখলেন বটে, কিন্তু তারপরই শুরু হয়ে গেল অন্য গোলমাল। গিরিশবাবু তাঁর পাওনা টাকা দাবি করতে লাগলেন। তাঁর তিন মাসের বেতন নশো টাকা মিটিয়ে না দিলে তিনি আর কোনও কাজে হাত দেবেন না।

অমর দত্ত নিজেই দ্রুত নাট্যরূপ দিয়ে রিহার্সাল শুরু করে দিল। এই সব পেশাদারি মঞ্চে সাতদিনের মধ্যে নতুন নাটক নামিয়ে দেওয়া হয়। নট-নটীরা কেউই পুরো পার্ট মুখস্থ করে না, নির্ভর করে প্রমটিং-এর ওপর। অনেক সময় প্রমটিং এত জোরে জোরে হয় যে, দর্শকরাও শুনতে পেয়ে যায়। নয়নমণির এটা পছন্দ নয়। সে নিষ্ঠার সঙ্গে, বাড়িতে রাত জেগেও সব সংলাপ মুখস্থ করে।

নয়নমণি খুব আশা করেছিল, মহড়ার সময় গ্রন্থকার রবীন্দ্রবাবু একবার অন্তত আসবেন। যেমন তিনি এসেছিলেন অনেকদিন আগে। কিন্তু তিনি এলেন না।

হুড়োহুড়ি করে চোখের বালি মঞ্চস্থ করা হল। নতুন নাটকের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়াবার জন্য সময় দিতে হয়, প্রথম কয়েক রাত দর্শক সংখ্যা কম থাকে। কিন্তু সে সময় পাওয়া গেল না। পাওনাদাররা মামলা ঠুকে দিল অমরেন্দ্রনাথের নামে। অনেক দিনের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, সে বাবদে উচ্ছেদের নোটিস জারি হয়ে গেল। অমর দত্তকে ঋণ দেবার মতনও আর কেউ নেই।

ক্লাসিক থিয়েটারের মালিকানা অমর দত্তর হস্তচ্যুত হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে অমর আবার ক্লাসিকে ফিরে এল বটে, কিন্তু বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে। তার মাইনে পাঁচশো টাকা। নতুন মালিকরা তাকে এত বেশি মাইনে দিতে রাজি হয়েছে এই শর্তে যে, তাকে লাভ দেখাতে হবে। ভাঙা দল আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করল অমর, গিরিশবাবু, দানী, তিনকড়ির মতন খ্যাতিমানরা অন্য থিয়েটারে যোগ দিয়েছে, পুরনোরা প্রায় কেউই নেই, নয়নমণি ছাড়া। মাঝখানে যখন ক্লাসিক বন্ধ ছিল, সে বাড়িতে বসে ছিল। অমর তাকে নিজে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

নয়নমণির ব্যবহারের কূলকিনারা পায় না অমর। নাচ, গান, অভিনয়, এই তিনটির জন্যই নয়নমণির খুব কদর, বিশেষত তার মতন নৃত্য পটিয়সী কোনও মঞ্চেই আর নেই। স্টার নয়নমণিকে পাবার জন্য খুব ব্যগ্র, তা অমর ভাল করেই জানে, গিরিশবাবুও তাঁর নতুন নাটকের জন্য একজন নর্তকী-অভিনেত্রী খুঁজছেন, তবু গেল না কেন নয়নমণি? এই ক' মাস তার উপার্জন বন্ধ ছিল, তবু গেল না? সে জানত, অমর দত্ত আবার ফিরে আসবে? অথচ অমর বার বার চেষ্টা করেও নয়নমণিকে তার নর্মসঙ্গিনী করতে পারেনি। সবাই জানে, অমর দত্তর সঙ্গে নয়নমণির পিরিত নেই, বরং মাঝেমাঝেই ঝগড়া হয়, তবু ক্লাসিকের প্রতি তার এত টান কেন? দুর্জ্ঞেয় নারী চরিত্র।

হালকা রঙ্গরসের নাটক নামিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল অমর। কিন্তু ক্লাসিক যেন এখন ভাঙা হাট, দর্শকরা ছুটছে স্টারে, মিনার্ভায়। উদ্বেগে, অস্থিরতায় চুল ছিঁড়ছে অমর। তখন নয়নমণি আবার অমরকে বলল, 'চোখের বালি' নাটকটা তো আমরা ঠিকমতন শুরু করতেই পারিনি, এখন সেটা আবার অভিনয় করা যায় না!

অমর নয়নমণিকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, বেশ কথা। তুই আমার লক্ষ্মী, নয়ন! তোর কথা কি আমি ঠেলতে পারি? দেখি, ওই নাটক দিয়েই যদি ক্লাসিকের গৌরব ফেরানো যায়!

অমরের স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে সরে গিয়ে নয়নমণি বলল, 'প্রেমের পাথার', 'প্রণয়-পরিণাম', 'প্রণয় না বিষ' ধরনের নাটকগুলো একঘেয়ে হয়ে গেছে। 'চোখের বালি' অন্যরকম, ঠিকমতন করতে পারলে লোকে নতুন একটা স্বাদ পাবে।

অমর বলল, আমি মহেন্দ্র, তুই বিনোদিনী, আমরা দু'জনেই অ্যাকটিং-এ ফাটাব, আর যারা আছে কাজ চালিয়ে দেবে। আজ থেকে মহড়া শুরু হোক।

এবারেও প্রথম রাতে অর্ধেক আসনের বেশি ফাঁকা রইল। অমর দত্তর নামের জাদু আর লোক টানছে না? তবু ধৈর্য ধরতে হবে। দ্বিতীয় রাতে অভিনয় শুরু হবার আগে অমর দত্ত বারবার গিয়ে টিকিট ঘরে খোঁজ নিয়ে আসছে। বিক্রি কিছু বেড়েছে, তবু আশানুরূপ নয়। মালিকপক্ষের লোক শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে সেখানে বসে আছে, চোখাচোখি হলেই অমরের অস্বস্তি হয়। থার্ড বেল পড়ে যায়, তবু অমর মেক আপ নেয়নি, প্রায় জোর করে তাকে টেনে আনা হল সাজঘরে।

পাঁচ অঙ্কের নাটক, দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে জানা গেল, কাহিনীকার রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধু নিয়ে অভিনয় দেখতে এসেছেন। তা শোনামাত্র বুক কাঁপতে লাগল নয়নমণির। তিনি এসেছেন! প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার থাকে, তাঁকে নয়নমণি দেখতে পাবে না, কিন্তু তিনি দেখবেন নয়নমণিকে। আজ নয়নমণি তার দেবতার কল্পনার নারী।

কত রাজা-মহারাজ, কত সাহেবসুবো আসে অভিনয় দেখতে, নয়নমণি বিচলিত হয় না। আজ তো তার বুক কাঁপলে চলবে না, আজ তাকে সমস্ত মন-প্রাণ একাগ্র করে অভিনয় করতে হবে। তবু নাটক ঠিক যেন জমছে না। অমর দত্ত বড় অস্থির, চঞ্চল, বারবার সে অন্ধকারের মধ্যেও দেখার চেষ্টা করছে, দর্শকদের আসন কতগুলি পূর্ণ হয়েছে। দু'বার সে পার্ট ভুলে গেল, উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে প্রমটিং শোনার চেষ্টা করল।

শেষ হবার পর অবশ্য হাততালি পাওয়া গেল যথেষ্ট।

অমর দৌড়ে ডেকে আনল রবীন্দ্রনাথকে। বারবার বলতে লাগল, আপনি কেন খবর দিয়ে আসেননি। আপনাদের জন্য বক্স-এর ব্যবস্থা করে রাখতুম।

অমর আগে কয়েকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ আসার সময় পাননি। আজ এ পাড়াতেই একটি সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন, তারপর চলে এসেছেন।

মঞ্চের পেছনে সিংহাসনের মতন একটি চেয়ারে বসানো হল রবীন্দ্রনাথকে। প্রথা অনুযায়ী সব নট-নটীকে এনে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে তাঁর সঙ্গে। সকলেই একে একে প্রণাম করে যাচ্ছে, নয়নমণি আর আসতেই চায় না। কী যে লজ্জা পেয়ে বসেছে তাকে। আড়াল থেকে দেখছে ওই দেবদুর্লভ রূপ, এই দেখাই তো যথেষ্ট, কাছে যাবার দরকার কী? কাছে গেলেই উনি যদি বুঝে ফেলেন যে, নয়নমণি প্রতিনিয়ত ওঁর কথাই চিন্তা করে? লেখকরা তো অন্তর্যামী হন।

অমরের হাঁকডাকে নয়নমণিকে কাছে আসতেই হল। পদ স্পর্শ করল না, সে অধিকারও তার নেই। একটু দূরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে প্রণাম জানাল রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ কিছুটা যেন অন্যমনস্ক। নাটক দেখে তিনি যেন একটু হতাশই হয়েছেন। অন্যরা তবু চলনসই, কিন্তু অমর দত্ত যেন মহেন্দ্রর চরিত্রটা ধরতেই পারেনি। মহেন্দ্রর প্রকৃতি অতি প্রবল, তার প্রণয়ে মিশে আছে উগ্রতা, কিন্তু সে দুশ্চরিত্র নয় কোনওক্রমেই। মুখে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সে সব বললেন না, অতিশয় ভদ্রতায় সকলকেই প্রশংসা করলেন, নয়নমণিকে তিনি আলাদাভাবে লক্ষও করলেন না। শুধু অমর দত্তকে

একবার বললেন, তুমি মহেন্দ্রকে যে রূপ দিয়েছ, তা অবশ্যই ভাল হয়েছে, তবে একটু অন্যরকমভাবেও তাকে চিন্তা করা যায়। বিনোদিনীর সঙ্গে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর অতটা উঁচুতে না তুলেও...

রবীন্দ্রনাথ যে নয়নমণির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না, বা একটাও কথা বললেন না, তাতেই নয়নমণি স্বস্তি পেল। সে তো অন্তরালবর্তিনীই থাকতে চায়। তবু যে চোখের দেখাটুকু হয়েছে, তাতেই সে ধন্য। সারা রাত তার ঘুম এল না।

এবারেও 'চোখের বালি' ক্লাসিক-এর ভাগ্য ফেরাতে পারল না। সমালোচকদের মতে এ কাহিনীতে নাটকীয় সংঘাত নেই। নয়নমণি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করছে, কিন্তু অমর তার আগেকার প্রতিভার পরিচয় দিতে পারছে না। প্রচুর অর্থব্যয়ের বিলাসিতা ও অহঙ্কারের মধ্যেই তার প্রতিভা খোলে। আগে সে ছিল এই থিয়েটারের মালিক, এখন কর্মচারী, এই হীনমন্যতা সে কিছুতে সহ্য করতে পারে না। টিকিট বিক্রির চিন্তায় যতই সে উতলা অস্থির হয়ে পড়ছে, ততই খারাপ হচ্ছে তার অভিনয়। সেটা যখন সে বুঝতে পারছে, তখন নিজের ওপর রাগ করে বাড়িয়ে দিচ্ছে মদ্যপান। রাত্রি জাগরণ ও অত্যাচারে তার শরীরও আর বইছে না।

আগে সে কখনও অভিনয়ের আগে বা মধ্যখানে মদ স্পর্শ করত না। অন্যদেরও সে নিখুঁত শৃঙ্খলা মানিয়ে চালাত। এখন সে সন্ধে হতে না হতেই লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়, এক একটি অঙ্কের মাঝখানে বোতল থেকে কাঁচা মদ গলায় ঢালে, শেষের দিকে তার কথায় জড়তা এসে যায়, তা ঢাকবার জন্য তাকে বারবার কাশতে হয়।

একদিন অভিনয়ের শেষে সে নয়নমণিকে বলল, তুই আমার ঘরে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

টেবিলের ওপর পা তুলে বসল সে, হাতে মদের বোতল। সামনে চেয়ার থাকলেও তাতে বসল না নয়নমণি, দাঁড়িয়ে রইল। মেক আপ মোছেনি সে, সাদা থান পরা, বিনোদিনীর বিধবার বেশ।

অমর বলল, কী রে নয়ন তোর কথা শুনে 'চোখের বালি' চালিয়ে কী লাভ হল? লবডঙ্কা! বক্স অফিসে বসে কেবলরাম মাছি তাড়াচ্ছে। আজ কত বিক্রি হয়েছে জানিস, একশো সাতাশি টাকা! তাতে আমার ইয়ে... হবে!

অমর জানে নয়নমণি অশ্লীল কথা পছন্দ করে না, কিন্তু আজ সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না। দর্শক সংখ্যা না বাড়লে যে অমরকে আরও অপমান সহ্য করতে হবে, তা নয়নমণি বোঝে। সে মৃদুস্বরে বলল, সেটা তো নাটকের দোষ নয়। এ নাটকের প্রধান দোষ এর অভিনয়, সেটাই তো আমরা পারছি না।

অমর বলল, কোন শুয়োরের বাচ্চা মহিন্দিরের পার্টে আমার চেয়ে ভাল অভিনয় করবে? এ নাটকে আরও মাল ঢোকাতে হবে। নাচ নেই, গান নেই, লোকে শুধু শুধু পয়সা খরচ করতে আসবে? কাল থেকে তুই দু'খানা নাচ দিয়ে দেখত!

নয়নমণি হেসে ফেলে বলল, মদ খেয়ে খেয়ে তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে অমরবাবু! বিনোদিনী হিন্দু ঘরের বিধবা না? সে নাচবে? তা দেখলে দর্শকরাই আমাদের মারতে আসবে!

অমর বলল, ওসব বাজে কথা ছাড়! কেন, বেধবারা বুঝি নেত্য করে না! ঠিক মতন নাচতে জানলেই নাচে! বিনোদিনী ঘরের মধ্যে একা একা নাচবে। সে রকম দু'খানা সিন ঢুকিয়ে দেব। লোকে নয়নমণির বকবকানি শুনতে আসে না, তার নাচ দেখতে আসে, তার গান শুনতে আসে! লাস্ট সিনে তুই একখানা গান গাইবি। খুব স্যাডের মাথায় গাইবি, লোকে যেন হাপুস হাপুস করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যায়। বাঙালিরা কাঁদতে বড় ভালবাসে।

নয়নমণি বলল, কী আবোল তাবোল বকছ? এসব শোনার আমার সময় নেই, বাড়ি যাচ্ছি।

অমর এবার গর্জে উঠে বলল, চোপ! আমি আবোল তাবোল বকছি? কাল থেকে তোকে নাচতে হবে। এই আমার হুকুম!

নয়নমণি তবু হালকাভাবে বলল, হুঃ, হুকুম না ছাই! কাল সকালে এসব কথা মনে থাকবে? অনেক খেয়েছ, এখন ঘুমিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো।

নয়নমণি পেছন ফিরতেই অমর আবার বলল, অ্যাই, যাচ্ছিস কোথায় ? কথাটা কানে গেল না ? ভেবেছিস আমি মাতাল হয়েছি ? মোটেই না ! যা বলছি, ঠিক বলছি। কাল থেকে তোকে নাচতে হবে !

নয়নমণি সংক্ষিপ্তভাবে বলল, আমি পারব না !

অমর বলল, পারবি না মানে ? আলবাত পারতে হবে !

নয়নমণি বলল, জোর করে আমাকে দিয়ে কোনওদিন তুমি কিছু করাতে পেরেছ ? এই নাটকে নাচ দেখানোর চেয়ে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভাল ! অমন বিশ্রী কথা আমি আর শুনতেও চাই না।

দাঁতে দাঁত চেপে অমর বলল, অত বেশি দেমাক দেখাবি না আমাকে। আমি অমর দত্ত !

টেবিল ছেড়ে উঠতে গিয়ে হাত থেকে মদের বোতলটা পড়ে ভেঙে গেল। তাতে আরও রাগ বেড়ে গেল অমরের। নেশার ঝোঁকে কী যে করছে তার খেয়াল রইল না, ছুটে এসে নয়নমণির গালে সপাটে এক চড় কষাল।

খানিকটা টলে গিয়ে দেওয়াল ধরে সামলে নিল নয়নমণি। গালে জ্বালা করছে, সেখানে একটা হাত রাখল। অমরের শরীরটা জ্বলছে, আর ফোঁস ফোঁস করে সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। পরস্পর সোজাসুজি চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

নয়নমণি শান্ত কঠিন গলায় বলল, অমরবাবু, আমার গায়ে আর হাত তুলো না কক্ষনও। পুরুষের স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারি না। তোমাকে অনেকদিন আগেই বলেছি না, আমার কাছে সবসময় একটা ছুরি থাকে, আর একবার কাছে এলে তুমি খুন হয়ে যাবে।

অমর বলল, ওসব ছুরি ফুরি আমি গ্রাহ্য করি ? আজ আমি তোর সতীপনার গুমোর ভাঙব !

নয়নমণি স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বলল, সাবধান, এগিয়ো না, আর এগিয়ো না, অমরবাবু তোমার মান-সম্মান সব ধুলোয় লুটোবে ! এই নাটকে যদি তুমি নাচ ঢোকাতে চাও, তা হলে অন্য মেয়ে খোঁজো। আমি পারব না, এই আমার শেষ কথা। তুমি অন্য মেয়েকে নাও। আমি কাল থেকে আসব না।

বিকৃত স্বরে অমর বলল, আসতে হবে না। আর কোনওদিন আসতে হবে না। দূর হয়ে যা ! তোকে ছাড়াও আমার নাটক চলবে। আর কোনওদিন আমার থিয়েটারে পা দিবি না !

আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল নয়নমণি। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক, তুমি নিজের মুখে এই কথাটা বলে আমাকে বাঁচালে। তুমি না তাড়িয়ে দিলে আমি যেতে পারছিলাম না। তোমার ওপর আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। এত ভাল একটা থিয়েটারকে তুমি নিজেই নষ্ট করলে। তুমি যেন আকাশের একটা উল্কা, ধ্বংস হয়ে যাওয়াই তোমার নিয়তি। যাক, চললাম, থিয়েটারের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

অমর বলল, যা, যা, দূর হয়ে যা ! ঘেন্না। তোর মতন মেয়েকেই আমি ঘেন্না করি। খালি বড় বড় কথা ! থিয়েটারকে বাঁচাবার জন্য আমি মুখে রক্ত তুলে মরছি, হারামজাদি, আমার কথা শুনবি না, আমি অন্য মেয়েকে গড়ে পিটে নেব...

নয়নমণি আর কথা বলল না, বেরিয়ে এল ঘর থেকে। অমর তবু তাকে তাড়া করে এল, চ্যাঁচামেচি শুনে জড়ো হল আরও অনেকে।

দর্শকরা সবাই চলে গেছে, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। মঞ্চে এখনও পাদপ্রদীপের আলোগুলো নেভানো হয়নি। অমর মঞ্চে এসে পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগল, আমি অমর দত্ত ! কারুর পরোয়া করি না। আমি জঙ্গলে গিয়ে একা অভিনয় করলেও দর্শকরা ছুটে আসবে। বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা, যা যা যা যা যা ! অমর দত্ত উল্কা, অ্যাঁ ? অমর দত্ত সূর্য, আর সব কটা জোনাকি !

নয়নমণি কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আগেও বেশ কয়েকবার এরকম ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, সুরার নেশায় আত্মবিস্মৃত হয়ে অমর অনেক

কটূকাটব্য করেছে। পরে সুস্থ অবস্থায় আবার অনুতাপ করেছে, নয়নমণির ওপর সে অনেকখানি নির্ভরশীল, লোক পাঠিয়ে নয়নমণিকে ডেকে আনিয়েছে, কখনও কখনও নিজে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছে। এবার সে আর এল না, একটানা তিন-চারদিন মদ্যপান চালিয়ে যেতে লাগল। 'চোখের বালি'র অভিনয় বন্ধ।

এক থিয়েটারের ভেতরকার খবর অতি দ্রুত অন্য থিয়েটারের মালিক-ম্যানেজারদের কাছে পৌঁছে যায়। অমর দত্ত নয়নমণির মতন অভিনেত্রীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে এই সংবাদ শোনামাত্র অন্য থিয়েটার থেকে লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে আনাগোনা শুরু করে দিল দূতেরা। কারুর সঙ্গে দেখাই করল না নয়নমণি। দিন সাতেক বাদে ক্লাসিক থিয়েটার থেকেই সহ-অভিনেতাদের তিন-চারজনের একটি দল এল তাঁর বাড়িতে, নয়নমণিকে এদের সঙ্গে কথা বলতেই হল। নয়নমণিকে অমর দত্ত অমন কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করার জন্য তারা দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ। নয়নমণি অবশ্য সে অপমান গায়ে মাখেনি। বেহেড মাতাল অবস্থায় কেউ কেউ অমন প্রলাপ বকে, এ তো নতুন কিছু নয়। আরও কত শ্রদ্ধেয় মানুষও তো কত কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করে, ওসব গায়ে মাখতে নেই।

ওই দলের মুখপাত্রটি অন্য একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। অমর দত্ত যে ভাবে চালাচ্ছে, তাতে ক্লাসিক থিয়েটারের শিগগিরই আবার যে ভরাডুবি হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাদের ভাগ্য অনিশ্চিত। সুতরাং অনেকে মিলে এখনই ক্লাসিক ছেড়ে বেরিয়ে এসে অন্য একটি রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে একটি নতুন দল গড়তে চায়। অর্ধেন্দুশেখরকে আনার চেষ্টা হবে। নয়নমণিকে তো সেই দলে অবশ্যই চাই।

নয়নমণি শান্তভাবে শুনল। নতুন মালিকপক্ষ যে-ভাবে চাপ দিচ্ছে, তাতে ক্লাসিক থিয়েটারে অমর দত্ত যে বেশিদিন টিকতে পারবে না, সেটা নয়নমণিও বুঝেছে। থিয়েটারে দল ভাঙাভাঙি তো চলেই। কিন্তু নয়নমণি সে দলে যোগ দেবে না।

নয়নমণি বলল, আমি থিয়েটার একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি। যে-টুকু টাকাকড়ি জমা আছে, তাতে খাওয়াপরার চিন্তা করতে হবে না। রং মেখে স্টেজে নামতে আর আমার ইচ্ছে করে না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পেড়াপিড়ি, অনুনয় বিনয় চলল, কিন্তু নয়নমণি অনড়। এটা তার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নয়, কিছুদিন ধরেই মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেবার কথা ভাবছিল, অমর দত্ত নিজে থেকেই তাকে বিদায় দেবার পর সে একেবারে মনস্থির করে ফেলেছে।

সেই দলটি ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। নয়নমণির তবু একটা আশঙ্কা রইল, যদি অর্ধেন্দুশেখর স্বয়ং তাকে অনুরোধ জানান, তখন সে কী ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে ? অর্ধেন্দুশেখর অবশ্য শপথের বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে গেছেন, কিন্তু সে কথা কি তাঁর মনে আছে ? কিছুকালের বিস্মৃতির পর অর্ধেন্দুশেখর আবার অতি উজ্জ্বলভাবে ফিরে এসেছেন মঞ্চে, এখন গিরিশবাবুর সহযোগী হয়ে বেশ সার্থকভাবে মিনার্ভা চালাচ্ছেন।

অর্ধেন্দুশেখর অবশ্য প্রস্তাব পাঠালেন না। নতুন দলটিও গড়া হল না।

পুঁটি কয়েকমাস আগেই স্টার থিয়েটারে সুযোগ পেয়েছে, তার দায়িত্বও আর নিতে হবে না নয়নমণিকে।

দেখতে দেখতে সে বেশ লম্বা হয়েছে, রূপ খুলেছে তার, মুখে বেশ লাবণ্য আছে, তাকে দেখলে এখন কে বলবে যে কয়েক বছর আগে সে ছিল বাপ মায়ের খেদানো এক পথের কাঙাল। তার কোমর কৃশ, নিতম্ব ও বক্ষদেশ পুরু, তার নাচের ভঙ্গিমা সাবলীল। ক্রমশ থিয়েটারে তার কদর বাড়ছে, সে যেন হয়ে উঠছে আর এক নয়নমণি।

এখন নিজেকে বেশ মুক্ত আর স্বাধীন মনে হয় নয়নমণির। থিয়েটারে আর যেতে হবে না। সে একা একা মনের সুখে কিংবা দুঃখে গান গাইবে, ইচ্ছে হলে ঘরের মধ্যে নাচবে। কিন্তু দর্শক-শ্রোতাদের হাততালি কুড়োবার জন্য তাকে আর ওসব করতে হবে না। হাততালির মোহ তার কেটে গেছে। থিয়েটারের মালিকদের নির্দেশে অনেক সময় অনিচ্ছার সঙ্গেও নাচতে হয়। যেখানে গান মানায় না সেখানেও গাইতে হয়। তাতে একটুও আনন্দ পাওয়া যায় না। তবু মুখে নকল

খুশির ভাব ফুটিয়ে রাখতে হয়। এখন সেসব থেকে মুক্তি!

অনেকদিন সরলা ঘোষালের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। বঙ্গ ভঙ্গ উপলক্ষে সারা দেশ উত্তাল, চতুর্দিকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রায় দিনই সভা সমিতি হচ্ছে বিভিন্ন স্থলে। তবু সরলা ঘোষালের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি দেশের কথা এত ভাবেন। তিনি তো এ সময় চুপ করে থাকার পাত্রী নন। নয়নমণি শুনেছিল, সরলা হিমালয়ে মায়াবতী আশ্রমে বেড়াতে গেছেন। সেখানে তিনি কতদিন বসে থাকবেন?

নয়নমণির থিয়েটার ছেড়ে দেবার কথা শুনে সরলা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। সরলা নয়নমণিকে অনেক কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। দেশের তৈরি বস্ত্র ও নানারকম সামগ্রী বিক্রি করার জন্য একটা স্বদেশি শিল্পভাণ্ডার খোলা হয়েছে, সরলার ইচ্ছে ছিল নয়নমণি সেই দোকানটি চালনার ভার নিক। দেশের মানুষকে এই সব দেশি জিনিস কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা দরকার। কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে নয়নমণিকে অনেক মানুষ চেনে। সে একটা দোকানে সর্বসমক্ষে দাঁড়াতে সংকোচ বোধ করেছে। অভিনেত্রীদের অনেক জ্বালা, কিছুতেই লোকেরা অভিনেত্রীদের সহজ, সাধারণ মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। নয়নমণিকে আগে ওই পরিচয়টা মুছে ফেলতে হবে।

সরলা মায়াবতী আশ্রম থেকে ফিরেছেন কিনা তা খোঁজ নেবার জন্য নয়নমণি একদিন গেল বালিগঞ্জের বাড়িতে। সেখানে একটি সংবাদ শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে বাড়িতে সরলার বাবা, মা কেউ নেই, কথা হল একজন পরিচারিকার সঙ্গে। সরলা ফেরেননি তো বটেই, এর মধ্যে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। তাও কলকাতায় নয় দেওঘরে!

এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, তা নয়নমণি ঘুণাক্ষরেও টের পেল না? এই বিখ্যাত পরিবারে কিছু একটা ঘটলেই সারা শহরে জানাজানি হয়ে যায়। আর সরলা ঘোষালের সঙ্গে কোনও বঙ্গ ললনারই তুলনা হয় না, তিনি অনেক নিয়ম ভেঙে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে বিবাহ করার জন্য কত বিশিষ্ট পুরুষ ব্যগ্র হয়েছে, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল কার সঙ্গে? তাও কলকাতার বদলে দেওঘরে কেন? অতি সামান্য কারণে এই ঘোষাল বাড়িতে প্রায়ই বিশাল ভোজের ব্যবস্থা হয়, এ বাড়ির কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহে সেরকম কিছুই হল না?

নয়নমণি কেন, কলকাতার উচ্চ সমাজের প্রায় কেউই সরলার বিবাহ-সংবাদ জানতে পারেনি। বলা যেতে পারে, ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে গোপনে। পাত্রও সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সরলা ছিলেন মায়াবতী আশ্রমে, দেওঘর থেকে তাঁর মা-বাবা জরুরি তলব দিয়ে তাঁকে সেখানে আনালেন। সেখানে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। জিনিসপত্র কেনাকাটিও শেষ। সরলা আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতেই ধমক খেলেন মায়ের কাছে।

জানকীনাথ বেশি কথা বলেন না, স্বর্ণকুমারী বললেন, তুমি এতদিন যা যা করতে চেয়েছ, আমরা বাধা দিইনি, তোমার বাবা বরং প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। আমাদের বংশ, আমাদের পরিবারের সুনামের কথাও তোমাকে চিন্তা করতে হবে। তুমি বিয়ে করবে না ঠিক করেছিলে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে গুজবের পর গুজবে কান পাতা যায় না। সমাজে আমরা এখন মুখ দেখাতে পারি না। ওই প্রভাতকে নিয়ে কী কেলেঙ্কারিটাই না হল! তুমি তাকে প্রশ্রয় দাওনি!

সরলা নিরুত্তর হয়ে মুখ নিচু করে রইল।

নবীন লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আসা যাওয়া করতেন সম্পাদিকা সরলা ঘোষালের কাছে। ক্রমে সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও আরও কিছু কিছু ব্যক্তিগত আলোচনা শুরু হয় দু'জনের মধ্যে। দেশ-বিদেশে কখনও কোনও সম্পাদকের বিশেষ কোনও লেখিকার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ার নিদর্শন আছে, কিন্তু সম্পাদিকার সঙ্গে কোনও লেখকের প্রণয়ের কথা আগে শোনা যায়নি। সরলা ঘোষালের সব কিছুই তো অভিনব। যাই হোক, প্রভাতের সঙ্গে সরলার এই ঘনিষ্ঠতা তার পিতা মাতা ও মাতুল পরিবার মেনে নিয়েছিলেন। এখন বিবাহ সম্পন্ন হলেই হয়। অবশ্য তার আগে পাত্রটিকে যোগ্য করে তোলা দরকার। প্রভাতের বংশগৌরব নেই। সাধারণ এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, অন্তত ব্যারিস্টার না হলে ঘোষাল বাড়ির জামাই হয় কী করে? সরলার মামা সত্যেন্দ্রনাথই

প্রভাতকে বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টারি পড়াবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রভাতদের পরিবারে আগে কেউ বিদেশে যায়নি, কালাপানি পার হওয়া এখনও পাপ মনে করেন প্রভাতের মা। জানতে পারলে তিনি অনুমতি দেবেন না, তাই প্রভাত চুপি চুপি জাহাজে উঠে পড়ে।

যথা সময়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলেন প্রভাত। ততদিনে অনেকেই জেনে গেছে যে সরলার সঙ্গে প্রভাতের বিবাহ আসন্ন। কিন্তু প্রভাতের বাড়ির লোকের কানে যখন এই কথা পৌঁছল, তখন ঘোর আন্দোলন শুরু হল। ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যাকে ঘরের বউ করে আনতে প্রভাতের মায়ের ঘোর আপত্তি। তা ছাড়া ও মেয়ে বয়স্কা, অনেক পর-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। শেষ পর্যন্ত মাতৃভক্তি জয়ী হল, প্রভাত নিজেও এ বিবাহে অসম্মতি জানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তাতে ঘোষাল পরিবারের চরম অপমান হয়নি? জানকীনাথ ঘোষাল মর্মাহত হলেন। তিনি নিজে পিতার ত্যাজ্যপুত্র ও জমিদারি থেকে বঞ্চিত হবার ঝুঁকি নিয়েও ব্রাহ্ম পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। তার এক প্রজন্ম পরেও এক শিক্ষিত, সাহিত্যরুচি সম্পন্ন যুবক মায়ের কুসংস্কার ও জেদের কাছে হার স্বীকার করল?

শুধু প্রভাত নয়, সরলার আরও পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। বাড়ির বৈঠকখানায় সব সময় কেউ না কেউ বসে থাকে। কোনও কোনও অবাঙালির সঙ্গেও সরলার নাম জড়িয়ে কথা কানাকানি হয়েছে। কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা গোখলের সঙ্গে সরলার বিয়ে হতে চলেছে, এ কথাও উঠেছিল না? তারপর ডাক্তার পৈরামলকে নিয়েও কী কাণ্ডটাই না হল। রুশ-জাপান যুদ্ধ চলছে, ভারতীয়রা জাপানের প্রবল সমর্থক। এ দেশ থেকে জাপানকে সাহায্য পাঠাবার নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সরলাও জড়িয়ে পড়েছিল রেড ক্রশের কাজে। রেড ক্রশের পক্ষ থেকে অনেক ওষুধপত্র দিয়ে পঞ্জাবের ডাক্তার পৈরামলকে পাঠানো হয় জাপানে। সেই সূত্রে পৈরামলের সঙ্গে সরলার পরিচয়। তারপর তাদের ঘনিষ্ঠতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে দু'একটি সংবাদপত্রে তাদের আশু বিবাহের কথা ছাপা হয়ে গেল পর্যন্ত। তারপর সে সম্পর্কও ভেঙে গেছে! ছি ছি ছি ছি!

সরলা বিয়ে করতে রাজি হয়নি, অথচ বিভিন্ন পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আপত্তি নেই। সমাজ তা মেনে নেবে না। তুমি যদি বিবাহ না করতে চাও, তা হলে তোমাকে অন্তঃপুরবাসিনী, ব্রহ্মচারিণী হতে হবে। অন্তঃপুরের বাইরে যদি তুমি মুখ দেখাও, তা হলে তুমি বিবাহ করতে বাধ্য। নচেৎ তোমার সমগ্র পরিবার সমাজচ্যুত হবে।

সরলার আর আপত্তি জানাবার মুখ নেই। বাবা-মা পাত্রও ঠিক করে ফেলেছেন, সে একজন পাঞ্জাবী, নাম রামভজ দত্ত চৌধুরী, বয়েস হয়েছে যথেষ্ট, এবং সে বিপত্নীক। পাত্রের বয়েস তো বেশি হবেই। সরলারই বয়েস হয়ে গেল তেত্রিশ। তার কাছাকাছি বয়েসের অবিবাহিত পুরুষ পাওয়া যাবে কোথায়? অধিকাংশ পুরুষেরই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়, আর মেয়ে হয়েও সরলা এতদিন পর্যন্ত কুমারী। ইচ্ছে করেই বাংলার বাইরে থেকে পাত্র নির্বাচন করা হয়েছে, বিবাহের পর সরলার অনেক দূরে থাকাই ভাল। কলকাতায় থাকলে যদি বিয়ের পরেও সরলার রূপ-গুণমুগ্ধের দল প্রাক্তন প্রেমিক, ব্যর্থ প্রেমিকরা তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে, তাতে আর এক কেলেঙ্কারি শুরু হবে। সেই একই কারণে কলকাতায় বিবাহ-বাসরের ব্যবস্থা করা হয়নি, সেখানে গোলমালের আশঙ্কা আছে। দেওঘরে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে অনুষ্ঠান সেরে নেওয়া হবে, খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আত্মীয় স্বজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শুধু।

বিদ্রোহিনী সরলা, বহু সংস্কার ভেঙে ফেলেছেন যে সরলা, তিনি আর মাথা তুলতে পারলেন না, বাবা মায়ের ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন। যে পুরুষটিকে তিনি চোখেও দেখেননি আগে, তাকেই বিবাহ করতে সম্মতি জানালেন সরলা।

নয়নমণি ফিরে এল ঘোষাল বাড়ি থেকে। সে ভেবেছিল, থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে সরলার নির্দেশে দেশের কাছে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু সরলাকে আর পাওয়া যাবে না। তিনি চলে যাবেন দূর দেশে। কলকাতায় তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড অসমাপ্ত রয়ে গেল। এখন নয়নমণিকে তার নিজের পথ

নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। নয়নমণি নামটারই বা আর দরকার কী। এখন থেকে সে আবার ভূমিসুতা।

৭৭

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে ব্রাহ্মসমাজের উল্টো দিকে শিবনারায়ণ দাসের গলি। সেই গলির একটি বাড়িতে বহু যুবকের আনাগোনা হয়। একতলায় ফিল্ড অ্যান্ড আকাদেমি ক্লাব, দোতলায় ছাত্রদের একটি মেস, একটি ঘরে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তৃতা করতে আসেন, প্রায়ই আসেন নিবেদিতা।

এ বাড়ির বারান্দা থেকে দেখা যায় একটা মস্ত বড় মাঠ। পান্তির মাঠ নামে পরিচিত এই খোলা জায়গাটায় প্রায়ই নানা রকম সভা বসে, সম্প্রতি একেবারে সরগরম। ছাত্ররা বারান্দায় দাঁড়িয়েই বক্তৃতা শুনতে পায়, এখান থেকেই হাততালি দেয় এবং স্লোগানে কণ্ঠ মেলায়। সভায় কখনও উত্তেজনার সৃষ্টি হলে তারা বারান্দার রেলিং টপকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটে যায় মাঠের মধ্যে।

আজকের সভায় খুব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। বয়কট আন্দোলনে উদ্বেল হয়ে আছে সারা দেশ, প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভা। খ্যাতিমান নেতারা মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন জনমত সংগঠন করার জন্য। সাধারণ মানুষ নির্দেশ চায়।

বয়কট আন্দোলন তো চলছেই, সম্প্রতি আর একটি বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, পক্ষে-বিপক্ষে তর্কবিতর্ক চলছে অনবরত। দেশ জুড়ে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং চালাচ্ছে প্রধানত ছাত্ররাই। কোনও দল নেই, কোনও সর্বমান্য নেতা নেই, তবু ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নেমে এসেছে রাস্তায়। এর আগে ছাত্রসমাজের এমন ভূমিকা কেউ দেখেনি। আহার-নিদ্রা তুচ্ছ করে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবার শপথ নিয়েছে।

এ বার টনক নড়েছে ইংরেজ সরকারের। দু'-চার জন নেতাকে কারারুদ্ধ করা যায়, কিন্তু হাজার হাজার ছাত্রকে দমন করা যাবে কী উপায়ে? সমস্ত দোকানের সামনে পথ অবরোধ করে আছে ছাত্ররা। ক্রেতাদের তারা প্রতিরোধ করছে। অনেক জায়গায় বিলিতি বস্ত্রের বান্ডিলে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মদের দোকানের বোতল ভাঙছে, সর্বক্ষণ পথে পথে ছাত্রদের মিছিল, তারা ধ্বনি দিচ্ছে বন্দেমাতরম।

সরকার পক্ষ থেকে একটা কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর নাম কার্লাইল সারকুলার। ছাত্রদের সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ, তারা মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে পারবে না। ছাত্রদের সংযত করার দায়িত্ব স্কুল-কলেজের। যে-সব স্কুল বা কলেজের ছাত্ররা এই নির্দেশ অমান্য করবে, সেই সব স্কুল-কলেজ সব রকম সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। ইতিমধ্যেই এই অভিযোগে রংপুরের দুটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য চালানো হয়েছে পুলিশের লাঠি ও বেত।

ছাত্ররাও খেপে উঠেছে। তারা তো সরকারের নির্দেশ মানবেই না, তারা স্কুল-কলেজও বয়কট করবে। বিলিতি দ্রব্যের মতন বিলিতি শিক্ষাও বর্জনীয়।

গোলদিঘিতে সভা করে ছাত্ররা নিজেরাই তৈরি করল প্রথম ছাত্র-সংগঠন। তার নাম হল অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি। তারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের বেরিয়ে আসার ডাক দেবে।

অভিভাবকরা শঙ্কিত। বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন মত। তবে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই ছাত্রদের এই প্রতিবাদের পক্ষপাতী। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কিছুই

শেখে না। পরীক্ষায় পাশ করে রাশি রাশি কেরানি তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিক্ষাব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এখন 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আগুন ছড়াচ্ছেন, তাঁর ভাষা এখন হাট-বাজারের লোকের মুখের ভাষার মতো, তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে ডাক দিলেন, 'তোমরা গোলদিঘির গোলামখানায় প্রস্রাব করিয়া দিয়া চলিয়া আইস!'

প্রধান মতবিরোধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপিন পালের। সুরেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় অন্যতম প্রধান নেতা, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত। বিপিন পাল কংগ্রেসের কেউ নন, বর্তমান আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী, তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতারা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বিপিন পাল সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনে বিশ্বাসী নন, তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে স্বরাজের দাবি। ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে আসার জন্য তিনি দারুণ উৎসাহ দিচ্ছেন।

সুরেন্দ্রনাথ এ পন্থা কিছুতেই মানতে রাজি নন। এ যে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জুয়া খেলা! রাজনীতির স্বার্থে ছাত্রদের বলিদান। ছেলেরা এমনিতেই লেখাপড়া করতে চায় না, তার ওপর গুরুজন শ্রেণীর নেতারা তাদের স্কুল-কলেজ ছাড়ার উস্কানি দিলে তারা ধেই ধেই করে নাচবে। তাদের ভবিষ্যৎ গোল্লায় যাবে! যারা ছাত্রদের এই ভাবে ব্যবহার করতে চায়, তারা আসলে ছাত্রদের শত্রু!

সুরেন্দ্রনাথের এই রকম নীতিবাগীশ জ্যাঠামশাইয়ের মতন ভূমিকা দেখে অনেকে আড়ালে তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি করতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বলাবলি করছে যে সুরেন্দ্রনাথের এই মতামতের পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। তাঁর নিজের একটি কলেজ আছে, ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করলে সেই রিপন কলেজও যে বন্ধ হয়ে যাবে।

বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ, সতীশ মুখার্জি প্রমুখরা ছাত্রদের পড়াশুনো বন্ধ করার কথা মোটেই বলেন না। ছাত্ররা সরকারি বিদ্যালয়ে যাবে না, তাদের জন্য গড়া হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এ দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে এ দেশেরই মানুষ। সরকারকে গ্রাহ্য করা হবে না, জাতীয় নেতারা প্রণয়ন করবেন নতুন পাঠ্যসূচি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে এই পান্তির মাঠেই কী কাণ্ড হল! ওই বিষয় নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়েছিল, বিভিন্ন বক্তা মতপ্রকাশ করছেন, হঠাৎ সুবোধ মল্লিক নামে এক শিক্ষিত ধনাঢ্য যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর বেশি কথার প্রয়োজন কী? অবিলম্বে কাজ শুরু হোক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আমি এক লক্ষ টাকা দিতে রাজি আছি।

প্রথমে কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়, তারপর উল্লাসধ্বনিতে সভাস্থল ফেটে পড়ল। এক লক্ষ টাকা? কতখানি দেশপ্রেম থাকলে এক জন মানুষ এই বিপুল অর্থ দান করতে পারে। অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, রাজা, রাজা! সেই সভাতেই জনতার পক্ষ থেকে রাজা খেতাব দেওয়া হল সুবোধ মল্লিককে। একদল ছাত্র দৌড়ে গিয়ে সুবোধচন্দ্রকে কাঁধে তুলে নিল। বাড়ি ফেরার সময় তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে নিয়ে টানতে লাগল ছাত্ররা।

সুবোধচন্দ্রের দৃষ্টান্তে আরও দান আসতে লাগল। কেউ কেউ দিতে চাইলেন সুবোধচন্দ্রের চেয়েও বেশি। কেউ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি। বয়কট আন্দোলনের এহেন সার্থকতার কথা অনেকেই কল্পনা করতে পারেনি।

সুরেন্দ্রনাথ তবু গোঁ ধরে বসে আছেন। জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ-বিরাগ যে এতখানি পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা যেন বুঝতে পারছেন না তিনি। রাজশক্তির সঙ্গে সর্ব বিষয়ে অসহযোগিতার কথা তিনি মনে স্থান দেন না, তাঁর মতে এটা অসম্ভব! আজকের সভায় সুরেন্দ্রনাথ আবার বললেন, আমি বয়কট আন্দোলনের পক্ষে, তার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে অবশ্যই, কিন্তু ছাত্রগণ, আমি ক্লাস বয়কটের কথা একবারও বলিনি। এটা তোমাদের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ! আগে লেখাপড়া, তারপর অন্য কিছু! তোমরা—

হঠাৎ হো-হো-হো-হো করে একটা শব্দ হল। এক কোণ থেকে একদল চেঁচিয়ে উঠল, দুয়ো

দুয়ো !

সেই গোলমাল, চ্যাঁচামেচি বাড়তে লাগল ক্রমশ। কয়েক জন কমলালেবুর খোসা ছুঁড়ে মারল মঞ্চের দিকে। বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন সুরেন্দ্রনাথ। সভার উদ্যোক্তারা দু' হাত তুলে বলতে লাগলেন, চুপ করুন, সাইলেন্স প্লিজ, বসুন, বসুন ! কিন্তু কে শোনে কার কথা ! সুরেন্দ্রনাথ আর মুখ খুলতেই পারলেন না। এত বড় একজন প্রবীণ নেতা ! সারা ভারতে অনেক নেতা আছে, কিন্তু একজন কোনও দেশনায়ক নেই। রাজশক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে নতুন ভারতীয় সমাজে এমন একজন দেশনায়কের প্রয়োজন, যাঁর কথা সকলে মান্য করবে। রবীন্দ্রনাথ সেই দেশনায়কের পদটি সুরেন্দ্রনাথকে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সুরেন্দ্রনাথের এমন হেনস্থা !

অপমানিতভাবে, ঘাড় নিচু করে তিনি সভাস্থল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভরত আর হেম প্রতিটি মিটিং শুনতে যায়, আজও এসেছে। সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য তাদেরও পছন্দ হয়নি, তারাও প্রতিবাদে কণ্ঠ মিলিয়েছে। ডন সোসাইটির বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানো একদল ছাত্রও হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চিৎকার করছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভরত হঠাৎ বিস্মিত হল। হেমের কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, ওই দিকে দ্যাখো !

ছাত্রদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন এক দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গিনী। শ্বেতবসনা, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। চিনতে ভুল হবার কোনও উপায় নেই। হেম বলে উঠল, ওই তো ভগিনী !

হেমের পা অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে, ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটে। সভা ভেঙে গেছে, সকলে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে যাচ্ছে। হেম বলল, ভরত, চলো ভগিনীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

কয়েক বছর আগে যখন সার্কুলার রোডে গুপ্ত সমিতি খোলা হয়েছিল, তখন মাঝে মাঝেই দল বেঁধে যাওয়া হত নিবেদিতার কাছে। তিনি এই উগ্রপন্থি যুবকদের উৎসাহ দিতেন, তাদের নানা দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়াতেন। অনেক দিন আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভরত আর হেম উঠে এল দোতলায়। ডন সোসাইটির কক্ষে একটি টেবিল, গুটিকয়েক চেয়ার ও একটি আলমারি ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই, কক্ষটি বেশ বড়, আলোচনা সভার সময় মেঝেতে মাদুর পেতে দেওয়া হয়। দেওয়ালে ভারতের একটি মানচিত্র।

এখন সেখানে বসে আছেন নিবেদিতা, সতীশ মুখুজ্যে ও আরও কয়েকজন। ভরত ও হেম ঢুকে এসে নিবেদিতাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি ওদের হাত ধরে ফেলে বললেন, না, না, প্রণাম না, নমস্কার, নমস্কার।

দু'জনকেই তিনি চিনতে পেরে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন।

নিবেদিতার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এই ক' বছরে। শীর্ণকায় বা স্থূল হননি, বয়েসের ছাপও ঠিক বোঝা যায় না, সেই নীল চোখ, সেই সোজা হয়ে বসে থাকার ভঙ্গি, তবু শরীরের শ্রী যেন আর আগের মতন নেই। কেমন যেন পুরুষালি ভাব, মুখের চামড়াও নয় আগেকার মতন কোমল। ছেলেছোকরারা আড়ালে তাঁকে বলে 'ধবলগিরি'।

ভরত ও হেম ফাঁকা দুটি চেয়ারে বসে পড়ল। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আজকের সভায় উপস্থিত ছিলে ? সুরেন্দ্রবাবুকে এরকম হেকল করা মোটেই ঠিক হয়নি। এতে মুভমেন্টের ক্ষতি হবে। এখন দলাদলি ভাল না, ভাল না। এতে নিজেদের শক্তিক্ষয় হয়।

মধ্যবয়েসী সতীশ মুখোপাধ্যায়ের পোশাক অতি সাদাসিধে, ধুতি চাদর, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। নভেম্বরের মাঝামাঝি, ক'দিন ধরে বেশ শীত পড়েছে, নিবেদিতা গায়ে একটা শাল জড়িয়েছেন, কিন্তু সতীশচন্দ্রের কোনও শীত বস্ত্র নেই।

তিনি বললেন, সুরেনবাবুকে ও ভাবে অপমান করা অবশ্যই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু উনি ছাত্রসমাজের মুড বুঝতে পারছেন না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ঘোষণা হয়ে গেছে, তবু উনি পুরনো মত আঁকড়ে ধরে আছেন। ছাত্ররা তো ক্ষেপে যাবেই।

নিবেদিতা বললেন, আমিও ওঁর মত সমর্থন করি না। তা বলে ওঁর ভিন্ন মত প্রকাশে বাধা দেওয়া

হবে কেন ? সকলেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। চিল্লামিল্লি করে ওঁকে থামিয়ে দেওয়া, না না, ঠিক নয়, ঠিক নয়। উনি যদি এখন এই মুভমেন্ট থেকে সরে দাঁড়ান, তার ফল খুব খারাপ হবে। শীঘ্রই কংগ্রেসের কনফারেন্স হবে কাশীতে, সেখানে উনি যদি এই ইস্যু না তোলেন, তা হলে বাংলার জোর থাকবে না। ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ওঁকে ফিরিয়ে আনা উচিত।

সতীশচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, আমি চেষ্টা করব। মুশকিল হচ্ছে কী জানেন, এর মধ্যেই দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। এমন কেউ নেই, যিনি সমস্ত দলের উর্ধ্বে।

পাশ থেকে এক জন ফস করে বলে উঠল, আহা, স্বামী বিবেকানন্দ অকালে চলে গেলেন। তাঁর কথা খুব মনে পড়ে। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তিনি উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তাঁর কথা সবাই মানত !

সতীশচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, না, সবাই মানত না। ব্রাহ্মরা মানত না। আমাদের অধিকাংশ নেতাই তো ব্রাহ্ম।

সেই ব্যক্তিটি বলল, তা হতে পারে। ব্রাহ্মদের প্রভাব শুধু কিছু শিক্ষিত লোকের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ভ্রমণ করেছেন, আপামর জনসাধারণ তাঁকে চিনেছে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিলে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠত ! আমার খুব মনে হয়, এই সময় ওঁর মতন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল !

মুখ মোছার ছলে নিবেদিতা ঘাড়টা অন্য দিকে ঘোরালেন। অন্যদের সামনে তিনি আবেগ প্রকাশ করতে চান না। কারুর মুখে হঠাৎ স্বামীজির নাম শুনলে এখনও তাঁর চোখ জ্বালা করে ওঠে, গলার কাছটায় ব্যথা ব্যথা বোধ হয়।

জীবিত থাকলে স্বামীজি সত্যিই কি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতেন ? নিবেদিতা স্বয়ং এক সময় তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি বারংবার দৃঢ় স্বরে বলেছেন, তিনি সন্ন্যাসী, রাজনীতিতে মাথা গলানো তাঁর কাজ নয়। মানুষের সেবা করা তাঁর মতে ঈশ্বরসেবার সমান, কিন্তু রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে চাননি কখনও। আবার এ কথাও ঠিক, স্বামীজি ছিলেন তীব্র দেশপ্রেমিক, পরাধীনতার জ্বালা তিনি অনুভব করতেন। ভীরুতা ও ক্লৈব্য ত্যাগ করে দেশের মানুষকে জাগাবার কথা তিনি অনেকবার বলেছেন। তিনি তো এরকম জনজাগরণ দেখে যাননি। হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে পড়েছে, পুলিশের চোখ রাঙানি ও লাঠি অগ্রাহ্য করে বয়কট কার্যকর করে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখেও কি তাঁর বেলুড় মঠের কুঠরিতে চুপ করে বসে থাকতে পারতেন ?

সতীশচন্দ্র বললেন, স্বামী বিবেকানন্দর অকালমৃত্যু খুবই দুঃখজনক ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেলুড় মঠে তাঁর যে গুরুভাইরা রয়েছেন, তাঁরাও তো কেউ এই সময়ে একবারও মুখ খোলেননি। তাঁরা অতি সাবধানে রাজনীতি থেকে দূরে সরে আছেন।

পাশের ব্যক্তিটি বলল, স্বামীজির মানসকন্যা তো আমাদের মধ্যেই রয়েছেন।

সতীশচন্দ্র নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু সে জন্য ভগিনীকে বেলুড় মঠের সংস্রব ত্যাগ করতে হয়েছে। ভাই, আমি আর একটা কথা বলি। মৌলবি মুজিবর রহমান, মৌলবি লিয়াকৎ হোসেন প্রতিবাদ আন্দোলনের বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করছেন। কিন্তু কোনও হিন্দু সন্ন্যাসীকে কেউ কখনও দেখেছ ? হিন্দু সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে কিন্তু একজনও এগিয়ে আসেননি।

হেম এবার গলাটা উঁচু করে বলল, আমি একটা কথা বলব ? আমার মনে হয়, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। দু'-চার জন মৌলবি বক্তৃতা করলেও কিন্তু সামগ্রিক ভাবে মুসলমানরা এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে আছে। তাদের আমরা একাত্মক করে নেবার চেষ্টা করেছি কি ? অধিকাংশ সভাতেই বেদ-উপনিষদ-গীতার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। তাতে কি মুসলমানরা কাছে আসবে ?

সতীশচন্দ্র বললেন, মুসলমানরা যোগ দেয়নি কে বলল ? বর্ধমানের আবুল হোসেন সাহেব কী করেছেন জানেন ? তিনি সভায় গিয়ে বক্তৃতা করার সময় দু' গেলাস জল আনতে বলেন। তারপর কুর্তার জেব থেকে দুটি পুরিয়া বার করে বলেন, এই দেখুন, এর মধ্যে আছে বিলিতি চিনি আর বিলিতি নুন। এই দুটো যে-ই মিশিয়ে দেব, অমনি ভেসে উঠবে গরু আর শুয়োরের রক্ত। এর

পরেও কি হিন্দু ও মুসলমান ভাইরা বিলিতি চিনি আর নুন খাবেন ? তাঁর এই বক্তৃতায় খুব কাজ হয়, তখনই সকলে বিলিতি চিনি আর নুন বর্জনের শপথ নেয়।

সতীশচন্দ্র হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

হেম তবু বলল, তিনি বর্ধমানের লোক। এদিককার কিছু কিছু মুসলমান সমর্থন করছেন ঠিকই, কিন্তু পূর্ববাংলায় কী ঘটছে ? সেখানকার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা জোর প্রচার চালাচ্ছেন। দলবল নিয়ে তিনি বয়কট ভাঙার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, অনেক জায়গায় মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

সতীশচন্দ্র বললেন, ঢাকার নবাব কি মুসলমান সমাজের নেতা নাকি ? তাঁর সে শিক্ষা-দীক্ষা আছে ! নিজের স্বার্থে তিনি ইংরেজদের ধামাধরা হয়েছেন। নিজের কিছু প্রজাদের তিনি দলে টেনেছেন, কিন্তু সব মুসলমান তাঁকে মানে না। এই তো ক'দিন আগে এক সভায় সভাপতিত্ব করলেন বগুড়ার নবাব আবদুল শোভান চৌধুরী। তিনি ঢাকার নবাবের চেয়ে কম কীসে ?

হেম বলল, তিনিও কি সমগ্র মুসলমান সমাজের নেতা ? নবাব-জমিদার হলেই নেতা হওয়া যায় ? মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, উদারমনা নেতা কে আছেন ? খুঁজে বার করতে হবে, তাঁর মতামত নিতে হবে।

নিবেদিতা চুপ করে শুনছিলেন। এবার মৃদু কণ্ঠে বললেন, ব্যারিস্টার চৌধুরী।

সতীশচন্দ্র বললেন, ঠিক ! ব্যারিস্টার আবদুল রসুল চৌধুরী, বিলেত ফেরত উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষ। এপ্রিল মাসে বরিশালে যে প্রাদেশিক কনফারেন্স হবে, তাতে তাঁকে সভাপতি করার চেষ্টা চলছে।

হেম জিজ্ঞেস করল, তিনি রাজি হয়েছেন ?

সতীশচন্দ্র বললেন, মিস নোব্‌ল-এর সঙ্গে তাঁর ভাল পরিচয় আছে। আপনিই বলুন না, তিনি রাজি হবেন না ?

নিবেদিতা বললেন, আমি যত দূর জানি, তিনি মিস্টার সুরেন ব্যানার্জিকে কথা দিয়েছেন।

হেম বলল, আমি এক দিন ওর সঙ্গে দেখা করে মুসলমান সমাজের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই। তবে যাই-ই বলুন, আমাদের নেতারা বেশি হিন্দু হিন্দু ভাব করলে এ আন্দোলনের ক্ষতিই হবে। সন্ন্যাসীরা দূরে আছেন, দূরে থাকাই ভাল।

এর পর আলোচনা অন্য দিকে ঘুরে গেল।

বিলিতি দ্রব্য বয়কট নিয়ে যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছে, তা কত দিন টিকে থাকবে জনসাধারণের মধ্যে ? সব মানুষের ব্যবহারযোগ্য এত স্বদেশি দ্রব্য কোথায় ? গুজরাতের কলগুলি কাপড় সরবরাহ করে কূল পাচ্ছে না। এখানে বঙ্গলক্ষ্মী মিল, মোহিনী মিল স্থাপিত হয়েছে, অনেকে ঘরে ঘরে চরকা বসিয়ে সুতো কাটছে, তাও যথেষ্ট নয়। বিলিতি দ্রব্য বর্জন করে ইংরেজের অর্থনীতিতে জোর ধাক্কা দিতে গেলে আরও বেশ কিছু দিন কৃচ্ছ্রসাধন করা দরকার। এর মধ্যেই মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। আর একটা ব্যাপারও ঘটছে, বাজারে যত জার্মান ও জাপানি জিনিসপত্র ছিল সেগুলিতে স্বদেশি ছাপ মেরে বিক্রি করা হচ্ছে, বয়কটপন্থীরা তা মেনে নিয়েছে। বিলিতি জিনিস না হলেই হল।

সতীশচন্দ্র বললেন, এই আন্দোলন টিকিয়ে রাখতে হলে পত্র-পত্রিকায় জোর প্রচার চালিয়ে যাওয়া দরকার। আরও পত্রিকা চাই। বিশেষত বাংলা পত্রিকা, যা সাধারণ মানুষ পড়বে। 'সঞ্জীবনী' আর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বটে, কিন্তু আরও কাগজ বার করতে হবে।

একজন বলল, ওঃ, 'সন্ধ্যা' কাগজে প্রত্যেক সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব কী জ্বালাময়ী লিখছেন। পড়লেই রক্ত গরম হয়ে যায়। হোল ইন্ডিয়াতে বাঙালির মতন এ রকম লেখা আর কেউ লিখতে পারবে না।

সতীশচন্দ্র বললেন, তা হলে তোমাদের একটা ঘটনা বলি, শোনো ! একবার রেওয়ার মহারাজ এসেছিলেন কলকাতা ভ্রমণে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর একদিন নেমন্তন্ন ছিল। খুব এলাহি বন্দোবস্ত। একটা খুব কারুকার্য করা দারুণ সিংহাসনে বসতে দেওয়া হল মহারাজকে। পাশের

দেওয়ালে ঝুলছে মণি-মুক্তো বসানো একখানা খাপসুদ্ধু তলোয়ার। সেই তলোয়ারটা হাতে নিয়ে মহারাজ ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, বাঙালিরা এখনও তলোয়ার ব্যবহার করে নাকি ? প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর দিলেন, না, বাঙালিরা অনেক দিন ধরেই তলোয়ার ধরতে ভুলে গেছে। কিন্তু বাঙালিরা এখন কলম ধরেছে, এখন আর তাদের তলোয়ার ব্যবহার করার দরকার হয় না।

গল্প শেষ করে সতীশচন্দ্র বললেন, কেমন জুতসই উত্তর দিয়েছিলেন বলো !

হেম বলল, মুখুজ্যেমশাই, এটা কিন্তু সুবিধেবাদীর মতন কথা হল। ইংরেজরা কলম চালাতেও জানে, অস্ত্রও ধরতে পারে। আমরা কি শুধু কলম হাতে নিয়েই বীরত্ব দেখাব ?

ভরত সাধারণত চুপ করেই থাকে, বেশি লোকের সামনে মুখ খোলে না। এখন সেও আর থাকতে পারল না, ফস করে বলে উঠল, জাপানিরা কিন্তু শুধু কলমের জোরে রুশদের হারায়নি।

নিবেদিতা মুখ তুলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে এই যুবকদুটির দিকে তাকালেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি এদের সমর্থন করেন।

রাশিয়াকে ইংরেজরাও সমীহ করে। ভারত সীমান্ত দিয়ে রুশ আক্রমণের জুজুতে ইংরেজরা অনেকবার বিচলিত হয়েছে। সেই মহাশক্তিমান রুশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছে জাপানের মতন একটি ছোট দেশ। এবং জাপানিরা এশিয়ার মানুষ। এতকাল ধারণা ছিল যে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি অপ্রতিরোধ্য, তাদের তুলনায় প্রাচ্যদেশীয়রা হীনবল। সেই ধারণা উল্টে দিয়েছে জাপান, তারা রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে সন্ধি করতে বাধ্য করেছে। জাপানের এই জয় থেকে ভরসা পেয়েছে এশিয়ার অন্য দেশগুলি। তা হলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও চিরকালীন হতে পারে না। এই বিশ্বাস ক্রমশ দানা বাঁধছে বলেই সাধারণ মানুষ এখন পুলিশকেও তেমন ভয় পাচ্ছে না।

গত বৎসর জাপানিদের এই জয় কাহিনী এখনও লোকের মুখে মুখে ঘুরছে।

সতীশচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, তা বটে। তবে আমাদের তো সে রকম অস্ত্র নেই, এখন যুব সমাজকে সাহসী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হচ্ছে।

হেম বলল, মিত্রসাহেবের ওই লাঠি খেলা আর কুস্তির আখড়া, আর সরলাদেবীর বীর পূজা আর প্রতাপাদিত্য উৎসব, এই নিয়ে যুব সমাজকে গড়তে গেলে যে আরও অন্তত একশো বছর লেগে যাবে ! এ সব তো ছেলেখেলা। দেখছেন না, ইংরেজ সরকার এ সব অবজ্ঞার চোখে দেখে বলেই কোনও দিন বাধা দিতে আসেনি। ইংরেজরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল চাই। অ্যান আই ফর অ্যান আই, এ টুথ ফর এ টুথ ! বন্দুক-পিস্তলের জবাব দিতে হবে বন্দুক-পিস্তল দিয়ে।

সতীশচন্দ্র বিস্ময়-কৌতুকের সঙ্গে বললেন, বাঃ ! বন্দুক ! ইয়াংম্যান, তুমি খোয়াব দেখছ নাকি ? ও সব কোথায় পাবে ? বিপিন পালমশাই যে বলেন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, সেটাই সঠিক পথ। তার জন্য দরকার প্রচুর মনোবল।

ভরত আড়চোখে হেমের দিকে তাকাল। হেমের কোমরে যে প্রায় সময়ই একটা পিস্তল গোঁজা থাকে, তা কেউ জানে না।

বিদায় নেবার জন্য ওরা উঠে দাঁড়াতেই নিবেদিতা বললেন, তোমরা একদিন এসো আমার বাড়িতে।

নমস্কার জানিয়ে ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। সাহেবপাড়ায় বিজলি আলো এসে গেলেও এ দিকে এখনও গ্যাসের বাতি জ্বলে। অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ শীত পড়ে যাওয়ায় পথে মানুষজন কম। একটি বাড়িতে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে উচ্চকণ্ঠে।

দু' হাতে আড়মোড়া ভেঙে হেম বলল, অনেকক্ষণ বকর বকর করা হয়েছে। এ বার অন্য কিছু করা যাক। এখন একটা থিয়েটার দেখতে গেলে কেমন হয় ?

ভরত নীরস কণ্ঠে বলল, নাঃ, থিয়েটারে যাব না।

হেম বলল, কেন, চলো না। সাড়ে আটটায় শো শুরু হয়। গিরিশবাবু বুড়ো বয়েসে নতুন নাটকটি নাকি খুব জমিয়েছেন, মেসের লোকরা বলাবলি করছিল।

ভরত বলল, তোমার ইচ্ছে হয়তো তুমি যাও। আমার থিয়েটার পাড়াতেই পা দিতে ইচ্ছে করে না।

হেম বলল, তুমি অত নীতিবাগীশ হলে কেন? মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে দোষ কী?

ভরত বলল, নাঃ নীতিবাগীশ নই। তবে থিয়েটার আমার রং-মাখা সঙের নাচ মনে হয়। মেয়েগুলোকে মনে হয় অবিকল কাকাতুয়া পাখি।

হেম হেসে বলল, সে কী হে। নয়নমণি, কুসুমকুমারী এই সব অ্যাকট্রেসদের তো খুব খ্যাতি। আমি নয়নমণির অ্যাকটিং একবার দেখেছি, খাসা গানের গলা।

ভরত আড়ষ্ট হয়ে গেল। নয়নমণি? না, সে কিছুতেই যাবে না। ওই নামের আড়ালে যে আসল মানুষটি, তাকে এখন আর ভরত স্বপ্নেও দেখতে পায় না। আবার তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতেও চায় না সে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হেম, এখন মেদিনীপুরে ফিরে গেলে হয় না? তুমি যা দেখতে এসেছিলে, তা তো দেখা হল।

হেম বলল, এ তো বড় তাজ্জবের কথা। মেদিনীপুরে আমার না হয় বউ-ছেলেমেয়ে আছে, তোমার কে আছে? তোমার ফিরে যাওয়ার কীসের টান?

ভরত বলল, আমার খামার বাড়িতে কত গাছপালা লাগিয়েছি। তারা আমায় টানে। কোন গাছে ফুল এসেছে, কোনটাতে ফল ফলেছে তা দেখতে ইচ্ছে করে। এই শীতে কত গাছের পাতা ঝরছে, সেই পাতা ঝরার শব্দও শুনতে বড় ভাল লাগে।

হেম বলল, গাছপালার চেয়ে মানুষের আকর্ষণ আমার বেশি। এখানকার মানুষের মুখে যে নতুন উদ্দীপনা দেখছি, তা ছেড়ে এখন মফস্বলে গিয়ে বসে থাকব, পাগল নাকি? আমার দৃঢ় ধারণা, বঙ্গভঙ্গ রদ হবেই, সেই শেষ না দেখে আমি যাব না। ঠিক আছে, যদি থিয়েটার দেখতে না চাও, চলো, আজ কোনও দোকানে গিয়ে ভাল খাবার খাই। রোজ রোজ মেসের রান্না মুখে রোচে না।

কলুটোলার দিকে একটা কাবাব-রুটির দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। সে দিকে হাঁটতে লাগল দু' জনে।

একটু পরে হেম জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভরত, সেবারে সার্কুলার রোডে আমাদের আখড়া ভেঙে যাবার পর আমাদের দলের ছেলেরা অনেকেই টপাটপ বিয়ে করে ফেলল। তুমি কিছু করলে না। আমাদের মেদিনীপুরেও ভাল মেয়ের অভাব নেই, তুমি কারুর দিকে তাকাও না। একটা কথা সত্যি করে বলো তো, নারীজাতি সম্পর্কে তোমার কোনও আগ্রহ নেই? এমন উদাসীন ভাব দেখি কেন?

ভরত চুপ করে রইল। হেম তাকে খোঁচা মেরে বলল, কী হে, উত্তর দিচ্ছ না কেন? মনের মধ্যে কোনও পুরনো দুঃখ জমা আছে নাকি?

ভরত বলল, তুমি আমাকে মেদিনীপুরে নিয়ে গিয়ে মহা উপকার করেছ। ওই খামার বাড়িতে একলা দিনের পর দিন থাকতে থাকতে আমার চোখ খুলে গেছে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নারী সত্তা আছে, আমি তার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে গেছি। আর কোনও রক্ত-মাংসের নারীর প্রয়োজন নেই আমার।

হেম চক্ষু সঙ্কুচিত করে বলল, এটা যেন গালভরা কথা হয়ে গেল। তুমি যা বলছ, তা কি সত্যি? নাকি কোনও কিছু চাপা দেবার জন্য এরকম বলছ? শুধু প্রকৃতিতে শরীরের দাবি মেটে?

ভরত হেসে বলল, জোরে পা চালাও। এর পর আর কোনও দোকান খোলা পাবে না।

৭৮

মধ্য কলকাতায় ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের বাড়িটি চোখে পড়বার মতন। ধপধপে সাদা রঙের ত্রিতল গৃহ, সামনে ফুলের বাগান, পিছনে কলা, পেঁপে, বেগুন, পালং শাক ইত্যাদি তরি তরকারির খেত, সমগ্র জমিটি মজবুত লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা, গেটের সামনে একজন উর্দি পরিহিত পাহারাদার সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়িটিতে সাজসজ্জার আড়ম্বর নেই, কিন্তু সর্বত্র ঝকঝকে পরিচ্ছন্নতাই গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দেয়।

রবিবার দিন ব্যারিস্টার সাহেব মক্কেলদের ডাকেন না, সপ্তাহে এই একটি দিন পুরোপুরি ছুটির দিন, সকালবেলা নিজের হাতে বাগান পরিচর্যা করেন। বিকেলবেলা ব্যাডমিন্টন খেলেন বন্ধুদের সঙ্গে। জনসাধারণের জন্য সেদিন অবারিত দ্বার, অনেকেই বিভিন্ন ব্যাপারে প্রার্থী হয়ে আসে তাঁর কাছে। বেশ কিছু দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি উদার হস্তে দান করেন প্রতি মাসে।

বেলা এগারোটার সময় সেই বাড়ির দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল হেম আর ভরত। দ্বারবান বাধা দিল না, আঙুল দেখিয়ে সামনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করার নির্দেশ দিল। সে ঘরখানিতে আট-দশখানি কালো মেহগনি কাঠের চেয়ার, শ্বেতপাথরের মেঝে, এক পাশে একটি ছোট টেবিল। ওরা গিয়ে বসতেই লঘু পায়ে একটি যুবক ঢুকে একটি ফর্ম পূরণ করতে দিল। তাতে নাম-ধাম ও সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিবরণ দিতে হয়। ভরত সেটি পূরণ করে উদ্দেশ্যের জায়গায় লিখল, ব্যক্তিগত। যুবকটি সেটি পাঠ করে বলল, আপনাদের কুড়ি-পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, সাহেব এইমাত্র স্নান করতে ঢুকেছেন।

একদিকের দেওয়ালে মহারানি ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের দুটি বড় ছবি। আর একদিকের দেওয়ালে ঝুলছেন লর্ড কার্জন। বাড়িটি এমনই নিস্তব্ধ যে ফিসফিস করে কথা বলতেও দ্বিধা হয়। ওরা চুপ করে বসে রইল।

একটু পরে বাইরে থেকে আরও একজন এল, বেশ হৃষ্টপুষ্ট রাশভারি পুরুষ, মুখভর্তি চাপ দাড়ি, মাথায় ফেজ টুপি। সে কিন্তু বসল না, গটগটিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। তাকে দেখে ভরতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আরে!

হেম চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, কী?

ভরত বলল, লোকটাকে আমার চেনা একজনের মতন মনে হল। তবে বোধহয় সে নয়। ভুল হয়েছে।

হেম বলল, মেঝেটা এত পরিষ্কার, আমাদের কি বাইরে জুতো খুলে আসা উচিত ছিল?

দু'জনেরই পায়ে সাধারণ চটি, এ বাড়ির পক্ষে বেমানান। হেমেরটা আবার একটু ছেঁড়া। ধনী গৃহে এলে স্বাভাবিকভাবেই একটু সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়, পায়ে ছেঁড়া জুতো থাকলে তো কথাই নেই। ভরত তবু বলল, ওই লোকটি তো জুতো পরেই ভেতরে ঢুকে গেল।

আবার কিছুক্ষণ দু'জন নিস্তব্ধ। কিন্তু কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। টেবিলের ওপর 'ক্যাপিটাল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে, তার প্রথম পৃষ্ঠায় লর্ড কার্জনের ভারত পরিত্যাগের সংবাদ। হেম সেটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল।

ভরত খুব মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, লর্ড কার্জনের কী হল বলো তো? দেশে এত আন্দোলন হচ্ছে, কিন্তু ওঁর কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি।

হেম বলল, কার্জন তো অনেকদিন আগেই পদত্যাগ করেছে।

ভরত বলল, তা তো জানি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ নিয়ে কার্জনের এত জেদ ছিল, সেটা কাজেও করে দেখাল, তার মধ্যে হঠাৎ পদত্যাগ করতে গেল কেন?

হেম বলল, সেনাপতি কিচনার কার্জনকে একটা থাপ্পড় কষিয়েছে!

অবিশ্বাসের সুরে ভরত বলল, যাঃ, তা হয় নাকি?

হেম বলল, হাত দিয়ে না মারলেও মেরেছে ঠিকই। ভেতরের ব্যাপারটা ঠিক জানি না। সাহেবরা তো নিজেদের দলাদলির কথা বাইরে প্রকাশ করে না। কিন্তু ওদের মধ্যেও রেষারেষি, আকচা-আকচি, ল্যাং মারামারি সবই আছে।

ভরত বা হেমের মতন প্রায় সব ভারতীয়ই চরম গৌরবের মুহূর্তে ভাইসরয় কার্জনের হঠাৎ অপসারণের কারণটি বুঝতে পারেনি। সকলেরই ধারণা, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্জনেরই মৌলিক চিন্তা। আগে থেকে আড়ালে যে কত কী ঘটেছে, তা জনসাধারণ জানবে কী করে? বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার পরেও কার্জনের কোনও উৎসাহ নেই কেন?

উৎসাহ থাকারও কথা নয়। বঙ্গভঙ্গ হল কি না হল, তাতে কার্জনের এখন আর কিছু যায় আসে না। এই সাধের ভারতবর্ষ সম্পর্কেও তিনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। কার্জন এখন ক্ষুব্ধ, অপমানিত, বিগত-মহিমা! মানসিক আঘাতের ফলে শরীরও ভেঙে পড়েছে।

এ সেই প্রভুর কৃপা ধন্য হবার জন্য দুই ভৃত্যের চিরাচরিত লড়াই। কার্জন এবং কিচনার দু'জনেই ব্রিটিশ সম্রাটের উঁচু জাতের ভৃত্য। কার্জন মনে করে বসে আছেন যে, তাঁকে ভারতের সর্বময় কর্তৃত্বের ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর কিচনার মনে করেন, কার্জন ভাইসরয়গিরি করুন ঠিক আছে, কিন্তু সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তাঁর নাক গলানো চলবে না। কিচনার এও জানেন, স্বদেশে তিনি কার্জনের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। তাই মাঝে মাঝে তিনি পদত্যাগের হুমকি দেন, তিনি পদত্যাগ করলে ইংলন্ডের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে, প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই তা চাইবেন না, এ বিশ্বাসও কিচনারের আছে। আর কার্জনের ধারণা, শাসন কার্যে তাঁর যোগ্যতা সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে, স্বয়ং সম্রাট নিশ্চয়ই তা জানেন। প্রধানমন্ত্রী, সেক্রেটারি অফ স্টেটও তাঁর পক্ষে।

সেনাবাহিনীতে একজন তদারকি অফিসার রাখার প্রশ্ন নিয়ে খিটিমিটি অনেক দূর গড়িয়েছে। কিচনার কিছুতেই তাঁর দাবি ছাড়বেন না, আড়ালে তিনি কলকাঠি নেড়ে চলেছেন। সামাজিকভাবে কার্জন-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অতি অমায়িক। মেরিকে তিনি এমন আদর-আপ্যায়ন এমনকী প্রেম প্রেম ভাব করেন যে মেরির দৃঢ় বিশ্বাস কিচনার কিছুতেই তাঁদের শত্রুতা করতে পারেন না। কিচনারের ধূর্ততা বোঝা এই আমেরিকান রমণীটির অসাধ্য।

একদিন এক ঘরোয়া খানাপিনার আসরে কার্জন বারবার কিচনারকে বলতে লাগলেন, এসো, আমরা দু'জনে মিলে একজন মিলিটারি মেম্বারের নাম ঠিক করি। আমরা একমত হলে আর কোনও গণ্ডগোল থাকবে না। তুমি রাজি হও, প্লিজ রাজি হও। সরকার চাইছে ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে সিভিলিয়ান মেম্বার রাখতে, কিন্তু মিলিটারি মেম্বার রাখাই কি উচিত নয়? তুমি রাজি না? একমত হবে না আমার সঙ্গে?

কিচনার বললেন, ঠিক আছে, রাজি।

কিচনার যে মিথ্যে কথা বলতে পারেন, তা কার্জন কল্পনাও করেননি। একদা ভারতবাসীদের কার্জন মিথ্যেবাদী বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের জাতের মধ্যেও যে কত রকম মিথ্যে ও কপটতার খেলা চলে সে ব্যাপারে যেন তিনি সচেতন নন। কিচনার গোপনে টেলিগ্রাম করে লন্ডনে জানিয়ে দিলেন, কার্জন জেনারেল ব্যারো নামের যে ব্যক্তিটিকে মিলিটারি সাপ্লাই মেম্বার হিসেবে নিতে চাইছেন, কিচনার তাকে গ্রহণ করতে রাজি নন। কার্জনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল।

এরপর অভিমানী বালকের মতন কার্জন পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। একবার নয়, দু'বার। কার্জনের আত্মবিশ্বাস এত প্রবল যে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, সরকারে তাঁর বন্ধুরা হন্তদন্ত হয়ে তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে বলবেন, তাঁর অভিমানে প্রলেপ লাগাবেন, তাঁর ক্ষমতা বাড়িয়ে

দেবেন!

দশ দিনের মধ্যে স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল। কার্জন যখন পদত্যাগের জন্য এত ব্যস্ত, তখন সম্রাট বাধ্য হয়েই তা গ্রহণ করছেন গভীর দুঃখের সঙ্গে।

কার্জন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন বেশ ক'দিন। এরপরেও ভারতে থেকে যাওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়, তবু থেকে গেলেন কয়েক মাস। কলকাতা ছেড়ে আগ্রায়। মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় তাজমহলের কাছে গিয়ে বসে থাকেন। কলকাতায় তিনি ভিক্টোরিয়ার নামে যে বিশাল স্মৃতিসৌধ বানাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল। আরও অসমাপ্ত রইল কত কাজ। পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টো এসে যাবার পর কার্জন বম্বে থেকে জাহাজে চড়েছেন গত সপ্তাহে। একবারও পেছনে ফিরে তাকাননি। এই ভারতবর্ষের মাটিতে তিনি আর কোনওদিন পা দেবেন না।

ভরত বলল, ব্যারিস্টার সাহেব এখনও কার্জনের ছবি ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন?

হেম বলল, নতুন বড়লাটের ছবি বোধহয় এখনও জোগাড় করা যায়নি।

ভরত উঠে গিয়ে একটা জানলার কাছে দাঁড়াল। পেছন দিকের বাগানটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে হলুদ গাউন পরা একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা মালিকে কী সব নির্দেশ দিচ্ছেন। ব্যারিস্টার রসুল সাহেব যে একজন ইংরেজ রমণীকে বিয়ে করেছেন, তা ভরত আগেই শুনেছে।

সে জানলার কাছ থেকে সরে আসতেই সেই দাড়িওয়ালা, টুপি পরা ব্যক্তিটি ফিরে এসে ঘরের মাঝখানে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, কী রে, ভরত, তুই এখানে কোন উদ্দেশ্যে?

ভরত কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর বলল, ইরফান? আমি চিনতেই পারিনি। এ কী চেহারা হয়েছে তোর?

ইরফান একগাল হেসে বলল, মুটিয়েছি, তাই না?

ভরত বলল, পসার ভালই জমেছে বোঝা যাচ্ছে। বড়লোক হয়েছিস।

ইরফান বলল, আল্লার আশীর্বাদে মোটামুটি ভালই আছি। তোর সঙ্গে সেই যে একবার একটা থিয়েটারে দেখা হল, তারপর তো আর যোগাযোগই রাখলি না।

ভরত বলল, হেম, এই আমার কলেজের বন্ধু ইরফান আলি। এক সময় আমরা অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলাম। তখন ওর ছিপছিপে রোগা-পাতলা চেহারা ছিল। দাড়ি ছিল না।

ইরফান জিজ্ঞেস করল, বিষয়-সম্পত্তি কিছু করেছিস বুঝি? মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিস?

হেম বলল, না, না, ওসব কিছু নয়। রসুল সাহেবের সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি।

ভরত বলল, বরিশাল কনফারেন্সে রসুল সাহেবের যাবার কথা ছিল, আবার শুনছি উনি যাবেন না। ওঁর যাওয়াটা খুব দরকার, সেটাই আমরা বুঝিয়ে বলতে চাই।

ইরফানের মুখখানা কঠোর হয়ে এল। দাড়ি চুমরিয়ে সে বলল, কেন যাবেন ব্যারিস্টার সাহেব? উনি যাতে না যান, সেই চেষ্টা করছি আমরা।

ভরত বলল, সে কী! তোর আপত্তি কীসের?

ইরফান বলল, উনি আমার মুরুব্বি। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ওঁর কথা মানে। মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, এমন কিছুই ওঁর করা উচিত নয়। বরং হিন্দুদের এই আন্দোলনে মুসলমানরা যাতে যোগ না দেয়, সেটা বুঝিয়ে বলাই ওঁর কর্তব্য!

ভরত বলল, আমাদের লড়াই ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এখন হিন্দু-মুসলমানের আলাদা আলাদা স্বার্থ থাকতে পারে নাকি?

ইরফান ধমকের সুরে বলল, তোদের ওই যে বয়কট আন্দোলন, তোদের ছেলেরা বেছে বেছে মুসলমানদের দোকানে হামলা করছে, জিনিসপত্র পোড়াচ্ছে, হাট-বাজার বন্ধ করে দিচ্ছে, এ সব তোরা জানিস না?

ভরত বলল, জানি। কোথাও কোথাও বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঠিকই। ছাত্রদের বদলে কিছু কিছু লুঠেরা

ফেরেব্বাজ বয়কটের নাম করে দোকান থেকে মালপত্র লুটে নিচ্ছে। আবার কয়েক জায়গায় ছাত্ররা এসে পড়ে ওদের ধরে পিটিয়েছেও বটে। কিছু কিছু অরাজকতা চলছে। কিন্তু ইরফান, তুই কী করে বললি যে বেছে বেছে মুসলমানদের দোকানপাটের ওপরেই হামলা চলছে শুধু? বহরমপুরে হিন্দুর দোকানে আগুন ধরানো হয়নি? মাড়োয়ারির দোকান জোর করে বন্ধ করতে গিয়ে মারপিট হয়নি বড়বাজারে?

ইরফান জোর দিয়ে বলল, মুসলমানদের ওপরেই জুলুম চলছে বেশি!

ভরত বলল, স্বীকার করছি, সেটাও মিথ্যে নয়। গোটা ছাত্রসমাজ ক্ষেপে আছে, তারা হিন্দু-মুসলমান বিবেচনা করছে না। মুসলমানরা অনেক জায়গাতেই বয়কটের সিদ্ধান্ত মানছে না, জোর করে দোকান খোলা রেখে বিলিতি জিনিস বিক্রি করতে চাইছে, ঢাকার নবাব মুসলমানদের জন্য আলাদা বাজার বসাচ্ছেন, তাই ছাত্ররাও সেসব জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বয়কট যে একটা দারুণ ভাল অস্ত্র। সেটা বুঝতে পারছিস না! এর মধ্যেই ইংরেজদের ব্যবসায়ে অনেকটা ধাক্কা লেগেছে। ম্যানচেস্টার থেকে কাপড়ের আমদানি কমে গেছে অনেক। হিন্দু-মুসলমান হাত মিলিয়ে আরও একটা বছর যদি এই আন্দোলন চালানো যায়।

তাকে থামিয়ে দিয়ে ইরফান বলল, এই আন্দোলন চালিয়ে মুসলমানের কী লাভ? মুসলমানের ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে হিন্দুরা গাছের ভাল ভাল ফলগুলো ছিঁড়তে চাইছে, তাই না? মুসলমান তা মুখ বুঁজে মেনে নেবে, তারা এত বোকা?

ভরত কয়েক মুহূর্ত বিহ্বলভাবে চেয়ে থেকে বলল, তুই কী বলছিস, আমি বুঝতে পারছি না ইরফান।

ইরফান তার লম্বা কুর্তার পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ফস করে ধরিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, তোরা কি শেষ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াতে চাস?

ভরত একবার হেমের দিকে তাকাল। হেম তার সমর্থনে কিছুই বলছে না, মুখ নিচু করে আঙুলের নোখ খুঁটছে।

ভরত বলল, মানে, ইংরেজদের তাড়ানো তো মুখের কথা নয়, আমাদের এখনও সে শক্তি নেই, প্রস্তুতি নেই। তবে মুখে স্বীকার না করলেও স্বরাজের স্বপ্ন কে না দেখে? আমরা কি চিরকাল পরাধীন হয়ে থাকব?

ইরফান বলল, স্বরাজ পাবার পর হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, তাই না?

ভরত বলল, মোটেই না। ভারতবাসীরা ভারতবর্ষ শাসন করবে।

ইরফান বলল, তার মধ্যে মুসলমানদের স্থান হবে কোথায়? চতুর্দিকে তো হিন্দু হিন্দু রব। তোদের সব নেতারা হিন্দুত্বের নামে শপথ নেয়। শিবাজী এখন ন্যাশনাল হিরো। এমনকী রবিবাবু, তাঁর কবিতা আমি এত ভালবাসি, তাঁর সব কবিতা আমার মুখস্থ, তিনি 'শিবাজী-উৎসব' নামে ওটা কী লিখলেন? 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'। এটা কোন ধর্মরাজ্যপাশ?

হেম এবার মুখ তুলে বলল, ওই কবিতাটা আমারও ভাল লাগেনি। ওঁর ওই কবিতাটা লেখা উচিত হয়নি। মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এক নম্বরের কট্টর হিন্দু। তিনি শিবাজী উৎসব চালু করলেন, অমনি বাঙালিরা তা মেনে নেবে? শিবাজী উৎসব, প্রতাপাদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী এই সবগুলোর মধ্যেই হিন্দুত্বের জয়গান। রবিবাবু প্রতাপাদিত্যকে পছন্দ করেন না, কিন্তু শিবাজীকে হিরো বলে মেনে নিলেন কেন?

ভরত কবীন্দ্র রবীন্দ্রবাবুর এমনই গুণমুগ্ধ যে তাঁর সমালোচনা সে সহ্য করতে পারে না। সে বলল, কবিরা উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়, তিনি ঝোঁকের মাথায় লিখে ফেলেছেন বোধহয়। শুনেছি সখারাম গণেশ দেউস্করের উপরোধে তিনি ওই কবিতাটা লিখে দিয়েছেন। উপরোধ এড়াতে পারেননি আর কী। তবে, ওটা নিতান্তই একটা হিস্টোরিক্যাল কবিতা, ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্মের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শিবাজী, এটা তো হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ। রবিবাবু ব্রাহ্ম,

তিনি কোনওরকম মূর্তিপূজা মানেন না, তিনি হিন্দু সাম্রাজ্য সমর্থন করবেন কী করে?

ইরফান বলল, ঔরঙ্গজেবের কথা বাদ দে। তুই কবিতাটা ভাল করে পড়িসনি। প্রেজেন্ট কনটেক্সটেই—রবিবাবু ওই ধর্মরাজ্যের কথা বলেছেন। "সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ/ শির পাতি লব... 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন/ কবির সম্বল"... এর চেয়ে স্পষ্ট আর কী হতে পারে?

ভরত খানিকটা দুর্বলভাবে বলল, আমরা রবিবাবুকে গিয়ে বোঝাব। না, না, ওঁর কোনও ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকতে পারে না। শুধু একটা কবিতা দিয়ে বিচার করলে কী চলে?

ইরফান বলল, একটার পর একটা যোগ হচ্ছে। তোদের সব নেতারা যদি হিন্দুত্বের রব তোলে, তা হলে মুসলমানরা দূরে সরে যাবেই। আমরা আর হিন্দুদের বিশ্বাস করি না, তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে চাই না।

ভরত বিবর্ণ মুখে বলল, ইরফান! তুই আর আমাকে বিশ্বাস করিস না? আমরা এক সঙ্গে দিনের পর দিন...

ইরফান কাছে এসে ভরতের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, কী পাগলের মতন কথা বলছিস! তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হবে নাকি? দ্বারিকাকে মনে আছে? সে তো নিষ্ঠাবান হিন্দু, এক সময় যখন আমার খাওয়ার সংস্থান ছিল না, থাকার জায়গা ছিল না, তখন ওই দ্বারিকাই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তার সেই উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলব? তুইও চিরকাল আমার বন্ধুই থাকবি। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হবে কেন? কিন্তু জাতিগতভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের আধিপত্য মেনে নেবে কেন? হিন্দুদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য মুসলমানদের এখন পৃথক আইডেনটিটি দরকার। সেইজন্যই আমরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করি। মুসলমান-প্রধান একটা আলাদা রাজ্য পেলে আমরা ছাড়ব না কিছুতেই?

হেম এবার শ্লেষের সঙ্গে বলল, তাতে অবশ্য চোরের ওপর রাগ করে আপনাদের মাটিতে ভাত খাওয়া হবে। হিন্দুদের অবিশ্বাস করে আপনারা সরাসরি ইংরেজদের ভেদাভেদের রাজনীতির খপ্পরে পড়বেন। ইংরেজ কিছুদিন আপনাদের নিয়ে সোহাগ করবে, তারপর আবার একসময় ছুঁড়ে ফেলে দেবে! আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়ে এই ফাঁদটা বুঝতে পারছেন না? ইংরেজরা এই ভারত সাম্রাজ্যটা কার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, হিন্দু না মুসলমানদের কাছ থেকে? আজ আপনারা আপনাদের সেই পরম শত্রু ইংরেজদের পা চাটবেন?

ইরফান বক্রহাস্যে বলল, এর নাম রাজনীতি। পুরনো ইতিহাস আঁকড়ে থাকলে চলে না।

দরজার কাছে একটা শব্দ হতেই সবাই ফিরে তাকাল। ব্যারিস্টার রসুল সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি জমিদার বংশের সন্তান, অতিশয় সুপুরুষ। দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, মুখে প্রশান্তশ্রী মাখানো, পাজামা কুর্তার ওপর একটি জামেয়ার জড়িয়ে রেখেছেন গায়ে। কৌতুক হাস্যে বললেন, কী, খুব তর্কাতর্কি হচ্ছিল বুঝি? সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কিছুটা শুনছিলাম। এ কী, আপনাদের চা-পানি দেয়নি?

উঠে দাঁড়িয়ে ভরত ও হেম সসম্ভ্রমে কপালের কাছে হাত তুলে বলল, আদাব!

রসুল সাহেব দুই করতল যুক্ত করে বললেন, নমস্কার।

ইরফান তাঁর দু'পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল।

ভৃত্যদের ডেকে চা পাঠাবার কথা বলে রসুল সাহেব একটা চেয়ারে বসলেন। তিনি হরিণের চামড়ার চটি পরে আছেন। ভরত দেখল, ওঁর পায়ের গোড়ালিও কী পরিষ্কার। তিনি এদের দু'জনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী বার্তা বলুন!

হেম বলল, আমরা দুই বন্ধু অতি সাধারণ মানুষ। আপনি সকলের সঙ্গে দেখা করেন শুনেই এসেছি। নিছক একটা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য। বরিশালে যে-প্রাদেশিক কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে আপনি সভাপতিত্ব করতে রাজি হয়েছেন শুনেছিলাম। আবার শুনেছি, আপনি যাবেন না। কেন মত পরিবর্তন করলেন, সেটাই জানতে ইচ্ছে করে।

রসুল সাহেব একটুক্ষণ হেমের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনাদের কি কেউ পাঠিয়েছে ? কারুর পক্ষ থেকে এসেছেন ?

হেম বলল, আজ্ঞে না। আমাদের কেউ পাঠায়নি।

রসুল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে, আমি সভাপতি হতে রাজি হই বা না হই, সেটা আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন ? এটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

হেম সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বলল, যদি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়, তা হলে আমরা মোটেই কৌতূহল প্রকাশ করতে চাই না। মাপ করবেন। আমরা দেশজুড়ে বর্তমানে যে-আন্দোলন চলছে, তার সামান্য কর্মী। আপনার যোগ দেওয়া না-দেওয়া যদি নীতিগত ব্যাপার হয়, তার একটা গুরুত্ব আছে। এই কথাই ভেবেছিলাম। তা হলে আর আপনার সময় নষ্ট করব না, আমরা উঠি।

রসুল সাহেব এক হাত তুলে বললেন, আরে বসুন, বসুন! চা আনতে বলেছি। যা জানতে এসেছেন, তা জানাতেও আমার আপত্তি নেই। বিপিন পাল ও সুরেন বাঁড়ুজ্যে মশাইদের সঙ্গে কালই আমার কথা হয়েছে। আগে ঠিক ছিল বরিশাল কনফারেন্স হবে ফেব্রুয়ারি মাসে, তাতে যোগদান করতে আমার ব্যক্তিগত অসুবিধা ছিল। ওই সময় পরিবারকে নিয়ে একবার ডালহৌসি পাহাড়ে যেতে হবে। ওনারা এখন তারিখ বদলেছেন, কনফারেন্স হবে পয়লা বৈশাখ, তখন আমার অসুবিধা নেই, আমি সভাপতিত্ব করতে রাজি হয়ে কথা দিয়ে ফেলেছি।

ইরফান মুখ ঝুঁকিয়ে তীব্র স্বরে বলল, স্যার, আপনি রাজি হয়ে গেলেন ?

রসুল সাহেব বিস্মিত ভাবে বললেন, জী। কেন ?

ইরফান বলল, ওখানে আপনার যাওয়া উচিত হবে না। এটা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী।

রসুল সাহেব বললেন, তাই নাকি ? কেন বলো তো ?

ইরফান বলল, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন হিন্দুর আন্দোলন। মুসলমান-প্রধান একটা আলাদা রাজ্য পেলে আমাদের লাভ হবে। মুসলমানরা অনেক বেশি চাকরি-বাকরি পাবে, আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবে। ঢাকা হবে ক্যাপিটাল। হবে মানে কী, হয়েই তো গেছে। আবার আমরা দুই বাংলাকে জোড়া দিতে চাই না।

রসুল সাহেব সামান্য হেসে বললেন, 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম', এই কি একটা নতুন রাজ্যের উপযুক্ত নাম হল ? সে রাজ্যের বাঙালিরা নিজেদের কী বলবে, পূর্ব বাঙালিয়া ? না কি বঙ্গালি-অসমিয়া ?

ইরফান বলল, স্যার, নামে কী আসে যায় ? অসমিয়াদের মধ্যেও অনেক মুসলমান আছে।

ভরত বলল, আমরা হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নই। হিন্দু বেশি চাকরি পাবে, না মুসলমান বেশি চাকরি পাবে, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে চাই না। আমাদের প্রশ্ন, ইংরেজ সরকার জুলুম করে বাঙালি জাতটাকে দু'ভাগ করে দিতে চাইলেই আমরা মেনে নেব কেন ? শাসন কাজের সুবিধের ছুতোয় এটা তো স্পষ্টই তাদের ভেদনীতি, তাই না ?

রসুল সাহেব বললেন, এই প্রথম হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এর আগে খোলাখুলি কেউ এ বিষয়ে কথা বলেনি। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। সম্পর্কটা পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ঘুচে যেতে পারে। ইরফান, তোমাকেই প্রথম জিজ্ঞেস করি, তুমি কি বাঙালি থাকতে চাও, না শুধু মুসলমান থাকতে চাও ?

ইরফান বলল, দুটোই! ইসলাম আমার পবিত্র ধর্ম, আমার জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল সেই ধর্মের সঙ্গে জড়িত। তা ... বাঙালি থাকতে তো আমার বাধা নেই।

রসুল সাহেব বললেন, গুড! ইসলাম হল ধর্ম, আর বাঙালিত্ব হল একটা জাতীয়তাবাদ। এ দুটো যদি তুমি মেনে নাও, তা হলে মুসলমানের মতন, হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিস্টানও বাঙালি হতে পারে। যার যার ধর্ম আলাদা থাক, তবু সবাই মিলে বাঙালি। এই মিলিত বাঙালি জাতির মধ্যে ভেদাভেদ আনলে তো আমাদেরই ক্ষতি! ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। ঠিক কি না ? আমি কিছু গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি। হিন্দুরা নিজেদের বাঙালি বলে, কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের বলে শুধু মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাতে হবে, আমাদের ভাই-বেরাদরদের মধ্যে গিয়ে

তুমি এটা বোঝাবার দায়িত্ব নাও, তা হলেই অনেক সমস্যা মিটে যাবে।

ইরফান বলল, স্যার, আপনি যা বলছেন, তা হল তত্ত্বকথা। বাস্তবের চেহারা ভিন্ন। লেখাপড়ায় হিন্দুরা অনেক এগিয়ে গেছে, চাকরি-বাকরি অধিকাংশ তারা দখল করে রেখেছে। ফোর ফ্রন্টে সব জায়গায় হিন্দু। এটা কি মেনে নেওয়া যেতে পারে ? পৃথক একটা রাজ্য হলে মুসলমানরা শিক্ষার অনেক সুযোগ পাবে, সব দিক থেকেই এগিয়ে যাবে। এ সুযোগ আমরা ছাড়ব কেন ? ইংরেজ করুক আর যে-ই করুক, বঙ্গভঙ্গ আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ। আর একটা কথা বলা দরকার, বাঙালি মুসলমানরাও জাতীয়তার প্রশ্নে শুধু বাঙালি নয়, সারা বিশ্বের মুসলমানদের সঙ্গেও যুক্ত।

রসুল সাহেব বললেন, এটাও তোমার তত্ত্বকথা। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। শুধু মুসলমান বলেই অন্য মুসলমানরা আমাদের কল্কে দেয় না। অবজ্ঞা করে। মনে করে, আমরা খাঁটি মুসলমান না। বুঝে দেখো। হিন্দু কি হিন্দুর ওপর অত্যাচার করে না ? হিন্দুদের মধ্যে কত জাত-পাত, কত শোষণ! তেমনি মুসলমানও কি মুসলমানকে শোষণ করে না ? মুসলমানের হাতে মুসলমান খুন হয় না ? সিয়া-সুন্নিদের কী সাঙ্ঘাতিক লড়াই আমি দেখেছি! ওরে ভাই রে, সব দেশেই কিছু লোক অন্যদের শোষণ করে ধনী হতে চায়। পৃথিবীতে দুটি মাত্র জাত আছে, অত্যাচারী আর অত্যাচারিত, তা যে ধর্মেরই হোক। আর একটা কথা, এদেশে হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা এগিয়ে আছে ঠিকই। ইংরেজরা দেশটা কেড়ে নিয়েছে মুসলমানদের হাত থেকে। তাই মুসলমানদের সন্দেহের চক্ষে দেখে দূরে সরিয়ে রেখেছে, মুসলমানরাও খানিকটা অভিমানভরে ফিরিঙ্গি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। হিন্দুরা সুযোগ পেয়েছে বেশি। সে জন্য হিন্দুদের দোষ দিয়ে লাভ কী, তারা তো মুসলমানদের বাধা দেয়নি! দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই যদি পরীক্ষায় পাশ করে, আর এক ভাই ফেল করে, তাতে কি বলা যায় যে অন্য ভাইটার জন্য এই ভাই পাশ করতে পারল না ? অভিমান ভুলে এবার প্রতিযোগিতায় নামো! অন্যকে দোষারোপ না করে নিজে উপযুক্ত হও। তা কিছুটা শুরুও হয়েছে, মুসলমানরা লেখাপড়া শিখছে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে।

ইরফান প্রকাশ্য ক্ষোভের সঙ্গে বলল, একটা কথা বলব স্যার, কিছু মনে করবেন না ? যদি গুস্তাকি হয় মাপ করবেন। আপনি বিলাতে লেখাপড়া করেছেন, মেম বিয়ে করেছেন, ব্যারিস্টার হিসেবে সফল। আপনি অন্য যে-সব উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তারা সবাই হিন্দু। খানাপিনা করেন সাহেবিকেতায়, ইসলামের রীতিনীতি কতটা মানেন জানি না। আপনি সাধারণ মুসলমানের মর্মবেদনা বুঝবেন না। মুসলিম সমাজকে উন্নত করতে গেলে আমাদের এখন বিশেষ বিশেষ অধিকার পেতেই হবে। সেইজন্যই বলছি স্যার, ঢাকার নবাব এই সব বয়কট-ফয়কটের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এককাট্টা হওয়ার যে ডাক দিয়েছেন, তাতে আমাদের সকলেরই শামিল হওয়া উচিত। আপনার মতন মানুষকে পেলে আমাদের শক্তি অনেক বাড়বে।

হা-হা করে হেসে উঠে রসুল সাহেব বললেন, তুমি যে আমার নামে অনেক অভিযোগ করে ফেললে হে! বিলেতে লেখাপড়া করেছি, সেটা তো ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, এখন আরও অনেকে যাচ্ছে। মেম বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু তার আগে মায়ের অনুমতি নিয়েছি। মাকে বলেছিলাম, জননী, তুমি যদি রাজি না হও, তবে এ বিয়ে করব না! তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। আমার স্ত্রী আমার ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তিনি শুয়োর-গরু কিছুই খান না। এ বাড়িতে গোস্তের চলই নেই। আমরা দু'জনের কেউই সুরা পান করি না। আমি পাঁচবার নামাজ আদায় করি না বটে, সময় পাই না, কিন্তু প্রতিদিন সকালে ও রাত্তিরে দু'বার অন্তত করি। রোজার মাসে রোজা রাখি, শবেবরাতের রাতে সারা রাত কোরান পাঠ করি। কোরান আমার যতখানি মুখস্থ, ততখানি অনেকেরই নেই। তবে আমি অন্যদের চেয়ে মুসলমান কম কীসে ? মুসলমানের ভাল-মন্দ আমার গায়ে লাগবে না ?

ভরত ও হেমের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা একেবারে চুপ কেন ?

হেম বলল, আপনি পাক্কা ব্যারিস্টারের মতন যে-ভাবে মামলা পরিচালনা করছেন, তাতে আমরা তো মুখ খুলতেই পারছি না।

ভৃত্য এসে চায়ের সঙ্গে প্রচুর বিস্কিট, কেক ও সন্দেশ দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রসুল

সাহেব বললেন, তোমাকে আর একটা কথা বলি ইরফান। আমাকে মাস ছয়েকের জন্য লাহোরে থাকতে হয়েছিল। সেখানে আমাদের অনেক খানদানি ভাই বেরাদরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই তেমন অন্তরঙ্গতা হল না। কেন জানো? ওরা কথা বলে ওদের মাতৃভাষায়, আমি উর্দু কিছু কিছু জানি বটে, কিন্তু আমার মাতৃভাষা বাংলা তো ওরা বোঝে না। তা ছাড়া দিনের পর দিন কী নিয়ে কথা বলব? আমাদের ধর্ম এক হলেও সব সময় তো ধর্ম নিয়ে কথা বলা যায় না। ওরা স্থানীয় বিষয় নিয়ে কথা বলে, যা আমি বুঝি না, ওদের রসিকতা অন্যরকম। দু' চারখানা গজল শুনতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু বাংলা গান না শুনলে কি মন ভরে? দিনের পর দিন কি বিরিয়ানি-মুরগ মশল্লম খাওয়া যায়? সাদা ভাত-মাছের ঝোলের জন্য মন আনচান করে। দেখো, একটা জায়গার ভাষা, খাদ্য, পোশাক, লোকাচার, গান-বাজনা নিয়ে একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, সবাই কিছু না কিছু ভাবে সেই সংস্কৃতির মধ্যেই জীবন কাটাতে পছন্দ করে। এই সংস্কৃতির টান সব সময় বোঝা যায় না, কিন্তু এর জোর কম নয়। রাজনীতির যোগ, ধর্মের যোগের চেয়েও সংস্কৃতির যোগের মূল্য বেশি, এটা আমি বুঝেছি। বাংলার এই সংস্কৃতির মধ্যে আমি ভেদ ঘটাতে চাই না, মুসলমান-হিন্দু সবাইকে মিলিয়েছে এই সংস্কৃতি।

ভরত ফস করে জিজ্ঞেস করল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনি কী ভাষায় কথা বলেন?

রসুল সাহেব বললেন, তাঁকে বাংলা শিখিয়ে নিয়েছি। তিনি বাউল-ফকিরদের মুখে বাংলা গান শুনতে ভালবাসেন। দিব্যি সজনে ডাঁটা চিবিয়ে খান।

ইরফান জিজ্ঞেস করল, আপনি বরিশাল কনফারেন্সে যাবেনই তা হলে?

রসুল সাহেব বললেন, কথা দিয়েছি, অবশ্যই যাব। শুধু কথা দেবার জন্য নয়, তোমাদের ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সঙ্গে আমি গলা মেলাতে পারব না। তাকে আমি নেতা মনে করি না। আমি মনে করি, আমরা সবাই বাংলা মায়ের সন্তান। হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি কূপমণ্ডুক হয়ে থাকার পক্ষপাতী নই। সুখে-দুঃখে আমরা এক সঙ্গে থাকব। একবার বিভেদের চেষ্টা মেনে নিলে তার থেকে শুরু হবে বিদ্বেষ, তারপর বিরোধ, তারপর মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত, আগুন, দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার পরিণতি কোথায় আমি জানি না। এই হিংসা-বিদ্বেষের বলি হবে অসংখ্য নিরীহ মানুষ। না, না, আমি ওসব ভাবতে পারি না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, বাঙালির জাতীয় ঐক্যের চেষ্টা চালিয়ে যাব।

আরও কিছুক্ষণ পর ওরা বিদায় নিয়ে বাইরে চলে এল।

ইরফান ওষ্ঠ বক্র করে বলল, ভরত। তোরাই জিতে গেলি! দলে পেয়ে গেলি ব্যারিস্টার সাহেবকে।

ভরত বলল, আমাদের তো বিশেষ কিছু বলতেই হল না।

হেম বলল, আপনি মহাভারতের গল্প জানেন? কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরু হবার আগে শ্রীকৃষ্ণকে দলে পাবার জন্য কৌরব আর পাণ্ডব দু'পক্ষই গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ দু'পক্ষেরই আত্মীয়। তিনি তখন ঘুমিয়েছিলেন, অর্জুন গিয়ে বসল তাঁর পায়ের কাছে, আর রাজার অহংকারে দুর্যোধন বসেছিল শিয়রের কাছে। চোখ মেলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জুনকেই দেখতে পেলেন, তাই তার অনুরোধ আগে শুনলেন। এখানেও তাই, আমরা রসুল সাহেবকে জোর করতে আসিনি, শুধু তাঁর মতামত শোনার জন্য পায়ের কাছে বসতে চেয়েছিলাম। আপনার জোর ছিল অনেক বেশি।

ইরফান বলল, রসুল সাহেবকে অতটা গুরুত্ব দেবেন না। উনি নামী ব্যারিস্টার হতে পারেন, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ওঁর তেমন কিছু জনপ্রিয়তা নেই। ঢাকার নবাবের কথাই বেশি লোক মানবে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইরফানের নতুন গাড়ি। সে গাড়ির দরজা খুলে ইরফান বলল, আপনাদের কোথাও পৌঁছে দেব?

হেম বলল, না দরকার নেই, আমাদের মেস কাছেই। হেঁটে যাওয়া যায়।

ইরফান তবু ভরতকে বলল, ভরত, তুই চল না আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করবি। তারপর পুরনো কালের গল্প হবে।

ভরত বলল, তোর সঙ্গে গেলে মন্দ হত না, খাওয়াটা ভালই জুটত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানিস, আমরা একটা পত্রিকা বার করছি, সেই ব্যাপারে দুপুরে একটা ঘরোয়া মিটিং আছে। আর একদিন যাব। কালই যেতে পারি।

ইরফান জিজ্ঞেস করল, কী পত্রিকা?

ভরত বলল, বাংলা পত্রিকা, নাম রাখা হয়েছে 'যুগান্তর'। অনেকে মিলে করা হচ্ছে।

ইরফান বলল, হুঁ, আমাদের মুসলমানদের ভাল পত্রিকা নেই। একটা বার করতে হবে।

এগিয়ে এসে ভরতের কাঁধে চাপড় মেরে, দাড়ির ফাঁক দিয়ে হেসে ইরফান বলল, তোরা যতই চেষ্টা করিস, জিততে পারবি না। বাংলা একবার ভাগ হয়ে গেছে, আর কোনও-দিনও জোড়া লাগবে না। ফাটা বাঁশি জোড়া দিলেও আর ঠিক সুরে বাজে না।

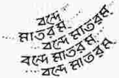

৭৯

একটা বড় স্টিমার ছাড়ল খুলনা থেকে বরিশালের দিকে। সাধারণ যাত্রীবাহী স্টিমার নয়, এর পুরোটাই ভাড়া নেওয়া হয়েছে দেশকর্মীদের জন্য। ওপরের ডেকের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ প্রবীণ নেতারা এবং সস্ত্রীক আবদুল রসুল ও আবদুল হালিম গজনভি। আর এক দিকে ছেলেছোকরার দল, তাদের মধ্যে মিশে আছে বারীন্দ্রকুমার, হেমচন্দ্র, ভরত, উপেন, নরেন গোঁসাই, সত্যেন, কানাই এবং অরবিন্দ ঘোষ।

স্টিমারটি যাত্রা শুরু করার সময় তীর থেকে হাজার হাজার লোক তুমুল কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছে। এর আগে আরও তো কত সভা-সমিতি হয়েছে, কিন্তু সকলেরই কেন যেন ধারণা হয়ে গেছে যে, বরিশালের সভায় একটা দারুণ কিছু ঘটবে। সাধারণ মানুষও এমন উদ্দীপনা দেখাচ্ছে, যেন এটা যুদ্ধযাত্রা, স্বদেশি বাবুদের সঙ্গে এবার সরাসরি লড়াই বাঁধবে ইংরেজ সরকারের।

চৈত্রের শেষ, এর মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেলেও সকালবেলার বাতাসে তেমন তাপ নেই। ধান কাটা হয়ে গেছে, নদীর দু'ধারের মাঠ শুষ্ক, রুক্ষ। মাছ ধরা নৌকোগুলো স্টিমারের ভোঁ শুনে ত্রস্তে সরে যাচ্ছে পাড়ের দিকে, উড়ে যাচ্ছে বকের ঝাঁক। নদীতে দেখা যাচ্ছে শুশুক, মাঝে মাঝে চর থেকে সরসর করে নেমে যাচ্ছে কুমির।

স্টিমার আলাইপুর স্টেশনে পৌঁছতেই দেখা গেল যে, সেখানেও অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে এক বিশাল জনতা। কী করে আগে থেকে খবর রটে গেল! লক্ষ করতে দেখা গেল, জনতার মধ্যে রয়েছে অনেক চাষা-ভুষো, জেলে। ছাত্রদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারাও বন্দেমাতরম ধ্বনি দিচ্ছে। নাচানাচি করছে অল্পবয়েসীরা। লাল কাপড় দিয়ে তারা পতাকা বানিয়েছে। কেউ কেউ লাঠির তলায় লাল গামছা বেঁধে পতাকা করে নিয়েছে। ভারতবাসীর কোনও পতাকা নেই। কী করে এরা লাল রংটা বেছে নিল? যেন রক্ত ঝরানোর জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে।

বারীন বলল, দেখো দেখো, জেলেরা নৌকোয় জাল গুটিয়ে রেখে দৌড়ে আসছে স্টিমারঘাটায় আর বন্দেমাতরম বলে চেঁচাচ্ছে। ওরা কি বন্দেমাতরম কথাটার মানে জানে?

হেম বলল, মানে না জানলেও ধ্বনিটা কানে ভাল শোনায়। ওরা মন্ত্রের মতন একটা কিছু পেয়ে গেছে।

ভরত বলল, হঠাৎ বন্দেমাতরম ধ্বনিটা কী করে সারা দেশে ছড়িয়ে গেল ? বঙ্কিমবাবু যখন গানটা লিখেছিলেন, তখন বোধহয় তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে, এই শব্দের এরকম ব্যবহার হবে।

বারীন বলল, বন্দেমাতরম ধ্বনিটা ছড়াতে বেশি সাহায্য করছে তো ইংরেজ সরকার ! তারা নিষিদ্ধ করেছে বলেই লোকে এখন বেশি বেশি বলছে !

হেম বলল, এবারে কাশী কংগ্রেসেও অনেকে নাকি বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়েছে। অবাঙালিদের মধ্যেও এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ভরত বলল, একটা ব্যাপার আমার আশ্চর্য লাগছে। সরকার নিষেধ করেছে জেনেও সাধারণ মানুষ এই ধ্বনি দিতে সাহস পাচ্ছে কী করে ? সাধারণ মানুষ সরকারকে ভয়-ভক্তি করে। এর আগে কেউ কি কখনও দেখেছে যে, এ দেশের সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে সরকারি নিষেধ অগ্রাহ্য করছে ?

হেম বলল, একটা নতুন আলো ফুটেছে, মানুষের ভয় ভাঙছে। এইখান থেকেই আইন অমান্য শুরু হবে।

সত্যেন বলল, নেতারা কিন্তু এখনও আইন অমান্যের পথে যেতে চান না।

হেম অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, নেতা ? সেরকম নেতা কে আছে, যার কথা সবাই শুনবে ? এক এক জন এক এক রকম কথা বলে !

এক পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সিগারেট টানছেন অরবিন্দ। এর আগে তিনি কলকাতা ও দেওঘর ঘুরে গেছেন, কিন্তু গ্রাম-বাংলা সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা নেই। এমন দৃশ্য তিনি আগে দেখেননি। এত জল, চতুর্দিকে জল ! একটার পর একটা নদী এসে মিশছে। ঘাটে ঘাটে স্নান করছে কত নারী-পুরুষ, সবাই বাংলায় কথা বলে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে মন্দির-মসজিদের চূড়া। অপূর্ব এক ভাল লাগায় তাঁর মন ভরে আছে।

স্টিমারটি যেখানে যেখানে থামছে, সর্বত্রই একই দৃশ্য। বহু মানুষ জড়ো হয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে সহমর্মিতা জানাচ্ছে এই স্টিমারের যাত্রীদের সঙ্গে।

আবদুল রসুল পায়চারি করতে করতে চলে এসেছেন ডেকের অন্য প্রান্তে। হেম এবং ভরত সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন জানাল। রসুল সাহেব অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বললেন, মাপ করবেন, আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার এক পূর্ব-পরিচিতর খুব মিল আছে। আপনি...আপনি এ ঘোষ ?

অরবিন্দও ভ্রূকুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, রসুল ?

রসুল সাহেব বললেন, তবে ঠিকই ধরেছি। অরবিন্দ, তুই ?

দুই বন্ধুতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

বিলেতে এঁরা দু'জন ছিলেন সহপাঠী। একেবারে একই বয়েসী। দেশে ফিরে আসার পর আর পরস্পরের যোগাযোগ ছিল না।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর রসুল বললেন, কতকাল পর দেখা। এখন কী করছিস তুই ? আই সি এস তো শেষ পর্যন্ত দিলি না। চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তাকে তোর কথা জিজ্ঞেস করেছি, সে-ও ঠিক বলতে পারে না।

অরবিন্দ বললেন, আমি যে থাকি অনেক দূরে, বরোদায়। বিলেতের কোনও বন্ধুর সঙ্গেই বিশেষ যোগাযোগ নেই। বাংলায় খুব কম আসা হয়।

রসুল জিজ্ঞেস করলেন, বরোদায় কী করছিস ? ব্যারিস্টারি ?

অরবিন্দ হেসে বললেন, না। ওখানকার রাজ কলেজে ইংরিজি পড়াই। তুই বরাবরই বক্তৃতায় তুখোড় ছিলি, বিলেত থাকতেই বুঝেছিলাম, তুই সফল ব্যারিস্টার হবি। তাই-ই হয়েছিস নিশ্চয়ই। আমি ওসব ঠিক পারি না।

রসুল বললেন, তুই তো ছিলি কবি। এখনও কবিতা লিখিস ? দাঁড়া, দাঁড়া, মনে পড়ছে, একটা কথা। এখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথাবার্তা চলছে জানিস তো ? প্রায় পাকা হয়ে গেছে। বড় বড় নেতারা আলাপ-আলোচনা করছেন যে, সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কে হবেন ?

একবার মিস্টার ঘোষ বলে একজনের নাম উঠেছিল, সেই ঘোষ তা হলে তুই ? অবশ্য বরোদায় তুই নিশ্চয়ই অনেক বেতন পাস, এখানে তো সামান্য টোকেন মানির বেশি দিতে পারবে না। তুই কি রাজি হবি ?

অরবিন্দ বললেন, বরোদায় আর আমার ভাল লাগছে না। এত বড় ঝড় উঠেছে বাংলায়, আমি কি আর এখন অত দূরে বসে থাকতে পারি ?

রসুল বললেন, তুই বরিশালের সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিস, এ কথাও কেউ আমাকে জানায়নি।

অরবিন্দ বললেন, জানাবার তো কিছু নেই। আমি শুধু দেখতে যাচ্ছি।

রসুল বললেন, সুরেনবাবু, বিপিনবাবুদের সঙ্গে তোর পরিচয় আছে ? চল চল ওদিকে চল।

রসুল অরবিন্দকে টেনে নিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে স্টিমারটি পৌঁছল বরিশাল শহরে। এখানেও স্টিমারঘাটায় এসে দাঁড়িয়ে আছে অগণ্য মানুষ। কিন্তু এখানে একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। স্টিমার থেকে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম। কিন্তু ওদিক থেকে কোনও প্রতিধ্বনি এল না। সবাই নিঃশব্দ। যেন মুখে কুলুপ এঁটে আছে।

এর আগে সব জায়গায় মানুষ এত উদ্দীপনা দেখিয়েছে, অথচ বরিশালে কোনও সাড়াশব্দ নেই ? তবে কি বরিশালের মানুষ এখানে সভা করার বিরোধী ? কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য !

সমস্ত পূর্ব বাংলার মধ্যে বরিশাল জেলা এক বিশেষ ব্যতিক্রম। অন্যান্য অনেক জায়গায় ঢাকার নবাবের নির্দেশে বয়কট ভাঙা হয়েছে, বয়কটের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে জোর প্রচার চালানো হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মতবিরোধ প্রকট হওয়ায় ছোটখাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়েছে কয়েক জায়গায়। ঢাকার নবাব বাংলা ভাষার ঐক্যের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন, বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই, তিনি উস্কে দিয়েছেন ধর্মীয় অগ্রাধিকারের প্রশ্ন। একমাত্র বরিশাল জেলাতেই সফল হতে পারেনি তাঁর দলবল। তাঁর কারণ, বরিশালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। তিনি মুসলমান-হিন্দুর কাছে সমান জনপ্রিয় দুর্ভিক্ষ-মহামারীর সময় তিনি কে হিন্দু, কে মুসলমান তা বিচার করেন না, তিনি আর্তদের বুক দিয়ে সেবা করেন। বিপদে পড়লে যে-কেউ এসে তাঁর কাছে সাহায্য পায়। লোকের মুখে মুখে তাঁর ডাকনাম শুধু বাবু। এই বাবু যা বলবেন, প্রত্যেকে তা মেনে নেবে। অশ্বিনীকুমার বিলিতি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছেন, এই জেলায় ওই সব জিনিসের সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কোনও বিলিতি জিনিস ছোঁবে না। কেউ বিলিতি কাপড় পরলে তার ধোপা-নাপিত বন্ধ। এক বৃদ্ধ মুসলমান অশ্বিনীকুমারের কাছে এসে কাঁচুমাচু গলায় বলেছিল, বাবু, আমার বাড়িতে একটা বিলিতি আমড়ার গাছ আছে, সেটাকে কেটে ফেলব ? অশ্বিনীকুমার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, নারে না, নামে বিলিতি আমড়া হলেও সেটা তো দেশের মাটিতেই গজিয়েছে ! এ দেশের মাটিতে যা উৎপন্ন হবে, সবই স্বদেশি !

অশ্বিনীকুমারকে টিট করার জন্য নবাবের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে কম চেষ্টা করা হয়নি। নবাবের অনুগত মোল্লারা এসে প্রচার করতে লাগল, হিন্দুদের এই আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান ধর্মবিরুদ্ধ। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের মিল কোথায় ? আমরা পশ্চিম দিক মুখ করে নামাজ পড়ি, হিন্দু সন্ধ্যাপূজা করে পুব দিকে মুখ ফিরিয়ে। আমরা কলাপাতার যে পিঠে ভাত খাই, হিন্দু তার উল্টো পিঠে খায়। হিন্দু কাছাকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে, আমরা লুঙ্গি। আমরা বলি পানি, হিন্দু বলে জল।

সাধারণ মুসলমান তা শুনে বলাবলি করে, মাঠে যে ধান ফলে, হিন্দুও তার ভাত খায়, মুসলমানও খায়। একই গরুর দুধ হিন্দুও খায়, মুসলমানও খায়। নদীতে মাছ ধরা হলে হিন্দু-মুসলমান এসে কেনে। একই রাস্তা ধরে সবাই হাঁটে। বন্যার সময় একই জায়গায় সবাই আশ্রয় নেয়। এতকাল সবাই পাশাপাশি থেকেছে, কখনও ঝগড়া হয়েছে, কখনও ভাব হয়েছে, সুখে-দুঃখে একই জীবনধারায় অংশীদার, হঠাৎ এ কী নতুন কথা শুরু হল ? অনেক সময় হিন্দুরাও পানি বলে, আমরাও জল বলি,

তবে ক্ষতি কী আছে ?

নবাবের আদেশে জোর করে বিলিতি জিনিসপত্রের বিক্রির জন্য হাট খোলা হল। অশ্বিনীকুমারের নির্দেশে স্বদেশি জিনিসের হাট বসল নদীর অন্য পারে। কোনও খদ্দের নবাবের হাটে যায় না। বিলিতি বস্ত্র যারা আমদানি করেছে, তাদের এক বছরেই ক্ষতি হল তিন কোটি টাকা। বরিশালে বাহান্নটা মদের দোকানের মধ্যে পঞ্চাশটাই বন্ধ হয়ে গেছে।

এবার জোরজবরদস্তি শুরু হল সরকার পক্ষ থেকে। নতুন রাজ্য 'পূর্ব বাংলা ও আসাম'-এর গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। তিনি প্রকাশ্যেই মুসলমানদের দিকে একদেশদর্শিতা দেখিয়েছেন। রসিকতার ছলে তিনি বলেছেন, অনেক লোকের যেমন দুটো বউ থাকে, আমারও সেই অবস্থা। এক বউ ভাল ব্যবহার না করলে অন্য পক্ষের দিকে আমাকে ঢলে পড়তেই হবে।

সেই দুয়োরানি হিন্দুদের কঠোরভাবে শায়েস্তা করার জন্য তিনি নামিয়েছেন গোর্খা বাহিনী। তারা শুধু নির্দেশ মানতে জানে, মায়া-দয়ার ধার ধারে না। বয়কট সমর্থকদের ওপর চলল বেত, লাঠি। সরকার থেকে নতুন বাজার বানিয়ে, আলো দিয়ে সাজিয়ে, সানাই বাজিয়ে খদ্দের ডাকা হতে লাগল। তবু সব ভোঁ-ভাঁ। সেখানে মাছি ওড়ে, একটাও মানুষ যায় না। সরকার ভয় দেখায়, আর অশ্বিনীকুমারের প্রতি রয়েছে সাধারণ মানুষের ভালবাসার টান। ভয়ের চেয়েও ভালবাসার জোর বেশি।

বরিশালে এই সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে চার-পাঁচ মাস ধরে। সারা বাংলা থেকে কয়েক হাজার প্রতিনিধি আসবে, অশ্বিনীকুমারের কলেজের বহু ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হয়ে খাটাখাটনি করছে, তৈরি হয়েছে বিশাল মণ্ডপ। আগেই জানানো হয়েছিল যে, কলকাতা থেকে আগত নেতাদের খুব ধুমধামের সঙ্গে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হবে অতিথি ভবনে। হঠাৎ কী এমন হল, কেউ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না। এখানে সবাই যেন শোকসভায় দাঁড়িয়ে আছে।

স্টিমার থেকে বারীন-হেমদের দল চিৎকার করে বলল, বন্দেমাতরম ! বলো ভাই বন্দেমাতরম !

তবু তীর থেকে সাড়া এল না। এবার দেখা গেল, পিছনে দাঁড়িয়ে আছে গোর্খা পুলিশবাহিনী।

তা হলে কি স্টিমার থেকে নামা ঠিক হবে ? সবাই জানে যে, অশ্বিনী দত্ত অকুতোভয়, তিনিও কি পুলিশকে ভয় পেলেন ? তা হলে কি সম্মেলন বাতিল হয়ে গেছে ?

ভিড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অশ্বিনী দত্তকে, ধুতি আর ফতুয়া পরা রোগা-পাতলা মানুষ। তিনি হাত তুলে কী যেন বলছেন, শোনা যাচ্ছে না।

অন্যদের আপাতত স্টিমারেই থাকতে বলে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র আর কৃষ্ণকুমার মিত্র—এই তিনজন নামলেন। এগিয়ে এসে তাঁদের উষ্ণভাবে আলিঙ্গন করলেন অশ্বিনী দত্ত।

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, অশ্বিনীবাবু ? —সবাই একেবারে চুপচাপ।

জনতার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, শুধুই নিঃশব্দ নয়, লোকেরা গম্ভীর, বিরক্ত এবং যেন ক্ষুব্ধ।

অশ্বিনী দত্ত থুতনি চুলকোতে চুলকোতে বললেন, একটা মুশকিল হয়ে গেছে, ম্যাজিস্ট্রেট ইমারসান সাহেবের কাছে আমি কথা দিয়েছি, এখানে চেঁচামেচি করা যাবে না, আর আপনাদের নিয়ে শোভাযাত্রায় বন্দেমাতরম ধ্বনিও দেওয়া যাবে না।

বিপিনচন্দ্র সবিস্ময়ে বললেন, সে কী ! আপনি...আপনি এরকম কথা দিলেন কেন ?

অশ্বিনী দত্ত বললেন, না হলে যে সম্মেলনই বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সম্মেলনের অনুমতিই দিয়েছেন এই শর্তে। এখান থেকে মণ্ডপে যাওয়া পর্যন্ত স্লোগান দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। বেশি দূরের রাস্তা নয়।

অশ্বিনী দত্ত সুরেন্দ্রনাথের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, শুধু এইটুকু মেনে নিন।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, অগত্যা তাই-ই করা যাক।

কৃষ্ণকুমার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না ! বরিশালের মাটিতে পা দিয়েই আমরা পুলিশের ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে থাকব ? লোকে আমাদের কাপুরুষ ভাববে !

বিপিনচন্দ্র মাথা নাড়লেন, তিনিও কৃষ্ণকুমারকে সমর্থন করেন।

অশ্বিনী দত্ত বললেন, তা হলে যে সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। ওরা সম্মেলন চালাতে দেবে না।

একটুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলল। সম্মেলন বন্ধ হয়ে যাক, এটা কেউ চায় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, এখন থেকেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গিয়ে কাজ নেই। তবে এখান থেকে শোভাযাত্রাও হবে না। নিঃশব্দ শোভাযাত্রা মানেই পরাজয়, তার বদলে প্রতিনিধিরা স্টিমার থেকে নেমে যার যার নির্দিষ্ট বাসস্থানের দিকে চলে যাক।

অশ্বিনী দত্ত বললেন, সভাপতির জন্য চার ঘোড়ার গাড়ি সাজিয়ে রেখেছিলাম। তা হলে শোভাযাত্রা হবে আগামী কাল।

সুরেন্দ্রনাথ স্টিমারে ফিরে এসে সকলকে বোঝাতে লাগলেন। রাগে গজরাতে লাগলেন কৃষ্ণকুমার ও আরও কয়েকজন, ছোকরারা হাসাহাসি করতে লাগল দূরে দাঁড়িয়ে।

পরদিন সম্মেলনের উদ্বোধন। কলেজ প্রাঙ্গণে বিশাল ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে, ছোট ছোট বালকেরা প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফুলের ডালি নিয়ে। মাননীয় অতিথিদের মাথায় পুষ্পবর্ষণ হবে। কাছের একটি বাড়ির ছাদ থেকে মহিলারা করবেন শঙ্খধ্বনি।

রাজাবাহাদুরের হাভেলি থেকে শুরু হবে শোভাযাত্রা। একেবারে পুরোভাগে চার ঘোড়ার গাড়িতে বসেছেন মূল সভাপতি আবদুল রসুল ও তাঁর স্ত্রী, পিছনে পদব্রজে আসছেন সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ, তারপর অন্যান্য প্রতিনিধি ও ছাত্ররা।

সকলে একসঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতেই ঘোড়া ছুটিয়ে কেম্প নামে একজন পুলিশ সার্জেন এসে বলল, বন্ধ করো, বন্ধ করো, ওই ব্যান্ডেমাটারাম চলবে না।

অশ্বিনীকুমার এগিয়ে এসে বললেন, সে কী কথা ! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল, স্টিমারঘাটায় আমরা স্লোগান দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে পারব না। সে কথা আমরা রেখেছি। আজ কেন নিষেধ করছেন ?

কেম্প বলল, ওসব জানি না। রাস্তায় ওই স্লোগান দেওয়া যাবে না। এই সার্কুলার তো জারি রয়েছেই ! তোমরা স্লোগান দিলে আমি মিছিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।

কৃষ্ণকুমার চেঁচিয়ে বললেন, তা হলে দরকার নেই। সম্মেলন বন্ধ হয় হোক। আমরা বন্দেমাতরম বলে জেলে যাব !

সুরেন্দ্রনাথ হাত তুলে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত মাথা গরম করছেন কেন ? পুলিশ সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করছি, আমাদের সম্মেলনের সময়, ঘেরা জায়গায় আমরা বন্দেমাতরম বলতে পারব তো ?

কেম্প বলল, সেখানে আপনারা যা খুশি করুন। রাস্তায় ওসব চেল্লামেল্লি চলবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক আছে। রাস্তায় বন্দেমাতরম বন্ধ থাক, তার বদলে গান চলুক। গান সম্পর্কে কোনও সার্কুলার নেই।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস রয়েছেন গানের দলে। তিনি উদাত্ত গলায় গান ধরলেন :

আমরা নেহাত গরিব
আমরা নেহাত ছোট
তবু আছি ত্রিশ কোটি—জেগে ওঠো !
জুড়ে দে ঘরে তাঁত
সাজা দোকান
বিদেশে যেন না যায় ভাই
গোলার ধান !

শোভাযাত্রাটি সবেমাত্র এগোতে শুরু করেছে, অমনি পাশের একটি বাড়ি থেকে হইহই করে বেরিয়ে এল বারীন, হেম, উপেন, ভরতের দল। তারা লাফাতে লাফাতে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে নাচতে লাগল। অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, বলো ভাই বন্দেমাতরম ! যদি বাঙালির বুকের পাটা

থাকে, তবে গলা ছেড়ে হেঁকে বলো, বন্দেমাতরম।

প্রথমে তাদের সঙ্গে যোগ দিল অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যরা। তারপর যেন দাবানলের মতন ছড়িয়ে গেল বন্দেমাতরম ধ্বনি। মিছিলের সকলে একযোগে বন্দেমাতরম বলে চিৎকার করতে করতে বাতাস কাঁপিয়ে দিল। আর পুলিশের নিষেধ কেউ মানবে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ছুটে এল গোর্খাবাহিনী। নির্মমভাবে লাঠি চালাতে লাগল নির্বিচারে। তারপর এল অশ্বারোহী বাহিনী। সাধারণ মানুষ যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, এত পুলিশ দেখেও তারা থামে না, মার খেয়েও তারা ধ্বনি দিচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবকরা প্রথমে বড় বড় নেতাদের সরিয়ে নিয়ে গেল নিরাপদ দূরত্বে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা আবার ফিরে এলেন, জনসাধারণ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হতে চান না। তাঁরাও পুলিশের লাঠি অগ্রাহ্য করতে চান। কেউ কেউ আহত হলেন, কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

বারীন, হেম, ভরতের দল পুলিশের সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলা খেলছে। পুলিশ তাড়া করে এলে তারা দৌড়ে পালাচ্ছে কাছাকাছি গলির মধ্যে, আবার অন্য গলি দিয়ে ফিরে এসে প্রবলভাবে বন্দেমাতরম বলে পুলিশকে ক্ষেপাচ্ছে। কেউ কেউ আড়াল থেকে ইষ্টক বর্ষণ করছে পুলিশের ওপর।

এক জায়গায় একটি যুবককে ঘিরে ফেলেছে তিন-চারজন গোর্খা, সবাই মিলে তাকে প্রহার করছে, তার মাথা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। দূর থেকে একজন কেউ চেঁচিয়ে উঠল, মনোরঞ্জনবাবুর ছেলেকে মেরে ফেলল! তখন অনেকেই চিনতে পারল, ওই যুবকটি বিশিষ্ট নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন। সেও অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্য, বন্দেমাতরম ধ্বনি কিছুতেই ছাড়বে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। মার খেতে খেতেও সে গলা ফাটিয়ে বন্দেমাতরম বলে যাচ্ছে। একসময় সে বাঁচবার জন্য পাশের পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাতেও নিস্তার নেই, একজন গোর্খাও সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে নেমে পড়ে লাঠি চালাতে লাগল তার সর্বাঙ্গে।

শত শত লোকের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটছে।

দূরের জনতা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একজন অচেনা যুবক। তার হাতে একটা বাঁশ। সে চেঁচিয়ে বলল, বাঙালি কি মরে গেছে? আমাদেরই একজন সাথীকে পুলিশ মারছে, আমরা চুপ করে দেখব? বাঙালি এত কাপুরুষ? আজ ওই শালা পুলিশেরই একদিন কি আমারই একদিন।

বারীন আর হেম লাফিয়ে এসে সেই যুবকটিকে দু'দিকে চেপে ধরে বলল, করছেন কী? পুলিশকে মারলে যে আপনাকে এখানেই শেষ করে দেবে।

তারা টানতে টানতে যুবকটিকে সরিয়ে আনল।

পুলিশকে মারলে কী হয়, তা ভরতের চেয়ে বেশি কেউ জানে না। পুলিশকে একটা মাত্র ঘুঁষি মেরেছিল বলে তাকে নিদারুণ অত্যাচার সইতে হয়েছে, জেল খাটতে হয়েছে দেড় বছর।

কিন্তু পুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে নিজেই চঞ্চল হয়ে উঠল। চিত্তরঞ্জন মার খেতে খেতে অবশ হয়ে যাচ্ছে, গলার আওয়াজ হয়ে গেছে ক্ষীণ। এবার যে ছেলেটি জলে ডুবেই মারা যাবে। পুকুরের পাড়ে এত পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে যে, কেউ ওদিকে যেতে সাহস পাচ্ছে না।

ভরত তীরবেগে ছুটে সেই পুলিশদের ভেদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। চিত্তরঞ্জন ডুবে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার জামার কলার ধরে টেনে তুলল। ভরতের কাঁধে পুলিশের লাঠির একটা বাড়ি পড়ল, ভরত গ্রাহ্য করল না, চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে সে সাঁতরাতে লাগল পুকুরের অন্য পাড়ের দিকে। চিত্তরঞ্জন একেবারে জ্ঞান হারায়নি, আচ্ছন্ন গলায় বলল জেলে নিয়ে যাচ্ছ? আমি জেলে যাব না। আমাকে মেরে ফেল! আমাকে মেরে ফেল! বন্দেমাতরম!

ভরতও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, বন্দেমাতরম!

কিছুটা দূরে কৃষ্ণকুমার মিত্র এক কনস্টেবলের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়েছেন। অন্য কয়েকজন পুলিশ তাঁকে মারতে আসতেই তিনি বললেন, সাবধান! এরপর কিন্তু রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে!

কেম্প সাহেব তক্ষুনি এসে পড়ল সেখানে। কৃষ্ণকুমার বললেন, আপনি কী করছেন বুঝতে পারছেন না! পুলিশদের লেলিয়ে দিয়েছেন, মানুষজন যেরকম ক্ষেপে উঠছে, এর পর যে-কোনও মুহূর্তে এখানে বিরাট মারামারি শুরু হয়ে যাবে।

কেম্প বলল, দোষ তো আপনাদেরই। আমার কথা শোনেননি।

কৃষ্ণকুমার ধমক দিয়ে বললেন, এই সেপাইটা আমাদের ব্রজেন গাঙ্গুলিকে মাথা ফাটিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছে। গভর্নমেন্টের এরকম নির্দেশ আছে?

সুরেন্দ্রনাথ সেখানে এসে পড়ে বললেন, শিগগির এই অত্যাচার থামান। বন্দেমাতরম বললে গ্রেফতার করার কথা, এরকমভাবে মারধরের আদেশ কে দিয়েছে? যদি মনে করেন আমাদের গ্রেফতার করুন।

কেম্প বলল, ঠিক আছে, আপনাকে গ্রেফতার করলাম।

কৃষ্ণকুমার এবং অন্যান্য নেতারাও বলে উঠলেন, আমাদেরও গ্রেফতার করুন। আমরা দায়িত্ব নিতে চাই।

কেম্প কিন্তু শুধু সুরেন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে চলল, অন্য নেতারাও চললেন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর দিকে।

এ দিকে মিছিলের সামনের দিকটা বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে সভামণ্ডপে পৌঁছে গেছে। রসুল সাহেবকে সভাপতির আসনে বসিয়ে সভার কাজ শুরু করে দেওয়া হল। অনেকেরই ধারণা, পুলিশ যেরকম আচরণ শুরু করেছে, তাতে এই সভাও হয়তো বন্ধ করে দিতে চাইবে। তার আগে যতক্ষণ চালানো যায়। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেফতার হয়েছেন শুনে সকলেই দারুণ উত্তেজিত। বিভিন্ন বক্তা তীব্র ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। চিত্তরঞ্জনের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, গায়ের জামা রক্তাক্ত। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, আমার ছেলের এই রক্তপাত কি বৃথা যাবে?

সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, না, না!

ভিড়ের মধ্য থেকে কারা যেন বলল, প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ চাই! রক্তের বদলে রক্ত!

আরও কিছুক্ষণ পরে খবর পাওয়া গেল, বেশি গোলমালের আশঙ্কায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে কারাগারে না পাঠিয়ে জামিনে মুক্তি দিয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকরা সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে আসছে সভায়। বক্তৃতা থেমে গেল। সকলে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল পথের দিকে। সুরেন্দ্রনাথ এসে পৌঁছতেই বহু লোক ছুটে গেল তাঁর পদধূলি নিতে। সভাস্থল বন্দেমাতরম ধ্বনিতে কম্পিত হতে লাগল।

সুরেন্দ্রনাথ মঞ্চে উঠে বললেন, বরিশালের সাধারণ মানুষ আজ যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছে তা অভূতপূর্ব। আজ নতুন করে বয়কটের শপথ নিতে হবে। যদি বেশি সময় না পাওয়া যায়, তাই আমি এখনই শপথবাক্য পাঠ করছি, আপনারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করুন। "জগদীশ্বর ও জন্মভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা সাধ্যমতো বিদেশি পরিত্যাগ এবং স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিব। কোনও অত্যাচারেই আমরা নতি স্বীকার করিব না।"

সভাপতি রসুল সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বেশি সময় পাওয়া যাবে না, এই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই আমিও আগেভাগেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই। বয়কট প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছে। আমি মনে করি, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা এক জননী ও জন্মভূমির সন্তান। এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হিন্দুর সঙ্গে অভিন্ন। ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ চিন, তুরস্ক ও জাঞ্জিবার দেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে এক হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অভিযানে আমরা স্বদেশীয় হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সহযাত্রী!

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল তাঁকে। বরিশাল শহরে বেশ

কিছু খ্রিস্টান রয়েছে, তারাও এসেছে, সভাস্থলের এক দিক থেকে সেই খ্রিস্টানরাও উঠে দাঁড়িয়ে সহমত জানাল। তারপর একের পর এক বক্তা উঠে বর্ণনা দিতে লাগলেন সরকারি দমন নীতির।

কলেজ প্রাঙ্গণে যখন এই সভা চলছে, সেই সময় কীর্তনখোলা নদীতে একটি নৌকোয় এসে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিলেন রাজকার্যের এক সংকটে মহারাজ রাধাকিশোরকে পরামর্শ দিতে। সেখান থেকে কুমিল্লা হয়ে আসায়, আসতে তাঁর কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। বরিশালে রাজনৈতিক সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে একটি সাহিত্য সমাবেশও হবে, তিনি সেই সমাবেশের সভাপতি। সাহিত্যের মাধ্যমেই বিভক্ত বাংলার ঐক্য বেশি করে প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

লাখুটিয়ার জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে আতিথ্য দেবেন। আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথ জল ভালবাসেন বলে শহরের মধ্যে না গিয়ে তিনি নদীর ওপর একটা বজরাতেই থাকবেন। নৌকো ছেড়ে সবেমাত্র বজরায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, বিশ্রামেরও সময় পেলেন না, স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটে এসে তাঁকে আজকের ঘটনার বিবরণ জানাল। গোর্খা পুলিশ শহরে তাণ্ডব শুরু করেছে, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেককে আহত ও অজ্ঞান করে দিয়েছে তো বটেই, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বহু দোকানে। এরই মধ্যে সভা চলছে। আপনি শিগগির সেখানে চলুন!

রবীন্দ্রনাথ সব শুনলেন। তারপর বললেন, না, আমি যাব না।

একজন স্বেচ্ছাসেবক বলল, সে কী, আপনি যাবেন না? লোকজন মহা উত্তেজিত হয়ে আছে। আপনার কথা শুনলে তারা প্রেরণা পাবে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি সাহিত্য সভার জন্য এসেছি। রাজনৈতিক সভায় তো বক্তৃতা দেবার কথা ছিল না আমার।

স্বেচ্ছাসেবকটি বলল, এমন যে ব্যাপার হবে, কেউ কি জানত? কলকাতায় রাখিবন্ধনের দিন আপনি যেমন মিছিল করেছিলেন, এখানে আজ যদি আপনি একবার গিয়ে দাঁড়ান, হাজার হাজার মানুষ আপনাকে অনুসরণ করবে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, এখন বহু স্থানেই মিছিল হয়। আমার আর মিছিলে দাঁড়াবার প্রয়োজন দেখি না।

তবু স্বেচ্ছাসেবকরা পীড়াপীড়ি করতে লাগল, একবার চলুন, একবার চলুন। একজন বলল, আমরা আপনাকে ঘিরে থাকব। আপনার ধারেকাছে কেউ আসতে পারবে না। পুলিশ যদি লাঠি তোলে, আমরা মাথা পেতে নেব।

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন।

সেই রাখিবন্ধনের মিছিলের পর রবীন্দ্রনাথ আর বিশেষ কোনও প্রতিবাদ মিছিলে যাননি, সভাসমিতিতেও যান না। অনেকের ধারণা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করে নেতৃত্ব থেকে সরে যাচ্ছেন। তা কি কোনও ভয়ে? দু'-একটি সভায় এ নিয়ে তাঁর নামে বক্রোক্তিও করা হয়েছে, তাও রবীন্দ্রনাথের কানে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন অনেকখানি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে তিনি অনেকখানি ভূমিকা নিয়েও এখন আর মন লাগাতে পারছেন না। অন্য অনেকের কথাবার্তা বা কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন না, অতিরিক্ত বাগাড়ম্বর বা আস্ফালন তাঁর চরিত্রবিরোধী। দেশের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য কিছু করতে গেলে ধীর স্থিরভাবে এগোতে হয়। কিন্তু অনেক নেতা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশকেই বড় করে দেখছেন। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন যেন সেই স্পর্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ।

বয়কট আন্দোলন যেদিকে মোড় নিয়েছে, সেটাও তাঁর পছন্দ নয়। জোর-জুলুম-জবরদস্তি চলছে অনেক জায়গায়, তা উনি সমর্থন করতে পারছেন না। বিভেদ তৈরি হচ্ছে দুই সম্প্রদায়ে। তিনি 'শিবাজী উৎসব' নামে কবিতা লিখে দিয়েছিলেন, তখন বুঝতে পারেননি, এই উৎসবের নামে ভবানী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হবে। যারা মূর্তি পূজক নয়, তারা এই উৎসব-সভায় যাবে কেন? তিনি নিজেও যান না সেইজন্য।

রবীন্দ্রনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে দেবকুমার রায়চৌধুরী বলল, রবিবাবু, কাল সাহিত্যবাসর হবে কি না ঠিক নেই। আজ যা কাণ্ড হল, কাল কি সভা করা যাবে? আপনি বরিশালে এসেছেন, লোকে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। আপনি আজকের সভাতেই কিছু অন্তত বলুন।

রবীন্দ্রনাথ বিরক্তির ভাব যথাসম্ভব গোপন করে বললেন, দেবকুমার, আমি কোনও জন্মেই লিডার বা জনসঙ্ঘের চালক নই, আমি ভাট মাত্র, যুদ্ধ উপস্থিত হলে গান গাইতে পারি, যদি আদেশ দেবার কেউ থাকেন, তাঁর আদেশ পালনেও প্রস্তুত আছি। দেশীয় বিদ্যালয় যদি সত্যিই কোনওদিন গড়া হয়, তার সেবাকার্যের জন্য যদি আমাকে আহ্বান জানানো হয়, আমি অবশ্যই যাব। কিন্তু নেতা হবার দুরাশা আমার একেবারেই নেই। যাঁরা নেতা বলে পরিচিত তাঁদের আমি নমস্কার করি। ঈশ্বর তাঁদের শুভবুদ্ধি দিন!

একটু থেমে তিনি আবার আপন মনে বললেন, যে অগ্নিকাণ্ড চলছে, তাতে আমি উন্মত্ত হতে পারব না। যতদিন আয়ু আছে, আমার নিজস্ব প্রদীপটি জ্বেলে পথের ধারে বসে থাকব।

আর একদল স্বেচ্ছাসেবক এই সময় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সভা ভেঙে গেছে, পুলিশ জোর করে সভা বন্ধ করে দিয়েছে!

দেবকুমার বলল, সেকী! সভামণ্ডপের মধ্যেও পুলিশ লাঠি চালিয়েছে? নেতাদের মেরেছে?

একজনের মুখ থেকে পূর্ণ বিবরণটি জানা গেল। পুলিশ সভাস্থলে লাঠি চালায়নি বটে, কিন্তু বক্তৃতা চলাকালীন সার্জেন কেম্প গটমট করে এসে মঞ্চে উঠে পড়েছিল। সভাপতিকে সে বলেছে, শহরে আইন-শৃঙ্খলার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সরকার এর প্রশ্রয় দিতে পারে না। এই সভা চলতে পারে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের কথা দিতে হবে, সভা শেষে সবাই চুপচাপ ফিরে যাবে, আর কোনও মিছিল হবে না, কেউ বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে পারবে না রাস্তায়।

সভাপতি বললেন, সভায় এত লোক, তারা এখান থেকে বেরোবার পর শ্লোগান দেবে কি না, সে দায়িত্ব আমরা কী করে নেব!

কেম্প বলল, আপনাদের সে দায়িত্ব নিতেই হবে। নচেৎ, আপনারা সভা বন্ধ করে দিন, আমরা সব লোকদের বার করে দেবার ব্যবস্থা করছি।

অন্য নেতারা সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা পুলিশের সঙ্গে কোনও চুক্তি করতে রাজি নই। আমরা সভা চালিয়ে যাব। পুলিশ কী করবে, জোর করে আমাদের তাড়াবে?

কেম্প বলল, সে রকম হলে আমি বলপ্রয়োগে বাধ্য হব!

তখনও কয়েকজন বললেন, তা হলে চলুক সভা। দেখি, পুলিশ কত মারতে পারে।

বড় রকমের গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সুরেন্দ্রনাথ সভা বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব দিয়ে, অন্যদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন। কোনও কোনও নেতা ফিরে গেছেন কাঁদতে কাঁদতে। যোগেশ চৌধুরী সকলকে বলেছেন, এই সভা ভাঙল, এখন প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে সভা হোক। চতুর্দিকে আগুন জ্বলুক, সে আগুনে চিরদিনের মতো বিলেতি জিনিস দগ্ধ হোক! কৃষ্ণকুমার মিত্র কিছুতে যেতে চাইছিলেন না, তিনি বারবার বলছিলেন, পুলিশ আমাকে মেরে তাড়াক! লাঠি মারুক! গুলি করুক! বন্ধুরা জোর করে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে।

একজন স্বেচ্ছাসেবক বলল, আমি নিজের কানে শুনলাম, ভূপেন বোস বিড়বিড় করে বলছেন, আজ থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসান শুরু হল!

আর একজন বলল, শহরের রাস্তায় এখন আর একটাও লোক নেই। শুধু পুলিশ!

দেবকুমার বলল, এরপর কালকের সাহিত্যবাসরের কি কোনও আশা রইল?

রবীন্দ্রনাথ দু' দিকে মাথা নাড়লেন। সভাপতির অভিভাষণ তিনি প্রবন্ধাকারে লিখে এনেছিলেন, কুর্তার পকেট থেকে সেই লেখাটি বার করে রাখলেন বাক্সের মধ্যে। তারপর বললেন, দেববাবু, এ যাত্রা আর বরিশালের মাটিতে আমার পা দেওয়া হল না। আমার ফেরার ব্যবস্থা করো। আমি ভোররাত্রেই ফিরতে চাই।

বারীন, হেম, ভরতদের দল এসে সন্ধেবেলা দাঁড়িয়েছে খেয়াঘাটে। ঝালকাঠিতে হেমের এক

আত্মীয় থাকে, সেখানে সবাই রাত্রি যাপন করবে। অরবিন্দ রয়ে গেছেন রসুল সাহেবের সঙ্গে এখানকার অতিথিশালায়।

চিত্তরঞ্জনকে পুলিশ মারছে দেখে যে যুবকটি পুলিশকে মারার জন্য ছুটে যাচ্ছিল, সেও খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেশ স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। বারীন তার কাছে গিয়ে বলল, নমস্কার, আজ আপনার সাহস দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমার নাম বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, আপনার নাম জানতে পারি ? আপনি কি কোনও সমিতির সদস্য ?

যুবকটি বলল, না, আমি কোনও সমিতিতে নেই। এমনিই মিটিং শুনতে এসেছিলাম। আমার নাম উল্লাসকর দত্ত।

বারীন তার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল, যে গোর্খাটা চিত্তরঞ্জনকে পেটাচ্ছিল, সে তো সামান্য একটা সেপাই। ওকে মেরেই বা কী হবে ? ও তো একটা চুনোপুঁটি। মারতে হলে ওর বাবাকে মারা উচিত।

উল্লাসকর ঠিক বুঝতে না পেরে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, ওর বাবা ? সে কে ? ওঃ হো, সার্জেন কেম্প ?

বারীন মাথা নেড়ে বলল, না। সেপাইরা যদি চুনোপুঁটি হয়, তা হলে কেম্পরা হল কই-খলসে। বাবারও বাবা থাকে। যেমন রাঘব বোয়াল। গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার। তার নির্দেশেই তো এইসব অত্যাচার চলছে। তাকে মারতে পারবেন ?

৮০

সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন গুপ্ত সমিতির সদস্যরা একে একে জড়ো হতে লাগল। বারীনই পত্রিকাটির মূল সংগঠক, সম্পাদনার অনেকখানি দায়িত্ব নিয়েছে ভূপেন দত্ত। দেবব্রত, সত্যেন, কানাই, নরেন গোঁসাই, উপেন এরকম অনেকেই কিছু কিছু লেখে, কোনও লেখাতেই লেখকের নাম থাকে না। ভরত আর হেম নিয়মিত আসে। পত্রিকার অফিসে কাজের সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাও চলে অবিরাম। সবাই মিলে দু পয়সা-তিন পয়সা চাঁদা দিয়ে আনানো হয় মুড়ি আর বেগুনি-ফুলুরি, সেই সঙ্গে ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা।

চাঁপাতলায় কানাই ধরের গলিতে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। নীচের তলায় প্রেস, ওপরতলায় তিনটি ঘরের মধ্যে একটিতে অফিস, অন্যটিতে একটি চৌকির ওপর বিছানা পাতা, সে বিছানা কখনও গোটানো হয় না, বালিশ দুটি তেল চিটচিটে হয়ে গেছে, এই বিছানার ওপরে বসেই সকলে গল্প-গুজব-তর্কাতর্কি করে, অধিক রাত্রি হলে দু-তিনজন ওখানে থেকেও যায়। অন্য কুঠুরিটা কিছুটা রহস্যময়, সব সময় তালা বন্ধই থাকে, তার চাবি থাকে শুধু দেবব্রতর কাছে। ওই ঘরটি সম্পর্কে অন্যরা কৌতূহল প্রকাশ করেন, বারীন শুধু মুচকি হেসে দেবব্রতর দিকে তাকায়। দেবব্রত কিছুই বলে না।

ক্রমে জানা গেল, ওই বন্ধ কুঠুরিতে বন্দুক-পিস্তল সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে গোপনে গোপনে ওই সব অস্ত্র বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এইবার শুরু হবে সত্যিকারের বিপ্লব।

হেম বরাবরই নিজের কাছে পিস্তল রাখে। অস্ত্র আইন সে গ্রাহ্য করে না, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি তার খুব ঝোঁক। এখানে কী ধরনের অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে, তা দেখার জন্য সে বারীনকে পীড়াপীড়ি করে। বারীন বলল, দেখো ভাই, এখানকার কথা পাঁচ কান হোক আমি তা চাই না। তা ছাড়া এসব

জোগাড় করতে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, যদি কোনও বিপ্লবী এখান থেকে অস্ত্র নিতে চায়, তাকে দাম দিতে হবে। হেম সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমাদের মেদিনীপুর সমিতির জন্য একটা অস্ত্র চাই, আমি দাম দিতে রাজি আছি।

শুধু হেমের সামনে এক রাত্রে সেই ঘরের চাবি খুলল দেবব্রত। সে ঘরে কোনও আলো নেই। দেবব্রত একটা রিভলবার তুলে দিল হেমের হাতে। হেমের অভিজ্ঞতা আছে, হাতে নিয়ে বুঝল, সেটা বেশ পুরনো ধরনের, ঠিক মতন গুলি বেরুবে কি না সন্দেহ। তবু সে জিজ্ঞেস করল, আর নেই ? বারীন বলল, যত চাও তত পাবে, তুমি তো একখানাই চেয়েছ ! হেম বলল, না, আমার অন্তত চার-পাঁচখানা লাগবে, সব দাম আমি মিটিয়ে দেব। তখন বারীন আমতা আমতা করে বলল, এখনই তোমাকে দেখানো যাবে না। ঠিক আছে, তুমি অর্ডার দিয়ে কিছু অগ্রিম দিয়ে যাও, কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই একটিমাত্র জং ধরা রিভলবারের জন্য এত সতর্কতা ! এই দিয়ে বিপ্লব শুরু হবে ! হেম নিঃশব্দে হাসল। বারীন অতিশয়োক্তিতে ওস্তাদ !

আর কিছুদিন পরে কিন্তু বারীন তাক লাগিয়ে দিল। সকলকে ছাদে ডেকে নিয়ে দুটি গোলাকার লোহার বল দেখাল। এর নাম বোমা। বারীন সবিস্তারে বোঝাল, এই বোমা পুঁতে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে রেললাইন উড়ে যাবে, কোনও বাড়ির মধ্যে ফাটালে সে বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে, সেখানকার কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

এ রকম বোমা কেউ আগে দেখেনি। বারীন এ বোমা পেল কোথা থেকে ?

বারীন সব সময় রহস্য করতে ভালবাসে। মাথা দুলিয়ে বলল, সে এক জায়গা থেকে পেয়েছি। আরও পাওয়া যাবে, আরও তৈরি হবে।

একটু পরে সে নিজেই জানাল যে নেপালের রাজার অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানার প্রধান মিস্তিরি একজন বাঙালি। তাকে হাত করে তার কাছ থেকে এই বিদ্যে সে মেরে দিয়েছে !

সেই মিস্তিরির কাছ থেকে এ বিদ্যে শিখে নিয়ে বারীন নিজেই বানিয়েছে ? তা অবশ্য নয়। এক কলেজের কেমিস্ট্রির ছাত্রের সে সাহায্য নিয়েছে।

হেমের সন্দেহপ্রবণ মন। সে জিজ্ঞেস করল, এ বোমা যে ফাটবে, তার প্রমাণ কী ?

বারীন একটা বোমা থেকে কিছুটা মশলা বার করে এনে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল। অমনই সেই মশলা জ্বলে উঠল দপ করে। অনেকটা তুবড়ির বাজির মতন।

বারীন বলল, লোহার খোলের মধ্যে যখন ফাটবে, তখনই বিস্ফোরণ হবে। সেটা তো আর এখানে দেখানো সম্ভব নয় ! যথাসময়ে দেখতে পাবে।

বারীন সেই বোমা দুটি কিছু কিছু ধনী ব্যক্তিকে দেখিয়ে মুগ্ধ-বিহ্বল করে দিয়েছে। হ্যাঁ। এবারে বাঙালির হাতে একটা অস্ত্র এসেছে বটে। এ দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে।

ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থেই রাজভক্ত হয়। কিন্তু ইদানীং স্বদেশি ভাবের জোয়ার এসেছে, কিছু কিছু ধনী ব্যক্তির মনেও ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা হয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহের পর, মাঝখানের এতগুলি বছরে ইংরেজ সরকারের এমন হিংস্র রূপ দেখা যায়নি। অল্পবয়েসী ছাত্রদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চলছে গ্রামেগঞ্জে। এমনকী ভদ্রলোক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাদের ওপরও লাঠি চালিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। বরিশালের ঘটনায় অপমানিত বোধ করেছে সারা দেশবাসী। বরিশালে এখনও পিটুনি-কর চলছে। সাধারণ মানুষও এখন উত্তেজিত হয়ে আছে দেখে ধনী মানুষদেরও মনে হচ্ছে, ইংরেজের রাজত্ব শেষ হওয়ার পালা এখন শুরু হয়ে গেছে।

বারীনের ওই বোমা দেখে কয়েকজন ধনী ব্যক্তি বলেছে, তোমরা যদি ইংরেজের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারো, তা হলে টাকা পয়সার অভাব হবে না। আমরা সাহায্য করব। কেউ কেউ দু হাজার-পাঁচ হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সুরেন ঠাকুর অগ্রিম দিয়েছে এক হাজার টাকা।

'যুগান্তর' সাপ্তাহিকটি কয়েক সংখ্যার মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বেশ। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। গরম গরম উত্তেজক রচনা এতে প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র পালও ইংরিজিতে 'বন্দেমাতরম'

নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, যার প্রধান লেখক অরবিন্দ ঘোষ। তিনি বারীনের কাগজেও লেখা দেন, তবে তিনি বাংলায় লিখতে পারেন না, তাঁর ইংরেজি লেখা অনুবাদ করে নেওয়া হয়।

'যুগান্তর'-এর লেখকদের সাহস দিন দিন বাড়ছে। তীব্র সরকার-বিদ্বেষী সুর ফুটে ওঠে বিভিন্ন রচনায়। ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ বিতাড়নের কথা কেউ আগে উচ্চারণ করেনি, এই লেখকরা জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ করতে লাগল যে এ দেশের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্যের মূল কারণ ইংরেজ শাসন। ইংরেজরা এ দেশকে পদানত করার আগে সকল মানুষেরই খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান ছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল, সমৃদ্ধি ছিল, এই মিথ্যে সুখচ্ছবিও ফোটানো হতে লাগল। দেশ স্বাধীন হলে নুনের ওপর ট্যাক্স থাকবে না, কাপড়ের ওপর ট্যাক্স থাকবে না, জিনিসপত্র সুলভ ও শস্তা হয়ে যাবে, সকলেই দু বেলা পেট ভরে খাবার পাবে, পরিধেয় বস্ত্র পাবে, তার চেয়েও বড় কথা আত্মসম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে, এই সব বোঝানো হতে লাগল সাধারণ মানুষকে।

পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় আর্টিকেল লিখে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কী হয়? ইংরেজ সরকারও এ সব লেখা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তারা কী ভাবছে, এ সবই দুর্বলের আস্ফালন! হেম মাঝে মাঝেই এ প্রশ্ন তোলে।

একদিন মধ্যরাত্রে বারীন একটা গোপন সভা ডাকল। সকলকে জানানো হয়নি, শুধু দেবব্রত, সত্যেন, হেম আর ভূপেন সেখানে উপস্থিত। বারীন বলল, তোমরা কিছু একটা শুরু করার জন্য অস্থির হয়ে আছ, আমি জানি। আমার নিজেরও একই অবস্থা। এইবার সময় এসেছে। আমি আমাদের প্রধান নেতার কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম, সেই নির্দেশ পেয়ে গেছি, আর দেরি করা চলবে না। তোমরা সবাই জানো, সারা বাংলা জুড়ে যে পুলিশি তাণ্ডব চলছে, তার মূলে কে! নতুন প্রদেশের গভর্নর ব্যামফিলড ফুলার। এমনকী পূর্ববঙ্গে যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হচ্ছে, তার পেছনেও আছে সরকারের উস্কানি। নির্লজ্জভাবে তারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। ফুলার সাহেবকে এর শাস্তি পেতেই হবে। আমরা আজ এই সভায় তার প্রাণদণ্ড দেব!

সত্যেন বলল, ঠিক আছে। দিলাম তার প্রাণদণ্ড। তারপর সেটা একসিকিউট করা হবে কী করে?

বারীন বলল, আমরাই একসিকিউট করব।

দেবব্রত বলল, যে-সে লোক নয়। প্রথমেই গভর্নর! সব সময় সেপাই-সান্ত্রীরা তাকে ঘিরে থাকে। দুর্ভেদ্য সিকিউরিটি। তা ভেদ করে তার সামনে পৌঁছনো যাবে কী করে?

বারীন বলল, সে স্ট্র্যাটেজি আমি ঠিক করেছি, পরে বলছি। আগে বলো, তোমরা সবাই এই প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে একমত কি না।

কেউ আপত্তি জানাল না। শুধু দেবব্রত বলল, আমারও অমত নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। এ কাজে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তারপরেও ধরা যাক আমরা সফল হলাম। কিন্তু একজন গভর্নরকে মেরে কী লাভ হবে? তার বদলে আর একজন নতুন গভর্নর আসবে। সে হয়তো আরও কঠোর দমননীতি চালাবে।

বারীন বলল, লাভ হবে এই যে, ইংরেজ বুঝবে, বাঙালির প্রত্যাঘাত করার সাহস ও শক্তি আছে। ইংরেজের দমননীতি আমরা সহ্য করব না। এত বড় ঘটনা সব সংবাদপত্রে ছাপা হবে, পাবলিসিটি হবে। সারা দুনিয়া জানবে। ইংরেজ তাতে ভয় পেতে বাধ্য হবে।

দেবব্রত বলল, সাহেব হত্যার পরিণাম কী হয় জানো নিশ্চয়ই। মহারাষ্ট্রে চাপেকর ভাইদের ফাঁসি হয়েছিল। ইংরেজ সরকার আমাদেরও খুঁজে বার করবে, কারুকে ছাড়বে না।

বারীন বলল, আমরা অনেক সাবধানতার সঙ্গে এগুবো। তবে ওদের একজনের প্রাণের বিনিময়ে আমাদেরও একজনকে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। একজনের বদলে একজন। এবার আমাদের লাইন অব অ্যাকশন কী হবে জানাচ্ছি। প্রথমে একজন দূর থেকে ছোটলাট ফুলারকে অনুসরণ করবে কয়েকদিন ধরে। ওর ডেইলি হ্যাবিট কী সেটা বুঝে নেবে। অর্থাৎ সে কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কোথায় যায়, গাড়িতে কে কে থাকে এই সব জানা দরকার। তারপর সে ঠিক কোন জায়গায় ছোটলাটের গাড়ির খুব কাছাকাছি যাওয়া যায়, সেটা ঠিক করে নেবে। তারপর তাকে সাহায্য করার জন্য আমাদের আর একজন যাবে। এই দ্বিতীয়জনকে অ্যাকচুয়াল খুনের কাজটা করতে হবে। একে স্থানীয় লোকেরা আগে দেখেনি, তাই তাকে কেউ চিনতে পারবে না। আর প্রথমজন কাজের আগেই সরে পড়বে।

সত্যেন বলল, তা হলে দ্বিতীয়জন, যে খুনটা করবে, তার হাতেনাতে ধরা পড়ার খুবই সম্ভাবনা।

বারীন বলল, হ্যাঁ, তা ঠিক। ধরা পড়লেই তাকে আত্মহত্যার জন্য রেডি থাকতে হবে। ফাঁসির দড়িতে ঝোলার বদলে সে নিজেই দেশের জন্য প্রাণ দেবে। ওই যে বললাম, একজনের বদলে একজন! ফুলারকে যে মারবে, সে নিজে প্রাণ দিলেও চিরকালের জন্য ইতিহাসে তার নাম লেখা থাকবে।

দেবব্রত বলল, ফুলার এখন শিলং-এ।

বারীন বলল, সেইটাই তো সুবিধে। গরমকালটা ওই হারামজাদা শিলং-এই থাকবে। শিলং-এ আমার সেজদার শ্বশুরবাড়ি, বউদি সেখানেই আছেন। সেজদা চিঠি লিখে দিলে আমি শরীর সারাবার অজুহাতে ওখানে গিয়ে থাকব কিছুদিন। এতে কারুর সন্দেহ করার কিছু নেই। আমি ফুলারের গতিবিধির সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে তোমাদের জানালেই তোমরা একজনকে পাঠাবে। কাকে পাঠাবে, সেটা কি এখনই ঠিক করে ফেলা যায়?

দেবব্রত বলল, লটারি করলেই হয়। যার নাম উঠবে।

বারীন বলল, হ্যাঁ, এটা একটা ভাল প্রস্তাব। তা হলে কারুর মনেই কোনও গ্লানি থাকবে না। চার বছর আগে আমরা যে কজন দেশের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দেওয়ার শপথ নিয়েছিলাম, তাদের মধ্যেই লটারি হোক।

সত্যেন বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, হুট করে ওরকম সিদ্ধান্ত নিয়ো না। ধরো যদি দেবব্রতদার নাম ওঠে, তাঁকে পাঠানো কি ঠিক হবে? দেবব্রতদা ধীরস্থির মানুষ, তাঁর কাছে কত ব্যাপারে আমরা পরামর্শ নিই। তাঁকে এক্ষুনি মরতে দেওয়া যায় না। এমন একজনকে ঠিক করা উচিত, যার মজবুত শরীর, বয়েস কম। জোরে ছুটতে পারবে, মারার সময় হাত কাঁপবে না। আমরা যারা পত্রিকাটি চালাচ্ছি, তাদের কারুর ওপর ও কাজের ভার দেওয়া ঠিক নয়।

বারীন বলল, তা হলে সে রকম কারুর খোঁজ করতে হয়। বরিশালে উল্লাসকর দত্ত নামে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, খুব সাহসী আর জেদি, দেশপ্রেম বুকের মধ্যে টগবগ করছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করব?

সত্যেন বলল, তাতে সময় লাগবে। আমি একজনের নাম সাজেস্ট করতে পারি। মেদিনীপুরে ক্ষুদিরাম নামে একটা ছেলে আছে। দারুণ ডাকাবুকো ছেলে। ওর বাপ-মা নেই, কোনও পিছুটান নেই। সাহেবদের ওপরেও খুব রাগ। সে ছেলেটা এর মধ্যে কী কাণ্ড করছে জানো? ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরে একটা কৃষি-শিল্প মেলা হয়েছিল। সেই মেলার গেটে দাঁড়িয়ে 'সোনার বাংলা' নামে একটা নিষিদ্ধ প্যাম্ফলেট বিলি করছিল ক্ষুদিরাম। সে প্যামফ্লেটে দারুণ সব ইংরেজ-বিরোধী কথা ছিল। একজন হেড কনস্টেবল তার একখানা কাগজ পড়েই দৌড়ে এসে ক্ষুদিরামকে চেপে ধরল। টেনে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ক্ষুদিরামকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় ক্ষুদিরাম দুম করে একখানা ঘুষি চালিয়ে দিল হেড কনস্টেবলের মুখে। তখন আরও একজন সেপাই ছুটে এল। দৈবাৎ আমি সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমার মনে হল, এ ছেলেটা পুলিশকে ঘুষি মেরেছে, এবার তো ওকে পেটাতে পেটাতে শেষ করে দেবে! কিছু না ভেবেই আমি বলে উঠলাম, আরে আরে, উও ডিপটি সাহাবকা লেড়কা হ্যায়, উসকো কেঁউ পাকড়ায়া? এ কথা শুনে সেপাইরা একটু হাত আলগা করতেই ক্ষুদিরাম টেনে দৌড় মারল। ছেলেটার দারুণ সাহস!

দেবব্রত বলল, এ ঘটনা আমিও শুনেছি। এর ফলে তোমার কেরানিগিরির চাকরিটা গেছে।

সত্যেন বলল, সে যাক। এই ক্ষুদিরাম ছেলেটার বুকের মধ্যে আগুন আছে। ওকে বড় কাজে

লাগানো যায়।

বারীন বলল, ভাল কথা। তুমি ওকে রাজি করাতে পারবে?

সত্যেন বলল, আমি বললে, সে নিশ্চয়ই রাজি হবে।

বারীন বলল, ঠিক আছে, তা হলে তুমি ছেলেটাকে কলকাতায় আনিয়ে নাও! এই বয়েসের ছেলেরা অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে।

হেম এতক্ষণ পরে বলল, এখানে আমার একটা বক্তব্য আছে। ক্ষুদিরামের নেহাতই অল্প বয়েস। এখনও কৈশোর ছাড়ায়নি, এই পৃথিবীর প্রায় কিছুই সে দেখল না, জানল না। বাপ-মা মরা ছেলে ভাল করে খেতেও পায়নি কখনও, জীবনের কিছুই সে উপভোগ করেনি, তাকে আমরা জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব?

বারীন বিস্মিতভাবে বলল, সে কী! দেশের জন্য প্রাণ দেবে, সেটা গৌরবের কথা নয়?

হেম বলল, হ্যাঁ, সেটা গৌরবের বিষয় হতে পারে অবশ্যই, তার আগে তো জানতে হবে, দেশ কাকে বলে! মানুষ আদর্শের জন্য প্রাণ দেয়, সেই আদর্শটা কী তা জানতে হবে না? ক্ষুদিরাম তা জানে? ক্ষুদিরাম একটা দুরন্ত, ডানপিটে ছেলে, তার মধ্যে সেই আদর্শবোধ জাগাতে হবে না? হুট করে তাকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা সবাই নিরাপদে দূরে বসে থাকব? আমি এটা কিছুতেই মানতে পারি না।

বারীন হতাশভাবে বলল, তা হলে তো সব কিছুই পিছিয়ে গেল। আগে সেরকম একজনকে তৈরি করে নিতে হবে।

হেম বলল, না পেছোবে না। তুমি শিলং-এ গিয়ে কাজ শুরু করো, খবর পাঠালেই আমি যাব।

সবাই সবিস্ময়ে হেমের দিকে ঘুরে তাকাল।

সত্যেন বলল, তুমি? পাগল নাকি! তোমার ছেলেপুলে আছে।

হেম বলল, একটু আগে লটারির কথা বলা হল। লটারিতে আমার নাম উঠতে পারত।

সত্যেন বলল, সেইজন্যই তো লটারির কথাটা বাতিল করেছি। অন্য ছেলে খুঁজতে হবে। তুমি বিয়ে করেছ, সংসারী মানুষ।

হেম বলল, হ্যাঁ, আমি বিয়ে করেছি বটে, ছেলেপুলেও হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই সংসারী হতে পারিনি। আমি চলে গেলেও ওদের কিছু ক্ষতি হবে না। ও কাজটা আমিই করব ঠিক করে ফেলেছি।

এবার সকলে আপত্তি জানাতে লাগল। শুরু হল তর্ক। হেমকে কিছুতেই বাগ মানানো যায় না। একসময় হেম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শোনো, আমি শেষ কথা বলছি। আমি নিজের সঙ্গে নিজে বাজি ধরেছি। ফুলার সাহেবকে যদি মারতে হয়, তা হলে আমাকেই যেতে হবে। তোমরা যদি রাজি না হও, বারীন যদি আমাকে সঙ্গে নিতে না চায়, তা হলে আমি একাই যাব। নিশ্চিত যাব। ক্ষুদিরামের মতন ছেলে তোমরা কজন পাবে? যে আগুন জ্বলবে এরপর, তাতে সংসারী লোকরাও বাদ যাবে না!

এরপর আর কোনও কথা চলে না।

দিন তিনেক বাদে ভোরবেলা হেম এল ভরতের সঙ্গে দেখা করতে। হেম এখন আর মেসে থাকে না, তার এক ছেলে অসুস্থ বলে তার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে, সকলে মিলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। পত্রিকা অফিসেও হেমকে কয়েকদিন দেখেনি ভরত।

শেষ রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এ ঘরটার একটা জানলার কাচ ভাঙা, সেখান থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসে। সে জন্য ভোরেই ভরতের ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু ভাঙা কাচটা বন্ধ করার কোনও উপায় নেই।

ভরতের ঘরটি দোতলায়। পাশেই একটা একতলার ছাদ, ভরতের ঘরের জানলা দিয়ে সেটা দেখা যায়, কিন্তু সে ছাদে কারুকে ভরত কখনও যেতে দেখেনি, কীভাবে যাওয়া যায় তাও সে জানে না। অনেকে নিজেদের ঘর থেকে সেই ছাদটায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে আবর্জনা ফেলে। বাথরুমের অব্যবহৃত সেই

ছাদটির আবর্জনার মধ্যে কয়েকটি গাছ গজিয়েছে, তাতে ফুটেছে ফুল। ভরত গাছপালা, ফুলফল বেশ চেনে। ওগুলো নয়নতারা ফুল। কী করে ওই আবর্জনার স্তূপে জন্মাল।

ভরত একমনে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ফুলগুলো দেখছে, কখন যে হেম তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সে খেয়ালও করেনি, হেম তার কাঁধে হাত রেখে বলল, কী ব্রাদার, কী খবর? এত সাততাড়াতাড়ি উঠে পড়েছ যে!

ভরত মুখ ফিরিয়ে বলল, কে ও, তুমি! তুমিও তো এত সকালে বেরিয়ে পড়েছ? ছেলে কেমন আছে? জ্বর কমেছে?

হেম বলল, হ্যাঁ, এখন ভাল আছে। ওদের মেদিনীপুরে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

ভরত বলল, দেখো হেম, এই ছাদটা, দেখলেই বোঝা যায়, ওখানে অনেকদিন কেউ যায় না। তবু ওখানে আপনি আপনি গাছ হয়েছে, কী সুন্দর ফুল ফুটেছে।

হেম অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ।

ভরত বলল, আমি রোজ জানলা দিয়ে ওই ফুলগাছগুলো দেখি। এই কদিন একটানা রোদে ওরা কীরকম যেন ম্লান হয়েছিল। কাল যেই বৃষ্টি হয়েছে, ওদের রূপ কত খুলে গেছে। লতাগুলো চকচকে হয়েছে, আর ফুলগুলো যেন খুশিতে হাসছে। ঠিক যেন এক ঝাঁক বাচ্চা মেয়ে।

হেম বলল, ভরত, তোমার মেদিনীপুরে ফিরে যাওয়া উচিত। আমি তোমাকে আটকে রেখেছি। তুমি গাছপালা এত ভালবাস, এই রুক্ষ শহরে তোমার মাসের পর মাস থেকে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তোমার খামারের গাছগুলোও তোমার বিরহে নিশ্চয়ই কাতর হয়ে আছে।

ভরত বলল, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। গাছের যে প্রাণ আছে, তা তো সবাই জানে। আমাদের জগদীশবাবু গাছপালার নানারকম চেতনার কথা যে বলেছেন, তা আমিও যেন অনুভব করেছি। গাছেরা মানুষদের লক্ষ করে, মানুষের মধ্যে কে তাদের বন্ধু, তাও চেনে। মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়, আমার খামারের গাছগুলো আমায় ডাকছে।

হেম বলল, তা হলে তুমি এখানকার পাট গুটিয়ে ফেল। আমাকেও একবার পূর্ববাংলায় যেতে হবে, একটা কাজ আছে, বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকব না।

ভরত জিজ্ঞেস করল, পূর্ববাংলায় তোমার কী কাজ? তুমিও কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুর চলো।

হেম বলল, সেটা সম্ভব নয়। দু-চারদিনের মধ্যেই আমায় রওনা হতে হবে। তুমি আমার বাড়ির লোকজনদের একটু দেখাশুনো কোরো।

এরপর চা এল। গল্প হল কিছুক্ষণ। হেম হঠাৎ পূর্ববঙ্গে যাচ্ছে কেন, তা বুঝতে পারল না ভরত। কারণ হিসেবে হেম বলল বটে যে, ঝালকাঠিতে তার এক অসুস্থ আত্মীয়ের সেবা করতে যাবে, কিন্তু সেটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। হেমের নিজের ছেলেই বেশ রুগ্‌ণ, তাকে ফেলে সে যাচ্ছে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সেবা করতে, এ কেমন মানুষ?

বিদায় নেওয়ার সময় হেম বলল, আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জানি না। তুমি মেদিনীপুরের দিকটা সামলে রেখো। আমাদের সমিতির ছেলেরা যেন কাজকর্ম চালিয়ে যায়।

তিন দিন পরই শিলং থেকে হেমকে পাঠাবার জন্য বারীনের নির্দেশ এল। কয়েকটা জামাকাপড় ও দুটি রিভলবার একটা পুঁটুলিতে বেঁধে তৈরি হয়ে নিল হেম। বোমা দুটি বারীন সঙ্গে নিয়ে গেছে। সব ব্যাপারটাই অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে, মাত্র তিনজন ছাড়া অন্য বন্ধুরাও কিছু জানে না।

শিয়ালদা স্টেশনে হেমকে পৌঁছে দিতে এসেছে ভূপেন। এই ট্রেন গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাবে, প্রতিটি কামরাতেই বেশ ভিড়। আগেই একটা কামরার ওপরের বাঙ্কে চাদর বিছিয়ে দখল বজায় রেখেছে হেম, কিন্তু ভেতরে এমন গুমোট ভাব যে বসে থাকা যায় না। ট্রেন ছাড়তে দেরি করছে, দুজনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

ভূপেন মাঝে মাঝেই অদ্ভুতভাবে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকছে হেমের দিকে। তাতে অস্বস্তি বোধ করছে হেম। একবার সে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, তুমি আমার মুখের দিকে কী দেখছ?

ভূপেন বলল, কেমন যেন বিচিত্র লাগছে। একজন বন্ধুকে চিরবিদায় জানাতে এসেছি। তোমার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না, এটা এখনও মেনে নিতে পারছি না।

হেম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ধ্যাৎ! ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

ভূপেন বলল, আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি কেন যাচ্ছ? তোমার অ্যাকশন যদি সাকসেসফুল হয়, সেই ডিস্ট্রিক্টের কাছাকাছি অনেক গার্ড থাকবে, তারা মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে ঘিরে ফেলবে, তারপর তোমার বাঁচার কোনও আশাই থাকবে না!

হেম হালকাভাবে বলল, সে তখন দেখা যাবে। মোট কথা, প্রাণ থাকতে আমি ধরা দেব না কিছুতেই।

ভূপেন বলল, সব জেনেশুনেই তুমি যাচ্ছ। এটা কি শুধুই দেশপ্রেম, না মৃত্যুবিলাস? কারুর ওপর তোমার অভিমান আছে?

হেম এবার হেসে ফেলে বলল, ওসব কিছুই না। কারুকে তো শুরু করতেই হবে। সেই প্রথম হবার অধিকারটা আমি ছাড়ি কেন?

ভূপেন বলল, তুমি হাসছ এখনও!

হেম বলল, কান্নাকাটি একদম বাদ। ফ্যাঁচফ্যাঁচানি আমি সহ্য করতে পারি না।

ভূপেন হেমের একটা হাত চেপে ধরে বলল, একটা কথা বলব, তুমি কিছু মনে করবে না?

হেম বলল, না, না, মনে করব কেন, তুমি বলো, যা খুশি বলো।

ভূপেন তবু বিহ্বলের মতন চুপ করে রইল।

হেম বলল, কী হল বলো? বলো! যা তোমার মনে আসে—

ভূপেন বলল, এই কথাটা অনবরত আমার মাথায় ঘুরছে। তোমাকে এভাবে বলা হয়তো উচিত নয়, তবু বলি। পরকাল বলে কি কিছু আছে? মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? মৃত্যুর পর কোনও মানুষের কাছ থেকেই আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তুমি একটা বন্ধুর কাজ করবে। তুমি তো মরতেই যাচ্ছ, মৃত্যুর পর যদি কিছু থাকে, তবে কোনও গতিকে আমাকে একবার তা জানিয়ে দেবে, এই প্রতিজ্ঞা করো।

হেম ঘোরতর নাস্তিক। সে আত্মার অস্তিত্ব, পরকাল, স্বর্গ-নরক এর কোনও কিছুই বিশ্বাস করে না। সে হো-হো করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, ভূপেনের মুখে তীব্র ব্যাকুলতার ছাপ দেখে হাসি দমন করল। নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, তুমি পরকালে বিশ্বাস করো, না?

ভূপেন বলল, কেমন যেন সংশয় আছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, অথচ কেমন যেন....তুমি ঠিক খবরটা দিলে বুঝতে পারব।

হেম বলল, এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার দাদা স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু। তিনি সারা বিশ্বে ঘুরে ঘুরে আধ্যাত্মিকতা প্রচার করলেন, আত্মার অবিনশ্বরতার কথা বোঝালেন, আর তিনি নিজের ছোট ভাইয়ের মনের সংশয় ঘোচাতে পারলেন না।

গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিলেন, ট্রেনের গা মুচড়ে উঠল। আর সময় নেই। হেম ভূপেনকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আন্তরিক গলায় বলল, যদি পরকাল বলে কিছু থাকে, সেখানে গিয়ে সে কথা মর্ত্যলোকে জানালে যদি কিছু শাস্তির ব্যবস্থা থাকে, এমনকী যদি অনন্ত কুম্ভীপাকেও চিরকাল বাস করতে হয়, তবু কোনওক্রমে আমি সে কথা তোমাকে নিশ্চয়ই জানাব।

তারপর দৌড়ে সে চলন্ত ট্রেনে নিজের কামরায় উঠে পড়ল।

এরপর হেম খানিকক্ষণ মনে মনে হাসল। ভূপেনের মুখ থেকে এরকম কথা শুনবে সে আশা করেনি। যুগান্তরের অনেকেই বেশ ধার্মিক। জপ-তপ, পুজো-আচ্চা করে। এমনকী পত্রিকার অফিসেই কেউ কেউ প্রার্থনায় বসে যায়। বারীনের দাদা অরবিন্দ ঘোষ, প্রকৃতপক্ষে সকলের নেতা, তিনি ঘোরতর হিন্দু হয়ে উঠেছেন, বারীন তাঁর নির্দেশে এখন জপ করে। পত্রিকার মলাটে খাঁড়া হাতে কালীর ছবি। উপেন গেরুয়া পরে। নরেন গোঁসাইয়ের আচরণও সন্ন্যাসীর মতন। শুধু হেম আর ভরতের মতন দু-তিন জন ওসবের ধার ধারে না। ভূপেনও বরাবর যুক্তিবাদী। ভক্তি বনাম

যুক্তি নিয়ে তর্ক হয় যখন তখন। কার্ল মার্কস নামে একজন দার্শনিকের কথা ভূপেন বলে মাঝেমাঝে। সমাজতন্ত্র নামে একটা নতুন ভাববাদে সে বিশ্বাস করে। সেই ভূপেনের মনেও পরকাল নামে সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক রূপকথা সম্পর্কে একটু একটু বিশ্বাস আছে!

সারারাত ভাল করে ঘুম এল না হেমের। ভূপেনের কথাটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। অনবরত সে একই দৃশ্য দেখছে। শিলং পৌঁছবার পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তাকে লাটসাহেবের মুখোমুখি হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দুড়ুম, দুড়ুম! পর পর বারোখানা গুলি চালাবে, তারপর দুটো বোমা। লাটসাহেব খতম! তখনই হেম আত্মহত্যা করবে। সে সময়টুকুও যদি না পায়, তা হলে বডি গার্ডরাই তাকে গুলি করে মারবে। কিংবা আধমরা করে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবে। সে না হয় হল, কিন্তু তারপর? তারপর কি কয়েকটা যমদূত তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে যমরাজের কাছে? থিয়েটারের ব্যাক ড্রপে যেরকম স্বর্গের দৃশ্য আঁকে সে রকম কিছু সত্যিই আছে?

আধো ঘুমের মধ্যে হেম মাথা নেড়ে বলে, না, না, ওসব কিছু নেই। মৃত্যু মানেই সব শেষ। তবু ওই দৃশ্যটা ফিরে ফিরে আসে চোখের সামনে।

ট্রেন ভোরবেলা এসে পৌঁছল গোয়ালন্দে। লোকজনের ভিড়, চ্যাঁচামেচি, ঠেলাঠেলি। হেম চায়ের জন্য খোঁজাখুঁজি করছে, পেছন থেকে কেউ তার কাঁধে হাত রাখল।

মুখ ফিরিয়ে ভূত দেখার মতন চমকে উঠল হেম। ভরত।

সে বলল, এ কী! তুমি কোথা থেকে!

একগাল হেসে ভরত বলল, পূর্ববঙ্গে আমারও বিশেষ কাজ আছে।

হেম রীতিমতন রেগে গিয়ে বলল, চালাকি কোরো না! এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! তুমি জানলে কী করে? তার মানে, আরও অনেকে জেনে গেছে?

ভরত বলল, না। আমি নিজেই কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। ফুলার সাহেবকে শাস্তি দেবার কথা মাঝে মাঝেই উঠেছে। ফুলার এখন শিলং-এ, বারীনও সেখানে গেছে। তুমিও যাচ্ছ। আমি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়েছি। তারপর সত্যেনকে চেপে ধরেছি। সত্যেন বিশ্বাস করে আমাকে প্ল্যানটা জানিয়েছে।

হেম বলল, তবু তোমার এভাবে আসা উচিত হয়নি। তুমি পরের ট্রেনেই ফিরে যাও।

ভরত মাথা নেড়ে বলল, উঁহুঃ। ফেরার প্রশ্নই উঠছে না। তোমাদের অ্যাকশন প্ল্যানে ভুল আছে। আততায়ী একজনের বদলে দু'জন রাখতে হয়। তা হলে নিশ্চিত হওয়া যায়। ধরো, ঠিক সময় বোমা ফাটল না, তোমার গুলি ফস্কে গেল। তখন দ্বিতীয়জন গুলি চালাবে। তোমার পাশে আমি থাকব। তা হলেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট পাওয়া যাবে।

হেম বলল, এটা ছেলেখেলা নয় ভরত। জীবন-মরণের প্রশ্ন। তুমি কেন প্রাণ দিতে যাবে?

ভরত বলল, তুমি কেন যাচ্ছ?

হেম বলল, আমার কথা আলাদা। আমি নিজের সঙ্গে বাজি ধরেছি। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছি সেটা আমাকে পারতেই হবে। এটা আমার নিজস্ব চ্যালেঞ্জ। তুমি শুধু শুধু কেন মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে যাবে। তুমি ফিরে যাও। পরে তোমাকে অন্য দায়িত্ব নিতে হবে।

ভরত বলল, হেম, আমি কতবার মৃত্যুর কাছাকাছি গেছি, তা তুমি জানো না। আমার বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের। নিয়তি আমাকে নিয়ে এক অদ্ভুত খেলা খেলছে। বারবার ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। এবার আমি নিজেই এগিয়ে যাব, দেখি কী হয়! তোমার বদলে আমার পক্ষেই এই ঝুঁকি নেওয়া স্বাভাবিক। এই বিশ্বসংসারে আমার কেউ নেই, আমার জীবনের কী দাম আছে! কেউ আমার জন্য কাঁদবে না। আমি হারিয়ে গেলেও কেউ আমার কথা মনে করবে না। তুমি দুটি সন্তানের বাবা, তোমার স্ত্রী রয়েছে, তাদের ফেলে তুমি কেন অকালে চলে যাবে? ফুলার সাহেবকে মারার পর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি পালাবে। তোমাকে বাঁচতেই হবে। সেইজন্যই আমি এসেছি।

হেম বলল, আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি এসেছ ? হঠাৎ তোমার এই আত্মত্যাগের সেন্টিমেন্ট উথলে উঠল কেন ? তুমি গাছপালা ভালবাস, ওদের নিয়েই তো থাকলে পারতে।

ভরত বলল, আমি গাছপালা ভালবাসি বলে মানুষকে ভালবাসতে পারব না ? তুমি গোঁয়ারের মতন মরতে যাচ্ছ জেনেও আমি কোনও ফুলগাছের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকব !

স্টিমারঘাটায় কত রকমের মানুষ যাওয়া আসা করছে, এরই মধ্যে দুটি যুবক চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে কী বিষয়ে তর্ক করছে, তা কেউ ধারণাও করতে পারবে না। কে আগে প্রাণ দেবে, তার প্রতিযোগিতা। হেম কিছুতেই তার দাবি ছাড়তে চায় না, ভরতও তাকে আড়াল করে রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর আগে বন্ধুত্বের ব্যাপারে এরা দু'জন তেমন আবেগ দেখায়নি। তুমি থেকে তুই সম্বোধনেও নামেনি। আজই হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল, এদের বন্ধুত্ব এমনই এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যে পরস্পরের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দু'জনেই নিজের জীবন দিতে রাজি।

এই গোয়ালন্দ থেকেই গৌহাটি যাবার স্টিমার ছাড়বে। আরও ঘণ্টা তিনেক বাকি আছে। স্টিমারটির নাম আসাম মেল, নোঙর করা আছে এক পাশে, সেদিকে তাকিয়ে ভরতের মনে পড়ল তার মায়ের কথা। স্মৃতিতে মায়ের কোনও মুখ নেই, আসামের মানচিত্রই যেন সেই মা। এই প্রথম ভরত আসামে যাচ্ছে। নিয়তিই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে ? মায়ের কোলে গিয়ে ভরত চিরঘুমে ঘুমোবে ?

রাত্রে কিছু খাওয়া হয়নি, হেমের খিদে পেয়ে গেছে। পরপর সব হোটেল, ধোঁয়া বেরুচ্ছে কয়েকটা থেকে, এর মধ্যেই আঁচ পড়ল উনুনে। খানিক বাদে হেম বলল, স্টিমারে কী খাবার পাওয়া যাবে না যাবে কে জানে ! এখানেই ভাত খেয়ে নিলে হয় না ? অনেকেই তো হোটেলে ঢুকছে দেখছি।

ভরত বলল, গোয়ালন্দের হোটেলের ভাত আর ইলিশের ঝোল খুব বিখ্যাত শুনেছি। চলো খেয়ে নিই, আর তো কোনওদিন এখানে আসা হবে না। যা যা সাধ আছে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

হেম বলল, হ্যাঁ চলে যাবার আগে একবার প্রাণ ভরে ইলিশ খেয়ে নেওয়া অবশ্যই উচিত।

মোটামুটি পছন্দ করে ওরা একটা হোটেলে ঢুকল। মাটির মেঝেতে চাটাই পাতা, সঙ্গে কলাপাতা। এর মধ্যেই আট-দশজন লোক খেতে শুরু করেছে। একটি ছোকরা ওদের খাতির করে বসাল। ভরত অর্ডার দিল, দু'খানা করে ইলিশ মাছ আর অনেক ঝোল আর ভাত, আর কিছু না। পেটির মাছ দেবে।

কলাপাতার ওপর লালচে রঙের ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ভাত ঢেলে দিল এক রাশ। কলাই করা প্লেটে দুটি করে মাছ ও লাল টকটকে ঝোল।

হেম খুশি হয়ে বলল ওরেব্বাস ! এত বড় বড় পেটির মাছ ! আমাদের ওদিকে পাওয়া যায় না !

ভরত বলল, এ হল পদ্মার ইলিশ। এর স্বাদই আলাদা।

হেম সবটুকু ঝোল ভাতে ঢেলে দিয়ে মেখে নিল। এক গেরাস মুখে দিয়ে বলল বাঃ ! সুন্দর রান্না।

দ্বিতীয় গেরাস মুখে দেবার পর চিবোতে ভুলে গেল। মুখের চেহারা বদলে গেল তার। চোখ দুটি বিস্ফারিত, মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে। সে কোনওক্রমে বলল, ওরে বাবা, কী ঝাল ! ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। ওঃ ওঃ, জল, একটু জল খাব।

মাটির গেলাসে জল এনে দেওয়া হল, তাতেও তার ঝাল কমে না। সে মেদিনীপুরের লোক, সেখানকার রান্নায় মিষ্টি দেয়, ঝাল খাওয়ার একেবারে অভ্যেস নেই। ভরতের অসুবিধে হচ্ছে না।

হেম মাথা থাবড়াচ্ছে, অন্য খদ্দেররা হাসছে তাকে দেখে। দরজার কাছে ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছে ম্যানেজার, সেও হাসছে। হেম তার দিকে তাকিয়ে বলল, কী মশাই, এ কী রেঁধেছেন : এটা রান্না, না বিষ ? এত ঝাল মানুষে দেয় ! আমি মরে যাচ্ছি যে।

ম্যানেজার হাসি মুখে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিয়ে বলল, মরিচ যদি না খাইবার পারস, তয় এহানে আইছ কিয়ত্তি ? দ্যাখছস না, এহানে এততগুলা লোক পত্তিদিন খাইছে, কই কেউ তো কহনও মরিচ

খাইয়া মইর‍্যা যায় না !

ধমক খেয়ে চুপসে গেল হেম। ভরত স্মিত হাস্যে তার দিকে চেয়ে বলল, না ব্রাদার, মরিচ খেয়ে মরে গেলে তো আমাদের চলবে না। ইলিশ মাছ মাথায় থাকুক, চলো আমরা মিষ্টি খাই।

৮১

যাত্রীবাহী স্টিমারটিতে প্রচণ্ড ভিড়। ডেকে তিল ধারণের জায়গা নেই, হাঁটাচলা করাই শক্ত। আগে-ভাগে যারা রেলিং-এর ধারে মাদুর বা সতরঞ্চি পেতে কিছুটা স্থান দখল করে নিয়েছে, তারা ভাগ্যবান। নীচের খোলে মানুষের ঠাসাঠাসিতে প্রায় দমবন্ধ হবার মতন অবস্থা। এরই মধ্যে কাচ্চাবাচ্চাদের যখন তখন কান্না, কিছু কিছু যাত্রীর পায়ে পা লাগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বিবাদ। কোথাও কোথাও বিবদমান দু' পক্ষকে দেখে মনে হয়, এই বুঝি হাতাহাতি, ঘুঁষোঘুঁষি শুরু হবে, তা অবশ্য হয় না, তবে সেই ঝগড়াতে অনেকটা সময় কেটে যায়। গৌহাটি পৌঁছতে চার দিন লেগে যাবে, একঘেয়ে যাত্রা, সময় কাটানোই প্রধান সমস্যা।

ভরত আর হেম প্রথমে একটু বসারও জায়গা পায়নি, সারেঙ-এর ক্যাবিনের কাছে কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল। দু'-জনের কাঁধে দুটি সতরঞ্চি মোড়া পুঁটুলি, তার মধ্যেই রয়েছে মোট তিনখানি রিভলবার ও গুলির বাণ্ডিল। গোয়ালন্দের ঝাল রান্না খেয়ে হেম বেশ কাহিল হয়ে গেছে, পেটের অবস্থা শোচনীয়, মুখেও সেই ছাপ পড়েছে। কথাবার্তা বন্ধ, দু'জনে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে।

কাছেই চার পাঁচজন যুবকের একটি দল মাদুর বিছিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে বসেছে, হইহই করে তাস খেলছে। তাদের পাশে অন্য কেউ বসবার চেষ্টা করলেই খেঁকিয়ে উঠছে, এমনকী ঠেলে সরিয়ে দিতেও দ্বিধা করছে না। এ যেন অনেকটা গায়ের জোরে ভূমি দখলের মতন। ঘণ্টা তিনেক কেটে যাবার পর সেই দলের একজন ভরতকে জিজ্ঞেস করল, দাদারা কি সারা রাত এক ঠ্যাঙে খাড়া হয়েই কাটিয়ে দেবেন নাকি ?

এই দু'জন যে অন্য যাত্রীদের মতন জায়গা খোঁজার জন্য একবারও ছোটাছুটি করেনি, তাতেই ওরা স্বতন্ত্র ও দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আগেই ওরা ঠিক করে নিয়েছিল, নিছক ভদ্রতার কথা ছাড়া কোনও সহযাত্রীর সঙ্গেই ভাব জমাবার চেষ্টা করবে না। পূর্ববঙ্গের লোকেরা যেমন অতিথি-পরায়ণ, তেমনই কৌতূহলী। কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন, কেন যাবেন, বাড়ি কোথায়, এই সব প্রশ্ন করতে করতে তারা সাতপুরুষের ঠিকুজি-কুষ্ঠি না জানা পর্যন্ত নিবৃত্ত হয় না। এবং জোর করে বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে চায়।

লোকটির প্রশ্ন শুনে ভরত শুধু একটুখানি হাসির উত্তর দিল।

সেই লোকটি আবার বলল, তাস খেলতে জানেন নাকি, তা হলে এসে বসুন, দু' হাত হয়ে যাক।

ভরত তাস-পাশা কিছুই খেলতে শেখেনি। হেম অবশ্য জানে, কিন্তু এখন তার খেলার মতন মর্জি নেই। ওরা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।

লোকটি বলল, আপনারা বেডিং ঘাড়ে করে বইছেন কেন, ওগুলো অন্তত এখানে নামিয়ে রাখুন।

ভরত বলল, না, আপনাদের খেলার অসুবিধে হবে। আমরা ঠিক আছি।

লোকটি এবার উঠে এল ওদের পাশে। অন্য যাত্রীদের একবার দেখে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, এই স্টেশনের পরের স্টেশন, রাত্তির ন'টার সময় আমরা নেমে যাব। আগে থেকে আপনারা আমাদের জায়গায় বসে পড়ুন, নইলে সে সময় কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যাবে।

এ রকম অযাচিত সাহায্য ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। সারা রাস্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার চিন্তায়

মনের মধ্যে বেশ বিরক্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। ভরতরা এসে বসতেই এরা তাস খেলা বন্ধ করে প্রশ্ন শুরু করে দিল। রাশি রাশি মিথ্যে কথার আশ্রয় নিতে হল ভরতকে। হেম ঝিম মেরে রইল।

যুবকেরা নেমে যাবার পর বিছানা পেতে পা ছড়িয়ে বসে ভরত বলল, শুভ সূচনা! ভাগ্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন মনে হচ্ছে। রাত্তিরে আমাদের ভাল করে ঘুমোতে হবে, শরীর পুরোপুরি সুস্থ রাখা দরকার।

হেম বলল, তা হলে আমি এখনই ঘুমিয়ে পড়ি।

ভরত বলল, সে কী! কিছু খাবে না? ভারী মনোরম রান্নার সুবাস আসছে। আমার তো পেট চনমন করছে।

হেম বলল, ও তো মুসলমান খালাসিদের ক্যান্টিন।

ভরত বলল, তাতে কী! আমাদের তো এখন আর কোনও নিয়ম-কানুন মানার বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা যা খুশি খেতে পারি।

হেম বলল, সে জন্য বলছি না। মুসলমানরা নিশ্চয় আরও বেশি ঝাল দেয়। আমার মেদিনীপুরি পেটে ও ঝাল সহ্য হবে না। তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি খেয়ে এসো।

ভরত বলল, গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারছি, কুক্কুট মাংস। একেবারে অমৃত! কোনও হিন্দুর দোকানে তো ও জিনিস পাবে না। ঝাল হলেই বা কী, জলে ধুয়ে নেবে! তুমি ওই নিষিদ্ধ পক্ষীটি কখনও খেয়েছ?

হেম বলল, একবার খেয়েছি। বাজি ফেলে। আমাদের ওখানে এক পণ্ডিতমশাই বলে বেড়াতেন যে মুরগি খেলে নাকি কুষ্ঠ হয়। সেই জন্যই হিন্দুরা মুরগির ডিম পর্যন্ত খায় না। সেই পণ্ডিতমশাইকে তোমার ওই খামরবাড়িতে একদিন ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর তার সামনে একটা ঝলসানো মুরগির ঠ্যাঙে কামড় দিয়ে বলেছিলাম, এই যে খাচ্ছি, দেখি কতদিনে আমার কুষ্ঠ হয়। তা দেখে পণ্ডিতমশাই চোঁ-চা দৌড়।

ভরত হাসতে হাসতে বলল, মুসলমান মোল্লারাও শুয়োরের মাংস সম্বন্ধে ওই রকম আজগুবি কথা বলে। সাহেব জাতটা গরু-শুয়োর-মুরগি খেয়ে ভুষ্টিনাশ করছে, কই তাদের তো কুষ্ঠ হয় না, জাতও যায় না। মানুষের যা খেতে ভাল লাগে, তাই খাবে। কথায় বলে, আপ রুচি খানা। খাদ্য নিয়ে কোনও সংস্কার থাকা কাজের কথা নয়। মুরগির মতন এমন সুখাদ্য আর কখনও খাওয়ার সুযোগ পাব না বোধহয়, চলো, সাধ মিটিয়ে খেয়ে আসি।

দীর্ঘ যাত্রাপথ, তাই স্টিমারে বেশ কয়েকটি খাবারের দোকান আছে। হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। অনেক যাত্রীই সঙ্গে চিঁড়ে-খই, গুড়-কলা নিয়ে আসে, তাই দিয়ে জঠর পূর্তি করে। হিন্দুদের দোকানগুলিতে পাওয়া যায় মোয়া, জিলিপি-অমৃতি, নারকোল তক্তি, বাসি লুচি-তরকারি। মুসলমান খালাসিরা একটা ক্যান্টিন চালায়, সেখানে গরম গরম ভাত আর ইলিশের ঝোল বা মুরগির ঝোল। হিন্দুদের কাছে নিষিদ্ধ হলেও কোনও কোনও হিন্দু যাত্রী লোভে লোভে লুকিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ে।

সত্যিই মুরগির ঝোলের অপূর্ব স্বাদ হয়েছে। ঝাল আছে ঠিকই, ভরতের তাতে অসুবিধে নেই। সে খেয়ে নিল অতি সন্তোষের সঙ্গে। হেম মাংসের টুকরোগুলি ধুয়ে নিল জলে, ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত তার বিশেষ পছন্দ।

ভরত বলল, যে ক'দিন আমরা স্টিমারে থাকব, দু' বেলাই এখানে খাব। ভাল খাওয়া আর ভাল ঘুম, এখন বিশেষ প্রয়োজন। ব্যারিস্টার রসুল সাহেবের বাড়িতে আমার এক বন্ধু ইরফানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মনে আছে? ওই ইরফান আমাকে অনেকবার মুরগি রেঁধে খাইয়েছে। এক সময় আমরা খুব বন্ধু ছিলাম। সেই ইরফান এখন বদলে গেছে।

হেম জিজ্ঞেস করল, ওর সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল?

ভরত বলল, হ্যাঁ, আরও দু'বার। দেখা হলেই তর্ক হয়। ইরফান এখন ঢাকায়। আমায় বলে গেল, নবাব সলিমুল্লার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সে একটা পার্টি গড়তে চায়। যে পার্টি শুধু

মুসলমানদের স্বার্থ দেখবে, নাম হবে মুসলিম লিগ।

হেম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শুধু মুসলমানদের জন্য পার্টি! এতদিন এ দেশে শুধু ধর্মের নামে কোনও দল ছিল না। মুসলিম লিগ নামে কোনও পার্টি যদি সত্যিই চালু হয়, তা হলে রেষারেষি করে হিন্দুরাও কোনও দল খুলবে! মুসলিম লিগ বনাম হিন্দু লিগ। তাতে ইংরেজরা খুশি হয়ে বগল বাজাবে। ওরা তো এটাই চায়। আমরা ওদের হাতের পুতুল হয়ে খেলছি। ওরা আঙুল নাড়বে, আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করব।

ভরত বলল, ইরফান বলে, তোদের একটা হিন্দু দল তো অলরেডি আছে। নামে না হলেও কংগ্রেসটাই তো একটা হিন্দু দল। আমি যত বলি, কংগ্রেসে অনেক মুসলমান আছে, তারাও বিবেকবান, বুদ্ধিমান, ইরফান সে কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। শেষ যেদিন দেখা, সেদিন বলল, তোরা যে ছোট ছোট গুপ্ত দল পাকাচ্ছিস, তাও আমরা জানি। তোরা সব বঙ্কিমচন্দ্রের চেলা হয়েছিস। জায়গায় জায়গায় আনন্দমঠ গড়তে চাস। তোরা এক একজন জীবানন্দ, সত্যানন্দ হয়ে হিন্দু শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিস, তাতে আমরা হাত মেলাতে যাব কী দুঃখে! বঙ্কিমবাবু ওই আনন্দমঠে 'মার মার ইংরেজ মার' কেটে দিয়ে 'মার মার যবন মার' করেছিলেন, তোর মনে নেই? তোরা ভুলে গেলেও আমরা ভুলব কী করে?

হেম বলল, কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। আমাদের নেতারা হিন্দুয়ানির বাড়াবাড়ি করে মুসলমানদের দূরে ঠেলে দিচ্ছেন তো বটেই। এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। শিলং থেকে ফিরে গিয়ে নেতাদের বোঝাব। বারীনের দাদা অরবিন্দবাবুকেই আমরা প্রধান নেতা বলে মানি, তিনি দিন দিন যে-রকম গোঁড়া হিন্দু হয়ে উঠছেন—

ভরত বলল, শিলং থেকে ফিরে গিয়ে? আমরা ফিরব?

দু'জনেই হঠাৎ থেমে গেল। তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

দিনের বেলা উৎকট গরম ছিল, এখন বাতাস বেশ আরামদায়ক। কৃষ্ণপক্ষের রাত, কিছুই দেখা যায় না, শুধু স্টিমারের গতিপথে নদীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির শব্দ শোনা যায়। আকাশ একেবারে অদৃশ্য।

খেয়েদেয়ে এসে হেম আগে শুয়ে পড়ল। ঘুমও এসে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাদে কী কারণে যেন জেগে উঠল সে। পাশে তাকিয়ে দেখল, ভরত তখনও শোয়নি। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে বসে আছে।

স্টিমারের আর সব যাত্রী যে-যেখানে পারে শুয়ে পড়েছে, অনেকে বসে বসে ঢুলছে। একজনও জেগে নেই, শোনা যাচ্ছে নানা রকম নাসিকাধ্বনি।

হেম ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, এ কী ভরত, তুমি শোবে না? তুমিই যে বলেছিলে, আমাদের ভাল ঘুম দরকার।

উত্তর না দিয়ে ভরত মুখ ফেরাল। একটু চমকে উঠল হেম। হঠাৎ যেন ভরতের মুখখানি অচেনা হয়ে গেছে। এত কাছে, তবু ভরতের দৃষ্টির মধ্যে যেন অনেকখানি সুদূর। একটা ঝোলানো হ্যাজাক বাতি দুলছে অনবরত, তার আলো-ছায়া খেলা করছে সর্বাঙ্গে।

একটুক্ষণ পরে ভরত ধীর স্বরে বলল, গৌহাটি পৌঁছোতে চার দিন লাগবে। সেখান থেকে শিলং যেতে আর একদিন। তার পরদিনই অ্যাকশান শুরু করতে পারি। ধরা যাক, যদি আরও একদিন বেশি লাগে, তা হলে মোট সাতদিন। এই সাতদিন আমাদের আয়ু আছে।

হেম কিছু না বলে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল বন্ধুর দিকে।

ভরত আবার বলল, যদি একজন দেবদূত এখন এসে বলে, তোমাদের আর সাতদিন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, এর মধ্যে যদি বিশেষ কোনও সাধ-আহ্লাদ থাকে, মিটিয়ে নিতে পারো—তা হলে তুমি কী চাইবে, হেম?

হেম বলল, উঁ, সাধ-আহ্লাদ, মানে, সে রকম ঠিক ভেবে দেখিনি, কারুর কাছে কিছু চাইবার, মানে, আসল কথাটা কী, আমি ওসব দেবদূত-টেবদূতে বিশ্বাস করি না।

ভরত বলল, আমিও যে ঠিক বিশ্বাস করি, তা নয়। তবে ছেলেবেলা থেকে শুনতে শুনতে মনের মধ্যে কিছু কিছু ছাপ পড়ে যায়। আচ্ছা, দেবদূত না হয় না-ই এল, তোমার কোনও অপূর্ণ সাধের কথা মনে পড়ে না ?

হেম বলল, আমরা চলেছি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, এর মধ্যে তো আর কোনও সাধ মেটাবার উপায় নেই। সে রকম কিছু অপূর্ণ সাধ... নাঃ, আমার কোনও কিছুতে লোভও নেই, অতৃপ্তিও নেই। ভরত, তুমিই বরং বলো, তোমার কী অপূর্ণ সাধ ?

ভরতের চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল, মাথা দোলাতে লাগল দু'দিকে। সে মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। একটি নারীর মুখ চকিতে চকিতে তার মনে পড়ে যাচ্ছে। সে নয়নমণি নয়, সে অনেকদিন আগের দুঃখিনী ভূমিসূতা।

হেমের ঘুম ছুটে গেছে, সে একটা সিগারেট ধরাল। একটুক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, একটা ব্যাপারে এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তুমি কেন যাচ্ছ আমার সঙ্গে ? কেন জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ ? তোমার আমার কথা দলের কেউ জানে না, তুমি এখনও তো ফিরে যেতে পারো।

ভরত বলল, আমার যাবার ব্যাপারে কোনও অস্পষ্টতা নেই। তুমি কেন যাচ্ছ, সেটাই বরং পরিষ্কার নয়। আমি যাচ্ছি বন্ধুর জন্য। এক বন্ধু যদি প্রাণের ঝুঁকি নেয়, আমি তার পাশে দাঁড়াব না ? তা হলে বন্ধু কীসের ? এটা খুব সোজা ব্যাপার। কিন্তু প্রথমে তুমি কেন এ দায়িত্ব নিতে গেলে ? এত লোক থাকতে, তুমি প্রাণ দেবার জন্য ব্যাকুল হলে কেন ?

হেম বলল, এর উত্তর আমি আগেই তোমাকে দিয়েছি।

ভরত বলল, আর একটা কথা তোমাকে বলি। ফুলার সাহেবকে মারলেই কি দেশোদ্ধার হবে ? এ রকম আরও কত শত ফুলার সাহেবকে মারতে হবে। ধর্ম মানো কিংবা না-ই মানো, তবু এক ধরনের কালচারের মধ্যে তো আমরা মানুষ হয়েছি, দেশের নামেই হোক আর যে-নামেই হোক, নরহত্যা কি আমাদের বিবেকের সায় দেয় ? দেশ নামে একটা ভাববস্তুর জন্য নিজের প্রাণ দেওয়াটাও কি মূর্খামি নয় ? মানুষ যখন জন্মায়, তখন তার কোনও দেশ থাকে না, জাত থাকে না, ধর্ম থাকে না। এই পৃথিবীতে সে মনুষ্যজাতির একজন হয়ে জন্মায়। আবার মানুষ যখন মরে, তারপরেও দেশ-টেশ সব তুচ্ছ হয়ে যায়। যতদিন বেঁচে থাকো, ততদিনই দেশপ্রেম, ততদিনই নিজের গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বন্ধুবান্ধব। সুতরাং যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকলেই তো এগুলো উপভোগ করা যায়, প্রাণটা শুধু শুধু নষ্ট করলে তো এসব কিছুই থাকে না।

হেম ক্ষীণ হেসে বলল, তুমি বড় অদ্ভুত মানুষ। তুমি যা যুক্তি দেখালে, সে-ই অনুযায়ী তোমারই তো ফিরে যাওয়া উচিত। বেঁচে থাকো, জীবনটাকে উপভোগ করো। আমি যখন একটা দায়িত্ব নিয়েছি, ঠিক হোক, ভুল হোক, আমাকে সেটা পালন করতেই হবে।

ভরত বলল, উহুঃ, এটা মোটেই ঠিক কথা হল না। দায়িত্ব হস্তান্তর করা যায়। বিশেষত সমিতির কোনও কাজে একজনের বদলে অন্য একজন দায়িত্ব তো নিতেই পারে। তোমারই ফিরে যাওয়া উচিত। কাজটা আমিই একলা সেরে ফেলতে পারব। আমার চাল-চুলো নেই, বিশ্ব সংসারে আমার কেউ নেই, আমি মরলাম না বাঁচলাম, তাতে কারুর কিছু যায় আসে না।

হেম বলল, তোমার যদি মনে হয়, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ায় কোনও সার্থকতা নেই, তা হলে শুধু শুধু প্রাণ দেবে কেন ?

ভরত বলল, শুধু শুধু তো নয়। দেশের জন্যও নয়, এমনকী তোমার জন্যও নয়, একজন বন্ধুর জন্য। বন্ধুর জন্য কি মানুষ প্রাণ দেয় না ? তাতে কত তৃপ্তি। সকালে যে স্টেশন আসবে, বোধহয় চাঁদপুর, তাতে তুমি নেমে যাও, আমি বারীনের সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ করে নেব।

হেম বলল, বাঃ বেশ। ধরো তোমার কথামতন আমি পরের স্টেশনেই নেমে পড়ে ফিরে গেলাম গুটিগুটি। আবার সাজলাম সংসারী। তারপর একদিন খবর পেলাম, সাহেব মারতে গিয়ে তুমি প্রাণ দিয়েছ। এতে তুমি তৃপ্তি পেলে, তুমি মহান হলে। তোমাকে বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বানানো হবে,

তোমার নামে গান লেখা হবে, ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে তোমার আদর্শ তুলে ধরার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথাও ছড়ানো হবে। আর আমার কী হবে ? আমি সারা জীবন হয়ে থাকব এক স্বার্থপর। কাপুরুষ ! ঘনিষ্ঠ মহলে যারা আসল ঘটনাটা জানে, তারা সব সময় আমার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ্যেই হোক বা মনে মনেই হোক, বলবে, নিজের জানটা বাঁচিয়ে তুমি ভরতকে বলির পাঁঠা করলে ? চমৎকার ! এই নিয়ে আমি বেঁচে থাকব ?

ভরত বলল, তুমি বেশি বেশি বাড়াচ্ছ। অত শত কেউ জানবেই না। আমি কিছুতেই ধরা দেব না, ফাঁসিতে ঝুলব না, সঙ্গে সায়েনাইড বিষ এনেছি, সাহেবটাকে খতম করার পর সেপাইগুলো যদি আমায় ঘিরে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে বিষ খাব। কেউ আমাকে চিনবে না। কেউ আমার পরিচয় জানবে না, আমার লাশটা পুঁতে দেবে কিংবা পুড়িয়ে ফেলবে। ব্যাস, আমি হারিয়ে যাব। আমাদের দলের কেউ জানেও না যে আমি তোমার সঙ্গে এসেছি, অন্যরা জানবে কী করে ?

হেম বলল, তোমার এ রকম হারিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ততা কেন ?

ভরত বলল, ওই যে বললাম, এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। আমার বেঁচে থাকার কোনও প্রয়োজনই দেখি না। কী হবে আর বেঁচে থেকে। তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে, আমি বসে বসে সেই কথাটাই ভাবছিলাম। তুমি শুধু শুধু কেন প্রাণ দিতে যাবে ? তুমি বেঁচে থাকলে সমিতির অনেক কাজ করতে পারবে। তোমার কথা অনেকে মানে। আমার কোনও গুরুত্ব নেই।

হেম বলল, কে বলল, দুনিয়ায় তোমার কেউ নেই। নিশ্চয়ই আছে।

ভরত ঈষৎ চমকে উঠে বলল, কে আছে ?

হেম বলল, এই দুনিয়াটাই তোমার আছে।

এ রকম কথার পিঠে কথা চলল প্রায় সারা রাত ধরে। ভোরের দিকে দু'জনেই একটু ঘুমোল, কিন্তু সকাল হতেই অন্য যাত্রীদের কলস্বরে জেগে উঠতে হল।

সারাদিন ধরে দেখা যায়, মানুষের ছোট ছোট স্বার্থের জন্য বিবাদ। সকলেই যেন জীবনটা আঁকড়ে থাকার প্রবল চেষ্টায় নিরত। শুধু নিজের জীবন, বড়জোর পরিবারের অন্যদের জীবন, তার বাইরে বাকি লোকেরা বাঁচুক বা মরুক তাতে কিছু আসে যায় না। এর মধ্যে বসে আছে এই দু'জন, দু'জনেই পরস্পরকে ফেরাবার চেষ্টা করছে, অথচ একজনকে ছেড়ে অন্যজন কিছুতেই যাবে না।

মাঝখানে একবার স্টিমার বদল করে ওরা চতুর্থ দিনে এসে পৌঁছল গৌহাটিতে। এর মধ্যে একদিনও স্নান করা হয়নি, গায়ের গেঞ্জি-জামা ঘাম চিটচিটে হয়ে গেছে। এখানে অনেক ধর্মশালা রয়েছে, পুণ্যার্থীরা কামাক্ষা মন্দির দর্শন করতে আসে। একটা ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়ে ওরা কুয়োর জলে ভাল করে স্নান সেরে নিল। আজই শিলঙে যাত্রা করতে হবে, শিলং শীতের জায়গা, ওদের সঙ্গে গরম কাপড় কিছু নেই, দুটো চাদর অন্তত কেনা দরকার। সে জন্য দোকানের দিকে এগিয়েও ওরা থমকে গেল। ব্যবহার করা হবে মাত্র দু'-তিন দিন, তার জন্য পয়সা নষ্ট করার কী দরকার, শীত সহ্য করাই ভাল। বরং ওই পয়সায় আলাদা টাঙ্গা ভাড়া করা যেতে পারে।

সাধারণ যাত্রীবাহী টাঙ্গায় গাদাগাদি করে সাত-আটজন যায়, পয়সা কম লাগে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকখানি পথ, ওই ভাবে যেতে বেশ কষ্ট হয়, তা ছাড়া অন্য যাত্রীরা মুখ চিনে রাখতে পারে। শুধু দু'-জনের জন্য একটা আলাদা টাঙ্গা ভাড়া করা হল। শেষ কটা দিন এটুকু আরাম করলে দোষ নেই।

ভরতের কাছে বেশ কিছু টাকা রয়েছে। আর ফিরতে হবে না। এই জন্য মেসবাড়ির এক ব্যক্তির কাছে মেদিনীপুরের খামারটা বিক্রি করবে বলেছিল। সেই লোকটিও মেদিনীপুরের, খামারটা দেখেছে, কিন্তু পুরো দাম দিতে পারবে না বলে বন্ধক নিয়েছে।

সমতল ছাড়াবার পর দু'পাশের দৃশ্য অতীব মনোহর। ছোট ছোট পাহাড়ের সারি, কোনও পাহাড়ের চূড়ায় জমে আছে মেঘ, কত রকম নাম-না-জানা গাছ, মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না। ভরত উত্তর ভারতের বহু অঞ্চল ঘুরেছে, সেই তুলনায় হেমের অভিজ্ঞতা কম। সে আগে পাহাড় দেখেনি। সে মুগ্ধ হয়ে দেখছে পথের শোভা। নিজেদের টাঙ্গা বলেই ইচ্ছেমতন থামানো

যায়। এক একবার কোনও ঝর্না দেখে টাঙ্গা থামিয়ে হেম ছুটে যাচ্ছে, তার ঠিক যেন বালকের মতন ফুর্তি। একবার ভরত তার পাশে বসে আঁজলা ভরে জল তুলে বলল, দেখো, এই জল কী ঠাণ্ডা, কী স্বচ্ছ, কী পবিত্র! কী মধুর কুলুকুলু শব্দ। ইচ্ছে করে, এ রকম একটা নির্জন ঝর্নার পারে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে।

হেম এক সময় ছবি আঁকত, অনেকদিন পর হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে তার শিল্পী সত্তা। থাকে থাকে নেমে যাওয়া উপত্যকা ও দূরের পাহাড়ি গ্রামের দিকে তাকিয়ে সে বলল, যদি এই জায়গাটার একটা ছবি আঁকতে পারতাম!

এই অঞ্চলের সঙ্গে ভরত ত্রিপুরার বেশ মিল দেখতে পাচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক কথা। এই আসাম তার মায়ের দেশ। তার দুখিনি মায়ের কোনও ছবিও সে দেখেনি। এখানকার মাটিতে তার শেষ-নিশ্বাস পড়বে, মা তাকে বুকে তুলে নেবে।

একটা ছোট গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি চায়ের দোকান। এমনই ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ যে এখানে থামতেই হয়। দোকানটির সামনে বাঁশের বেঞ্চি করা আছে। চা ছাড়া কমলালেবু আর মধু বিক্রি হচ্ছে সেখানে। তিনটি ফরসা, ফুটফুটে শিশু খেলা করছে ধুলো মেখে। তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভরতের হঠাৎ চোখে জল এসে গেল। যেন সে নিজের ওই বয়েসটা দেখতে পাচ্ছে। তিনটে কমলা কিনে সে বাচ্চাদের দিতে গেল, তারা কিছুতেই নেবে না। বোধহয় কমলায় তাদের অরুচি ধরে গেছে।

এ পথ দিয়ে অনবরত টাঙ্গা যাওয়া-আসা করছে। সকলেরই খুব ব্যস্ততা। সন্ধের পর রাস্তাটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, ভাল্লুকের উৎপাত আছে, তা ছাড়া ঠ্যাঙাড়ের দলও লুটপাট করে।

ভরত আর হেম বেশ তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছে, তাদের পাশ দিয়ে একটা টাঙ্গা চলে গেল, তাতে বসে আছে একজন মাত্র যাত্রী। পায়ের ওপর পা তোলা, গায়ে শাল জড়ানো, হাতে সিগারেট, রীতিমতন ফুলবাবু। চলে যাবার পরেই ভরত বলল, লোকটিকে চেনা চেনা মনে হল না?

হেম বলল, বারীন?

থামো থামো বলে চেঁচিয়ে সে টাঙ্গাটার পেছনে ছুটতে লাগল, টাঙ্গাটা থামল একটু পরে। মুখভর্তি দাড়ি রেখেছে বলে বারীনকে প্রথমটায় চিনতে পারা যায়নি।

টাঙ্গা থেকে নেমে এসে বারীন বলল, হেম! ইস, তুমি দেরি করে ফেললে?

হেম বলল, কই দেরি তো করিনি। খবর পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়েছি একটা বেলাও নষ্ট করিনি।

বারীন বলল, হ্যাঁ, তুমি দেরি করোনি, কিন্তু আসলে দেরি হয়ে গেছে। কী চমৎকার সুযোগ ছিল। ফুলার সাহেব রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যায়। একা। তাকে ফলো করে নিরিবিলি রাস্তায় আমি একটা স্পট ঠিক করেছিলাম। সেখানে বোমা ছুঁড়লে ঘোড়া সমেত ছোটলাটকে ঘায়েল করা যেত, তুমিও পালাবার অনেক সময় পেতে। ধরা পড়ার চান্স খুব কম।

হেম জিজ্ঞেস করল, সেটা কাল করা যাবে না? দেরি হবে কেন?

বারীন বলল, ফুলার সাহেব গতকালই গৌহাটিতে নেমে এসেছে। শিলং-এ আর কিছু করা যাবে না।

হেম বলল, যাঃ। এখন তা হলে... তা হলে আমাদের আর শিলং যাবার কোনও মানে হয় না। গৌহাটিতে ফিরে যাব?

বারীন জিজ্ঞেস করল, আমাদের মানে? তোমার সঙ্গে আর কে এসেছে?

হেম বলল, ভরত। ওর সঙ্গে মাঝপথে দেখা হয়ে গেল। কিছুতেই আর ছাড়তে চাইল না।

বারীন উৎকট মুখভঙ্গি করে বলল, দেখো হেম, বিপ্লব ছেলেখেলা নয়। যখন তখন জীবনমরণের প্রশ্ন। ভরত কি তা বোঝে? যাই হোক, অ্যাকশানের কথা যখন জেনে ফেলেছে, তখন ওকে আর বাইরে রাখা যাবে না। তোমরা শিলং-এ কয়েকদিন থাকো। আমি গৌহাটি গিয়ে ফুলারের গতিবিধির হদিশ করছি তারপর তোমাদের ডেকে পাঠাব।

পকেট থেকে একটা নোটবুক ও পেন্সিল বার করে এক জায়গায় খসখস করে সে কিছু লিখল। তারপর সেই পাতাটা ছিঁড়ে হেমকে দিয়ে বলল, একজনের নাম-ঠিকানা দিলাম, এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। খুব সাবধানে থাকবে। ওখানে আমার একটা গোলমাল হয়েছিল, তাই দেখছ না ছদ্মবেশ ধরেছি।

বারীন টাঙ্গায় উঠে পড়ল, হেম চায়ের দোকানে ফিরে এসে ভরতকে বলল, আরও কয়েকদিন আয়ু বৃদ্ধি হয়ে গেল আমাদের। পাখি উড়ে গেছে। চলো, শিলং শহরটা কেমন ঘুরে দেখা যাক।

বারীন যার নাম লিখে দিয়েছিল, সেই লোকটিকে খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। তার নাম পরেশ, বাজারের মধ্যে একটি দশকর্ম ভাণ্ডারের মালিক। বেঁটে মতন, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, চক্ষু দুটিতে দৃঢ়তার ছাপ আছে। নিছক দোকানদারি করে জীবন কাটিয়ে দিতে চায় না, এখানে সে একটা সমিতি গড়েছে, অনেকটা সময় সেই সমিতির কাজে ব্যয় করে।

পরেশ ওদের নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর সে বলল, আপনারা ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াতে পারেন কিন্তু বারীন ঘোষের সঙ্গে যে আপনাদের সম্পর্ক আছে সে কথা স্থানীয় বাঙালিদের জানাবার দরকার নেই। আপনারা আমার আত্মীয়, এখানে এমনিই বেড়াতে এসেছেন, এই কথাই বলব সবাইকে।

কথায় কথায় জানা গেল, বারীন এখানে বেশ একটি গোলমাল পাকিয়ে গেছে। বারীন বেশি কথা বলতে ভালবাসে, সে যে ফুলার হত্যার জন্য এখানে এসেছিল, সে কথা প্রায় কোনও বাঙালিরই জানতে বাকি নেই। সে যে কত বড় বিপ্লবী তার প্রমাণস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রগুলিও অনেককে দেখিয়েছে। বোমা থেকে খানিকটা বারুদ বার করে ফস করে আগুন জ্বেলে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তাদের। একজন আনাড়ির হাতে সে একটা রিভলবার তুলে দিয়েছিল, সে একটু নাড়াচাড়া করতেই গুলি ছুটে যায়, সেই গুলি লোকটির হাতের তালু ভেদ করে গেল। উপায়ান্তর না দেখে লোকটিকে ভর্তি করতে হল হাসপাতালে। সেখান থেকে পুলিশে রিপোর্ট গেল। শিলং-এর মতন শান্তিপূর্ণ জায়গায় কোনও রকম গণ্ডগোলের আশঙ্কার কথা পুলিশ বিভাগ এখনও চিন্তা করে না। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হল বটে কিন্তু ভয় ঢুকে গেল স্থানীয় লোকদের মনে। এর পর ফুলার-বধ হলে পুলিশ এই সব বাঙালিদের নিশ্চিত ধর-পাকড় করবে। বিপ্লবের নাম শুনে যারা উৎসাহিত হয়েছিল, পুলিশের ছায়া দেখেই তারা অদ্ভুত মনে করতে লাগল বারীনকে। সেইজন্যই বারীনকে এখান থেকে সরে পড়তে হয়।

হেম বারীনের মনোভাব অনেকটা বোঝে। বিপ্লবের প্রধান মন্ত্রগুপ্তিই যে গোপনীয়তা তা বারীনের মনে থাকে না। তার এই দেখানেপনা অবশ্য নিছক আত্মশ্লাঘার জন্য নয়, সে মনে করে, এইভাবে বিপ্লবের কথা প্রচার করলে আরও অনেককে দলে টানা যাবে। অন্য অনেক শহরে যে বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, দলে দলে যুবকেরা প্রস্তুত, এই রকম অনৃত ভাষণেও দ্বিধা নেই তার।

কোনও কাজ নেই, হেম আর ভরত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। শৈলনগরী শিলং বেশ জনবিরল। চতুর্দিকে বড় বড় ঝাউগাছ, তার ফাঁকে ফাঁকে বাড়িগুলি যেন লুকিয়ে আছে, সাহেব-মেমের সংখ্যাই বেশি, যখন তখন বৃষ্টি নামে বলে সকলেই রঙিন ছাতা রাখে সঙ্গে। পথের ধারে ধারে দোকানগুলি সুন্দরভাবে সাজানো। এ শহরে আজও মোটরগাড়ি আসেনি, উঁচু-নিচু রাস্তায় অন্য যানবাহন চালানোও কষ্টকর। প্রায় সকলেই পদব্রজে ঘোরে। শহরের উপান্তে খাসিয়াদের ছোট ছোট বাড়িগুলি ঠিক ছবির মতন। এদের মধ্যে দারিদ্র্য আছে যথেষ্ট, তবু মানুষগুলি হাসিখুশি, মেয়েরা এক সঙ্গে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে যায়।

শহরের প্রায় মধ্যেই একটা ছোট পাহাড়। তার চূড়ায় খানিকটা সমতল জায়গা, সেখানে অনেকে চড়ুইভাতি করতে আসে। ভরত আর হেম যেদিন অপরাহ্ণে সেখানে উঠে এল, তখন সেখানে আর কেউ নেই। চারিদিকে গোল হয়ে আছে পৃথিবী। এখান থেকে মনে হয় যেন সবটাই পাহাড়ের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। একদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে, কিন্তু তেমন বর্ণময় নয়, যেন একটা মেঘলা পাহাড়ের

আড়ালে ইচ্ছে করে লুকিয়ে পড়ছে সূর্য। মাথার ওপরের আকাশ এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অমলিন নীল। বাতাসে হিমেল স্পর্শ। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দিক দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা দৈব মহিমার কথা মনে হল।

ভরত অনেকটা আপন মনেই বলল, এই যে নীলাকাশ, তার ওপারে সত্যিই কি কিছু নেই?

হেম বলল, একদিন তো সেরকমই বিশ্বাস করে এসেছি। আর ক'দিন পরই ঠিক ঠিক প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ভরত বলল, পৃথিবীটা ভারী সুন্দর, তাই না?

হেম বলল, এতদিন ভাল করে দেখা হয়নি! শুধু পাহাড় কিংবা সমুদ্র নয়, একটা চুপচাপ ফাঁকা মাঠ, যতদূর চোখ যায়, মাঝখানে একটা বড় ঝাঁকড়া গাছ, সেই গাছের নীচে অনেকক্ষণ বসে থাকা, কেউ শুনবে না, শুধু আপন মনে একটা বাঁশি বাজানো, হঠাৎ আজ সকালে এই ছবিটা মনে এল। ও রকম কখনও করিনি!

ভরতের গণনায় ছিল সাত দিন, তারপর আরও কয়েকটা দিন বেড়ে যাওয়ায় সে মোটেই খুশি নয়। বরং ভেতরে ভেতরে অস্থিরতায় সে ছটফট করছে। জীবন দেওয়া ও নেওয়ার ব্যাপারটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়াই যেন ভাল। বেঁচে থাকার চেয়েও, মৃত্যুর পর কী হয় সেটা জানার জন্য আগ্রহই এখন বেশি।

তিন দিন পরই বারীনের কাছ থেকে খবর আসায় ওরা গৌহাটিতে নেমে এল।

বারীন এখানেও এর মধ্যে দলবল জুটিয়ে ফেলেছে। বেশ কয়েকটি যুবক খুব উৎসাহী। বারীনের অস্ত্রগুলি দেখে মুগ্ধ। এরা কেউই জীবনে কখনও রিভলবার দেখেনি, হাতে ছোঁওয়া তো দূরের কথা, বোমার নামই শোনেনি। কিন্তু এখানে ফুলারকে হত্যা-প্রচেষ্টার বিশেষ সুবিধে নেই। সে সকালে অশ্বারোহণে ভ্রমণে বেরোয় না, রাজকার্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সব সময় লোকজন তাকে ঘিরে থাকে।

তবু নজর রাখার কাজ চলতে চলতেই একদিন একটি যুবক এসে জানাল, ফুলার সেদিনই গৌহাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে বরিশালের দিকে। যুবকটি সরকারি কর্মচারী, সে ভেতরের খবর রাখে। তৎক্ষণাৎ এরাও গৌহাটি ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

প্যাসেঞ্জার স্টিমার অনেক জায়গায় থামতে থামতে আসে, গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হয়। ব্যামফিল্ড ফুলার পূর্ব বঙ্গ ও আসাম রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তার জন্য রয়েছে পৃথক একটি স্টিমার। কিন্তু সে স্টিমারও নিশ্চিত পথে দু'একবার থেমেছিল, বারীনরা বরিশালে এসে দেখল, লাটসাহেবের নিজস্ব স্টিমার 'ব্রহ্মকুণ্ড' জেটিতে এসে সদ্য ভিড়েছে। ঘাটে এবং রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে কাতারে কাতারে লাল পাগড়ি পুলিশ। টুপি, শামলা, কোট, চোগা চাপকান পরা আরও বহু সরকারি কর্মচারী ও বশংবদ ব্যক্তিরা এসেছে অভ্যর্থনার জন্য। কিন্তু ঢাকায় গিয়ে ফুলার সাহেব মুসলমান জনসাধারণের কাছ থেকে যে রকম জয়ধ্বনি পেয়েছিল, বরিশালে সে রকম কেউ নেই। বরিশালের মানুষের মনে পুলিশি তাণ্ডবের ক্ষত এখনও দগদগ করছে।

জেটিঘাটের ভিড় ফাঁকা হয়ে যাবার পর অস্ত্রশস্ত্র সমেত পোঁটলাগুলি ঘাড়ে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল বারীন, হেম আর ভরত। যেন সাধারণ পথিক। বরিশালে ভাল হোটেল নেই, হাটের পাশে কিছু কিছু থাকার জায়গা আছে বটে, সারি সারি ঘর, চ্যাঁচার বেড়া, ভেতরে একটা করে খাটিয়া পাতা, কিন্তু কোনও ঘরেরই দরজা নেই। মারাত্মক অস্ত্রগুলি নিয়ে এ রকম ঘরে থাকা যায় না। কিছুদিন আগে কনফারেন্সে যোগ দিতে এসে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে রকম দু'-তিনজনের বাড়ি খুঁজে খুঁজে দেখা করার পর কালীবাড়ির পাশে এক বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া গেল।

হাতমুখ ধুয়ে মুড়ি-নারকোল খেতে খেতে বারীন বলল, এ এক হিসেবে ভালই হল। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। শিলং-গৌহাটির বদলে এই বরিশালে ফুলারকে মারতে পারলে আমাদের আরও বড় জয় হবে। এখানে ফুলারের হুকুমে পুলিশ বীভৎস অত্যাচার করেছে, এই বরিশালের

মাটিতেই ফুলারকে আমরা পুঁতে ফেলব। সারা দেশ বুঝবে, বাঙালি অপমানের বদলা নিতে জানে। হেম, যদি কালপরশুই অ্যাকশান শুরু করা যায়, তোমরা রাজি?

ভরত বলল, পরশু কেন, কাল হলেই ভাল হয়।

বিকেলের দিকে আরও কয়েকজন যুবককে জড়ো করা হল সেখানে। যথারীতি বারীন এক বৈপ্লবিক বক্তৃতা দেবার পর অস্ত্রগুলি দেখাল। সকলেই অভিভূত, সকলেই সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু বাধা এল সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে।

খরার জন্য বরিশাল অঞ্চলে সাঙ্ঘাতিক দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। এখানে বিপদে-আপদে অশ্বিনীকুমার দত্তই ভরসা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে লোক ছুটে আসছে তাঁর কাছে। এইসব সাধারণ গ্রামের মানুষ সরকারকে চেনে না, জমিদারকে চেনে না, অশ্বিনীকুমারই তাদের বিপদ-ত্রাতা। অশ্বিনীকুমার পাড়ায় পাড়ায় সেবাকেন্দ্র খুলেছেন, দিন-রাত খাটছেন। এই তিন যুবকের আগমনবার্তা ও উদ্দেশ্যের কথা তাঁর কানে পৌঁছল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসলেন। সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা চালাতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে তিনি বিশ্বাসী নন। ফুলার-বধের মতন একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটলে পুলিশ এখানে অভুক্ত, অসহায়, দুর্বল মানুষদের ওপর বেদম অত্যাচার চালাবে। তিনি তা কিছুতেই হতে দেবেন না। তিনি কঠোরভাবে কয়েকজন কর্মীকে নির্দেশ দিলেন, কলকাতার ওই ছোকরাদের গিয়ে বলো, বরিশালে তাদের ওসব অতি বিপ্লবীপনা চলবে না। ওরা বাহাদুরি করে এখানে নাম কিনতে চায়। এখানে আমরা মানুষদের বাঁচাবার কাজে ব্যস্ত আছি, মানুষ মারার কোনও কথাই শুনতে চাই না। ওরা যত তাড়াতাড়ি বরিশাল ছেড়ে চলে যায়, ততই মঙ্গল!

যে কয়েকটি যুবক বারীনের বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তারাও এখন পিছু হঠতে লাগল। অশ্বিনীকুমারের নির্দেশ অমান্য করতে সকলেই নারাজ। অশ্বিনীকুমারের সমর্থন ছাড়া বরিশালে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়।

বারীন তবু থেকে যেতে চায়। হেম আর ভরতের মনে হল, এখানে প্রতিকূলতা এমনই যে-কেউ হয়তো তাদের খবর আগে থেকেই পুলিশের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

এর পর যেন একটা খেলা শুরু হল। বারীন জিদ ধরে আছে, তার মধ্যেই খবর এল, ফুলার সাহেব এখানে নেই, এর মধ্যেই সে ফিরে গেছে গৌহাটি। তা হলে চলো গৌহাটি। একবার যখন গোঁ ধরা হয়েছে, তখন ফুলারের নিস্তার নেই। কার্যসিদ্ধি না করে হেম আর ভরতের বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না!

যাত্রীবাহী স্টিমারটি থেমে গেল চাঁদপুরে, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আর যাবে না। পরদিন আবার অন্য স্টিমার। চাঁদপুরে নেমে ওরা শুনল, ফুলার বোধহয় এখন গৌহাটিতে নেই, ইতিমধ্যে অন্য কোথাও চলে গেছে। কেউ কেউ বলল, থাকতেও পারে। আসলে ফুলারের গতিবিধি সম্পর্কে সরকার থেকে ইচ্ছে করেই নানান রকম পরস্পরবিরোধী সংবাদ ছড়ানো হয়।

কিন্তু গৌহাটি এসে ফুলার উঠেছে কোথায়? আগেরবার যে বাংলোতে ছিল, সেটা ফাঁকা, পুলিশ পাহারাও নেই। লাটসাহেব এলে পুলিশ ও আমলাদের যতখানি তৎপরতা থাকা উচিত, সে রকম দেখা যাচ্ছে না, অথচ ফুলার এখানে এসেছে ঠিকই। তবে কি সে আবার শিলং চলে গেল?

ঠিক হল, ভরতকে একা পাঠানো হবে শিলং-এ, সে খবরাখবর নেবে, তারপর উপযুক্ত সুযোগ বুঝে সে ডেকে পাঠালেই হেম যাবে সেখানে। বারীন আর শিলং যেতে চায় না। তা ছাড়া ফুলার এর মধ্যে আবার গৌহাটি নেমে আসে কিনা সেটাও লক্ষ রাখতে হবে।

ভরত একা যেতে খুবই আগ্রহী। প্রস্তাবটা শোনামাত্র তার মনের মধ্যে একটা গোপন পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেছে। ছোটলাটকে যদি শিলং-এ পাওয়া যায়, তা হলে হেম-বারীনকে আর খবর পাঠাবার দরকার কী? সে একাই অ্যাকশান সেরে ফেলতে পারবে। ফুলার সাহেবের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি চালাবে। শিলং-এর সেই ঘটনা শুনতে পেয়ে এখান থেকে পালাবার অনেক

সময় ও সুযোগ পাবে হেম আর বারীন।

এটা ভাবতেই ভরতের মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে গেল।

ভরত কিছু একটা হঠকারিতা করে ফেলতে পারে, এ রকম একটা সন্দেহ হেমের মনেও দেখা দিল। ভরত যখন পুঁটলি গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন হেম বলল, ভরতের তো এখন অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেওয়ার দরকার নেই। তুমি স্পটটা ঠিক করবে, তারপর সংকেত পেলেই আমি ওসব নিয়ে যাব।

বারীনও বলল, ঠিক। অস্ত্র নিয়ে গিয়ে ভরত আগেই ধরা পড়ে গেলে মুশকিল হবে। ভরতের কিছুই নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি তো শুধু খোঁজখবর নিতে যাচ্ছ।

হেম অস্ত্রগুলো সব পাশের ঘরে নিয়ে রেখে এল।

টাঙ্গার আড্ডায় তিনজনে এক সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। হেম আর বারীন ভরতকে শুধু খানিকটা পথ এগিয়ে দেবে। ভরত যাত্রীবাহী সাধারণ টাঙ্গাতেই যাবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদুর যাবার পর ভরত থমকে দাঁড়াল। হাসি মুখে বলল, এই রে, পেটটা যেন কেমন কেমন করছে, পথে যদি বেগ পায়, টাঙ্গা থামাতে চাইবে তো? তোমরা বরং এখানে একটু দাঁড়াও, আমি একবার সেরে আসি।

ভরত দৌড়ে ফিরে গেল। হেমের ঘরে ঢুকে দ্রুত পুঁটুলি খুলে প্রথমে একটা রিভলবার গুঁজে নিল পেটে। তারপর বেশ কিছু গুলি ও আর একটা রিভলবারও তুলে নিল। দু' হাতে দুটো নিয়ে পরপর গুলি চালাতে হবে, কিছুতেই যাতে ব্যর্থ হতে না হয়। শুধু একটা গুলি রেখে দেবে নিজের মাথার জন্য।

৮২

টাঙ্গা ছাড়ল সাড়ে দশটায়, সন্ধের আগেই শিলং পৌঁছে যাবে। পেছন দিকে বসেছে দুটি বোরখা পরা রমণী, আরও তিনজন পুরুষ সমেত একটি মুসলমান পরিবার, একজন ফলের ব্যাপারি, ভরতকে নিয়ে মোট সাতজন। ভরত বসেছে টাঙ্গা চালকের পাশে।

গৌহাটিতে বেশ গরম, চিটচিটে ঘাম হয়। খানিক দূরে পাহাড়ে উঠলেই বাতাস ক্রমশ শীতল হবে। ঘোড়ার পায়ের কপ কপ আওয়াজ শুনতে বেশ লাগে। সামনে বসলে ধুলো সহ্য করতে হয় বটে, তবু এই জায়গাটাই ভরতের বেশ পছন্দ হল। এক এক সময় সে জামার তলায় গোঁজা রিভলবার দুটো হাত দিয়ে অনুভব করছে, তাতে যেন বলবৃদ্ধি হচ্ছে শরীরে। যেন সে একটা যুদ্ধে যাচ্ছে, এ যুদ্ধে কিছুতেই হারলে চলবে না। মনে মনে সে বলছে, ব্যামফিল্ড ফুলার, তোমার নিয়তি ঘনিয়ে এসেছে, আর নিস্তার নেই।

বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের সংবাদ আসছে প্রায়ই। কয়েক জায়গায় স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোথাও বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে ছাত্রদের পুলিশের লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা বয়েছে। বয়কট ভাঙার জন্য দাঙ্গার উসকানি দিচ্ছে পুলিশ। এর পরেও ফুলারের মৃত্যুদণ্ডকে অনৈতিক বলা যাবে না।

ভরতের হঠাৎ মনে পড়ল, তার একটি সন্তান আছে কটকে। এতদিনে সে বেশ বড় হয়ে গেছে মনে হয়। কখনও তাকে দেখতে যাওয়া হয়নি, মহিলামণির পিত্রালয়ের সঙ্গে ভরত কোনও যোগাযোগও রাখেনি। ওড়িশাতে তার আর যেতেই ইচ্ছে করে না, তার জীবনের ওই অধ্যায়টা যেন মুছে গেছে। আসলে কিন্তু মুছে যায় না। অনেক দিন পর হঠাৎ ফিরে আসে ছবি। ভরত শিশুদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে না। এখানে রাস্তার ধারে অল্পবয়েসী ছেলেদের দেখে কেন মনে পড়ছে

নিজের ছেলের কথা? এই শিশুদের কাছে ডেকে আদর করতে ইচ্ছে হয়। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে সে নিজের সন্তানের কপালে একটা চুমো দিয়ে যাবে না?

ভরতেরই মতন তার সন্তানও ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই মাতৃহীন। বাবাকেও নিশ্চয়ই তার মনে নেই। তার বাবা বেঁচে আছে কি না তাও সে জানে না। এখন সত্যি সত্যি পিতৃহীন হলেই বা এমনকী উনিশ-বিশ হবে? ভরতের কিছু সম্পত্তি আছে। খামার বাড়িটা শুধু বন্ধক দেওয়া আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে ওই খামার তার সন্তানের পাওয়া উচিত। হেমকে সেরকম কিছু বলে আসা হয়নি। হেম ভরতের আগেকার জীবনের কথা কিছুই জানে না। যাক, তার ছেলে মামারবাড়িতে ভালই আছে, মামারা বেশ সচ্ছল, ওই সম্পত্তি তার না পেলেও চলবে।

কল্পনায় ছেলের মুখখানা যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় ভরত, কিন্তু মহিলামণির মুখ তার মনে পড়ে না। তার অবয়ব আছে, মুখ নেই। নিজের স্ত্রীকে সে ভুলে গেছে? খুব তীব্রভাবে চিন্তা করলে মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে অন্য একটি মুখ। ভূমিসুতার মুখ। ভূমিসুতার মুখশ্রীর সঙ্গে মহিলামণির মুখের কিছুটা মিল ছিল। সরলা ঘোষালের বাড়িতে বহুদিন পর ভূমিসুতাকে দেখেও ভরত এই মিল পেয়েছিল। ভূমিসুতা! সে এখন অন্য জগৎবিহারিণী, মঞ্চের আলোয় তার জীবন ঝলমল করছে, সে ভরতের কেউ নয়। ভূমিসুতা শুধু বুকের মধ্যে একটা কাঁটা হয়ে রয়ে গেল। আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। আর কলকাতায় ফেরা হবে না। ত্রিপুরায় কেউ তার কথা জানবেও না। একটা মূল্যহীন জীবন! অবাঞ্ছিত জন্ম, ভাগ্য তাকে বারবার বিড়ম্বিত করেছে। সুখের ছবি দেখিয়ে কেড়ে নিয়েছে বারবার। মৃত্যু তাড়া করে ফিরেছে। এভাবে বেঁচে থাকারই বা অর্থ কী। যদি ভূমিসুতা একবার তার দিকে চোখ তুলে চাইত, সেদিন সরলা ঘোষালের বাড়িতে...।

হঠাৎ ভরতের চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। যেন বিশ্বচরাচর একেবারে কুচকুচে কালো। কোথাও আলোর রেখা নেই। মুখের মধ্যে অদ্ভুত তিক্ত স্বাদ। শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। এ কী হল? অকস্মাৎ কি অন্ধ হয়ে গেল সে? কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে চিৎকার করতে চাইছে, স্বর ফুটছে না কণ্ঠে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার সব কিছু স্বাভাবিক। এই তো ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলেছে, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, রাস্তার দু'পাশে অপরূপ প্রকৃতি। তা হলে কী হয়েছিল একটু আগে! এই কি মৃত্যুর মহড়া! প্রাণ হারাবার সময় এরকম হয়! এর পর ভরতের খুব ইচ্ছে হল, চলন্ত গাড়িটা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ার! এ আবার কী! সে নিজেই নিজের ইচ্ছের মর্ম বুঝতে পারছে না।

ভরত বিড়বিড় করে বলতে লাগল, পাখি সব করে রব, পাখি সব, পাখি সব, পাখি সব, ভরত নেমে পড়ো! পালাও! পালাও! এখনও সময় আছে। কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, পাখি সব, পাখি সব, বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে, পালাও!

বুকের ভেতর থেকে কাঁপুনি উঠছে, যেন সে ছিটকে পড়ে যাবে। ভরত মুঠোয় চেপে ধরল নিজের মাথার চুল। এ কী হচ্ছে! সে ভয় পেয়েছে? এতখানি ভয় বুকের মধ্যে জমে ছিল? সে আসলে কাপুরুষ! দেশের জন্য বা কিছুর জন্যই সে জীবন দিতে চায় না। শেষ মুহূর্তটা পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বাঁচতে চায়। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

যে কটা দিন হেমের সঙ্গে ছিল, তখন এসব মনে পড়েনি। হেমকে বাঁচাবার জন্যই সে এসেছে। হেম পাশে থাকলে হেমকে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে সে নিজে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত নিশ্চিত। অন্য কেউ সঙ্গে থাকলে নিজেকে বেশি সাহসী হিসেবে প্রমাণ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু একা একা সে বিষম দুর্বল হয়ে পড়ছে। অত্যন্ত তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে লাফিয়ে নেমে পড়ে দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যেতে। আর কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। জঙ্গলের মধ্যে জংলি হয়ে বেঁচে থাকবে। দু'বেলা খাদ্য না জুটলেও ক্ষতি নেই, তবু তো বেঁচে থাকা হবে! নিজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে সে বলতে চাইছে, হ্যাঁ, আমি কাপুরুষ, আমি বাঁচতেই চাই।

আরও কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে এইরকম দ্বন্দ্ব চলল। মুসলমান পরিবারটি নিজেদের মধ্যে গল্প করছে কারুর আসন্ন শাদি বিষয়ে। গাড়োয়ানটি মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে দেখছে ভরতকে। কেউই

টের পাচ্ছে না এই মানুষটির মুখে কেন ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চক্ষু দুটি উন্মাদের মতন।

রাস্তা এক জায়গায় বাঁক নিতেই দেখা গেল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লাল পাগড়ি মাথায় পুলিশ। এখানে এত পুলিশ কেন? কয়েকজন পুলিশ রাস্তার মাঝখানে এসে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছে। এ গাড়ির গাড়োয়ান দ্রুত ঘোড়ার রাশ টেনে ধরতেই ঘোড়াটা চি চি শব্দ করে উঠল। ভরতের সমস্ত শরীর এখন সজাগ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। প্রথমেই তার মনে হল, বারীন আর হেম কি বোমা সমেত ধরা পড়ে গেছে? কোনও রকমে খবর পেয়ে পুলিশ ভরতকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছে এখানে?

একজন দারোগা শ্রেণীর পুলিশ গট গট করে হেঁটে আসছে এই গাড়ির দিকে। ভরত রিভলবারে হাত ছোঁয়াল। তার সব দুর্বলতা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। রাগে শক্ত হয়ে উঠেছে চোয়াল। সে ঠিক করল, তাকে গ্রেফতার করতে এলেই সে গুলি চালাবে। একজনকে অন্তত না মেরে সে মরবে না। রিভলবারগুলোর অনেক দাম, অনেক কষ্টে জোগাড় করতে হয়, এমনি এমনি সে পুলিশের হাতে তুলে দেবে নাকি?

দারোগাটি রুক্ষ স্বরে বলল, সবাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াও। গাড়িটাকে রাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে রাখো। এখন কোনও গাড়ি যাবে না। এখান দিয়ে লাট সাহেবের কনভয় পাস করবে।

ভরতের বুকটা ধড়াস করে উঠল। যাঃ! ফুলার সাহেব শিলং থেকে ফিরে আসছে এরই মধ্যে?

সাহেবদের দেখার জন্য কিছু কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দু'পাশে। ভরত তাদের মধ্যে মিশে গেল। এখানেই ফুলারকে হত্যা করার চেষ্টা করা যায়? চলন্ত গাড়ির পাদানিতে উঠে জানলা দিয়ে গুলি চালালে কেমন হয়? তারপর পুলিশরা ভরতকে ঝাঁঝরা করে দেয় তো দিক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দূরে দেখা যাচ্ছে একসঙ্গে গোটা পাঁচেক গাড়ি আসছে, তার মধ্যে কোন গাড়িতে ফুলার আছে, তা বোঝা যাবে কী করে! গাড়িগুলো ছুটছেও বেশ জোরে।

ভরতের চোখের সামনে দিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল লাটসাহেবের কনভয়। আর এখন শিলং যাওয়া অর্থহীন। উল্টোদিকের ফেরার গাড়িগুলি সবই ভর্তি। তবু একজন গাড়োয়ানকে অতিরিক্ত পয়সা কবুল করে ভরত উঠে পড়ল।

বাড়ি ফেরার পর সংবাদ শুনে বারীন বেশ উৎফুল্ল হলেও হেম গম্ভীর। সে বলল, ভরত এখন আমরা তিনজনে রয়েছি। সব সিদ্ধান্ত তিনজনে মিলেই নিতে হবে। একা কেউ কোনও গোপন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আমাদের না জানিয়ে রিভলবার দুটো নিয়ে গিয়ে তুমি ঘোরতর অন্যায় করেছ!

বারীন বলল, অস্ত্র দুটো নিয়ে গিয়েছিল নাকি? সে কী! এসব ব্যাপারে কিন্তু আমার কথাই ফাইনাল। এ জন্য ভরতকে শাস্তি পেতে হবে। দলের মধ্যে ডিসিপ্লিন রাখাটা খুব বড় কথা।

ভরত চুপ করে রইল।

বারীন বলল, কী শাস্তি পাবে তা ভেবে দেখতে হবে। আপাতত মুলতুবি রইল।

পরদিনই খবর পাওয়া গেল, ফুলার সাহেব সদলবলে চলে গেছে রংপুর।

বারীনরা খানিকটা দমে গেল। সে যে অনেক দূর। উত্তরবঙ্গের ওদিকটায় এরা কেউই কখনও যায়নি। বারীনের ইচ্ছে আপাতত কলকাতায় ফিরে যাওয়া হোক, এবারের মতন ফুলার রক্ষা পেয়ে গেল। হেম তাতে রাজি নয়। সে শেষ পর্যন্ত দেখতে চায়। রংপুরের স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে।

রংপুরে এসে দেখা গেল, এখানকার পরিবেশ বরিশালের থেকে ভিন্ন। এখানে কোনও সর্বজনপ্রিয় নেতা নেই, কিন্তু বারংবার পুলিশি অত্যাচারের ফলে এখানকার কিছু যুবকের মধ্যে একটা প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে উঠেছে। তারা একটা কিছু করতে চায়। কলকাতা থেকে তারা কোনও সাহায্য পায় না। কয়েকজন এর মধ্যেই কলকাতার কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, নেতারা শুধু লম্বা-চওড়া বুলি আউড়েছেন। তাঁরা এমন ভাব দেখিয়েছেন, যেন মফস্বলের লোকেরা কিছু বোঝে না, তাঁরাই সবজান্তা। যথাসময়ে তাঁরা রংপুরে নির্দেশ পাঠাবেন। এতে রংপুরের

যুবকরা কলকাতার নেতৃত্বের প্রতি বেশ বিরক্ত হয়ে আছে। এইসময় বারীনের দলটি পৌঁছোনোয় তারা খুব সদয়ভাবে গ্রহণ করল না। তারা জেরা করতে লাগল নানারকম। বারীনের কাছে যে অস্ত্রসম্ভার আছে, সে সম্পর্কেও তারা সন্দিগ্ধ।

হেম বলল, সকলের সামনে আমি অস্ত্রগুলি দেখাতে চাই না। আপনারা একজন প্রতিনিধি ঠিক করুন, কোনও নির্জন জায়গায় তাকে আমাদের অস্ত্রের কার্যকারিতা বুঝিয়ে দেব।

সেইরকমই ব্যবস্থা হল। শহরের বাইরে একটি বিস্তৃত জলাশয়ের পাশে ঝোপজঙ্গল। সন্ধেবেলা সেখানে গিয়ে বারীনরা নিজেদের পুঁটুলি সমেত বসে রইল। জায়গাটায় অসম্ভব মশা, অনবরত চাপড় মারতে হচ্ছে গায়ে। হেম আর বারীন একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে, কারুর দেখা নেই। চাঁদনি রাত, প্যাঁচা ডাকছে, শেয়ালের হুক্কাহুয়াও শোনা যাচ্ছে বেশ কাছেই।

অনেকক্ষণ পর গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এল একজন। বেঁটে, যণ্ডামার্ক চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। লোকটির নাম যোগেন্দ্রমোহন দাস, সবাই জগুদা বলে ডাকে। মুখে নানারকম অভিজ্ঞতার ছাপ আছে, কয়েকবছর সে জাহাজের খালাসি হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছে।

অস্ত্রগুলো দেখার পর সে একটা বোমা হাতে তুলে খানিকটা অবহেলার সঙ্গে বলল, এটা ছুঁড়ে মারলে ঠিকমতন ফাটবে কি না তা পরীক্ষা করে দেখেছেন?

বারীন সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, দেখা আছে।

জগু বলল, আমার সন্দেহ আছে। ছুঁড়ে দেখব ফাটে কি না?

সে হাতটা উঁচু করতেই বারীন হা-হা করে তাকে বাধা দিয়ে বলল, এখানে ছুঁড়বেন কি মশাই? আমাদের কাছে দুটো মাত্র আছে, দুটোই কাজে লাগবে।

জগু বলল, ধরুন, বোমা ছোঁড়া হল, ফাটল না। তখন কী হবে?

আমার ধারণা, এগুলো বোমা নয়, সাধারণ পটকা।

বারীন বলল, সেকেন্ড লাইন অফ অ্যাকশানও ঠিক করা আছে। বোমা যদি না ফাটে তা হলে আমাদের দু'জন রিভলবার নিয়ে একেবারে লাটসাহেবের সামনে এগিয়ে যাবে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি চালাবে।

জগু বলল, লাটসাহেবের কাছাকাছি তিন-চারজন বডিগার্ড থাকে। তারা তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে সে দু'জনের খুলি উড়িয়ে দেবে!

বারীন বলল, দেবে তো দেবে! তাতে কী আসে যায়? এই দু'জন তো প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই যাবে। দে হ্যাভ অলরেডি ডেডিকেটেড দেয়ার লাইভস!

জগু কৌতূহলী চোখে ভরত আর হেমের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনারা প্রাণ দিতে চান কেন?

এক কথায় কী উত্তর দেওয়া যায় তা ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল দু'জনেই।

জগু বলল, কার্যোদ্ধারের আগেই যারা প্রাণ দেবার জন্য রেডি হয়ে থাকে, তারা কী ধরনের বিপ্লবী? একজন সাহেবকে মারতে গিয়ে দু'জন প্রাণ দেবে? প্রাণের ঝুঁকি থাকবে ঠিকই। কিন্তু বাঁচার পথ, পালাবার পথ চিন্তা করে রাখা হবে না কেন?

বারীন বলল, দু'জন প্রাণ দিলে শত শত ছেলে ইনস্পায়ার্ড হবে!

জগু বলল, ধরুন, দু'জনে একেবারে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বুক চিতিয়ে সাহেবের সামনে এগিয়ে গেল। এ যা পুরনো ধরনের রিভলবার দেখছি, এতেও ঠিকমতন গুলি বেরুলে ভাগ্য বলতে হবে। ধরুন সাহেবের গায়ে গুলি লাগল না। সাহেব মরল না, কিন্তু এই দু'জনের প্রাণ গেল। তাতে সাহেবরা হাসবে না? বলবে, ভেতো বাঙালিরা অস্ত্র ধরতে জানে না, রিভলবার হাতে নিয়ে ভয়ে কেঁপেছে, তাতেই গুলি অন্যদিকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। প্রাণ দেওয়া সোজা, কাজ উদ্ধার করা অনেক শক্ত! যে-কাজের জন্য যাওয়া, তাতে যাতে সেন্ট পারসেন্ট সফল হওয়া যায়, সে জন্য পাকাপোক্ত প্ল্যান করা দরকার নয় কী? আপনারাই বলুন না।

বারীন বলল, আমরা আটঘাট বেঁধেই এগুব।

জগু একটা বিড়ি ধরিয়ে দু'টান দেবার পর জিজ্ঞেস করল, আলফ্রেড নোবেল নামে সুইডেনের এক বৈজ্ঞানিক ডায়নামাইট নামে এক ধরনের বোমা আবিষ্কার করেছেন, সে বিষয়ে কিছু জানেন? বোমাটা এক জায়গায় পুঁতে তার সঙ্গে একটা তার জুড়ে দেওয়া হয়। সেই তারটা অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে কল টিপে বোমাটা ফাটানো যায়। এইভাবে পাহাড়ও ফাটানো যায়, কারুর গায়ে কিছু লাগে না।

হেম বলল, এই বোমার বিষয়ে আমি পড়েছি।

জগু বলল, ধরুন, লাটসাহেব কোন ট্রেনে আসছে, আগে থেকে খবর নেওয়া গেল। ট্রেন লাইনের মাঝখানে একটা ওই ডায়নামাইট বোমা পুঁতে রাখা হল, ট্রেন এসে পড়ার পর লাটসাহেবের কামরাটা ওই জায়গায় পৌঁছালে দূর থেকে কল টিপে সেটা উড়িয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের চম্পট দেবারও অনেক সময় পাওয়া যাবে। ধরা পড়ার প্রশ্ন নেই। যাকে বলে, সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

বারীন বলল, সে রকম বোমা আমরা কোথায় পাব?

জগু বলল, কিছু কিছু মশলা জোগাড় করতে পারলে সে রকম বোমা বানানো খুব শক্ত কিছু নয়। আমিও আপনাদের সাহায্য করতে পারি। আমার মশাই সাতটা ছেলেমেয়ে, দুটো বউ, বুড়ো বাপ-মাও বেঁচে আছে, সব আমার ঘাড়ের ওপর, আমি নিজে সামনা-সামনি যাব না, তবে আড়াল থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে রাজি আছি।

তারপর সে ভরতের কাঁধে হাত রেখে বলল, খামোখা মরতে চান কেন? পৃথিবীতে বুঝি ভালবাসার কেউ নেই?

ভরতের মনে হল, এমন মধুর কথা সে আগে কখনও শোনেনি। প্রাণ দেওয়াটা যে কত গৌরবের, এই তত্ত্বটাই মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বলছে বাঁচার কথা। সত্যিই তো, কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাঁচার পথটাই বা খোলা রাখা হবে না কেন? অত বড় একজন সাহেবকে মেরেও যদি ধরা না দেওয়া যায়, পালানো যায়, সেটাই তো বেশি বীরত্বের।

রংপুরে কেউ এই তিনজনকে নিজেদের বাড়িতে আতিথ্য দেয়নি। তবে একজন একটা ফাঁকা বাড়ি ওদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে ওরা রান্না করে খায়। রান্না করতে হয় ভরতকে। এটা তার শাস্তির অঙ্গ। ডাল আর ভাত আলাদা রান্না করার বদলে ভরত প্রায় রোজই খিচুড়ি বানায়, সঙ্গে কিছু ভাজাভুজি। এখানে ঝিঙে-বেগুন শস্তা, আলু-পেঁয়াজের বেশ দাম, পটল পাওয়া যায় না। পয়সা ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি। স্টিমারের ভাড়া দিয়ে কারুর কাছেই আর তেমন কিছু নেই। নতুন বোমাটা বানাতেও বেশ কিছু টাকা লাগবে। তা হলে উপায়? একটাই শুধু আশার কথা, ফুলার সাহেব রংপুরে বেশ কিছুদিন থাকবে। এটা খুব নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

অর্থ সংগ্রহের জন্য বারীন কলকাতায় চলে গেল। ভরত আর হেম বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোয় না। জগু সাবধান করে দিয়েছে, এখানে ওদের পক্ষে বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা না করাই ভাল। ফুলার সাহেব বেশ কিছুদিনের জন্য আস্তানা গেড়েছে বলে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ, তার মধ্যে কিছু টিকটিকিও মিশে আছে। নতুন লোক দেখলে খোঁজখবর নিচ্ছে। জগু নিজে অবশ্য প্রায়ই ওদের কাছে এসে নানান দেশের গল্প করে।

সময় কাটাবার কোনও সমস্যা নেই। এ বাড়িতে একটা আলমারির মধ্যে বেশ কিছু পুরনো বই রয়েছে, বাংলা-ইংরেজি মেশানো। দেখে মনে হয়, অনেক দিন সেই আলমারি খোলা হয়নি। হেম সারা দিন শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। ভরতও চটপট রান্না সেরে নিয়ে পছন্দমতন বই খোঁজে। তার মনোভাব এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাকে সবসময় বেশ উৎসাহী ও হাসিখুশি দেখায়। রংপুরে আসার আগে পর্যন্ত মৃত্যুচেতনা মাথার ওপর ভূতের মতন চেপে বসেছিল। দেশের কাজ করা কিংবা পরাধীনতার অপমানবোধের চেয়েও প্রধান হয়ে উঠেছিল নিজেদের প্রাণদান। যেন মৃত্যু

অবধারিত। এখন মনে হয়, দেশের কাজ করতে হবে, অত্যাচারী ফুলারকে শাস্তি দিতে হবে, এ সবই ঠিক, সেইসঙ্গে নিজের প্রাণ বাঁচাবারও সবরকম চেষ্টা করতে হবে। সব মানুষই বাঁচতে চায়, আগে থেকেই নিজে নিজেকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে বসবে কেন? ভরত ধরেই নিয়েছে, নতুন বোমাটা বানানো হলে তাদের কার্যসিদ্ধি তো হবেই, নিজেরাও প্রাণে বাঁচতে পারবে। সে রকম বেগতিক দেখলে সুদূর পাঞ্জাব বা সিন্ধু প্রদেশে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে কিছুদিন। যতই অচেনা পরিবেশ হোক, যত দূরই হোক, তবু তো বেঁচে থাকা! এখন প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর সূর্যের আলো দেখার পরই মনে হয়, এই পৃথিবী কত সুন্দর! কয়েকটা টুনটুনি পাখি ডাকাডাকি করে, তাও মনে হয় কত মধুর! পাগল ছাড়া এই পৃথিবী কেউ এমনি এমনি ছেড়ে যেতে চায়!

আপাতত বেঁচে থাকার অন্য একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। বারীন দু'-তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে বলেছিল, এক সপ্তাহ কেটে গেল, তার পাত্তা নেই। কোনও চিঠিপত্রও লেখেনি। টাকা-পয়সাও নিঃশেষ, রান্নাঘরে চাল-ডালও বাড়ন্ত, এর পর খাওয়া জুটবে কী করে? ভরতের কাছে শেষ যে-কটি টাকা ছিল তা বারীনের যাওয়ার ভাড়ার জন্য দিতে হয়েছে, এখন উপায়? বারীন কি অসুস্থ হয়ে পড়ল? বারীন যদি আর না আসে? ওরা দু'জন এখান থেকে ফিরবেই বা কী করে?

আজ শুধু খিচুড়ি, আলু-বেগুনও জোটেনি। দুপুরে দুটো কলাপাতায় খিচুড়ি বেড়ে দিয়ে ভরত বলল, চাল-ডাল আজ শেষ। কয়েকটা ঝিঙে পড়ে আছে। ও বেলায় শুধু তার ঝোল হবে। কাল কী করে চলবে আমি জানি না। হেম, তোমার কাছে আর পয়সা আছে?

হেম বলল, আমার শেষ সিকিটা তো পরশু খরচ করে ফেললাম! আশা করি বারীন আজ এসে পড়বে!

ভরত বলল, যদি না আসে? ভদ্দরলোকের ছেলে, কারুর কাছে তো ভিক্ষেও চাইতে পারব না।

হেম বলল, এখানে আমাদের ভদ্দরলোক হিসেবে ক'জন চেনে? চুলে ধুলোবালি মেখে, খালি গায়ে, শুধু লুঙ্গি পরে যদি বাজারের কাছে বসি, কেউ ভিক্ষে দেবে না!

ভরত হেসে বলল, না, কেউ দেবে না। তুমি বা আমি যদি ভিখিরি সেজে বসি, লোকে বলবে, আ মর মিন্‌সে, খেটে খেতে পারিস না? অমন তাগড়া চেহারা নিয়ে ভিখ মাঙছিস লজ্জা করে না?

হেম বলল, তা হলে কুলিগিরির চেষ্টা করতে হবে। রেলের লাইন সারানো হচ্ছে দেখেছি।

ভরত বলল, স্থানীয় কুলিরা ঠেঙিয়ে আমাদের তাড়াবে! দুর্ভিক্ষের ধাক্কায় বহু চাষা-মজুর শহরে এসে ভিড় করেছে।

সে রাতেও বারীন ফিরল না। পরদিন আর উনুন ধরাবার প্রশ্ন নেই। কাছে যখন টাকাকড়ি থাকে, তখন একটা বেলা, কিংবা একটা গোটা দিনও কিছু না খেলে তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু আজ সকাল থেকেই পেট চুঁই চুঁই করছে, একটাই কথা মনে পড়ছে, কী খাব, আজ কী খাব?

দু'জনে দুটি বই খুলে চৌকিতে শুয়ে রইল। চোখ মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে সদর দরজার দিকে, কান এমনই উৎকর্ণ যে শালিক পাখির পায়ের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে। যদি বারীন আসে, সে এসে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। হেম পড়ছে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ', আর ভরত পড়ছে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', সে বইটার সামনের কয়েকখানা পাতা ছেঁড়া।

পড়তে পড়তে একসময় ভরত হো-হো করে হেসে উঠল। হেম পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করল, কী হে, এত হাসির কী হল?

ভরত বলল, এই জায়গাটা শুনবে? 'মা শুনে বড় খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্য ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলেবেলায় আমাদের এ সংস্কার ছিল; সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম। আর আমাদের মঞ্জুরী বলে দিশি একটি সাদা বেড়াল ছিল (আহা কাল সকালে সেটি মরে গ্যাছে— বাচ্চাও নাই) বাকী সে প্রসাদ পেতো।'

পড়া থামিয়ে ভরত বলল, কতকাল সন্দেশ খাইনি। এই সাদা বেড়ালটাকেও ভাগ্যবান মনে হচ্ছে না?

হেম বলল, সন্দেশ খেতে চাও, তোমার বাবুয়ানি তো কম নয়। দেখো ভাই, সারা দিন যদি ভাত-টাত নাও জোটে, পেটে কিল মেরে থাকতে পারি, কিন্তু এক কাপ চা না হলে যে চলে না। বিড়ি-সিগ্রেটও ফুরিয়ে গেছে। আমাদের প্রতিবেশী নলিনীবাবুর বাড়িতে গেলে কি এক পেয়ালা চা দেবে না ?

ভরত বলল, উনি ভুরু কুঁচকে কথা বলেন। বাগানে দাঁড়ালে দেখা হয়, কোনওদিন বাড়ির মধ্যে যেতে বলেননি। ওঁর বাড়িতে দুটি সোমত্থ মেয়ে আছে, তাই বোধহয় আমাদের সন্দেহ করেন।

হেম সোৎসাহে উঠে বসে বলল, এই তো একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। বারীন যদি না-ই ফেরে, তা হলে তোমায় একটি বিয়ে দেব এখানে। তুমি পাত্র হিসেবে খারাপ নয়, লেখাপড়া জানো, চেহারাপত্তর ভাল। তুমি জাতে তো কায়স্থ। নলিনীবাবুরাও কায়স্থ, আপত্তি হবে না বোধকরি।

ভরত বলল, আমি কায়স্থ না চাঁড়াল, তা বুঝবে কী করে ? তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস করবে ? আমার চালচুলো নেই, আর কারুর কাছে যে খোঁজ নেবে, তারও উপায় নেই। তুমিই বরং আর একটা বিয়ে করে ফেল।

হেম বলল, আমার একটি যে গৃহিণী আছে, তাতেই রক্ষা নেই। সৃষ্টিকর্তা মেয়েদের একটি সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র দিয়েছেন, তার নাম কান্না। তাতেই আমি কুপোকাত হয়ে গেছি কতবার। আর একটা বিয়ে করার বদলে আমি ফাঁসি যেতেও রাজি আছি।

এরূপ আলোচনা চলতে চলতেই দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বারীন নয়, এসেছে জগু। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর জগু জিজ্ঞেস করল, আজ রান্নার আয়োজন দেখছি না যে। বেলা তো প্রায় বারোটা বাজে।

হেম বলল, কালকের বাসি অনেক খাবার ছিল, সকাল সকাল খেয়ে নিয়েছি।

জগু বলল, তাই নাকি ? কী খেলেন ?

ভরত বলল, বেশ খানিকটা ঘি-ভাত ছিল। আর খাসির মাংস। মাংস রান্না বাসি হলেই ভাল জমে। চিংড়ি মাছও ছিল গোটা কয়েক। আর কামরাঙার অম্বল।

জগু বলল, আহা-হা, এ তো অতি উপাদেয়। আগে এলে একটু চেখে দেখতাম। সঙ্গে দই ছিল না। রংপুরের দই বিখ্যাত, আর পাতক্ষীর।

হেম বলল, তাই নাকি ? ও বেলা আনিয়ে খাওয়া যাবে।

জগু একটা বিড়ি ধরাল, হেম লোভীর মতন তাকিয়ে রইল তার দিকে। বিড়ির গন্ধে তার মন আনচান করছে। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় চাইতে পারল না।

জগু বলল, স্নান করবেন না ?

ভরত বলল, সকালেই সারা হয়ে গেছে।

জগু বলল, তা হলে উঠুন, কামিজ পরে নিন। আমার অর্ধাঙ্গিনী আজ আপনাদের নেমন্তন্ন করেছেন। এত জলদি জলদি যে এতসব ভাল ভাল খাদ্য খেয়ে বসে থাকবেন তা তো বুঝিনি আগে। চলুন, শুধু দুটি ডাল-ভাত খাবেন, একটু না হয় দেরি করেই খেতে বসব।

ভরত ও হেম পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করে একসঙ্গে হেসে উঠল। জগু না হেসে গম্ভীরভাবে ভরতকে বলল, আপনি তো মশাই ম্যাজিক জানেন। কাল সন্ধেবেলা দেখলাম ঝিঙের তরকারি রেঁধেছেন। আজ সেটা হয়ে গেল বাসি মাংস।

হেম বলল, তা হলে দিন, আগে একটা বিড়ি দিন। ভাত খাওয়ার আগে আপনার বাড়িতে চা খাব।

বারীন ফিরল পরের দিন। কিন্তু সে দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। চেষ্টা করেও সে মাত্র পঁচিশ টাকার বেশি জোগাড় করতে পারেনি। সে টাকাও দিয়েছেন অরবিন্দ ঘোষ, তিনি বলেছেন, তাঁর কাছে আর টাকা নেই। সত্যিই তো, তিনি বেশি টাকা পাবেন কোথায় ? যে-সব বড় মানুষেরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা কেউ পাত্তা দেয়নি। আসল ব্যাপারটি এই। ফুলার বধের পরিকল্পনা নিয়ে এই দলটি অনেক দিন বাইরে রয়েছে, তাতে কলকাতার নেতাদের ধারণা হয়েছে যে

এরা কাজের কাজ কিছুই না করে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে। সেজন্য আর কেউ টাকা দেবে না। একটা বড় রকমের অ্যাকশন করে দেখাতে পারলে অনেক অর্থ সাহায্য আসবে।

পঁচিশ টাকায় বিপ্লব ? নতুন বোমা বানাবার খরচই বা আসবে কোথা থেকে, ওদের খাওয়া-দাওয়াই বা কীভাবে চলবে। তবে কি এবারের মতন এ পরিকল্পনা বাতিল করে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় ? ভরত ফিরে যাওয়ার পক্ষে, বারীনও নিমরাজি। কিন্তু হেম জেদ ধরে রইল। সে কিছুতেই ব্যর্থতা স্বীকার করে নেবে না।

দু'দিন ধরে তর্কাতর্কি চলার পর তৃতীয় দিন উপস্থিত হল আর একজন। নরেন গোঁসাই। তাকে অরবিন্দবাবু পাঠিয়েছেন বিশেষ এক বার্তা দিয়ে। বারীনরা ফিরে যাক, এটা অরবিন্দবাবু চান না। কলকাতা থেকে আর অর্থ সংগ্রহের আশা নেই। এই রংপুর থেকেই টাকা তুলতে হবে। এমনিতে কেউ দেবে না। বারীনদের কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, সেগুলোকেই কাজে লাগাতে হবে।

অর্থাৎ ডাকাতি। হেম আর বারীন রাজি হয়ে গেলেও এই ব্যাপারটা ভরতের মনঃপূত নয়। চার বছর আগে যতীন বাড়ুজ্যের আখড়ায় জমায়েত হবার সময় কয়েকবার ডাকাতি করে টাকা তোলা হয়েছিল, সেই টাকার কোনও হিসেব নেই, সব নয়-ছয় হয়ে গেছে। এ কাজ অনৈতিক। বিপ্লবীদের নামে কলঙ্ক লাগবে। দেশের মানুষের ওপর ইংরেজরা অত্যাচার চালাচ্ছে, তার ওপর বিপ্লবীরাও অত্যাচার চালাবে ?

নরেন বলল, তোমার এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই ভুল। আমরা তো নিজেদের স্বার্থে কিছু করছি না। দেশের কাজের জন্যই টাকা চাই। সে টাকা তো দেশের মানুষই দেবে। যদি স্বেচ্ছায় দিতে না চায়, তা হলে আপাতত জোর করে আদায় করতে হবে। সে টাকার পাই-পয়সা পর্যন্ত হিসেব রাখা হবে এবার। বেশি বড় দল দরকার নেই, আমরা চারজনই যথেষ্ট।

ভরত বলল, একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই। আমার কাছে রিভলবার আছে বলেই আমি দেশের মানুষকে মারতে পারব না। সেটা পাপ। ডাকাতি করতে গিয়ে যদি বাধা আসে, তখন কী হবে ?

নরেন বলল, মানুষ মারতে হবে না, ভয় দেখালেই যথেষ্ট। ফাঁকা আওয়াজ করব। কেউ কাছাকাছি এসে পড়লে বড়জোর পায়ে গুলি চালাব। দেশের কাজের জন্য কোনও কিছুই পাপ নয়।

শুরু হল ডাকাতির পরিকল্পনা। ভরত একটা ব্যাপারে অবাক হল, অরবিন্দবাবু নরেনকে এ কাজের জন্য পাঠালেন কেন ? সে জমিদারের ছেলে। এককালে বাংলার সব জমিদারই নাকি ডাকাত ছিল, কিন্তু ইংরেজ আমলে তাদের জারিজুরি ভেঙে গেছে, ইংরেজরা নিজেরাই সবচেয়ে বড় ডাকাত বলে অন্য সব ডাকাতদেরই ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। এখনকার জমিদাররা অলস, ভোগবিলাসে মত্ত। নরেনের দুধ-ঘি-মাখন খাওয়া চেহারা। সন্ন্যাসীদের মতন গেরুয়া পোশাক পরে। তবু ডাকাতির ব্যাপারে তারই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ। অবশ্য আনন্দমঠের বিপ্লবীরাও সন্ন্যাসী ছিল।

ঠিক হল নবগ্রাম নামে একটি জায়গার এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ডাকাতি করাই সুবিধাজনক। সে ব্রাহ্মণটি অতি কৃপণ ও সুদে টাকা খাটায়। খাতকদের নানাভাবে হেনস্থা করে, জমি নিলাম করিয়ে দেয়। লোকটি অতি বদ, তার টাকা কেড়ে নেওয়ায় দোষ নেই। তার পরিবারে লোকসংখ্যাও বেশি নয়।

রংপুরের দুটি যুবককে নানাভাবে পরীক্ষা করে দলে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোক ছাড়া সব খবরাখবর সংগ্রহ করা যায় না। তাদের মধ্যে একজনের মামাবাড়ি ওই নবগ্রামে। সে আগের রাতে সেখানে চলে যাবে। এই দলটি ঠিক রাত একটায় পৌঁছলে সে সংকেত দেবে।

সবাই দিনের বেলা ভাল করে ঘুমিয়ে নিল। বিকেলবেলা ভাল করে চা, নিমকি ও পাতক্ষীর খাওয়া হল, তারপর দলটি রওনা দিল সন্ধের অন্ধকার নেমে আসার পর। পথ দেখাবে স্থানীয় অন্য যুবকটি। আগের রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেছে, সমস্ত রাস্তাই কাদা। নিঃশব্দে হাঁটতে গেলেও ছপছপ শব্দ হয়। লোকবসতি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। সাপখোপের ভয় পদে পদে। একটা ব্যাঙের ওপর পা পড়তে ভরত আতঙ্কে প্রায় চিৎকার করে ফেলেছিল আর একটু হলে !

চার বছর আগে এই রকম অভিযানে দলে লোকসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ডাকাতের বড় দলবল দেখলেই গ্রামবাসীরা ভয় পায়। এবারে অন্য কৌশল ঠিক করা হয়েছে। মহাজন ব্রাহ্মণটি যে বালিশ মাথায় দিয়ে শোয়, সেই বালিশের মধ্যেই তার জমানো টাকা, সোনা-দানা থাকে। টাকার গরম ছাড়া তার ঘুম হয় না। কোনওক্রমে সেই বালিশটি কেড়ে নিতে হবে। বেশি লোককে সে বিশ্বাস করে না, একজন নমঃশূদ্র পাহারাদার শুয়ে থাকে তার দরজার বাইরে। লাঠি ছাড়া কাছে আর কোনও অস্ত্র থাকে না। রিভলবারের ভয় দেখিয়ে তাকে কাবু করতে হবে। বুড়োর কাছ থেকে বালিশটা কেড়ে নিয়ে পালাতে হবে ঝটাপট।

বাড়ির মধ্যে ঢোকারও একটা উপায় পাওয়া গেছে। গোয়ালঘরের গা ঘেঁষে রয়েছে একটা বড় চালতাগাছ। সেই গাছ বেয়ে খড়ের চালে নামা যায়। সেখান থেকে উঠোনে। কিন্তু বুড়ো তো নিজের ঘরের দরজা খুলে ঘুমোবে না, সেই দরজা ভাঙা যাবে কী করে? ভাঙতে গেলে প্রচণ্ড শব্দ হবেই। যদি বর্মা টিকের দরজা হয়, তা ভাঙাও সহজ কর্ম নয়। না ভেঙেও কার্য উদ্ধার করা যায়, তাতে ধৈর্য লাগবে। ব্রাহ্মণটি রাত্তিরে তিনবার অন্তত প্রস্রাব করবার জন্য বাইরে আসে। সেরকম একবারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

তা হলে, প্রথমে একজন চালতাগাছ বেয়ে উঠোনে নামবে। নেমেই সে সদর দরজা খুলে দেবে ভেতর থেকে। এ কাজের ভার নেবে হেম। সবসময় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নেবার জন্য সে বদ্ধপরিকর। দরজা খোলা পেয়ে অন্যরা ভেতরে ঢুকে পাহারাদারটিকে কাবু করবে। আর যদি সদর দরজার ভেতর থেকে তালা দেওয়া থাকে? তা হলে হেম সঙ্কেত দেবে, অন্যদেরও ওই চালতাগাছ বেয়েই যেতে হবে অন্দরে।

ভরত জিজ্ঞেস করেছিল, পাহারাদারটি যদি আগেই জেগে উঠে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে? এদের লাঠির জোর সাঙ্ঘাতিক হয়।

বারীন উত্তর দিয়েছিল, অগত্যা তা হলে ওকে মারতেই হবে। একটা গুলিই যথেষ্ট।

নরেন বলেছিল, না না। খুন করার দরকার হবে না। গ্রামের লোকেরা সাহেবদের কাছে ছাড়া বন্দুক-পিস্তল দেখেইনি। সাহেবদের অস্ত্র হিসেবে এগুলোকে ওরা যমের মতন ভয় পায়। দেখালেই থরথরিয়ে কাঁপে। বড়জোর হাতে বা পায়ে গুলি চালাতে হবে।

হেম বলেছিল, গুলি চালালে শব্দ হবে। তাতে বুড়োটা ঘর থেকে বেরুবে কেন। আগে দেখতে হবে, লোকটা ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে। কোন পজিশনে শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে গিয়ে পেছন দিক থেকে ওকে জাপটে ধরে মুখ বেঁধে দিতে হবে। আমার ওপর সে ভার ছেড়ে দাও, সেটা আমি পারব।

বারীন বলেছিল, যেমন করেই হোক, বুড়োর বালিশটা আমাদের চাই-ই। তাতে দু'-একজন ঘায়েল হয় তো হোক, এ ব্যাপারে আমাদের মন শক্ত করতে হবে। কিছুতেই খালি হাতে ফিরব না।

পুকুরধারে পাশাপাশি দুটো ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ, সেখানে এসে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দেশলাই জ্বেলে দেখছে বারীন, একটা প্রায় বাজে। জায়গাটাতে অসম্ভব মশা, কাছেই শ্মশান ছিল কিনা কে জানে। বিকট পচা গন্ধ আসছে একদিক থেকে।

একটা বেজে গেল, তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। যে যুবকটি আগে থেকেই এখানে আছে, সে কি ঘুমিয়ে পড়ল? কিংবা ভয় পেয়ে গেল? আগে সে খুব সাহস দেখিয়েছিল। মশার কামড়ে এখানে আর তিষ্ঠনো যাচ্ছে না। ছেলেটি সংকেত না দিলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে? টাকা চাই, টাকা চাই। ফুলার-বধ আর কতদিন বিলম্বিত করা যায়? আজ রাত্তিরেই যা হোক একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে হবে।

এর মধ্যে চাঁদ উঠে গেল। যাঃ, কোন তিথি তা হিসেব করে আসা হয়নি। কাল রাতে অত মেঘ ছিল, আজ একেবারে আকাশ পরিষ্কার, ফটফট করছে জ্যোৎস্না।

অন্যরা জ্যোৎস্না দেখে উদ্বিগ্ন হলেও হেম বলল, ভালোই হল, খড়ের চালে বসে বাড়ির ভেতরটা

মোটামুটি দেখে নেওয়া যাবে। কিন্তু ছেলেটি না এলে বুড়োর বাড়ি চেনাবে কে?

অন্য যুবকটি বলল, সে বাড়ি আমিও চিনি। কিন্তু কিছু কি গণ্ডগোল হল?

হেম বলল, চলো, তা হলে যাওয়া যাক।

বারীন বলল, বালিশটা আমার কাছে থাকবে। ফেরার সময় আমরা আলাদা আলাদা ফিরব। যে যেদিকে পারে। দু-একদিনের মধ্যে রংপুর শহরে না ফিরলেও ক্ষতি নেই।

একটা বাঁধের মতন উঁচু রাস্তা, দু'পাশে মাঠ। তারপর একটি পাড়া। ব্রাহ্মণের বাড়িটি ফাঁকা জায়গায় নয়, দূরে কাছে কয়েকটি বাড়ি আছে, শোরগোল উঠলেই অন্য প্রতিবেশীরা জেগে উঠতে পারে। এদের একমাত্র ভরসা আগ্নেয়াস্ত্র। ভরত অনুভব করল, আজকের পরিকল্পনায় যুক্তির বদলে দুঃসাহসই বেশি। অন্য যুবকটি এল না কেন? ঠিক ভয় নয়, বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ, কিছু যেন ভুল হয়ে গেছে।

আপাতত বাড়িগুলি ঘুমন্ত নিঝুম, কোথাও বাতি জ্বলছে না। ব্রাহ্মণের বাড়িটি বেশ সুরক্ষিত, উঠোনটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। গোয়ালঘরটি মূল বাড়ি থেকে অনেকটা তফাতে, মাঝখানে উঠোন। একটা কুকুর ওদের সঙ্গে সঙ্গে এসে অনবরত ডেকে চলেছে। স্থানীয় যুবকটি মাটি-ঢেলা ছুঁড়ে সেটাকে তাড়াতে চাইলেও সেটা খানিক দূরে গিয়ে ফিরে আসছে আবার।

হেম ধুতির বদলে হাফপ্যান্ট পরে এসেছে, কোমরে রিভলবার বাঁধা, চালতাগাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল। বেশ স্বাস্থ্যবান, বড় গাছ, ঘন পাতায় ঢাকা, খসখস শব্দ হচ্ছে পাতায়। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা ডাল ধরে দোল খেতে খেতে হেম লাফিয়ে নামল খড়ের ঢালু চালে। সেখানে বসে রইল কয়েক মিনিট, তারপর ঠিক একটা বাঘের মতন গুঁড়ি মেরে মেরে এগুতে লাগল। একটু পরে তাকে আর দেখা গেল না।

এ পর্যন্ত ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। হেম লাফিয়ে নেমেছে মাটিতে? পাহারাদারটি ঘুমন্ত না জাগ্রত? হেম আগে দরজা খুলে দেবে, না আগে পাহারাদারটিকে একাই কাবু করতে যাবে? অধীর প্রতীক্ষা। একটা একটা করে মুহূর্ত গোনা হচ্ছে।

হেম দরজা খুলে দেবার আগেই কিছুটা দূরে অকস্মাৎ বহু মানুষের চিৎকার শোনা গেল। কারা যেন ইতস্তত ছোটাছুটি করছে, জ্বলে উঠল কয়েকটি মশাল। এদিকেই ছুটে আসছে, মার মার, ডাকাত ডাকাত রব শোনা যাচ্ছে। কী হল ব্যাপারটা? এখানে কেউ জাগেনি এখনও, অত দূরে ওরা ডাকাতির কথা টের পেল কী করে? আগের যুবকটি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? এদের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে?

সত্যি সত্যি ক্রুদ্ধ জনতা ছুটে আসছে এদিকেই। এরই মধ্যে কাকে যেন ধরে ফেলে মার শুরু করেছে। শোনা গেল তার আর্ত চিৎকার। কিছু লোক তাড়া করছে, কিছু লোক ছুটে পালাচ্ছে। ওরা কারা?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল ব্যাপারটা। এ বাড়ির ডাকাতদের কথা কেউ এখনও টের পায়নি। কিন্তু এমনই ভাগ্যের পরিহাস, আজই, এই একই সময়ে এ গ্রামের অন্য একটি বাড়িতে, ডাকাত পড়েছে। তারা সত্যিকারের ডাকাত দল, যে বাড়িতে তারা হামলা করতে গিয়েছিল, সেটা নায়েবের বাড়ি, তার বরকন্দাজদের সঙ্গে গ্রামের লোকও লাঠি-সোঁটা নিয়ে ডাকাতদের পিছু নিয়েছে।

তা হলে তো আর এখানে থাকা চলে না। বারীন চেঁচিয়ে বলল, রিট্রিট, রিট্রিট!

ভরত বলল, হেম? হেম যে এখনও ভেতরে?

হেমের জন্য অপেক্ষা না করে দলের অন্যরা দিকবিদিক ভুলে দৌড় দিল। ভরত তবু না নড়ে গলা ফাটিয়ে ডাকল, হেম, হেম! বেরিয়ে এসো!

কোনও উত্তর নেই। কিন্তু জনতার অগ্রবর্তী কয়েকজন ভরতের গলা শুনতে পেয়েছে। দু'জন লোক বলল, ওই তো এক শালা!

ভরত এবার দৌড়েও বেশি দূর যেতে পারল না। সেই দু'জন দু'দিক দিয়ে তাকে প্রায় বেষ্টন করে ফেলেছে। ওদের হাতে বর্শা। ভরত রিভলবারটা বার করে বলল, সাবধান! গুলি খেয়ে

মরবি, হটে যা !
একজন ভরতের দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারল। ভরত গুলি চালাতে দ্বিধা করল তবু। তার হাত কাঁপছে। সে মানুষ মারবে ? সে না মারলে এরা তাকে মেরে ফেলবে। সে নলটা ওপরের দিকে করে ট্রিগার টিপল দু'বার, সেই শব্দে কাজ হল। তার অনুসরণকারীরা গুলি না খেয়েই আছড়ে পড়ল মাটিতে, তারপর হ্যাচোড় প্যাচোড় করে পালাতে লাগল।

অন্য কোথাও আরও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভরত দৌড়চ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে জানে না, ঢুকে পড়েছে একটা জঙ্গলে। জ্যোৎস্না রয়েছে, তবু মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখছে কেন ? পেটে এত ব্যথা, এ কী পেটে একটা বর্শা গেঁথে আছে, তার মস্ত বড় ডান্ডাটা নিয়েই সে ছুটছে এতক্ষণ ? বর্শাটা কখন লাগল সে টেরও পায়নি। এতক্ষণ ব্যথাও করেনি। এটা আগে তুলে ফেলা দরকার। ডান্ডাটা ধরে টানাটানি করতে সেটা ভেঙে গেল মট করে। ফলাটা গেঁথে রইল পেটে।

ভরত ছুটছে। তাকে বাঁচতেই হবে। হেমের কী হল, ওই বাড়ির মধ্যে আটকা পড়ে গেছে ? হেম সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়, হেমের মাথায় ঝটিতি বুদ্ধি খেলে। হেম যদি চালতাগাছটার ওপরে বসে থাকে, কেউ তার অস্তিত্ব টের পাবে না। সেটাই সবচেয়ে ভাল উপায়। লোকজন সরে গেলে সে চুপি চুপি নেমে সরে পড়তে পারবে। বারীনরা আগেই ছুটে গেছে, ভরতেরই একটু দেরি হয়ে গেল। এই সব চিন্তা বিদ্যুতের মতন মাথায় আসছে বটে, তার মধ্যেই ভরত অনবরত ভেবে যাচ্ছে, তাকে বাঁচতেই হবে, যে-কোনও উপায়ে বাঁচতেই হবে। ক্রুদ্ধ জনতা ধেয়ে আসছে তার দিকে, রক্তপিপাসু কণ্ঠে তারা চিৎকার করছে, ধরো, ধরো, মারো শালাকে।

প্রকৃতপক্ষে অনুসরণকারীরা জঙ্গলে ঢোকেনি, চলে গেছে অন্য দিকে। তবু ভরত শুনতে পাচ্ছে সেই শাসানি, শুনতে পাচ্ছে বহু মানুষের পায়ের আওয়াজ, তার কানে তালা লেগে যাচ্ছে। যেন স্বয়ং মৃত্যু সহস্র মানুষের রূপ ধরে কেড়ে নিতে আসছে তার প্রাণ। ভরত ছুটছে, মাঝে মাঝে আছাড় খেয়ে পড়ছে,, আবার উঠে ছুটছে, পেটের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে অবিরাম, তার খেয়াল নেই, যন্ত্রণায় দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে আসছে, তবু যেন তার যন্ত্রণাবোধ নেই, তাকে পালাতেই হবে।

একটা ছোট নদীতে হাঁটুজল, তাও ভরত ছপছপিয়ে পার হয়ে গেল। এপারে জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে, এখনও কোনও জনবসতি আসেনি। হাপরের মতন বুকটা ওঠানামা করছে ভরতের, গলা শুকিয়ে কাঠ, সে আর দম নিতে পারছে না। কীসে যেন পা লেগে ভরত আবার পড়ে গেল, এখনও সে শুনতে পাচ্ছে অনুসরণকারীদের হিংস্র গর্জন। এক্ষুনি এসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। ভরত মুখ তুলে দেখল, অদূরেই একটা সিঁড়ি, সে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল সেদিকে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওঠার পর একটা আধো অন্ধকার ঘর। সেটার মধ্যে ঢুকেই ভরত প্রাণপণে আবার উঠে দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে গেল, দরজার একটা পাল্লা ভাঙা, বন্ধ করার উপায় নেই, ভরত লুকোতে চাইল ঘরের এক কোণে, আর একবার কোনও কঠিন বস্তুতে গুঁতো খেয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল।

বেশিক্ষণ নয়, ফের উঠে বসল ভরত। এখন সব দিক দারুণ নিস্তব্ধ। আর কোনও চিৎকার সে শুনতে পাচ্ছে না কেন ? তবে কি ইতিমধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে গেছে ! তার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে আত্মা ! ভরত নিজের শরীরে হাত বুলিয়ে দেখল, না। শরীরটা সে অনুভব করতে পারছে, পেটে ঢুকে আছে বর্শার ফলা। এটা কোন জায়গা ? এটা একটা পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দির, ওপরের ছাদ খানিকটা নেই, সেখান দিয়ে এসে পড়েছে একটুকু চাঁদের আলো। ভরত দেখতে পেল, মাঝখানে একটি কালী প্রতিমার সঙ্গে সে ধাক্কা খেয়েছিল।

সে সেই দেবীমূর্তির পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে বলতে লাগল, মা, মা, আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও ! ওরা আমাকে মারতে আসছে, তুমি রক্ষা করো। মা, মা...

ভরত সেই প্রার্থনা জানাতে জানাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কিছুতেই মরতে চায় না। এখন একমাত্র কোনও দৈব ক্ষমতাই তাকে বাঁচাতে পারে।

এক সময় তার অশ্রু নিঃশেষ হয়ে গেল। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না। চোখের সামনে একটা অন্ধকার পর্দা দুলছে। ভরত নিজেই বুঝতে পারছে, তার শরীর থেকে চলে যাচ্ছে সব ক্ষমতা।

এর নামই মৃত্যু। পেটে বর্শার ফলা ঢুকলে কেউ বাঁচে ? সেই অল্প বয়েস থেকে মৃত্যু তাকে তাড়া করে আসছে, এবার সফল হল। ভরত ভাবল, বেছে বেছে শুধু তাকেই কেন ? জীবনের কাছে সে কী অপরাধ করেছে ? কত মানুষ ভালবাসা পায়, সংসার পায়, ছোট ছোট আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকে। মৃত্যু তাকে কিছুই দিল না। এইভাবে মরতে হবে ? সবাই জানবে, সে এক ঘৃণ্য ডাকাত ! অন্য ডাকাত দলের একজন মনে করবে। যে অপরাধ সে করেনি, সেই অপবাদ নিয়ে তাকে চলে যেতে হবে পৃথিবী থেকে।

চোখে চরম ঘুম নেমে আসছে। সেই অবস্থাতেও ভরত মাটির মূর্তির পা ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে এক জীবনব্যাপী অভিমান ও বেদনার সঙ্গে বলতে লাগল, কেন, কেন, আমাকে বাঁচতে দিলে না। তুমি মিথ্যে, মিথ্যে ! সব মিথ্যে ! কেউ আমাকে একটুও ভালবাসল না।

কয়েকবারের ঝাঁকানিতে সেই পুরাতন মাটির মূর্তি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ভরতের ওপর। ভরতের শরীর নিথর হয়ে গেল।

৮৩

এত বিশাল নদী, যেন অপার বারিধি। সত্যিই, এই নদীর প্রান্তে দাঁড়ালে যেন সমুদ্র দর্শন হয়। শুধু উত্তাল জলরাশি, পরপার দেখা যায় না। নদী নয় অবশ্য, নদ, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র, ব্রহ্মপুত্র। 'ব্রহ্মপুত্র মহাভাগে শান্তনু কুলনন্দন'। তিব্বতের মানস সরোবরে এর উৎপত্তি, তিব্বতের আদি নাম শাংপো, সংস্কৃতে সেই শাংপো-ই হয়েছে শান্তনু। পাহাড় থেকে সমতলে নামার পর এই নদ ক্রমশ বিশাল আকার ধারণ করেছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র তেজী, দুর্দান্ত ; উত্তরবঙ্গে কুড়িগ্রামের কাছে অপেক্ষাকৃত শান্ত কিন্তু সুবিস্তৃত।

লোকে অবশ্য মুখে মুখে নদীই বলে। নদ-নদীগুলির কে নামকরণ করেছে কে জানে, কেন একটি জলধারা হবে নদ, অন্যটি হবে নদী, তাও জানার কোনও উপায় নেই, এখন লিঙ্গ নির্ধারিত থাকে কাগজে-কলমে, সাধারণ মানুষ সব নদীকেই নারী মনে করে, তাই ব্রহ্মপুত্রও নদী।

এই ব্রহ্মপুত্র বক্ষে একটি বড় আকারের বজরায় কয়েকদিন ধরে আস্তানা গেড়েছে দ্বারিকানাথ ও বসন্তমঞ্জরী। তাদের পুত্রসন্তানটির বয়েস এখন ছ' বছর, ভারী সুশ্রী ও বুদ্ধিমান ছেলে, তার নাম সত্যানন্দ, ডাকনাম ছোটকু। পাহারাদার, দাস-দাসী-পাচক নিয়ে জলের ওপর রীতিমতন এক সংসার। ওই সব কর্মচারীদের জন্য বজরার সঙ্গে বাঁধা আছে আরও দুটি বোট।

রাত পোহালে সর্বপ্রথম ঘুম ভাঙে বসন্তমঞ্জরীর। একেবারে ব্রাহ্ম মুহূর্তে। প্রতিদিন সূর্যোদয় দেখা তার নেশার মতন দাঁড়িয়ে গেছে। দ্বারিকা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, সূর্য দেখার জন্য তাকে ডাকলেও সে জাগে না, বরং বিরক্তি প্রকাশ করে। আর কেউই জাগে না, বজরার ছাদে উঠে হাঁটু গেড়ে সূর্যমুখী হয়ে বসে থাকে বসন্তমঞ্জরী। নদীগর্ভ থেকে একটি লাল গোলকের মতন লাফিয়ে উঠে আসে সূর্য, তখন তাকে আকাশের বদলে জলের দেবতা বলে মনে হয়, সেই মুহূর্তটিতে হাত জোড় করে বসন্তমঞ্জরী প্রণাম জানায়, কোনও কোনও দিন খুব মৃদু স্বরে আপনমনে গান করে। সেই গান অনেকটা কান্নার মতন শোনায়। কবে যে বসন্তমঞ্জরীর মনে গান আসবে তার ঠিক নেই, কখনও মাসের পর মাস সে গান করে না, স্বামীর অনুরোধেও গলা খোলে না, আবার হঠাৎ এক এক দিন নিজে থেকে গেয়ে ওঠে।

স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার, কোনও কিছুরই অভাব নেই, তবু বসন্তমঞ্জরী ঠিক সংসারী হতে পারল না। তার মধ্যে একটুও গৃহিণীপনা নেই। প্রতিদিন কী রান্না হবে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায়

না, কোনও খাদ্যদ্রব্যের প্রতিই তার নিজস্ব ঝোঁক নেই, টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটি বিষয়েও লোভ নেই, এমনকী নিজের ছেলের সম্পর্কেও যেন সে খানিকটা উদাসীন। প্রতিটি মা-ই সন্তানকে ভালবাসে, বসন্তমঞ্জরীই বা ভালবাসবে না কেন, কিন্তু সে ছেলেকে নিয়ে আদিখ্যেতা করে না, ছেলের জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত আছে, তার ওপর ভার দিয়েই সে নিশ্চিন্ত। সে যেন সুরলোকের মানুষ, কখনও পুরোপুরি বাস্তবে নেমে আসে না, কখনও সখনও সে গাছপালার দিকে অনেকক্ষণ এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন সে প্রকৃতির নিঃশব্দ সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে সে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার জন্য ছাদে বসে থাকে একা। পুকুরে স্নান করতে গেলে যেন জলের সঙ্গে কথা বলে। হঠাৎ হঠাৎ সে ঘরের সাদা দেওয়ালের দিকে এমন ভাবে মনোযোগী হয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেন কোনও গ্রন্থ পাঠ করছে।

অনেকে আড়ালে বসন্তমঞ্জরীকে পাগল বলে, দ্বারিকার বোন-ভগ্নীপতি ও অন্যান্য আত্মীয়রা মনে করে, বসন্তমঞ্জরীর হাব-ভাব মোটেই স্বাভাবিক নয়। তা তো মনে করবেই। অধিকাংশ সংসারী মানুষই একরকম ধরাবাঁধা নিয়মে চলে, যাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার মেলে না, তাদেরই তারা মনে করে অস্বাভাবিক। দ্বারিকা তার স্ত্রীর এই সব পাগলামি মোটামুটি পছন্দই করে, শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া। মাঝে মাঝে বসন্তমঞ্জরীর মুখচোখের চেহারা বদলে যায়, তখন যেন তার শরীরে কিছু একটা ভর করে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে, যে-ঘটনা তখনও ঘটেনি তা সে বলে দেয়, কিংবা অনেক দূরে যা ঘটছে, তা যেন দেখতে পায় সে। দ্বারিকা তখন খুব অস্বস্তি বোধ করে, নিজের স্ত্রীকে কেউ জাদুকরী হিসেবে দেখতে চায় না। এ জন্য দ্বারিকা কবিরাজ ডেকে চিকিৎসাও করিয়েছে বসন্তমঞ্জরীর। বসন্তমঞ্জরী নিজেও ওই ব্যাপারটার জন্য লজ্জা পায়, ঘোর কেটে গেলে সে কান্নাকাটি করে, স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বারবার বলতে থাকে, কেন, কেন আমার এমন হয়! আমি নিজেই যে কিছু বুঝি না!

বসন্তমঞ্জরীর বিবাহ উপলক্ষে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল শহরে। নিজের প্রজারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ক্রুদ্ধ দ্বারিকা বিক্রি করে দিয়েছিল জমিদারি। তারপর সে এটা-সেটা ব্যবসায়ের চেষ্টা করেছিল, কোনওটাতেই তেমন সফল হয়নি। তা ছাড়া বসন্তমঞ্জরী এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে চায় না, কলকাতায় তার মন টেঁকে না, অনবরত ভ্রাম্যমাণ হলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে কী করে? অনেক ভেবে-চিন্তে দ্বারিকা সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আবার একটি জমিদারি কিনে ফেলেছে। জমিদারিই এখন সবচেয়ে লাভজনক, সর্বক্ষণ জমিদারের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না, নায়েব-গোমস্তা দিয়ে কাজ চালানো যায়, জমিদারের দর্শন যত দুর্লভ হয়, প্রজারা তত বেশি সমীহ করে। তার অসামাজিক বিবাহের কথা মানুষের মনে নেই।

দ্বারিকার আগের জমিদারি ছিল খুলনায়, এখন কিনেছে জঙ্গিপুরে। যে ঋণগ্রস্ত জমিদারের কাছ থেকে দ্বারিকা এটি কিনেছে, তার আরও পাঁচটি তালুক ছড়িয়ে আছে বাংলার বিভিন্ন জেলায়। দ্বারিকা এক সঙ্গে সব কিছুরই মালিক হয়েছে, তবে দূর দূর স্থানের ছোটখাটো তালুকগুলির খবরদারি করা কষ্টকর, সে জন্য সেগুলি আস্তে আস্তে বিক্রি করার উদ্যোগ নিয়েছে সে। কুড়িগ্রামের কাছে সেরকম একটি তালুক আছে। কিন্তু এ জায়গাটিতে এসে এখানকার প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছে বসন্তমঞ্জরী, তাই অচিরে এই তালুক বিক্রি করার সংকল্প পরিত্যাগ করা হয়েছে। এখানে বেশ কিছু দিন থেকে যাবার আরও একটি কারণ আছে। বঙ্গভঙ্গের ফলে এই জেলা নবগঠিত প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে পড়েছে, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে এখনও। সরকারি স্কুলের ছাত্ররা বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে প্রতিবাদ মিছিল করেছিল, সেই অপরাধে সেপাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের লাঠিপেটা করেছে, রক্তপাতও হয়েছে যথেষ্ট, শুধু তাই নয়, গভর্নর সাহেবের নির্দেশে সেই স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এই ঘটনা শুনে দ্বারিকা দারুণ বিক্ষুব্ধ। সে ঘোষণা করে দিয়েছে, নিজ ব্যয়ে সে এখানে একটি স্কুল খুলে দেবে, যা সরকারি সাহায্যের তোয়াক্কা করবে না। সেই স্কুল ভবন দ্রুত নির্মিত হচ্ছে, শেষ হলে দ্বার উদ্ঘাটন করে দিয়ে তবে সে কুড়িগ্রাম ছেড়ে যাবে বগুড়ার দিকে।

কাল শেষ রাতে জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশ এখনও মেঘলা। আজ সূর্যোদয় দেখা যাবে কি না সন্দেহ। বজরার ছাদে বসে আছে বসন্তমঞ্জরী, পূর্ব দিকে মুখ করে। একটু একটু আলোয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে অন্ধকার। ফিনফিনে বাতাসে কাঁপছে ব্রহ্মপুত্রের জল।

অনেক দিন পর আপনা আপনি বসন্তমঞ্জরীর কণ্ঠ থেকে সুর বেরিয়ে এল।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নব ঘন মেঘ ডাকে
বিজুলি চমকে লাগে ডর, চল যাবো ঘর
কদমতলায় নিশি হল ভোর।
একটা কদমের তলে
কৃষ্ণ ঘুমালো বলে
বাঁশিটি তো নিয়ে গেল চোর....

হঠাৎ গান থামিয়ে দিয়ে দ্রুত পদে নীচে নেমে এল বসন্তমঞ্জরী। স্বামীর কক্ষে এসে পালঙ্কের পাশে দাঁড়াল। নাসিকা-গর্জন করতে করতে হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রিত রয়েছে দ্বারিকা। তার চেহারাটি এখন বেশ স্থূল, সেই অনুযায়ী গোঁফটিও সুপক্ক হয়েছে, জমিদার হিসেবে তাকে বেশ মানায়। বসন্তমঞ্জরী আগেকার মতনই তন্বী।

আস্তে আস্তে স্বামীর গায়ে কয়েকবার ঠেলা দিয়ে সে ডাকল, এই, এই, একটু উঠবে?

অত সহজে জেগে ওঠার পাত্র নয় দ্বারিকা। গত রাতে একটু বেশি মদ্যপান হয়েছে। সেই সঙ্গে গুরুভোজন, বেলা দশটা-এগারোটার আগে তার ঘুম ভাঙার কথা নয়।

বসন্তমঞ্জরী ব্যস্তভাবে জোরে জোরে ঠেলতে লাগল।

নাসিকা-গর্জন থেমে গেল দ্বারিকার, একটু পরে চোখ না মেলে বিরক্তভাবে বলল, কে?

বসন্তমঞ্জরী বলল, ওগো, বজরাটা চালাতে বলবে?

দ্বারিকা বলল, কী?

বসন্তমঞ্জরী খুব কোমল অনুনয়ের সুরে বলল, বজরাটা তিন দিন ধরে এই এক জায়গায় থেমে আছে, আমার ভাল লাগছে না। একটু চালাতে বলো না!

পুরোপুরি চক্ষু মেলল দ্বারিকা, কথাটা বুঝতে কিঞ্চিৎ সময় নিল। তারপর বলল, এই আবার পাগলামি শুরু হল। এখনও সূয্যি ওঠেনি, কাকপক্ষী ডাকেনি এখন বজরা চালাবে কে? দাড়ি-মাঝিরা গ্যাঁজায় দম দিয়ে ঘুমোচ্ছে!

বসন্তমঞ্জরী বলল, তুমি ডাকলে তারা উঠবে না?

দ্বারিকা আবার পাশ ফিরে চক্ষু মুদে বলল, ঠিক আছে, তোর ইচ্ছে হয়েছে যখন, দুপুরবেলা চালাতে বলব।

বসন্তমঞ্জরী বলল, না দুপুরে চাই না! এখন! এখানকার আকাশ মেঘলা, আজ সূর্যোদয় দেখা যাবে না, খানিক দূর গেলে দেখা যাবে।

দ্বারিকা বলল, এমন উদ্ভুট্টে কথা কখনও শুনিনি! মেঘ কি এক চিলতে হয়? এখানে যে-মেঘ, দশ মাইল দূরে গেলেও সেই মেঘ। এখন উঠে সবাই মিলে তৈরি হতে হতেই অনেক বেলা হয়ে যাবে। সূয্যি কি বসে থাকবে তোর জন্য! আমাকে আর একটু ঘুমোতে দে!

বসন্তমঞ্জরী ব্যাকুলভাবে বলল, বড় বজরা ছাড়তে যদি অসুবিধে হয়, একটা ছোট বোট নিয়ে তো যাওয়া যায়। চলো, আমার খুব ইচ্ছে করছে!

অন্য কেউ এ রকম বেয়াদপি করলে সিংহগর্জনে ধমক দিত দ্বারিকা। সে শুধু কটমট করে তাকাল স্ত্রীর দিকে। এই ছোট্টখাট্ট তরুণীটির কাছে সে জব্দ। একে সে বকুনি দিতে পারে না। কারণ, সে জানে, সংসারে মন গাঁথেনি বসন্তমঞ্জরীর, জাগতিক কোনও বিষয়ের প্রতিই তার আসক্তি নেই, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে সে হঠাৎ এ সংসার ছেড়ে চলে যেতে পারে। আত্মহননও বিচিত্র নয়। সেই জন্যেই এর অনেক অযৌক্তিক আবদার তাকে মেনে নিতে হয়।

সে বলল, ঠিক আছে কাল সকালে যাব। আজ ব্যবস্থা করে রাখব।

বসন্তমঞ্জরী তবু বলল, না, আজই। চলো, ছোট নৌকোয় দু'জনে বেড়াতে যাই। এই ভোরের হাওয়া গায় মাখলে তোমারও ভাল লাগবে।

শেষপর্যন্ত বসন্তমঞ্জরীর জেদই বজায় রইল। শয্যা ছেড়ে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল দ্বারিকা। পাশের কামরায় ছোটকু গভীর ঘুমে মগ্ন, বসন্তমঞ্জরী তাকে ডাকল না, ঝুঁকে তার ললাটে আলতো একটা চুমো দিয়ে চলে এল।

ছোট নৌকোটিতে একজন মাঝিই যথেষ্ট। জলিল নামে সেই মাঝিটি প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে নামাজ পড়ে। তাকে ডেকে তোলার প্রয়োজন হল না। মেঘ আরও জমাট হয়েছে, এ বেলা সূর্য দর্শনের আশা নেই। আলো ফুটতে পারছে না ভাল করে, নদীর জল গভীর কৃষ্ণবর্ণ। তবে বাতাসের স্পর্শ সত্যি উপভোগ্য।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধো-শোওয়া হয়ে রয়েছে দ্বারিকা, তার পায়ের কাছে বসে আছে বসন্তমঞ্জরী। প্রতিদিন সূর্যবন্দনা করে সে প্রীত হয়, আজ সূর্যহীন আকাশের দিকে চেয়েও সে আনন্দবোধ করছে।

মাঝি জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাব হুজুর?

দ্বারিকা বলল, চল, যেদিকে তোর মন চায়। হ্যাঁ রে, ঝড়-টড় উঠবে না তো? দেখিস বাবা, ডোবাসনি। এই ধড়া চুড়ো পরে সাঁতরাতে পারব না।

নৌকো চলল, দক্ষিণ দিকে। বসন্তমঞ্জরী একবার পেছন ফিরে দেখে নিল। তাদের বজরাটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সে আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, এখন বলো, ভাল লাগছে না? ঘুমোলে কত সময় নষ্ট হয়। আজকের দিনটা কেমন অন্যরকম। রাত শেষ হয়ে গেছে, অথচ সকাল হয়নি!

দ্বারিকা বলল, মন্দ লাগছে না ঠিকই। কিন্তু এখন যদি ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামে, একেবারে পাঁঠা-ভেজা ভিজব!

বসন্তমঞ্জরী বলল, না হয় একদিন ভিজলাম!

দ্বারিকা বলল, বেশি ভিজলে নির্ঘাত সান্নিপাতিক হবে, কোবরেজের তেতো ওষুধ গিলতে হবে, মনে থাকে যেন!

বসন্তমঞ্জরী বলল, জ্বর হলে আমার ভাল লাগে, মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে, চক্ষু বুজে আসে, যেন বয়েস কমে যায়, কত কী দেখি। ছোটবেলায় আমার খুব জ্বর হত। নবদ্বীপের গঙ্গায় জ্বর গায়ে নাইতাম।

কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল, আর একটা ছোট নদী ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। দ্বারিকা মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, জলিল মিঞা, এটা কী নদী? এটাই সেই বাঙালি নদীটা নাকি?

জলিল বলল, না, হুজুর, এইটা বাংগালি নদী না। সেইটা পাবেন কানাইপাড়ার কাছে। এর নাম ধরলা।

দ্বারিকা বলল, বাঙালি নদী! কী অদ্ভুত নাম। বিষখালি, তেতুলিয়া, শারিগোয়াইন, পিয়াইন, ঘাঘাটি, কতরকম নামই যে হয়! এটার নাম ধরলা, তা হলে ছাড়লা নামেও নদী আছে নাকি?

জলিল বলল, কী জানি হুজুর, থাকলেও থাকতে পারে। এত বড় দ্যাশ, আমি আর কতটুকু জানি! বগুড়া জেলার ওই ধারে আর যাই নাই কখনও!

দ্বারিকা বলল, পদ্মা দেখিসনি? গঙ্গা দেখিসনি? ঠিক আছে, তোকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাব।

জলিল নিজের বুকে এক হাত ছুঁইয়ে বলল, ইনসা আল্লা—

দ্বারিকা এবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে এবার ফেরা যাক?

বসন্তমঞ্জরী শাখা নদীটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দেখার কিছুই নেই, কোনও নৌকো চলাচল করছে না সেখানে, কোনও মানুষ নেই, তবু সে দেখছে। মুখ না ফিরিয়েই বলল, একবার ওই নদীতে যাই না?

দ্বারিকা বলল, ওখানে গিয়ে কী হবে? অনেক তো ঘোরা হল, এখন একটু চায়ের জন্য মনটা আনচান করছে।

জলিল বলল, এই নদীটায় পানি বেশি নাই। বেশি দূর যাওয়া যাবে না।

বসন্তমঞ্জরীর মাথায় ঘোমটা, মাঝির দিকে সে পেছন ফিরে বসে আছে। স্বামীকে বলল, ওকে বলো, যত দূর যাওয়া যায়। দু'দিকে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই অনেক পাখি আছে। একটা পাখি চোখ গেল চোখ গেল বলে ডাকতে ডাকতে গলা ফাটায়, সে পাখিটা কেমন দেখতে হয়, কখনও দেখিনি।

দ্বারিকা বলল, আমরা যে পাখিটাকে বলি চোখ গেল, পশ্চিম মুল্লুকে সেটাকেই বলে পিউ কাঁহা। বেশি দূর আর যাব না কিন্তু, বড়জোর আর আধঘণ্টা।

ধরলা নদীর দু'পাশে সত্যিই বেশ ঘন গাছপালা, কোনও জনবসতি দেখা যায় না। বসন্তমঞ্জরী কথা বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে দেখছে তীরের দিকে, যেন সে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে কোনও বিশেষ পাখির ডাকের জন্য।

খানিকটা যাবার পর নদী অগভীর হয়ে এল। এখনও পুরোপুরি বর্ষা নামেনি, মাঝে মাঝে চর হয়ে আছে। জলিল জিজ্ঞেস করল, কত্তা, এবার নাওয়ের মুখ ঘুরাই?

বসন্তমঞ্জরী বলল, ওকে নৌকোটা পাড়ে লাগাতে বলো, একটু ঘুরে দেখব।

দ্বারিকা বলল, এখানে তো শুধু জঙ্গল। কী দেখার আছে?

বসন্তমঞ্জরী বলল, জঙ্গলে গিয়ে জঙ্গলই দেখব। তোমার জঙ্গলে ঘুরতে ভাল লাগে না?

দ্বারিকা হেসে বলল, শোনো মেয়ের কথা। খামোখা জঙ্গলে ঘুরতে যাব কেন? শিকারটিকার করতে যাওয়া যায়, এ জঙ্গল তো তেমনও নয়।

বসন্তমঞ্জরী কাতরভাবে বলল, একবারটি নামবে না? আমার যে খুব ইচ্ছে করছে।

দ্বারিকা বলল, সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি! এখন এই জলকাদার মধ্যে আমাকে হাঁটতে হবে!

কোনওক্রমে কাদা বাঁচিয়ে নামা হল তীরে। এখানে বন বেশ ঘন। পাখির অভাব নেই। গাংশালিকই বেশি, আর একরকম পাখি ট-র-র ট-র-র করে ডাকছে, ওদের বলে জলতরঙ্গ। ছাতারে পাখির দল ঝগড়া করছে মাটিতে নেমে, চোখ গেল শোনা গেল না বটে, কিন্তু কোনও বড় গাছের নিবিড় পাতার আড়ালে একটা হলুদ পাখি ডেকে যাচ্ছে, গৃহস্থের খোকা হোক, গৃহস্থের খোকা হোক। ঘুঘু ডাকছে, ঠাকুর গোপাল ওঠো, ওঠো, ওঠো!

বসন্তমঞ্জরী বিহ্বল হয়ে সেইসব পাখির ডাক শুনতে শুনতে হাঁটছে। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল সে। যেন তার ঘোর লেগেছে, চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, ভুরু দুটি অনেকখানি তোলা, শরীর একটু একটু দুলছে।

দ্বারিকা একটি সোনালি গোসাপ দেখতে পেয়ে সেটাকে ধরার কথা চিন্তা করছিল, ইদানীং বিশেষ চোখে পড়ে না, এই গোসাপের চামড়ায় ভাল চটি জুতো হয়। বসন্তমঞ্জরীর পরিবর্তন সে লক্ষ করেনি।

বসন্তমঞ্জরীর বলল, ও গো, আমার ভেতরটা যেন কেমন কেমন করছে!

দ্বারিকা চমকে মুখ ফিরিয়ে বলল, অ্যাঁ, শরীর খারাপ লাগছে? বাসি, এই জন্য নৌকো থেকে নামতে বারণ করছিলুম! চল, শিগগির ফিরে চল। হাঁটতে পারবি, নইলে আমার হাত ধর।

বসন্তমঞ্জরী বলল, না, সে রকম নয়। কীসে যেন আমায় টানছে। আমার কেন এই রকম হয় বলো তো?

দ্বারিকা বলল, পাগলামি করিস না। আমার হাত ধরে থাক।

বসন্তমঞ্জরী সে কথায় কান না দিয়ে এক দিকে দৌড় লাগাল। অগত্যা দ্বারিকাকেও ধুতির কোঁচা সামলে ছুটতে হল। হরিণীর মতন ত্রস্ত পায়ে ছুটে যাচ্ছে বসন্তমঞ্জরী, বনের মধ্যে আর একটি ছোট নদী পড়ল, তাতে অতি সামান্য জল, ছপছপিয়ে সে নদী পার হয়ে গেল। তারপর দাঁড়াল একটা

ভাঙা মন্দিরের সামনে। দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

হতবুদ্ধির মতন দ্বারিকা তার পাশে এসে বলল, কী হল, বাসি ? কাঁদছিস কেন ? কী হল, আমাকে বল !

মুখ থেকে একটা হাত সরিয়ে বসন্তমঞ্জরী মন্দিরটার দিকে দেখিয়ে বলল, তুমি ওর ভেতরে যাও !

দ্বারিকা বলল, কেন ? দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে পুজোটুজো হয় না। আমি এই মন্দিরের মধ্যে যেতে যাব কেন ?

বসন্তমঞ্জরী দ্বারিকার পায়ের কাছে বসে পড়ে অতি কাতর স্বরে বলল, লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি, একবার ভেতরে গিয়ে দেখে এসো !

এ তো বিশুদ্ধ পাগলামি। এর সঙ্গে তর্ক চলে না। বোঝাই যাচ্ছে, বসন্তমঞ্জরীর মাথায় বায়ু চড়ে গেছে। দ্বারিকা ঠিক করল, এ বার কলকাতায় ফিরে সাহেব ডাক্তার দিয়ে ওর চিকিৎসা করাতেই হবে।

দ্বারিকা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। দরজার একটা পাল্লা ভাঙা। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। মাটির কালী মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে মেঝেতে, মাথাটা গড়িয়ে গেছে খানিক দূরে। প্রথমে দ্বারিকার মনে হল, কালীমূর্তির নীচেও আর একটা কোনও মূর্তি। হয়তো শিবের। কিন্তু মূর্তিটা এক কাত হয়ে পড়ে আছে, হাত দুটো মাথার কাছে। কোনও কুমোর বা ভাস্কর মাথায় হাত দেওয়া শিবের মূর্তি গড়ে কি ?

আরও কাছে এসে দ্বারিকা দেখল, মূর্তি নয়, একজন মানুষ, সদ্য মৃত।

ছুটে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল দ্বারিকা। রাগে তার সমস্ত শরীর জ্বলছে। এখন আর সে সংযম রাখতে পারল না, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা বসন্তমঞ্জরীর চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে বলল, হারামজাদি, তুই কে ? মায়াবিনী না পিশাচী, তোকে আজ বলতেই হবে !

অশ্রু আপ্লুত কণ্ঠে বসন্তমঞ্জরী বলল, আমি জানি না। বিশ্বাস করো, আমি কে, তা জানি না। আমি প্রাণপণে তোমার দাসী হয়ে থাকতে চাই।

দ্বারিকা বলল, মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা। তুই নৌকোয় বেড়াবার ছুতো করে আমাকে ঘুম থেকে তুললি, তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে এসে আমার বন্ধুর মড়া মুখ দেখালি ? কেন ? তোকে বলতেই হবে !

বসন্তকুমারী বলল, কেন এমন হয় আমি বুঝি না ! মা কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, আমার মনের মধ্যে কী হয়, আমি জানি না। তুমি ঠিকই বলো, আমি পাগল ! দিন দিন আরও পাগল হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ কান্না থামিয়ে সে বলল, মরে গেছে ?

দ্বারিকা বলল, চতুর্দিক রক্তে মাখামাখি। হতভাগাটা এখানে কেন মরতে এল কে জানে ! মনে হয়, কেউ খুন করেছে ! তুই কী করে জানলি, ও এখানে পড়ে থাকবে ? ভরত সম্বন্ধে তুই আগেও এমনধারা কথা বলেছিস। ভরত তোর কে ? আমাকে চেনার আগে তুই ভরতকে চিনতি ? সত্যি করে বল !

নিঃস্ব মানুষের মতন মাথা দোলাতে দোলাতে ভাঙা ভাঙা গলায় বসন্তমঞ্জরী বলল, কেউ না। উনি আমার কেউ না। তুমিই প্রথম আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলে। উনি তো কোনও কথাও বলেননি। উনি যে এখানে আসবেন, তা আমি কেমন করে জানব ? তবু কেউ যেন আমাকে টেনে নিয়ে এল ! তুমি আমাকে শাস্তি দাও !

ওর চুল ছেড়ে দিল দ্বারিকা। মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, অথচ রাগও দমন করতে পারছে না। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

স্থানটি একটি পরিত্যক্ত শ্মশান। হয়তো কাছাকাছি কোনও গ্রাম ছিল একসময়। ওলাউঠা-বিসূচিকায় কিছু লোক মরে গেলে সেই গ্রাম ছেড়ে বাকি লোকরা পালিয়ে যায়, সেইরকমই কিছু ঘটেছে বোধহয়, শ্মশানটা আর ব্যবহৃত হয় না, এই মন্দিরেও কেউ আসে না অনেক দিন। কিছু

কিছু হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে এ-দিকে সে-দিকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বসন্তমঞ্জরী নত মুখে জিজ্ঞেস করল, আমি একবার মন্দিরের মধ্যে যাব ?

দ্বারিকা ঠিক বুঝতে পারছে না, এখানে আর থাকা উচিত হবে কি না। ভরতের জন্য তার কষ্ট হচ্ছে ঠিকই। ছেলেটা বরাবরের হতভাগ্য। কিন্তু এখানে আর কেউ নেই, শেষ পর্যন্ত সে-ই খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে না তো ! নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার আগে পুলিশের খাঁই মেটাতে বহু টাকা খসাতে হবে। তা ছাড়া মানুষজনও এমন, একবার কথাটা রটলে অনেকে চক্ষু কুঞ্চিত করে বলবে, হুঁ হুঁ বাবা, ভেতরে ভেতরে কী ছিল কে জানে !

বসন্তমঞ্জরী মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলে দ্বারিকা অবশ্য বাধা দিল না। সেও চলল সঙ্গে সঙ্গে। সিঁড়িতে এসে বসন্তমঞ্জরী মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তারপর ঢুকল ভেতরে।

সেই নিদারুণ দৃশ্যের সামনে দু'জনে কেউই কিছুক্ষণ কথা বলল না। বসন্তমঞ্জরীর চক্ষু দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে একটু পরে বলল, আমি কি একবার ছুঁয়ে দেখব ? তুমি অনুমতি দেবে ?

চোখের ইঙ্গিতে সম্মতি জানাল দ্বারিকা।

বসন্তমঞ্জরী হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে কালীমূর্তির ভগ্নাংশ সরাতে লাগল। স্থানটি একেবারে পরিষ্কার করে ফেলার পর সযত্নে ভরতের দেহটাকে চিত করে শুইয়ে দিল। এবারে উভয়েরই চোখে পড়ল ভরতের পেটের ক্ষত। একটা বর্শার ফলা বিঁধে আছে, এখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে।

বসন্তমঞ্জরী ভিতু ভিতু স্বরে জিজ্ঞেস করল, আমি ওঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসলে কি দোষ হবে ? আমার পাপ হবে ?

বসন্তমঞ্জরী আরও কী মায়ার খেলা দেখাবে, দ্বারিকা তা শেষ পর্যন্ত দেখতে চায়। উগ্র কৌতূহলে তার বুক ধকধক করছে। সে আবার চোখের ইঙ্গিত করল।

জানু ভাঁজ করে বসে ভরতের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিল বসন্তমঞ্জরী। চোখের পাতা দুটো টেনে টেনে খুলতে লাগল। কী যেন বিড়বিড় করে সে বলছে আপন মনে।

দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, এখন তুই মন্ত্র পড়বি ?

বসন্তমঞ্জরী বলল, না, আমি সে রকম কোনও মন্তর জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, শরীরটা এখনও একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। তুমি একটু জল আনতে পারো ?

দ্বারিকা ঝটিতি বেরিয়ে গেল। কীসে করে জল আনবে ? কয়েকটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি মালসা বাইরে পড়ে থাকতে দেখেছে, তারই একটা কুড়িয়ে নিয়ে কাছের সেই ক্ষীণতোয়া নদী থেকে জল নিয়ে এল।

মন্দিরে এসে দেখল, ততক্ষণে বসন্তমঞ্জরী নিজের আঁচল দিয়ে ভরতের মুখ থেকে ধুলোময়লা মুছে দিয়েছে, জোরে জোরে অনবরত ফুঁ দিচ্ছে ভরতের দৃষ্টিহীন খোলা চোখে।

জল নিয়ে সেই চোখেই ঝাপটা মারতে লাগল বসন্তমঞ্জরী। মারছে তো মারছেই। দ্বারিকার মনে হল, যেন অনন্তকাল এ রকম চালাতে চায় তার স্ত্রী, সে এখান থেকে ভরতকে ছেড়ে উঠবে না। অথচ এ সবই পণ্ডশ্রম।

একাগ্রভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হল, একবার কি কাঁপল ভরতের চোখের পলক ? বারেক স্পন্দিত হল শরীর ?

আরও কিছুক্ষণ বাদে স্পষ্টতই নড়ে উঠল সেই মৃতবৎ দেহ, কাতর শব্দ করল, আঃ আঃ, মা, মা, মাগো—

আশ্চর্য, যে মানুষ নিজের মাকে দেখেইনি প্রায়, মাতৃস্নেহের কণামাত্র পায়নি, এমন অন্তিম মুহূর্তে সেই মানুষও মাকেই স্মরণ করে !

৮৪

নাটক সদ্য শেষ হয়েছে। সাজঘরে রং তুলছে অমরেন্দ্রনাথ। মন মেজাজ একেবারেই ভাল নেই। আজ দর্শক সংখ্যা খুবই কম ছিল, অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে অমরেন্দ্রনাথ দেখছিল, সামনের আসনগুলি প্রায় সব ফাঁকা। এইসব দিনে তার অভিনয়েও মন লাগে না। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থাকবে। কিছু লোক টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে, তবে না দাপট দেখানো যাবে মঞ্চে। অভিনয়ে যত অমনোযোগী হচ্ছে অমরেন্দ্রনাথ, ততই কমে যাচ্ছে দর্শক। এখন নৈরাশ্য কাটাবার জন্য এক একটা দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে নিজের ঘরে গিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মদের বোতলে চুমুক দিয়ে আসে। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়, এমনকী মহড়ার সময়েও কেউ মদ্যপান করতে পারবে না, অমরেন্দ্রনাথ এই কঠোর নির্দেশ জারি করেছিল, সে নির্দেশ সে নিজেই ভেঙেছে অনেকদিন।

অতি দর্পে হতা লঙ্কা! এক সময় অমরেন্দ্রনাথ দর্প করে বলেছিল, সে জঙ্গলে গিয়ে নাটক করলে সেখানেও দর্শকরা তার অভিনয় দেখতে ছুটে যাবে। কোথায় গেল সেইসব দিন? আগে দশ বারোটা ক্ল্যাপ বাঁধা ছিল, এখন যে ক'জন দর্শক আসে, তারাও যেন হাততালি দিতে ভুলে গেছে। দর্শক টানবার জন্য মরিয়া হয়ে অমরেন্দ্রনাথ 'সিরাজদৌল্লা' নাটক নামাল। মিনার্ভায় ওরা 'সিরাজদৌল্লা' খুব জমিয়েছে, ক্লাসিকেও সেই একই নাটক, চলুক প্রতিযোগিতা। এখানে নাম ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং, মিনার্ভায় দানি। আশ্চর্য ব্যাপার, দর্শকরা তবু মিনার্ভাতেই গিয়ে ভিড় করছে! অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দানির তুলনা হয়? দানির কাঁপা কাঁপা গলায় টানা টানা সুরের সংলাপও লোকে পছন্দ করল? ওরা অবশ্য তারাসুন্দরীকে পেয়েছে। ক্লাসিকে তেমন কোনও আকর্ষণীয় নায়িকা নেই। নয়নমণি ছেড়ে চলে যাবার পর কুসুমকুমারী ও অন্যান্যরা বিদায় নিয়েছে। অমরেন্দ্রনাথ কাজ চালাবার জন্য ক্রমাগত নতুন মেয়েদের আনছে, 'সিরাজদৌল্লা'য় লুৎফার ভূমিকায় অভিনয় করছে বিনোদিনী। এক কালের মঞ্চসম্রাজ্ঞীর সঙ্গে নামের মিল থাকলেও এ মেয়েটির ডাক নাম হাঁদি, থিয়েটারের সবাই তো বটেই, দর্শকরাও তার ওই নাম জেনে ফেলেছে। নামেও হাঁদি, কাজেও হাঁদি। রংটাই যা ফর্সা। চক্ষু দুটি গরুর মতন, তার অভিনয় দেখতে দেখতে এক এক সময় অমরেন্দ্রনাথেরই চড় কষাতে ইচ্ছে হয়।

মন ভেঙে গেলে শরীরও ভেঙে যায়। ইদানীং কিছুটা বেশি মদ্যপান করলেই অমরেন্দ্রনাথের হাত কাঁপে, এক একসময় এমন কাশির দমক ওঠে যে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। মঞ্চে অভিনয় করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ পা দুটি এমন দুর্বল হয়ে যায় যে মনে হয় বেশিক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। সেই সুঠাম সুন্দর শরীরের এখন ভগ্নদশা, অথচ বয়েসের দিক থেকে যৌবন এখনও যায়নি।

রং তোলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নারকোল তেল দিয়ে মুখখানা ঘষছে অমরেন্দ্রনাথ, একটি ছোকরা উঁকি দিয়ে বলল, বড়বাবু, দু'জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

অমরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল, এখন আবার কে? না নাঃ, বলে দে, এখন দেখা-টেখা হবে না!

আগে অভিনয়ের পর উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেকে সাজঘরে ফুল দিতে আসত, বড় মানুষেরা মেডেল দিতে চাইতেন, সাধারণ ভক্তদের গদ গদ স্তুতিবাক্য উপভোগ করত অমরেন্দ্রনাথ। এখন আর সেরকম কেউ আসে না। এখন কেউ দেখা করতে চাইলেই মনে হয় পাওনাদার। চতুর্দিকে ঋণ, অমরেন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ ঋণের দায়ে জর্জরিত। ক্লাসিক থিয়েটার এখন রিসিভারের হাতে। এককালে

অমরেন্দ্রনাথ এর মালিক ছিল, এখন যে সে বেতনভোগী ম্যানেজার মাত্র, সে কথা তার মাঝে মাঝে মনে থাকে না। টিকিট বিক্রি কমে যাচ্ছে বলে রিসিভারের সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাধে। এরপর একদিন ক্লাসিক থেকে অমরেন্দ্রনাথের বিতাড়িত হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

ছোকরাটি বলল, ওঁদের মধ্যে একজন ব্যারিস্টারবাবু আছেন, তাকে আপনি চেনেন।

অমরেন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তা হলে আলাদা কথা, উকিল-ব্যারিস্টারদের চটানো যায় না। শত্রু পক্ষের উকিল হলেও তাকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হয়। এখন যা অবস্থা, পাওনাদার পক্ষের কোনও উকিল তাকে জেলে ভরে দিতে পারে।

অমরেন্দ্রনাথ বলল, ঠিক আছে, আসতে বল। আর একখানা কুরসি দিয়ে যা।

মনোবল বাড়াবার জন্য সে হুইস্কির বোতলে আর একটা চুমুক দিয়ে নিল।

আগন্তুকদ্বয় যে বিশিষ্ট ব্যক্তি তা তাদের পোশাক ও মুখভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। যাদুগোপাল ও দ্বারিকা। প্রথমজনকে অমরেন্দ্রনাথ চেনে, সে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাল। দ্বারিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাদুগোপাল বলল, অমরবাবু, আমরা কোনও মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে আসিনি, অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করা হল। আমার এই বন্ধুটি বিশেষ প্রয়োজনে একজনের খোঁজ নিতে এসেছেন, যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন।

অমরেন্দ্রনাথ দ্বারিকার দিকে তাকাল। দ্বারিকা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ভূমিসুতা নামে একটি মেয়ে আপনার এখানে অভিনয় করত। শুনলাম সে এখন ছেড়ে দিয়েছে। সে কোথায় থাকে বলতে পারেন?

অমরেন্দ্রনাথ বলল, ভূমিসুতা? আমার চোদ্দো পুরুষে এই নাম শুনিনি। কোনও বাঙালি মেয়ের যে এই নাম হয়, তাও জানতুম না। আপনারা ভুল জায়গায় এসেছেন।

যাদুগোপাল বলল, ওহে দ্বারিকা, আমাদেরও ভুল হয়েছে। ওর ওই নামটা অনেকেই জানে না। স্টেজে সে অন্য নাম নিয়েছিল। নয়নমণি।

অমরেন্দ্রনাথ দপ করে জ্বলে উঠে বলল, তার একটা অন্য নামও ছিল? কোনওদিন বলেনি। নিজের সম্পর্কে কক্ষনও মুখ খুলত না। আপনারা কী বললেন, সে ক্লাসিক ছেড়ে দিয়েছে? মোটেও না। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, দূর করে দিয়েছি। গলা ধাক্কা দিয়ে গেটের বার করে দিয়েছি। কেন জানেন? তার বড় বাড় বেড়েছিল। অহংকারে মটমট করত। আমাকেও সে উপদেশ দিতে আসে। আমাকে ভয় দেখায়! ফুঃ, ওরকম বাঁদরি আমি কত দেখেছি। কতজনকে হাতের আঙুলে নাচিয়েছি! কতজন এসে কেঁদে কেঁদে আমার পায়ে লুটিয়েছে। আমি অমর দত্ত, স্টেজে মাগি নাচিয়ে পয়সা রোজগার করি না। থিয়েটারে নতুন ধারা এনেছি। একটা মেয়েছেলে না থাকলেও নিজের একার অভিনয়ের জোরে নাটক দাঁড় করিয়েছি। কোথাকার কে নয়নমণি, আমার শেখানো পার্ট করেই তো সে দর্শক মজিয়েছে, সে আমার মুখে মুখে কথা বলার আস্পর্ধা দেখায়! এক কথায় বিদায়! দূর হয়ে যা। আমি কারুর পরোয়া করি না।

দ্বারিকা বলল, মশাই, আপনাদের মধ্যে কী হয়েছিল, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে চাই না। মেয়েটির সন্ধান পাওয়া খুব দরকার। সে কী অন্য বোর্ডে গেছে? সে কোথায় থাকে বলতে পারেন?

অমরেন্দ্রনাথ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, আপনারা বুঝি নতুন থিয়েটার খুলবেন? ওর কাছে গিয়ে পায়ে ধরে সাধবেন? ওই ঠেঁটি ছুঁড়িকে নিয়ে আপনাদের কোনও লাভ হবে না। বাগ মানাতে পারবেন না। আমি কি কম চেষ্টা করেছি? বাগান বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যদি ফুর্তি করার কথা ভেবে থাকেন, সে গুড়ে বালি! ও মেয়ের রক্ত ঠান্ডা। সতীপনার দেমাক আছে। বলে কিনা, কোনও পুরুষকে ছোঁবে না, এই ব্রত আছে। আসলে কী জানেন, কাঁপের জোর নেই, ব্যাটাছেলেদের ভয় পায়। আরে মশাই, নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে চলে।

যাদুগোপাল হেসে বলল, দত্তমশাই, আপনি ভুল করছেন, আমরা থিয়েটারও খুলতে যাচ্ছি না, বাগান বাড়িতে আসর জমাবার মতলবও করিনি। আমরা দু'জনেই ও লাইনের লোক নই। বিশেষ

একটি ব্যক্তিগত কারণে নয়নমণির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা দরকার।

অমরেন্দ্রনাথ ধমকের সুরে বলল, কেন আমাকে ওই নামটা মনে করিয়ে দিলেন? রাত্তিরটা বরবাদ হয়ে গেল। নয়নমণি! শুয়ার কি বাচ্চী! সে আমার সর্বনাশ করে গেছে।

বোতলটা তুলে ঢক ঢক করে অনেকখানি গলায় ঢালল অমরেন্দ্রনাথ, তারপরই তার কথার সুর সম্পূর্ণ বদলে গেল। ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে সে স্বগতোক্তির মতন বলতে লাগল, নয়নমণি, নয়নমণি, সে ছিল আমার লক্ষ্মী! যতদিন সে ছিল, ক্লাসিক থিয়েটার রমরমিয়ে চলেছে। সে ছিল দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কেউ তার গায়ে হাত দেবার সাহস করেনি। এমনকী আমি পর্যন্ত তাকে বুকে জড়াতে পারিনি! ওরে তুই আমার বাইরেটাই দেখলি, আমি মুখে যা-তা কথা বলি, এক একসময় আমার মাথার ঠিক থাকে না, যাদের বন্ধু বলে ভেবেছি, তারা আমায় কুপরামর্শ দিয়েছে, কত টাকা নষ্ট করেছি, নেশার ঝোঁকে মানীর মান রাখতে পারিনি। কিন্তু, নয়ন, তুই আমার ভেতরটা দেখলি না? আমি যে তোকে কত ভালবেসেছিলাম, তুই আমাকে ঠিকঠাক পথে চালাতে চেয়েছিলি, আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছিল, তাই শুনিনি। রবিবাবুর নাটকে আমি খ্যামটা নাচ ঢোকাতে চেয়েছিলুম, তা তুই কিছুতেই নাচতে চাসনি, তুই চলে গেলি, তখন যদি তোর কথা শুনতুম, তা হলে আজ আমার এ দশা হত না! নয়ন, একবার দেখে যা, আমি পাঁকে ডুবে যাচ্ছি, এক সময় থিয়েটারের রাজা ছিলুম, এখন ছুঁচো-চামচিকেরাও আমায় লাথি মেরে যাচ্ছে...না, নয়ন আসবে না, কোনওদিন সে আর থিয়েটারে আসবে না, আমি পায়ে ধরে সাধতে গেলেও সে আমার মুখ দর্শন করবে না, ওঃ ওঃ, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরছি গো...

যাদুগোপাল আর দ্বারিকা এক সময় উঠে পড়ল। অমরেন্দ্রনাথ পুরোপুরি মাতাল হয়ে অসংলগ্ন কথা বলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে কাশির দমকে, কেঁদে কেঁদে বুক চাপড়াচ্ছে, এর কাছ থেকে আজ আর কোনও সাহায্য পাবার আশা নেই, সে কোনও কথাই শুনতে চায় না।

বাইরে বেরিয়ে এসে আফশোসের শব্দ করে যাদুগোপাল বলল, ইস, লোকটির কী দশা হয়েছে! ভাল বাড়ির ছেলে, আগে দেখেছি তো, কী তেজ ছিল, চোখে মুখে প্রতিভার জ্যোতি ছিল, থিয়েটারে নতুন অনেক কিছু করার সাহস দেখিয়েছিল। কী-ই বা বয়েস, এর মধ্যে একেবারে শেষ হয়ে গেল!

দ্বারিকা জিজ্ঞেস করল, ওর এমন অধঃপতন হল কেন? টাকা পয়সা তো কম করেনি এক সময়। থিয়েটারে যারা আসে তারাই এমন নষ্ট হয়ে যায়? লাইনটাই খারাপ। আমাকেও দু' একজন টাকা ঢালার প্রস্তাব দিয়েছিল।

যাদুগোপাল বলল, থিয়েটারের কী দোষ? এখানে এসে যারা মাথার ঠিক রাখতে পারে না, তারাই মরে। গিরিশবাবুকে দেখো, কতকাল ধরে ঠিক চালিয়ে আসছেন, এখনও বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখাচ্ছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বোস, এঁরাও টিকে আছেন বহুকাল। অমর দত্তর ব্যাপারটা কী হল জানো, সে যুগধর্ম ঠিক বুঝতে পারেনি। এখন আমরা টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে বাস করছি, গত সেঞ্চুরিতে আমাদের দেশের অধিকাংশ বড় মানুষ মদ খেয়ে গড়াগড়ি দিত, রক্ষিতার বাড়িতে রাত কাটাত, কে কোন সুন্দরী মেয়েকে রক্ষিতা রাখবে তা নিয়ে রেষারেষি চালাত, আর বুলবুলির লড়াই, বেড়ালের বিয়ে কিংবা কার্তিক ঠাকুরের পুজো উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করত। এ সবই ছিল হঠাৎ-নবাবদের বালখিল্যতা। আস্তে আস্তে সে সব দিনকাল বদলেছে। এখন ধনীর দুলালরাও লেখাপড়া শেখে, পাঁচটা সামাজিক কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়, ব্যক্তিগত চরিত্রও ন্যক্কারজনক নয়। এখন মদ খেয়ে মাতলামি করাটাকে কেউ পৌরুষ মনে করে না, অসহায় মেয়েদের জোর করে ধরে এনে শয্যাসঙ্গিনী করার মধ্যেও পৌরুষ নেই, টাকার মূল্য না বুঝে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করা কিংবা অপাত্রে দান করাটাও উদারতার পরিচয় নয়, মূর্খামি। অমর দত্ত ঠিক তাই করেছে। ওর অনেক কীর্তিই আমার কানে এসেছে। যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, তখন থিয়েটারের কত না উন্নতি ঘটাতে পারত, তা না, আরও মদ গিলতে লাগল, শয্যাসঙ্গিনীর সংখ্যা নিয়ে গর্ব করে বেড়াতে লাগল, আর বদ মোসাহেবদের পাল্লায় পড়ে বহু টাকা জলে দিয়েছে। ওর পতন কে আটকাবে?

দ্বারিকা বলল, ভূমিসুতাকে ও তাড়িয়ে দিয়েছে শুনে আমার এমন রাগ হচ্ছিল!

যাদুগোপাল বলল, যতদূর শুনে মনে হল, সে নিজেই ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু গেল কোথায়? একবার গিরিশবাবুর কাছে খোঁজ করা যাক। থিয়েটারের জগতের নাড়ি-নক্ষত্র উনি জানেন—

পরদিন দুই বন্ধুতে যখন মিনার্ভায় পৌঁছল, তখন সদ্য নাটক শুরু হয়েছে। এখন গিরিশবাবুর সঙ্গে দেখা করা যাবে না, দু'খানা বক্সের টিকিট কেটে দু'জনে ঢুকে পড়ল ভেতরে। মিনার্ভায় এখনও সগৌরবে চলছে 'সিরাজদ্দৌলা'। আট আনা-একটাকার একটি আসনও খালি নেই।

মাসের পর মাস মাইনে পাচ্ছিলেন না বলে ক্লাসিক ছেড়ে এসে মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। এসেই তিনি ঝিমিয়ে পড়া মিনার্ভাকে চাঙ্গা করে তুললেন। কেউ কেউ অবশ্য বলতে শুরু করেছিল যে, গিরিশবাবুকে আর এনে কী হবে, উনি আর আগের মতন পার্টও করতে পারেন না, নাটকগুলোও একঘেয়ে হয়ে গেছে। ওঁর নতুন নাটক সম্পর্কে দর্শকদের আর আগ্রহ জাগে না।

এই সব সমালোচনা কানে এলেই গিরিশচন্দ্র যেন ঘুমন্ত সিংহের মতন হুংকার দিয়ে জেগে ওঠেন। তাঁর নতুন নাটক 'বলিদান' অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল। নিন্দুকরাই বলতে লাগল, এত ভাল নাটক গিরিশচন্দ্র নিজেও আগে লেখেননি। বাংলার কলঙ্ক হল পণপ্রথা, তারই একটি মর্মস্পর্শী চিত্র এই নাটক। এই বিষয়বস্তু যেমন সত্য, তেমনই সমসাময়িক। হিন্দু পরিবারের বিবাহে কন্যাদের সম্প্রদানই যেন বলিদান।

পরের নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'। সমসাময়িক বাস্তবতা ও শিল্পীর দায়বদ্ধতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর আগে অনেক পৌরাণিক কাহিনী, হিন্দুদের ধর্মীয় পুনর্জীবন ও বীরত্ব নিয়ে অনেক নাটক লেখা হয়েছে। সেগুলিরও প্রয়োজন ছিল, অধিকাংশ হিন্দু তাদের অতীত গৌরবের কথা ভুলেই গিয়েছিল, ইংরেজদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে হীনম্মন্যতায় ভুগত। মুঘল-পাঠানদের আমলে বড় বড় নবাব-বাদশাদের জীবন কাহিনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস নিকট-স্মৃতি, সেই তুলনায় হিন্দুদের গৌরব যুগ তলিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতিতে। নাট্যকাররা সেই সব গৌরব কাহিনী ফিরিয়ে আনছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যখন হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে দূরত্ব ও বিরোধ ঘটাবার চেষ্টা চলছে নানা দিকে, সেই সময় গিরিশচন্দ্র বেছে নিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয়টি। সিরাজ উপলক্ষ মাত্র, মূল কথা, বাংলার স্বাধীনতা হরণ। ইতিহাসে সিরাজের চরিত্রে নানা কলঙ্ক, অদূরদর্শিতা, হঠকারিতা, চারিত্রিক অসংযমের কথা আছে বটে, কিন্তু বাংলার এই তরুণ শেষ স্বাধীন নবাবটি তার সময়েরই শিকার। গিরিশচন্দ্র তাকে এমন একটি ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তার প্রতি সহানুভূতি জানাবেই। এই সহানুভূতিই দুই ধর্মের মানুষকে পরস্পরের কাছে টানতে পারে আবার।

নাটকটি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেল যাদুগোপাল ও দ্বারিকা। যেমন মঞ্চসজ্জা, তেমন সম্মিলিত অভিনয়। সিরাজের ভূমিকায় দানির গলা কাঁপানো এই চরিত্রের পক্ষে মোটেই বেমানান লাগছে না। গিরিশবাবু স্বয়ং একটি ছোট্ট ভূমিকায় তাক লাগিয়ে দিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর বরাবরই ছোট ছোট চরিত্রেই বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন, এই নাটকে তিনি দানসা ফকির আর গিরিশচন্দ্র করিমচাচা। একটি দৃশ্যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা পালাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বহুমূল্য পোশাক থাকলে ধরা পড়ে যাবেন, তাই নবাব করিমচাচার সঙ্গে পোশাক বদল করে নিলেন। নবাব পরলেন ধূলিমলিন লুঙ্গি ও ফতুয়া, আর করিমচাচা ভূষিত হলেন হিরে-মুক্তো খচিত নবাবি পোশাকে। সেই অবস্থায় চলে যেতে গিয়েও ফিরে তাকিয়ে করিমচাচা সিরাজ-পরিত্যক্ত বাংলার মসনদকে যখন তিনবার কুর্নিশ করলেন, তখন বহু দর্শকই অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বারিকা বা যাদুগোপালের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। তবে হাইকোর্টের এক উকিল মহেন্দ্র মিত্র এখন মিনার্ভার আংশিক মালিক, তিনি যাদুগোপালকে বিলক্ষণ চেনেন। সেই সূত্রে, অভিনয় সাঙ্গ হবার পর গিরিশবাবুর সঙ্গে ওরা সাজ ঘরে দেখা করতে এল।

ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে গিরিশচন্দ্র গড়গড়া টানছেন, একটি বালক ভৃত্য তাঁর অঙ্গ মার্জনা করছে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা, এখন মঞ্চে লাফানো কাঁপানো তাঁর ঠিক সহ্য হয় না। যাদুগোপাল ও

দ্বারিকার মুখে প্রচুর প্রশস্তি শুনে গিরিশচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, আপনারা শিক্ষিত লোক, আপনারা এ নাটকের মর্ম ঠিকই বুঝবেন। সাধারণ দর্শক বুঝলে তবেই না সার্থক।

নাটকের কথা বাদ দিয়ে দেশের কথা উঠল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র আগ্রহী। কিছুক্ষণ পর যাদুগোপাল আসল প্রসঙ্গটি তুলল।

গিরিশচন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, নয়নমণি ? হ্যাঁ, সে কোথায় এখন ? শুনেছিলুম, মহেন্দ্র তাকে মিনার্ভায় আনতে চেয়েছিলেন, সে আসেনি। শুনেছি, ক্লাসিক ছাড়ার পর সে কোনও বোর্ডেই যোগ দেয়নি। মেয়েটা বেশ ক্ষেপী ধরনের, বুঝলেন। একবার নাকি সে আমার জন্য অমরের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। শেষ পর্যন্ত অমরকে দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইয়েছিল। থিয়েটারের মেয়েরা হচ্ছে জলের মতন। যখন যে-পাত্রে রাখবে, তখন সেই রকমটি হয়ে থাকবে। শ্রদ্ধা, গুরুভক্তি, এসব কথার কথা। ও মেয়েটা আলাদা। ভাল নাচে, গান ভাল জানে, অ্যাকটিংও ভাল করে, সে হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে চুপচাপ বসে রইল কেন ? কোনও শাঁসালো বাবু ধরেছে ?

দ্বারিকা বলল, ওর বাসা কোথায়, তা কি বলতে পারেন ? তা হলে আমরা নিজেরাই খোঁজ নিয়ে দেখতুম।

গিরিশচন্দ্র চোখ নাচিয়ে বললেন, মশাই, আমার কি আর সে বয়েস আছে যে অ্যাকট্রেসদের বাড়িতে রাত কাটাতে যাব ? নেশাভাঙও অনেক কমিয়ে দিয়েছি, নিজের বিছানায় শুলেই আরাম হয়। এখন আমার একমাত্র শয্যাসঙ্গিনী হচ্ছে পাশবালিশ।

তারপর বললেন, দাঁড়ান দেখি সাহেব কিছু জানে কি না।

তিনি দু'বার সাহেব সাহেব বলে ডাকতেই পাশের ঘর থেকে এসে অর্ধেন্দুশেখর উঁকি মারলেন। গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সাহেব, তুমিই তো নয়নমণিকে প্রথম থিয়েটারে এনেছিলে। সে ছুঁড়িটা গেল কোথায় ? কোন খাঞ্জা খাঁ তাকে হরণ করে নিয়ে গেল ? এনারা তার খোঁজ করতে এসেছেন।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, অনেকদিন তার পাত্তা নেই। থিয়েটার ছেড়ে সে বাবু ধরবে, এসব মনে হয় না। আমি আগে অনেকবার তাকে বাজিয়ে দেখেছি। সে অনেকটা যোগিনী যোগিনী টাইপ। যৌবনে যোগিনী। তুমি তাকে নিয়ে একটা নাটক লিখে ফেলতে পারো। প্রথম তাকে কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম জানো ? নিমতলা ঘাট শ্মশানে। জানোই তো আমার শ্মশানে মশানে ঘোরার বাতিক আছে। মেয়েটা ঝুলিঝুলি ছেঁড়া কাপড় পরে এক কোণে গুটিশুটি মেরে বসে থাকত, সবাই পাগুলি মনে করত। আমিও প্রথম প্রথম মাথা ঘামাইনি। একদিন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছিল, শ্মশানে লোকজন বিশেষ ছিল না, হঠাৎ শুনলুম মেয়েটার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল কান্না, তারপর বুঝলুম, গুনগুনিয়ে গাইছে, কী গান জানো ? আজও আমার মনে আছে। 'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি/শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি/আর কোনো সাধ নাই মা চিতে/চিতার আগুন জ্বলছে চিতে ..'

গিরিশবাবু পরের পঙ্‌ক্তিটি গেয়ে উঠলেন, 'ও মা, চিতাভস্ম চারি ভিতে, রেখেছি মা আসিস যদি....'।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, শুনেই বুঝলুম, এর গানের একেবারে তৈরি গলা। গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁ গা, তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে ? এখানে কেন পড়ে থাকো ? প্রথমে উত্তর দিতেই চায় না। ভয়ে কুঁকড়ে মুঁকড়ে থাকে। কিন্তু আমি পাগল চরাতে ভালই পারি।

গিরিশবাবু বললেন, তা পারবে না কেন, তুমি নিজেই যে একটা পাগল।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, তারপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার পেটের কথা বার করে দেখি, সে মোটেই পাগল নয়। অবস্থার গতিকে শ্মশানে আশ্রয় নিয়েছে। আগের কথা কিছুতেই জানাবে না। কিন্তু বোঝা গেল, মেয়েটা শুধু গান জানে না, কথাবার্তায় শিক্ষার ছাপ আছে। শ্মশান থেকে তুলে এনে কিছুদিন তাকে আমার বাড়িতে রাখলুম। আমার স্ত্রী তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে একটা ভাল শাড়ি পরিয়ে দিতেই একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এল। থিয়েটারে এনেও তাকে বিশেষ তালিম দিতে হয়নি। দেখতে দেখতে কেমন তরতরিয়ে ওপরে উঠে গেল।

গিরিশবাবু বললেন, আমাদের কত ছাইগাদায় এমন মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে, কে তার খোঁজ রাখে ? দারিদ্র্য রাক্ষুসীই সব কিছু খেয়ে নেয়, তুমি তবু একজনকে তুলে এনেছিলে।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, আবার তার মাথায় বোধহয় পাগলামি চেপেছে। নইলে এত ডিমান্ড থাকতেও কেউ স্টেজ ছেড়ে দেয় ! আগেও সে দু'-একবার এ রকম করেছে।

গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায় থাকে তুমি জানো ?

অর্ধেন্দুশেখর বললেন, আমাদের সেই গঙ্গামণিকে মনে আছে ? বউবাজারে সেই একটা বাড়ি করেছিল। সেইখানে থাকত নয়নমণি, আমাকে একবার যেতে হয়েছিল। গঙ্গামণি পটল তোলার আগে নয়নমণিকে সেই বাড়িটা দিয়ে গেছে। শুনছি তো নয়নমণি সে বাড়িও বিক্রি করে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। ও বাড়িতে থাকলে থিয়েটারের লোকেরা তাকে বিরক্ত করত।

গিরিশচন্দ্র হতাশভাবে বললেন, যাঃ। আর কোথায় তার খোঁজ করবেন ?

যাদুগোপাল বলল, সে বাড়ি সে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে, তা আমিও জানি।

থিয়েটারের অন্য কয়েকজনকেও ডেকে জিজ্ঞেস করা হল। কেউই সঠিক নয়নমণির সন্ধান জানে না। তবে টগর নামে একটি মেয়ে বলল, সে কাশী মিত্তিরের ঘাটে তিন-চারবার নয়নমণিকে দেখেছে। নয়নমণি ওখানে নিয়মিত গঙ্গাস্নান করতে আসে, কাঙালি-ভিখিরিরা তাকে দেখলেই ঘিরে ধরে। সে সবাইকে পয়সা দেয়।

তা হলে কাশী মিত্তির ঘাটের কাছাকাছি কোথাও নয়নমণির নতুন আস্তানা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সব গঙ্গার ঘাটেই নারী ও পুরুষদের স্নানের জায়গা পৃথক। মেয়েদের ঘাটের অংশটি দেওয়াল ঘেরা, কাপড় ছাড়ার জন্য ঘরও আছে। রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে থাকে কাঙালিরা। যেখানে সেখানে মন্দির, সেই সব মন্দিরের পূজারীরা বুভুক্ষুর মতন স্নানযাত্রীদের ডাকাডাকি করে। অন্যদের পুণ্য পাইয়ে দেবার জন্য তারা ব্যাকুল। পাশেই শ্মশান, কোনও বড় মানুষের শবদেহ এলে সঙ্গে প্রচুর সাঙ্গোপাঙ্গ থাকে, তখন সারা অঞ্চলটা জমজমাট হয়। এককালে এই সব শ্মশানে বড় বড় হাড়গিলে পাখির খুব উপদ্রব ছিল, এখন সেগুলিকে মেরে মেরে প্রায় শেষ করা হয়েছে।

স্নান সেরে কাশী মিত্তির ঘাট থেকে বেরিয়ে এল ভূমিসুতা, সঙ্গে দুটি সাত-আট বছরের বালিকা। ভূমিসুতা পরে আছে কালো পাড় সাদা সুতির শাড়ি, অঙ্গে কোনও অলঙ্কার নেই, ভিজে চুল পিঠের ওপর খোলা। কাঙালিরা তাকে চেনে, দেখা মাত্র হই হই করে লাইন ছেড়ে ধেয়ে এল। ভূমিসুতা নিজের হাতে পয়সা বিলোয় না, সঙ্গের মেয়েদুটি প্রত্যেককে দিতে লাগল একটি করে আনি।

সকাল সাতটা, আকাশ মেঘে থমথমে হয়ে আছে। গঙ্গার ওপর অনবরত শোনা যাচ্ছে স্টিমারের ভোঁ। একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে ভূমিসুতাকে দেখছে দ্বারিকা আর যাদুগোপাল। একটু পরে কাঙালিদের ভিড় পাতলা হতে তারা কাছে এগিয়ে এল।

যাদুগোপাল ধীর স্বরে বলল, কেমন আছ, ভূমিসুতা ? অনেকদিন তুমি আমাদের বাড়িতে আসোনি।

ভূমিসুতা চমকে উঠলেও ঠিক বোঝা গেল না। আয়ত নয়নে যাদুগোপালের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, নমস্কার। আপনি এখানে ?

যাদুগোপাল বলল, তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি। কোথায় বাড়ি জানি না, কালও এসেছিলাম এই ঘাটে, খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বারিকা আর ভনিতার সময় না দিয়ে বলে উঠল, ভুমি, বিশেষ কারণে তোমার কাছে এসেছি। আমাদের বন্ধু ভরত, সে খুবই অসুস্থ, মানে খুবই, চিকিৎসকেরা ভরসা দিতে পারছেন না, তুমি যদি তাকে শেষ দেখা দেখতে চাও, মানে, তুমি একবার গেলে ভাল হয়। বেশি দেরি করা যাবে না—

ভূমিসুতা এ কথা শুনেও চাঞ্চল্য দেখাল না, বরং যেন নিথর হয়ে গেল। পাথরের প্রতিমা। চক্ষুদুটি মাটির দিকে স্থির নিবদ্ধ। যেন পথের ধূলিকণার সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তা।

কিছু পরে সে প্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, তিনি কি আমায় ডেকেছেন ?

যাদুগোপাল বলল, হ্যাঁ। সে তোমার জন্য...

দ্বারিকা তাকে বাধা দিয়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কী, সে রকম ভাবে ডাকেনি। তার কথা বলার ক্ষমতা নেই। প্রায় সময়েই তার জ্ঞান থাকে না। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফেরে, তখনও কথা বলে না, কিংবা বলতে পারে না। মানুষ চিনতে পারে না, ডাকলেও সাড়া দিতে চায় না। একদিন অজ্ঞান অবস্থায়, খুব জ্বর, একশো পাঁচ ডিগ্রি, তখন প্রলাপ বকছিল, কয়েকটা নাম ভাল করে বোঝা যায়নি, আমি নিজেও শুনিনি, আমার বউ শুনেছে, তার মধ্যে একবার বোধহয় ... । আমায় স্ত্রীই আমাকে জিজ্ঞেস করল, ভূমি কে ? আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি তো তোমাকে বেশি দেখিনি, তা ছাড়া তোমার নয়নমণি নামটাই মনে আসে। আমার স্ত্রীও তোমার এই নাম জানে না, তোমাকে চেনে না। সে যখন বলল, ভূমি কে, তার মানে ভরতের মুখেই শুনেছে।

যাদুগোপাল বলল, দ্বারিকা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তখনই আমার মনে পড়ে গেল, তোমার কথা। তুমি মাঝে মাঝে আসতে আমাদের বাড়িতে, আমার স্ত্রী তোমাকে খুব পছন্দ করেন, তোমার বউবাজারের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানা গেল, সেখানে অন্য লোক থাকে, তোমার নতুন ঠিকানা জানে না।

মাটি থেকে চোখ না তুলেই ভূমিসূতা বলল, আমি থিয়েটারে ছিলাম। সবাই জানে, থিয়েটারের মেয়েরা অশুচি, আমাদের কি রুগির ঘরে যেতে আছে ?

যাদুগোপাল বলল, এসব কী বলছ ভূমি ? আমরা ওই সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই ? তুমি আমাদের বাড়িতে গেছ, কেউ অযত্ন করেছে ?

দ্বারিকা হেসে বলল, তুমি এক সময় শ্মশানে ছিলে, আমি শুনেছি। আমার স্ত্রী-ও এক সময় .. যাক সে সব কথা পরে শুনবে। সে তোমাকে নিমেষে আপন করে নেবে।

ভূমিসূতা তবু বলল, রুগির ঘর ... তিনি চোখ মেলে আমাকে দেখে যদি অপছন্দ করেন ? যদি তাতে আরও খারাপ হয় ? বোধহয় আমার দূরে থাকাই ভাল।

যাদুগোপাল অস্থিরভাবে বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, ভূমি, ভরত এখন যে-অবস্থায় আছে, তার থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না। আর দেরি কোরো না।

এবার ভূমিসূতা আঁচলে চোখ ঢেকে ফেলল। কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ।

কাশী মিত্তিরের ঘাটের অদূরেই একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে ভূমিসূতা। সে বাড়িতে আর এগারোটি বালিকা থাকে। এরা সবাই অনাথ-আতুর, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা মেয়ে। একজন বয়স্কা রমণীকে রাখা হয়েছে তাদের দেখাশুনো করবার জন্য। তাকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অতি দ্রুত তৈরি হয়ে নিল ভূমিসূতা।

রংপুর থেকে জীবন্মৃত ভরতকে কলকাতায় নিয়ে আসার পর যাদুগোপালের পরামর্শে তাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে নিজের বাড়িতেই এনে রেখেছে দ্বারিকা। ভরতের পেটে একটা বর্শার ফলা গেঁথেছিল, এই ধরনের ব্যাপার পুলিশকে জানানো কর্তব্য। দ্বারিকা বাইরে বাইরে থাকে, সেই তুলনায় যাদুগোপাল বেশি খবর রাখে। ভরত 'যুগান্তর' সাপ্তাহিকীর সঙ্গে জড়িত ছিল, ওই পত্রিকার দফতরটি যে উগ্রপন্থিদের আড্ডা, তা যাদুগোপালের কানে এসেছিল। রংপুর অঞ্চলে ভরত কী করতে গিয়েছিল, যাদুগোপাল তা না জানলেও অনুমান করেছিল যে সে কোনও মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চিত, সন্ধান পেলে পুলিশ তাকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে।

বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক কেশব চক্রবর্তী ভরতের চিকিৎসার ভার নিয়েছেন। কেশব চক্রবর্তী যাদুগোপালের ভায়রাভাই, তিনি গোপনীয়তা রক্ষা করবেন অবশ্যই। দ্বারিকার মানিকতলার বাড়িতে কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ থাকে না, ভরতকে রাখা হয়েছে দোতলার একটি কক্ষে, দু'জন নার্স নিযুক্ত হয়েছে তার জন্য। বসন্তমঞ্জরী রংপুর থেকে আসার পথে ভরতের যথাসাধ্য সেবা করেছে, কিন্তু কলকাতায় সেবার ভার নার্সদের ওপর, সন্ধের পর সে একবার মাত্র দেখতে আসে। দ্বারিকা তাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছে, ভরত বাঁচবে কি না তুই বল ? ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখতে পায় যে বসন্তমঞ্জরী, সে কিন্তু এই ব্যাপারে অসহায়, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলেছে, জানি না, জানি না !

অস্ত্রোপচার করে পেট থেকে বর্শার ফলাটা বার করে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু কিছুতেই ভরতকে

পুরোপুরি সজ্ঞানে আনা যাচ্ছে না, কিছু খেতেও পারছে না সে। নাকে নল ঢুকিয়ে তরল খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ডাক্তার, এরই মধ্যে ভরত প্রায় কঙ্কালসার হয়ে গেছে, মিশে গেছে বিছানায়।

ভূমিসূতাকে এনে প্রথমেই পাঠিয়ে দেওয়া হল অন্দরমহলে বসন্তমঞ্জরীর কাছে। কলকাতায় ঢাকা গাড়ি ছাড়া বাইরে বেরোয় না বসন্তমঞ্জরী, তাও কদাচিৎ, বাড়িতেও বাইরের লোকের সামনে আসে না। কিন্তু নিছক অন্তঃপুরিকা হয়ে থাকতে পারে না সে, তিনতলায় একটি বারান্দায় দিনের অধিকাংশ সময় কাটায়। এখান থেকে দেখা যায় পথের চলমান দৃশ্য, দেখা যায় অনেকখানি আকাশ, দূরের গাছপালা। নারকেলডাঙার দিকে ঝোপ জঙ্গলই বেশি, মধ্যে মধ্যে কয়েকটা বড় বাড়ি। খাল দিয়ে নৌকো চলে, সুন্দরবন থেকে কাঠ বোঝাই করে আনে। এক একদিন রাস্তায় দেখা যায় ষাঁড়ের লড়াই, দুটি অতিকায় বলীবর্দ পথের ঠিক মাঝখানে গুঁতোগুঁতি করে, গাঁক গাঁক শব্দ করে, পথচারীরা ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায় যানবাহন। দুপুরের দিকে কোনও কোনও দিন হয় বাঁদর নাচ কিংবা মাদারির খেলা, ওপর থেকে পয়সা ছুঁড়ে দেয় বসন্তমঞ্জরী। এই বারান্দা থেকেই সে বাইরের জগৎটাকে কাছে পায়।

ভূমিসূতাকে দেখে বসন্তমঞ্জরী বহুকালের পরিচিতার মতন অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, এসো ভাই। ও মা, তুমিই ভূমিসূতা ? তোমাকে তো আমি থিয়েটারে দেখেছি।

ভূমিসূতার এখন চোখ শুষ্ক। তেমনই শুষ্ক কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, তিনি কোথায় ?

বসন্তমঞ্জরী বলল, যাবে, আমি নিয়ে যাব। তার আগে বলো তো, কেন তাকে ওই দূর দেশে মরতে পাঠিয়েছিলে ? নিজের কাছে ধরে রাখতে পারোনি ?

ভূমিসূতা কোনও উত্তর দিতে পারল না।

বসন্তমঞ্জরী বলল, প্রথম যেদিন দেখি, সেদিনই মনে হয়েছিল, মানুষটা কেমন যেন দিশেহারা। এক-একজন মানুষের মুখে কী যেন থাকে, মনে হয় চেনা চেনা, আগে কোথাও দেখেছি, মুখখানা মনে গেঁথে যায়। অন্য কিছু ভেবো না যেন, কাশীর গঙ্গায় একজন নৌকার মাঝিকে দেখেও আমার এ রকম মনে হয়েছিল। আর একটা শিমুল গাছ, বিহারে ট্রেনে যেতে যেতে, মাঠের মধ্যে মহারাজের মতন একলা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, লাল ফুলে ভরা, কাছাকাছি আর কিছু নেই, আমার বুকটা ধক করে উঠল, মনে হল, ওমা, ঠিক এই শিমুল গাছটাকেই তো আমি আগে একবার দেখেছি, অথচ সেই প্রথম আমার ট্রেনে যাওয়া, তবে কী করে আগে দেখলাম ? হয়তো গত জন্মে। আমার এমন হয়।

তারপর ভূমিসূতার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তোমার এত দুঃখ কেন গো ? থিয়েটারে তোমার কত নাম, এমন তোমার রূপ, তবু হাত ছুঁয়েই বোঝা যায়, তুমি বড় দুঃখী। অবশ্য মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে সবাইকেই দুঃখ পেতে হয়। দুঃখই আমাদের ললাট লিখন। তবে, বলতে নেই, আমি বেশ সুখে আছি, আমার উনি কোনও অভাব রাখেননি। এক একসময় ভাবি, এত সুখ নিয়েই বা আমি কী করব ? যদি কারুকে ভাগ দেওয়া যায়।

একটু পরে বসন্তমঞ্জরী বুঝল, এখন এই রমণীটির সঙ্গে তার ভাব জমবে না। সে কোনও কথাই বলতে চাইছে না।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো, সেই ঘরে নিয়ে যাই। আগে মনটা তৈরি করে নাও। হয়তো প্রথমটায় চিনতেই পারবে না। শরীরটা শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে। যমে-মানুষে টানাটানি চলছে, তুমি কিছুতেই যমকে জিততে দিয়ো না। আমি যমকে স্বচক্ষে দেখেছি, জানো ! স্টিমারে যখন ওঁকে নিয়ে আসছি কলকাতায়, একদিন দেখি যে সন্ধেবেলা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন দণ্ডধারী যমরাজ, এত বড় বড় চক্ষু গরম করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছাড়, তুই ছেড়ে দে ওকে ! আমি ছাড়িনি। কিন্তু আর আমার ক্ষমতা নেই, আমি যে অন্যের স্ত্রী, সব সময় একটা সীমারেখা দেখতে পাই, এখন থেকে তোমার ওপর সব ভার। ডাক্তার যা পারবে না, তোমাকে তা পারতে হবে।

দোতলায় রোগীর ঘরে দিনের বেলার নার্স একটা টুলে বসে কুরুশ কাঠি দিয়ে লেশ বুনছে।

ঘরটি বেশ বড়, মোট পাঁচটি জানলা। মাঝখানে একটি পালঙ্কে চোখ বুজে শুয়ে আছে ভরত, ঘুমন্ত না অচেতন বোঝা যায় না। নিশ্বাসের সঙ্গে বুক সামান্য উঠছে নামছে, সেইটুকুই প্রাণের চিহ্ন, সত্যিই মুখ দেখে পূর্বেকার ভরতকে চেনার উপায় নেই। শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে।

ওদের দেখে নার্সটি উঠে দাঁড়াল, বসন্তমঞ্জরী চোখের ইঙ্গিতে তাকে বলল, ঘরের বাইরে যেতে। তারপর ভূমিসূতাকে বলল, এই নাও ভাই, তোমার জিনিস তোমার হাতে তুলে দিলাম। মেঝেতে বিছানা পেতে দেব, এখন থেকে তুমি এ ঘরেই থাকবে।

ভূমিসূতার মুখের দিকে একটুক্ষণ গাঢ় ভাবে চেয়ে রইল বসন্তমঞ্জরী। আপন মনে, খুব অস্ফুট স্বরে বলল, তোমাকে আগে চিনিনি, এখন দেখে বুঝতে পারছি, তুমি আর আমি হুবহু এক। তুমিই যেন আমি, কিংবা আমিই যেন তুমি। ভাগ্যের দিক থেকে আমরা যেন যমজ।

ভূমিসূতা একথার অর্থ বুঝতে পারল না।

বসন্তমঞ্জরী বলল, আজ বুঝলাম, কেন ওই মানুষটাকে আমি বারবার দেখতে পেয়েছি। তোমার জন্য। এখন যাই, পরে আবার কথা হবে।

বসন্তমঞ্জরীও ঘর থেকে বিদায় নেবার পর ভূমিসূতা আস্তে আস্তে এসে ভরতের শিয়রের কাছে দাঁড়াল।

কতকাল পরে দু'জনের মিলন হল। মাঝখানে একটা যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এ কেমন ধারা মিলন? ভূমিসূতার বুক কাঁপছে, দুশ্চিন্তায় নয়, আশঙ্কায়। ভরত যদি চক্ষু মেলে, যদি তাকে চিনতে পারে, তখন কী হবে তার প্রতিক্রিয়া? যদি ভূমিসূতাকে অবাঞ্ছিত মনে করে? যদি বলে, তুমি, তুমি কেন এসেছ? জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে ভরত একবার ভূমিসূতার নাম বলেছিল, তার অর্থ কী? হয়তো সে বলতে চেয়েছিল, ভূমিসূতাকে ডেকো না, তাকে আমি চাই না, সে নষ্ট হয়ে গেছে!

খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে ভরতের দিকে চেয়ে রইল ভূমিসূতা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চক্ষুদুটি কোটরগত, শীর্ণ মুখে খাড়া হয়ে আছে নাকটা। ওষ্ঠ বিবর্ণ। সব মিলিয়ে বড় অসহায় আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নাকের নল দুটি আপাতত খোলা।

ভরত একবারই, একটি ক্ষুদ্র চিঠি পাঠিয়েছিল ভূমিসূতাকে। সে চিঠি শশিভূষণের হাতে পড়লেও পরে ভূমিসূতা সেটি সংগ্রহ করে রেখেছিল। কতবার যে পড়েছে, তার ঠিক নেই। প্রতিটি শব্দ তার মুখস্থ। তারপর দু'জনেরই জীবন বাঁক নিল কত বিচিত্র দিকে। তবু সে চিঠির কথাগুলি কি মিথ্যে হয়ে গেছে?

যদি জ্ঞান ফেরার পর ভরত তাকে দেখে বিরক্ত হয়, তাকে চলে যেতে বলে, সে বিনা প্রতিবাদে চলে যাবে। জীবনের কাছ থেকে তার কোনও প্রত্যাশা নেই। অনাথা ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে সময় কাটাতে তার বেশ লাগে। তা ছাড়া তার দেবতা আছেন।

এ যাবৎ ভূমিসূতা স্বেচ্ছায় কোনও পুরুষ মানুষকে স্পর্শ করেনি। আর কারুর সম্পর্কে তার তেমন ইচ্ছেও হয়নি, শুধু এই একজনকে ঘিরেই এক সময় তার সাধ-স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। জীবনে একবারও কি সে সাধ মিটবে না?

দুরু দুরু বক্ষে, খানিকটা ঝুঁকে ভূমিসূতা ভরতের কপালে একটি হাত ছোঁয়াল। একজন সংজ্ঞাহীন পুরুষ, কিছু দেখছে না, বুঝছে না, তবু তাকে স্পর্শ করলেই শরীরে এমন বিদ্যুৎ প্রবাহের অনুভব হয়!

৮৫

কবিরাজি, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কোনও চিকিৎসাই বাকি রাখছে না দ্বারিকা। শহরে শল্যচিকিৎসক হিসেবে প্রধান এখন ডোনাল্ড জেফ্রি, লোকমুখে তাঁর নাম ধন্বন্তরি জেফ্রি সাহেব, তিনি সফল অস্ত্রোপচারে ভরতের পেট থেকে বর্শার ফলাটা বার করে দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও দুর্ভাবনা কাটেনি। ভরতের কিছুতেই পুরোপুরি জ্ঞান ফিরছে না। তার ক্ষতস্থানটি দূষিত হয়ে আছে, সেই জন্যই তার শরীর সর্বক্ষণ জ্বরতপ্ত, মাঝে মাঝে তো সে বিড়বিড় করে কিছু বলে, তা প্রলাপের মতন অসংলগ্ন, ভাল করে শোনাও যায় না।

ডোনাল্ড জেফ্রির সুযোগ্য ছাত্র নিশিকান্ত মজুমদার আসেন প্রতিদিন। তাঁর সঙ্গে কবিরাজ গঙ্গাচরণ সেনের আলোচনা হয়। অ্যালোপ্যাথির ডাক্তারের সঙ্গে কবিরাজির বিরোধ নেই, কিন্তু হোমিওপ্যাথ গুণময় দত্ত প্রতিবাদ জানিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। তাঁর মতে, কবিরাজির শেকড়-বাকড়ের সঙ্গে হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্ম ওষুধ একেবারেই চলে না। অপরপক্ষে নিশিকান্ত মজুমদারের দাদামশাই ছিলেন কবিরাজ, বাল্যকালে তাঁর চিকিৎসাতেই একবার কঠিন রোগ থেকে তিনি বেঁচে উঠেছেন, সুতরাং কবিরাজকে তিনি কখনও তাচ্ছিল্য করতে পারেন না। কবিরাজ গঙ্গাচরণ সেনও বিশেষ খ্যাতিমান, শোনা যায়, সূচিকাভরণ দিয়ে তিনি মৃতবৎ রোগীকেও জাগিয়ে তুলতে পারেন, এ ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন ফল হচ্ছে না তাঁর ওষুধের। বিচিত্র এই মানুষের শরীর, কোন ওষুধে যে কার কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে, তা আজও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এত ওষুধেও কেন ভরতের জ্বর প্রশমিত হচ্ছে না, তা বুঝতেই পারছেন না চিকিৎসকরা। এর চেয়েও গুরুতর রোগীরা এই একই ওষুধে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ডাক্তার-কবিরাজরা যখন আসেন, তাঁদের সঙ্গে থাকে দ্বারিকা, ভূমিসূতা তখন পাশের একটি ছোট কক্ষে চলে যায়। সে সামনে আসে না, কিন্তু আড়াল থেকে সব কথা শোনে। কয়েকদিন ধরে কবিরাজমশাই একটি নতুন প্রস্তাব দিতে শুরু করেছেন। তিনি অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, কোনও কোনও যোগী-মহাপুরুষের এমন ক্ষমতা থাকে যে, তাঁরা ইচ্ছে করলে কোনও মৃত ব্যক্তিরও প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারেন। এরকম একজন যোগী আছেন কাশীতে, তাঁর নাম স্বরূপানন্দ স্বামী, তিনি প্রখ্যাত ত্রৈলঙ্গস্বামীর সাক্ষাৎ শিষ্য। শেষ উপায় হিসেবে ভরতকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। নিশিকান্ত মজুমদার এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী, তিনি স্বরূপানন্দ স্বামী সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চান না, কিন্তু এরকম রোগীকে এখন স্থানান্তর করার প্রশ্নই ওঠে না। এখান থেকে কাশীতে নিয়ে যাবার ধকল সহ্য করা এ রুগির পক্ষে অসম্ভব।

দ্বারিকা দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়। ভরত দিন দিন যে-রকম ক্ষীণবল হয়ে আসছে, তাতে যে-কোনও সময় হঠাৎ তার প্রাণবায়ু নিবে যেতে পারে। নিজে থেকে তো সে খেতেই পারে না, জোর করেও তাকে প্রায় কিছুই খাওয়ানো যায় না। সে অচেতনের মতন পড়ে থাকে, কোনওক্রমে তার মুখ খুলে চিনির জল ও অতি তরল মাংসের সুরুয়া খাওয়ানোর চেষ্টা হয়, কিছুটা ভেতরে যায় কি যায় না, আবার বেরিয়ে আসে। এখন কোনও অলৌকিক সংঘটন ছাড়া তাকে বাঁচাবার বোধহয় কোনও উপায় আর নেই।

ভূমিসূতাকে সে জিজ্ঞেস করে, কী করা যায় বলো তো? বেনারসেই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব? ডাক্তাররা তো আর কোনও আশ্বাসই দিতে পারছে না।

ভূমিসূতা ধীরে ধীরে দু' দিকে মাথা দোলায়। দ্বারিকা তার বন্ধুর চিকিৎসার সব রকম ভার

নিয়েছে, ভূমিসূতার পক্ষে পৃথক মতামত দেওয়া ভাল দেখায় না। কিন্তু ভরতকে এখান থেকে সরাবার চেষ্টা সে কিছুতেই মানতে পারে না, কবিরাজের মুখে কথাটা শোনামাত্র আশঙ্কায় তার বুক কেঁপেছে।

দ্বারিকা বলল, কাশীর বাতাস এমনিই বড় পবিত্র। বড় স্বাস্থ্যকর। সেখানে গেলে সকলেরই উপকার হয়। আর সত্যিকারের মহাপুরুষরা ইচ্ছে করলে অসাধ্যসাধন করতে পারেন।

ভূমিসূতা চুপ করে থাকে, তার নীরবতাতেই অনিচ্ছা প্রকাশ পায়।

বসন্তমঞ্জরীও এককথায় এ প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিয়েছে।

ভূমিসূতা আসবার পর থেকে সে আর একবারও ভরতকে দেখতে যায়নি। যেন ভূমিসূতার ওপর সব ভার অর্পণ করে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। ভরত বাঁচবে কি বাঁচবে না, দ্বারিকা তাকে এই প্রশ্ন করলে সে সরলভাবে বলে, আমি তো জানি না, অত বড় বড় ডাক্তাররা দেখছেন...। যেন তার দৈবশক্তি চলে গেছে, ভবিষ্যদ্বাণী করারও আর ক্ষমতা নেই। ওসব মাঝে মাঝে হয়, যখন সে একটা ঘোরের মধ্যে থাকে, তা আবার কেটেও যায়। সর্বক্ষণ ওইরকম ঘোরের মধ্যে থাকলে তো সে বাঁচতেই পারত না।

ভূমিসূতার সঙ্গে তার বেশ মনের মিল হয়েছে। যদি সুখের সময় হত, তা হলে দু'জনের সখীত্ব আরও নিবিড় হতে পারত, কিন্তু এখন দুঃখের কথাই বেশি হয়। ভরতের সেবায় ভূমিসূতার নিজের নাওয়া-খাওয়ার খেয়াল থাকে না, বসন্তমঞ্জরীর তা ঠিক খেয়াল থাকে, সে ভূমিসূতাকে জোর করে ওপরে ডাকিয়ে আনে, নিজের সঙ্গে খেতে বসায়। ভূমিসূতা খেতে না চাইলে সে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলে, দেখো মেয়ে, তুমিও অসুস্থ হলে কী ঝঞ্ঝাটে পড়ব বলো তো। এ বাড়িতে দুটো রুগি কে সামলাবে!

এর মধ্যে একদিন সে ভূমিসূতাকে বলল, ডাক্তাররা যা-ই বলুক, ওই মানুষটাকে বাঁচিয়ে তুলতে একমাত্র তুমিই পারো। তোমার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক মিল। অনেক দুঃখ, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পার হয়ে, অনেক সাধনার পর আমি এই শিবের মতন স্বামী পেয়েছি। ছোটবেলা আমি কৃষ্ণনগরে এক বাড়িতে খেলতে যেতাম। সেখানে উনি আমাকে প্রথম দেখেন, উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমার বাবা রাজি হলেন না, আমাকে নরকের দিকে ঠেলে দিলেন। সে কী অন্ধকার, সে কী পিচ্ছিল, কত বাঘ-ভাল্লুকের মতন মানুষ, কী দুর্গন্ধ! এক নদী থেকে আর এক নদী। ছোট নদী থেকে বড় নদী। আমি ভাসতে ভাসতে গেলাম। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, উনিই আমার স্বামী, আর কেউ আমাকে ছুঁতে পারবে না। নষ্ট করতে পারবে না। যখন-তখন মরতে রাজি ছিলাম, বিষের কৌটো বেঁধে রেখেছিলাম আঁচলে, ভগবানকে ডেকে বলতাম, হে ঠাকুর, একবার যেন ওঁর দেখা পাবার পর মরি। কত পাঁকের মধ্য দিয়ে গেছি, কিন্তু গায়ে কাদা লাগেনি, মরতে ভয় ছিল না বলে আর কিছুকেই ভয় পাইনি। যখনই একা থাকতাম, দেখতে পেতাম, নিদারুণ অন্ধকারের মধ্যে এক জায়গায় একটা জোরালো আলো, যেন একটা সুড়ঙ্গের ওপরে ঝকমক করছে সূর্য, সেই আলো আমাকে হাতছানি দিত। আমি জেদ ধরে বসেছিলাম, ওই আলোর কাছে আমাকে যেতেই হবে! এখন দেখো, কত আলো, আমার স্বামী, সংসার, আমার সন্তান।

ভূমিসূতা মুখ নিচু করে ভাতের থালায় আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলল, তুমি ভাগ্যবতী, তুমি শেষ পর্যন্ত পেয়েছ। কিন্তু আমার ভাগ্যে বোধহয় তা আর হবে না। বড় দেরি হয়ে গেছে।

বসন্তমঞ্জরী বলল, ও মা, অমন অলক্ষুণে কথা বলতে আছে? মানুষটা তো বেঁচে আছে এখনও। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বেহুলা লখীন্দরকে বাঁচিয়েছিল, আর তুমি পারবে না? তোমাকে যে পারতেই হবে।

ভূমিসূতা বলল, কী করে পারব আমি জানি না। আমার কতটুকু শক্তি?

বসন্তমঞ্জরী বলল, তোমার হাতেই তো সব শক্তি। ইচ্ছাশক্তি। তুমি ওকে ভালবাসা দাও, খুব ভালবাসা, আরও আরও, অনেক অনেক ভালবাসা। সেই ভালবাসার টান এড়িয়ে ও যাবে কোথায়?

ভূমিসূতা মুখ তুলে বসন্তমঞ্জরীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এরকম রমণী সে আগে

কখনও দেখেনি। এ পর্যন্ত অন্য যত নারীদের সঙ্গে সে মিশেছে, তারা কেউ ভালবাসা শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণই করে না। এই শব্দটাই যেন সে নতুন শুনছে।

সে দ্বিধার সঙ্গে বলল, যার বোধ নেই, যে কোনও সাড়া দেয় না, আমি ঘরের মধ্যে আছি কি না জানেই না, সে কী করে বুঝবে আমার ভালবাসা কম না বেশি...

বসন্তমঞ্জরী বলল, ও মা, তাতে কী হয়েছে? মানুষ দেবতাকে ভালবাসে না? দেবতা কি সব সময় সাড়া দেয়? তবু মানুষ পাথরের মূর্তির পায়ে মাথা ঠোকে, কাঁদে। মানুষ ফুলকে ভালবাসে না? ফুল, গাছপালা, সুন্দরের কত মহিমা, ভালবাসায় বুক টনটন করে, কিন্তু তারা তো কেউ সাড়া দেয় না। ভূমি, আমি জানি, একা একা যে ভালবাসা, অন্য কারুর জন্য, তা অনেক বেশি তীব্র হয়। তা ক্রমশ বাড়তেই থাকে, শরীরটা যেন গলে গলে অদৃশ্য হয়ে যায়, শূন্যতার মধ্যে জেগে থাকে হাহাকার, আমি জানি, আমি নিজের জীবন দিয়ে এটা জানি। তুমি ভালবাসা দিয়ে ওই ঘরটাকে ভরিয়ে রাখো, ধূপের ধোঁয়ার মতন তোমার বুক থেকে ভালবাসা বেরিয়ে এসে ওই মানুষটাকে ঘিরে থাকবে, তা হলে যমদূত ওখানে ঢুকতে সাহস পাবে না। ভালবাসার কাছে মৃত্যুও নির্ঘাত হেরে যাবে।

এরকম কথা শুনলে কান্না রোধ করা সম্ভব নয়। ভূমিসূতা বসন্তমঞ্জরীর কাঁধে মাথা রেখে হু হু করে কাঁদতে থাকে।

রাত্রিবেলা ভূমিসূতা রোগীর ঘরেই মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। ঘুম তার প্রায় আসেই না। এত বড় বাড়ি একসময় নিঝুম হয়ে আসে, শহরের রাজপথের শব্দও কমে আসে। ক্বচিৎ দু'-একটি ঘোড়ার গাড়ি যায় আসে, শোনা যায় লাঠি ঠকঠকিয়ে পাহারাওয়ালার হুঁশিয়ারি। ভূমিসূতা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে ভরতের নিশ্বাসের শব্দ। এমনিতে খুবই মৃদু, প্রায় শোনাই যায় না, মাঝে মাঝে হঠাৎ খুব জোরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। তখনই ভূমিসূতা ভয় পেয়ে যায়। উঠে এসে ভরতের মুখের দিকে চেয়ে দেখে, বুকের ওপর হাত রেখে ওঠা-পড়া ঠিক আছে কি না বুঝে নেয়।

প্রথম রাত্রেই ভূমিসূতার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। এই প্রথম সে একজন পুরুষের সঙ্গে এক কক্ষে রাত্রিবাস করছে। যে-কোনও পুরুষ নয়, তার দয়িত, যার জন্য সে এতকাল তার কুমারীত্ব রক্ষা করেছে। ভরতকে সে কোনওদিন ফিরে পাবে, তা ঠিক আশা করেনি, তবু ভরতের জন্য সে তার শরীর উৎসর্গ করে রেখেছিল। ভরতের সেই চিঠিটির প্রতিটি অক্ষর তার মনে গেঁথে আছে। ভরত লিখেছিল, "তোমাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তোমার সহিত আমি সংযোগ রক্ষা করিব। তোমাকে অপমানের জীবন হইতে মুক্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করিব। কিন্তু এতদিন তাহা পারি নাই। তুমি নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছ যে, আমি কাপুরুষের মতন পলায়ন করিয়াছি, তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছি। ...সত্য এই যে, আমি তোমাকে একদিনের জন্যও বিস্মৃত হই নাই। সর্বক্ষণ তোমার কথা মনে পড়ে। রাত্রে আমার ঘুম আসে না। আমার ঘরের শূন্য দেওয়ালে তোমার মুখচ্ছবি দেখিতে পাই..." এ চিঠি পাবার আগে থেকেই ভূমিসূতা স্থির করে রেখেছিল যে, ভরতই তার জীবনস্বামী।

তা হলে এই প্রথম রাত্রিই তো তার বাসররাত্রি। কিন্তু এ কেমন বাসর? ফুল নেই, মালা নেই, চন্দনের সুবাস নেই, এমনকী মনের মানুষটি থেকেও নেই। সে ভূমিসূতার অস্তিত্বের কথাই জানে না। ভূমিসূতা তাকে স্পর্শ করলেও সে টের পায় না।

এ যেন বেহুলা-লখীন্দরের লৌহবাসরের মতন। সেখানে তবু ফুলশয্যার প্রথম প্রহরে লখীন্দর নববধূকে অনেক সোহাগ করেছিল, তারপর ঢলে পড়ে সাপের বিষে। বেহুলা শেষপর্যন্ত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল, সে জন্য তাকে ভাসতে হয়েছিল কলার ভেলায়, নাচতে হয়েছিল দেবতার সামনে। ভূমিসূতাও নাচ জানে বটে, কিন্তু এখানে তা কোন কাজে লাগবে?

নাচের কথা মনে পড়লেই ভূমিসূতার মনে একটা আশঙ্কা জাগে। ভরত চেতনাহীন, ভূমিসূতাকে সে ডাক পাঠায়নি। যদি তার চেতনা ফিরে আসে, সে কি উন্মুক্ত মনে ভূমিসূতাকে গ্রহণ করতে পারবে? সে যে থিয়েটারের নটী! ভরত কি শুনতে চাইবে যে, ভূমিসূতা এতকাল স্বেচ্ছাবৈধব্য বরণ করেছিল? সজ্ঞানে আসার পরই যদি সে বলে, কালামুখী, তুই এখানে কেন এসেছিস? ভূমিসূতাকে

দেখে খুশি হবার বদলে যদি বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়, তা হলে তো ওর আরও ক্ষতি হতে পারে।

তবু ভূমিসূতা এখান থেকে যেতে চায় না। ভরতকে কাশী পাঠানোর প্রস্তাবও তার মনঃপূত নয়। এক হিসেবে, এই রাত্রিগুলিই ভূমিসূতার সবচেয়ে সুখের সময়। তার মনের মানুষকে সে এখানে অতি আপন করে পেয়েছে। সে ভরতের সর্বাঙ্গ ধুয়ে মুছে দেয়, ইচ্ছে হলে ওর বুকে হাত রাখে। ভরতের অবশ আঙুল ছুঁইয়ে দেয় তার মুখে। ভোরের আলো যখন ফোটে, জানলা দিয়ে রক্তিম রশ্মি এসে পড়ে ভরতের মুখে, ভূমিসূতা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই মুখের দিকে। এই তো তার পরম পাওয়া।

এক একদিন সন্ধের পর থেকেই ভরতের জ্বর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভূমিসূতা তার কপালে জলপটি দেয়। কপালের উত্তাপে সেই জল শুকিয়ে গেলে আবার কাপড়ের ফালিটা ভিজিয়ে নিতে হয়। সেইরকম জ্বরের সময় ভরত বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুরু করে। ভূমিসূতা ব্যাকুলভাবে সেই কথাগুলি শোনার চেষ্টা করে, ভরতের মুখের কাছে কান নিয়ে যায়, তবু বোঝা যায় না প্রায় কিছুই, একটা নাম শুধু চেনা যায়, হেম, যেন ওই নামের লোকটিকে সে কিছু জানাবার চেষ্টা করছে।

ভূমিসূতার সমস্ত অন্তরাত্মা তৃষিত হয়ে থাকে ভরতের মুখে অন্তত একবার তার নামটি শোনার জন্য। শোনা যায় না। ভরতের মনের গহনে কি ভূমিসূতা কোথাও নেই আর?

হেম নামের লোকটিকে ভূমিসূতা চেনে। দ্বারিকা 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে ভরতের বন্ধুদের খবর দিয়েছিল। বারীন, হেমচন্দ্র, প্রফুল্ল, নরেন, উপেনরা এসে ভরতকে দেখে গেছে। হেম একা এসেছে কয়েকবার। সকালের দিকে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

ভরতের মুখ থেকে এরকম অসংবদ্ধ প্রলাপ তিন দিন মাত্র শোনা গেছে। অন্যান্য দিন সে কোনও শব্দই করে না। যেন যোগনিদ্রায় মগ্ন। মুখের একটা রেখাও কুঞ্চিত নয়, যেন তার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ব্যথা বোধ নেই, মানুষের সংসারে কোনও কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না। হয়তো এই নিদ্রার মধ্যেই সে একসময় মহানিদ্রায় চলে যাবে। ভূমিসূতা কিছুতেই বুঝতে পারে না, আর কতখানি ভালবাসা দিলে ভরত মৃত্যুঞ্জয় হতে পারবে, কী করে দিতে হয় সেই ভালবাসা? সে রাত্রির ঘুম বিসর্জন দিয়েছে, সারারাত ঘরের কোণে একটি প্রদীপ জ্বলে, সেই ক্ষীণ আলোতে সে বই পড়ার চেষ্টা করে, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর সে উঠে এসে ভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ফিসফিস করে বলে, চলে যেয়ো না, চলে যেয়ো না।

ভূমিসূতা আসার একাদশতম রাতে ভরত একবার পাশ ফিরে বলল, উফ্! মাগো!

তারপর দু'বার বলল, জল, জল!

ভূমিসূতার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। এ যে পরিষ্কার কণ্ঠস্বর! এ পর্যন্ত সে একবারও জল চায়নি। তবে কি জ্ঞান ফিরে আসছে?

প্রচণ্ড আনন্দ হল বটে। তবু ভূমিসূতা ভাবল, সে কি নিজে জল দেবে, না অন্য কারুকে ডাকবে? চোখ মেলে প্রথম ভূমিসূতাকে দেখার বদলে অন্য কারুর যাওয়াই বোধহয় ঠিক। বসন্তমঞ্জরীদের কাছে খবর পাঠাবে? কিন্তু এখন রাত দুটো-তিনটের কম নয়। এই সময় ডাকাডাকি করাটা কি উচিত হবে! দাস-দাসীরা কয়েকজন নীচের তলায় শোয়—

এর পরেই তার মনে হল, এ কী করছে সে? মানুষটা জল চাইছে, সে জল দেবে না? এই যদি তার শেষ জল চাওয়া হয়?

সে ধড়ফড় করে ছুটে গিয়ে গেলাসে জল নিয়ে এল। চোখ মেলেনি ভরত, তবে তার মুখের কাছে জলের গেলাসটি ধরতেই সে অনেকখানি জল পান করল, তারপর পাশ ফিরল অন্য দিকে।

তাতেও ভয় কাটল না ভূমিসূতার। প্রদীপ নিবে যাবার আগে দপ করে একবার জ্বলে ওঠে। মানুষের জীবনেও এরকম হয়, ভূমিসূতা জানে। সে ভরতের শয্যার পাশে বসে তার নিশ্বাসের শব্দ গণনা করতে লাগল।

ভোরের দিকে আর একটু বেশি জ্ঞান ফিরল ভরতের। সে আবার জল চাইল। এবার জল পান করতে করতে চোখ মেলে বলল, তুমি কে?

আবেগকম্পিত কণ্ঠে ভূমিসূতা বলল, আমি ভূমি...আপনি আমায় চিনতে পারছেন না?

ভরত বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, তুমি ভূমি? কত দূর থেকে এসেছ, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে তাই না?

ভূমিসূতা বলল, কই, না, দূর থেকে আসিনি তো!

ভরত মাথাটা একটু ঘুরিয়ে ঘরের ছাদটা দেখে জিজ্ঞেস করল, এটা কোন জায়গা?

ভূমিসূতা বলল, এটা কলকাতা। আপনার বন্ধুর বাড়ি।

ভরত বলল, কলকাতা? আমি কি তা হলে কোথাও যাইনি? যাইনি? যাইনি?

ক্রমে জড়িয়ে এল তার স্বর, সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

এবারে সত্যিকারের আনন্দের স্রোত বয়ে গেল ভূমিসূতার শরীরে। ভরত সুস্থতার দিকে ফিরেই আসছে, তাকে দেখে রাগ করেনি। জল খাওয়ার সময় তার আঙুলের সঙ্গে ভরতের আঙুলের ছোঁওয়া লেগেছে।

একটু পরে আবার অন্য রকম হল। ভরত জেগে গিয়ে বলল, উফ্ এত গরম!

ভূমিসূতা পাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে দেখল, ভরতের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তার জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। সে ভূমিসূতার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

ভূমিসূতা বলল, আমি ভূমি।

ভরত বলল, তুমি বুঝি এই কালীমন্দিরে থাকো?

আগের তুলনায় ভরতের কণ্ঠস্বর আবার নিস্তেজ, চোখ মেলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে তার। একটা হাত উঁচু করতে চাইলেও পেশির শক্তি নেই, আবার পড়ে যাচ্ছে ধপ করে।

ভরত ভূমিসূতার চোখে চোখ রেখে বলল, কপাল...কুণ্ডলা। আমি ইচ্ছে করে ভাঙিনি। পড়ে গেল! ও কি আমায় আবার মারবে? আর আমি পারব না, এবারই শেষ! কেউ জানে না। আমি রাস্তা চিনি না...

এও এক ধরনের প্রলাপ, কিন্তু কথাগুলি বোঝা যায়। ভূমিসূতা ভরতের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরল। সে প্রদীপ নিবতে দেবে না। কিছুতেই না। বসন্তমঞ্জরী বলেছিল, ভালবাসা ধূপের ধোঁয়ার মতন বুক থেকে বেরিয়ে আসবে, সত্যি তা হয়? অন্তর্যামী জানেন, ভূমিসূতা নিজের সবটুকু আয়ু দিয়েও এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলতে চায়।

জানলা দিয়ে সমান্তরাল রেখার মতন সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে। জেগে উঠছে শহরের জীবন। শোনা যাচ্ছে ফেরিওয়ালাদের ডাক। একটি কিশোর প্রতিদিন সকলের চেয়ে আগে ননী-মাখন বিক্রি করতে আসে, সে খটখট করে কড়া নাড়ছে দরজার। এ বাড়ির দাস-দাসীরাও সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা শুরু করেছে।

ভরতের শয্যার পাশে পাষাণমূর্তির মতন স্থির হয়ে বসে আছে ভূমিসূতা, লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা। মাথার চুল খোলা, পরপর রাত্রি জাগরণে চক্ষু দু'টি কোটরগত, মনে হয় যেন অনন্তকাল সে সেখানেই বসে থাকবে।

দ্বারিকা যখন খোঁজ নিতে এল, তখনও ভরত কথা বলে যাচ্ছে আপন মনে। তার স্থান-কালের বোধ নেই, কথার মাঝে মাঝে সে কেঁপে উঠছে, যেন ঝাঁকুনি লাগছে সারা শরীরে। দ্বারিকা তার নাম ধরে ডাকাডাকি করল কয়েকবার, তাতে কোনও সাড়া পেল না, তবু দ্বারিকা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তখুনি খবর পাঠানো হল ডাক্তারদের। নিশিকান্ত মজুমদারও রোগীর এই অবস্থান্তর দেখে খুশি, জ্বর ছেড়ে গেছে, এটাই প্রবল আশার কথা। পেটের ক্ষতস্থানটি পরীক্ষা করে তিনি নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন, বসে রইলেন অনেকক্ষণ, নিজে একসময় কয়েক চামচ ফেনাভাত খাওয়াবার চেষ্টা করলেন ভরতকে। আজ আর বমি হল না।

সারা দিন আধো-তন্দ্রার মধ্যেই রয়ে গেল ভরত। সন্ধের পর তার আবার জ্বর এল বটে, খুব বেশি নয়, তার মধ্যেও তার স্বগতোক্তির বিরাম নেই। সেই অবচেতনের ভাষা অন্য কেউ বুঝবে না। যেন সে কোনও অচেনা জটিল অরণ্যে একা একা ভ্রাম্যমাণ।

ভূমিসূতাকে সে চিনতে না পারলেও তার পাশে যে একজন নারী সর্বক্ষণ বসে আছে, এই বোধ তার আছে। এই নারী তাকে জল পান করাচ্ছে, উষ্ণ কপাল মুছে দিচ্ছে, সুতরাং এর দ্বারা কোনও বিপদ ঘটবে না। এটা মানুষের শরীর ঠিক অনুভূতি দিয়ে বোঝে। এর একটা সুফল হল এই যে, পরের রাত্রে ভরত যখন স্ববশে এল, বুঝতে পারল যে, সে শুয়ে আছে একটা পালঙ্কে, ভাঙা মন্দিরে নয়, বাইরে শহরের কলরোল এবং পাশের সেবাপরায়ণা নারীটি ভূমিসূতা, অর্থাৎ আকস্মিকতার আঘাত তাকে সইতে হল না, ভূমিসূতা সম্পর্কে তার যে অপরাধবোধের আড়ষ্টতা ছিল তাও মনের উপরিতলে এল না, ভয়ার্ত শিশু যেমন মাকে আঁকড়ে ধরে, সেইভাবে সে নিজেই তখন ভূমিসূতার আঁচল চেপে ধরল এবং সজ্ঞানে প্রথম কথাটিই বলল, ভূমি, আমাকে বাঁচাও।

ভূমিসূতার শুষ্ক চোখ জলে ভরে গেল। এই প্রথম খুব দুর্বল বোধ করল সে।

শুধু তাই নয়, কিছুক্ষণ পরে এক ধরনের অদ্ভুত লজ্জাও পেয়ে বসল তাকে। এতদিন ভরত ছিল প্রায় জড়ের মতন, এখন সে একজন চেতনাসম্পন্ন পুরুষ, হাত-পা নাড়তে পারে, স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে। এখন তো ভূমিসূতার পক্ষে আর ভরতের সঙ্গে এক ঘরে থাকা উচিত নয়। লোকে বলবে কী ? তার সঙ্গে ভরতের তো কোনও সামাজিক সম্পর্ক নেই। প্রথম দিন এসে সে মনে করেছিল, এটা তার বাসরঘর। এখন তার পরিচয়, সে একজন সেবিকা মাত্র।

একটু পরে ভরত আবার ঘুমিয়ে পড়তেই ভূমিসূতা ওপরে চলে এল বসন্তমঞ্জরীর কাছে।

বসন্তমঞ্জরী তার ও কথাটা শুনে হেসে একেবারে লুটিপুটি খায় আর কি! হাসি আর থামেই না। তারপর বলল, ওমা, তাই তো, তাই তো। ঠিকই বলেছ। তোমরা বর-বউ নও, তা হলে কী করে এক ঘরে শোবে ? মানুষটা উঠে বসতে পারে ?

ভূমিসূতা বলল, এখনও পারে না। কিন্তু লোক চিনেছে। কথা বলতে পারছে।

বসন্তমঞ্জরী বলল, তা হলে এক কাজ করো। দুটো গোরের মালা আনিয়ে দিই, আজ রাতে তোমরা মালা বদল করে নাও। ব্যস! গন্ধর্ব মতে হয়ে যাবে। যেমন দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা!

লজ্জায় কর্ণমূল আরক্ত হয়ে গেল ভূমিসূতার। সে বলল, যাঃ, তা হয় না। আমি নিজে থেকে...

থুতনিতে আঙুল দিয়ে কৃত্রিম চিন্তার ভঙ্গি করে বসন্তমঞ্জরী বলল, তাও তো বটে। মেয়েদের তো মুখ ফুটে বলতে নেই। পুরুষরাই আগে বলে, সেটাই নিয়ম। পুরুষরা বলবে, মেয়েরা মেনে নেবে। মানুষটার রোগব্যাধি এখনও সারেনি, এখন কি আর ওই কথা মনে পড়বে ? আচ্ছা, মনে করো, তুমি মানুষ নও, তুমি অপ্সরা। আকাশ থেকে নেমে এসেছ। অপ্সরারা নিজের মুখে বলতে পারে, তাতে কোনও দোষ হয় না।

ভূমিসূতা প্রবল বেগে মাথা নাড়ল।

বসন্তমঞ্জরী বলল, তা হলে আমার কর্তাকে ঘটকালি করতে বলতে হয়। সেটা উনি ভাল পারবেন। গাঁইগুঁই করলে ঘাড় ধরে জোর করে বিয়ে দেবেন। খুব ঘটা করবেন। তাতে আবার সময় লেগে যাবে। আচ্ছা, ও কথা এখন থাক। ভূমি, তুমি কখনও কাশী গেছ ?

ভূমিসূতা বলল, কাশী ? না তো! আমি আর কোথায় গেলাম! সেই ছোট বয়েসে পুরী থেকে এসেছি কলকাতায়, তারপর আর কোথাও যাইনি!

বসন্তমঞ্জরী বলল, আজ বিকেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। তখনই তোমাকে ডেকে বলব ভেবেছিলাম। বারান্দায় বসে আছি, উনি বাড়িতে নেই, একলা, রাস্তা দেখছি, কত মানুষ, গাড়ি যাচ্ছে, ঘোড়া যাচ্ছে, বরফওয়ালা, একটা খোঁড়া ভিখিরি, দু'জন পাদ্রি সাহেব, ঝাঁকা মুটে, এই সব দেখছি, হঠাৎ সব মিলিয়ে গেল। রাস্তা নেই, দেখছি একটা নদী। ঢেউ ছলাত ছলাত করছে। সেই নদীর ঘাট দিয়ে ধাপে ধাপে অনেক সিঁড়ি উঠে গেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ওমা, এ তো খুব চেনা জায়গা। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট। ওখানে আমরা এক সময় থেকেছি, ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে সূর্যপ্রণাম করেছি।

ভূমিসূতা বলল, তোমার সেই কথা মনে পড়ে গেল ?

বসন্তমঞ্জরী বলল, না, না, সে জন্য নয়। অমন তো মানুষের মনে পড়েই। আর দেখলাম, সেই

ঘাটের সিঁড়িতে তুমি বসে আছ। তোমার খোঁপায় একগোছা সাদা ফুল। তুমি বেনারসে কখনও যাওনি বললে, অথচ তোমায় আমি ওখানে বসে থাকতে দেখলাম কেন ?

ভূমিসূতা চুপ করে চেয়ে রইল।

বসন্তমঞ্জরী বলল, কবিরাজমশাই ভরত সিংহকে বেনারস পাঠাতে বলেছিলেন। তখন মনে হয়েছিল, তা মোটেই উচিত নয়। কিন্তু আমি ওরকম দেখলাম। অবশ্য এটা আমার একটা স্বপ্ন। আমি এরকম কত স্বপ্নই যে দেখি!

ভূমিসূতা বলল, তুমি কী করে এমন স্বপ্ন দেখো ? আমায় শিখিয়ে দেবে ?

বসন্তমঞ্জরী হেসে বলল, এসব না দেখাই ভাল। অনেকে তো এ জন্য আমাকে পাগল বলে! আমি নিজের এসব পাগলামি নিয়ে বেশ আছি!

ভূমিসূতা বলল, সত্যিই তুমি বেশ আছ। তোমাকে হিংসে হয়। আচ্ছা বোন, আজ রাতে তা হলে আমি তোমার কাছে থাকি ?

এবার বসন্তমঞ্জরী রেগে উঠল। চোখ পাকিয়ে বলল, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। উনি একা থাকবেন ? রাত্তিরবেলা জেগে উঠে তোমাকে দেখতে না পেলে কী রকম অসহায় বোধ করবেন বলো তো ? যদি আবার রোগ বাড়ে ? মানুষটা এখনও উঠে বসতে পারে না। নিজে নিজে কিছু খেতে পারে না, সেই মানুষের ঘরে থাকলে দোষ হয় ?

ভূমিসূতা তবু বলল, সত্যি দোষ হয় না ?

বসন্তমঞ্জরী বলল, সে কথা পরে। আগে তুমি বলো, তোমার মন চায় কি চায় না ?

এর পরে আর কথা নেই। ভূমিসূতা নীচে নেমে এল। ভরতের ঘরের মেঝেতে তার বিছানা পাতা। অন্য দিন জেগে বসে থাকে, আজ তার ঘুমে চোখ টেনে আসছে। ভূমিসূতা মনে মনে বলছে, ঘুমোব না, ঘুমোব না, ঘুমোলেই কোনও বিপদ হতে পারে। তবু একসময় বুঝি তার ঝিমুনি এসেছিল, ভরতের ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে এল। ভরত তিনবার তার নাম ধরে ডেকেছে।

ভূমিসূতা কাছে এসে দাঁড়াতেই সে শান্তভাবে বলল, আমি এবার বেঁচে গেলাম, তাই না ? যদি বেঁচেই উঠব, তা হলে মৃত্যু বারবার আমাকে টানে কেন বলতে পারো ?

ভূমিসূতা বলল, এখন ওসব ভাববেন না। একটু জল দেব ?

ভরত বলল, এবার মনে হচ্ছিল, আমি একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যাচ্ছি তো যাচ্ছি, টের পাচ্ছিলাম যেন এটাই মানুষের জীবনের শেষ যাত্রাপথ, অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, তারপর এক সময় সেই অন্ধকারে মানুষ মিলিয়ে যায়, তারপর আর কিছু নেই। কিন্তু শেষ তো হল না, প্রথম চোখ মেলে দেখতে পেলাম তোমাকে। তুমি যেন সেই সুড়ঙ্গ থেকে আমাকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এলে।

ভূমিসূতা ব্যাকুলভাবে বলল, এসব কথা এখন থাক। আপনার বিশ্রাম দরকার।

ভরত বলল, এই মাত্র আমার ঘুম ভাঙল একটা ভয়ের কথা মনে পড়ল বলে। আমার জীবন অভিশপ্ত। মৃত্যু আমাকে যখন-তখন টানে। আমি কোনওক্রমে বেঁচে যাই বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে যাদের জীবন জড়িয়ে থাকে...আমার মা...আর একজন, তোমার সঙ্গে তার মুখের মিল ছিল...এরপর তোমারও যদি কোনও বিপদ হয় ?

ভূমিসূতা বলল, আমার সহজে মরণ নেই, আমি জানি!

ভরত খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, পুরীর মন্দিরের বাইরে আমি ভিখারিদের সঙ্গে শুয়ে থাকতাম। ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো কোনও না কোনওদিন মন্দিরে পূজা দিতে আসবে, তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি একদিনও আসোনি। তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

ভূমিসূতা বলল, সেসব কথা পরে বলব। আজ নয়।

ভরত বলল, আমরা কি আর সময় পাব ?

ভূমিসূতা তার কোমল হাত দিয়ে ভরতের চোখ বন্ধ করে দিয়ে বলল, এখন আর কোনও কথা নয়।

ভরত অন্যদিকে ফিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরদিন সকালে এল হেম। ভরত এর মধ্যে বালিশে হেলান দিয়ে বসেছে। এই প্রথম চা খাচ্ছে।

হেম বলল, এই তো একেবারে ফিট দেখছি! সেরে উঠেছ! একটা নাপিত ডেকে দাড়ি কামিয়ে ফেল। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে বেশি রুগ্‌ণ দেখায়। যুগান্তরের আখড়ায় সবাই তোমার কথা বলাবলি করে। চলো, যাবে নাকি?

ভরত দুর্বলভাবে হেসে বলল, আজই কি পারব?

হেম বলল, আজ না হয় কাল। বেশিদিন বিছানায় শুয়ে থাকা ঠিক নয়। দ্বারিকাবাবুকে সবাই ধন্য ধন্য করছে। উনিই তোমাকে বাঁচালেন। আমরা দ্বারিকাবাবুকেও দলে নিয়ে নেব ঠিক করেছি।

ভরত জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা হেম, সে রাতে আর কারুর কিছু হয়নি?

হেম বলল, কোথায়, সেই রংপুরে? না, আমরা সবাই মিরাকুলাসলি এসকেপ করতে পেরেছিলাম। তোমায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাইনি। আর একটা ডাকাতের দল এসে এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে দিল। আমি সারারাত একটা গাছে উঠে বসেছিলাম, আমায় কেউ দেখতে পায়নি।

ভরত বলল, শুধু আমারই কেন এমন হয়? লোকটা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল আমার সামনে, হাতে একটা বর্শা। শুধু আমাকে মারবার জন্যই যেন ওকে কেউ পাঠিয়েছিল।

হেম বলল, ওসব আর ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমাদের কাজ তো শেষ হয়নি। আবার শুরু করতে হবে।

ভরত অস্ফুট স্বরে বলল, ফুলার?

হেম এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিল। কাছাকাছি কারুকে দেখতে না পেয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে এনে বলল, সেই শূকর সন্তানটা এখনও বেঁচে আছে। আমাদেরও বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে বলতে পারো। রংপুরে তো কিছুই হল না। আমরা তোমায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে ধরে নিলাম, তুমি কলকাতায় ফিরে গেছ। কারণ পুলিশের হাতেও তুমি ধরা পড়নি। এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল, ব্যামফিল্ড ফুলার ট্রেনের বদলে ব্রহ্মকুণ্ড স্টিমারে চেপে গোয়ালন্দ যাচ্ছে, সেখানে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

ভরত বলল, সংবর্ধনা?

হেম বলল, সেই তো মজা! আমরা যাকে বাঙালির এক নম্বর শত্রু ভেবে নিধন করতে চাইছি, তাকেই আবার বাঙালিরা সংবর্ধনা জানাতে চায়। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের জন্য যারা খুশি, সেই পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর বাঙালি। আমরা ঠিক করলাম, ওখানেই অ্যাকশান নিতে যাব। এবারে আর বারীন গেল না, আমাকে আর প্রফুল্ল চাকীকে পাঠাল। ও হরি, গোয়ালন্দে গিয়ে দেখি সেখানে জল থইথই করছে। ক'দিন আগে বন্যা হয়েছে, গোয়ালন্দ স্টেশনেও এক কোমর জল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বাতিল, লাটসাহেব স্পেশাল ট্রেনে ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়।

ভরতের ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

হেম চওড়াভাবে হেসে বলল, হাসিরই ব্যাপার বটে। এ যেন বাচ্চাদের চোর-পুলিশ খেলাকেও হার মানায়। আমরা যেখানেই যাই পাখি ফুড়ুৎ! তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আমাদের প্ল্যান জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তা হলে তো পুলিশ আমাদের শ্রীঘরে পুরে দিত আগেই। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি, ফুলারের নিয়তিই যেন তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। গোয়ালন্দে বসেই আমরা মরিয়া হয়ে ঠিক করলাম, শিয়ালদা স্টেশনেই আমরা ফুলারের ওপর অ্যাটেম্প্‌ট করব। আমরা ধরা পড়ি, মরি, যা হয় হোক। প্রফুল্লর খুব উৎসাহ। আমি তোমার অভাবটা খুব ফিল করছিলাম। যাই হোক, ট্রেনে চেপে আমরা নৈহাটি স্টেশনে এসে দেখি, সেখানে পুলিশে পুলিশে একেবারে ছয়লাপ। যেদিকে তাকাও শুধু লাল পাগড়ি। চতুর্দিকে প্রচুর আলো। কী ব্যাপার? শোনা গেল,

ফুলারসাহেব ওই স্টেশনে বসে আছে, সেখানে ইঞ্জিন পাল্টানো হবে না কী যেন হবে। পুলিশ সব লোকের বডি সার্চ না করে স্টেশনে যেতে দিচ্ছে না। বাচ্চা ছেলেরাও বাদ নয়। আমরা দু'জনে কামরার উলটোদিকের দরজা দিয়ে নেমে পড়ে হাঁটতে লাগলাম লাইন ধরে। খানিক দূরে গিয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। ট্রেন তো এই দিক দিয়ে যাবেই। প্রথমে বেশি স্পিড থাকে না। লাটসাহেবের কামরা দেখে লাফিয়ে উঠতে পারব। তারপর দু'জনে গুলি চালাব সঙ্গে সঙ্গে যাতে মিস না হয়। দু'জনে বসে একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগলাম। আমার এ কথাও মনে হচ্ছিল, এভাবে অ্যাকশান নিলে আমাদের পালাবার কোনও পথ থাকবে না, লাটসাহেবের বডিগার্ডরাও গুলি চালিয়ে আমাদের ফুঁড়ে ফেলবে, তাই যদি হয়, তা হলে সিগারেটের প্যাকেটটা আর রেখে লাভ কী, শেষ করাই ভাল। প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে আছি, কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর একসময় ট্রেনের শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জনে ফুল অ্যালার্ট। ও হরি, সেটা ট্রেন নয়, শুধু ইঞ্জিন। তাও ঘ্যাস ঘ্যাস করে খানিকটা এসে থেমে গেল, আবার পিছোতে লাগল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা গুটিগুটি এগোলাম স্টেশনের দিকে। গিয়ে দেখি, একটাও পুলিশ নেই। আলো নেই, সব ভোঁ ভাঁ। যেন ভানুমতীর খেলের মতন সব কিছু মিলিয়ে গেছে। একজন টিকিটবাবুকে ধরে জানলাম, লাটসাহেব হুগলির পুল পেরিয়ে চলে গেছে গঙ্গার ওপারে। সেখান থেকে ই আই রেলওয়ে ধরে সোজা চলে যাচ্ছেন বোম্বাই। তারপর জাহাজ ধরে একেবারে বিলেত। এ দেশে আর ফিরবেনই না!

ভরত হতবুদ্ধির মতন জিজ্ঞেস করল, তার মানে কী...উনি ভয় পেয়ে পালালেন?

হেম বলল, পাগল নাকি? মহাশক্তিমান ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি ভয় পাবে আমাদের মতন কয়েকটা ল্যাকপেকে বাঙালিকে? ব্যাপারটা তা নয়। একটা খবর আমরা জানতেই পারিনি, ব্যামফিল্ড ফুলার এর মধ্যে পদত্যাগ করেছে। কেন্দ্রের সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে খিটিমিটি বেঁধেছিল, কার্জন সাহেবের মতন ফুলারও পদত্যাগ করে দেশে ফিরে গেল। আমাদের প্রথম বিপ্লব প্রয়াসেরও এখানেই ইতি।

ভরত বলল, ফুলারের বদলে অন্য ফুলার আসবে।

হেম বলল, তা ঠিক।

অন্দরমহল থেকে হেমের জন্য চা ও জলখাবার এল। দ্বারিকা অনেক বেলা পর্যন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করে। এগারোটার আগে নীচে নামে না। ভূমিসুতা সংলগ্ন কক্ষটিতে নিঃশব্দে বসে আছে, হেম তার উপস্থিতি টের পায়নি।

খানিকক্ষণ বিশ্রম্ভালাপের পর হেম বলল, আমি কয়েক দিনের জন্য মেদিনীপুরে যাব, তুমিও আসবে নাকি আমার সঙ্গে?

ভরত একটু ইতস্তত করে বলল, এখনও বিছানা থেকে নামতে পারি না। একটু নড়াচড়া করলেই পেটের ক্ষতটায় ব্যথা শুরু হয়। কবে হাঁটতে পারব জানি না।

হেম বলল, ঠিক আছে, আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম নাও। আমি ঘুরে আসি। মেদিনীপুরে বসে প্ল্যান করব। এরকম ছেলেখেলা আর নয়, এরপর আঁটঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে। তখন তোমাকে সঙ্গে পাব তো? তোমাকে ডাকলে তুমি আসবে?

ভরত পাশের ঘরের দিকে চকিতে একবার তাকাল। দরজার একটি পাল্লা খোলা। একটা জলচৌকির ওপর বসে থাকা ভূমিসুতাকে সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু বিপরীত দিকের চেয়ারে হেমের দৃষ্টিপথে সে আসে না।

হেম বলল, বন্ধু, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংসারসুখ আমাদের জন্য নয়। আমার তো বাড়িতে থাকতেই ভাল লাগে না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। আমরা তো প্রাণ দিতে রাজিই আছি। কিন্তু তার আগে একটা কিছু বড় কাজ করে যেতে হবে, যাতে ইংরেজ-শক্তি কেঁপে ওঠে।

ভরত হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বন্ধু, তুমি যখনই ডাকবে, আমি তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব।

৮৬

কবি যদি হতেন নিছক কল্পনা-বিলাসী কিংবা বাস্তব-বিমুখ, সংসারের নানানমুখী স্রোতের মধ্যেও নিজস্ব একটা দ্বীপ নির্মাণ করে যদি থাকতেন স্বেচ্ছা নির্বাসিত, তা হলে তিনি অনেক সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তেমন কোনও অনাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কি কবিতা রচনা সম্ভব ? কুসুমগন্ধ, চন্দ্রকিরণ আর দখিনা পবন সেবন করে কবিরা বাঁচতে পারে না, যদিও জনসাধারণের সে রকমই ধারণা। সব কবিকেই অনেক সময় জল-কাদার পথ হেঁটে পার হতে হয়, পারিপার্শ্বিকের লোভ, বঞ্চনা, শোষণ, দারিদ্রের আঁচ শরীরে অনুভব করতে হয়, সমসাময়িক বাস্তবতার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয় কখনও কখনও। দেশ ও সমাজের সংকটে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে যদি নাও পারেন, তবু তিনি অতন্দ্র পর্যবেক্ষক। কবিতা বা গদ্য যা-ই লিখুন, সবই মনুষ্যজীবনের ইতিহাস।

অন্যান্য কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েছেন অনেক বেশি। একসঙ্গে অনেকগুলি দায়িত্বের বোঝা তাঁর কাঁধে। জমিদারি দেখাশুনোর সব ভারই এখন তাঁর ওপর, আয় বাড়াবারও চিন্তা করতে হয়, বাবামশাই গত হয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে জমিদারি পরিচালনার প্রণালী রবীন্দ্রনাথই বেশি শিখেছেন। অন্য দিকে আছে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। তার ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি, শিক্ষক নিয়োগ, অর্থের জোগান, এই সব কিছুই তো দেখতে হয় তাঁকে। শান্তিনিকেতনে হঠাৎ ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। কারণ, স্বদেশি আন্দোলনের জন্য ছেলেরা বয়কট করেছে সরকারি স্কুল, অরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতায় স্থাপিত হয়েছে জাতীয় বিদ্যালয়, বউবাজার স্ট্রিটের একটি ভাড়া বাড়িতে। কিছু কিছু অভিভাবক সন্তানদের সরকারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন বটে, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সাহস পাচ্ছেন না। সেটা সরাসরি সরকার-বিরোধিতা। সেইসব অভিভাবকদের চোখ পড়েছে শান্তিনিকেতনের দিকে। এ বিদ্যালয় সরকারিও নয়, জাতীয় বিদ্যালয়ের আওতার মধ্যেও পড়ে না। ছাত্রসংখ্যা বাড়লে সমস্যাও বাড়ে।

শুধু শান্তিনিকেতনের ওই রূপ একটি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়াই একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত। তিনি সংসার থেকেও মুক্ত পুরুষ নন, মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলিকে সামলাতে হয় তাঁকেই। আপাতত জ্যেষ্ঠপুত্র রথীকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে আমেরিকায়, তার খবরাখবর রাখতে হয়। মাধুরীলতা স্বামীর ঘর করছে, মাঝেমাঝে তার শরীর ভাল থাকে না। মীরা বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছে, এবার তার বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। ছোটছেলে শমী থাকে শান্তিনিকেতনে, সে ছিল তার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বাবারও অতি আদরের। শমীর ভাবভঙ্গি অবিকল তার বাবার মতন, অনেকে বলে রবি ঠাকুরের ছেলে শমী ঠাকুর। এর মধ্যেই সে ভাল গান গায়, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই কনিষ্ঠ পুত্রটিকে বেশি সঙ্গ দিতে পারেন না। তাঁকে অনবরত ঘুরে বেড়াতে হয়, তবু শমীর পড়াশুনোর যাতে ক্ষতি না হয় সেই চিন্তা সর্বক্ষণ তাঁর মন জুড়ে থাকে।

এ ছাড়া রয়েছে দেশের চিন্তা। আর কোনও লেখক মাতৃভূমির ভাবমূর্তি এবং দেশের মানুষের অপমান ও দুর্দশা নিয়ে এতখানি ভাবিত নন। ইংরেজদের যে-কোনও দুষ্কর্ম যেন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করে। বঙ্গভঙ্গ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। বাঙালি জাতিকে এই ভাবে দু' ভাগ করে দিলে এক সময় বাংলা ভাষার ওপরেও খড়্গাঘাত হবে। তাঁর অতি প্রিয় বাংলা ভাষা।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলন যে-দিকে বাঁক নিয়েছে, তাও তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। নেতাদের

মধ্যে দলাদলির প্রকট রূপ দেখে তিনি কষ্ট পান। প্রত্যেকের ভিন্ন মত। ভারতের দুর্ভাগ্য এই। এমন কোনও সর্বভারতীয় নেতা নেই, যাঁর নির্দেশ সকলে মেনে চলতে পারে। দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শা মেটা, বদরুদ্দীন তায়েবজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুর রসুল, বিপিন পাল, রানাডে, তিলক, গোখলে, আবদুস শোভান চৌধুরী, লালা লাজপৎ, এঁরা কেউই সর্বজনগ্রাহ্য নন। রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রকে দেশনায়ক করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। সুরেন্দ্রনাথও সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে নিজের রিপন কলেজের স্বার্থ দেখছেন বলে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন অনেকখানি।

বিদেশি রাজতন্ত্র, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে ভারতীয়রা শেখেনি। সে রকম নেতাই বা কোথায় ? ইংরেজ ভারতীয়দের এই দুর্বলতা জেনে গেছে বলেই আরও বিভেদ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, ভারতের সব দুর্দশার জন্য শুধু ইংরেজকে দায়ি করা ঠিক নয়, এ আমাদেরই পাপ। আমরা এখনও ক্ষুদ্র স্বার্থ আর অহমিকা নিয়ে মত্ত।

অল্পবয়েসীরা, ছাত্র ও তরুণ দল ইদানীং তিলকের খুব ভক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এক সময় তিলককে সমর্থন করেছেন, তিলক কারারুদ্ধ হবার সময় তাঁর মামলা চালাবার জন্য সাহায্য করেছেন। এখন আর উৎসাহ পান না, বরং মনে হয়, তিনি ভুল করেছিলেন, অন্যের কথায় মেতে উঠে শিবাজী উৎসবের মতন কবিতা লেখা তাঁর উচিত হয়নি। বালগঙ্গাধর তিলক যদি সর্বভারতীয় নেতা হয়ে ওঠে, তা হলে আরও বিপদ আসন্ন। মহাতেজা ওই লোকটি উগ্র হিন্দু, হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে ধরে তিনি জাতীয় আন্দোলন থেকে মুসলমানদের আরও দূরে ঠেলে দিচ্ছেন ! মহারাষ্ট্রের গণেশ উৎসব, শিবাজী উৎসবকে তিলক নিয়ে এসেছেন বাংলায়, অনেকেই মেতে উঠেছে তা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের একেবারেই পছন্দ হয় না। পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর শোনা যায়। এতকাল প্রতিবেশী থেকেও মুসলমানরা যে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে পারে, হিন্দুরা মুসলমানদের নারী-শিশুর ওপর অত্যাচার করতে পারে, এটাই তো অবিশ্বাস্য ! এই বিভেদের বীজ কোথায় সুপ্ত ছিল ? ইংরেজ শাসকরা যে নিজেদের স্বার্থে এই বীজকে সযত্নে লালন করছে, তা হিন্দুরাও বুঝছে না, মুসলমানরাও বুঝছে না।

এত সব দায়িত্ব ও চিন্তা থাকলে কি কবিতা রচনা করা যায় ? কবি ভাববিলাসী নন, আবার নিরন্তর কর্মযোগী হয়ে থাকলেও তাঁর শিল্প-সত্তা চাপা পড়ে যায়। পলায়নবাদী নন কবি, কিন্তু সৃষ্টির সময়টাতে তাঁকে পলাতক হতেই হয়। সে সময়ই পাচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ, তাই কবিতা লেখাও হচ্ছে না তেমন, ইদানীং একটার পর একটা প্রবন্ধ লিখছেন, তাতে প্রকাশ করছেন দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা। কিন্তু এসব পড়ে বা ক'জনের চৈতন্য উদয় হবে কে জানে !

আপাতত কন্যার বিবাহের চিন্তাটাই প্রাধান্য পাচ্ছে। মীরার বয়েস তেরো পেরিয়ে গেছে, আর দেরি করা যায় না, পাত্রের অনুসন্ধান চলছে নানা স্থানে। অনেক পাত্রপক্ষ নিজেরাই প্রস্তাব নিয়ে আসে। চতুর্দিকে রটে গেছে, ঠাকুরবাড়ির কোনও কন্যাকে বিবাহ করলে, রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের মতন, একটি সুন্দরী বধূ ও ইংলন্ডে গিয়ে পড়াশুনোর খরচ পাওয়া যায়। শ্বশুরবাড়ির খরচে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টার হবার লোভে অনেক যুবকই উঁকিঝুঁকি মারে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ঠিক করে রেখেছেন, এবার আর তিনি কিছুতেই পণ দেবেন না। বিদেশে পাঠাবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে জামাই আনবেন না। রেণুকার বিয়ের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ! সত্যেন্দ্র এখনও জ্বালিয়ে চলেছে তাঁকে। সত্যেন্দ্রর অপদার্থতায় রেণুকার মন ভেঙে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে আর বাঁচলই না।

বন্ধুরা কিছু কিছু পাত্রের সন্ধান আনছেন, কোনওটি বোম্বাইয়ের, কোনওটি লাহোরের। বিভিন্ন রাজ্যের, ভিন্ন ভাষাভাষীর ছেলেমেয়েদের বিবাহের কিছু কিছু চল হয়েছে, সরলার যেমন বিবাহ হয়ে গেল পঞ্জাবের এক অধিবাসীর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ মেয়েকে খুব দূরে পাঠাতে চান না, মাঝে মাঝে তাকে দেখতে চান।

একদিন বরিশালের বামনদাস গাঙ্গুলির এক ছেলে একটি চিঠি নিয়ে এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সে এসেছে ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কীয় কাজে, কিন্তু তাকে দেখেই রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়ে গেল। সতেরো-আঠারো বছর বয়সী সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক, বেশ দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ, সুঠাম স্বাস্থ্য, মুখমণ্ডলে বেশ একটা তেজস্বী ভাব আছে। তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে আরও মুগ্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথ, এ যেন দৈব যোগাযোগ। ছেলেটির নাম নগেন, সে ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান, আবার গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয় বলে খাঁটি ব্রাহ্মণ। যাকে বলে সোনায় সোহাগা।

রবীন্দ্রনাথ বামনদাসের চিঠির উত্তরে কাজের কথা লেখার পর নগেন্দ্রর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব জানালেন। যথাসময়ে উত্তর এল, বামনদাস জানালেন যে একে তো সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবার, তার ওপরে প্রখ্যাত কবি ও ব্রাহ্ম সমাজের নেতা রবীন্দ্রবাবুর কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহ দেওয়া তো অতি ভাগ্যের কথা। কিন্তু শ্রীমান নগেন্দ্র এখন বিবাহে ইচ্ছুক নয়, সে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ করতে চায় ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকার্য ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, দুটিই বিশেষ সমর্থনযোগ্য, তবে এর সঙ্গে বিবাহ করতে বাধা কী ? বামনদাসের কাছ থেকে এবারে উত্তর এল যে তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুত্রকে রাজি করিয়েছেন, কিন্তু শ্রীমানের একটি শর্ত আছে, সে উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা যাবে বলে মনস্থির করেছে। জাহাজ ভাড়া ও সেখানে পড়াশুনোর ব্যয় জুগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য তার পিতার নেই। সুতরাং মহাশয় যদি জামাতাকে পুত্রবৎ মনে করে আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তবেই এ বিবাহ সম্ভব হতে পারে।

ঘুরেফিরে সেই একই প্রস্তাব। তবে ইংল্যান্ড নয়, আমেরিকা, ভাড়া অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ নিজের জেদ আঁকড়ে থাকতে পারলেন না, পাত্রটি তাঁর এমনই মনোমতন যে তিনি ওকে হাতছাড়া করতে চান না। তিনি আবার ভুল করলেন, তিনি ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা আছে। কিন্তু পদবিতে ব্রাহ্মণ হলেও নগেন্দ্র ব্রাহ্মণত্ব কিছুই মানে না, হিন্দুয়ানিরই ঘোর বিদ্বেষী। এই বয়েসেই সে গোঁড়া ব্রাহ্ম, তাও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের, আদি সমাজের সঙ্গে তাদের দূরত্ব অনেকখানি। প্রথম দর্শনে রবীন্দ্রনাথ তাকে মনে করেছিলেন তেজস্বী, আসলে সে স্বভাবে উদ্ধত ও গোঁয়ার। বিবাহের রাতেই তার আচরণে সে প্রমাণ পাওয়া গেল।

বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে শান্তিনিকেতনে। এর আগে শান্তিনিকেতনে বড় রকমের কোনও পারিবারিক উৎসব হয়নি, রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব অনেককে আমন্ত্রণ জানালেন। এই তাঁর শেষ কন্যার বিবাহ, সেজন্য বেশ বড় রকমের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল, পাত্রপক্ষ সদলবলে এক দিন আগেই উপস্থিত।

বিবাহের দিনে সকাল থেকেই শোনা গেল, নগেন্দ্র নাকি বলেছে, মেয়েদের পায়ে আলতা দেওয়া ও মাথায় সিঁদুর পরা সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, ওসব নাকি হিঁদুয়ানি। যাকে তাকে সে টিপ টিপ করে প্রণাম করতেও পারবে না। হিন্দুরা যে কোলাকুলি করে, তাও তার অপছন্দ, ব্রাহ্মদের ওসব মানতে নেই। কথাগুলি রবীন্দ্রনাথেরও কানে গেল, তিনি মৃদু হাসলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অল্পবয়েসী ছেলে ছোকরারা তো কিছুটা বাড়াবাড়ি করে, তিনি জানেন। নগেন্দ্রকে পরে বুঝিয়ে বললেই হবে। তিনি নিজে সিঁদুর-আলতা পরা বা কোলাকুলিকে সমর্থনও করেন না, আবার পরিত্যাজ্যও মনে করেন না। এগুলি কোনও ধর্মের অঙ্গ নয়, লোকাচার, স্থানীয় সংস্কৃতি। এক একটি অঞ্চলে এরকম কিছু কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে, তার বিরুদ্ধাচরণ করাও হাস্যকর গোঁড়ামি। যা অনেক মানুষে চায়, যা একটা সামাজিক প্রথা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, তা শুধু শুধু অবজ্ঞা করতে চাওয়া হবে কেন ? কোনও মেয়ে যদি পায়ে আলতা পরে কিংবা কপালে একটা লাল টিপ পরে আনন্দ পায় তো পাক না, এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।

সকালবেলাতেই নগেন্দ্র গায়ে হলুদে আপত্তি জানাল। তাতে কেউ বিশেষ আমল দিল না, খানিকটা হলুদবাটা বরের অঙ্গে ছুঁইয়ে কনের কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়, তা এমনি পাঠিয়ে দেওয়া

হল। তবে গোলমাল বাধল বিবাহবাসরে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণকে উপবীত ধারণ করতেই হয়। যদি কারুর উপবীত না থাকে, তা হলে পুরোহিতমশাই সেখানেই গ্রন্থি দিয়ে বরকে দ্বিজত্বে উন্নীত করেন। নগেন্দ্রর উপনয়ন তো হয়নি বটেই, সে প্রস্তাব শুনেই সে বলে উঠল, আমি পৈতে পরব না!

উপবীত ধারণের প্রশ্ন নিয়েই প্রথম ব্রাহ্ম সমাজে ভাঙন ধরে। এখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজই বেশি সক্রিয় ও শক্তিশালী, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-শূদ্র ইত্যাদি জাতিভেদ নেই, পৈতে দিয়ে আলাদা করে ব্রাহ্মণকে চিহ্নিত করা তাদের কাছে উপহাসের ব্যাপার। নগেন্দ্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে বলে গলায় পৈতে পরতে হবে, এমন পাত্র সে নয়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

পুরোহিত মশাই পড়লেন মহা ফাঁপরে। উপবীত না ছুঁয়ে মন্ত্র পড়লে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, এদিকে ভাবী বর বেঁকে বসেছে। তিনি নরমভাবে মিনতি করে বললেন, বাবাজীবন, কিছুক্ষণের জন্য অন্তত উপবীতটি ধারণ করো, তারপর কাজ চুকে গেলে না হয় খুলে ফেলো। বেশিক্ষণের ব্যাপার তো নয়।

তিনি নগেন্দ্রর কণ্ঠে নয় পাক দেওয়া পৈতেটি পরিয়ে দিতেই সে উঠে দাঁড়াল, পৈতেটি ছিঁড়ে নিক্ষেপ করল দূরে। কর্কশ কণ্ঠে বলল, এই সব জঞ্জাল ছাড়া বিয়ে হয় কি না বলুন! নইলে....

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন একটু দূরে। যেন একটা নিথর মূর্তি, নিশ্বাসও পড়ছে না।

কবিরও কি কখনও ক্রোধ হয় না ? কিন্তু এখানে ক্রোধ সংবরণ করা ছাড়া উপায় নেই।

সতেরো-আঠারো বছরের এই অশিষ্ট যুবকটিকে এখন জোর ধমক দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেউ তা দেবে না। নগেন্দ্রর বাড়ির লোকজন যেন মজা দেখছে। হিন্দু সমাজে একটা অদ্ভুত রীতি চালু আছে, আদি ব্রাহ্ম সমাজও তার থেকে মুক্ত নয়। বিবাহ বাসরে বরপক্ষ যেমন খুশি অভদ্র, অন্যায় আচরণ করতে পারে, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে পারে না কন্যাপক্ষ। বিবাহবাসরে পণের টাকা পুরোপুরি পাওয়া যায়নি কিংবা প্রতিশ্রুত স্বর্ণালঙ্কার সব দেওয়া হয়নি, এই অজুহাত দেখিয়ে বিবাহ সম্পূর্ণ না করেই পাত্রকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় বরপক্ষ, এরকম ঘটনা সারা বাংলায় অহরহ ঘটছে। কন্যাপক্ষ তখন অসহায়, কারণ পূর্বনির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট লগ্নে যদি কন্যার বিবাহ না হয় তা হলে সে লগ্নভ্রষ্টা হয়ে যায়। সে অতি কলঙ্কের কথা, সে কন্যার আর বিবাহ হয় না। সেই জন্য কন্যাপক্ষ তখন সেই সব লোভী, কুৎসিত ব্যবহারকারী পাত্রপক্ষের কাছে হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি করে, পা ধরতেও বাকি রাখে না।

নগেন্দ্র কাব্য-সাহিত্য পাঠের ধার ধারে না। তার ভাবী শ্বশুর যে একজন কবি এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, তা সে গ্রাহ্য করল না। যেন এ পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে ধন্য করে দিচ্ছে। প্রথম দিনেই তার আচরণ দেখে বোঝা যায়, তার সহবত জ্ঞান নেই, রুচি নিম্নস্তরের, এ যুবক ঠাকুরবাড়ির যোগ্য জামাতা হতে পারে না। মীরা যে সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বর্ধিত হয়েছে, তাতে সে শ্বশুর পরিবারে গিয়ে স্বস্তি বোধ করতে পারবে না। এখনও এ বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া যায়।

কিন্তু কবির মন দ্বিধান্বিত। এ বিবাহ সম্পন্ন না হলে যদি মীরাকে অনূঢ়া অবস্থায় কাটাতে হয় সারা জীবন ? তখন তো আত্মীয়-বন্ধুরা মীরার পিতাকেই দুষবে। অনুপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে সহবাস, না সারা জীবন কুমারী থাকা, কোনটা বেশি কাম্য ?

সবাই চুপ করে আছে। পুরোহিত মশাই অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছেন, রবীন্দ্রনাথের দিকে। রবীন্দ্রনাথ দু'বার মাথা নোয়ালেন। উপবীত ছাড়াই মন্ত্রপাঠ হোক।

বাকি সময় আর রবীন্দ্রনাথ সে আসরে রইলেন না। বন্ধুদের মধ্যে জগদীশ আসেননি, লোকেন পালিতও আসতে পারেননি, এই সময় কথা বলার মতন কেউ নেই। বিদ্যালয়ের ঘরগুলিতে অতিথিদের খাওয়া দাওয়া চলছে, রবীন্দ্রনাথ সেদিকেও গেলেন না। তাঁর বাড়ির পেছন দিকে নির্জন স্থানে পায়চারি করতে লাগলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের আকাশ একেবারে পরিষ্কার, মেঘের চিহ্ন নেই,

অসংখ্য তারা দেখা যায়। যখন মনের মধ্যে সংকট থাকে, তখন রবীন্দ্রনাথ আকাশের দিকে তাকিয়ে শান্তি পান। কী বিপুল, কী অনন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেদিকে মাথাটা উঁচু করলে মনে হয়, এর মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখ কত তুচ্ছ!

আমি বিশ্ব-সাথে রব সহজ
বিশ্বাসে
আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
প্রাণের মধ্যে নিঃশ্বাসে।
পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
পুণ্য হবে সর্ব দেহ...

হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পেলেন। যেন প্রাণান্তকর কোনও নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। খুব কাছেই। রবীন্দ্রনাথের বুক কেঁপে উঠল। মীরা, এ তো মীরা। ঝোঁকের মাথায় মীরা একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু করে বসল নাকি! ঘোমটায় মুখ ঢেকে সে বসেছিল, তবু সে বাবার অপমানের ব্যাপারটা টের পেয়েছে, সে কি আত্মঘাতিনী হল?

রবীন্দ্রনাথ দৌড়ে ঢুকে গেলেন বাড়ির মধ্যে। আওয়াজ এসেছে স্নানের ঘর থেকে। আরও কয়েকজন এরই মধ্যে জড়ো হয়েছে সেখানে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্নানঘরের দরজা খোলা, ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে মীরা, অঙ্গে নববধূর বেশ, ডায়নামো দিয়ে বিজলি বাতি জ্বালানো হয়েছে, তাই ভেতরটা বেশ আলোকিত। মীরা গলায় দড়িও দেয়নি, গায়ে আগুনও ধরায়নি, তার চক্ষু বিস্ফারিত, সে থরথর করে কাঁপছে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন সাপটাকে। ঠিক চৌকাঠের ওপর আধাআধি, বাকি অর্ধেক উঁচু হয়ে ফণা মেলে রয়েছে, একটা গোখরো সাপ, এত বড় গোখরো সচরাচর দেখা যায় না। ফণা মেলে দুলছে সেই সাপ।

এক নজর দেখেই মনে হল, মীরাকে বাঁচানো যাবে না। সাপটাকে মারতে গেলেই সেটা স্নানঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। মীরা বেরিয়ে আসতে পারবে না। গোখরো সাপ এমনিতেই বদমেজাজি হয়, সামনে পেয়ে প্রথমেই মীরাকে দংশন করবে। সবাই হতবুদ্ধি হয়ে আছে।

কবিকে কখনও কখনও লাঠিও হাতে নিতে হয়। কয়েকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে এসেছে, অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছে না। কবি একজনের হাত থেকে একটা লাঠি নিয়ে নিলেন। তাঁকে যদি কামড়ায় তো কামড়াক, তবু মেয়েকে বাঁচাতেই হবে। অতটুকু বয়েস, জীবনের কিছুই জানবে না? তিনি তো তবু অনেক কিছু পেয়েছেন।

কোনওদিন কোনও প্রাণীকে আঘাত করেননি কবি, আজ তিনি দৃঢ়মনস্ক। একটা শক্ত ঘা দিতে হবে। তাতে সাপকে একেবারে ঘায়েল করা যায় না, তবু তার মনোযোগ মীরার দিক থেকে ফিরবে, সে ক্রুদ্ধ হয়ে এ দিকে ছোবল দিতে আসবে। লাঠিটা উঁচিয়ে এক পা এক পা করে এগোতে লাগলেন কবি।

সাপটির পরমায়ু আরও কিছুদিন বাকি ছিল, এবং পিতা-পুত্রীরও। অকস্মাৎ সে ফণাটা নিচু করে নিল, তারপর প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে চৌকাঠের এক পাশের গর্তে ঢুকে পড়ল। সকলে হই হই করে উঠল এক সঙ্গে।

মীরা ছুটে এসে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাতে তাকে ব্যেপে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর হৃদয়ে মোচড় লাগল। আর কোনও ছেলেমেয়ের বিবাহের রাতে এরকম সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেনি। এটা কীসের সূচক! তবে যাই ঘটুক না কেন, তিনি তাঁর কন্যাকে সব সময় এ রকম আগলে রাখবেন।

বিবাহ-পরবর্তী পরিকল্পনা নগেন্দ্র আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে। নবোঢ়া পত্নীকে নিয়ে মধুযামিনী উপভোগ করার বাসনা তার নেই। অবিলম্বে সে আমেরিকায় যাবার ব্যবস্থা করতে চায়। তার আগে সে একবার বরিশালে গিয়ে স্ত্রীকে সেখানেই রেখে আসবে কিছুদিনের জন্য।

বিবাহের পর পিত্রালয় ছেড়ে যাবার সময় সব মেয়েই কান্নাকাটি করে। কিন্তু মীরার কান্না থামতেই চায় না। বাবাকে ছেড়ে আগে সে কোথাও যায়নি, মায়ের মৃত্যুর পর সে-ই সাধ্যমতন বাবার সেবা করেছে, এখন বাবা একলা থাকবেন কী করে? রবীন্দ্রনাথ কত করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মীরা একেবারে অবুঝ। দেবেন্দ্রনাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বিয়ের পরেও বাপের বাড়িতেই থাকত, স্বামীরা ঘর-জামাই হত। কিন্তু সময় বদলে গেছে, গোষ্ঠীপতি দেবেন্দ্রনাথ নেই, ঠাকুরবাড়ির সেই আগেকার জাঁকজমকও নেই, এখন ভাইয়েরা যে-যার নিজস্ব অংশে থাকে, পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে তো যেতেই হয়, মীরার দিদি মাধুরীলতা যায়নি মুঙ্গেরে?

শেষ পর্যন্ত মীরার পীড়াপীড়িতে রবীন্দ্রনাথকেও বরিশাল যেতে হল। কন্যাকে তিনি তার শ্বশুরালয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে আসবেন। সেই প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় ফুলার সাহেবের নির্দেশে পুলিশি অত্যাচারের বিবরণ শুনে রবীন্দ্রনাথ নৌকা ছেড়ে বরিশাল শহরে পদার্পণ করেননি। তারপর এই আবার বরিশালে আসা। তাঁর আগমন-বার্তা অঘোষিতই রয়ে গেল।

গাঙ্গুলি পরিবারটির ধরন-ধারণ তাঁর কেমন মনঃপূত হল না। কথাবার্তার সুর কেমন যেন রুক্ষ। নগেন্দ্রর ভাইগুলি আরও বেশি কট্টর, হিন্দু সংস্কৃতির অনেক কিছু নিয়েই তারা ঠাট্টাতামাশা করে। ব্রাহ্মদের এই বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ নয়। তিনিও নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী তা বলে কি তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ কাহিনী উপভোগ করতে পারবেন না! এ কাহিনীর মধ্যে যে চিরন্তনতা আছে, তা কোনও বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

মীরাকে তিনি অবশ্য কিছুই বুঝতে দেন না, তার শ্বশুর কুলের সকলের নামেই বিস্তর প্রশংসা করেন। স্বামী বিদেশে গেলে মীরা পড়াশুনো করার অনেক সময় পাবে। তিনিও কন্যাকে নিয়মিত চিঠি লিখবেন।

একদিন চট্টগ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে তাঁকে ধরলেন। কবি কখনও চট্টগ্রামে যাননি, সেখানকার অধিবাসীরা কবিকে একবার নিজেদের মধ্যে পেতে চায়। তাঁকে সংবর্ধনা জানাবে। বেশি অনুরোধ করতে হল না। রবীন্দ্রনাথ রাজি হয়ে গেলেন। বরিশাল থেকেই কলকাতায় ফিরতে তাঁর মন চাইছিল না। মীরা থাকবে না, জোড়াসাঁকোর বাড়িটা তাঁর কাছে শূন্য মনে হবে।

মীরা অবশ্য বরিশালের মতন অচেনা স্থানে, শ্বশুরবাড়ির প্রায় অপরিচিত লোকজনদের সঙ্গে একা কিছুতেই থাকতে রাজি হল না। রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে দেখলেন নগেন্দ্রর সঙ্গে মীরাও ফিরে এসেছে। আর কয়েকদিন পরই নগেন্দ্র আমেরিকা যাত্রা করবে, মীরা তখন চলে যাবে শান্তিনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ আবার প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেকে তিনি ব্যস্ত রাখতেই চান, নইলে এক একদিন যেন বুকের মধ্যে আকাশজোড়া শূন্যতা ঢুকে পড়ে। মনে হয়, তিনি যা কিছু করে যাচ্ছেন, সবই যেন অর্থহীন। জীবন যেন প্রতিদিন শুষ্ক থেকে শুষ্কতর হয়ে উঠছে। সম্পূর্ণ নারীবর্জিত জীবন। একটুও মধুর রসের ছোঁয়া নেই। কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে তিনি পুরোপুরি মন খুলে দিতে পারেন না, শুধু কোনও কোনও নারীর কাছেই তিনি সহজ হতে পারেন। এটা তাঁর স্বভাব। বিবির বিয়ে হবার পর যোগাযোগ অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে। আর কোনও নারীকে তিনি চিঠিও লেখেন না। সেইজন্যই কি কবিতা লেখাও কমে আসছে?

একমাত্র প্রিয়ংবদার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, সে সাহিত্যগত প্রাণ, কবিতা ভালবাসে, নিজেও কবিতা লেখে, সে নিজের কবিতা শোনায়। কিন্তু প্রিয়ংবদার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হওয়ার সামাজিক অসুবিধে আছে। তা ছাড়া আরও একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, একসময় হঠাৎ খুব টাকার টানাটানি পড়েছিল, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের খেতে না পাওয়ার মতন অবস্থা, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া যাচ্ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সে সময় হন্যে হয়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন—প্রিয়ংবদা কী করে যেন তাঁর প্রিয় কবির অত দুশ্চিন্তার কথা শুনে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঋণ দিয়েছিলেন দশ হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ প্রতি মাসে কিছু কিছু সেই টাকা শোধ করছেন। কোনও রমণীর কাছে যদি অর্থ-ঋণ

থাকে, কোনও অধমর্ণ পুরুষ কি তার সঙ্গে মধুর ভাবের কথা বলতে পারে ! কবির এই সঙ্কোচের কথা জেনে প্রিয়ংবদা আরও পাঁচশো টাকা পাঠালেন শান্তিনিকেতনের জন্য, এটা ঋণ নয়, দান। তাতে কৃতজ্ঞতার বোঝা আরও বেড়ে গেল।

দু'-একজন বন্ধু মাঝে মাঝে ইঙ্গিত দেয়, বিপত্নীক কবির আবার বিবাহ করা উচিত। তাঁর বয়েস এখন মাত্র ছেচল্লিশ, শরীর অটুট, অদম্য কর্মক্ষমতা, তবে তিনি আর একজন জীবনসঙ্গিনী বেছে নেবেন না কেন ? এই বয়েসের অনেক পুরুষই আকছার বিয়ে করে। এতে দোষের কিছু নেই। সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকেও তিনি অনেকখানি মুক্ত। কেউ কেউ একটু বাঁকা সুরে বলে, রবিবাবু নিজে আবার বিয়ে করবেন বলেই বুঝি ছোট মেয়েটির তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিয়ে দিলেন ?

এসব কথাই কবির কাছে খুব অরুচিকর মনে হয়। মৃণালিনী চলে যাবার পর আবার বিবাহের কথা তিনি স্বপ্নেও কখনও চিন্তা করেননি। তিনি পাঁচটি সন্তানের পিতা, তাদের মধ্যে জীবিত রয়েছে চারজন, সম্পূর্ণ এক অচেনা নারীকে তারা মা বলে ডাকবে ? এ কখনও হতে পারে। এ রকম নির্লজ্জতার কাজ তিনি করতে পারেন, এমন কথা লোকে ভাবে কী করে !

তবু নারীসঙ্গলিপ্সা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে। নারীর সৌন্দর্য, নারীর হৃদয়-রহস্য পুরুষকে সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। স্ত্রী নয়, সংসারসঙ্গিনী নয়, কোনও নারী কি শুধু বন্ধু হতে পারে না ? সখী হতে পারে না ? তেমন নারীই বা কোথায় ?

একদিন ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে দূত এল। তিনি কবির সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরের প্রতি খানিকটা অপ্রসন্ন হয়ে আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে গোলমাল লেগেই আছে, কিছুতেই সামলাতে পারছেন না রাধাকিশোর। পিতার চরিত্রের দার্ঢ্য তাঁর মধ্যে একেবারেই নেই। বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থাপনার অনেকখানি দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর সচিব রাধারমণ ঘোষ। সে কাজে তিনি ছিলেন অতীব দক্ষ, আগেকার মহারাজ অনেকখানি নির্ভর করতেন তাঁর ওপর। এখন সে রকম একজন সুযোগ্য প্রশাসক দরকার, তাই রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বাসভাজন রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু রমণীমোহনের বিরুদ্ধে মহারাজের পারিষদরা চক্রান্তে মেতে উঠেছে, একজন বহিরাগতকে তারা সহ্য করবে না। রাজকার্যের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে যে-কোনও স্থান থেকে আনানো যায়, কিন্তু রাধাকিশোর শক্তভাবে সমর্থন দিতে পারছেন না তাঁর এই সচিবকে। রমণীমোহন আর টিকতে পারবে না ত্রিপুরায়। এর মধ্যেই এক ইংরেজকে চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছিলেন, কোনও ইংরেজকে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। এই করে ইংরেজরা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা গ্রাস করবে।

ত্রিপুরা রাজ্যটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দুর্বলতা আছে। অনেকদিন থেকে তিনি জড়িয়ে আছেন এর সঙ্গে। এই রাজপরিবারটির তিনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ বেধেছিল, তিনি রাধাকিশোরকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। ত্রিপুরার এই রাজপরিবার বাংলা ভাষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। এই রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরও বিস্তার ঘটতে পারে। উপজাতীয়রাও বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করছে। কিন্তু রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারছেন না। তাঁর পিতা ভেবেছিলেন, বৈষ্ণব পদাবলীর একটি নির্ভরযোগ্য সঙ্কলন প্রকাশ করবেন, একটা আধুনিক উন্নত প্রেসও খুলবেন, সেখান থেকে প্রকাশিত হবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার শোভন রাজ সংস্করণ। রাধাকিশোর পিতার অসমাপ্ত বাসনা পরিপূর্ণ করার কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না। আগরতলায় নতুন রাজপ্রাসাদ বানাবার জন্য ব্যয় করছেন প্রচুর অর্থ।

তবু এই সাক্ষাৎ প্রার্থনা একেবারে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহারাজকে আমন্ত্রণ জানালে অনেক আয়োজন করতে হয়, এখন সে রকম লোকবল নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই গেলেন।

তিনি যখন উপস্থিত হলেন, রাধাকিশোর সেই মুহূর্তে প্রাসাদের বাইরে একটি নতুন, চকচকে মোটর গাড়িতে উঠছেন। কবিকে দেখে মহারাজ দু'বাহু বাড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন রবিবাবু, আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন। চলুন, এই গাড়িতে চেপে একটু গঙ্গার পবিত্র সমীরণ উপভোগ করে আসা যাক।

রবীন্দ্রনাথ গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ির চালকের অঙ্গে খাকি রঙের পোশাক, মাথায় পাগড়ি। তার সামনে একজন বন্দুকধারী দেহরক্ষী। রাধাকিশোর বললেন, রবিবাবু, এ গাড়িটি সদ্য বিলেত থেকে এসেছে, দেখেছেন ইঞ্জিনের একটুও শব্দ নেই। মোটর গাড়ি হচ্ছে এ যুগের জাদু গালিচা, আকাশে ওড়ে না বটে, কিন্তু আপনি বসলেন, আপনার ইচ্ছে মতন যে-কোনও জায়গায় নিয়ে যাবে। রবিবাবু, আপনি গাড়ি চালাতে জানেন ? আমি শিখব ভাবছি।

ঠাকুরবাড়িতেও গোটা দু'-এক গাড়ি কেনা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ জুড়িগাড়ি বাতিল করে এখন মোটর গাড়ি চাপছেন। এখন আর মোটর গাড়ি অভিনব কিছু নয়। কিন্তু রাধাকিশোর শিশুর মতন উচ্ছ্বসিত, অনবরত গাড়ির গুণপনার কথা বলে চলেছেন।

এক সময় তিনি বললেন, এই গাড়ির আরোহী হয়ে বেনারস পর্যন্ত যাব ঠিক করেছি। শের শাহের আমলের যে রাস্তা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, সেই পথে সরাসরি যাওয়া যায়। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে ?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, এখন তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতনে নতুন স্কুলবাড়ি নির্মাণ করতে হচ্ছে, নিজে তদারকি করতে চাই—

মহারাজ আরও দু'একবার পীড়াপীড়ি করলেন, রাজি হলেন না কবি। অন্য কোনও প্রসঙ্গ উঠছে না দেখে তিনি একটু পরে নেমে পড়লেন।

পরদিন জাতীয় শিক্ষা পরিষদে তাঁর বক্তৃতা, 'বিশ্বসাহিত্য'। জনসমাগম হয়েছিল অনেক, কিন্তু বাড়ি গিয়েও মন প্রসন্ন হল না। তিনি কি প্রবন্ধ লেখক আর বক্তৃতাবাজ হিসেবে খ্যাত হবেন ? সবাই বেশ ভারিক্কি ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে ? কবিতা কোথায় !

মাথায় গুনগুন করছে নটমল্লারের সুর। 'মোরি নই লগন লাগিরে...'। এটাকে ভেঙে তিনি নিজস্ব কথা বসালেন 'মোরে বারে বারে ফিরালে...'। শেষ করার পর দু-তিনবার গেয়ে খানিকটা হালকা বোধ করলেন। এরপর একটা কবিতা লিখলে হয় না ? আগে এরকম কতবার হয়েছে, একই সঙ্গে দু-তিনটি গান ও দু-তিনটি কবিতা রচনা করে গেছেন বিভোর হয়ে। তখন জগতের আর কোনও কিছু সম্পর্কে খেয়াল থাকে না।

একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করেও মন অন্য দিকে চলে গেল। ওষ্ঠে একটা তিক্ত স্বাদ। একটা নতুন অভিযোগ উঠেছে, তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য। শুধু তাই নয়, তিনি ইচ্ছে করে অর্থহীন, ধোঁয়াটে কবিতা লিখে পরবর্তী তরুণ কবিদের মাথা খাচ্ছেন, এতে বাংলা কাব্যের চরম ক্ষতি হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বন্ধু ছিলেন এক সময়, তিনি হঠাৎ বিরোধী হয়ে বিশ্রী ভাষায় আক্রমণ করছেন, লোকেন পালিতও নাকি সমর্থন জোগাচ্ছেন তাঁকে। সবচেয়ে আক্রমণের লক্ষ্য তাঁর 'সোনার তরী' নামের কবিতাটি, ওর নাকি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমেত চার-পাঁচ রকমের ব্যাখ্যা হয়। এক কবিতার যদি বিভিন্ন পাঠকের কাছে বিভিন্ন অর্থ প্রতিভাত হয়, দ্বিজুবাবুর মতে সেটা নাকি খুব খারাপ। রবীন্দ্রনাথ এসব তর্কে প্রকাশ্যে কিছুতেই জড়াতে চান না। 'সোনার তরী' নিয়ে ওদের এত মাথাব্যথার কারণটা কী ! এ সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক ! কবিতার রস যদি কোনও ব্যাখ্যার ওপরেই নির্ভর করে, তবে সে কবিতা বৃথাই লেখা হয়েছিল। ওরা কেন ভাবে না যে 'সোনার তরী' কবিতাটির বিশেষ কোনও অর্থই নেই, কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের ভাব, একটা ছবি, একটা সঙ্গীত মাত্রই হয়, তাতেই বা কী ক্ষতি ?

এই সব মাথার মধ্যে ঘুরলে নতুন কবিতা আসে।

পরদিনই রবীন্দ্রনাথ একটা চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। কয়েকটি ছাত্র এল দেখা করতে। তিরিশে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের বার্ষিকী। এবারও ওই দিনটিতে রাখিবন্ধন উৎসব হবে, সারা বাংলায়

৬৮৯

পালিত হবে অরন্ধন, মিছিল হবে কলকাতার রাজপথে, এবার আরও জোরদার করতে হবে প্রতিবাদ। সেই উৎসব ও মিছিলের পূর্ব পরিকল্পনা তারা রবীন্দ্রনাথকে শোনাল। মিছিলের পুরোভাগে অবশ্যই থাকবেন রবীন্দ্রনাথ। এবারে তিনি ওই উপলক্ষে নতুন গান লিখবেন না ?

সব শুনে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত ভাবে বললেন, না। আমি আর মিছিলে যেতে চাই না। ছাত্ররা বলল, সে কী ! 'রাখিবন্ধন' আপনারই পরিকল্পনা, আপনি যাবেন না, তা কি হয় ? আমরা প্রেরণা পাব কার কাছ থেকে ?

রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধন সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, তোমরা যাও, আমি আর ওর মধ্যে নেই। মিছিলে যাওয়া কবির কাজ নয়। কবির অস্ত্র লেখনী। আমি আর কোনওদিনই কোনও মিছিলে যাব না।

একটি ছাত্র কাতরভাবে বলল, কবিবর, আমাদের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন। আমরা কার কথা শুনব ? সুরেনবাবু এক কথা বলছেন, বিপিনবাবু অন্য কথা। 'বন্দেমারতম' পত্রিকায় অরবিন্দবাবু সরাসরি উস্কানি দিচ্ছেন রাজদ্রোহে। তিলক বলছেন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা। সরলাদেবী নেই। আমাদের কে সঠিক পথ দেখাবে ? আমরা সবাই আপনাকে মান্য করি। আপনি নেতৃত্বভার গ্রহণ করুন, আপনি সারা দেশবাসীকে ডাক দিন, আমরা আপনার পেছনে এসে দাঁড়াব !

রবীন্দ্রনাথ খানিকটা উষ্ণভাবে বললেন, কী, আমাকে নেতা হতে বলছ। জননেতা ? সভায় দাঁড়িয়ে বাগাড়ম্বর করব ? অপরকে হেয় করে নিজেকে বড় বলে প্রমাণিত করতে হবে ? দলাদলি, মিথ্যাচার, ব্যক্তিস্বার্থ, এর নাম রাজনীতি ! আগে অন্যদের বলেছি, এখন তোমাদেরও জানাচ্ছি, ওসব যাঁরা পারেন, তাঁরা করুন। আমি রাজনীতির সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখতে চাই না। নেতা সাজবার আমার বিন্দুমাত্র সাধ নেই। আমি নিজের কাজ করে যাব। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় চালানোই এখন আমার প্রধান কাজ। এই দেশ, এই দেশের মানুষের জন্য আমার যে-টুকু সাধ্য লিখে যাব, তোমরা আমাকে অন্য অনুরোধ কোরো না।

কলকাতার আসন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনেও যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে গানও গাইবেন না। তিনি চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। কলকাতার চেয়ে শান্তিনিকেতনেই তাঁর নিজস্ব আশ্রয়। এখানে সবাই তাঁকে গুরুদেব বলে। তিনি জননেতা হতে চান না, কিন্তু বাকি জীবন তাঁকে গুরুদেব হয়ে থাকতে হবে।

৮৭

সন্ধের সময় একখানি বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভরত। এখনও তার ঘুমের ঠিক সময়-অসময় নেই, কখনও মাঝরাতে জেগে উঠে বসে থাকে, আর চক্ষু বুজতে চায় না, সেই অবস্থাতেই সে ভোরের পাখির ডাক শুনতে পায়। আবার কোনওদিন সকাল দশটাতেই ঘুমে চোখ টেনে আসে। এখন সে সংবাদপত্র পড়ে, বইও পড়ে, দ্বারিকা একগুচ্ছ বই পাঠিয়ে দিয়েছে তার জন্য। কিন্তু ভরত একটানা বেশিক্ষণ বইয়ের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না, কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্ত লাগে।

আজ সে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' নামে গ্রন্থখানি পড়তে শুরু করেছিল। কেমন যেন অদ্ভুত ভাষা, ঠিক কবিতা নয়, কাহিনীর মতনও নয়। তিন-চার পৃষ্ঠার পরই ঘুমে ঢলে পড়েছিল সে। জেগে উঠল প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। অসময়ের ঘুমে প্রহরজ্ঞান চলে যায়। ভরত প্রথমে বুঝতেই পারল না, এখন সকাল না বিকেল। তার ধারণা, ঘরের দরজাটা পায়ের দিকে, কিন্তু সেদিকে নিরেট দেওয়াল। তা হলে এ ঘরটা কার ? তাকে কি স্থানান্তরিত করা হয়েছে ?

সে উঠে বসে চোখ কচলিয়ে ভাল করে দেখল। না, সেই একই তো ঘর, দরজাটা ডান দিকে ঠিকই আছে। এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তা হলে এখন রাত। কত রাত ? সে ডেকে উঠল, ভূমি, ভূমি !

কেউ সাড়া দিল না।

জ্বরের ঘোর ও আচ্ছন্ন অবস্থাটা কেটে যাবার পর এই কয়েকটা দিন ভূমিসুতাকে ডাকলেই সাড়া পাওয়া তার অভ্যেস হয়ে গেছে। মেঝেতে একটা বিছানা পেতে ভূমিসুতা শুয়ে থাকে, তার ঘুম খুব পাতলা, ভরত জেগে উঠলেই কী করে যেন সে টের পেয়ে যায়। আজ সে গেল কোথায় ? ভরত আবার দু'বার ডাকল।

এবারে নীল পাড় শাড়ি পরা একজন পুরুষালি ধরনের স্ত্রীলোক দরজার কাছে এসে বলল, জল খাবেন ? আপনার রাতের খাবার আনব ?

ভরত চোখ সঙ্কুচিত করে তার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে ?

স্ত্রীলোকটি বলল, আজ্ঞে আমি দাই। আমার নাম আন্নাকালী।

ভরত বলল, ভূমিসুতা কোথায় ?

আন্নাকালী বলল, আজ্ঞে তা তো আমি জানি না। আমি এবেলা এসেছি। ওপরের দিদিমণি বলে দিয়েছেন, আপনি জেগে উঠলে আপনাকে খাবার দিতে। নিয়ে আসি ?

জ্ঞান ফেরার পর থেকে ভূমিসুতার হাত থেকেই শুধু খেয়েছে ভরত। এক একসময় তার মনে হয়েছে, মাঝখানের এতগুলি বছর যেন অলীক, ভূমিসুতার সঙ্গে তার কোনওদিন বিচ্ছেদ হয়নি, নেহাতই দুঃস্বপ্ন, ভূমিসুতা সব সময় তার পাশে পাশে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

আন্নাকালী চলে যেতে ভরত পালঙ্ক থেকে নামল। এখন সে হাঁটতে পারে। চিকিৎসকরা তাকে দু'বেলা ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার শরীরের জীর্ণ-শীর্ণ ভাবটাও আর নেই, প্রতিদিন সকালে এক ক্ষৌরকার তার দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যায়।

দরজার সামনেই একটা টানা বারান্দা, এক পাশ দিয়ে ওপরে ওঠার শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। নীচের তলায় কিছু লোকজনের কথা শোনা যাচ্ছে। ভরত বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল। একটু পরেই একজন কর্মচারী ধরনের ব্যক্তি উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে, ভরত তাকে ডেকে বলল, ও মশাই, একটু শুনবেন ? দ্বারিকাবাবু কোথায় ?

লোকটির খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাব, বারান্দার অন্য কোণের একটি ঘরের বন্ধ দরজার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, নামেননি এখনও ? সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আচ্ছা আমি খবর দিচ্ছি।

অবিলম্বেই সিঁড়িতে খটাস খটাস শব্দ করতে করতে নেমে এল দ্বারিকা। কোঁচানো ধুতির ওপর সিল্কের বেনিয়ান পরা, পায়ে খড়ম, কপালে রক্তচন্দনের তিনটি রেখা। ছাদে একটি ঠাকুর ঘর আছে, প্রতি সন্ধ্যায় দ্বারিকা সেখানে বেশ কিছুক্ষণ জপতপ করে। তারপর ছেলের সঙ্গে ক্যারাম খেলতে বসে, ফাঁকে ফাঁকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনায়। ছেলের জন্য সকালে দু'জন গৃহশিক্ষক আসে, সন্ধের সময় দ্বারিকা তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাবেই।

ভরতকে দেখে দ্বারিকা উৎফুল্ল হয়ে বলল, কী রে, ঘর থেকে বেরিয়েছিস ? বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ! বাঃ দিব্যি দেখাচ্ছে। সেরেই তো উঠেছিস। আয় আমার সঙ্গে।

বারান্দার অপর দিকের কক্ষটির দরজা খুলল দ্বারিকা। তুলনায় এ কক্ষটি ছোট, চামড়ার গদি মোড়া কয়েকটি সোফা রয়েছে, দেয়ালের গায়ে পর পর দুটি আলমারি। একটি আলমারি খুলতে খুলতে দ্বারিকা বলল, বোস। এটা আমার প্রাইভেট চেম্বার, এখানে আর কেউ ঢোকে না।

আলমারির তাকে সার সার বিলাতি মদের বোতল, কাট গ্লাসের গেলাস, ডিকান্টার। একটি বোতল বার করে গেলাসে সুরা ঢালতে ঢালতে দ্বারিকা বলল, রাত্রে ডিনারের আগে আমার এই কয়েক পাত্তর চড়ানো অভ্যেস হয়ে গেছে নইলে ঘুম আসে না। তুই একটু খাবি নাকি ?

ভরত ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বলল, আমি তো আর ওসব খাই না।

দ্বারিকা বলল, এক সময় খেয়েছিস তো আমার সঙ্গে, মনে নেই ? সেই উইলসন হোটেলে ... তারপর যাদুগোপালের সেই আবগারি জামাইবাবুর বাড়িতে, আহা সেই ভদ্রলোক বেঘোরে মারা গেছেন, তুই শুনেছিস সে ঘটনা ?

ভরত সে বিষয়ে কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, হ্যাঁরে দ্বারিকা, একজন শক্ত চেহারার স্ত্রীলোক আমায় খাবার দেবে কেন বলল ?

মুখ ফিরিয়ে অট্টহাস্য করে দ্বারিকা বলল, শক্ত চেহারা ! নরম মেয়েমানুষ হঠাৎ পাব কোথায় ? চট করে ট্রেইন্ড নার্সও পাওয়া যায় না। মেডিক্যাল কলেজ থেকে এই একজন দাইকে আনিয়েছি, রাত্তিরে তোর যদি কিছু লাগে টাগে। একটু ব্র্যান্ডি খা, কোনও ক্ষতি হবে না। সোডা ওয়াটার মিশিয়ে দিচ্ছি, ভাল লাগবে। এ সব জিনিস একা একা ঠিক জমে না, একজন স্যাঙাত না হলে ... আমি অবশ্য একাই খাই প্রায় দিনই ... একটা চুরুটও ধরা, সেরে উঠেছিস, সেটা সেলিব্রেট করতে হবে না ?

প্রায় অস্ফুট স্বরে ভরত বলল, ভূমিসূতা চলে গেছে ?

দ্বারিকা বলল, হ্যাঁ, চলেই তো গেল।

ভরত জিজ্ঞেস করল, কেন ?

দ্বারিকা দুটি গেলাস হাতে নিয়ে ভরতের মুখোমুখি সোফায় বসল। ভরতের চোখের দিকে বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, কেন চলে গেল, তুই জানিস না ? একটি মেয়ে নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে পড়ে রইল, রাতের পর রাত জেগে তোর সেবা করল, সে হঠাৎ চলে যেতে চায় কেন তুই বুঝিস না ?

ভরত সরলভাবে মাথা নেড়ে বলল, না, জানি না।

দ্বারিকা বলল, অমন একটা গুণের মেয়ে, আমাদের কথা শুনে এক বস্ত্রে চলে এল, নিজের দিকে একবারও চায়নি, সর্বস্ব ঢেলে তোর যা সেবা করল, অতি আপনজন ছাড়া কেউ তেমন পারে না। তার বদলে তুই তাকে কী দিয়েছিস ?

অসহায়ের মতন বিবর্ণ হয়ে গিয়ে ভরত বলল, আমি তাকে কী দেব ? আমার তো কিছু নেই !

ভরতের হাতে একটা গেলাস তুলে দিয়ে দ্বারিকা বলল, নে, একটা চুমুক দে। মুখখানা অমন বেগুন ভাজার মতন করার দরকার নেই। ইডিয়েট ! কিছু নেই মানে কী ! আমি কি কোনও জিনিস দেবার কথা বলেছি ? দ্যাখ ভরত, আমার বউটা প্রায় একটা পাগল ! আমি অন্য কোনও স্ত্রীলোকের দিকে নজর দিইনি, তাকেই মনপ্রাণ সঁপেছি, তবু আজও আমি তার মতিগতির দিশা পাই না। আমার তুলনায় তুই দেখছি শিশু, নারীচরিত্র কিছুই বুঝিস না। একজন রমণীকে কী দিতে হয় জানিস না ? দিতে হয় ভবিষ্যৎ !

ভরত বলল, আমাকে সে একবার বলেও গেল না ?

দ্বারিকা বলল, সেটাও সে আমার গিন্নিকে বলে গেছে। সে চলে যাবার আগে তোকে যেন কিছু জানানো না হয় ! শুনলুম তো, তুই যখন ঘুমুচ্ছিলি, তখন সে তোর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে গেছে। বিদায় নেবার সময় অনেক রকম আদিখ্যেতা হয়, হয়তো সেসব তার পছন্দ নয়।

ভরত আপন মনে বলল, আমাকে কালঘুমে পেয়েছিল !

দ্বারিকা বলল, তোর যে-বন্ধুটি প্রায়ই আসে, হেমচন্দ্র, তার সঙ্গে নাকি তুই ক'দিন ধরে আলোচনা করছিস যে আর একটু সুস্থ-সবল হলেই তোরা আবার গুণ্ডামি শুরু করবি ? আবার ডাকাতি করতে যাবি কিংবা কাকে মারবি ! দেখিস বাবা, আমাকে জড়াস না। পুলিশের হুজ্জোত আমি সামলাতে পারব না। বাজারে জোর গুজব, আমি একজন সরকারি উকিলের কাছেও শুনেছি, তোদের ওই 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে নাকি শিগগিরই পুলিশের হামলা হবে। যা সব গরম গরম লেখা বেরুচ্ছে, ইংরেজ সরকার তা আর কতদিন সহ্য করবে।

ভরত বলল, ভাই দ্বারিকা, তোকে জানাতে দোষ নেই। আমরা কয়েকজন মিলে তলোয়ার ছুঁয়ে অগ্নিসাক্ষী করে শপথ নিয়েছি, এ দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দেব ! সে শপথ

কি ভাঙা যায় ? স্বাধীনতার ব্রত নিলে আর পিছিয়ে যাওয়া যায় না। সেটা কাপুরুষতা। আমি জীবনে আগে একবার চরম কাপুরুষের মতন কাজ করেছিলাম, আবার যদি সে রকম করি, তা হলে আমার বেঁচে থাকার কোনও মর্যাদা থাকবে না। হেম যদি আমাকে ডাকে, কিংবা নাও ডাকে, হেম কোনও পরিকল্পনা নিয়েছে যদি শুনতে পাই, তা হলে আমাকে যেতেই হবে। হেমের মতন খাঁটি মানুষ আমি আর দেখিনি। আমার জীবনের একটা সময়ে, যখন একেবারে দিশাহারা অবস্থা, কী করব, কোথায় যাব, বাকি জীবনটা কী করে কাটাব কিছুই ঠিক ছিল না, সেই সময় হেম আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। মেদিনীপুরে, হেমের সঙ্গে থেকে, ওর মনের জোর, ওর আত্মত্যাগের নিষ্ঠা দেখে আমি ওর সঙ্গে ছুটে গেছি। হেম যদি কিছু শুরু করে আবার, আমি ওর পাশে অবশ্যই থাকব।

দ্বারিকা বলল, আ মোলো যা ! দেশের কাজ করবি তো কর না। কে বারণ করছে। আরও তো কত লোক দেশের জন্য ঝাঁপিয়েছে। কিন্তু তারা কি বিয়ে থা করে না, ঘর-সংসার করে না ? সুরেন বাঁড়ুজ্যের বউ-ছেলেপুলে নেই ? বিপিন পাল মশাই, তোদের অরবিন্দ ঘোষ, এমনকী তোর এত বন্ধু যে হেম, এরা সবাই তো বিয়ে থা করেছে। দ্যাখ ভরত, তোরও তো বয়েস কম হল না, তুই তো আর ছোকরাটি নোস্‌, কত আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, এক জায়গায় থিতু হতে হবে না ? ওই ভূমিসূতা মেয়েটা কতগুলো বছর তোর জন্য অপেক্ষা করে আছে ! থিয়েটারের মেয়ে হয়েও আর কোনও পুরুষের কাছে ধরা দেয়নি, এ কথা জনে জনে সাক্ষী দিয়েছে।

ভরত বিষণ্ণভাবে বলল, ঠিক বলেছিস, বয়েস হয়ে গেল, কতগুলি বছর এমনি এমনিই বৃথা কেটে গেল ! অন্যদের সঙ্গে আমার একটা তফাত আছে, আমার যে অতিশয় দেরি হয়ে গেছে ! আগামী মাসেই যদি আমাকে কোনও অ্যাকশানে যেতে হয়, আমি অনেকবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই তো তা হবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের মতন কিছু লোককে প্রাণ দিতেই হবে ! ভূমিসূতাকে আমি কী দেব, আমার যে ভবিষ্যৎ বলেও কিছু নেই !

দ্বারিকা বলল, তোরা ইংরেজ তাড়াবি ? কত বছর লাগবে ? পঞ্চাশ, একশো, দুশো বছরেও এদের হঠানো যাবে ?

ভরত বলল, তা জানি না। তবু লড়াইটা শুরু করতে তো হবে কোনও এক সময়। চিরকালের জন্য যারা পরাধীনতা মেনে নেয়, তারা কি পূর্ণ মানুষ হতে পারে ? আমরা হয়তো তেমন কিছুই পারব না, এমনি এমনি প্রাণটা যাবে, তবু ইংরেজ শক্তির মতন এক বিশাল দৈত্যের অধীনতা মেনে নিইনি, আঘাত দিতে চেয়েছি, এই গর্বটুকু নিয়ে মরতে পারব। পরবর্তীকালের ছেলেরা সেটা বুঝবে না ?

দ্বারিকার অনেক অনুরোধেও ভরত একবারের বেশি ব্র্যান্ডি নিল না। একটা চুরুট ধরিয়েও দু' টান দিয়ে ফেলে দিল। মুখ এখনও বিস্বাদ হয়ে আছে। সারারাত তার ঘুম হল না। এপাশ ওপাশ করতে লাগল বারবার। বুকের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট। ভূমিসূতাকে এতদিন পর এত কাছে পেয়েও আবার হারাতে হল। কিন্তু কোন আশ্বাসে সে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারত ?

দ্বারিকার এখানেও আর বেশিদিন থাকা চলে না। দ্বারিকার ঔদার্যের তুলনা নেই, তবু তাকে বিপদে জড়ানো একেবারেই ঠিক নয়। উপকার যে নেয়, তারও কিছুটা বিবেচনা বোধ থাকা উচিত। একথা নিশ্চিত যে দ্বারিকা তাকে ছাড়তে চাইবে না। এরকম রাতের বেলায় সরে পড়তে হবে চুপি চুপি। দ্বারিকার স্ত্রী বসন্তমঞ্জরী আবার তাকে খুঁজে বার করবে ? ওই রমণীটির অলৌকিক ক্ষমতার কথা ভাবলে, বিস্ময়ের সীমা থাকে না। অথচ বসন্তমঞ্জরী ভরতের সামনে আসে না, কথা বলে না তার সঙ্গে। এ বাড়িতে এসে সে একবারের জন্যও বসন্তমঞ্জরীর দর্শন পায়নি সজ্ঞানে।

না, চলে যেতেই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে ? এ শহরে আর কোনও আশ্রয় নেই ভরতের, পয়সা কড়িও নিঃশেষ। ভাঙা কালীমন্দির থেকে দ্বারিকা যখন তাকে উদ্ধার করে, তখন তার পকেটে ছিল একটি রিভলবার ও মাত্র বারোটি টাকা। রিভলবারটি দ্বারিকা বারীনদের দিয়ে দিয়েছে। নিজের শরীরের রক্তমাখা বারোটি টাকা রাখা আছে ভরতের বালিশের নীচে। এই তার শেষ সম্বল। মেদিনীপুরের খামার বাড়িটিও আর তার নিজের নেই। ফুলার বধের সংকল্প নিয়ে বেরুবার সময়

নীলমাধব চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তির কাছে মাত্র পাঁচশো টাকায় সে খামার বন্ধক দিয়েছিল। সে বন্ধক ছাড়াবেই বা কী করে ? এখনই অর্থ উপার্জনের চেষ্টাতেও সে লাগতে পারবে না, শরীর ততটা সমর্থ হয়নি, ওষুধ খেয়ে যেতে হবে আরও কিছুদিন। আবার কখনও সে আগের মতন শক্তি ফিরে পাবে কি না কে জানে !

অশক্ত শরীর, ভবিষ্যৎহীন একজন মানুষ, সে ভূমিসুতাকে কী দিতে পারে ? তার মনের কথা সে কারওকে বলতে পারে না, কিন্তু যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকত, তা হলে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারত, সে শুধু ভূমিসুতাকেই চায়। যদি মা বেঁচে থাকতেন, তা হলে মায়ের নামে দিব্যি দিয়ে বলত, ভূমিসুতার সঙ্গ না পেলে তার বাকি জীবনটা বিস্বাদ হয়েই থাকবে। তবু, এ চাওয়াও অর্থহীন, সে কিছুতেই ভূমিসুতাকে পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারল না।

খ্যার খ্যার শব্দে একটা প্যাঁচা ডাকছে যেন কোথায়। এটা লক্ষ্মী প্যাঁচা না কাল প্যাঁচা ? লক্ষ্মী প্যাঁচা নাকি সৌভাগ্যের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। ভরত শয্যা থেকে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। প্যাঁচাটাকে দেখা গেল না। এ শহরে আর কোনও রাতপাখি ডাকে না। মেদিনীপুরে অনেক রাতেই একটা 'চোখ গেল' পাখির অশ্রান্ত ডাক শোনা যেত।

রাত্রির রাস্তা বেশি ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন দেখায়। গ্যাসের বাতির বদলে বিজলি-আলো জ্বলছে। একটাও গাড়ি ঘোড়া নেই। একটু পরে একজন লোক পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসতে লাগল। লোকটির কোনও ব্যস্ততা নেই, গুনগুন করে গান গাইছে। এত রাতে লোকটি কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে ? ও যেন অনন্তকালের পথিক। ভরতের মনে হল, ওই মানুষটি সে নিজে। গন্তব্যহীন পথ চলাই তার নিয়তি।

বিছানায় ফিরে এসে সে ঠিক করল, মেদিনীপুরেই যেতে হবে, হেম সেখানে আছে। তার রাহা খরচ কুলিয়ে যাবে বারো টাকায়, হেমের কাছে তার কোনও চক্ষুলজ্জা নেই। এক হিসেবে দ্বারিকার চেয়েও হেমের কাছে সে বেশি সহজ হতে পারে। মাসের পর মাস সে হেমের সঙ্গে থেকেছে, স্টিমারে ঘুরেছে, এক অন্ন ভাগ করে খেয়েছে, এমনকী অনশনও ভাগাভাগি করেছে।

মেদিনীপুরে যাবার আগে একবারও কি ভূমিসুতার সঙ্গে দেখা হবে না ?

ভরত চলে যাবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে, এরই মধ্যে দিন চারেক পরে একটি অল্পবয়েসী ছেলে একটি চিঠি নিয়ে এল হেমের কাছ থেকে। সেই চিঠি পাঠ করে ভরত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আবার সে দিকভ্রান্ত !

হেম লিখেছে :

ব্রাদার ভরত,

আমি চল্লাম, অনেকদিন আর আমার দেখা পাবে না। এই সব ছেলেখেলা আর আমার ভাল লাগছে না। বিপ্লবের নামে আমরা কী করছি ? অজা যুদ্ধ, ঋষির শ্রাদ্ধ আর প্রভাতে মেঘডম্বরের মতন সবই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ! আমাদের কোনও সত্যিকারের নেতা নেই, কেউ কারওকে মানে না, সবাই সবজান্তা ! অথচ কেউই জানে না, কীভাবে গুপ্ত সমিতি গঠন করতে হয়। অস্ত্র চালনা বিষয়ে কারও কোনও জ্ঞান নেই। অরবিন্দবাবু যে বলেছিলেন, অন্যান্য রাজ্যে অনেক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তারা বিপ্লবের জন্য তৈরি, শুধু আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য অপেক্ষা। কই, এ পর্যন্ত আর কারুরই তো কোনও সাড়া শব্দ নেই। এ সব আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে আমাদের আর কতদিন উত্তেজিত করে রাখবেন ? কোমরের কষি যে আলগা হয়ে যাচ্ছে।

তাই আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই, নিজে কিছু পারি কি না। বিদেশে পাড়ি দিচ্ছি। হয়তো ফ্রান্সে যাব, কিংবা আমেরিকায় কিংবা রুশ দেশে। প্যারিস নগরীতে বহু দেশের গুপ্ত সমিতির আখড়া আছে বলে শোনা গেছে। তাদের কর্মপদ্ধতি দেখব, হাতেকলমে শিক্ষা নেব। বোমা বানানোও শিখে নিতে হবে। আমি কিছুদিন বিজ্ঞান পড়েছি, আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত হবে না।

নিজের খরচ নিজেই চালাব, এ দেশের ধনীদের কাছে ভিক্ষা করতে আমার ঘৃণা হয়, তাই নিজের বাড়ি-জমি-সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়েছি। মেদিনীপুরের পাটই তুলে দিয়েছি একেবারে,

দারা-পুত্র-পরিবার, তুমি কার কে তোমার ? সকলকে পাঠিয়ে দিয়েছি গৃহিণীর পিত্রালয়ে। ভাল কথা, তুমি শুনেছ কি না জানি না, মেদিনীপুরে কিছুদিন আগে এক মহা বিধ্বংসী ঝড় হয়ে গেছে, তাতে বহু লোকের বহু ক্ষতি হয়েছে। তুমি সাধ করে যে-সব গাছপালা লাগিয়েছিলে, তার অধিকাংশই সমূলে উৎপাটিত। বাড়িখানি মেরামতির অভাবে নড়বড়ে ছিল, সেটি একেবারে বিধ্বস্ত। তুমি এসে দেখলে কষ্ট পাবে।

দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছি বলে ভেবো না পলায়ন করছি। দেশের জন্য প্রাণটা যখন একবার উৎসর্গ করে দিয়েছি, এ প্রাণের আর কোনও সাধ আহ্লাদ নেই। ফিরে আমি আসবই, তৈরি হয়ে আসব, সশস্ত্র হয়ে আসব। যে-ইংরেজ শাসকরা আমার দেশের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করছে, যারা ভারতীয়দের মানবেতর প্রাণী বলে মনে করে, আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বঙ্গভঙ্গ করে দিল, তাদের দু'চারটিকে অন্তত হত্যা না করে আমি মরেও শান্তি পাব না। আমার এই শপথ সত্য হয় কিনা দেখো।

শরীরটাকে সারিয়ে তোলো। আমার অপেক্ষায় থেকো।

ইতি

তোমার হেম

পুনশ্চ : এই চিঠি পাঠ করা মাত্র ছিঁড়ে ফেলবে।

চিঠিখানি অন্তত তিনবার পড়ল ভরত। তারপর কুচি কুচি করতে করতে ভাবল, এরপর কী ? তার নিয়তি এখন তাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে ?

আবার যেন দুর্বল হয়ে গেল শরীর। পরপর দু'দিন ভরত সর্বক্ষণ শুয়ে কাটাল, আন্নাকালী তার জন্য খাবার নিয়ে আসে, তার কিছু খেতেও ইচ্ছে করে না। বই পড়ে না, মনটাও যেন কুয়াশাচ্ছন্ন।

এক সময় দ্বারিকা সে ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, কী রে, ঘর থেকে আর বেরোস না কেন ? সব সময় অন্ধকারে ভূতের মতন শুয়ে থাকিস। সন্ধেবেলা ডাকতে এসে দেখি তুই ঘুমোচ্ছিস। অসময়ের ঘুম মোটেও ভাল নয়। এক কাজ কর, বাইরে থেকে একবার ঘুরে আয়। মাথায় টাটকা বাতাস লাগুক। মনটা চাঙ্গা না হলে দেশের কাজ করবি কী করে ?

দ্বারিকা প্রায় জোর করেই তাকে গৃহ থেকে নির্গত করে ছাড়ল। তাও একা যেতে দেবে না, ভাড়ার গাড়িতেও না, নিজের একটা এক-ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে দিল তাকে।

ভরত আর কোথায় যাবে, শহরের পথে পথে কি অনির্দিষ্টভাবে ঘোরা যায়, খানিকবাদে সে থামল 'যুগান্তর' অফিসের সামনে। সেখানে আজ বিকেলে আড্ডা জমেনি, বারীন নেই, রয়েছে শুধু ভূপেন দত্ত আর উপেন বাড়ুজ্যে, তারাও প্রুফ সংশোধনে ব্যস্ত। তবু কিছুক্ষণ বসে রইল ভরত। কথায় কথায় জানা গেল, হেমচন্দ্র সত্যিই বাড়ি-জমি বিক্রি করে বিদেশে চলে গেছে, ওরাও সে সংবাদ জানে।

হেমের জন্য ভূমিসুতাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি ভরত। হেম এখন নেই। ভূমিসুতাও তাকে ছেড়ে গেছে। সে আর একবারও ভরতের খবর নিতে আসেনি।

পরের সন্ধেবেলা দ্বারিকা আবার ভরতকে ধরল, নিয়ে গেল তার প্রাইভেট চেম্বারে। আজও সে ভরতকে জোর করেই ব্রান্ডি খাওয়াবে। তার ধারণা, ব্রান্ডি পান না করলে ভরতের এই জড়ত্ব, মনের এই ক্লৈব্য কাটবে না।

দু'পাত্তর শেষ করার পর দ্বারিকা তাকে ধমক দিয়ে বলল, ভরত, তুই একটা কী রে, এমন অকৃতজ্ঞ মানুষে হয় ? ওই যে নয়নমণি নামে মেয়েটি তোর সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল, তুই তারপর আর তার কোনও খবরও নিলি না ? এমন প্রাণ ঢালা সেবা করে গেল, তোকে সে-ই তো বাঁচিয়ে তুলল বলতে গেলে, ডাক্তাররা তো এক সময় আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তবু নয়নমণি, না না ভুল বললাম, ভূমিসুতা, সে যমের সঙ্গে লড়াই করেছে। তা সত্ত্বেও তুই তাকে দুটো ভাল কথাও বললি না ?

ভরত শুষ্ক মুখে বলল, সে কোথায় থাকে তা আমি জানি না।

দ্বারিকা বলল, জানিস না তো আমাকে জিজ্ঞেস করিসনি কেন ? লজ্জা ? নাকি তোর মনটাই

অসাড় হয়ে গেছে।

ভরত বলল, তুই তার বাড়ি চিনিস ?

দ্বারিকা বলল, আলবাত চিনি। আমি আর যাদু অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বার করেছি। আমিই তাকে এখানে এনেছি। আমারও উচিত তাকে ধন্যবাদ জানানো। চল, এখনি যাই তার কাছে।

ঈষৎ নেশায় দ্বারিকা উত্তেজিত, বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে গাড়ি তৈরি করার হুকুম দিল।

গঙ্গার ধারে সেই বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে বেজে গেল রাত সাড়ে আটটা। বাড়ির সামনে বেশ মজবুত লোহার গেট তালাবন্ধ, একজন নেপালি দ্বারবান বসে আছে, তার এক হাতে লোহা বাঁধানো লগুড়, কোমরে ভোজালি। বাড়ির মধ্যে বালিকাদের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

দ্বারবানটি জেদি, সে তালা খুলবে না, এ সময় যে-কোনও লোকের প্রবেশ নিষেধ। কিছুটা তর্ক বিতর্কের পর সে জানাল যে মালিকানি বাড়িতে নেই, কলকাতাতেই নেই।

এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বারিকার মনে আছে, আগের দিন সে একটি বয়স্কা মহিলাকে দেখেছিল বালিকাগুলির তত্ত্বাবধান করতে, ভূমিসুতা তাকে কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল। দ্বারবানটিকে সে বলল, আমরা ভেতরে ঢুকতে চাই না, মালিকানি নেই, আর যে একজন দিদিমণি আছে তাকে ডাকো। জরুরি কথা আছে।

বয়স্কা মহিলাটি এলেন বটে, তবু গেট খোলা হল না। দ্বারিকাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি গেটের ওপাশ থেকেই জানালেন, ভূমিসুতা দু'দিন আগে কাশী চলে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। কাশীতে সে কোথায় উঠবে, তা তিনি বলতে পারবেন না।

গাড়িতে উঠতে উঠতে দ্বারিকা বলল, ভালই হল। বেনারস অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। তরিতরকারি যেমন টাটকা তেমনই চমৎকার স্বাদ। মালাই-রাবড়ি যত ইচ্ছে খাবি, শরীর খারাপ হবে না। সেবারে এলাহাবাদে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মনে আছে ? সেখান থেকে কাশীতে এসে অনেকদিন ছিলাম। একটা ছোটখাটো বাড়িও কিনেছি। দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রায় ওপরেই সেই বাড়ি, ছাদে দাঁড়ালে গঙ্গার দৃশ্য দেখতে পাবি। কবিরাজ মশাই কোন মহাপুরুষের কথা বলেছিলেন, একবার তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে পারিস। আমার বাড়িতে দু'জন কর্মচারী আছে, তোর খাওয়া-থাকার কোনও অসুবিধে হবে না।

ভরত যেন দ্বারিকার পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করেছে। আপত্তি জানাবার কোনও কারণও নেই। কলকাতায় সে শুধু বসে থেকেই বা কী করবে ? 'যুগান্তর' দলের নতুন কোনও পরিকল্পনা আছে বলেও মনে হল না। কাশীতে গেলে আর কিছু না হোক, দূর থেকে ভূমিসুতাকে অন্তত চোখের দেখাও তো দেখা যাবে !

পরদিনই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। একজন কর্মচারী টিকিট কেটে হাওড়ায় ভরতকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। দ্বারিকার সেদিন একটা মামলা আছে, সে নিজে যেতে পারবে না। ট্রেনে যাওয়ার জন্য ফল-মূল, চিঁড়ে গুড়ের একটা পুঁটলি বেঁধে দেওয়া হল। দ্বারিকা জোর করে একশোটি টাকা গুঁজে দিল ভরতের পকেটে। ভরত যে জামা-কাপড় পরে আছে, তাও দ্বারিকার। অথচ দ্বারিকার কাছে কোনও কৃতজ্ঞতার কথা জানাতে গেলে সে প্রচণ্ড ধমক দেবে।

যাত্রা করার আগে ভরত একবার ওপরের সিঁড়ির দিকে তাকাল। বসন্তমঞ্জরির কাছ থেকেও কি বিদায় নেওয়া উচিত নয় ? কিন্তু সে নিজে থেকে একবারও দেখা করতে আসে না, দ্বারিকাও কিছু বলল না, ভরতের পক্ষে কিছু বলাও বোধ হয় শোভন নয়।

নীচে নামতে নামতে সে দ্বারিকার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, তোর কাছে আর তোর বউয়ের কাছে চিরঋণী রয়ে গেলাম।

দ্বারিকা তার পিঠে চাপড় মেরে বলল, বাকি আছে, বাকি আছে। এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল নাকি ? তুই আরও কত কীর্তি করবি, কে জানে !

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে দ্বারিকার বাড়িটি সত্যি সুন্দর। তেমন কিছু বড় নয়, একতলায় তিনটি, দোতলায় দুটি কক্ষ, নীচের তলাটি খানিকটা স্যাঁতসেতে অন্ধকার মতো হলেও ওপরে প্রচুর আলোবাতাস। ওপর তলাটি মালিকপক্ষের ব্যবহার ছাড়া তালাবন্ধই থাকে। একেবারে সামনেই গঙ্গা।

বেনারসে এই সময় খুব ভিড়, প্রচুর জমিদার, রাজা-মহারাজরা এখানে আসেন। অনেকেই একটি করে শখের বাড়ি নির্মাণ করে রেখেছেন। এ শহর যেমন বিখ্যাত তীর্থস্থান, স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবেও নাম রটেছে। আবার তেমনি ফুর্তির স্থানও বটে। সন্ধে হলেই ডালমন্ডির বাঈজি পাড়া গমগম করে। সন্ধের পর ভরা গঙ্গায় অনেক বজরা ভাসে, তাতে বিলাসী পুরুষরা সুরার পাত্র হাতে নিয়ে গা এলিয়ে বসে থাকে, শোনা যায় নূপুর নিক্কণ। ভরত ছাদ থেকেও এ দৃশ্য দেখতে পায়।

যতই জনসমাগম হোক, কাশীতে বিশেষ কোনও মানুষকে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। ভোরবেলা কিংবা অপরাহ্ণে বহিরাগতরা কোনও না কোনও ঘাটে আসবেই। ঘাটগুলি ঘুরে দেখলেই পরিচিত মুখ চোখে পড়বে। সবচেয়ে বেশি মানুষ আসে মণিকর্ণিকা আর দশাশ্বমেধ ঘাটে। বেণীমাধবের ধ্বজাতেও একবার না একবার সকলের ওঠা চাই।

কর্মচারী দু'জনের নাম সংগ্রাম সিং আর বিষ্ণুপদ মহান্তি। সংগ্রাম সিং মধ্যবয়সী, নামের সঙ্গে চেহারার মিল সামান্যই, তার মস্তবড় জুলফি দুটোই শুধু বীরত্বব্যঞ্জক, সে দু'খানা ঘর নিয়ে সপরিবারে থাকে। অপরজনের বাজপড়া তালগাছের মতন শরীর, চক্ষুদুটি চঞ্চল, দু'একটি কথা শুনলেই বোঝা যায়, এ লোকটির বুদ্ধি আছে। কর্মচারী হিসেবে বিষ্ণুপদ জুনিয়র, সে-ই ভরতের জন্য রান্না করে দেয়।

বিষ্ণুপদ রাঁধে ভালই, কিন্তু আহার্য পরিবেশনের সময় সে বড় বেশি কথা বলে। অনেক খবরাখবর রাখে সে। কিন্তু অত খবর জানার উৎসাহ নেই ভরতের। কেচ্ছাকাহিনীর দিকেই তার ঝোঁক। কোন রাজা কতগুলি রানি সঙ্গে নিয়ে এসেছে, দু'জন বড় মানুষের বজরায় পাল্লা দিতে গিয়ে একটা ডুবে গেল, রাজস্থানের এক রাজকুমারী ভেগে গেছে এক মুসলমানের সঙ্গে .... এইসব। তার কাছ থেকেই জানা গেল, গতবছর কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল, সে কী এলাহি ব্যাপার, বড় বড় নেতারা ঝগড়া করেছেন খুব। হাতাহাতি হয় আর কি ! স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা এসেছিলেন, তাকে দেখে বিষ্ণুপদ মুগ্ধ, কী সুন্দর বাংলা কথা বলেন, তিনিই তো ঝগড়া থামালেন। সেই সিস্টার নিবেদিতা এবারেও কাশীতে এসেছেন, বিশ্বনাথের গলির কাছেই থাকেন।

ভগিনীর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি ভরতের। ইদানীং আর যোগাযোগ রক্ষা করাও হত না। সার্কুলার রোডের আখড়ার সময় ভগিনী অনেক বই জুগিয়েছেন, বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করার জন্য গোপনে পরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখালেখি করেন। কংগ্রেসের নেতারা যাওয়া-আসা করে তাঁর কাছে। ভরতের একবার ক্ষীণ ইচ্ছা হল ভগিনী নিবেদিতাকে প্রণাম জানিয়ে আসবে, একটু পরেই সে ইচ্ছেটাকে চাপা দিয়ে দিল। থাক বরং, ভগিনী যদি কোনও দায়িত্ব দিয়ে দেন, তা পালন করার মতন মনের অবস্থা এখন নেই তার। দূর থেকে প্রণাম জানানোই ভাল।

গঙ্গার ঘাটগুলিতেই ভরত সময় কাটায়, পারতপক্ষে শহরের মধ্যে যায় না। গোধূলিয়ার মোড়ের কাছে অগণ্য মানুষ ও যানবাহনের ভিড়ে পথ চলা দায়। একেই তো বেনারস টাঙ্গায় টাঙ্গায় ছয়লাপ, তার ওপর নতুন উৎপাত হয়েছে মোটর গাড়ি, সেগুলি অনবরত ভেঁপু বাজায় আর ধোঁয়া ছাড়ে। কখন কাকে চাপা দেয় ঠিক নেই। কোনও হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি বা রাজা যখন যান, তাঁদের সঙ্গে থাকে প্রচুর সাঙ্গোপাঙ্গ, তাদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য সেপাইরা সাধারণ পথচারীদের ডান্ডা তুলে হটিয়ে দেয়।

ঘাটগুলিতে সারাদিন ধরে অনেক দৃশ্য বদল হয়। খুব ভোরে স্নান করতে আসে সাধু-সন্ন্যাসী ও শহরের স্থায়ী অধিবাসীরা। একটু বেলা হলে আসে নবাগতের দল। তাদের কাছ থেকে অর্থ দোহন করার জন্য বহু লোক ব্যাপৃত। কেউ তেল মাখিয়ে দলাই মলাই করে দেয়, কেউ স্নানের পর

কপালে ও বাহুতে চন্দন মাখায়, ছোট ছোট মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পুরোহিত-পাণ্ডারা পুণ্য বিক্রি করার জন্য হাঁকাহাঁকি করে। এ ছাড়া রয়েছে ফিরিওয়ালা ও ভিখারি। স্নানপর্ব চলে বেলা তিনটে-চারটে পর্যন্ত, তারপর আসেন কথক ঠাকুররা, তারা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শোনান। বই দেখতে হয় না, সব তাঁদের কণ্ঠস্থ, এবং যে-যত নাটকীয়তা আনতে পারেন, তাঁর কাছে তত শ্রোতা জমে। কোথাও কোথাও বসে কীর্তন গানের আসর। নৌকো ভ্রমণে যায় অনেক যাত্রী। গঙ্গাবক্ষ থেকে বারাণসীর প্রাসাদমালা ঘাটের সিঁড়িগুলির দৃশ্য ভারী চিত্তহারী। বিলাসীদের বজরাও অগুন্তি। দূরে দেখা যায় রামনগর প্রাসাদের আলো।

ভূমিসূতাকে ভরত প্রথম দেখতে পেল এক সকালবেলা। সে বসেছিল মণিকর্ণিকাঘাটের সিঁড়িতে, পাশের শ্মশানে চিতা জ্বলছে, সে চেয়েছিল সে দিকে। স্ত্রী-পুরুষের স্নানের জন্য পৃথক ঘাট নেই। এখানে আব্রু রক্ষার জন্য কেউ ব্যস্ত নয়। এক জায়গায় বেশ কয়েকজন রমণী অবগাহন করছিল, তাদের মধ্য থেকে তিনজন এক সময় ওপরে উঠে এল। যাদের কাছাকাছি বাড়ি, তারা বাড়িতে গিয়েই কাপড় ছাড়ে, কেউ কেউ সিক্ত বস্ত্রেই পুজো দিতে যায়।

সেই তিনজনের দিকে একবার তাকিয়েই ভরতের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ওদের মধ্যে যেজন যুবতী, সে ভূমিসূতা নয়? নিশ্চিত ভূমিসূতা। ভিজে শাড়ি শরীরে লেপ্টে আছে, এই অবস্থায় নারীদের দিকে চেয়ে থাকা অশোভন, তাই ভরত সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন কি সে ভূমিসূতাকে ডাকবে? এখন কথা বললে যদি নির্লজ্জতা মনে হয়? না, উচিত নয়।

সেই তিন রমণী এদিকেই আসছে। ভরত যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে, কথা না বলে, তা হলে কি ভূমিসূতা মনে করবে যে সে ইচ্ছে করে ভূমিসূতাকে চিনতে চাইছে না? সে অপমানিত বোধ করবে? এই দো-টানার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত থেকেই ভরত মনস্থির করে ফেলল। সে দ্রুত উঠে পড়ে চলে গেল ওপরের দিকে। একটা ঘটি-বাটির দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে গা-আড়াল দিল। তবু তার বুকের স্পন্দন থামে না। ভূমিসূতা কি তাকে দেখতে পেয়েছে? যদি দেখে থাকে, তবে নিশ্চয়ই ভাববে, ভরত কেন পলায়ন করল?

খানিকবাদে ভরত বুঝতে পারল, তার সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে। গঙ্গার ঘাটে সিক্ত বসনা নারীদের সঙ্গে অনেকেই কথা বলে। এখানে বিধবা স্ত্রীলোকদের সংখ্যা অগণ্য, তারা যে-বয়েসেরই হোক, সায়া-সেমিজ কিছু পরে না, ভিজে শাড়িতে তাদের শরীরের সবকটি রেখা ফুটে ওঠে, তবু তাদের হায়া বলে কিছু নেই, সেই অবস্থাতেই তারা দোকানে দাঁড়িয়ে দর-দাম করে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। পরিচিতা নারীর সঙ্গে তো কথা বলাই যায়, ভরত কেন লজ্জা পেল?

ভূমিসূতা অপমানিত বোধ করতে পারে ভেবে সারা দিন বিমর্ষ হয়ে রইল ভরত।

পরদিন বিকেলেই সে আবার দেখতে পেল ভূমিসূতাকে। এবারে দশাশ্বমেধ ঘাটে এক কথক ঠাকুরের শ্রোতাদের মধ্যে। কথক ঠাকুরটির কণ্ঠস্বর বেশ জোরালো, প্রায় দেড়শো-দুশোজন শ্রোতাকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। এখানে নারী ও পুরুষরা পৃথক ভাবে বসে। ভূমিসূতা বসে আছে অনেক স্ত্রীলোকের মাঝখানে। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা শক্ত। ভরত অপেক্ষা করতে লাগল।

আসর যখন ভাঙল, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাবণ সন্ন্যাসী বেশে এসেছে সীতাহরণ করতে, ইনিয়ে বিনিয়ে সে ভিক্ষা চাইছে, কিন্তু লক্ষ্মণের গণ্ডি সে পেরুবে না। সীতাও আসবে না গণ্ডির বাইরে। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা না দিয়ে ফিরিয়ে দিলে কতখানি পাপ হয় তা সবিস্তারে বলে গেল রাবণ, শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়ে সীতা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে গণ্ডি রেখার দিকে। এই পর্যন্ত বলেই থেমে গিয়ে কথক ঠাকুর হাতজোড় করে বললেন, বাবাসকল, মাঠাকরুণরা, অদ্য এখানেই সমাপন করি, আবার কাল হবে। অধমকে অনুমতি দিন, বাকিটা আগামীকাল শোনাব।

কথক ঠাকুরটি ভালই নাটক জানেন, সব শ্রোতাকে কাল আবার আসতেই হবে। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে একটি-দুটি পয়সা দিল পেতলের থালায়। ভরত তখনও ভূমিসূতাকে ডাকতে পারল না। কারণ সে আর চারজন বিভিন্ন বয়সী মহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার রাজ্যের লজ্জা পেয়ে বসল ভরতকে। গতকাল সকালে সে কেন ভূমিসূতার সঙ্গে কথা বলেনি, সেটা

তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, কিন্তু অন্যদের সামনে সে পারবে না।

খানিকদূর গিয়ে অন্য মহিলারা নিশ্চয়ই যে-যার বাড়ির দিকে চলে যাবে, ভরত একটু দূরে থেকে ওদের পিছু নিল। ওরা আপন মনে গল্প করতে করতে চলেছে বাঙালিটোলার দিকে। অন্যদের বিদায় নেবার নাম নেই। সে বুঝতে পারছে যে এখানে যদি দ্বারিকা থাকত, তা হলে এক ধমক দিয়ে বলত, স্টুপিড, যা, দৌড়ে যা, ভূমিসূতার সামনে গিয়ে দাঁড়া, তা হলেই অন্য মেয়েলোকগুলো হটে যাবে। কিন্তু ভরত কিছুতেই সঙ্কোচ কাটাতে পারছে না।

পাশাপাশি দুটি বাড়ির একটির দরজা দিয়ে তিনজন রমণী ঢুকে গেল, অন্যটিতে ভূমিসূতার সঙ্গে একজন। আজ আর ভরতের ততটা অপরাধ বোধ হল না। ভূমিসূতার বাড়ি তো চেনা হয়ে গেল। এর পর একদিন এসে অনায়াসে দেখা করা যাবে। আজ রাত হয়ে গেছে। কিংবা কাল বিকেলে ভূমিসূতা ওই কথক ঠাকুরের কাছে যাবেই, তখন জড়তা কাটিয়ে ভরত নিশ্চিত ওর সঙ্গে কথা বলবে।

পরদিন সকালে বিষ্ণুপদ তাকে লুচি ও কুমড়োর ছক্কা খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, কাশীর ধারে কাছে কত দর্শনীয় স্থান আছে, আপনি কিছু দেখবেন না? বাবু যদি বলেন, আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। আমি অনেকের গাইডের কাজ করেছি। হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি সব জানি।

এই বাক্যবাগীশ লোকটির সঙ্গে ভরতের ভ্রমণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, তবে সারনাথ জায়গাটি দেখে আসা যেতে পারে। সে একাই যাবে, বেশি দূর নয়। বিকেলে কথকতা শুরুর আগেই ফিরে আসবে।

ভরত একটা এক্কা গাড়ি ভাড়া নিল। বড় বড় টাঙ্গা গাড়িগুলো একসঙ্গে অনেক যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে ভরতের মনে পড়ল তার গৌহাটি থেকে শিলং যাত্রার কথা। ব্যামফিল্ড ফুলারের পেছনে কতই ছোটাছুটি করতে হয়েছিল, তার চুলের ডগাও স্পর্শ করা গেল না, মাঝখান থেকে ভরত প্রায় মরতে বসেছিল। ওই ভাবে প্রাণ দিলে তার প্রাণদান বৃথা হত। চাপেকর ভাইরা সাহেবদের মেরে তারপর মরেছে।

সারনাথে প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। এক একটা ঢিবির তলা থেকে পাওয়া যাচ্ছে নতুন নতুন সঙ্ঘারাম। আজ খুব চড়া রোদ, শোলার টুপি মাথায় দিয়ে কয়েকজন সাহেব তদারকি করছে খনন কার্যের। দর্শনার্থী এসেছে অনেক, তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা খুবই কম, শিশুরা রয়েছে, তারা ছোটাছুটি করছে চর্তুদিকে।

ভরত অন্যদের সংস্পর্শ এড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। এখনও বেশি হাঁটলে বা অনেক সিঁড়ি ভাঙলে তার ক্লান্ত লাগে। মূল স্তূপটি থেকে অনেকখানি দূরে সে একটা ঝাঁকড়া পিপুল গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিতে লাগল।

এই স্থানে গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি ঠিক কোথায় বসতেন? ভরত কল্পনা করার চেষ্টা করল। হয়তো এরকমই একটি বৃক্ষতলে পাথরের বেদিতে বসে থাকতেন বুদ্ধ। তাঁকে ঘিরে থাকত শিষ্যমণ্ডলী। বুদ্ধের কথা ভাবলেই ভরতের খুব বিস্ময় লাগে এই জন্য যে, কতকাল আগের কথা, প্রায় আড়াই হাজার বছর, তখনও সক্রেটিস আসেননি, যিশু আসেননি, মানব সভ্যতার ভাল করে বিকাশ হয়নি। সেই কালেও গৌতম বুদ্ধ এত সূক্ষ্ম দর্শনের অধিকারী হলেন কী করে? কী করে চিন্তা করলেন এমন এক ধর্মের কথা, যাতে ঈশ্বরের স্থান নেই? তখনও এই ভারতে কোনও বিদেশি আক্রমণ হয়নি, হয়তো শান্তি ছিল, সমৃদ্ধি ছিল, তাই জ্ঞানের চর্চা অত উন্নত হয়েছিল।

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমে চক্ষু টেনে এল তার। গাছের তলায় অনেকখানি ছায়া, বাতাস বইছে, ঘুমটি বেশ গাঢ়ই হল। মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তাতেও তার ঘুম ভাঙল না। গাছটির ঘন পাতার ছাউনির জন্য তার গায়ে বেশি বৃষ্টি পড়েনি, তবু কিছু ছাঁট তো লেগেছে, তাও সে টের পায়নি। গত রাতে অনেকক্ষণ সে ভূমিসূতার কথাই ভেবেছে, ভাল ঘুম হয়নি, তার মাথায় অনেক ঘুম জমে ছিল।

ভরত যখন জেগে উঠল, তখন বিকেল হয়ে সূর্য ঢলে পড়েছে। অন্ধকার নামতে আর বেশি

দেরি নেই। চর্তুদিক একেবারে শুনশান। দর্শনার্থীরা কেউ নেই, শ্রমিকরাও নেই। বৃষ্টির সময়ে সকলে নিশ্চয়ই চলে গেছে। সামনের রাস্তায় এসে ভরত আরও বিস্মিত হল। এখানে কয়েকটি দোকানপাট ও একটি ভাতের হোটেল ছিল, সব বন্ধ। দর্শনার্থীরা চলে গেলে আর কেউ থাকে না। টাঙ্গা বা এক্কাও নেই। ভরত এখন ফিরবে কী করে? সব কি মন্ত্র বলে উপে গেল?

দুপুরে কিছু খায়নি, সে উদরে যথেষ্ট ক্ষুধা টের পাচ্ছে। তার চেয়েও তার মন খারাপ লাগছে এই জন্য যে কথকতার আসরে সে পৌঁছতে পারবে না। আজও ভূমিসূতার সঙ্গে কথা হবে না।

বিষণ্ণভাবে সে হাঁটতে শুরু করল। এই শরীর নিয়ে আট-দশ মাইল পথ তার পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। যদি পথে কোনও গাড়ি পাওয়া যায়। এ দিকে জনবসতি নেই, পথ অতি নির্জন। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

ভরত যত এগোচ্ছে, কোনও গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্নও দেখতে পাচ্ছে না। তা হলে এই পথের ধারেই আজ রাত কাটাতে হবে। এই ভেবে যখনই সে এক স্থানে বসার উপক্রম করল, তখনই শুনতে পেল একটা শব্দ। টাঙ্গা বা এক্কা নয়, মোটর গাড়ি। ধুলো উড়িয়ে আসছে। মোটর গাড়ি মানেই ধনী ব্যক্তিদের ব্যাপার, সে গাড়ি নিশ্চয়ই ভরতকে নেবে না। তা ছাড়া গাড়িটা আসছে কাশীর দিক থেকে।

গাড়িটা কাছাকাছি আসতেই ভরত রাস্তার একধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িটা আসছে পথের বাম দিক ধরে, ভরত দাঁড়িয়েছে ডান দিকে, তবু গাড়িটা যেন হঠাৎ তার দিকে মুখ করে ছুটে আসতে লাগল। সত্যিই তাই। গাড়িটা তাকে চাপা দেবে নাকি?

ভরত দৌড়ে চলে গেল রাস্তার বিপরীত দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাও সেদিকে ঘুরে এল। ইচ্ছে করে তাকে চাপা দিতে চাইছে। আবার মৃত্যু ধেয়ে আসছে তার দিকে? কেন? কে আছে এই গাড়িতে? এ কি কোনও কৌতুকপ্রবণ মানুষের নিষ্ঠুর খেলা? এই জনশূন্য পথে ভরতকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করে গেলে কেউ কিছু টেরও পাবে না। কিন্তু কেন? ভরত তো কারুর কাছে কোনও অপরাধ করেনি।

রাস্তার দু'পাশে পাথুরে টিলা, তা বেয়ে ওঠার সময় নেই। গাড়িটা মাতালের মতন এদিক ওদিক করতে করতে তেড়ে আসছে তাকে, ভরত প্রাণভয়ে ছুটল, তার পায়ে বেশি জোর নেই, জোরে সে ছুটতে পারবে না বেশিক্ষণ। এক জায়গায় পাথরের একটু ফাঁক, সেখানে একটা জলাশয়, ভরত তার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ল। গাড়িটা এঁকে বেঁকে এগোচ্ছে সামনের দিকে, কে যেন ভেতর থেকে চিৎকার করে কী বলছে। একটু পরেই গাড়িটা একটা বড় পাথরের চাঁইয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে এক দিকে কাত হয়ে গেল।

ভরত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, এবারেও বেঁচে গেলাম তা হলে? এক সময় গাড়িটা খুব কাছে এসে গিয়েছিল, দৌড়তে দৌড়তে একবার পিছু ফিরে দেখেছিল, গাড়ির সামনেটা যেন একটা হিংস্র রাক্ষসের মুখের মতন, দু' পাশে দুটি জ্বলন্ত চোখ, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাকে গ্রাস করবে! ভূমিসূতার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আস্তে আস্তে ভরত সেই পানাভরা পুকুরটি থেকে উঠে এল। শরীর এখনও থরথর করে কাঁপছে। তাকে নিয়ে মৃত্যুর এ কী ছেলেখেলা!

শ খানেক গজ দূরে গাড়িটা কাত হয়ে আছে, কৌতূহলী হয়ে ভরত গুটিগুটি সেদিকে এগিয়ে গেল। ভেতর থেকে কার যেন ক্ষীণ কাতর স্বর শোনা যাচ্ছে। মৃত্যুপথযাত্রীর কান্নার মতন। তাকে মারতে এসে কেউ নিজেই নিহত হল? ভরত দেখতে চায় সেই অজ্ঞাত আততায়ীর মুখ।

কাছে এসে দেখল, গাড়ির চালক ছাড়াও আর একজন রয়েছে পাশে। সেই পাশের লোকটি কোনও সাড়া শব্দ করছে না, গাড়ির চালকটি গোঙাচ্ছে, তার শরীর রক্তাক্ত। দু'জনেরই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মতন পোশাক। তার মধ্যে চালকটিকেই বেশি পদমর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়, তার গলায় তিন ছড়া খাঁটি মুক্তোর মালা ম্লান আলোতেও বোঝা যায়। স্টিয়ারিং-এর ওপর রাখা হাত দুটিতে অনেকগুলি আংটি।

কোনওরকমে দরজাটা খুলে ভরত প্রথমে পাশের লোকটিকে তুলে এনে পথের ওপর শুইয়ে দিল। এর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, নিশ্বাস পড়ছে, মনে হয় জ্ঞান হারিয়েছে। চালকটিকে বার করা শক্ত হল, তার বুকে জোর আঘাত লেগেছে, সারা বুক রক্তে মাখামাখি, নাক দিয়েও রক্ত পড়ছে। ভরত তাকে পাঁজা কোলা করে তুলে আনল, তারপর শুইয়ে দেবার আগে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে, ভরত অনড় হয়ে গেল। এ কার মুখ? কোনও ভুল নেই, এ তো ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য! রক্তের সম্পর্কে তার ভাই।

রাধাকিশোর গাড়ি চাপা দিয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? কেন? ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে অন্তত কুড়ি বছর ভরতের কোনও সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে সে-রাজ্যের কেউ তাকে দেখেনি, সে ত্রিপুরার কোনও ক্ষতি করেনি, তবু কেন এতগুলি বছর ধরে রাধাকিশোর তার ওপর জাতক্রোধ পুষে রেখেছে? কী সেই রহস্য!

হঠাৎ ভরতের শরীরটা যেন জ্বলে উঠল। এখুনি রাধাকিশোরের গলা টিপে সে খুন করে প্রতিশোধ নিতে পারে। পাশের লোকটার মাথায় একটা পাথর দিয়ে ছ্যাঁচা মারলে আর জ্ঞান ফিরে পাবে না। সব শেষ হয়ে যাক! বিনা দোষে ওরা তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। ওদের জন্যই তার সারাটা জীবন বিড়ম্বিত, বারবার সে দেখতে পায় মৃত্যুর উদ্যত থাবা। এবার সে কেন ঘুরে দাঁড়াবে না? সে কেন প্রতিশোধ নেবে না?

কোনও মৃত্যুপথযাত্রীকে খুন করার মনোবৃত্তি নিয়ে ভরত জন্মায়নি। শিক্ষা-দীক্ষায় পরিশ্রুত হয়েছে সে, রাজকীয় নিষ্ঠুরতা তার নেই। প্রতিশোধের কথা একবার মনে আসে মাত্র, তা আসে বুক ভরা অভিমান থেকে। রাধাকিশোরকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে ভরত ছুটে গিয়ে পুকুর থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে এল।

পাশের লোকটি এর মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে। তার বিমূঢ় অবস্থা এখনও কাটেনি। এবার ভরত ওকেও চিনতে পারল। মহিম ঠাকুর, সে আগের রাজা, ভরতের পিতার দেহরক্ষী ও বিশেষ অনুগত অনুচর ছিল। এই মহিম নিশ্চয়ই সব জানে।

মহিম মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, কী হল? কী হয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট। মহারাজ কোথায়, মহারাজ নেই?

ভরত অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, ওই যে! বেঁচে আছেন এখনও।

মহিম আর্তনাদ করে বলে উঠল, কী সর্বনাশ। আমি কত করে বারণ করেছিলাম, এখন কী হবে? মহারাজাকে কী করে নিয়ে যাব?

তারপর ভরতের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ও মশাই, আমাদের বাঁচান। ইনি কে জানেন, যে-সে লোক নন, ত্রিপুরার মহারাজ, এর প্রাণ বাঁচাতেই হবে।

ভরত রাধাকিশোরের রক্ত ঢাকা চোখদুটি ধুইয়ে দিতে দিতে বলল, এঁকে আগেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, আপনারা আমাকে মারতে চেয়েছিলেন কেন? আমাকে কি আপনারা চেনেন?

মহিম বলল, মারতে চেয়েছিলুম? না, না! ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আর একটু হলে চাপা পড়তেন, ঠিকই, মহারাজ নতুন গাড়ি চালানো শিখছেন, সামলাতে পারেননি, কিংবা কোনও যন্ত্রের গলদ হয়েছে, উনি গাড়িটা থামাতে পারছিলেন না। আপনাকে মারতে চাইব কেন? কেউ কি শুধু শুধু কোনও মানুষকে মারতে চায়? আপনাকে তো চিনিই না। এর আগেও একটা গাছে ধাক্কা লেগেছিল ...

ভরত বলল, ওঁকে এক্ষুনি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে, ডাক্তার দেখাতে হবে, কিন্তু নেবেন কীসে।

মহিম বলল, আপনি ভাই দয়া করে একটা ব্যবস্থা করুন। আমার এখনও মাথা ঝিমঝিম করছে, উঠে দাঁড়াতে পারছি না।

ভরত বলল, এখন গাড়ি কোথায় পাই। যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় ... এত রক্ত

বেরিয়েছে।

রাধাকিশোরের গোঙানি থেমে গেছে, তাতে আরও ভয় হয়।

মহিম মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, এত করে নিষেধ করেছিলাম, কিছুতেই শুনলেন না। গোঁয়ারের মতন জেদ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নিজে গাড়ি চালাবেন, ভাল করে শেখেননি। আপনি মহারাজাকে চেনেন বললেন, আগে দেখা হয়েছে বুঝি?

ভরত বলল, না, সে ভাবে নয়। রাজা-মহারাজদের লোকে যেমন দূর থেকে দেখে, সেই রকম।

ভরত আর একবার এক আঁজলা জল এনে রাধাকিশোরের মুখে ঢেলে দিল। তাতে কিছু ফল হল না। এখনও প্রাণ আছে, শরীরটা মৃগী রোগীর মতন মাঝে মাঝে জোরে কেঁপে উঠছে।

ভরত মহিমকে বলল, আপনি তা হলে মহারাজের কাছে বসুন। আমি দেখি যদি কোনও গাড়ি জোগাড় করা যায়।

সৌভাগ্যবশত খানিকদূর এগিয়ে একটা টাঙ্গা পাওয়া গেল। পথের বাঁকে টাঙ্গাটা একটা গলিপথে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, ভরত ছুটে গিয়ে টাঙ্গাওয়ালার হাত চেপে ধরল। সে টাঙ্গায় একজন যাত্রী আছে, তার কাছে কাকুতি মিনতি করে রাজি করিয়ে টাঙ্গাটির মুখ ফেরানো হল।

আগের যাত্রীটি বসল সামনে, মহারাজাকে শুইয়ে দেওয়া হল পেছনের মালপত্র রাখার জায়গায়, দু' পাশে বসল মহিম আর ভরত। মহিম টাঙ্গাওয়ালাকে বলল, যত টাকা লাগে দেব, তুমি ভাই খুব জলদি আমাদের বেনারস পৌঁছে দাও।

ভরতের হাত জড়িয়ে ধরে সে আবার বলল, ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন। আপনি না থাকলে কী যে হত, আমরা কেউই বাঁচতাম না। মহাশয়ের নামটি জানতে পারি কী!

ভরত বলল, একেই বলে বোধ হয় নিয়তি। আমার নাম শুনে আর কী করবেন। বলতে গেলে মিথ্যে নাম বলতে হবে।

মহিম চমকিত হয়ে এক দৃষ্টিতে ভরতের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আত্মগত ভাবে বলল, চেনা চেনা লাগে যেন, মুখের আদলে মিল আছে, আপনি কি ত্রিপুরার লোক?

ভরত বলল, মহিমদাদা, আমি ভরত। মনে আছে কি আমার কথা?

ভ্রুকুঞ্চিত করে মহিম বলল, ভরত? মানে, কোন ভরত?

তারপরই উচ্ছ্বসিত ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি সেই ভরত? এতদিনে তোমার সন্ধান পেলাম, তাও এইভাবে, এই সময়ে? তোমার কথা প্রায়ই আমরা বলি। সেইজন্যই মনে হচ্ছিল, পরলোকগত মহারাজের সঙ্গে মুখের কিছুটা মিল আছে। তুমিও তো রাজকুমার!

ভরত বলল, না, আমি রাজকুমার নই। আমি কাছুয়ার সন্তান। আমার কোনও বংশ পরিচয় নেই!

মহিম বলল, তাও কি হয়? পিতার পরিচয়েই সন্তানের পরিচয়। স্বর্গত-মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রক্ত বইছে তোমার শরীরে। আগরতলায় এখনও সবাই জানে, ভরত নামে একজন রাজকুমার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আশ্চর্য না, কী আশ্চর্য! ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা পেল!

ভরত ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বলল, একটু এদিক হলে সেই ভাইয়ের হাতে এই ভাইয়ের প্রাণটাও যেতে পারত! বেঁচে গেছি শুধু এই জন্য যে আমার কপালে এখনও মৃত্যু লেখা নেই। মহারাজ কি আরও কারওকে চাপা দিয়েছেন নাকি?

মহিম বলল, টাকটুক লেগেছে কয়েক জায়গায়, কিন্তু মানুষ মরেনি। যন্ত্রপাতির ব্যাপার, কখন কী হয় বলা তো যায় না। নিশ্চয়ই হঠাৎ ব্রেকটা বিগড়েছে। হল কি জানো, আমাদের যে-ড্রাইভার, কাল রাত থেকে তার ধুম জ্বর। বিকেলে মহারাজের শখ চাপল গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুবেন, তাই নিজেই চালাতে লাগলেন। রাজা-রাজড়ারা মানুষের ওপর হুকুম চালাতে পারেন, কিন্তু যন্ত্র কি হুকুম মানে? ভরত, শুধু তোমার প্রাণ কেন, আমার প্রাণটাও তো যেতে বসেছিল। আমি অনবরত দুর্গানাম জপেছি। মা ত্রিপুরেশ্বরী আমায় বাঁচিয়েছেন। এখন মহারাজকে যদি ...

দু'জনেই সংজ্ঞাহীন রাধাকিশোরের দিকে তাকাল। রাজাদের কত গাড়ি-ঘোড়া থাকে, কত

হুকুমের চাকর থাকে, কুসুম-কোমল, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শোওয়া অভ্যেস, সে রকম একজন রাজা এখন পড়ে আছে টাঙ্গার পেছনে বেওয়ারিশ লাশের মতন, গর্তবহুল রাস্তায় টাঙ্গাটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে, তাতেও রাজার শরীরে কোনও স্পন্দন নেই, শুধু নাক দিয়ে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে।

মহিম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এতক্ষণ বাদে।

এই অবস্থাতেও ভরতের মনে পড়ল, আজ আর কথক ঠাকুরের আসরে পৌঁছনো যাবে না। দেখা হবে না ভূমিসুতার সঙ্গে।

রাজবাড়িতে পৌঁছনোর পর দারুণ শোরগোল পড়ে গেল। বাড়িতে অনেক লোক, সকলেই মহারাজের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল, সেই মহারাজ ফিরে এলেন মুমূর্ষু অবস্থায়।

রাধাকিশোর মাণিক্য এমনিতে ধীর স্থির মানুষ, কখনও কোনও খেলাধুলোতেও উৎসাহ দেখাননি, শুধু ইদানীং এই মোটর গাড়ি নিয়ে শিশুর মতন মেতে উঠেছিলেন। এ খেলা তাঁর মানায় না, তাই এমন নির্মম পরিণতি।

ধরাধরি করে রাধাকিশোরকে দোতলার একটি কক্ষে শুইয়ে দেওয়া হল। শহরের খ্যাতনামা দু'জন চিকিৎসককে নিয়ে আসা হল প্রায় জোর করেই। মহারাজের যা অবস্থা তাতে আজ রাতটাও কাটবে কি না বলা যায় না। বুকের বেশ কয়েকটা পাঁজরা ভগ্ন হয়েছে।

কাশীতে ভাল হাসপাতাল নেই, একটিই আছে সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়। ধনী ব্যক্তিদের নিজেদের বাড়িতেই চিকিৎসা হয়। তবু চিকিৎসক দু'জনের অভিমত, হাসপাতালে অপারেশনের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই নিয়ে গেলে ভাল হয়। মহারাজের শিয়রের কাছে দণ্ডায়মান রাজপুরোহিত তাতে ঘোর আপত্তি জানালেন। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজাকে সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য কোনও চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর আরও অনেক বছর আয়ু আছে, তিনি এখানেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। অন্তঃপুরের মহিলাদেরও সেই অভিমত।

মহিম কিছুতেই ভরতকে যেতে দিল না। ভরতের পোশাকও সম্পূর্ণ রক্তাক্ত, এই অবস্থায় সে যাবে কী করে? তাকে জোর করে স্নানের ঘরে পাঠিয়ে এক প্রস্থ পোশাক দেওয়া হল। তারপরেও মহিম তাকে বসিয়ে রাখল মহারাজের শয্যার পাশে।

রাধাকিশোরের জ্ঞান ফেরেনি। তাঁর সর্বাঙ্গ ধুইয়ে মুছিয়ে, ওষুধ প্রয়োগ করে, ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে পেরিয়ে গেল মধ্যরাত। ভরতের ওপরেও কম ধকল যায়নি, সে নিজেও যে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, তা তো কেউ জানে না এখানে। দৌড়োদৌড়ি করার ফলে তার পেটের ক্ষতস্থানের সেলাইয়ে একটু একটু ব্যথা শুরু হয়েছে। তা ছাড়া, তার ঘুম। ঘুমে টেনে আসছে তার চোখ, ঢুলে পড়েছে কয়েকবার। এ বাড়িতে সবাই এখনও জেগে আছে, এর মধ্যে তার ঘুমিয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এক সময় সে মহিমের হাত ধরে অনুনয় করে বলল, আমি এখন বাড়ি যাই। আবার প্রয়োজন হলে অবশ্যই আসব।

মহিম রাজি হল বটে, কিন্তু একলা ছাড়ল না। রাজবাড়ির একটি জুড়িগাড়ি তাকে পৌঁছে দিয়ে এল বাড়িতে।

পরদিন বিকেলের রোদ পড়ার আগেই জরুরি এত্তালা এল রাজবাড়ি থেকে। এক কর্মচারীর হাতে মহিম ঠাকুর চিঠি পাঠিয়েছে, ভরতকে এখুনি একবার আসতে হবে, সে যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে!

ভরত একবার ভাবল, তবে কি রাধাকিশোরের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে? এই সময় সে গিয়ে কী করবে? রক্তের সম্পর্কের ভাই চলে যাচ্ছে, কিন্তু ভরত কোনও টান অনুভব করছে না। রাজপরিবারের সকলে কান্নাকাটি শুরু করবে, ভরত তো তাদের কেউ না!

তবু এমন পত্র প্রত্যাখ্যান করা যায় না। একবার ভদ্রতার স্তরে উন্নীত হলে, মানুষ ভদ্রতার ক্রীতদাস হয়ে যায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভরত পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল।

রাজবাড়িতে এসে দেখল অন্য চিত্র। দাস-দাসী, দ্বারবানরাও উৎফুল্ল। মহারাজের অবস্থার আশাতীত উন্নতি হয়েছে। তার জ্ঞান ফিরে এসেছে তো বটেই, তিনি খানিকটা সুরুয়া খেয়েছেন,

কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে। রাজপুরোহিতের কথাই সত্য হয়েছে, মহারাজ এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।

মহিম ঠাকুর ভরতকে নিয়ে এল রাজকক্ষে। চিকিৎসকরা এখন নেই, ঘর ভর্তি অনেক মানুষ, তার মধ্যে কয়েকজন নানা বয়সী মহিলাও রয়েছেন। সম্ভবত কয়েকজন রাধাকিশোরের পত্নী, কয়েকজন মাতা ও বিমাতা। অন্য পুরুষদের সামনে এই মহিলারা থাকেন না, কিন্তু এর মধ্যে নিশ্চিত ভরতের পরিচয় সকলকে জানানো হয়েছে। সে একজন রাজকুমার, তার কাছে আব্রু রক্ষার প্রয়োজন নেই।

ভরত এক মুহূর্তের জন্য ভাবল, এই মহিলাদের মধ্যে মনোমোহিনীও আছেন নাকি? এতদিন পর ভরত তাঁকে দেখলে চিনতেও পারবে না। সে শুনেছে, বৈধব্য বরণের আগে মনোমোহিনী অনেকগুলি সন্তানের জননী হয়েছেন।

মহারাজের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি বালিকা, তিনি তাঁর সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন। মহিম ভরতকে কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কুমার ভরতচন্দ্র।

মহারাজ তার একটা হাত দুর্বলভাবে তুলে বললেন, ভাই—

মহিম বলল, মহারাজ, কাল এঁর জন্যই আমরা রক্ষা পেয়েছি। ইনি না থাকলে যে কী হত!

ভরতের চোখে ভেসে উঠল গতকাল সায়াহ্নের সেই দৃশ্য। হিংস্র দানবের মতন গাড়িটা তেড়ে আসছে তার দিকে, সে প্রাণ ভয়ে ছুটছে। যন্ত্রের দোষ?

মহারাজ বললেন, আমি সব শুনেছি। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। আমার হাতখানি ধরো। তোমার কথা আমরা প্রায়ই বলি—

ভরত সেই হাত স্পর্শ করল।

মহারাজের চক্ষু দুটি জলে ভরে গেল। তারপর মাথাটা তোলার চেষ্টা করে বললেন, শশীমাস্টার, শশীমাস্টার বলেছিল, আমি তোমাকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম। মিথ্যা, মিথ্যা! মঙ্গলময় ঈশ্বর জানেন, এমন পাপের কথা আমি কখনও মনেও স্থান দিইনি। আজও যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমার নরকেও স্থান না হয়। গীতা নিয়ে এসো, আমি গীতা ছুঁয়ে বলব—

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, মহারাজ, অত উত্তেজিত হবেন না। আপনি শান্ত হন।

মহিম বলল, সবাই জানে, আপনি কখনও মিথ্যা বলেন না। সেই ঘটনার অনেক তদন্ত করেছি আমরা, কোনও সদুত্তর পাইনি।

মহারাজ বললেন, তুমি আমার ভাই, আমাদেরই বংশের একজন।

মহিম বলল, রাজবংশতালিকায় ওঁর নাম উঠে গেছে।

মহারাজ বললেন, তোমার জন্য তিনশো টাকা মাসোহারা ধার্য আছে। তুমি যখন ইচ্ছে নিতে পারো। কথা দাও, তুমি আমার সঙ্গে ত্রিপুরায় যাবে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে থাকবে আপন অধিকারে।

এক সঙ্গে এত কথা বলে মহারাজ হাঁপাতে লাগলেন।

এরকম অবস্থার মধ্যে মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কিন্তু কথাটা শোনা মাত্র ভরত ঠিক করে ফেলেছে, সে কোনও দিনই এই মাসোহারা নেবে না। তার নিজের উপার্জন-যোগ্যতা আছে। এতদিন পরে তার রাজকুমার সাজারও বিন্দুমাত্র সাধ নেই।

রাজপুরোহিত এসে মহারাজাকে কথা বলতে একেবারে নিষেধ করে দিলেন, মহারাজ তবু ভরতকে ছাড়লেন না। হাতের ইঙ্গিতে তাকে পালঙ্কের পাশে বসতে অনুরোধ করলেন। একটা কুরসি আনা হল, তাতে উপবিষ্ট ভরতের দিকে মহারাজ তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টে। ভরতের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। সে যেন একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু, অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে রমণীরাও তাকে দেখছে। ভেতরে ভেতরে ক্রমশ বেশি উতলা বোধ করছে ভরত।

মহারাজ সম্পর্কে আর সকলে আশাবাদী, কিন্তু ভরতের মনে হল, রাধাকিশোর খুব সম্ভবত আর ত্রিপুরায় ফিরতে পারবেন না। তাঁর মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া।

প্রায় একঘন্টা পরে একজন চিকিৎসক আসতেই রমণীরা সকলে কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন।

চিকিৎসককে বসার জন্য ভরত নিজের কুরসিটা ছেড়ে দিল এবং অন্যদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এল বাইরে।

বিকেল শেষ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। ভরত দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল দশাশ্বমেধ ঘাটে। গঙ্গার ওপরের আকাশের রক্তিমাভা মুছে যাচ্ছে একটু একটু করে। ভরত টের পেল তার শরীরটা বেশ হালকা লাগছে। যেন সে একটা অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি ছিল, মুক্তি পেয়ে গেছে অকস্মাৎ। তার চক্ষে, ওষ্ঠে, এমনকী আঙুলের ডগাতেও অপরূপ মুক্তির স্বাদ। কীসের মুক্তি?

ত্রিপুরার রাজবাড়ির সঙ্গে সে আর সম্পর্ক স্থাপন করবে না। সে জীবন তার জন্য নয়। তবু একটা অন্যরকম বোধ তার মাথার মধ্যে কাজ করছে। জন্মভূমি থেকে সে ছিল নির্বাসিত, সব সময় যেন মাথার ওপর ঝুলত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার খাঁড়া। সেইজন্যই কি নানান ছদ্মবেশে মৃত্যু তাকে তাড়া করে ফিরেছে এতকাল! যেন কার অভিশাপ ছিল.তার ওপর, আজ সেটা উঠে গেল।

হয়তো অভিশাপ-টভিশাপ কিছু নয়, সে ছিল রাজপ্রাসাদের কারও ঈর্ষা, ক্রোধ, ষড়যন্ত্রের শিকার। এরকম তো কতই হয়। তবু ভরত আজ সেইসব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, এরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে ঠিকই!

কথক ঠাকুরের আসর কি ভেঙে গেছে এর মধ্যে? সেই চাতালটিতে এসে দেখল, প্রায়ান্ধকারেও তিনি দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন, চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন কাহিনী। সীতাহরণ পর্ব গতকাল শেষ হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে বলেছেন সবিস্তারে, আজ মাত্র পৌঁছেছেন জটায়ু বধে। প্রায় নেচে নেচে এমন আস্ফালন করছেন, যেন নিজেই তলোয়ার চালিয়ে কাটছেন জটায়ুর এক একটি ডানা।

শ্রোতাদের ঠিক মাঝখানে বসে আছে ভূমিসূতা। সে কি রামায়ণের গল্পের টানে একই কথকের কাছে আসছে প্রতিদিন? অথবা সে জানে যে ভরত আসবে এখানে? এর আগের দু'দিন ভরত লক্ষ করেছে যে ভূমিসূতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথকতা শোনে, এদিক ওদিক তাকায় না, সে ভরতকে দেখবে কী করে? বাড়ি ফেরার সময়ও সে একবারও চায় না পিছন ফিরে। সে জানে না, অথবা জেনেও ভরতের অস্তিত্বকে অবহেলা করে?

ভরত কথকতা কিছুই শুনছে না, এক দৃষ্টিতে শুধু দেখছে ভূমিসূতাকে। পাঁচ সাতজনের সমবেত সঙ্গীতের সময় শুধু একজনের মুখের দিকে যদি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকা যায়, তা হলে যেমন সেই একজনের কণ্ঠস্বর আলাদা করে শোনা যায়, সেই রকমই ভরত একমাত্র ভূমিসূতাকেই দেখতে পাচ্ছে, তার আশেপাশে যেন আর কেউ নেই। এই জনবহুল গঙ্গার ঘাটেই যেন আর কেউ নেই, শুধু সে আর ভূমিসূতা।

গতকাল প্রায় এই সময়ে ভরত মৃত্যুর মুখ থেকে কোনওক্রমে বেঁচেছে। আর দু'এক মুহূর্ত দেরি হলে জ্বলন্ত চক্ষুওয়ালা ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা তাকে গ্রাস করে নিত। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে মাঝে মাঝে এক চুলের ব্যবধান থাকে। ভরত মরে গেলে ভূমিসূতা হয়তো খবরই পেত না। সে ভাবত যে ভরত আবার কাপুরুষের মতন পলায়ন করেছে। ভরত যে অক্ষত শরীরে আজ এখানে বসে আছে, এটা যেন একটা অলৌকিক ঘটনা।

ভূমিসূতা উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভরতও উঠে পড়ল। গৃহমুখী শ্রোতাদের ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগল ভরত, সে অন্য কারুকে গ্রাহ্যই করছে না।

আজ ভূমিসূতার সঙ্গে একজনই সঙ্গিনী, একটি সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণা তরুণী। ভরত আজ আর কোনও দ্বিধা করল না, কাছে গিয়ে বলল, ভূমি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, তোমার কি সময় আছে?

ভূমিসূতা কয়েক মুহূর্ত নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সঙ্গিনীটিকে বলল, চারু, তুই একলা বাড়ি যেতে পারবি? একটা একাগাড়ি নিয়ে নে, তোর কাছে পয়সা আছে?

চারুবালা বলল, হাঁা, আমি চলে যেতে পারব। আমি বরং আগে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করি।

মেয়েটি চলে যাবার পর ভরত সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল। কোথায় একটু বসতে হবে। ঠিক কোথায়? এমন কোনও স্থান আছে, যেখানে প্রাণ খুলে সব কথা বলা যায়? এক একসময় সেরকম স্থান খুঁজে পাওয়া যায় না সারা বিশ্বে। তবু জলের প্রায় কাছাকাছি, নিরিবিলিতে এক জায়গায় সিঁড়িতে বসল ভরত, ভূমিসূতা তার পাশে নয়, বসল কয়েক ধাপ নীচে।

তখনি কথা এল না কিছু, বেশ কিছুক্ষণ ওরা নিস্তব্ধ হয়ে রইল। দূরে দূরে কয়েকটা নৌকোয় মিটিমিটি আলো জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে নদীর জলোচ্ছ্বাস।

এক সময় ভূমিসূতাই বলল, আপনি এখন কেমন আছেন?

ভরত বলল, ভাল, বেশ ভাল। তুমি, তুমি হঠাৎ কাশীতে চলে এলে কেন?

ভূমিসূতা বলল, এলাম ... কোথাও তো কখনও যাইনি, মনে হল, কাশীতে গিয়ে আপনার নামে পুজো দিই।

ভরত জিজ্ঞেস করল, আমিও যে ক'দিন আগে এখানে চলে এসেছি, তুমি জানতে? আমাকে দেখতে পেয়েছ।

ভূমিসূতা বলল, হ্যাঁ।

ভরত বলল, আমিও তোমাকে দেখেছি। কথা বলতে পারিনি, কেন জানো? শুনলে বোধ হয় তোমার বিশ্বাস হবে না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলাম।

ভূমিসূতা কিছু বলল না। তার পরনে একটা সাধারণ ডুরে শাড়ি, মাথার সব চুল খোলা, একটা হাঁটু উঁচু করে তার ওপর থুতনির ভর রেখেছে। আজকের আকাশ পরিষ্কার, এর মধ্যেই অনেক তারা ফুটেছে, নদীর তরঙ্গে দোল খাচ্ছে চাঁদ। আকাশের আলোয় ভূমিসূতার মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে শুধু।

ভরত জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন আমার নামে পুজো দিতে এলে? দ্বারিকা বলছিল, ওদের এক ডাক শুনেই তুমি চলে এসেছিলে। আমার অসুখে প্রাণ ঢালা সেবা করেছ। কিন্তু আমি তোমায় কিছুই দিইনি। তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারি না। তবু তুমি কেন আমার জন্য পুজো দিতে চাও?

ভূমিসূতা খুব নরম গলায় বলল, আপনি দিয়েছেন।

ভরত বলল, কী দিয়েছি?

ভূমিসূতা তার উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইল জলের দিকে।

তা হলে ভূমিসূতা আগেই দেখেছিল ভরতকে। প্রত্যেকবার? কাল যে ভরত আসেনি, তাও কি সে লক্ষ করেছে? সে অন্য দিকে তাকায় না। তার তৃতীয় চক্ষু দিয়ে খুঁজেছিল ভরতকে? ভরত যে তার সঙ্গে কথা বলেনি, সে জন্য রাগ কিংবা অভিমান হয়নি ওর? আজ এক কথাতেই ভরতের সঙ্গে বসতে রাজি হয়ে গেল।

ভরত বলল, চুপ করে রইলে কেন? বলো, কী দিয়েছি আমি তোমাকে? আমার যে দেবার মতন কিছুই নেই। তুমি কত উঁচুতে উঠে গেছ,...আমি ভুল করেছি বারবার...

ভূমিসূতা বলল, তবু আমি পেয়েছি।

ভরত মুখ ঝুঁকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, কী পেয়েছ? আমি জানতে চাই। সব সময় আমার মনের মধ্যে একটা নিঃস্বতা...

ভূমিসূতা বলল, সেই যে একদিন, ভবানীপুরের বাড়ি থেকে আপনি আমায় নিয়ে এলেন, তারপর রাস্তায় অনেক হাঙ্গামা হল, আমরা হারিয়ে গেলাম, খুব অন্ধকার ছিল, আমি একটা দোকানের সিঁড়িতে বসেছিলাম, আপনি এলেন খুঁজে খুঁজে, আমার একটা হাত ধরে বললেন, আর তোমাকে কখনও ছেড়ে যাব না—

ভরত অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি তো সে কথা রাখিনি। আমি পারিনি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল ... শশীমাস্টার মশাই যখন এই কথা বললেন, আমার মনে হয়েছিল, তিনি তোমার যোগ্য, আমি তোমার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করিনি, ছি ছি ছি ছি, সে যে তোমার কত অপমান,

তখন বুঝিনি, যখন চৈতন্যোদয় হল, তখন আর তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ভূমিসূতা এবারও কিছু না-বলে একটা আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল।

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল দু'জনে। এরই মধ্যে একজন লোক ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। দাপাদাপি করল খানিকটা।

সেই লোকটি উঠে যাবার পর ভরত বলল, ভূমি, তোমার কাছে আমার আরও কিছু স্বীকার করার আছে। আমরা দু'জনে দু'দিকে চলে গেছি। কতগুলো বছর চলে গেল। কতগুলো বছর। আমাদের যৌবনের অনেকখানি। এর মধ্যে সব সময়েই যে আমি তোমার কথা মনে রেখেছি তা নয়। মাঝে মাঝে ভুলে গেছি, আশা হারিয়ে ফেলেছি, ভেবেছি, তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর আমার দেখা হবে না। তারপর আবার মনে পড়েছে, কষ্টও হয়েছে। তুমি বেঁচে আছ কি না তাও জানতাম না। এর মধ্যে একবার আমি বিয়েও করেছি। কেন জানো? সেও ওড়িশার মেয়ে, তার মুখের সঙ্গে তোমার মুখের একটু মিল ছিল। আমার নিয়তি, সেও বাঁচল না। আমাদের একটি ছেলেও আছে, সে কেমন আছে জানি না। বহুকাল তাকে দেখিনি।

ভূমিসূতা বলল, কেন তাকে বঞ্চিত করবেন? এইবার একবার তার কাছে যান।

ভরত বলল, হ্যাঁ, যাব। এখন যেতে পারি। তুমি ... তুমি এতগুলো বছর ... তুমি কেন একা ছিলে? তুমিও তো জানতে না আমি বেঁচে আছি কি না। অনেকেই বলেছে, তুমি থিয়েটারের নাম করা অভিনেত্রী ছিলে, অথচ তুমি কোনও পুরুষ ... কেউ তোমার ... তুমি কারওকেই চাওনি। কেন নিজেকে বঞ্চিত করেছ?

ভূমিসূতা বলল, সেই যে আপনি একবার আমার হাত ধরেছিলেন, তারপর আর ... আমার ইচ্ছে করেনি, আমার মন চায়নি।

হঠাৎ মাথাটা তুলে, সোজা হয়ে বসে ভূমিসূতা বলল, না, ঠিক বলিনি। মন চেয়েছিল। আমি কোনও পুরুষকে স্পর্শ করিনি, কিন্তু মন দিয়েছিলাম একজনকে। দেবতাকে মানুষ যেমন ভালবাসে, সেইরকম আমিও একজন মানুষকে ...

ভরত বলল, কে তিনি? তিনি ধন্য! নাম শুনলে কি চিনতে পারব?

ভূমিসূতা বলল, হ্যাঁ। তিনি একজন কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভরত বিস্মিতভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, রবীন্দ্রবাবু? তাঁর সঙ্গে? সরলা ঘোষালের বাড়িতে বুঝি তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল?

ভূমিসূতা বলল, না সেখানে একবারও দেখা হয়নি।

তারপর একটু থেমে আবার ধীর স্বরে বলল, আর কেউ জানে না, তবু আপনার কাছে স্বীকার করতেই হবে, শুধু ভক্তি নয়, পুজো নয়, সে ছিল ভালবাসা, তাঁকে আমি মন দিয়েছিলাম, আমার এক এক সময় খুব কষ্ট হত, তাঁর লেখা পড়তে পড়তে...তিনি অবশ্য কিছুই জানেন না, তিনি দু'তিনবার এসেছেন আমাদের থিয়েটারে, সেখানেই দেখেছি, একটা কথাও হয়নি, সবই শুধু এক দিক থেকে...

ভরত বলল, রবীন্দ্রবাবু আমারও খুব প্রিয়। কবিদের মন দেওয়া যায়।

তারপর যেন সে আর কথা খুঁজে পেল না। নদীর দিকে চেয়ে রইল। মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে দেখতে আপন মনে বলে উঠল :

এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম-বিশ্বাস ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত। আশাহীন
কর্মের উদ্যম— হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম ....

বলতে বলতে হঠাৎই থেমে গেল ভরত। মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনল সামনের দিকে। বলল, ভূমি, একবার আমার দিকে তাকাও। এ কী, তোমার চোখে জল কেন?

ভূমিসূতা বলল, হ্যাঁ, চোখে জল এসে যাচ্ছে, কিন্তু আমি কাঁদছি না।

ভরত বলল, আমার চোখে কেন জল আসে না ? ভেতরটা কি একেবারে শুকিয়ে গেছে ? যারা ভালবাসতে পারে, তারাই কাঁদতে পারে। আমার খুব ইচ্ছে করে—

ভূমিসূতা বলল, পুরুষ মানুষদের কাঁদতে নেই। ভাল দেখায় না।

ভরত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কতগুলো দিন কেটে গেল, কত বছর, আর কখনও দেখা হবে ভাবিনি। এখন মনে হয়, তুমি অনেক দূরের মানুষ, মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান...

ভূমিসূতা বলল, আমি এই তো কাছে বসে আছি...

ভরত বলল, আমার ভবিষ্যতে কী আছে জানি না। তুমি, সেই যে অনেক বছর আগে কলুটোলার কাছে দোকানের সিঁড়িতে তুমি বসেছিলে, আমি তোমার হাত ধরেছিলাম, তারপর এতগুলো বছর ..., আজ যদি তোমার হাতটা আবার ধরতে চাই, তুমি দেবে ?

ভূমিসূতা নিজের ডান হাতের পাঞ্জার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল, প্রায় ফিসফিস করে বলল, এই হাত, শুধু একজনেরই জন্য—

ডানপাশ ফিরে সে বাড়িয়ে দিল হাতখানি।

তারপর ওরা হাত ধরে চুপ করে বসে রইল। আর কোনও কথা নেই, সমস্ত কথার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ওরা বসেই রইল। ঘাট ক্রমশ নির্জন হয়ে আসছে। বাতাস বইছে বেশ জোরে। বজরাগুলোও ফিরে যাচ্ছে। সবাই ঘরে ফিরছে। এই দু'জনের যেন কোনও ঘরবাড়ি নেই, কোথাও ফিরতে হবে না। এরকম একটি অনন্তকালের দৃশ্য হয়ে ওরা বসেই থাকবে।

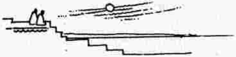

লেখকের কথা

আঠারোশো বিরাশি সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অতি তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভগ্নহৃদয়' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন এই কবি খুবই স্বল্প পরিচিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতারা স্নেহভরে তাঁর কবিতার বই ছাপিয়ে দিতেন। তবু ওই কাব্যগ্রন্থ সুদূর ত্রিপুরা রাজ্যে (বাংলার প্রতিবেশী হলেও তখন সুদূরই ছিল) পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেখানকার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য সেটি পাঠ করেছিলেন। রাজার পাটরানি তখন সদ্য-মৃত, তিনি ওই কবিতাগুলি পাঠ করে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এবং দূত মারফত শিরোপা পাঠিয়েছিলেন কবিকে। একজন নবীন কবির পক্ষে এই রাজস্বীকৃতি খুবই বিরল ঘটনা এবং এই ঘটনাটি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। আমার উপন্যাস এখান থেকেই শুরু।

ত্রিপুরার এই রাজ পরিবারটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল ও আগ্রহ অনেক দিনের। ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির তুলনায় ত্রিপুরার তফাত ছিল। ত্রিপুরা একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গণ্য হত। রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ও তাঁর উত্তরাধিকারী রাধাকিশোর মাণিক্য বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য স্বয়ং বাংলা কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করতেন, তিনি ও তাঁর পুত্র দুজনেই বাংলা সংস্কৃতির প্রসারে বহু রকম পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাঁদের রাজকোষ তেমন স্বাস্থ্যবান না হলেও এই ব্যাপারে বহুবার দান করেছেন উদার হস্তে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে সময়মত আর্থিক সাহায্য না পেলে বিদেশে আত্মসম্মান রক্ষা করে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করতে পারতেন কি না বলা যায় না। এই সব কাহিনী এখন তেমন সুপরিচিত নয়। এই রাজপরিবার নিয়ে একটি উপন্যাস রচনার চিন্তা আমার মনের মধ্যে আস্তে আস্তে দানা বেঁধেছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কয়েকবার ত্রিপুরাতে ঘুরেও এসেছি। 'প্রথম আলো' লেখা আরম্ভ করার কিছু দিন পর আমি বুঝতে পারলাম, শুধুই একটি রাজ-কাহিনী গড়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উপাদানের বড় অভাব, তা ছাড়া রাজা হোক বা প্রজা হোক, চরিত্রগুলির ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলি এবং জীবন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ফোটাতে না পারলে তা নিছক ইতিহাস হতে পারে, উপন্যাস হয় না। আবার উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি রক্ষা করতে গেলে কল্পনার মিশ্রণ, আগেকার দিনের গোয়ালাদের দুধে জল মেশানোর মতন, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলে না।

এই জাতীয় উপন্যাস রচনার সময় আমার কোনও পূর্বকল্পিত ছক থাকে না। মূল একটি বিষয় মনের মধ্যে স্থির থাকে, তা ঘিরে গড়ে ওঠে কাহিনী। পরিণতি সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণা থাকে না। কাহিনীর যেন নিজস্ব একটি গতি আছে, চরিত্রগুলিও যেন নিজেরাই পথ বেছে নেয়, সেই ভাবে কাহিনী এগিয়ে যায়। যেমন, ভরত নামে একটি কিশোরের চরিত্র যখন আমি প্রথম সন্নিবেশিত করি, সে যে পরে সমগ্র কাহিনীতে একটি অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে, তখন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বলতে গেলে। ত্রিপুরার রাজার সূত্রে যখন রবীন্দ্রনাথের কথা এসে পড়ে, তখন মনে হয়েছিল যে তিনিই হবেন এ-উপন্যাসের নায়ক, তাও সর্বাংশে হয়নি অবশ্য। আমার মূল বিষয় আমাদের ইতিহাসের বিশেষ একটি সময় এবং সেই বিষয়ের টানেই আরও অন্যান্য বহু চরিত্র ও ঘটনাবলি এসেছে। 'সেই সময়' উপন্যাসে আমি ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সময়কে বিধৃত করেছি। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের ব্যাপ্তিকাল দুই দশকের কিছু বেশি, এক শতাব্দীর শেষ ও অন্য শতাব্দীর শুরু। 'সেই সময়' উপন্যাসের মূল উপজীব্য ছিল সমাজ সংস্কার, তাকে কেন্দ্র করে

নানাবিধ দ্বন্দ্ব, বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদিকাল, শিক্ষা বিস্তার ও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে স্থান দেয়নি। বরং সিপাহি বিদ্রোহের সময় ভয় পেয়েছে, তা যে এক ধরনের বিপ্লব তা বোঝেওনি, সমর্থনও করেনি। পূর্ববর্তী দীর্ঘকালের অরাজকতার বদলে ইংরেজরা যে শক্তিশালী স্থায়ী সরকার গড়েছিল, বরং তাতেই স্বস্তি পেয়েছে। কিছুটা মুক্ত চিন্তার অধিকারী সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মন দিয়েছে সংস্কৃতিচর্চায়। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেই সেই মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লব ও স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস এ দেশের অনেকের কাছে পৌঁছে যায়। আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে ইংরেজদের মার খাওয়া এবং জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়ের সংবাদে এদেশেও কিছু কিছু মানুষের মনে এই চেতনা জাগে যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি অপরাজেয় সর্বশক্তিমান নয়। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের সময়সীমায় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষই প্রধান ঘটনা। তৎকালীন দেশের অবস্থা বোঝাবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলন, অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চা, থিয়েটারের ভূমিকা, কবি রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের মতবিভেদ, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগ, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদ-রেখা সৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে আনতে হয়েছে। প্রথমে ভাবিনি, এই রচনাটি এত বৃহদায়তন হবে, কিন্তু এক প্রসঙ্গের টানে অন্য প্রসঙ্গ অবধারিত ভাবে এসে গেছে, যেমন পেশাদারি থিয়েটার মঞ্চে গিরিশ ঘোষ-বিনোদিনী-অর্ধেন্দুশেখরের অবদানের কথা লিখতে গেলে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মতন এক বর্ণময় উল্কা-প্রতিম চরিত্রের কথা বাদ দেওয়া যায় না।

"প্রথম আলো' আমার পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সেই সময়'-এর পরবর্তী খণ্ড নয়, কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতার মিল আছে।

তথ্য সংগ্রহ করতে করতে নেশা লেগে যায়, আবার অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়ে গেলে উপন্যাসটি তথ্য-ভারাক্রান্ত হবার ভয়ও জাগে। তথ্যের সন্ধানে আমি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পর্যন্ত হানা দিয়েছি কার্জন পেপারস দেখার জন্য। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে গিয়ে ইন্দিরা দেবীর নিজের হাতে লেখা খাতাটি দেখতে গেছি। রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল চিঠিগুলি গোপন করে যে-খাতায় তিনি চিঠিগুলির অংশ বিশেষ লিখে রেখেছিলেন, সে-খাতাতেও বহু লাইন বারবার ঘষে ঘষে কাটা, যাতে কিছুতেই পাঠোদ্ধার করা না যায়, এমনকী কোনও কোনও পৃষ্ঠার কিছু অংশ কাঁচি দিয়ে কাটা। কেন এত গোপনীয়তা? সেই খাতার ভিত্তিতেই পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'ছিন্ন পত্রাবলী'। সত্যিই 'যার সর্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে'। যাই হোক, সংগৃহীত অনেক তথ্য আমাকে বাদ দিতেও হয়েছে অন্য কারণে। এক সময় আমি ভেবেছিলাম, ভারতীয়দের পাশাপাশি সেই সময়কার ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়েরও ঘরোয়া ছবি দেখিয়ে দেব, পরে মনে হল তাতে উপন্যাসটি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাবে। সেই জন্যই শুধু লর্ড কার্জনের প্রসঙ্গই এনেছি। সব সময় মনে রাখতে হয়েছে, বিশুদ্ধ ইতিহাস রচনা আমার কাজ নয়, সে দায়িত্ব আমি নিইনি, সে যোগ্যতাও আমার নেই, আমি উপন্যাস রচয়িতা মাত্র।

তথ্য সংগ্রহের জন্য নানান গ্রন্থ পাঠের একটা আলাদা সুখও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটির সন্ধান করতে করতে মনে হয়েছে, ওঁরা আমার খুব কাছের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার অন্তরালের উপলক্ষ্য জানতে পারলে রোমাঞ্চ হয়। সত্যি কথা বলতে কী, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতা ও গদ্য সব এমন তন্ন তন্ন করে আমি আগে পড়িনি, এই পাঠে যেমন আমি রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি, তেমনই এই সব রচনার মধ্য থেকে যে বহুমুখী প্রতিভাবান কবি এবং প্রেমিক, কর্মদ্যোগী এবং অ-সাংসারিক মানুষটি প্রকাশিত হয়েছে, এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ হিসেবে তাকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।

উপন্যাসে কতখানি ইতিহাস আর কতখানি কল্পনা, তা নিয়ে পাঠকদের মনে ধন্দ থাকে। যাঁরা ইতিহাসবিদ, তাদের এ-সমস্যা নেই। কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই এ রকম প্রশ্ন করেন। ঐতিহাসিক চরিত্রদের পাশাপাশি কিছু কিছু কাল্পনিক চরিত্র মিশিয়ে না দিলে কাহিনী নির্মাণ করা যায়

না, কাহিনীর অগ্রগতিও হয় না। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি চিহ্নিত করার পর বাকি কোন কোনটি কাল্পনিক চরিত্র, তার একটি তালিকা দেওয়াও অসঙ্গত, অবান্তর। শুধু এইটুকু বলা যায়, ভরত ও ভূমিসুতা সম্পূর্ণই লেখকের কল্পনাপ্রসূত। সেই সময়কার একটি পত্রিকায় ওড়িশার একটি কিশোরীকে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করার সংবাদ পাঠ করে আমি ভূমিসুতা চরিত্রটি গ্রহণ করি। সেই অনাথিনী কিশোরীকে দেবদাসী হিসেবে নিয়োগ করার উদ্যোগ দেখেই মনে হয়েছিল, সে সম্ভবত নাচ-গান জানে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকেও আমি বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত করিয়েছি, তাদের মুখে সংলাপ বসিয়েছি, তাতে কিছুটা স্বাধীনতা নেওয়া হলেও তা একেবারে তথ্য বহির্ভূত নয়। তাঁদের রচনা, চিঠিপত্র, অন্যদের স্মৃতিকথা থেকে সেইসব পরিবেশ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সংলাপ ব্যবহারের স্বাধীনতা তো ঔপন্যাসিককে দিতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে-কথা আছে, চিঠিতে অন্যদের যা লিখেছেন, কিংবা প্রবন্ধে, তারও কিছু কিছু আমি ব্যবহার করেছি সংলাপ হিসেবে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে লিখতে গেলে লেখকের নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকবেই। তা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে মতভেদও ঘটতেই পারে। পুরো উপন্যাসটিতে আমি যা লিখেছি, তার বাইরে আমি আত্মপক্ষের সমর্থনে আর কিছু জানাতে আগ্রহী নই। তবে প্রাসঙ্গিক ভাবে দু'একটি বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময়ই হিন্দু দেবী কালী সম্পর্কে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের একটি মন্তব্যের জন্য প্রবল আপত্তি ওঠে। ডাক্তার সরকার কালীকে বলেছিলেন 'সাঁওতালি মাগি', তাতে হিন্দুদের ধর্মবোধে আঘাত লেগেছে এই অভিযোগ নিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হন; কলকাতার ময়দানে সাঁওতালরা সভা ডেকে আমাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। হিন্দু ধার্মিকেরা খেয়ালই করেননি যে এটা ঔপন্যাসিকের নিজস্ব বক্তব্য নয়, বাস্তব চরিত্র ডাক্তার সরকারের উক্তি, তিনি একাধিকবার এই উক্তি করেছিলেন, একবার শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাতে আহত বা ক্রুদ্ধ হননি, বরং হাস্য করেছিলেন। এই উক্তি আক্ষরিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে শ্রীম রচিত "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত" গ্রন্থে এবং বিবেকানন্দের অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায়। সাঁওতালদের আপত্তি অন্য কারণে, আমি সাঁওতালবন্ধুদের বোঝাতে চাই যে 'মাগি' শব্দটি তৎকালে কোনও হীন অর্থে ব্যবহৃত হত না, এমনকী অনেক মহিলাও নিজেদের সম্পর্কেও এই কথাটি বলতেন (যেমন, 'আমি বুড়ি মাগি', 'আমি বিধবা মাগি')। কোনও এক স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল রমণীর সাদৃশ্যে এক হিন্দু তান্ত্রিক দেবী কালীর মূর্তি গড়েছিলেন মাত্র কয়েকশো বছর আগে, এমন তথ্যও আছে। হিন্দুদের মূর্তিপূজা মোটেই বেশি দিনের ব্যাপার নয়, রামায়ণ-মহাভারতে দেব-দেবীর কোনও মূর্তির উল্লেখ নেই।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। প্রবহমান ঘটনাবলি থেকে কিছু কিছু যে বেছে নিয়ে উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়, তাতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। তেমনই একটি উদাহরণ, অ্যালবার্ট হলে সিস্টার নিবেদিতার কালী বিষয়ক বক্তৃতা। এই বক্তৃতার সঙ্গে নিবেদিতার কর্মজীবনের কোনও মিলই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর মতন এক বিস্ময়কর উদার ধর্মনীতি স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর বিরাট ধর্ম সম্মেলনে তেজের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দই কেন কলকাতার প্রকাশ্য সভায় তাঁর বিদেশিনী শিষ্যাকে দিয়ে কালীপূজার মাহাত্ম্য ও পশুবলির সমর্থনের বক্তৃতা দেওয়ালেন, তার মর্ম বোঝা যায় না। এটা স্বামীজির চরিত্রের নানা বৈপরীত্যের একটি দৃষ্টান্ত বলেই মনে হয়। সিস্টার নিবেদিতাকে তিনি আনিয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও মানবসেবার জন্য, তার সঙ্গে কালীপূজা ও পশুবলির সম্পর্ক কী? বিবেকানন্দর জনপ্রিয়তা ও নিবেদিতা সম্পর্কে মুগ্ধতা সত্ত্বেও যে ওই রকম ঘটনার প্রতিবাদ জানাবার মতন মানুষ সেকালে ছিল, সেটা দেখাবার জন্যই আমি ওই জনসভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। ধর্মীয় উন্মাদনার বিপরীতে ছিল বিজ্ঞানচেতনা ও যুক্তিবাদ। এ দেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তার প্রতিনিধি।

ভক্তিবাদ আমার বিষয় নয়। যাঁরা আমাদের দেশে মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য, তাঁদের রক্তমাংসের

মানুষ হিসেবেই আমি দেখাতে চেয়েছি। জন্ম থেকেই কেউ মহাপুরুষ হয় না। সাধারণ মানুষের মতনই তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, কখনও দু-একটি দুর্বলতা প্রকাশ পায়। স্বামী বিবেকানন্দের তামাক ও ইলিশ মাছের প্রতি আসক্তি, কৌতুক প্রবণতা, কৌতুকের ঝোঁকে প্রাকৃতজনের মতন ভাষা ব্যবহার, তাঁকে আমাদের অনেক কাছের মানুষ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথও কখনও কখনও দুর্বল হয়ে পড়েছেন, মাঝে মাঝে অবিবেচকের মতন এমন ভুল করেছেন (যেমন, একগাদা পণের টাকা কবুল করে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ততা), যে জন্য নিজেকে গর্দভ পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এতে সেই মহান কবি ও মহান মানুষটির অসাধারণত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। সাধারণ অবস্থা থেকে, ভুল-ভ্রান্তির পথ ভেঙে ভেঙে অসাধারণত্বে উন্নীত হওয়ার কাহিনীই অন্যদের প্রেরণা দিতে পারে।

আমার কৈশোরে স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের মতন চরম বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটে গেছে। বাংলা ও বাঙালি জাতি হয়েছে দ্বিখণ্ড। আমি সেই ট্র্যাজেডি প্রত্যক্ষ করেছি এবং পারিবারিক ভাবে দেশবিভাগজনিত অনেক বিপদ, অসহায়তা ও কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে দুই বাংলা আবার যুক্ত হবার সম্ভাবনা নেই, হয়তো যৌক্তিকতাও নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংরেজ সরকার জোর করে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করেছিল, সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়ে সৃষ্টি করেছিল কৃত্রিম দুই বাংলা, তখন জনগণের প্রবল প্রতিবাদে ইংরেজ সরকার সে-সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল, আবার মিলিত হয়েছিল দুই বাংলা, বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিরা পুনর্গঠিত হয়েছিল এক জাতি হিসেবে। সেই বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি জাতির পুনর্মিলনের অধ্যায়টি বিস্তৃত ভাবে রচনা করে আমি ব্যক্তিগত সুখ অনুভব করেছি। এটাকে 'ভাইকেরিয়াস প্লেজার'ও বলা যেতে পারে।

সেই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। সেই প্রথম বিদেশি শাসকদের কোনও নীতির প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে আসে। ছাত্র সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়। সারা ভারতেই এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ আর শাসকশ্রেণীকে ভয় পায়নি। জনসাধারণের সেই ভয়-ভাঙাই স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে প্রথম ও বিশেষ অর্জন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সারা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

দুই বাংলা আবার জোড়া লাগে ১৯১১ সালে। আমার কাহিনী থেমে গেছে তার কিছুটা আগে। পরবর্তী ঘটনার বর্ণনায় ইতিহাসের কচকচি বেশি এসে যেত। আগেই বলেছি, আমি ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিনি। তবে পাঠকদের অবগতির জন্য কিছু কিছু ছিন্নসূত্রের পরবর্তী তথ্য এখানে জানানো যেতে পারে। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো নিজের বাড়ি ঘর বিক্রি করে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, ফ্রান্সে ছিলেন বেশ কিছুদিন, সেখানে বিপ্লবী গুপ্তসমিতির কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন এবং অস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ফিরে আসেন দেশে। মজফফরপুরে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর বোমা আক্রমণের পর শ্রীঅরবিন্দ, বারীন, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, সত্যেন, কানাই, নরেন প্রমুখ বিপ্লবীরা যখন ধরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ছিলেন অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য মোটর গাড়ির দুর্ঘটনায় কাশীতেই দেহরক্ষা করেন। নিবেদিতা বেঁচেছিলেন ১৯১১ সাল পর্যন্ত, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ইংরেজদের পিছু-হটা এবং ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের সূত্রপাত দেখে গেছেন।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় বিভিন্ন ব্যক্তি আমাকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে, ভুল ধরিয়ে, বই পত্র-পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু, চিত্রা দেব, মুনতাসীর মামুন, ঝরা বসু, এষা দে, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, পার্থ বসু, পার্থসারথি চৌধুরী, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, বাদল বসু, সুনীলকুমার মণ্ডল, হর্ষ দত্ত, সুব্রত রুদ্র, ইমদাদুল হক মিলন, অশোক মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের কাছে আমি সবিশেষ

কৃতজ্ঞ।

প্রশান্তকুমার পাল রবীন্দ্রজীবনের বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, তাঁর গ্রন্থ থেকে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি, তা আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে চাই।

অনেক পাঠক পাঠিকার অনুরোধে আমি এখানে একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী দিয়ে দিলাম।

রবিজীবনী (প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড)—প্রশান্তকুমার পাল
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৭ খণ্ড) —শঙ্করীপ্রসাদ বসু
নিবেদিতা লোকমাতা (চার খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বিবেকানন্দ স্মরণে বিদেশিনী—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
ইওরোপে বিবেকানন্দ—স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ
সহাস্য বিবেকানন্দ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ
স্বামীজীকে যে রূপ দেখিয়াছি—নিবেদিতা
স্বামীজী ও তার বাণী—নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—নিবেদিতা
স্বামী বিবেকানন্দ—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়—ডঃ বেণীশঙ্কর শর্মা
শাশ্বত বিবেকানন্দ—নিমাইসাধন বসু (সম্পাদনা)
স্বামী বিবেকানন্দর বাণী ও রচনা (নয় খণ্ড)
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ অন্য চোখে—উৎস মানুষ সংকলন
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ (সম্পাদনা)
বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য—প্রণবরঞ্জন ঘোষ
বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ
আমার জীবন কথা—স্বামী অভেদানন্দ
ধর্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের জীবনকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদনা)
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—(পাঁচ খণ্ড) শ্রীম
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত—মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা)
শ্রীশ্রীমায়ের কথা—উদ্বোধন কার্যালয়
শ্রীমার জীবন দর্শন—অভয়চরণ ভট্টাচার্য
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী—রোঁমা রোলাঁ
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (দুই খণ্ড)—স্বামী সারদানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ—ক্রিস্টোফার ইশারউড

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা (দুই খণ্ড)—স্বামী প্রভানন্দ
অলৌকিক রহস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন—লাডলীমোহন রায়চৌধুরী
সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীতে রামকৃষ্ণ—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
ঈশ্বরকোটির রঙ্গকৌতুক—কমলকুমার মজুমদার
মহিমা তব উদ্ভাসিত (ধর্ম মহাসভা : শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ)—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (সম্পাদনা)
রবীন্দ্র রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংকলন)
অনন্য রবীন্দ্রনাথ—নিতাই বসু
রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—মন্মথনাথ ঘোষ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—সুশীল রায়
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী—গোপালচন্দ্র রায়
জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল—সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে—সৌরীন্দ্র মিত্র
কাদম্বরী দেবী—সুব্রত রুদ্র
কারাগার কণ্ঠরোধে রবীন্দ্রনাথ—ডঃ দিলীপ মজুমদার
অন্য চোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ—পীযূষ দাশগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ—চিন্মোহন সেহানবীশ
রবীন্দ্রনাথকে কৌতুক—সুব্রত রুদ্র
রবি সনাথ—অমিয়কুমার সেন
নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ—জ্যোতির্ময় ঘোষ
মৃণালিনী দেবী, রবীন্দ্রকাব্য ও জীবনে—প্রজ্ঞা পারমিতা বড়ুয়া
মাধুরীলতার গল্প—পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সংকলক)
মাধুরীলতার চিঠি—পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
ইন্দিরা দেবী-প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী—সুভাষ চৌধুরী (সংকলক)
অবনীন্দ্র রচনাবলী
রঙ্গপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ—নিতাই বসু
আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু
শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
জমিদার রবীন্দ্রনাথ—অমিতাভ চৌধুরী
আমার জীবনস্মৃতি—লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া
জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী চৌধুরানী
স্মৃতিকথা—সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদনা)
আত্মচরিত—ফকিরমোহন সেনাপতি
কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র
বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
বঙ্কিমচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়
রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা—গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদনা)
ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর—শ্রীনাথ চন্দ্র
আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—ঝরা বসু
রাজমালা ও আধুনিক ত্রিপুরা—পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী
ত্রিপুরা দর্শন—সমীরণ রায় (সম্পাদনা)
জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যান—বিশ্বনাথ দাস (সম্পাদনা)
ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য—প্রদীপ আচার্য
ছবি তোলা, বাঙালির ফটোগ্রাফি চর্চা—সিদ্ধার্থ ঘোষ
দেশীয় রাজ্য—মহিম ঠাকুর
ত্রিপুরার স্মৃতি—কুমার সমরেন্দ্রনাথ
ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল—চিত্রা দেব
মহিলা ডাক্তার : ভিন গ্রহের বাসিন্দা—চিত্রা দেব
অন্তঃপুরের আত্মকথা—চিত্রা দেব
বিজ্ঞান পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র—ডঃ বিমলেন্দু মিত্র
জগদীশচন্দ্র—সালাম আজাদ
নানা চোখে ঋষি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র—দেবব্রত ভট্টাচার্য ও অজয় চক্রবর্তী (সম্পাদনা)
বিজ্ঞান ভাবনায় কলকাতা—অরূপরতন ভট্টাচার্য (সম্পাদনা)
ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার জনক জগদীশচন্দ্র—দিবাকর সেন
স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস— অমলেশ ত্রিপাঠী
ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব—অমলেশ ত্রিপাঠী
বঙ্গীয় নব জাগরণের অগ্রপথিক—পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘ
সত্তর বৎসর (আত্মজীবনী)—বিপিনচন্দ্র পাল
কলকাতার গুপ্ত সমিতি : উনিশ শতক—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
জাতি যেদিন গঠন পথে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
আমার আত্মকথা—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
সঞ্জীবনী (সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র)—কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা)
কীর্তির্যস্য—ভবতোষ দত্ত
একশো বছরের বাংলা থিয়েটার—শিশির বসু
গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
অমৃতলাল বসুর জীবন ও সাহিত্য—ডঃ অরুণকুমার মিত্র
গিরিশ প্রতিভা—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা—মন্মথ রায়
আমার কথা ও অন্যান্য রচনা—বিনোদিনী দাসী
অমৃত মদিরা—অমৃতলাল বসু
তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
অর্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার—শঙ্কর ভট্টাচার্য

থিয়েটারের গালগল্প—বিষ্ণু বসু
সাজঘর—ইন্দ্রমিত্র
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত
বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১, তিন খণ্ড)—সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদনা)
শোকগাথা—অনঙ্গমোহিনী দেবী
কলকাতা কলহ কথা—সুভাষ সমাজদার
তৃতীয় মীর—শান্তনু কায়সার
ইমান ও নিশান—গৌতম ভদ্র
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : নতুন ভাবনা—ডঃ পঞ্চানন সাহা
ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা—গৌতম নিয়োগী
দাঙ্গার ইতিহাস—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্মের উৎস সন্ধানে—ভবানীপ্রসাদ সাহু
বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক—নজরুল ইসলাম
বাঙলার কীর্তন ও লোকসঙ্গীত—ডঃ রীনা দত্ত
বাংলা দেহতত্ত্বের গান—সুধীর চক্রবর্তী
সঙ্গীত চয়ন—চারণ কবি মুকুন্দদাস
ছড়ায় মোড়া কলকাতা—পূর্ণেন্দু পত্রী
বঙ্গভঙ্গ—সমুদ্র গুপ্ত
বঙ্গভঙ্গ—মুনতাসীর মামুন (সম্পাদনা)
বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কাননুগো
উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র— মুনতাসীর মামুন
উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি—মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম
পুরনো ঢাকা : উৎসব ও ঘরবাড়ি—মুনতাসীর মামুন
প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য—ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়
The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908)—Sumit Sarkar
Modern India 1885-1947—Sumit Sarkar
Tripura District Gazetteers—K.D. Menon (Editor)
History and Culture of Bengal—A.K. Sur
Bengal Under the Lieutenant Governors—C.F. Buckland
History of the British Empire in India—E. Th
Terrorism in India—C. Tegart
Urban Roots of Indian Nationalism—Rajat Ray
British Statesmen in India—V. B. Kulkarni
The Life of Lord Curzon—Earl of Ronaldshay
India Under Curzon and After—Lovat Frazer
Lord Curzon the last of the British Moghuls—Nayana Goradia
Viceroys of India—M. Bence-Jones
Political Protest in Bengal—Boycott and Terrorism
Curzon in India—David Dic[illegible]
British Policy in India—S. G[illegible]l
Muslims in British India—Peter Hardy
Kitchener, Portrait of an Imperialist—Sir Philip Magnus
History of the Freedom Movement in India—R.C. Mazumder
India's Fight for Freedom—Haridas & Uma Mukherji
The Emergence of Indian Nationalism—Anil Seal
The Life and Philosophy of Lokmanya Tilak—Dr. V.P. Varma
Tilak and Gokhale—Stanley Wolpart
Annie Besant—Anne Taylor
Modern Religious Movements in India—J. Farquhar
The Life of Josephine Macleod—Prowrajika Prabudhaprana
An Autobiography—M.K. Gandhi
The Illegitimacy of Nationalism—Ashis Nandy
(ইংরেজি বইয়ের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া অপ্রয়োজনীয়)